বাউল

শিল্পী—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

আমরা ব্যবসায়ী বাঙ্গালী—ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। একটি সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবার কল্পনা আমরা করিলাম কেন, এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যব্যাপার আমাদের পক্ষে অব্যাপার বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু ঠিক কি তাই?

ভাবের ঘরে চুরি করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, আমরা যখন পত্রিকা-প্রকাশ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করি, তখন একটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল। সে সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ করিয়া কিছু বলি নাই; ভাবিয়াছিলাম, উদ্দেশ্য ক্রমশঃ আপনাকে আপনি পরিস্ফুট করিবে; অঙ্কুর ফল ও ফুলে যথাসময়ে পরিণতি লাভ করিবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে পত্রিকার নাম, সম্পাদক ইত্যাদি অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে।

এই পরিবর্ত্তনের সুযোগ লইয়া আমাদের মূল উদ্দেশ্যটি আমরা সাধারণের গোচর করিতেছি; অতঃপর, আর যাহাই হউক, আমাদিগকে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের সহিত বহিঃপৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; এই সম্পর্ক কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম্মগত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই যে শিল্পবাণিজ্যগত, ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। একাধিক স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, আরব, এশিয়ামাইনর, চীন, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার শিল্প-বাণিজ্যের পণ্যাদি প্রেরিত হইত; জলপথে বঙ্গোপসাগরের কূল হইতে বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত অর্ণবপোত চলাচল করিত। এই সকল বাণিজ্যপথ যখন যে-দেশের অধিকারে ছিল তখনই সেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্ক খণ্ডিত হওয়া মাত্রই এই সকল দেশ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তৎকালে নিজেদের ব্যবহার্য্য যাবতীয় বস্তু প্রস্তুত হইত না, উদ্বৃত্ত দ্রব্য ভিন্ন দেশে পণ্যরূপে প্রেরণ করা তো দূরের কথা। একমাত্র ভারতবর্ষেই ভারতবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইত এবং ব্যবহৃত হইয়া এত উদ্বৃত্ত থাকিত যে অন্যান্য বহুদেশে সেগুলি বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও মানবের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য-উৎপাদনে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাক্‌চারে ভারতবর্ষ একদা অদ্বিতীয় ছিল বলিয়াই শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারেও পৃথিবীর অন্য সকল দেশ অবনত মস্তকে ভারতের প্রাধান্য স্বীকার করিত; ভারতবর্ষই একমাত্র ভূখণ্ড ছিল নিজের প্রয়োজনের জন্য যাহাকে অন্য কোনও দেশের নিকট হাত পাতিতে হইত না। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ থাকিয়া স্বীয় প্রতিভা, কলাকৌশল ও ক্ষমতার প্রাচুর্য্যে অন্যান্য দেশেরও কল্যাণ সাধন করিত।

কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যবসায় করিতে গিয়া কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অভাব-দৈন্যগ্রস্ত। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যই আর ভারতে প্রস্তুত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে অতিরিক্ত মূল্যবিনিময়ে তাহাকে নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়; সর্ব্বদা তাহাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়।

এমন হইল কেন? এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল কিসে? যাহারা একদা শিল্প-বাণিজ্যে সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধর আমরা এমন ভাবে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইলাম কেন? কাঁচা মাল বা 'র মেটিরিয়েল' ভারতবর্ষে এখনও তেমনই

উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃতি এখনও অযাচিত কৃপা বর্ষণ করিতেছেন, তথাপি আমাদের এই ব্যর্থতা, এই দারিদ্র্য কেন? অতীতে ও বর্ত্তমানে এই বিসদৃশ বৈষম্য কেন হইল?

আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই একটি দ্রব্য-উৎপাদন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া আমরা আমাদিগের এই শোচনীয় অধঃপতনের মূল কারণের সন্ধান পাইতে লাগিলাম। আবেষ্টনীর সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু দেশের লোকের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; দেহে ও মনে নানা বিকার আসিয়াছে। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বহিঃপৃথিবীর সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের দেহ ও মনের ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়াছে, রুচির তারতম্য ঘটিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক ছিল, বিকৃত মনোবৃত্তির জন্য আদর্শের বদল হইয়া তাহার অনেক অতিরিক্ত আমরা কামনা করিতেছি। ফলে, আমরা আর আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ থাকিতে পারিতেছি না। এমন বহু দ্রব্য আমাদের আবশ্যক হইতেছে যাহা উৎপন্ন করিবার সুবিধা নাই, কৌশলও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। সুতরাং বহিঃপৃথিবীর নিকট আমাদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রার্থী রূপে দাঁড়াইতে হইতেছে। আমরা ক্রমশঃ দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছি।

আদর্শের বিকার ঘটাতে রুচিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে অনেক বিজাতীয় দ্রব্য স্থান পাইতেছে, যাহা অন্য দেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুবিধামত উৎপাদন করা সম্ভব নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা পারিতেছিও না; ক্রমশঃ অধিকতর বিকৃতিরুচি হইয়া অধঃপতিত হইতেছি।

এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে। এক, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক আদর্শে নিজেদের অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অথবা জীবন-যুদ্ধে জয়ী আমাদের শালপ্রাংশু মহাভুজ পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিস্মৃত আদর্শ সন্ধান করিয়া তাহার অনুসরণ করা।

প্রথমোক্ত পন্থা যে আমাদের নহে তাহা যাঁহারা বর্ত্তমানে সে-পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য ও চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ বিক্ষিপ্তচিত্ত, অশান্ত; সেখানকার চিন্তাশীল মনস্বীরা জগৎ ও জীবনের সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন; যে প্রচণ্ড গতিতে পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ মুক্তির বা ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, সেই গতিমুখ ফিরাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন, এমন কি, এই দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত পতিত ভারতবর্ষের নিকটেও তাঁহারা মুক্তির বাণী প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

সুতরাং দ্বিতীয় পন্থাই আমাদের পন্থা এবং নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বর্ত্তমানের এই পরাজয়, এই ক্ষুদ্রতা, এই অপমানের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে, শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে আবার পূর্ব্বের প্রাধান্য অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদিগকে পিছনে ফিরিয়া দেখিতে হইবে; আমাদের গৌরবময় অতীতের সহিত, আমাদের বিজয়ী পিতৃপিতামহগণের সহিত মুখামুখি দাঁড়াইতে হইবে; তাঁহাদের আদর্শ সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহারা গৌরবের সর্ব্বোচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন সেই বাণী অধিগত করিতে হইবে; তবেই আমরা সুস্থ, সবল, ঋজু মানুষ হইয়া তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণা ও বাণিজ্য-প্রতিভা লাভ করিব।

কিন্তু কোথায় তাঁহাদের বাণী, কোথায় তাঁহাদের সেই মহিমময় আদর্শ? ভারতবর্ষের জন-সাধারণ তাহার সন্ধানও জানে না; পূর্ব্ব-পুরুষের সহিত তাহাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াছে। আত্মবিস্মৃত জাতির এই মোহ দূর করিবার জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সেই বাণী, সেই আদর্শ, যাহা তন্ত্রমন্ত্র-সংহিতা-পুরাণ-কাব্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহারই সুলভ প্রচার সংকল্প করিয়া প্রাচ্য-গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ স্থাপন করিলাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও প্রথিতযশা অধ্যাপকগণকে নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়দর্শন, কৌলজ্ঞান, কাব্যপ্রকাশ, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, অভিনয়-দর্পণ প্রভৃতির বিশুদ্ধ পাঠ ও টীকাসম্বলিত সংস্করণের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইল।

আমাদের ব্যবসায়ের সহিত আমাদের প্রাচ্য-গ্রন্থ-প্রচার-বিভাগের সম্পর্ক সংক্ষেপে ইহাই। কিন্তু শুধু প্রাচ্যগ্রন্থ প্রচার লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলাম না। এই সকল গ্রন্থ যে ভাষায় ও যে ভাবে লিখিত দেশের জনসাধারণ

সে ভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে, ভাষার জটিলতা ভেদ করিয়া লিখিত বিষয়সমূহ অধিগত করিবার শিক্ষাও তাহাদের নাই। এই সকল গ্রন্থ যাঁহারা বংশগত সম্পত্তি হিসাবে সগৌরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই এই সকল গ্রন্থের যথাযথ তাৎপর্য্য নিজে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইবার মত শিক্ষা ও সামর্থ্য নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদের কবলে ভারতবর্ষের কীর্ত্তিসমূহের ইতিহাস রক্ষিত হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রামের পরিধির বাহিরে দেশকে কল্পনা করিতেই পারেন না; বিরাট ভারতবর্ষের কোনও স্পষ্ট ধারণাই তাঁহাদের নাই। বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি দর্শনের সেখানে সূত্রপাত অথচ দর্শনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত যাঁহারা তাঁহাদের অনেকেই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ।

এমত অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নহে বুঝিয়া বর্ত্তমানযুগপ্রচলিত ভাষায় সাধারণের সহজবোধ্য ভাবে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য ও মহান্ আদর্শের পরিচয়-সম্বলিত যে সকল গ্রন্থ স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার মধ্যে লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল এবং যেগুলি পর পর প্রকাশ করিয়া আমরা সাধারণ্যে প্রচার করিতে চাহিতেছি, তাহাদেরই প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে প্রচার করার আবশ্যকতা অনুভব করিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে, আমাদের দেশের ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সহজবোধ্য ভাষায় পড়িতে পাইলে তাঁহারা কেন আয়ত্ত করিতে পারিবেন না? যোগশাস্ত্রে মানবের শক্তি-গুলিকে আশ্চর্য্যরকমে বাড়াইয়া তুলিবার যে সকল কথা আছে সেগুলিরই বা পরীক্ষা হইবে না কেন—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মনে জাগিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, দেশের প্রাচীন রত্নসমূহ যত মূল্যবানই হউক, যুগোপযোগী বেশভূষা পরিয়া আত্মপ্রকাশ না করিলে তাহাদের কোনও মূল্যই লোকে দিবে না। সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে প্রচলিত ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের অতীত বিস্মৃত পরিচয়, আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃ-পিতামহগণের আদর্শ আমাদের স্মরণে আসিবে। এই সকল কারণেই সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করিলাম।

সেই সময় শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকাটি লইয়া একটু বিব্রত হইয়াছিলেন। আমরা 'উপাসনা'কেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পুরাতন শিথিল জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন সৌধনির্ম্মাণের চেষ্টা নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত হইতে লাগিল দেখিয়া আমরা অবশেষে নূতন নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া 'উপাসনা'র নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বঙ্গশ্রী" রাখা হইল। দেশের পুরাতন শ্রীকে ফিরাইয়া আনাই ইহার চেষ্টা হইবে। 'উপাসনা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গশ্রী'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না; 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস।

আমরা বুঝিয়াছি প্রাচীন আদর্শে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া এই দুর্ভাগ্য জাতির আর মুক্তি নাই; পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া আদর্শচ্যুত আমরা, বিলাস-বাসনার বিকারে ও ভারে যে ভাবে পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, অচিরাৎ প্রাচীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই সকল বাহুল্য বর্জ্জন না করিলে আমরা বাঁচিব না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনা আমরা যদি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে নূতন শ্রীকেও প্রতিষ্ঠা দিতে পারিব। তাঁহাদের সেই সহজ সরল অথচ মহান্ আদর্শ জীবনে বরণ করিতে পারিলে একদা শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারেও তাঁহারা যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিই অর্জ্জন করিব; আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান আমাদের সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—মেট্রপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্‌লিশিং হাউস লিঃ

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাস

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, তাহা লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ, তর্ক-বিতর্ক আছে। আমি বলি, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসংবাদ ছাড়িয়া দিয়া গৃহস্থালী হিসাবে একটা কিছু ঠিক করিয়া লওয়া ভাল। সকল পুরাণেই বলে, পরীক্ষিতের অভিষেক হইতে নন্দরাজার অভিষেক পর্য্যন্ত ১০৫০ বৎসর। নন্দরাজার অভিষেক খৃঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে হয়। সুতরাং পরীক্ষিতের অভিষেক খৃঃ পূঃ ১৪৭৫ অব্দে হইয়াছিল। এই তারিখটি গ্রহণ করিবার বিশেষ একটি কারণ এই যে, পুরাণে মগধের রাজাদের প্রত্যেকের রাজ্যকাল দেওয়া আছে। ৫৯ জন রাজার রাজ্যকাল যোগ দিয়া ১০৫০ বৎসর হইয়াছে; সুতরাং এটা একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি হইতে পারে। এখন এইটা লইয়া দিন কত কাজ চালানও যাইতে পারে। যাঁহারা সূক্ষ্ম করিতে চান, তাঁহারা সূক্ষ্ম হিসাব লইয়া থাকুন। আমরা মোটামুটি চাই; আমাদের কাজ ইহাতেই চলিতে পারে।

পরীক্ষিৎ যখন রাজা হন, তখনই যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপ্রস্থান করেন। তখন তাঁহার বয়স ১০৮ বৎসর। এই কথা মহাভারতে বলিয়া দেওয়া আছে, হিসাব করিয়াই বলিয়া দেওয়া আছে; সুতরাং অবিশ্বাসের কারণ নাই। যুধিষ্ঠিরের বাবা ছিলেন পাণ্ডু, জ্যেঠা ধৃতরাষ্ট্র। দুইজনে প্রায় সমবয়সী, আর বোধ হয় তাঁহাদের ৩০।৩৫ বৎসর বয়সে ছেলে হয়। সত্যবতী শাস্ত্রানুসারে নিয়োগ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে ব্যাসদেবের দ্বারা সন্তান জন্মাইয়া লন। হিসাব মত পরীক্ষিতের অভিষেককালে ব্যাসদেবের বয়স বোধ হয় ১৭০-১৮০ বৎসর হইবে। তিনি তখন বাঁচিয়া ছিলেন; জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সময়েও ছিলেন; লোকে এইরূপ বলে। বিশ্বাস করিতে হয় কর, না হয় করিও না।

তবে তিনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন এটা ঠিক। বিভাগ মানে,—একটা মন্ত্ররাশি ছিল; তিনি তাহা বাছিয়া ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন ভাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং বেদ-বিভাগটা তাঁহার জীবিতকালেই হইয়াছিল এবং পরীক্ষিতের রাজ্যলাভের আগেই হইয়াছিল। তিনি বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শাখাভেদ তিনি করেন নাই। তিনি তিনখানি বেদ তিনজন শিষ্যকে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই শিষ্য-পরম্পরা হইতে শাখাভেদ হয়। সুতরাং শাখাভেদটা পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রভৃতির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত হইতে থাকে। শাখাভেদও বড় অল্প হয় নাই। আমরা এ বিষয়ে চরণব্যূহের কথা না হয় নাই শুনিলাম। কিন্তু পতঞ্জলিও বলিয়া গিয়াছেন যে, যজুর্বেদের ২১ শাখা, ঋগ্বেদের ১০১ আর সামবেদের ১০০০। পাণিনির অনেক পূর্বেই বোধ হয় শাখাভেদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কারণ তিনি কতকগুলি শাখাকে পুরাতন আর কতকগুলিকে নূতন বলিয়াছেন। প্রত্যেক শাখায় এক একখানি ব্রাহ্মণ থাকার কথা। তবে এক শাখার ব্রাহ্মণকে অন্য শাখাও নিজের বলিয়া লইতে পারে এবং লইবার সময় কিছু অদল-বদল করিয়া লয়। যেমন, কাণ্ব-শাখার যে শতপথ ব্রাহ্মণ, মাধ্যন্দিন শাখারও সেই শতপথ ব্রাহ্মণ; তবে বিস্তর অদল-বদল আছে। সব শাখাও পাওয়া যায় না, সব ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাদের ইতিহাস লেখা কিছু কল্পিত না হইয়া যায় না। কিন্তু কিছু লেখাও ত' চাই; নহিলে ইতিহাসই যে হয় না। সেকালে, অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ লেখা হইতেছিল, তখন আরণ্যক ও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত ছিল। যথা, বৃহদারণ্যকও শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। যদিও ছাপায় আমরা দেখি যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক জিনিষ, ঐতরেয় আরণ্যক অন্য জিনিষ, তথাপি ঐতরেয় প্রথম আরণ্যকটি ব্রাহ্মণ ছাড়া কিছুই নহে; উহা মহাব্রত নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান। পঞ্চম আরণ্যকও মহাব্রতেরই অনুষ্ঠান। বাকী তিনটি, আরণ্যক ও উপনিষদ্। মীমাংসকেরা বলেন, বেদের দুই ভাগ,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ; "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্"। তাঁহারা আরণ্যক ও উপনিষৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ মানেন না এবং বলেন, যদি আরণ্যক ও উপনিষৎ যজ্ঞকর্মে ব্যবহার না হয়, তবে উহা বেদই হইতে পারে না। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহার সৌজন্যে

কিন্তু মীমাংসকেরা যাহাই বলুন, আরণ্যক ও উপনিষৎকে ব্রাহ্মণের মধ্যেই পুরুন অথবা জ্ঞানকাণ্ডের অস্তিত্ব অস্বীকারই করুন,—ব্রাহ্মণের অন্য অন্য অংশ হইতে আরণ্যক ও উপনিষৎ যে অনেক পৃথক্ সেটি স্বীকার করিতেই হইবে।

পাণিনি পাটলীপুত্রে রাজধানী হইবার পর সেখানকার রাজসভায় পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্বাণের ৪০।৫০ বৎসর মধ্যেই মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে আসে। তখন উদয়ী মগধের রাজা এবং তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে এই পরিবর্তন হয়। কবে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে কত-বৎসর গেলে উদয়ীর রাজত্বের চার বৎসর হয়, সে কচকচি করিব না। যাঁহারা পারেন করুন। আমি মোটামুটি বলি যে খৃঃ পূঃ ৫০০—খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দের মধ্যে পাণিনি পাটলীপুত্রে আসেন। তিনি যখন বলেন "পুরাণপ্রোক্ত" অর্থাৎ বহুকালের ঋষিদ্বারা কথিত যে ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র তাহাতেই 'ণিনি' প্রত্যয় হইবে,—যাজ্ঞবল্ক্যে 'ণিনি' প্রত্যয় হয় না। সুতরং যাজ্ঞবল্ক্য চিরন্তন বা বহুকালের লোক নহেন। তাই বলিয়া তিনি পাণিনির তুল্যকাল লোক ইহা বলাও ঠিক নয়। আমাদের দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতিকে নব্যস্মৃতি বলে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'কে নব্যন্যায় বলে। রঘুনন্দন ৪০০ বৎসর আগের লোক; গঙ্গেশ হইতেছেন ৮০০ বৎসর আগের। এইমাত্র বলা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য চিরন্তন নন, সেইজন্য 'ণিনি' প্রত্যয় হয় না। চিরন্তন না হইলেই যে তুল্যকাল হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমার মনে হয় যাজ্ঞবল্ক্য পাণিনির অন্ততঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ববর্তী। বুদ্ধদেবের ২।৩ শত বৎসর পূর্বে হওয়া অনেকটা সম্ভব। যে বুদ্ধিবিপ্লবে উপনিষদের উৎপত্তি, বুদ্ধদেবের সময়ে যে বিপ্লব হইয়াছিল, সেও কি সেই একই বুদ্ধিবিপ্লব? বিশ্বাস হয় না। প্রাচীন উপনিষৎগুলি, বৌদ্ধরা যাহাদের তীর্থিক বলে,—তাহাদের চেয়ে যেন কিছু বেশী পুরাণ। আমরা দেখিতে পাই যে উপনিষদে যজ্ঞের ব্যাখ্যা হইতে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তীর্থিকেরা তাহা করে না; তাহারা ত' যাজ্ঞিক ছিল না। ব্রাহ্মণদের দর্শনশাস্ত্র দেখিয়াই তীর্থিকেরা দর্শনশাস্ত্র শিখিয়াছে। তীর্থিকেরা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ, ৭ম শতকের লোক। বুদ্ধদেব ইহাদের মধ্যে বয়সে সকলের ছোট। ছয়জন তীর্থিক ও বুদ্ধদেব,—এই সাতজনের কিছু আগে উপনিষদ্ দর্শনের সৃষ্টি হয়। আর যাঁহার হইতে এই দুই দলেরই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি, তিনি সাংখ্যদর্শনের কর্তা কপিল। সেই আটটি প্রকৃতি, সেই ষোলটি বিকার এবং সেই পুরুষ। ইহা লইয়া সাংখ্যমতের কত ভেদ যে হইয়াছে, বলা যায় না। একখানি পুরাণে এই সব মতভেদের একটি তালিকা দেওয়া আছে। কেহ বলে সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যা ২৪, কেহ বলে ২৫, কেহ বলে ২৬, কেহ বলে ২৭, কেহ বলে ১৭, কেহ বলে ১৩, কেহ বলে ৭ আবার কেহ বলে ৫। সুতরাং সাংখ্যের নানা ভেদ হইয়া গেলে তাহার পর উপনিষদের, তাহারও পরে তীর্থিকদের উৎপত্তি।

পরীক্ষিতের সময় যাগযজ্ঞের খুব প্রচলন ছিল। সে সময়, জ্ঞানের কথা বড় হইত বলিয়া মনে হয় না। বলিবে, মহাভারতে মোক্ষধর্ম আছে; তাহা ত' পরীক্ষিতের আগে। কিন্তু ১২শ পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত মহাভারতে অনেক পরের জিনিষ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমার এক একবার মনে হয়, যে, মোক্ষধর্ম মহাভারতে ছিল না; সেই জায়গায় ছিল বিষ্ণুধর্ম। মোক্ষধর্মের চাপে বিষ্ণুধর্ম সরিয়া গিয়াছে। কারণ মহাভারতে যে পঞ্চরত্ন আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি, তাহার তিনটি মাত্র এখনকার মহাভারতে মিলে; বাকী দুইটি আর কোথায়ও মিলে না, মিলে কেবল বিষ্ণুধর্মে। সেই পাঁচটি রত্ন এই :—(১) ভগবদ্গীতা, (২) ভীষ্মস্তবরাজ (৩) বিষ্ণুসহস্রনাম, (৪) অনুস্মৃতি, (৫) গজেন্দ্রমোক্ষণ। প্রথম তিনটি মহাভারতে আছে। শেষ দুইটি বিষ্ণুধর্মেই কেবল পাওয়া যায়।

জ্ঞানের উৎপত্তি কপিল হইতে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যে, কুম্ভকোণমের মহাভারতে যে যে অধ্যায়েই কপিলের কথা আছে, নীলকণ্ঠের টীকাশুদ্ধ সেই সেই অধ্যায়ই বোম্বাইএর মহাভারত হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কপিলের কথা খুব বেশী আছে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে। সেখানে তিনি কর্দম প্রজাপতির পুত্র, তাঁহার মাতা দেবহূতিকে সাংখ্য ও যোগের উপদেশ দিতেছেন। কপিলকে খুব প্রাচীন করিবার চেষ্টা ভাগবতে করা হইয়াছে। এইখান হইতেই ভারতবর্ষে দুই প্রকারের গুরু হইতে আরম্ভ করিল। একদল যজ্ঞ লইয়া থাকিত; আর একদল সাংখ্য ও যোগ লইয়া থাকিত।

সাংখ্যের নাম জ্ঞান, আর যজ্ঞের নাম সেই জ্ঞানের ক্রিয়া। কপিলের দল কিন্তু প্রাচীন পুরাণে বিষ্ণুকেই ভগবান্ বলিয়া, অথবা ২৬ তত্ত্ব বলিয়া উপাসনা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে কপিলের মত ভাঙ্গিয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছিল। পুরাণের মধ্যেই তাহার যথেষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলই আমাদের আদি বিদ্বান্, তিনিই পরমর্ষি। পরমর্ষি শব্দটায় মনে একটু খট্‌কা লাগে। আমাদের ঋষিদের একটা 'গ্রেড্' আছে। প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি, তৃতীয় রাজর্ষি, চতুর্থ মহর্ষি, পঞ্চম ঋষি। এই 'গ্রেডে'র কোথায়ও পরমর্ষি নাই। তাই মনে হয় কপিলকে সকলের বড় করিয়া পরমর্ষি করা হইয়াছে। যাজ্ঞিকেরা কপিলকে কি চক্ষে দেখিতেন বলা যায় না, কিন্তু ভক্তরা ও জ্ঞানীরা ভাল চক্ষেই দেখিতেন।

অনেক সময় আরণ্যক ও উপনিষৎ পড়িয়া পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটা ভূত, পাঁচটা ভূতের পাঁচটা বিশেষ গুণ এই সব কথা পাই;—এ সবই যেন কপিলের ঠিক করিয়া দেওয়া। অনেক ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে ইহার সংখ্যা ঠিক নাই। কেহ হয়ত বলিলেন, "চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, প্রাণ।" ত্বক যে একটা ইন্দ্রিয় ইহা তখন ধারণাই হয় নাই। প্রাণকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু অ-পুরাণ উপনিষদ্গুলিতে এই সংখ্যা ঠিক হইয়া পাঁচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণ তখন আর ইন্দ্রিয় না থাকিয়া বায়ুর মধ্যে আসিয়াছে; সে বায়ুও তত্ত্ব নয়। তৈর্থিকেরা প্রায় সকলেই দশটা ইন্দ্রিয় আর চারিটা বা পাঁচটা ভূত স্বীকার করিয়া থাকে। আকাশকে অনেকে স্বীকার করে না।

এখন কথা হইতেছে যে, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, শতানীক, অশ্বমেধদত্ত, অধিসীমকৃষ্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবরাজাদের সময় হইতেই শাখাভেদ আরম্ভ হয়, নানা শাখায় নানা প্রশ্নের নানারূপ মীমাংসা হইতে থাকে। দুই এক শত বৎসর পরে এই মীমাংসাগুলি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ লেখা হয়। ব্রাহ্মণগুলি একজন ঋষির নামে চলিতে থাকিলেও উহারা সংগ্রহ-গ্রন্থমাত্র, কোন বিশেষ লোকের রচনা নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইতরার পুত্র মহিদাসের নামে চলে। কিন্তু ইহা মহিদাসের রচনা নহে। তিনি শাকল শাখায় ব্রাহ্মণগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। তিনি পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সময় হইতে, যে যে রাজা ঐন্দ্র মহাভিষেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও বিবরণ দিয়াছেন। এক একটি বিবরণে এক একটি ব্রাহ্মণ; এইরূপ ১২টি ব্রাহ্মণ পর পর সাজান আছে। জনমেজয়ের অভিষেক যদি পরীক্ষিতের অভিষেকের ৩০ বৎসর পরে হইয়া থাকে, তবে উহা ১৪৪৫ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছিল। যিনি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি যখন এই বার জনের নাম দিয়াছেন, তখন আমরা যদি তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসরে অথবা কিছু পূর্বে ফেলি তাহা হইলে বিশেষ দোষ হইবে না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একখানি পুরাণ ব্রাহ্মণ, আমরা যদি মাঝখানে ৯০০।৯৫০ বৎসর একটি দাঁড়ি টানিয়া তাহার আগের গুলিকে পুরাতন ও পরের গুলিকে নূতন বলি, তবে যাজ্ঞবল্ক্য নূতনের মধ্যে আসিয়া পড়েন। তিনি যদি নূতনের মধ্যেও নূতন হন তাহা হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৮ম শতকের লোক। শতপথ ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যকের উপনিষৎ আছে। উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যকই দর্শন সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলে। যতই বলুক, সাংখ্যকে ছাড়াইয়া যায় না; সুতরাং কপিলকে বৃহদারণ্যকের আগের লোক বলিতে হইবে।

এইখান হইতেই, বলিতে গেলে ভারতবর্ষে বেদোক্ত ও বেদবাহ্য ধর্মের উৎপত্তি। যাহারা কেবল কপিলের কথা মানিত তাহাদিগের ধর্মকে বেদবাহ্য বলিত; আর যাহারা বেদবাক্যের সহিত কপিলবাক্য মিশাইয়া লইত তাহাদিগের ধর্মকে বেদোক্ত বলিত। বেদবাহ্য প্রথমধর্ম পার্শ্বনাথের জৈনধর্ম। মহাবীরের দুই তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হন; আর মহাবীর বুদ্ধদেবের তুল্যকাল লোক। সুতরাং পার্শ্বনাথ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রায় তুল্যকাল হইলেন। নিরুক্তকার যাস্ককে সাহেবেরা ষষ্ঠ শতকের লোক বলেন। কিন্তু নানাকারণে তাঁহাকে আমরা এই সময়েই ফেলিতে চাই। আমি আর এক জায়গায় বলিয়াছি যে, পাণিনির পূর্ব্ববর্তী ব্যাকরণকার শাকটায়ন প্রায় এই সময়ের লোক। কারণ যেখানে শাকটায়নের নাম আছে সেখানেই লেখা আছে "শ্রুতকেবলিদেশীয়"। যাহারা জিনদেবের উপদেশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই 'শ্রুতকেবলী'। তাঁহাদের অপেক্ষা যাহারা 'ঈষদূন' তাঁহারা শ্রুতকেবলিদেশীয়। এই

কেবলী যদি মহাবীর হন, তবে শ্রুতকেবলিদেশীয় শাকটায়ন পাণিনির পূর্ববর্তী হইতে পারেন না; কারণ মহাবীরের শ্রুতকেবলীরা চন্দ্রগুপ্ত মহারাজের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রুতকেবলিদেশীয়দিগের কথা ছাড়িয়া দাও। সুতরাং শাকটায়নকে শ্রুতকেবলিদেশীয় ও পাণিনির পূর্ববর্তী হইতে হইলে পার্শ্বনাথেরই শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে হয়;—অর্থাৎ পার্শ্বনাথের শিষ্যগণের শিষ্য হইতে হয়।

Buhler বলেন, স্মৃতিসূত্রকার বশিষ্ঠ এই সময়ের লোক। তিনি বশিষ্ঠের সময় খৃঃ পূঃ আট শতকে নির্ণয় করিয়াছেন। স্মৃতিসূত্রকারদের মধ্যে বশিষ্ঠ একমাত্র গৌতম হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং Buhler গৌতমকে খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর ও বশিষ্ঠকে খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসর আগের লোক ঠিক করিয়াছেন। তারপর বোধায়ন, তারপর আপস্তম্ব, তারপর হিরণ্যকেশি। ইঁহারা যখন কল্পসূত্র লিখিতেছেন, বুদ্ধ ও মহাবীরের শিষ্যেরা তখন চারিদিকে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তবে প্রভেদ এই যে, ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশে, ব্রহ্মর্ষিদেশে ও দাক্ষিণাত্যে এবং বৌদ্ধ ও জৈনেরা মগধ ও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ক্রমে খৃঃ পূঃ ৫ম শতকে (খৃঃ পূঃ ৫০০-২০০ ?) অর্থাৎ পাণিনির সময়ে, পাটলীপুত্র রাজধানী হইয়া উঠিল; সব দেশের পণ্ডিতেরাই সেখানে আসিতে লাগিলেন। এতদিন তক্ষশিলা গুলজার ছিল, এখন পাটলীপুত্র গুলজার হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় হইতে চারিশত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা ব্যাকরণ-শাস্ত্রটাকে সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত করিয়া লন। ছোট ছোট গ্রন্থকারগণের নাম এড়াইয়া বলিতে গেলে, এই সময়ের মধ্যেই পাণিনির প্রাদুর্ভাব, কাত্যায়নের প্রাদুর্ভাব, ব্যাড়ির প্রাদুর্ভাব ও পতঞ্জলির প্রাদুর্ভাব হয়। খৃঃ পূঃ ৩য় ও ২য় শতকে ব্রাহ্মণেরা বেদের কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্ম মীমাংসা নামে একটা শাস্ত্র করিয়া ফেলেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁহার গ্রন্থে মীংমাসক বলিয়া একটা সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। মীমাংসকদের মধ্যে কাশকৃৎস্ন নামে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার শিষ্যদিগকে কাশকৃৎস্ন বলিত।

এই কয়শত বৎসরের মধ্যেই শিক্ষাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাত্যায়নের প্রাতিশাখ্য যে বৈয়াকরণ কাত্যায়নেরই লেখা একথা Goldstucker একরকম প্রমাণই করিয়া দিয়াছেন। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রও এই সময়েই লেখা হয়। পিঙ্গল অশোকের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র খৃঃ পূঃ ৪০০-৩০০ বৎসরের মধ্যে লেখা। কৌটিল্য চাণক্যই নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সে কথা তিনি তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বলিয়াও গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র নানাবিধ শাস্ত্রের সমষ্টি। ইহাতে দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালতের কথা আছে, রাজনীতির কথা আছে, যুদ্ধের কথা, ব্যূহরচনার কথা আছে; রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে কি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, কি করিয়া দুর্গনির্ম্মাণ করিতে হয়,—ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা আছে। অনেকে বলেন যে, কামন্দকের নীতিসারও বোধ হয় এই সময়ের বই; কারণ, কামন্দক বোধ হয় কৌটিল্যেরই সাক্ষাৎ শিষ্য। মানবদের যে অর্থশাস্ত্র ছিল, তাহাও বোধ হয় এই সময়ের বই। পিশুন, কৌনপদন্ত, বাতব্যাধি, অন্তীঅ প্রভৃতিও এই সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতি ও উশনার শাস্ত্র ইহার বহুপূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল।

পাণিনি দুইখানি নটসূত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন; একখানি শিলালির, আর একখানি কৃশাশ্বের। অনেক নাটক না হইলে নাট্যশাস্ত্র হয় না; সুতরাং নাটক এই সময়ে খুব চলতি ছিল। নানা নাট্যশাস্ত্রের ব্যাকরণশাস্ত্রের মত নানা ভাষ্য, বার্তিক, নিরুক্ত, সংগ্রহ ও কারিকাও ছিল। যত নাট্যশাস্ত্র ছিল সব একত্র করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্র এই কয়শত বৎসরের মধ্যে লেখা হয়। ভাসের নাটকগুলি এই চারি শত বৎসরের মধ্যে লেখা হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারও নাকি নিজেরা অভিনয় করিতেন।

বেদবাহ্যদলের ধর্মগুলির এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হয়। যত বেদবাহ্য ধর্ম আছে, চার্বাক বা লোকায়তিকদলের মতই খুব কড়া। ইঁহারা বেদও মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না। শঙ্করাচার্য্য বলিতেন যে, চার্বাকদের হাতেই কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ, যাহারা পরকাল মানে না, যাহারা ইহসর্ব্বস্ব তাহাদের হাতে কৃষি-আদির উন্নতি ত' হইবেই। ইহাদের সূত্রসমূহ এইসময়ে সংগ্রহ হয়। সে বই আর পাওয়া যায় না বটে, তবে বাৎসায়ন তাঁহার কামসূত্রের একটি অধিকরণে সব কয়টি সূত্রই তুলিয়া দিয়াছেন। পতঞ্জলি বলেন যে,

ইঁহাদের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ভাগুরি। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে, অর্থসাধন বিষয়ে লোকায়তিকদের মতই মত। লোকে বলে, লোকায়তসূত্রের নামই বৃহস্পতিসূত্র সুতরাং তিনিও বেদবাহ্য দলের লোক। বৌদ্ধদের বইয়ে যে ছয়জন তীর্থিকের নাম করে, তাহাদের মধ্যে একজন সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তো। তিনি বুদ্ধদেবের তুল্যকাল ছিলেন; কিন্তু বয়সে বোধ হয় একটু বড়। তাঁহার মত এই ছিল যে, যেমন গুড়, জল ও বীজ একত্র জ্বাল দিলে একটা মাদকতা-শক্তি জন্মায়, তেমনি ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ একত্র হইলেই তাহাতে চৈতন্ত-শক্তি জন্মে। কেহ কেহ বলেন, এই বেলট্‌ঠিপুত্তোই লোকায়তিকদের গুরু। আমার কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না। কারণ বৃহস্পতি বেলট্‌ঠিপুত্তের অনেক আগের লোক।

বেদবাহ্যদের মধ্যে বৌদ্ধেরা প্রধান। বুদ্ধদেব কোন বই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার শিষ্যেরাও লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে বোধ হয় খান কত বই লেখা হইয়াছিল; কি ভাষায়, জানা যায় না; বোধ হয় মগধে প্রচলিত কোন ভাষায়। একশত বৎসর পরে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া হয়; দুইটা দল হয় এবং দুই দলে আঠারটি শাখা হয়। ইহারই মধ্যে একশাখা মহারাজ অশোক অবলম্বন করেন। তিনি মস্ত এক সভা করিয়া সব বৌদ্ধদের ডাকাইয়া তাঁহার শাখার পুস্তকাদি ঠিক করিয়া লন এবং অন্য সব শাখার মতগুলি খণ্ডন করিয়া একখানি বই লেখান। এই বইয়ের নাম 'কথাবত্থু'। এই বই এখন পালি ভাষার লেখা আছে। ঝগড়া হইয়া যে দুই দল হয়, তাহার ভিতরে নূতন দলে এক প্রকাণ্ড বই আছে,— নাম মহাবস্তু। উহার ভাষা না সংস্কৃত না প্রাকৃত; দুইয়ের মিশালে এক ভাষা তৈয়ারী হইয়াছিল। এই ভাষার নাম মিশ্রভাষা; নূতন দল এই ভাষাতেই বই লিখিত। পুরাণ দল যে কি ভাষায় লিখিত তাহা জানি না; তবে তাহাদের সব বই এখন পালিতে লেখা।

জৈনেরা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাহাদের বই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই সংগ্রহকে তাহারা পূর্বী বলিত। এই সংগ্রহ [illegible] আর নাই। খৃঃ পাঁচ শতকে পূর্বীগুলি ভাষায় তর্জমা হইয়া অঙ্গ, উপাঙ্গ ইত্যাদি ৪৯ ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ই অনেক জিনিষ কাহারও মুখস্থ ছিল না। লোকে বলিল যে, একজন মাত্র লোকের সব মুখস্থ আছে। তিনি একজন শ্রুতকেবলী, নাম স্থূলভদ্র, তখন নেপালে তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি নন্দরাজার মন্ত্রী শকটারের ভাই। যাঁহারা বই সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেইখানে লোক পাঠাইয়া তাঁহার মুখ হইতে সব লিখিয়া আনিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলীপুত্রে দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে ভদ্রবাহু সমস্ত জৈন ভিক্ষুদের লইয়া দক্ষিণে চলিয়া যান এবং সেখানে শ্রমণ বেলগোলা নামক পর্ব্বতে মঠ স্থাপন করেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্তের ২৪ বৎসর রাজত্ব হইয়া গিয়াছিল। তিনিও ভিক্ষু হইয়া ভদ্রবাহুর সহিত দক্ষিণে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার নাম হয়——। * জৈনেরা বলে, যে, তিনি সেখানেই মারা যান। কিন্তু, যে শিলালিপিতে এই কথা ক্ষোদিত আছে তাহা সাত শত বৎসর পরের লেখা; তাই সকলে একথা বিশ্বাস করিতে চায় না।

পূর্বীটা কি ভাষায় লেখা হইয়াছিল জানা যায় না; তবে বোধ হয় সেকালকার মাগধী ভাষায় লেখা হইয়াছিল।

বেদোক্ত ধর্ম যাঁহারা মানিতেন, তাঁহারা এই সময়ে বহুল পরিমাণে মূর্তিপূজা আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পূজাও আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন যে, বৌদ্ধদিগের প্রভাব খর্ব্ব হইবার পরে মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়, একথা একেবারেই সত্য নহে। মূর্তিপূজা কবে আরম্ভ হয়, ঠিক না জানা গেলেও এই ৪ শত বৎসরে ইহার খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়।

প্রমাণ :—(১) বুদ্ধদেবের জন্ম হইলে তাঁহাকে গ্রামের বাহিরে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়; মহেশ্বর স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে কোলে করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে মহেশ্বরের মূর্তিপূজা তখন খুব চলিয়া গিয়াছে এবং অনেক দিন হইল চলিয়া গিয়াছে।

(২) ব্রহ্মার মূর্তি নগরে নগরে স্থাপিত হইত।

(৩) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নগরের কোন কোন অংশে কোন কোন দেবতার মূর্তি রাখিতে হইবে এবং কি কি মূর্তি রাখিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

* পাণ্ডুলিপিতে কোন নাম নাই; যেমন মুদ্রিত হইয়াছে তেমনই লেখা ছিল। এ বিষয়ে কেহ আমাদিগকে জ্ঞাতব্য কিছু জানাইলে, আমরা সাদরে [illegible] প্রকাশ করিব। বঃ সঃ।

(৪) মহাভাষ্যে একজায়গায় আছে যে সোণার দরকার হইলে এক একটা প্রতিমা খাড়া করিয়া দিত। মানেটা তখন বুঝিতাম না। অর্থশাস্ত্র পড়িয়া জানিলাম যে, মৌর্য্য রাজারা যুদ্ধবিগ্রহের সময় টাকার দরকার হইলে কোন মূর্তি খাড়া করিয়া দিয়া রটাইয়া দিত যে, ইনি বড় জাগ্রৎ দেবতা। লোকে মানত করিয়া টাকা পয়সা দিলে, সেগুলি রাজকোষে জমা হইত।

(৫) মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অনেক দিন হইতেই ছিল। দেখাদেখি বৌদ্ধরা ও জৈনরাও সেখানে জুটিয়াছিলেন। এখন যেমন রামলীলা হয়, তখন বোধ হয় তেমনই কংসবধের যাত্রা হইত।

(৬) বাসুদেব নামে উপাস্য দেবতার নাম পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আছে।

(৭) সাঁচী, কার্লী প্রভৃতি বৌদ্ধক্ষেত্রে দানপতিদিগের যে নাম পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা প্রভৃতি যাবতীয় দেবতার পূজাই চলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ দাতাদের নাম হরিদত্ত, গঙ্গাদত্ত ইত্যাদি দেবতা-নামানুযায়ী হইত।

(৮) বিদিশার রাজা ভাগবতের সহিত দেখা করার জন্য পঞ্জাবদেশীয় যবন (গ্রীক্) রাজার দূত হেরিওবোলাস্ আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় এক বিষ্ণুমূর্তি ও তাহার সম্মুখে এক গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন। তিনি খৃঃ পূঃ ২য় শতকের লোক।
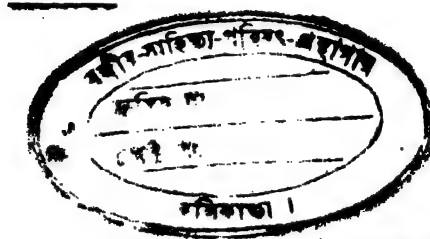
বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

প্রথম পর্য্যায়

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী-পরিচালিত নাট্যশালার ইতিহাসকে দুই যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রথম, সখের থিয়েটারের যুগ, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে ১৮৭২ পর্য্যন্ত; দ্বিতীয়, সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ, ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত। প্রথম যুগের ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ আমি 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিবরণের উপসংহার হিসাবে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার কথা বলিব।

বহু বৎসর ধরিয়া সখের থিয়েটার করার ফলে এদেশে নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তিও ঘটনাচক্রে একটি সখের দল হইতেই হয়। সুতরাং বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ও প্রসারে সখের থিয়েটারের কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহের একান্ত তৃপ্তি হয় নাই, উহাতে একটু অভাব ছিল। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন বড়লোকের উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগ-

* "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস"—মাসিক বসুমতী, বৈশাখ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক ১৩৩৯। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর একটি নূতন কথা জানা গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও এক সময় উত্তমের সহিত সখের থিয়েটার পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৭২, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের *The National Paper* পত্রে এদেশের নাট্যশালার পূর্ব্ব ইতিহাস সংক্ষেপে বলিবার উদ্দেশ্যে তৎসম্পাদক নবগোপাল মিত্র লিখিয়াছিলেন:—"The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosono Coomar Tagore......The next attempt of the kind was made by Baboo Nobin Chunder Bose, of Shambazar. The theatre got up by him was of a high order. The play of Bidya Shoondur was enacted in it. The third attempt of the kind was made by the late Baboo Nogender Nauth Tagore. He was very successful in his attempt. Theatres were next got up by the late Rajah Pretap Narian Sing, by Baboos Kally Prosono Sing, Charoo Chunder Ghose, by Rajah Jotindro Mohun Tagore, by Baboos Gonendro Nath Tagore and Shama Churn Mullick......"

কর্তার গণ্যমান্য বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জন সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও জনসাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। নিতান্ত রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া আসিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। এই অভাব পূর্ণ হয় বাগবাজারের কয়েকটি যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারা। উহাই কলিকাতার প্রথম পেশাদারী নাট্যশালা।

এইরূপ একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যে তখনকার দিনে খুবই অনুভূত হইত উহার প্রমাণ আমরা সমকালীন সাময়িক পত্রে অনেক পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 'হালিসহর পত্রিকা'য় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> জাতীয় নাট্যশালা।—...কয়েক বৎসর গত হইল, কলিকাতায় নাটকাভিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রত্যেক গলিতেই নাটকাভিনয়ের সভা, সকলেই নাটক লইয়া ব্যস্ত, যে স্থানে যাওয়া যায় সেই স্থানেই নাটকের কথা।
>
> আমরা পদ্মাবতী, নলদময়ন্তী, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, শ্রীবৎসচিন্তা প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি, সমুদয় গুলিরই অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকাভিনয়ে কাহারও কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। উক্ত নাটক সমূহের অভিনয় প্রায়ই কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে হইয়াছিল, সাধারণে যে তাহা দেখিতে পায় নাই তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা পাইয়াছিল তাহারা অনেক কষ্টে অনেক যত্নে দুই এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে।...
>
> কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নাটকাভিনয়ের আর অধিক প্রাদুর্ভাব নাই। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরই দেশীয় নাটকের মান রাখিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজ ব্যয়ে নাটক রচিত করাইয়া নিজ বাটীতে তৎসমুদয়ের অভিনয় করান কিন্তু তাঁহার বাটীর স্থান সংকীর্ণতার জন্য অনেকেই তাঁহার নাটকাভিনয় দর্শন করিতে পারে না। আমরা একবার তথায় যাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। সকল বিষয়ই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, কোনদিগে কোন গোলযোগ হয় নাই। উক্ত মহোদয়ের বাটীতে নাটকাভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের একরূপ আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যদি একটী দেশীয় নাট্যশালা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেকেই তথায় যাইয়া, অল্প ব্যয়ে অভিনয় দর্শন করিতে পারেন। কলিকাতার নিকটস্থ অনেক পল্লীগ্রাম আছে, সেস্থানের অনেকে অদ্যাবধি নাটকাভিনয় দর্শন করা দূরে থাকুক্ কখন কোন রঙ্গভূমি পর্য্যন্ত দর্শন করে নাই। আমরা অনেকবার 'লুইথিয়েটার' দর্শন করিয়া মনে করিতাম আমাদের যদি একটী নাট্যশালা থাকিত তাহা হইলে আমরা তথায় দেশীয় নাটকাদির অভিনয় দর্শন করিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতাম। নাটক অভিনয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অর্থবল ও লোকবল বিলক্ষণ আবশ্যক। যাহা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যতিরেকে অপর কোন ধনি ব্যক্তিরই নাটকাদির প্রতি বিশেষ যত্ন নাই। এক জনের যত্নে কি হইতে পারে? আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণে যখন সমস্ত সাময়িক পত্রে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখিলাম, তখন আনন্দে আমাদের মন নৃত্য করিতে লাগিল। এত দিনে যে আমাদের দেশে একটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া আন্তরিক আহ্লাদিত হইলাম। জাতীয় নাট্যশালা দ্বারা যে সাধারণের অনেক উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য। *

ন্যাশনাল থিয়েটারের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, অভিনয় দেখিবার জন্য টিকিট বিক্রয় প্রথম হয় ঢাকায়। উহার বিবরণ আমি গত কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'র ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়াছি। তাহা ছাড়া ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল। ১৮৬০ সনের প্রারম্ভে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার, এবং যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি

---

* হালিসহর পত্রিকা, ১২৭৯ সাল, ২য় খণ্ড ১১শ সংখ্যা। এই বিষয়ে *National Paper*-এর মন্তব্যও উদ্ধৃত করিবার যোগ্য,—"Theatres and Operas are not a few in number in this city. If not now, at least some time ago, they were as thick as blackberries—if we may use such an expression. Every street and every lane could boast of one such institution. Nor were these Theatres of ordinary merit. Some were of excellent character. But they were all private undertakings set on foot by individual gentlemen. Except the friends and relatives of the projectors none did else enjoy the benefit, or the privilege of witnessing them............The National Theatre is the first public undertaking of its character. The promoters of it deserve our sincere thanks for making it a *fait accompli*. The doors of the National Theatre are open to the public. Whoever shall pay for admission to it will be permitted to go in it." (11 Decr. 1872).

ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার’ নামে জনসাধারণের জন্য একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি ১৮৬০ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রে এই নাট্যশালার একটি অনুষ্ঠান-পত্রও * প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত তাহার কোন ফল দেখা যায় নাই। ১৮৬২ সনের ১২ই মে তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’ লিখিয়াছিলেন, “শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।”

ন্যাশনাল থিয়েটার

এখন কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার—সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহাও অভিনয় দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই। যে-দল পরে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করিয়া টিকিট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, সেটি পূর্ব্বে সখের থিয়েটারের দলই ছিল। কিন্তু এই দলের অভিনেতা ও উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই গৃহস্থ-ঘরের যুবক ছিলেন, খুব আড়ম্বর করিয়া থিয়েটার করিবার সঙ্গতি তাঁহাদের কাহারও ছিল না। যখন দেখা গেল তাঁহাদের অভিনয়ে জনসাধারণ প্রীত হইয়াছে এবং স্থানাভাবে বহু টিকিট-প্রার্থীকে ফিরাইতে হইতেছে, তখন দলের অনেকে টিকিট বিক্রয় করিয়া নাট্যশালাটিকে স্থায়ী করিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্থির হইল টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। এইরূপে, কলিকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হইল।

যে সখের দল ন্যাশনাল থিয়েটারে রূপান্তরিত হয় তাহার ইতিহাস আমি গত কার্ত্তিক মাসের ‘মাসিক বসুমতী’তে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাঁহারা পরবর্ত্তী যুগে বাংলা দেশে নাট্যগুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি—তাঁহাদের সকলেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবৈতনিক অবস্থায় প্রথমে উহার নাম ছিল—বাগবাজার এমেচার থিয়েটার। ১৮৬৮ সনে পূজার সময় এই দলকর্ত্তৃক প্রথম অভিনয় হয়; পুস্তক—দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত ‘সধবার একাদশী’। ১৮৭২ সনের মে মাসে বাগবাজারের এই সম্প্রদায় পর পর তিনটি শনিবার দীনবন্ধুর ‘লীলাবতী’ নাটক অভিনয় করেন।† এই সময় সম্প্রদায়ের নাম ‘শ্যামবাজার নাট্য-সমাজ’ ছিল বলিয়া সাময়িক পত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে এক দিকে সম্প্রদায়ের ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামকরণ হয়, ও অপর দিকে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া যান।

লীলাবতী অভিনয়ের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায়, অনেকেই অভিনয় দেখিবার জন্য আসিতেন ও স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া দলের কেহ কেহ সেই সময়েই প্রস্তাব করেন টিকিটের দাম করা হউক। যখন ‘নীলদর্পণ’ অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতেছে তখন এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার এবং নূতন নাট্যশালার ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নামকরণ করিবার কথা হয়। এই প্রস্তাবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই রাজী হইলেন; হইলেন না গিরিশচন্দ্র। তাঁহার রচিত ‘বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী’ পুস্তিকায় দেখিতে পাই :—

> নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাস বাবু আমাকে কাগজ-কলমে দেন।…ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। (পৃ. ২১-২২)

---

* Cited in P. R. Sen's *Western Influence in Bengali Literature*, pp. 260-63.

† কলিকাতায় লীলাবতী নাটকের অভিনয়কাল লইয়া সকলেই গোল করিয়াছেন। যাঁহারা সঠিক তারিখ সম্বন্ধে কৌতূহলী তাঁহারা গত পৌষ মাসের ‘পঞ্চপুষ্প’ পত্রে প্রকাশিত আমার আলোচনা দেখিতে পারেন।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতি বলিলেন, বড় বাড়ি ও ভাল রঙ্গমঞ্চ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, এত ব্যয় করা যখন তাঁহাদের সাধ্যাতীত তখন তাঁহাদের যেরূপ সামর্থ্য সেইরূপ আয়োজনেই নাট্যশালার কাজ আরম্ভ করা হউক। পরিশেষে অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রভৃতির মতই বজায় রহিল। ফলে গিরিশচন্দ্র দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়াই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। লীলাবতী অভিনয় করিবার সময় আখড়া বসিত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের অনুগ্রহে রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন বাবুর বাড়ির দোতালায় হইতে লাগিল। এই উদ্যমে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক মনোমোহন বসু, 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র, প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৭২ সনের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'নীলদর্পণ'-এর ড্রেস-রিহার্সাল হইয়া গেল। এই সময়েই (নবেম্বর, ১৮৭২) অমৃতলাল বসু মহাশয় আসিয়া দলে জুটিলেন; তিনি 'লীলাবতী' মহলা দিবার সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবার জন্য মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' নামে খ্যাত, মধুসূদন সান্যালের সুবৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটীর উঠানটি লওয়া লইল। ঐ স্থানেই বিনা আড়ম্বরে নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার অয়োজন চলিতে লাগিল। অমৃতলাল বসু বলিয়াছেন,—"তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,— ২৲ টাকার, ১৲ টাকার ও ৷৹ আনার। প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়া এক রকম বেঞ্চি করা হইল; তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ির ধাপগুলিকে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।" পরে ধর্মদাস সুরের কর্তৃত্বে ষ্টেজ তৈয়ার হইয়া গেলে ঠিক হইল ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনয় হইবে। অভিনয়ের পূর্ব্বে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

নীলদর্পণ নাটক অভিনয়।

চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় বাবু

মধুসূদন সান্যালের বাটীতে

শনিবার ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।

টিকিটের মূল্য।

প্রথম শ্রেণী ১ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণী ৷৹ আনা।

টীকিট দ্বারে বিক্রীত হইবে।

রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় দ্বার মুক্ত, এবং ৮ ঘটিকার সময় অভিনয়ারম্ভ হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেক্রেটরী।

এই অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া গেল।—

অর্দ্ধেন্দু	...	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র	...	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)	...	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর	...	রাইচরণ ও তোরাপ। (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)
মহেন্দ্রলাল বসু	...	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)	...	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ [?]	...	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস	...	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	...	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর	...	রোগ্ সাহেব। (এই একটী পার্ট্ সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট্ প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
গোলোক চট্টোপাধ্যায়	...	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	...	সরলা। (চমৎকার প্লে করিয়াছিল)।
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)	...	ক্ষেত্রমণি।
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। তোরাপ কোথা পাগল হইয়া যায়া গেল।)

আমি [অমৃতলাল বসু] ...	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্র নাথ মিত্র (এঞ্জিনীয়ার) ...	ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইঁহারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।)
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ...	Dresser.
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র ...	(কমিটির প্রেসিডেণ্ট। ইনি যে থিয়েটারের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটরে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত 'নীলদর্পণ' অভিনয় হইয়া গেল, এবং ১৮৭২, ১২ই ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় উহার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল।—

ন্যাসনাল থিয়েটার

নীলদর্পণ অভিনয়।—গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোশাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়ীত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজ বদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তৈলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।

অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।...

অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্ত্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্র তেমন সুন্দর রূপ দেখাতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়াছিলাম দৃশ্য সকলের বর্ণ চাতুর্য্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটী সামান্য কথা নহে। দেশের একটী প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয় সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।

অভিনয় মোটের উপর সুন্দর হইলেও নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার'-এ (১১ই ডিসেম্বর) যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথম রজনীতে টিকিট-সংগ্রহ ও অন্যান্য দু-একটি ব্যাপারে একটু বিশৃঙ্খলা হয় এবং সেক্রেটারী আশ্বাস দেন যে ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবে না। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'হালিসহর পত্রিকা'য় একটি দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। লেখক বলেন,—

...আমরা সমুৎসুক চিত্তে প্রথমেই যাইয়া 'নীলদর্পণের' অভিনয় রাত্রে নাট্যশালা বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সে রাত্রের কথা মনে পড়িলে এখন হৃৎকম্প হয়। আমরা বাঙ্গালী, আমরা যে কখন কোন্ কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব এরূপ কখনই বোধ হয় না। যাহা হউক অনেক কষ্ট অনেকবার তাড়িত হইয়া আমরা এক খানি টিকিট লইয়া অভিনয়ের স্থলে প্রবেশ করিলাম। একজন ভদ্র ব্যক্তি আমাদের হস্তে 'প্রোগ্রাম' দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আলোকের অভাবে চসমা দ্বারাও তাহার এক বর্ণ পড়িতে পারিলাম না। সুতরাং অন্ধের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। রঙ্গভূমি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রঙ্গভূমির সম্মুখেই একখানি বিজাতীয় যবনিকা দোদুল্যমান রহিয়াছে। জাতীয় নাট্য-শালায় বিজাতীয় কোন বস্তু দেখিলেই মনে দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি উপস্থিত হইতে পারে? তৎপরে যখন দেখিলাম যে কতকগুলি কৈয়াজ আসিয়া একতান বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল তখন আমাদের দুঃখ দ্বিগুণিত হইল। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া আমরা একাগ্র চিত্তে অভিনয় দর্শন করিতে লাগিলাম।...

> নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যদি একটি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া লোকদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি অনেকে তাহাদের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। জাতীয় নাট্যশালায় উপযুক্ত রূপবান ব্যক্তির অভাব আছে, নাটকে, অভিনেতা দিগের যে রূপ গুণ দুইই চাই তাহা কে না স্বীকার করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ দিগের এ অভাব মোচন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ উন্নত হয় নাই যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা বাইয়া অভিনয় করিবে কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের 'পাট' আদর্শ লওয়া উচিত, তাহা হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না বলিয়া আমরা এরূপ বলি না যে কতকগুলি ব্যাশা আনিয়া নাট্যশালায় অভিনেতৃসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত, কিন্তু যাহাতে কোন উপায়ে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগকে জাতীয় নাট্যশালার মধ্যে নিযুক্ত করা যায় এরূপ চেষ্টা করা উচিত।...

'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকার বিবরণে প্রকাশ যে এই অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া চারি শত টাকা আয় হয়।

অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন, নীল-দর্পণের অভিনয়ের পর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি বিদ্রূপ-পূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল ; লোকে বলিল, উহা গিরিশ বাবুর লেখা। * আমি এখনও 'ইংলিশম্যান'-এর এই সমালোচনা দেখি নাই, কিন্তু অমৃতলাল উহার যে-কয়েকটি ছত্র স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি এইরূপ,—"Up goes the red rag ; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি।" এই সমালোচনা ঠিক এই ভাষায় লিখিত এবং গিরিশচন্দ্রের রচিত হউক আর না-ই হউক, 'ইংলিশম্যান' যে নীলদর্পণ অভিনয়ের উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তাহা সুনিশ্চিত। কারণ 'নীলদর্পণ' দ্বিতীয় বার অভিনীত হইবার পূর্ব্বে 'ইংলিশ-ম্যান'-এর তরফ হইতে উহা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়, কেন হয় যথাস্থানে বলিতেছি।

'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' অভিনীত হয়। এ-বিষয়ে অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলেই ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন নীলদর্পণ দুইবার অভিনীত হইবার পর জামাই-বারিকের অভিনয় হয়। † প্রকৃতপ্রস্তাবে জামাই-বারিকের অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার,—প্রথম নীলদর্পণ অভিনয় হওয়ার ঠিক সাত দিন পরে ; নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ২১এ ডিসেম্বর, জামাই-বারিক অভিনীত হইবার পরের সপ্তাহে।

১৪ই ডিসেম্বর তারিখে জামাই-বারিকের যে অভিনয় হয় তাহার বিবরণ আমরা ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার' ও ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই। উহার মধ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র বিবরণটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার মত। নিম্নে উহা দেওয়া হইল :—

> ন্যাসনাল থিয়েটার
>
> জামাই বারিক।—ন্যাসন্যাল থিয়াটরে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন ক্রন্দন করি, গত শনিবারে জামাই বারিক দেখিয়া তেমনি হাসিয়াছিলাম।...দীনবন্ধু বাবুর গুণ ইতিপূর্ব্বে অনেকে জানিয়াছেন বটে, তাঁহার অনেক নাটকও ইতিপূর্ব্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রন্থ নিহিত রত্নগুলি যেরূপ জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিতেছে, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও সে রূপ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা গতবারে লিখি যে, ন্যাসনাল থিয়েটরে নীলদর্পণকে পূর্ণযৌবন প্রদান করিল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, জীবিত করিয়াছে লিখি।...
>
> এবারকার অভিনেতৃগণ এক একটী রত্ন বিশেষ। সকলের বিশেষতঃ পদ্মলোচন, বগলা ও বিন্দুর অংশ বড় অপূর্ব্ব হইয়াছিল। ইহারা এক একটী বিষয় অভিনয় করিলেন, আর আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহারা একটি বিষয়ের অভিনয় না করিয়া আমাদের বিশেষ মনক্ষুণ্ণ করেন। কামিনীর স্বামীর ভিটার উপরে পড়িয়া স্বামীর নিমিত্ত রোদন করা গ্রন্থের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ এবং সেইটী কামিনীর দ্বারা অভিনয় না করাইয়া ময়রাণীর মুখে বলানতে একেবারে মাটি হইয়াছে। কল এটি গ্রন্থ কর্ত্তার ভুল এবং দীনবন্ধু বাবু উপস্থিত থাকিলে উহা বুঝিতে পারিতেন। আর একটি ভুল, দুই সতিনীর ঝগড়ার পর পদ্মলোচনের বগলায় অঞ্চল ধরিয়া বাটার সঙ্গে নৃত্য ও গীত করা। পদ্মলোচনের পূর্ব্বেকার চরিত্রের

---

* শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—"আমরা শুনিয়াছি, বরং গিরিশচন্দ্রই গুপ্ত নামে (nom-de-plume) "Fathers" স্বাক্ষর করিয়া *The Indian Daily News* নামক খ্যাতনামা সংবাদপত্রে এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।" ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ২৩০)। 'বিশ্বকোষে' "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)" প্রবন্ধের লেখকও এই কথা লিখিয়াছেন।

† 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১০৩, ১০৯। 'গিরিশচন্দ্র'—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১০১। 'গিরিশ-প্রতিভা'—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ অভিনেতৃগণ এ অংশটি বাদ দিয়া অভিনয় করিবেন।

'ন্যাশনাল পেপার'-এর বিবরণে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দ্বিতীয় দিনে আসন ও আলোর ব্যবস্থা প্রথম দিনের অপেক্ষা ভাল হয় এবং বিলাতী বাদ্যের পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনা করিবার বন্দোবস্ত হয়; তাহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের সান্নিধ্যে ধূমপান বা কোনরূপ গর্হিত আচরণও নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল। এই পত্রিকাতেই প্রকাশ যে, জামাই-বারিকের অভিনয়ে আড়াই শত টাকার টিকিট বিক্রয় হয়।

'ন্যাশনাল পেপার' অভিনয়ের বিবরণ দিয়া উদ্যোক্তা-দিগকে একটি উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটি—অভিনয় দেখিবার জন্য মহিলাদিগকে আনা সম্বন্ধে। 'ন্যাশনাল পেপার' এ-বিষয়ে নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সমাজের এখন একটা পরিবর্ত্তনের যুগ, এখনও কাহারও খামখেয়ালকে সংযত করিবার মত জনমত গঠিত হইয়া উঠে নাই, সুতরাং সর্ব্বসমক্ষে ভদ্রমহিলাদিগকে আনা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। ইহা হইতে মনে হয়, তখনই মহিলাদিগকে অভিনয় দেখাইবার কল্পনা-জল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল।

জামাই-বারিকের পর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' পুনরায় 'নীল-দর্পণ' অভিনয় করেন। কিন্তু এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরই 'ইংলিশম্যান্' পত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন যে, এই নাটক ইংরেজদের মানহানিকর, সুতরাং উহার অভি-নয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। উত্তরে নাট্যশালার সেক্রেটারী একখানি পত্রে ইংলিশম্যানের পাঠকবর্গকে জানান যে, 'নীল-দর্পণ' নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা অভিনয়-শেষে রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকগণকেও বিজ্ঞাপিত করা হয়। তিনি বলেন, নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখান,—ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়, ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। *

'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৭২ সনের ২১এ ডিসেম্বর। ১২৭৯ সালের ১৫ই পৌষ (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে উহার নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাওয়া যায়:—

> নীলদর্পণ অভিনয়।—গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাট্যশালায় উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ দর্শক শ্রেণীর সংখ্যা ও শোভা দেখিয়া আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। এত লোকের সমাবেশ হইয়া-ছিল, যে অধ্যক্ষগণ আসন যোগাইতে কাঁফর হইলেন!…বহু সংখ্যক দর্শনার্থীকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছি।…
>
> কয়েক জন অভিনেতৃ এরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহাদের অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য প্রয়োগকে উচ্চ শ্রেণীতে সন্নিবেশ করা যায়। অপর কয়েক জনের অভিনয় মধ্যবিধ। বস্তুতঃ নিতান্ত অপকৃষ্ট কেহই নন। 'এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্!'…
>
> গোলোকচন্দ্র বসু, নীলকুঠীর দেওয়ান, উড্ সাহেব, রোগ সাহেব, আমিন, মোক্তার, কবিরাজ, তোরাপ, রাইচরণ, গোপ, সাবিত্রী, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, যাঁহারা এই কয়েক জনের বেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।
>
> নবীনমাধব, সাধুচরণ, পণ্ডিত, দারোগা, চারিজন শিশু, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, পদীময়রাণী দ্বিতীয় শ্রেণী।
>
> অপর সকলে ইঁহাদের কাছাকাছি। তাঁহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যায়।…
>
> সম্বিদ্বান বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই অভিনয় দর্শন করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, অভিনয়ের পুর্ব্বে তিনি মনে মনে অভিনেতৃগণের মধ্যে যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতির উচিত্য কল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে প্রকার গঠনের লোক যেরূপ সজ্জায় যেরূপ ভঙ্গীতে যে সময় যে কথোপকথন করিবে আশা করিয়াছিলেন,

* "The *Englishman* in noticing the announcement of the play said, that as it was libellous it should not be permitted by Government to be represented on any Stage. We are glad to observe that the Secretary of the Theatrical Society has informed the readers of that Journal by an official letter that the libellous portions contained in the work have been omitted. The managers also expressed the same view by a public declaration when closing the performance of the play on Saturday night last. They openly said that in acting the play their object was simply to represent village life in Bengal as beautifully depicted in the *Nil Durpun*, and not to traduce the character of Europeans for whom they entertained every respect."
—The *National Paper* for Dec. 25, 1872.

অভিনয়কালে দেখিলেন, অবিকল সেইরূপ—ঠিক তাঁহার কল্পনানুরূপ হইয়াছে। এ প্রশংসা সামান্ত গৌরবের নহে।...

পাঠকগণের স্মরণ হইতে পারে, এই নাটক উপলক্ষে প্রজা-হিতৈষী লেং লং সাহেবের কারাবাস হইয়া গিয়াছে। সে দিবস ইংলিসম্যান এই নাটক অভিনয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন। নাট্যসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে এবং সাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, আইনানুসারে যে যে অংশ দোষাবহ, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনয় হইতেছে। গত শনিবার পুলিসের ডেপুটী কমিস্তনর মহাশয় দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার কানাইলাল দে রায়বাহাদুরকে তিনি বলিলেন, নাট্যাধ্যক্ষগণ যেন মনে করেন না, আমি দর্শক ভিন্ন অন্য কোনো ভাবে এখানে আসিয়াছি। অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেলে, জনেক অধ্যক্ষ রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যক্ত করিলেন, যে, এই নাটকে পল্লীগ্রামের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত আছে, এজন্য আমরা ইহার অভিনয় করিতেছি, কাহারো প্রতি দ্বেষবশতঃ অথবা কোনো সম্প্রদায়ের গ্লানি উদ্দেশে নহে। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উপযুক্ত হইয়াছিল।...'

'ন্তাশনাল পেপার' পত্রেও (২৫ ডিসেম্বর) এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রঙ্গভূমি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অভিনয়-দিবসের পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে অভিনয়-দিবসে অনেক ভদ্রলোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'ন্তাশনাল পেপার'-এ এ সংবাদও দেওয়া হইয়াছিল যে, অনেক দর্শকের মতে এই অভিনয় প্রথম অভিনয়ের মত উৎকৃষ্ট হয় নাই। 'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয়ে টিকিট-বিক্রয়ের দ্বারা আয় হয় ৪৫০ টাকা।

'নীলদর্পণ'-এর দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ন্তাশনাল থিয়েটারে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়। একজন গ্রন্থকারেরই নাটক বার-বার অভিনয় করাতে দর্শকগণ পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ 'সধবার একাদশী'র বিজ্ঞাপন দিবার সময়ে সর্ব্বসাধারণকে জানান যে, অন্য নাটকের অভাবে তাঁহাদিগকে যে-সকল পুস্তক বর্ত্তমান, তাহারই অভিনয় করিতে হইতেছে, তবে তাঁহারা উপযুক্ত লোকের দ্বারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখাইয়া লইবার ইচ্ছা রাখেন। * সে যাহা হউক ২৮এ ডিসেম্বর দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইল। ১৮৭৩, ২রা জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। এই বিবরণে প্রশংসা ভিন্ন একটু সমালোচনাও ছিল,—

> ন্তাসনাল থিয়েটার।—গত শনিবার 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অভিনয় হয়। অভিনয়টি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর প্রহসনের মধ্যে 'সধবার একাদশী' অনেকের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সধবার একাদশীর উদ্দেশ্য সুরাপান কি ভয়ানক জিনিষ, সেইটী প্রকাশ ও লোকের হৃদয়ঙ্গম করা...। অভিনয় সম্বন্ধে আমরা গুটী কয়েক কথা বলিব। সঙ্গীতটী তত ভাল হইতেছে না। নটী না সাজে না রূপে না গাওয়ায় শ্রোতৃ মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল। যদি অভিনেতৃগণের বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে দুইটি সুশ্রী বালককে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। তাঁহারা যদি মাহিয়ানা করিয়া রাখেন, তবে এরূপ অনেক যাত্রাওয়ালার ছোকরা পাইতে পারেন। দ্বিতীয় আসনগুলি এত ঘন ঘন দেওয়া হয় যে লোকের বসিবার ও চলা ফিরা করিবার ভারি কষ্ট হয়, আবার নম্বর অনুসারে রিজার্ভ আসনে শ্রোতৃগণ না বসিয়া কষ্টের বৃদ্ধি করেন।

ইহার পরের সপ্তাহে (৪ঠা জানুয়ারি ১৮৭৩) ন্তাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক দীনবন্ধুর 'নবীন-তপস্বিনী' অভিনীত হয়। এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ৯ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন,—

> অভিনেতৃগণ নিজ নিজ অংশ সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। জলধর বিশেষতঃ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। নবীন-তপস্বিনীর অভিনয়ে সিনগুলি অতি চমৎকার হইয়াছিল।...

'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবারেও "সঙ্গীত বিষয়ে আমরা কোন উন্নতি দেখলাম না" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন, এবং ন্তাশনাল থিয়েটারের অনুষ্ঠাতৃগণকে এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (২৯এ পৌষ ১২৭৯) বলেন,—

> জাতীয় নাট্যশালা।—গত শনিবার রজনীযোগে জাতীয় নাট্যশালায় 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ ইহাতে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার বিষয়, যে, অন্যান্য অভিনেতৃ

* "We are further desired to state that the promoters of the Theatre intend soon to get good dramas written by competent authors. In the meantime they are compelled by sheer necessity to perform such play or plays as they have got ready, cut and dry."—The *National Paper* for 25 Dec. 1872.

সমাজ এক খানি নাটক ছয় মাস কি এক বৎসর কাল শিক্ষা করিয়া অভিনয় করেন, ইঁহারা প্রতি সপ্তাহে এক এক খানি নূতন নাটক অভ্যাস করিয়া যোগ্যতা সহকারে অভিনয় করিতেছেন। শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। অতএব ইঁহাদের উৎসাহকে ধন্যবাদ! কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। এ বিষয়ে সুলভ সমাচার ও ন্যাসন্যাল পেপার যে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি নাট্যাধ্যক্ষগণের চিত্তার্পণ করা উচিত। তাঁহাদিগকে সামাজিক আমোদ সংক্রান্ত একটী বিশেষ অভাবের নিরাকরণ পক্ষে উৎসাহী দেখিয়া সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত ও উৎসাহদাতা হইয়াছেন। সুতরাং প্রথমেই দোষাপেক্ষা গুণের অংশ কীর্ত্তিত হইয়াছিল। গুণাংশ বিশেষরূপে প্রদর্শিত ও সাব্যস্ত হইয়াছে, এক্ষণে অল্পভাগে যাহা কিছু দোষ আছে বা হইতে পারে, তদ্দিগে দৃষ্টিপাত করা উচিত।...

প্রথম। যখন 'জাতীয়' বিশেষণটী ধারণ করা হইয়াছে, তখন যাহাতে সেই গুরু বিশেষণের মর্য্যাদা থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। তাহা করিতে গেলে প্রথমতঃ এমন বিষয় নির্ব্বাচন করা এবং সেই বিষয়কে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা চাই, যাহাতে আমোদ ও কৌতুক ব্যতীত সন্নীতি শিক্ষা হয়; যাহাতে উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া প্রদর্শক ও দর্শক উভয়ের মনোবৃত্তি উর্দ্ধে উন্নত হয়; যাহাতে পাপের প্রতি ঘৃণা এবং ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ জন্মে; যাহাতে সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথা উপহসিত হয়, যাহাতে সামাজিক সৎপ্রথা ও সদাচার সংরক্ষিত ও দোষশূন্য হয়; যাহাতে স্বদেশের বিশেষ বিশেষ পূর্ব্বঘটনা ও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থানীয় জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া স্বদেশস্থ লোকের মন প্রাণ স্বদেশানুরাগে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজিত হয়। ইহার সকলেই যে এককালে হইবে, তাহা অসম্ভব। বর্ত্তমান অবস্থায় লেখকগণের দ্বারা যত দূর হইতে পারে, তাহার যত্ন করা উচিত।

দ্বিতীয়। নাট্যসমাজের অধ্যক্ষ বিভাগ সুদৃঢ় করা আবশ্যক। কতিপয় বহুজ্ঞ সুবিবেচক ব্যক্তির সমাবেশ দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। সেরূপ লোকের সংশ্রব তাঁহাদের স্পষ্ট সন্নিয়ম ও তাঁহাদের বিশিষ্ট পরিদর্শন ব্যতীত এ প্রকার দশ জন কর্ত্তার কাজ কখনই নিরাপদ নহে। সেই অধ্যক্ষ সভা দুই ভাগে বিভাজিত হউক। এক ভাগ আয় ব্যয়াদি বিষয়ে, অন্য ভাগ অভিনয়ের বিষয় ও লেখক নির্ব্বাচনে এবং রঙ্গভূমির উৎকর্ষ বিধানে নিযুক্ত থাকুন।

তৃতীয়। পটক্ষেপণ ও পটোত্তলনাদি কার্য্যে আরো তৎপরতা আবশ্যক। প্রস্থানকালে অভিনেতাগণ যেন কৃত্রিমভাবে চরণ চালনা না করেন। স্বগত কথাগুলি অনেককে উর্দ্ধমুখে কহিতে দেখা গিয়াছে; সকল সময় তাহা স্বাভাবিক নয়। বরং অধোমুখে পদচারণ করিতে করিতেই লোকে স্বগত চিন্তা করিয়া থাকে। কাহারো কাহারো অঙ্গভঙ্গী কোনো কোনো অবস্থায় ঠিক হয় না, তৎসংশোধন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ রঙ্গভূমির কোন্ স্থলে দাঁড়াইলে বা কোন্ মুখে কোথায় বসিলে শ্রোতৃগণের প্রীতিকর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। সে বিষয় অভিনয়াধ্যক্ষ বুঝাইয়া দিবেন। কেহ কেহ এমন ভাব ধারণ করেন, যেন দর্শক শ্রেণীকে কহিতেছেন। তাহা উচিত নহে, তিনি যে চরিত্রের প্রতিরূপ এবং যে চরিত্রের প্রতিরূপের সহিত তাঁহার কথা, তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যে সে স্থানে আছে তাহা ভুলিয়া না গেলে প্রকৃত অভিনয় হয় না।

চতুর্থ। গানের কথা যেন লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং ঐকতান বাদ্যটী যেন ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে!

আমরা সম্পূর্ণ মিত্রভাবে এই কথা বলিলাম, অন্যভাব গৃহীত না হয়,...।

অল্প দিনের মধ্যে এইরূপে নূতন নূতন পুস্তক অভিনয় দেখান একটি কারণে সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নাট্যশালায় প্রম্‌টার রাখিবার প্রথা হয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"পাঠক জানেন না, যে ন্যাশান্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাশান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত।" *

'নবীন-তপস্বিনী'র পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'লীলাবতী' অভিনীত হয় (১১ই জানুয়ারি ১৮৭৩)। পরবর্ত্তী ১৬ই জানুয়ারি তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন যে এই অভিনয়টিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন :—

লীলাবতী নাটক।

ন্যাসনাল থিয়েটারের অভিনেতৃগণ সুন্দররূপে শিক্ষিত হইয়াছেন। নাটকোল্লিখিত অংশগুলি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অতি চমৎকার রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি গত শনিবারে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই কেন? লীলাবতী নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ, সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করেন কেন? আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করি। একখানি পাঠ্যোপযোগী নাটক সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থলে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া লই, অনেক স্থলে একটী ভাবে নানা ভাবের উদয় হয়। অভিনয়ের সময় আমরা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া

* "বঙ্গীয় নাট্যশালার নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" (১৩১৩), পৃ. ২৫।

জীবনের কার্য্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখিতে আশা করি, সুতরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা সুখ বোধ করিতে পারি না, প্রত্যুত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই জন্য প্রধান প্রধান লেখকদিগের নাটকও অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। পাঠকালীন যাহাই হউক অভিনয়ের সময় দুই ব্যক্তির পক্ষে কথোপকথন এদেশীয়দের রুচিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিজনক এই জন্য সেদিন ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপের সময় অনেকে ইংরাজিতে "প্রেমিকেরা প্রেমালাপে ক্ষান্ত দিউন" বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়াছিলেন। লীলাবতী রোগ বা বিরহশয্যায় অচেতন হইয়া আছেন, তাঁহার মুখ দিয়া তখন কবিতা স্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক। পুস্তকে লীলাবতীর স্বপ্ন বিবরণ পদ্যে বর্ণিত আছে। কিন্তু লীলাবতী বোধ হয় শ্রোতৃগণের অনুরোধে উহা কথাবার্ত্তার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ও সেই জন্য উহা চমৎকার হইয়াছিল। ন্যাশনেল থিয়েটরের অভিনেতারা যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যদি নাটকগুলি স্বভাব ও রুচিসঙ্গত করিবার জন্য পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন।

এতদিন পর্য্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে একমাত্র শনিবারে অভিনয় হইত। 'লীলাবতী' অভিনীত হইবার পর হইতে বুধবারেও অভিনয় করিবার উদ্যোগ হয়। এই সময় হইতেই বাংলা নাট্যশালায় বুধবার ও শনিবার অভিনয় দেখাইবার রেওয়াজ হয়। প্রথম বুধবারের অভিনয় হয়—১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়ারি। এই অভিনয়ের বিষয়—দীনবন্ধুর 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যান্টোমাইম্। ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাংলার রঙ্গভূমিতে প্যান্টোমাইম্ এই প্রথম প্রদর্শিত হইল। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (৬ই মাঘ ১২৭৯) এই অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেক জানিবার কথা আছে। উহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

> জাতীয় নাট্যসমাজ।—বিগত ৩রা মাঘ বুধবার জাতীয় নাট্যালয়ে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র অভিনয়, 'কুজার কুঞ্চটন' 'নব বিদ্যালয়' 'মুস্তফি সাহেবের তামাসা' এবং 'পরীস্থান' প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র অভিনয় হইল। প্রথমে নট, পরে রতা, কেশব, ভুবন প্রভৃতির পালা। তাঁহাদিগের অভিনয় সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল, কেবল মাঝে মাঝে একটু আদটু দোষ ছিল। অর্থাৎ আমরা সচরাচর যেমন কথা কহিয়া থাকি, কোনো কোনো স্থানে সেরূপ হয় নাই। তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহারা সেই সেই অংশ অভ্যাস করিয়া আসিয়া বলিতেছেন। অপিচ একজনের কথা শেষ হইয়া গেলে, অপরের উক্তির পূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধ মিনিটকাল সময় লওয়া হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত অভিনয়ের মধ্যেই এই শেষোক্ত দোষ দৃষ্ট হইল।
>
> যদিও প্রতি সপ্তাহে এক এক খানি অভিনব নাটক অভ্যাস করাতে এ ত্রুটী সম্ভব, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিয়া অর্থাৎ ভালরূপে না শিখিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওনের প্রয়োজন কি? দুই তিন খানিতে ভালরূপে শিক্ষিত হইয়া পালাক্রমে তাহাই হইতে থাকুক, তদবসরে তাঁহারা নূতন কেন অভ্যাস করুন না? ফলতঃ অভিনেতৃগণ যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন, তাহাতে গোরোচনাস্পৃষ্ট পয়ঃকুম্ভের ন্যায় ঐ সকল দোষ থাকা উচিত নহে।
>
> রাজিবের অভিনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। গৃহে বসিয়া পাঠ, অতিথীর সহিত প্রসঙ্গতঃ আপন বৃদ্ধদশার কথা অর্দ্ধোক্তিতে বলিয়া আপনাপনি অপ্রস্তুত হওয়া, এবং ঘটকরাজের সহিত কথোপকথন ও তাৎকালিক অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের এমত ভ্রম হইয়াছিল, যে, আমরা যেন প্রকৃত ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছি।
>
> সর্ব্বাপেক্ষা সুশীল অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে এরূপ সুন্দর অভিনয় করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।
>
> আর আর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কেবল পেঁচোর মার উক্তির সময়ে কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল।
>
> দ্বিতীয়। 'কুজার কুঞ্চটন' ইহার দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয়, যেন প্রকৃত স্থল। অভিনয়ও তদ্রূপ। কুজার আকৃতি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ইহার অন্যান্য অভিনেতারাও অত্যন্ত সন্তোষ দান করিয়াছেন।
>
> তৃতীয়। 'নব বিদ্যালয়।' ছোট কর্ত্তার প্রতিষ্ঠিত গণিত, জরিপ, রসায়ণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা দানার্থ হুগলিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই ব্যঙ্গার্থক অনুকরণ। ইহা অতীব হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য নির্জ্জিত দেশে শাসন কর্ত্তার ভ্রম এরূপে প্রহসিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ কি না, তাহা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, ইহাতে দুইটী শ্রেণী ছিল। একটী মুসলমান আর একটী হিন্দুদিগের। সকলের কাণেই কম্পাস এবং পশ্চাতে শৃঙ্খল (চেইন)! প্রথমতঃ মুসলমান ছাত্রেরা আসিয়া একটি মুসলমানি কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। হিন্দুরা আসিয়াও একটী কবিতা পাঠ করিয়া আপনাপন স্থানে বসিল। পরে শিক্ষকের আগমন মাত্রেই মুসলমান ছাত্রেরা ভূমিতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম বাজী করিল, হিন্দুরা বসিয়া রহিল। শিক্ষক চটিয়া লেক্চর দিলেন। পরে সাহিত্য, রসায়ণ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিষয় একে একে শিক্ষা দিলেন। শেষে অশ্বারোহণ, সন্তরণ ও ফুটরেসের পাঠ দেওয়া হইল। পাঠকগণ বলিতে পারেন, যে, রঙ্গভূমিতে

কি রূপে অশ্ব আনিত হইল এবং জলাশয় অভাবে কিরূপে সাঁতার দেওয়া হইল? নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহাদিগের কতকটা কৌতূহল নিবারিত হইতে পারিবে।

যখন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে চাহিল, তখন তিনি কহিলেন 'তোমরা বড় ভীত, অতএব অগ্রে মানুষ ঘোড়া চড়িতে অভ্যাস কর, পশ্চাতে ভাল ভাল ওয়েলার আনাইয়া দিব।' পরে কি ঘটনা হইয়াছিল বোধহয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর ছাত্রেরা সন্তরণ শিক্ষা করিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন "বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন 'ছাত্রেরা যে নদীতে সন্তরণ শিক্ষা করিবে, সেখানকার কোনো ঘাট এখন পাওয়া যাইবে না।' অতএব তোমরা মাটিতে সাঁতার শিখ।" ছাত্রেরা বলিল "জল কৈ?" ঐ কার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনের নিমিত্ত তথায় বোতলে করিয়া জল ছিল শিক্ষক তাহা রঙ্গভূমিতে ছড়াইয়া দিলেন। ছাত্রেরা সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল! পরিশেষে ফুটরেস্ হইয়া পটক্ষেপণ হইয়া গেল। দোষে গুণে জড়িত তামাসা মন্দ হয় নাই!

৪র্থ। "মুস্তফি সাহেবের তামাসা।" ইহা আর কিছুই নহে, কেবল কাফ্রি সাহেবের বেশে চারিজন বেহালা, ফুলুট প্রভৃতি লইয়া রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় ফিরিঙ্গিদিগকে বিদ্রূপ করা। আমরা ইহার কিছুই ভাল দেখিলাম না। ইহাতে বরং অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

৫ম। 'পরীস্থান'। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে দৃষ্ট হইল, একটী রমণীয় উদ্যান মধ্যে পুরুষ বেশী এক জন পরী বসিয়া আছে। ক্রমে অল্পে অল্পে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্থির ও নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে রঙ্গভূমির পার্শ্বদেশ দিয়া দুইটী অল্প বয়স্কা পরী দেখা দিল। তাহাদিগের হস্তে গোলাপ পুষ্পের শাখা। তাহারাও প্রথমে উল্লিখিত প্রধান পরীর সম্মুখে দুইটী শাখার অগ্রভাগ বক্রভাবে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! পরে ঐকতানের সঙ্গে তালে তালে প্রায় দশমিনিট কাল নৃত্য করিল। তাহা দেখিতে অতীব চমৎকার এবং দর্শক সমূহের জল্পনা শুনিয়া বোধ হইল, দর্শক মাত্রেই তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে রঙ্গভূমির ভিতরে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের উজ্জ্বল আলো প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানের শোভা আরো মনোহারিণী হইল। পরিশেষে ঐ দুইটী পরী তানলয় শুদ্ধ একটী গান করিল তাহাও বিশেষরূপে চিত্তহর হইয়াছিল। পরে এক জন মুখে কালী মাখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের নিকট বিদায় লইলেন। যবনিকাও পতিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে, যদিও এই নাট্যশালা সাপ্তাহিক ও কখনো কখনো অর্দ্ধ সাপ্তাহিকরূপে কলিকাতার মধ্যে একটী বিশেষ আমোদ ও কৌতুকের স্থান হইয়াছে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য যে অধ্যক্ষগণের আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। যে আমোদ দিতেছেন, তাহাকেও সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ আমোদ বলা ভার। কয়েক রজনীতে এমন সকল নাটকাংশের অভিনয় হইয়াছে, যাহা ত্যাগ করাই উচিত ছিল। "জাতীয় নাট্য-সমাজ" এই নামটী অতি উচ্চ। এই নাম ধারণ করাতে তাঁহাদের নিকট কেবল আমোদ ব্যতীত আরো যে উচ্চ আশা আছে, এবং তাঁহারাও যে সে আশা পূরণের আশা দিয়াছিলেন, এখন কি তাহা ভুলিয়া গেলেন?

সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক শিক্ষা এরূপ নাট্যাভিনয়ে যেমন হয়, তেমনটী গুরুপদেশ ও গ্রন্থ পাঠেও হয় না। কৈ সেদিগে ইঁহাদিগের দৃষ্টি কৈ? এক জন গ্রন্থকর্ত্তার নাটক লইয়াই ইঁহারা মত্ত আছেন। তাঁহার প্রণীত সকল নাটকই যে উত্তম, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। তন্মধ্যে কোন্ খানি উদ্দেশ্যসাধক, কোন্ খানি নয়, তাহার বাছনি মাত্র নাই।...

*

এস্থলে আর একটী কথা। বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সমাজে বঙ্গভাষায় নাটকাভিনয় করিয়া এবং জাতীয় নামে অভিহিত করিয়া অধ্যক্ষগণ কি জন্য ইংরাজী ভাষার নাম গ্রহণ ও ইংরাজী ভাষায় টিকিট ইত্যাদি প্রকাশ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা অক্ষরে "ন্যাসনাল থিয়েটার" এরূপ লেখা কি হাস্যাস্পদ নহে? তৎপরিবর্ত্তে "জাতীয় নাট্যশালা" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় টিকিট ইত্যাদি করা কি উত্তম হইতেছে না?...যখন অভিনয় কার্য্যে কোনো বিশেষ দোষ নাই, তখন এসকল হীনতা অনায়াসে এক কথায় সংশোধিত হইতে পারে।

ইহার পরের শনিবারে (১৮ই জানুয়ারি) ন্যাশনাল থিয়েটারে কোন নূতন পুস্তকের অভিনয় না হইয়া নবীন-তপস্বিনীর দ্বিতীয় অভিনয় হইল, এবং তাহার পর ২২এ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ বা মনান্তর যে টাকা-পয়সা লইয়া বাধে তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পরে পাই। যথাস্থানে উহার আলোচনা করা হইবে। এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও হেমন্তকুমার ঘোষকে লইয়া একটি সালিশী কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ:—

We regret to learn that a breach has of late taken place among the members of the Theatre party. Read the following.

NOTICE

At a meeting held on Sunday last, the 19th Instant, at the meeting house of the National Theatre Office, it was resolved that all proceedings of the Theatre should be postponed, till Thursday next, the 24th Instant, when the difference among the members are to be settled by the following gentlemen appointed as arbitrators at the aforesaid meeting.

Babu Nobogopal Mitter
" Manomohun Bose
" Hemuntokumar Ghosh
Mohendro Lal Bose.
Mutty Lal Soor.
Amrito Lal Pal *
Rajendro Nath Pal.
Members. †

এই কমিটিই সম্ভবতঃ বিবাদ মিটাইয়া দেন। ৩০এ জানুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদটি দেওয়া হয়:—

> ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণের মধ্যে একটু গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক রহিলেন।

১২৭৯ সালের ২০এ মাঘ তারিখের 'মধ্যস্থ'পত্রেও এই বিবাদ নিষ্পত্তি ও ২৫এ জানুয়ারি তারিখে 'নব-নাটক' অভিনয় হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়।

ইহার কয়েক দিন পর হইতে "অবৈতনিক সেক্রেটারী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখ-যুক্ত একটি বিজ্ঞাপন 'ন্যাশনাল পেপার'-এ প্রকাশ করিতে থাকেন; তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের আপিস বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট হইতে, বাগবাজার নেবু বাগান, ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে উঠিয়া যায়। ‡

'নব-নাটক'-এর পর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের পুনর্ব্বার অভিনয় (১ ফেব্রুয়ারি) হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৭৩ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন:—

> আগামী শনিবার, ন্যাসন্যাল থিয়েটারে নীলদর্পণের পুনরভিনয় হইবে। এবার তাঁহারা পুর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনেতৃ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এবার পুর্ব্বের অপেক্ষা অভিনয় উৎকৃষ্ট হইবে।...

ইহার পর একখানি নূতন পুস্তকের অভিনয় হয় ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩। পুস্তকখানি—'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া'।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই-বারিক'-এর পুনরভিনয় হয় ও ইহার পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক-নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।§ এই অভিনয়ের বর্ণনা আমরা ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পাই।—

---

* গিরিশচন্দ্রের "লুপ্তবেণী বইছে তেরোধারে" গানটিতে 'কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে' এইরূপ একটি পদ আছে। 'অমৃত হরষে' কথা দুইটির ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া 'বিশ্বকোষ'-এর "রঙ্গালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল—'অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিভাবক।' ইহার ভুল দেখাইয়া অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১১৪) বলিতেছেন:—"অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরষে' লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন না।' এই উক্তিতেও আবার কিছু ভুল আছে। উপরে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতে মনে হয় অমৃতলাল পাল ন্যাশনাল থিয়েটারের একজন কর্ম্মকর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, নহিলে তিনি বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিবেন কেন?

† ১২৭৯ সালের ১৩ই মাঘ তারিখে 'মধ্যস্থ' লিখিয়াছিলেন:— "অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অত্যন্ত লজ্জাকর বিবাদ ও মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এত দূর, যে, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং জনরব যে আদালত পর্য্যন্ত বা যাইতে হয়। গত বুধবাসরীয় ন্যাসনাল পেপারে উক্ত সমাজের চারি জন সভ্য বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে, যে পর্য্যন্ত বাবু নবগোপাল মিত্র, বাবু মনোমোহন বসু ও বাবু হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়দিগের মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন নাট্যশালার কার্য্য স্থগিত রহিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই বিজ্ঞাপনানুসারে বিবাদ মিটাইবার কোনো উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। সকল মধ্যস্থকে এখনও একথা জানানো হয় নাই।

‡ The *National Paper* for April 9, 1873.

§ শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন:—"অমৃতবাজার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ... মহাশয় প্রদত্ত 'ভারত-মাতা' নামক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম 'মাস্ক'খানিও এই সঙ্গে অভিনীত হয়।" (নাট্য-মন্দির, পৌষ ১৩১৯, পৃ. ২৯১-৯২)

'ভারতমাতা' যে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা তাহা ১২৮০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সমালোচনা হইতেও জানা যায়। 'বঙ্গদর্শন' লিখিয়াছিলেন:—"ভারতমাতা। ন্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত। শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।...এখানি 'মাস্ক' বা রূপক।"

ন্যাশন্যাল থিয়েটর।—গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে জামাই বারিক প্রহসন অভিনয়ের পর 'ভারত-মাতার একটী দৃশ্য' প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিশ্বাস ও রোদন ধ্বনিতে কেবল মধ্যে ২ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সে দিন ন্যাশন্যাল থিয়েটরে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জ্জন, ও এমন একটি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিন্ কালে বিনষ্ট হইবে না। রঙ্গভূমি যেরূপ সমাজের সংস্কারক, সেইরূপ আবার উহা সমাজের শিক্ষক। আমাদের আশা হইতেছে যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটর এই দুইটি মহৎ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইবে।...

ইহার পর দিনই ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশনে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানস্থ হীরালাল শীলের উদ্যানে ভারতরাজলক্ষ্মী ও অন্যান্য নাটকের (নীলদর্পণ প্রভৃতির) অংশ-বিশেষ অভিনীত হয়। *

এই সকল অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটারের দল মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করা স্থির করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—ভীমসিংহের ভূমিকা কে লইবে? কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের নাম করিলেন। অবশেষে বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করিলেন। কিন্তু স্থির হইল তিনি 'আমাটর' ভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেন, এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম থাকিবে না। গিরিশচন্দ্র "বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী" নামক পুস্তিকার ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

...যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম Amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় ভীমসিংহ—By a distinguished amateur প্লাকার্ডে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ সনের ২২এ ফেব্রুয়ারি শনিবারে 'কৃষ্ণকুমারী' ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়। কোন্ অভিনেতা কোন্ ভূমিকা লইয়াছেন তাহার যে হ্যাণ্ডবিল দেওয়া হয়, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা হইল :—ভীম সিংহ —By a distinguished amateur। অন্যান্য ভূমিকা ও অভিনেতাদের নাম অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে দেওয়া হইল : –

বলেন্দ্র সিংহ	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধনদাস	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি
জগৎ সিং	...	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মন্ত্রী	...	গোপালচন্দ্র দাস
কৃষ্ণকুমারী	...	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী
রাণী	...	মহেন্দ্রলাল বসু
বিলাসবতী	...	বেলবাবু [অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়]
মদনিকা	...	আমি [অমৃতলাল বসু]

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব আনুকূল্য করিতেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মহলার সময় তিনি অভিনেতৃবর্গকে কিরূপে উৎসাহ দিতেন তাহার বর্ণনা আমরা অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্মৃতিকথায় পাই। অমৃতলাল বলিতেছেন :—

ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশ বাবুর রিহার্শ্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরীশ বাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।

কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত হইবার কয়েক দিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ করিতে হইল। শেষ অভিনয় হয়—৮ই মার্চ্চ তারিখে। ১২৭৯ সালের ৩রা চৈত্র (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে প্রকাশিত হইল,—

গত শনিবার ন্যাসনেল থিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের মত উহা বন্ধ হইল; বোধ হয় আগামী-বর্ষে আবার খোলা হইতে পারে।

* The *National Paper* for 19 & 26th February, and 5th March 1873.

অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় এই বিদায়-দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্ব্বে 'জ্যাঠা' বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুট্‌লাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলোনা আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হতাশে শুকায়॥
অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়॥
নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়॥

গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ করবে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুলব কেন? যেখানে অভিনয় করবে আমরা আস্‌ব বৈকি!

পরিশিষ্ট

যে-সকল অভিনয়ের তারিখ আমি সমকালীন সংবাদ-পত্রে পাইয়াছি তাহার একটি তালিকা নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।—

ন্যাশনাল থিয়েটার

(জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের বাড়ি)

নাটক	রচয়িতা		তারিখ
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	...	৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২, শনিবার N. Paper, 11 Dec. '72
জামাই-বারিক	দীনবন্ধু মিত্র	...	১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২, শনিবার N. Paper, 18 Dec. '72
নীলদর্পণ	ঐ	...	২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২, শনিবার N. Paper, 25 Dec. '72
সধবার একাদশী	ঐ	...	২৮ ডিসেম্বর, ১৮৭২, শনিবার N. Paper, 25 Dec.
নবীন-তপস্বিনী	ঐ	...	৪ জানুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার অ. বা. পত্রিকা, ৯ জানুয়ারি, ১৮৭৩; মধ্যস্থ,২৯ পৌষ,১২৭৯
লীলাবতী	ঐ	...	১১ জানুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার N. P. 15 Jan. '73
বিয়ে পাগলা বুড়ো (কুজ্ঝার কুঘটন, নব বিত্তালয়, মুস্তফি সাহেবের তামাসা, পরীস্থান প্রভৃতি)	ঐ	...	১৫ জানুয়ারি, ১৮৭৩, বুধবার N. P. 22 Jan. মধ্যস্থ, ৬ মাঘ, ১২৭৯
নবীন-তপস্বিনী	ঐ	...	১৮ জানুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার N. P. 22 Jan.
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন		২২ জানুয়ারি, ১৮৭৩, বুধবার N. P. 22 Jan.
নব-নাটক	ঐ	...	২৫ জানুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার মধ্যস্থ, ২০ মাঘ, ১২৭৯
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	...	১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার অ. বা. প ৩০ জানুয়ারি
নয়শো রুপেয়া	শিশিরকুমার ঘোষ	...	৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার N. P. 12 Feb.
জামাই-বারিক 'ভারতমাতা'র একটি দৃশ্য	দীনবন্ধু মিত্র কিরণচন্দ্র বন্দ্যো		১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার অ. বা. প. ২০ ফেব্রুয়ারি
ভারত রাজলক্ষ্মী নীলদর্পণ	(হিন্দু মেলায় অভিনীত)	...	১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, রবিবার N. P. 19 & 26 Feb., 5 March.
কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	...	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩, শনিবার অ. বা. প. ২০ ফেব্রুয়ারি
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	...	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ Englishman, 25 Feb. 1873.
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল প্যান্টোমাইম	মধুসূদন দত্ত		৮ মার্চ্চ, ১৮৭৩ মধ্যস্থ, ৩ চৈত্র, ১২৭৯

[অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা হইতে জানা যায়, মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' এবং মনোমোহন বসুর 'প্রণয়-পরীক্ষা' ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল]

পৃথ্বীরাজ

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

লক্ষ কিরীট উঠিয়া দাঁড়ালো—লক্ষ অসিতে পড়িল কর—
কাঁপে কুণ্ডল রক্ত কর্ণে এ কেমনতরো বিবাহ-সাজ!
পুষ্প-কেতন, স্বস্তি-বচন হায়রে সাধের স্বয়ম্বর!
ভেঙে পড়ে ঝাড়—ছিঁড়ে যায় তাঁবু
—কানাৎ যত
অযুত অসিতে ওঠে ঝঙ্কনা, অযুত কণ্ঠে—'পৃথ্বীরাজ।'

হোথা জয়চাঁদ পাষাণ-মূরতি—হাতে কুশঘাস—অবাক্ মুখে
বেতসলতিকা কাঁপে সুনন্দা—অর্ঘ্যে বহিয়া পুষ্প, লাজ,
করঙ্কবাহী চৌকাঠ ধরি কোন মতে হায় রয়েছে ঝুঁকে
উদ্যত শাখ থেমেছে শূন্যে
অকস্মাৎ;
অযুত অসিতে ওঠে ঝঙ্কনা—অযুত কণ্ঠে—'পৃথ্বীরাজ।'

পাষাণ-মূর্ত্তি দুই হাতে ধরি' মৃত্যু-আদেশ প্রতীক্ষিয়া
('দৌবারিকের গলে যার মালা শপথিয়া
তারে ত্যজিনু আজ'—)
ঝড়ের মুখের শশিকলাসম আপন আলোতে চকিত হিয়া
ক্ষীণ তনুতলে আড়াল খুঁজিছে
কনোজ-বালা—
সভায় তখন ওঠে গর্জ্জন অযুত কণ্ঠে—'পৃথ্বীরাজ।'

"বীরের ভোগ্যা ধরণী রমণী—তরবারি যার পার্শ্বচর,
বল আছে যার অবলা তাহার—মালা-চন্দনে মিথ্যা কাজ।"
কাঞ্চী কোশল বুঁদি মাড়োয়ার এক সাথে সবে বাড়ায় কর—
হঠাৎ সভায় প্রবেশ কাহার!
—অশ্বারোহী।
"বল আছে যার অবলা তাহার জানে এ বারতা পৃথ্বীরাজ।"

বর্শা খড়্গ শাণিত কৃপাণে হাজার খণ্ড আকাশতলে
ওড়ে কুঙ্কুম, ছেঁড়ে মণিহার, ধূলিলুণ্ঠিত হীরার সাজ!
ছুটিল অশ্ব, ছুটিল রে রথ, ধায় পদাতিক, হস্তী চলে!
শত্রুর ব্যূহ ছিন্ন করিয়া
দিল্লীমুখে
কনোজবালারে অশ্বে তুলিয়া বিদ্যুৎ বেগে পৃথ্বীরাজ!

ধূলি-কুয়াশার আড়ালে তখন প্রেতপাণ্ডুর অন্ধ শশী
হাতাড়িয়া পথ চলে পায়ে পায়ে ইস্পাতশাদা আকাশ মাঝ;
অশ্বের বেগে শরবন যত শন্ শন্ রবে উঠিছে শ্বসি'—
দূর গিরিচূড়া পাশ দিয়ে ছুটে
পালায় দূরে
প্রান্তর জুড়ে আর কেহ নাই—কনোজিনী আর পৃথ্বীরাজ।

শত যুদ্ধের বন্ধু ঘোড়াটি পুঞ্জ-কেশর তরঙ্গিয়া
ছুটেছে আজিকে, বুঝেছে আজিকে,
বোঝে চিরদিন প্রভুর কাজ;
দ্রুত পায়ে পায়ে পথের পাথর পড়ে চারিধারে উচ্চকিয়া;
জোনাকী চমকে বাঁকা চার ক্ষুরে
মুহুর্মুহু—
যেমন কুমারী, তেমনি অশ্ব, তেমনি যোদ্ধা পৃথ্বীরাজ!

এক বুক উঁচু ভুট্টার ক্ষেত পার হয়ে যায় বিজন ভূঁয়ে,
চিক্কণ কালো অশ্ব-অঙ্গে ঘামে ভিজে গেছে সোণার সাজ!
শুক্তি-স্বচ্ছ-কপোলা কুমারী বীরের বাহুতে পড়েছে নুয়ে;
ঝলকে মালিকা কাঞ্চী কেয়ূর
নূপুর সীঁথি,
ঝলে অঙ্গদ-উষ্ণীষ-অসি-বর্ম্মভূষিত পৃথ্বীরাজ!

হুঁসিয়ার ঘোড়া বুঝেছে পরশ—কাণ খাড়া রেখে ছুটেছে তাই,
নারীর পরশ বোঝে না যে জন জীবনে তাহার কিসের কাজ!
একটি নয়নে চাহে প্রভু পানে—আরটি নয়ন দেখে সদাই
পথের বাঁকেতে পাহাড়ের ফাঁকে
যেন কি ছায়া—
এমন অশ্ব কয়জন পায় কত না পুণ্যে পৃথ্বীরাজ।

সহসা চন্দ্র ছিঁড়ে পড়ে গেল—যবনিকা টানি ধরার চোখে!
এমন আঁধারে এমন বিজনে আপনার জনে বল কি লাজ!
বৃথা লাজ আর বৃথাই সরম—জানিতে পাবে না
কোনই লোকে—
প্রথম প্রেমের পরশতপ্ত
কর্ণমূলে
স্বেদ-মুক্তার বর-মালা গাঁথা নোয়াইল মাথা পৃথ্বীরাজ!

বিচিত্র জগৎ

মধ্য আফ্রিকার বন্যজন্তু

কাপ্তেন পিট্‌ম্যান বহুদিন মধ্য-আফ্রিকার ইউগাণ্ডা প্রোটেক্টরেটে বন্য জন্তুর রক্ষক ও পরিদর্শক ছিলেন—এই অদ্ভুত পদ আমাদের দেশে নাই, সরকারী বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা ঐ কার্য্য সাধারণতঃ করিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বনভূমি সুবিস্তীর্ণ ও বন্য জন্তু সুপ্রচুর, (যেমন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড্ প্রভৃতি) এবং আধুনিক ধরণের বন্দুক ও রাইফেলের সাহায্যে শিকার চলিয়া থাকে—স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া সে সব স্থলে অবাধ প্রাণীহত্যা নিবারণ করিবার জন্য লোক রাখিতে হয়; ইহাদিগকে game warden বলে। কাপ্তেন পিট্‌ম্যান বহু বৎসর ধরিয়া মধ্য-আফ্রিকার নানা স্থানে game warden-এর কাজ করিয়াছেন। ওখানকার বন্য জন্তু সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনি বিচিত্র। তিনি সম্প্রতি তাঁহার এই সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, সেখানে আমরা কাপ্তেন পিট্‌ম্যানকে শুধু বনরক্ষক কর্ম্মচারী হিসাবে দেখি না, দেখি যে এই সকল বন্য জন্তুর জীবনযাত্রা-প্রণালী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মন তাঁর আছে, জীবনে যে সুযোগ তাঁর জুটিয়াছিল, সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতা তাঁর আছে। কাপ্তেন পিট্‌ম্যানের বিবরণ শুধু শিকারের গল্প নয়, naturalist-এর লিখিত বৈজ্ঞানিক কাহিনী। যে অসীম তৃণ-ভূমির মধ্যে মুক্ত আকাশতলে তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন কাটাইয়াছিলেন, সে আরণ্য প্রকৃতিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন, প্রকৃতির বুকে লালিত জন্তু-জানোয়ারদিগকেও ভালবাসিয়াছেন—ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য ইহাদিগকে ভাল না বাসিলে সম্ভব হইত না।

কুমীরের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইউগাণ্ডাতে একটা মহিষকে একবার কুমীরে ধরে। মহিষটী গৃহপালিত, গলায় শিকল বাঁধা। হ্রদের কিনারায় কিনারায় জলজ ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে কুমীরটা তাহাকে আক্রমণ করে এবং গলার শিকলের একপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরে, দেহের কোনো অংশ ধরিতে পারে নাই। উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি হয়, নিকটে একদল পশুপালক ছিল, তাহারা শব্দ শুনিতে পাইয়া আসিয়া মহিষের লেজ চাপিয়া ধরিয়া টানিতে থাকে, ওদিকে কুমীরেও টানিতে থাকে। কিছুক্ষণ টানাটানির পরে মহিষের দলই জয়লাভ করে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ এই যে কুমীরটা ধরিবার কিছু পায় নাই, মহিষের অন্ততঃ নাকটা ধরিতে পারিলেও কুমীর হারিয়া যাইত না। নদীতে জলপানের সময় একবার একটা বিরাটকায় গণ্ডারের পা কুমীরে চাপিয়া ধরিয়াছিল—এবং অনেকক্ষণ টানাটানির পর কুমীর গণ্ডারটাকে নদীর মধ্যে হেঁচ্ড়াইয়া লইয়া গিয়া ডুবাইয়া মারে।

কুমীরের সম্বন্ধে পিটম্যান একটা অদ্ভুত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন কুমীরকে যত ভয় করা যায় আসলে তাহাদিগকে অতটা ভয় করিবার কারণ নাই। একথা সত্য যে আফ্রিকায় প্রতি বৎসরে অন্য সব জন্তুতে যত মানুষ মারে, একা কুমীরে মারে তাদের সবগুলো জড়াইয়া যত হয় তার চেয়েও বেশী—কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে আফ্রিকার জলের ধারের গ্রামগুলি জনসঙ্কুল এবং আফ্রিকার জলাশয় মাত্রেই কুমীরের অজস্র ভিড়। সে অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে কুমীর যে অতিশয় উগ্র ও হিংস্র প্রকৃতির এমন কথা বলা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে গরিলা সম্বন্ধেও সাধারণের ধারণা ভ্রমপূর্ণ ছিল। দুশেলু প্রভৃতি কয়েকজন ভ্রমণকারী ইহাদের বিষয়ে যে সকল অতিরঞ্জিত বিবরণ লেখেন, তাহা পড়িয়া ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে গরিলা রাক্ষসের মত হিংস্র প্রকৃতির, মানুষের গন্ধ পাইলে বুক বাজাইয়া জয়ঢাকের মত আওয়াজ করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, এক কামড়ে রাইফেলকে আখের ছাঁপ বানাইয়া ছাড়িয়া দেয় ইত্যাদি। কিন্তু রাওয়েণজরী পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিসম্পন্ন ভ্রমণকারী ও শিকারীদের যাতায়াতের পরে গরিলা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, ড়ুশেলুর বর্ণিত গরিলার সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য অনেক। ইহারা মানুষের আওয়াজ পাইলে ছুটিয়া আসা দূরের কথা, নিবিড়তর বনের

কুমীরের ছানা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

মধ্যে পলাইবার চেষ্টা করে। আকৃতিতেও ইহারা ড়ুশেলুর গরিলা অপেক্ষা ছোট। যে নিবিড় বাঁশের বনে গরিলা বাস করে, সেখানে গিয়া অনেক খোঁচা খুঁচি করিয়াও ইহাদের বাহির করা দায়, এই জন্য কিভূ পর্ব্বতের দুর্গম অধিত্যকায় উঠিয়াও অনেককেই গরিলা না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিতে

দুইটি পোটো-শাবক (Potto) : পোটো এক জাতীয় লেমুর, ক্যাপ্টেন পিট ইহাদিগকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়াছিলেন।

হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মত এই যে গরিলার সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে—এবং এখন হইতে রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা অবাধ শিকার বন্ধ না করিলে আর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে গরিলাকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এইচ. জি. ওয়েলস্ কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে ইহা লইয়া একটী সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন।

আজকাল বন্য জন্তু শিকার করা অপেক্ষা ক্যামেরার

মৃগ-শিশু (কয়েক দিন মাত্র বয়স)

সাহায্যে তাহাদের ফটো লওয়ার প্রচলন বেশী হইয়াছে। এই কার্য্যে সাহস ও কৌশল উভয়েরই প্রয়োজন নতুবা সাফল্যের আশা কম। পিট্ম্যানও এরূপ বহু ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন—তিনি প্রাণীশিকারের পক্ষপাতী নহেন, স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্তুদের ফটোগ্রাফ লওয়ার আনন্দ তাঁর কাছে অনেক বেশী।

শ্বেত-গণ্ডার।

বন্য সাদা বেজির ধূর্ত্ততা সম্বন্ধ পিট্ম্যান্ একটী চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু মুরগী পুষিতেন, মুরগীর ঘরের চারিদিক তারের বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই প্রতিরাত্রে কিসে দু চারটী মুরগীর ঘাড় মট্কাইয়া

রাখিয়া যাইত। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হইল কিন্তু উৎপাত বরং ক্রমে বাড়িয়াই চলে, কমিবার নামও নাই। অবশেষে পিট্‌ম্যান্ মুরগীর খাঁচার পাশে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাত্রে নিজে পাহারা দিতে লাগিলেন। একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছে মাত্র, হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তারের বেড়ার গা ঘেঁসিয়া বেড়ার ওপাশে কি যেন একটা জানোয়ার! উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় যেন একটা বড় বনবিড়ালের মত দেখাইতেছে—খুব দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট বনবিড়াল।

একটি অদ্ভুত ধরণের অতিকায় টিক্‌টিকি (Varanus)

পরবর্ত্তী ঘটনা পিট্‌ম্যানের নিজের কথায় বলি।

"আমি অবাক হয়ে জানোয়ারটার দিকে চেয়ে রইলাম। ব্যাপার কি? জানোয়ারটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করছিল। সেটা ধীরে ধীরে নাচের ভঙ্গিতে লোমগুলো খাড়া ক'রে কখনো লাফিয়ে, কখনো খুঁড়িয়ে তারের সাম্‌নে পায়চারী করে বেড়াচ্চে।

কখনো সেটা লাফাচ্চে, কখনো লেজটা জমিতে আছড়াচ্চে, কখনো বা হঠাৎ পিছু হটে যাচ্চে, কখনো বা তারের বেড়া ঘেঁসে এগিয়ে আস্‌ছে, এতটুকু থাম্‌চে না বা দম নিচ্চে না—থিয়েটারী নাচের ভঙ্গিতে একবার এদিক একবার ওদিক ছুটচে—নানা ভঙ্গি করচে, কিন্তু সবই সেই মুরগীর ঘরের তারের বেড়ার সাম্‌নেটাতে।

সব জিনিষটা ঘটচে কিন্তু নিঃশব্দে, এতটুকু শব্দ নেই কোনো দিকে।

একটু পরে এই চাঁদের আলোর ভূতের নৃত্যটা মুরগীদের চোখে পড়ে গেল। বারে, কি ওটা! দু'চারটী মূর্খ মুরগী নিজেদের খোপ থেকে বার হয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তাদের বেড়ার দিকে এগিয়ে চল্‌লো। তবুও ভাল দেখা যায় না—ওটা নাচে কি ওখানে! তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু'একটা মুরগী গলা বার করে দেখতে গেল। আর একটু হ'লে জানোয়ারটা মুরগীগুলোর ঘাড় কাট্‌কাতো, কিন্তু আমি সেই সময় গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গুলি লাগল না—জানোয়ারটা পালিয়ে গেল।

তারপর মুরগীর খাঁচার সাম্‌নে ফাঁদ পাতা হ'ল। দু'রাত পরে সেটা নাচতে এসে ধরা পড়ে গেল অদ্ভুত।

কাণ্ড! জানোয়ারটা আর কিছু নয়, একটা কৃশকায় বুনো বেজি। কে জান্‌তো তার পেটে পেটে এত ফন্দি-ফিকির ও বদ্‌মাইসী!"

নন্দী-ভালুক

বহুকাল ধরিয়া আফ্রিকার শিকারী ও ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে মধ্য আফ্রিকার গভীর বনে এমন সব বিচিত্র রহস্যময় জন্তু আছে, যা মানুষের চোখে সাধারণতঃ খুব কম পড়ে; বিজ্ঞানেও তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই। নন্দী ভালুক তাদের অন্যতম। পিট্‌ম্যান কিন্তু কয়েকবার এই রহস্যময় জানোয়ারের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, এবং তাঁর মত এই যে নন্দী ভালুক এক শ্রেণীর হায়েনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদ্যান-রচনায় শিল্পীর হাত

আমাদের দেশে অনেকেরই হয়তো জানা নাই যে ইউরোপ বা আমেরিকায় গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান রচনা করিবার জন্য বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইতে হয়। আমাদের এখানকার মত যদৃচ্ছা দুদশটা গোলাপের চারা কি এরিকা পাম্, হয়তো একদিকে একটু পালংশাকের ক্ষেত, দুটো পেঁপে গাছ পুঁতিলেই বাগান হয় না—উদ্যানরচনায় সত্যকার শিল্পীর প্রয়োজন আছে। Garden designing ও সব দেশে একটা বড় শিল্প যাহা কষ্ট করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, যাহাতে প্রতিভার প্রয়োজন আছে, সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং কৌশলেরও প্রয়োজন আছে। বিশেষ করিয়া কৌশলের প্রয়োজন এইজন্য যে অনেক সময়ে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান অল্প একটু জমির উপর করিতে হয়, বড়লোকের পল্লীভবনের চারিপাশে তিন চারিশত বিঘা জুড়িয়া প্রকাণ্ড পার্ক থাকিতে পারে, কিন্তু সহরের উপকণ্ঠে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাসস্থানে দশ বারো কাঠা বা তারো কম জমিতে মনোমত উদ্যান করিতে গেলে হাত দরাজ হইলে চলে না। ঐ টুকু জমির উপর গুছাইয়া সবই করিতে হইবে, লতাবিতানও চাই, ভ্রমণের পথও চাই, হয়তো খেলিবার লন্‌ও চাই। দু চারটা বড় বড় ছায়াতরুও বসাইতে হইবে, একটু শাকসব্জির ক্ষেতও না হইলে গৃহস্থের অসুবিধা। অথচ সব মিলাইয়া এমন করিতে হইবে যাহাতে বাগানখানি সুদৃশ্য হয়, মানুষের মনকে আনন্দ দিতে পারে, কর্ম্মশ্রান্ত দেহকে বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল জমির দর ক্রমেই বাড়িতেছে, সহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে বাড়ী তৈয়ারী করিতে গেলে বেশী জমি প্রায়ই পাওয়া যায় না, এইজন্য ভিক্টোরীয় যুগের উদ্যান-রচনার রীতি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে। তখনকার কালে প্রকৃতির হাতে অনেকখানি কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইত, এখন মানুষের অবসর কম, জীবনও অধিকতর অস্থির ও অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে—এখন প্রকৃতির অপেক্ষায় দশ বিশ বৎসর

ইটালিয়ান পদ্ধতির একটি লতাবিতান।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন—"Attuned to this state of things, we demand quicker effect and more varied interest, even though—often through force of circumstances—compressed into a smaller area." অতএব যে সব গাছ শীঘ্র বাড়ে, শীঘ্র ফলফুল দেয়, অল্প খরচে বেশী আনন্দ যোগাইতে পারে সেই সব গাছপালার জ্ঞান থাকা বর্ত্তমান যুগের উদ্যান-শিল্পীর একান্ত আবশ্যক।

এ একটা দিক মাত্র। আর একটা বড় কথা এই যে উদ্যান-শিল্পে ক্রমশঃ রুচি পরিবর্ত্তন হইতেছে। আগেকার যুগে ভাল করিয়া মণ্ডসী ফুল সাজাইতে পারিলে ও নানা জ্যামিতিক আকারের ফুলের ক্ষেত করিতে পারিলে যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইত, কিন্তু আজকাল উদ্যানশিল্প স্থাপত্য-শিল্পের কাছ ঘেঁসিয়া চলিতে চাহিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি

আধুনিক লতাবিতানের ছবি দেওয়া হইল। ইহার থামগুলি ইটালিয়ান্ ধরণের, জাফ্‌রীর ফাঁক ও মেজেতে বিছানো টালির আকার চতুষ্কোণ—লতামণ্ডপটীর সমগ্রতার সহিত কি সুন্দর সামঞ্জস্য! মণ্ডপের দূরপ্রান্তে পাথরের ধ্যানরতা একটী বালিকা-মূর্ত্তি। উহার উল্টা দিকে পাদপীঠের উপর বিখ্যাত ভাস্কর Ruby Levio-এর একটী ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি বসানো আছে। থামের গায়ে ও জাফরীর ফাঁকে পুষ্পিত লতা আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে, ছাদ অনাবৃত, জ্যোৎস্নারাত্রে বা পরিপূর্ণ দিনের আলোয় পায়ের তলার শ্বেতপাথরের টালির উপর আলো-ছায়ার খেলা কি বিচিত্র, কি সুন্দর! উপরে, নীচে ও পাশে বড় বড় সরলরেখার সম্পাতে দৃশ্যের সমগ্রতা একটী মহিমময় রূপ ধারণ করিয়াছে—অথচ পথের দুপাশে অনাবশ্যক ও বাড়তি গাছপালা বসাইয়া জবড়জঙ্গ করা হয় নাই।

লতাবিতান রচনার এই রীতি একেবারে নূতন নহে। ব্রেজিল ও মেক্সিকোর অনেক পুরাতন স্পেনীয় বাসভবনে এ পদ্ধতির লতাগৃহ আছে। তবে এই আধুনিক লতাবিতানটীর ছাদ অনাবৃত, কিন্তু স্পেনীয় পদ্ধতির মণ্ডপগুলি সব ছাদ আঁটা এই যা পার্থক্য।

বাগানে যা তা খেলো ধরণের মূর্ত্তি বসানো কুরুচির পরিচায়ক বলিয়া আজকাল গণ্য হয়। পূর্ব্বে এ দিকে তত দৃষ্টি দেওয়া হইত না, মূর্ত্তি হইলেই হইল, যারই হাতে গড়া হৌক্ বা যে ধরণেরই হৌক্ আজকাল নামজাদা শিল্পীর হাতের জিনিস ছাড়া বাজে মাল ব্যবহৃত হয় না। তাও যেখানে সেখানে যা তা বসাইলে চলিবে না, যেখানে যে মূর্ত্তিটী বসাইলে ভাল দেখায়, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদি অবস্থায় না কুলায় তবে বরং বিখ্যাত মূর্ত্তিগুলির নকল কেনাও ভাল, তবুও আনাড়ি শিল্পীর হাতের খেলো মালের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল, গৃহের নিকটস্থ উদ্যানের সম্বন্ধে সেগুলি খাটে। কিন্তু পার্ক শ্রেণীর উদ্যানের রচনা-প্রণালী অন্যরূপ। সেখানে জমির অভাব নাই, তিন চারিশত বিঘা হইতে হাজার দেড়হাজার বিঘা জমির পার্কও আছে। এগুলি ধনীলোকের বাসভবনসংলগ্ন, অর্থেরও সে সব ক্ষেত্রে কোনো অপ্রতুল নাই। পার্ক-রচনায় প্রধানতঃ পটভূমির সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। বিশাল ছায়াতরু, নিম্নে ফুলফলের ঝোপ, বনভূমি, ঝিল, উচ্চাবচ তৃণক্ষেত্র, সুদৃশ্য প্রাচীন পদ্ধতির সাঁকো, মুক্ত মাঠ, পক্ষীগৃহ, লিলি-পণ্ড সবশুদ্ধ মিলাইয়া একটী সুন্দর landscape-এর সৃষ্টি করিতে হইবে। কি ভাবে কোন্ গাছ বসাইতে হইবে, গাছের মধ্যে আবার ফাঁকা থাকা চাই, সান্ধ্যদিগন্তের রক্তিমাভা ঢাকা না পড়ে, দূরে পাহাড় থাকিলে তাহার সুনীল সীমারেখা গাছের ডালের আড়াল না করে, কোথায়ও চাই মৃগচারণ-ভূমি, লাইব্রেরী-ঘরের বড় ফরাসী bay window দিয়া যাহাতে অনেকখানি মুক্ত দৃশ্য নজরে আসে—এই সব বুঝিয়া সুঝিয়া, সকল দিকে হুঁসিয়ার হইয়া তবে কাজে নামিতে হইবে। শিল্পজ্ঞানও চাই, কৌশলী হওয়াও চাই এ ক্ষেত্রে

ঝর্ণাকে বাঁধিয়া একটি কৃত্রিম নদী তৈয়ার করা হইয়াছে।

একটী পার্ক শ্রেণীর উদ্যানের ঝিলের ছবি এখানে দেওয়া হইয়াছে। ঝিলের উপরে পাথরের খিলান-সাঁকো। ইচ্ছা করিয়াই সেকালের ধরণে তৈরী। ঝিলের দু' ধারে নানা জলজ পুষ্পের গাছ, গাছপালার ফাঁকে দূরে বাসভবন দেখা যাইতেছে। ঝিলের ঢালুর উপর আইরিস্ ফুলের ঝোপ, একসারি বড় বড় ছায়াতরু। বড় বড় উদ্যানে জলাশয় থাকাই চাই, জলের ধারে বড় প্রস্তর-মূর্ত্তি উচ্চ পাদপীঠের উপর বসানো থাকে, জলে তাদের ছায়া পড়া চাই, লিলি ও নানা জলজ পুষ্পের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সৌন্দর্য্যের দিক হইতে এদের মূল্য অনেক, জলাশয় বাদ দিয়া পার্ক রচনা নিতান্তই অসম্ভব।

ভবিষ্যতে ইউরোপের কয়েকটী বিখ্যাত উদ্যানের রচনাভঙ্গি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস

—শ্রীযদুনাথ সরকার

যে নবীন ভারতে আমাদের বাস, যাহার চিন্তার ও ভাবের মধ্যে আমাদের চিত্তের চিরবসতি, তাহার জন্ম আজ দেড়-শ পৌনে দু-শ বৎসর মাত্র হইয়াছে। সত্য বটে প্রকৃতির নিয়ম এই যে যুগ যুগ ধরিয়া জাতি-বিশেষের মধ্য দিয়া, দেশ-বিশেষের মধ্য দিয়া, বংশ বিশেষের মধ্য দিয়া, কোন একটা জীবনী-শক্তি নানা আকারে প্রকাশ পায়; পিতা হইতে পুত্রের জন্ম; পুরাতনের নিকট ঋণ লইয়া নূতন আসিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ যুগে ভারত এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমন নূতন পথ ও নূতন প্রণালী ধরিয়া চলিতেছে, যে ইহাকে যুগবিপ্লব বা প্রলয় (revolution) না বলিয়া থাকা যায় না। আজ আমরা পুরাতনের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া, নূতন এক ভাষার নূতন এক ভাবের বেদ খুলিয়া বসিয়াছি; আজ জাতীয় জীবন নূতন এক রক্তের তেজে চলিতেছে।

অথচ, এই অতি অল্পদিন আগে আমাদের যে পুরাতন ছিল তাহাকে একেবারে ত্যাগ করা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? সন্তান কি বংশের দেহের মুখের মনের ভঙ্গি একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে পারে? জাতীয় চরিত্রে কি যুগবিপ্লব সম্ভব? আমাদের মজ্জার ভিতর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দানগুলি এখনও কাজ করিতেছে, ইহাই নৃতত্ত্ব-বিদ্যার শিক্ষা। কর্কটশাবকের মত আমরা মাতার রক্তমাংস শুষিয়া খাইয়া বড় হইয়াছি, তাঁহার মৃতদেহের খোলাখানি মাত্র পথের ধারে পড়িয়া আছে।

নবীন ভারতের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই দেশময় ছিল মুঘলদের রাজত্ব, এবং মুঘলদের রাজসভায় পালিত সভ্যতা। সে সভ্যতা দিল্লীর বাদশার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া সমস্ত করদ ও স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারই ফলে, আমাদের এই মহাদেশটা জুড়িয়া আচার ব্যবহার, উচ্চশ্রেণী লোকের বেশভূষা, চিন্তা, সাহিত্য-রচনা, শাসন ও পত্রব্যবহারের প্রণালী, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, কলা ও শিল্প, প্রায় একই আকার ধারণ করে। অবশ্য, আজকার পাশ্চাত্য সভ্যতার অজেয় প্রভাবে এগুলি যেমন এক ছাঁচে ঢালা, কলে তৈয়ারি সমান মাপের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ততটা নহে, কিন্তু সেই পথে বটে।

এই বৃটিশ-পূর্ব্ববর্ত্তী মুঘল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকের ও বেশী ভাগের উপর একছত্র রাজত্ব, একই ধরণের শাসন-পদ্ধতি, একই প্রকারের ভদ্রসমাজের আমোদ-প্রমোদ, বেশ ও ভব্যতা, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধারা প্রচলিত করিয়া দেয়। দেশের অনেকটা জুড়িয়া এবং অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রবল প্রতাপান্বিত রাজশক্তি শান্তি স্থাপন করে, পথঘাট রক্ষা করে, একমাত্র সরকারী ভাষা ও মুদ্রা প্রচলন করে; এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে ধন-উৎপত্তি ও বাণিজ্য-বৃদ্ধি, প্রদেশে প্রদেশে কর্ম্মচারীলোকের, ভাবের, পণ্যদ্রব্যের ও কলার বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়। এক সমবেত ভারতীয় জাতি যে একদিন গঠিত হইবে ইহা যদি কল্পনাতীত স্বপ্নের দেশ হইতে সম্ভাবনীয় আশার রাজ্যে আসে, তবে তাহা মুঘল সাম্রাজ্যের আরম্ভ করা কাজেরই পূর্ণ পরিণাম একথা বলিতে হইবে।

এই দিল্লী সাম্রাজ্যের গৌরব ও কীর্ত্তি দেড়শত বৎসর (১৫৫৬-১৭০৭) ধরিয়া বাড়িয়া চলে। আকবর ও জহাঙ্গীর, শা জহান ও আওরংজীবের ইতিহাস ইহারই আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু আওরংজীবের মৃত্যুর পর ৪০ বৎসর ধরিয়া দ্রুত অবনতি (মুহম্মদ শা বাদশার মৃত্যু ১৭৪৮, পর্য্যন্ত)। অবশেষে এই সাম্রাজ্য ও সভ্যতার পতন এবং দেশে বিদেশী-প্রাধান্য স্থাপন (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) হইয়া এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন। এ পর্য্যন্ত কেহই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস মৌলিক ও বিস্তৃতভাবে রচনা করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে জীবদেহের ক্ষয় এবং সাম্রাজ্যের পতন দুইটিই সমান দুঃখকর দৃশ্য। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তারা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন যে বিয়োগান্ত নাটক (ট্রাজেডি) করুণা ও ভয় জন্মাইয়া দর্শকের হৃদয় পরিষ্কৃত পবিত্র করিয়া দেয়। আমরা এইরূপ নাটকে হাতে হাতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং পাপের অনিবার্য্য দণ্ড যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই। এই সত্য মনে রাখিলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকেও একটি মহান্ শিক্ষাপ্রদ ট্রাজেডি নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর এই নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের জাতির ও দেশের

অতি নিকটস্থ পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের সঙ্গে ইঁহাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন নাটক আমরা অবহেলা করিতে পারি না।

তাহার উপর, যদি ইতিহাসকে জাতীয় জীবনের গীতা বলিয়া, জীবন্ত দর্শন গ্রন্থ বলিয়া, অন্ধ বর্ত্তমানের পথপ্রদর্শক দীপ্ত দীপ বলিয়া মানি, তবে এই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কাহিনী আমাদের আর সব বিষয় অপেক্ষা অধিক মূল্যবান রাজনৈতিক শিক্ষা দিবে। নবীন ভারতের ভাগ্যকর্ত্তারা যদি এই ইতিহাস না জানেন, যদি ইহা পড়িয়া সাবধান না হন, তবে পদে পদে বিপদ আনিবেন, বিফল প্রযত্নে জীবন কাটাইবেন। অতএব, এই যুগের সত্য ইতিহাস আজকার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

ভারতের হিন্দু যুগের, বৌদ্ধ যুগের, এমন কি আদি মুসলমান যুগের ইতিহাসে অনেক স্থল অন্ধকার। তাহার কোন সমসাময়িক, এমন কি বিস্তৃত পরবর্ত্তী কাহিনী নাই। সুতরাং সামান্য দুই একটি প্রস্তরফলক বা অর্দ্ধলুপ্ত প্রাচীন মুদ্রা লইয়া কল্পনার সাহায্যে ঐ সব সময়ের একটি "বোধ হয় এইরূপ ছিল" ছবি আঁকা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু অপর দিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অসংখ্য সাক্ষী বিদ্যমান; তাহারা নানা জাতির নানা ধর্ম্মের লোক, নানা ভাষায় নিজ নিজ দৃষ্ট ঘটনা লিখিয়া গিয়াছে। এবং এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপাদান অগণ্য। সুতরাং এই যুগের ভারত-ইতিহাস যিনি চর্চ্চা করিবেন তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ।

সত্য বটে, সেই পতনের যুগে দিল্লীর রাজশক্তি দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ, রাজপরিবার দরিদ্র, সদা উৎপীড়িত, দিল্লী-মধ্যে বন্দী ছিল। সুতরাং আকবর ও শা জহানের মত সরকারী পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ ইতিহাস ("আকবর-নামা," "বাদশা-নামা" প্রভৃতি) রচনা করাইবার শক্তি ও প্রবৃত্তি এই সব দিল্লীশ্বরের ছিল না। কিন্তু অনেক কর্ম্মী পুরুষ ফার্সী ভাষায় নিজ নিজ জীবনের ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন; অসংখ্য চিঠি এবং রাজসভা বা শিবির হইতে প্রেরিত হাতে-লেখা সংবাদপত্র ('আখবারাৎ') রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী সৈনিক ও রাজপুরুষদের আত্মকাহিনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংগৃহীত ইতিহাস এবং রিপোর্ট (despatches) আছে, এবং তাহার প্রায় সবগুলিই মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। সকলের চেয়ে বেশী সুখের বিষয় এই যে সে-যুগের ভারত-ইতিহাসের যাহা অর্দ্ধেক উপাদান, অর্থাৎ মারাঠাদের লিখিত চিঠি, বিবরণ ও রিপোর্ট —তাহার প্রায় সবটা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া মারাঠা-শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নহে, উত্তর-ভারতেও—সিন্ধুতীরে আটক্ হইতে ভাগীরথী-তীরে মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই রাজসরকারের প্রায় সমস্ত কাগজপত্র এতদিন অপ্রকাশিত, একরূপ অজ্ঞাত ভাবে, পুণায় "লাখরাজ জমীর অফিসে" বন্ধ হইয়া ছিল। গত তিন বৎসর ধরিয়া বম্বে গভর্ণমেণ্টের, এবং শেষ বা চতুর্থ বৎসর (১৯৩২) মারাঠা রাজাদের চাঁদায়, এই দেড় কোটি কাগজের বোঝাগুলি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই একদল কেরাণী লইয়া ঘাঁটিয়া, তাহার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক কাগজগুলি বাছিয়া লইয়া, তারিখ ও টীকা যোগ করিয়া, ২৭ খণ্ড ইতিমধ্যে ছাপিয়াছেন; অবশিষ্ট ১৮ খণ্ডও প্রায় প্রস্তুত হইয়া আছে। এক বৎসরের কমেই ছাপা শেষ হইবে আশা করা যায়। এই মহাকীর্ত্তির মূল্য যে কত তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক লেখকই বুঝিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে অনেক মারাঠা ঐতিহাসিক পত্র রাজবাড়ে সানে ও পারসনিস (১৮৯৮ হইতে) এবং খরে (১ম খণ্ড ১৮৯৭) ছাপিয়াছেন। পারসনিসের প্রকাশিত পত্রগুলি সবচেয়ে অধিক মূল্যবান, তাহার অধিকাংশই পেশোয়া-রাজের সরকারী দপ্তরের বিক্ষিপ্ত এক শাখা হইতে লওয়া। খরের পত্রগুলি শুধু দক্ষিণ মারাঠার পটবর্দ্ধন রাজবংশ (বর্ত্তমান মিরজ জুনিয়ার ঘর)এর সংগ্রহ হইতে লওয়া এবং প্রায়শই শুনা কথা, দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ নহে। রাজবাড়ে ও সানের সংগ্রহে কিছু সার উপাদান ও প্রচুর অকেজো কাগজ আছে। কিন্তু সরদেশাই-সম্পাদিত খণ্ডগুলিতে প্রথম শ্রেণীর প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। সুতরাং এখন এমন সময় আসিয়াছে যে ঘরে বসিয়া প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক মালমসলা সংগ্রহ করা যায় এবং তাহার সাহায্যে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। সরদেশাই ও কুলকর্ণী সম্পাদিত "ঐতিহাসিক পত্রব্যবহার" (দ্বিতীয় সংস্করণ), যদিও পেশোয়া-দপ্তর হইতে লওয়া নহে, ইহাতে ঐ দপ্তরের কাগজ-পত্রের মত অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক চিঠি নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি সানে-সম্পাদিত পত্রসংগ্রহ, কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণে আকার দ্বিগুণের অধিক বাড়িয়াছে,

এবং অনেক ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। সরদেশাই এবং অপর দুইজন সহকারী সম্পাদিত "পত্রে ইয়াদি বগৈরে" (২য় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য বটে, কিন্তু "ঐতিহাসিক পত্রব্যবহার"এর মত মূল্যবান নহে।

ঐ যুগে ফরাসী ভাষায় Law of Lauriston, Gentil, ও De Boigneএর কাহিনী এবং বর্ত্তমানে M. Alfred Martineau-রচিত Dupleix এবং Perronএর জীবনী এবং Emile Barbe-রচিত Rene Madecএর পত্র ও ইতিহাস অত্যন্ত কাজের জিনিষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমে Xavier Wendel নামক একজন জেসুইট্ পাদরী ভরতপুরের জাঠ-রাজাদের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি ইংরাজদের চরের কাজও করিতেন। তাঁহার লেখা জাঠ-ইতিহাস (ফরাসীতে) হস্তলিপির আকারে ইণ্ডিয়া অফিসে আছে (দুই প্রতি)। আর টাইরোল-দেশীয় জেসুইট্ Tieffenthaler যদিও ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া নার্‌ওয়ার নগরে (মালবের উত্তর অংশে) বাস করেন, তাঁহার পুস্তক (ফরাসী অনুবাদ বার্ন্নলী কর্ত্তৃক রচিত) ভূগোলের বই মাত্র, ঐতিহাসিক সংবাদ কম দেয়। চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীর সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র যাহা লোপ পায় নাই, মার্টিনো সাহেবের যত্নে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উত্তর-ভারত সম্বন্ধে বড় কম কথা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের রচিত ভারত-সম্বন্ধীয় বইগুলি এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য হইয়াছে। আমাদের হতভাগ্য রাজধানীগুলির পুস্তকাগারে তাহার কোন সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ সংগ্রহও নাই। ইহা দরিদ্র ঐতিহাসিকের পক্ষে কম কষ্টের কারণ নহে।

পারসিক হস্তলিপির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরল গ্রন্থগুলি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে, এদেশে পাওয়া যায় না। তাহার ফটো আনান ব্যয়-সাধ্য, কিন্তু এই বইগুলির মধ্যে অনেক এত আবশ্যক যে তাহাদের ফটো আনান ভিন্ন উপায় নাই, ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্-এর সময় হইতে ভারতে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পারসিক ভাষায় লেখা ইতিহাসের হস্তলিপির খুব খোঁজ করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী লোকেরা তাঁহাদের জন্য ঐ ভাষায় নিজদর্শিত ঘটনার বিবরণ লিখিয়া তাঁহাদের উপহার দেয়। আর ওয়েলেস্‌লীর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার পর ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ এবং ইতিহাস-রচনার খুব উৎসাহ পড়িয়া যায়। এমন কি তাঁহার এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের পার্শিয়ান্ ট্রান্সলেটর্ অথবা ফরেন্ সেক্রেটরির মন যোগাইবার জন্য অনেকে ফার্সী ইতিহাস রচনা করিয়া দেন। সর্ব্বশেষে ডাল্‌হাউসীর ফরেন্ সেক্রেটরি বিখ্যাত সর্ হেনরী এলিয়ট্ হিন্দুস্থানের সব নবাব জমিদারের ঘর ঝাঁটিয়া পুরাতন ফার্সী ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তাহা এখন ব্রটিশ মিউজিয়মে, এবং তাহার অনেকগুলি জগতে একক!

ইংরেজ কর্ম্মচারীদের জন্য রচিত ফার্সী ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহার প্রায় সবগুলিই খুব কাজের বই এবং মূল্যবান সংবাদ দেয়:—

রিয়াজ উস্ সালাতীন (বাঙ্গলার ইতিহাস)

তারিখে বাঙ্গালা (১৭০৪—১৭৬৩ বঙ্গ-ইতিহাস)

তারিখে শাহাদৎ-ই-ফরুখ্‌সিয়র্ (বাদশা মুহম্মদ শার ধাত্রীপুত্র "দুধ-ভাই" মুহম্মদ বখ্‌শ আশোব্ রচিত)

ইব্‌রৎনামা (ফকীর খয়েরউদ্দীন রচিত)

ইমাদ্-উস্ সাদৎ (ঘুলাম আলী রচিত), ইত্যাদি।

বিলাতে কিরূপ মূল্যবান ফার্সী ঐতিহাসিক হস্তলিপি আছে, যাহার নকল এদেশে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) পূর্ব্বোক্ত আশোবের গ্রন্থ

(২) কাশীরাও রচিত পাণিপথের যুদ্ধের ইতিহাস

(৩) নজীব খাঁর জীবনী

(৪) বাদশাহ আহম্মদ শাহ (রাজ্যকাল ১৭৪৮-১৭৫৪)-এর বিস্তৃত ইতিহাস

(৫) বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর (রাজ্যকাল ১৭৫৪-১৭৫৯)-এর বিস্তৃত ইতিহাস

(৬) পাণিপথ যুদ্ধের বর্ণনা, মুনাজিল্-উল্-ফতুহ্

(৭) মিস্কিন নামধারী একজন তুর্কী-বালক ক্রীতদাস-রূপে ১৭৪৮ সালে ৮ বৎসর বয়সে পঞ্জাবে আসে। পরে তহমাস্ খাঁ নামে দিল্লীর ওমরা হয়। তাহার আত্মকাহিনী। ইহার এক অংশ মাত্র এদেশে আছে।

(৮) দিল্লী দরবারের সংবাদপত্র, সহস্র পৃষ্ঠারও অধিক।

হুইস্‌ল

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিঝুম শীতের রাত্রি জড়িমা মাখা
কুয়াশার ভারে প্রহর হয়েছে ভারী
গাঢ় হইয়াছে তম,
লেপ-ঢাকা ধরা মূর্চ্ছা-বিবশ যেন।

মশারা অলস, সার দিয়া বসিয়াছে
ধনীর দুয়ারে দীন ভিখারীর মত
মশারির চারি পাশে ;
টেবিলের ঘড়ি টিক টিক করি শীতেরে ব্যঙ্গ করে।
ঘরের কোণেতে মিটিমিটি জ্বলে আলো।
পথ-পুলিশের ক্লান্ত চোখের পাতা—
দুইটা বাজিয়া গেছে।

বন্ধ হয়েছে পথে লোক-চলাচল,
ফাঁকা গড়পার রোড—
একটি কি দুটি মোটর ছুটেছে এলোমেলো বাঁকা চালে
দূরে বড় রাস্তায়,
হুস্ করে হর্ণ একটানা বেজে কোথায় মিলায়ে যায়।
ফিটন গাড়ীর ঘোড়ার পায়ের ধ্বনি
পীচ্‌ঢালা পথে খট্‌খট্ করি বাড়ীর দেয়ালে ঠেকে,
কানে এসে বাজে মধ্যযুগের সুর—
যেন রাজকন্যারে
হরণ করিয়া বিদেশী দস্যু অশ্বলগা টানি
পিছনে ফিরিয়া দেখিছে গর্ব্বভরে।

মৃত কফিনের মত
ঠুনঠুন করি কচিৎ কখনো রিক্সা চলিয়া যায় ;
মাতাল শুইয়া তাতে—
দাম দিয়া কেনা নেশার ভারেতে ভারী দামী মাথাখানি
ঝুলিয়া কখন পড়িয়াছে একধারে।
ফেলে-আসা প্রিয়া অঘোরে ঘুমায় ঘরে,
ফিরিয়া আসিবে প্রিয়তম বলি জাগিছে যে আর জন—
তারো কোলে নাই মাথা।

মশারির তলে লেপে ঢাকা দেহ নেহাৎ নিরুদ্বেগে
স্বামী-স্ত্রী শুয়ে পাশাপাশি দুইজন।
রুদ্ধ দুয়ার বাতায়ন সব কটি ;
নিদ্রিত নিঃশ্বাসে
শীতল কক্ষ গরম হয়েছে কিছু—
তিনটা বাজিল রাত।

শয্যায় জেগে বসিল সহসা নারী,
ঘুম-ভাঙা চোখে কালো শঙ্কার ছায়া।
চাহিয়া স্বামীর পানে
শিহরিয়া ভাবে, হঠাৎ একি এ হ'ল,
কেন করে ভয় ভয়!
আতঙ্কে দুই চক্ষু বুজিয়া আসে,
রুদ্ধ দুয়ার বাতায়ন পানে চায়।
জানালা বন্ধ, দ্বারে অর্গল আঁটা,
স্বামীর বক্ষে গাঢ় সুপ্তির উঠে পড়ে নিঃশ্বাস।
কেন তবে হেন ভুল!
মনে হ'ল তার এখনি সে দেখিয়াছে···
না, না, সে ভয়ঙ্কর!
ভাবিতেও ভয় হয়।

মনের বিকার—সে ভীষণে দিতে ফাঁকি
রমণী নয়ন মুদি—
মাথা ঢাকি লেপে শুইল স্বামীর পাশে,
দুই বাহু দিয়া বক্ষে তাহারে টানি
করে অনুভব ধুক্ ধুক্ করা জীবনের স্পন্দন।

আবার······আবার ওই······
হিম আকাশের ছিঁড়ি বায়ুমণ্ডল,
ছিঁড়ি রাত্রির কুয়াশা-জড়িত তম
দূরে কোথা যেন করুণ তীব্রতায়
কেঁপে কেঁপে ওঠে, কাঁপিয়া মিলায় আর্ত্ত বিলাপধ্বনি,
কাঁপে মানুষের মন।

ঘুম-ভাঙা নারী আবার কাঁপিল ডরে,
আবার উঠিয়া ব'সে দুই হাতে চাপিয়া ঢাকিয়া কান
বলে, ভগবান, তুমিই রক্ষা কর।
দুই চোখে তার কান্নার বান ডাকে,
দৃষ্টি যতই ঝাপ্‌সা চোখের জলে
তত বেড়ে যায় মনের সে বিভীষিকা।

বেশী কিছু নয়, শিয়ালদহতে শান্টিং করে ট্রেণ,
শান্টিং করে আর দেয় হুইস্‌ল—
শান্ত স্তব্ধ শীতরজনীর মুখর উপদ্রব।
মুখর তবুও রজনীর নীরবতা
ভাঙিয়া মুহুর্মুহু,
অন্ধকারেরে চিরিয়া চিরিয়া অধিক প্রগাঢ় করে।

নিদ্রার ঘোরে শুনি এই হুইস্‌ল
রমণী জাগিয়া বসে,
রমণী পেয়েছে ভয়।
ভয়েতে কাঁদিয়া স্বামীর পরশ খোঁজে—
বাতাস-কাঁপানো তীক্ষ্ণ তীব্র সুর
মনের তন্ত্রী সহসা ছিঁড়েছে তার,
বিঁধিয়াছে অন্তর।
হুইস্‌ল শুধু হুইস্‌লধ্বনি নহে ;
শীতরজনীর শীতল অন্ধকারে
বন্ধ জানালাদ্বার।

মনে হয় তার, কেন জানি মনে হয়,
দূরে কোথা কারা অতিপরিচিত প্রিয় প্রিয়জন ছাড়ি
যাত্রা করিছে অসীম অজানা পথে,
আসিবে না ফিরে আর।
হুইস্‌ল-ধ্বনি যেন দৈত্যের বাহু,
যেন মৃত্যুর কালো সে করাল ছায়া—
ছিঁড়িয়া লইবে প্রিয় হতে প্রিয়জনে।
দ্রুত কম্পিত তীক্ষ্ণধ্বনির মাঝে
লক্ষ যুগের বিরহ-বেদনা জমাট বাঁধিয়া আছে,
সে ঘন-বেদনা তরল হইয়া শূন্যে তুলিয়া ঢেউ
দূর হতে ক্রমে ছড়ায় দুরান্তরে।
তীক্ষ্ণ সূচের মত
অস্থি-মাংস ভেদ করি ক্রমে পশে অন্তরমাঝে ;
রূঢ় মরণের মূক বিচ্ছেদ সম
প্রিয় ও প্রিয়ের মাঝে রচে ব্যবধান।

যেমনি কর্ণে পশিয়াছে এই সুর,
পাশে শুয়ে স্বামী, মনে হ'ল পাশে নাই—
যেন কোথা দূরে যুগ যুগান্ত পারে
ওঠে পড়ে তার বক্ষের নিঃশ্বাস।
ধরা নাহি যায়, ছোঁয়া নাহি যায় তারে,
ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু ফিরে আসে শূন্যে আহত হয়ে,
চোখ ভরে আসে জলে।

মনে হ'ল যেন গুমরি গুমরি কাঁদে—
মাটির আঁধারে লক্ষ যুগের লক্ষ ব্যথিত হিয়া।
প্রিয়হারা নারী ধূলায় লুটায়ে কাঁদে,
সন্তানহারা অশ্রু-অন্ধ মাতা ;
হাতে গড়া ছেলে অকালে মরেছে, হতভাগা পিতা কাঁদে,
জলহীন চোখ, মূক ক্রন্দনে কাঁদে ;
নীলাকাশ কালো ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে।
সব মিলে সেই জমানো কান্না মাটির গর্ভ ত্যজি—
আঁধার শূন্যে ধরে হুইস্‌লরূপ……
সীঁথির সিঁদুর লেপে-মুছে যায় সতী রমণীর শিরে,
এয়োতীর নোয়া ভেঙে হয় খান খান।

* * * *

বৎসর গত, তেমনই শীতের রাতি,
রমণী জাগিয়া বসিয়া তাহার নিরালা শয্যা'পরে—
তিনটা বাজিল রাত।
হাতে নোয়া আর সীঁথিতে সিঁদুর নাই।
শিয়ালদহেতে শান্টিং করা ট্রেণ
ঘন দেয় হুইস্‌ল।
হুইস্‌ল নয়, যেন মৃদু ইঙ্গিত—
দূরে কোথা প্রিয় প্রতীক্ষা করে বনের আড়ালে একা—
অভিসারিকারে হুইস্‌লে দিল ডাক।

নারী জুড়ি দুই কর—
প্রিয়েরে অথবা দেবতারে তার শান্ত প্রণাম করে ;
মুখে অস্ফুট বলে—
আর দেরী নয়, আমি যাব, আমি যাব,
পেয়েছি শুনিতে হে প্রিয়, তোমার ডাক।
শান্ত রমণী আবার শয়ন করে,
মধুর ঘুমেতে রজনী প্রভাত হয়।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Rajmohun's Wife বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। ইহা কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field নামক সাপ্তাহিক পত্রে ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ যাবৎ কেহই এই উপন্যাসখানি চোখে দেখেন নাই। শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্কিম-জীবনী" (৩য় সং) পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"বঙ্কিমচন্দ্রও এক দিন 'Rajmohun's Wife' নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি 'Rajmohun's Wife'……ছাড়িয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' শচীশবাবু নিশ্চয়ই Rajmohun's Wife দেখেন নাই। ইহা পুরাদস্তুর উপন্যাস, ২১টি অধ্যায়, তাহা ছাড়া Conclusion-ও রহিয়াছে!

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত এই প্রথম উপন্যাসখানির প্রথম ৩টি অধ্যায় ছাড়া বাকী সব অধ্যায়গুলি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম ৩টি অধ্যায় পাওয়া না গেলেও বাকী অধ্যায়গুলির দ্বারা উপন্যাসখানির রসগ্রহণে পাঠকদের কোনই বাধা হইবে না।—বঃ সঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[একটি জমিদার-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস]

বাঙ্গালার বহু প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশ যে নীচকুলোদ্ভব ইহা নিন্দার কথা হইলেও সত্য।

বংশীবদন ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের এক বৃদ্ধ জমিদারের খানসামা ছিল। এই জমিদারের নাম এবং বংশ এখন উভয়ই লোপ পাইয়াছে। প্রথম বিবাহ নিষ্ফল হওয়াতে জমিদারটি বুড়া বয়সে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু সন্তানের মুখ দেখিয়া বাঁচা এবং মরা কোনোটাই তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। অবশ্য, সন্তান-ভাগ্যের পরেই তিনি যে বস্তুটি এই বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য মনে করিতেন তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল – একটি যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী তিনি পাইয়াছিলেন। একথা সত্য যে তাঁহার দুই জীবন-সঙ্গিনীর পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রায়ই তাঁহার পারিবারিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিত, কারণ, অধিকবয়স্কা যিনি তিনি সর্ব্বক্ষণ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, যে আগে আসিয়াছে তাহার দাবী আগে এবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। বৃদ্ধ কিন্তু এবিষয়ে নিসংশয় হইতে পারেন নাই। গতিক যখন খুবই খারাপ তখন এমন একজন মধ্যস্থ আসিয়া বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন যে কাহারও কিছু প্রশ্ন করিবার রহিল না। বড়র নিঃসংশয় দাবী যথাযথ স্বীকার করিয়া তিনি তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিলেন। বৃদ্ধ এবং তাঁহার তরুণী ভার্য্যা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু এই ঘটনা যেন বৃদ্ধকে সতর্ক করিয়া দিয়া গেল; তিনি মনে মনে অনুভব করিলেন, তাঁহার ডাক পড়িতেও আর বেশী দিন নাই। পুত্র-মুখ দেখিবার কোনও সম্ভাবনাই আর রহিল না। বৃদ্ধের মন এই ভাবিয়া তিক্ত হইয়া গেল যে তাঁহার এই বিশাল সম্পত্তি এমন সকল লোকের ভোগে আসিবে যাহাদিগকে তিনি চেনেন না বলিলেই চলে। পত্নীর জীবিতকাল পর্য্যন্তও না হয় সম্পত্তি তাহার হাতছাড়া হইতে পারিবে না কিন্তু আইন তাহাকে স্বামীর সম্পত্তি হইতে সামান্য ভরণপোষণের উপযোগী একটা ভাতা ছাড়া আর কিছুই লইতে দিবে না। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার যুবতী পত্নী যাহাতে সম্পত্তির পুরা মালিক হইতে পারে বৃদ্ধ সে বিষয়ে অবহিত হইলেন; যুবতী পত্নীর পরামর্শ ও যুক্তি তাঁহাকে চালিত করিতে লাগিল। এ বিষয়ে নিজের মনোহর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই যুবতীর অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল বলিয়া সে স্বামীকে দিয়া ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করিতে লাগিল। সমস্ত স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর করিবার দিকে বৃদ্ধ ঝোঁক দিলেন। জমিদারীকে যতটা পারেন নগদ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তিতে তিনি রূপান্তরিত করিতে লাগিলেন। নগদ টাকা সম্বন্ধে তাঁহার এই লোভ এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি যেদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তাঁহার উত্তরাধিকারিণী সেদিন যে বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিল—স্থাবর জোতজমা তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র।

করুণাময়ী যে বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে আমাদিগকে সন্দেহ করিবার অবকাশ মাত্র না দিবার জন্য স্থির করিল, রূপা এবং রূপ নামক যে দুইটি পদার্থের সে অধিকারিণী সেই দুইটিরই সদগতি করিতে হইবে। সে নিজেকে বুঝাইল, ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্র সীতাবিরহে কাতর হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর

প্রতি গভীর প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিলেন। মৃত স্বামীর প্রতি তাহার প্রভূত ভালবাসা এই প্রকারের প্রতিনিধি-পদ্ধতির সাহায্যেই বা সার্থক হইবে না কেন? সে আরও ভাবিল যে, যে-প্রিয় চলিয়া গিয়াছে, যাহাকে সে হারাইয়াছে এবং যাহার বিরহে সে শোকার্ত্ত, সামান্য ধাতুমূর্ত্তিকে তাহার প্রতিনিধি না করিয়া যদি একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষকেই সেই পদ দেওয়া যায় তাহা হইলে এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করা হয়, কারণ, মানুষ প্রাণীটাই একটা মহত্তর ব্যাপার, ধাতুদ্রব্য অপেক্ষা মানুষের সহিত নিশ্চয়ই উহার মিল বেশী এবং এই মিল শুধু বাহিরের অবয়বের মিল নহে। এরূপ তর্কের দ্বারা মনকে দৃঢ় করিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃও বটে আবার দেবতাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও বটে, অনতিকাল মধ্যে সে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া লইল। বাবুর খানসামা বংশীবদন ঘোষের ললাটে রাজটীকা পড়িল। ধূর্ত্ত বংশীবদনও এই সুবিধা ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রভু-পত্নীর দেহ-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া সে তাহার অস্থাবর সম্পত্তিরও মালিক হইবে না এমন কথা ভাবিতে পারিল না। সম্পত্তির মালিক হইতে তাহাকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না; খানসামা হইতে সদর নায়েব পদে উন্নতি দেখিতে দেখিতে হইল।

এদিকে করুণাময়ীর তখন প্রত্যহই ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছিল—সেই জ্বর অজ্ঞাত কারণে কিম্বা হয়ত বা অত্যন্ত জ্ঞাত কারণেই হঠাৎ বাড়িয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং লুব্ধ বিধবার মনের আগুন নিবিবার বহু পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তাহাকে

তাহার সংসার ও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বামীর দূর সম্পর্কের লোলুপ আত্মীয়েরা একে একে সম্পত্তির লোভে আসিয়া হতাশ হইয়া দেখিল, সামান্য দুই একটি দরিদ্র গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহারা শুনিল, অস্থাবর সম্পত্তি অতি সামান্যই ছিল এবং যাহা ছিল তাহাও বিধবার স্বামীর দাস-দাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বংশীবদন বিপুল সম্পত্তি লইয়া রাধাগঞ্জে তাহার দরিদ্র পৈত্রিক ভিটাতে উপস্থিত হইল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া সে যে প্রভূত ধনের মালিক হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিল না, সাধারণ রকম আরামে থাকিতে গেলে যেটুকু করা দরকার তাহার অধিক খরচ সে করিল না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার তিন পুত্রের ভাগ্যেই ভাগবাটোয়ারা হইয়া প্রচুর পৈত্রিক অর্থলাভ ঘটিল। বহুদিনের অধিকারের ফলে তখন তাহারা এই অর্থের মালিকান স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে—তাহাদিগের পিতা যে-ভয়ে সংযত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল তাহারা তাহা করা আবশ্যক মনে করিল না। তাহারা জমিদারী খরিদ করিতে লাগিল, বড় বড় ইমারৎ নির্ম্মাণ করাইল এবং তাহাদের অর্থের অনুপাতে আড়ম্বর ও চাল বাড়াইয়া চলিল। জ্যেষ্ঠ রামকান্ত খুব হিসাব করিয়া সুপরিচালনার ফলে তাহার নিজের অংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিল এবং বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া একমাত্র পুত্র মথুরের সক্ষম হাতে সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া গেল। মথুরের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পাঠকের পরিচয় হইয়াছে।* পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকোপে দেশের

যুবক বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র।

* প্রথম তিন পরিচ্ছেদের কোথায়ও মথুরের প্রসঙ্গ ছিল।—

প্রাচীন রীতিনীতির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল রামকান্তের তাহা ভাল ঠেকিত না। সে বরাবরই ইংরেজি স্কুলে পুত্রের শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, এই ইংরেজি স্কুল গুলিকে সে শুধু অনাবশ্যক মনে করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, ইহাদের দ্বারা দেশের সত্যকার ক্ষতির আশঙ্কা করিত। মধুর বাল্যকাল হইতে পিতাকে জমিদারী পরিচালনায় সাহায্য করিত এবং জাল-জুয়াচুরী প্রজা-শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে খুব পাকা হইয়া উঠিয়াছিল।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাইয়ের ভাগ্য ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সে স্বভাবতই অলস ও অমিতব্যয়ী ছিল বলিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে নানা বৈষয়িক গোলযোগের সৃষ্টি করিল। তাহার বাড়ী ও বাগান ছিল সব চাইতে জমকালো কিন্তু তাহার স্থাবর সম্পত্তির আয় ছিল না বলিলেই হয় এবং বৈষয়িক এমন অব্যবস্থাও আর কাহারও ছিল না। তাহার চারি পাশে একদল ফন্দীবাজ মোসাহেব জুটিয়া নানা ফিকিরে তাহার বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল। অবস্থা যখন খারাপ তখন তাহারা নিজেদের কল্পিত কোনো বিশেষ ব্যবসায়ে যোগদান করিলে কি ভাবে অবস্থা ফিরান যাইতে পারে সে বিষয়ে রঙ চড়াইয়া নানা কথা বলিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। রাম কানাই তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিল এবং নিজেকে সম্পূর্ণ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বাস উঠাইয়া আনিল। বলা বাহুল্য, পরামর্শদাতারা একটু একটু করিয়া ব্যবসায়ে সে যে টাকা ফেলিয়াছিল তাহার সবটুকুই গ্রাস করিয়া তাহাকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিল যে অনতিবিলম্বে তাহার অব্যবস্থিত ও অবহেলিত স্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়িল।

রামকানাইয়ের সহরে বাস করার একটি ফল হইয়াছিল ভাল—সহরের লোকেদের দেখাদেখি সে তাহার পুত্রের কলিকাতায় যতটা সম্ভব ততটা শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। হিন্দু পিতার যাহা চরম কাম্য-এক অপরূপ সুন্দরী বালিকার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া সে কামনাও সে চরিতার্থ করিয়াছিল।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের এক দরিদ্র কায়স্থ বড়াই করিত যে দেবতা তাহাকে যে মহামূল্য সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলে না—রূপে, গুণে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ও বিনম্র ব্যবহারে তাহার দুই কন্যার জোড়া নাই। কিন্তু যে অদৃষ্ট-দেবতা কোমলপ্রাণ বাঙালী ঘরের অপরূপ সুন্দরী ও অতিকোমলপ্রাণা বালিকাদের সঙ্গে অতি অপদার্থদের যোগ ঘটাইয়া থাকেন, তিনিই তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সহৃদয়া ও সুন্দরী মাতঙ্গিনীকে বর্ব্বর রাজমোহনের বাহুবন্ধনে নিক্ষেপ করিলেন। বিবাহ হওয়ার পরেও মাতঙ্গিনীর পিতার বিশ্বাস ছিল যে বর মাতঙ্গিনীর অনুপযুক্ত হয় নাই। রাজমোহন তখন পুরা জোয়ান; বয়সের বৈষম্য সত্ত্বেও তাহা মানিবার প্রয়োজন হয় নাই। রাজমোহন দেখিতে সুপুরুষ ছিল না; কিন্তু লোকে তখন কিশোর বর খুঁজিতে গেলেই সৌন্দর্য্য দেখিত—যৌবনে যে পা দিয়াছে তেমন বরের চেহারার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হইত না। পাশের গ্রামেই তাহার বাস ছিল; বিবাহ হইয়া গেলেও কন্যা যে পিতার নিকট হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না, এই বিবাহের পক্ষে ইহাও একটি কারণ ছিল। রাজমোহনকে যাহারা জানিত তাহারা তাহার সবল দেহ ও অপরিমেয় দেহশক্তিকে হিংসা করিত ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহাকে না দেখিয়া পারিত না। সে অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম ও পরিশ্রমী ছিল এবং কোনও কিছুতেই পশ্চাদপদ হইত না বলিয়া তাহার পিতা তাহার জন্য কিছুই না রাখিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাহাকে মোটেই শিক্ষাদীক্ষা না দিতে পারিলেও সে কখনও অভাব অনটনে কষ্ট পাইত না। মাতঙ্গিনীর পিতা রাজমোহনের এই ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিল এবং কন্যা যে কোনও দিন অভাবের তাড়না সহ্য করিবে না এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াই এই বিবাহ ঘটাইয়াছিল। দ্বিতীয়া এবং অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবতী কন্যা হেমাঙ্গিনীই বালক মাধবের বধূ হইল।

মাধবের পিতা রামকানাই মাধবের কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাধব পিতার মৃত্যুতে কপর্দ্দকহীন হইত কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা তাহাকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিল।

বংশীবদনের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল জ্যেষ্ঠ রামকান্তের মত ভাগ্যবানও ছিল না এবং মধ্যম রামকানাইয়ের মত হতভাগ্যও ছিল না। সে নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবের হাতে নিজের প্রায় সমুদয় সম্পত্তি এই সর্ত্তে দিয়া যায় যে যতদিন তাহার

বিধবা পত্নী মাধবের আশ্রয়ে থাকিবে ততদিন মাধব তাহার ভরণপোষণ করিবে।

শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মাধব পড়াশুনা লইয়াই রহিল—তাহার অবর্ত্তমানে ও তাহার সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীরাই সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে লাগিল। বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে তরুণী সুন্দরী স্ত্রীসমভিব্যহারে সহর ছাড়িয়া দেশে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। যাত্রার পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার নিকট বিদায় লইবার জন্য সে পত্নীকে পিতৃগৃহে লইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী মাতঙ্গিনীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিল—ভাগ্যচক্রে হউক অথবা যে কারণেই হউক ঠিক এই সময়ে রাজমোহনের স্ত্রী মাতঙ্গিনীও পিতৃগৃহে উপস্থিত ছিল।

শ্বশুরালয়ে বেশীদিন থাকিবার ইচ্ছা মাধবের ছিল না। পিতামাতা ও ভগ্নীর নিকট হইতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় হেমাঙ্গিনী খালি কাঁদিত। তাহার মনে হইত সে দূরে—বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে এবং হয়ত কখনও বাল্যের স্নেহস্মৃতিসম্বলিত পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিবে না। তাহার পিতামাতা কি কখনও তাহাকে দেখিতে যাইবেন ? বাবা বলিয়াছেন, তিনি যাইবেন, কিন্তু মা ? দিদি ? মা ও দিদি উত্তর দেয় নাই, নীরবে কাঁদিয়াছিল ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

মাতঙ্গিনী একদিন ভগিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে লইয়া গিয়া বলিল, হেম, তোকে একটা কথা বল্‌ব, রাখবি ? হেমাঙ্গিনী জবাব না দিয়া ডাগর কালো চোখের বিস্মিত আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া দিদির দিকে চাহিল।

মাতঙ্গিনী আবার বলিল, হেম, কালকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে, নয় ?—হেমাঙ্গিনী আর থাকিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাতঙ্গিনী নিজে বহুকষ্টে কান্না সামলাইয়া বলিল, কাঁদিসনে বোন, কাঁদিসনে। ভগবান তোর মঙ্গল করবেন। মাধবের মত স্বামী পেয়েছিস—সে তোকে অসুখী করবে না।—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখে অশ্রুর বান ডাকিল; গাল ছাপাইয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হেমাঙ্গিনীর পদ্মের মত শুভ্র হাতের উপর পড়িল। হাতখানি মাতঙ্গিনীর হাতে ধরা ছিল।

চোখ মুছিয়া হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কিছু বল্‌ছিলে, দিদি ?

—হেম, আমি বড় গরীব—এত গরীব তবু শুধু নিজের জন্যে হলে তোকে কিছু বলতাম না। কিন্তু আমার স্বামী, সে যাই হোক বোন—ভগবান তাকে অমনই গড়েছেন—তবু সে আমার সব, তার জন্যে আমাকে ভাবতে হয়। সে এখন বেকার বসে আছে—অবস্থা তার ভারী খারাপ। তার হয়ে মাধবের কাছে তোকে কিছু বলতে বলেছে—পারবি ?

—পারব না কেন দিদি, কিন্তু কি বলব ?

—বলবি যদি সে তার একটা চাক্‌রি জুটিয়ে দিতে পারে—এমন কিছু যাতে সংসারটা চলে যায়।

—নিশ্চয়ই বলব দিদি।

হেমাঙ্গিনী প্রতিশ্রুত হইল। তারপর দুই ভগিনী অন্য বিষয় লইয়া কথা বলিতে লাগিল।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী দিদির প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে এমন একটি কাজের ভার লইল—যাহা সে কেমন করিয়া করিয়া উঠিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহার বয়সটা এমন কাঁচা যে এ বয়সে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারে না এমন একটা বিষয় লইয়া কথা তো বলেই না। তবু সে মন স্থির করিয়া স্বামীকে তাহার দিদির সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা বলিয়া ফেলিল। মাধব সাধ্যমত চেষ্টা করিবে বলিল।

রাজমোহন গোঁয়ারদের স্বাভাবিক সঙ্কোচ বশতঃ সরাসরি ভায়রাভাইয়ের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা না জানাইয়া সাধারণত দরিদ্র আত্মীয়েরা যে পন্থার আশ্রয় লয়—সেই পথে শাড়ী-রাজ্যের প্রতিনিধির আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। মাধব কিন্তু রাজমোহনকে নিজেই জবাব দিবে স্থির করিল এবং পর দিন প্রাতে রাজমোহনের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা সুরু করিল। সে যতটা সম্ভব বিনীত ভাবে রাজমোহনের বর্ত্তমান অবস্থা ও কাজকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। রাজমোহন অন্ধ গর্ব্ব অথবা লজ্জা অথবা অন্য কোনও মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের দুরবস্থা স্বীকার করিল না, শুধু বলিল—বর্ত্তমানে সে তেমন কিছু করিতেছে না। মাধব তখন তাহাকে জানাইল যে তাহার জমিদারীর কিয়দংশের পরিচালনার ভার দিতে পারে এমন একজন বিশ্বাসী কর্ম্মঠ

আত্মীয়ের সাহায্য তাহার আবশ্যক এবং রাজমোহনের যদি রাধাগঞ্জে গিয়া বাস করিবার কোনও আপত্তি না থাকে তাহা হইলে এই আত্মীয়ের কাজটুকু করিয়া দিবার জন্য সে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে।

রাজমোহন জবাব দিল—তা হয় না, ভায়া। এঁদের রেখে যাব কার কাছে?

মাধব বলিল, সে কথা কি না ভেবেই বল্‌ছি! রাধাগঞ্জেই একটা ভাল দেখে বাড়ী ঠিক করে দেব।

রাজমোহন ভায়রাভাইয়ের দিকে তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিল। বলিল—রাধাগঞ্জে গিয়ে থাকবে! অসম্ভব, তার চাইতে জেলখানায় পচে মরা ভাল।—বলিয়াই রাগে গর গর করিতে করিতে সে চলিয়া গেল।

মাধব রাজমোহনের এই অকারণ ক্রোধ দেখিয়া বিস্মিত হইল কিন্তু কিছু বলিল না। রাজমোহনের কিন্তু বাছিয়া লইবার মত অন্য পথ ছিল না। তাহার স্ত্রীরও অজ্ঞাত এমন একটি কারণ ছিল যে জন্য অবিলম্বে বাসস্থান পরিবর্ত্তন তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল—কিন্তু সে রাধাগঞ্জে যাওয়ার কথা ভাবে নাই। সে দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া আবেদন করিয়াছিল বটে কিন্তু এই আবেদনের মূলে দারিদ্র্যের হাত সামান্যই ছিল। মাধবের প্রস্তাবে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এরূপ ভাব প্রকাশ করিল। চাদর লইয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ফাঁকা মাঠের পথে সে একটানা চলিতে লাগিল—দৌড়াইতে লাগিল বলিলেই যেন ঠিক বলা হয়। কোথাও সে দাঁড়াইল না, কাহারও সহিত সে কথা কহিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, মাধব ফিরিল না। অবশেষে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সে গম্ভীর—মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট। সে সপরিবারে রাধাগঞ্জে যাওয়াই স্থির করিয়াছে। সে মাধবকে তাহার সঙ্কল্পের কথা নিতান্ত ভদ্রভাবে বলিল না। মাধব তাহার যাওয়ার আয়োজন করিবার সুবিধা দিবার জন্য আরও কিছু-দিন থাকিয়া গেল এবং আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সকলে মিলিয়া সহর ত্যাগ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই রাধাগঞ্জে পৌঁছিল।

রাজমোহনের ব্যবহার যত কর্কশই হউক, যে অভদ্রতার সঙ্গেই সে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকুক, মাধব তাহার প্রতি অতি সুন্দর ব্যবহার করিতে লাগিল। বর্ব্বর ভায়রা-ভাইয়ের দুর্নীতিপরায়ণ অকৃতজ্ঞ চরিত্রের কথা জানিয়াও শুধু মাতঙ্গিনীর অকারণ দুর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য সে মাত্র একখানি গ্রামের তত্ত্বাবধানের ভার রাজমোহনের হাতে ছাড়িয়া দিল বটে কিন্তু তাহার মোটা মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। রাজমোহনের জন্য একটি বাড়ীও নির্ম্মিত হইল—এই বাড়ীর সহিতই আমরা গ্রন্থারম্ভে পাঠকের পরিচয় করাইয়াছি—তাহাকে জন-মজুরের সাহায্যে চাষ করিবার উপযুক্ত জমি দিল। রাজমোহন শেষের কাজটা লইয়াই প্রায় সমস্ত সময় ব্যাপৃত থাকিত—জমিদারী শেরেস্তার কাজ সে বুঝিত না বলিলেই হয়।

কিন্তু এত করিয়াও মাধব রাজমোহনের মন জয় করিতে পারিল না। রাধাগঞ্জে পদার্পণ করা অবধি রাজমোহন হৃদয়হীন ব্যবহারে মাধবকে পীড়িত করিতে লাগিল। মাধবের সহৃদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে রাজমোহনের ব্যবহারকে শুধু হৃদয়-হীন বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, রাজমোহন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল এবং দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক সামান্যই রহিল। মাধব বাহিরে রাজমোহনের এই অদ্ভুত আচরণ যেন লক্ষ্যই করিল না, করিলেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই চলিতে লাগিল কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি সমান দাক্ষিণ্য দেখাইতে সে কুণ্ঠিত হইল না। দুই পক্ষের এই মনোভাবের ফলে পরস্পর অত্যন্ত স্নেহসম্পন্না দুই ভগিনীর মেলামেশার অবকাশ অত্যন্ত কমিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[একটি পত্র—অন্তঃপুর]

মাধব জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের* নিকট বিদায় লইয়া বাগান হইতে ফিরিয়া দেখিল একটি লোক 'জরুরী' মার্কা একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে। মাধব ব্যস্তসমস্তভাবে খামখানি ছিঁড়িয়া অধীর আগ্রহে চিঠি পড়িতে লাগিল। জেলার সদর হইতে তাহার উকীল এই চিঠি পাঠাইয়াছে। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে মাধব মনে মনে যে সকল মন্তব্য করিল সেইগুলি শুদ্ধ উহা উদ্ধৃত করিতেছি। মাধব পড়িল—

* মূল ইংরাজীতে 'Cousin' শব্দ আছে। Cousin অর্থে সব রকম ভাই-ই হইতে পারে—এ ক্ষেত্রে রামকান্তের পুত্র মথুর হওয়াই সম্ভব এইরূপ [illegible] করিয়া জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র লিখিত হইয়াছে।—বঃ সঃ

"মহার্ণব,

অধীন সদরে থাকিয়া বিশেষ যত্নসহকারে হুজুরের মামলা পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং সবগুলিতেই যে জয়লাভ ঘটিবে অধীন এইরূপ আশা পোষণ করে।"

মাধব ভাবিল—সবগুলিতেই……তুমি তা বলিতে পার উকীল, কারণ কোনটাই আমার মিথ্যা মামলা নয়। কিন্তু আদালতেই কি আর সব সময়ে ন্যায়-বিচার হয়?……… তোমার কথা কিছু বাদসাদ দিয়াই ধরিতে হইবে। লোকটা কাজের বটে, মামলা যে ভাল চালায় একথা স্বীকার করিতেই হইবে……আর এই সব হাঙ্গামাহুজ্জুত যদি চুকিয়া যাইত! কিন্তু প্রতিবেশীরা কি আবার মকোদ্দমা বাধাইতে ছাড়িবে? হ্যাঁ, তারপর? মাধব পড়িতে লাগিল—

"নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে 'অন্ধ অছির সাহায্যে হুজুরের খুড়ীমাতা সদর আমীনের আদালতে হুজুরের নামে এই মর্ম্মে এক মকোদ্দমা দায়ের করিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর উইল জাল এবং তিনি ওয়াশীলাৎ সহ তাঁহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার দাবী করেন।"

খুড়ীমা!……বিহ্বল মাধবের হাত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। খুড়ীমা! হায় ভগবান! আমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া চান! আমি জাল করিয়াছি! হতভাগীকে লাথি মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব।

মাধব কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতে লাগিল, শেষে নিজেকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সে চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

"তাঁহাকে এইরূপ করিবার পরামর্শ কে দিয়াছে প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত নহি; অধীন অনুসন্ধানের ত্রুটি করে নাই। কারণ, কেহ যে ইহার পিছনে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং সে একজনের নামও শুনিয়াছে। এই কার্য্যের সঙ্গে মহদাশয়েরা সব যুক্ত আছেন।"

মাধব ভাবিল—পরামর্শদাতা? কারা হইতে পারে? সে অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল একজন প্রতিবেশী জমিদারের কথা। তারপর আর একজনের কথা মনে হইল কিন্তু কোনও নামটাই সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। মাধব পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু হুজুরের ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। আমি জানি উইল জাল নহে এবং যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। কিন্তু তবুও সাবধান হইতে হইবে। জজ কোর্টের অমুক বাবুকে ও অমুক উকীলকে ওকালতনামা দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সদর আদালত হইতেও একজনকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। উভয় পক্ষের সওয়ালজবাবের দিন এবং শেষ শুনানীর তারিখেও সুপ্রীম কোর্টের একজন ব্যারিষ্টার রাখিলে ভাল হয়। মোট কথা অধীনের যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকু প্রয়োগ করিতে কুন্ঠিত হইব না; এই মকোদ্দমার জন্য প্রাণ দিয়াও চেষ্টা করিব। হুজুরের অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

সেবকাধম
শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস

পুঃ—প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের জন্য আপাতত এক হাজার টাকা হইলেই চলিবে।"

চিঠি পড়িয়াই মাধবের প্রথম মনে হইল, সে খুড়ীমার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা জানিবে। মাধব দ্রুত ভিতর-মহলে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু সেখানে জেনানা জীবনের অতিশয় চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ তলাইয়া গেল। গোলগাল কালো একটি ঝি, ঠিক কাহাকে লক্ষ করিয়া মাধব বুঝিল না, গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি দ্রব্যের অভাব লইয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল। অপর একজন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিষয়ে সেও কম ভাগাবতী নয়, এবং ভগবানের দেওয়া বিরাট দেহখানি যত খানি সম্ভব প্রকট করিতে সে গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল—, ঝাঁটা হাতে মেঝেয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তূপীকৃত তরিতরকারির খোসা প্রভৃতি জঙ্গল সাফ করিতে করিতে সমানে জিহ্বার ব্যবহার করিতেছিল। যে তরকারি কুটিয়াছে ঝাঁটার প্রত্যেক প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে এই অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী নারী সশব্দ অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল।

তৃতীয় একজন উঠানের একপাশে আঁস্তাকুড়ের ধারে বসিয়া কতকগুলি পিতলের বাসন মাজিতে ব্যস্ত ছিল; তাহার বনেদি হাত দুখানি যত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছিল মুখ-যন্ত্রও তাহার সহিত তাল রাখিয়া হতভাগ্য রাঁধুনীর বিরুদ্ধে চোখাচোখা বাণ নিক্ষেপ করিতেছিল। রাঁধুনীর অপরাধ সে পিতলের পাত্রগুলিকে যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে এবং সেইজন্যই তো এতো খাটিতে হইতেছে। রন্ধনকারিণী স্বয়ং তখন এই দৃশ্য হইতে কিছু দূরে একজন বর্ষীয়সী রমণী সম্ভবতঃ বাড়ীর কর্ত্রী অথবা গৃহিণীর সহিত রাত্রির রান্নার ঘিয়ের পরিমাণ বিষয়ক অত্যন্ত মনোহারী প্রসঙ্গে একটু উত্তপ্ত হইয়া লিপ্ত ছিল বলিয়াই বাসন-মাজা ঝি তাহার ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সম্বন্ধে যে ভয়াবহ আলোচনা করিতেছিল তাহা শুনিতে পাইতেছিল না। অন্নব্যঞ্জন-প্রস্তুতকারিণী সাধ্বী প্রয়োজনের ঠিক দ্বিগুণ ঘি মাত্র চাহিতেছিল—কারণ নিজের ব্যবহারের জন্য খানিকটা ঘি গোপনে না সরাইলে চলিবে কেন। অন্য কোণে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা যে লোভনীয়ই হইয়াছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ অতি মধুর ঘস্ ঘস্ শব্দ সহযোগে বঁটিতে মাছ কোটা হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিকা রন্ধনকারিণীর দুঃখের কারণ ঘটাইতেছিল। দালান ও বারান্দার এদিকে ওদিকে মলিন মৃত্তিকা-প্রদীপ

ঝালাইয়া ছোট ছোট হাতে ধরিয়া কয়েকটি মনোহর মূর্ত্তি নিঃশব্দে না হইলেও মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া দ্রুত যাতায়াত করিতেছিল; রূপার মলের রুনুঝুনু আওয়াজ এবং কচিৎ বা ততোধিক মধুর কণ্ঠে তাহাদের পরস্পরকে আহ্বানের শব্দ কানে আসিতেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক জোড়া শিশু এই অবসরে নিজেদের বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য পরস্পরের চুল টানিয়া ছিঁড়িবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল। এই সমস্ত আবর্জ্জনার মধ্যে তাহাদিগকে বেমানান ঠেকিতেছিল না। ছাদের এক কোণে বসিয়া একদল বালিকা সশব্দে আগডুম বাগডুম খেলায় মত্ত ছিল।

মাধব ক্ষণকাল হতাশভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—এই প্রচণ্ড কলকোলাহলের মধ্যে তাহার কথা শুনিবে কে?

শেষে যখন অসহ্য হইল, গলাটা যতদূর সম্ভব চড়াইয়া সে বলিল—আরে এই মাগীরা—তোরা থাম দেখি, একটা কথা বল্‌তে দে।

এই অল্প কয়টি কথাই যেন যাদুমন্ত্রের কাজ করিল। গৃহস্থালীর অনির্দ্দিষ্ট তৈজসপত্রাদির অভাব সম্বন্ধে যাহার উচ্চ কণ্ঠ এতক্ষণ বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিতেছিল একটা বিপুল আর্ত্তনাদের মাঝখানেই সে থামিয়া গেল—সেই গোলগাল কালো বপুখানি আর দেখা গেল না। ঝাঁটা-হস্তেন সংস্থিতা শ্রীমতীর হস্ত হইতে প্রচণ্ড অস্ত্রখানি খসিয়া পড়িল; সর্পাহতার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া সে দ্রুতপদে তাহার অর্দ্ধউলঙ্গ মেদভার কোনও অন্ধকার কোণে লুকাইবার প্রয়াস করিল। পিত্তল বাসন মাজিবার কার্য্যে যে অনলবর্ষিণী রত ছিল তাহার কণ্ঠের মধুর অভিশাপবাণী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; তাহার বাহু ও জিহ্বার আবর্ত্তন সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই থামিল। মৎস্যকুলের নিধন-সাধনে যে ব্যস্ত ছিল সেও খানিক বাধা পাইল এবং যদিও সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সে কার্য্যে মনোনিবেশ করিল—তেমন আওয়াজ আর তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল না। রন্ধন-শালার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঘৃতবিষয়ক প্রস্তাব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল বটে কিন্তু তাড়াতাড়িতে পলাইতে গিয়া সে ভুলক্রমে ঘিয়ের পাত্রটাই লইয়া গেল—ইহারই অংশ বিশেষের জন্যই এতক্ষণ বাগবিতণ্ডা হইতেছিল। প্রদীপ হস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মূর্ত্তিরা দ্রুত ধাবনে অন্তর্দ্ধান করিল বটে—তাহাদের চরণের অলঙ্কার মুখর হইয়া তাহাদিগের আত্মগোপনের পথে বাধা জন্মাইল। অন্ধকারে দুই উলঙ্গ বীরের যুদ্ধ দুই পক্ষেরই পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সমাপ্ত হইল—তবে অপেক্ষাকৃত কৃতী যোদ্ধা যে, সে পলাইবার মুখেও বিপক্ষের পশ্চাতে একটি লাথি মারিয়া নিজের প্রাধান্য প্রচার করিতে ছাড়িল না।—এই বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগডুম বাগডুম খেলায় রত বালিকারা খেলা ছাড়িয়া হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে পলাইল। ইতিপূর্ব্বে যে দৃশ্যের কলকোলাহলের তুলনা ছিল না সেই দৃশ্যই হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেল, শুধু ঘরের প্রবীণা গৃহিণীই শান্ত স্থির ভাবে গৃহকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রবীণাকে সম্বোধন করিয়া মাধব বলিল, মাসী, ব্যাপার কি? বাড়ীতে বাজার বসেছে যে!

মাসী প্রসন্ন স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, পাঁচজন মেয়ে একজায়গায় হলে যা হয় তাই হচ্ছে বাছা, চ্যাঁচানোই তো স্বভাব ওদের।

—খুড়ীমা কোথায় মাসী?

— সেই কথা তো আমিও ভাবছি বাপু। সকাল থেকেই তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মাধব বিস্মিত হইয়া বলিল, সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছ না? কথাটা তা হলে দেখ্‌ছি সত্যি।

—কি সত্যি বাবা?

—এমন কিছু নয় মাসী, তোমাকে পরে বল্‌ব। তা হলে তিনি গেলেন কোথায়? জিজ্ঞেস করে দেখ ত কেউ তাকে দেখেছে কিনা।

মাছ ও পিতলের বাসন লইয়া যাহারা ব্যস্ত ছিল তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া প্রবীণা কহিলেন, অম্বিকা, শ্রীমতী, তোরা কি তাকে দেখেছিস?

মৃদু কণ্ঠে তাহারা জবাব দিল, না।

প্রবীণা কহিলেন, আশ্চর্য্য, তারপর যেন দেওয়ালকে সম্বোধন করিয়াই কহিলেন, কেউ দেখেনি তাকে?

দেওয়ালের ওপাশ হইতে কে জবাব দিল, স্নানের সময় তাকে বড়-বাড়ীতে দেখে এসেছি।

প্রবীণা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বড়-বাড়ীতে?

মাধবও বলিয়া উঠিল, বড়-বাড়ীতে? মথুর দাদার বাড়ীতে?—মাধব হঠাৎ যেন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল; অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, মথুর দাদা! তা হ'লে কি তিনিই এসব করাচ্ছেন? না, না, তা হতে পারে না। আমি অন্যায় সন্দেহ করছি।

পরক্ষণেই একটু উচ্চ কণ্ঠে উপস্থিত স্ত্রীলোকদের একজনকে সম্বোধন করিয়া মাধব কহিল, বড়-বাড়ীতে গিয়ে দেখ—সেখানে যদি খুড়ীমা থাকেন, তাকে এখনই আস্‌তে বল। যদি তিনি আসতে না চান, তারও কারণ জেনে এসো।

(ক্রমশঃ)

[illegible] দাস কর্ত্তৃক অনূদিত।

ম্যালেরিয়া

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বহু কালের পুরাতন একখানি গ্রাম। সকল পুরাতন গ্রামের মতো এই গ্রামখানিরও একটি ইতিহাস আছে। কিন্তু সে কথা থাক।

শরৎকালের প্রভাত। কিন্তু শারদ-শ্রীতে উদ্ভাসিত নয়। প্রভাতের আলো কেমন যেন পাণ্ডুর, মলিন। একটি অপরিচ্ছন্ন, জঙ্গলাকীর্ণ ডোবার ধারে ধারে গুটিকয়েক শীর্ণ-দেহ, নগ্নকায় বালক নিঃশব্দ সতর্কতার সহিত ছিপ হাতে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের পায়ের চাপে ঝরা পাতায় যে মর্ম্মর-ধ্বনি হইতেছিল তাহা ছাড়া আর কিছুতে তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

ডোবার ওদিকের কোণে একটি বক মুনি-ঋষির মতো নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া ছিল। আর একটা মাছরাঙ্গা পাখী ডোবার জলের এক ইঞ্চি উপর দিয়া অবিশ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ডোবার পূর্ব্বদিক দিয়া যে কাঁচা রাস্তাটি মাঠের দিকে গিয়াছে সেই পথে একটি রাখাল-বালক গুটিদুই শীর্ণ অস্থি-চর্ম্মসার গরুকে ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে চরাইতে লইয়া যাইতেছিল। পত্র-মর্ম্মরে তাহার দৃষ্টি বাঁ দিকে পড়িতেই সে মেছুরিয়া বালকদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—

কিরে শরতা, মাছ পেলি? হেই! শালার গরু—

শরতার ছিপে মাছ লাগিবার কেবল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সে ইঙ্গিতে রাখাল-বালকটিকে কথা কহিতে নিষেধ করিবার জন্য বাঁ হাতটি তুলিল।

গরু দুটি শীর্ণ হইলে কি হয়, বদমাইসিতে কোনো গরুর চেয়ে কম নয়। একটির তো গলায় উদুখলই দিতে হইয়াছে তবু কি মানে? কেবলই বিপথে ছোটে। রাখাল-বালক এইটিকে লইয়া ব্যস্ত ছিল, শরতার ইঙ্গিত দেখিতে পায় নাই। গরু দুটিকে মাঠের দিকে নামাইয়া দিয়া সে ছুটিয়া মাছ ধরা দেখিতে আসিল।

—পেয়েছিস্? শরতা?

মাছ বোধ হয় একটা লাগিয়াছিল। কিন্তু রাখালের পদশব্দেই হোক, অথবা তাহার চীৎকারেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, মাছটি ছাড়িয়া গেল।

শরতা শূন্য ছিপে একটা খিঁচ দিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল,—পেয়েছিস্? শরতা? মারবো শালা ছিপের বাড়ি।

শরতা বলিষ্ঠ নয়, কিন্তু রাখাল আরও দুর্ব্বল। বছর পনেরো বয়স, কিন্তু আট নয় বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম জার্ম্মান। পেট-জোড়া পীলে, বুকের হাড় গোণা যায়।

শরতার বিঘূর্ণিত লোচন ও উদ্যত ছিপ দেখিয়া জার্ম্মান ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু দমিবার ছেলে সে নয়। জিভ বাহির করিয়া ভেংচি কাটিয়া সে মাঠের দিকে ছুট দিল।

শরতা হাতের কাছে একটা মাটির ঢিল তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। ঢিল লাগিল না। সে আবার মৎস্য-শীকারে মনোনিবেশ করিল।

ডোবার দক্ষিণ দিক হইতে পায়ে-চলা রাস্তাটি ঢালু হইয়া যেখানে নামিয়াছে সেইখানটি এ পাড়ার খিড়কীর ঘাট। একটি বর্ষিয়সী বিধবা মহিলা সেখানে আপন মনে বাসন মাজিতেছিলেন। একটি তরুণী বধূ বাঁ হাতে এক কাঁড়ি বাসন লইয়া সেই ঘাটে নামিল। তাহার পিছনে আর একটি বছর তিনেকের খুকী। গায়ে অনেকগুলা সূতী জামার উপর একটা জুট-ফ্লানেলের ফ্রক,—ফ্রক ঠিক নয়, একেবারে পায়ের গোছ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। তাহার উপর আবার একটা ছোট সাড়ী ভাঁজ করিয়া গায়ের কাপড়ের ভঙ্গিতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বধূটি ডোবার উঁচু পাড়ের একটা পরিচ্ছন্ন রৌদ্রাস্তীর্ণ স্থান দেখাইয়া খুকুকে বলিল,—এই খানে বোস্ সন্তু। ঘাটে নামিস্ না।

সন্তু দুটি হাত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া নাকি সুরে বলিল, —না।

—লক্ষ্মীটি, বোসো। আমি বাসন মেজেই তোমাকে কোলে নোব, কেমন?

সন্ত বড় ভালো মেয়ে। এবারে সে চুপ করিয়া বসিল। বসিল বটে, কিন্তু সে মায়ের অনুরোধে নয়, ঘাটে যে বর্ষিয়সী মহিলা বাসন মাজিতেছিলেন তাঁহারই ভয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একটু পরেই গুন্‌গুন্ স্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বর্ষিয়সী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হরিহর এসেছে না কি বৌমা?

হরিহর কলিকাতায় চাকরী করে। এক শনিবার অন্তর বাড়ী আসে, আবার রবিবার রাত্রের ট্রেণে চলিয়া যায়।

বৌমা সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আসিয়াছে।

—আমাদের সেই ওষুধটা এনেছে নাকি দেখেছ?

বৌমা অত জানে না। বলিল,—তাতো জানি না জ্যেঠি-মা। তবে অনেক জিনিসই তো এনেছে। বোধ হয় আপনারটাও এনেছে।

জ্যেঠিমা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—তোমার মেয়েটি কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বৌমা। আর আমাদের লক্ষ্মীমন্ত···

বৌমা হাসিয়া বলিলেন,—ঠাণ্ডা না ছাই। বোধ হয় আপনাকে দেখে অমনি ক'রে রয়েছে। জ্বর হ'য়ে অবধি কি যে ঘুঁ কি হয়েছে!

জ্যেঠিমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, —এখনো জ্বর রয়েছে নাকি?

—এখন তো জ্বর আসে না। আসে বিকেল বেলায়।

—জ্বরের কথা আর বোলো না বৌমা, কি যে ম্যালোয়ারী লেগেছে, ম'রে গেলাম। আমাদের রাখালদাস ক'দিন বেশ ছিল। কাল সন্ধ্যে বেলায় কোথা থেকে বেড়িয়ে এলো, গা একেবারে আগুণ। আর কী কাঁপুনী। দু'খানা লেপ চাপিয়েও তার কাঁপুনী যায় না। ম্যালোয়ারী বটে, মা!

—বট্‌ঠাকুর কেমন আছেন এখন?

—জ্বরটা একটু নরম পড়েছে বটে, কিন্তু এখনো ছাড়ে নি। ঝিম্ হ'য়ে পড়ে রয়েছে। তোমাদের বাড়ী তো হাসপাতাল।

বৌটি একটু মৃদু হাসিল। বলিল,—পনেরো-ষোলো জন লোক, তার দশ-বারো জন প'ড়ে। সাবু রান্না হয় দুবেলাই।

জ্যেঠিমার বাসন মাজা হইয়া গিয়াছিল। উঠিতে উঠিতে বলিলেন,—আর বলো কেন, মা। যাবো একবার তোমাদের বাড়ীতে। দেখি গে, ওষুধটা এনেছে কিনা।

জ্যেঠিমা যাওয়া মাত্র সন্তর গুঞ্জন উচ্চতর হইয়া উঠিল। বধূটি হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ডোবার ধারেই যে বাড়ী, সেই বাড়ীটি মুখুয্যেদের। হরিহরকে মুখুয্যে-বাড়ীর কুলপ্রদীপ বলা চলে। গত বৎসর সে এম এ পাশ করিয়াছে এবং সৌভাগ্যক্রমে মাস কয়েক পরেই কলিকাতার একটি মার্চেণ্ট অফিসে পঞ্চান্ন টাকার চাকুরী পাইয়াছে। মেসে থাকে, বাড়ী যখন আসে কপিতে-আলুতে-মটরশুঁটিতে, কাপড়-চোপড়ে যে জিনিস লইয়া আসে তাহা তিনটি কুলীর বোঝা। দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়।

বাড়ীতেও একটা সমারোহ পড়ে। বধূটির কাজও বাড়ে, হাসিও বাড়ে।

পোষ্যসংখ্যাও তো কম নয়। কিন্তু এবারে সব জ্বরে পড়িয়া। মেজ ভাইটির সতেরো আঠারো বৎসর বয়স। কিন্তু এমন কাবু হইয়াছে যে আর উঠিতে পর্য্যন্ত পারে না। মেজাজও খিট্‌খিটে হইয়াছে। সাগুর নাম শুনিলে চটিয়া যায়। অথচ ম্যালেরিয়ায় সাগু ছাড়া আর কি-ই বা খাইতে দেওয়া যায়!

হরিহরকে সব ভাই-ই অত্যন্ত ভয় করে।

মা বলিলেন,—ওরে হরি, মুরলীর ঘরে গিয়ে একটু বোস্ গে তো। তোকে দেখে যদি একটু সাবু খায়।

হরিহর ঘরের মধ্যে আসিয়া মুরলীর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিল।

—এখন তো জ্বর নেই, দেখ্‌ছি।

মুরলী ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল,—সকালেই ছেড়ে গেছে। আবার আসবে সেই বিকেল পাঁচটায়।

এমন সময় মা আসিয়া দাঁড়াইলেন সাগুর বাটি হাতে করিয়া।

সকালে মুরলী মায়ের দুটি হাত ধরিয়া সাধিয়াছিল,—আমাকে কই মাছ দিয়ে বাঁধাকপির তরকারী একটু দিও মা, দেবে?

মা বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন,—তুই কী যে মুরলী। আজ সকালে জ্বর ছেড়েছে আর এরই মধ্যে বাঁধাকপির তরকারী? তুই যে মণ্টুরও অধম হলি!

মুরলী মিনতি করিয়া বলিয়াছিল,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, একটুখানি দিও। আমার অসুখ যখন সারবে তখন বাঁধাকপিও উঠে যাবে। দেখবে তখন তোমার মন-অসুখ করবে।

এই কথায় মায়ের মন অনেকটা নরম হইয়াছিল।

তিনি চুপি চুপি বলিয়াছিলেন,—আচ্ছা, সবারই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমি তরকারী একটু নিয়ে আসব। কিন্তু আর কোনোদিন চাইতে পাবে না। বেশ?

মুরলী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিল, আচ্ছা।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার রোগীর শত্রু বোধ হয় পদে পদে।

পিসিমা যে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন, সে কথা ইহাদের কেহ জানিত না। বিধবা পিসিমা, ছেলেপুলে নাই। এই বাড়ীর তিনিই কর্ত্রী। মায়ের অধিক স্নেহ দিয়া বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে তিনি মানুষ করিয়াছেন। তিনিও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে দিন চারেক হইল উঠিয়া দুটি পথ্য করিয়াছেন। মা ও ছেলের কথা তাঁহার কানে যাইতেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—

—তাই দিও। ছেলেটাকে বাঁচতে যে দেবে না সে তো জানি। আর যত কুপথ্য করবে কি এই ধেড়ে ছেলেটাই!

প্রকাশ্যে কিছু বলিবার সাহস মুরলীর ছিল না। সে মনে-মনে বলিল,—ডাইনী!

মুরলীর মা আর কথাটি না কহিয়া তখনই সরিয়া পড়িলেন।

এখন মা ঘরে আসিতেই সে প্রথমটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁর হাতে সাগুর বাটি দেখিয়া মুরলী পাশ ফিরিয়া শুইল। রকম দেখিয়া মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

—খা একটু সাবু।

মুরলী জবাব দিল না।

এবারে হরিহর ডাকিল,—খেয়ে নে নিয়ে শো। সাবু খাবার সময় হ'লেই যত গোলমাল।

মুরলী যেন সাগুর উপরই রাগ করিয়া মায়ের হাত হইতে বাটি লইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে সবটা পান করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

মা মুখ ফিরাইয়া হাসি ঢাকিলেন। হরিহরও পিছন ফিরিল। এতক্ষণে তাহার পাশের বিছানাটির দিকে দৃষ্টি পড়িল।

হরিহর জিজ্ঞাসা করিল,—এটা কোথায় গেল রে? মণ্টুটা?

সাগু খাইলেই মুরলীর বমি আসে। কিন্তু এই প্রশ্নে সে কোনো রকমে বমি চাপিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল,—যাবে আবার কোথায়? রান্না-ঘরেই আছে। সে তো দিন নেই, রাত নেই, রান্না-ঘরেই প'ড়ে আছে। জর কি সারে না সাধে?

হরিহরের খাওয়ার জায়গা করা হইয়াছে। সে এইবার খাইতে আসিবে বুঝিয়া মণ্টু আগে-ভাগেই সরিয়া পড়িয়াছে।

মুরলীর কথা শুনিয়া সে বাহির হইতেই চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল,—রান্নাঘরে আবার কখন গেলাম! আমি তো সেই থেকে এইখানে ব'সে আছি।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—কই, আমি যখন আসি তখন তো তুই ওখানে ছিলি না।

মণ্টুর বয়স আট নয় বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে কখনো ভাবিতে হয় না।

সে আপন বিছানাটিতে শুইতে শুইতে বলিল,—বা রে! তখন তো আমি পায়খানায়।

মুরলী গোঁ গোঁ করিয়া বলিল,—হুঁঃ! পায়খানায়!

অকস্মাৎ মণ্টু চীৎকার করিয়া উঠিল,—আমার ডিম! আমার কমলা লেবু?

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল,—ডিম কি রে?

সে কথা কানে না তুলিয়াই মণ্টু চীৎকার করিতে লাগিল,—আর একটা ডিম, আর কমলা লেবু? এই বালিশের নীচে রেখেছিলাম যে! নিশ্চয় তুমি নিয়েছ মেজদা। দিয়ে দাও বলছি।

মুরলী ভেংচাইয়া বলিল,—আহা, স্বপ্ন দেখছেন!

মণ্টু কিন্তু এত সহজে ভুলিবার ছেলে নয়। গর্জ্জন করিয়া বলিল,—ইয়ার্কি কোরো না মেজদা। নিশ্চয় তোমার কাজ। লুভিষ্টি কোথাকার!

হরিহর আবার জিজ্ঞাসা করিল,—ডিম কি রে?

মণ্টু বালিশটা তুলিয়া বলিল,—এইখানে রেখেছিলাম যে। মোট ছ'টা ছিল তো? কই ছ'টা? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটা। আর একটা গেল কোথায়?

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, আর চিলের মতো চ্যাঁচাতে হবে না। আমি দোবো তোকে আর একটা, তা হ'লেই তো হবে।

মাকে চটাইবার সাহস কোনো রোগীরই ছিল না। আর মুরলীর কাছ হইতে হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করাও মণ্টুর সাধ্যাতীত।

সে শুইতে-শুইতে বিড়বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিল,—তুমি তো সবই দেবে?

মণ্টুর ডিম্ব-সংগ্রহের একটা ইতিহাস আছে। গত তিনমাস ধরিয়া সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। একদিন ভালো থাকে তো দু'দিন জ্বরে ভোগে। তাই ভালো-মন্দ জিনিস তাহার খাওয়া হয় না। হংস-ডিম্বের উপর মণ্টুর বিশেষ প্রীতি আছে। যেদিনই বাড়ীতে ডিম-রান্নার আয়োজন হয় সে দিনই সে খাওয়ার বায়না ধরে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার অংশের একটি করিয়া কাঁচা ডিম তাহাকে দেওয়া হয়। সে ভালো হইয়া উঠিলে খাইবে।

এই ডিমের একটি মুরলী চুরি করিয়াছিল,—খাওয়ার জন্য নয় নিশ্চয়ই, মণ্টুকে রাগাইবার জন্যই।

হরিহরের খাওয়ার ডাক আসিয়াছিল। সে চলিয়া যাইতেই মুরলী করুণ কণ্ঠে ডাকিল,—মা!

কিরে?

মুরলী কথা বলিল না। শুধু করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তরকারী? এখুনি ঠাকুরঝি জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না। ক্ষিধে যদি পায়, বরং আর একটু সাবু এনে দোব।

মুরলী রাগিয়া বলিল,—আর সাবু আনতে হবে না। এই সাবু খাওয়াই যেন শেষ সাবু খাওয়া হয়।

মা চটিয়া বলিলেন,—কি বললি?

মুরলী উত্তর দিল না, পাশ ফিরিয়া শুইল। জ্বরে ভুগিয়া-ভুগিয়া মুরলী দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাহার আর কোনো সংশয় নাই। জ্বরে কুপথ্য যে খুব খারাপ সে কথা বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছে। তবু মানে না।

বাহিরে তখন হরিহরের সঙ্গে পিসিমার কথা হইতেছিল। হরিহর কি বলিতেছিল শোনা গেল না। কিন্তু পিসিমার ঝাঁঝালো কণ্ঠ কাঁসরের মতো ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল,—

—জ্বর তো কোন্ দিন সেরে যেত। সারছে না শুধু তোর মায়ের জন্যে। যখন যে যা বায়না ধরবে তাই ওর দেওয়া চাই। কুপথ্যি দিতে ওর একটু ভয় করে না তাই ভাবি। আর তাও বলি, মণ্টুটা না হয় ছেলেমানুষ, ঝোঁক একটু হয়। কিন্তু তুই একটা ধেড়ে মিন্‌সে, তুই যা তা খেতে চাস কি ব'লে?

মণ্টু কথা শুনিয়া লেপের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসি শুনিয়া মুরলীর রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

সে চাপা কণ্ঠে মণ্টুকে ধমক দিল,—এই দেখ্ মণ্টু, এক চড়ে দাঁত ভেঙ্গে দোব।

হরিহর খাওয়া শেষ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। নীচে শুইয়া-শুইয়াই মুরলী তাহার পায়ের শব্দ শুনিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল হরিহর এতক্ষণ নিশ্চয়ই দিবানিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে।

আস্তে আস্তে ডাকিল,—মণ্টু!

—কি?

—ডিম নিবি না?

মণ্টু উঠিয়া বসিল। বলিল,—দাও।

মুরলী বালিশের নীচে হইতে একটা ডিম বাহির করিয়া দিল।

মণ্টু বলিল,—আর কমলা লেবু?

—সেটা খেয়ে ফেলেছি।

মণ্টু রাগিয়া বলিল,—তুমি যে একটা রাক্ষস।

মুরলী রাগ করিল না, বরং একটু প্রসন্ন মনেই হাসিল। বলিল,—রান্নাঘর থেকে খুব খেয়ে এলি তো?

মণ্টু জবাব দিল না।

মুরলী আবার বলিল,—বড়দা কি কি এনেছে রে?

—কমলা লেবু।

—আর?

—কপি, মটরশুঁটি।

—আর কিছু আনে নি?

মণ্টু মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

মুরলী বলিল,—বল না।

—কাঁকড়া এনেছে এক হাঁড়ি। চমৎকার!

কাঁকড়ার নামে মুরলীর জিহ্বা লালাসিক্ত হইয়া উঠিল। সে ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুই খেয়ে এলি তো?

মণ্টু আবার মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিল।

মুরলী বলিল,—স্বার্থপর কোথাকার! একটা খবরও যদি দেয়!

মুরলী আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিল না। সে কেবল উঠিতে যাইবে এমন সময় মা নিজেই আসিয়া তরকারীর বাটী সুমুখে ধরিলেন।

—কাঁকড়া আছে?

—আছে। সে খবরও পেয়েছ?

একটু একটু করিয়া মুরলী তরকারীটুকু পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতে বসিল। কিন্তু তাহার কি নিশ্চিন্ত মনে আহার করিবার যো আছে? আহার শেষ হইতে না হইতে হরিহর একেবারে ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

—ওকি হচ্ছে রে?

তখন আর বাটি লুকাইয়া ফেলিবারও সময় ছিল না। মুরলী বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া শুধু একটু অপ্রতিভের মতো হাসিল। মা বাটিটা আবার তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বিরক্তভাবে বলিল,—থাক্ বাপু থাক্। তুই আর বাধা দিস্‌নে।

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল, তুমি বলো কি! কাল ওর একশো পাঁচ জ্বর আর আজ ওকে ওই সব দিচ্ছ? কাঁকড়া ও হজম করতে পারবে?

—খুব পারবে। ও কি বেশী খাচ্ছে নাকি?

হরিহর বিরক্ত ভাবে বলিল,—যা মন চায় তাই করো।

—তাই করব। তুই সব্ দেখি! বেচারাকে মুখের খাবার খেতে দিচ্ছিস্ না।

কিন্তু মুরলী আর বাটি স্পর্শও করিল না। মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

গোলযোগ দেখিয়া পিসিমাও দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তখনও আহার হয় নাই।

তিনি বলিলেন,—জ্বরের মুখে ওই সব যে ওকে খাওয়াচ্ছ বৌ, ওকে কি বাঁচতে দেবে না?

মায়ের মেজাজ চটিয়াই ছিল। বলিলেন,—খুব বাঁচবে। একটুখানি তরকারী খেলে আর মানুষ মরে না।

পিসিমা শান্তভাবে বলিলেন,—সে সহজ মানুষ মরে না। কিন্তু ওর গায়ে এখনও জ্বর আছে। ওর কাছে ও যে বিষ! রোগীর কাছে মা হ'লে চলে না, শত্রু হ'তে হয়।

হাতের বাটি ছুঁড়িয়া বাহিরের নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া মা বলিলেন,—তবে এই নাও। হ'ল তো!

রাগে তাঁহার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। তিনি হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মণ্টু এতক্ষণ বেশ মজা দেখিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারও মন মেজ দাদার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার তখন জ্বর আসিতেছে, একটু কাঁপুনিও দেখা দিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল,—আর তুমি যে দিব্যি কদ্‌বেল বসাচ্ছ!

হরিহর বিস্মিত ভাবে বলিল,—কে রে?

—ওই পিসিমা।

পিসিমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন,—কে রে? আমি? শোনো ছেলের কথা!

মণ্টু বলিল,—তোমার ঘরে দেখলাম যে! মাখা রয়েছে একটা পাথর-বাটিতে।

পিসিমা বলিলেন,—কখন দেখ্‌লি রে হতভাগা?

হরিহর বলিল,—বুঝতে পেরেছি। চল তোমার ঘর দেখি গে!

হরিহরকে বেশী খুঁজিতে হইল না। একটা কোণে একটা শ্বেত-পাথরের বাটিতে কদ্‌বেল সত্যই মাখা, অতি সহজেই পাওয়া গেল।

বাটিটা হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হরিহর বলিল,— এটা কি?

পিসিমা ধরা পড়িয়া চটিয়া গেলেন। বলিলেন,—বেশ করব, খাবো। বিধবা মানুষ, টক খাবো না, কিছু খাবো না, তো খাবো কি দিয়ে?

—আমার মাথা দিয়ে খাবে। আজ সকালের ওষুধ খেয়েছ ?

পিসিমা ন' বছরের দুরন্ত জেদী মেয়ের মতো ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন,—না বাপু, ওই তেতো ওষুধ আমি খেতে পারবো না।

হরিহর রাগিয়া বলিল, তবে টক খাও, খেয়ে মর।

এবারে পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—ওরে, আমি মরবো না রে, মরবো না। বিধবা হওয়ার পরেও যখন ত্রিশ বছর বেঁচে আছি তখন টক খেলেও মরবো না, ওষুধ না খেলেও মরবো না।

এ বড় মন্দ যুক্তি নয়! যে মানুষ বিধবা হওয়ার পরেও ত্রিশ বৎসর কাল বাঁচিয়া রহিল, সে নিশ্চয় অমর। নহিলে বৈধব্যশোকে বহুকাল পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত। তা যখন হয় নাই তখন তাহার পক্ষে যে-কোনোরূপ কুপথ্য-ভোজন অনায়াসেই চলিতে পারে।

কিন্তু হরিহর শুধু বিস্মিত হইয়া ভাবিল, ছেলেদের এতটুকু অনিয়মে যিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন, জীবনের প্রান্তে আসিয়া তিনি নিজে এমন অনিয়ম করেন কি বলিয়া? ত্রিশ বৎসর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সকল প্রকার সুখ-বিলাস যিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন, তিনি যে আজ সামান্য কদ্‌বেলের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কী হইতে পারে?

বুদ্ধকথা

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

উপক্রমণিকা

শুধু ভারতের নয়, বুদ্ধদেব সমগ্র এসিয়ার শ্রেষ্ঠমানব মনীষীরা এই কথা বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত এচ্‌ জি ওয়েল্‌স্‌ পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে বুদ্ধ ও খ্রীষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে বাস্তবিকই মনে হয় চরিত্রে, জ্ঞানে, ত্যাগে ও লোকহিত-কর্ম্মে বুদ্ধদেব বহু ধর্ম্ম-প্রচারকের উপরে ছিলেন এবং কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। কাশী-কোশল, অঙ্গ-মগধ এই ছোট ছোট রাজ্যে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বুদ্ধদেবের "ধর্ম্ম" স্বকীয় অন্তর্নিহিত মহিমাবলে ও রাজশক্তির সহায়তায় সমগ্র ভারতের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অপূর্ব্ব প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল, তারপর তথাগত-প্রবর্ত্তিত নূতন মন্ত্রের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সম্রাট ও ভিক্ষুর মিলিত শক্তিতে এই "ধর্ম্ম" ভারতের সমুদ্র-পর্ব্বতের দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দূর দূরদেশে, উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ছড়াইয়া পড়িল। সভ্য ও অসভ্য নব নব জাতি স্ব স্ব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নিজেদের "শাক্যমুনির পুত্র" বলিয়া পরিচয় দিল। ইহাই ভারতের বিশ্বজয়। প্রাচীন ভারতে আর্য্যরা দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় জাতিকে নিজেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন, বাহুবলে নয় সভ্যতার বলে, যাহাকে ইংরেজিতে বলে "কাল্‌চারাল কংকোয়েষ্ট"। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজারা পরস্পরের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, পরস্পরকে জয়ও করিয়াছেন কিন্তু বিজেতা-বিজিতের এই সম্বন্ধ স্থায়ী হয় নাই—বিজেতা উত্তর বা দক্ষিণে ফিরিতে আরম্ভ করিলেই বিজিতজাতি সশস্ত্রে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। ইতিহাসের মর্ম্মদর্শী রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বৌদ্ধভারতের এই বিশ্বজয় হইয়াছিল বাহুবলে নয় মৈত্রীবলে, ধন-লুণ্ঠন-আহরণের দ্বারা নয় প্রাণের শ্রেষ্ঠসম্পদ ধর্ম্মবিতরণের দ্বারা। এই প্রেমের জয়ের ফলে চীন-জাপান-তিব্বত-শ্যাম-ব্রহ্ম-সিংহল প্রভৃতি দেশে বুদ্ধ-পদলাঞ্ছিত মগধ-কোশল-কাশী পরমতীর্থরূপে পূজিত হইতেছে।

আমাদের দেশের এই এতবড় মহাপুরুষ যে বুদ্ধ, তাঁহাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভারতবিদ্যাবিদ ফরাসি পণ্ডিত সিলভেঁ লেভি অনুযোগ করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক বোধের

অভাবে আমরা বাস্তব হারাইয়া আজগুবির আশ্রয় লইয়া আমাদের দেশের বড় বড় কীর্ত্তিমান পুরুষদের স্মৃতির অবমাননা করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের মত দার্শনিক মহাপণ্ডিতকে ভোজবাজিপ্রদর্শক তার্কিকমাত্রে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছি; যে কালিদাস মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাবনিচয়কে ভাষাসৌষ্ঠবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার মত অপূর্ব্বরূপরসস্রষ্টা সুকুমার কবিকে তরলচিত্ত বিদূষকে পর্য্যবসিত করিয়াছি; এবং দেশের শ্রেষ্ঠসন্তান বুদ্ধকে একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছি। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও ইন্দো-চীন যখন তথাগতের জন্মভূমির অভিমুখে ফিরিয়া তাঁহার জীবনকথা ভক্তিভরে আবৃত্তি করিত তখন যে দেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই ভারত বুদ্ধের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। নেপাল উপত্যকার অন্তরালে মহাযানের গ্রন্থগুলি বৃথা রক্ষিত হইয়াছিল; বিদ্রোহ, বিদেশীর আক্রমণ, পরাজয় উপেক্ষা করিয়া সিংহল দেশ ভারতে সংস্কৃতের অনুজা ভাষা পালিতে রচিত ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বৃথাই বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিয়াছিল—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা ধিক্কার দিয়াছিলেন সেই বুদ্ধের নাম বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল, কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার বা জানিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। অধ্যাপক লেভি সত্যই বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বুদ্ধকে আমাদের কাছে ফিরাইয়া দিয়াছেন; বহু পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার ও অর্থভেদ করিয়া ইঁহারা ভারতের লুপ্ত গৌরবকাহিনীর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বহু পণ্ডিতদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের বা শাস্ত্রের কোন জিনিষই পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না, সকল দেশের শাস্ত্রেই মহাপুরুষরা ভক্তদের কাছে কালক্রমে লোকোত্তর পদ ও ভগবান আখ্যা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের শিক্ষারও কোনদিক উপেক্ষিত হয়, কোনদিক বা শিষ্যপরম্পরার দ্বারা বহু পল্লবিত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করে। কিন্তু বুদ্ধ ত' মানুষই ছিলেন—তাঁহার মাতাপিতা ছিল, তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র হইয়াছিল; তপস্যায় তাঁহার অনেক ক্লেশ হইয়াছিল; অনেক লোক তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মত দেখিত, অনেকে অপমান করিয়াছিল, স্ত্রীলোকের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন; একদিন তিনি একমুষ্টিও ভিক্ষা না পাইয়া অনাহারে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার রোগ হইয়াছিল, তিনি চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, ঔষধ খাইয়াছিলেন; তিনি শিষ্যদের তর্জ্জন করিতেন, শিষ্যসংগ্রহের জন্য কৌশল অবলম্বন করিতেন; আহার নিদ্রা ছাড়েন নাই, বার্দ্ধক্যে তাঁহার শরীর বিকল হইয়াছিল ও তিনি বলিয়াছিলেন জীর্ণ শকটের মত অতি কষ্টে তাঁহাকে চলাফেরা করিতে হয়; তাঁহার মৃত্যু হইল ও অন্তরঙ্গ সেবক আনন্দ তাঁহার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মৃত্যুর কিছু পরে দেহাবশেষগর্ভ উৎকীর্ণ লিপি পাত্ররক্ষিত হইয়াছিল এবং এখন সেই লিপিযুক্ত পাত্র পাওয়া গিয়াছে—এসব বিবেচনা করিলে তাঁহাকে মানুষ ছাড়া আর কি বলা যায়? অন্যান্য শাস্ত্রের মত বৌদ্ধশাস্ত্রও বহু অতিপ্রাকৃত বিষয়ে পূর্ণ, এগুলি যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া বুদ্ধকে মানুষভাবেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে তাঁহার যুগ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সে সময়ে সাধারণ লোক খুবই ভোগাসক্ত ছিল, যেমন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে হইয়া থাকে। অতীতকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করা মানুষের একটা প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা, অতীতের গুণ গাহিয়া মানুষ বর্ত্তমানের দোষ অপনোদন করিয়া মনে শান্তি পায়। সকলেই মনে করে এখন ঘোর কলিকাল, পূর্ব্বে দ্বাপর ত্রেতায় অবস্থা ভাল ছিল, এবং তাহারও আগে সত্যযুগে মন্দ কিছুই ছিল না; অথচ কলি যে কখন না ছিল তাহা জানি না। আমরা এখন কলি বলি, মনুসংহিতার সময়েও কলি চলিতেছে দেখিতে পাই, গৌতম-বশিষ্ঠ-আশ্বলায়ন প্রভৃতির ধর্ম্মসূত্রের যুগেও তাহাই দেখি, বুদ্ধও নিজের যুগকে কলি মনে করিতেন। সংসার সদাই পাপপুণ্যময়। সেই যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জরা উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির মধ্যে একটা নূতন সত্যের সন্ধানের জন্য প্রবল প্রয়াস হইতেছিল। সমাজ বহু দল বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কাম্যের সাধনা করিতেছিল। মহাবীর তাঁহার সমসাময়িকদের মোটামুটি ক্রিয়াবাদী, অক্রিয়াবাদী, অজ্ঞানবাদী ও বিনয়বাদী এই চার দলে ভাগ করিয়াছিলেন। ক্রিয়াবাদীরা একটা মৌলিক কার্য্যকরী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন,

কেহ বলিতেন ইহা কাল, কেহ ঈশ্বর, কেহ আত্মা, নিয়তি বা স্বভাব ইত্যাদি; অক্রিয়াবাদীরা বলিতেন মৌলিক কোন শক্তির অস্তিত্ব নাই, সবই যদৃচ্ছা হয়; অজ্ঞানবাদীরা বলিতেন জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, জ্ঞানেই মতভেদ, কলহ ও পাপ হয়, অজ্ঞানই মুক্তির পথ; বিনয়বাদীরা বলিতেন মাতাপিতা গুরু প্রভৃতিকে ভক্তি করিলেই মুক্তি লাভ হয়। বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িকদের মোটামুটি আট দলে ভাগ করিয়াছিলেন; আত্মা অনন্ত কি সান্ত, জগৎ অনন্ত কি সান্ত, জগৎ সসীম কি অসীম, আত্মা কারণসম্ভূত কি অকারণসম্ভূত, জগৎ কারণ-সম্ভূত কি অকারণসম্ভূত, মৃত্যুর পর আত্মার জ্ঞান থাকে কি থাকে না, বিনাশ হয় কি হয় না, আত্মার স্বরূপতঃ শরীর, না মন, না আকাশ, না জ্ঞান, এই সব লইয়া বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইত, কেহ স্পষ্ট উত্তর দিতেন, কেহ দিতেন না, কেহ বা আবার বলিতেন, ইহ সংসারের ইন্দ্রিয়সুখ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিলেই মুক্তিলাভ হয়। আজীবিক নামক আর একটা দল ছিল, গোশাল মঙ্খলিপুত্র ইহার নেতা ছিলেন, তিনি বলিতেন বল, বীর্য্য, পুরুষকার প্রভৃতি বলিয়া কিছু নাই, সবই পূর্ব্ব-নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এ ছাড়া অগ্নি-উপাসক, জলবাসী ও অন্যান্য অদ্ভুত ক্রিয়াশীল অনেক সম্প্রদায় ছিল; ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্রতন্ত্র ত' ছিলই। সেই যুগের ধর্ম্ম-আন্দোলনের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ভারতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে—উভয় আন্দোলনেই দেখিতে পাই বহু লোক বহু দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একটা সাধারণ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রবল প্রয়াস করিতেছে এবং চিন্তাশীল সমাজে তাহা লইয়া উত্তেজনা ও আলোচনা এবং কিছু কিছু কর্ম্মও চলিতেছে। তাছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, বিরুদ্ধতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও খুব ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান দুই শাখা, হীনযান ও মহাযান। হীনযান বা স্থবিরবাদের (থেরবাদ) শাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা পালিভাষায় লিখিত। তিনটি পিটকে (ঝুড়িতে) অর্থাৎ তিন অংশে বিভক্ত হইয়া এই শাস্ত্র যুগপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিপিটক, ইহা (ক) সুত্ত পিটক, (খ) বিনয় পিটক ও (গ) অভিধর্ম্ম পিটক, এই তিন অংশে বিভক্ত।

বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ

(ক) সুত্ত পিটক

ইহাতে বুদ্ধের বহুলোকের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কথোপকথনের বর্ণনা আছে। ইহা পাঁচটি "নিকায়" বা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

(১) দীঘ-নিকায়। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রসঙ্গের আলোচনা আছে; ইহা তিনটি "বগ্‌গে" বিভক্ত, প্রতি বগ্‌গে দশ হইতে তেরটি "সুত্ত" আছে। পালি "সুত্ত" ও সংস্কৃত "সূত্র" এক জিনিস নয়, আমরা এখন সংস্কৃতে সূত্র বলিতে চার পাঁচটি বা দশ বারটি শব্দের সমষ্টি বুঝি কিন্তু এই পালি সুত্ত গুলির প্রত্যেকটি প্রায় দশ কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী এক একটি আলোচনা।

(২) মজ্‌ঝিম-নিকায়। ইহাতেও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা আছে। ইহাতে পনেরটি বগ্‌গ আছে, প্রতি বগ্‌গে দশ হইতে বারটি সুত্ত আছে।

(৩) সংযুত্ত-নিকায়। ইহাতে পরস্পরসম্বদ্ধ সুত্তগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটি বগ্‌গ ও প্রতি বগ্‌গে দশ হইতে তেরটি "সংযুত্ত" আছে।

(৪) অঙ্গুত্তর-নিকায়। ইহাতে সুত্তগুলির সংখ্যানু-ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ইহা এগারটি "নিপাতে" বিভক্ত, প্রতি নিপাতে কয়েকটি বগ্‌গ ও প্রতি বগ্‌গে দশ বা ততোধিক সুত্ত আছে।

(৫) খুদ্দক-নিকায়। ইহা পনেরটি গ্রন্থে বিভক্ত; "ধম্মপদ", "সুত্তনিপাত", "থেরগাথা","থেরীগাথা" ও "জাতক" এই বিখ্যাত গ্রন্থগুলি এই পনেরটির মধ্যে পাঁচটি। "সুত্ত-নিপাত"কে পণ্ডিতেরা সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে প্রাচীনতম অংশ বলিয়াছেন।

(খ) বিনয়-পিটক

"বিনয়" শব্দের অর্থ নিয়ম, ইহাতে সঙ্ঘসংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলীর বিবরণ ও ইতিহাস আছে। ইহা "সুত্তবিভঙ্গ", "মহাবগ্‌গ", "চুল্লবগ্‌গ" ও "পরিবার" এই চার অংশে বিভক্ত।

(গ) অভিধম্ম-পিটক

ইহাতে সুত্তপিটকের বিষয়গুলির সম্বন্ধে দীর্ঘতর আলোচনা ও শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহাতে দার্শনিক বিচার

ও তর্কে "ধর্ম্মে"র প্রসার ও বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নাম। ইহা সাতখানি গ্রন্থে বিভক্ত।

সুত্তপিটকের পাঁচখানি, বিনয়পিটকের চারখানি ও অভিধম্মপিটকের সাতখানি, মোট এই ষোলখানি গ্রন্থের প্রত্যেকটির বিস্তৃত টীকাও আছে। এই সব মিলিয়া ত্রিপিটক বিপুলায়তন শাস্ত্র হইয়াছে।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর হইতেই শিষ্যেরা তাঁহার বাণী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। মহানির্ব্বাণের পরই এজন্য একটি ক্ষুদ্র সভা আহূত হইয়াছিল। তাহার পর বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে রাজা কালাশোকের সময় দ্বিতীয় সভায় শাস্ত্র সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। সম্রাট অশোক মৌর্য্যের সময় তৃতীয় সভা আহূত হইয়া শাস্ত্র সংস্কার করা হয়। এই রূপে কালক্রমে শাস্ত্র গড়িতে ও বাড়িতে থাকে; সম্রাট কণিষ্কের সময় চতুর্থ সভায় হীনযান ও মহাযান দুইদলে সঙ্ঘ পাকাপাকি ভাগ হইয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা", "সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক", "লঙ্কাবতার" প্রভৃতি গ্রন্থ মহাযান দলের প্রামাণ্য শাস্ত্র; "ললিতবিস্তর", অশ্বঘোষ প্রণীত "বুদ্ধচরিত", "জাতক নিদান কথা","জিন চরিত" প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; সিংহলের "মহাবংস" ও "দীপবংস" নামক গ্রন্থদ্বয়ে সঙ্ঘের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যের অনেক মহাযান গ্রন্থ তিব্বতী ও চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল; এ গুলির সংস্কৃত মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া গেলেও তিব্বতী ও চীনা অনুবাদগুলি এখনও পাওয়া যায়।

অনুমান ৫৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন গৌতম-গোত্রের ও শাক্য-বংশের লোক ছিলেন ও নেপালের নিকটবর্ত্তী কপিল বাস্তু (কপিল বত্থু) নামক স্থানে বাস করিতেন। শাক্যরা আর্য্য জাতি ছিলেন কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে; খুব সম্ভব তাঁহারা পার্ব্বত্য মঙ্গোলিয় জাতির লোক ছিলেন—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের অনেক অনার্য্য জাতির লোক যেমন শূদ্র নামে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান পাইয়াছিল সেইরূপ অনেক অভারতীয় অনার্য্য জাতির লোকও

সিদ্ধার্থের মহানিষ্ক্রমণ

ভারতে বসবাস করিয়া স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে যোদ্ধারা ক্ষত্রিয় নামে—যেমন রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি জাতি—ও বণিকেরা বৈশ্য নামে ব্রাহ্মণ্য সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। সেই কালের প্রচলিত প্রথানুসারে কুল-পুরোহিত ব্রাহ্মণ যে গোত্রের হইতেন ইহাদেরও সেই গোত্র হইত।

সে যুগে ভারতে কোনও বড় রাজ্য ছিল না, সমস্ত দেশ বহুসংখ্যক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এই ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে কোশল(কোসল)ই বোধ হয় সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল ও মগধ বড় হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সব রাজ্যের শাসনতন্ত্র একরকমের ছিল না, কোথাও একজন রাজা দেশ শাসন করিতেন, কোথাও—যেমন লিচ্ছবি, মল্ল, শাক্য প্রভৃতি বংশের—ক্ষত্রিয়েরা সকলে মিলিয়া রাজ্য চালাইতেন। রাজ্য-চালনাসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য তাঁহাদের সভাগৃহ ছিল—এই গৃহকে সংস্থাগার (সন্থাগার) বলা হইত। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধ লেখকেরা কপিলবাস্তুকে বিশাল রাজ্য ও শুদ্ধোদনকে মহাপ্রতাপশালী বহু ঐশ্বর্য্যবান রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ কথা ঠিক নয়। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে কোনও লোকের কথা উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উপাধি-পদবী প্রভৃতি খুব সঠিক ভাবে দেওয়া হইত, সে ব্যক্তি অন্যলোককে কি বলিয়া সম্বোধন করিত, অন্যেরাই বা তাহাকে কি বলিয়া ডাকিত এ সবও যথাযথ লেখা হইত। প্রাচীন পালিশাস্ত্রে শুদ্ধোদনকে কোথাও রাজা বলা হয় নাই, মাত্র "শাক্য শুদ্ধোদন" (সক্য সুদ্ধোদন), নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আসলে শুদ্ধোদন একজন অবস্থাপন্ন জমিদার এবং সেজন্য এক রকম ছোটখাট রাজা ছিলেন। তাঁহার অনেক জমিজমা চাষবাস ছিল। তাঁহার জমিতে ভাল ধান জন্মিত ও পণ্ডিতদের কেহ কেহ বলেন যে এই জন্য তাঁহার নাম "শুদ্ধ-ওদন" হইয়াছিল। অনেক পালি বর্ণনা ও গল্পে কপিলবাস্তুর ধান্যসমৃদ্ধি ও শাক্যদের ধান্যক্ষেত্রের কথা পাওয়া যায়। শাক্যরা কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও নামে কোশলের অধীন ছিলেন কারণ একটী প্রাচীন পালি সুত্তে বুদ্ধদেব নিজেকে "কোশলের লোক" বলিয়াছেন; কোশলের রাজাও একবার বুদ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, ভগবান(অর্থাৎ বুদ্ধদেব)ও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, ভগবানও কোশলের লোক আমিও কোশলের লোক।"

বুদ্ধদেবের মাতার নাম ছিল মায়াদেবী। তিনি অনুপমা সুন্দরী ছিলেন; বর্ণিত আছে যে তাঁহার অতুল রূপলাবণ্যের জন্য তাঁহাকে অপার্থিব মায়াময়ী সৃষ্টি বলিয়া মনে হইত ও সেইজন্য তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীর মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধে বৌদ্ধ লেখকরা অনেক নাম ধাম ও অন্যান্য বংশ-পরিচয়াদি দিয়াছেন। এই সব সংবাদ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী, কোথাও বা সামঞ্জস্যহীন, বহুস্থলেই হয়ত বিভিন্ন লেখকের নিজের কল্পনাপ্রসূত এবং এসবে আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

বর্ণিত আছে বুদ্ধের জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে একটি শ্বেতহস্তী তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিল। শুদ্ধোদনকে এ কথা জানাইলে তিনি জ্যোতিষীদের ডাকাইলেন এবং জ্যোতিষীরা স্বপ্নব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে মায়াদেবীর গর্ভে মহাপুরুষ জন্মিবেন, তিনি সংসারে থাকিলে বড় রাজা হইবেন ও সংসার ত্যাগ করিলে বড় সাধু হইবেন। জৈনশাস্ত্রে দেখিতে পাই, যে পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে এমন ক্ষত্রিয়কুমারের কথা বলিতে হইলেই শাস্ত্রকারেরা তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাহার মাতার হস্তী, সিংহ, পদ্ম প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিবার কথা, পিতাকে জানাইবার কথা, জ্যোতিষীদের ডাকাইলে তাঁহাদের স্বপ্নব্যাখ্যা করিয়া ভাবী শিশুর মহাপুরুষত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করিবার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইকালে বোধ হয় এ সবের খুব প্রচলন ছিল। মায়াদেবী পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন বা বেড়াইতে গিয়াছিলেন এমন সময়ে লুম্বিনী নামক বনে বা উদ্যানে বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইলেন। পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে এই ঘটনাগুলির বহু অতিরঞ্জিত কবিত্বময় বর্ণনা আছে— ইন্দ্রাদি দেবতারা বোধিসত্ত্বকে জন্মগ্রহণের জন্য স্তব করিলেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল, মর্ত্তে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেবতারা মহাসমারোহে নবজাত শিশুকে মহার্ঘ বস্ত্রে স্বহস্তে মাতৃগর্ভ হইতে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পূজা-বন্দনা করিলেন ইত্যাদি। আমরা ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কবি-কল্পনার আলোচনায় আমাদের লাভ নাই। কাব্যামোদী মূলসাহিত্যে এই বর্ণনাগুলির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন। এই সব অলৌকিক গল্পই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া যীশুখৃষ্টের জন্মকালের ঘটনা বলিয়া খৃষ্টীয় শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন

পুত্রসন্তানের জন্মে মাতাপিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নবজাত শিশুর "সিদ্ধার্থ" নাম রাখা হইল। শিশুর ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য আবার জ্যোতিষীদের ডাকা হইল, তাঁহারা শিশুর দেহে অনেক শুভলক্ষণ দেখিলেন ও তাহার মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া তাহার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের গুরু সম্ভাবনা জানাইলেন—এরূপ বর্ণিত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব নহে; আবার এমনও হইতে পারে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা জানা ছিল বলিয়া বর্ণনাকারেরা পূর্ব্বের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ইহার উল্লেখ করিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, সিদ্ধার্থের জন্মের কিছু দিন পরে —শাস্ত্রে আছে সাত দিন পরে—মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। মায়াদেবীর ভগ্নী শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী শিশুকে পালনের ভার লইলেন। ইঁহার নাম কি ছিল জানা যায় না, শাস্ত্রে ইঁহাকে "মহাপ্রজাবতী গৌতমী" (মহাপজাপতী গৌতমী) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কারণ ইনি বুদ্ধের মত প্রজা অর্থাৎ পুত্রকে পালন করিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনের কথা সঠিক বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। লেখকেরা যেসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সিদ্ধার্থ মেধাবী বালক ছিলেন। কুল-পুরোহিত ব্রাহ্মণের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন ও বিদ্যালাভে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের কিন্তু বালসুলভ চপলতা ছিল না, সমবয়সীদের খেলাধূলায় তিনি বিশেষ মাতিতেন না। তাঁহার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য ও ভাবুকতা দেখা যাইত। তিনি কখন কখন নির্জ্জনে বসিয়া যেন অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেন। শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদত্ত সিদ্ধার্থের সমবয়সী ছিলেন। দেবদত্ত একবার তীরবিদ্ধ করিয়া একটি হাঁসকে ভূপাতিত করিয়াছিলেন, সিদ্ধার্থ এই আহত পক্ষীর শুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। হাঁসটি কাহার এ কথা লইয়া পরে উভয়ের বিবাদ হয়, দেবদত্ত বলিলেন, "আমি তীর মারিয়া মাটিতে ফেলিয়াছি, ইহা আমার", সিদ্ধার্থ বলিলেন "আমি ইহাকে সেবা করিয়া বাঁচাইয়াছি, ইহা আমার।" পুরোহিতের কাছে উভয়ে বিবাদনিষ্পত্তির জন্য গেলে পুরোহিত হাঁস সিদ্ধার্থেরই

প্রাপ্য বলিলেন। এই ঘটনাটি ভাবী বুদ্ধের বাল্যকালের মনোবৃত্তির অতি সুন্দর নিদর্শন। সিদ্ধার্থ একবার সঙ্গীদের সঙ্গে নগরের বাহিরে গ্রামে গিয়াছিলেন; সঙ্গীরা খেলাধূলায় লাগিয়া গেল কিন্তু সিদ্ধার্থ কাহাকেও না বলিয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সঙ্গীরা ফিরিয়া আসিলে সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন না। শুদ্ধোদন খুঁজিতে বাহির হইলে সিদ্ধার্থকে নির্জ্জন বনে একটি গাছের তলায় চিন্তামগ্ন হইয়া উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর একবার সিদ্ধার্থ পিতার সঙ্গে জমিজমা চাষবাস দেখিতে গিয়াছিলেন; শুদ্ধোদন যখন কৃষিকার্য্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন সিদ্ধার্থ একটি জামগাছের নীচে বসিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; পরজীবনে বুদ্ধ এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বড়লোকের ছেলে বলিয়াই হউক, অথবা বৌদ্ধলেখকরা যেমন বলিয়াছেন, জ্যোতিষীদের সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে শুদ্ধোদনের নিজের ইচ্ছায়ই হউক, সিদ্ধার্থ বিলাসে পালিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে তিনটি বাড়ী বানাইয়া দিয়াছিলেন, একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য ও একটি শীতকালের জন্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই উদ্যান ও পদ্ম-পুষ্করিণী ছিল। সিদ্ধার্থ সর্ব্বদাই নৃত্য-গীতবাদ্যরতা সুন্দরী ললনাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন, বর্ষাকালে দোতলা হইতে নামিতেনই না—এসব কথা বুদ্ধ নিজে বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি অক্ষম বা দুর্ব্বল ছিলেন তাহা নয়। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে একবার কথা উঠে যে সিদ্ধার্থ অন্তঃপুরে কামিনীকুলসংসর্গে কাল কাটাইয়া পুরুষোচিত শিক্ষা পান নাই। ইহার উত্তরে সিদ্ধার্থ শাক্যদের সম্মুখে নিজের ক্ষত্রিয়কুমারোচিত শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার চড়িবার জন্য একটি শ্বেতহস্তী আনা হইতেছিল, কিন্তু পরশ্রীকাতর দেবদত্ত ইহা সহিতে না পারিয়া হাতিটিকে বধ করিয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সের সময় সিদ্ধার্থের বিবাহ হইল। সেই যুগে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়দের এত অল্প বয়সে বিবাহ হইত না। সিদ্ধার্থের অসাংসারিক ভাবগতি দেখিয়া—জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী থাকুক বা না থাকুক—গুরুজনকে শুদ্ধোদনকে পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করেন। সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা আছে। কেহ বলেন গুরুজনেরা শুদ্ধোদনের অনুরোধে সিদ্ধার্থকে বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধার্থ বিবেচনার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া পরে জানান যে উচ্চমনা ও নম্রপ্রকৃতির কন্যা হইলে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ বলেন ভাবীপত্নীতে কি কি গুণ প্রত্যাশা করেন তাহার একটা তালিকা বানাইয়া গুরুজনদের হাতে দিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহাদের কন্যা নির্ব্বাচন করিতে বলেন। কেহ বলেন সমবেত শাক্যকুমারীদের মধ্য হইতে সিদ্ধার্থ নিজে একটি বালিকাকে পত্নীরূপে মনোনীত করেন। যাহা হউক, বিবাহ সিদ্ধার্থের হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম কি ছিল জানা যায় না। পালিশাস্ত্রে তাঁহাকে পুত্রের নামানুসারে "রাহুল-মাতা" বলিয়া কদাচিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে, পালিশাস্ত্র বুদ্ধের পত্নী সম্বন্ধে প্রায় নির্ব্বাক। সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী প্রভৃতি গ্রন্থে সিদ্ধার্থের পত্নীর অনেক নাম পাওয়া যায়, যথা গোপা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা, ভদ্রা, বিম্বা, ইত্যাদি। বিবাহের একাধিক বিবরণ ও পত্নীর বিভিন্ন নাম হইতে মনে হয় সিদ্ধার্থের একসঙ্গে বা একটির পর একটি করিয়া একাধিক কন্যার সঙ্গে হয়ত বা বিবাহ হইয়া থাকিতে পারে। সেই যুগে ধনীপুত্রের একাধিক বিবাহ হওয়াই সাধারণ ছিল। জৈনশাস্ত্রে দেখিতে পাই ক্ষত্রিয়কুমারদের একই দিনে বহু কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইত। এক পত্নীর সহিত তাহার পিতৃগৃহ হইতে আরও অনেক কুমারী দাসীরূপে গিয়া পতিগৃহে উপপত্নী-রূপে বাস করার প্রথাও প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেক স্থলে আছে। প্রধানা পত্নী বা ধর্ম্মপত্নী প্রায় একজনই হইতেন। বিবাহিতা পত্নী ছাড়া সিদ্ধার্থকে বিলাসে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধোদনের অনেক সুন্দরী ও নৃত্যগীতকুশলা কামিনী-নিয়োগের কথাও অনেক গ্রন্থে আছে। "রাহুল-মাতা" কোনও মতে বুদ্ধের মাতুলকন্যা ও কোনও মতে পিতৃব্যকন্যা ছিলেন। অধিকাংশ মতে তিনি দেবদত্তের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন ও তাঁহাদের পিতার নাম ছিল সুপ্রবুদ্ধ, আবার কেহ বলেন তিনি অমিতোদন বা অমৃতোদন নামক শুদ্ধোদনের আর এক ভ্রাতার কন্যা ছিলেন। পিতৃব্য-কন্যা বা মাতুল-কন্যা বিবাহ সে যুগে খুবই প্রচলিত ছিল। জৈনগুরু মহাবীরের ভাগিনেয় জমালিও মহাবীরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থের মনে সুখ ছিল না। জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন সিদ্ধার্থ জরা ব্যাধি মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার-ত্যাগ করিবেন তাই শুদ্ধোদন পাহারা বসাইয়া সিদ্ধার্থের নজরে এ চারটি জিনিষ আসা নিবারণ করিলেন, অবশেষে প্রমোদ-উদ্যানে যাইবার সময় পথে দৈবাৎ এগুলি দেখিয়া সারথির কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল—এ সব কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। সিদ্ধার্থের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জরা কি, ব্যাধি কি, মৃত্যু কাহাকে বলে এ সব জানিতেন না, এ কথায় কোনও কাণ্ডজ্ঞানবান ব্যক্তির আস্থা হইবে না। শিক্ষাগুরুর কাছে, পঠনীয় ধর্ম্ম ও কথা-সাহিত্য, বাল্যের খেলার সঙ্গীদের কাছে, যৌবনে বয়স্ত বন্ধুদের কাছে, কপিলাবাস্তু নগরের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে তিনি কি কখনও এ গুলির কথা শুনিলেন না বা স্বচক্ষে দেখিলেন না? শুদ্ধোদনের বৃহৎ পরিবারে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আত্মীয়স্বজন দাসদাসীদের ভিতর কি একটা লোকও বুড়া হয় নাই, একটা লোকেরও অসুখ করে নাই, বা একটা লোকও মরে নাই? উপকথার বন্দিনী রাজকন্যার মত তিনি যে ত্রিশ বৎসর একটি ঘরে কাটাইয়া দিয়াছিলেন তাহাও নয়, তাঁহার পরবর্ত্তী কালের কথাবার্ত্তা ও জীবন হইতে বেশ বুঝা যায় যে সাংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বুদ্ধের যথেষ্ট ছিল; ইহা কি তিনি সংসার-ত্যাগের পর তপস্যা করিবার সময় বনে বসিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, না, সংসারে থাকিতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন? আসলে এ গল্পগুলি সাধারণ লোকের বা "ললিত-বিস্তর" প্রভৃতি গ্রন্থের কল্পনাপ্রসূত। বুদ্ধদেব যেখানে যেখানে শিষ্যদের কাছে নিজের পূর্ব্বজীবনের ও সংসারত্যাগের কথা বলিয়াছেন বলিয়া পালিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে সেখানে এ কাহিনীর বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। পালিশাস্ত্রের প্রাচীনতম যে যে অংশে বুদ্ধের সংসার-ত্যাগের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, যদিও তাহা সামান্যই, তবু তাহাতে এসব কাহিনীর লেশমাত্র নাই। এ কাহিনীগুলি বাস্তবিক যাহা ঘটিয়াছিল এরূপ কয়েকটি সূক্ষ্মরেখার মধ্যে কল্পনার অজস্র বর্ণসমাবেশে পরিকল্পিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্মশান-ঘাট

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য-মহিমান্বিত একটী স্নানঘাট। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী। রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা বরাবর পূর্ব্বমুখে আসিয়া এই ঘাটেই শেষ হইয়াছে।

সড়কটীর দুই পাশে ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটী বাজার। বাজার মানে খান কুড়ি বাইশ দোকান—খান কয় মিষ্টির, দু'খানা মুদীর, ছ'সাতখানা কুমোরের—মণিহারী, পানবিড়ি ত' আছেই। ঘাটের একেবারে উপরে জনা দুই পসারী, অর্থাৎ কলা ও ডাব, বিক্রয় করে।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটীতে তিলধারণেরও স্থান মেলে না। চীৎকারে, গুঞ্জনে সারা বাজারটা গম্ গম্ করে, যেন একটা মেলা। অস্তমান সূর্য্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। সন্ধ্যায় জনহীন বাজারখানা খাঁ-খাঁ করে। তখন দু'দশ জন আগন্তুক যাহারা আসে—তাহারা শ্রান্ত শব-বাহকের দল। শব সৎকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ক্লান্তিতে, শোকে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, ফোঁটাকয় জলও তাহার চোখ হইতে হয়তো গড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক দুই চারিটা কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে, মৃত কিম্বা মৃত্যুকে লইয়া। ঠিক যেন জলবুদ্বুদের মত, দুই চারিটা পর পর উঠে, মিলাইয়া যায়, আবার নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা থম্‌থম্ করে।

মোটকথা, বাজারের কোলাহল তাহারা বাড়ায় না।

তখন যা কিছু সাড়া, যা কিছু চাঞ্চল্য সে শুধু দোকান কয়টার। দোকানীরা আপন আপন দোকানে বসিয়া সমস্ত দিনের লাভ-লোকসান কসে, মুখে হাসি গল্প চলে, হাতে কাজ করিয়া যায়।

শেষ কার্ত্তিকের একটী শীতকাতর সন্ধ্যা।

বিড়ির দোকানদাস ছকু বিড়ি পাকাইতেছে। কোথাকার মেলা-ফেরৎ কালীচরণ আপন দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। পাশে কুমোর বুড়ো কি একটা গড়িতেছিল, হাতে ময়দার মত মাটীর নেচী। নেচী হইয়া উঠিল একটা ডম্বরু। নিপুণ আঙুলের চাপে দেখিতে দেখিতে সেই ডম্বরুটীর প্রান্তে গড়িয়া তুলিল দুটী কান, মধ্যে লম্বা চেপ্টা মুখ, পিছনে বাঁকানো লেজ, নীচের দিকে চারিটী পা। সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠিল একটী ঘোড়া। পাশের লম্বা পিঁড়িখানার উপর একটীর পর একটী পক্ষীরাজের বাহিনী সাজাইয়া তোলা হইতেছিল।

কুমোর বুড়োর দোকানের সম্মুখেই রাস্তার ওপারে বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। আপন চালাঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মাদুর বুনিতে বুনিতে কুসুম গল্প করিতেছিল কুমোর বুড়োর সঙ্গে। মেয়েটী অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ। তিনকুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী। মাদুর বোনাই বেচারীর জীবিকা। রোজই এমন গল্প চলে—সুখ দুঃখের কথা, হাসির কথাও দুই চারিটা হয়। এক একদিন কুমোর বুড়ো উপকথা বলে, কুসুম কাজ করিতে করিতে হুঁ হাঁ করিয়া যায়। কুমোর বুড়ো থামিলে বলে—তারপর ?

পাল বলে—তারপর বুড়ো কত্তার ব'কে ব'কে গলা শুকোয়, তার তামাক খেতে ইচ্ছে হয় - কিন্তু নাতনীর তা' সহ্য হয় না।

নাতনী কৌতুকে হাসিয়া উঠে।

ও পাশে মুদীর দোকানে একটা দাবা টাকা লইয়া সেদিন বাজনা পরীক্ষা চলিতেছিল। খরিদ্দারের ভিড়ে কে কখন ঠকাইয়া গিয়াছে। পাশের দোকানীরা কেহ বলিতেছিল চলিবে, কেহ বলিতেছিল, না। মুদি বারবার টাকাটা সজোরে আছড়াইয়া আওয়াজ বাড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেটা ঠন্ করিয়া সাড়া আর দেয় না।

পাশের দোকানী বিড়িওয়ালা ছকুর বাপ দ্বিজদাস কহিল—ঠ্যাঙালে চীৎকার বেরোয়, সুর বের হয় না ভাই; ও তুমি গঙ্গার নামে খরচ লিখে হাত ধুয়ে বসো।

দ্বিজদাসের কথাটা মুদীর ভাল লাগিল না। সে আপন মনেই গালি দিল বঞ্চককে—কোন্ শালা গঙ্গাতীরে এমন বঞ্চনা ক'রে গেল বল দেখি ? পুণ্যি করতে এসে—

রসান দিয়া দ্বিজদাস কহিল - ফল হাতে হাতে পেয়েছে সে, টাকার ষোল আনাই তার লাভ।

ওদিকে কান দিতে গেলে দুঃখের বোঝা ভারী হয়। মুদী শাপ-শাপান্ত করিয়া আত্মপ্রবোধ দিল, যা—যা গঙ্গাতীরে বঞ্চনা যেমন করলি, তেমনি নরকে যাবি, নরক হবে তোর। আমার না হয় ষোল আনাই গেল।

আবার ক্ষণপরে কহিল—তা' বারো আনায় চলে যাবে, রাণীমার্কা বটে, কি বল দাস ?

দাস নীরবে হাসিল, সেদিন তা'রও ঠিক এমনি হইয়াছিল।

সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটীর কোল পর্য্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রূপার পাতের মত চকচক্ করিতেছে। ঘাটের উপরেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে সর্ব্বাঙ্গ শিরশির্ করে।

গঙ্গার মৃদু ধ্বনি ছাপাইয়া কখনও কখনও দাঁড় ছপ্‌ছপ্ করিয়া নৌকা চলে কাটোয়ার বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে তার বুকের ক্ষীণ আলোকে গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকম্পিত প্রতিবিম্ব। দূরে শ্মশান-ঘাটে রোল শোনা যায়,—বল হরি, হরি-বো—ল !

মুদী কহিল—আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীর মুখে কহিল—খাতাটা কইরে ছকু ?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা লইয়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

শ্মশান-ঘাট এবার দ্বিজদাস ডাকিয়া লইয়াছে। জমিদারকে বার্ষিক জমা দিতে হইবে এগার শো টাকা—সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান-জমা দু'টাকা এক আনা।

মুদী কহিল—তোদের কপাল ভালরে ছকু। এবার আসছে খুব।

কথাটা ছকুর তত ভাল লাগিল না, সে উত্তর দিল না, বিড়ির তাড়াগুলা লইয়া অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওপাশে কুমোর বুড়ো ঘোড়ার লেজ বাঁকাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিল—আজকাল সবই উল্টো হয়েছে গো, আজকাল হয়েছে কি জান—

নাই ধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে।
আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির কাটছে।

গল্প হইতেছিল ডাকাতীর।

টানার সুতার ফাঁকে ফাঁকে মাদুরের পাতি সুকৌশলে পরাইতে পরাইতে কুসুম হাসিয়া কহিল—তা হ'লে পালকর্ত্তা, বল রাত্রে ঘুমোও না।

পাল-কর্ত্তা কোন উত্তর দিবার আগেই ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া হঠাৎ কেনারাম চাটুজ্জে পিছনের অন্ধকার হইতে দোকানের আলোর সম্মুখে যেন উদয় হইয়াই কহিল—কিরে, কার ঘুম হয় নারে বাপু?

পাল কহিল—নাতজামাই যে! এসো, এসো। কবে এলে?

কুসুম অবগুণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিল। কেনারামই কুসুমের স্বামী।

গ্রামে গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না, বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে। মাও নাই, বাপও নাই। বন্ধনের মধ্যে ওই কুসুম, সে বাঁধনও কেনারাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। আগে তবু ঘরে থাকিত, তখন সত্যকার একটী বন্ধন ছিল—তিন চার বছরের কন্যা খুকুমণি। মাসতিনেক হইল মেয়েটীর মৃত্যুর পর সে সব ছাড়িয়াছে। এ পাড়ায় বড় একটা আসেও না, কুসুমকে একটা কথাও বলে না। কোথায় যায়—দশদিন বিশদিন কোথায় থাকে, আবার একদিন আসে।

পাল-কর্ত্তার সাদর অভ্যর্থনায় চাটুজ্জে কান দিল না—কার ঘুম হয় না সে লইয়াও মাথা ঘামাইল না। ও দিকে কালীর দোকানে তখন তাহার নজর পড়িয়াছে, কালীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—আরে কালী যে! তুই কবে ফিরলিরে মেলা থেকে, এঁয়া?

দু'পা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া কালীকে প্রশ্ন করিল—তার পর মেলা কেমন দেখলি বল্ দেখি? কই বিড়ি দেরে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি দেশলাই টানিয়া লইল।

কালী সংক্ষেপে কহিল—বেশ মেলা, খুব ভিড়, বেচা-কেনাও বেশ!

ঠাকুর তখন সদ্য বিড়িটা ধরাইয়াছে, মুখে একরাশ ধোঁয়া। কেরোসিনের টবের আলমারীতে খালি সিগারেটের বাক্স সাজাইতে সাজাইতে কালী কহিল—এবার ওখানে মেলাতে বেশ্যে বসতে দিলে না, দাদাঠাকুর! তুলে দিলে সব।

চাটুজ্জের মুখের ধোঁয়াটা অকস্মাৎ হুস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কহিল—সে কিরে—কে তুলে দিলে?

—গবরমেণ্টার হ'তে সায়েব এসেছিল যে। দারোগা পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন সব। তারাই দিলে। উঃ—দারোগাটা কি সংঘাতিক মোটা মাইরী! ঠিক যেন গঙ্গার শুশুক, বুঝলি ছকু!

কেনারাম নীরবে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ কহিল—বসতে দিলে না?—কি হ'ল তাদের কালী?

ওপাশে পালের গলা শোনা গেল, উঠলে যে ভাই নাতনী! এত সকালেই?

কুসুমের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময়টাতে সমস্ত বাজারটা হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এমন হয়, বহু লোক, বহু কোলাহলের মধ্যেও এমন এক একটী আকস্মিক নিস্তব্ধ মুহূর্ত্ত আসিয়া যায়।

চাটুজ্জেই প্রথম এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল—তারা খুব গরীব, নয়রে কালী?

নত মুখে কালী কহিল—খু—ব।

ও পাশ হইতে ছকু ডাকিল—যাত্রা ক'রতে হবে চাটুজ্জে মশায়—আমরা যাত্রার দল খুলছি।

চাটুজ্জে সাড়া দিল না।

ছকু আবার ডাকিল—শুনচেন দাদাঠাকুর?

বিরক্ত হইয়া চাটুজ্জে গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে গিয়া দাড়াইল।

কালী হাসিয়া কহিল—মেয়েগুলোর ভাবনা ভাবতে বসেছে।

একটা ইঙ্গিত করিয়া ছকু কহিল—এদিকে নিজের পরিবারের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নাই।

মৃদুস্বরে কালী কহিল—কেন, পাল-কর্ত্তা!

দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে কিন্তু আবার তখনই ফিরিল। গালে হাত দিয়া বসিয়া মহা দুশ্চিন্তার সহিত সে কহিল—মেয়েগুলোর শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল কালী?

—আর দাদা, সেইখানে সব না খেয়ে শুকিয়ে বেচারীরা—

বাধা দিয়া ছকু কহিল—না দাদাঠাকুর, ও ফাজিলটার কথা শোনেন কেন? তাদের সব ভাড়া দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে।

চাটুজ্জে মহাখুসী। কহিল—তা সে বেশ হয়েছে, এ খুব ভালো বন্দোবস্ত হ'য়েছে। সায়েবের মাথারে বাপু! তারপর একগাল হাসিয়া বলিল—তুই কি যেন বলছিলি ছকু?

—আমরা যাত্রার দল খুলছি। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-মিলন পালা হবে। তোমাকে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাজতে হবে।

অমনি গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া লইয়া চাটুজ্জে কহিল—হরিশ্চন্দ্র তো আমি সেজেই আছিরে, দেখবি!—'শৈব্যা শৈব্যা, রোহিতাশ্ব রোহিতাশ্ব!' কিন্তু খালি গায়ে যে শীত করছেরে!

—হ্যাঁ, বামুনের আবার শীত, বলে যার মুখের ফুঁয়ে আগুন! কিন্তু ও বক্তৃতায় তো হবে না দাদাঠাকুর, বই থেকে বক্তৃতা করতে হবে। এই দেখ বই কিনেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জে ছকুর মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর অল্প একটু হাসির সহিত কহিল—সত্যি বলছিস্ ছকু!

—কবে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি, বল তো?

—দে, তবে বই দে তোর। কি বক্তৃতা করতে হবে দেখি।

ছকু তাহাকে বইখানা আগাইয়া দিল। চাটুজ্জে বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—"রাণী, রাণী, তুমি যে কখনও কোমল শয্যা ভিন্ন শয়ন কর নি, ও-হো-হো। বাপ রোহিতাশ্বর রে, সোনার পুতুল আমার—(রোহিতাশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিলেন)।"

ও পাশে কালী ভ্যাঙচাইয়া উঠিল—বাপ যুধিষ্ঠির রে, (হনুমান কলা খাইতে লাগিলেন)।

এ পরিহাস চাটুজ্জে বুঝিল। বইখানা ছকুর দোকানে ফেলিয়া দিয়া সরোষে সে কহিল,—দেখ কেলে, তোর না হয় পয়সাই হয়েছে; তাই ব'লে লঘু-গুরু মানামানি নাই তোর?

কালী দমিল না, সে অঙ্গভঙ্গী করিয়া কহিল—ওয়ান্ মর্ণ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্ ইন্ এ লেন্ কোলোজ টু মাই ফারম।

ইংরেজীর কথা উঠিলেই চাটুজ্জে সদম্ভে এই লাইন কটা ঝর্ ঝর্ করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

চাটুজ্জে আগুন হইয়া কহিল—আমি যদি বামুন হই তবে তোর—কি হবে জানিস্?

—কি হবে শুনি?

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া চাটুজ্জে কহিল—জানি না যা। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেল। কালীর পরিহাসটা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। যাইতে যাইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই সে যেন কহিল—যা তুই বল্লি বল্লি, আমি শাপ দেব না তোকে। ফেটে ম'রে যাবি শেষে!

পাল-কর্ত্তার মজলিসে তখন উপকথা জমিয়া উঠিয়াছে। কুসুম যে কখন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উপকথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পাল কহিল—এস, এস, নাতনী এস! রাত বেশী হয়নি, ব'স। তুমি নইলে আসর জমছে না।

ভারী গলায় কুসুম উত্তর দিল—না কর্ত্তা, দেহ বেশ ভাল নাই আমার।

তারপর অনাবশ্যক ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াই যেন সে কহিল—আলোটা আবার নিবে গেল, তেল নিয়ে আসি।

নির্ব্বাপিত হ্যারিকেনটা লইয়া সে ঘাটের নিকটবর্ত্তী মুদীর দোকানটায় গিয়া উঠিল।

চাপা গলায় ছকু কালীকে কহিল—শরীর ভাল নাই! চাটুজ্জে আজ এ পাড়ায় এসেছে কিনা!

কালী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। দোকানে হারিকেনটা নামাইয়া দিয়া কুসুম কহিল—এক পয়সার তেল পুরে দাও তো।

মাপের হাতলওয়ালা বাটীতে ভরিয়া তেল পুরিতে পুরিতে দোকানী কহিল—তেল যে রয়েছে গো।

কুসুম গঙ্গার ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল; কোন উত্তর দিল না।

আলোর মুখীটা লাগাইয়া দিয়া মুদী আবার কহিল—আলো জ্বেলে দেব মা? ঠাক্‌রুণ!

সচকিত কুসুম কহিল—এঁ্যা!

—আলো জ্বেলে দেব?

—না থাক্, বাড়ীতে জ্বেলে নেব আমি। হারিকেনটা লইয়া সে চলিয়া গেল।

গাল্পকর্ত্তার মজলিসে তখন পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশ-পথে উড়িয়াছে।

চাটুজ্জে ঘাট হইতে ফিরিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ছকু তাহাকে ডাকিয়া কহিল—উঠে বসুন চাটুজ্জে মশায়। রাগ করলেন?

চাটুজ্জে কহিল,—নাঃ আর ব'সবো না। ও পাড়ায় যাচ্ছি।

পাল তখন কহিতেছিল—পক্ষীরাজের পিঠে রাজ পুত্তুর চড়লেন, আর পক্ষীরাজ সোঁ সোঁ ক'রে আকাশে উড়ল—

চাটুজ্জের আর যাওয়া হইল না। তৎক্ষণাৎ পালের দোকানে ঢুকিয়া প্রতিবাদ করিয়া সে কহিল—বুড়ো বয়সে গঙ্গাতীরে ব'সে এত মিথ্যে কথা কেন বল, বল দেখি? সোঁ—সোঁ—করে আকাশে উড়ল! ঘোড়া আবার আকাশে ওড়ে?

ঘোড়ার কান গড়িতে গড়িতে পাল হাসিয়া কহিল—এস—এস ভাই, নাত-জামাই এস। দে-রে দে, বসতে দে মোড়াটা। নাও তামাক খাও।

চাটুজ্জে মোড়ায় বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা বসাইয়া চাটুজ্জের হাতে দিয়া পাল কহিল—

—তবে আর উপকথা কাকে বলেছে ভাই!

হুঁকা টানিতে টানিতে চাটুজ্জে কহিল—তাই বলে যত মিছে কথা বলতে হবে নাকি?

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়া চাটুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বুড়া কহিল—যত সব নাতী-নাতনীতে এসে ধরে, কি করি বল?

—তবে তুমি বল যত পার—পেট ভরে মিছে কথা বল। হুঁঃ—ঘোড়া নাকি আবার আকাশে ওড়ে!

উপকথা আগাইয়া চলিল—প্রবাল দ্বীপের চিলে-কোঠা দেখা যাইতেছে; রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল ভিজানো জলে স্নান-করা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ। সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারি পাশে গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশে। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, 'আরও জোরে পক্ষীরাজ, আরও জোরে।'

হঠাৎ বাধা পড়িল ময়রা বুড়ীর হাসিতে—

—ও মাগো, এ-কে-গো! ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ, কাতু কুতু কে দেয় গো!

কাতুকুতু যে দিতেছিল তাহারও সাড়া পাওয়া গেল—কেঁউ-কেঁউ কুঁ-কুঁ।

একটা কুকুর ছানা! কোথা হইতে আসিয়া সেটা বুড়ীর পিঠ চাটিতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

বুড়ী চটিয়া আগুন, কহিল—আ-মর, মর্ মুখপোড়া কুকুর। আমি বলি কে বুঝি সুড় সুড়ি দিচ্ছে।

উপকথা ছাড়িয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাল কহিল—তাড়াও হে তাড়াও! দোকানে ঢুকলে সর্ব্বনাশ হবে, সব ভেঙে ফেলবে। লাঠি গাছটা কই, লাঠি গাছটা?

বুড়ী খোঁজে ঝাঁটা, পাল খোঁজে লাঠি। চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি হুঁকাটা নামাইয়া কুকুর-ছানাটীকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর আলোয় আনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেটাকে দেখিয়া কহিল—আরে তুই কেত্থেকে এলি? এ যে শ্মশান-ভৈরবীর বাচ্চা হ্যাদাটা! শ্মশান ছেড়ে এখানে কি করতে এলি মরতে? চল্ হতভাগা, তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি। যত সব অখাস্ত কাণ্ড, হুঁ! চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িল।

পাল কহিল—শোন, শোন, যেয়ো না। ডাকছে তোমার ডাকছে, ও—।

সম্মুখেই কুসুমের আলোকিত মুক্ত দ্বার, দুয়ারের কাছে মেঝের কুসুম দাঁড়াইয়া। চাটুজ্জে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল

না। কুকুর-ছানাটা কোলে করিয়া পথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পাল কহিল—শরীর খারাপ, বেশী রাত করো না; তুমি দোর দিয়ে শোও নাতনী।

কুসুম ততক্ষণে আলো হাতে বাহিরে আসিয়াছে। আবার সে বারান্দায় মাদুর বুনিতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পাল কহিল—শরীর খারাপ বলছিলে না নাতনী?

নত মুখে কুসুম কহিল—এটা কালই দিতে হবে কত্তা। গরীবের শরীর খারাপ হ'লে চলবে কেন বল? বল, তোমার উপকথা বল, কাজ করি আর শুনি।

কে একজন কহিল—কি যে করে গেল বামুন মা!

পালেদের ছি-চরণ কহিল—আহা সোনার প্রতিমা!

একজন কহিল—চাটুজ্জে ত' ভালই ছিল। মেয়েটা মরেই—

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া পাল উচ্চকণ্ঠে কহিল—চুপ্ চুপ্, সব চুপ কর্। উপকথা শোন্, হ্যাঁ তারপর হ'ল কি, পক্ষীরাজও এসে পড়ল আর কি, পা তার ছাদ ছোঁয় ছোঁয়—

কিন্তু একটা কলরোলের মধ্যে পালের কথাটা ঢাকা পড়িয়া গেল। দূরে শ্মশান-ঘাটে আবার রোল উঠিল—"বল হরি—হরি বোল্।"

* * *

গঙ্গার তীরভূমির ঘন বন-সন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁসিয়া একটী স্বল্প-পরিসর পথ। পথটী গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নান-ঘাটের উত্তরে কিছু দূরে আর একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে নামিয়াছে। ইহার দু'ধারে বুক-ভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটাই শ্মশান-ঘাট।

চাটুজ্জে উপর হইতে এই পথে নামিল।

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে এক টুক্‌রা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। এক দিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে ওখানে দুই চারিটা নর-কপাল, হাড়ের টুক্‌রা পড়িয়া আছে।

একটু অগ্রসর হইয়া চাটুজ্জে একখানি জীর্ণ টিনের চালায় আসিয়া উঠিল। চালাটার উত্তর দিকে রাজ্যের ছেঁড়া বিছানা গাদা হইয়া আছে। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধুনি। ধুনিটার কোল ঘেঁসিয়া একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা, চালাটার কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো লম্বা তারে বাঁধা একটা হ্যারিকেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিমে বাঁশে চাটাইএ তৈয়ারী আর একখানা ছোট ঘর।

নীচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ নিশীথ অন্ধকারের বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশে পাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখার প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধূম পাক্ খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নীচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটী শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটীর মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ এগারো বছরের কচি মেয়ে! ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে—কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটী মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূরা জোয়ান, নিকষকালো বর্ণ, মাথার দীর্ঘ বাবরী-চুল অগ্নি-তপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।

চালার উপরে দাঁড়াইয়া চাটুজ্জে তাহাকে ডাকিল—পৈরু!

মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে পৈরু কহিল—"পর্‌নাম্—ঠাকুর মহারাজ! আসেন্ আসেন্। কবে আস্‌লেন্ দেশে?

—এই বিকেল বেলা রে। তার পর ভাল আছিস্ তো?

—আপনার কিরপা মহারাজ।

—ছেলে-পুলে তোর?

—সবহি ভালা দেওতা!

কাপড়ে ঢাকা কুকুর-ছানাটাকে বাহির করিয়া চাটুজ্জে কহিল—আরে তোর সেই ন্যাদা বাচ্চাটা যে বাজারে গিয়ে পড়েছিল। শেয়ালে নিত আর একটু হলেই—। গলা চড়াইয়া চাটুজ্জে হাঁকিল—ভৈরবী, ভৈরবী! কালু! কালু!—মহাদেও!

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই চালা-ঘরটা হইতে একপাল কুকুর আসিয়া চাটুজ্জেকে ঘিরিয়া লেজ নাড়িতে সুরু করিল। একটা আবার চিৎ হইয়া শুইয়া থাবা দিয়া চাটুজ্জের পায়ে আঁচড়াইতেও লাগিল।

কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল—মা হ'য়ে ছেলের খোঁজ নাই হারামজাদী!

ভৈরবী কাতরে মৃদু আর্ত্তনাদ করিল, যেন অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতেছে!

চাটুজ্জে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া কহিল—যা, যা, সব শুগে যা—খুব আদর হয়েছে। যা—সব—যা।

কুকুরের দল তবুও যায় না।

পৈরু হাসিল—হঠাৎ কুকুরের দল চীৎকার করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল। পলায়নপর জন্তুর পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—"খ্যাক্ খ্যাক্।" টিনের চালায় খাটিয়াটার বিছানার ভিতরে কে যেন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া একটী শিশু মুখ বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—এ—বাবা।

পৈরু উত্তর দিল—যাই, যাই হো মায়ী,—ঘুম্ যাও, শো যাও—শো—যাও হো বেটিয়া।

শিশুটী বিছানায় মুখ লুকাইল।

চাটুজ্জে কহিল—তোর সেই খুকীটা,—না রে পৈরু?

—হাঁ মহারাজ, কুছুতে ছাড়লো না হামাকে আজ।

চিতাটা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। পৈরু হাত মুখ ধুইয়া উপরে আসিয়া কন্যাটাকে সযত্নে কম্বল ঢাকিয়া দিল। তারপর মাথার চুলগুলি তাহার হাতে করিয়া সাজাইয়া দিতে দিতে কহিল—বেটী হামার বহুৎ ভালা দেওতা, হামাকে বড়া পিয়ার করে।

চাটুজ্জে চিতার দিকে চাহিয়া ছিল, কথা কহিল না। বিড়ি বাহির করিয়া পৈরু কহিল, বিড়ি পিবন্ মহারাজ?

চিতার আগুনের পানে চাহিয়া চাটুজ্জে কহিল—দে। ধুনির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া চাটুজ্জে চিতার পানেই চাহিয়া রহিল।

পৈরু কহিল—থোড়া বস্‌বেন মহারাজ?

—হুঁ।

—তব, বসেন্ আপনি হামি খাইয়ে লিই।

পৈরু একটা ঝাঁটা লইয়া ওই কুকুরের ঘরের মেঝেয় গিয়া ঢুকিল। চারিটা পাশ ময়লায় ভর্ত্তি। তারই একটা প্রান্ত ঝাঁটা বুলাইয়া পৈরু জল ছিটাইয়া দিল। এবং ঐখানেই সে গাম্‌লা-ঢাকা খাবার লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে জলন্ত চিতাটা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

চাটুজ্জে কহিল—চিতাটা যে নিবে এল পৈরু, আও্‌রা ঝাড়তে হবে।

খাইতে খাইতে পৈরু কহিল—যাই হামি মহারাজ!

—খাবার দেরী কত তোর?

—দের পোড়া আছে। থাক্ আমি যাই।

—থাক্, তুই খা, আমিই দিচ্ছি ঝেড়ে।

চাটুজ্জে কাপড় সাঁটিতে-সাঁটিতে চড়ায় নামিয়া পড়িল।

পৈরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল—না না দেওতা, বাড়ী যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে—।

অর্দ্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল—তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ।

একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল—নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা—

—দূর বেটা; শিব নিজে একাজ করে জানিস্? তোরা হচ্ছিস্ নন্দীর বাচ্চা।

পৈরু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। বাহিরে পথের উপর হইতে কে তাহাকে ডাকিল—পৈরু।

তাড়াতাড়ি পৈরু বাহির হইয়া আসিল এবং আহ্বানকারীকে দেখিয়া একান্ত অপরাধীর মতই কহিল—মাইজী! রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কুসুম।

কুসুম কহিল—একবার ডেকে দাও পৈরু!

পৈরু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মহারাজ, মহারাজ, এ ঠাকুর জী!

মহারাজ তখন চিতাগ্নিটাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে করিতে বক্তৃতা সুরু করিয়া দিয়াছে—শৈব্যা, শৈব্যা।

জোর গলায় পৈরু আবার ডাকিল—ঠাকু-রজী!

চিতাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে চাটুজ্জে পৈরুকে ডাকিয়া কহিল—দেখে যা, বেটা দেখে যা, চিতা যার নাম, এ নইলে মানাবে কেন? জানিস্ পৈরু, এমনিধারা চিতা সারা দিন-রাত যদি জ্বালিয়ে রাখতে পারিস্—তবে ঠিক রাত্রে শ্মশান-কালীকে আসতে হবে। এ একটা মন্তুরে!

পৈরু আবার ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম বাধা দিয়া কহিল—থাক্ পৈরু, আমি খাবারটা দিয়ে যাই, তুমি খাইয়ো। ব'লো না যেন আমি দিয়ে গেছি।

চালার একটা প্রান্ত কুসুম এক হাতে পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর অঞ্চলতলে ঢাকা খাবার, জলের ঘটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে পৈরু কহিল—সাথমে যাই হামি মাইজী।

কুসুম একটু হাসিল, কহিল—না বাবা, তুমি যাও, খাবারটা হয়তো কিছুতে খেয়ে দেবে। আমি একাই যেতে পারব।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কুসুম ডুবিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৈরু ফিরিল।

চিতাটা নাড়িতে নাড়িতে চাটুজ্জে কহিল—কি?

—হাত মুখ ধুয়ে আসেন্। বেশ জ্বলছে উ।

—তোর হল?

—হাঁ, আপনি শিগ্রি আসেন। ॰ফেলেন বাঁশ ফেলেন।

পৈরুর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ছিল, চাটুজ্জে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উঠিয়া আসিল।

অঙ্গুলিনির্দ্দেশে খাবার দেখাইয়া দিয়া পৈরু কহিল—ভোজন করেন।

—কে আনলে পৈরু?

—হামি আনাইলাম গো, ওহি চাষাদের ছোক্‌রাকে দিয়ে।

পৈরুর মুখপানে চাটুজ্জে তাকাইয়া কহিল—কুসুম দিয়ে গেল, নয় পৈরু?

—হাঁ, এৎনা রাতমে মাইজী আসবে হিঁয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাটুজ্জে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে কহিল—সত্যি, বড় খিদে পেয়েছিল পৈরু। এই জন্তেই তোকে এত ভালবাসি।

পৈরু উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল মাইজীর কথা। শ্মশানের চণ্ডাল সে, দুঃখের উচ্ছ্বাস সে অনেক দেখিয়াছে, বুক-ফাটা কান্না সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু দুঃখের এমন নীরব প্রকাশ সে আর দেখে নাই।

চাটুজ্জে আপন মনেই কহিতেছিল—আমাকে আর কেউ ভালবাসে না পৈরু, তুই ছাড়া।

পৈরুর মনে হইল, মাইজী যেদিন চিতায় চড়িবে সেদিন হয়তো বুকের জমা-করা কান্নায় চিতার আগুন জ্বলিবে না, নিভিয়া যাইবে। চাটুজ্জে আবার কহিল—কুসুমও আমায় ভালবাসে পৈরু। কিন্তু— কথাটা তাহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পৈরু ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলেন মহারাজ জী?

চাটুজ্জে উত্তর দিল না।

পৈরু ডাকিল—দেওতা।

চাটুজ্জে মুখ তুলিয়া চাহিল। চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হ'লেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস্ পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ভাসে।

পৈরুর চোখ দিয়াও এবার জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

চাটুজ্জে আবার কহিল—কিন্তু জানিস্ পৈরু, খুকুমণির জন্তে ওর একটুও দুঃখ হয় নি; ও তার জন্তে কাঁদে না।

বাধা দিয়া পৈরু কহিল—মৎ বোল না, ই বাত্ মৎ বোল না, ঠাকুর জী! মাইজীর আঁখের পানিতে দরিয়া বেড়ে গেল দেওতা। তুম্হার আঁখ নেহি; তুমি দেখলে না।

সচকিত ভাবে চাটুজ্জে পৈরুর মুখ পানে চাহিয়া কহিল—সত্যি পৈরু?

দৃঢ়কণ্ঠে পৈরু কহিল—সাম্‌না মে গঙ্গাজী যেমন সাচ্, মহারাজ, ই বাত হামার তেমনি। ঝুট্ হোয় তো শিরমে হামার বাজ গিরবে দেওতা।

কতক্ষণ পর চাটুজ্জে ধীরে ধীরে কহিল—লোকে কত কি বলে ওই বুড়ো পালকে নিয়ে, কিন্তু সে মিথ্যে, আমি জানি।

কিন্তু কুসুম কাঁদে খুকুমণির জন্যে ?—সারাদিনই যে মাদুর বোনে ও, দিনরাতই যে ওর পয়সা পয়সা !

পৈরু একথার কোন জবাব দিল না।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোল উঠিল—বল হরি—হরি—বো—ল। নূতন কে মহাপথ-যাত্রী আসিল।

সে রোলের প্রতিধ্বনি বনে বনে, গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ধ্বনিয়া দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। চকিত শৃগালের দল কলরব করিয়া উঠিল। গাছের মাথায় শকুনিরা পাখা ঝটপট্ করিয়া নড়িয়া বসিল।

টিনের চালায় মানুষ দুটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। হাত-মুখ ধুইয়া চাটুজ্জে বিড়ি ধরায়, পৈরু শবের কড়ি সংগ্রহ করিতে নীচে নামিয়া যায়।

নূতন কাঠ বহিয়া আনিয়া পৈরু আবার চিতা সাজাইল।

শববাহকের দল চিতায় শব তুলিয়া দিতে গেল।

পৈরু ডাকিল—ঠাকুর জী !

কেহ উত্তর দিল না, চাটুজ্জে কখন চলিয়া গিয়াছে।

শবের কাপড় বিছানা ভাঁজ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া পৈরু শবের পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাস মত বাঁশে ভর দিয়া পৈরু গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

"পৈরু !" চাটুজ্জে ফিরিয়া আসিল।

—মহারাজ !

—এ কেমন মড়ারে ?

—ই-যানেওলা হ্যায় মহারাজ,—সাদা মাথা !

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিতেই পৈরু উপরে আসিয়া বসিল।

চাটুজ্জে চুপি চুপি কহিল—পৈরু !

—মহারাজ !

—কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।

চিতার আগুনে পৈরুর মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; সে মুখ তাহার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গঙ্গাজী সাচ্ হ্যায় দেওতা ; ঝুটাতো নেহি। ধূলির পাশে একখানা কম্বল বিছাইয়া চাটুজ্জে শুইয়া পড়িল। চিতাটার নির্ব্বাণ অপেক্ষায় শ্মশানের বুকে চণ্ডাল জাগিয়া বসিয়া রহিল।

* * *

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান-ঘাটের রূপ একেবারে পাল্টাইয়া গেছে। ঘাটে বাজারে লোক আর ধরে না। স্তব-গানের রোলে পাখীর কলরবও ঢাকা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকে নৌকার মেলা ; মহাজনী নৌকাগুলা উজানে গুণের টানে চলিয়াছে ; জেলে-ডিঙিগুলা মোচার খোলার মত হেলিয়া দুলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ওপারের খেয়া-ঘাটে যাত্রীর দল, মাল-বোঝাই গাড়ীর সারি, গরু মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে। পথের পাশে কাণা খোঁড়ার সারি বসিয়া গিয়াছে।

—অন্ধজনে দয়া কর রাণী মা।

—খোঁড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান মা।

একদল বাউল দুটী ছেলেকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বাঁধা-ঘাটের পাশে পল্লীবাসিনীরা স্নান করিতেছে। কুসুমকেও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ও পাড়ার বিশ্বাস-গিন্নি, কুসুমের সই-মা, কুসুমকে দেখিয়া কহিলেন,—তাই ত মা কুসুম, কাল বাড়ী এসে সব শুনলাম ; এখানে তো ছিলাম না। কি করবি বল্ মা—গাছের সব ফল ক'টা কি থাকে ? মনে কর ও তোর নয়।

কুসুমের চোখ দিয়া দর্ দর্ ধারে জলে গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—ও কথা ব'লো না সই-মা, সে আমার—সে আমার ছাড়া কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ সেই চোখ সেই কথা, সেই সব।

—তাই হোক্ মা তাই হোক, আশীর্ব্বাদ করি তাই হোক। সে তোর খেলতে গিয়েছে, আবার ফিরে তোর কোলে আসুক।

স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল। গত বছরের ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে। কোন একটা ফসলে ফুলও দেখা দিয়াছে।

চাটুজ্জে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

দ্বিজদাসের দোকানে তখন অনেক ভিড়, সেখানে রাত্রের পাওনা-গণ্ডার হিসাব চলিয়াছে। মুদীর দোকানে কলাই না কিসের একটা ওজন হইতেছে—'রামে-রাম—রামে-রাম—রামে-দুই - দুই রাম।'

পাল-কর্ত্তার দোকানে রঙ্-বেরঙের পুতুলের সারি।

চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়া উঠিল।

কুসুম বোধ হয় দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিল, ঘর হইতে ডাকিল—এসো !

চাটুজ্জে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

কুসুম আবার ডাকিল—এসো।

সঙ্কোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান ক'রে আসি। রাত্রে শ্মশানে—।

হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক্।

দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান।

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা পুতুল।

দেঁদ্রিউ

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[ইহা আয়র্লাণ্ডের আইরীশ জাতির মধ্যে প্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ গল্প —আইরীশ ভাষায় Oidhe Chloinne Uisnigh অর্থাৎ 'উইস্‌নিষ্‌ বা উস্‌নেথ্‌-এর বংশের বিনাশ' নামে সুপরিচিত, 'এরিন্‌ (বা আয়র্লাণ্ড) এর তিন বিষাদ-কাহিনী'র মধ্যে অন্যতম। গল্পের পাত্রপাত্রীগণ অনেকটা ঐতিহাসিক বলিয়া অনুমান হয়—মূল ঘটনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী। ঐ সময়ে আইরীশ জাতির নিজস্ব একটী বিশেষ সভ্যতা ছিল—এই সভ্যতা গ্রীস ও ইটালীর সভ্যতা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা কেল্‌টিক জাতীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যগণের সৃষ্ট সভ্যতার একটী শাখা ছিল। আইরীশ জাতির এই আদিম সভ্যতা পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত রোমের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়া আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়, এবং আয়র্লাণ্ডের খ্রীষ্টানী সভ্যতা ঐ দেশের প্রাচীন সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রাখে। খ্রীষ্টান আয়র্লাণ্ড লাটিন ও আইরীশ বিদ্যার একটী বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংরেজদের দ্বারা আয়র্লাণ্ড-বিজয় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, আয়র্লাণ্ডের নিজের এই সভ্যতার এবং আইরীশ ভাষার সাহিত্যের ক্রমবর্দ্ধনশীল উন্নতি ঘটিতেছিল, কিন্তু ইংরেজের সংসর্গে আয়র্লাণ্ডের ভাষার ও সংস্কৃতির উচ্ছেদসাধন ঘটিতে থাকে। আত্মজাতীয় প্রাচীন আইরীশ বীর পুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রাচীন আয়লাণ্ডের অনেক চারণ ও কবি গাথা এবং গদ্যকাব্য রচিয়া গিয়াছেন। ওইশিন্‌ (Oisin) বা ওশিয়ান (Ossian) এই কবিদের মধ্যে একজন প্রধান। এই সকল প্রাচীন ইতিকথা ও কাহিনী আয়র্লাণ্ডের আইরীশ ও আইরীশ-বংশ-সম্ভূত স্কটলাণ্ডবাসী গেলিক-হাইলাণ্ডারদের মধ্যে এখনও সমধিক প্রচলিত আছে। আয়র্লাণ্ডের আইরীশ ও স্কটলাণ্ডের গেলিক-ভাষী হাইলাণ্ডারদের সঙ্গে বিজেতা ইংরেজদের বহুকাল ধরিয়া অহি-নকুল সম্বন্ধ থাকায়, সভ্যতাভিমানী ইংরেজের নিকট আইরীশ জাতি ও পাহাড়িয়া গেল জাতি বর্ব্বর ও হেয় জাতি বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, এবং আইরীশ ভাষা অতি দুরূহ—এই কারণে, ইউরোপীয় সভ্যজগতে এইসকল প্রাচীন বীর-গাথা বহুকাল ধরিয়া খনিগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় অজ্ঞাত ছিল। কিছুকাল যাবৎ আধুনিক ইউরোপের কৌতূহলের ফলে এবং আইরীশ জাতির মধ্যে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির উদ্ধার ও চর্চা, অনুবাদ ও আলোচনা, এবং প্রচার চলিতেছে,—ইংরেজীতে এই প্রচারকার্য্য আইরীশ জাতীয় লোকের দ্বারাই অনেকটা হইয়াছে। একটী সমগ্র জাতির এই প্রাচীন উপাখ্যানগুলি বর্ণনাদক্ষতায়, মনোহারিত্বে, কবিত্বে এবং চিরন্তনত্বে ইউরোপীয় টিউটন জাতির Edda এদ্দা ও Saga সাগার উপাখ্যানের, বা মধ্যযুগের Arthur আর্থর রাজার অনুচর বীরগণের বিখ্যাত গল্পগুলির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিকথাবলীর নিকটেও সগৌরবে দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশের কোনও বিশিষ্ট পুরাণ-কাহিনী যেমন ঈষৎ বিভিন্ন রূপে একাধিক পুস্তকে পাওয়া যায়, এবং এই সকল পুস্তকের বয়স ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহিনীটীর যেমন একটী ক্রমবিকাশ দেখা যায়, আয়র্লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনীগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। নিম্নলিখিত উপাখ্যানটীর প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই Book of Leinster নামক বিখ্যাত প্রাচীন আইরীশ হস্তলিখিত পুঁথিতে ; এই পুঁথির লিখন-কাল খ্রীষ্টীয় ১১৬০ ; ইহাতে কতকগুলি পুরাতন আখ্যায়িকা আছে। জর্ম্মান পণ্ডিত Ernst Windisch তাঁহার Irische Texte-এর প্রথম খণ্ডে ১৮৮৭ সালে লাইপ্‌সিক্‌ নগরী হইতে Book of Leinster-এ রক্ষিত এই উপাখ্যানের মূল আইরীশটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৯২ সালে পারিস হইতে ফরাসী পণ্ডিত H. d' Arbois de Jubainville তাঁহার Cours de Litterature Celtique-এর পঞ্চম খণ্ডে ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মধ্য ও আধুনিক আইরীশে এবং স্কটলাণ্ডের গেলিক ভাষায় এই গল্পের কুড়িটীরও অধিক বিভিন্ন পুঁথি ও পাঠ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে Alexander Carmichael কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গেলিক ভাষার পাঠটী উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে যে সকল আয়র্লাণ্ডের কবি ও নাট্যকার ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই (যথা Sir Samuel Ferguson, J. M. Synge, W. B. Yeats) এই গল্পটী ইংরেজীতে প্রচার করিয়াছেন, বা ইহার আশয় লইয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে ইহার লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। গল্পটীকে এক হিসাবে "আয়র্লাণ্ডের রামায়ণ" বলা যায়—যেমন Tain Bo Cualigne নামক উপাখ্যানকে "আয়র্লাণ্ডের মহাভারত" আখ্যা দেওয়া যায়। আয়র্লাণ্ডের পুরাণ-কাহিনী সাধারণতঃ গদ্যে নিবদ্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা থাকে। নিম্নে বাঙ্গলায় যে রূপটী প্রদত্ত হইল, সেটী মুখ্যতঃ প্রাচীনতম রূপের সংক্ষিপ্তসার, তবে পরবর্ত্তী রূপ হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং দুই একটী কবিতা ইত্যাদি পরবর্ত্তী পাঠ হইতে গৃহীত।]

Ulad উলাদ্ বা **Ulster** অল্স্টার্-এর রাজা **Conchobar** কোন্খোবার[১] সদলে **Fedelmid** ফেদেল্মিদ্[২] নামক তাঁহার একজন অনুচরের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। সেখানে সকলে মিলিয়া আনন্দে পান ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে গৃহস্বামীর পত্নীর একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

রাজার সঙ্গে একজন পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল **Cathbad** কাথ্বাদ্। তখনকার দিনে অ-খ্রীষ্টান আইরীশদের মধ্যে পুরোহিত একাধারে দেবযাজক, ভাট বা চারণ, বন্দনা-পাঠক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা সমস্তই হইতেন। এই পুরোহিত শিশুর জন্মের কথা শুনিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"এই মেয়ে হ'তে অল্স্টার্ প্রদেশে ভবিষ্যতে অনেক রক্তপাত ও হানি হবে।"

এই কথা শুনিয়াই রাজার যোদ্ধারা চীৎকার করিয়া বলিল —"অমন শিশুকে এখনই মেরে ফেলা হোক্।" কিন্তু রাজা বলিলেন—"না, তা হবেনা; মেয়েটীকে কালই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, আমি ধাই রেখে তাকে পালন ক'র্বো, আর সে যখন বড় হবে তখন আমি নিজে তাকে বিবাহ ক'র্বো, তা হ'লে তার থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকবে না।"

শিশুটীর জন্মের পরেই পুরোহিত কাথ্বাদ তাহাকে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে শিশুটী অস্থির হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। এই ব্যাপার হইতে কাথবাদ তাহার নাম দিলেন "দের্দ্রিউ", অর্থাৎ "যে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে অস্থির ভাবে লড়ে বা ঝাঁপাঝাঁপি করে"[৩]। রাজার অনুমতি অনুসারে দের্দ্রিউকে রাজার আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হইল, এবং **Leborcham** লেবোর্থাম্ নামে একজন ধাত্রীর হাতে শিশুকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইল। ধাত্রীর কাছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি যত্নের সহিত সে পালিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে বড় হইল, এবং শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হইয়া উঠিল। দের্দ্রিউর শিক্ষক, ধাত্রী, ও দাসী ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল।

একদিন শীতকালে সমস্ত পৃথিবী তুষারে ঢাকিয়া গিয়াছে। যে দুর্গে দের্দ্রিউ থাকিত, তাহার চারিদিকে যেন শুভ্র বসন বিছানো রহিয়াছে। সে দিন আহারের জন্য একটী গো-বৎস বধ করা হইয়াছিল, তাহার রক্ত সেই তুষারের উপর পড়িয়া আছে, এমন সময়ে মিশ-কালো এক দাঁড়কাক উড়িয়া আসিয়া সেই রক্তটুকু খাইতে লাগিল। দের্দ্রিউ তাহা দেখিয়া তাহার ধাত্রীকে বলিল—"যার মাথার চুল ঐ দাঁড়কাকের মতন কালো, গালের রঙ ঐ রক্তের মতন লাল, আর গায়ের রঙ ঐ বরফের মতন সাদা, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিবাহ ক'র্বো না।" লেবোর্থাম বলিল, "সে রকম লোকের সাক্ষাৎ দুর্ঘট নয়—রাজার অনুচরদের মধ্যে একজন যুবক আছে, তার শরীরে ঐ তিন রঙ বিদ্যমান, তার নাম হচ্ছে **Noise** নোইশি[৪], সে **Usnech** উস্নেখ্[৫]-এর ছেলে।" দের্দ্রিউ উত্তর দিল,— "তাকে না দেখ্তে পেলে আমার আর জীবনে আনন্দ নেই।"

ঠিক এই সময়ে নোইশি রাজপ্রাসাদের এক প্রাচীরের উপরে পরিখার ধারে নিজ বজ্র-গম্ভীর স্বরে গান গাহিতেছিল।

---

১ এই নামটীর (অন্য আইরীশ নামের মত) প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে নানা রূপ আছে—Concobar, Conchobar, Conchobhar, Conhovar, Conowr, Conor, Cnochur. প্রাচীনতম রূপ—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যুগে ছিল * Kuno-kobros, তাহারই ক্রমিক পরিবর্ত্তনজাত এই রূপগুলি। স্কটলাণ্ডে Conachar কোনাখার রূপেও নামটি মিলে।

২ Fedelmid—প্রাচীন রূপ, পরবর্ত্তী কালে Feilimidh ফেইলিমি, বা Feilim ফেইলিম্।

৩ Derdriu—প্রাচীন আইরীশ রূপ। নামটী বাঙ্গালা ভাষায় কিম্ভূতকিমাকার লাগিবে, কিন্তু আমাদের 'দ্রৌপদী' 'শ্রুতকীর্ত্তি' ইত্যাদি নামের তুলনায় বিশেষ শ্রুতিকটু নহে। Derdriu নামের অন্য কতকগুলি রূপ-ভেদ আছে—যথা Deirdre দেইর্দ্রে, Deirdire দেইর্দিরে; এবং Deiridire, Dearduil, Deurduil, Dearshuil, Diarshula, Deurthula প্রভৃতি কতকগুলি রূপ স্কটলাণ্ডে গেলিক-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত। অষ্টাদশ শতকে James Macpherson নামে স্কচ লেখক ইংরেজী ভাষায় গেলিক কবি Ossian-এর যে কাব্যময় আখ্যায়িকার সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি নামটীর Darthula রূপে একটী মার্জ্জিত সংস্করণ ব্যবহার করেন—গেলিক ভাষায় এই Darthula-র মূল রূপ হইতেছে Dart-huile, অর্থ 'বিশালনেত্রা' বা 'সুলোচনা'। এখানে প্রাচীনতম আইরীশ রূপ হিসাবে Derdriu রূপটাই ব্যবহৃত হইল; "দের্দ্রিউ" শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ "* দর্দ্রিয়া" হইতে পারে।

৪ অন্য রূপ—Naisi, Naoise, Naois, Naoisne, Naosnach, Naoisneach, Nathos ইত্যাদি। প্রাচীনতম রূপ—Noise.

৫ অন্য রূপ—Usna, Uisne, Uisneg, Uisneach, Uisneachan, Usnoth, Snitheachan, Sniothachan.

উস্‌নেখ্‌-পুত্র নোইশি অতি সুমধুরকণ্ঠে গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিয়া দোহনের কালে গাইয়ে অধিক দুধ দিত, সকল লোকে তাহার গানে অপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। উস্‌নেখ্‌-এর তিন পুত্র খুব শূর-বীর ছিল; এবং তিন ভাই যখন পিঠাপিঠি অস্ত্রধারণ করিয়া দাঁড়াইত, সমগ্র অল্‌স্‌টারের যোদ্ধারা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়া কিছু করিতে পারিত না। তিন ভাইয়ে ভালবাসা ছিল অসাধারণ। শিকারে তাহারা ছিল ডালকুত্তার মত ক্ষিপ্রগতি—দৌড়িয়া গিয়া হরিণ ধরিয়া বধ করিত।

নোইশি একা একা গান করিতেছে, এমন সময়ে দের্দ্রিউ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পরস্পরকে দেখিয়া ইহারা মুগ্ধ হইল। দের্দ্রিউ যে কে, তাহা নোইশি জানিত। সে দের্দ্রিউকে বলিল—"বৎসতরীর ন্যায় সুন্দরী কুমারী, তুমি নর-বৃষ অল্‌স্‌টার্‌-রাজের বাগদত্তা—তুমি এখানে কেন?" দের্দ্রিউ বলিল—"আমি রাজার রাণী হ'তে চাই না, তুমিই আমার স্বামী।" নোইশি কাথ্‌বাদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিল,—"সে হ'তে পারে না।" দের্দ্রিউ বলিল, "তাহ'লে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছ?" নোইশি বলিল—"হাঁ।" দের্দ্রিউ তখন নোইশির কাছে গিয়া তাহার দুইটী কান দুই হাতে ধরিয়া বলিল—"তোমার দুই কানের দিব্য, যদি তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে না যাও, তাহ'লে চিরকালের জন্য যেন লজ্জা আর অপমান তোমার নামের সঙ্গে জড়িত থাকে।" নোইশি তখন আর দের্দ্রিউর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল।

নোইশির দুই ভাই Andle আন্দ্‌লে* ও Ardan আর্দ্দান্‌ ভাইয়ের খোঁজে আসিয়া তাহাকে দের্দ্রিউর সঙ্গে দেখিল। নোইশি তাহাদের সব কথা বলিল—সে দের্দ্রিউকে বিবাহ করিবে। ভাইয়েরা বলিল, "ব্যাপার গুরুতর, অল্‌স্‌টারের লোকেদের হাতে তা হ'লে আমাদের বিপদ ঘ'ট্‌বে। কিন্তু তা ব'লে তুমি তো দের্দ্রিউকে ছেড়ে যেতে পারো না। তার চেয়ে চলো, আমরা চারজনে বরং অল্‌স্‌টার ছেড়ে অন্য দেশে পালাই।"

এইরূপে নোইশি দের্দ্রিউকে বিবাহ করিয়া দুই ভাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আয়র্লাণ্ডে গেল, কিন্তু কোন্‌খোবার রাজা গুপ্ত ভাবে তাহার হত্যা করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপন্ন হইয়া অবশেষে নোইশি তাহার অনুচর-বর্গকে Erin এরিন্‌ বা আয়র্লাণ্ডে রাখিয়া, Albion আল্‌বিয়ন্‌ বা স্কটলাণ্ডে চলিয়া গেল—সঙ্গে দের্দ্রিউ ও দুই ভাই। স্কটলাণ্ডে তাহারা একটী অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে লাগিল। একটী ছোট হ্রদের তীরে তাহারা গিয়া উঠিল। পাহাড়ের গায়ে বনে-জঙ্গলে এবং হ্রদের ও আশপাশের দ্বীপে শিকারী কুকুর ও বাজপাখী লইয়া তাহারা শিকার করিত, এবং শিকার-লব্ধ মাংসের দ্বারাই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের গায়ের অঙ্গ-বস্ত্র ছাড়া আশ্রয় ছিল না, এবং ঢাল ছাড়া অন্য শয্যা ছিল না। কিছু-কাল ধরিয়া গৃহ-হীন ও অগ্নিস্থান-হীন হইয়া তাহারা চারিজনে বনে পাহাড়ে ও সাগরতীরে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু তাহারা খুব আনন্দে দিন যাপন করিত, এবং সকলে একসঙ্গে থাকায় দুঃখকষ্টের কথা মোটেই তাহাদের মনে আসিত না। শেষে তাহারা বাসের জন্য একটী খুব সুন্দর ও নিরাপদ স্থান পাইল, সেখানে আহারের দ্রব্য মৎস্য ও হরিণ মাংস সংরক্ষণের ও রন্ধনের জন্য এবং দিবাযাপন ও নিদ্রার জন্য গাছের ডালের তৈয়ারী এবং পাতা ও ঘাসে ছাওয়া তিনটী ছোট ছোট কুটীর প্রস্তুত করিল। তাহাদের জীবন সুখের জীবন ছিল; দের্দ্রিউ ও নোইশি পরস্পরকে খুব ভালবাসিত; এবং নোইশি ও তাহার ভাইয়েরা সব কাজেই একমত ছিল।

কিন্তু তাহাদের এ সুখের জীবন বেশী দিন ধরিয়া চলিল না। নোইশিকে স্কটলাণ্ডের এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—স্কটলাণ্ডের লোকদের গোহরণ করায় তাহারা একযোগে তিন ভাইকে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করে। এই রাজার আশ্রয়ে কিছুকাল থাকিবার পরে, দের্দ্রিউকে দেখিয়া রাজা তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল, এবং নোইশি ও তাহার ভাইদের বধ করিতে নানা প্রকার প্রয়াস করিতে লাগিল। এদিকে আবার রাজার প্রজাদের সঙ্গেও শত্রুতা। স্ত্রী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত নোইশিকে গুপ্ত ভাবে পলাইয়া গিয়া সমুদ্রের মধ্যে একটী দ্বীপে আশ্রয় লইতে হইল। তাহাদের এই সব বিপদের সংবাদ

* অন্য রূপ—Ainle, Aille, Aillein, Aluinn, Althos.

স্কটলাণ্ড হইতে ক্রমে আয়র্লাণ্ডে গিয়া রাজা কোন্‌খোবারেরও কানে উঠিল।

রাজা কোন্‌খোবার কিন্তু দের্দ্রিউ ও নোইশির কথা ভুলেন নাই। দের্দ্রিউকে লইয়া নোইশি যে পলাইয়া গিয়াছে,—কিসে তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টিত ছিলেন। একদিন অল্‌স্‌টারের রাজধানী Emain এমাইন-এর গড়ে[৭] একটা খুব বড় ভোজ হইতেছিল। অনেক সামন্ত ও যোদ্ধা তাহাতে উপস্থিত ছিল। রাজা সকলকে বলিলেন—"দেখ, উস্‌নেখ্‌-এর পুত্রেরা বিদেশে কি রকম বিপদে র'য়েছে—কেবল একটা স্ত্রীলোকের জন্য। ওরা দেশে ফিরে আসুক না কেন?" রাজার এই কথা তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক রূপে নোইশি ও তাহার ভাইয়েদের কানে ক্রমে উঠিল। তাহারা কিন্তু কোন্‌খোবারকে জানিত। নোইশি বলিয়া পাঠাইল—তাহারা ফিরিয়া গেলে তাহাদের কোনও হানি ঘটিবে না এরূপ স্বীকৃতি চাই—এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়জন সামন্ত—Fergus ফের্‌গুস্‌, Conall কোনাল্‌, Cuchulainn কুখুলাইন[৮], Dubthach দুব্‌থাখ্‌ ও Cormac Condlongas কোর্‌মাক্‌ কোন্দ্‌-লোঙ্গাস্‌—ইঁহারা যদি কথা দেন, তবেই তাহারা ফিরিতে পারে।

রাজা কোন্‌খোবার তাহাতেই রাজী হইলেন। তাঁহার আহ্বান-বাণী লইয়া স্কটলাণ্ডে বৃদ্ধ ফের্‌গুস্‌ তাঁহার দুই পুত্র Illand Find ইল্লান্দ ফিন্দ্‌ বা সাদা ইল্লান্দ ও Buinne Borb বুইন্নে বোর্‌ব্‌ বা লাল বুইন্নেকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার একখানি ক্ষিপ্রগতি নৌকায় করিয়া সাগর পার হইয়া আয়র্লাণ্ড হইতে স্কটলাণ্ডে পঁহুছিলেন। দ্বীপের যে পাহাড়ের গায়ে অরণ্যে উস্‌নেখ্‌-পুত্রেরা বাস করিতেছিল, সেই পাহাড়ের নীচেই খুব প্রশস্ত সিকতাময় সাগরবেলায় তাঁহার নৌকা ভিড়িল। কূলে অবতরণ করিয়া ফের্‌গুস্‌ মৃগয়া-রত যোদ্ধার মতন খুব জোরে একটা হাঁক দিলেন। তাঁহার চীৎকারের শব্দ পাহাড়ের ওপারেও অনেক দূর পর্য্যন্ত শোনা গেল। সেই সময়ে তাহাদের কুটীরের সামনে একটি গাছের তলায় ঘাসের উপরে বসিয়া নোইশি ও দের্দ্রিউ পাশা খেলিতেছিল। নোইশি বলিল—"আমি যেন একজন আয়র্লাণ্ডের লোকের হাঁক শুনলুম।" কিন্তু দের্দ্রিউ যেন শুনিতে পায় নাই এমন ভাবে খেলিতে লাগিল।

ফের্‌গুস্‌ আবার হাঁক দেওয়ায় নোইশি পুনরায় শুনিতে পাইয়া বলিল—"নিশ্চয়ই একজন আইরীশ বীর ডাক দিচ্ছে।" দের্দ্রিউ কেবলমাত্র বলিল—"কোনও স্কট্‌-এর গলা নয় বটে।" ফের্‌গুস্‌ এইবার তৃতীয়বার ডাক দিলেন, তখন নোইশি তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, সে আর্‌দান্‌কে গিয়া ফের্‌গুস্‌কে কুটীরে লইয়া আসিতে বলিল। দের্দ্রিউ তখন নোইশিকে বলিল—"হায়, প্রথম আওয়াজ শুনেই আমি ফের্‌গুসের কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পেরেছিলুম।" সে নোইশিকে প্রথমেই একথা বলে নাই, কারণ মনে মনে তাহার এক আশঙ্কা জাগিতেছিল যে তাহাদিগকে শীঘ্রই আয়র্লাণ্ডে ফিরিতে হইবে, এবং সেখানে তাহার স্বামী ও দেবরদ্বয়ের নিদারুণ বিপদ ঘটিবে। সেই অজ্ঞাত ভাবী বিপদের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা তাহার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।

নোইশি ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় যত্নের সহিত ফের্‌গুসের অভ্যর্থনা করিল, এবং দেশের খবর জিজ্ঞাসা করিল।

"কোন্‌খোবার তোমাদের নিঃশঙ্কচিত্তে ফিরে আস্‌তে ব'ল্‌ছেন—আর তোমাদের নিরাপদে রাখ্‌বার জন্য দায়ী আমি, আর অমুক, আর অমুক।"

কিন্তু দের্দ্রিউ বলিল—"আমাদের যাবার দরকার কি? অল্‌স্‌টারে রাজা কোন্‌খোবারের চেয়েও কি এখানে আমরা বেশী সুখে নেই?" ফের্‌গুস্‌ উত্তর দিলেন—"মাতৃভূমি সব দেশের সেরা, মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশে কেউ স্বস্তিতে প্রাণ

---

৭ Emain বা Emain Macha এমাইন্‌-মাখা—উত্তর-পশ্চিম আয়র্লাণ্ডে Armagh আর্মা নগরের দুই মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত স্থান—ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন Nabhan বা Navan Fort নামে পরিচিত।

৮ Cuchulaind বা Cuchulainn কুখুলাইন্‌—কোন্‌খোবারের ভাগিনেয়, প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের সর্ব্ববিখ্যাত বীর। আমাদের অর্জ্জুন, গ্রীসের আখিলেউস্‌ বা আকিলীস, পারস্যের রুস্তম্‌, টিউটনীয়দের Sigurd সিগুর্ড, বা য়িহুদীদের রাজা দাউদ বা দাবীদ (David)-এর ন্যায় আয়র্লাণ্ডের National Hero, অর্থাৎ জাতীয় শৌর্য্যের আদর্শস্বরূপ। কুখুলাইনের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, শত্রুকন্যা Emer এমের-এর সহিত প্রণয় ও বিবাহ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজানিত ভাবে নিজ পুত্রকে বধ প্রভৃতি বিষয়ক গল্পগুলি ঐ যুগের কথাবলীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থান পাইয়াছে।

ধারণ ক'রতে পারে না।" নোইশিও বলিল—"সত্য বটে, আর যদিও আমরা এই স্কটলাণ্ডে আয়র্লাণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী আনন্দে আছি, তা হ'লেও স্বীকার ক'রবো যে আয়র্লাণ্ডকেই ভালবাসি। আমরা ফের্গুসের কথার উপর নির্ভর ক'রে যাবো।"

তারপর নোইশি দের্দ্রিউকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। অবশেষে নোইশি ও দের্দ্রিউ এবং নোইশির ভাই দুইজন ফের্গুসের নৌকায় উঠিয়া আয়র্লাণ্ডের জন্য যাত্রা করিল।

যখন নৌকা অনুকূল বাতাসে পালভরে পশ্চিমে আয়র্লাণ্ডের দিকে যাইতেছিল, তখন দের্দ্রিউ সজল নয়নে পূর্ব্বে স্কটলাণ্ডের দিকে তাকাইয়া গান গাহিতে লাগিল:—

"সূর্য্যদেবের উচ্চ প্রাসাদস্বরূপ, হে সুন্দর Alba আল্‌বা, বিদায়; হে পর্ব্বত, অধিত্যকা, গিরিদুর্গ, বিদায়; বিদায়, সুইনির পুরী Dun-Suibline; আমার প্রভু আর থাক্‌তে পারছেন না, যখন আমার হৃদয়ের স্বামী আমাকে সঙ্গে ক'রে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন আমিও আর দেরী ক'রতে পারি না॥

"Glen Masan গ্লেন্ মাসান, গ্লেন্ মাসান,—যেখানে হরিণেরা স্বাধীন ভাবে ছুটাছুটি করে, সেখানে আমার স্বামী আমার সঙ্গে মৃগমাংস আহার ক'রতেন, যেথায় ঝড়ের বাতাস বইলে তোমার জলের কোলে দোল খেয়ে আমার প্রভু ঘুমাতেন,—বিদায়, গ্লেন্ মাসান্

"Glen da Ruadh গ্লেন্ দা-রুআ, গ্লেন্ দা-রুআ—যেখানে দুপুরে বুলবুলীর নিদ্রার সময়ে ভূর্জ্জবৃক্ষ 'মধুশিশির'-এর অশ্রুবর্ষণ করে, যেখানে আমার প্রিয়তম উঁচু hazel হেজেল-গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে কোকিলের কুহুধ্বান শোনাতে আমার নিয়ে যেতেন,—গ্লেন্ দা-রুআ, বিদায়॥

"Glen Urchy গ্লেন উর্‌খি, গ্লেন উর্‌খি—যেখানে উচ্চস্বরে ও বহুক্ষণ ধ'রে আমার প্রিয়তম সঙ্গীতরবে বনকে যেন জাগিয়ে তুল্‌তেন;—আর তখন প্রতিধ্বনি—পাহাড়ের ছেলে (mac an-t-alla)—তার গিরি-কন্দরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সুমধুর হাসির সঙ্গে উত্তর দিত,—গ্লেন উর্‌খি, বিদায়॥

"Glen Eitche গ্লেন্ এইৎথে, গ্লেন্ এইৎথে! যেখানে ফোঁটা-কাটা হরিণেরা বেড়ায়, যেখানে যে কুঁড়েটীকে আমি প্রথম আমার নিজের ঘর ব'লতুম সেটীকে রেখে যাচ্ছি, যেখানে আমার ও আমার প্রিয়তমের সঙ্গে একত্রে বাস ক'রতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে সূর্য্যদেব যেন আপনারও ঘর ক'রে নিয়েছিলেন,—বিদায়, গ্লেন্ এইৎথে॥

"Droighin দ্রোইয়িন্-এর সাগর, বিদায়: বিদায়, নীল সিন্ধু-তরঙ্গ, যে তরঙ্গ বেলার উপর ঝলমলে' আলোয় ভেঙে প'ড়্‌ত; বিদায় Dun-Fiagh দুন্-ফিয়াগ্! কারণ আমার প্রিয়তম থাক্‌ছেন না, আর যখন আমার প্রেমাস্পদ আমায় দূরে ডাক্‌ছেন তখন আমিও দেরী ক'রতে পারি না॥

"হে পূর্ব্বদিকের ভূমি, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; ব্যথিত হৃদয়ে আমি তোমার কূল ছেড়ে যাচ্ছি; তোমার মাঠ সুন্দর ও ফুলে পরিপূর্ণ; তোমার পাহাড়গুলি সবুজ বনে ঢাকা হ'য়ে উঁচুতে উঠেছে; তার সমস্ত মনোরম জিনিসের সঙ্গে ঐ পূর্ব্বদিকের দেশ স্কটলাণ্ড আমার প্রিয়॥

"আমার নোইশির আদেশ না হ'লে আমি তোমায় ছেড়ে যেতুম না; সমুদ্রবেলার কাছে আমাদের গৃহটী আমার প্রিয়, সমুদ্রবেলার জল ও চক্‌চকে' বালি আমার প্রিয়; আমার প্রিয়তমের আদেশ না হ'লে আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যেতুম না॥"[১]

ফের্গুস আয়র্লাণ্ডের Craobh Ruadh, অর্থাৎ Red Branch বা "রক্ত শাখা" নামে বিখ্যাত যোদ্ধ্-গোষ্ঠির অন্তর্গত ছিলেন। ঐ দলস্থ যোদ্ধাদের মধ্যে এরূপ নিয়ম ছিল যে, একজন অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে সে নিমন্ত্রণ কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যাইত না। উস্‌নেথ্-এর পুত্রদিগকে লইয়া ফের্গুস্ আয়র্লাণ্ডে পঁহুছিবা-মাত্র রাজা কোন্‌খোবারের ষড়যন্ত্র-মত Borrach বোর্‌রাখ্ নামে ঐ দলের একজন যোদ্ধা তাঁহাকে তিনদিন ব্যাপী একটী বৃহৎ ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। ফের্গুস্ উস্‌নেথ্-পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার দলের নিয়ম পালন করিতেই হইবে। তিনি নোইশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করা যায়, এবং নোইশি তাঁহাকে বলিল যে তাঁহার ঐ নিয়ম পালন করাই উচিত।

তখন ফের্গুস্, নোইশি দের্দ্রিউ ও নোইশির ভাইদিগকে নিজের পুত্রদ্বয়ের হাতে (ইল্লান্দ্ ও বুইন্নের হাতে) সমর্পণ করিয়া উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, তিনি সঙ্গে না থাকিলে হয় তো নোইশি প্রভৃতির সমূহ বিপদ ঘটিবে।

দের্দ্রিউ পতিকে বলিল—"যখন ভোজের জন্য ফের্গুস্ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, তখন ব্যাপার ভাল বোধ হ'চ্ছে না।" ফের্গুস্-এর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, এমাইন্-এর রাজা

[১] এই কবিতাটী আখ্যায়িকার একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ হইতে গৃহীত।

কোন্‌খোবারের বাড়ীর দিকে সোজাসুজি না যাইয়া, উপকূলের কাছে একটী দ্বীপে অবস্থান করিবার জন্য স্বামীর কাছে সে প্রার্থনা করিল। তাহার মনে একটা ভীষণ আশঙ্কার ভাব জাগিতেছিল, এবং আশু বিপৎপাতের অনেক অশুভ লক্ষণ সে দেখিতেছিল—তাহার বোধ হইতেছিল যেন তাহার সামনে একটা রক্তের মেঘ ভাসিতেছে এবং সেটা এমাইনে রাজার বাড়ীর উপরে ঘুরিতেছে।

ফের্‌গুস্‌-এর পুত্রেরা কিন্তু বলিল যে একেবারে রাজার কাছে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার কথা আছে; এবং তা' ছাড়া যখন তাহাদের পিতা তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন ভয় কি? তবুও দের্দ্রিউ বলিল—"বেশ, তবে আমরা Dun-Dalgan ডুন-দাল্‌গান্‌-এ কুখুলাইনের কাছে প্রথমে যাই, তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এমাইন্‌-গড়ে যাবো।" কিন্তু নির্ভয়-চেতা নোইশি বলিল—"অপরের সাহায্য ভিক্ষা ক'র্‌তে তার দ্বারে যাওয়ার আমাদের আবশ্যক নেই।"

এইরূপে ফের্‌গুস্‌-এর পুত্রদের সঙ্গে তাহারা এমাইনে গেল। দের্দ্রিউর চক্ষে দুর্নিমিত্তগুলি ক্রমশঃ যেন বাড়িতেছে বোধ হইল। এমাইনে পহুঁছিবার পরে থাকিবার জন্য তাহাদের বড় মাঝের কামরাযুক্ত একটী বাড়ী দেওয়া হইল। কিন্তু রাজা কোন্‌খোবারের হুকুম-মত তাহাদিগকে রাজার আবাস-বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল না।

তাহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কোন্‌খোবার নিজ ভৃত্য-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কেউ গিয়ে দেখে এসো তো, দের্দ্রিউ এখনও পূর্ব্বের মতই সুন্দরী আছে কিনা।" তখন দের্দ্রিউর ধাত্রী লেবোর্‌খাম্‌ এই কাজের ভার লইয়া নোইশি ও দের্দ্রিউরা যে বাড়ীতে ছিল সেখানে গেল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই দের্দ্রিউ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল ও অশ্রুজলে তাহার বক্ষের বসন সিক্ত করিয়া দিল। লেবোর্‌খাম্‌ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"বাছা! কোন্‌খোবারের হাতে পড়া তোমাদের পক্ষে বিপদের কথা, তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চ'ল্‌ছে। বেশ ভাল ক'রে জানালা দরজা বন্ধ ক'রে নিজেরা সচেত হ'য়ে থাকো। আমার মনে আশঙ্কা হ'চ্ছে, বুঝি বা আজকের এই রাত্রি এমাইন্‌-গড়ের পক্ষে শেষ সুখের ও গৌরবের রাত্রি।" তাহার পরে লেবোর্‌খাম্‌ রাজার নিকটে আসিয়া বলিল—"মহারাজ! একটা সুসংবাদ এনেছি—তোমার তিনজন সাহসী যোদ্ধা ভাল মনে তোমার কাছে আবার ফিরে এসেছে। আর একটা খবর ভাল নয়—যে সৌন্দর্য্য নিয়ে আয়র্লাণ্ড থেকে দের্দ্রিউ চ'লে গিয়েছিল, তার সেই রূপ আর তেমন নেই।" রাজাকে ভুলাইবার জন্য লেবোর্‌খাম্‌ এ কথা বলিল, কারণ সত্যসত্যই আয়র্লাণ্ড হইতে যাইবার কালে দের্দ্রিউ যেরূপ সুন্দরী ছিল, এখন সে তদপেক্ষা আরও বেশী সুন্দরী হইয়াছিল।

রাজার ক্রোধ ও ঔৎসুক্য কিছু কালের জন্য প্রশমিত রহিল। কিন্তু ধাত্রীর কথায় অবিশ্বাস হওয়ায় তিনি আর একটী লোককে গোপনে নোইশি ও দের্দ্রিউর সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। এই লোকটা নোইশির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। সে নোইশির বাসাবাটীর দেওয়ালের পাশ দিয়া গুড়ি মারিয়া একটা জানালার ধারে গেল; জানালাটা খোলা থাকায় সে উঁকি দিয়া দেখিল যে ঘরের ভিতরে নোইশি ও দের্দ্রিউ পাশা খেলিতেছে। দের্দ্রিউ-এর চোখ কিন্তু পাখীর চোখের মতন চট্‌ করিয়া তাহাকে দেখিয়া ফেলিল; তখন সে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিল; তখন নোইশিও স্ত্রীর চক্ষের অনুসারে মুখ ফিরাইতেই তাহাকে দেখিতে পাইল। নোইশি ক্ষিপ্র হস্তে একখানি খেলার পাশা তুলিয়া লইয়া সেই চরের মুখ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। পাশাখানি তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে লাগায় সে চোখটা একেবারে কাণা হইয়া গেল। আহত গুপ্তচর তখন দৌড়াইয়া রাজার কাছে গেল, এবং তাহাকে বলিল যে যদি স্ত্রী দের্দ্রিউ ছাড়া নোইশির আর কিছুও না থাকে, তথাপি সে জগতে সর্ব্বা-পেক্ষা ভাগ্যবান্‌ পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কোন্‌খোবার তখন উস্‌নেখ্‌-পুত্রদের বিনাশ করিয়া দের্দ্রিউকে বন্দিনী করিয়া আনিবার জন্য সৈন্যসজ্জা করিয়া চলিলেন। নোইশির বাড়ী ঘেরাও করিলেন বটে, কিন্তু নোইশি, আন্দ্‌লে ও আর্দান এবং ফের্‌গুস্‌-এর পুত্রদ্বয় ইল্লান্দ ও বুইয়ের ভয়ে কেহ ভিতরে বা নিকটে আসিতে সাহস করিল না। তখন রাজার দলের লোকেরা বাড়ীটাতে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য তাহার কাঠের ছাতের উপরে দূর হইতে জলন্ত মশাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল

দেখিয়া দের্দ্রিউ বলিল—"ফের্গুস্ আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে।" তাহাতে ফেরগুস্-এর দ্বিতীয় পুত্র বুইন্নে বলিল—"না, ভয় নেই, আমরা বিশ্বাসঘাতক নই।" এই বলিয়া, তলোয়ার হাতে সে গৃহদ্বারে গেল, এবং সেখানে কোন্‌খোবারের যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহাদের আক্রমণ করিয়া কতকগুলাকে বধ করিল, এবং অবশিষ্টকে বিতাড়িত করিয়া দিল।[১০] তখন কোন্‌খোবার বুইন্নেকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"কি পেলে তুমি নোইশিকে ছেড়ে আমার দলে আসবে?" "তুমি কি দেবে, রাজা?"—কোন্‌খোবার উত্তর দিলেন—"আমার অনুগ্রহ সমেত একটা খুব বড় জায়গীর।" "ভাল, তাই কবুল ক'রলুম" বলিয়া বুইন্নে, উস্‌নেথ্-এর পুত্রদের শত্রুমধ্যে রাখিয়া, কোন্‌খোবারের গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু এ বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাহার কোনও লাভ হইল না; কারণ দেবতাদের কোপে রাজ-দত্ত তাহার বিশাল জায়গীর বালি ও জলে পূর্ণ হইয়া মরুতে পরিণত হইল,—এখনও সেই জমি সেইরূপ পতিত অবস্থায় আছে। বুইন্নের বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া দের্দ্রিউ বলিল,—"যেমন বাপ, তেমনি ছেলে।"

কিন্তু ইল্লান্দ্ একটা মশাল লইয়া তলওয়ার হাতে বাড়ীর বাহিরে আসিল, এবং চাষার ছেলে যেমন শস্য হইতে পাখী তাড়াইয়া দেয় সেইরূপ বার বার রাজার সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিল। কোন্‌খোবার তাহাকেও লোভ দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইল্লান্দ্ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে না চাওয়ায় রাজা তাহার বিরুদ্ধে নিজের এক পুত্র Fiachra ফিয়াখ্‌রাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইল্লান্দ্ তরবারির আঘাতে রাজপুত্রকে ভূপতিত করিল। এখন ফিয়াখ্‌রা তাহার পিতা রাজা কোন্‌খোবারের বর্ম্ম পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। তাহার পিতার এক আশ্চর্য্য ঢাল ছিল, ঐ ঢালের নাম "সিন্ধু"; যাহার নিকট ঐ ঢাল থাকিত, তাহার কোনও বিপদ হইলে ঢাল হইতে সাগর-গর্জ্জনের মত ধ্বনি বাহির হইত। ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া পড়ায় সেই ঢাল হইতে গুরু-গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতে রাজপুত্রের বিপদ হইয়াছে বুঝিয়া চতুর্দ্দিক হইতে যোদ্ধারা দৌড়াইয়া আসিল। এই সময়ে নোইশির পালক-পিতা Conall কোনাল্ এমাইন্-গড়ে আসিয়াছিলেন—তিনি উস্‌নেথ্-পুত্রদের আগমন ও রাজা কর্ত্তৃক তাহাদের আক্রমণ প্রভৃতি ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। রাজপুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিও অস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং অস্ফুট আলোকে গোলমালের মধ্যে দেখিলেন যে, রাজপুত্র ফিয়াখ্‌রা আহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে, ও তাহার পার্শ্বে একজন বীর তরবারী দ্বারা তাহাকে আবার আঘাত করিতে যাইতেছে। তখন কোনাল্ কিছু না বলিয়া পিছন দিক হইতে তাঁহার চওড়া-ফলা বর্শাখানা ইল্লান্দ্-এর গায়ে বিঁধাইয়া দিলেন। মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া ইল্লান্দ্ ফিরিয়া হন্তার দিকে চাহিয়া বলিল—"কে আমায় অস্ত্র প্রহার ক'রলে?" তিনি উত্তর দিলেন—"আমি কোনাল্; তুমিই বা কে?" ইল্লান্দ্ বলিল—"আমি ইল্লান্দ্, ফের্গুস্-এর পুত্র; তুমি আমাকে এভাবে আহত ক'রে ভারী অন্যায় ক'রলে আমি পিতার হ'য়ে উস্‌নেথ্-এর পুত্রদের রক্ষা ক'রছিলুম।" তখন কোনাল্ না বুঝিয়া এইরূপে ইল্লান্দ্‌কে আহত করায় অত্যন্ত অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, এবং কোন্‌খোবারের ক্রূরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"তার দুষ্কৃতির এই প্রতিশোধ।" এই বলিয়াই তিনি আহত ভূপতিত রাজপুত্রের শিরশ্ছেদ করিলেন, এবং দুঃখে ক্ষোভে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইল্লান্দ্ মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া অতি কষ্টে নোইশি ও তাহার ভাইয়েদের কাছে গেল, এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তিন ভাই তখন তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারী ও ভল্ল ও বড় বড় ঢাল লইয়া লড়াই করিতে বাহির হইল। বিস্তর লোক তাহাদের হাতে মরিল—"সমুদ্রের বালি, মাঠের শিশির-বিন্দু, বনের পাতা এবং আকাশের নক্ষত্র গণনা করা যায়, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাইয়ের হাতে নিহত লোকের কাটা মাথা হাত পায়ের সংখ্যা নাই।"[১১] কিন্তু অসম্ভব বীরত্ব দেখাইয়াও তাহারা রাজার সৈন্যকে বিদূরিত করিতে পারিল না। নোইশি পরিশ্রান্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া আসিল; বীরপত্নী দের্দ্রিউ পতিকে উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ভয় কি? আমরা ঠিক রক্ষা পাবো; বীর তুমি, বীরের মত যুদ্ধ কর।"

---

১০ ইলিয়াড, মহাভারত ও শাহ্‌নামার মতন প্রাচীন আইরীশ বীরগাথায় একজন অভিজাত যোদ্ধা বা রথী একা সর্ব্বত্রই সমগ্র সৈন্যদলকে পরাভূত করিতেছে দেখা যায়।

১১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের আইরীশ সাহিত্যে এইরূপ অত্যুক্তি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়।

অনেক যুদ্ধের পরে অবশেষে তিন ভাই তাহাদের ঢালের দ্বারা একটা আবরণ প্রস্তুত করিল, এবং নিজেদের মধ্যে দের্দ্রিউকে রাখিয়া রাজ-সৈন্য ভেদ করিয়া একসঙ্গে তিন শ্যেন পক্ষীর মত তাহারা যাইতে লাগিল,—কোন্‌খোবারের যোদ্ধারা তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা দের্দ্রিউকে লইয়া নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে একটা নদী পড়ায় তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজার পুরোহিত কাথ্‌বাদ্‌ রাজার বিপদ আশঙ্কা করিয়া যাদুবিদ্যার প্রভাবে নদীর জল বাড়াইয়া তুলিলেন, কিন্তু নোইশি ও তাহার দুই ভাই দের্দ্রিউকে কাঁধে করিয়া লইয়া পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাথ্‌বাদের মন্ত্র-প্রভাবে জল যেন আঠার মতন তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রহিল, তাহাদের হাত অবশ হইয়া গেল, ও আর তাহারা অস্ত্র চালাইতে বা অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন অনেক রাজসৈন্য এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এবং বন্দী করিয়া রাজার নিকটে আনিল।[১২]

কোন্‌খোবার কাথ্‌বাদের নিকট প্রতিশ্রুত থাকার দরুন স্বহস্তে উস্‌নেখ্‌-পুত্রদিগকে হত্যা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন—"আমার হ'য়ে কে উস্‌নেখ্‌-এর ছেলেদের বধ ক'র্‌বে?" অল্‌স্টার-বাসী এমন কেহই ছিল না যে এ বিষয়ে কোন্‌খোবারের কথা শুনে। তখন Durthacht দুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র Eogan এওগান (বা এওআন্‌) এই কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইল—এই লোকটা কোন্‌-খোবারের এক সামন্ত রাজা, এবং নোইশির প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।

ভাই তিন জনের মধ্যে তখন কে আগে প্রাণ দিবে তাহা লইয়া বিসংবাদ আরম্ভ হইল। আরদান্‌ বলিল—"আমি সকলের ছোট, আগে আমিই মরি।" আন্দ্‌লে বলিল—"আমি আর্‌দানের আগে হ'য়েছি, আমারই আগে যাওয়া উচিত।" নোইশি শেষে বলিল—"এওগান্‌ আমার তরবারী খানা নিক্‌, এই তরবারী দেব-দত্ত অস্ত্র, এখানির মত বড় আর তীক্ষ্ণ তরবারী আর কারো নাই; এই তরবারীর এক কোপে আমাদের তিন জনের মাথা একসঙ্গে কেটে ফেলুক্‌, তা হ'লে কেউ কাকেও ম'র্‌তে দেখ্‌বো না।" মোটা একটা গাছের গুঁড়ির উপরে তিন ভাই পাশাপাশি মাথা রাখিল, এবং এওগান্‌ এক কোপে তিনজনের শিরশ্ছেদ করিল; সমস্ত ব্যাপার দের্দ্রিউর সমক্ষে ঘটিল।

দের্দ্রিউ পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল; তাহার পরে জ্ঞানহারার মত বিলাপ করিতে লাগিল। যখন তাহার স্বামী ও দেবরদিগকে কবর দেওয়া হইতেছিল, তখন সে এইরূপে শোক করিতে লাগিল—

"পর্ব্বতের সিংহেরা চ'লে গিয়েছে, হায়, কেবল একা আমাকেই রেখে গিয়েছে। কবর খুব গভীর আর চওড়া ক'রে খোঁড়ো, আমি বাঁচ্‌তে পারি না, আমি ম'র্‌তে চাই॥

"বনের বাজ পাখীরা উড়ে গিয়েছে, কেবল আমিই একলা প'ড়ে আছি: কবর চওড়া আর গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমাদের পাশাপাশি ঘুমাতে দাও॥

"পাহাড়ের ড্রাগনেরা (মহানাগেরা) ঘুমাচ্ছে, আমার রোদন সত্ত্বেও তারা আর জাগ্‌বে না। কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রাখো, আমাকে আমার প্রভুর দেহের উপর রেখো॥

"আমার বীরদের বল্লম আর উজ্জ্বল ঢালগুলি তাদের পাশে পাশে রেখে দাও; হায়, কতদিন এই ঢালের উপরে তিন জনে আমায় বহন ক'রেছে॥

"নীচু কবরের মধ্যে প্রত্যেকের মাথার নীচে নীল তলওয়ার-গুলি রাখো; হায়, তিন উদার বীর আমার রক্ষার্থ কতবার না ঐ নীল তরবারী লাল রক্তে রঞ্জিত ক'রেছে!

"তাদের শিকারী কুকুরের গলা-বন্ধনী পায়ের কাছে রেখে দাও; ঐ কুকুরগুলি কতবার না আমার জন্য বড় লাল হরিণ শিকার ক'রেছে!

"আহা! আমার প্রভুর গান বাজন্ত ভেরীর মত মধুর শুনাত; তাঁর গভীর স্বর আমাদের কুটীরের চারিদিকে বাজন্ত ভেরীর মত ভেসে বেড়াত!

---

১২ উপরে লিপিবদ্ধ ব্যাপারগুলি এই উপাখ্যানের অর্ব্বাচীন রূপ হইতে গৃহীত; প্রাচীনতম রূপে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে একটু অন্য ধরণের কথা আছে। সপরিজন নোইশি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটা বাটীতে অবস্থান করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করা হয়—ফের্‌গুস্‌-এর এক পুত্র তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত বা নিহত হয়। পরে নোইশির ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য পরিজনগণকে সপরিবারে বধ করা হয়, এবং দের্দ্রিউকে রাজার নিকটে বন্দিনী করিয়া আনা হয়। যে ব্যক্তি নোইশিকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করে তাহার নাম Eogan Mac Durthacht দুর্‌থাখ্‌ৎ-এর পুত্র এওগান (বা এওআন)—কোন্‌খোবারের অনুগত একজন সামন্ত রাজা। পরবর্ত্তী বর্ণনা আরও বিস্তৃত, কিন্তু মূল আখ্যানটুকু লইয়া প্রাচীনতম রূপের সহিত বিরোধ নাই।

Derdriu

সতী দেদ্রিউ

[প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের সীতা]

John Duncan, A.R.S.A. কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

[চিত্রদ্বয় J. C. Leyendecker কর্তৃক অঙ্কিত

Rigain Medb (Ben-Rian Meyv) = রাজ্ঞী মেদ্‌ব (রাণী মেয়্‌ভ্‌)

[প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের বীরাঙ্গনা]
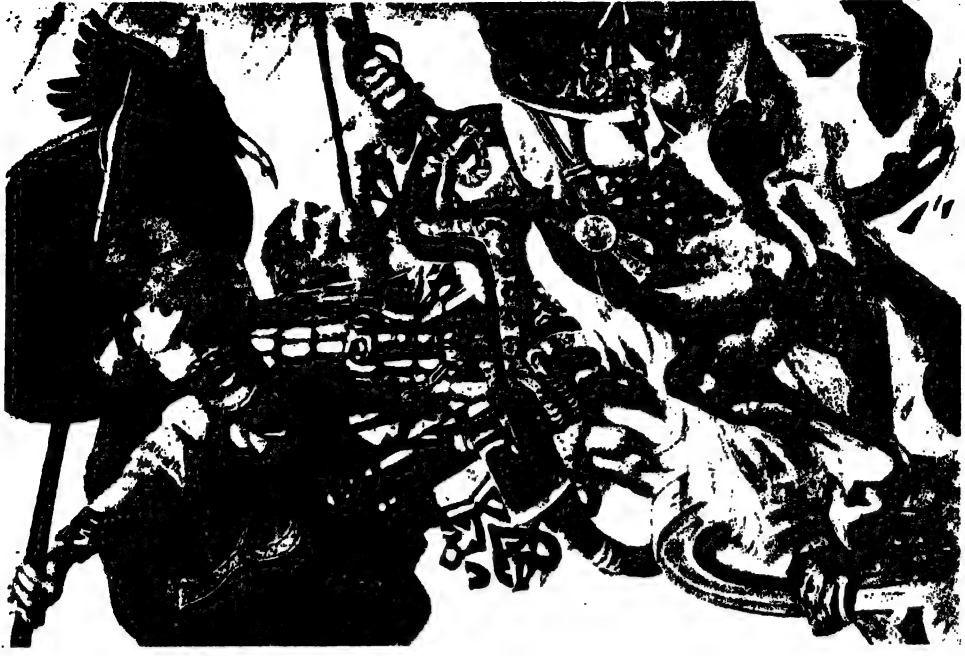
Cuchulainn ocus Arae = রথী কুখুলাইন্‌ ও সারথি

[প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের অর্জ্জুন]

"যখন তিন জনে একসঙ্গে গান ক'র্‌ত, তখন তাদের উচ্চস্বর আমাদের মাথার উপরে স্তব্ধ চাতককে অতিক্রম ক'র্‌ত; আহা, তখন প্রতিধ্বনির শব্দ আমাদের সবুজ সুন্দর কুটীরের চারিদিকে কেমন শুনাত!

"প্রতিধ্বনি, এখন থেকে সকালে সন্ধ্যায় ঘুমাও; চাতক, তুমি একলাই এখন আকাশকে মোহিত কর; আর্‌দান্‌-এর ওষ্ঠে আর শ্বাস নাই, মৃত্যুতে নোইশির জীভ শীতল হ'য়ে গিয়েছে॥

"হরিণ, উপত্যকায় আর পাহাড়ে আনন্দে বেড়াও; সামন্‌ মাছ, হ্রদ থেকে ঝরণায় লাফ দাও; বক, খোলা বাতাসে রোদ পোহাও; উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা আর তোমাদের কোনও হানি ক'র্‌বে না॥

"রণস্তম্ভের শাসক, আর তোমরা এরিন্‌-এর আশ্রয়-স্থল নও; যুদ্ধের দণ্ড সরল রাখা আর তোমাদের ভাগ্যে নাই॥"

"হায় হায়, মিথ্যা ও অন্যায়ের দ্বারা উস্‌নেথ্‌-এর বংশের নাশ হ'ল! বোর্‌রাগ্‌-এর ভোজে ও কোন্‌খোবারের অর্থে ক্রীত ও বিক্রীত হ'ল!

"তার ছাত আর পাঁচীলের সঙ্গে এমাইন্‌-এর ঘর নিপাত যাক্‌! "রক্তশাখা"র গৃহ ও অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস হোক্‌। বিশ্বাসঘাতক পাতকী কোন্‌খোবারের বংশে দশগুণ বিপদ ও কলঙ্ক-কালিমা পড়ুক্‌!

"কবর প্রশস্ত ও গভীর ক'রে খোঁড়ো, আমি আর বাঁচি না, আনন্দের সঙ্গে আমি ম'র্‌বো; কবর খুঁড়ে ঠিক ক'রে রেখে দাও, আমাকে আমার প্রভুর পাশে রেখো॥"১৩

কোন্‌খোবার প্রায় এক বৎসরকাল দের্দ্রিউকে বন্দিনী করিয়া রাখে; কিন্তু দের্দ্রিউ এই সময় কখনও মাথা তুলিয়া চাহে নাই বা হাসে নাই; নীরব শোকার্ত্ত হৃদয়ে ভূমির উপরে বসিয়া থাকিত—আহার করিত না, নিদ্রা যাইত না, এবং জানুদ্বয়ের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া চাহিত না। কোন্‌খোবার দের্দ্রিউর মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টিত ছিল, গায়ক বাদক প্রভৃতি পাঠাইয়া তাহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিত। দের্দ্রিউ এইভাবে শোক করিত—

"তোমাদের চোখে বীর যোদ্ধাসকল সুন্দর—
যারা লড়াই থেকে বিজেতার দর্পে এমাইন-গড়ে ফিরে আসে;
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঘরে ফির্‌ত,
উস্‌নেথ্‌-এর তিন বীর পুত্র॥

"মধুবান্‌ নোইশি কি সুন্দর ছিল!
আগুনে তপ্ত-করা জলে আমি তাকে স্নান করাতুম।
আর্‌দান্‌ সুন্দর একটী গোরু বা শূওর নিয়ে আস্‌ত—
আন্দ্‌লে তার বৃষ-স্কন্ধে আগুনের জন্য কাঠ আন্‌ত॥

"যতই সুলাবান্‌ মাধ্বীক সুধা হোক্‌ না কেন—
যা নেস্‌-রাজার মহান্‌ পুত্র কোন্‌খোবার পান করেন,—
যে কাল আর ফিরে আস্‌ছে না, সেই অতীত কালে
তার চেয়েও মিষ্ট আর প্রচুর পানীয় ও ভোজন আমি পেয়েছি॥

"যখন আর্য্য নোইশি অরণ্যের মধ্যে
আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশে যোদ্ধাদের দ্বারায় আনা কাঠের স্তূপ সাজাতেন—
তখন অন্য সব খাদ্যের চেয়ে আমার কাছে স্বাদুতর লাগ্‌ত
উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রদের দ্বারা মৃগয়ার লব্ধ পশুমাংস॥

"প্রতি মাস অতি সুমিষ্ট সব ধ্বনি বাহির হয়, সত্য—
তোমাদের মধ্যে যে-সব বাঁশী আর রণভেরী বাজানো হয়, সে-সব থেকে;
কিন্তু আমি সত্য জেনে ব'ল্‌ছি, আজ তোমাদের আমার বলা উচিত—
আমি যে এ-সবের চেয়েও মিষ্ট সঙ্গীত শুনেছি॥

"রাজা কোন্‌খোবারের সভায়
বাদকেরা যে বাঁশী আর ভেরী বাজায়, তা মিষ্ট;
কিন্তু আমি আরও আনন্দ পেয়েছি—
উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রেরা যে বিশ্ব-বিশ্রুত লোক-মুগ্ধকারী গান গাইত, তা শুনে॥

"সাগর-কল্লোলের সঙ্গে তুলনীয় ছিল নোইশির কণ্ঠস্বর;
এমন সুন্দর সঙ্গীত ছিল তার কণ্ঠে, কেউ শুনে কখনও শ্রান্ত হ'ত না।
আর কি মিষ্ট সু-উচ্চ ছিল আর্‌দানের কণ্ঠ!
আন্দ্‌লের মধ্যম সুন্দর কণ্ঠ আমাদের গৃহে আমি শুন্‌তুম॥

"নোইশিকে সমাধির মধ্যে প্রোথিত করা হ'য়েছে;
কি দুঃখময় রক্ষার প্রতিশ্রুতিই না আমার নোইশি পেয়েছিল!
তাদের ধরণেই এই সব লোকে তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছে—
তারা তাকে দিয়েছে বিষ-মিশানো পানীয়, যা খেয়ে তার মৃত্যু হ'ল॥

"হৃদয়ের ধন আমার! সুন্দর আমার! ওগো, তার রূপ যে সকলকে মোহিত ক'র্‌ত!
সুন্দর পুরুষ! ওগো সবাইয়ের মন-টানা ফুল আমার!
ওগো, এই যে আমার চরম দুঃখ—
যে উস্‌নেথ্‌-এর পুত্রদের আশায় আর আমায় ব'সে থাক্‌তে হবে না॥

"প্রিয়তম! ওগো সত্যাত্মা, ওগো দৃঢ়চিত্ত,
প্রিয়তম! ওগো শূর আমার, ওগো ধীর আমার!
আয়র্লাণ্ডের বনে বনে ঘুরে
তোমার সঙ্গে রাত্রের বিশ্রাম কি মধুরই না হ'ত!

১৩ এই কবিতাটী একটী অর্বাচীন আইরীশ রূপ হইতে—ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গালা।

"নীলনয়ন প্রিয়তম! একজনমাত্র নারীর বল্লভ তুমি ছিলে,—
কিন্তু শত্রুর কাছে ছিলে অপরাজেয়।
সারা বন ঘুরে, আমরা আমাদের কি সুন্দর মিলন-স্থানে পৌঁছুতুম!
প্রিয়তম, তোমার মিষ্ট কণ্ঠ-স্বর সমস্ত কৃষ্ণ অরণ্যকে ভ'রে দিত॥

"আর আমি ঘুমাই না গো —
আর আমার হাতের আঙুলের নখ লাল রঙে রঙাই না।
আমার প্রাণে আর আনন্দ নেই গো,
ওগো উস্‌নেখ্-এর পুত্রেরা আর যে ফিরে আস্‌বে না॥

"আমি ঘুমাই না—
আধেক রাত আমি বিছানায় ছটফট্ করি।
লোকের ভীড়ের আশে-পাশে আমার প্রাণ কেঁদে' কেঁদে ফেরে।
আমি খাই না, হাসি না॥

"আজ আমার এক মুহূর্ত্তও আনন্দের নয়—
এমাইন্-গড়ের জন-সভার মাঝে।
আমার তরে শান্তি নেই,—আনন্দ নেই, বিশ্রাম নেই:
বড় বাড়ীতে আরাম নেই, সুন্দর অলঙ্কারও চাই না॥

"তোমাদের চোখে বীর-যোদ্ধাসকল সুন্দর,
যারা লড়াই ক'রে বিজেতার দর্পে এমাইন্-গড়ে ফিরে আসে।
কিন্তু এদের চেয়েও বেশী শৌর্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঘরে ফির্‌ত—
উস্‌নেখ্-এর তিন বীর পুত্র॥" [১৪]

এইরূপ শোক ও বিলাপের মধ্যে দের্দ্রিউকে থাকিতে দেখিয়া কোন্‌খোবার বিরক্ত হইয়া দের্দ্রিউর আরও লাঞ্ছনা করিবার জন্য তাহার [illegible]-হন্তা এওগান্-এর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে চাহিল। কারণ দের্দ্রিউ বলিয়াছিল যে কোন্‌খোবার ও এওগান্ এই দুইজন তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য। এওগান্ দের্দ্রিউকে নিজের রথে চড়াইয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে, তখন কোন্‌খোবার নিকটে আসিয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিতে লাগিল—"কিগো দের্দ্রিউ, তুই মেষের মাঝে প'ড়ে নিরুপায় ভাবে মেষী যে চোখে চায়, সেই চোখে যে চাচ্ছ!"[১৫] ইহাদের এই প্রকার কথা শুনিয়া, কাছে একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ছিল, দের্দ্রিউ সেই প্রস্তরে মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে ফের্‌গুস্ বোর্‌রাথ্-এর ভোজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোন্‌খোবারের ও নিজ পুত্র বুইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার কথা এবং ইল্লান্দ্, নোইশি প্রভৃতির মৃত্যুর কথা শুনিয়া, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন লইয়া এমাইন্-গড় আক্রমণ করিলেন। এমাইন্-গড় ধ্বংস করিয়া এবং রাজার পুত্র ও আত্মীয় পরিজন ও বহুশত সৈন্যকে বধ করিয়া, তাহার সমস্ত ধনরত্ন গোরুবাছুর লুটিয়া লইয়া গেলেন। তারপর ফের্‌গুস্ নিজের দলবল লইয়া Connaught কনাখ্‌ট্ বা কনাট রাজ্যে গেলেন, এবং সেখানকার রাজা Ailill আইলিল্ ও রাণী Medb মেদ্‌ব্-এর[১৬] অধীনে সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর ধরিয়া কনাট হইতে লোক-লস্কর লইয়া অলস্‌টারে কোন্‌খোবারের বিরুদ্ধে ফের্‌গুস্ যুদ্ধ করিতে আসিতেন, এবং লুঠ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া কোন্‌খোবারের রাজ্য ছারখার করিয়া দিতেন।

দের্দ্রিউর জন্মকালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহা এই প্রকারে সত্যে পরিণত হইল। পুরোহিত কাথ্‌বাদ্ যখন শুনিলেন যে কোন্‌খোবার উস্‌নেখ্-পুত্রদের হত্যা করিয়াছে, তখন তিনি শাপ দিলেন, যেন এমাইন্-পুরী মরুর মত পড়িয়া থাকে, এবং আর কোনও রাজা যেন সেই অভিশপ্ত পুরীতে বাস না করে। এমাইনে আর কখনও রাজার পুরী নির্ম্মিত হয় নাই—এখনও সেই স্থান মরুর ন্যায় পড়িয়া আছে; এবং লোকে উহার জনশূন্য পতিত অবস্থা দেখিয়া কোন্‌খোবারের নৃশংসতা, এবং নোইশি ও দের্দ্রিউর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম ও তাহাদের শোচনীয় পরিণামের কথা মনে করে।

[চিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য।—দের্দ্রিউর চিত্রখানি স্কচ চিত্রকর John Duncan, A. R. S. A. কর্ত্তৃক অঙ্কিত, Alexander Carmichael, LL. D. কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশিত গেলিক ভাষায় রচিত গদ্য ও পদ্য কাব্য Deirdire agus Laoidh Chlann Uisne গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত (Paisley, Scotland: Alexander Gardner, 1914)। কুলখুইন্ ও মেদ্‌ব্-এর চিত্র দুইটী আমেরিকান চিত্রকর J. C. Leyendecker কর্ত্তৃক অঙ্কিত, বিখ্যাত আমেরিকান পত্রিকা Century Magazine-এর ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসের সংখ্যায় Theodore Roosevelt কর্ত্তৃক রচিত The Ancient Irish Sagas প্রবন্ধের সঙ্গে তিন রঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই ছবি দুইখানি T. W. Rolleston কৃত Myths and Legends of the Celtic Race (Harrap, London, 1912) পুস্তকে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন আইরীশ-জাতীয় যোদ্ধা ও রাজবংশীয় নারীর পরিচ্ছদের ছবি হিসাবে, দের্দ্রিউ-উপাখ্যানের পাত্রপাত্রীদের বাহ্য রূপের কতকটা পরিচয় দিবে বলিয়া এই ছবিগুলি পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই ছবিগুলিতে পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি সমস্তই প্রাচীন আইরীশ সংস্কৃতির অংশস্বরূপে প্রাপ্ত অলঙ্কার তৈজসাদি বস্তুর অনুকৃতিরূপে অঙ্কিত।]

---

১৪ এই শোক-গাথা কাহিনীটার Book of Leinster-এ প্রাপ্ত প্রাচীনতম রূপে আছে; ফরাসী অনুবাদ অনুসরণে বাঙ্গালা করা হইল।

১৫ প্রাচীন আইরীশের নমুনা-হিসাবে এই বাক্যটীর মূল (Book of Leinster হইতে) এবং আইরীশ শব্দগুলির যথাক্রমে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া গেল—'maith a Derdriu, ol Concobar, suil chairech eter da rethi gnii-siu etr-um-sa ocus Eogan' = 'ভাল, হে দের্দ্রিউ,' বলিল কোন্‌খোবার, 'চোখ মেষীর মধ্যে দুই মেষ করিতেছ-তুমি আমার-মধ্যে তথা এওগান্ (-এর মধ্যে)।'

১৬ রাণী মেদ্‌ব্ বা মেভ্ (Medb, Medhbh, Meyv, Maev, Maeve) আয়র্লাণ্ডের একজন প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার গর্ব্বদৃপ্ত চরিত্র কতকটা মহাভারতের দ্রৌপদীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কালগতিতে এখন তিনি Queen Mab রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া Fairy বা ব্রিটীশ জাতির পরী-রাজ্য শাসন করিতেছেন।

প্রদর্শনী

অস্ত্র-চিকিৎসায় যুগান্তর

যাঁরা কোনদিন কোন হাঁসপাতাল-সংশ্লিষ্ট 'অপারেশন-থিয়েটার'-এ ঢুকিয়াছেন তাঁরা জানেন পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টির মধ্যে দেখিবার এত বড় জিনিষ খুব কমই আছে। 'অপারেশন-টেব্‌ল'-এর উপর অচেতন রোগী, পাশে দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক ধব্‌ধবে শাদা পোষাক পরিহিত অস্ত্র-চিকিৎসক, এদিকে-ওদিকে ত্রস্ত সহকারী আর নার্সের দল। চিকিৎসকের হাতে যে অস্ত্র রহিয়াছে, উহারই উপর রোগীর প্রাণ নির্ভর করিতেছে। সমস্ত মিলিয়া এ দৃশ্য মহান্‌। নিত্য এই কক্ষে শত শত মানুষের প্রাণ রক্ষা হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর অস্ত্র চিকিৎসার কাহিনীও অদ্ভুত। সেদিন একখানি বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম—একটি এমার্জেন্সি অপারেশনের কথা। স্থান—

রেডিও নাইফ: বিনা ক্ষতে অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্র।

নিউইয়র্ক সিটি হস্‌পিট্যাল; রোগিণী, একটি যুবতী; পীড়ার কারণ গর্ভের শিশু। তল-পেটে অস্ত্র করিতে হইবে। একজন রোগিণীর নাড়ী ধরিয়া আছেন—ডাক্তারের ছুরি যুবতীর তুষারশুভ্র দেহকে ছিঁড়িয়া ফুঁড়িয়া চলিয়াছে। যিনি নাড়ী ধরিয়া ছিলেন হঠাৎ তিনি বলিলেন, 'নাড়ীর অবস্থা খারাপ'; সার্জ্জন বুঝিলেন, আর এতটুকু দেরী করিলে চলিবে না, যত শীঘ্র হয় অস্ত্র শেষ করিতে হইবে। এক দিকে মৃত্যুর দূত অন্যদিকে মানুষের শক্তি- আবার ছুরি চলিল। হঠাৎ শোনা গেল, 'নাড়ী নাই'—রোগিণীর

নিউম্যাটিক ড্রিল: অস্থিতে অস্ত্র করিবার জন্য ব্যবহৃত।
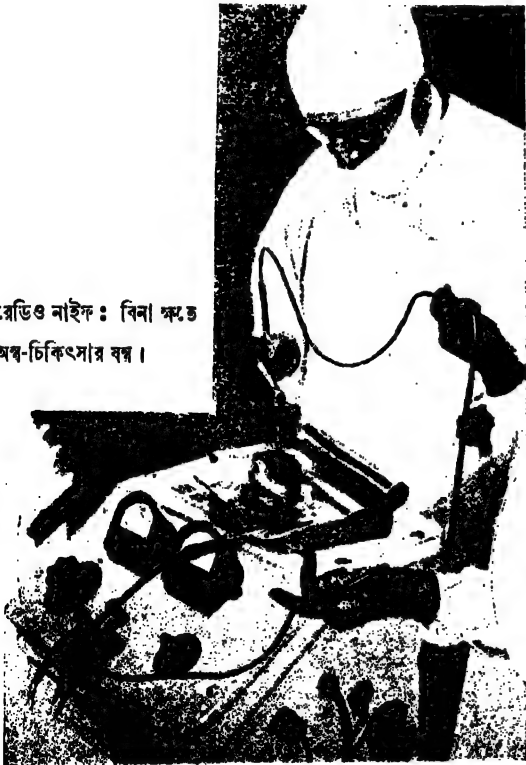
নিশ্বাস ফুরাইয়াছে। সার্জ্জনের ছুরি থামিল, মাথা নোয়াইয়া তিনি রোগিণীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, আশা—প্রবাহিত রক্তস্রোত আরও অন্ততঃ কয়েক মুহূর্ত্ত ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে—বুক পরীক্ষা করিলেন, স্পন্দন নাই। মেয়েটির ওষ্ঠ নীল হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শরীরে সেই নীল ধরিল বলিয়া। পাশের টেব্‌ল এর উপর একটি সিরিঞ্জ ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে সেটিকে তুলিয়া নিয়া পাঁজরার কাছে ফুঁড়িয়া দিলেন সেই সিরিঞ্জের ঔষধ। সিরিঞ্জে আর্দেনালিন (ardenalin) ছিল, মুহূর্ত্তে বক্ষের স্পন্দন ফিরিয়া আসিল—মেয়েটির প্রাণ বাঁচিল।

এমন একটি দুইটি নয়, দিনের পর দিন পৃথিবীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে সহস্র-সহস্র নরনারীর প্রাণ রক্ষা করিতেছেন এই সার্জ্জন। আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রপাতির হিসাবই বা কে রাখিবে! পাশে আমরা যাঁহার প্রতিকৃতি দিলাম, তাঁহার হাতে যে যন্ত্রটি রহিয়াছে ইহা রেডিয়ো-নাইফ (radio-knife). আমাদের দেশের চাঁদশীর চিকিৎসকেরা বিনা অস্ত্রে ক্ষত-চিকিৎসা করেন, এই ছুরি দিয়া বিনা ক্ষতে অস্ত্র-চিকিৎসা করা হয়,—ডাক্তার এক টুক্‌রা মাংসের উপর তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন। আর এই গোল ছবিটার মধ্যে যে যন্ত্র দেখা যাইতেছে সেটি হইল pneumatic drill (নিউমাটিক্‌ ড্রিল) অর্থাৎ হাওয়া ভরা তুরপুণ গোছের। যদি অস্থিতে অস্ত্র করিতে হয় কিম্বা অনেকখানি অস্থি অস্ত্রচিকিৎসার্থে মানুষের দেহ হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে এই যন্ত্রের সাহায্য লাগে।

উভচর বাইসিক্‌ল

উভচর-যানের কথা আমরা অনেক পড়িয়াছি। বর্ত্তমানে প্যারিসে ইহার বাইসিক্‌ল সংস্করণ দেখানো হইয়াছে। পাশে তাহার ছবি দেওয়া হইল। সাইকল-আরোহী ভদ্রলোককে দেখা যাইতেছে—ছয় চাকার গাড়ী চাপিয়া দিব্য জলের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, মুখে চুরুটটি পর্য্যন্ত রহিয়াছে। আসলে এই ছয়টি চাকার চারটি হাওয়া-ভরা গোলক মাত্র। ইহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই উপরে উঠাইয়া সামনের দুটিকে হাণ্ডেলের দুই পাশে এবং পিছনের দুটিকে স্যাড্‌লের পাশে ঝুলাইয়া দেওয়া চলে—সে অবস্থায় ইহারা চারটি ছোট গ্লোবের মত সাইক্‌ল-আরোহীর চার পাশে অবস্থান করে। এবং সাধারণ সাইক্‌লের মত আরোহী পেড্যাল চালাইয়া দুচাকার গাড়ীতে পথ চলিতে

উভচর বাইসিক্‌ল।

পারেন। বর্ত্তমানে যে ছবি দেখিতেছি ইহাতে এই চারটি গোলক ভাসমান চারটি চাকায় রূপান্তরিত হইয়াছে—এবং পেড্যাল চালাইয়া আরোহী ইহাদেরই সাহায্যে জলের উপর দিব্য আরামে বাইসিক্‌ল চালাইতেছেন।

কব্‌জী-বন্দুক

পথ চলিতে চলিতে আচম্বিতে গুণ্ডার হাতে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়—দিনে দুপুরে যখন তখন যেখানে সেখানে এমন হইতেছে। সেদিনও কলিকাতায় দুর্ব্বৃত্তেরা ইউনিভার্সিটির দারোয়ানের পিছু নিয়া মোটা অঙ্কের টাকা সাফ করিয়া উধাও হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ওৎ পাতিয়া যে দিন সুবিধা পায়, এই দুর্ব্বৃত্তেরা সে দিন নিজেদের মতলব সিদ্ধ করে। অত্যন্ত অকস্মাৎ আসিয়া আক্রমণ করে বলিয়া ইহাদের সহিত পারিয়া ওঠা মুস্কিল—কাছে কোন অস্ত্র থাকিলেও। সম্প্রতি কব্‌জী-ঘড়ীর মতো এক প্রকার কব্‌জী-বন্দুকের সৃষ্টি হইয়াছে। চিকাগোর পুলিশ-বিভাগের একটি পেন্‌সন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এ বন্দুকে টোটা কি গুলি কিছু থাকিবে না—টোটাগুলির পরিবর্ত্তে ইহা কাঁদন-গ্যাসে (tear gas) ভর্ত্তি থাকে—কব্জী বাঁকাইলেই এই গ্যাস প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া আততায়ীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে। দেখিতে প্রায় কব্‌জী-ঘড়ীর ব্যাণ্ডের মত একটি ফিতার সহিত ইহা কোটের হাতার নীচে সংলগ্ন থাকে—

কব্জী বন্দুক : টিয়ার গ্যাসে ভরা।

আংটির মত দেখিতে আঙ্গুলে ইহার ঘোড়া পরানো থাকে। কাজে লাগাইতে হইলে মাত্র কব্জীটা একবার বাঁকাইতে হইবে—তাহা হইলেই আর দেখিতে হইবে না।

কল্পতরু জলের কল

কলিকাতার রাস্তায় চলিতে চলিতে আশে পাশে জলের কল দেখিতে পাওয়া যায় অনেক। কান টিপিয়া তাহার জল বাহির করিয়া যাঁহারা তৃষ্ণানিবারণের চেষ্টা কোন দিন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কি কষ্টসাধ্য

কল্পতরু কল।

ব্যাপার সে। পাশে যে কলের ছবি দেওয়া হইল—ইহা সভ্য মানুষের এই কষ্ট দুরীকরণার্থে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কান কি চাবি কোথাও কিছু টিপিতে

নাগর-দোলা গাড়ী : পর্ব্বতশৃঙ্গের নিসর্গ-দৃশ্য দর্শনে ব্যবহৃত।

হইবে না, এই কলের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া কলের উপরে মুখ নোয়াইলেই—কল্পতরুর মত ইহা হইতে অজস্র জল বর্ষিত হইবে। আবার কল ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে জলধারা আপনা হইতে থামিয়া যাইবে। ব্যাপারটি এই, ইহার কোথাও এমন একটি বৈদ্যুতিক চাবি আছে, যাহাতে আলোর বাড়্‌তি-কম্‌তি সাড়া আনে (light-sensitive) ; ফলে কেহ এ কলের কাছে দাঁড়াইলে আলোর যে ব্যত্যয় ঘটে, তাহাতে সেই চাবি জাগিয়া কলের ভিতরকার অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে সচল করে এবং কলের মুখে জলের প্রস্রবণ আনে।

নাগর-দোলার গাড়ি

সুইট্‌জার্লাণ্ডের এংগেলবার্গে এই অভিনব গাড়ি তৈয়ারী হইয়াছে। অ্যাল্‌পসের পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিবার জন্য ইহার সৃষ্টি। দুরারোহ পর্ব্বতগাত্রে নিসর্গ যে আল্পনা আঁকিয়াছে এই গাড়ী হইতে তাহাই দেখিতে দেখিতে ভূমিতল হইতে ছয় হাজার ফুট উপরে উঠিয়া নামিয়া আসা যায়। গাড়ি পাত্‌লা অ্যালুমিনিয়ামে তৈয়ারি, উপরের তারের লাইনে কপিকলে ইহা ঝুলিয়া আছে, ভিতর হইতে লোকজন দুরধিগম্য অ্যাল্‌সের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অপরূপ করাভরণ

অনর্থক অ্যালার্মের কল টিপিয়া ফায়ার-ব্রিগেডকে এপথ ওপথ ঘুরাইবার মজা দেখিবার দুষ্ট লোকের অভাব কোন দেশেই নাই।—কাজ নাই সুতরাং খুড়াকে গঙ্গাযাত্রা করানোর মতই এ সখ অদ্ভুত। সম্প্রতি আমেরিকার সেন্ট লুইসে একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে এ সখে দুষ্ট লোকের মন বিরূপ হইবেই—কল টিপিতে গেলে একটি হাতকড়ার ভিতর দিয়া হাত না চালাইলে উপায় নাই—এবং হাত চালাইবা মাত্র কোথা হইতে কুলুপচাবি আসিয়া এই হাতকড়া হাতে লাগিয়া যায়।—কিন্তু যাহার বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে, সে যদি এমন বন্দী হইয়া পড়ে, তবে ফায়ার-ব্রিগেড গিয়া আগুন নিবাইতে বেগ পাইবে—কেননা গৃহকর্ত্তা এখানে বন্দী রহিয়াছে। সুতরাং এই হাতকড়ার এমন ব্যবস্থা, যে ইচ্ছা করিলে ইহা সমেত যেখানে সেখানে যাওয়া যাইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ফায়ার-ব্রিগেডের চালকের সহিত দেখা হইতেছে, সে পর্য্যন্ত এ হাতকড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই কেননা চাবি তাহার কাছে। সুতরাং বেকারের দল এইবার একটু মুস্কিলে পড়িবে।
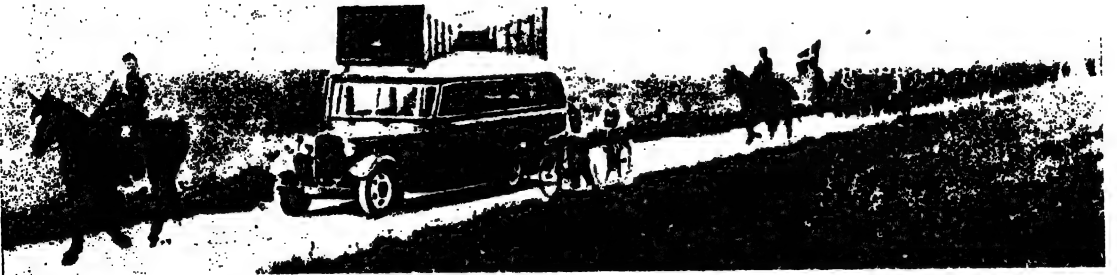
আর্মি-ব্যাণ্ডের অভিনব সংস্করণ : মোটর গাড়ির ভিতরে যন্ত্র আছে, উপরে শব্দ-প্রসারক দেখা যায়।

যুদ্ধ-সঙ্গীতের অভিনব সংস্করণ

বায়োস্কোপ থিয়েটারে আজকাল আর রক্ত-মাংসের মানুষের ঐক্যতান বাদন প্রচলিত নাই—এ কথা সকলেই জানেন। তার পরিবর্ত্তে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইয়া, সেই শব্দকে যন্ত্রসাহায্যে বিস্তৃত করিয়া আজ কাল কাজ চালানো হয়—ফলে আগে যা হইত, তার তুলনায় এই ব্যাপদেশে এখনকার বায়োস্কোপ থিয়েটারে ব্যয় হয় যৎসামান্য। এখানে যে ছবি দেওয়া

হইল, তাহা ইহারই প্রকারান্তর। কুচ্‌কাওয়াজের সময় সেনাদল সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলিয়া চলে—ইহা আমরা জানি। এত দিন এই কল্পে প্রত্যেক সৈন্যদলের সহিত একটি করিয়া 'ব্যাণ্ড-পার্টি' থাকিত। এখন ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে এই 'ব্যাণ্ড-পার্টি'র কপাল পুড়িল। এই ছবিতে একদল দিনেমার সৈন্য কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া পথ চলিয়াছে, সম্মুখে অশ্বারোহী নায়ক, আর যে মোটর গাড়িটি দেখা যায়, উহাই ব্যাণ্ড-পার্টির আধুনিক সংস্করণ। ইহার ভিতরে ফোনোগ্রাফ আছে, তাহাতে যুদ্ধ-সঙ্গীতের রেকর্ড চাপানো রহিয়াছে—গাড়ির উপরে দুপাশে হার্মোনিয়ামের বেলোর মত দেখিতে যে যন্ত্র; উহাই শব্দ-প্রসারক—উহারই সাহায্যে সম্মুখে ও পিছনে ফোনোগ্রাফের রেকর্ড বহুদূর ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিবরণ পড়িয়া মনে হয়—এই ধরণের সঙ্গীতে সেনাদলের বেশ কাজ চলে। বছর খানেক হইল, রেডিয়ো কর্পোরেশন অব আমেরিকা সে দেশের সরকারকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় এ প্রথা এখনও চলে নাই। ইতিমধ্যে ডেন্‌মার্ক ইহা কাজে লাগাইয়া ফেলিয়াছে।
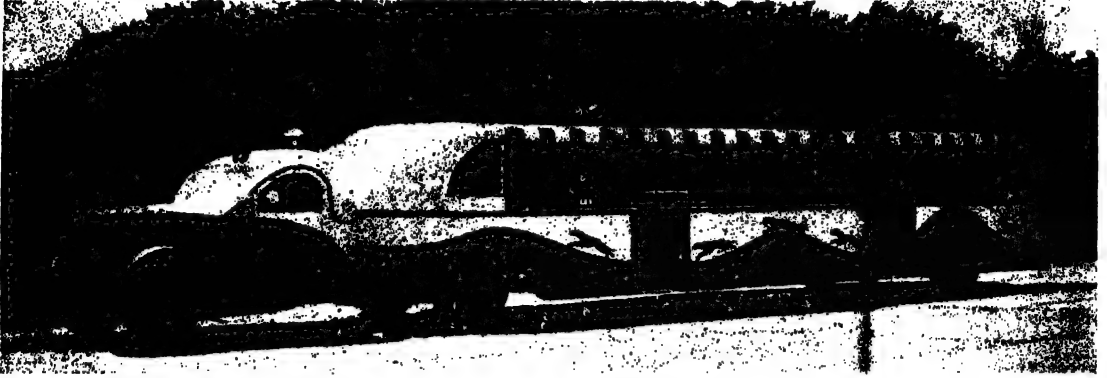
৬০ ফিট দীর্ঘ সরীসৃপ-বাস্: ভিতরে পঞ্চাশ জনের বসিবার ও পঁয়তাল্লিশ জনের দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে।

সরীসৃপ বাস্

চিকাগোতে এই বৎসরে নিখিল-বিশ্বের এক মেলা বসিবার আয়োজন হইতেছে। বিস্তৃত মেলার প্রাঙ্গণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার জন্য এই সুবৃহৎ ষাট ফুট লম্বা বাস্ তৈয়ারি হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় এত বড় বাস্ ঘুরিবে ফিরিবে কি করিয়া। সে ব্যবস্থা ইহার ভিতরেই আছে—বুকে হাঁটিয়া যে সব জন্তু চলে, তাহাদের মত করিয়া ইহার দেহাবয়ব সুকৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে। এ বাসে পঞ্চাশ জন যাত্রীর বসিবার ও পঁয়তাল্লিশ জনের দাঁড়াইবার ব্যবস্থা আছে। মেলার জন্য এমন চারটা বাসের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, খরচ পড়িবে প্রায় দশ লক্ষাধিক মুদ্রা। দুটি ইহারই মধ্যে কাজে লাগিয়াছে আর একটি শীঘ্রই মেলার বিজ্ঞাপনার্থে আমেরিকা-পরিভ্রমণে বাহির হইবে।

পাত্রাপাত্র

আকাশে কালো মেঘ ঝাপটি পাখা
পথের ধূলি পানে চায়—
মেঘের ছায়া ঢাকা নদীর জল,
ঢেউয়ের বাহু বাড়ায়।

জলের ধারা হয়ে নামিয়া মেঘ,
ধূলিরে কর্দ্দম করে,
বাড়িয়া নদীবেগ দুকূল ছেপে
বিছায় পলি মরুচরে।

অভিশাপ

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা শহরে সে রকম বাড়ী যে থাকিতে পারে, না দেখিলে সেকথা সহজে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

বাগবাজার অঞ্চলে ছোট ছোট কয়েকটা অতীব সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া খোলার একটা নোংরা বস্তির পাশ দিয়া যাইতে হয়। দাঁত-বাহির-করা জরাজীর্ণ ইঁটের প্রাচীর দিয়া ঘেরা, সদর দরজা এক কালে হয়ত ছিল, এখন আর নাই। সেই প্রাচীরেরই ধ্বসিয়া-যাওয়া খানিকটা ফাটলের মধ্য দিয়া পথ। পথের দু'পাশে ছোট বড় নানা জাতীয় আগাছার জঙ্গল বাড়ীর উঠানটিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া এত বেশি ঘন হইয়া দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছে, যে, এদিক ওদিক কোনোদিকেই আর নজর চলে না। চোখ বুজিয়াও সোজা খানিকটা চলিয়া গেলেই দেখা যায়—সুমুখে জরাজীর্ণ বহুকালের প্রাচীন একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। উপরের দিকে তাকাইবার উপায় নাই। কোথাও বা ছাদ ধ্বসিয়া গিয়া লম্বা একটা কড়িকাঠ বাহির হইয়া আছে, কোথাও-বা স্তূপীকৃত ইঁট, দেওয়ালের ফাটল্ বাহিয়া অশ্বত্থের গাছ উঠিয়াছে, বাড়ীর উত্তর দিকটা ত' এক রকম নাই বলিলেই হয়, দক্ষিণ দিকে নীচের তলায় তিনখানি ঘরে মাত্র মানুষ বাস করে। কোন্ সাহসে যে বাস করে কে জানে। তবে বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক খোঁড়া শ্রীহর্ষ বলে, 'নির্ভয়ে বোসো দাদা, যা পড়বার তা প'ড়ে গেছে। ওপরের পানে তাকিয়ো না—বাস্ তাহ'লেই হোলো।'

তিনখানি ঘরের মধ্যে একখানি বসিবার ঘর আর বাকি দু'খানি অন্দর-মহল। ইহাদের মাঝখানে মাত্র উঁচু একটি বাঁশের ছিলা দিয়া তৈরি টাটির ব্যবধান। দুইটি দরমা ত্রিকোণাকারে এমন ভাবে বাঁধিয়া একেবারে কায়েমী করিয়া ফেলা হইয়াছে, যে, এই বাড়ীখানি হয়ত'-বা কোনোদিন একেবারেই ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ওই বাঁশের বেড়া চিরদিনই ঠিক এম্‌নিই থাকিবে।

তা ইহার প্রয়োজনও ছিল। বিনা প্রয়োজনে এত কষ্ট করিয়া শ্রীহর্ষ বেড়া যে বাঁধে নাই সেকথা সত্য।

বেড়ার ওপারে শ্রীহর্ষের অন্দর-মহল, ফাঁকা নয়। আরও দুইটি প্রাণী সেখানে বাস করে। একটি শ্রীহর্ষের যুবতী কন্যা মালতী, আর একটি শ্রীহর্ষের যুবতী বধূ—চম্পাবতী। ডাক নাম—চাঁপা।

বধূটি দ্বিতীয় পক্ষের। শ্রীহর্ষ চট্ করিয়া অবশ্য সেকথা স্বীকার করে না। নিতান্ত অজানা লোক জিজ্ঞাসা করিলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে, 'একা থাকতে মালতীর বড় কষ্ট হচ্ছিল দাদা, তা এই এত বড় বাড়ীতে, কই, তুমিই বল না! আর তাছাড়া সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার এই পা'টা তখন কাটা পড়েনি, বুঝলে? তারপর হঠাৎ একদিন···তখন বর্ষাকাল···পথ-ঘাট সব পিছোল্ হয়ে গেছে···ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে—'

যাক্। তাহার কাটা পায়ের ইতিহাস কেহ শুনিতে চায় নাই। সে-সব পরের কথা।

এখন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ইহারা আসিল কেমন করিয়া সেই কথাই বলি।

শ্রীহর্ষের বাবা ছিলেন ছোট-খাটো ডাক্তার। ছোট-খাটো হইলেও তখনকার দিনে এত বেশী ডাক্তারের ছড়াছড়ি ছিল না, কাজেই রোজগার তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন। স্বভাব ছিল তাঁহার অত্যন্ত দিল্-দরিয়া, অযাচিত ভাবে লোককে দান করিতেন, বন্ধু-বান্ধবের বিপদ-আপদে অর্থসাহায্য করিতেন প্রচুর এবং কাহাকেও কিছু ধার দিয়া তাহার কাছে আর ফেরত চাহিতেন না।

ফেরত না চাহিবার কারণ—কাহাকে কি যে দিয়াছেন সম্ভবত তিনি ভুলিয়া যাইতেন। দুষ্ট লোকে বলে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কতবার যে তিনি মদ্যপান করিতেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তবে চিকিৎসা নাকি খুব ভাল করিতেন বলিয়া সেকথা কেহ আর ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিত না।

সারাদিন মদ খাইতেন কিনা কে জানে,—কিন্তু সন্ধ্যার সময় এক-একদিন তাঁহাকে মত্ত অবস্থায় ডাক্তারখানায় চীৎকার করিতে শোনা যাইত; ইহা সত্য। তাহার পর তিনি যে কোথায় যাইতেন কি করিতেন কেহই জানিত না। রাত্রে যদি কোনও মরণাপন্ন রোগীর কাছ হইতেও তাঁহার ডাক

আসিত, বাড়ীর চাকর-বাকরেরা দরজা খুলিত না, খুলিলেও বলিত, 'বাবু বাড়ী নেই।'

এমন একদিন নয়—দু'দিন নয়; প্রত্যহ।

পুত্র শ্রীহর্ষ বলে, 'আমার যদি কেউ সর্ব্বনাশ করে' থাকে ত' সেই করেছে। নরকেও ঠাঁই হবে না ওর—তা জানো?'

লোকে ভাবে বুঝি শ্রীহর্ষ তাহার বিদ্যাশিক্ষার কথাই বলিতেছে। বলে, 'সে দোষ তোমার বাপের দিয়ো না শ্রীহর্ষ, বাপ না হয় কিছু বলতো না, তাই ব'লে তুমিই বা লেখাপড়া শিখলে না কেন? বাপের টাকা ত' ছিল!'

শ্রীহর্ষ বলে, 'তোমরা ভারি আড়ে বোঝো, তাই তোমাদের সঙ্গে কথা ব'লে আমার সুখ হয় না। তা ত' বলিনি, বলছি বাবার আক্কেলের কথা! মা নাহয় সে বেঁচে থাকতেই মরেছে, হাড় জুড়িয়েছে; একটা বোন ছিল সেটাও গেছে, রইলুম শুধু আমি। তা অত অত টাকা যে রোজগার করলি, আমার জন্য কি রেখে গেলি শুনি? মোটে পঁচিশ হাজার টাকা। বাকি টাকা তাহ'লে গেল কোথায়? গেল ওই মদে আর ওই হেঁ হেঁ···তা জানো? তবে আর বলি কেন?'

কিন্তু ওই পঁচিশ হাজারের কথা শ্রীহর্ষ বহুদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ঘটা করিয়া পাছে বাপের শ্রাদ্ধ করিতে হয় বলিয়া তাহার পরদিন হইতেই শ্রীহর্ষ যেখানে সেখানে হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল—'একটি পয়সা রেখে যায়নি দাদা, শ্রাদ্ধপিণ্ডি ত' দূরের কথা, বাড়ীটার চার মাসের ভাড়া বাকি, চাকর-বাকরের মাইনে, কোম্পাউণ্ডার-বেটা কিছু পাবে—কি যে করি, কি যে খাই··· আমি একেবারে অকূল পাথারে পড়ে' গেলাম।'

সকলেরই দয়া হইল। বাড়ীওয়ালা বাড়ীর ভাড়া ছাড়িয়া দিল, চাকর-চাকরাণী মৃত মনিবের অনেক খাইয়াছি বলিয়া বিদায় লইল, কম্পাউণ্ডার-ছোক্‌রাটি ডাক্তারখানার জিনিষ-পত্র বেচিয়া যাহা পাইল নিজে না লইয়া মনিবের শ্রাদ্ধের জন্য শ্রীহর্ষের হাতেই তুলিয়া দিয়া বাড়ী গেল।

অশৌচান্তে পাঁচ দশ টাকা খরচ করিয়া কোনো রকমে জনকতক ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ সারিয়া স্ত্রীকে লইয়া শ্রীহর্ষ তাহার ভবানীপুরের বাস উঠাইয়া দিয়া সটান একটা খোলার বাড়ীতে আসিয়া উঠিল একেবারে বাগবাজারে।

* * * *

বাগবাজারের এই ভাঙ্গা বাড়ীটার মালিক জমিদার শিবপদ বাবুর তখন শেষ দশা। বাহিরের ঠাট্-ঠমক্ কোনো রকমে তখনও পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভিতরটা তখন একেবারে ফোঁপরা হইয়া গেছে। 'রেশ' খেলিয়া, মদ্য পান করিয়া এবং আনুসঙ্গিক আরও অনেক প্রকারে দেশের জমিদারী তখন নিলাম হইয়াছে, জমি-জমা যাহা কিছু ছিল তাহাও বিক্রয় করিয়া আসিয়াছেন, থাকিবার মধ্যে আছে শুধু ওই বাড়ীখানি আর দেশে একটি ছোট জমিদারী মহল, কিন্তু সে মহলের আয় কিছুই নাই।

পঁচিশ হাজার টাকার মালিক শ্রীহর্ষ তখন দুপুরে আহারাদির পর নিতান্ত লক্ষীছাড়ার মত পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়ীর কাছেই এই শিবপদ বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসে, বাবুর সঙ্গে গল্প-গুজব করে, দরকার হইলে চাকরের মত বাজার হইতে এটা-সেটা আনিয়া দেয়, কোনো কোনো দিন দয়া করিয়া বাবু তাহাকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠেও লইয়া যান, বাবু টিকিট করিয়া ভিতরে ঢুকিলে শ্রীহর্ষ তাঁহার ঘোড়ার গাড়ী আগলাইয়া বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

শ্রীহর্ষ এখনও তাহার দ্বিতীয় পক্ষ চাঁপার কাছে সেই গল্প করে। বলে, 'মাঠে তখন টাকার ঝম্‌ঝমানি দেখে' গাড়ীতে বসে বসে এক-একদিন ভাবতাম, বলি, দিই কিছু টাকা ঢেলে এইখানে, বাড়ে ত' বাড়ুক্! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত—হেঁ হেঁ শ্রীহর্ষ বাবা কাঁচা ছেলে নয়, দেখলাম, ফতুর হতে ওখানে বেশি সময় লাগে না, শেষ পর্য্যন্ত সব শালা হেরেই আসে; তখন বলি—না বাবা থাক্, যেমন আছি তেমনিই থাকি।'

সন্ধ্যার পর শিবপদ বাবু শ্রীহর্ষকে প্রায়ই বলিতেন, 'যাও শ্রীহর্ষ, বাড়ী থেকে জামাটা তোমার গায়ে দিয়ে এসো, একটুখানি বেড়িয়ে আসা যাক্।'

শ্রীহর্ষ তাহার বহুকালের জরাজীর্ণ কোটখানি গায়ে দিয়া পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া হাতে বেতের একটি ছড়ি লইয়া শিবপদ বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। বাবু হয়ত হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে একটুখানি সেজেগুজে যাওয়াই উচিত, বুঝলে শ্রীহর্ষ, তোমার ও ছেঁড়া জামাটা খুলে ফ্যালো, আমার জামা তোমার গায়ে হবে?'

শ্রীহর্ষ সানন্দে তাহার গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিত, 'কেন হবে না বাবু, খুব হবে।'

শিবপদ বাবু মোটা মানুষ। শ্রীহর্ষকে তাঁহার গায়ের একটা পাঞ্জাবী পরাইয়া সং সাজাইয়া তাহাকে লইয়া একটুখানি আমোদ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

শ্রীহর্ষ জামা পাইয়াই খুসী। ঢিলা হইল কি খাটো হইল, সে-সব কিছু বুঝিত না। হাতের আস্তিন্ গুটাইতে গুটাইতে গাড়ীতে গিয়া উঠিত। বলিত, 'জামা তৈরি করাব কি, জানেনই ত' একটা মেয়ে হয়েছে, তার দুধ জোগাই কেমন ক'রে সেই হয়েছে ভাবনা।'

শিবপদ বাবুর দয়া হইত। বলিতেন, 'সে ভাবনা তুমি ভেবো না শ্রীহর্ষ, কাল থেকে আমার যে দুধ দেয়, সেই গয়লাটাকে বলে দেবো।'

এমনি করিয়া শিবপদ বাবুর দয়াতেই শ্রীহর্ষের দিন একরকম করিয়া চলিতে থাকে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই শিবপদ বাবুর দয়া! গোয়ালার কাছে প্রায় আশী টাকা বাকি, মুদির দোকানে ধারের আর অন্ত নাই, চারিদিকে দেনার দায়ে ভদ্রলোক একেবারে অসম্ভব রকম বিব্রত, তবু নিত্য নিয়মিত গোয়ালার কাছ হইতে শ্রীহর্ষের দুধ যায়, মুদির দোকান হইতে জিনিস যায়, জামাটা জুতাটা ত' পায়ই। মুদিকে গয়লাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া শিবপদ বাবু বলেন, 'টাকা তোরা পাবি, আমি দিয়েও দেবো, কিন্তু ওই শ্রীহর্ষ বাবু যখন আমার কাছে বসে থাকবে তখন যদি টাকা চা'স্ ত' তোদের আমি খুন করে ফেলব।'

ঋণের মাত্রা যখন অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিল, শিবপদ বাবু তখন তাঁহার ঘোড়া বিক্রয় করিলেন, গাড়ী বিক্রয় করিলেন, সহিস্ কোচম্যানকে মাহিনা, বক্শীশ্ দিয়া বিদায় করিয়া বলিলেন, 'শুনেছ শ্রীহর্ষ, সেদিন একটা ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক ভদ্রলোকের ভারি বিপদ হ'য়ে গেছে? খবরের কাগজে পড়লুম—ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন একটা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে, ট্রামটা আসছিল সামনের দিক থেকে, বাস, এমন এক ধাক্কা লাগলো যে ঘোড়া মলো, গাড়ী গেল ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে আর সেই ভদ্রলোক হাঁসপাতালে গিয়ে তিনদিন পরে মারা গেলেন। তাই ও-সব ঝঞ্ঝাট আমি আর রাখলাম না। দিলাম বিক্রি করে। কেমন, ভাল কাজ করিনি?'

শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'বেশ করেছেন, এবার একটা মোটর কিনুন।'

শিবপদ বাবু হাসিয়া বলেন, 'হ্যাঁ, সেই কথাই ভাবছি।'

শ্রীহর্ষ বলিবার মত আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'গাড়ীতে সহিস্-কোচুয়ান ছিল না? তাদের কি হ'লো? তারাও মরেছে?'

গল্পটা তিনি বানাইয়া বলিয়াছেন, কাজেই সহিস্-কোচোয়ানের প্রশ্নও যে উঠিতে পারে সে কথা ভাবেন নাই। আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন 'হ্যাঁ,—না, গাড়ী থেকে তারা লাফিয়ে পড়েছিল।'

রাত্রে সেদিন বাড়ী ফিরিবার সময় শিবপদ বাবুর কি যে খেয়াল হইল কে জানে, পথ হইতে শ্রীহর্ষকে ক্রমাগত হাতে ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া টানিতে লাগিলেন—'চল, তোমায় আজ আমার বাড়ী খেতে হবে।'

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে, খাবার হয়ত' একজনের মাত্র ঢাকা দেওয়া আছে ভাবিয়া শ্রীহর্ষ প্রথমটা রাজি হইতেছিল না, কিন্তু শিবপদ বাবু ছাড়িবার পাত্র ন'ন্, কোনো রকমে তাহাকে টানিয়া হিঁচ্ড়াইয়া বাড়ীতে আনিয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিলেন। বাড়ীতে তাঁহার একমাত্র গৃহিণী। পুত্র কন্যা হয় নাই বলিয়া এই এত বড় বাড়ী একেবারে ফাঁকা। আগে যদি বা বিস্তর চাকর চাকরাণীতে বাড়ীখানা সর্ব্বদাই গম্ গম্ করিত, আজকাল আবার তাহাও নাই। নিস্তব্ধ নির্জ্জন গৃহের সিঁড়ির উপর অসংযত পদক্ষেপে শব্দ করিতে করিতে দু'জন ঠিক সিঁড়ির মাথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। শিবপদ আগে, শ্রীহর্ষ পশ্চাতে।

শিবপদ ডাকিলেন, 'রাণী!'

অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক নারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। হ্যাঁ, রাণীই বটে! এত রূপ শ্রীহর্ষ কখনও চোখে দেখে নাই। চোখ দুটা যেন তাহার ঝল্‌সাইয়া গেল।

কিন্তু তাহাও শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। স্বামীর সঙ্গে পর-পুরুষ দেখিয়া লজ্জায় খানিকটা জিভ কাটিয়া রাণী সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন করিয়া আগে সে কোনদিনই দাঁড়াইত না। এত বড় বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল, এমন দিনও গিয়াছে যখন তাহাকে বহু অপরিচিতের সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে আসিয়া দাঁড়াইতে

হইয়াছে, খাইতে দিয়াছে, আদর যত্ন করিয়াছে, আপ্যায়িত করিয়াছে। অথচ তাহার জন্য একটি দিনও কোনও অভিযোগ তাহার মুখ দিয়া কেহ শোনে নাই। আজ যে কেন এমন করিল ইহাই আশ্চর্য্য।

শ্রীহর্ষের সুমুখে এই লইয়া শিবপদ বাবু কোনও কথাই বলিলেন না। খাবার ঢাকা ছিল একজনের মতই কিন্তু আহার্য্য বস্তু যাহা ছিল তাহা প্রচুর। দুইটা থালায় ভাগ করিয়া দু' জনেই তাহা শেষ করিলেন এবং খাওয়া শেষ হইলে শ্রীহর্ষ চলিয়া যাইবা মাত্র রাণী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবপদ বাবু ভাবিয়াছিলেন রাগ করিয়া কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথা বলিবেন না। কিন্তু এরকম প্রতিজ্ঞা বিবাহের পর হইতে ইস্তক আজ পর্য্যন্ত তিনি বহুবার করিয়াছেন, কখনই টিঁকে নাই। সেদিনও টিঁকিল না। রাণীর মুখের পানে তাকাইবা মাত্র সব-কিছু তাঁহার গোলমাল হইয়া গেল। বলিলেন, 'কি গো রাণী, বয়স যত বাড়ছে তত কচি খুকি হচ্ছ নাকি? শ্রীহর্ষর সুমুখে বেরোলে না কেন শুনি?'

ম্লান একটুখানি হাসিয়া রাণী বলিল, 'এম্‌নি।'

'তার মানে?'

'মানে কিছু নেই। এমনিই বেরোলাম না।—যাক্ খাওয়া হয়েছে ত' ওঠো।'

খাইতে তাঁহার চিরকালই দেরি হয়। শ্রীহর্ষ চলিয়া যাইবার পরও তিনি বসিয়া বসিয়া খাইতেছিলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ, উঠি।' বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিছানায় শুইয়া তামাক টানিতে টানিতেও সেই এক কথাই তাঁহার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছিল। রাণী আজ শ্রীহর্ষের সামনে বাহির হইল না কেন? তাই তিনি কথাটা তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, 'না রাণী, তোমায় বলতে হবে কেন বেরোলে না। রাগ করেছ?'

রাণী আবার তেমনি ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিল। বলিল, 'রাগ কার ওপর করব? অদৃষ্টের ওপর?'

কারণটা শিবপদ বাবু এতক্ষণে কিছু বুঝিলেন। বলিলেন, 'ও, বুঝেছি।'

'কি বুঝেছ বল ত?'

শিবপদ বাবু বলিলেন, 'রাণীর গর্ব্ব আর তোমার নেই। সেই জন্য লোকজনের সুমুখে আর বেরোতে চাও না। কেমন?'

ঘাড় নাড়িয়া রাণী বলিল, 'হ্যাঁ। জানোই যদি, তবে আর বেরোতে আমায় বল কেন?'

এই বলিয়া খানিক থামিয়া রাণী আবার বলিল, 'যার গায়ে হীরে-জহরতের গয়না থাকতো, সেই রাণী তোমার আজ এই হাতে দু' গাছা চুড়ি পরে' কেমন করে' বেরোয় বল ত? হ্যাঁগো?'

সে কথা সত্য। শিবপদ বাবুও কম আঘাত পাইলেন না। কিন্তু কোন আঘাতই এখন আর তাঁহাকে বড় বিচলিত করিতে পারে না। বলিলেন, 'তাতে আর এমন কী হয়েছে রাণী! সব দিন মানুষের সমান যায় না। তোমার নামে এ বছর দুখানা টিকেট কিনেছি ডার্ব্বি-সুইপের। দ্যাখ না, হয়ত' কিছু পেয়েও যেতে পারি।'

রাণী বলিল, 'ঘুমোও।'

বছর-তিনেক পূর্ব্বে এক মাড়োয়ারীর কাছে শিবপদ বাবু হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা ধার লইয়াছিলেন।

নগদ টাকা পাইয়াছিলেন দশহাজার কিন্তু হ্যাণ্ডনোটে তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল পনেরো হাজার। সেই টাকা সুদে আসলে এখন অনেক হইয়াছে। মাড়োয়ারী মহাজন টাকা চাহিতে আসিল। বলিল,—না দিলে এবার সে নালিশ করিবে।

শিবপদ বাবু কিছুদিনের সময় চাহিলেন। মাড়োয়ারী প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার এই বাড়ীখানির দাম যদিও অত টাকা হয় না, তবু সে এখন এই বাড়ীখানি পাইলেই দয়া করিয়া হ্যাণ্ড্‌নোটখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে।

শিবপদ বাবু বলিলেন, 'বাড়ী আমার নয়, আমার স্ত্রীর।'

মাড়োয়ারী হাসিয়া বলিল যে, মহাজনকে ফাঁকি দিবার জন্য বাড়ী তিনি তাঁহার স্ত্রীর নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা সে জানে, কিন্তু শুধু হাতে টাকা ধার দিয়া এক সময় সে তাহার অনেক উপকার করিয়াছে, সে কথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিলেই স্ত্রী অন্তত উপকারীর প্রত্যুপকারের জন্যও বাড়ীখানি ছাড়িয়া দিবে।

স্ত্রীকে হয়ত বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজনও হইবে না। মহাজনকে ফাঁকি দিবার জন্যও শিবপদ বাবু বাড়ীখানি রাণীর নামে লিখিয়া রাখেন নাই। ছোট্ট সেই জমিদারী মহল ও কলিকাতার এই বাড়ীখানি তিনি স্ত্রীর নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন শুধু এই জন্য যে, হঠাৎ যদি তিনি কোনদিন মরিয়াও যান ত' স্ত্রীকে তাঁহার পথে বসিতে হইবে না। কলিকাতার এই বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া কিম্বা ভাড়ায় বসাইয়াও রাণী এই জমিদারী মহলে গিয়া একখানি মাটির ঘরেও অন্তত বাস করিতে পারিবে।

এই মাড়োয়ারী-ভদ্রলোক যখন টাকা চাহিতে আসিয়াছিল, শ্রীহর্ষ তখন শিবপদ বাবুর কাছে বসিয়া। শ্রীহর্ষ বলিল, 'দাঁড়ান, আমার একটা জানাশোনা লোক আছে, তার কাছ থেকে আপনাকে কিছু টাকার জোগাড় আমি করে' দিতে পারি কি না দেখি!'

শিবপদ বাবু বড় দুঃখেই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, 'পাগল! আমায় আর টাকাকড়ি কেউ দেবে না শ্রীহর্ষ! বাড়ীখানা শেষপর্য্যন্ত বিক্রী করতেই হ'লো দেখছি।'

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ীর ন্যায্য দাম কত টাকা হ'তে পারে?'

শিবপদ বাবু বলিলেন, 'তা হাজার পঞ্চাশেক টাকার কম ত' নয়ই।'

সেইদিন হইতে উঠাউঠি কয়েক রাত্রি ধরিয়া শ্রীহর্ষের চোখে আর ঘুম আসিল না। ক্রমাগত সে চিন্তা করিতে লাগিল, এই সময় কিছু টাকা দিয়া শিবপদ বাবুর স্ত্রীর কাছ হইতে বাড়ীখানা মর্টগেজ লিখাইয়া লইলে কেমন হয়! মন্দ অবশ্য কিছুই হয় না, কিন্তু যে-শ্রীহর্ষ তাহার বাড়ীর দুধটুকু হইতে আরম্ভ করিয়া ছেঁড়া জামাটি পর্য্যন্ত শিবপদ বাবুর কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়াছে সে-ই আবার আজ কেমন করিয়া কি বলিয়া তাঁহাকে অত টাকা ধার দিবে—ইহাই হইল মহা-সমস্যার বিষয়। অনেক রকম করিয়াই সে ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিল—এত সস্তা দাঁও হাতছাড়া করা উচিত নয়, তাহা ছাড়া নগদ টাকা পরিশোধ করিয়া বাড়ী ছাড়াইবার মত অবস্থা শিবপদ বাবুর আর কোনোদিনই হইবে না, সুতরাং অতি অল্প টাকায় বাড়ীখানা ভবিষ্যতে তাহারই হইয়া যাইবে, কাহাকেও বধ করিতে হইলে এমনি করিয়াই করা উচিত, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা শ্রীহর্ষের এক রকম খারাপ হইয়া যাইবার জোগাড় হইল কিন্তু গোলমাল বাধিল শুধু ওই এক জায়গায়।

তবু সে হাল ছাড়িল না।

শিবপদ বাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'বলি হ্যাঁ হে শ্রীহর্ষ, সেই যে সেদিন বলেছিলে কে তোমার জানা-শোনা লোক আছে তার কাছে একদিন—'

শ্রীহর্ষ বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেদিন গিয়েছিলাম তার কাছে। বলে, মহাজনের ঋণটা শোধ করবার মত টাকা আমি দিতে পারি কিন্তু বাড়ীটা তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে মর্টগেজ রাখতে হবে। বললাম, তা না হয় রাখবে। সে বললে, দাঁড়াও তাহ'লে দুদিন ভেবে দেখি।'

শিবপদ বাবু খানিক ভাবিয়া বলেন, 'তার চেয়ে জমিদারী মহলটা বরং বিক্রি করে' ফেলি, না কি বল শ্রীহর্ষ! বাড়ীটা বন্ধক দিলে স্ত্রীর অবস্থাটা শেষে—ধর, আমি যদি হঠাৎ মরেই যাই…'

মহল বিক্রি করিয়াই পাছে ঋণ শোধ করিয়া ফেলেন ভাবিয়া শ্রীহর্ষ তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে,—'না না মহল বিক্রি করার চেয়ে বাড়ী বন্ধক দেওয়া ঢের ভালো। জমিদারী-মহল বলে' কথা! হাজার হোক, রাজার মতন মান-খাতির।'

সে কথাও সত্য। জমিদারীর আয় যদিও কিছুই নাই তবু প্রজারা অনুগত ভৃত্যের মত। বিপদে আপদে প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিবে।

শিবপদ বাবু বলেন, 'তার চেয়ে এক কাজ করি না শ্রীহর্ষ, ওই জমিদারীটাই তাঁর কাছে বন্ধক রাখি না! সেই কথাই তুমি একবার তাঁকে বলে দেখো। টাকাটা শোধ করতে না পারলে রাত্রে আমার আর ঘুম হচ্ছে না শ্রীহর্ষ। লোকটা আমায় বেশী করে' লিখিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু দশ হাজার টাকাও ত' নিয়েছি!'

শ্রীহর্ষ বলে, 'তা ঠিক রাজি হবে কি না জানি না। আচ্ছা, দেখি বলে'।'

এমনি করিয়া শ্রীহর্ষ দিন গত করিতে থাকে।

ওদিকে মাড়োয়ারী ভাবে, এমনি নালিশ করিয়া বিশেষ কিছু ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। তার চেয়ে শমন চাপিয়া চাপিয়া ভদ্রলোকের নামে বডি-ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া

একেবারে যদি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলা হয় ত' তখন লজ্জায় খাতিরে মান-সম্মান রক্ষা করিবার জন্যও হয় ত' বাড়ীখানা লিখিয়া দিবে।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। সম্মানে আঘাত করিয়া বাড়ীখানা আদায় করিবার পন্থাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া মাড়োয়ারী-মহাজন কৌশলে শিবপদ বাবুর নামে গ্রেফ্‌তারের পরোয়ানা বাহির করিয়া ফেলিল এবং একদিন সন্ধ্যায় শ্রীহর্ষের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া শিবপদবাবু আর বাড়ী ফিরিলেন না।

সংবাদটা রাণীর কাছে শ্রীহর্ষই পৌঁছাইয়া দিল। ঝি আসিয়া জানাইল যে, শ্রীহর্ষ বাবু বলিতেছেন—রাস্তা হইতে বাবুকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

রাণী বলিল, 'ডাকো শ্রীহর্ষ বাবুকে!'

শ্রীহর্ষ আসিয়া দাঁড়াইল। রাণী আর সেদিন তাহাকে লজ্জা করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে শ্রীহর্ষ বাবু?'

ইহাই উপযুক্ত সুযোগ ভাবিয়া পথের মাঝে শিবপদ বাবুর চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সংবাদটা শ্রীহর্ষ বেশ অতিরঞ্জিত করিয়াই রাণীকে জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও বলিল যে, তাঁহার স্বামীকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য কোনও একটি স্ত্রীলোকের কাছ হইতে কিছু টাকা সে সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে, রাণী যদি এই রাত্রেই সেই স্ত্রীলোকটির নামে তাহার এই বাড়ীখানি লিখিয়া দেয়।

রাণী সে কথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, 'আপনি বাড়ী যান শ্রীহর্ষ বাবু।'

স্ত্রীকে কোনরকমে রাজী করিয়া বাড়ীখানিই তিনি ঋণের দায়ে সেই মাড়োয়ারী-মহাজনকে দান করিবেন এই অঙ্গীকারে পরদিন বেলা প্রায় বারোটার সময় শিবপদ বাবু বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া দেখেন সর্ব্বনাশ!

স্ত্রী তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।—সেই রাণী, যাহাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এতদিন ধরিয়া যে রাণী ছিল তাঁহার নিত্য-সহচরী, সেই অনাঘ্রাতা সুন্দরী রাণী স্বামীর অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়াই দেহ হইতে প্রাণটাকে তাহার জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

মাড়োয়ারী-ভদ্রলোক শিবপদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

মৃতদেহ চালান গেল 'মর্গে'। সেখান হইতে শ্মশানে।

রাণীকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া উন্মাদের মত শিবপদ বাবু বাড়ী ফিরিলেন।

কিন্তু এমনি বিধাতার পরিহাস যে, রাণীর মৃত্যুর দশটি দিন তখনও পার হয় নাই এমন দিনে কলিকাতার এক সাহেব-কোম্পানী হইতে শিবপদ বাবুর নামে এক চিঠি আসিল; চিঠিতে লেখা—রাণীর নামে শিবপদ বাবু যে জমিদারী-মহলটি রাখিয়াছিলেন সেই মহলটি কোম্পানী নগদ পঁচিশ হাজার টাকায় খরিদ করিতে চায়। খরিদের সর্ত্ত পড়িয়া মনে হয়, কোম্পানী কোনরকমে জানিতে পারিয়াছে যে, উহার মাটির নীচে কয়লা আছে।

অন্য সময় হইলে এই লইয়া শিবপদ বাবু অনেক কাণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিতেন কিন্তু এখন আর তাঁহার সেরূপ মনের অবস্থা নয়। শ্রীহর্ষকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখেছ শ্রীহর্ষ, আমার ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তা ত' হবেই বাবু।'

শিবপদ বাবু বলিলেন, 'হবেই নয় শ্রীহর্ষ, এতদিন হয়নি আর আজ হঠাৎ এমন অজান্তে কেন হ'লো জানো?'

শ্রীহর্ষ হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

শিবপদ বাবু বলিলেন, 'মরবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতাম মানুষের সবই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এখন দেখছি তা হয় না শ্রীহর্ষ। মৃত্যুর পরেও রাণী আমায় ভুলতে পারেনি, আমার এই ঋণ-শোধের ব্যবস্থা সে-ই করেছে।'

বাড়ীখানা হাতছাড়া হইয়া গেল ভাবিয়া শ্রীহর্ষ একটুখানি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। বলিল, 'তা হবে।'

শিবপদ বাবু সেই দিনই মাড়োয়ারীর বাড়ী গিয়া কোম্পানীর কাছে মহল বিক্রী করিয়া টাকা তাহার পরিশোধ করিয়া দিলেন।

দশ হাজারের জায়গায় যে লোক পনর হাজার লিখাইয়া লইতে পারে তাহার ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া দেওয়া

উচিত নয় বলিয়া শ্রীহর্ষ তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু শিবপদ বাবু কিছুতেই সেকথা বুঝিলেন না, বলিলেন, 'পাগল! ও টাকা আমায় কে দিলে তা আমি বুঝতে পেরেছি শ্রীহর্ষ। এর মানেই হচ্ছে এই যে, যত শীঘ্র পারি ঋণ পরিশোধ করে' আমি যেন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। একটি দণ্ডের জন্যে যে আমায় চোখের আড়াল করতে চাইতো না, সেই রাণী—সেই রাণী আমার—' বলিতে বলিতে চক্ষু দুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

এবং তাহারই দিন দুই-তিন পরে রাণীর বিরহ তাঁহার যেন আর সহ্য হইল না, ঋণমুক্ত অবস্থায় রাণী যে-ঘরের ঠিক যে-জায়গায় মরিয়াছিল ঠিক সেই জায়গায় দেওয়ালে টাঙানো রাণীর একখানি ছবির সুমুখে দেখা গেল, তিনি উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন, হাতে তাঁহার দু'নলা বন্দুক, সমস্ত মুখের চেহারা বিকৃত—রক্তাক্ত।

নিজের হাতে বন্দুকের গুলি করিয়া তিনিও আত্মহত্যা করিলেন।

দিন কয়েক পরে এটর্নির বাড়ী হইতে চিঠি আসিল শ্রীহর্ষর নামে। মরিবার আগে শিবপদবাবু তাঁহার শেষ উইল রেজেষ্ট্রী করিয়া তাঁহার এই কলিকাতার বাড়ীখানি দরিদ্র বন্ধু শ্রীহর্ষকে দান করিয়া গেছেন।

এই ত' গেল বাড়ীর ইতিহাস। কিন্তু সে আজ প্রায় বাইশ বৎসর আগেকার কথা। বাইশ বৎসরে পাকা এই অতবড় একখানা বাড়ীর এহেন শোচনীয় দুর্দ্দশা হইবার কথা নয়, কিন্তু কেন হইয়াছে সে কথা আমরা জানি।

সেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রি স্মরণ করিলেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। শ্রীহর্ষের মত পাপিষ্ঠ নরাধমকেও চোখ বুজিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়। কেন হয় সে কথা পরে বলিতেছি।

শ্রীহর্ষ এখনও তাহার ওই মাথার উপরের বিরাট ধ্বংস-স্তূপের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলে, 'সিঁড়িটা ধসে গেছে, ওপরে যাবার উপায় নেই, নইলে তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।"

ঢোক গিলিয়া বলে, 'দেখিয়ে দিতাম—বাড়ীর সব ঘরই গেছে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে—কিন্তু আশ্চর্য্য, যায়নি শুধু সেই ঘরখানি যে-ঘরে বাবু আর গিন্নি দুজনেই মারা গেছেন। ওই যে হাঁ করে' কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে,—ওরই ওই পাশের ঘরখানি।'

'যে বাড়ীখানির লোভে শিবপদবাবুকে শ্রীহর্ষ বেনামীতে টাকা ধার দিতে চাহিয়াছিল, সেই বাড়ীই যে আজ এমন করিয়া শ্রীহর্ষর হাতে আসিবে তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করে নাই। শেষ বয়সে অর্থাভাবে অশেষবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া শিবপদবাবু আজ মরিয়াছেন, হাতে টাকা থাকিতেও যে শ্রীহর্ষ তাঁহাকে সাহায্য করে নাই আজ সেই শ্রীহর্ষকেই তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া গেছেন।

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া এটর্নী বাড়ী হইতে শ্রীহর্ষ ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী তখন তাঁহার শিশুকন্যা মালতীকে দুধ খাওয়াইতেছিল, হাসিতে হাসিতে স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, সত্যিই পেয়েছ?'

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'হ্যাঁ. সত্যিই।'

মেয়েকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখিয়া স্ত্রী তাহার জানালার বাহিরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখছ কি অমন করে?'

স্ত্রীর তখন দু'চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়াছে। বলিল, 'দেখিনি কিছু। কিন্তু ওই ওঁকেই তুমি তখন টাকা ধার দিলে না। ছি!'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তোরা মেয়েমানুষ বাপু মেয়েমানুষের মত থাক্ না! তোদের অতসব কথায় কাজ কি বল্ ত?'

স্ত্রী চুপ করিয়া হেঁটমুখে আবার তাহার মেয়েকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'টাকা ধার দিলে পেতিস্ ওই অতবড় বাড়ীখানা—দিতো তোকে খাইয়ে! টাকা দিলে ওর বৌ অমনি গলায় দড়ি দিয়ে মরতো বুঝি! আর বৌ না ম'লে বাবুও মরতো না, বাড়ীও পেতাম না।'

এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আবার বলিল, 'এ বাবা ভালই হয়েছে, ঈশ্বর যা করেছেন মঙ্গলের জন্যেই। চল—বাড়ীউলিকে বলা যাক্, কালই আমরা ও উঠে যাই।'

স্ত্রী এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল 'কালই যাবে?'

'হাঁা, কালই। শুভস্য শীঘ্রং। গিয়ে একবার দখলটা নিয়ে তারপর বরং অতবড় বাড়ী-ভাড়ায়-টাড়ায় বসিয়ে আমরা অন্য কোথাও একটা ছোট-খাটো বাড়ী দেখে উঠে যাব।'

স্ত্রী আর কোনও কথা বলিল না, কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে শ্রীহর্ষ হড়বড়, করিয়া বলিয়াই চলিল,—'আমাদের এই মেয়েটা বেশ পয়মন্ত মেয়ে। ওটা দেখতেও সুন্দরী হবে, আর ত্মাখো, বেশ একটি ভাল ছেলে দেখে অনেক টাকা খরচ করে ওর বিয়ে দেবো। ও বাড়ীতে গিয়ে একটা ঝি রাখতে হবে। একা একা মেয়েটাকে নিয়ে কাজকর্ম করতে তোমার কষ্ট হয়। এ বাড়ী থেকে কাল উঠে যাব কেন বলছি জানো? কাল মাসের পনেরোই। কাল উঠে গেলে এক মাসের পুরো ভাড়া আর দিতে হবে না, অর্দ্ধেক দিলেই হবে, না কি বল? বাড়ীউলি যদি কিছু বলে ত তুমি বরং তাকে বুঝিয়ে বোলো। বাড়ীখানা পেয়েছি বলেই আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গিয়ে পুরো মাসের ভাড়াই দেবো তা যেন বলে বোসো না, বুঝলে? বাড়ী পেয়েছি সেকথা ও মাগীকে জানাবারই বা কি দরকার! জানিয়ো না, বুঝলে? জানালে হয়ত কিছুতেই ছাড়বে না। —বা-রে! উঠে যাচ্ছ যে? কথা গুলো বুঝি তোমার কানেই গেল না? এ হারামজাদীকে নিয়ে আমি এক ভারি বিপদে পড়েছি দেখছি।'

(ক্রমশঃ)

আর এক দিক

শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাদ গান্ধী যে মাতৃগর্ভ থেকেই মহাত্মা হ'য়ে জন্মান নি সে কথা তিনি আত্মজীবনীতে বার বার করে লিখলেও আমাদের বিশ্বাস করতে বাধে। আমরা আজ যাঁকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করছি, তিনি যে ছোট ছিলেন, দুষ্টু ছিলেন, বাবু ছিলেন এসব কথা ভাবতেও ভরসা হয় না। কিন্তু আমরা না ভাবলেই বা, অন্যলোকে ভাবতে ছাড়বে কেন? ইউনাইটেড প্রেস বলছেন—মহাত্মা যখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তখন ছাত্র-মহলে তাঁর চলতি নাম ছিল—গান্ধী দি ড্যাণ্ডি অর্থাৎ বাবু গান্ধী। গান্ধীজীর যৌবনে বিলাত-প্রবাসের সময়, এখন যেমন ধনী হিন্দু (ভারতীয় অর্থে) ছোক্‌রা দেখলেই তাকে কাপ্তেন করার চেষ্টা হয় তখন তাঁকেও তেমনি কাপ্তেন করার চেষ্টা হত; মহিলা-মহলে তিনি শেক (অনেকটা নবাবের মত) বলে খাতির পেতেন।

কমেডিয়ান বা হাস্যরসিক নট (ভাঁড়) হিসেবে যাঁরা নাম করেন তাঁদের বিপদের রকম আছে। প্রোফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় একবার এক শ্রাদ্ধ-ভোজে নিতান্ত সহজ ভাবেই 'একটু নুন দেবেন মশাই' বলে এক কাণ্ড বাধিয়েছিলেন; বাৎসরিক শ্রাদ্ধ নয়, নিয়ম-ভঙ্গের ব্যাপার! সেইদিনই অশৌচ শেষ হয়েছে—এমন অবস্থাতে ওই 'একটু নুন দেবেন মশাই' শুনে চারিদিকে সে কি হাসির ঘটা! সবাই বিষম খেয়ে সে এক বিষম ব্যাপার! বুড়ো উইলিয়াম কোলিয়ারকে বলতে শোনা যেত যে, যদি তিনি কোনো দিন নিতান্ত গম্ভীর মুখে কাঁদ কাঁদ হয়েও কোথাও প্রকাশ করেন যে তাঁর বাবা মারা গেছেন, তাহলেও লোকে হেসে গড়িয়ে পড়বে। হাস্য রসিকদের সম্বন্ধে ব্যাপার হলেও দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

হেনরী ওয়ার্ড বীচার নামজাদা পাদ্‌রী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা 'শুনবো না' বলে মুখ গোমড়া করে বসে থাক্‌বার কারো জো ছিল না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক শ্রোতাকেও কান খাড়া করিয়ে শোনাবার প্রতিভা তাঁর ছিল। একবার হয়েছিল কি—ভার্জ্জিনিয়ার এক সহরে জুলাই মাসের এক সকালে তিনি উপস্থিত হলেন। বক্তৃতা-বাজরা সেই সহরের নাম রেখেছিলেন "ডেথ-ভ্যালী" বা মৃত্যু-উপত্যকা এবং অনেক দুঃখেই ও-নাম রেখেছিলেন। কারণ, যখনই তাঁরা তামিল টামিল দিয়ে পাঁয়তাড়া ভেঁজে সেখানে বক্তৃতা দিতে গেছেন, ওখানকার হাঁদা বোকা লোকগুলোর জন্যে বক্তৃতা জমে নি—ব্যর্থ হয়েই তাঁদিকে ফিরতে হয়েছে। বীচার জেনে শুনেই তো সেখানে গেলেন। সেদিন বিকেলে যখন বক্তৃতামঞ্চে তুলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হচ্ছিল, অর্দ্ধেক লোক তখনই ঝিমুতে সুরু করেছে। বীচার চেয়ার ছেড়ে কপালের ঘাম রুমালে মুছে মঞ্চের ঠিক সামনে এসেই সুরু করলেন—"It's a God-damned hot day"—অর্থাৎ দিনটা এমনই গরম যে মনে হয় ঈশ্বরের অভিশাপ লেগেছে। এখন damned কথাটা সাধারণ ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য; একজন নামজাদা পাদ্‌রীর মুখে ঐ কথা শুনে ওই বোকা সোকা লোকগুলো যেন চম্‌কে উঠল—হাজার চোখ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল—বীচার একটু থেমেই আবার সুরু করলেন। "আজ বিকেলে একজনকে এই কথাটা বল্‌তে শুনেছি" বলেই তিনি এই ধরণের ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক তীব্র বক্তৃতা করলেন। লোকগুলো শেষ পর্য্যন্ত হাঁ করে শুনে গেল।

রুডল্‌ফ ডি স্প্রেকেল্‌স একবার কালিফোর্ণিয়ার এক বাদশাহী হোটেলে গিয়ে ওদেশের নিয়মমত নিজের নাম সই করছেন, হোটেলের কেরাণী তাঁর সই দেখে চিনতে পেরে বললে, আজ্ঞে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের "গোলাপ কুঞ্জ" ঘরটায় থাকবেন।

স্প্রেকেল্‌স বললেন, অত বেশী খরচা দিয়ে থাকা তাঁর পোষাবে না, কম খরচের একটা ঘর হ'লেই তাঁর চলবে।

কেরাণী বাধা দিয়ে বললে, সে কি মশাই, আপনার ছেলে এখানে এলেই যে ওই গোলাপ-কুঞ্জে থাকেন!

স্প্রেকেল্‌স জবাব দিলেন—সে থাকতে পারে মশাই, তার বাপ বড়লোক; আমার তার মত কপাল নয়।

আর্থিক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালার আর্থিক প্রগতির নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গালার আর্থিক দুরবস্থার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন-পত্র দাখিল করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিবিধ আর্থিক সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অতঃপর বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টকে প্রণালীবদ্ধ মতে রক্ষণ ও সংগঠন-মূলক প্রচেষ্টা করিতে হইবে—ইহাই উক্ত আবেদনের স্থূল মর্ম্ম। এজন্য বেঙ্গল চেম্বারের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্যর আর্থার সল্টার-এর প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে এক প্রাদেশিক ইকনমিক কৌন্সিল বা অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান-সমিতি গঠন করা উচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—উদ্দেশ্য, এই কৌন্সিল বা সমিতি প্রাদেশিক যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

আমরা বেঙ্গল চেম্বারের এই প্রস্তাব বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে করি। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রণোদিত রাষ্ট্র-সংস্কারের পর হইতেই বাঙ্গালার আর্থিক সমস্যা বিভিন্ন প্রকারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের ঘাটতি বজেট, মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা, পাটের মন্দা বাজারে চাষীর অবস্থা-বিপর্য্যয়,—ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রমাগত আমরা অভিযোগ করিতেছি এবং শুনিতেছি। কিন্তু এই বিভিন্নমুখী জটিল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কেহই সম্যক রূপে পথ প্রদর্শন করেন নাই। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙ্গালার ব্যবসা-শিল্প সম্বন্ধে যে সকল আইন-প্রস্তাব আলোচিত বা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহা কোন ব্যাপক পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কাজেই তাহার সহায়তায় বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহতই থাকিবে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গৃহীত 'ষ্টেট্ এড্ টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ অ্যাক্ট' বা বিগত বৎসরে প্রস্তাবিত 'মনি-লেণ্ডার্স বিল' ইত্যাদি সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রসংস্কারের উপর সকল দোষ আরোপ করিয়া যাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার সরকারের আয়ের সংস্থান বাড়াইয়া দিলেই প্রাদেশিক আর্থিক দুর্গতির অবসান হইবে না। এই দুর্গতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার অপসারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাহারও মূলে ব্যাপক পরিকল্পনার শক্ত বনিয়াদ থাকা চাই। নতুবা অনেক চেষ্টাই হইবে না বা হইলেও তাহা ফলবতী হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-এ স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা বাড়িলেই যে এ সমস্যা অপ্রত্যাশিত রূপে সরল হইয়া যাইবে, এমন নয়। ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত মন্ত্রীগণকেও ইহার জন্য কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ সংগঠন-মূলক নীতি রাষ্ট্র যন্ত্রের নিত্য-পরিচালনভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, সেই গভর্ণমেণ্ট-এর পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব বা সহজ নহে বলিয়াই প্রস্তাবিত 'ইকনমিক কৌন্সিল' ইতিমধ্যে জার্ম্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নানা মূর্ত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইদানীং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায়ও এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও যে ইহার অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বাঙ্গালার সহিত ভিন্ন প্রদেশের আর্থিক স্বার্থ-সংঘর্ষ

'ইকনমিক কৌন্সিল'-এর প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য হইলেও আমরা বেঙ্গল চেম্বারের আবেদনের কতকগুলি যুক্তি আন্তপ্র্াদেশিক ঈর্ষ্যা-উদ্দীপক বলিয়া মনে করি। উক্ত চেম্বার বাঙ্গালার আর্থিক দুরবস্থার কথা বিশদভাবে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এ যাবৎ রক্ষণ মূলক যে-সকল শুল্ক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার সুবিধা অর্জ্জন করিয়াছে বাঙ্গালা বাদে অপর সকল প্রদেশ, কিন্তু

তাহার দরুণ চড়াদরের গুরু ভার বহন করিতে হইয়াছে দরিদ্র বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার জন্য কার্পাস-বস্ত্র, করগেট টিন, গম, লবণ প্রভৃতির উপর ধার্য্য সংরক্ষণমূলক আমদানী-শুল্কের কথা ও তাহার তাৎপর্য্য অর্থাৎ তাহার দরুণ অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল আমদানী-শুল্ক বসাইবার ফলে বাঙ্গালার অধিবাসীকে চড়া দরের দায় সামলাইতে হইতেছে বটে, কিন্তু নির্ব্বিচারে বর্ত্তমান ধার্য্য শুল্ক রদ করিয়া দিবার পক্ষে তাহা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ হইতে পারে না। আমদানী-শুল্কের সুবিধা পাইবার পক্ষে যে কোন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অসাম্য থাকিবেই। এই অসাম্য বর্জ্জন করিয়া আমদানী-শুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ করা অনেক স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বেঙ্গল চেম্বারের এই অসাম্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন নহে। বর্ত্তমান আমদানী-শুল্ক রদ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদেশী মাল কাটৃতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং সেরূপ ঘটিলে যে অনেক ইংরেজ বণিকেরই সুবিধা হইবে, ইহা অতি সহজ সিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। চড়া দরের দরুণ বাঙ্গালার অধিবাসীকে অতিরিক্ত মাত্রায় পীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে, একথা বলিয়া বাঙ্গালা-প্রদেশকে আমদানী-শুল্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চাহিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ শুল্ক বাঙ্গালার পক্ষে ক্ষতিজনক হইলেও তাহা নিরপেক্ষ ভাবে শুল্ক রদের সমর্থক কারণ হইতে পারে না। বর্ত্তমান আমদানী-লবণ-শুল্ককে আমরা এই পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি। এ বিষয়ে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে যে আপত্তির কারণ রহিয়াছে তাহা নির্ব্বিচারে শুল্ক রদ করিয়া দিবার প্রস্তাবের সমর্থক নয়। ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সংস্থান হইতে ভাতা দিয়া এই দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণের পন্থা রহিয়াছে বলিয়া এবং মুখ্যতঃ একমাত্র বাঙ্গলা দেশকেই এই শুল্কের গুরু ভার বহন করিতে হয় বলিয়া বাঙ্গালার অধিবাসী লবণের উপর ধার্য্য আমদানী-শুল্কের বিরুদ্ধবাদ করিয়াছে; বর্ত্তমান শুল্কের সুবিধা কেবলমাত্র বোম্বাই প্রদেশের লবণ-কারখানাগুলি অর্জ্জন করিতেছে বলিয়া নহে। রক্ষণশীল আমদানী-শুল্ক সম্বন্ধে বাঙ্গালার ঈর্ষ্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই; বরং আক্ষেপ করিবার কারণ রহিয়াছে এইজন্য যে, অনেক স্থলেই এইপ্রকার শুল্কের সুবিধা পাইয়াও বাঙ্গালায় শিল্প-প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ হইতেছে না, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা চিনির কারখানার কথা উল্লেখ করিতে পারি। আজ এক বৎসর পূর্ব্বে আমদানী বিদেশী চিনির উপর দীর্ঘ পনেরো বৎসরের জন্য রক্ষণ-মূলক শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে,—তাহার পর হইতে বিহার প্রদেশে ক্রমাগত অনেকগুলি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত পুঁজিপতিরা এ বিষয়ে উদাসীনই রহিয়াছেন বলিতে হইবে। কেবল দু'একটী কোম্পানীর অংশ মূলধন-সংগ্রহের আয়োজন চলিতেছে মাত্র। ইহার পর যদি বাঙ্গালার অধিবাসীকে কিঞ্চিৎ উচ্চ মূল্যে বিহার বা যুক্ত প্রদেশের কারখানার চিনি ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের হয়ত পুনরায় চড়া দরের লোকসান সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু সে জন্য আমদানী-শুল্কের দোষ ধরিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে কেন?

বাণিজ্য-স্বার্থ-সংরক্ষণে গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণের সমস্যা যেরূপ ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়িগণের ক্ষোভ অপসারিত হইবে না। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে এদেশে যে সকল ব্যবসায়িক কারবার বা শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমদানী-শুল্কের সুযোগ বা সাক্ষাৎ ভাবে রাজস্ব হইতে সাহায্যপ্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা চলিবে না। ভারতবর্ষে যে সকল শক্তিমান বিদেশী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই মীমাংসার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। দেশীয় শিল্পসহায়ক যে কোন সুবিধা সমভাবে ইহাদের আয়ত্তাধীন হইলে ভারতীয়গণের শিল্প-প্রতিষ্ঠা অনেক পরিমাণেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে; কারণ এই সকল বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার বিপদ ঘাড়ে করিয়া অনেক শিল্পপ্রচেষ্টাই ফলবতী হইবে না। এই মীমাংসার ফলে ভারতবর্ষে শিল্প-সংরক্ষণমূলক শিল্প-ব্যবস্থার তাৎপর্য্য অনেকাংশে অলীক প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

কেন্দ্রীয় 'রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক'-গঠনের প্রস্তাব

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে আপত্তির কারণ থাকিলেও গোলটেবিল বৈঠকের আর একটী সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের গৃহীত কর্জ্জ-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও আর্থিক মান ও বিনিময়-মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে স্থির হইয়াছে যে আপাতঃপক্ষে এই সকল বিষয় গবর্ণর জেনারেলের সম্মতিসাপেক্ষ থাকিলেও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক নির্ব্বাচিত মন্ত্রীবর্গের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। এই প্রকার শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তরের তাৎপর্য্য সঠিক বুঝিতে হইলে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময়, গঠন-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালন-ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত না হইলেও গভর্ণমেণ্টের সহিত এই ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকিবেই। গভর্ণমেণ্ট কোনরূপে ইহার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে, এই ব্যাঙ্কের দ্বারা দেশীয় ব্যবসা-শিল্পসহায়ক অনেক কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব থাকিয়া যাইবে। এ সমস্যা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। তারপর ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধেও স্থিরনিশ্চয় কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বতোভাবে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ বণ্টন ব্যবস্থায় যেরূপ বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইতেছে, ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ-সংগ্রহের পর কখন এরূপে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে তাহা বিশেষ সমস্যামূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কার্য্যতৎপরতা সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়াই দৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে স্বায়ত্ব শাসন লাভ করিবার পক্ষে যে পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা খুব অনায়াসগম্য নহে।

পাট-রপ্তানী শুল্ক

বাঙ্গালার পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকের আর একটি মীমাংসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান পাট-রপ্তানী-শুল্কের অন্যায় সম্বন্ধে বাঙ্গালার অধিবাসী কয়েক বৎসর যাবৎ তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছে। শুল্ক-নির্দ্ধারণের ফলে বাঙ্গালার সরকারকে প্রতিবৎসর তিন কোটি টাকা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। ফলে বাঙ্গালায় বজেট ঘাটতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ-গঠন-সহায়ক বিভাগে আর্থিক অভাবহেতু শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টও পাটরপ্তানী-শুল্ক প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বিগত সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজ-সভায় বাঙ্গালার গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন এ বিষয়ে বাঙ্গালার দাবী সমর্থন করিয়া স্পষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। গোলটেবিল বৈঠকেও বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ ইহার জন্য দাবী পেশ করিয়াছেন। উক্ত বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট অনধিক দুইকোটি টাকার জন্য পাটের উপর আবগারী টেক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন, তদনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রপ্তানী-শুল্কের আদায়ের হার কমাইয়া দিবেন। গোলটেবিল বৈঠকের এই রূপ বন্দোবস্ত সমর্থন করা সম্ভব নহে। পাট-রপ্তানী-শুল্কের উপর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কোন দাবী নাই,—একথা আধুনিক রাজস্ব-বিজ্ঞানের স্থূল নীতি অনুসারে অবশ্য স্বীকার্য্য। এমতাবস্থায় শুল্কের আদায়ে অন্যায়রূপে ভাগ বাটোয়ারা করিতে চাহিলে বাঙ্গালার অধিবাসী পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহিবে কেন ?

ব্যবসায়ে সালতামামী

ইংরাজী ১৯৩২ সালের হিসাব নিকাশ করিবার সময় এখনও হয় নাই। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বাৎসরিক তথ্যসমূহ বাহির হওয়ার পূর্ব্বে সারা বৎসরের সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যে সকল তথ্য এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে প্রথমেই এই কথা বলা যায় যে বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দা আরম্ভ হওয়ার পর ব্যবসায়ীদের পক্ষে ১৯৩২ সালের মত এত কষ্টদায়ক আর কোন বৎসর আসে নাই। ১৯৩১ সাল গত হওয়ার পরে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে ব্যবসা-মন্দার তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে ; কিন্তু এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল দেশেরই ব্যবসায়িগণ নিরাশ হইয়াছেন। পণ্য দ্রব্যের

বাজার-মূল্য কমিতে কমিতে এত নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যে, কি চাষী কি ব্যবসায়ী কেহই এখন আর তাঁহাদের তৈয়ারী-খরচাও আদায় করিতে পারিতেছেন না। সকলেরই অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুত-কারকগণের তুলনায় কৃষিজীবীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী খারাপ হইয়াছে। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক শিল্পদ্রব্যের মূল্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার-দর অধিকতর ভাবে কমিয়া যাওয়ায় চাষীরা এখন তাহাদের দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বর্ত্তমান বাজার-মন্দার তীব্রতা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানেই বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে : এবং এই হিসাবে ১৯৩২ সালে ভারতের আর্থিক ইতিহাস চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ব্যবসা-মন্দার তীব্রতার আর একটী উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের বহর গত ক'এক বৎসর যাবৎ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ১৯২৯-৩০ সালে আমরা বিদেশ হইতে ২৪০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য কিনিয়াছিলাম; ১৯৩০-৩১ সালে তাহা কমিয়া ১৬৪ কোটিতে এবং ১৯৩১-৩২ সালে ১৩৪ কোটিতে দাঁড়ায় ; অর্থাৎ দুই বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের মূল্য কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসের আমদানীর বিবরণী হইতে যাহা দেখা যায় তাহাতে মনে হয় না যে ১৯৩২-৩৩ সালের অবস্থা ১৯৩১-৩২ সালের অপেক্ষা খুব বেশী ভাল হইবে। এই আট মাসে আমরা ৯২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছি।

আমদানী বাণিজ্যের মূল্য এত কমিয়া যাওয়ার তিনটী প্রধান কারণ আছে ; প্রথমতঃ মোট মূল্যের হ্রাস যে হারে হইয়াছে, মোট পরিমাণের হ্রাস সে অনুপাতে হয় নাই। পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যহ্রাসের জন্য আমদানী-বাণিজ্যের বহর যে পরিমাণে কমিয়াছে, মূল্য তাহাপেক্ষাও বেশী কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর সংরক্ষণ-শুল্ক বসানো হওয়াতে স্বভাবতঃই বিদেশী আমদানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ; স্বদেশী মনোভাবের ক্রম-বিস্তারের জন্যও লোকে বিদেশী জিনিস কম কিনিয়াছে। কিন্তু আমদানীর মোট মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ হইল রপ্তানীর পরিমাণ এবং মূল্যের অভূতপূর্ব্ব হ্রাস নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১-৩২
৩১৮ কোটি	২২৬ কোটি	১৬০ কোটি

আমদানীর ন্যায় রপ্তানীরও মূল্য দুই বৎসরে প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। কিন্তু গত আট মাসে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে। এই কয় মাসে মোট রপ্তানীর মূল্য মাত্র ৮৪ কোটি টাকা ; বাকী চার মাসে খুব বেশী করিয়া ধরিয়াও আমরা যদি ৫০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি তাহা হইলেও মোট রপ্তানীর মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশী হইবে না। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান বাজার-মন্দার জন্যই রপ্তানীর পরিমাণ এবং মূল্য এত অধিক হ্রাস হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেরই লোকের ক্রয়শক্তি অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়ার দরুণ তাহারা বিদেশ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা কম মূল্যের জিনিস কিনিয়াছে।

রপ্তানীর মূল্যের সহিত আমদানীর মূল্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহা সকলেই জানেন। আমরা রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে যে টাকা পাইব তাহা দিয়াই বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারিব। কাজেই রপ্তানীর মূল্য হ্রাস হওয়ার দরুণ আমদানীর মূল্যেরও হ্রাস হইয়াছে।

এই সম্পর্কে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। চিরকালই আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের বিশেষত্ব ছিল এই যে, আমদানীর মূল্য অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য বেশী ছিল এবং উদ্বৃত্ত রপ্তানীবাবদ আমরা বরাবরই বিদেশ হইতে টাকা পাইয়াছি। প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার সোনা এই জন্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর হইতেই আমাদের আমদানী ও রপ্তানীর এই প্রভেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল এবং ক্রমে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে রপ্তানীর মূল্য অপেক্ষা আমদানীর মূল্য বেশী হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর এখন অবশ্য আবার রপ্তানীর মূল্য আমদানী অপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইবে ; কিন্তু গত আট মাসের একত্রিত হিসাব হইতে দেখা যায় যে এই কয় মাসে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য এখনও ১২ কোটি টাকা কম আছে।

এই অবস্থায় অতিরিক্ত আমদানীর মূল্য শোধ করা সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বলা যায় যে গত পূর্ব্ব বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে আমাদের দেশ হইতে যে পরিমাণ সোনা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য বাবদ এই দেনা শোধ হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই সোনা বিদেশে চালান না হইলে আমরা কিছুতেই আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের সমতা রক্ষা করিতে পারিতাম না, ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও এই স্বর্ণ-রপ্তানীকে কিছুতেই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বলা যায় না। এই বিষয় বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই এক বাক্যে এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোনও রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, এবং ইহার ফলে গত পনেরো মাসে ১০০ কোটিরও অধিক মূল্যের সোনা বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে।

১৯৩২ সালে আমাদের দেশে আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি অন্যতম। অটোয়া কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত একটী চুক্তি করিয়াছেন যে অন্যান্য বিদেশের জিনিষের উপর তাঁহারা যে হারে আমদানী-শুল্ক বসাইবেন, বিলাতী জিনিষের উপর তদপেক্ষা শতকরা দশ হিসাবে কম বসাইবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ইংলণ্ডে আমাদের দেশের পণ্যদ্রব্যের আমদানী সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই চুক্তির ফলে যে আমাদের কোনও উপকার হইবে না পরন্তু দেশের অপকার হওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটাধিক্যে চুক্তি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ হইবে। এই চুক্তি গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষের বাস্তবিক কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা আরও কিছু দিন না গেলে বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইবেই।

১৯৩২ সালের আর একটী প্রধান ঘটনা চিনি-শিল্পের সংরক্ষণ সঙ্কল্পে বিদেশী চিনির উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক বসানো। এই সংরক্ষণের ফলে ইতিমধ্যে আমাদের দেশে অনেকগুলি নূতন নূতন চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; এবং অদূরভবিষ্যতে আমাদিগের প্রয়োজনীয় চিনির অনেক পরিমাণ যে আমরা আমাদের দেশেই পাইব সন্দেহ নাই; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই নূতন কারখানাগুলির মধ্যে একটিও বাঙ্গালী পরিচালিত নহে, এবং খুব কম কারখানাতেই বাঙ্গালীর মূলধন খাটিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালীর এই ঔদাসীন্য কবে দূর হইবে?

ভারতে জীবন-বীমা

জীবন বীমার ব্যবসায়ে কোন একটা তুলনামূলক আলোচনা করা শক্ত। দেশের আর্থিক অবস্থার ওপরই সব নির্ভর করে কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা জানি যে আমেরিকায় এ ব্যবসা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করেছে। সেখানে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ গড়ে দৈনিক ১৪৲ আর আমাদের গড়ে আয় ৵০ আনা মাত্র। সেখানে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ প্রায় ৪০০০৲ টাকা (বর্ত্তমান এক্‌সচেঞ্জ, Exchange হিসাবে)। আর আমাদের দেশে মাত্র ৫৲ টাকা। অর্থাৎ ৮০০ ভাগের এক ভাগ। ভারতবর্ষ কোনও দিন আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হতে পারবে এ আশা করি না। যদি ধ'রে নিই যে আমরা আরও ৫০ বৎসর চেষ্টার ফলে ১৯৮৩ সালে, আমেরিকার তুলনায় এক-দশম অংশ বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারি, তবে আমাদের বীমার পরিমাণ হবে ৪০০৲×৩,৫০,০০০,০০০ কোটী=১,৪০০,০০০,০০০,০০ কোটী। অর্থাৎ মাথাপিছু যদি ৪০০৲ বীমা গড়ে হয় তবে ৩৫ কোটী লোকের মোট বীমার পরিমাণ হবে চৌদ্দ হাজার কোটী টাকা।

বর্ত্তমানে আমাদের বীমার পরিমাণ আছে প্রায় ১৬০ কোটী টাকা। দেশী কোম্পানীর সংখ্যা ১২৬টী, সুতরাং গড়ে প্রত্যেক কোম্পানীর কাজের পরিমাণ ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকার কিছু উপর। এর মধ্যে একটী কোম্পানীর বীমার পরিমাণই ৪০ কোটী টাকার উপর এবং তা যদি বাদ দিয়ে হিসাব করতে হয় তবে গড় বীমার পরিমাণ আরও অনেক কমে যাবে। যাই হোক আমরা ধরে নিলাম যে বর্ত্তমান জীবন-বীমার পরিমাণ গড়ে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা। ৫০ বৎসর পরে দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি হবে একথা নিশ্চয়। আর একটা কথাও ধ'রে নিই যে তখন গড়ে প্রত্যেক কোম্পানীর ১ কোটী ২০ লক্ষের স্থলে বীমার পরিমাণ হবে ১০ কোটী টাকা। তা'হলে দেখতে পাই যে ১৪০০০ কোটী টাকার বীমা ব্যবসা করার জন্য ১৪০০ খুব ভাল এবং বড় কোম্পানীর দরকার হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আরও বহুগুণ না বাড়লে এবং আমাদের আর্থিক অবস্থা সেই অনুপাতে না উন্নত হলে এই হিসাবের কোন সার্থকতা হ'বে না। সাধারণের মনে মোটামুটী একটা ধারণা জন্মেছে যে দেশে অনাবশ্যক বহু কোম্পানী হয়েছে। সে কথাটা একটু আলোচনা করা দরকার মনে করে এই তুলনামূলক সমালোচনা করেছি। হয়ত এ একেবারে স্বপ্ন। কোনও দিনই, অন্ততঃ ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে হয়ত এমন অবস্থা হবে না যখন ১৪০০০ কোটী টাকার বীমার কাজ ভারতীয় কোম্পানীকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এতো আমেরিকার অনুপাতে এক-দশম অংশ মাত্র। সেটাকে আমরা ৫০ বৎসর পরেও অসম্ভব বলে ভাবতে চাই না। সুতরাং আমার মনে হয় দেশে আরও অনেক ভাল কোম্পানীর দরকার আছে এবং আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ হয় নাই।

ভারতে রেলগাড়ীর আগমন

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতি এমন কি কৃষির রূপান্তর ও বিস্তৃতি চিরদিনই তাহার যানবাহনাদির সুযোগের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে। জাতির অর্থনৈতিক জীবনে সে জন্য আমাদের জলপথ, সমুদ্রপথ, ও রেলপথের আদর এত বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমাদের আর্থিক প্রচেষ্টা নূতন ধারায় চলিতে পারিয়াছে প্রধানতঃ আমাদের দেশে রেলগাড়ীর প্রচলন ও বিস্তৃতি হইবার দরুণ। ভারতবর্ষে এই নূতন শক্তি কি রূপে প্রবর্ত্তিত হইল তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তাহার পরেও অনেক দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাহাদের না ছিল বাহিরের জগতের সহিত সম্বন্ধ, না ছিল নূতনের সন্ধানের চেষ্টা। সমস্ত জাতি যেন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব-স্বপ্রধান জনমণ্ডলীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরাকালের হিন্দু রাজাদের ধর্ম্ম, দর্শন ও সভ্যতার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মোগল রাজশক্তিও ক্ষীণবল হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ বণিক্‌গণ তখন এদেশে রাজত্ব-বিস্তারের চেষ্টায় ব্যাকুল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অর্থসংগ্রহ ভিন্ন অন্য দিকে মন দিবার তখনও তাঁহাদের অবকাশ হয় নাই। এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই আমাদের রাজপথগুলি সংস্কারের অভাবে দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল, এবং উপযুক্ত শাসনের অভাবে এই দুর্গম পথও বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়ায় গ্রামগুলির কূপমণ্ডুকতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। দূরবর্ত্তী গ্রাম ও নগরে পণ্য-সরবরাহের নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে নৌকাযোগে অথবা ভারবাহী পশুর সহায়তায় উহা সম্পন্ন করিতে হইত। এ অসুবিধার দরুণ বাণিজ্য তেমন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তদানীন্তন জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক লিখিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবীতে বোধ হয় এমন দেশ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না, যেখানে জনসাধারণ এরূপ সমৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান অথচ রাস্তাঘাট এরূপ শোচনীয় এবং গতায়াত এমন দুরূহ। হাজার হাজার মাইলের মধ্যে কোনরূপ গাড়ীচালনা অসম্ভব ছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরু, মহিষ, উট ও ঘোড়া দ্বারা পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইত। ইহাতে একদিকে যেমন খরচ পড়িত বেশী, অন্যদিকে তেমনি পণ্যের ভারে পশুদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। এমন কি ইহাও শোনা যায় যে এই সকল মৃত পশুদের হাড় দেখিয়া পথিক তাহার রাস্তা ঠিক করিয়া লইত।

ইহার ফলে প্রতি গ্রামের ব্যবসায়-প্রণালী, দ্রব্যাদির মূল্য এবং ব্যবহৃত মুদ্রার মধ্যেও অনেক বৈষম্য উপস্থিত হয়; তাহার উপর কোন কোন স্থলে রাস্তা ও নদীর প্রান্তে শুল্ক-আদায়ের ব্যবস্থা থাকায় পরস্পর আদান-প্রদান বিশেষ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন এমন অবস্থাও হইত যে এক স্থানে প্রচুর শস্য থাকিতেও একশত মাইলের পরেই দুর্ভিক্ষ দেখা যাইত এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয়ের তেমন সুযোগ না থাকায় বহু উর্ব্বরা ভূমির চাষ হইত না। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার একটী স্মরণীয় পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন—মাঠের পর মাঠে প্রকৃতির দান উপছিয়া পড়িতেছে কিন্তু তাহার আদর নাই; কোথাও বা বিক্রয়ের সুযোগ নাই বলিয়া চাষী শস্যের উৎপাদনে উপযুক্ত মন দিতেছে না—সকলেই যেন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাইবার পথের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। নাগপুর ও অমরাবতী হইতে বলদের উপর চাপাইয়া পাঁচশত মাইল দূরে মির্জাপুরের তুলা আমদানী করা হইত। তাহাতে লাগিত প্রায় দুই মাসের উপর এবং মণপ্রতি খরচ পড়িত তখনকার হিসাবে প্রায় দশ টাকা, এবং পথিমধ্যে বৃষ্টি উপস্থিত হইলে বণিক্‌ ও ভারবাহী উভয়েই মারা পড়িত। এই ছিল দেশের অবস্থা, যখন ভারতবর্ষে রেল-পথ-নির্ম্মাণের প্রথম আলোচনা আরম্ভ হয়।

১৮৩১-৩২ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কাবেরী নদীর ধারে ধারে কাভেরীপট্টম হইতে কারুর পর্য্যন্ত দেড়শত মাইল পথে রেল লাইন পাতিবার প্রস্তাব করিয়া জনৈক ইংরাজ এঞ্জিনিয়র পার্লামেণ্টের একটী সিলেক্ট কমিটীর নিকট আবেদন করেন। উহাই ভারতবর্ষে রেল-পথের প্রথম প্রস্তাব।

বাষ্পীয় এঞ্জিন দ্বারা গাড়ী টানাইবার কথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আশা ছিল যে দুইখানি সমতল লোহার লাইনের উপর দিয়া ভারবাহী পশুর সাহায্যেই গাড়ী টানার ব্যবস্থা হইবে। ইহার চারি বৎসর পরে আর একজন সিভিল এঞ্জিনিয়র ক্যাপ্টেন কটন মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ৮৬২ মাইল এক রেলপথের উপযোগিতা সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। কি উপায়ে এরূপ রেল লাইন প্রস্তুত হইবে ও তাহার জন্য টাকা আসিবে কোথা হইতে তাহার মীমাংসা না হওয়ায় এ প্রস্তাবে তখন কেহ মনোযোগ দেন নাই।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে নূতন রেল গাড়ী প্রবর্ত্তিত হয় ও দিন দিন বাষ্পীয় যানের উন্নতি হইতে থাকে। ইংরাজেরা রেলের উপকারিতা ও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহী হইয়া পড়েন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ভিগ্‌নোলেস্ নামক একজন ইংরাজ ভারতবর্ষে রেল-পথ নির্ম্মাণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া এক পত্র দেন ও তাহাতে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজকে রেল-পথে সংযুক্ত করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় শাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে প্রভূত সুবিধা হইবে তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। প্রায় এই সময়ে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রেলওয়ে এঞ্জিনিয়র ষ্টিফেন্‌সনের আত্মীয় মিষ্টার ম্যাকডনাল্ড ষ্টিফেন্‌সন্ কলিকাতায় আসিয়া এদেশে রেল-পথ নির্ম্মাণের সার্থকতা ও সাফল্যের সম্ভাবনা বিচার করিতে থাকেন। বাংলা সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন তখন মিষ্টার হালিডে। তিনি ষ্টিফেন্‌সন সাহেবের প্রস্তাব খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট প্রেরিত এক সুদীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ পত্রে কলিকাতা হইতে পেশোয়ারাভিমুখে প্রথম রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি চাহিয়া পাঠান। ইহাকেই ভারতে রেলপথ আনয়নের প্রথম কার্য্যকরী প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। মিষ্টার ম্যাকডোনাল্ড ক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী সংগঠিত করিয়া এই পথেই রেল লাইন প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতা অঞ্চলে যখন এইরূপ চেষ্টা চলিতেছিল তখন বোম্বাই দেশে রেল লাইন নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারীগণ সচেষ্ট হন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের উৎসাহে অনুপ্রেরিত হইয়া হোয়াইট বরেট এণ্ড কোম্পানী বিলাতে গ্রেট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নামে এক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন ও কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে বোম্বাই হইতে দিল্লী ও পুণা অঞ্চলে রেল লাইন প্রস্তুতের অনুমতির আবেদন করেন। প্রায় সেই সময়েই কলিকাতা হইতে পশ্চিমে রেল তৈয়ারীর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী সংগঠিত হয়।

ভারতবর্ষের মত নদ, নদী, পাহাড় ও জঙ্গলসঙ্কুল বৃহৎ দেশে অশিক্ষিত শ্রমিক লইয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করা যে তখন কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সকল বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধানতঃ ছিল তিনটি, যথা :—কোন পথে রেল লাইন নির্ম্মাণ সহজ ও লাভজনক হইবে, গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিবে না কোন কোম্পানীর হাতে নির্ম্মাণের ভার দিবে, এবং কি উপায়ে রেলপথ প্রস্তুত ও রেলওয়ে পরিচালনার অর্থবল ও জনবল সংগৃহীত হইবে। এই কয়টী বিষয়ের আলোচনায় সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়।

বোম্বাই অঞ্চলে তখন রেলপথের প্রয়োজনীয়তা ইংরাজের স্বার্থ হিসাবে অধিক, কারণ খান্দেশ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে শীঘ্র ও সস্তায় বিলাতে রপ্তানির তুলা লইয়া যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। অথচ এঞ্জিনিয়রগণ তখনও কি উপায়ে বোম্বাইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া রেল লইয়া যাইবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই এই হিসাবে যে সকল তদন্ত চলিয়াছিল তাহারই ফলে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে এবং বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন তৈয়ারী হয়।

অপর দিকে কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতে হইলে কোন্ পথে সুবিধা হইবে তাহা লইয়াও কম আন্দোলন হয় নাই। কলিকাতা হইতে ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীর ধরিয়া বরাবর রেলওয়ে লাইন লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব প্রথমে বিশেষ উৎসাহের সহিত গৃহীত হয়, তাহার কারণ নদীপথে যে প্রচুর পণ্য সরবরাহ হইত তাহার অধিকাংশ রেলযোগে আনিবার সুবিধা হইলে ব্যবসায়েরও সুবিধা এবং রেলেরও লাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। রাজপুরুষদের ইচ্ছা কিন্তু ছিল সরল ভাবে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ও আগ্রা হইয়া দিল্লীর অভিমুখে লাইন লইয়া যাওয়া। তাহাতে রাজ্যশাসনের দিক দিয়া সুবিধা হইবার কথা, কারণ সোজা পথে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সৈন্য আনা লওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে। বাণিজ্যের সুবিধা ও রাজ্যশাসনের সুবিধা এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া অবশেষে ই-আই-আর মেন লাইন যে পথে গিয়াছে সেই পথই প্রথম লাইনের জন্য স্থিরীকৃত হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ ভারতবর্ষে রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বড়লাট সাহেবকে পত্র দেন ও

নিম্নলিখিত বাধাগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য জনৈক অভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়র মিষ্টার সিম্‌স্‌কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন ; যথা ১। বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপ, ২। ঝড় ও রৌদ্রের আতিশয্য, ৩। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উই জাতীয় পোকার অত্যাচার, ৪। রেলপথের উপর জঙ্গল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, ৫। রেললাইনের দুই ধারে জীবজন্তুর রক্ষার জন্য বেড়া দিবার প্রয়োজনীয়তা এবং ৬। অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে রেলপথ নির্ম্মাণ ও রেলগাড়ী চালনার জন্য এঞ্জিনিয়র ও অন্যান্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী পাইবার সম্ভাবনা।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল বিষয়ের তদন্ত মোটামুটি শেষ হয় এবং দেখা যায় উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে সকল বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে মিষ্টার সিম্‌স্‌ মত প্রকাশ করেন যে এদেশীয় রেলপথ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত বিলাতী কোম্পানির দ্বারাই নির্ম্মিত ও পরিচালিত হওয়া ভাল।

ইহার কিছুদিন পরেই লর্ড ডালহৌসীর আগ্রহাতিশয্যে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ ভারতে রেলপথের সাফল্য বিচার করিবার জন্য বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে সামান্য দুই তিনশত মাইল মাত্র লাইন নির্ম্মাণের আদেশ দেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই দুই প্রান্তে রেলওয়ে তৈয়ারীর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে কোম্পানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদের যাহা অর্থব্যয় হইবে তাহার হিসাব মত শতকরা ৫৲ টাকা সুদ গ্যারাণ্টি করা হয়। এইরূপে প্রথম ভারতবর্ষে রেলপথ প্রবর্ত্তিত হয় ও ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে সুনিশ্চিত লাভ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া ব্রিটীশ কোম্পানি সমূহ এদেশে রেলনির্ম্মাণ ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সহায়ক হইবে মনে করিয়াই প্রধানতঃ আমাদের ইংরেজ শাসন-কর্ত্তাগণ এদেশে রেলগাড়ীর প্রচলন করিবার জন্য ব্যগ্র হন এবং সেজন্য ব্রিটীশ কোম্পানিগুলির সহিত এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যাহার ফলে ভারতীয় করদাতার উপর বিশেষ গুরুভার চাপিয়া পড়ে। ক্রমে যখন নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন গভর্ণমেণ্ট বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল কোম্পানির হাত হইতে রেলপথগুলি খাস করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। সে পরবর্ত্তী যুগের কথা।

ভারতবর্ষে প্রথম রেলগাড়ী চলে বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্য্যন্ত প্রায় ২৩ মাইল পথ। ১৮৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে ঐ লাইন খোলা হয়। তাহার কয়েকমাস পরেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত লাইন খোলা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে ব্রিটীশ কোম্পানির পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণ হইতে থাকে। নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

রেলের নাম	গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রথম চুক্তির তারিখ	প্রথম অংশ খুলিবার তারিখ	বৎসরের শেষে কত মাইল পথ খোলা হইয়াছিল			১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নূতন আরও কত নির্ম্মিত হইতেছিল
			১৮৫৮	১৮৬৩	১৮৬৮	
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা	১৮৪৯	১৮-৪-৫৩	১৯৪	৫৫৩	৪৭৫	৪০০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	১৮৪৯	১৫-৮-৫৪	১৪১	৯৩৭	১৩৫৩	১৪৭
মাদ্রাজ	১৮৫২	১-৭-৫৬	৯৫	৪৪৭	৬৭৮	১৮৫
বম্বে, বরোডা	১৮৫৫	১০-২-৬০	—	১৮৫	৩০৫	৭৮
সিন্ধ, পঞ্জাব ও দিল্লী	১৮৫৫	১৩-৫-৬১ ১০-৪-৬২	—	১৫০	৪০৮	২৬৬
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	১৮৫৮	২৯-৯-৬২	—	১১০	১১৪	৪৫
গ্রেট সাদার্ণ ইণ্ডিয়া	১৮৫৮	১৫-৭-৬১	—	৭৯	১৬৮	২১০

চিনির কল

—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন

টারিফ বোর্ড (Tariff Board) এর রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর থেকে বাঙলা দৈনিক ও মাসিকগুলিতে চিনির কারখানা নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে।* অনেকে বেকার সমস্যার সমাধান করবার উপায় মনে করে চিনির কুটীর-শিল্পের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন, এমন কি তাঁদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে, কয়েক হাজার টাকা হলেই চিনির কারখানা বেশ ভালভাবে চালান যেতে পারে। গুড়ের দাম কমে যাওয়াতে, গুড় থেকে ব্যাগ্‌ফিলটার (bagfilter)-এর, সেণ্ট্রিফ্যুগাল মেশিন (centrifugal machine) এর সহায়তায় চিনি তৈরী করবার লোভ কেউ কেউ সম্বরণ করতে পাচ্ছেন না—হাতে টাকা থাকলে, দেশে দু'দশটা এ রকম চিনির কুটীর-শিল্প আমরা এতদিন দেখতে পেতাম। যুক্ত প্রদেশে বেল-প্রসেশে (Bel Process)-এ এ রকম ভাবে চিনি অনেক দিন থেকে তৈরী হয়ে এসেছে। এতে যে বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা আছে, সে কথা আমাদের জানা নাই।

প্রত্যেক শিল্পের একটা economic unit আছে—যার থেকে ছোট করে কারখানা খুললে লাভ হয় না, প্রথম থেকেই লোকসান হতে থাকে। টারিফ বোর্ড (Tariff Board) নানাদিক থেকে ভেবে এবং দেখে স্থির করেছেন—দিন ২২ ঘণ্টা করে, বছরে ১২০ দিন অনবরত কল চালিয়ে, প্রতিদিন ৪০০ টন্ আখ মাড়াতে পারলে, ভারতের চিনির কারখানাগুলি পৃথিবীর অন্যান্য কলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। কারখানা যদি এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে লোকসান অনিবার্য্য।

টুক্‌রো করে না কেটে, আখ চিবিয়ে খেতে কতটা শক্তির দরকার আমরা জানি। মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, আখে আছে রস এবং আঁশ। গাঁটের রসে চিনির ভাগ কম থাকলেও, কারখানার দিক থেকে, এর মূল্য কম নয়। এমন কল হওয়া চাই, যাতে করে অন্যান্য কারখানার কলের শক্তির চাইতে, বেশী না হলেও অন্ততঃ সমান পেষণী শক্তি থাকবে। তা না হলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে।

মনে করা যাক, আখের ওজন হচ্ছে এক মণ; এবং এতে যে আঁশ আছে তার ওজন (ক) মণ।

তাহলে আখের ভিতরকার রসের ওজন হবে—(১—ক) মণ; এই আখে জল না দিয়ে পিষে সম্পূর্ণ রস নিংড়ে নেবার পর, আঁশের ওজন যদি প্রতিমণ ছিবড়ের (খ) ভাগ হয় তাহলে ১ মণ আখের সঙ্গে তুলনায় ছিবড়ের ওজন হবে $\left(\frac{ক}{খ}\right)$ মণ; রসের ওজন হবে $\left(\frac{খ—ক}{খ}\right)$ মণ। এথেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—আখের ভিতরে স্বাভাবিক অবস্থায় যে রস ছিল, তার প্রতি মণের সঙ্গে তুলনায় যে রস পিষে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে, তার ওজন হচ্ছে $\frac{(খ—ক)}{খ(১—ক)}$ মণ; এবং ছিবড়ের ভিতরে যে রস আছে তার ওজন হচ্ছে $\frac{ক(১—খ)}{খ(১—ক)}$ মণ। যে সব কলে (খ)=০·৫০ হয়ে থাকে সে গুলিকে ভাল কল বলা হয়। ছিবড়ের ভিতরে কম রস থাকে না; সেজন্য একাধিকবার জল দিয়ে সেগুলি পেষা হয়।

বিজ্ঞানের দিক থেকে, আখমাড়াই কল নানা রকমের হতে পারে—পেষণের শক্তি এবং ব্যবস্থা থাকলেই চলবে। সাধারণত ছটি বড় মোটা ভারী রোলার (roller)-এর উপর আর একটি roller চাপিয়ে যে যন্ত্র তৈরী করা হয়, তাকেই চিনির কল বলে। এরকম চারটি কল পর পর সাজিয়ে এবং তার সামনে দুই roller-এর একটি ক্রাশার (crusher) নিয়ে যে প্রণালী (system) অথবা মিলিং ট্রেণ (milling train) করা হয়, তাকে চিনি-শিল্পে "a crusher and twelve roller tandem" বলা হয়। পৃথিবীর সব বড় বড় কারখানায় এই ব্যবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যে সকল কলওয়ালা চিনির কারখানা করে লাভবান হচ্ছেন, তাঁরা সকলেই এই ব্যবস্থা করেছেন।

টারিফ বোর্ড পনর বছরের জন্য সংরক্ষণ (protection) দেবার প্রস্তাব করার সময়, এরকম কলের কথাই ভেবেছিলেন—কোন রকম কুটীর-শিল্পের কথা ভাবেন নাই। বোর্ডের মতে, এরকম কারখানায়, প্রতি মণ চিনি তৈরী করতে খরচ পড়ে—

* এই সম্পর্কে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'উপাসনায়' প্রকাশিত শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের 'চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সঃ বঃ।

১।	আখ প্রতি মণ ॥০ আনা হিসাবে—	৫॥১০	পাই
২।	অন্যান্য আবশ্যক কাঁচা মাল —	।/০	আনা
৩।	মজুর	॥০	আনা
৪।	জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি ...	/৩	পাই
৫।	মাহিনা, আফিস খরচাদি ...	॥৩	পাই
৬।	চলতি মেরামতি খরচা ...	।৶০	আনা
৭।	প্যাকিং খরচা	৵৯	পাই
৮।	অন্যান্য আবশ্যক খরচা (সুদবাদ) ...	॥৶০	আনা
	মোট	৮৶১	পাই
	চিটে গুড়ের দাম বাদ	॥৵৮	পাই
	মোট	৭॥৫	পাই

এবাদে কারখানার বাড়ীর পড়্তি (depreciation)

ধরেছেন শতকরা—২·৫%

কলের পড়্তি ধরেছেন— ৫·০%

চল্তি মূলধন (working capital)-এর

সুদ শতকরা— ৯·০%

ম্যানেজিং এজেন্ট-এর কমিশন (commission) ধরা হয়েছে শতকরা ৭॥০ টাকা ; এটা অন্যান্য আবশ্যক খরচের ভিতরে ধরা হয়েছে।

Imperial Council of Agricultural Research-এর sugar technologist, ভারতবর্ষের প্রচলিত কারখানা (typical factory)র বিষয় আলোচনা করে দেখিয়েছেন—

১। কলের পেষণী শক্তি— ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ টন্

২। আখের মণ প্রতি গড়পড়তা দর— ।৵১১ পাই

৩। চিটে গুড়ের মণ প্রতি গড়পড়তা দর—১।৵ আনা

৪। আখের ওজনের শতকরা চিনির ওজন— ৯·২%

৫। আখের ওজনের শতকরা চিটেগুড়ের ওজন—৩·৬%

৬। এক মণ চিনি তৈরী করতে আখের ওজন—১০·৩৬ মণ

তিনি এই প্রচলিত কারখানা (typical factory)-র এক মণ চিনি তৈরী করবার খরচার হিসাব দিয়েছেন—

১।	আখের দাম	৪·৭৭০	টাকা
২।	জ্বালানী কাঠ	০·৩৫৩	„
৩।	অন্যান্য কাঁচা মাল	০·১১০	„
৪।	পিচ্ছিলক (Lubrication) ...	০·০৮০	„
৫।	ফিলটারের কাপড়	০·০২৩	„
৬।	পাটের বস্তা	০·১৭০	„
৭।	অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য ...	০·০৬০	„
৮।	মাহিনা ইত্যাদি	০·৮২৬	„
৯।	ম্যানেজিং এজেন্টস্ ...	০·৩০০	„
১০।	পড়্তি (Depreciation) ...	০·৬৫০	„
১১।	মেরামতী খরচা	০·২০৯	„
১২।	সুদ ও প্রিমিয়াম	০·১৮৮	„
১৩।	দালালী	০·০১৯	„
১৪।	অন্যান্য খরচা	০·১০৬	„
	মোট	৭·৮৬৪	টাকা
	চিটে গুড়ের দাম বাদ	·৬৩৫	„
	মোট	৭·২২৯	টাকা
		=৭॥১১	পাই

তিনি লাভ এবং রিজার্ভের হিসাব দেন নাই।

এসঙ্গে মিঃ নোয়েল ডীয়ার (Mr. Noel Deer) জাভার প্রচলিত কারখানা (typical factory)-র বিষয় কি লিখেছেন জানা দরকার। মিঃ নোয়েল ডীয়ার (Mr. Noel Deer) পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শর্করা-বিশেষজ্ঞ (best sugar expert)-দের ভিতর একজন। তিনি লিখেছেন—সেখানে একটা আদর্শ কারখানা (typical factory)-তে এক বছরে—

১। আখ মাড়াই হয় ... ৪৮,০০,০০০ মণ

২। চিনি তৈরী হয় ... ৬,০০,০০০ „

৩। চিটে গুড় তৈরী হয় ... ১,৬০,০০০ „

৪। আখ থেকে শতকরা চিনি তৈরী হয় ১২·৫%

৫। চিটে গুড় তৈরী হয় ... ২·৯%

৬। চিটে গুড়ের দাম প্রতি মণ ১৲ টাকা

তিনি সেখানকার এক মণ চিনি তৈরীর খরচ দেখিয়েছেন, আমাদের ভারতবর্ষের টাকায়—

১।	আখের দাম	১·৪১৭	টাকা
২।	কারখানার খরচ	০·৭৫০	„
৩।	তত্ত্বাবধান খরচা (Overhead charges)	০·২০০	„
৪।	অন্যান্য খরচা	০·২৫০	„
	মোট	২·৬১৭০	টাকা

ভারতবর্ষের প্রচলিত কারখানা-(typical factory)-র খরচা অনেক বেশী পড়ে থাকে, সেজন্য টারিফ বোর্ড দুইটী খরচার মিল রাখবার জন্য, সংরক্ষণ-(protection)-এর যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে করে কেবল মাত্র বড় বড় কারখানা গুলি দেশী ও বিদেশী কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিঁকে থাকতে পারবে। চিনির কুটীর-শিল্পের স্থান নেই, থাকতে পারে না।

এরকম বড় কারখানায়, রেলগাড়ী কিংবা গরুর গাড়ী করে আখ এনে প্রথমে ওয়ে ব্রিজ-(weigh bridge)-এ ওজন করা হয়। সেখানে একটা বিশেষ বহন-প্রণালী-(endless carrier)-র সাহায্যে আখ কলে পৌছুলে, প্রথমে ক্রাশার দিয়ে টুকরো করে কেটে কলে চালান দেওয়া হয়। সেখান থেকে পর পর অন্যান্য কলে যাওয়ার পথে ছিবড়ের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে জল অথবা রস মিশান হয়, একে ইম্‌বিবিশন্ প্রোশেস (imbibition process) বলে। শেষ কল থেকে যে ছিবড়ে পাওয়া যায়—সেগুলি অনেকটা ছাতুর মত হয়ে যায় এবং সেগুলি অপর একটা বহন-প্রণালী (endless carrier)-র সাহায্যে বয়লার (boiler)-এ নিয়ে গিয়ে জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করা হয়। বয়লারের চুলো এমন করে তৈরী যে কাঁচা ছিবড়ে জ্বালাতে কোন বেগ পেতে হয় না।

প্রথম অবস্থায় রসে অনেক বাজে জিনিষ ও মাটী মিশান থাকাতে ঘোলাটে রং-এর দেখতে হয়। পাম্প করে overhead tank-এ নিয়ে গিয়ে চুণ এবং sulphur-dioxide অথবা carbondioxide মিশিয়ে রস ফিলটারের ভিতর দিয়ে চালান করা হয়। ফিলটার নানা রকমের এবং একাধিক হয়ে থাকে।

পরিষ্কার রস থেকে চিনি তৈরী অতি সাবধানে করতে হয়—বিশেষজ্ঞ না হলে, এ কাজ মোটেই ভাল হয় না—অনেক চিনি নষ্ট হয়ে গিয়ে glucose-এ পরিণত হয় এবং চিটে গুড় বেশী হয়ে পড়ে। পরিষ্কার রস ক্রমশঃ নরম করবার জন্য পাম্প করে triple effect অথবা multiple effect নিয়ে গিয়ে বাষ্পের সাহায্যে ধীরভাবে গরম করা হয়ে থাকে। যখন syrup-এর মত হয়, তখন রস আবার পাম্প করে vacuum pan-এ নিয়ে গিয়ে জ্বাল দিয়ে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যাতে করে ঠাণ্ডা হলে চিনি ক্রমশ দানা বাঁধতে পারে। Syrup ঠাণ্ডা করা সহজ কাজ নয়—এতে অনেক জল দরকার। Condenser-এর সাহায্যে রস ঠাণ্ডা হলে, দানা বাঁধবার জন্য কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে আবার পাম্প করে centrifugal machine-এ দিতে হয়। যেমন machine ঘুরতে থাকে, তেমনি চিটে গুড় ছিট্‌কে বের হতে থাকে। এমনি করে পর পর centrifugal machine-এ দিয়ে ১নং, ২নং এবং ৩নং চিনি পৃথক করে। আবার dryer-এর সাহায্যে চিনি শুকিয়ে বস্তাবন্দি করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এসব কারখানায় গাড়ী থেকে আখ নামান সুরু করে, চিনি বস্তাবন্দি করা পর্য্যন্ত সব কাজ কলে হয়ে থাকে, হাত দিয়ে কিছু করা হয় না।

সাধারণতঃ আখের ভিতরে চিনির ভাগ খুব কম থাকে এবং সব চিনি নিংড়ে বের করাও সম্ভব নয়। জাভাতে ১০০ মণ আখ থেকে ১২.৫ মণ চিনি এবং ভারতবর্ষের সব চেয়ে ভাল কারখানাতে ৯.২ মণ চিনি তৈরী হয়। কলিকাতার বাজারে ১ মণ সাদা জাভা চিনির দাম ১০৷৵০ আনা। চিনি কম তৈরী হলে প্রতি মণে ১০৷৵০ আনা লোকসান হয়ে থাকে।

যদি আখের ভিতরে চিনির সারাংশ (sucrose) শতকরা ১১.৭৮% এবং আঁশের ভাগ শতকরা ১৬.৬৪% থাকে তাহলে ২২ ঘণ্টায় ৫০ টন আখ মাড়াই করবার শক্তিসম্পন্ন কলে মাত্র ৭.৩৮% চিনি এবং ২২ ঘণ্টায় ৪০০ টন আখ মাড়াই করবার শক্তিসম্পন্ন কলে ৯.২৬% চিনি তৈরী হয়ে থাকে। একই রকমের আখ থেকে, কল ছোট হওয়ার জন্য ১.৮৮ মণ চিনি লোকসান হয়ে থাকে।

জাভায় বছরে ৮৪ হাজার মণ আখ মাড়াই করবার কলের কর্ম্মকর্ত্তার মাইনে বছরে ১২০০০৲ টাকা। সেই কারখানার বড় বড় কর্ম্মচারীরা সকলে মিলে বছরে ৫০০০০৲ মাইনে পেয়ে থাকেন। ছোট কলে এত মাইনে দিয়ে কর্ম্মচারী রাখা সম্ভব নয়—রাখলে লোকসান বেশী হয়ে থাকে। একে কলের শক্তি অল্প থাকার জন্য চিনি কম পাওয়া যায়, অন্য পক্ষে অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে কাজ করানর ফলে বড় কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠে না।

একই শ্রেণীর কলে, প্রধানত চারটা কারণে, কারখানার লাভলোকসান নির্ভর করে। চিনি তৈরীর খরচের চার-

ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে আখের দাম। অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় আখ চাষ অথবা কিনতে পারলে লাভ বেশী হয়ে থাকে। আখে চিনি এবং আঁশের ভাগ বেশী থাকলে খুব সুবিধা হয়; তাতে চিনি বেশী পাওয়া যায় এবং অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার করতে হয় না—ছিবড়ে থেকে সব কাজ চালান যায়। আবার অধিক পরিমাণে আঁশ থাকলে, রস বের করা শক্ত হয়ে পড়ে; বার বার পেষণ করা সত্ত্বেও ছিবড়ের ভিতরে অনেক রস থেকে যায়। চিনির কল দিন-রাত সমান ভাবে চালাতে হয়। একবার চালাতে সুরু করলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আখ পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কল থামান উচিত নয়। কলের প্রত্যেক অংশের কাজের সঙ্গে প্রত্যেক অংশের কাজের অনবিচ্ছিন্ন যোগ আছে। রস বের করতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের ভিতরে আগেকার রস ফিলটার হয়ে মাল্‌টিপ্‌ল এফেক্ট (multiple effect)-এ গিয়ে গরম হতে থাকে। Multiple effect-এ যে রস ছিল, সেই রস ভ্যাকুয়াম প্যান (vacuum pan)-এ গিয়ে জ্বাল হতে থাকে। কোন এক জায়গায় গলদ হলে অন্যান্য জায়গায় গোলযোগ উপস্থিত হয়ে সব কাজ পণ্ড হয়ে যায়। যাতে করে ধারাবাহিক ভাবে অনবরত আখের আমদানি হতে পারে সেদিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য। তুলো এবং পাটের মত গুদামজাত করে রেখে সারাবছর ধরে চিনির কারখানা চালান যায় না। ক্ষেতে আখ কাটবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাড়াই করতে হয়। না করলে সুক্রোস্ (sucrose) গ্লুকোস্ (glucose)-এ পরিণত হয়ে চিটে গুড়ের ভাগ বেশী হয়; একে ইন্‌ভেনসন্ (invention) বলে। কলের ১৬ মাইলের বাইরের আখ এনে কাজ করতে হলে লাভের চেয়ে লোকসান হয়ে থাকে, যদি চাষ থেকে আখ আসতে ২৪ ঘণ্টার অধিক দেরী হয়ে পড়ে। সাধারণত চিনির কলের কাজ বছরে ১২০ দিনের বেশী হয় না; এর চেয়ে অধিক দিন আখ পাওয়া যায় না এবং পাকার বেশীদিন পর আখ কাটলে নষ্ট হয়ে যায়। কাজ বেশী দিন চল্‌লে অর্থাৎ season বড় হলে লাভ অধিক হবার সম্ভাবনা। ছোট কলে লাভ করতে গেলে, আখের দাম কম, চিনি ও আঁশের অংশ উপযুক্ত ভাবে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং কাজ হবার সময় (season) বড় থাকা দরকার।

বাঙলা দেশে দশ রকমের আখ জন্মায়। তাদের নাম, প্রতি একরে উৎপন্ন গুড়ের ওজন এবং শতকরা চিনির সারাংশের হিসাব নীচে দেওয়া হ'ল—

আখের নাম	প্রতি একারে উৎপন্ন গুড়ের ওজন	শতকরা চিনির সারাংশ (Percentage of) Sucrose
১। গেণ্ডারী	৬০-৭০ মণ	১৪-১৫
২। শামসের	৪৫-৫৫ „	১৫
৩। পুরী	৩৫-৪৫ „	১৫-১৬
৪। বাঁশতা	৩০-৪০ „	১১-১১
৫। ডালসুন্দর	৬০-৭০ „	১৩-১৪
৬। ভেন্দামুখি	৬০-৭০ „	১৩-১৪
৭। টানা	৫৫-৬৫ „	১৩
৮। খেরি	৩০-৪০ „	১২-১৩
৯। কাজলা	৫০-৬০ „	১৩-১৪
১০। সি-ও ৩১২ (Co 312)	৫০-৬০ „	১৫-১৮

শামসের আখের চাষ একরকম উঠে গেছে। টানা ভেন্দামুখি ও শামসের থেকে ভাল সাদা চিনি হয় না। সব চেয়ে ভাল চিনি হয় সি-ও ৩১২ (Co 312) থেকে। বাঙ্গালা-দেশে আজকাল বহুল পরিমাণে এর আবাদ হচ্ছে; বৎসরে প্রায় পনর হাজার একারের বেশী জমিতে আজকাল সি-ও ৩১২ (Co 312) চাষ করা হচ্ছে।

একটা বড় চিনির কারখানা করতে হলে, কল থেকে ১৬ মাইলের ভিতর কম করে ৩,৩৬০ একার আখের আবাদী জমি থাকা আবশ্যক। এরকম জমি দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া এবং রংপুর অঞ্চলে অনেক আছে। বাঙ্গালাদেশের আখপ্রধান স্থানের একটী শাখা (sugarcane belt) বিহার অঞ্চল থেকে এসে, দিনাজপুর জেলার বিরোল থানা থেকে সুরু করে বোচাগঞ্জ, পিরগঞ্জ, কাহারোল এবং নবাবগঞ্জের ভিতর দিয়ে আত্রাই নদীর দুইধার বেয়ে রাজসাহী জেলা হয়ে বগুড়া জেলায় এসে পড়েছে। অপর একটী শাখা (belt)টী নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট হয়ে রংপুর জেলার বদরগঞ্জে এসে প্রবেশ করেছে। এসব জেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে দুই তিনটা বড় চিনির কারখানা অনায়াসে চলতে পারে।

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ চিনির কল বিহার এবং যুক্ত-প্রদেশে থাকার জন্য বাঙ্গলা দেশের আয়ের উন্নতি এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) আজ পর্য্যন্ত ভাল ভাবে হয় নাই। কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, প্রথমে আখ বিশ্লেষণ (analyse) করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদের মতে অনুকূল আবহাওয়া থাকার জন্য বাঙ্গলা দেশের আখে চিনির সারাংশ (sucrose) বেশী থাকার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় আখের চাষপর্ব্ব (season) কত দিন সে বিষয়েও স্থির নির্ণয় এখনও হয় নাই। দেখতে পাওয়া যায় দিনাজপুর অঞ্চলে নতুন গুড় গাঁয়ের হাটে কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে উঠে থাকে এবং আখমাড়াই বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলে। এ থেকে মনে হয় বাঙ্গলায় আখের চাষপর্ব্ব (season) অপেক্ষাকৃত লম্বা।

বাঙ্গলাদেশে এমন পতিত জমি নাই, যেখানে কারখানা খুলে আখের চাষ চল্‌তে পারে। চাষীদের কাছ থেকে আখ কিনে কল চালান ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। এক বিঘে আখ জন্মাতে হ'লে চাষীর খরচ পড়ে ২৭৷৷৹ আনা। প্রতি বিঘায় ২০০/৹ মণ করে আখ হ'লে এবং আখের দাম ।/৹ আনা করে মণ হলে চাষীর বিঘাপ্রতি লাভ হবে ৩৫৲ টাকা। এই আখ বিক্রি না করে গুড় করতে আরও ২৶৹ করে বিঘাপ্রতি খরচ পড়বে। এক বিঘায় ২০/ মণ গুড় হ'লে এবং ৬৷৶৹ আনা করে প্রতি মণ গুড় বিক্রি করে চাষী লাভ করবে ৭১।৹ আনা। চাষের এবং গুড় তৈরী করবার খরচের ভিতরে কৃষক-পরিবারের মজুরির হিসাব ধরা হয় নাই, তাহলে লাভের অংশ আরও অনেক কম হবে। টাকার দিক থেকে গুড় বিক্রি করে কৃষক বিঘাপ্রতি ৭১৶৹ আনা বেশী পেলেও, চিনির কলে আখ বিক্রি করলে তার লাভ হবে শতকরা ১২৬৲ টাকা এবং গুড় তৈরী করে বিক্রি করলে বিঘাপ্রতি লাভ হবে মাত্র শতকরা ১০০৲ টাকা। শতকরা বিঘাপ্রতি ২৬৲ টাকা বেশী লাভ করার জন্য আখ বিক্রি করার সম্ভাবনা একেবারে নাই বলে মনে হয় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
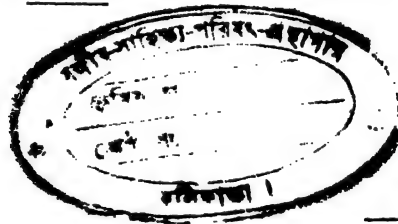
ভিয়েরীর প্রাণ

—কামিল লিমনিয়ের

বেলজিয়ানদের সঙ্গে আমাদের একটা জায়গায় মিল আছে—আমাদের মত ওদেরও অতীত সম্বন্ধে একটা মমতা আছে, অতীত গৌরবের কথা ভেবে ওরাও আমাদের মতই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিরূপ হ'য়ে ওঠে। বেলজিয়ান সাহিত্যে এই দিকটার যে প্রতিচ্ছায়া পড়েছে, সে ছায়ার মধ্যে আমরা নিজেদের অনেকখানি খুঁজে পাই। কামিল লিমনিয়েরের (১৮৪৪-১৯১৩) এই গল্পটা হ'তে তা খানিকটা বুঝ্‌ব। বেলজিয়ান সাহিত্যের অন্য কয়টি বৈশিষ্ট্য—তার ছবির মত মনোহারিত্ব, বিষাদ-করুণতা, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি —এ গল্পে প্রত্যেকটিরই আভাস আছে।

সরকারী পার্কের উপরে যে পান্থাবাসটি, ওখানকার ঐ অল্পবয়সী পিয়েত্‌জি আমাকে প্রশ্ন করেছিল—যে ছেলেটি দিনরাত 'মেঠো সুর বাজিয়ে' ফেরে, তাকে আমি দেখেছি কি না! মেয়েটি আমাকে এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে? ভিয়েরীতে আমি এই তিন দিন ধ'রে আছি কিন্তু ও যেমন ব'ল্‌লে, তেমন কাউকে ত' দেখি নি'! ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে ভাবলাম, এমন নির্ব্বোধ কেউ ভিয়েরীতে আছে কি, যে ঐ রকম ক'রে ঘুরে বেড়ায়। সুরের সাধনা এখানে একেবারেই নিষ্ফল,—ঘরবাড়ির দোর এখানে সর্ব্বদা রয়েছে বন্ধ, কচিৎ হয়ত জানালায় একটি বুড়ো লোকের দর্শন মেলে কিংবা কোনও বৃদ্ধা ঠাকরুণের! যদি বা কোন সুন্দরীর মুখ হঠাৎ দেখা যায়, তাঁর মাথায় সেই অদ্ভুত দেখ্‌তে টুপি, কানের বোতাম তার ঝুলে পড়েছে রগ অবধি। গান এখানে শুন্‌বে কে? আশ্চর্য্য এই ছোট্ট ভিয়েরী গ্রামখানি—ঐ জানালাগুলির নীল আর সবুজ কাঁচের মধ্য দিয়ে এদের সবাইকে দেখায়, যেন মমিদের মেলা বসেছে ওখানে।

গ্রামটির সম্বন্ধে এই আমার ধারণা। ঘটনাক্রমে আমি যদিই বা দেখ্‌তে পেতাম, সেই ছেলেটি এর পথে-পথে মেঠো সুর বাজিয়ে চলেছে, আমি আমার মুখে আঙুল তুলে তাকে সতর্ক করে দিতাম—এই ঘরবাড়ির অন্দরে যে-নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, তাতে যেন সে বাধা না দেয়। স্বয়ং সূর্য্যদেব এখানে পথের মাঝখানে ডোরাকাটা সোনালি চাদর বিছিয়ে নিদ্রা গেছেন। একদিন যে-দেশ জাগ্রত ছিল, অথচ এখন গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়েছে—তাকে বহুদিন ধ'রে পুনর্জ্জাগ্রত ক'রবার চেষ্টা ক'রে ক'রে তিনি কবে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন! ভিক্ষুক যদি দিনের পর দিন কোনও বাড়ির দ্বার হ'তে ফিরে ফিরে যায় আর সে বাড়ির দ্বার কেউ না খোলে—তার পায়ের দাগ সেই দ্বারপ্রান্তে যেমন দেখায়—সূর্য্যকিরণ তেম্‌নি এখানকার ঘরবাড়ির প্রবেশ-পথে মূর্চ্ছিত হয়ে আছে। আর ছায়ামূর্ত্তিরা সব ভিতর হ'তে দ্বারে দিয়েছে অর্গল।

যদি আমি একশ' বছরও বাঁচি, ভিয়েরীর সেই পথের কথা কখনও ভুল্‌ব না আর তার অলি-গলির সেই উঁকি-মারা ছোট ছোট বাড়িঘরগুলি, মনে হয় যেন হাতে হাত দিয়ে তারা সবাই প্রার্থনা করছে। জীবন থেকে সব কিছু এমনই বিচ্ছিন্ন যে নিজের সম্বন্ধে নিজেরই এখানে সন্দেহ জাগে।—আগে আগে চলেছে ক্ষীণ একটি ছায়া, কোথায় যে সে চলেছে, তা প্রথমটা বুঝে ওঠা কঠিন। অবশেষে দেখা যায় সব যেখানে গিয়ে মিশেছে—সেই গির্জ্জার দিকে তারও গতি। ওদিকে বাঁধের ওপারে নীল সমুদ্র, তার বুকে জাহাজের সার, মাথার উপর মেঘে ঢাকা খিলানের মত আকাশ, বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে সে-আকাশ নেমে এসেছে। সেই শহরে আমার মনে হ'য়েছিল যে আমি মরতে বসেছি, আমার বুকের ধ্বনি ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে,—আঙুল দিয়ে সূর্য্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে নিজে বেঁচে আছি কি না আমি তা পরীক্ষা করেছিলাম।

ভাবলাম, 'অল্পবয়সী ঐ পিয়েতজি মেয়েটা আমার সহজ বিশ্বাসের উপর চাল দিয়েছে কিংবা হয়ত বহুকাল পূর্ব্বে, এখানকার এদের এই মৃত্যুর আগে যা ঘটেছিল,—ও তারই কথা বলেছে।'

এম্‌নি সময়ে গির্জ্জার ঘণ্টাগুলি বেজে উঠল—সুমিষ্ট, মেঠো সুরে। কবে একদিন গ্রীষ্মকালে, রবিবারের এক অপরাহ্নে দাদামশাই লাঠির উপর দুহাতের ভর দিয়ে ব'সে বাড়ির ঠিক নীচেই রাস্তার উপর হ'তে ধুলা-চাল্‌নি দেখেছিলেন—এই বাজ্‌নায় সেই কথা মনে পড়্‌ল। কোনও সুরের যন্ত্র পুরানো হ'য়ে ভেঙ্গে গেলে যেম্‌নি বাজে, এর সুর ঠিক তেম্‌নি। গির্জ্জার চূড়া থেকে সুরগুলি যেন নিতান্ত আলস্যে ঝরে ঝরে পড়্‌ছিল—মন আমার খারাপ হ'য়ে গেল; মনে হ'ল যেন আমি হঠাৎ প্রাচীন ভিয়েরীর শেষ আর্ত্তনাদের সুর শুন্‌লাম।

সরকারী পার্কে টাউন-হলটি সুন্দর, পূর্ব্বসমৃদ্ধির সাক্ষ্য স্বরূপ সযত্ন সজ্জিত; এর দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাজরাজড়ার ও সাধুফকিরের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মনে হয়—কিন্তু ভিয়েরীর পূর্ব্ব ইতিহাস এখন কে মনে রেখেছে? মনে মনে আঁচলাম, এই ঘণ্টার কথাই নিশ্চয় ব'লেছে সেই অদ্ভুতনয়না কিশোরীটি। এই জীর্ণ মূর্ত্তিগুলিকে তাদের আসন-বেদীর উপর এমন অশোভন লাগ্‌ল, এম্‌নি ভাবে তারা নীল সাগরের দিকে দিনরাত চেয়ে আছে যে, আমার মন এদের সম্বন্ধে অবজ্ঞায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা এখানে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, এমন একটা কিছুর প্রত্যাশায়, যা কোনোদিন ঘটেনি। বহুদিন আগে বন্দর ছেড়ে যে-সব জাহাজ চলে গেছে, তাদেরই ফিরে আসার প্রতীক্ষায় হয়ত এই সব পাথরে খোদাই ছায়াময় চোখ চেয়ে আছে। পার্কের কাছেই একটি প্রাচীন গির্জ্জার চূড়া দেখা যায়—সমুদ্রগর্ভে তার চাবি যুগ যুগ ধ'রে সমাহিত আছে।

অল্প একটু হেসে ভাবলাম, কী পরিহাস! প্রত্যেকেই শহর ছেড়ে এখন সমুদ্রের ধারে বিস্তৃত প্রাকারের আশেপাশে বেড়াতে গেছে। শহরে এখন কয়েকটি মাত্র বৃদ্ধ শুধু রয়েছে—জরাগ্রস্ত, নাকের নীচে তাদের মলিন, বিবর্ণ, ক্ষুদ্রাকৃতি ছায়া-রেখা, মৃত্যুর পর যেমন গায়ে-মুখে ছাতা পড়ে তেম্‌নি। কিন্তু তবু এইসব প্রস্তরমূর্ত্তি, এদের তরোয়াল আর দণ্ডের দিকে চাইলে মনে হয়, এরাই সত্য সত্য জীবন্তদের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাচ্ছে।

বরাবর গির্জ্জায় গিয়ে আমি পা দিয়ে তার ফটকে তিনবার সশব্দ আঘাত করলাম। নিতান্তই ব্যঙ্গের ভাব নিয়ে আমি এমন করেছিলাম, জান্‌তাম যে এই প্রাচীন দেব-মন্দিরের নির্জ্জনতায় এমন কেউ নেই যে আমাকে উত্তর দেবে। মৃত্যুর দেশে

শব্দ কেমন লাগে, এ শুনবারও আমার ইচ্ছা ছিল। তাই হঠাৎ দ্বার খুলে একটি প্রিয়দর্শন যুবককে বার হ'তে দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম—অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি, মখমলের খাটো একটি কোর্ত্তা তার গায়ে,—তাতে জিল্যাণ্ডবাসীরা যেমন পরে তেম্‌নি রূপার বন্ধনী লাগানো। তার হাতে একটি অ্যাকর্ডিয়ন্ বন্দরে-বন্দরে দোকানে যা কিনতে পাওয়া যায়, নাবিকেরা সমুদ্রে যা বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলায় রূপালি সুর তোলে—যে সুর এক মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পরক্ষণেই করুণ, দীর্ঘ হ'য়ে ওঠে।* যুবকটিকে দেখে বোধ হ'ল, জোর ক'রে কে যেন তাকে সুখস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ মনে পড়্‌ল, এই বুঝি সেই, পিয়েত্‌জি যার কথা ব'লেছিল, যে কেবলি মেঠো সুর বাজিয়ে-বাজিয়ে ফেরে

মাথা ফিরিয়ে সে আমার দিকে চাইলেনা পর্য্যন্ত, অথচ পাশ দিয়ে চলে গেল, দুপাশে রইল প'ড়ে ফিকে লাল রঙের দেয়াল, জরাজীর্ণ কাঁচ-বসানো লম্বা, খাড়া জানালার সার, বাঁধাকপি আর পেঁয়াজকলির সব্জী-বাগান। আস্তে আস্তে সে সরকারী পার্ক পেরিয়ে গেল ;—ওদিকে আবার একবার গির্জ্জার ঘণ্টা বাজ্‌ল তেম্‌নি স্ফটিকস্বচ্ছ সুরে, ভিয়েরীর শেষ আর্ত্তনাদের সেই দুঃখার্ত্ত রাগিণীর মত। বাতাসে সে সুর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ঘর-বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে ভেসে-ভেসে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। আর সেই অদ্ভুত লোকটি তার অ্যাকর্ডিয়নটি কাঁধে তুলে ধ'রে চাবিতে আঙুল টিপে যন্ত্রটি বাজাতে সুরু ক'র্‌লে। মনে হ'ল সে সুর যে বাজাচ্ছে, তার অর্থ সে নিজেই শুধু জানে। যন্ত্রটির একেবারে কাছে মাথা নিয়ে এম্‌নি ভাবে সে হাস্‌লে যেন সে এ পৃথিবীর কেউ নয়। মনে হয়, সেদিন সত্যই অন্তরে-অন্তরে বুঝেছিলাম যে কোন গোপন কারণে ছেলেটির মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে আর ভিয়েরী গ্রামের রহস্যের সঙ্গে সে তার সেই নিজের দুঃখের সুর দিয়েছে মিলিয়ে। কিন্তু এর মানে কি, তা ব'লতে পারিনা।

তারপর এমন কিছু ঘ'টল যা আমার উদ্বেগের কারণ হ'য়েছিল। ছেলেটি গির্জ্জার দিকে চোখ তুলে চাইলে, সেখানে সেই প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি সে দেখ্‌লে এবং তারপর দূর সমুদ্রের পানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল—সে দৃষ্টিতে তখন আগামী দিনের আলো দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। অ্যাকর্ডিয়ন বেজেই চলেছিল দ্রুত, দ্রুততর—যেন কিসের উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসেছে। মনে হ'ল যেন দেশের আদিম অন্তরে গিয়ে এই সুর-মাতালের সুরের নেশা লেগেছে। শিঙ্গা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে বিচিত্র নৃত্যে পথ চলে যে নাবিক, তারই মত এও চলেছিল এপথ হ'তে ওপথ। তার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল—মাথার উপরে যন্ত্রটা তুলে ধ'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আচম্বিতে সেটিকে একেবারে খোয়া-বিছানো পথের কাছ অবধি নামিয়ে আন্‌লে সে, এবং তারপর এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল একটি অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে, তার চোখ তখন বন্ধ এবং মুখে ফুটে উঠেছে ভাবাবিষ্ট পূজারীর মত হাসি আর অবিরাম চলেছে সেই তালে তালে উন্মাদ নৃত্য ও উদ্দাম সঙ্গীত—প্রত্যেকটি সুর তার প্রণয়ের আবেগে মুখর, মারাত্মক খুনের মোহে অধীর।

সেই সব খেল্‌নার বাড়িঘর-দোরে এই গানে অল্পে অল্পে প্রাণের সঞ্চার হ'ল, জীবনের পুনরাবির্ভাবের সূচনা দেখা গেল, মনে হ'ল, রুদ্ধ কবাটের অন্তরালে প্রাণ যেন অ্যাকর্ডিয়ন-বাদক এই পাণ্ডুর বর্ণ যুবকের পথ চেয়েই এতদিন সুপ্ত ছিল। বাতায়নের অন্তরালে, তরুণীদের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল—মাথায় তাদের শাদা টুপি, তাই থেকে বেরিয়ে আছে প্যাঁচানো শুঁয়োপোকার মত অদ্ভুতদর্শন শুঁড়—ভিয়েরীর সব সুন্দরী মেয়েরা তাদের জানালার পর্দ্দার কাছে এল ভীড় ক'রে, মৌমাছির ঝাঁকের আড়ালে গোলাপ ফুলের মতই তাদের মুখ হ'য়ে উঠেছে উদ্ভিন্ন। তাদের দেহের বর্ণ তাজা, গভীর অন্ধকার হ'তে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তারা জানালার কাছে—ঠিক মনে হ'ল পুতুল-পুরীর বাড়িঘর যেন যাদুবিদ্যায় পেল

* অ্যাকর্ডিয়নকে, একটি কর্ড(তার) যার,এ হিসাবে একতারা বলা চলে। বললে ছবিটা আমাদের চোখে স্পষ্ট ফুটেও ওঠে, কেননা একতারা-হাতে বৈরাগীর সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। আসলে অ্যাকর্ডিয়ন হাত-হার্ম্মোনিয়ামের মত একটি যন্ত্র, একপাশে তার বেলোজ্, (bellows) অন্য পাশে চাবির ঘর (keys) হার্ম্মোনিয়ামের মত বাতাস দিয়ে এতেও সুর তুল্‌তে হয়। মনে হয়, বেলজিয়ামে অ্যাকর্ডিয়ন্ আমাদের একতারার মত।—অনুবাদক।

প্রাণ—ভিয়েরীর ঘরে-ঘরে ছিল এই সব পুতুল, অনাবৃত সুন্দর হাতগুলি তাদের সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় হ'য়ে উঠেছে তামাটে, পরিধানের বস্ত্র হাওয়ায় কেঁপে উঠছে, মাথার চুলে খেল্‌চে রঙের ঢেউ আর চোখে ঘনিয়ে এসেছে সাগরের নীলিমা।

অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে চলল সে এম্‌নি পথের পর পথ বেয়ে—এখানে, ওখানে, সেখানে,—বাজনার এলোমেলো সুরে তার বিষণ্ণ করুণ কান্না, সে সুর শুনে চোখ জলে ভ'রে আসে। রাত্রের অন্ধকারে জাহাজের ছোক্‌রা যে করুণ সুর সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে দেয়—এ সেই সুর। ভিয়েরীর প্রাণের কান্না এ, নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিকের জন্য এম্‌নি নীরবে ও কাঁদে। কবরখানায় ক্রুশের নীচে যেসব সুন্দরী মেয়েরা ঘুমিয়ে আছে, যাদেরকে ঘরে রেখে সুপুরুষ ছেলেরা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল আর ফেরেনি, তাদেরই জন্য ওর এই দীর্ঘশ্বাস; এম্‌নি বেজে বেজে অ্যাকর্ডিয়নের সুর দূরে বালিয়াড়ির আড়ালে অবশেষে গেল মিলিয়ে।

আমি ফিরে এলাম সরাইখানাতে, ব'ল্‌লাম পিয়েত্‌জিকে "ঠিক ব'লেছিলে তুমি। এ শহরে একটি ছেলে আছে, যে অম্‌নি মেঠো সুর বাজিয়ে ফেরে। তুমি কি জান কিসের জন্য ওর এই ব্যথা?" বিড়ালাক্ষী কিশোরী হাস্‌লে, হেসে জানালার ধারের একটি লোককে ইঙ্গিত ক'রে দেখিয়ে ব'ল্‌লে :—

"ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। আমার চাইতে উনি জানেন ভাল।"

তারপর যে কাহিনী শুন্‌লাম তা নিতান্ত সাধারণ এ কথা বল্‌তেই হবে। সকলে বলে ঐ ছেলেটি জানালার কাছে যাদেরকে দেখা যায়, পুতুলের মত সেজে গুজে যারা সব ঘোরা-ফেরা করে, তাদেরই একজনের প্রেমে পড়ে। একদিন সন্ধ্যায় ছেলেটি তার বাড়িতে যায় নাচের নিমন্ত্রণে আর অ্যাকর্ডিয়ন্‌ বাজাতে। অন্য সব ছেলেরাও ঐ বাড়িতে মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করতে যেত। এতে ছেলেটি যখন ক্ষোভ জানাত, তখন মেয়েটি তাকে ব'ল্‌ত, 'কি তুমি চাও বলত? তোমাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু আমি ওকে, ও বাড়ির ঐ ছেলেটিকেও যে ভালবাসি, আর তুমি চ'লে গেলে এখ্‌খুনই যে আসবে আমার কাছে, তাকেও—সব্বাইকে ভালবাসি আমি।' একদিন বেড়ার ধারে মেয়েটিকে সে দেখে একটি যুবকের বুকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে, সেইদিন সে রাগের মাথায় দুজনকেই খুন করে।

"সেইদিন থেকে এ পর্য্যন্ত"—যে ভদ্রলোক আমাকে গল্পটি বলেছিলেন, তাঁর কথায়—"ঐ ছেলেটি পথে পথে ভবঘুরের মত বাজ্‌না বাজিয়ে ফিরছে। কারুর কিছু অনিষ্ট করে না, ছোট ছোট মেয়েরা ওকে ঢিল ছুঁড়ে মারে, মেয়েরা হাসে। ওর কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই।"

কিন্তু এ কাহিনীকে আমি সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারিনে। কোন ঘটনারই বাইরে থেকে দেখে আমরা বল্‌তে পারি নে, এই সব। অত্যন্ত স্পষ্ট কাহিনীর অন্তরালেও গোপন অর্থ আছে, সেই অর্থ খুঁজে বার করতে হয়—সেই অর্থ স্পষ্টার্থের চাইতে সুন্দর। সুতরাং আমার নিজের মানে আমি খুঁজে বার করাই—এই ছেলেটিই ভিয়েরীর প্রাণ। কেন যে সে গির্জ্জা হ'তে বেরিয়ে এসেছিল, এর মানে আমি এখন বুঝেছি। তুমি, ভিয়েরীর সেই ছোট্ট গাঁ আর এই পাগ্‌লা বেচারি, সকলের মাথা এক অদ্ভুত ছিটে হ'য়েছে খারাপ। সমুদ্রের বাতাস বুঝি সকলের মাথা দিয়েছে ঘুরিয়ে। কিছু একটা হারিয়ে গেছে, যা আর ফিরে আসবেনা। যার জন্য গির্জ্জার ঘণ্টার এই করুণ কান্না, অ্যাকর্ডিয়নের সুরে যে কান্নার সুর উঠ্‌ছে ফুঁপিয়ে।

তাই ভিয়েরীতে সব সময়ে দেখি একটি অদ্ভুত লোক সমুদ্রের উপকূলের দিকে হেঁটে চলেছে, দৃষ্টি তার সমুদ্রের ওপারে।*

---

* শ্রীকিরণকুমার রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

অন্তঃপুর

—বিষ্ণুশর্ম্মা

[ছিন্ন-কন্থায় দেহ আবৃত করিয়া যে জাতি আজ মৃত্যু-পথযাত্রী, সেই মুমূর্ষু জাতির নিকট হইতে বিশ্বের কাহারও কিছু দাবী করিবার নাই, কিন্তু সেই মরণোন্মুখ জাতির শিয়রে যে শঙ্খবলয়-পরিহিতা শুচিস্মিতা পুরলক্ষ্মীর দল নিজেদের অমৃতজ্যোতিঃতে মৃত্যুকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে সংসারের এখনও কিছু শিখিবার আছে।

বঙ্গের সকল শ্রী লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিলেও এখনও তাহার অন্তঃপুরের মঙ্গলশঙ্খ স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, এখনও তাহার জীর্ণ কুটীর-প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চে শান্ত ঘৃত-দীপ জ্বলিতেছে।

কিন্তু আমরা করিতেছি কি ? যাঁহাদের নিকট হইতে প্রাণশক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছি, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাঁহাদিগকেই অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আমাদেরই লাঞ্ছনায় ও পীড়নে আজ যে অবস্থায় তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন তাহা কোন দিক দিয়া গৌরবের তো নহেই বরং লজ্জাকর। এই অন্ধ অবজ্ঞার ফলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আদর্শ নষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। একদিকে পুরুষদিগকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলিয়া আহ্বান করিতেছি, অন্যদিকে অন্তঃপুর সম্বন্ধে যে আমাদের কোনও কর্ত্তব্য আছে সে কথা ভুলিয়াও মনে করিতেছি না। ইহাও আমাদের অবনতিরই আর একটি লক্ষণ। প্রত্যেক সমাজ নারী ও পুরুষের সমান সহযোগিতার দ্বারা তাহার ভিত্তিকে দৃঢ় করে এবং একের পঙ্গুতা অপরকেও বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া থাকে। অতীতের মহীয়সী নারীদের কয়েক জনের নাম মুখস্থ করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছি, কিন্তু সেই ভাবে আমাদের পুরললনাদের গড়িয়া উঠিবার পথে সাহায্য করি নাই তাঁহারা এখনও গৃহশ্রীর যেটুকু কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অতীতের সংস্কারবশেই করিতে পারিতেছেন।

আমরা শুনিতে পাই বর্ত্তমানে নাকি নারী জাতির শুভযাত্রা সুরু হইয়াছে, বঙ্গের নারী অচলায়তনের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পথের সন্ধানে নিজেরাই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর সেদিন নাই। কথাগুলি শুনিতে খুবই ভাল কিন্তু পুরুষদের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়াই কি নারী-জীবনের চরম আদর্শ ? যে দেশের পুরুষরাও এখনও পথে বাহির হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই সেই দেশের নারী পথের মাঝে কি নিজের সম্মান রক্ষা করিবার ভরসা রাখেন ? পৌরুষের দীক্ষা ও মন্ত্র নারীজাতির পক্ষে শুভ কি অশুভ তাহার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কি ? আমাদের মনে হয় বর্ত্তমানে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব সাহিত্যে, শিল্পে এবং আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে সেই আদর্শকে গ্রহণ করিলে নারী ভুলই করিবেন। বাঙ্গালী শিশু-জীবন হইতে তাহার একটা আদর্শকে ঠিক করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়া তাহার জীবনের গতিবেগ অতি অল্পকালের মধ্যেই মন্থর হইয়া আসে, তাহার জীবনে ব্যর্থতার ক্ষোভ থাকিয়া যায়, কারণ লক্ষ্যহীন চলার মধ্যে থাকে অনন্ত পথেরই নির্দ্দেশ—গন্তব্য স্থান বলিয়া কোন কিছু নির্দ্দিষ্ট থাকে না। এই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা ভাব-বিলাসীদের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু বাস্তবরাজ্যের অধিবাসীদের পক্ষে তাহা শোচনীয়। বঙ্গের পুরলক্ষ্মীদের সর্ব্বপ্রথম নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাদের শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক।

ইউরোপের নারী-সমাজের যথার্থ অনুকরণ যদি এদেশের অন্তঃপুর-লক্ষ্মীরা করিতে চাহেন তাহা হইলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ তো হইবেই উপরন্তু তাঁহারা নিজেদের অবস্থাই হাস্যকর করিয়া তুলিবেন। মহিলাদের প্রগতি বলিয়া যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া থাকি তাহা ফেরঙ্গ রীতির অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বঙ্গের যুবক সম্প্রদায় ঠিক এমনি অনুকরণ করিতে গিয়া বঙ্গের সমাজকে হতশ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ যদি মহিলারাও ঠিক তেমনি ভাবে প্রগতির নেশায় মাতিয়া উঠেন তাহা হইলে বঙ্গের কল্যাণ-সতী যে প্রাণত্যাগ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাই বলিয়া কি আমাদের নারী জাতি বিগত যুগকেই শুধু আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন তাঁহারা কি সমস্ত শিক্ষা লাভ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন ? তাঁহারা কি পুরাতন সংস্কার গুলিকে আঁকড়াইয়া, বাহিরের জগতের দিকে একবারও না তাকাইয়া শুধু ঘরের কোণটিকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া রাখিবেন ? এ যুগে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। জগতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক দিয়া একটা পরিবর্ত্তন সুরু হইয়া যায়, যুগের গতির সহিত ছন্দ বজায় রাখিবার চেষ্টা না করিলে ঘূর্ণমান চক্রের উপর হইতে ঠিক পাথরের মতই ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িতে হয়, সেইজন্য যুগকে অনুসরণ করিতেই হইবে, কিন্তু অন্ধভাবে নয়, নির্ব্বিচারে নয়, যথেষ্ট চিন্তা করিয়া। ইউরোপের নারীদের যাহা সদ্‌গুণ, যে গুণে তাঁহারা জগতের সকলের কাছে বরেণ্য হইয়া থাকেন মাত্র তাহাই গ্রহণ করা উচিত।

এক দেশের পক্ষে যাহা ভাল অপর দেশের পক্ষে তাহা হিতকর কিনা ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। স্থান কাল পাত্র সকল দিক দিয়া সামঞ্জস্য করিয়া যদি আমরা না গড়িয়া উঠিতে পারি তাহা হইলে আমাদের জীবনই ব্যর্থ। অপর দেশের সমস্ত রীতি-নীতি আমাদের দেশে চালাইতে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুধু ভুল নয় অন্যায়। আমাদের কর্ত্তব্য নিজেদের দেশকাল অনুসারে গড়িয়া ওঠা এবং অপরের যাহা কিছু শুভ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া তোলা। এই ভাবে না চলিলে রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বিদেশী তলোয়ারের খাপে দেশী খাঁড়া ভরিবার' চেষ্টা হইবে মাত্র, কিন্তু যাহা উদ্দেশ্য তাহা ফলপ্রসূ হইবে না।

বঙ্গ-শ্রী পত্রিকায় এই আদর্শ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই অন্তঃপুর বিভাগ খোলা হইল। মহিলাদের পক্ষে যাহা শুভ ও কল্যাণকর তাহা প্রকাশ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করিব। শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, জীবনী, আলোচনা, সূচী-শিল্প, রন্ধন প্রণালী, গৃহশিল্প, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-কথা, শিশু-পালন প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া অন্তঃপুর বিভাগে প্রকাশ করিবার আয়োজন হইতেছে। বঙ্গ-শ্রীর সকল পাঠক পাঠিকাকে এবং নারী সমাজের সকল হিতাকাঙ্ক্ষীকে এই অন্তঃপুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি। আশা করি এ আবেদন নিষ্ফল হইবে না। যিনি মহিলাদের পক্ষে যে কোন জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া পাঠাইবেন তাঁহার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমাদের কল্পনা-অনুরূপ বস্তু দিতে পারিলাম না]

কাপড়ের উপর কাজ

দরজির উপর নির্ভর না করিয়া আমাদের দেশের বহু মহিলা ঘরে জামা, পায়জামা, ফ্রক, সেমিজ প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় অনেক জিনিষ তৈয়ারী করিয়া থাকেন। খরচের দিক দিয়া এবং শোভনতার দিক দিয়া অনেক সময় তাহার ফল ভালই হইয়া থাকে। ইউরোপের মহিলাদের মাত্র জামা কাপড়ের কাটছাঁট ও বোনা শিখিবার জন্য অন্ততঃ শতাধিক পত্রিকা আছে। প্রত্যেক মাসে নূতন ধরণের ডিজাইন নূতন রকমের বয়ন-প্রণালী তাঁহারা এই সকল পত্রিকা হইতে শিখিয়া লইতে পারেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেরূপ কোন পত্রিকা নাই এবং বিদেশের পরিচ্ছদের ধরণ ও ফ্যাশান এদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া আমাদের মহিলারা যে তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাও মনে হয় না। আমাদের মহিলারা সেলাই ও কাটছাঁট যাহা জানেন তাহার উপর যদি নূতন নূতন ডিজাইন তৈয়ারীর মাল মসলা পান তাহা হইলে অতি অল্প খরচে গৃহশ্রীকে বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। আমরা সেই জন্য প্রতিমাসে
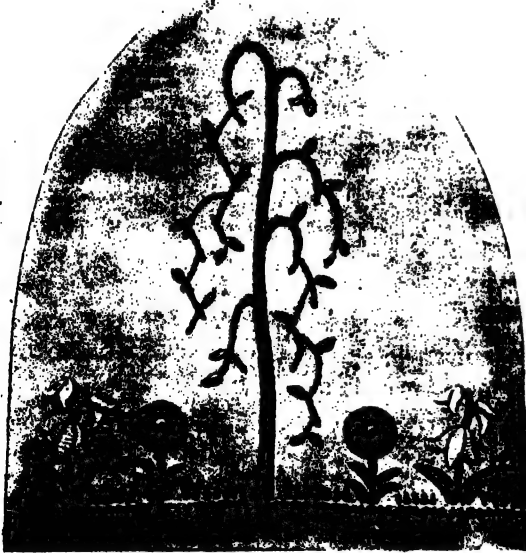
কাপড়ের উপর নক্সার ডিজাইন। (১)

নূতন নূতন ডিজাইন প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এবারে একটি ডিজাইন নমুনা স্বরূপ দেওয়া হইল। লংক্লথের উপর কিম্বা ভাল সিল্কের কাপড়ে এই ধরণের ফুল বোনা সম্ভব।

টেবিল ক্লথের উপর এইরূপ ডিজাইনে ফুল ও লাইন বুনিলে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। কাঁথার উপর নক্সা প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন লাল বা ব্লু পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া লইতে হয় তেমনি কোন কাপড়েই যাহা কিছু তৈয়ারী
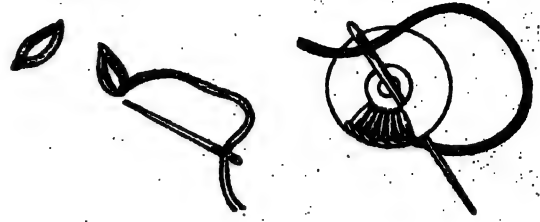
মুদ্রিত ডিজাইন : এই রকমে ফুল ও ডাল তোলা হইয়াছে। (২)

করুন না কেন পেন্সিল দিয়া প্রথমে একটি আদরা করিয়া লইবেন। তাহার পর যেখানে লাইন শেষ হইয়াছে সেখান হইতে সমানভাবে ঠিক সেলাইয়ের অনুরূপ বুনিয়া যাইবেন। ২নং চিত্রে কি ভাবে ছুঁচ ও সুতার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইল।

অনেক সময় কোন একটি বড় ডিজাইন কাপড়ের উপর তৈয়ারী করিতে হইলে দুই দিক সমান ভাবে অঙ্কন করিতে অনেকে অসুবিধায় পড়েন। এই অসুবিধা নিবারণ করিতে হইলে—একটি বড় কাগজে একদিকের নক্সা আঁকিয়া তাহা সমানভাবে ভাঁজ করিয়া লইবেন এবং একটি ছুঁচ বা আলপিন দিয়া অঙ্কিত লাইনের উপর একটু ফাঁক ফাঁক ছিদ্র করিলেই কাগজের অপর অংশে সেই নক্সার অনুরূপ আর একটি নক্সা ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পর কাগজটির ভাঁজ খুলিয়া কাপড়ের উপর রাখিবেন। যে কাগজটি রাখা হইল তাহার উপর লাল খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে কাপড়ের উপর তাহা পড়িবে। ন্যাকড়ার পুঁটুলি করিয়া উক্ত ছিদ্রের উপর খড়ি থুপিয়া যাইলেই বেশ স্পষ্ট দাগ উঠিবে। তাহার পর খড়ির উপর পেন্সিলের দাগ টানিয়া দিলেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে এবং আপনি ইচ্ছামত সূচীকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন। এই নক্সাটিকে যদি একরঙা করিতে চাহেন তাহা হইলে চকোলেট কিম্বা সবুজ
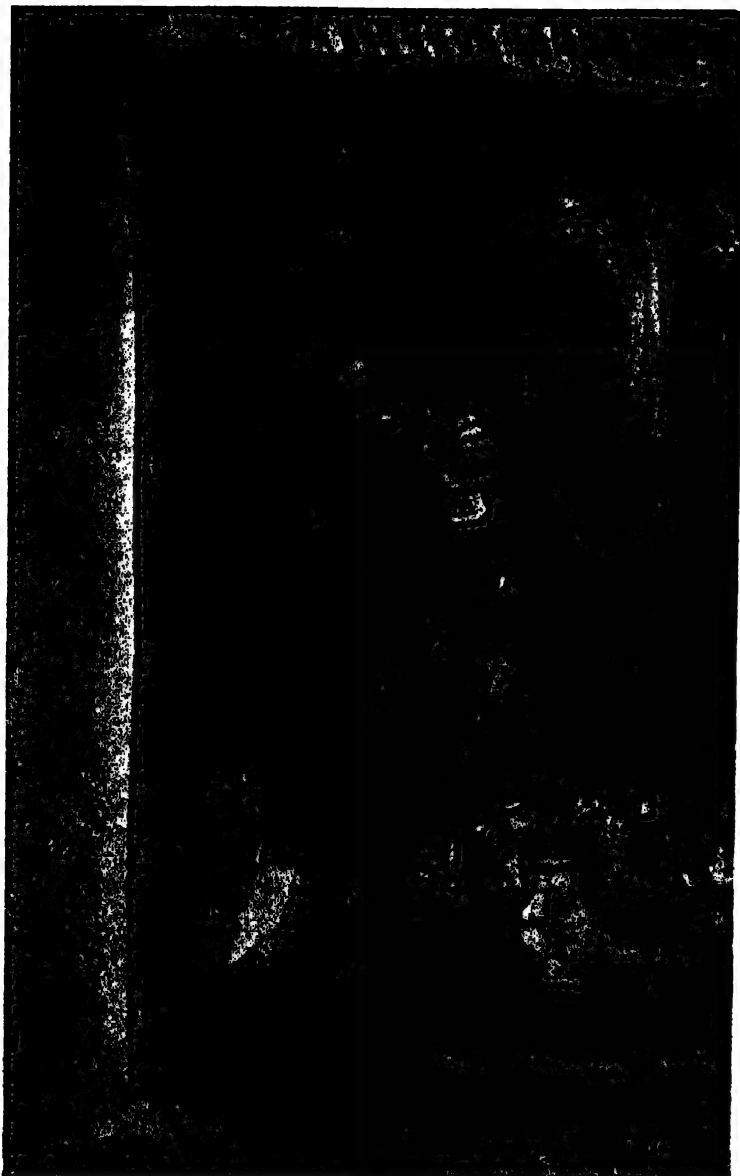
রংয়ের রেশম ব্যবহার করিলেই দেখিতে সুন্দর হইবে। ফুলগুলি ভায়লেট রঙে বুনিয়া মূল লাইন চকোলেট রংয়ে তৈয়ারী করিলে দেখিতে আরও সুন্দর হইবে।

রান্না-বান্না

বেগুনের চপ :—বোঁটাশুদ্ধ একটা বেগুনকে ঠিক সমান ভাবে চিরিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর ছুরী দিয়া মাঝখানটি কুরিয়া ফেলিতে হইবে। এইবার মাছের পুর তৈয়ারী করিয়া লইবে। মাছের পুর তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমে পোনা বা ভেট্‌কী যে কোন মাছ তৈলে ভাজিয়া লইবে। একটু নরম করিয়া ভাজিতে হইবে। ভাজিয়া কাঁটাগুলি বাছিবে তাহার পর তাহাতে পরিমাণ মত লবণ, লঙ্কা ও আদার রস, সামান্য হলুদ দিতে হইবে। ইহার পর ঘি দিয়া ও তেজপাতা দিয়া ঠিক কিমার মত পুরটিকে ভাজিয়া লইবে। তাহার পর উপরে একটু গরম মসলা ছড়াইয়া দিবে। উপরোক্ত পুর বেগুণের ভিতর যতটা ধরা সম্ভব তাহা দিয়া ব্যাসন জল দিয়া গুলিয়া (যেমন বেগুনি তৈয়ারীর জন্য ব্যাসন ঠিক করিতে হয়) তাহা ঠিক সেই পুরের উপর মাখাইবে। ইহার পর ধীরে ধীরে কড়ায় ভাজিয়া লইলেই বেগুনের চপ তৈয়ারী হইল।

হাঁসের ডিমের চপ্ :—একটি হাঁসের ডিম সিদ্ধ করিয়া তাহাকে ঠিক সমানভাবে মাঝামাঝি চিরিবে। তাহার পর কুসুমের ভিতর আদার রস ও পিঁয়াজের রস দিয়া দিবে। পরে আর একটি হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া, উপরোক্ত ডিমটি তাহার রসে ফেলিয়া বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া লইবে, তাহার পর তৈলে ভাজিয়া লইলেই হাঁসের ডিমের চপ তৈয়ারী হইল।

পোনামাছের ফ্রাই :—প্রথমে পোনামাছ চাকা চাকা করিয়া কাটিবে। তাহার কাঁচা অবস্থায় সেগুলি দইয়ে মাখাইয়া লইবে। তার পর হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া আদার রস, পিঁয়াজের রস, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি পরিমাণ মত মিশাইবে। উক্ত পোনামাছগুলি সেই হাঁসের ডিমের নালে মিশাইয়া বিস্কুটের বা সুজির গুঁড়া মাখাইয়া ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া লইবে।

নারকেল নাড়ুর চপ্ :—একটি নারিকেল কুরিয়া বাটিবে। তাহার পর সেই কুরা নারিকেল একভাগ, একভাগ চিনি, একভাগ ক্ষোয়া ক্ষীর ও এক ভাগ ছানা ভাল করিয়া মিশাইয়া নাড়ু যেভাবে পাক করে সেইরূপ পাক করিবে। তাহার পর উক্ত নাড়ুর ভিতর মিছরি ও এলাচদানা দিবে। তাহার পর ময়দা দুধের সহিত মিশাইয়া একটু ঘন গোলা করিবে। নাড়ুটিকে চপের মত চ্যাপ্টা করিয়া উক্ত গোলায় ডুবাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া রসে ফেলিবে। খাইতে অতি সুস্বাদু।

টোট্‌কা

অম্লশূল :—অম্লশূলের যন্ত্রণা বড়ই কষ্টদায়ক। অনেকে এই রোগটিতে বড়ই কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমাদের দেশী একটি ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উপকার পাইবেন। প্রত্যহ সকালবেলা প্রাতঃকৃত্যের পর 'চিতের পাতা' একটি করিয়া চর্ব্বণ করিলে অম্লশূলের যন্ত্রণা হ্রাস পাইবে। এই পাতা বেনের দোকানে বা বেদের নিকট পাইবেন।

আমাশয় :—আমরুল শাকের রস একতোলা ও জাম-পাতার রস একতোলা সেবন করিলে আমাশয় সদ্য আরোগ্য হইতে পারে। ছাগ-দুগ্ধের সহিত কচি জাম পাতার রস মিশাইয়া খাইলেও আমাশয় আরোগ্য হয়। দূর্ব্বার রস ও চাঁপা কলার শিকড় জলে বাটিয়া খাইলেও আমাশয়ের পক্ষে ভাল।

অর্শ :—চারা নিমগাছের শিকড় আধতোলা এবং একতোলা আতপ চাউল বাটিয়া খাইলে অর্শরোগ সারিয়া যায়। যে নিমগাছের ফুল হয় নাই এমন অফুলা নিমের শিকড় রোগীর ডান হাতে বাঁধিয়া দিলে কয়েক হপ্তার মধ্যে অর্শ সারিয়া যায়।

দরকারী কথা

সিল্কের পোষাকের তত্ত্বাবধান :—আমাদের দেশে পুরুষ এবং মহিলা আজকাল বহু প্রকার সিল্কের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত পরিচ্ছদ ময়লা হইলে ধোপার বাড়ী বা ডাইং-ক্লিনিং-এ ছাড়া পরিষ্কার করিবার আর কোন উপায় আমরা খুঁজিয়া পাই না। অথচ বাহিরে সিল্কের বস্ত্রাদি কাচাইবার জন্য পাঠাইলে তাহা অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ডাইং-ক্লিনিং-এ অতিরিক্ত মূল্য দিয়া "ড্রাই-ক্লিনিং" করাইয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে

এত উচ্চহারে প্রতি সপ্তাহে কাপড় কাচান একরূপ দুঃসাধ্য। বাটীতে সিল্ক কাচিয়া লইলে অনেকে ধোপার খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন সিল্কের পোষাক যদি কাল রংয়ের হয় এবং পূর্ব্বে কোনদিন ধৌত করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যদি সিল্কের পোষাক খুব পুরাতন হয় এবং বর্ণ বিকৃত হইয়া যায় তাহা হইলে ১ গ্যালন জলে এক পাঁইট হুইস্কি মিশাইয়া ধৌত করিতে হইবে। ধুইয়া কখনও নিংড়াইবেন না। সিল্ক কি ভাবে ধৌত করিতে হয় তাহা প্রত্যেকের জানা আবশ্যক। সিল্ক বা সিল্কের পোষাক টেবিলে রাখিয়া অল্প অল্প গরম জলে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া উহাতে সাবান মাখাইবেন। ফ্ল্যানেলে সাবান লাগাইয়া সিল্কের উপর উহা ঘষিতে হইবে। যখন সিল্ক হইতে ময়লা উঠিয়া যাইবে তখন স্পঞ্জ দিয়া সিল্কের উপর হইতে সাবানটি ঘষিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবেন। এইভাবে সিল্কের দুই পিঠ ধৌত করিবেন। ধোয়ার পর ছায়ায় শুকাইবেন। কাল বা গাঢ় নীলবর্ণের সিল্ক টেবিলে ফেলিয়া জিন্ বা হুইস্কিতে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহা দ্বারা উহা মুছিয়া লইলে রং উজ্জ্বল হইবে। যে-কোন সিল্ক না ধুইয়া এইভাবে স্পঞ্জ করিয়া লইলেও সিল্ক পরিষ্কার হইতে পারে।

সিল্কের সাটিন পরিষ্কার করিবার উপায়:—প্রথমে সাটিনটি একটি কম্বলের উপর আঁটিয়া লইতে হইবে। তাহার পর বাসি পাঁউরুটির শাঁসে পাউডার-ব্লু মিশাইয়া এক টুকরা লিনেন দিয়া সাটিনের উপর ঘসিতে হইবে, তাহার পর নরম কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। নরম বুরুষ ব্যবহার করিয়াও মুছিয়া ফেলা যাইতে পারে।

<u>বুরুষ পরিষ্কারের উপায়</u>:—এক কোয়ার্ট জলে অতি সামান্য সোডা মিশাইয়া রাখুন। ইতিমধ্যে বুরুষ চিরুণি দিয়া আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহার পর সাবধানে কাঠের হ্যাণ্ডেল বা বুরুষের হ্যাণ্ডেল না ডুবাইয়া বুরুষের লোম সেই সোডামিশ্রিত জলে ডুবাইতে হইবে। এইভাবে বারবার করিতে করিতে বুরুষের লোম পরিষ্কার হইয়া আসিলে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লওয়া দরকার। তাহার পর রৌদ্রে শুখাইতে হইবে। কখনও লোম মুছিবার চেষ্টা করিবেন না তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত নরম হইয়া যাইবে।

<u>সন্ধানী</u>

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

স্যর এস্ রাধাকৃষ্ণন্ ভবিষ্যৎ সভ্যতার রূপ সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত 'কল্কি' নামক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকটি 'টু-ডে এণ্ড টু-মরো' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। কোন ভূমিকা না করিয়া আমরা এই পুস্তক হইতে অংশবিশেষের মর্ম্মানুবাদ দিতেছি। ভবিষ্যতের সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের একজন মণীষীর মতামতের সহিত আমাদের পরিচয় থাকা ভাল—দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি বৈদেশিক ভাষায় তাঁহার মতামত লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সভ্যতার গতিপথে নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে এক একটি দুর্য্যোগ আসিতে দেখা যায়, আজ সেই দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া সভ্যতা চলিয়াছে। জগৎ যেন জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া ফেলিতেছে। মানুষের মাপকাঠি, আদর্শ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান—এক পুরুষ আগে যাহারা সাধারণতঃ গ্রাহ্য ছিল, সব কিছুকে মানুষ আজ যাচাই করিতে চাহিতেছে,— তাহাদের পরিবর্ত্তনও হইতেছে। পুরাতন কার্য্য-কারণ সব শিথিল হইয়া পড়িতেছে; নূতন শক্তির অভ্যুদয় হইতেছে। এ যুগের মনোভাবে যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনিই স্পষ্ট বুঝিতেছেন—ইহার চাঞ্চল্য, ইহার অনিশ্চয়তা, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি ইহার অসন্তোষ এবং অনাগত নূতন যে জীবন তাহার জন্য ইহার অধীরতা। যে আদর্শের সংজ্ঞা ভাল

করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহার জন্য এই বিশৃঙ্খল চিন্তা এবং অধীর উৎসাহ প্রমাণ করে যে মানুষ আজ নূতন পথে পা বাড়াইতেছে।

এই বিশৃঙ্খলতার একটি প্রধান কারণ আধুনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আমাদের সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য না হইলেও বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে ইহার উন্নতির গতি দ্রুত, ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ও এত সুদৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা সহজেই ইহাকে জীবনে মিশ খাওয়াইয়া লইতেছি। যদি কোন প্রাণীকে আমরা তাহার স্বাভাবিক আবেষ্টনী হইতে টানিয়া আনিয়া অন্যত্র ছাড়িয়া দেই তাহা হইলে নূতন অবস্থার সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া নিতে না পারা পর্য্যন্ত সে অস্থির ও অসুস্থ বোধ করে। যখন রিপনের বিশপ কিছু কালের জন্য বিজ্ঞানকে ছুটি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন তিনি আমাদিগকে এই বিষয়েই সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান অতি দ্রুত গতিতে চলিয়া আমাদিগকে নব নব আবিষ্কার দিতেছে বটে, কিন্তু মানুষ সে আবিষ্কারের সুবিধা লইয়াও সমান তালে নিজেকে সংস্কৃত করিয়া লইতে পারিতেছে না।

সমগ্র জগৎ বাহ্যতঃ একই ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে। ইউরোপ আর আমেরিকা এবং এশিয়া আর আফ্রিকা একই দিকে চলিয়াছে—কেবল প্রথম দুইটি শেষ দুইটি অপেক্ষা দ্রুত ছুটিয়াছে। নিতান্ত পশ্চাতে যে সব দেশ পড়িয়া আছে, সেই সব দেশেও আধুনিকতার সুস্পষ্ট সব চিহ্ন—মোটর-কার, এরোপ্লেন ও ছায়াছবি চোখে পড়ে। প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদ মানুষ যতখানি আয়ত্ত করিতে পারিবে উন্নতিও ততখানি হইবে—এ বিশ্বাস চীন হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ভারত এবং চীনকেও এই ঘূর্ণীবাত্যায় টানিয়াছে। প্রাচ্য জাতিসমূহ যদি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মরিতে না চায় তবে অন্যান্য যে সব জাতি উৎসাহ, উদ্যম ও সংগঠন-শক্তির বলে পৃথিবীর দুর্গম প্রদেশেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের সহিত সমান তালে পা ফেলিবার জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতেই হইবে—এই নূতন বোধ হইতেই প্রাচ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদ আছে বলিয়া আতঙ্কবাদীরা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিলেও আসলে তাহা নাই। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কাল্‌চারকে—জ্ঞান বুদ্ধি, আত্মিক শক্তি, ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, যান্ত্রিক রীতি-নীতি, রাষ্ট্রতন্ত্র, আইন-কানুন, শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে সব দেখিতে পাইতেছি এবং তাহাদের ফলস্বরূপ যাহা পাইতেছি—সে সবই পরস্পরকে পরস্পর নিকটতর করিয়া তুলিতেছে। জগৎটা আজ একই জীব-যন্ত্ররূপে কাজ করিতে চলিয়াছে।

বাহ্যতঃ এই সামঞ্জস্য কিন্তু মানসিক বা অধ্যাত্মিক যোগ সাধন করিতে পারে নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে নূতন নিকট সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাতে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায় নাই কিংবা বিরোধও হ্রাস পায় নাই, কারণ—মনের মিলন এবং অধ্যাত্ম-যোগের জন্য আমরা প্রস্তুত হই নাই। ম্যাক্সিম গর্কি বলিয়াছেন, একবার এক কৃষকসভায় বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহার এক বক্তৃতাকে কৃষকদের তরফ হইতে একজন এইরূপ সমালোচনা করিয়াছিল; "মশায়, পাখীর মতো আকাশে উড়বার এবং মাছের মতো জলে সাঁতার কাটবার শিক্ষা আমরা পাচ্ছি বটে, কিন্তু এই মাটির ধরার উপর কেমন করে কাটাবো তা তো জানি না!" এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি বাস করিতেছে—বিভিন্ন তাহাদের বর্ণ, বিভিন্ন তাহাদের ধর্ম্ম; কিন্তু সদ্‌জীবন-যাপনার্থে প্রয়োজন যে প্রীতির ভাব তাহা কাহারো মধ্যে নাই। বরং তাহারা মনে করে যে তাহারা পরস্পর-বিরোধী। মানুষের খোলস যদিও এক রূপ ধারণ করিতেছে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে একই চিৎশক্তির ক্রীড়া লক্ষিত হইতেছে না। বিভিন্ন জাতির মনের মিলন আজও দেখা যায় নাই।

স্পেংলার-এর "প্রতীচীর অধঃপতন" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের যে প্রতিপাদ্য, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কাল্‌চার বিভিন্ন আদর্শকে ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা পৃথিবীব্যাপী একই কাল্‌চার অথবা সভ্যতার বিকাশের আশাকে খণ্ডিত করিতেছে। তাঁহার মনভুলানো অনুমান—বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন কাল্‌চার স্বতন্ত্রভাবে জন্ম, বিকাশ, লয়ের মধ্য দিয়া ছন্দোবদ্ধ ভাবে চলিয়াছে—তাহাকে বাস্তব সত্যের পরিপন্থী বলিয়া বোধ হয় না। অতীতে হয় তো এক এক ভূখণ্ডের সভ্যতা সেই সেই ভূখণ্ডের সভ্যতারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা হয় তো কাল-পরম্পরায় শৈশব, যৌবন, এবং

জয়া অতিক্রম করিয়া যখন লয়প্রাপ্ত হইত, তখন উত্তর-কালের সভ্যতার জন্য তাহাদের শিশু-সভ্যতার জন্য উত্তরাধিকার দান রাখিয়া যাইত। বর্ত্তমানে এমন সম্ভাবনা সম্ভবতঃ নিঃশেষিত হইয়াছে। দেশের গণ্ডীবদ্ধ যে সভ্যতা, যাহা নাকি একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত না তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নিশ্চয় করিয়া এমনও বলা যায় না যে মানবের ইতিহাস একটা একটানা গতি, যাহা নাকি উত্তরকালে আবেষ্টনীর পার্থক্যে ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন শাখায় প্রসারিত হইয়াছে। নির্দ্ধারিত ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, বিভিন্ন কাল্‌চার স্ব স্ব ধারা ধরিয়া বিকাশ লাভ করিয়া পরে পরস্পর মিশিতে চাহিয়াছে এবং অধুনা মিলিত হইয়া এক বিপুল অখণ্ড রূপ ধরিতে চাহিতেছে। স্পেংলার বলিতেছেন, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার এখন অন্তিম কাল, নিয়তিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া ইহার কোন লাভ নাই; তাঁহার এই উক্তির অর্থ অনেকখানি ব্যাপক,—তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, সকল দেশগত সভ্যতার এখন তিরোভাবের সময় এবং বিরাট বিশ্বকে ধরিয়া এক নূতন জীবন-যাত্রা প্রণালীর পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাস-বর্ণিত কোন কাল্‌চার বা সভ্যতা পূর্ণ সার্ব্বজনীনতার দাবী করিতে পারে না; কয়েকটি মানুষের এক একটি দলের ব্যক্তিগত জীবনী-শক্তিরই প্রকাশ ছাড়া তাহারা আর কিছুই নহে। এ সব ক্ষেত্রে ইতিহাস ছাড়া অপর কোন যুক্তি নাই; কিন্তু ইতিহাসে কোন সার্ব্বজনীন আদর্শের মানব পাই না, কাজেই বিশ্বজনীন সভ্যতা বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। ভবিষ্যৎ সভ্যতাকে মানব ও মানব-জীবনের বিশ্বজনীন স্বপ্ন লইয়া জাগিতে হইবে। অতীত বা বর্ত্তমানের নানা প্রাদেশিক কাল্‌চার সব সময় মানবের যথার্থ ইষ্টসাধন করিতে পারে নাই। সে সব সভ্যতায় দেখি বর্ণগত, ধর্ম্মগত এবং রাজনৈতিক একাধিপত্যের প্রয়াস, নারীর উপর পুরুষের অথবা দরিদ্রের উপর ধনীর প্রাধান্য স্থাপন। সর্ব্বমানবের হিতকর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কোন সভ্যতার সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রত্যেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সভ্যতাকে আদর্শ বিশ্ব-সভ্যতারূপে নিজের দাঁড়াইবার পথে কতখানি বাধা ও অযোগ্যতা আছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন ভবিষ্যৎ সভ্যতার মিলনবেদীর পীঠ গড়িতেছে, তেমনি আধ্যাত্মিক একত্বের প্রাথমিক বুনিয়াদ হিসাবে প্রথানুগত ক্রিয়া-প্রণালী, মত বা আচার-অনুষ্ঠানেও ভাঙ্গনের সূচনা দেখা দিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই, বিশেষ করিয়া যুবকদের মনে এই ভাব জাগিতেছে। অপরে যত বুদ্ধিমান বা বয়সে বড়ই হোক্ না কেন, একালের যুবকেরা কাহারও হস্তেই ক্রীড়নক হইতে চাহে না। এ পর্য্যন্ত আমাদের যে মত বা চিন্তা ছিল, তাহার মধ্যে একটা কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, অসন্তোষের একটা হেতু কোথাও রহিয়া গিয়াছে—এই বোধ দ্রুত জাগিতেছে এবং নূতন কিছুর জন্য চেষ্টা সুরু হইয়াছে। ধ্বংসের বীজ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন মতাবলম্বী চিন্তাশীল লোকদের মনে আধ্যাত্মিকতার জন্য ঔৎসুক্য ও নব আশার সঞ্চার হইতেছে।

বদ্ধ গোঁড়াদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্, কারণ, তাহাদের সঙ্গে কোন তর্ক চলে না। বর্ত্তমানে সভ্যতার ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়া চলিয়াছেন সেই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রত্যেকের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সকল দিক দিয়া ব্যাপক ভাবে এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সর্ব্বমানব একই জীব-যন্ত্রস্বরূপ—ক্রমবর্দ্ধমান স্বকীয় ঐশ্বর্য্যের প্রতি ও নিজের প্রতি নিজে সে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাহার উন্নতির পথে কোন কিছুই অন্তরায় হইতে পারে না। দান্তে বলিয়াছেন "বিভিন্ন সভ্যতার লক্ষ্য বিভিন্ন হইতে পারে না; মানবীয় সভ্যতা একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে চলিতেছে।" কিন্তু সর্ব্বমানবের সভ্যতার লক্ষ্য যদি এক হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ ইহাই নয় যে, সকলে একই ভাষায় কথা বলিবে, একই ধর্ম্ম পালন করিবে অথবা একই গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিবে কিম্বা একই রকম রীতি ও নীতির একই অপরিবর্ত্তনীয় ছন্দের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবে। সভ্যতার মধ্যে যে ঐক্যধারা, তাহাকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট রাগিণীর মধ্যে খুঁজিলে চলিবে না, হার্মনি'র মধ্যে খুঁজিতে হইবে। প্রত্যেক বড় কাল্‌চারই গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানবের সংমিশ্রণে। মিশর এবং বাবিলন, ভারতবর্ষ ও চীন, গ্রীস এবং রোম ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, কাল্‌চারগত ঐক্যসাধনে আজ যাঁহারা প্রয়াস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া এই ঐক্যসাধন চলিতেছে। ভবিষ্যতের যে ধর্ম্ম তাহা পরস্পরের সহযোগিতায়, পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যে নয়; প্রতিবেশী মানুষকে আপন করিবার চেষ্টার অনুকরণে নয়—সহিষ্ণুতায়,—ব্যক্তি প্রাধান্যে কিম্বা ঔদ্ধত্যে নয়।

আত্মহত্যা

['নর্থ আমেরিকান রিভিউ'-এর অক্টোবর সংখ্যায় হেন্‌রি মর্টন রবিনসন্‌ 'আত্মহত্যার কারণ' (Why Suicide) শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নীচে দেওয়া হইল।]

চারি পাশে বন্ধু-বান্ধব-পরিবৃত, সুস্থ, সবল যে মানুষ, মনে যাহার অপূর্ব্ব মাদকতা, অনায়াসে মানুষকে যাহা নৈরাশ্যের অন্ধকার পার করাইয়া দেয়—সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না নিজের হাতে মানুষ কি করিয়া নিজের জীবনকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ মানুষ এমন ভাবেই গঠিত—দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অপযশে তাহারা একেবারে এমন বিচলিত হয় না, যাহাতে নাকি মরণ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকায় দেখিতেছি, ১৯১৮ সন হইতে আত্মহত্যার হার বাড়িয়াই চলিয়াছে—এখানে জীবনের সমস্যা-সমাধানার্থে যেন লোকে এই সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

সকল মানুষ আত্মহত্যা করিলেই কিছু সোরগোল হয় না। একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে বসিয়া দুর্ভাগ্য জীবনের বাতিটি নিবাইয়া দেয়, কেহ তাহা নিয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। মনুষ্যজাতিরূপ বড় জাহাজখানির আনাচে-কানাচে এই সব ফুটা-ফাটা থাকা খুব বিচিত্র নয়—বরং এই বিচিত্র যে, ইহার সংখ্যা আরও কেন বাড়েনা। কিন্তু যখন ধনবান, গুণবান, শক্ত-সমর্থ, সমাজে মান্যগণ্য কেহ জীবনসূত্রকে স্বহস্তে কাটিয়া ফেলে, তখন বুঝি যে আত্মহত্যার পিছনে যে মনোবিকার আছে, তাহাকে তাচ্ছীল্য করা চলেনা, সে বিকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

একেবারে সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাধির ফল এই আত্মহত্যা। শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া মানুষ সমষ্টিকে বড় করিয়া না দেখিয়া স্বদেশ,স্ববর্ণ, স্বধর্ম্ম হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজেকে, নিজের সত্তাকে বড় করিয়া দেখিতেছে। এই রূপান্তরে তাহার মনে অদ্ভুত এক ব্যাধির ঘুণ ধরিয়াছে। এই ব্যাধির প্রকাশ নানাবিধ; আত্ম-চরিতমূলক উপন্যাস-রচনা ও যাহা কিছুর প্রান্তভাগে রচয়িতার নাম খোদাই করা (রাইনস্‌ কি চার্ট্রেশ-এর শিল্পীর নাম কেহ আজও জানেনা) ইত্যাদি ইহার রকমফের। যেখানে মানুষ ব্যষ্টিকেই মূল বলিয়া ধরিয়াছে নিজের সুখ দুঃখকেই সেরা বলিয়া জানিয়াছে এবং নিজের জয়ঢাক নিজেই বাজাইতে শিখিয়াছে—সেখানে এ ব্যাধির প্রকোপ বেশী। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের যে ইতিহাস তাহা এই নিজের জয়ঢাক নিজে বাজাইবার ইতিহাস মাত্র।

ব্যক্তিত্ব-বোধ যাহাদের বেশি, তাহাদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও বেশি, ইহার প্রমাণ আছে। পুরুষরা মেয়েদের চাইতে বেশি ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিয়া প্রকাশ, পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও মেয়েদের চাইতে বেশি। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে আত্মহত্যা ক্যাথলিকদের চাইতে বেশি। প্রত্যেক দেশে অশিক্ষিত জন-সাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐশ্বর্য্য আর স্বাতন্ত্র্য, স্ব-চর্চ্চা ও প্রচুর অবসর, এই সব মানুষকে আত্মহত্যা করায় বেশি।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বাতন্ত্র্য-বিকাশকে দোষী করা যায় না। ব্যাধির হেতু অন্যত্র। মোটামুটি বলা যায়, আজিকার মানুষ স্বাতন্ত্র্যের বহিরাবরণ পরিলেও অন্তরে সে-স্বাতন্ত্র্যের মূল আজও পৌছায় নাই। দূরের পথ সে অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এখনও সুদূরে পৌছায় নাই। মনের বিকাশকে পূর্ণ করিবার জন্য মানুষ ধর্ম্মের আশ্রয় ও অভিভাবকত্বের বাধা অগ্রাহ্য করিয়াছে। যে ছেলে বড় হইয়াছে, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধনার্থে তাহার পিতার আশ্রয় ছাড়া প্রয়োজন, সুতরাং মানুষের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক হয় নাই—কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই, যে, মানুষকে ছেলে-বয়সের সব খেল্‌না,—রঙিন কল্পনা, মোহ, আশ্রয়-সন্ধানের স্বভাব, সমস্ত পিছনে ফেলিয়া আসিতে হইবে।

যদি সে ইহা না পারে কিংবা না পারিতে চায়,—তাহাকে জীবনের কঠিন বাস্তবতার চাপে মারা পড়িতেই হইবে।

বর্ত্তমান কালের এই আত্মহত্যা ও উন্মাদ রোগের কারণ শুধু এই এক—বড় হইয়াছি এই ভাণ করা, বড় হইলে যে সব সুখ-সুবিধা, বন্ধন হইতে মুক্তি, সামর্থ্য- সেই সমস্তের দাবী করা, অথচ বড় কিন্তু একেবারেই হই নাই। বামনকে কিম্বা পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বীরের বর্ম্ম পরাইয়া দিলে যা হয় এও তাই—সত্যকার বীর না হইলে ঐ বর্ম্মের ভার বহন করাই দায়, শত্রুর প্রথম আঘাতেই তাই বীর-বেশ খসিয়া পড়িতে দেরী হয় না।

আর্থিক দুরবস্থাকে আত্মহত্যার হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বিগত মহাযুদ্ধ অষ্ট্রিয়ার ডিউক্‌কে হত্যা করিবার জন্য যেমন দায়ী আর্থিক দুরবস্থা মানুষের আত্মহত্যার জন্য তেমনই দায়ী। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে আত্মহত্যার এই প্রবল বন্যার হেতু আর্থিক দুর্গতি নয়—ইহার হেতু মানসিক বিকৃতি; আর্থিক দুরবস্থা এই বিকৃতির শুধু অন্যতম লক্ষণ।

এই মানসিক বিকারের মূলে রহিয়াছে, মনে মনে নিজে ছাড়া অপরের প্রতি নির্ভর করিবার প্রবৃত্তির অপূর্ণতা। সত্য যাহার বয়স হইয়াছে সে জানে নিজে ছাড়া আর কাহারও আশ্রয় খোঁজা নিরর্থক। বয়ঃসন্ধিকালের যে দুর্য্যোগ, অনেকেই জীবন ভরিয়া তাহার ঝঞ্ঝাট পোহায়, সারা জীবন ধরিয়া অনেকে সেই পরনির্ভরতার প্রবৃত্তির পেষণে উদ্ব্যস্ত থাকে। স্বাতন্ত্র্যের যে অপরিহার্য্য শাস্তি, দুঃখ ও নিঃসঙ্গতা, ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অর্থের, মাতৃস্নেহের আর প্রণয়িনীর আশ্রয় প্রয়োজন—তাহারা এ কথা বিশ্বাস করে এবং না পাইয়া বিপর্য্যস্ত হয়।—ফলে পূরা মানুষ না হইয়াও তাহার ভাণ করার ফলে, পূরা মানুষের কঠিন দায়িত্ব ও নিরতিশয় একাকীত্বের ভারে মারা পড়ে।

এই অবস্থায় আশ্রয় না পাইয়া তাহারা ভয় খাইয়া যায়—তাহাদের মন-গড়া বীরের বর্ম্ম পরিধান হইতে খসিয়া ভূমিতে লুটায় এবং এই বর্ম্মেরই চাপে ইহাদের প্রাণান্ত হয়।

কিন্তু এমন চিরকাল ছিল না। বহু শতাব্দী ধরিয়া (ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও) পৃথিবী ছিল মাতৃত্ববাদী—তখন ধরণী ছিল মাতা, ধর্ম্মমন্দিরও ছিল ঐ রকম—তাহাদের বুকে মানুষ সুখে দুঃখে আশ্রয় খুঁজিয়া পাইত। তখন রাজাকে, পুরোহিতকে, সমাজকে—সকল উপরওয়ালাকেই মানুষ সহজে মানিয়া চলিত—তাই আত্মহত্যারও প্রচলন ছিল না। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তিকে তখন একা-একা তপ্ত মরুভূমিতে পথ-চলার কষ্ট পাইতে হইত না—তাই আত্মহত্যাও তাহাকে করিতে হইত না।

এমন যদি সম্ভব হইত যে আজ পৃথিবী আবার সেই নিরুদ্বেগ জীবন ফিরিয়া পাইত, যখন ধন-জন-মানের জন্য লোকের মাথাব্যথা ছিল না;—নিতান্ত অখ্যাত ভাবে কৈশোর-সারল্যের মধ্যে ও শিশুর বিশ্বাস নিয়া মানুষের জীবন কাটিত—তবে আত্মহত্যার হার একেবারে নামিয়া শূন্যের অঙ্কে পৌঁছাইত, একথা জোর করিয়া বলা যায়। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সুখ ও স্বস্তির জন্য জীবনের কঠিন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানুষের আজ বাদ দিলে চলিবে না।

এই সব আত্মহত্যার হেতু দূর করিতে মানুষকে আস্তে আস্তে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা দরকার, যাহাতে সে বিপদে না ভাঙিয়া পড়ে—ভূত তাড়াইবার মত তুক্‌তাক্ মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি দিয়া এ পাপ অপসৃত করা যায় না। যদি আমরা আর আত্মহত্যা কিংবা পাগলা-গারদের সংখ্যাবৃদ্ধি না চাই—তাহা হইলে যে-সব কল্পনামূলক উপন্যাস মানুষকে শিশুর স্বপ্নে বিভোর রাখে এবং সেই স্বপ্নে ঘা লাগিলেই সে মরিয়া হইয়া উঠে কি পাগল হয়—সেই রোমাঞ্চকর উপন্যাসের স্রোত বন্ধ করা আগে দরকার।

জীবনের সঙ্গিনীর সহিত বহু ত্যাগ দ্বারা রফা করিতে হয়, যে কোন মুহূর্ত্তে সেই রফাতে ভাঙন লাগার আশঙ্কা আছে—এই সব সত্য কথাই ছাপার বই কি রেডিয়োর মারফৎ প্রচার করা দরকার,—প্রেম ও স্বপ্নে দিন কাটে না, হঠাৎ দাঁও মারিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও হওয়া যায় না, একটি একটি করিয়া পয়সা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করা ছাড়া লক্ষপতি হইবার আর কোন সহজ পথ নাই,—এ কথা আমাদের বুঝিতেই হইবে। ছবি আঁকিয়া কি কবিতা লিখিয়া নাম হইলনা, সুতরাং ব্যর্থ স্বপ্নের জন্য মৃত্যুকে বরণ করি—আত্মহত্যার মূলে এই ধরণের চিন্তাও কম ইন্ধন জোগায় না। আসলে ছবি আঁকার যে আনন্দ কি কবিতা লেখার যে আনন্দ তাহা ছাড়া আর কোন আনন্দই সত্যকার শিল্পী কি কবি প্রত্যাশা করে না। জীবনের পথ চলিতে নিন্দা, গ্লানি আছেই, সেজন্য ভাঙিয়া পড়া এবং একেবারে জীবনের গতির মোড় ফেরানো নিতান্তই ছেলে-মানুষি—এ কথাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

মার্কাস অরেলিয়াসের কথায়—"মানুষকে ভিতর হইতে খিলান ও ভিত্ গড়িয়া মজবুদ হইতে হইবে, নহিলে মন্দির ধূলিসাৎ হইতে বাধ্য।"

প্রাচ্যে দুর্য্যোগ

'স্ক্রবনার্স' ম্যাগাজিন'-এর গত অক্টোবর সংখ্যায় মিঃ লথ্‌রপ্ ষ্টার্ড—'প্রাচ্যে দুর্য্যোগ' (Chaos in the East) শীর্ষে লিখিয়াছেন—

পাশ্চাত্যের মর্য্যাদা প্রাচ্যে আর নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু প্রাচ্যও আর স্বধর্ম্ম প্রাচ্যত্বের গর্ব্ব করিতে পারে না। গান্ধী কি 'টাগোর' ঝাঁটা মারিয়া সমুদ্রের স্রোত রুধিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। শ্বেত-মনুষ্যের অধীনতা হইতে আজ ভারতবাসী উদ্ধার পাইতে চায়—গান্ধীর সহিত ভারতবর্ষের জনসাধারণের এইটুকুই মিল, চরকা কাটার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। অনেকে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের একটা সামঞ্জস্য করিতে চান—ইহা সম্ভব নয়। জাপান তাহার প্রমাণ। জাপান প্রতীচ্যের স্বপ্নে ভরপুর হইয়া আছে। এতদিন তবু জাপান তাল রাখিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু আর তাহা পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু জাপানে যাহা মাত্র তাল ভাঙিয়াছে—প্রাচ্যের অপরাপর দেশে তাহা অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে। এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফল কি হইবে কে জানে।

কস্মৈ দেবায় ?

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

[শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত এই উপন্যাসটি উপাসনায় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছিল—যাঁহারা উপাসনার গ্রাহক ছিলেন তাঁহাদের জন্য উপন্যাসটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য; অথচ যাঁহারা বঙ্গশ্রীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা একটি খণ্ডিত উপন্যাস না পড়িতেও পারেন, এইজন্য এই উপন্যাসের যতটুকু উপাসনায় বাহির হইয়াছে তাহার চুম্বক স্বয়ং গ্রন্থকারকে দিয়া লেখান হইল। এই চুম্বকটি পড়িয়া লইলে বঙ্গশ্রীর পাঠকদের এই উপন্যাসটি বুঝিতে কষ্ট হইবে না।—বঃ সঃ]

লোক্যাল ট্রেণের যাত্রীদের নিত্য অনেক প্রকার ফিরিওয়ালা, ক্যানভাসার, চাঁদার উমেদার প্রভৃতির অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। অধিকাংশ ডেলি প্যাসেঞ্জারেরই এ সমস্ত এক রকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ উদাসীন এই সমস্ত জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত কেরাণীরাও কোনো কোনো সময় কৌতূহলী হইয়া উঠে একটি অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর শুনিয়া। কিশোর বয়সের একটি সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত ছেলে ট্রেণে মাঝে মাঝে কোনো অনাথ আশ্রমের জন্য ভিক্ষা করিতে আসে। যেমন অপূর্ব্ব তাহার কণ্ঠস্বর তেমনি অপরূপ তাহার স্নিগ্ধ রূপ। দেখিলে আপনা হইতেই স্নেহে হৃদয় গলিয়া যায়।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ছেলেটি শুধু বলে, "আমার নাম অমৃতানন্দ, ব্রহ্মচারীর আর পরিচয় কি ?"

কিন্তু অমৃতানন্দের অন্য পরিচয় আছে, চিরদিন সে এমন ছিল না। ছেলেবেলার স্মৃতি তাহার মধুর নয় বলিয়াও বোধ হয় সে ভুলিতে চায়।

ছেলেবেলার কথা ভাবিলে প্রথম তাহার মনে পড়ে একটি ছোট সঙ্কীর্ণ ঘর, ভালো আলো আসে না। মধ্যবিত্ত দরিদ্র কেরাণীর ঘরে যেমন আসবাব-পত্র থাকা সম্ভব তাহার বেশী কিছু সেখানে নাই। সেই ঘরে প্রথম জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সে তাহার পিতার যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা বিশেষ সন্তোষ-জনক নয়। অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত লোক। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবার মত ইচ্ছা পর্য্যন্ত যেমন তাঁহার নাই প্রত্যেক স্খলনের পর অনুশোচনাও তেমনি তাঁহার প্রবল। মত্তাবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আত্মগ্লানিতে তিনি দগ্ধ হইতে থাকেন।

বিনুর মা সাধারণ বাঙালী ঘরের শান্ত সহনশীলা বধূ। সামান্য একটু অনুযোগ ছাড়া আর কিছু তিনি স্বামীর আচরণের বিরুদ্ধে করিতে জানেন না। কিন্তু তাহাতেই কিছুদিনের মত কাজ হয়। বিনুর বাবা কিছুদিনের মত নিজের জীবন-ধারা পরিবর্ত্তন করেন। বিনুদের সংসার সহজ ভাবে চলে।

কিন্তু বিনুর বাবার চরিত্রের গ্লানিকর দিকটা আবার ফুটিয়া ওঠে। তাঁহার সমস্ত সৎ সঙ্কল্প প্রলোভনের মুখে ভাসিয়া যায়। ধীরে ধীরে তাহাদের সংসারে ভাঙন ধরিতে থাকে। বিনুর উপর সে ভাঙনের প্রভাব গভীর ভাবে পড়ে।

বিনু একটু লাজুক স্বভাবের ছেলে। তাহার মনের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য সে লাজুকতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হইয়াই থাকে। স্কুলে নির্ম্মম কোনো কোনো শিক্ষকের হাতে বিনু তাই নিগৃহীত হয় এবং যে বয়সে তাহার বাহিরের আবেষ্টন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার কথা সেই বয়সে সংসারের নিষ্ঠুরতায় সে তাহাদের দারিদ্র্যের লজ্জাকে নিজের জীবনে আবিষ্কার করে। পিতার চারিত্রিক দুর্ব্বলতার জন্য নিজের সমবয়সী সঙ্গীদের কাছেও সে মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হয়। এমনি করিয়া প্রতিকূল অবস্থার মাঝে বিনুর মন অন্তর্মুখী হইতে বাধ্য হয়।

তাহার পর দেখা যায় তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিয়াছে। বিনুর বাবার চাকরী গিয়াছে, অনেক দিনের বাকী বাড়ি-ভাড়ার দরুণ তাহাদের বাড়ি ছাড়িতে হইতেছে। ঘরে তাহাদের সেই পুরাতন অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হয়। তাহার পিতার দুর্ব্বল অনুশোচনা, মাতার মৃদু অনুযোগ। নূতন ভাবে জীবন-যাপনের জন্য পিতার আবার শপথ গ্রহণ।

কিন্তু বাড়ি ছাড়া ব্যাপারটা বিনুর কাছে তেমন করুণ মনে হয় না। তাহার বেশ ভালই লাগে। শিশু-মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা সে একেবারে এখনও হারায় নাই।

সমস্ত বাড়ি-ঘর ওলট-পালট করিয়া গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। আশ্চর্য্য রকমের গোটা কতক জিনিষ আবিষ্কার করিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না; কাঠের সিন্দুকের তলায় সুন্দর একটা পেন্সিল, খাটের উপর পাতা মাদুরের নীচে তাহার ছেলেবেলাকার এক জোড়া মোজা।

গরুর গাড়ীর উপর তাহার যথাসর্ব্বস্ব খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া সে বোঝাই করে। পাশের বাড়ির মেনি বেড়ালটাকে নেহাৎ মায়ের নিষেধের জন্যই সে লইয়া যাইতে পারে না।

তাহাদের বাড়ির গলির মোড় ছাড়াইয়া বাবা ও মায়ের সঙ্গে যাইবার সময় হঠাৎ তাহার এতদিনকার সাথীদের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। ইহাদের অগোচরে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে ভাবিয়া কিছুক্ষণ আগেই তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। কোন মতেই তাহাদের সহিত কথা বলিবে না এই ছিল তাহার সঙ্কল্প। কিন্তু কোথায় তাহা ভাসিয়া যায়।

একজন ছেলে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করে "কোথায় যাচ্ছিস রে বিনু?"

বিনু পরম উৎসাহে চীৎকার করিয়া জানায়—"আমরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছি—আমাদের নতুন বাড়ি ভাড়া হয়েছে যে!"

ছেলের দল তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে বলে, "আর আসবিনা?" আর আসবি না! এক মুহূর্ত্তে নূতন জায়গায় যাইবার উৎসাহ বিনুর ম্লান হইয়া আসে। চলিয়া যাওয়ার এ অর্থ সে ত আগে উপলব্ধি করে নাই। অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে সে বলে, 'না'।

ছেলের দল অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসে। যে বাড়ি হইতে একদিন সে নিজে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, যে ছেলেদের হাতে একদিন সে মার খাইয়াছে ও অপমানিত হইয়াছে তাহাদের জন্যই বিনুর মন কাতর হইয়া উঠে।

জীবনের জটিল বিচিত্র রহস্যের প্রবল স্বাদ বুঝি বিনু পাইয়াছে—সে স্বাদ কিছু তিক্ত, কিছু মধুর এবং কিছু এমন যাহা বর্ণনা করা যায় না। বিনুর পক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীর মাঝে তাহাদের এবার থাকিতে হয়। টিনের চালের বাড়ি, মাটির দেওয়াল। বাড়ি দেখিয়া মা প্রসন্ন হন নাই। বাবাও এমন বাড়িতে তাহাদের আনিবার জন্য একটু লজ্জিত হইয়া আছেন মনে মনে। কিন্তু এ বাড়ির মধ্যে মা ও বাবার কাছে যাহা ত্রুটী বলিয়া মনে হয় বিনুর কাছে সেই গুলিই পরম আকর্ষণের বস্তু।

টিনের চালের ফুটা দিয়া বর্ষার রাতে জল চোঁয়াইয়া পড়া তাহার ভালো লাগে—বাড়ির পাশে শ্যাওলার ছোপ লাগান কর্দ্দমাক্ত নর্দ্দামা তাহাকে নদীর আভাষ দেয়। সামনের মাঠের একটি পরিত্যক্ত ইটের পাঁজাতে সে পর্ব্বতের হিমালয় আরোপ করিয়া খুসী হইয়া উঠে। পৃথিবীকে সে নিজের মন দিয়া নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে শিখিতেছে।

কিছুদিন ধরিয়া তাহার বাসার সাময়িক পরিবর্ত্তনের জন্য সংসারও তাহাদের মসৃণভাবে চলিতেছে—তাহার মার মুখে আবার প্রসন্ন হাসি ফুটিয়াছে। দেখিলে মনে হয় বুঝি তাহাদের সুদিন এবার স্থায়ী ভাবে ফিরিল।

হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই শান্তির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। শনিবারের রাত। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিয়া মা বিনুকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন। স্বামীর আজকাল অফিস হইতে ফিরিতে কখনও বিলম্ব হয় না বলিয়াই বিনুর মার উদ্বেগ এত বেশী। স্বামীর পরিবর্ত্তন স্থায়ী বলিয়া তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বিশ্বাসে এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত তিনি পাইবেন কে জানিত।

মাঝ রাত্রে হঠাৎ বিনুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়িতে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল চলিতেছে। ভীত ত্রস্ত হইয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

মা ঘরে নাই। তাহাদের বাহিরের দরজায় কে যেন জোরে পদাঘাত করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে মার উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল "কি দরকার ছিল আসবার। শেষ রাতটুকু কাটিয়ে এলেই ত পারতে।"

দরজায় আবার পদাঘাতের শব্দ শোনা গেল, তাহার পর তাহার বাবার অস্বাভাবিক রূঢ় গলার স্বর, "খোল দরজা, নইলে ভেঙ্গে ফেল্‌ব বলছি!"

"ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভেঙ্গেই ফেল, খুলবনা আমি কিছুতে!" তাহার মাকে এমন উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে আর কখনও বিনু শোনে নাই। বিছানা হইতে সভয়ে নামিয়া সে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের দরজা বাবার পদাঘাতে মড়্ মড়্ করিয়া উঠিতেছে। তাহার মা নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ পাড়ার মধ্যে কেলেঙ্কারীর কথাটা স্মরণ করিয়া কিনা বলা যায় না বিনুর মা দরজাটা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কেলেঙ্কারীর কিছু বাকী রহিল না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাবা মার মুখের কাছে গিয়া হাত পা নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া কি যে বলিলেন ভাল করিয়া বিনু শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মা বলিতেছিলেন—"কেন দরজা বন্ধ রাখব না শুনি, রাত তিনটের সময় বাড়ী ঢুকতে লজ্জা করে না!"

বাবা টলিতে টলিতে ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিলেন—"আমার খুশী, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি অনেক সয়েছি তাই তোমার আস্পর্দ্ধা এত বেড়েছে।"

বাবা বিনুর পাশ দিয়াই দরজায় একবার টাল খাইয়া ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু বিনুকে তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

"আমার স্পর্দ্ধা বেড়েছে?" রাগে ক্ষোভে দুঃখে মার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাইতেছিল। বাবার পিছু পিছু দাওয়ায় উঠিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "রাত দুপুরে মাতাল হয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে, তাই মুখ বুঁজে না সইলেই আমার স্পর্দ্ধা হয়!—কেন আমি কি তোমার কেনা বাঁদী?"

বাবা ঘরের চৌকাঠের কাছে তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কটু কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"চুপ চেঁচিও না।"

"কেন চেঁচাব না, যার স্বামী তোমার মত ইতর তার আবার মান সম্ভ্রম কিসের?" বিনুর মার স্বাভাবিক জ্ঞান যেন লোপ পাইয়াছে। এমন ভাবে উত্তেজিত তিনি কখনও হন নাই। স্বামীর এবারকার পরিবর্ত্তন গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আকস্মিক আঘাত তাঁহাকে বুঝি এতখানি

বিচলিত করিয়াছিল। অনেকখানি আশা করিবার সুযোগ দিয়া স্বামী যেন তাহাকে শেষ মুহূর্ত্তে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। শান্তিময় সংসারের যে স্বপ্ন তিনি অনেক কষ্টে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এমন ভাবে তাহা ধূলিসাৎ হইবার পর আর যে তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে না, মনের গোপনে তিনি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর আশাহত অন্তরের শেষ আর্ত্তনাদ তাই এমনি ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মা আবার বলিলেন—"চিরদিন চুপ করে থেকেছি বলেই ত আমার এই দুর্দ্দশা তুমি করেছ।"

"তবে চেঁচাও" বলিয়া মাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বাবা ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। ঠেলাটা যে অত জোর হইবে তাহার বাবাও বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। বিনু শিহরিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সামলাইতে না পারিয়া মা দাওয়ার উপর হইতে একেবারে উঠানের উপর সজোরে পড়িয়া গেলেন।

বিনু আতঙ্কে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেমন ভাবে পড়িয়াছিলেন তেমনি ভাবেই মা উঠানের উপর পড়িয়া রহিলেন—শুধু তাঁহার চাপা কান্নার শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতে লাগিল। বাবা ঘরের ভিতর হইতে আর বাহির হইলেন না। বিনুর সমস্ত বোধ-শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। কি যে হইয়া গেল সে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই। শুধু নিজেকে তাহার একান্ত অসহায়, একান্ত পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। পৃথিবীতে তাহার কথা কাহারও মনে নাই—সে নিতান্ত অনাবশ্যক। নিজের অজ্ঞাতেই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল। কিন্তু সে কান্না কেহ লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে সে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল সে জানে না।

তাহার পরদিন অবশ্য কাটে, কিন্তু তেমন করিয়া নয়। সেই রাত্রিটি তাহাদের সংসারের উপর গভীর ভাবে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সেই ঘটনার পরও আবার একদিন বাবা ও মায়ের মধ্যকার ব্যবধান মনে হইল দূর হইয়াছে—কিন্তু সত্যকার মিলন তাহা বুঝি নয়। বিনুর মা কেমন যেন তাহার বাবাকে আজকাল ভয় করিয়া চলেন। সেই রাত্রির শারীরিক নয়, মানসিক আঘাত অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই হয়ত অত্যন্ত নিদারুণ হইয়াছিল। বিনুর মার আত্মমর্য্যাদা-বোধের মূল পর্য্যন্ত তাহাতে শুখাইয়া গিয়াছে। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে অন্যান্য সাধারণ মেয়ের মত সে মর্য্যাদাবোধ কোন দিনই তাঁহার গভীর ছিল না। কখনও তাহার পরীক্ষা হয় নাই বলিয়াই তাহা কোন মতে এতদিন টিঁকিয়া ছিল। জীবনের প্রথম আঘাতেই তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

সেই রাত্রের পরদিন বিনুর বাবা বাড়িতে এক সঙ্গে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। বিনু এখন জানে যে সে টাকা বাবা জিতিয়াছিলেন ঘোড়দৌড় খেলিয়া ঘোড়দৌড় জুয়া বলিয়া যে মৃদু আপত্তি মা তুলিয়াছিলেন বাবা তাহাতে বিশেষ কান দেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন যে জুয়ায় হার হইলেই তাহা খারাপ, জিতিলে নয়। একবার হার হইলেই তিনি এ জুয়া ছাড়িবেন এমন কথাও বুঝি তিনি জানাইয়াছিলেন।

সে কথা অবশ্য তিনি রাখেন নাই। গত কয়েকবার তিনি শূন্য হাতেই ফিরিতেছেন। সংসারে তাহাদের অর্থকষ্ট আবার বাড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার মায়ের পরাজয় সম্পূর্ণ, স্বামীকে তাঁহার শপথের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও তাঁহার মনে নাই।

সত্য কথা বলিতে কি মা এখন বাবার ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে একটু যেন উৎসাহিতই হইয়া উঠিতেছেন।

শনিবার দিন সকালে হয়ত মা বলেন, "দেখ আজ সরষের তেলের ভাঁড়ে দেখি চারটে আরসুলা পড়ে রয়েছে।"

কথাটা বলিয়া বিনুর মা উৎসুক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকান।

বিনুর বাবা সকালে উঠিয়াই দাওয়ায় বই-কাগজ লইয়া রেসের হিসাব করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। পেন্সিলটা কাগজ হইতে তুলিয়া হাসিয়া বলেন—"তার মানে আজ চার নম্বর আসচে কেমন ?"

"যাঃ আমি বুঝি সেই কথা ভাবছি—" বলিয়া বিনুর মা চলিয়া যান, কিন্তু খানিক বাদেই ঘুরিয়া আসিয়া বলেন—"তুমি আমার কথা শুনে খেলে দেখো আজ ঠিক চার নম্বর আসবে।"

বিনুর বাবা হাসিয়া বলেন—"আচ্ছা।"

কোন দিন বা ঘোড়দৌড়ে কি ভাবে হঠাৎ লোকে বড়লোক হইয়া যায় এবং কাহার তাহা হইয়াছে বাবা তাহার গল্প করেন।

মা অনেকক্ষণ শুনিবার পর জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা তুমি একদিন ওই রকম কেউ খেলেনি এমন একটা ঘোড়া খেলতে পারনা ?"

বাবা হঠাৎ ধমক দিয়া বলেন "যা বোঝনা তা নিয়ে যা তা বল কেন ? সে রকম ঘোড়া খেললেই আসে নাকি ?" বাবার মেজাজ আজকাল সহজেই গরম হইয়া উঠে,মায়ের প্রতি ব্যবহারেও আজকাল তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মা চুপ করিয়া যান। কিন্তু কৌতূহল তাঁহার দূর হয় না। খানিক বাদে আবার বলেন—"আচ্ছা একদিনে ঠিকমত টিপ্ মিলে গেলে একশ টাকা থেকে কত টাকা করা যায় ?"

বাবা বলেন,—"তা দশ হাজার হ'তে পারে !"

মা সবিস্ময়ে শব্দটিকে যেন উপভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন—"দ-শ—হা জা-র !" নিত্যকার অসচ্ছলতার মধ্য হইতে বিনুর মার অর্থলোভের অনায়াসসাধ্য পদ্ধতিতে লোভ জন্মিয়াছে। তাঁহার অধঃপতন সম্পূর্ণ।

বিনুর এ সমস্ত টাকার কথা শুনিতে মন্দ লাগে না। শনিবার সন্ধ্যার পর বাবার আসিবার আগে মার উদ্বেগ এক একদিন তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষণিক।

এদিকে তাহাদের সংসারে গ্লানির অন্ত নাই—সে গ্লানি বিনুকেও স্পর্শ করে না এমন নয়। সকালে হয়ত তাহাদের দরজায় আসিয়া কেহ তাহার বাবার নাম ধরিয়া ডাকে। বিনুর বাবা মাকে ইসারায় কি যেন বলেন। মা তাহার পর বিনুকে যাহা চুপি চুপি শিখাইয়া দেন তাহাতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া যায়, তাহার পর ব্যাপারটাকে অত্যন্ত মজা বলিয়াই তাহার মনে হয়।

বাড়ির ভিতর হইতে বিনু চেঁচাইয়া বলে—"বাবা বাড়িতে নেই।" কিন্তু বলিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। কিন্তু মা যখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙাইয়া ওঠেন তখন ব্যাপারটা শুধু আমোদের নয় বলিয়া কেমন অস্বস্তিকর সন্দেহ তাহার মনে জাগে।

প্রত্যক্ষভাবে একটু আধটু তাহার পিতার চরিত্র লইয়া সাধারণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। বাকি পয়সার জন্য বাজারে দোকানে অনেক অপমান সে নীরবে সহ্য করে। সে লাঞ্ছনার কথা কাহাকেও বলিবার নয়।

শিশু-মনকে মুকুলে বিনষ্ট করিবার জন্য যে সমস্ত আয়োজন-উপকরণ ও আবেষ্টন প্রয়োজন বিনুর চারিধারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। গৃহের এই গ্লানিকর আবহাওয়ার ঊর্দ্ধে মাথা তুলিতে না পারিলে হয়ত আরও অনেক শিশুর মতই বিনুর জীবন লইয়াও লিখিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু বিনু হঠাৎ গৃহের বাহিরে নূতন এক অবলম্বন পাইয়া বাঁচিয়া গেল। তাহাদের সংসারের কলঙ্কের ছাপ তাহার গায়ে লাগিবার সুযোগ পাইল না।

বিনু আজকাল যে নূতন স্কুলে পড়ে সেখানে তাহার এক বন্ধু জুটিয়াছে। ছেলেটি নিজে সাধিয়া তাহার সঙ্গে ভাব না করিলে বিনু তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহস করিত কিনা সন্দেহ। বিনু স্বভাবতঃই লাজুক, তাহার উপর মানুষের অবস্থার প্রভেদ সম্বন্ধে সে আজকাল অতিমাত্রায় সচেতন হইতে বাধ্য হইয়াছে। যে ছেলে দরওয়ান সঙ্গে করিয়া ঝকঝকে মোটরে নিত্য অমন নূতন নূতন জামাজোড়া পরিয়া স্কুলে আসে এবং স্কুলের মাষ্টাররাও যাহাকে সমীহ করিয়া চলে বলিয়া সন্দেহ হয় তাহার সহিত বিনু বন্ধুত্ব পাতাইতে যাইবে কোন সাহসে।

কিন্তু দেবব্রতের কেন বলা যায় না ক্লাবের এতগুলি ছেলের ভিতর বিনুকেই অত্যন্ত মনে ধরিয়াছে। দুপুরে টিফিনের সময় দেবব্রতের জন্য নিত্য চাকরে খাবার লইয়া আসে। বিনুর ওজর আপত্তি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেবব্রত একদিন জোর করিয়া সে খাবারের ভাগ দিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইল।

তাহার পর হইতে বিনুকে কোন দিনই সে টিফিনের সময়ে ছাড়ে না। বিনুর স্বাভাবিক কুণ্ঠা ত আছেই তাহার উপর আছে অন্যান্য ছেলেদের ব্যঙ্গোক্তির ভয়; কিন্তু দেবব্রতকে সে কথা বলা বৃথা। সে বলে, "আমার ভাই একলা খেতে ভাল লাগে না, আর বারণ করলেও মা কত খাবার দেয় দেখেছিস ভাই; একি একলা খাওয়া যায়!"

দেবব্রত বিনুর কাছে একেবারে নূতন জগতের লোক। শুধু বড় লোকের ছেলে বলিয়াই তাহাকে বিনুর অপূর্ব্ব মনে হয় বলিলে বিনুর প্রতি অবিচার করা হইবে। দেবব্রতের সাজপোষাক ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বিনুকে মুগ্ধ করে বটে, তাহার অর্থসাচ্ছল্য বিনুর কাছে দেবব্রতের নিজস্ব একটা গুণ বলিয়া মনে হয় একথাও সত্য, কিন্তু শুধু তাহাতেই সে আকৃষ্ট হয় নাই। দেবব্রতের গুণ অনেক। বিনুর চেয়েও দুর্ব্বল রুগ্ন ওই ছোট ছেলেটির চারিধারে বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্তি যেন ঝলমল করিতেছে। তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের সীমানার বাইরের অদ্ভুত সমস্ত প্রশ্ন করিয়া সে মাষ্টারদেরও বিচলিত করিয়া তোলে। অনায়াসে ইংরেজি বলিয়া যায় যেন প্রায় মাষ্টার মহাশয়দেরই মত, আর এমন সব কথা সে বলে যাহা জীবনে বিনু কখনও শোনে নাই, কল্পনাও করে নাই।

স্কুলের ছুটির পর এক একদিন দেবব্রত জোর করিয়া বিনুকে তাহাদের মোটরে করিয়া লইয়া যায়। বলে "বেশ গল্প করতে করতে যাব ভাই, চ'না, তোদের রাস্তায় নামিয়ে দেবখন—" মোটরে চড়িতে যাওয়াটা জীবনের পরম সৌভাগ্য মনে করিলেও বিনু সহজে রাজী হয় না। না রাজী হইবার কারণ আছে। মোটরের সুবেশ সোফার ও দারোয়ান তাহার মলিন ছিন্ন বেশভূষার দিকে যে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে তাকায় এটুকু বিনু বেশ বুঝিতে পারে। নানাভাবে বিনুর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেও তাহারা ত্রুটি করেনা। দেবব্রতের জন্য মোটরের দরজা খুলিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে এবং সে উঠিলেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দেয়। একান্ত সরল বলিয়াই বোধ হয় দেবব্রত এ সব ছোটখাট ব্যাপারের অনেক ঊর্দ্ধে। ইহার ভিতরকার অপমানটা সে দেখিতে পায় না, শুধু একটু বিরক্ত হইয়া সে বলে, "আঃ দরজা বন্ধ করলে কেন, বিনু যাবে যে!"

তাচ্ছিল্যভরে ভুরু দুইটি কুঁচকাইয়া সোফার বলে—"ওঃ, তাই নাকি? ওঠ ওঠ খোকা, পা দুটো মুছে ওঠ।" সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরে ষ্টার্ট দেয়।

দেবব্রতই দরজাটা খুলিয়া ধরে, বিনু অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে খাতা-বই গাড়ির পা-দানির উপর রাখিয়া দুইহাত দিয়া ভর দিয়া মোটর চলিয়া যাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

নিজের আচরণের অশোভনতায় তাহার নিজেরই লজ্জা হয় ; কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। কিছুক্ষণ পরেই মোটরে চড়িবার গৌরবের কথাও তাহার মনে থাকে না, দেবব্রত এমন অদ্ভুত সব কথা বলে। হঠাৎ হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—"বড় হলে তুই কি হবি বিনু ?"

বড় হইলে কি হইবে ? কই বিনু কোনদিন ত সে কথা ভাবে নাই, বড় হইলে বাবার মত চাকরী করিবে এবং কিছুতেই মদ খাইবে না ও রেস খেলিবে না এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার আছে বটে কিন্তু সে কথা দেবুকে কেমন করিয়া বলা যায়। দেবু অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিয়া যায়—বড় হইলে সে বিলাত গিয়া ডাক্তার হইয়া আসিবে। শুধু ডাক্তার হইবে না, এমন একটা ঔষধ সে বাহির করিবে যাহাতে মানুষের যক্ষ্মা সারিয়া যায়। তাহার দিদি যক্ষ্মায় মারা গিয়াছে। বাবা বলিয়াছেন যক্ষ্মার ঔষধ এখনও কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সে সেই অসাধ্য সাধন করিবে এবং তাহার পর বিনামূল্যে সমস্ত গরীব লোকের ভিতর বিলাইয়া দিবে।

বিনু অবাক হইয়া এ সমস্ত কথা শোনে। এ সমস্ত কথা তাহার কল্পনার অতীত। বিলাত সাহেবদের দেশ একথা বিনু জানে কিন্তু সেখানে পড়িতে যাইতে হয় এবং যক্ষ্মা বলিয়া একটা ভয়ঙ্কর রোগের ঔষধ বাহির করা অত্যন্ত দরকার এ কথা কে জানিত। পাশাপাশি বসিয়াও দেবুকে তাহার অনেক দূরের ভিন্ন জগতের ছেলে বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রতি বিনুর শ্রদ্ধার ও সম্ভ্রমের সীমা থাকে না।

দেবব্রত উৎসাহভরে বলিয়া যায়—"তুইও যদি আমার সঙ্গে যাস ত বেশ হয়।" যক্ষ্মার ঔষধ বাহির করা যেমন কাজই হোক দেবুর সহিত যাইতে পাইবার আশায় বিনু তৎক্ষণাৎ খুশী হইয়া সায় দিয়া বলে—"আমিও যাব।"

দেবু হাসিয়া বলে,—"তোর সমুদ্রে জাহাজে চড়ে যেতে ভয় করে না ত ! আমার করেনা ভাই। ভয় করবে কেন ভাই, এত ভারী মজা। আমার এরোপ্লেনে চড়তেও ভয় করে না।"

চিন্তার এ রকম ধারাই বিনুর কাছে নূতন, সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে,—"সমুদ্রে জাহাজ ডুবে যায় না ?"

দেবু বলে,—"দুর্ ডুবে যাবে কেন, এখনকার সব বড় বড় ষ্টীমের জাহাজ। আমাদের বাড়িটার চেয়েও ঢের বড়, সে কি সহজে ডোবে।"

বিনু সবিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে।

দেবু খানিক বাদে আবার নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলে—"দু একটা মাঝে মাঝে ডোবে কিন্তু সে খুব কম ! কেন, তোর ভয় করছে নাকি ?"

বিনু তাড়াতাড়ি বলে, "না, আমিত সাঁতার জানি একটু একটু।"

দেবু হাসিয়া ফেলিয়া বলে, "দুর্ একটু সাঁতার জানলে বুঝি সমুদ্রে বাঁচা যায়। সমুদ্র দেখিস্ নি বুঝি ? ওয়াল-টেয়ারে সে কি বড় বড় ঢেউ !"

বিনুর সমুদ্র-যাত্রার উৎসাহ অনেকটা ম্লান হইয়া আসিলেও সে জোর করিয়া বলে, "তুই সঙ্গে গেলে আমার ভয় করবে না।"

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন দেবুর সঙ্গলাভও বিনুর ভাগ্যে ঘটে না। দুদিন স্কুলে আসিতে না আসিতেই আবার কয়েকদিন দেবুকে দেখা যায়না। মনমরা হইয়া বিনু ক্লাশের এক ধারে বসিয়া থাকে। ছেলেরা নির্ম্মমভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"কিরে, আজ টিফিনে রসগোল্লা খেলিনে, বড় মানুষের ছেলের রসোগোল্লা ?" স্কুলের ছুটির পর পরিহাস করিয়া বলে, "বিনয় বাবুর মোটর কোথা গেল আজ !"

দেবু সঙ্গে থাকিলে এসমস্ত ব্যঙ্গ বিনু অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু অন্য সময়ে এগুলা বড় বাজে।

কয়েকদিন বাদে আরো একটু শীর্ণ আরো একটু কাহিল চেহারার সঙ্গে দেবব্রত স্কুলে একগাল হাসি লইয়া হাজির হয়। বিনুকে গোপনে ডাকিয়া বলে—"বড্ড অসুখ করেছিল ভাই, মা আজকেও আসতে দিচ্ছিল না, আমি জোর করে এলাম।"

কেন যে সে জোর করিয়া আসিয়াছে তাহা দেবব্রত অবশ্য বলে না, কিন্তু বিনু তাহা জানে। জানিয়া তাহার গর্ব্বের, আনন্দের আর সীমা থাকে না। কিন্তু দেবুর এত অসুখ করে কেন ! অসুখ না করিলে তাহাকে ত বার বার এত কামাই করিতে হইত না।

দেবু সেদিন বিনুকে একেবারে তাহাদের বাড়িতে লইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে দেবুদের বাড়ি বিনু কখনও দেখে নাই। দেবুদের অনেক পয়সা সে জানে, কিন্তু তাই বলিয়া অত বড়

বাড়িতে সে থাকে ইহা সে কল্পনা করে নাই। বাবা যে সব বাড়ির ছবি আঁকিত সেগুলাও এ বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়। এ বাড়ির বিশালতাই বিনুকে অভিভূত করিল সব চেয়ে বেশী, খুঁটিনাটির কথা মনে করিয়া বলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরের পর ঘর। উপরে নীচে এমন করিয়া সাজান, এত বড় বড় এতগুলা ঘর দেবুদের কি কাজে লাগিতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না।

জুতা পায় দিয়া সে ঘরে ঢুকিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল, চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"জুতো খুলে যাব ভাই ?"

দেবু অবাক হইয়া বলিল,—"না জুতো খুলবি কেন !"

দেবুর দেখাদেখি সে জুতা পায়েই চলিল, কিন্তু প্রতি পদেই তাহার অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, ছবি আঁকা এ রকম মোটা নরম কাপড় মেজেতে কি জুতা পায়ে ময়লা করিবার জন্য পাতা আছে! আর তার জুতা যা নোংরা।

ঘরের আসবাবপত্র তাহার মনের উপর অস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গেল মাত্র। তাহাকে বিস্মিত ও লুব্ধ করিল প্রকাণ্ড একটা বাঘের মাথা সমেত ছাল। অনেকক্ষণ সেখান হইতে সে নড়িতেই চাহিল না। তাহার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যিকারের বাঘ দেবু ?"

"হ্যাঁরে সত্যিকারের। গুলি করে বাবা মেরেছিল।" বলিয়া দেবু তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

বিনুর সবচেয়ে ভাল লাগিল দেবুর মাকে। এত ঐশ্বর্য্য এত বৈচিত্র্যের মাঝে দেবুর সাহচর্য্য সত্বেও যেটুকু সঙ্কোচ তাহার মন হইতে দূর হয় নাই, দেবুর মা তাঁর সহজ স্নেহের দ্বারা সেটুকু সম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া দিলেন।

তুলনা করিবার বয়স তাহার নয় তবু বিনুর মনে কেমন করিয়া একটা ধারণা জন্মিয়া গেল যে তাহার মাও যেন দেখিতে এমনি ছিলেন একদিন। এমনি প্রসন্ন হাসি, এমনি স্নেহার্দ্র চোখ সে যেন মারও একদিন দেখিয়াছে।

বেশভূষা বা ব্যবহারে একটুমাত্র ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর থাকিলেও হয়ত বিনুর মন নিজের অজ্ঞাতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত কিন্তু দেবুর মার কোথাও তাহা নাই। অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের বেশভূষা, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার,—কে [illegible] এত বড় বাড়ির গৃহিণী।

তাঁহার উপস্থিতিতে এ বাড়ির ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার হইয়া উঠিতে পারে নাই—একটি সহজ শ্রী লাভ করিয়াছে।

বিনুকে আদর করিয়া তিনি বলিলেন—"ও দেবু, এই এক রত্তি তোর বিনু ? তোর কাছে 'এই বিনু সেই বিনু' শুনে শুনে আমি ভেবেছিলাম বিনু না জানি কত বড় একটা বীর।"

বিনু লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া ছিল। তাহার মুখটি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া দেবুর মা আবার বলিলেন—"দিব্বি ফুটফুটে ছেলেটি, কিন্তু এত রোগা কেন বাবা ? দুজনে কি যুক্তি করে পৃথিবীতে এসেছিলে হাড়ের ওপর চামড়া ছাড়া রাখব না !"

বিনু এবার বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু দেবু আমার সঙ্গে পারে না।"

কিন্তু দেবু এত সহজে হার স্বীকার করিতে রাজী নয়, সে তৎক্ষণাৎ জানাইল—"হ্যাঁ, আর তুমি যে বক্সিং কিছু জাননা !"

"আচ্ছা দুজনেই সমান পালোয়ান।" বলিয়া হাসিয়া দেবুর মা তাহাদের খাবারের আয়োজন করিতে গেলেন।

তাহার ছেঁড়া জুতা ও ময়লা কাপড়ের লজ্জা বিনু এতক্ষণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

খাওয়া দাওয়ার পর দেবু তাহাকে তাহার ছবি ও বই দেখাইতে বলিল,—এমন ছবি ও এমন গল্পের বই বিনু কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। বই ঘাঁটিয়া ছবি দেখিয়া তাহার আর আশ মেটেনা। দেবু তাহাকে নূতন পৃথিবীর সন্ধান দিয়াছে—সে পৃথিবী যেমন বিশাল তেমনি আশ্চর্য্য রকমের বিচিত্র। গৃহের আবেষ্টন ছাড়াইয়া এমনি একটি বিশাল জীবনের ক্ষেত্রে বিনুর শিশু-মনের মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

এমনি করিয়া ঘরের জীবন বিনুর কাছে অত্যন্ত উপযুক্ত সময়ে গৌণ হইয়া আসিল। বাড়িতে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি, তাহাদের সংসারে হয়ত বড় রকমের ভাঙ্গন সুরু হইয়া গিয়াছে কিন্তু বিনুর তাহা লক্ষ্য করিবার সময় রহিল না। দেবুর সাহায্যের ফলে বিনুর জীবনের নূতন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেবুর রুগ্ন শরীর আজকাল যেন একটু বেশী খারাপ হইয়াছে মনে হয়। প্রায়ই সে স্কুলে হাজির হইতে পারে না। কিন্তু বিনু আজকাল একলাই স্কুলের পরে দেখা করিতে যায়।

বিনু আসিলেই দেবু শীর্ণ দেহ লইয়া বিছানার উপর সাগ্রহে উঠিয়া বসে। তাহার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বিনুর দিকে চাহিয়া সে কাতর ভাবে বলে, "আজ ভাই আমার জ্বর হয়েছে। আমি চল্লাম, একটু ত জ্বর—মোটরে করে স্কুলে যাব আর আসব—তাতে কি আর হয়েছে! কিন্তু ডাক্তার বারণ করলে, ডাক্তারদের ভাই যত বাড়াবাড়ি।"

বিনু তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলে—"তোর হাত ত ভাই এখনও গরম।"

"হ্যাঁ এখনও জ্বর আছে" বলিয়া দেবু ম্লান মুখে চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু খানিক বাদেই উৎসাহিত হইয়া বলে—"কাল দেখিস্ জ্বর ঠিক সেরে যাবে—আমার ভাই বিছানায় শুয়ে থাকতে মোটে ভাল লাগে না। ডাক্তারটা এমন পাজী, বই পড়তে পর্য্যন্ত বারণ করেছে! আমি কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি।"

দেবু হাসিতে থাকে কিন্তু বিনু প্রাণ খুলিয়া সে হাসিতে যোগ দিতে পারে না। দেবুর বার বার এত অসুখ করে কেন ভাবিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

দেবু হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসে—"আচ্ছা তুই ভগবান মানিস্?"

"ভগবান? বাঃ ভগবান বুঝি আবার মানা না মানা হতে পারে। ভগবান ত আছে।"

দেবু বলে, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস্ না!"

বিনু সরল ভাবে বলে, "সে-বার অসুখ হলে করেছিলাম," তাহার পর জিজ্ঞাসা করে—"তুই করিস্ না?"

"আমিও করি, কিন্তু বাবা কি বলে জানিস্ ভাই—বলে ভগবান নেই! মার সঙ্গে ভাই কত তর্ক হয়!"

দেবুর বাবার সহিত বিনুর এখনও পরিচয় হয় নাই। সারাদিন তিনি কাজে থাকেন—রাত্রে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন তাহার অনেক আগেই বিনু চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবান না মানার কথায় দেবুর বাবা সম্বন্ধে বিনুর কেমন একটু খারাপ ধারণাই হয়।

দেবু আবার বলে—"বাবার কথা শুনলে ভাই হাসি পায়। বাবা বলে যে ভগবান ব'লে যদি কেউ থাকে তাহলে সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বদ লোক। মানুষের যা দয়ামায়া আছে তাও নেই, নইলে পৃথিবীতে এত অন্যায় এত দুঃখ থাকে।"

এ সব কি অদ্ভুত কথা! বিনু থই না পাইয়া কেমন স্তম্ভিত হইয়া যায়। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানিবার সে অবশ্য কখনও দরকার বোধ করে নাই। কিন্তু ভগবান এমন কখনও হইতে পারে নাকি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবার পর সেবার তাহার অসুখ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সারিয়া গিয়াছিল, এত বিনুর প্রত্যক্ষ দেখা।

সে হঠাৎ একটা অকাট্য যুক্তির সন্ধান পাইয়া বলে—"ভগবান না থাকলে এসব চন্দ্র সূর্য্য তারা কে তৈরী করলে?"

"মাও ত তাই বলে, কিন্তু বাবা বলে, কেউ তৈরী করেছে তাই বা ভাববার কি দরকার!"

না, এ অগাধ সমুদ্র, বিনু ও কথার মানেই বুঝিতে পারে না।

দেবু আবার বলিয়া যায়—"আমার কিন্তু বাবার কথা ভালো লাগেনা ভাই। দিদি যে অত কষ্ট পেয়ে মরে গেল, সে ত ভগবান তাকে ডেকে নিয়েছেন বলে। ভগবান না থাকলে দিদি কি মিছিমিছি অত কষ্ট পেল?"

দেবুর চোখ ছলছল করিতে থাকে।

বিনু দেবুর গায়ে হাত রাখিয়া বলে, "দিদিকে তুই খুব ভালো বাসতিস্?"

'খু—ব' বলিয়া দেবু চুপ করে। খানিক বাদে আবার সে বলে,—"আমিও ত ভাই মরে যেতে পারি! ভগবান নেই, দিদি নেই ভাবলে আমার মরতে ভয় করে···"

হঠাৎ দেবুর মা ঘরে আসিয়া পড়েন। অপ্রসন্ন মুখে বলেন, "ওসব কি কথা হচ্ছিল দেবু?"

চিররুগ্ন হওয়ার দরুণ দেবুর মন বোধহয় সাধারণ ছেলেদের হইতে একটু পৃথক হইয়াছে, বিকৃত না হউক একটু অস্বাভাবিক তাহাকে বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বেও এমনি ধরণের কথা বলিয়া সে হয়ত মাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। তাই লজ্জিত হইয়া সে বলে—"না, মা, বিনুকে ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। ও ভগবান মানে, মা।"

মা ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করিবার জন্য বলেন, "ভগবানের ত তাহলে খুব ভাগ্যি বলতে হবে।"

সবাই মিলিয়া হাসিতে থাকে।

কথা গুলা কিন্তু বিনুর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়া যায়, সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে নগরের ধূলি-মলিন প্রায়ান্ধকার আকাশে প্রথম তাহার শৈশব-জগতের দেবতাকে সন্ধান করে। তাহার জগতের ভগবান একজন এতদিন ছিল। মা ও বাবার কথায় সচেতন ভাবে ও নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে সে ঠিক দেবুর 'ভগবান' নয়—সে ভগবান যতটা দয়ালু তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর বিচারক, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধের সে চুলচেরা বিচার করিয়া শাস্তি দেয়।

কিন্তু ভগবান যদি না থাকে! বিনু অত্যন্ত ভালো ছেলে, কিন্তু তাহারও স্খলন হয় বই কি! সেদিন যে অঙ্কের ক্লাসের মাষ্টার মহাশয়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া সে চারিটা অঙ্কের জায়গায় মাত্র দুইটা অঙ্ক দেখাইয়া সই করাইয়া লইয়াছে, একটি কথাও বলে নাই—সে অপরাধের বিচার করিবার তাহা হইলে কেহ নাই! তাও কি কখনও হইতে পারে? না, ভগবান আছেই। বিনু সমস্ত মন দিয়া অনুভব করে অন্ধকার আকাশের পার হইতে দুই জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া আছে। চোখ বুজিলেও সে দৃষ্টির হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

একটু ভাল থাকিলেই দেবু কাহারও কথা না শুনিয়া কাঁদাকাটি করিয়া স্কুলে আসিয়া হাজির হয়। আজকাল সে যেন একটু বেশী খেয়ালী হইয়াছে। ভালো থাকিলে তাহার মাথায় নানারকম দুষ্ট বুদ্ধি চাপে। ক্লাসে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে হঠাৎ বিনুর কানে কানে বলে, "আর ভাল লাগছে না ভাই, বাইরে খাবার নাম করে চ পালিয়ে যাই।"

বিনু ভয়ে ভয়ে বলে—"না ভাই ফিরে এলে বকুনি খাব।"

"নারে খাবি না, আমি তোর হয়ে বলে দেব খন" বলিয়া দেবু বিনুর হাতে টান দেয়। মাষ্টারদের উপর দেবুর রহস্যময় প্রভাব যে আছে তাহার প্রমাণ বিনু ইতিপূর্ব্বেও পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সে রাজী হইয়া বলে, "কোথায় যাবি?"

"রাজবাড়ির সেই পুকুরপাড়ে।"

রাজবাড়িটি আসলে তাহাদের স্কুলের অনতিদূরস্থ একটি বিশাল পোড়ো বাড়ি। বহুদিন আগে সেখানে নাকি কোন ধনী বাস করিতেন; তাহার পর কি কারণে তাঁহারা সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন যে সহরের মাঝখানে অবস্থিত হইয়াও বিস্তীর্ণ বাগান সমেত সে বাড়ি এখনও পর্য্যন্ত অবহেলায় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে তাহা কেহ জানে না। কিন্তু বৃহৎ বাগানের মাঝে আম কাঁঠালের ঘন ছায়ায় ঢাকা দুধারে ভাঙ্গা বাঁধান ঘাট সমেত একটি পুকুর এখনও সেখানে আছে। একদিন দেবুর খেয়ালে এমনি বেড়াইতে বাহির হইয়া তাহারা এই পুষ্করিণীটি আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার পর হইতে দেবুর কি যে টান পড়িয়াছে এই পুকুরটির প্রতি বলা যায় না। সময়ে অসময়ে সে সেখানে যাইতে চায়।

রাজবাড়ির কথায় বিনু কিন্তু একটু ভীত হইয়া বলে, "না ভাই তোর শরীর ভাল নয়, অতদূর যায় না।"

দেবু একটু অধৈর্য্যের সঙ্গেই বলে, "খালি অসুখ আর অসুখ, ভাল লাগে না আমার শুনতে, অসুখ অসুখ বলে কাঁচের পুতুল হয়ে থাকব নাকি চিরকাল!"

বিনু ইহার উত্তর দিতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত ফন্দি করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ছুটি লইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে।

দেবু স্কুলের বাইরে পা দিয়াই বলে, "কেমন মিষ্টি মেঘলা দিন দেখেছিস ভাই—ভালো লাগে এমন সময়ে চুপ করে ক্লাশে বসে থাকতে!"

বিনুও অন্তরে মেঘমেদুর আকাশের এই অপরূপ স্নিগ্ধতা-টুকু অনুভব করিতেছিল কিন্তু দেবুর মত প্রকৃতির রূপকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে সে এখনও বোঝে নাই। মেঘলা দিন তাহার ভালো লাগে, বিশেষতঃ যেদিন মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া যায় না, স্বচ্ছ নীল হ্রদের মত তাহার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও টুকরা টুকরা আকাশ দেখা যায়।

কিন্তু কেন যে ভালো লাগে তাহা বিশ্লেষণ এ পর্য্যন্ত সে কোন দিন করে নাই। দেবুর কথায় তাহার দৃষ্টি খুলিয়া যায় যেন।

বিনু নীরবে দেবুর পাশে পাশে চলিতে থাকে। স্কুল পালানর আনন্দে ও মেঘলা আকাশের মায়ায় তাহাদের অতি পরিচিত পথগুলিও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর উৎসাহ একটু বেশী। দামী জুতাটাকে ধূলার মধ্যে সে ইচ্ছা করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া চলে।

বহুদিনের পরিত্যক্ত হইলেও রাজবাড়ির চারিধারের ইটের পাঁচিল এখনও অধিকাংশ জায়গাতেই খাড়া হইয়া

আছে। সেই পাঁচিলের একটি ভগ্ন অংশ ডিঙ্গাইয়া তবে তাহাদের ভিতরে ঢুকিতে হইবে। আরও কয়েকবার এমনি ভাবে প্রবেশ করিলেও পাঁচিল ডিঙ্গাইবার সময় বিনুর একটু ভয় করে। দেবু তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া বলে, "এমনি করে যাওয়াতেই ত মজা, আমরা যেন ভাই দেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি।"

দুর্ব্বল দেহে পাঁচিল ডিঙ্গাইতে কষ্ট অবশ্য দেবুরই বেশী হয়, তাহার দামী জামা কাপড় একটু আধটু ছিঁড়িয়া যায়, হাতে পায়ে একটা আঁচড় যে না লাগে তাও নয় কিন্তু তাহার ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বিনুর পিছনে থাকিয়া ঘন কুকসিমের জঙ্গল পার হইয়া যাইতে যাইতে সে বলে, "এ কেমন মজা বল ত, কেউ জানে না আমরা কোথায় যাচ্ছি।"

বিনুর যে মজা লাগে না তাহা নয় কিন্তু একটু ভয়ও করে। তবে সে ভয় সে স্বীকার করিতে সহজে চায় না।

আম কাঁঠালের পুরান বাগান দিয়া তাহারা চলিয়াছে। প্রতি পদে পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়-মড় করিয়া ওঠে, কয়েকটা পাখী সচকিত হইয়া গাছ হইতে উড়িয়া পলাইয়া যায়।

দেবু নূতন একটা কল্পনা লইয়া হঠাৎ মাতিয়া ওঠে। বলে, "আমরা যেন ভাই ডাকাত, আর এইটে আমাদের লুকোবার জায়গা। ওই পুকুরটার তলায় আমরা যেন সমস্ত টাকাকড়ি লুট করে এনে পুঁতে রাখি। তবে তুই আর আমি ছাড়া কেউ যেন তা জানে না।"

ডাকাত হওয়ার কল্পনাটা বেশীক্ষণ উপভোগ করা যায় না। টাকাকড়ি লুট করিতে গেলে মানুষ মারিতে হয়—সেটা কেমন যেন ভালো লাগে না কাহারও।

এখন দুইজনে পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিত্যক্ত ঘাটের পৈঠাগুলি শ্যাওলায় পিছল। একটা বড় গাছের শিকড় ঘাটটাকে মাঝামাঝি বিদীর্ণ করিয়া বিশাল অজগরের মত জলের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। তাহার উপর বসিয়া দু'জনে জলের ভিতর মাছের খেলা দেখে।

ছোট ছোট কয়েকটা মাছ দল বাঁধিয়া নির্ভয়ে কিছুক্ষণ তাহাদের একেবারে গায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, জলে পড়া একটা আমপাতাকে অকারণ ঠোকর মারে। তাহার পর পাতাটি নড়িয়া উঠিতেই অকস্মাৎ ভয় পাইয়া তীরবেগে জলে রূপালী দাগ টানিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

দেবু বলে, "ওগুলো কি মাছ জানিস ত!"

"না, কি মাছ?"

"ওগুলো তেচোখো মাছ!"

"তেচোখো মাছ! ওদের তিনটে চোখ আছে?" বিনু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। দেবু বলে, "ওইতেই অবাক হচ্ছিস। সমুদ্রে কত অদ্ভুত মাছ আছে জানিস?"

দেবু খানিকক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রের অদ্ভুত মাছের গল্প করে—তরোয়াল মাছ আর হাঙ্গরের, সাগর-বাদুড়ের আর তিমির। বিনুর এসমস্ত গল্প সহজে বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। সমুদ্র এমন অদ্ভুত!

হঠাৎ দেবু গল্প থামাইয়া বলে, "কাপড় দিয়ে মাছ ধরবি?"

"না ভাই জলে নামলে আবার অসুখ করবে হয়ত!"

এবার দেবু বিনুর কথায় বিরক্ত হয় না, ম্লান মুখে খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হতাশ ভাবে বলে, "আমার ভাই কত অদ্ভুত দেশে যেতে ইচ্ছে করে, কত কাজ করতে ইচ্ছে করে, কেবল যদি এমনি অসুখই করে কবে সে সব করব ভাই?"

বিনু ইহার কি সান্ত্বনা দিবে? সে কাতর ভাবে শুধু সামনের দিকে তাকাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ট্রেড্‌মার্ক

আমরা এখনও ট্রেড্‌মার্কের দাম দিতে শিখি নাই—কিন্তু এই ট্রেড্‌মার্কই পৃথিবীতে কত অঘটন ঘটাইয়াছে! কত মামলা, কত খেসারৎ! ট্রেড্‌মার্কের মহিমা জানিলে আমরা হয় ত আরও উন্নত হইতে পারিতাম।

পূর্ণগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ লইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ব্যাপারে একবার একটি সামান্য ট্রেড্‌মার্ক কি বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল লোকে সেকথা আজিও মনে করিয়া রাখিয়াছে। 'চলচ্চিত্রে সংবাদ-দাতা' এক কোম্পানী পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের ছবি তুলিবার জন্য নিউ ইংলণ্ডে চার পাঁচটি অভিযানদল প্রেরণ করে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কোনও দলই ছবি তুলিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু এত টাকা যখন খরচ হইয়াছে, ছবি তখন একটা চাইই। তাহাদের বিপদের কথা শুনিয়া ফটোগ্রাফীতে বিশেষজ্ঞ একব্যক্তি তাহার ষ্টুডিওতে বসিয়াই এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে চায়। সে এই কার্য্য পরিপাটি ভাবে করিয়া দিতে সক্ষমও হয়, কিন্তু ষ্টুডিও হইতে ছবিটি যখন পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠান হয় তখন একটি সামান্য খুঁত ধরা পড়াতেই গোল বাধে। সূর্য্যের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি ট্রেড্‌মার্ক—মাজদা (Mazda).

সৃষ্টি-রহস্য

জগতের উৎপত্তি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আদিম বর্ব্বর জাতিদের মধ্যেও বংশপরম্পরায় বহুবিধ গল্প, উপকথা, কাহিনী ইত্যাদি চলিয়া আসিতেছে; এই সকল গল্পের উৎপত্তির ইতিহাসও রহস্যাচ্ছন্ন, উৎসমুখ অনাবিষ্কৃত—মানুষের সহজাত সংস্কারের মতই এগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই যেন বর্ত্তমান আছে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার এবং বিভিন্ন কালের এই উপাখ্যানগুলি পরস্পর পৃথক হইলেও, এক বিষয়ে ইহাদের মিল আছে—প্রত্যেকটিতেই একজন সৃষ্টিকর্ত্তার কথা আছে এবং কুমোরের কাছে মাটির তালের মত এই সৃষ্টিকর্ত্তার হাতের কাছে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিবার উপকরণ থাকার উল্লেখও সকল উপাখ্যানে আছে। এই সৃষ্টিকর্ত্তার রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন—কোনও গল্পে ইনি পক্ষীরূপী, কোন গল্পে ইহাঁর জন্তুর আকৃতি, আবার কেহ বা ইহাঁকে মনুষ্যাকৃতি বৃদ্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অনেক গল্পে দেখিতে পাই, সমুদ্র ও আকাশকে অনাদি ও শাশ্বত বলিয়া ধরা হইয়াছে—শুষ্ক স্থলভাগের উদ্ভবই সৃষ্টির আদিমতম লীলা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায় এই ধরণের প্রত্যেকটি কাহিনীই মানুষের কবি-কল্পনার খেলা মাত্র; প্রথম মানব বিস্মিত দৃষ্টিতে সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখিয়া কল্পনার যে আতিশয্যে পীড়িত হইয়াছিল তাহারই ছাপ ঐ কাহিনীগুলিতে আছে।

ভারতের আদিমতম অধিবাসীর মনেও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া থাকিবে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাহার ইতিহাস অবগত নহি। ভারতে আর্য্য জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অত্যাচারেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক ভারতের প্রাচীনতম যুগের কাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেছে; সে কতদিনের কথা তাহাও ঠিক মত জানা নাই। ভারত-ইতিহাসের আদি কথা বলিতে আমরা বেদকেই বুঝিয়া থাকি। তার পর উপনিষৎ, পুরাণ। বেদে পুরাণে প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র উপাখ্যান আছে; পরস্পরবিরোধী বহু বিচিত্র কাহিনী। বর্ব্বর অথচ সুস্থ সবল মানুষ মাথার উপরে খররৌদ্রদীপ্ত সূর্য্য, অনন্ত নীলাকাশ, সঞ্চরণশীল মেঘ, উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, উত্তাল সমুদ্র, অভ্রংলিহ বনচূড়া ইত্যাদি দেখিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হইয়া যে বন্দনা-গান রচনা করিয়াছিল, প্রাচীনতম বেদ সেই গানেরই সমষ্টিমাত্র - প্রত্যক্ষীভূত প্রকৃতির প্রথম সূচনার কথাও এই সকল অকৌশলী মহাকবিদের কল্পনায় আসিয়াছে। সেদিন তাহারা যাহা ভাবিয়াছিল ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানে হয়তো তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তথাপি মানুষের মনের খেয়ালকে বিজ্ঞান সম্মান করিবে না।

বাইবেলেও সৃষ্টিসম্বন্ধে (বুক অব জেনেসিসে) উপাখ্যান আছে। ঈশ্বরের জয়গানই তাহার আসল উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গ্রীকেরাও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া জগতের সৃষ্টির কথা ভাবিয়াছিল। তাহাদের পুরাণ-আখ্যানে কবিকল্পনার যথেষ্ট বাহাদুরী আছে কিন্তু তাহাও কল্পনা-বিলাস মাত্র। আদিমতম দেবতা উরেনাসের বংশ তিন পুরুষ ধরিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের সৃষ্ট পৃথিবী দেবদেবীতে ছাইয়া যায়, এইরূপ কথিত আছে।

এম্পিডক্ল্‌স, এরিষ্টটল ও প্লেটো বিশ্বসৃষ্টির মূলে একটি অখণ্ড নীতির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান তখন এতই অসম্পূর্ণ ছিল যে সেই দিন হইতে দুই হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর বিজ্ঞান মানুষকে এই নীতির সন্ধান দিল। কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত প্লেটো, এরিষ্টটলের অসম্পূর্ণ কল্পনাই বিশ্বসৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন ভাবিতেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের সাহায্যেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, এরিষ্টটলের মতেও তেমনই প্রকৃতি ক্ষিতি (Earth), মরুত (Air), তেজ (Fire) ও অপ (Water) এই চারি ভূতের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চারি ভূতের মধ্যে চারিটি ধর্ম্ম বিদ্যমান—মাটিতে শৈত্য, বায়ুতে শুষ্কতা, অগ্নিতে তাপ ও জলে সিক্ততা। এরিষ্টটলের মতে—যাহা বিদ্যমান নাই তাহা হইতে কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না; যাহা আছে তাহা হইতেই সব কিছুর উদ্ভব। সৃষ্টির কোনও বিধিবদ্ধ প্রণালী নাই, প্লেটোর

এথিনিয়ামে বর্ণিত চারি ভূতের পরস্পর বিচিত্র সমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়।

গোলাকার পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নিশ্চলভাবে অবস্থিত, এই ধারণাই তখন ছিল—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপও গোলাকার—গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, তদানীন্তন পণ্ডিতেরা ইহার বেশী কল্পনা করিতে পারেন নাই। পৃথিবীকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়া মানুষের আত্মাভিমান যতখানিই বাড়িয়া থাকুক, এখন বুঝিতে পারি এই কল্পনাই সত্য অনুসন্ধানের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৃথিবী কি করিয়া সৃষ্ট হইল একথা ভাবিবার আবশ্যকতাই,কেহ অনুভব করে নাই। গ্রহ উপগ্রহের জন্ম যদি বিড়ালছানার জন্মের মত একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইত, তাহা হইলে অন্যান্য গ্রহের জন্মপদ্ধতি অনুধাবন করিয়া আমরা আমাদের পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। তাই গোড়াতেই পৃথিবীকে কেন্দ্র-শক্তি ভাবাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে পৃথিবীকে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিয়া তুলনায় কোনো একটা সত্যের সন্ধান লওয়ার চেষ্টা হয় নাই। এই মতবাদের প্রভাব এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল যে তদানীন্তন খৃষ্ট ধর্ম্মের হর্ত্তা-কর্ত্তারা কেহ পৃথিবী সম্বন্ধে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করিলে তাহাকে ঘোরতর শাস্তি দিতেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও দেখিতে পাই, ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস অব কুসা নামক একজন বিখ্যাত পাদ্রী লিখিয়াছেন: 'অনেক-দিন ধরিয়া চিন্তা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আমাদের এই পৃথিবী নিশ্চল নহে, অন্যান্য নক্ষত্রেরা যেরূপ ভ্রাম্যমান, পৃথিবীও সেইরূপ…আমার মনে হয় পৃথিবী দিন ও রাত্রে আপনার মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তিত হয়।' এমন পাপ-কথা বলিয়াও পাদ্রী সাহেব কি করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়—সম্ভবতঃ তখনকার লোক তাঁহার কথার ঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু নিকোলাস অব কুসাকে গুরু করিয়া যাঁহারা এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই ঘোরতর লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এমন কি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে জিওরদানো ব্রুনো নামক এক ব্যক্তি নূতন প্রচারিত কোপারনিকাসের জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশ্বাসবান ছিলেন বলিয়া সাত বৎসর কারারুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে ধর্ম্মের দুয়ারে দগ্ধীভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। কোপারনিকাস নিজে এই বিপদ হইতে মুক্ত ছিলেন এই কারণে যে, তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ De Revolutionibus Orbium Coelestium প্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ঐ গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত খণ্ড স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন।

কোপারনিকাস চার্চ্চকে ফাঁকি দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীয় বৈজ্ঞানিকদের পথ কণ্টকিত করিয়া গেলেন। তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মযাজকেরা অবহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সভয়ে অনুভব করিলেন যে কোপারনিকাসের মতবাদ বেশী প্রচারিত হইলে চার্চ্চের ক্ষমতা খণ্ডিত হইবেই—সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠার পড়িবে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে শুধু প্রাচীন ক্যাথলিক মতাবলম্বীরাই বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় হন নাই - নব্য তন্ত্রের লুথার ও ক্যালভিন 'যে ভুঁইফোঁড় জ্যোতির্বিদ পুণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরেও নিজের মতবাদকে স্থান দেয়' সেই কোপারনিকাসকে অভিশপ্ত করিলেন। চার্চ্চের এই দুই পরস্পরবিরোধী দল মিলিত হইয়া সত্যানুসন্ধানের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মধ্বজীদের ভয়াবহ অত্যাচার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও সত্যানুসন্ধানে প্রচুর বিলম্ব ঘটাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের যে মন অন্তরীক্ষে উড়িয়াছে, অতল সমুদ্রগর্ভে মুক্তার খোঁজে যাত্রা করিয়াছে, অসুস্থকে স্বাস্থ্য দিতেছে, মৃতকে পুনর্জ্জীবন দান করিবার কল্পনা করিতেও যে ইতস্তত করে নাই, চন্দ্রলোককেও অধিগম্য করিয়া তুলিবার স্বপ্ন যে মানুষ দেখিতেছে, সে মানুষ ধর্ম্মের নামে সেই ভীষণ হইতে ভীষণতর অত্যাচারেও নিরস্ত হয় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা সে আজিও করিতে পারে নাই সত্য কিন্তু সৃষ্টির রহস্য আজ আর তাহার নিকট রহস্য নাই।

সেই রহস্য-সন্ধানের ইতিহাস আমরা লিখিতে বসিয়াছি। প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল, এই ইতিহাস লেখকের গবেষণা-লব্ধ নহে; এ বিষয়ে সামান্য রকমের পাণ্ডিত্যের দাবীও আমাদের নাই। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনেক শাখা—জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন

বিজ্ঞান; এই সকল বিভাগের গবেষণার ফলে, বহু মনস্বীর বহু মনন-কর্ম্মের দ্বারা, বহু বৈজ্ঞানিকের অনেক বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর সৃষ্টিরহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বহু মূল্যবান গ্রন্থে এই আবরণ উন্মোচনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক ভাবে যাহা লিখিব তাহা এই সকল গ্রন্থে ছড়ান উপাদান হইতে সংগৃহীত হইবে। বহুস্থলে হুবহু অনুবাদ করিয়া দিব; চিত্রগুলিও এই সকল পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইবে। আমরা প্রারম্ভেই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই প্রসঙ্গের শতকরা একশত অংশই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে গৃহীত। মাতৃভাষায় দেশের লোকের বোধগম্য করিয়া যদি এই কঠিন বিষয় লিখিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মহামনীষী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন। এবং সেই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেন তৃতীয় নেত্রের অধিকারী হইল। যে রহস্যের সমাধানে যুগ যুগ ধরিয়া সে মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছে অথচ কোনও সমাধানই হয় নাই, এই যন্ত্রটি হাতে পাইয়াই মানুষ সেই রহস্যের অনেকখানি সন্ধান পাইল। জ্যোতির্লোকের দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়া গেল। আর কিছু না হউক সেদিন পথভ্রান্ত মানুষ পথ খুঁজিয়া পাইল। গ্যালিলিও যে ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহা অতি সমাদরের সহিত আর্চেট্রিতে রক্ষিত আছে; পাষাণ-রহস্য-পুরীর প্রবেশ-দ্বারের সেই ক্ষুদ্র চাবিকাঠিটি আজিও মানুষের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে।

এখানে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলার প্রয়োজন। টেলিস্কোপ ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভারতে ইংরেজদের আগমনের পূর্ব্বে এই যন্ত্র আসেও নাই, অথচ দেখিতে পাই জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবর্ষ অপূর্ব্ব উন্নতি, টেলিস্কোপের আবিষ্কারে পূর্ব্বেই করিয়া ফেলিয়াছে—সেই প্রাচীন শাস্ত্র অনুসারেই আজিকার দিনের পঞ্জিকা গণনা করা হয়, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটার কাল নিরূপিত হয়—ভুল হয় বলিয়া মনে হয় না। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে একথাও পাশ্চাত্যবাসীদের মুখে ভারতবর্ষ প্রথম শোনে নাই। তাই মনে হয় ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে হয়তো ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান না থাকিলে জ্যোতিষগণনায় দিন ক্ষণ স্থির করা সম্ভব নয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াই গ্যালিলিও শুক্রগ্রহের অবস্থান ও পথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কোপারনিকাসই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী, শুক্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহেরা পরিভ্রমণ করিতেছে। উরেনাস ও নেপচুন তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। গ্যালিলিওর আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোপারনিকাসের বিরুদ্ধবাদীরা এই বলিয়া তর্ক করিত যে, গ্রহেরা যদি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিত তাহা হইলে মাঝে মাঝে আমরা পৃথিবী হইতে এই সকল গ্রহের যে অংশ দেখিতে পাই সে অংশ সম্পূর্ণ অন্ধকার না হইলেও অংশতঃ অন্ধকার দেখাইত; চন্দ্রের মত কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ হওয়াও উচিত ছিল। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও প্রমাণ করিয়া দিলেন যে চন্দ্রের ন্যায় গ্রহগুলিরও কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ আছে এবং এই প্রমাণের পর কোপারনিকাসের মতবাদ সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিল না।

ইহার অনতিকাল পরেই এই বৎসরেই বৃহস্পতি গ্রহের চারিটি প্রধান উপগ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোপারনিকাসের মতবাদের সপক্ষে আরও একটি দৃঢ়তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। যদি আমাদের পক্ষে টেলিস্কোপের সাহায্যে গৃহকর্ত্তা সূর্য্যকে তাঁহার গ্রহ-উপগ্রহের পরিবারসমেত দেখা সম্ভব হইত তাহা হইলে কোপারনিকাসের মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। নভোমণ্ডলের অন্যান্য সূর্য্যদের গ্রহ উপগ্রহের অধিবাসীরা এই দৃশ্য সর্ব্বদাই দেখিতে পায় কিন্তু নিজের মাথার টাক নিজে দেখার মত এই দৃশ্য আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভবপর নয়।

গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ এই সত্যই প্রকাশ করিল যে যদ্যপি আমরা আমাদের গ্রহগুলিকে আমাদের সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরিতে দেখিতে পাইতেছি না, গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত অন্যান্য সূর্য্য নভোমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—তাহাদিগকে লইয়াই গবেষণা চলিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে

সেইদিন হইতেই গবেষণা সুরু হইল। জুপিটার বা বৃহস্পতি তাহার উপগ্রহ-পরিবার লইয়া—ঠিক কোপারনিকাসের কল্পনা মত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে ভাবে গ্রহেরা থাকে সেই ভাবেই দৃষ্ট হইল ; অল্পকাল পরেই স্যাটার্ণ বা শনিগ্রহকেও উপগ্রহগোষ্ঠী লইয়া পরিভ্রমণ করিতে দেখা গেল। একই প্রণালীতে গতিবদ্ধ এই দুইটি গ্রহের আবিষ্কারে এই কথাই প্রমাণিত হইল যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একটি স্বাভাবিক নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকামণ্ডলী পরিভ্রমণ করিতেছে—সৃষ্টির কোথায়ও কাহারও খামখেয়ালিপনার কোনই অবকাশ নাই।

ব্রহ্মাণ্ডজোড়া এই একটি নীতির সন্ধান যেদিন মানুষ পাইল সেদিনই এই বিশ্ব-জগৎ ও আমাদের পৃথিবীর জন্মের ইতিহাস জানিবার বাসনা তাহার হইল—এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বসৃষ্টির চরমতম রহস্যের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক মানুষ প্রবৃত্ত হইল। এই সম্পর্কে এত কাল মানুষের মনোজগতে যে কল্পনাবিলাস ও ধর্ম্মান্ধতার দরুণ ভীতি ও গোঁড়ামি ছিল তাহা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। মানুষ পথ খুঁজিয়া পাইল এবং সেই পথে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া সার্দ্ধ তিন শত বৎসরকাল চলিয়া প্রায় পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া মানুষ বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, জ্যোতির্বিদ্যার তরফ হইতে সেই কথাই আমরা আগামী সংখ্যার সৃষ্টিরহস্য বিভাগে আলোচনা করিব। এবার এইটুকু মাত্র জানিয়া রাখিলাম যে এই অনির্দ্দেশ সন্ধানের পথে প্রথম সোপানের কাজ করিয়াছে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র। অনেক ঋষি ও তপস্বী এদেশে এবং বিদেশে বিজ্ঞানের দুরধিগম্য পথে নহে, অলৌকিক সাধনা ও দৈবার্জ্জিত মনন-শক্তির দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান জানিয়াছেন ও পৃথিবীর লোককে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের তপস্যালব্ধ সেই জ্ঞান আমাদের আলোচনার গণ্ডীর বাহিরে। আমরা শুধু ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে যাহা জানা গিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিব। দূরবীক্ষণ হইতেই ইহার যাত্রা সুরু, তাই দূরবীক্ষণের উদ্ভাবক পিসা নগরীর মনস্বীপ্রধান গ্যালিলিওকে এই রহস্য-সন্ধানী যাত্রীদলের অগ্রপথিক হিসাবে নমস্কার নিবেদন করিয়া বিদায় লইলাম।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বাহন তার সুর এবং রবীন্দ্রনাথ কাব্যে অন্ততঃ পুরাতন-পন্থী। পুরাতন-পন্থী বলিতেছি—বর্ত্তমানে যে ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই কথা স্মরণ করিয়া। সে ধারা রবীন্দ্রনাথের ধারা নহে, ভাল কি মন্দ তাহা বিচারসাপেক্ষ কিন্তু নূতন। রবীন্দ্রনাথ যেদিন সন্ধ্যাসঙ্গীতের পসরা লইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেদিন যাঁহারা তাঁহার জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার নূতনত্ব দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন সন্দেহ নাই—এই নূতনত্বের জন্য তাঁহাকে কম অভিশপ্ত হইতে হয় নাই। কিন্তু নূতন হইলেও পুরাতন খাতেই রবীন্দ্রনাথ নূতন হইয়া দেখা দিয়াছিলেন—তাঁহাতে আসিয়া পুরাতনের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। তিনি সম্পূর্ণ নূতন সুরের আমদানি করিয়াছিলেন—পুরাতনকে ঠেলিয়া ফেলেন নাই : সেই জন্যই সাহিত্য-সম্রাট, পুরাতন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানী, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীত দেখিয়া বিষয়ের নূতনত্ব সত্ত্বেও তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তার পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। সেই পুরাতন খাতেই রবীন্দ্রকাব্যের ধারা কখনও সাগরসমান উত্তাল হইয়া কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে, কখনও শরৎ-হেমন্তের শীর্ণ শুভ্র রজত ধারার মত জলপ্রবাহ লইয়া কুলু কুলু নাদে বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কখনও রবীন্দ্রনাথের তাল কাটে নাই ; তাঁহার কাব্যের যাহা সব চাইতে বড় সম্পদ তাঁহার অপার্থিব সুরের ধারা, তাহা বজায় আছে—সন্ধ্যাসঙ্গীতে আছে, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল এবং প্রভাতসঙ্গীতে আছে ; সোনার তরী, কল্পনা, চিত্রা ও চৈতালীতে আছে ; কথা ও কাহিনী, চিত্রাঙ্গদায় আছে ; উৎসর্গ, স্মরণে আছে ; বলাকা, পলাতকা এবং পূরবীতেও আছে। বাণী ও বীণাপাণির বীণাযন্ত্রখানি রবীন্দ্রনাথের হাতে লাঞ্ছিত হয় নাই। সুরের পাখা মেলিয়া তিনি সেদিন পর্য্যন্তও বিশ্বভুবন জয় করিয়া আসিয়াছেন ; বিমানচারী পক্ষী ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে পড়ে নাই।

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের নূতন রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া' লেখা সমাপ্ত করিয়া হঠাৎ যেদিন 'শেষের কবিতা'র দুর্ভাগা নিবারণ চক্রবর্তীর কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে পুরাতন মনে করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সে দিনই বাংলা সাহিত্যে দুর্দ্দিন

আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে তখন অতি নূতনে পাইয়া বসিল। পুরাতনের ধারা ছিন্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অভিনব হইতে চাহিলেন। সুরের ওস্তাদের সুর কাটিল, তাল কাটিল।

পৌষের প্রবাসীর প্রথম কবিতা 'শুচি' পুরাতন রবীন্দ্রনাথের সেই নূতন সুরকাটা তালকাটা কবিতা। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী পাঠক এইগুলিকে গন্ধ-কবিতা আখ্যা দিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের পূজাভাব জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আসলে এগুলি কি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কখনও তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে ভরসা পান নাই; অতি-আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার 'পরিচয়ে'র প্রবন্ধেও নয়।

কিন্তু মজ্জায় মজ্জায় যাঁহার সুর, তিনি চেষ্টা করিলেই বা আধুনিক হইতে পারিবেন কেন? 'শুচি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সুরু করিয়াছিলেন, পংক্তির পর সুরহীন তালহীন পংক্তি সাজাইয়া মডার্ণ হইবার যে বাসনা লইয়া তিনি কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন, চার লাইন শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার সে বাসনাবিফল হইয়াছে—পুরাতন রবীন্দ্রনাথ নূতন-হইবার-প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়াছেন; কবিতাটিতে সুর আসিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সুরু করিয়াছিলেন এইরূপ—

"রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে
সন্ধ্যা বেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস"

ইচ্ছা করিয়া সুর কাটানো হইয়াছে। কিন্তু তার পরেই—

"সে দিন মন্দিরে উৎসব,
রাজা এলেন, রাণী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,"

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত কবিতাটি সুরে ভরপুর হইয়া আছে। এইরূপ অপরূপ সুন্দ্র rythmএর প্রবাহ বজায় রাখিতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এরূপ কবিতা যে-কোনও দেশের কাব্য-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ছন্দের কান যাঁহাদের আছে তাঁহারা একটু নজর দিয়া পড়িলেই খুসী হইবেন।

ইহার পরই যে মন্তব্য করার প্রয়োজন কবিগুরু সম্বন্ধে সে মন্তব্য করা অনাবশ্যক। ,তিনি স্বয়ং ইহার কারণ বুঝিবেন।

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস—পৌষের প্রবাসীতে যে মহামূল্য রত্নরাজির সমাবেশ হইয়াছে বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত; প্রবাসীতেও কচিৎ কদাচিৎ এরূপ সমারোহ দেখিয়াছি। শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার লিখিত বাঙ্গালা টাইপ ও কেস এই রত্নরাজির একটি। বাঙ্গালা টাইপ ও কেস সম্বন্ধে এই ধরণের প্রবন্ধের আবশ্যকতা বহুদিন ধরিয়া অনুভব করিতেছিলাম। অজয়বাবু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—বিদেশী গ্রন্থ হইতে ধার-করা [illegible] সাজাইয়া প্রবন্ধ লিখেন নাই। ছাপাখানার কাজ করিতে করিতে বাঙলা হরফ ও কেসের দরুণ যে সকল অসুবিধা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে—অভিজ্ঞতার বিষে জর্জ্জরিত তাঁহার মন, যে যে প্রণালীতে মুক্তির উপায় খুঁজিয়াছে, তিনি সেগুলি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া যদি বাঙ্গলা সাহিত্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন ও সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যদি কুশ্রী ও জটিল বাঙ্গলা টাইপ ও কেস সুশ্রী ও সরল হয়, তাহা হইলেই অজয়বাবুর প্রবন্ধের সার্থকতা। হরফ ও কেসের সংস্কৃতি বিষয়ে মাথা ঘামাইতে যাঁহারা প্রস্তুত নন, কতকগুলি অতি আবশ্যক জ্ঞাতব্য তথ্যের জন্যও তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশ পাঠ করিবার জন্য আমরা উৎসুক থাকিলাম।

শুভযাত্রা—শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার রচিত কথানাট্য; প্রবাসীর এই সংখ্যায় রত্নরাজির এটি মধ্যমণি। বাঙলার নাটক পড়িয়া পড়িয়া যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন শুভযাত্রার শুভপ্রবেশ শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভদ্র, সংযত ভাষায়, সামান্য না হইলেও ঘটিতে পারে, ঘটিয়াছে এমন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের মধ্য দিয়া কি অপরূপ শতদল বিকশিত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই এক অখ্যাতনামা নূতন লেখকের কণ্ঠে বীণাপাণি ভর করিয়াছিলেন। নাটকের দরবারেও শুভ-যাত্রার যাত্রা শুভ হউক ইহা-ই কামনা করি।

এই নাটকের গল্পাংশ দিব না; নাটকটি সম্পূর্ণ না পড়িলে ইহার রসোপলব্ধি হইবেনা—এবং এমন নাটক না পড়াটাও আমরা দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্তের কাগজের কথা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ।

ভণ্ডুল মামার বাড়ি, বাঙলা দেশের প্রচলিত গল্পশ্রেণীর গল্প নয়—ইহার টেক্‌নিক অভিনব এবং শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা এই গল্পে বাড়িবে বই কমিবে না। অ-'চটকদার'ত্ব-ই এই গল্পের প্রধান বিশেষত্ব।

শুনিয়াছি, মানুষের কোনও অঙ্গের অভাব হইলে ভগবান তাহার অন্য অঙ্গগুলিকে অসম্ভব রকম পুষ্ট করিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া দেন; এবং *vice versa*। পৌষের প্রবাসীর ত্রিবর্ণ চিত্র লয়লা মজনু ও পথভ্রান্তা দেখিয়া প্রবাসী প্রবন্ধ ও গল্পসম্ভারে হঠাৎ এমন সমৃদ্ধ হইল কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর হরগৌরীর হর, শ্রীযুক্ত আবদার রহমান চাঘতাই-এর ওমরখায়েমের সাকী এবং বসরাই উপকথার একটি লম্বগ্রীব উটের সমাবেশে লয়লামজনু ছবিখানি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে; শ্রীভুবনের ভুবনজোড়া যশ হইতেছে। 'পথভ্রান্তা' প্রবাসীর কম্পাউণ্ডে সত্য সত্যই পথভ্রান্তা বটে।

ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩৩৯

পৌষের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরাণ ও হিন্দু সংস্কৃতির রাজটীকা ললাটে পরিয়া বাহির হইয়াছে—তাহার দেহের অন্যান্য বহু ত্রুটি এইজন্য দৃষ্টিকে এড়াইয়া যাইতেছে। 'হিন্দু' বলিতে যাঁহারা

শুধু abstract somethingকে বুঝেন না, নিজেকে হিন্দু বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিতেও যাঁহার আনন্দ হয়, এক বিরাট ভাবগঙ্গাধারায় পবিত্র সলিলে অবগাহন করিবার অধিকারী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহারাই এই প্রবন্ধের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া সুনীতি বাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন। হিন্দু নামের প্রতি প্রবন্ধকারের যে মমতা, হিন্দু ভাবধারার প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাসহকারে প্রবন্ধটি পড়িলে নিজের মনেও সেই মমতা-বোধ জাগে—সেই শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয়। প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

* * রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ, হিন্দু ধর্ম্ম ও চর্য্যার প্রধান গ্রন্থ। বেদ উপনিষদ আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্য্যার ভিত্তিস্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, যে শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কায়া বলিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র হইতেছে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ। * * হিন্দু-চিন্তার ইতিহাসে পুরাণের ভাবধারা বেদেরই পরিপূর্ত্তি—বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও আগম, উভয়ের সমন্বয় ও অচ্ছেদ্য মিলনের ফলে হিন্দু ধর্ম্ম ও চর্য্যার পত্তন। হিন্দুর ইতিহাসে পুরাণকে অশ্রদ্ধা করিলে চলে না, পুরাণের অবশ্যম্ভাবিতা ও নানাবিষয়িনী শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকার করিতেই হয়; আধুনিক বিচারশৈলী অনুসারে আমরা এই সকল সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ঐতিহাসিক আলোচনার দিক্ হইতে হিন্দু সভ্যতার বিকাশে পুরাণের স্থান যে অতি উচ্চে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

* * পুরাণ আমাদের আমাদের দেশে কেবল পণ্ডিতের উপজীব্য, মৃত বা মৃতকল্প বিদ্যামাত্র নহে: ইহা তদতিরিক্ত অনেক কিছু; পুরাণ কেবল মাত্র সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ, বিশেষ কোনও ভাষা বা শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় শিষ্টজনেরই আলোচ্য বস্তু মাত্র নহে। আবালবৃদ্ধ-বণিতানির্বিশেষে ইহা একটী বিরাট ভূভাগের সমগ্র অধিবাসি বৃন্দের হৃদয় স্পন্দনের সহিত জড়িত, আধিভৌতিক অর্থাৎ রক্ত-মাংসের দেহের মতই ইহা জাতির আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক দেহ; ইহা পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত রিক্থের এক অশরীরী অংশ। এই রিক্থকে এতদিন ধরিয়া হিন্দু যে ভাবে আঁকড়াইয়া রক্ষা করিয়া আছে, তাহা জগতে অন্য জাতির মধ্যে দেখা যায় না; এবং এই রিকৃথকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিবার চেষ্টাই তাহাকে চিরকাল ধরিয়া অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছে, বহু পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজ প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশের পথে অবিচলিত গতিতে তাহাকে চালিত করিয়াছে। বিগত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব যাহা, তাহা ইতিহাস ও পুরাণের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত ও জাতিগত নানা সমস্যা ও সমাধান, তাহার রূপকথা ও ইতিকথা, তাহার ভূয়োদর্শন ও চিন্তা, তাহার ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ভাব-জগৎ, তাহার ভোগ ও ত্যাগ, অনুরাগ ও বিরাগ, তাহার আশা ও আশঙ্কা, আদর্শ ও জুগুপ্সা, শৌর্য্য ও ভীরুতা, তাহার শৈশব-স্মৃতি ও বার্দ্ধক্যের বিচার - সমস্তই রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে আনিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ জীবনেরই মত বিরাট, অখণ্ড, সর্ব্বঙ্কষ, সর্ব্বংসহ; সম্ভাব ও বিরোধ উভয়েরই পূর্ণ, সঙ্গতার্থ এবং অসঙ্গতার্থ উভয় প্রকারের বাণী বা বচন পুরাণে বিদ্যমান। বহু শতাব্দী ধরিয়া একটী জাতির সমগ্র জীবনের প্রতীক স্বরূপ পুরাণ উপেক্ষণীয় নহে। হিন্দুর জ্ঞান সাধনার পরিচয় এই পুরাণমধ্যেই নিহিত আছে—প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষ, শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাবহারিক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলে পুরাণগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিতে হয়।

পুরাণের মধ্যে নিহিত যে শাশ্বত আদর্শ-সমূহ দুই তিন সহস্রক ধরিয়া হিন্দুর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শগুলির কার্য্যকারিতা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ অধুনাতন কালে আমাদের জীবনে পুরাণের শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যকতা যতটা অধিক ভাবে অনুভূত হইতেছে ততটা প্রাচীন কালে ছিল কিনা সন্দেহ। এখন আমাদের সমাজ, বিশেষতঃ গত দুই তিন দশকের মধ্যে, যতটা আত্মহারা, যতটা কেন্দ্রচ্যুত, যতটা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ততটা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছিল কিনা জানি না। বোধ হয় ততটা কখনও হয় নাই। জীবন-যাত্রা এতাবৎ সরল ছিল, সহজ ছিল; দেশের আপামরসাধারণ একটী সর্ব্বজন-গ্রাহ্য philosophy of life, অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চের সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা ধারণা, ও তদনুসারে একটী discipline of life অর্থাৎ জীবন-যাত্রানিয়ামক একটা বিনয় বা পরিপাটী স্থির করিয়া লইয়াছিল, এবং তদনুসারে সকলেই চলিতে চেষ্টা করিত। এখন আমরা এই philosophy ও discipline, এই অবলোকন-শক্তি ও বিনয়-পরিপাটী, উভয়ই হারাইতে বসিয়াছি, বহু স্থলে হারাইয়াও ফেলিয়াছি। নূতন কোনও philosophy, যোগ্যতর অর্থাৎ যুগোপযোগী নূতন কোনও discipline এখনও আমরা পাই নাই। এখন ভাঙ্গনের দশা; কালবৈশাখীতে সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে, আমাদের সমাজ-তরী প্রতিকূল বায়ু ও স্রোতের মুখে পড়িয়া কোন্ বিশালাক্ষীর দহে গিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে জানিনা; কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য মানবের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমরা তো জড় কাঠ-কুটার মত গা ভাসাইয়া দিতে পারিনা, আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে কি উপায়ে আমরা ঝড়-জল কাটাইয়া উঠিতে পারি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও তন্নিহিত ভাব সম্পদ্ আমাদিগকে এখন অবস্থা বুঝিয়া চলিতে সাহায্য করিতে পারে।

* * পুরাণ ও ইতিহাসের আখ্যান ও আদর্শ যতই অনুশীলন করা যাইবে দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক, তথা শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় সংস্কৃতির পক্ষে ততই মঙ্গল। একটা কথা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ যেমন একদিকে জগতের শ্রেষ্ঠতম উপাখ্যানাবলীর অক্ষয় ভাণ্ডার, তেমনি অন্যদিকে ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম এবং চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভাবধারার, তথা ভারতের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ তপস্যা ও যোগসাধনার অনন্ত অমৃত-প্রস্রবণ। পুরাণ ও ইতিহাস আলোচনায় এবং লোকসমাজে ইহাদের ভূয়ঃ প্রচারে একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যানের সহিত শিশু ও কিশোরদিগকে সময়োপযোগী আকারে পরিচিত করাইবার সাধু চেষ্টা বঙ্গদেশে আজকাল দেখা যায়। কিন্তু দেশের সাধারণ ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পুরাণের অমর উপাখ্যানাবলীকে, ইহার দেবচরিত্র-বিষয়ক কাহিনীগুলিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভাবশুদ্ধির সহিত আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন বহুক্ষেত্রে আমরা হারাইয়া ফেলিতেছি। পুরাণের আখ্যান কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে ও ভাব-গম্ভীর্য্যে অতুলনীয়; আমরা অধুনা যেন সেইগুলিকে কেবলমাত্র আমাদের aesthetics বা সৌন্দর্য্যবোধের উপায়নরূপেই ব্যবহার করিয়া, তাহাদের অমর্য্যাদা করিতেছি। পৌরাণিক আখ্যানের কাব্য বা চিত্রসৌন্দর্য্যেই তাহাদের চরম সার্থকতা নহে; এই আখ্যানগুলি মানুষের গভীরতম সত্তার ও অনুভূতির প্রতীক; এই বোধ—অন্ততঃ পক্ষে এইরূপ বোধকে জাগরিত করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ আমাদের এই রিক্‌থের প্রতি অবমাননা করা হয়।* *

সম্পাদকীয়

সংবঙ্গ

প্রথমেই যে সংবাদ লইয়া আমরা বাঙালী পাঠকদের দরবারে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, সেই সংবাদটি বাঙালীর সমাজ ও জাতির জীবনের দিক দিয়া এমন গৌরবের, যে, সংবাদটি বহন করিবার অধিকার পাইয়াই আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি। সংবাদটি এই, যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশ এক হইবার স্বপ্ন দেখে নাই, বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরেই শুধু বাঙালীর ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় নাই—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, বাঙালী শুধু এই স্বপ্ন দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—সত্যই এক হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ সেদিন পাওয়া গিয়াছে।

বিগত ২রা জানুয়ারী তারিখে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের একটি সাধারণ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ডি, আর, ভাণ্ডারকর বগুড়া জিলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্য্যযুগের একটি শিলালেখ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শিলালেখটি সম্পূর্ণ নহে, খণ্ডিত। মহাস্থানে খননকালে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মীলিপি ও অশোকের পূর্ব্বী প্রাকৃতে লেখা—অশোক-স্তম্ভ গাত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে সেই ভাষা। পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন যে ইহা অশোকের সময়কার একটি শিলালিপি।

ইহাতে লিখিত আছে যে, সংবঙ্গীয়দের মধ্যে খুব সম্ভব দুর্ভিক্ষের জন্য অন্নকষ্ট হওয়ায় রাজা......(নাম পাওয়া যায় নাই) পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের নিকট আজ্ঞা দিতেছেন যে, উক্ত সংবঙ্গীয়দিগকে গণ্ডক মুদ্রা (গণ্ডক—গণ্ডা হইতে) ধার দেওয়া হউক এবং রাজার গোলা হইতে ধান্য দেওয়া হউক এবং তাহাদিগকে জানান হউক যে ভাল সময় আসিলে তাহারা যেন ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়।

এই রাজা মৌর্য্যযুগের, সম্ভবতঃ অশোকের সময়ের কোনও রাজা। এই খণ্ডিত শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অনেক দিক দিয়া অনেক আলো প্রবেশ করিয়াছে; (১) পুণ্ড্র-বর্দ্ধন যে বগুড়ার মহাস্থান তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। (২) ইহাতে এক শ্রেণীর মাগধীর ব্যবহার হওয়াতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ, অন্ততঃ উত্তর বঙ্গ, তৎকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আর একদিক দিয়া এই শিলালেখটি মূল্যবান—এতদিন পর্য্যন্ত যতগুলি শিলালিপি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে এইটিই তন্মধ্যে প্রাচীনতম। ইতিপূর্ব্বে বাঁকুড়া, শুশুনিয়া পাহাড়ে একটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার তারিখ আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দ। ইহা রাজা সিংহবর্ম্মণ অথবা সিদ্ধবর্ম্মণের সময়কার। এই রাজা চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রপট্টটি গুপ্ত যুগের; আনুমানিক ৪৩০ খৃষ্টাব্দে উহা লিখিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সংবঙ্গীয়দের (Confederacy of Bengali Tribes) খবর ছাড়াও এই শিলালেখটির মূল্য আছে। ইহা বাংলায় আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপি।

আশ্চর্য্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে সেই সময়েও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট ছিল।

ক্যাল্‌ভিন কুলিজ

গত ৫ই জানুয়ারি নর্দাম্পটন (ম্যাসাচুসেট্‌স) সহরে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট (১৯২৩-২৮) ক্যালভিন কুলিজের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ হইয়াছিল। ১৮৭২ সনে প্লিমাউথ ভারমাউণ্টে সামান্য চাষী-গৃহস্থের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৫ সালে তিনি গ্রাজুয়েট হন্ এবং ইহার দুই বৎসর পরে নর্দাম্পটনে ব্যবহারজীবীর বৃত্তি সুরু করেন। ১৯১৯-২১ সনে তিনি ম্যাসাচুসেট্‌সের গবর্ণর নির্ব্বাচিত হন্। হার্ডিং-এর মৃত্যুর সময়ে (১৯২৩) তিনি সেনেটের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, প্রেসিডেণ্টের মৃত্যুতে তাঁহাকেই শূন্য পদ গ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর ১৯২৫এ তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন্। তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন না, বরং অতি সাধারণই ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে উন্নীত ব্যক্তিগণের তালিকায় বোধকরি তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহাকে জাতির 'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক' বলিয়া লোকে জানে নাই। অথচ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তিনি এ জাতির কর্ণধার ছিলেন। এই কঠিনতম দায়িত্বের পদের

সহিত তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনপ্রণালীকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে মিশ খাওয়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পদ অর্জ্জন করিয়াও তিনি দেশবাসীর কাছে চিরকাল তাহাদেরই একজন থাকিয়া গেলেন। সাধারণ হইয়াও তাঁহার অনন্যসাধারণত্ব ঠিক এইখানেই

ভারতে অস্পৃশ্যতা

"A Rationalist view of Untouchability in India" শীর্ষক প্রবন্ধসম্বলিত একটি ছাপা কাগজ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি. এস. সি, (লণ্ডন)। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতাকে সমর্থন করিয়া তিনি কয়েকটি অতি সুচিন্তিত পুস্তক লিখিয়াছেন যথা, "Epochs of Civilization", "Some Present-day Superstitions", "An Eastern View of Western Progress."

ভারতে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

অস্পৃশ্যতার পশ্চাতে যে মনোভাব তাহা কোন না কোন ভাবে অনাদিকাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। ইহার কারণ প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নীতির মধ্যেই নিহিত আছে—মানুষের পরস্পর প্রকৃতিগত বৈষম্যই ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ। এই পরস্পরের বৈষম্যগত অস্পৃশ্যতা আমেরিকা, আফ্রিকা, পলিনেশিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে যেরূপ ভয়াবহ মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পায়, ভারতবর্ষে তেমন পায় না। লিঞ্চিং প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই। একমাত্র ১৯২০ সালেই আমেরিকাতে পঁয়ষট্টি জন নিগ্রোকে (ইহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল) লিঞ্চ করিয়া মারা হয়; ইহার মধ্যে আবার তের জনকে জীবন্তে দগ্ধ করিয়া মারা হইয়াছিল।.........

ভারতবর্ষে যদিও অস্পৃশ্যতা প্রথমটা স্বাস্থ্যের আইন মানিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে কিন্তু উহা নিতান্ত অর্থহীন প্রথাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে মানুষের বিকৃত মনোভাব, ঘৃণা ও অত্যাচার-স্পৃহার জন্যই এতকাল টিকিয়া আছে তাহা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আমার এক ভগিনীর কথা বলিতে পারি। সে কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিল। আমার আহার, পানীয় ও সাধারণ জীবনযাত্রা যদিও গোঁড়া হিন্দুয়ানী সম্মত তথাপি আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বিলাতবাস করিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া সে আমার সহিত অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার করিত। তাহার রান্নাঘরে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না কিম্বা সে আমার ছোঁয়া খাবার বা পানীয় ব্যবহার করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া আমার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার তাহার যে বিন্দুমাত্র অভাব ছিল তাহা নয়। হিন্দুদের বাড়ীতে মৃত্যু হইলে কালাশৌচ হয়—অর্থাৎ কিছুকালের জন্য গৃহস্থ সকলেই অস্পৃশ্য হইয়া যায়। তাছাড়া আমরা যাহাদিগকে অস্পৃশ্য জাতি বলি তাহাদের মধ্যেও অস্পৃশ্যতা দেখিতে পাই। চামার মেথরের অস্পৃশ্য, ভাঙ্গি মেথরের অস্পৃশ্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ভিতর হিংসাদ্বেষ নাই

...আমার মনে পড়ে, এমন একদিন ছিল যখন আমি উচ্চনীচবর্ণের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখিয়াছি। হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও যথেষ্ট প্রীতির ভাব দেখিয়াছি—সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিয়া কোনও সমস্যার উদ্ভব তখন হয় নাই। এই সখ্য ও প্রীতির মূলে ছিল আমাদের কর্ম্মবাদ—প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্মফলে বিশ্বাস।

ইহার পর শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় ভারতের ধর্ম্মগুরুরা মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করিবার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া বলিতেছেন—"এই সকল চেষ্টা সত্ত্বেও এই বৈষম্য রহিয়া গেল।" দক্ষিণ ভারতে কোথায় কি ভাবে এই অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক বলিতেছেন—ঠিক এই অস্পৃশ্যতার জন্যই যে তাহারা অত্যন্ত দুঃখে আছে একথা ঠিক নয়।

বসু মহাশয়ের শেষ কথা এই—

সম্প্রতি একদল কলহপ্রিয়, অত্যন্ত বক্তৃতাবাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা ইকোয়ালিটি, ডেমক্রেসী ও মাস এডুকেশন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বুকনি কপ্চাইয়া কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ করিতেছেন—পূর্ব্বে যেখানে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ছিল সেখান বিরোধের সৃষ্টি করিতেছেন।............

গোলযোগ হইতেছে দুইটি বিষয় লইয়া—একত্র ভোজন ও মন্দির-প্রবেশের অধিকার। প্রথমটি সম্বন্ধে আমার মত এই যে, অস্পৃশ্যেরাই অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ভোজন করে না ; অনেক অস্পৃশ্য, উচ্চবর্ণের হিন্দু এমন কি ব্রাহ্মণদের সহিতও পংক্তি ভোজন করিবে না। দ্বিতীয় বিষয় মন্দির-প্রবেশের অধিকার। মন্দির-প্রবেশের অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই অন্যায়, কিন্তু যুগ-যুগান্তের এই অন্যায় দূর করিতে হইলে রহিয়া সহিয়া করা আবশ্যক। বিষের প্রতীকার করিতে গিয়া অধিক বিষ না ছড়ান হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

আমরা সর্ব্ববিষয়ে বসু মহাশয়ের সহিত একমত না হইলেও তাঁহার মত যে সুচিন্তিত তাহা স্বীকার করিতেছি।

মিলিত ভাষা

সেদিন কলিকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহা সর্ব্বাংশে সার্থক হইয়াছে। সভাপতি কবি কায়কোবাদের অভিভাষণ হিন্দুদিগকেও ভাবিবার যথেষ্ট খোরাক দিয়াছে। প্রকাশ্য মুসলমান সভায় বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া কবি কায়কোবাদ সমগ্র বাঙালী জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকারের বাংলা ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর জন্য এক প্রকারের বাংলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাংলার হিন্দু এবং বাংলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই। আমি ভাষার দিক দিয়া মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না।

বার্ণার্ড শ'

গত ৮ই জানুয়ারি সকালে সুবিখ্যাত ইংরেজী নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ' বোম্বাই আসিয়াছিলেন। কথার আতসবাজিতে জনসাধারণকে চমক লাগাইয়া দিতে বর্ত্তমান যুগে ইহাঁর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। অতি সহজ প্রশ্নের উত্তর অতি জটিল করিয়া এবং অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ ভাবে দিবার বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয়। ইংরেজ জাতকে তাঁহার মত এমন কটূক্তি আজ অবধি কেহই করেন নাই। স্পষ্টবাদী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তাঁহার সুনিপুণ ব্যঙ্গোক্তি সত্যই উপভোগ্য। সেদিন বোম্বায়ে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্নোত্তরে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ বহু বক্রোক্তি করিয়াছেন। ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতের মানচিত্র দেখিয়া মনে হয় যে, রেলগাড়ীর একটি কামরা ব্যতীত বেশী কিছু দেখিতে পাইব না। আমি জানি যে ভারতের রেলগাড়ীর একটি কামরা ও ইংলণ্ডের রেলগাড়ীর কামরা মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। যাহা হউক এবিষয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল নাই।' অর্থ ইহার হয়ত আছে, কিন্তু ইহার রস সে-অর্থ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—ইংলণ্ডে কোন শ্রমজীবীর ছায়া গায়ে পড়িলে একজন অভিজাত রমণী হয়ত আপত্তি না করিতে পারেন, কিন্তু সেই শ্রমজীবী যদি তাঁহার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন তবে সে অস্পৃশ্য বিবেচিত হইবে। ইহার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহাকে বার্ণার্ড শ'য়ের মনের কথা বলিয়া ধরা চলে না। মোটের উপর কথনোই কোন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধির কাছে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, বিশেষ করিয়া যদি সে বিচক্ষণ ব্যক্তি ইংরেজ জাতের সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং তাঁহাকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ' যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উপভোগ করিলেও ইহাঁর সে কথার বেশী মূল্য দিই না। কেননা বার্ণার্ড শ' রসিক, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এবং তাঁহার সেই পরিচয়েই তিনি আমাদের আত্মীয়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হর-পার্ব্বতী
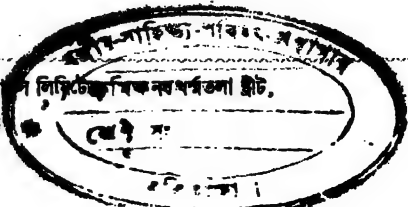
সেকালের টোল

-অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কে ছিলেন এই পরিচয় না দিলে অনেকে এখন তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না, অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি লেখাকে স্থান দিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। ইনি বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের শুধু নিয়মিত লেখক নন, বঙ্কিমের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নবজীবন' ইঁহারই কাগজ ছিল। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'—জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ১২৫৩ সালে চুঁচুড়া সহরে ইঁহার জন্ম—মৃত্যু ১৩২৪ সাল। ইঁহার পিতা রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর সুকবি ছিলেন।

গোচারণের মাঠ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, হাতে হাতে ফল, পিতাপুত্র, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, মোতিকুমারী, মহাপূজা, সাহিত্য-পাঠ, সাহিত্য-সাধনা এবং রূপক ও রহস্য প্রভৃতি পুস্তিকা ও পুস্তকের লেখক অক্ষয়চন্দ্র বাংলার তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটি ইতিহাস রচনা আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাসের গোড়ার অংশ। সম্ভবতঃ ১৩১০ সালে এই লেখা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন স্থানের বিদ্যার্থীদের যে বিবরণ ও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা ওই সময়কার। অক্ষয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসাহিত্যিক শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধটি প্রকাশার্থ দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।—স. ব.

নানা সময়ের, নানা দেশের ছাত্রবর্গের লেখাপড়ার কথা ও ছাত্রগণের পাঠাগারের বিবরণ অনেক ছাত্রেরই জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। এরূপ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হইল।

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করে। এমন কি এই ছাত্রগণের জন্য মধ্যবর্ত্তী ভদ্রলোকের বাসা মিলা ভার।

কাশীতেও ছাত্রসংখ্যা বিস্তর। এক কুইন্‌স্‌ কলেজে প্রায় ১২০০ ছাত্র।*

কাশীর হিন্দু কলেজও দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে

সমুদয় কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫ সহস্র। তাহার মধ্যে কেবল মহারাজ দ্বারবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত টোলে, প্রায় ৮০০ বিদ্যার্থী থাকে।†

পশ্চিম দেশের আলিগড় কলেজেও ১২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। আলিগড় কলেজ আসিয়ার মধ্যে অপূর্ব্ব বিদ্যামন্দির।

জাপানের রাজধানী টোকাইও নগরীতে লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করে‡ তাহারা সকলেই নাকি নাস্তিক।

য়ুরোপের মধ্যে বিলাতের অক্সফোর্ডে ১৩০০ ছাত্র। জর্ম্মান দেশের সাক্সনি প্রদেশের লীপজিগ্‌ কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ৭০০।

আমেরিকার চিকাগো কলেজে ৯০০র অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। ১১০০ পর্য্যন্ত ছাত্র থাকিবার সংস্থান আছে।

আফ্‌রিকার মিশর দেশের রাজধানী কাইরো নগরে ও তন্নিকটবর্ত্তী অজহর্‌ বিদ্যামন্দিরে লক্ষাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। অজহরে ১৭০০০ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করে। তাহাদিগের বেতন লাগে না। দুই ক্রোশ দীর্ঘ, অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপরি এই বিদ্যামন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি প্রতিষ্ঠিত। এখনকার ইঞ্জিনিয়ারগণ মনে করেন ১০ কোটি টাকা ব্যয় করিলে, এইরূপ বাড়ী এখন নির্ম্মিত হইতে পারে।

এখন বিদ্যার্থীগণের জন্য বড় বড় বাড়ীর প্রয়োজন হয়, ভাল ভাল ছাপার বই দিতে হয়, দুই বেলা তাঁহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। অজহরে প্রত্যহ আটাশ মণ মাংস লাগে। কিন্তু এমন দিনকাল ছিল, যখন ছাত্রেরা কুটীরে বাস করিত, আপনার পড়িবার পুস্তক, আপনি নকল

* ইংরাজি কলেজ ২১০, সংস্কৃত কলেজ ৩৫৩, ইংরাজি সংস্কৃত কলেজ ৪৮, কলেজিয়েট স্কুল ২৮৬, টাউন স্কুল ২৯১—মোট ১১৮৮।

† অনেক কথাই ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতী হইতে গৃহীত।

‡ Of the 100000 students at Tokio, the great majority have abandoned the national faiths and as yet believe in nothing. *Gentlemen's Maga.*—August, 1901

করিয়া লইত এবং যৎসামান্ত উপকরণে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন আপনি পাক করিয়া, তাহাই ভোজন করিয়া দিনযাপন করিত। শুষ্ক তালপত্রে অগ্নি লাগাইয়া, তাহা প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহাতেই পাঠচর্চ্চা করিত, এ কথা গল্পকথা নহে।

বৌদ্ধ-গৌরবের সময়ে, এক এক মঠে দশ হাজার, বিশ হাজার ব্রহ্মচারী ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত। শিলাদিত্যের রাজধানীতে এইরূপ মঠ চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

কুটীরবাসী ছাত্রের সংখ্যা নবদ্বীপে বহুতর ছিল। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসী স্বচক্ষে বিংশতি সহস্র ছাত্র নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন। (*Calcutta Review*)

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বিস্তারিত লিখিয়াছেন,

নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥১

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥

সেই সময়ের নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যার কথা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা বিংশতি সহস্র ছিল, ফরাসি পর্য্যটকের এই কথাটুকু না পাইলে, এবং এখনও কাইরো ও টোকাইও নগরীদ্বয়ে লক্ষাধিক ছাত্র বিদ্যা চর্চ্চা করে, এ কথা না জানিলে আমরা বৈষ্ণব কবির বর্ণনা অতি সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিতাম। এখন ঐ বর্ণনা পাঠ করিলে, হৃদয়মধ্যে বিস্ময় ও বিশ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

কেবল নবদ্বীপ বলিয়া নয়, নবদ্বীপের দক্ষিণে ও উত্তরে বহুদূর যাবৎ ভাগীরথীর দুই ধারে, বিশেষত পশ্চিম তটে বহুতর টোল ছিল। সমগ্র রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় হইতে, বিশেষ শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে, অনেক সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ নিত্য গঙ্গা-স্নানের সুবিধা জন্য এবং পুত্র পৌত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা জন্য এতদঞ্চলে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিঃস্ব * হইলে, বিদ্যার পরিচয় দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য এই নবদ্বীপ অঞ্চলেই বাস করিতেন। আর বহুতর বিদেশী ছাত্র গুরুজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, এতদঞ্চলে গুরুগৃহে বাস করিতেন। বড় বড় অধ্যাপকের বড় বড় টোল ছিল।

টোল বাঙ্গালার অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান, এমন গৌরবান্বিত অথচ আড়ম্বররহিত অনুষ্ঠান জগতে আর বুঝি নাই। টোলের সুশৃঙ্খলা, আড়ম্বরশূন্যতা, ও মিতব্যয়িতা, জগতের সকল অজহরকে ধিক্কার দেয় আর বাঙ্গালি ছাত্রগণকে বলে, তোমরা তৃণ পর্ণকুটীরের মর্য্যাদা বুঝ, প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রাসাদ দেখিয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইও না।

টোলকে এখন চতুষ্পাঠী বলা হয়, পূর্ব্বে 'চৌবাড়ী' বলিত। একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপরি চারিদিকে মেটে দেওয়াল দেওয়া খড়ে ছাওয়া লম্বা লম্বা ঘর। ঘরগুলি বারিকের মত খুব লম্বা; সেইগুলি ছোট ছোট কুঠরীতে বিভক্ত। কুঠরীগুলি ৩ হাত চৌড়া, আর ৬ হাত দীর্ঘে। যে দেওয়ালের দ্বারা, একটি কুঠরী অন্যটি হইতে পৃথক হইয়াছে, সে দেওয়ালগুলি খড়ের চাল পর্য্যন্ত ঠেকে নাই, প্রায় ৪ হাত উচ্চ। কুঠরীগুলির সামনের দাওয়া, লম্বা একটানা খোলা, খুঁটী লাগান। এমনই একটী ঘরে কুড়িটি কুঠরী। এরূপ তিন চারি খানি করিয়া ঘর প্রত্যেক দিকে। কোন এক দিকে হয়ত, একখানি ঘর কম আছে, সেই খান দিয়া অধ্যাপকের ভবনে যাইতে হয়। এই যে চত্বর, ইহাই চৌবাড়ী। এমন একটি চৌবাড়ীতে ২৫০।৩০০ ছাত্র সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। প্রতি কুঠরীতে এক একজন রন্ধন, ভোজন, এবং শয়ন করেন। কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ গৃহস্থালি সম্পর্ক নাই।

তবে এক কুঠরী হইতে পার্শ্বের কুঠরীর ছাত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহা চলে, ব্যবধান চারিহাত উচ্চ, মুখ দেখা চলে না, রন্ধন ভোজন শয়ন একটি তিন হাত প্রশস্ত ঘরের মধ্যে হয়, সে ত বড় বিচিত্র! বিচিত্র বৈ কি? আগড় ঠেলিয়া বা কবাট খুলিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিবে, ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চাতের দেওয়ালে দুর্গার কাঠামর মার্কিন (?) চাল খানি ধরে, এরূপ বৃহৎ একটি কুলুঙ্গী। সেই কুলুঙ্গীতে রন্ধনের

* পাণ্ডুলিপি অস্পষ্ট।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

। ১৮৯১ সনে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে

পাত্র থাকে, তিন হাত, ছয় হাত মেজের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র দোপাকা চুল্লী। অবশ্য রন্ধনের সময়েই ব্যবহৃত হয়।

দিনের বেলা পাঠাভ্যাস, দাওয়াতেই হয়; কখন বা অধ্যাপকের সমক্ষে, কখনও বা নয়। রাত্রির বিদ্যাচর্চ্চা, সেই কুঠরীর অভ্যন্তরেই হইয়া থাকে। দোপাকার উনানের আলোকই দীপের কার্য্য করে। আহারান্তে পাঠাভ্যাস পারত পক্ষে দীপালোকে হয়; কুলুঙ্গীর বিপরীত দিকের দেওয়ালে, দীপ রাখিবার একটু হাতলের মত আছে; চুল্লীর দিকে নাই। চুল্লীর বিপরীত দিকে ছোট একটি পেতেন আছে, তাহাতে গোটা দুই হাঁড়ি ও ভাঁড়।

যেমন আবাস, আহারের বন্দোবস্ত তদনুরূপ বা আরও বিচিত্র। অধ্যাপক ছাত্রদিগকে তণ্ডুল ও কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। তণ্ডুল রন্ধনোপযোগী দেন, কাষ্ঠ হয় বাগান, না হয় জঙ্গল হইতে ভাঙ্গিয়া আনিতে হয়; নতুবা বড় বড় কুঁদো কাঠ অধ্যাপক মহাশয় সংগ্রহ করিয়া চত্বরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই চেলাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেবল কাঠ আর চাল হইলেই ত চলে না; তেল লুণ চাই; সামান্য ব্যঞ্জনও ত কিছু চাই, দাইলও ত কিছু চাই—আর বঙ্গদেশীয় ছাত্র কিছু মৎস্য না হইলেই বা কিরূপে চলে? যে বাড়ী হইতে প্রচুর আনিতে পারিত, তাহার ত কথাই নাই। কিন্তু অনেকেই ত পারিত না, কাজেই তাহাদের দক্ষিণা, দানের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং অতি কষ্টে চলিত। আর তাহাদিগকেই তালপাতা জ্বালিয়া পাঠ চর্চ্চা করিতে হইত। কিন্তু এই কঠোর জীবনের বিদ্যার আঁটনি বড়। রঘুনাথের জীবনীতে তাহা আমরা দেখিয়াছি। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ টোলই বাঙ্গালার এই সকল অঞ্চলে ছিল, এবং অধিকাংশ ছাত্রই অতি কষ্টে দিন যাপন করিত। তবে দুই একটি সুবিধাও ছিল।

প্রথম সুবিধা, তখন সকল ভব্য গৃহস্থেরই বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ; তাহা ছাড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ব্রত নিয়ম, দিন শ্রাদ্ধ, জন্ম তিথি পূজা এ সকল ছিল, সুতরাং ছাত্রগণের এখন অপেক্ষা পাওনা ছিল।

দ্বিতীয় সুবিধা অন্য রূপের—বাঁশবেড়ে হইতে মুর্শিদাবাদ খাগড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে কাঁসারির কারবার খুব চলিত। পিত্তল কাঁসার তৈজস রাশি রাশি নির্ম্মিত হইত। নির্ম্মাণের জন্য কাঁসারিদের কয়লার প্রয়োজন হইত। গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া কাঁসারির, কচিৎ স্বর্ণকারের লোকেরা কাঠের কয়লা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত।

নবদ্বীপ পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কাঁসারি ছিল। একটা টোলে গেলে, এক স্থানে ২০০।৩০০ চুল্লীর কয়লা পাওয়া যায়, কাজেই ছাত্রগণের কয়লা বিক্রয়ের বড় সুবিধা ছিল। গরীব দুঃখীর মেয়েরা ছাত্রদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিত যে, তাহারা ঘর নিকাইয়া, থালা মাজিয়া, কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া, বাজার করিয়া দিবে, কেবল দুই বেলার কয়লাগুলি ও পাতের ভাতগুলি পাইবে। এইরূপ বন্দোবস্তে ছাত্রদিগের বড় সুবিধা হইয়াছিল। ছাত্রগণ দুখিনীর হাতে প্রাতে দুইটা করিয়া পয়সা দিলেন, আর নিশ্চিন্ত। সে সেইরূপ পয়সা লইয়া আট আনা কি দশ আনার বাজার আনিল। তৎপূর্ব্বেই গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া, থালাবাটি মাজিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার পর বাটনা একত্র বাটিয়া, কুটনা একত্র কুটিয়া, এক এক খানি পিত্তলের থালে, বাটনা ও তরকারি হয়ত কিছু মৎস্য সাজাইয়া প্রতি কুঠরীতে দিয়া চলিয়া গেল। প্রাতেই ছাত্রেরা তাহাকে বলিয়া দিতেন, 'আজি ত্রয়োদশী বার্ত্তাকু আনিওনা।' 'অদ্য হইতে মুগ আর চলিবে না।' পরিচারিকা পেটেল কুটনা, বাটনা, তরকারি দিয়া চলিয়া যাইত। ছাত্রদের ভোজনের পরই আসিয়া তাড়াতাড়ি কয়লায় জল দিত। কেননা সেইগুলিই ত তাহার প্রধান সম্বল। কাঁসারিরা তাহার নিকট হইতেই কয়লা লইত। প্রসিদ্ধ কাণা রঘুনাথের মাতা এইরূপ পেটেল ছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় চৌবাড়ীর সংলগ্ন আপনার মণ্ডপে প্রথমে অধিকতর কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন; সেই ছাত্রেরা আবার তাহার সমক্ষে অন্য ছাত্রগণকে পাঠ দিত। কদাচিৎ তিনি কোন ঘরের দাওয়ার একদিকে উচ্চবেদীতে বসিয়া পাঠদান করিতেন। বৈকালে বিদ্বান ছাত্রগণের মধ্যে বিতণ্ডা বা বাদানুবাদ হইত।

গ্রামস্থ অধীতশাস্ত্র ছাত্রগণ টোল ছাড়িয়াও ছাড়িতেন না, তাঁহারা প্রায়ই টোলে আসিতেন, অধ্যাপক যাঁহাদিগকে পাঠ দিতে বলিতেন, তাহাদিগকে পাঠ দিতেন এবং সেই টোলের নিমন্ত্রণ হইলে তাহার ফল ভোগ করিতেন।

এখন ঠিক এরূপ টোল দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ছাঁচ সেইরূপই আছে। তবে অনেক স্থলেই ছাত্রেরা এখন বাঁধা ভাতের অব্দার করিয়া থাকেন। একটু আধটু অব্দার হয় হোক, কিন্তু ছাত্র মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বালককাল শিক্ষার সময়, বিলাসের সময় একেবারেই নয়! বালককালে কঠোরতা অভ্যাস করিলে কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই পর জীবনে মনে হয় না। লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও সংযম যত শিখিতে পারা যায়, ততই লাভ। এমন লাভ পারত পক্ষে বালক সকল ছাড়িত না।

বসন্তের ফুল

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

(১)

বসন্তের ফুল আর বসন্তের পাখী;
একটি সে ঝরে' যায় খরসূর্য্যতাপে,
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মদির মাধবী নিশা। বিস্ময়-বিস্ফার আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল; দিতে নারে ফাঁকি
তবু তারে দু'দণ্ডের বেশী—প্রাণ কাঁপে
থরথরি', রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণ তনু ঢাকি'।

ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়;
বর্ষ সাথে আয়ুঃশেষ—সে যে শুধু রূপ!
আলোকে আঁধারে বোনা বর্ণ-রেখা-স্তূপ
কুজ্ঝটি-অম্বরে; সে যে ফেন-বিম্ব প্রায়
হরিত-সায়রে ফুটি' তখনি মিলায়,
মধু-শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ।

(২)

বসন্তের পাখী, সে ত' মৃত্যু নাহি জানে,
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসরি'—
সে জানে কালের ছন্দ, পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী সন্ধানে।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্ত-বন্ধে আপনা সম্বরি';
রূপ নয়, দেহ নয়—উর্দ্ধাকাশ ভরি'
ভাবের অবাক-ধারা ঢালে গানে গানে।
গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পশরা,
মর্ম্মমূলে বহে শুধু মৃত্তিকার রস,
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা,
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা—
অনন্ত বসন্ত তার, অনন্ত বরষ!

(৩)

সেই মত আমি কবি একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী মাসে; ইন্দ্রিয়-গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি; প্রাণ-সবিতায়
দিনু অর্ঘ্য, অঞ্জলিয়া প্রীতি নির্ভাবনা—
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায়।

বসন্তের পাখী নই, বসন্তের ফুল,
ফুটে ঝরে' গেছি তাই নীরস নিদাঘে;
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে—
মরণের হাসি-ভরা জীবনের ভুল!
মোর স্মৃতি নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-সমতুল—
ডুবে গেছি চেতনার অতল তড়াগে।

বাঙ্গালা ভাষার পরিণাম

—শ্রীসুকুমার সেন

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য এখন এক যুগ-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে। কথাটা মোলায়েম করিয়া বলিলে এইরূপই শোনায় বটে, আসলে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূরা দমে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এখন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মহৎদিগের নেতৃত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে বা শেষ হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর আচারে ব্যবহারে, সমাজে শিক্ষায়, চিন্তায় চরিত্রে, সর্ব্বত্রই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গালী জাতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এই সর্ব্বব্যাপী শৈথিল্যের ও নির্জ্জীবতার প্রতিচ্ছায়া ভাষায় ও সাহিত্যেই বা দেখা দিবে না কেন? তবে রবীন্দ্রনাথের আমলেই ইহা ঘটিতেছে বা ঘটিবার সুযোগ পাইতেছে ইহাই গভীর ক্ষোভের বিষয়।

ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য, অতএব অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এলোমেলো ভাবে বা খেয়াল অনুযায়ী হয় না; এই পরিবর্ত্তনের নিয়মিত ধারা আছে। সেই ধারা ভাষার প্রকৃতি দেশের পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করিয়া চলে। বিদেশী কোন শক্তিমান্ ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে ভাষার মধ্যে সেই বিদেশী ভাষার কিছু না কিছু প্রভাব আসিয়া যায়। তবে সেই প্রভাব সচরাচর শব্দকোষের উপরই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভাষার নিজস্ব পরিবর্ত্তনের ধারা কিন্তু অব্যাহত রহিয়া যায়। বহতা নদীর সহিত ভাষার উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। উপমার দ্বারা কোন তথ্যকে প্রকাশ করা যতটা সম্ভব ততটা হিসাবে এই উপমা সার্থক সন্দেহ নাই। নদীও নিজের খাত ছাড়িয়া ধাবিত হয় না, এবং ভাষাও নিজস্ব ধারা পরিত্যাগ করিয়া চলে না। নদীতে বান ডাকিলে যেমন জল উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দিকে বিদিকে প্রসারিত হয়, ভাষা (ও সাহিত্যে) স্বৈরাচারের বান আসিলে ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এইরূপ স্বৈরাচার ও মত্ততার বান আসিতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখ করিলাম বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে কেবল মাত্র বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে তাহারই আলোচনা করিব, এবং অদূরভবিষ্যতে যে ইহার গতি কোন দিকে ধাবিত হইবে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে মোটামুটী একটা বিচার করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার মধ্যে বিকৃতি আসিলেই যে তাহা অবাঞ্ছনীয় বা অনিষ্টকর হইবে তাহা নহে, কিন্তু এখনকার দিনে আর যাহাতে ভাষা হইতে উপভাষার সৃষ্টি না হয় তাহা দেখা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যাইতেছে তাহার উদ্ভব দুই রকমে হইতেছে, (১) ইচ্ছাকৃত (২) অনিচ্ছাকৃত। (এখানে বাঙ্গালা ভাষা বলিতে কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্র সমাজের কথ্য ও লেখ্য ভাষা এবং সাধুভাষা বুঝাইবে)। 'অনিচ্ছাকৃত' পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ উচ্চারণের মধ্যেই দেখা দিয়াছে। লেখার মধ্যে অজ্ঞাতসারে আগত ইংরেজী ছাঁদও 'অনিচ্ছাকৃত' বলিয়া ধরিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা অঞ্চলের যুবক ও বালকদিগের মধ্যে কতকগুলি শব্দের বা শব্দসমষ্টির উচ্চারণে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্পর্শবর্ণের (plosive) অস্পষ্ট (indistinct অথবা slurred) উচ্চারণ প্রায়ই শোনা যায়। জিহ্বাকে পর পর দুই বা তিনটী বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে লইয়া না গিয়া একই বা সংলগ্ন স্থানে সেই সকল শব্দের উচ্চারণ করা হয়। এই রকম উচ্চারণ-প্রণালী কলিকাতার 'ফ্যাশন' মনে করিয়া কলিকাতার বাহিরের ও মফস্বলের যুবক ও বালকেরা ইহার অনুকরণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফলে এই উচ্চারণ-শৈথিল্য অচিরে ব্যাপক ভাবে দেখা দিতে পারে এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উচ্চারণ-প্রযত্নে দৃঢ়তার অভাব জাতির ভবিষ্যৎ দৌর্ব্বল্যের সূচনা করে।

মগধ-রাঢ়-বঙ্গ অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রসারলাভের প্রথম যুগেই শ, ষ, স এই তিন উষ্ম (sibilant) ধ্বনির স্থলে একমাত্র শ-কার রহিয়া যায়। তাহার পর হইতে বরাবর এই শ-কারের অস্তিত্ব প্রাচ্য

ভারতীয় আর্য্য ভাষার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিক প্রাচ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার মধ্যে কেবল বাঙ্গালাই এই শ-কারকে পূর্ণ ভাবে বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর হইতে পশ্চিম বঙ্গের (বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলের) যুবক ও বালকদিগের মধ্যে শ-কারের পরিবর্ত্তে স-কারের উচ্চারণ দেখা দিয়াছে। এই স-কারের উচ্চারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই শোনা যাইত। এখন ভদ্রঘরের ছেলেদের মুখে এই উচ্চারণ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। স-কারের উচ্চারণ একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে শ-কারের উচ্চারণ দুরূহ হইয়া পড়ে।

শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক ও বালকদিগের ভাষায় আর একটী অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। এই বিশেষত্ব হইতেছে কতকগুলি সুপরিচিত দেশীয় নামের ইংরেজী উচ্চারণ করা। আজকাল ইস্কুলের বালকদিগের মধ্যে তো কথাই নাই বহু বহু শিক্ষিত লোকের মুখে 'সংস্কৃত' 'কলিকাতা' ইত্যাদির বদলে 'স্যাঙ্‌স্ক্রুট্‌,' 'ক্যালকাটা' প্রচুর শোনা যায়। ইহার জন্য কতকটা দায়ী ইংরেজীর মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ এবং বাকীটার জন্য দায়ী আমাদের বর্ব্বরতা। কেহ কেহ আবার কোন স্থান-নামের প্রকৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইংরেজী উচ্চারণের (অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজীর বিকৃত উচ্চারণের) পশ্চাতে আপনার অজ্ঞতা বা প্রাদেশিকতা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

এই সম্পর্কে আর একটী কথা বলিবার আছে। ইংরেজী বানানের প্রভাবে আমাদের অনেক স্থান-নাম বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় 'চিটাগঙ্‌' ('চাট্‌গাঁ' পুরাতন বাঙ্গালা 'চাটিগ্রাম,' 'শুদ্ধ' রূপ 'চট্টগ্রাম'), 'কণ্টাই' (কাঁথি), 'বনগঙ্‌' (বনগাঁ), 'সাঁকটিগড়' (শক্তিগড়) 'চিন্‌সুরা' (চুঁচুড়া) ইত্যাদি। এই বর্ব্বরতার জন্য বেশীর ভাগ দায়ী বাঙ্গালা সংবাদপত্র। আমাদের সংবাদপত্রের ভার কি রকম লোকের উপর ন্যস্ত থাকে এবং দেশীয় সংবাদপত্রের দায়িত্ব-জ্ঞানই বা কতদূর তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'চ্যাটার্জ্জি' 'মুখার্জ্জি' প্রভৃতি উচ্চারণও অনুরূপ কারণে চলিয়া যাইতেছে। 'চিটাগঙ্‌', 'কণ্টাই', 'চ্যাটার্জ্জি' ইত্যাদি শব্দ গুলিকে আর তাড়াইতে পারা যাইবে না। ইহারা ভাষার মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করিয়া বসিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম বা অর্দ্ধতৎসম শব্দের অন্তস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্বরান্ত উচ্চারণ হইয়া থাকে। (এইটী বাঙ্গালা ভাষাকে অনন্যসুলভ কোমলতা দান করিয়া দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দীতে এইরূপ উচ্চারণ নাই বলিয়াই হিন্দীভাষা বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্জ্জস্বী।) ইংরেজী উচ্চারণের প্রভাবে কতকগুলি স্থান-নামের উচ্চারণে পদের অন্তস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্বরান্ত উচ্চারণ লোপ পাইতেছে। যেমন, 'রাণীগন্‌জ্‌' 'বালীগন্‌জ্‌' (<রাণীগন্‌জ, বালীগন্‌জ)।

এইবার 'ইচ্ছাকৃত' পরিবর্ত্তনের কথা ধরা যাউক। বাঙ্গালা ভাষার শব্দকোষে ইংরেজী শব্দ যথেষ্ট ঢুকিয়াছে এবং অজস্র ঢুকিতেছে। ইহাতে কোন ক্ষতি তো নাই-ই, উপরন্তু যথেষ্ট লাভ আছে। বিদেশী দ্রব্যের উল্লেখ বা বিদেশী বিষয় বা ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বিদেশী শব্দের সাহায্য অপরিহার্য্য। এইরূপ শব্দের আমদানীতেই ভাষার সম্পদ বাড়ে। বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-রীতিতেও (syntax) ইংরেজী কায়দা কিয়ৎ পরিমাণে ঢুকিয়াছে। ইহাও অবশ্যম্ভাবী, কেননা ইংরেজী ভাষার ছত্রচ্ছায়ায় বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি না হউক, পোষণ হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা গদ্যের রীতিতে ইংরেজীর ছাঁচ কতক পরিমাণে যে আসিয়া গিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি যতটা ইংরেজী ধাঁচ বাঙ্গালা গদ্যে আসা সম্ভবপর ছিল ততটা আসে নাই। ইয়োরোপীয়রাই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা ইহা বলিলে আশা করি কেহ বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবেন না। পাদ্রি আস্‌সুম্‌প্‌সাউঁ (Manoel Da Assumpcam) প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ' বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম বর্ত্তমান নিদর্শন। (এই পোর্ত্তুগীস্‌ পাদ্রিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বই খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়া লিস্‌বন্‌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্যাকরণখানি অবশ্য পোর্ত্তুগীস্‌ ভাষায় লেখা। এই ব্যাকরণটী শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদকতায় বাঙ্গালা অনুবাদসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' হইতে পাদ্রি আস্‌সুম্‌প্‌সাউ-এর বাঙ্গালা গদ্যরচনার নিদর্শনও কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে।)

যে সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী ধাঁচ অপরিহার্য্য তাহার কথা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অনাবশ্যক ভাবে ইংরেজী রীতি আসিয়া পড়িতেছে। উদাহরণরূপে বলিতে পারা যায় 'আনন্দের সঙ্গে' 'আগ্রহের সঙ্গে' ইত্যাকার প্রয়োগ। এই বাক্যাংশ দুইটী ইংরেজী 'with pleasure' 'with eagerness' এই বাক্যাংশের অনুবাদ বলিয়া কানে ঠেকে। এই বাক্যাংশ দুইটীর ভাব বাঙ্গালার নিজস্ব রীতিতে প্রকাশ করিতে হইলে বলা উচিত 'আনন্দিত হইয়া' 'আগ্রহ করিয়া'। 'আনন্দের সহিত' 'আগ্রহের সহিত' বলিলেও কানে বিশেষ বাধে না। বাঙ্গালায় 'সঙ্গে' এই কথাটীর ব্যক্তিগত সহার্থ (sociative function) বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই শব্দটীর সাধারণ সহার্থ (concomitance) বা ক্রিয়াবিশেষণমূলক প্রয়োগ না করাই ভাল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালায় যখন অসমাপিকার সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষণের কার্য্য উত্তমরূপেই চলে তখন অযথা এইরূপ ইংরেজী ধাঁচের আমদানীর আবশ্যকতা আছে কি?

প্রকৃত কথা এই যে বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজী-শিক্ষিত সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই বিষয়বস্তু ইংরেজীতে ভাবিয়া লইয়া বাঙ্গালায় (মনে মনে অনুবাদ করিয়া লইয়া) লেখেন। বাঙ্গালায় সেই ভাব যে কি করিয়া ঠিকমত প্রকাশ করা উচিত সে বিষয়ে তাঁহারা মাথা ঘামাইবার দরকার মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রধানতঃ এই কারণেই ইংরেজী রীতি বাঙ্গালা ভাষায় প্রবল বেগে ঢুকিতেছে। 'প্রেমে পড়া' হয়ত চলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি "ভয়ে 'শরীরের রক্ত বরফ হ'য়ে' যায়" এই রকম অদ্ভুত কথা চালাইতে হইবে?

ইংরেজী রীতির অনুকরণে যৌগিক অব্যয় (conjunction)-এর প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় আর একটী লক্ষণীয় ইংরেজিয়ানা হইয়া দাঁড়াইতেছে। দুইটী উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে। 'কেন কী করেছি আমি? বা কী করি নি?' 'তিনি নোইশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি করা যায়, এবং নোইশি তাঁহাকে বলিল যে তাঁহার ঐ নিয়ম পালন করাই উচিত।' [এখানে 'বা' ও 'এবং' এই দুইটীর প্রয়োগ ইংরেজী or ও and-এর অনুকরণে হইয়াছে।]

আধুনিকতম বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের লেখায় যে ইংরেজিয়ানা সর্ব্বাপেক্ষা বিকট বোধ হয়, তাহা হইতেছে ইংরেজী রীতির হুবহু অনুকরণে (এবং অনুবাদ করিয়া) বিশেষণের প্রয়োগ। প্রত্যেক ভাষারই বিশেষণ-প্রয়োগের বিশেষ বিশেষ ধরণ আছে। অবশ্য অনেক সময় ঐক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে বিশেষণের ধরণ অন্য প্রকার, সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করিলে তাহা অবোধ্যই রহিয়া যাইবে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; 'সস্তা কৌশল', 'সস্তা অনুকৃতি', 'পরিবর্ত্তনশীল অন্নদাতা', 'স্নায়ুহীন কবিত্ব', 'স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্দেশ', 'সংশয়ী ব্যঙ্গ', 'সত্যসন্ধী নির্ভীকতা', 'অসহিষ্ণু অস্বীকার', 'নিষ্করুণ কৃচ্ছ্রবাদ', 'রূপালী হাসি' ইত্যাদি। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহাদের তো কথাই নাই, যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারাও সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। দুই একজন হয়ত এই রকম বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উপর পরীক্ষা (experiment) চালাইতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লেখকই (অবশ্য যাঁহারা এই রকম লিখিয়া থাকেন) যে বাঙ্গালা ভাষায় তত্তৎভাব প্রকাশে অক্ষম বলিয়া এইরূপ করিয়া থাকেন এই সন্দেহ স্বতঃই মনে উদিত হয়।

আবশ্যক ও অনাবশ্যক ভাবে প্রচুর ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। কোন কোন লেখক ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া তাহাদের অশোভনতা ও উগ্রতাকে ঢাকিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অযথা এত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ কি না করিলেই চলে না। বুঝিলাম যে লেখক ইংরেজী অনভিজ্ঞদিগের জন্য লিখিতেছেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি আগাগোড়া ইংরেজীতে লিখিলেই কি সুষ্ঠু ও শোভন হয় না? (ইংরেজী শিক্ষিতেরাও হয়ত সকলে টানা ইংরেজী বুঝিতে পারিবেন না এই রকম আশঙ্কা হয় না তো?)। লেখকদিগের অজ্ঞানতাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী না হইতে পারে। 'ফ্যাশন'ই বোধ হয় ইহার জন্য বেশী দায়ী। সে যাহাই হউক, ইঁহারা যে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষার উপর অত্যাচার করিতেছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থাতেই বোধ হয় ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ফরাসী ভাষায় সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন এক জর্ম্মান লেখা বুঝা যাইবে না, ইহা কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে কি? এই ব্যাপার যদি আরও কিছুদিন চলিতে থাকে তাহা হইলে আত্মীয়

প্রভাবে ফারসীর যে দুরবস্থা হইয়াছে ততোধিক দুর্দশা বাঙ্গালা ভাষার হইবে।

ইংরেজী শব্দ সম্পর্কে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী শব্দ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখনকার দিনে ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় লিপ্যন্তর করিতে হইলে ইংরেজীর তাৎকালীন উচ্চারণই গৃহীত হইত। সে সময়ে ইংরেজীতে প্রথম অক্ষর (syllable) স্থিত 'o' এই স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালায় আ-কারের মত ছিল। সেই জন্য তখনকার দিনে কালেজ, 'কাপি', 'আপিস', 'লাট' (<'লার্ড' lord) ইত্যাদি লেখা হইত। 'কালীচরণ' এই নামের ইংরেজীতে রূপ ছিল Colly Churn। এই সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ (যথা 'আপিস', 'লাট' ইত্যাদি) বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাকী শব্দগুলি (যেমন 'কলেজ' 'কপি') এখনকার উচ্চারণ-রীতিতে অনুলিখিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শব্দের বাঙ্গালায় অনুলিখনের একটা সাধারণ প্রণালী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই প্রণালী অবশ্য সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণের অনুগত নহে। এই প্রণালী অনুযায়ী সকলেই 'ট্রেন' (train), 'মেল' (mail), ইত্যাদি লিখিয়া থাকে। সম্প্রতি দুই একটী লেখক (ইঁহারা বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী) এই সকল শব্দ 'ট্রেইন', 'মেইল' এই রকম করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (এই দুই শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'ট্রেইন', 'মেইল', এই উচ্চারণের অবশ্য বেশী কাছাকাছি হইলেও এই বানানে 'ট্রে-ই ন', 'মে-ই-ল' পড়িবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং সে হিসাবেও এই নূতনত্বের কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না)।—এই সব লেখকদিগের এই জ্ঞান নাই যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা স্থানগত মুদ্রাদোষ জোর করিয়া চালানো যায় না। ব্যাপক ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিলে লেখ্য ভাষার মধ্যেই উপভাষার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে।

ভবিষ্যতে বাঙ্গালা ভাষা (লেখ্য ও শিক্ষিত সমাজের কথ্য) যে কোন পথ দিয়া চলিবে তাহার কিছু কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষার মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এই সংঘর্ষ সুরু হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের (প্রকৃত পক্ষে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলের ও পূর্ব্ব কূলের কিয়দংশের) কথ্য ভাষার ভিত্তির উপর আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে। আর এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাই মূলতঃ বাঙ্গালার আদর্শ (standard) কথ্য ভাষা। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই—তা তিনি যে কোন অঞ্চলের হউন না কেন—এই কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এই সংঘর্ষে পশ্চিম বঙ্গের ভাষাই যে চরমে জয়ী হইয়া উঠিবে তাহাতে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নাই। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষা এখন পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর সীমান্তেও (অবশ্য শিক্ষিত সংসারে) আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে। কিন্তু শেষে জয়ী হইলেও পশ্চিম বঙ্গের ভাষার উপর পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার লাঞ্ছন জাজ্বল্যমান থাকিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে কতকগুলি বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিম বঙ্গের ভাষাকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। এই বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।

পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষায় অতীতকালে প্রথম পুরুষে '-ল' এবং '-লে' এই দুই বিভক্তি হয়। ক্রিয়া যদি অকর্ম্মক হয় তবে '-ল' বিভক্তি আসে, আর ক্রিয়া যদি সকর্ম্মক হয় তবে '-লে' বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় এই '-লে' প্রত্যয়টী নাই। ধাতু অকর্ম্মক হউক বা সকর্ম্মক হউক উভয়ত্রই '-ল' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় 'গেল', 'দিলে', আর পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় 'গেল', 'দিল'। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কথ্য (এবং লেখ্য) ভাষায় এই '-ল' প্রত্যয় সকর্ম্মক ক্রিয়াতেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রগৃহে 'দিল', 'খেল', 'পেল' ইত্যাদি রূপ প্রচুর শোনা যায়। এমন কি অনেকের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে 'দিলে', 'খেলে' 'পেলে' ইত্যাদিরূপ গ্রাম্য জনোচিত সুতরাং ভদ্রসমাজে প্রযুজ্য নহে। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে অল্পকালের মধ্যেই সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে '-লে' প্রত্যয় ব্যাকরণের উদাহরণ মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

নঞর্থ বাচক শব্দে প্রয়োগেও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় 'ন' শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। ইহা ছাড়া অন্যত্র নঞর্থ ক্রিয়ায় ব্যবহার হয়। এই নঞর্থ ক্রিয়ার যে কয়টী রূপ এখন প্রচলিত আছে তাহা অব্যয় রূপে পরিণত

হইতে চলিয়াছে। সেই রূপগুলি এই—উত্তম পুরুষে 'নই (নহি)' মধ্যম পুরুষে 'নও (নহ)' প্রথম পুরুষে 'নয় (নহে)।' এবং মধ্যম ও প্রথম পুরুষে সম্মানসূচক 'নন (নহেন)'।

আধুনিক সাহিত্যিকদিগের অনেকেরই লেখায় এখন নঞর্থ ক্রিয়া-পদের স্থানে নঞর্থ অব্যয় 'না' শব্দের ব্যবহার দেখা যাইতেছে যেমন, 'আমি না' 'তুমি না' 'সে না'; খুজে পেতে না' (-খুঁজিয়া পাতিয়া নহে)। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় সমাপ্ত অতীত কালে (perfect tense) ক্রিয়ার সহিত 'না' শব্দের প্রয়োগ হয় না, বর্ত্তমান কালের রূপের সহিত 'নাই (< নি, নেই) এই নাস্তি-বাচক শব্দের ব্যবহার হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব (এবং ইংরেজী ভাষার প্রভাব) বশতঃ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন লেখক এখন অনবধানতা অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ সমাপ্ত-অতীত কালে 'না' শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন। যেমন, 'সে এ কাজ করিয়াছিল না'।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব ছাড়াও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পশ্চিমবঙ্গের কথ্য (ও লেখ্য) ভাষায় দেখা দিয়াছে বা দিতেছে। এইবার সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব। বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকারকের বহুবচনে দুইটী বিভক্তি (প্রকৃত পক্ষে একই বিভক্তির দুইটী রূপ) আছে—'-এরা' ও '-রা'। শব্দ হলন্ত বা অকারান্ত হইলে '-এরা' বিভক্তিটী প্রযুক্ত হয়, আর অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরান্ত হইলে '-রা' বিভক্তিটী প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'লোকেরা', 'শাক্তেরা', 'চীনেরা' 'জাপানীরা' ইত্যাদি। বিদেশী শব্দ হইলে—স্বরান্ত বা হলন্ত যাহাই হউক না কেন— '-রা' বিভক্তিই সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, দৈবাৎ '-এরা' বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, 'ইউরোপীয়রা' 'ইয়োরোপীয়েরা', 'আমেরিকানরা' ইত্যাদি। অধুনা কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষায় (বিশেষতঃ শিশু ও বালক-দিগের মুখে) '-এরা' বিভক্তির স্থানে '-রা' বিভক্তি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা কথ্য ভাষা হইতে শিশু-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সাধারণ সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। এই পদ্ধতির মূলেও বোধ হয় উচ্চারণ-শৈথিল্য।

পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় দ্বিতীয়া (ও চতুর্থীর) বহুবচনে '-দের' বিভক্তির পরে আর '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ হয় না। এই '-কে' বিভক্তি কেবল দ্বিতীয়া ও ব্যক্তিবাচক শব্দের দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর একবচনেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লেখ্য ভাষায়ও এইরূপ, অধিকন্তু দ্বিতীয়া ও দ্বিতীয়া-চতুর্থীর বহুবচনেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে ('-দিগ + কে', '-দি + কে')। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের উপভাষায় (বিশেষ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে) '-দের' বিভক্তির সহিত '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। এখন অনেক সাহিত্যিক (তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও আছেন) চতুর্থী বিভক্তি বা ক্রিয়ামূলক সম্প্রদান-কারকের উপর জোর বুঝাইবার জন্য 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' এই পদ ব্যবহার করিতেছেন। আদর্শ কথ্যভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় চতুর্থী মূলক কর্ম্মকারক ও ক্রিয়ামূলক সম্প্রদান-কারক ভিন্ন অন্যত্র '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ বহুদিন হইতেই নাই। তবে অঞ্চল বিশেষে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'সেদিনকে', 'ঘরকে' প্রভৃতি প্রয়োগ চলিত আছে। পুরাতন বাঙ্গালায়ও তাহাই ছিল, কিন্তু প্রয়োজনাভাবে (গদ্য সাহিত্যে ও) কথ্যভাষায় বর্জ্জিত হইয়াছে। 'তাদের বলব' ইত্যাদি প্রয়োগে 'তাদের' শব্দে চতুর্থী বিভক্তির অর্থ কিছু মাত্র বিস্পষ্ট বা ক্ষুণ্ন হয় নাই। সুতরাং অনাবশ্যক ভাবে ভাষার উপর ব্যাকরণের বোঝা বাড়াইতে যাওয়া কেন? ষষ্ঠ্যন্ত পদের পর পুনরায় বিভক্তির প্রয়োগ (যেমন, 'তাহারদিগের', 'মানুষেরদিগকে' ইত্যাদি) শতবৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ও লেখ্য ভাষায় ছিল। ঐরূপ প্রয়োগ এখন বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

কোন কোন সহিত্যিকের মধ্যে এখন অযথা উপভাষা-প্রীতি দেখা দিয়াছে। উপভাষা হইতে প্রয়োজনানুরূপ শব্দ ভাষায় গৃহীত হইলে ভাষার সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অসার্থক অথবা দুষ্টপ্রযুক্ত শব্দ লইলে কিছু লাভ আছে কি? কেহ কেহ এখন 'তারির' (তাহারই), 'কারুর' (কাহারও), 'কারুরই' (কাহারই) ইত্যাদি পদ ইচ্ছা পূর্ব্বক চালাইতেছেন। এই পদগুলি কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষায় আছে বটে, কিন্তু তাহার ব্যবহার সার্ব্বজনীন তো নহেই, প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। পদগুলি অপভ্রষ্ট; অবিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতে ইহাদের জন্ম। এই পদগুলি ভাষার কোন অভাবও মোচন করিতেছে না। সুতরাং ভাষায় ও সাহিত্যে ইহাদের স্থান হইতে পারে না।

কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষার উপর পক্ষপাতিত্ব যে সকল আধুনিক সাহিত্যিকদিগের রচনার মধ্যে লক্ষিত হইতেছে, তাঁহারা এই অঞ্চলের অধিবাসী, কিংবা এই উপভাষার উপর তাঁহাদের কিছু দখল আছে এরূপ বোধ হয় না। ইঁহারা 'বে' (বিয়ে), 'নে'যাবার' (নিয়ে যাবার) ইত্যাদি লেখেন, তাহাতে কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু 'দেওয়া' 'নেওয়া' এই সকল পদকে 'দেয়া' 'নেয়া' লিখিলে সত্যই ভুল করা হয়। কলিকাতা অঞ্চলে এই দুই শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ হইতেছে 'দেওয়া' অথবা 'দোয়া', 'নেওয়া' অথবা 'নোয়া'। ণিজন্ত ক্রিয়ার অপপ্রয়োগও এই সকল সাহিত্যিকের রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানতঃ দুইটী অপপ্রয়োগ ইঁহাদের রচনাকে ইঁহাদের অজ্ঞাতসারে হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়া থাকে। সে দুইটীর মধ্যে একটী হইতেছে অস্থানে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ (যেমন, 'চোখ বোঁজা', 'সাজিয়া গুঁজিয়া'), এবং অপরটী হইতেছে অতীতকালে প্রথম পুরুষে অকর্ম্মক্রিয়ার—'ল' বিভক্তি ও সকর্ম্ম ক্রিয়ার—'লে' বিভক্তির মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলা। যেমন, 'দম নেবার জন্যে থাম্‌লে' ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেক সাহিত্যিকই চেষ্টা করিতেছেন ও পরীক্ষা (experiment) চালাইতেছেন। কিন্তু একদিকে কেহই লক্ষ্য দিতেছেন না। নূতন নূতন ধাতু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ভাষার একটা প্রধান শক্তি। আমাদের মধ্যে কেবল মধুসূদনই বুঝিয়াছিলেন যে নামধাতুর ব্যবহারের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার একটা কত বড় শক্তি লুকায়িত রহিয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায় এক সময় নাম ধাতুর প্রয়োগ বিলক্ষণ চলিত (যেমন, 'শান্তাইল', 'আশ্রয়িল', 'আদেশিল', 'ক্ষমাইল', 'কোপিল', 'স্তবিল', 'শিথিলিল' ইত্যাদি)। সুতরাং নামধাতুর প্রচুর প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় পক্ষে নূতন কিছু নহে। মধুসূদনের যে অতুলনীয় ভাষা-জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি ছিল তাহা তাঁহার সমকালীন ও পরবর্ত্তী কবি ও সাহিত্যিকদের না থাকায় বাঙ্গালা ভাষা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং সে ক্ষতি আর পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিম বঙ্গের অঞ্চল বিশেষের উপভাষায় নামধাতু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা এখনও আছে। 'গুলিয়ে (=গুলি করিয়া) মারা', 'তিরিয়ে (=তীর বিঁধিয়া) মারা', 'জমি কুদলে (=কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া) দেওয়া' ইত্যাদি প্রয়োগ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। আদর্শ কথ্য ভাষা হইতেও নামধাতু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পায় নাই। এ যাবৎ দুইটী ইংরেজী শব্দ নাম-ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। দুইটীই তাস খেলা সম্পর্কীয় 'পাশানো' (pass), 'কাটানো' (cut)। সুতরাং চেষ্টা করিলে যে নামধাতুর চলন লেখ্য ভাষায় পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইবে না তাহা বোধ হয় না।

উচ্চারণ-প্রযত্নে শৈথিল্য আর শব্দের অপপ্রয়োগ উভয়ই সমান ভাবে ভাষার অবনতির সূচনা করে। প্রাচীন ভারতে আর্য্যেরা যখন প্রথম অনার্য্যদিগের নিকট সম্পর্কে আসেন তখন সেই নৈকট্যের ফলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য (বৈদিক) ভাষার দ্রুত অবনতির আশঙ্কা হইয়াছিল। তখন যাঁহাদের উপর সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার ভার ছিল, সেই ঋষি বা শিষ্টেরা শিক্ষা-প্রণালীর কঠোরতার দ্বারা ভাষাকে ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে অভূতপূর্ব্ব রূপে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। উচ্চারণের বিশুদ্ধিতা তখনকার দিনের ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। শিক্ষার্থীকে তখন উপদেশ দেওয়া হইত—তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ ('অতএব ব্রাহ্মণ শব্দের অপপ্রয়োগ বা উচ্চারণে শৈথিল্য করিবে না')। আমাদের শিক্ষার্থীদিগেরও এই উপদেশ কঠোরভাবে পালন করিয়া চলিবার দিন আসিয়াছে।

"মূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত।"—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রাচীন বঙ্গের পুষ্করণা-জনপদ

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'-তে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম অনুশাসন, সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী-লিপিময় 'সংবঙ্গীয় লেখ'-এর সংবাদ দিবার কালে শুশুনিয়া পাহাড়ের গাত্রে উৎকীর্ণ লেখের উল্লেখ করা হইয়াছে। শুশুনিয়া বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এই লেখটী প্রত্নবিৎ-সমাজে সুপরিচিত হইলেও, এবং বাঙ্গালা পুস্তকে ও পত্র-পত্রিকায় ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইলেও, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর রাখেন না। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের গুপ্ত-যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় তিন ছত্রে পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ এই ক্ষুদ্র লেখটী। অগ্নিশিখাযুক্ত বহু-অর-বিশিষ্ট বিষ্ণুচক্রের নীচে দুই পংক্তিতে উৎকীর্ণ আছে—'পুষ্করণাধিপতিমহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ'। বিষ্ণুচক্রের দক্ষিণ-ভাগে উৎকীর্ণ আছে—'চক্র_স্বামিনে ধোসগ্রামোতিসৃষ্টঃ' (অর্থাৎ 'চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর জন্য ধোসগ্রাম উৎসর্গীকৃত হইল'; এই পাঠ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহাশয়ের প্রদত্ত; মূল লেখটীতে কয়েকটী বর্ণাশুদ্ধি আছে;—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্যরূপে পড়িয়াছিলেন—এই ছত্রের পাঠ, তাঁহার মতে, - 'চক্র_স্বামিনো দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ', অর্থাৎ 'চক্রস্বামীর দাস বা সেবকপ্রধানকর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত'। এসম্বন্ধে দ্রষ্টব্য *Epigraphia Indica*, **XIII, p. 133**; ***Archæological Survey, Annual Report for*** **1927-28, p. 188.**)। এই প্রাচীন লেখের আশে পাশে পরবর্ত্তী যুগের অক্ষরে উৎকীর্ণ কয়েক ছত্র অন্য লেখা আছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের উৎকীর্ণ লিপি—পুষ্করণ বা পুষ্করণার রাজা সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা। এই 'পুষ্করণ' বা 'পুষ্করণা' কোথায়? স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় (*Epigraphia Indica*, **XII, pp. 317**) অনুমান করিয়াছিলেন যে এই পুষ্করণা রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যে অবস্থিত 'পোখরণ' নগর। শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্ম্মাকে, দিল্লী কুতব-মিনার মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রোথিত লৌহ-স্তম্ভের লিপিতে যে চন্দ্র-রাজার কথা আছে সেই চন্দ্ররাজার সঙ্গে এবং রাজপুতানা ও মালবের বর্ম্ম-বংশীয় অলব্ধপরিচয় সম্ভাব্য এক চন্দ্রবর্ম্মার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতানা পোখরণ হইতে এতদূরে অত প্রাচীনকালে একজন রাজার বিষ্ণুচক্র লিপি উৎকীর্ণ করণের কোনও কারণ দেখা যায় না। ঐ সময়েই গুপ্তসম্রাটগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল—দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের চন্দ্ররাজা, যিনি বাহ্লীক হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটগণেরই একজন, হয় তো বা তিনি গুপ্তবংশীয় প্রথম বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই হইবেন, এইরূপ অনুমানও করা হইয়াছে; এবং সেই অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে। যাহা হউক, আমাদের এই 'পুষ্করণা' শুশুনিয়া-পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী রাঢ় অঞ্চলেরই কোনও স্থান হইবে, এইরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সরকারী প্রত্নানুসন্ধান বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহাশয় অন্যতম—ইঁহার মতে, বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত 'পোখরনা' (বা 'পখরনা') গ্রাম-ই প্রাচীন 'পুষ্করণা'। এই মত আমি আমার *Origin and Development of the Bengali Language* (১৯২৬ সালে প্রকাশিত) পুস্তকে গ্রহণ করিয়াছি। 'পোখরনা' দামোদর নদের দক্ষিণতীরবর্ত্তী, ঈস্ট্-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের রাজবাঁধ ষ্টেশনের দক্ষিণে দামোদরের উত্তরে অবস্থিত আমলাজোড়া গ্রামের অপর পারে অবস্থিত, এবং শুশুনিয়া পাহাড় হইতে ২৫।২৬ মাইল পূর্ব্বে। 'পুষ্করণা' হইতে 'পোখরনা' নামের উদ্ভব অতি সহজেই হইয়াছে।

অনুমান হয়, পুষ্করণার এই রাজা চন্দ্রবর্ম্মা গুপ্ত-সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগ অশোক-স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে যে বিজিত চন্দ্রবর্ম্মা নামক রাজার উল্লেখ আছে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের পুষ্করণা-জনপদের রাজা, আমাদের শুশুনিয়া পাহাড়ের চন্দ্রবর্ম্মা হওয়াই সম্ভব।

বাঁকুড়া জেলার কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ কালে বিগত ২১শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) আমার পোখরনা গ্রামে যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও আমি, আমরা উভয়ে এখন চণ্ডীদাস-পদাবলী সম্পাদনে নিযুক্ত। এই কার্য্য-সম্পর্কে আমাদের বীরভূম-নান্নুর যাইতে

হইয়াছিল, এবং বাঁকুড়া-ছাতনার সহিত চণ্ডীদাসের সংযোগের কথা বিদ্যমান থাকায়, ছাতনা পরিদর্শন করিয়া আসাও আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাঁকুড়ার কতকগুলি গ্রামে বৈষ্ণব পদের পুঁথি অন্বেষণ করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পোখর্‌না গ্রামে গিয়া গ্রামটী দেখিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে পোখর্‌না প্রাচীন পুষ্করণাই বটে। পোখর্‌নায় স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও পার্শ্ববর্ত্তী পলাশডাঙ্গা গ্রামের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত হরেকৃষ্ণবাবু ও আমি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখি। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, বহুপূর্ব্বে এই গড়ে এক স্বাধীন রাজা বাস করিতেন। গড়ের স্থানে কতকগুলি উঁচু ভিটি আছে, সেগুলি খনন করিয়া দেখিবার যোগ্য। গড়খাইগুলি এখন পুষ্করিণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটী পুষ্করিণীতে সিন্দুকের আকারে সাজানো বৃহদাকার কতকগুলি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছিল। এখনও এই 'গড়ের ডাঙ্গা' হইতে মাঝে মাঝে মূর্ত্তি আদি নাকি পাওয়া যায়, তবে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলিকে এতাবৎ কেহ রক্ষা করে নাই; এবং এতদ্ভিন্ন মোহর ও অন্যান্য মুদ্রাও নাকি পাওয়া গিয়াছে। পোখরনায় কতকগুলি গ্রাম্য দেবতার স্থানে, গাছের তলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অযত্নে রক্ষিত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তির ভগ্নাংশ পড়িয়া রহিয়াছে এই সব ভগ্ন মূর্ত্তি স্থানটীর প্রাচীনত্বের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। আমরা সূর্য্য, গণেশ, অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী, বিষ্ণু, মস্তকোপরি নাগের ফণযুক্ত কোনও দেবতার, এবং জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই গ্রামে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে. সে গুলি বিশেষ লক্ষণীয়। একটী পোড়ামাটীতে উৎকীর্ণ নারী মূর্ত্তি—এটী কুষাণ যুগের, বা এমন কি তৎপূর্ব্বকালের হইতে পারে। আর একটী প্রস্তরময় ক্ষুদ্র সিংহবাহিনী দেবী মূর্ত্তি, মাথাটী ভাঙ্গা, মূর্ত্তিটীর বাম ক্রোড়ে একটী শিশু, বাম পার্শ্বে একটী উপবিষ্ট মূর্ত্তি ও একটী অস্পষ্ট পক্ষিমূর্ত্তি; এই উপবিষ্ট দেবীমূর্ত্তিটীর ভঙ্গী গুপ্তরাজগণের স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত সিংহবাহিনী দেবীর মূর্ত্তির মত, এবং পক্ষিমূর্ত্তিটী গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় অঙ্কিত গরুড়ধ্বজের গরুড়ের অনুরূপ; সুতরাং মূর্ত্তিটী গুপ্ত যুগের হইতে পারে। তৃতীয় মূর্ত্তিটী হইতেছে উপবিষ্ট বীণাবাদিনী চতুর্ভুজ সরস্বতী মূর্ত্তি, ক্ষুদ্র আকারের, পাথরে মোটা হাতের কাজে তৈয়ারী; এই মূর্ত্তিটী বিশেষ রহস্যময়,—ইহার রচনারীতি দুই চারিটী বিষয়ে যবদ্বীপের দেবমূর্ত্তি-গঠন প্রণালীর অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। এই মূর্ত্তিগুলি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ কতকগুলি বিশেষজ্ঞকে দেখানো হইয়াছে, এবং ইহাঁরা সকলেই এই গুলির প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (এই মূর্ত্তিগুলি লইয়া ভবিষ্যতে একটী সচিত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল)। এইরূপ মূর্ত্তি, ইহাদের প্রাপ্তি-স্থান পোখরনার প্রাচীনত্বের ও নানা দিক দিয়া এই স্থানের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন পোখরনার দক্ষিণে 'চাঁদাই' গ্রাম, 'সিঙ্গাই' জোড়, এবং 'চকাই' গ্রাম প্রাচীন রাজা চন্দ্রবর্ম্মা ও সিংহবর্ম্মার এবং চক্রস্বামী বিষ্ণুর স্মৃতি বহন করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়—সম্ভবতঃ সিংহবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মার নাম অনুসারে 'সিংহাবতী' ও 'চন্দ্রাবতী' নামক স্থানের আধুনিক পরিণতি 'সিঙ্গাই' ও 'চাঁদাই', এবং হয় তো চক্রস্বামী বিষ্ণুর মন্দির ছিল বলিয়া তৃতীয় স্থানটীর নাম 'চক্রাবতী' বা 'চকাই'।

পুষ্করণা-পোখর্‌নার স্থান বাঙ্গালীর ইতিহাসে বিশেষ গৌরবের। এখন হইতে পনের শত বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার এই অধুনা-অখ্যাত স্থানটীতে যে একটী স্বাধীন বঙ্গীয় রাজার রাজধানী ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। চক্রস্বামী বিষ্ণুর পূজা এখানে প্রচলিত ছিল—চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে এই অধুনা অরণ্য-সঙ্কুল প্রদেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রনগরের সংবাদ আমরা পাইতেছি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের 'সংবঙ্গীয় লেখ' হইতে; তাহার পরে, বঙ্গদেশের আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখ করিতে হয় পুষ্করণা-পোখর্‌নাকে। পোখরনা সেই হিসাবে বাঙ্গালী জনগণের তীর্থস্থান হইবার যোগ্য। পোখরনায় পূর্ণভাবে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমাদের জাতির ও সভ্যতার উৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য এই স্থানেই যে ভূগর্ভের মধ্যে নিহিত আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

রাজমোহনের স্ত্রী

-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[মুদিতচক্ষু ব্যক্তি মাত্রই নিদ্রিত নয় ; প্রস্তর-প্রাচীরের মত মৃত্তিকা-প্রাচীরেরও কান থাকে ।]

আসুন পাঠক, আমরা মাতঙ্গিনীর নিকট ফিরিয়া যাই।* স্বামী কর্ত্তৃক কঠোর ভাবে লাঞ্ছিত হইবার পর সেই যে তাহার পিসশাশুড়ী তাহাকে তাহার শয়ন-কক্ষে টানিয়া আনিয়াছিলেন তখন পর্য্যন্ত সে বাহিরে আসে নাই। দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া সে পড়িয়া ছিল। বৃদ্ধা যথা সময়ে নৈশ আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এবং ননদী কিশোরীর সকল অনুরোধ-উপরোধই ব্যর্থ হইয়াছিল, সে বাহিরে আসিয়া খাইতে বসে নাই। তাঁহারা শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের দুশ্চিন্তা লইয়া তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দিয়াছিলেন

শয্যায় শুইয়া শুইয়া মাতঙ্গিনী ভাবিতেছিল - এই ভাবেই তাহাকে সারা-জীবন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সে জানিত তাহার স্বামী সে রাত্রে আর তাহার সহিত দেখা করিবে না—তাহার প্রতি কুপিত হইলে এরূপ করাই তাহার স্বভাব ! ইহাতে সে কতকটা খুসীই ছিল, কারণ, একা থাকিতে পাইলে সে নিজের ভাবনা চিন্তা লইয়া নিরুপদ্রবে থাকিবে।

রাত্রি গভীর হইলে বাটীর সকলে একে একে শয়ন করিতে গেল। ঘরে ও বাহিরে গভীর শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর কক্ষে প্রদীপ ছিল না, গাঢ় অন্ধকারে কক্ষ আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ক্ষুদ্র গবাক্ষের ফাটল দিয়া খানিকটা প্রদীপ্ত চন্দ্র-কিরণ ঠাণ্ডা মাটির মেঝের উপরে আলোর একটি রেখা টানিয়া দিয়াছিল। উপাধান হইতে ঈষৎ উর্দ্ধে আপনার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপে বক্ষদেশ হইতে অঞ্চলখানি কোমর অবধি টানিয়া সেই চন্দ্র-কিরণ-রেখার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মাতঙ্গিনীর স্মৃতিপথে তাহার শৈশবের কথা উদিত হইল—যখন সে ভাবনা-বিরহিত লঘু শিশু-চিত্ত লইয়া সায়াহ্ন সূর্য্য-করে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত। হায়রে শৈশব ! স্নেহের হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া খোলা আকাশের তলে শুইয়া স্নিগ্ধ রশ্মি-বিকীরণকারী, সীমাহীন নীল আকাশ-সমুদ্রে সন্তরমান রৌপ্য গোলকের দিকে চাহিয়া কাটানো শৈশব ! শিশুমনের প্রিয় কত কাহিনীই যে তাহারা পরস্পরকে শুনাইত, অথবা স্নেহময়ী ঠাকুরমার মুখে শুনিত—কি সে একাগ্রতা আর আনন্দ ! এই আট বৎসরে কত পরিবর্ত্তনই যে ঘটিয়াছে ! সেই উচ্চ কলকণ্ঠ কোথায় মিলাইয়াছে, যে মুখগুলিকে সে ভালবাসিত, যাহাদের স্মৃতি তাহার অন্তরে সযত্নে রক্ষিত ছিল, সে গুলি পর্য্যন্ত যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই স্মিত হাসি, সেই স্নেহবিজড়িত কণ্ঠস্বর—হায়রে, সেই হাসি দেখিবার জন্য ও সেই স্নেহস্বর শুনিবার জন্য আজ সে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে পারে। তাহার অন্তরের প্রেম-প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত হইতে চায় কিন্তু পাষাণের অন্তরায় ! উৎসমুখেই সেই স্বর্গ-মন্দাকিনী-ধারা কাহার রূঢ় নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া গেছে। বেদনাময় একটি স্মৃতি—বেদনাময় তবু এত মধুর যে বারম্বার সেই কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগে—তাহার অতীত সৌভাগ্যের সহিত বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের সংযোগ রক্ষা করিতেছিল। সেই স্মৃতি সে ভুলিতে চায় কিন্তু পারে কই ? ভাবিতে ভাবিতে কনকের কথা তাহার মনে পড়িল ; তাহার কাছাকাছি সেই এখন একমাত্র প্রাণী যে তাহাকে ভালবাসে। ছলচাতুরীহীন সরল কনক ; শুধু তাহাকেই সে তাহার মনের গোপন স্মৃতির কথা নিবেদন করিয়াছে। এইটুকু ছাড়া মাতঙ্গিনীর জীবনের ইতিহাস, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের ইতিহাস মাত্র। মাতঙ্গিনী এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই কাঁদিতেছিল যে এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই।

গ্রীষ্মের গুমোট গরম ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, মাতঙ্গিনী শয্যা ছাড়িয়া জানালাটা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিল। কিন্তু জানালা খোলা হইল না—অতিমৃদু ও সতর্ক পদক্ষেপ-শব্দ সহসা তাহার কর্ণগোচর হইল। ঘরের বাহিরের শব্দ

---

* প্রথম তিন পরিচ্ছেদের কোনো একটিতে রাজমোহন কর্ত্তৃক মাতঙ্গিনীর লাঞ্ছিত হওয়ার কথা ছিল।

হইলেও দূরের নহে, যে জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়াছিল ঠিক যেন তাহার পশ্চাতেই শব্দ হইতেছিল। মেটে ঘরের জানালা যেমন সাধারণত হয় এই জানালাটি সেই ধরণেরই ছিল—খুব ছোট, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন আর দুই ফুটের বেশী হইবে না, এবং ঘরের মেঝে হইতে ইহার উচ্চতাও দুই ফুটের অধিক নহে।

মাতঙ্গিনী থামিল, থামিয়া জানালার ফাটল দিয়া বাহিরে দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু অনতিদূরে একসারি গাছ এবং দূরে চন্দ্রালোকিত আকাশের পটভূমিতে অপর কতকগুলি গাছের আন্দোলিত শীর্ষদেশ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইল না।

পদশব্দ যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেখানে বা তাহার কাছাকাছিও কোনও পায়ে চলার পথ ছিল না; মাতঙ্গিনী ভীত হইল, পাষাণ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া আবার সেই শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিল। পদধ্বনি তাহার অত্যন্ত নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। মাতঙ্গিনী শুনিতে পাইল কাহারা অতি মৃদুস্বরে যেন কানে কানে কথা কহিতেছে; কথোপকথন-নিরতদের মধ্যে একজনের কণ্ঠ তাহার স্বামীর কণ্ঠ বলিয়া চিনিতে পারাতে মাতঙ্গিনীর কৌতূহল ভয়ানক বাড়িয়া গেল; ওই কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্বরে কথা বলিতেছিল। মাতঙ্গিনী ও ইহাদের মধ্যে তখন একটি সামান্য মেটে দেওয়াল ছাড়া অন্য ব্যবধান ছিল না বলিয়া মাতঙ্গিনী একেবারে স্পষ্ট সব কথা শুনিতে না পাইলেও বক্তাদের উদ্দেশ্য বুঝিবার মত সব কিছুই শুনিতে পাইতেছিল।

পরস্পর কিঞ্চিৎ বাক্যবিনিময় হওয়ার পর একজন বলিল, অত জোরে কথা বলছ কেন? তোমার বাড়ীর লোকে শুনতে পাবে যে!

মাতঙ্গিনী গলার আওয়াজে বুঝিল, রাজমোহন বলিতেছে—এত রাত্রে কেউ জেগে নেই।

—আচ্ছা দেখ, দেয়ালের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে কথা বললে হয় না? যদি কেউ জেগে থাকেও আমাদের কথা সে শুনতে পাবে না—অপর ব্যক্তি এই মন্তব্য করিল।

রাজমোহন বলিল, না, হে না, তোমার কথা যদি সত্যিও হয়, কেউ যদি জেগেও থাকে তাহলে আমরা এই জায়গাটাতেই সব চাইতে নিরাপদে আছি—দেয়ালের আর চালের আড়ালে বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ আমাদের দেখ্‌তে পাবে না, জানালার ফাটল দিয়েও এখানটা দেখা যায় না। এত রাত্রে যদি কেউ বাইরে আসে, তাহলেও আমাদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অন্যজন উত্তর দিল, ঠিক। আচ্ছা, এ ঘরটায় কে থাকে?

রাজমোহন বলিল, সে খোঁজে তোমার কাজ কি?—কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, তোমাকে বলতে বাধা নেই, এটা আমার শোবার ঘর, আমার স্ত্রী ছাড়া এঘরে কেউ নেই।

অন্যজন প্রশ্ন করিল, তোমার স্ত্রীতো জেগে থাকতেও পারে!

—ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়ই, তবু দেখে আসি। তুমি এখানেই দাঁড়াও।

মাতঙ্গিনী শুনিল, পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে যাইতেছে। মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার উপর উঠিল—আঁচলের খসখস শব্দও শোনা গেল না; তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘুমন্ত লোক যে ভাবে শয়ন করে ঠিক সেইভাবে শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাজমোহন তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার অবধি আসিয়া মৃদুভাবে তাহাতে আঘাত করিল, কেহ দরজা খুলিল না। ধীরে ধীরে সে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিল। তাহাতেও কোন ফল হইল না। রাজমোহন বুঝিল, মাতঙ্গিনী নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর রাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকাও অসম্ভব নয় ভাবিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিবে স্থির করিল। রাগের কারণ তো যথেষ্ট ঘটিয়াছে। রাজমোহন রান্নাঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং সেই প্রদীপ হাতে ফিরিয়া শোবার ঘরের দরজার পাশে প্রদীপ নামাইল, তারপর এক পায়ের সাহায্যে দরজার একপাল্লা চাপিয়া ধরিয়া এক হাত দিয়া অন্য পাল্লাটি সজোরে টানিতেই দুই পাল্লার মাঝখানে খানিকটা ফাঁক হইল। রাজমোহন সেই পথে আঙুল ঢুকাইয়া পরীক্ষা করিল, কাঠের বড় হুড়কো, ছোটখিল এবং লোহার ছিটকিনি সবগুলিই বন্ধ আছে কিনা। শুধু কাঠের বড় হুড়কোটিই লাগানো ছিল; রাজমোহন বুঝিল যে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ঘরে ঢুকিতে দিবার জন্যই মাতঙ্গিনী খিল সম্বন্ধে সাবধান হয় নাই—বাহির হইতে হুড়কো খুলিয়া ফেলা যায়। রাজমোহন

দুইটি আঙুল ঢুকাইয়া হুড়কো উপরে তুলিয়া আঙুল সরাইয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল এবং দীপহস্তে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

রাজমোহন দেখিল, তাহার স্ত্রীর দেহ শয্যায় এলান, সে ঘুমাইতেছে। সে কয়েকবার এমন মৃদুস্বরে মাতঙ্গিনীর নাম ধরিয়া ডাকিল, ঘুমাইয়া থাকিলে সে যাহাতে না জাগিয়া পড়ে; অতি মধুর কণ্ঠে ডাকিল। রাগ বা অভিমানের বশে যদি সে চুপ করিয়া থাকে, মিষ্টস্বর শুনিয়া রাগ অভিমান ভুলিয়া হয়তো সে জবাব দিবে। মাতঙ্গিনী তবুও নীরব, তাহার নিঃশ্বাস ঘন হইয়া পড়িতেছে। মাতঙ্গিনীর ঘুমের ভাণ করিবার কোনই কারণ রাজমোহন ভাবিয়া পাইল না, সে তাহার ঘুম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া যে কৌশলে দরজা খুলিয়াছিল ঠিক সেই কৌশলে আবার তাহা বন্ধ করিল। তারপর, প্রদীপ নিবাইয়া বাড়ীর চারিদিকে একবার টহল দিতে দিতে প্রত্যেক ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া নিদ্রিতদের নাম ধরিয়া ধীরে ধীরে ডাকিয়া কাহাকেও জাগ্রত না দেখিয়া তাহার সঙ্গীর কাছে ফিরিয়া গেল।

স্বামীর পদশব্দ মিলাইতে না মিলাইতে মাতঙ্গিনী শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা শুনিল।

কোন দিক দিয়া ভয়ের কোনও আশঙ্কা নাই জানিয়া রাজমোহনের অজ্ঞাত সঙ্গী কহিল, তুমি তাহ'লে এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ?

বিশেষ রাজি নই—রাজমোহন জবাব দিল। অবিশ্যি এতদূর এগিয়ে সাধুগিরি ফলাবার মতলব আমার নেই কিন্তু—লোকটাকে আমি পছন্দ না করলেও সে আমার অনেক উপকার করেছে।

ধূর্ত্ত আগন্তুক প্রশ্ন করিল, তাহলে তাকে তোমার ভাল লাগে না কেন?

রাজমোহন বলিল, কেন? ভাল সে আমার অনেক করেছে বটে, কিন্তু মন্দও কম করেনি, সম্ভবতঃ ভালর চাইতে মন্দই করেছে বেশী।

—তাহলে আমাদিকে সাহায্য করছ না কেন?

—করব কিন্তু আমি যা চাইব তা আমাকে দিতে হবে। আমি এ পাপ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে চাই কিন্তু অন্যত্র গেলে আমার দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটা ভার হবে। সুতরাং যাতে অন্য জায়গায় উঠে গেলেও আমার বিপদ হবে না সেই পরিমাণ টাকা আমার চাই। তোমাদের সাহায্য করলে তোমরা যদি টাকাটা পাইয়ে দাও আমি রাজি আছি।

আগন্তুক বলিল, তোমার কত চাই, বল।

রাজমোহন জবাব দিল, আমাকে কি করতে হবে তা জানতে পারলে আমার দাবীর কথা বলতে পারি।

—ইতিপূর্ব্বে একবার যা করেছ তাই করতে হবে—তার অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু সরাতে হবে, এই কাজে তোমার সাহায্য দরকার। এবারে নগদ টাকা ছাড়া আর যা কিছু পাব সব তোমার জিম্মায় রেখে দেব—কিন্তু কাজটা আজ রাত্রেই করা চাই।

রাজমোহন বলিল, বুঝতে পারছি—কিন্তু আমার সাহায্য তোমাদের কতখানি দরকার সে খবরটা আমার কাছে লুকুলে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হবে না। অমন ডাকসাইটে ধনীর ঘরে অমন ব্যাপার করার ফল কি দাঁড়াবে বুঝতেই পারছ—সম্পত্তির খোঁজে কি ভয়ঙ্কর খবরদারি আর খানা-তল্লাসী যে চল্‌বে! তোমরা চাইছ এমন একজন লোক যে ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপহৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতদিন না তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে তার উপস্বত্ব ভোগ করতে পার—এমন লোক হওয়া চাই যে একেবারেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না—আমাকে পাকড়াও করেছ ঠিকই, কারণ তোমরা জান একাজ আমার মত আর কেউ করতে পারবে না, আমাকে কেউ সহজে সন্দেহ করবে না, তাছাড়া ওসব জিনিষ লুকিয়ে রাখবার মত জায়গাও আমার আছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমার দাবী তোমাদের কাছে বেশী মনে হবে।

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে আগন্তুক একজন ডাকাত—সে বলিল, বুঝতেই যখন পারছ, একটু হিসেব করে বল।

রাজমোহন বলিল, আমি দর কষাকষি করতে চাই নে—তোমরা সম্পত্তি বিক্রী করে যা পাবে তার চার ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে হবে।

দস্যু রাজমোহনকে ভাল রকমেই চিনিত, সে বুঝিল, রাজমোহন অবস্থা বুঝিয়া দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছে

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, আমার কথা যদি শুনতে চাও, আমি রাজি—কিন্তু অন্যদের মতও তো নেওয়া দরকার। অবিশ্যি তুমি জান আমার কথায় তারা অমত করবে না।

রাজমোহন বলিল, তা আমি জানি, কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে; মাল সরিয়ে ফেলবার আগে, আন্দাজে একটা দাম ধরে আমাকে নগদ তার একের চার ভাগ দিতে হবে। অবিশ্যি, বিক্রী করতে গিয়ে যদি দাম কম পাও, আমি টাকা ফেরৎ দেব, বেশী পেলে, তোমরা বাকীটা ধরে দেবে।

বেশ বেশ, তাতে আর কথা কি, কিন্তু আমাদের আর একটা সর্ত্ত আছে—আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

—তার জন্যে আলাদা ইনাম দিলে নিশ্চয়ই করব।

—ইনাম পাবে বৈকি। মাধব ঘোষের সম্পত্তি আমরা নিজেদের জন্যে চাই, অন্য একজনের আর একটা ফরমাস আছে।

কৌতূহলী রাজমোহন প্রশ্ন করিল, কি আবার?

—মাধব ঘোষের খুড়োর উইল।

রাজমোহন সামান্য বিচলিত হইল। শুধু বলিল, হুঁ।

হ্যাঁ, দাম আমরা এর জন্যে দেব। এই উইল সে কোথায় রাখে তোমাকে বলতে হবে।

—আমি নিজেও ঠিক জানি না, তবে একটা হাতবাক্স থেকে তার জরুরী কাগজপত্র বের করতে আমি দেখেছি—কিন্তু সেটা কোথায় থাকে আমি জানি না, অন্য কোনও বাক্সে, কি সিন্দুকে কিম্বা আলমারীতে হয়তো সেটা থাকে। আমি ঠিক জানি না—কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এটা কার ফরমাস বল তো?

—তা বলতে আমরা বাধ্য নই।

—আমাকেও বলবে না?

—কাউকে না।

—মথুর ঘোষ, নয়?

—হতে পারে, না হতেও পারে, আচ্ছা, বাক্সটা কি রকমের?

—আমাকে দিচ্ছ কি?

—কি চাও তুমি?

—নগদ দু'শো টাকা।

—দুটো কি তিনটে কথার জন্যে দু'শো টাকা? বড্ড বেশী। কিন্তু আমাদের কাজও ত ঢের—দস্যু যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, সমস্ত রাত ধরে একটা কাগজের টুকরো খোঁজা। বাক্সটা নিশ্চয়ই শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকে আছে; বাক্সটা দেখতে কেমন জানতে পারলে আর বের করা কঠিন হবে না। তোমার সঙ্গে ছ্যাঁচড়ামি করা বৃথা—বেশ, তোমার কথাতেই রাজি।

রাজমোহন বলিল, বাক্সটা হাতির দাঁতের, ডালার ওপর সোনা দিয়ে লেখা তিনটি ইংরেজি অক্ষর—তার নামের প্রথম অক্ষর তিনটি।

দস্যু বলিল, সবই তো পাকাপাকি কথা হল। এখন তুমি আমার সঙ্গে এস, দলের লোকের সঙ্গে কথা বলা যাক। আমরা একটা জায়গা ঠিক করে দেব, তুমি সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এস, আর দেরী করার সময় নেই, চাঁদ ডুববার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করতে হবে। গ্রীষ্ম কালের রাত—বড্ড শীগ্‌গির ফুরিয়ে যায়।

এই বলিয়া দস্যু ও তাহার সহকারী ধীরে ধীরে দেয়ালের ছায়ার আড়াল ছাড়িয়া পরস্পর কিছু ব্যবধান রাখিয়া বনের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অচিরকাল মধ্যে এক অন্ধকার স্থানে আসিয়া মিলিত হইল। এদিকে মাতঙ্গিনী বিস্ময়ে ও আতঙ্কে বিমূঢ় হইয়া মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

আর একদিক

একজন ইংরেজ মহিলা রোমে প্রবাস যাপন করবার সময় ৩৫ পাউণ্ড দাম দিয়ে একটা চমৎকার ঘড়ি খরিদ করেন। লণ্ডনে ফিরে তিনি একজন জহুরীর কাছে তার দাম কষতে দেন। জহুরী দেখে শুনে বলে, ঘড়িটার জন্যে মেরে কেটে পাউণ্ড খানেক দেওয়া যায় কিন্তু আরও কমে হলে ভাল। মহিলাটি চটে মটে সরাসরি মুসোলিনীকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, যে জাতের মধ্যে এমন সব জোচ্চোর এখনও আছে তাদের শাসন করবার বড়াই তিনি যেন না করেন। হপ্তা দুইয়ের মধ্যে খোদ মুসোলিনীর কাছ থেকে এক চিঠি—তিনি ঘড়িওয়ালার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে মহিলাটির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। সঙ্গে ৩৫ পাউণ্ডের একটি চেকও ছিল। তারও দুহপ্তা পরে মহিলাটি ইটালী থেকে আর একটা চিঠি পেলেন—যে জোচ্চোরটা তাঁর কাছে ঘড়ি বেচেছিল চিঠি তার। তাতে লেখা ছিল যে গবর্ণমেণ্ট তার দোকান বন্ধ করে দিয়ে তার জরিমানা করেছে এবং তার ছমাসের জেল হয়েছে। মুসোলিনীর কাণ্ড দেখে মহিলাটি অবাক।

বাঙালীত্বের স্বরূপ

—শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

১

প্রাদেশিক অথবা সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধই ভারতবর্ষের ঐক্যের পথে প্রধান বাধা, একথা আজিকার দিনে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রদেশ ও সম্প্রদায়ের দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস এখন পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় নেতা দেখাইয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে না। সত্য কথা বলিতে কি, ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের মন এখনও বড়ই আস্থা ও আশ্বাসহীন। তাই দেখিতে পাই, ইংরেজ রাজপুরুষেরা যখন বলেন ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন আমরা ভারতীয় ঐক্যের যে ছবি আঁকি তাহা এত বেশী আধ্যাত্মিক হইয়া দাঁড়ায়, যে উহার দ্বারা ভারতবর্ষের আধিভৌতিক অনৈক্যই প্রায় প্রমাণ হইতে বসে, ইংরেজদের যুক্তিতর্কের মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের নিজেদেরই বিশ্বাসের অভাব। আমাদের জাতীয়ত্বের প্রকৃত অবলম্বন ভারতবর্ষ না প্রদেশ, এ-বিষয়ে আমরা এখনও দ্বিধাহীন হইতে পারি নাই। সেজন্য আমরা ভারতীয় ঐক্যের যে ধারণা করি তাহা বড় বেশী ফেডেরালিজ্‌ম্‌পন্থী হইয়া পড়ে, জাতীয়ত্বের যে আদর্শ পোষণ করি তাহাও বড় বেশী প্রদেশঘেঁষা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা ভাবি এবং বলিও, ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল ধারাই এই—এত বড় একটা দেশ, এতগুলি জাতি-উপজাতির একটা সমষ্টি, এতগুলি ভাষা, এতগুলি ধর্ম্ম কখনও জার্ম্মেনী বা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের মত নিবিড় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না; প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ভারতবর্ষে থাকিবেই; কি সংস্কৃতিতে, কি ভাষায়, কি রাষ্ট্রে ফেডেরালিজ্‌ম্‌ই ভারতীয় ঐক্যের যথার্থ রূপ; ভারতবর্ষকে ইউরোপের একটি দেশবিশেষের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, উহার যথার্থ উপমাস্থল সমগ্র ইউরোপ; সুতরাং ফ্রান্স, জার্ম্মেনী বা ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ইউরোপে যেমন সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পূর্ণতালাভ করিয়াছে, আমাদের প্রদেশগুলির বৈশিষ্ট্যও তেমনি সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিবে; তবে উহার বাড়া যে জিনিষটা ভারতবর্ষে থাকিবে উহা ভারতীয় ঐক্যের অপেক্ষাকৃত নিবিড় একটা অনুভূতি—আমরা ইউরোপের দেশগুলির মত মারামারি কাটাকাটি করিব না, অতীতেও কখনও করি নাই; ইউরোপে লীগ অফ্ নেশ্যন্‌স্‌-এর প্রতিষ্ঠা সেদিন মাত্র হইয়াছে, উহার শত শত বৎসর পূর্ব্বে একটা ভারতীয় লীগ্ অফ্ নেশ্যন্‌স্ স্থাপন করিয়া আমরা জগৎকে বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটা পথ দেখাইয়া দিয়াছি; ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের উহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ; উহার অপেক্ষাও নিবিড় ঐক্যের প্রয়োজন আছে কি?

অবিরত আবৃত্তির ফলে এই ইউরোপীয় উপমায় বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রগত, সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত ফেডেরালিজ্‌ম্‌-এ আস্থা আমাদের যে কত দূর মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমি নেহ্‌রু কমিটির রিপোর্টের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভাষাই ভারতবর্ষকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করিবার ভিত্তি হওয়া উচিত এই মত প্রকাশ করিয়া নেহ্‌রু কমিটি বলিতেছেন,—

> "ভারতবর্ষের নূতন প্রাদেশিক বিভাগের মূলনীতি হিসাবে আর একটি জিনিসকেও মানিয়া লইতে হইবে। উহা ভারতবর্ষের কোন একটি বিশেষ জনসমষ্টির ইচ্ছা। আমরা আজ সমগ্র জাতির জন্য স্বাধিকারের দাবী করিতেছি। আমাদের পক্ষে কোন একটা প্রদেশের দাবীকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়—অবশ্য যদি এই দাবীর সহিত কোন মূলগত নীতি অথবা গুরুতর জাতীয় স্বার্থের বিরোধ না থাকে। কোন একটি বিশেষ স্থানের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস করে, যে তাহারা অন্য সকল জনসমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, কিংবা যদি তাহারা নিজেদের সংস্কৃতিকে কোন একটা বিশেষ পথে চালাইতে চায়, তাহা হইলে ঐতিহাসিক অথবা সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের অবর্ত্তমানেও তাহাদের এই বিশ্বাস এবং এই ইচ্ছাই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে দিবার সঙ্গত কারণ। এক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ অপেক্ষা মনোভাবের মূল্য অনেক বেশী।" (Nehru Report, p. 63. ইংরেজী হইতে অনূদিত।)

এই যুক্তি যদি ঠিক হয় তাহা হইলে ভারতীয় ঐক্যের আশা কি? কিন্তু সত্যই কি ইউরোপে ফ্রান্স বা জার্ম্মেনীর স্বতন্ত্র থাকিবার যে দাবী ও অধিকার আমাদের প্রদেশগুলিরও সেই অধিকার? সত্যই কি কেহ ইচ্ছামাত্র করিলেই একটা

রাষ্ট্র বা সমাজের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে? জাতিগত স্বাতন্ত্র্যে আস্থা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় চিন্তার একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম। ইউরোপও কখনও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নেহ্‌রু কমিটি যে যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই। আমার মনে হয় আমাদের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের মূলে কি আছে তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই বলিয়াই প্রাদেশিকত্ব সম্বন্ধে আমরা অতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীল। আমাদের প্রাদেশিক বিরোধের কারণ কি এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের স্থান কতটুকু, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকৃত রূপ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। নিজের প্রকৃত রূপ দেখা পরকে চেনা অপেক্ষা দুরূহ, তবুও আত্মপরীক্ষাই সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেজন্য অন্য কোন প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের দোষ ধরিবার পূর্ব্বে বাঙালীকে নিজের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অভিমানের মূলে কি আছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। বাঙালীর প্রাদেশিক অভিমান ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম উগ্র নয়। তাই বাঙালীত্বের স্বরূপের সন্ধান পাইলে, অন্য প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত অভিমানের প্রকৃত কারণ নির্ণয় হয়ত তত কঠিন হইবে না।

২

ফ্রান্স বা জার্ম্মেনীর নজীরে যাঁহারা আমাদের প্রদেশগুলির জন্য স্বাতন্ত্র্যের দাবী করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ইউরোপের জাতীয়ত্ববাদ ও আমাদের প্রাদেশিকতা এক জিনিষ নয়। ইউরোপের দেশগুলি শুধু যে রাষ্ট্রতন্ত্রেই স্বতন্ত্র তাহাই নহে, সেগুলি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, এক-কথায় সভ্যতারও অবলম্বন। ইউরোপীয় সভ্যতা মূলতঃ এক হইলেও উহার মধ্যে প্রত্যেকটি ইউরোপীয় জাতির স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কতকগুলি দান আছে। এই নিজস্ব কীর্ত্তির গৌরব ইউরোপের জাতীয়তাবাদের খুব বড় একটা কারণ। ভারত-বর্ষের সভ্যতায় প্রাদেশিকতার স্থান নাই। ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশের অধিবাসীরা যদি ভারতীয় সভ্যতাকে কিছু দিয়া থাকে তবে সে ভারতীয় হিসাবে, প্রাদেশিক জাতি হিসাবে নয়। ভারতবর্ষের স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, সাহিত্যে, ধর্ম্মসাধনায় বিভিন্ন প্রদেশের কতকগুলি নিদর্শন আছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাদেশিকত্বের কোন অনুভূতি নাই। গুজরাটের স্থাপত্য যে গৌড়ের স্থাপত্য হইতে ভিন্ন তাহা আমরা দেখিবামাত্রই ধরিয়া ফেলিতে পারি। কাংড়ার ছবি ও বাংলাদেশের পটে কি তফাৎ তাহা বুঝিতেও আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু এ সকল বৈষম্য একমাত্র দূরত্ব ও অপরিচয়ের ফল। উহাদিগকে বিশিষ্ট প্রাদেশিক সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিলে অন্যায় হইবে। তাই দেখিতে পাই, এক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাঠার মধ্যে ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোন জাতির মধ্যেই প্রাদেশিক গৌরবের কোন স্মৃতি নাই।

ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রদেশকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া আমাদের প্রাদেশিকত্ব জাতীয়ত্বে পরিণত হইতে পারে নাই। মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের অবস্থাও ভারতবর্ষের মতই ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে জাতীয়ত্ববাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের লোকেরা তাহাদের দেশকে যে-চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে আমরা আমাদের প্রদেশগুলিকে সে-চক্ষে কখনও দেখি নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনা করিয়া একজন ফরাসী লেখক বলিয়াছিলেন, আমেরিকানদের কাছে আমেরিকা আর্থিক স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ একটা সমাজ মাত্র, ইউরোপের লোকেরা তাহাদের মাতৃভূমিকে জীবনের অবলম্বন বলিয়া মনে করে। এই ফরাসীর লেখকের ভাষায়, ইউরোপীয়দের নিকট তাহাদের দেশ "a fountain-head of precious traditions which must be safeguarded and of moral and intellectual impulsions which must be sustained." আমাদের ক্ষেত্রে এখনও এই স্থান অধিকার করিয়া আছে অখণ্ড ভারতবর্ষ, আমাদের প্রাদেশিকতা স্থানীয় বৈচিত্র্য মাত্র।

আসল কথাটা এই, আমাদের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণ 'নিগেটিভ' একটা ব্যাপার। আমরা প্রাদেশিক হইয়াছি কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সকল ক্ষেত্রে আমাদের রাশ টানিয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়া, নিজেদের কোন অনু-প্রেরণায় নয়। এই ধরণের স্থানীয় বৈচিত্র্য সকল যুগে সব দেশেই দেখা গিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে উহা ফ্রান্সে ছিল, রুশ বিপ্লবের পূর্ব্বে উহা রুশিয়ায় ছিল। ইউরোপের সকল দেশেই এখন পর্য্যন্তও উহা অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। এই স্থানীয় বৈষম্যকে কাটাইয়া উঠিবার জন্য এই সকল দেশের শাসকদিগকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছে তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। ভারতীয় সভ্যতারও যদি যথোচিত কেন্দ্রমুখীন শক্তি থাকিত, ভারতীয় মনের জাতীয়তা বোধও যদি এত দুর্ব্বল না হইত, তাহা হইলে হয়ত এতদিনে আমাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের উচ্ছেদ হইয়া যাইত, নহিলে উহা প্রাদেশিক জাতীয়ত্বে পরিণত হইত। এ দুয়ের অভাবে আমাদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য লোপও হইতে পায় নাই, পূর্ণ-বিকশিতও হয় নাই, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে ঝুলিয়া আছে।

প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল বাংলা দেশ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। অবশ্য বাংলাদেশের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য একটু বেশী, কারণ বাংলাদেশ সর্ব্বদাই ভারতবর্ষের

কেন্দ্রীয় সভ্যতা হইতে একটু দূরে রহিয়াছে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বহুশত বৎসর ধরিয়া উত্তরাপথ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালীত্ববাদের কোন আভাস পাওয়া যায় না, কিংবা স্বতন্ত্র একটা বাঙালী সভ্যতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। ধীরচিত্তে দেখিলে মনে হয়, বাঙালীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই অগভীর।

১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের বাংলাজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশের একটা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের যুগ। এই যুগেও যে বাঙালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চায় নাই, চৈতন্যদেবের জীবনই তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ। বর্ত্তমানে অবশ্য আমরা মধ্যযুগের বাঙালী-জীবনকে বাংলা দেশের একটা খুব নিজস্ব জিনিষ বলিয়া দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে তাহার সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তৎকালীন সভ্যতার কোন মূলগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হইবে না। যাঁহারা খড়ের ঘরে, ছেড়া-কাঁথায় এবং চিত্রিত হাঁড়িকুড়িতে বাংলাদেশের অবিনশ্বর আত্মার সন্ধান পান, তাঁহারা সে-যুগের সংস্কৃতির গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে কি? এ-কথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে সমস্ত মুসলমান যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের জনসমষ্টি কোন নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বোধ করি চায়ও নাই। কি ভাষায়, কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্য ও আর্টে, কি আচার-ব্যবহারে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা অপভ্রংশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা লইয়াই তাহারা এই কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ব্যাপৃত ছিল। উহার ফলে আমরা যাহা পাইয়াছিলাম তাহা হিন্দু সভ্যতার একটা 'তদ্ভব' রূপ মাত্র —একটা folk civilization। এই গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, উহা কোন জাতীয়ত্ববাদের ভিত্তি হইতে পারে না, কার্য্যক্ষেত্রে হয়ও নাই।

এই ত গেল আমাদের অতীতের কথা। বর্ত্তমানের দিকে ফিরিলেও আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জীবনের যতগুলি মূল ধারা আছে, এক ভাষা ভিন্ন তাহার কোনটার মধ্যেই প্রাদেশিকতার স্থান নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাই প্রথমে ধরা যাক্। উহাতে দেশাচারের জন্য কতকগুলি বিভিন্নতা আছে সত্য, কিন্তু এই বাহ্যিক লক্ষণের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতিগত কোন বিভেদ দেখা যাইবে না। শতাব্দীব্যাপী ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজের চাকুরীর ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা একই ছাঁচে ঢালা হইতেছে। এই ঐক্য সাধারণ জনসমষ্টির মধ্যে আরও সুস্পষ্ট। মূলতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি উপজাতিই একই অর্দ্ধসভ্যতার স্তরে। কৃষকের জীবন বাংলাদেশে যেরূপ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সেরূপ। খাজনা আদায় করিয়া রাজার অংশ রাজাকে দিয়া বাকীটুকুর উপর অলস জীবন যাপন করা বাংলাদেশের গ্রাম্য ভদ্রলোকের যেমন পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি, পঞ্জাবের জমিদারেরও তাই, মান্দ্রাজের জমিদারেরও তাই। বিদ্যালোচনা করা আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি লোকের জীবিকা, তাঁহারা বাংলাদেশে যেমন কয়েকটি প্রাচীনম্মন্য অর্ব্বাচীন শাস্ত্র লইয়াই বসিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের অন্যত্রও তাহাই করেন। এই জীবনে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রামাণিক ভারতীয় কীর্ত্তির কোন স্মৃতি নাই, প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন্ত প্রাণেরও কোন সন্ধান পাই না। বস্তুতঃ যতটুকু শিক্ষা এবং যতটুকু আর্থিক সচ্ছলতার স্তরে উঠিলে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা উঠিতে পারে, ভারতবর্ষের বিরাট জনসমষ্টি এখনও সে জায়গায় উঠিতে পারে নাই। তাই অগণিত স্থানীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক কালচারের অভাব ও নিরন্নতার মধ্যে ভারতবর্ষ যে ঐক্যলাভ করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া দুরূহ।

৩

আমাদের অতীতের, এবং প্রথাগত ও উত্তরাধিকারলব্ধ জীবনযাত্রার কথা বলিলাম। এই টানার উপর যে দুইটি জিনিষ পোড়েনের মত আসিয়া পড়িতেছে, উহাদের সহিতও প্রাদেশিকতার কোন সম্পর্ক নাই। এই দুইটি জিনিষের একটি—প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মচর্চ্চা, সুকুমার কলায় প্রভাব, অপরটি—ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাত। নবাবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষ কি করিয়া আমাদের জীবনকে একটু একটু করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছে, সে-কথা এ-প্রবন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন; এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যে উহার গতিও কেন্দ্রমুখীন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার স্রোত কি করিয়া আমাদের প্রাদেশিক ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে, সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় সভ্যতা যে-রূপ ধরিয়া আমাদের নিকট দেখা দিতেছে তাহা প্রাদেশিক ত নয়ই, বোধ করি ইউরোপীয়ও নয়। উহা বিশ্বজনীন। আজিকার দিনে পশ্চিম হইতে যতগুলি তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত করিতেছে, সে-গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে,—(১) ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও আর্টের প্রভাব; (২) ইউরোপের বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিপ্লব-বাদ। ইহাদের প্রথমগুলির মধ্যে ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতির জাতীয়তার ছাপ আছে, দ্বিতীয়গুলি বিশ্বজনীন। এ-দুয়ের মধ্যে প্রথমগুলির অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর তরঙ্গগুলির প্রভাব আমাদের উপর অনেক বেশী এবং তাহার যুক্তিযুক্ত কারণও আছে।

নব্যবিজ্ঞান যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া মানবসমাজে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহার সহিত একমাত্র কৃষির উদ্ভাবনের পর যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহারই তুলনা চলিতে পারে। এ-যুগে যন্ত্রব্যবহার কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সকল জাতিকে এবং সকল দেশকেই উহা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার যন্ত্রব্যবহার সেই দেশের পক্ষেই তত সহজ যে দেশ আয়তনে যত বিস্তৃত, লোকসংখ্যায় যত মহান্, ধাতু ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, শস্য প্রভৃতিতে যত ঐশ্বর্য্যশালী। এই কারণে যন্ত্রপ্রবর্ত্তনের ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া একটা 'মেটেরিয়্যাল' বিশ্বজনীনতার সহিত পুরাতন জাতীয়ত্ববাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই সংঘাতে ইউরোপ—বিশেষ করিয়া ফ্রান্স—পুরাতনের, ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য (এবং রুশিয়াও বলা যাইতে পারে) নূতনের অবলম্বন। যে আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ইউরোপীয় সভ্যতার একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, তাহার লোপ হইয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় ইউরোপের লেখকেরা সাধারণতঃ নূতন 'মাস্'-সভ্যতা সম্বন্ধে খুব শ্রদ্ধাশীল ন'ন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ-কথাটা তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারিতেছেন না যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সহিত industrial universalism-এর বিরোধে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাঁহারা বুঝিয়াছেন ইউরোপকে বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে যে শুধু 'মাস'-সভ্যতা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই নয়, নিজেদের রাষ্ট্রীয়, সংস্কৃতিগত ঐ অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যও অনেকটা বর্জ্জন করিতে হইবে। ইউরোপে আজকাল যে ঐক্য-আন্দোলন দেখা দিয়াছে ইহাই তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি।

আর একদিক হইতেও ইউরোপের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি খোদিত হইতেছে। যন্ত্রব্যবহার যেমন বিশ্বজনীন, যন্ত্র-প্রবর্ত্তনের ফলে জগতে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহাও তেমনি বিশ্বজনীন। জাতীয়ত্ববাদের প্রবর্ত্তনের পর হইতে সেদিন পর্য্যন্ত ইউরোপ কতকগুলি জাতীয় সমাজে বিভক্ত ছিল। যন্ত্রযুগ মানবজাতিকে ধনী ও দরিদ্র, শ্রমিক ও শ্রমের ফল-উপভোগকারীতে ভাগ করিয়া শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আজ দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র সভ্যজগতকে দুইটি 'ক্লাসে' পরিণত করিতে চলিয়াছে।

যন্ত্রব্যবহার ও সামাজিক বিপ্লববাদ এই দুইটি বর্ত্তমান যুগের দুইটি দুর্দ্দমনীয় ধারা। এ-দুইটিকেই ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গ্রহণ করিতেছি এবং ইহার ফলে আমাদের দেশেও প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য লোপ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। অবশ্য এ-কথাটা সত্য যে এখন পর্য্যন্তও আমাদের সমাজে যন্ত্র বা সোশ্যালিজ্‌ম্-এর প্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু প্রতিদিনই এদেশেও industrialize করিবার আন্দোলন এবং জমিদার ও প্রজার, শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধ যেরূপভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় দশ বৎসর আগে হউক কিংবা দশ বৎসর পরে হউক ভারতবর্ষকেও রুশিয়ার মত বিরাট আয়োজনে যন্ত্রব্যবহার সুরু করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষের জনসমষ্টিকেও শ্রমিক ও ধনিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতে হইবে। এ-অবস্থা যদি কখনও হয় তাহা হইলে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ যে টিকিবে না তাহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার চিন্তা ছাড়িয়া দিলেও এ-পর্য্যন্ত ইংরেজীশিক্ষার ফলে আমাদের দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহাও প্রাদেশিক সভ্যতা সৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আজ একশত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া আমরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছি। উহার ফলে ভারতবর্ষে একটা 'রিণেসেন্স' দেখা দিয়াছে এ-কথা মাসিক সাপ্তাহিকের পাতা উল্টাইলেই চোখে পড়ে। বিনাতর্কে এই রিণেসেন্সের অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও যে জিনিষটা সর্ব্বাগ্রেই চোখে পড়ে তাহা এই,—এই রিণেসেন্সের ফলে আর যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, ভারতবর্ষের কোথাও একটা বিশিষ্ট বাঙালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বা গুজরাটী সভ্যতার সৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শের সুপরিচিত পুস্তক, *The Heart of Aryavarta*-এর সমালোচনা করিয়া বৎসর কয়েক আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বাংলা দেশের সভ্যতার ধারা সম্বন্ধে আমি বলি,—

"The undercurrent towards more and more complete Europeanization is stronger than Europeans and Indians alike choose to admit. While the English thinker sees the vision of

warring civilizations, and the Bengali poet dreams of a glorious future for his countrymen, who, he confidently prophesies, will establish the brotherhood of man, and will, by sheer force of genius, "reconcile the tiger and the ox", the European and the Indian that is, the real cultural role of the Bengalis seem to be much less ambitious. It is to assimilate, by slow degrees, the ways of Europe till at last civilization in India becomes the provincial edition of the civilization of Europe palely reflecting like the moon its borrowed light from the great sun beyond."

সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। আজ আমরা 'কাল্‌চারে'র ক্ষেত্রে যাহা করিতেছি, তাহা কোন নূতন সভ্যতার সৃষ্টি নয়—শুধু একটা আধাবিলাতী আধাদেশী ভারতব্যাপী সাধারণ সংস্কৃতিকে নিজেদের ভার্না-কুলারের ছাঁচে ঢালিবার প্রচেষ্টা। ইউরোপীয় সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদির অনুকরণে বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই উপন্যাস লিখিবার ও ছবি আঁকিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফলে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইতেছে উহা উল্লেখযোগ্য কি তুচ্ছ, আসল কি মেকী সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি উহার দিক হইতে বড় কথাটা এই যে, উহার মধ্যে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কোন স্থান নাই। বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় সাহিত্য গুজরাটেই লেখা হউক আর বাংলা দেশেই লেখা হউক উহা একই ছাঁচে ঢালা। মোটের উপর এ-কথাটা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না যে আমাদের দেশে সভ্যতা বলিয়া যাহা কিছুরই সৃষ্টি হইতেছে, সে-সকলের মূল সর্ব্বত্রই এক—তফাৎ শুধু পোষাকে।

৪

তবে আমাদের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের গোড়া কোথায়? যদি আমাদের অতীতের দান একটা অসাড় স্থানীয়বৈশিষ্ট্যই হয়, আমাদের বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপের মধ্যেও স্বতন্ত্র একটা বাঙালী সভ্যতা সৃষ্টি করিবার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা না থাকে, সহজ কথায় যদি আমাদের বাঙালীত্ববাদের কোন বাস্তব ভিত্তিই না থাকে, তবে আমরা কিসের জন্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এতটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছি, কেনই বা কাল্পনিক প্রাদেশিক কীর্ত্তির ফিরিস্তি দাখিল করিয়াও নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতে চাহিতেছি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু যথার্থ উত্তর দিতে হইলে রাষ্ট্র, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সংস্কৃতিগত দাবীর উৎপত্তি কি করিয়া হয় সে-বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা বিশ্বাস করি, লোকে যখন এই সকল ব্যাপারে বিশেষ কোন অধিকারের দাবী করে তখন তাহারা তাহার মূলে ন্যায় ও সত্য দুই-ই আছে বলিয়াই করে। যেমন, মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষের বিরাট জনসমষ্টির মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও বিচ্ছিন্নতা চিরস্থায়ী করিতে চান তখন তাঁহারা এই দাবী এই জ্ঞান-বিশ্বাসেই করেন যে তাঁহারা সত্যসত্যই জাতিতে, ধর্ম্মে, 'কাল্‌চারে' এবং ভাষায় ভারতবর্ষের অন্য অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। অন্য সকলেও তাঁহাদের এই যুক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তাহার উল্টা। বর্ত্তমান কালের একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, লোকে এই সকল দাবী ন্যায্য বা সত্য বলিয়া করে না, করিতে ভাল লাগে,—ইচ্ছা হয় বলিয়াই করে। এক্ষেত্রে ইচ্ছা জাগে আগে, তথ্য প্রমাণ ও যুক্তি আসে পরে। যে লেখকের কথা বলিলাম, তিনি বলেন,

"These ideas are adopted not because they appear to be just or true, or even conformable to interest, but because they satisfy the need the party in question has to experience this or that sentiment....

"It is seen that here it is not the ideas which provoke the sentiments, but on the contrary the sentiments which provoke the ideas. To be more exact, it is the sentiments—pre-existing in the state of *pure* sentiment, that is to say devoid of all intellectual complement (idea or image) and consequently avid for such a complement—which seize upon and, if necessary, invent the ideas or images capable of satisfying them...."

ইহার উত্তরে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এই ইচ্ছার কোন ভিত্তিই না থাকে তবে উহা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও লেখক দিয়াছেন। তিনি বলেন, সকল রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত আন্দোলনের উৎস দুইটি,—(১) পার্থিব সম্পদ (জায়গা-জমি, টাকাকড়ি, এবং এই দুইটি জিনিষ দিতে পারে বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা) বজায় রাখিবার অথবা দখল করিবার ইচ্ছা; (২) অন্য সকল জনসমষ্টি হইতে আমরা বিভিন্ন ও বিশিষ্ট, ইহা অনুভব করিয়া আত্মাভিমানের তৃপ্তি। এই ফরাসী মনীষীর মতে দ্বিতীয় কারণটি প্রথমটির অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম শক্তিশালী নয়।

আমার মনে হয় বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্বন্ধেও এই যুক্তি খাটে। ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু বাঙালীত্ববাদের প্রধান অবলম্বন। বাঙালীত্ববাদ ইঁহাদেরই স্বার্থবোধ এবং অভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে জীবিকা উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য ও অসহায়। সেজন্য, মান্দ্রাজীরা আসিয়া আমাদের কেরাণীগিরি কাড়িয়া লইতেছে, মাড়োয়ারী আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য দখল করিয়া ফেলিয়াছে, পঞ্জাবী মুসলমানরা জুতা ও চামড়ার ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিল, শিখরা ট্যাক্সি ও বাসের ড্রাইভারী লইতেছে, শিখ ও মান্দ্রাজী উভয়ে মিলিয়া ভবানীপুরের বাড়ী ভাড়া চড়াইতেছে, এই সকল দুর্দ্দৈবে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া আছি। ইহাদের 'কম্পিটিশ্যন্' দূর করিয়া আমাদের সরকারী ও সওদাগরী চাকরী বজায় রাখিবার ইচ্ছা বাঙালীত্ববাদের যে খুব বড় কথা সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার চেয়েও বড় কথা ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর অভিমান।

এই অভিমানের মূল আমাদের অতীতের মধ্যে নিহিত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র হইতে দূরে থাকার জন্য আর্য্য সংস্কৃতি বাংলা দেশে কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এই কারণে হিন্দু সভ্যতার অর্দ্ধ-আবাদি জঙ্গল হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের নিকট বাংলাদেশের কোন সম্মান ছিল না। এই ক্ষুণ্ণ আত্মাভিমান বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-গৌরবে পরিণত হইয়া গেল। ইংরেজের পার্শ্বচর ও ইংরেজী সভ্যতার 'মিড্‌ল্‌ম্যান' হিসাবে প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিল। আজ আবার সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অন্যান্য প্রদেশের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বসিয়াছে, বাঙালী এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তন বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। বাংলার ইতিহাসের এই ধারার মধ্যেই বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবাদের কারণ খুঁজিতে হইবে। প্রথম যুগের হীনতাবোধ, দ্বিতীয় যুগের হঠাৎ ধনী হইবার গর্ব্ব ও তৃতীয় যুগের নবলব্ধ ধন হারাইবার ভয়, এই তিনটি জিনিবের উপরই প্রকৃত-প্রস্তাবে বাঙালীত্ববাদের প্রতিষ্ঠা।

৫

এই তিনটি বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইলে পুস্তক লিখিতে হয়, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কুলাইবার নয়। তাই এখানে আমার বক্তব্যের আভাস ভিন্ন আর কিছুই দিবার চেষ্টা করিব না। প্রথমে বাংলা দেশের হীনতার কথাই বলি। সেদিন মাত্র আমরা বাংলা দেশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে সুরু করিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ বিষয়ে একটু সঙ্কুচিতই ছিলেন। বর্ত্তমান কালে যেমন কেবল দেশী আদর্শ, দেশী শিক্ষা বা দেশী আচার-ব্যবহার লইয়া আমাদের সমাজে ঠিক পাংক্তেয় হওয়া যায় না, ইউরোপীয় ছাপ থাকিলে কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসে, সেকালেও তেমনই ছিল। তবে এ-যুগে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে ইউরোপ, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙালীর কাছে সে সম্মান ছিল উত্তরাপথের। সেজন্য কাশী গিয়া যথাসম্ভব অবাঙালী হইবার চেষ্টা না করিলে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ হইত না, বিষয়ীদেরও দিল্লী-আগরা হইতে ফরমান না আনিলে সত্যকার অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত হওয়া ঘটিত না। এক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালীদের মধ্যে ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রাও অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জ্জিত ছিল। এই গ্রাম্য আচার-ব্যবহার ও গ্রাম্য 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং' লইয়া বড়লোকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না বলিয়া আমাদের দেশের জমিদারবর্গ বর্ত্তমান কালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালীদের মত, অন্ততঃ সদরে, বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদেশী আদব-কায়দা ও বিদেশী বুলি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

বহুকাল ধরিয়া বাঙালী এই ভাবে আর্য্যাবর্ত্তের মুখ চাহিয়া আসিয়াছে—কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি শাস্ত্রালোচনায়, কি সঙ্গীতে, কি শিল্পে, কি যুদ্ধবিদ্যায়। অবশ্য বাংলা দেশেও এই সকলের চর্চ্চা যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু তাহা যেন নিতান্তই মধুর অভাবে গুড় দিয়া কাজ চালাইবার মত। বাংলা দেশের রাইবেঁশে ও রাজপুত বা মোগল যোদ্ধাতে আমরা যে তফাৎ অনুভব করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও অক্সফোর্ড-এর গ্রাজুয়েটে আমরা যে সম্ভ্রমের তারতম্য করি, কাশীতে বেদাধ্যয়ন ও বাংলা দেশের কোনও টোলে বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, বাংলা দেশের নিজস্ব আদর্শ ও উত্তরাপথের

আদর্শের মধ্যেও আমরা ঠিক সেই তফাৎ করিতাম। সে-জন্য যাঁহাদের কোন উপায় ছিল না তাঁহারা বাঙালী আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও সকলেই সাধ্যমত কেন্দ্রীয় আদর্শের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। উহা ভিন্ন যথার্থ খানদানী হইবার কোন পথ ছিল না।

এ বিষয়ে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। আমরা সকলেই অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বর্ণনা পড়িয়াছি। এই বর্ণনায় প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ভারতচন্দ্র কতগুলি বিদেশী ব্যক্তি ও বিদেশী সার্টিফিকেটের উল্লেখ করা উচিত মনে করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য।—

কালোয়াত্ত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজশেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তকপ্রধান শের মামুদ সভায়।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা যারপর॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হোসেন মোগল কর্ণসম॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেন সুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার বুন্দেলা শতশত॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানোনগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুড়া ঘড়ি নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরোপা সুলতান-ই-সুলতানৎ॥

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধে উহা দ্বিজ রামচন্দ্র নামে এক ব্যক্তির রচিত একটি পুস্তক হইতে গৃহীত। এই দ্বিজ রামচন্দ্র যে কে এবং বহিখানির যে কি নাম তাহা আমি বাহির করিতে পারি নাই। কারণ একটি পুরাতন গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করিতে করিতে ১৮২০ সনে ছাপা যে পুস্তকে আমি এটি পাইয়াছি, উহার টাইটেল পেজটি নাই, শুধু শেষের দিকে উহা 'শশী ঋষি বেদ শশী শকে' রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু দ্বিজ রামচন্দ্র যিনিই হউন, তাঁহার পুস্তক হইতে বাঙালীর শাস্ত্র-চর্চ্চা সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের নিজেদেরও কিরূপ ধারণা ছিল, তাহার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এক রাজা বাজপেয় যজ্ঞ করিতে চাহেন। তিনি কুলপুরোহিত সদানন্দ বাগীশকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন—

শুনি সদানন্দ কহে শুন সমাচার।
যাগযজ্ঞ এ প্রদেশে নাহি ব্যবহার॥
ব্যবহারশাস্ত্রে সে জানিবে নৃপমুনি।
যাগযজ্ঞ বিবরণ নাহি মোয়া শুনি॥
একুদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ জানি আর ঘটদান।
লক্ষ্মীপূজা ষষ্ঠীপূজা ব্রতের বিধান॥
মনসাপঞ্চমী জানি আর খন্দপালা।
ঘেটুপূজা পঞ্চানন্দ আর ত শীতলা॥
এমত শুনিয়া নৃপ জিজ্ঞাসে দেওয়ানে।
যজ্ঞ করে হেন দ্বিজ পাব কোন খানে॥
পাত্র কহে দেশে দেশে কিরাও চেঙ্গেড়া।
থাকিলে অবশ্য আসি ধরিবেক ঢেড়া॥
এত শুনি ঢেড়া দিল নগরে নগর।
বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন নৃপবর॥
কেহ যদি জান এই যজ্ঞের পদ্ধতি।
চেঙ্গড়া ধরই তবে আসি শীঘ্রগতি॥
এদেশী ব্রাহ্মণ কেহ না ধরিল ঢেড়া।
ওড্রদেশী পাঁচজন ধরিল চেঙ্গেড়া॥

কিন্তু তারপর? তারপর ঐতিহাসিক চক্রের এক আবর্ত্তনের ফলে সবই ওলটপালট হইয়া গেল। যাহারা এতদিন সকলের তুলনায় হীন ছিল তাহারা উপরে উঠিয়া গেল, যাহারা উপরে ছিল তাহারা নীচে গেল। বাঙালী ভদ্রলোক এতদিন পর্য্যন্ত বড় ও অভিজাত হইবার আকাঙ্ক্ষায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনুকরণ করিতেছিলেন, ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই কথাটা বুঝিতে পারিলেন যে, এই নূতন যুগে হিন্দুস্থানীর ও মুসলমানের অনুকরণ ও সাহচর্য্য অপেক্ষা ইংরেজের সহায়তা ও ইংরেজী আচার-ব্যবহারের অনুকরণ অনেক বেশী লাভজনক। তাহার পর হইতে দলে দলে বাঙালী ইংরেজের চাকুরী গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং শুধু ইংরেজের কেরাণী ও মুৎসদ্দি গিরিই নয়, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষক রূপে, ইংরেজের বন্ধু এবং ইংরেজী সভ্যতার প্রচারক রূপে বাঙালী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই নূতন বাঙালীকে ভারতবর্ষের অন্যান্য

প্রদেশের অধিবাসীরা আর আগেকার মত অবজ্ঞা করিতে ভরসা পাইল না। যে বাঙালী এতদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে অপাংক্তেয় ছিল, ইংরেজের জোরে সে আজ অন্যকে অপাংক্তেয় করিয়া ভারতবর্ষে what ইংরেজ is to বাঙালী, বাঙালী is to খোট্টা, এই রেশিওর অঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীজাতির এই কীর্ত্তি সম্বন্ধে আমাদের এত বেশী শ্রদ্ধা যে যিনি আমাদের এই পথের প্রথম পথ-প্রদর্শক তাঁহাকে আমরা যুগগুরু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে উহার মূল্য কতটুকু? উহাতে কৃতিত্বই কি খুব বেশী? নিজস্ব জাতীয় গৌরব নাই বলিয়া বাঙালী বরাবরই পরমুখাপেক্ষী ও পরধর্ম্মী। মুসলমান আমলের আগে বাঙালী জাতি বলিয়া যে বিশিষ্ট একটা জাতি ছিল তাহার বেশী প্রমাণ আমরা পাই না। যদি থাকিত তবে হয়ত দেখিতাম তখনও বাঙালী উত্তরাপথের মুখ চাহিয়া আছে, সংস্কৃত অথবা প্রাকৃতে কথা কহিতেছে, আর্য্য আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে। পাঠান রাজত্বের সময় হইতে বাঙালীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পাইতে আরম্ভ করি। উহার শেষের দিকে বাঙালী দুয়েকজন করিয়া পাঠানের চাকুরী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরবী ফারসী প্রয়োগে ও মুসলমানী আদবকায়-দায় সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠে। তখনকার দিনের সম্রান্ত বাঙালী বাংলা অপেক্ষা ফারসী পড়িতেন ও বলিতেন অনেক বেশী, প্রকাশ্যে মুসলমানী পোষাক পরিতেন ও মুসলমানী আদবকায়দা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতেন। মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় পেশার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, প্রভু-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল মাত্র।

বাঙালী-জীবনের এই দ্বিত্ব—পুরাতন বনিয়াদী বাড়ীর মত একটা বিদেশী কায়দায় সাজানো সদর এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা অত্যন্ত হীন ও 'প্রিমিটিভ' অন্দর থাকার দরুণ বাঙালী কখনও একটা বড় 'কাল্‌চারে'র সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু উহাতে তাহার বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী রীতিনীতি ধরিয়া ফেলিবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা গড়িয়া উঠিয়াছে। যে অনুকরণশীলতা বাঙালী-মনের একটা সনাতন ধর্ম্ম, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তি তাহার একটি নূতন প্রয়োগ মাত্র। কে পরিশেষে প্রভু হইয়া দাঁড়াইবে তাহা বুঝিবার একটা সহজাত চাতুর্য্যের প্রমাণ উহার মধ্যে আছে, কিন্তু সংস্কৃতি সৃষ্টির কোন পরিচয় নাই।

আজ ইংরেজের সহিত আমাদের নিবিড় ও একক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরাও ইংরেজী সভ্যতাকে বুঝিবার ও পাইবার জন্য বাঙালীর মুখাপেক্ষী নয়। তাই তাহারা আর পূর্ব্বের মত বাঙালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চায় না। বাংলাদেশের ভিতরেও একদল লোক দেখা দিয়াছেন যাঁহারাও অতীতে ইংরেজের অনুচর ও বর্ত্তমানে ইংরেজ-বিদ্রোহী বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুর নেতৃত্ব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ন'ন। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু সকল দিকেই অজ্ঞাতসারে হার মানিতেছেন অথচ যে-পথ ধরিলে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা, সে-পথে চলিতেছেন না। বাঙালীকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহাকে ভারতবর্ষের বিরাট জনসমষ্টির সহিত মিলিত হইতে হইবে এ-কথা যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। আমরা তাহা করিবার কোন আগ্রহ দেখাইতেছি না। পক্ষান্তরে আরও প্রাণপণে বাঙালীত্বের অভিমানকেই আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। এই অন্ধ আত্মাভিমান ও বন্ধ্যা স্বশ্রেণী প্রীতির ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু এবং তাহার সহিত বাঙালীত্ববাদের যদি অবসান হইয়া যায় তাহা হইলে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে গর্ব্ব সত্যকার গর্ব্ব, জাতীয় কীর্ত্তি ও জাতীয় কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-ই একমাত্র নিজের অস্তিত্বের জন্য যুঝিতে পারে, অথবা নূতন অবস্থায় নূতন রূপ ধারণ করিয়া আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে পারে। আমাদের নিকট সে শক্তির প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বাঙালীত্বের স্বরূপ একটা সর্ব্বতোমুখী ব্যর্থতার তীব্র অনুভূতি বই আর কিছুই নয় ত!

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

দ্বিতীয় পর্য্যায়

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় কলিকাতায় অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে। ইহার নাম—ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। যাঁহারা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এ-পর্য্যন্ত এই নাট্যশালাটির উল্লেখ করেন নাই। এই নাট্যশালাটিও ন্যাশনাল থিয়েটারের মত ভদ্রসন্তানদের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাহারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। ১২৭৯ সালের ১২ই ফাল্গুন (২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংবাদ এবং তৎসঙ্গে নাম-সম্বন্ধে একটু টিপ্পনীও আছে। 'মধ্যস্থ' বলেন :—

> পয়সা দিয়া নাটক দেখিতে না পাওয়াতে সাধারণে বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে দুঃখ মোচনের উপায় হইয়াছে এবং ক্রমে আরো হইতে চলিল। জাতীয় নাট্যশালাতো প্রসিদ্ধই হইয়াছে। আবার ওরিএন্টাল থিয়েটার নামা নূতন নাট্যশালা আমাদের পাড়ায় খোলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই এবং দেশের লোক ইংরাজীর এত গোঁড়া, যে, বাঙ্গালাতে অভিনয় করিয়াও নাট্যসমাজের নাম ইংরাজী না রাখিলে নয়! এত বড় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একটা নাম কি যুটিয়া উঠিল না?

ইহার পূর্ব্বেই—১৮৭৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্ত্তৃক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী-মাধব' অভিনীত হয়। ১৮৭৩, ২৮এ ফেব্রুয়ারি (১৮ ফাল্গুন ১২৭৯) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে আমরা পাই :—

> 'কলিকাতা ওরিয়েণ্ট্যাল থিয়েটর'।
>
> —মালতীমাধব নাটক—
>
> মহাশয়! কলিকাতায় আবার আর একটী নূতন সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা 'ন্যাসানেল থিয়েটারের' অনুকরণ……।
>
> বিগত ৫ই ফাল্গুন শনিবার উপরোক্ত নাট্যালয়ে (২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাটীতে) পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'মালতীমাধব নাটক' অভিনীত হইয়াছিল।……এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট নাটক আমরা সে দিবস একেবারে পদদলিত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। সে দিবসের অভিনেতৃ-বর্গের মধ্যে বোধ হয়, কেহই মালতীমাধবের কোন অঙ্গ সুচারুরূপে অভিনয় করিবার উপযুক্ত নহেন। "উজ্জয়িনী অধীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী—ভূরিবসু" "পরিব্রাজিকা কামন্দকী" ও দুই একজন যৎকিঞ্চিৎ যাহা অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।
>
> আমরা কেবল সে দিবস সাধারণ বিজ্ঞাপনের (placard) ছটা ও অভিনয় প্রস্তাব অতি উত্তম দেখিয়াই সৌৎসুক্যচিত্তে দেখিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু যাইয়া সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়াছিলাম। অভিনয় স্থানে যদিও অধিক জনতা হয় নাই (বোধ হয় ২০০ হইবে) তথাপি এরূপ গোলমাল হইয়াছিল, যে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।…
>
> দৃশ্যগুলি আরও সুন্দর ও উপযোগী হওয়া উচিত। সে দিবস কেবল 'শ্রীপর্ব্বত' দৃশ্য যথার্থ দৃষ্টির উপযুক্ত ও প্রশংসার উপযুক্ত।
>
> একতান বাদন……মন্দ নহে।…
>
> সকলেরই বেশ অতিশয় অসংলগ্ন।…
>
> সে দিবসে সংগীতগুলি মন্দ গীত হয় নাই, কিন্তু আরও উন্নতি করিলে ভাল হইতে পারে।
>
> কলিকাতা। ১৮৭২। অনুগত শ্রীকে

'মালতীমাধব'-এর পর ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্ত্তৃক মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা নাটক' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ১৮৭৩, ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> NOTICE.
>
> In the house of Babu Krishna Chunder Dev, Cornwallis Street No. 222, the Oriental Theatre will be held on the 29th February 1873 at 8 P.M., precisely, where in Manorama Natuck a tragedy named Manorama by Moddun Mohun Mitter will be acted. Tickets are sold at the following rates in these premises.

Reserved Class	...	...	Rs. 2
First Class	...	...	Re. 1
Second Class	...	...	As. 8

১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ্চ মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয়। তখন ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অভিনয়ও চলিতেছিল। এই দুইটি সংবাদই 'মধ্যস্থ' এবং 'ন্যাশনাল পেপার', উভয় পত্রেই দেওয়া হইয়াছিল। 'মধ্যস্থে'র বিবরণ এইরূপ :—

গত শনিবার [৮ই মার্চ্চ] ন্যাসনেল থিয়েটরের শেষ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরের মত উহা বন্ধ হইল ;......ঐ দিবসাবধি কর্ণওয়ালিষ ষ্ট্রীট ২২২ নং ভবনে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটর' নামক আর এক নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে ; ইঁহারাও টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। ('মধ্যস্থ', ৩ চৈত্র ১২৭৯)

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১২ই মার্চ্চ (বুধবার) তারিখে 'ন্যাশনাল পেপার' লিখিয়াছিলেন :—

The National Theatre closed its entertainments for this session on Saturday last......The Oriental Theatre recommenced its operations from Saturday evening last. The Coilahatta amateur concert attended it. A full house attended the Theatre which is reported to have been successful.

ইহার পর ১৮৭৩, ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে আর একটি অভিনয় হইয়াছিল। ১২৭৯ সালের ১০ই চৈত্র তারিখের 'মধ্যস্থে' দেখি :—

সংবাদ।—...গত শনিবার 'ওরিয়েণ্ট্যাল থিয়েটরে' বিদ্যাসুন্দর নাটক ও চক্ষুদান প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। নাটকের অভিনয় বড় ভাল হয় নাই ; প্রহসন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শুনা গেল, এ শনিবার 'রত্নাবলী নাটক' অভিনীত হইবে।

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের আর কোন অভিনয়ের উল্লেখ আমি এখনও পাই নাই। এই থিয়েটার কর্ত্তৃক যে-সকল অভিনয়ের উল্লেখ সাময়িক পত্রে আছে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।—

পরিশিষ্ট

ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার

(২২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাটী)

মালতীমাধব নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
এডুকেশন গেজেট ২৮-২-১৮৭৩।

মনোরমা নাটক—মদনমোহন মিত্র ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩
'ন্যাশনাল পেপার' ১২-২-৭৩

———— ৮ মার্চ্চ ১৮৭৩ 'ন্যাশনাল পেপার' ১২-৩-৭৩

বিদ্যাসুন্দর—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (?) } ১৫ মার্চ্চ ১৮৭৩
চক্ষুদান—রামনারায়ণ তর্করত্ন } 'ন্যাশনাল পেপার'
১৯।৩।৭৩ ; 'মধ্যস্থ' ১০ চৈত্র ১২৭৯

রত্নাবলী—রামনারায়ণ তর্করত্ন ২২ মার্চ্চ ১৮৭৩
'ন্যাশনাল পেপার' ১৯।৩।৭৩ ; 'মধ্যস্থ' ১০ চৈত্র ১২৭৯

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৭৩ সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখে শেষ অভিনয় * হইবার পর মূল ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায় এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেন বন্ধ হয়, সে-সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। এই নাট্যশালার সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ চার জন এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র, ধর্ম্মদাস সুর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন যে টাকা-পয়সা লইয়া মনোমালিন্যই ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার কারণ। তিনি বলেন,—

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।... কিসে গোল বাধিল ঠিক এখন বলিতে পারিব না ; টাকা কড়ির খরচ পত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল।

* * *

যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটরে আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।

* * *

---

* এই দিনে যে-যে বইগুলি অভিনীত হয় তাহা ১৮৭৩, ৮ই মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে।—

NATIONAL THEATRE, CALCUTTA.
Last Night ! Last Night !! Last Night !!!
The Last of the Season.
Saturday, 8th March.
Booro Shaliker Gharer Rho,
Jamun Kurfho Tamni Fol.

PANTOMIME.

1. Bilatee Baboo
2. Subscription Book.
3. Green Room of a Private Theatre.
4. Model School.
5. Mastaphi Saheb Ka Pucka Tamasha.

To conclude with a Fairy Scene and a Farewell Address of Mastaphi Saheb.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Hony. Secretary.

ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাত পূর্ব্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ গিরীশ বাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে।

(পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১১৯, ১২১, ১২৪)

টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জাম লইয়া বিবাদ হওয়ার কথা গিরিশচন্দ্রও বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ উপস্থিত হয় মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হইবার পর,—পূর্ব্বে নয়। তাঁহার মতে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথমে বন্ধ হইয়া যায় বর্ষার জন্য। তিনি লিখিয়াছেন—'

বর্ষা আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসান্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম কে রাখিবে?—বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবাদ নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবাদ, বক্তৃতা ও কাগজে-কলমে বহুবার প্রকাশিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণই ছিল না। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (Hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল। (বঙ্গীয় নাট্যশালার নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ২৩-২৪)

অর্দ্ধেন্দুশেখর বর্ষা এবং টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জাম লইয়া মনোমালিন্য দুইয়ের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌টি কখন ঘটে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

সান্যাল-বাড়িতে টিকিট বেচে থিয়েটার করবার পর আমরা টাকার মুখ দেখলেম এবং যে-ভাবে উপার্জ্জন করা গেল, তাতে প্রলোভনই জেগে উঠ্‌ল। তা ছাড়া খরচপত্রেরও প্রয়োজন হ'তে লাগ্‌ল। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন থিয়েটারের আয় থেকে আমাদের খরচপত্র দেওয়া হোক। ক্রমে তাও সুরু হ'ল; কিন্তু তাতে হ'ল না। কারও দু-এক টাকা বেশী হ'লে অপরে বিরক্ত হ'তে লাগ্‌ল। তখন একদিন নগেন্দ্রবাবু, অমৃতলাল বসু, ধর্ম্মদাস সুর আর আমি—আমরা চার জনে কর্ত্তব্য বিচার করতে বসলেম। নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন—এস, আমরা চার জনে স্বত্বাধিকারী ব'লে প্রচার করি। ধর্ম্মদাস বাবু অস্বীকার করলেন, বললেন সকলে মিলে পরিশ্রম ক'রে জিনিষটা করা গেল, একা আমরা তা গ্রাস করি কেন? ক্রমে এই অর্থের কথা নিয়ে অনর্থ বেধে উঠ্‌ল। আমরা দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেম। নগেন্দ্র বাবু, অমৃত বাবু আর আমি একদলে; ধর্ম্মদাস বাবু, মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু আর একদলে প্রধান হয়ে পড়লেন। ধর্ম্মদাস বাবু ম্যানেজার ছিলেন, তাঁরই হাতে টাকাকড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। তিনি সে-সমস্ত নিয়ে গিরিশ বাবুর শরণ নিলেন।

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন,—

মার্চ্চ মাসের শেষ অভিনয়ের পর আমরা বৃষ্টির ভয়ে সান্যালদের বাটী হইতে ষ্টেজ উঠাইয়া আনিলাম। পথে মুটের মারফৎ ষ্টেজ চালান দিয়া নগেন্দ্র বাবু ও আমি অন্য কাজে গেলাম। দু-এক ঘণ্টা পরে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে ষ্টেজ শোভাবাজারের রাজবাড়ির নাটমন্দিরে চালান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদাস বাবু ও মতি বাবুর নিকট লোক পাঠাইলাম। তাঁহারা কহিলেন, 'আমাদের নিকট ষ্টেজ থাক, তোমাদের কাছে ড্রেস আছে। ফলতঃ ইহার পূর্ব্বে পরস্পরে কিছু কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। সে-সকল বিষয় বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। *

অর্দ্ধেন্দুশেখর যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্মদাস সুরের 'আত্ম-জীবনী'তে যে বিবরণ আছে তাহার মোটামুটি মিল আছে। তিনি বলেন—

……আমার অতিরিক্ত পয়সার আমদানি হইতে লাগিল, অমনি সন্দেহ জন্মিল, কারণ আমার হাতে টাকা, হিসাব সবই ছিল। তৎপরে তিন জন Director নিযুক্ত হইল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ। ইহার পূর্ব্বে গিরিশ বাবু বা অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা দায়িত্ব ছিল না, দায়িত্ব সবই আমার ছিল। Director নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর বেশী দিন থিয়েটার রহিল না, ৭ই মার্চ্চ [?] তারিখে বন্ধ হইয়া গেল। ইহার প্রধান কারণ নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত তিন জন মিলিত হইয়া আমাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া, চারি জন Proprietor বলিয়া declaration দিতে চাহিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম, বলিলাম, "সকলে খাটিয়াছি—অন্য সকলকে চাকর বা আমাদের অধীন করিব—তাহা কখন হইবে না।" থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। নগেন, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত এক দিকে আর আমি অপর দিকে। অবশিষ্ট যত লোক সব আমার পক্ষ অবলম্বন করিল। নগেনের বাটীতে পোষাক থাকিত, সে-সমস্ত তাহারই অধিকারে রহিল; ষ্টেজ আমার অধীনে ছিল—আমারই কাছে রহিল, অবশিষ্ট টাকাও আমার কাছে ছিল। আমি গিরিশ বাবুকে কর্ত্তৃত্ব দিয়া টাউনহল ভাড়া লইয়া Native Hospitalএর Benefit দিলাম। National Theatre আমাদের দলের নাম রহিল। (নাট্য-মন্দির, ভাদ্র ১৩১৭, পৃঃ ১০২-১০৬)

* এই দুইটি বিবরণ অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে গৃহীত। শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইগুলি দেখিতে দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

এই কয়েকটি বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার কারণ মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়। আমাদের মনে হয়, টাকা-পয়সা লইয়া অল্পবিস্তর মনোমালিন্য পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার মার্চ্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায় বর্ষার জন্যই। ইহার পরই টাকা-পয়সা ও সাজসরঞ্জামের ভাগবাটোয়ারা লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়া দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই দুই দলের এক দলে যে গিরিশচন্দ্র, ধর্ম্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, ও অন্য দলে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি ছিলেন এবং প্রথম দলই যে সাজসরঞ্জাম ও ষ্টেজ পান তাহা অবশ্য অবিসম্বাদিত। প্রথম দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া অল্পকাল পরেই প্রথমে টাউন-হলে ও পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে সেই ষ্টেজ খাটাইয়া অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দল কোন ষ্টেজ ও সিন্ না পাইয়া 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া অভিনয় দেখাইবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল অভিনয় করেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার দুইটি বিজ্ঞাপন আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। অপেরা হাউসে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল, শনিবার। ঐ দিনে 'ইংলিশম্যান' পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

Opera House, Lindsay Street
HINDU NATIONAL THEATRE,
Calcutta.
Grand Opening Night,
This Evening,
Saturday, 5th April, 1873.
Grand Pantomime
Grand Pantomime.
Grand Pantomime.

1. Model School and its Examination. [মডেল স্কুল]
2. Belatee Baboo. [বিলাতী বাবু]
3. Distribution of Title of Honor, &c. etc. [উপাধি বিতরণ]

MOSTAPHI SHAHIB KA PUCKA TAMASA,*
Professor Aukhil's Wonderful Feats,
Followed by
Michael M. S. Datta, Esq.'s
Celebrated Comedy
SARMISTA.

Prices of Admission.

Private Box, Dress Circle, to admit five			—	20
Lower Stage Box to admit four			—	16
Dress Circle	—	—	—	4
Stalls (front)	—	—	—	3
Ditto (back)	—	—	—	2
Pit —	—	—	—	1

Tickets to be had at the Opera House, Lindsay Street, and at the House of the late Kaliprasanna Singha, Baranussee Ghose's Street, Jorasanko, on Friday and Saturday, from 9 A.M. to 5 P.M.

Doors open at 7-30,
Performance to commence at 8-30.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Hony. Secretary.

পরের সপ্তাহে (১২ই এপ্রিল, শনিবার) হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অভিনয় করেন। ১০ই এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যানে' ইহার বিজ্ঞাপন দেখিতেছি।

এই রঙ্গমঞ্চে আরও দু-একটি অভিনয় হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কোন বিবরণ বা বিজ্ঞাপন আমি এখনও পাই নাই। অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সেখানকার [অপেরা হাউসের] নাট্যলীলা আমাদের অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল; আমরা কালী সিংহের একটা হল্ ভাড়া লইয়া ষ্টেজের প্লাটফরম বাঁধিতে লাগিলাম। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১২৮)

১৮৭৩ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার হাওড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৭৩, ১২ই জুন তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি পত্রে আমরা পাই :—

> কলিকাতা হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার।—মহাশয়! আমরা অনেক দিন হইতে উক্ত থিয়েটারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু গত ২৬শে এপ্রেলের পুর্ব্বে আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ দূর হইবার সুযোগ ঘটে নাই। উক্ত দিবসে উক্ত থিয়েটর সম্প্রদায় হাবড়া

* 'মুস্তাফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' সম্বন্ধে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রেলওয়ে থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন।...শ্রীদীননাথ ধর। চুঁচুড়া।

এই অভিনয়ের কয়েক দিন পরেই—মে মাসের গোড়ায়—হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় চলিয়া যান। ১৮৭৩, ১৫ই মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় তাহার উল্লেখ পাইতেছি :—

> কলিকাতার হিন্দু ন্যাসনাল থিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা-যাত্রা সম্বন্ধে অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন :—

> ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।...মোহিনী বাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। সেই বাগানবাড়ীটি ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১২৮-২৯)

ঢাকায় গিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার তথাকার পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমির বাঁধা ষ্টেজে খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় দেখান। একদিন অন্তর তাঁহাদের অভিনয় হইত। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

> ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রাম্সীনি, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্‌ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম। (পৃ. ১২৯)

ঢাকায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় যে কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা ১৮৭৩, ২২এ মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যাইবে :—

> সংবাদ।...ঢাকার হিন্দুন্যাশন্যাল থিয়েটর কোম্পানির নীলদর্পণ নাটক অভিনয় সম্বন্ধে একজন দর্শক আমাদিগকে এইরূপ লিখেন :—
>
> "গত শনিবার ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার হিন্দু নেশনাল থিয়েটরের সভ্যগণ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় যে কত দূর সুন্দর হইয়াছিল বলা যায় না। ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্র সমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। চারি ঘণ্টা কাল অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের মনের যে কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলা বাহুল্য। আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।"

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় আরও কয়েকখানি নাটকের—নব-নাটক প্রভৃতির—অভিনয় করেন। তাঁহাদের অভিনয় সম্বন্ধে ঢাকার সংবাদপত্র-সমূহ যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৭৩, ২৬এ জুন তারিখে এই পুস্তিকার পরিচয় দিয়া বলেন,—

> হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটর।—উক্ত নট সম্প্রদায় এক মাসের অধিক ঢাকায় অভিনয় করেন। তথাকার স্থানীয় সংবাদ পত্র সকল কোম্পানির অভিনয় সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করেন এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটর ঢাকায় সমধিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইহার তিন মাস পরে ঢাকার স্থানীয় নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয় প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা ঢাকার হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক নব-নাটকের অভিনয়ের সাফল্যের কথা জানিতে পারি।—

> ঢাকা থিয়েটার কোম্পানির নব নাটকের অভিনয়। গত বৎসর ঢাকা নগরিতে, কৃতবিদ্যগণের উদ্যোগে 'রামাভিষেক নাটক' অভিনীত হয়।...হিন্দু নেসনেল থিয়েটর নামক নট সম্প্রদায় আসিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আর আমরা জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে পৃথিবীতে এইরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় থাকতে জঘন্য রামাভিষেকের অভিনয় দেখতে কার প্রবৃত্তি জন্মে? বাস্তবিক মহাশয় সেই অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন করে ঢাকার অভিনয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল...। এক রাত্রি নব নাটক অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন ঢাকা থিয়েটর কোম্পানির ধেষ্বগণ ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে 'নবনাটক কখনও অভিনয় করিতে পারিবে না'।...যখন হিন্দু নেসন্তাল কোম্পানী এবং ঢাকা থিয়েটর কোম্পানী নাটকাভিনয় লইয়া গোলযোগ করেন সেই

সময় শেষোক্ত কোম্পানী বলিয়াছিলেন জন্মাষ্টমীর সময় অভিনয় দেখাইবেন কারণ সেই সময় গ্রাম হইতে বিস্তর লোক তামাসা দেখিতে ঢাকাতে আগমন করে।...

দর্শকমাত্রেই অসন্দিহান চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ঢাকা কোম্পানির নবনাটক অভিনয় হিন্দু নেশনাল থিয়েটারের শতাংশের একাংশও হয় নাই, এমন কি কালেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবর্গও ইহা হইতে ভাল অভিনয় করিয়াছে, এবং শ্রীনগর থিয়েটারের কতকাংশ ইহা হইতে উত্তম হইয়াছিল। আমরা জন দশেক। ঢাকা।

ঢাকায় মাসখানেক থাকিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিছু দিন পরে এই দলের কয়েক জন অভিনেতা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইয়া একবার অভিনয় করেন। উহার উপলক্ষ্য দীঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন। এই অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলেন :—

কিছুদিন পরে দিঘাপতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।

এই অভিনয়ের পর তাঁহারা রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার একটি অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—

আমরা দীঘাপাতিয়ায় ৩ রাত্রি অভিনয় করিয়া ঘোর বর্ষার রামপুর বোয়ালিয়া আসিয়া ভুরিচাঁদ কাওয়ারীমলের মুনীব গোমস্তা দেবীদাস বাবুর কুঠীতে (যেখানে People's Association ছিল) কয়েক দিন অভিনয় করি। তৎপরে আমরা বহরমপুরে অভিনয় করি।

১৮৭৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়ায় 'মোহান্তের এই কি কাজ?' অভিনয় করেন। তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া নাটকখানি রচিত হয়, কলিকাতায় উহা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার চুঁচুড়ায় গিয়া নাটকখানা অভিনয় করিয়া আসেন। ১৮৭৩, ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় আমরা পাই :—

সংবাদ।...আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামী শনিবার হিন্দু ন্যাসন্যাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ চুচড়ার ডাক্তিকের হলে 'মোহন্ত' নাটক অভিনয় করিবেন। অভিনয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা নবীনের উপকারার্থে প্রদত্ত হইবে।

চুঁচুড়ার এই অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী; নগেন, নবীন সাজিলেন; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

পরিশিষ্ট

মুস্তফী সাহেব-কা পাক্কা তামাশা

এই সময় দেব কার্সন নামে একজন ইংরেজ অপেরা হাউসে "Bengali Baboo" লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন :—"Dave Carson Sahib ka Pucka Tumasha." 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া রচিত। গিরিশচন্দ্র 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' পুস্তিকার ৭-৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় 'দেবকার্সন' নামক এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিদর্শনস্বরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসন্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন,...।

সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সংগৃহীত নাট্যশালার ইতিহাসের কতকগুলি কাগজপত্র আমাকে দিয়াছেন। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বহস্ত-লিখিত এই গানটি ছিল। গানটি এইরূপ :—

The merry Christmas is at hand
Sherry Champagne let us try
And how twill be a joly land
When pegs begin to fly

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly

হাম বড়া সাব হায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাটুগাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom &c.

গর কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy—ham—
নেই সক্তা নিগার্স বাট্‌ মেরা to'erate
চুনাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti &c.

Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপরে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো
Health রাখ্‌নে মেরা সাফ.
Rom-ti-tom &c.

Coat পিনি Pantaloon পিনি পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom &c.

চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I [eat]
চারপাই is my palang posh, Morah is my Royal [seat]
Rom-ti-tom-

Chorus—
I am a gentleman

[শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা' পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় ইহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন]

ন্যাশনাল থিয়েটার

মূল ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া দুই দল দাঁড়াইবার পর "গিরিশ বাবু এই ভগ্নাংশটিকে ন্যাশনাল থিয়েটর নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।"* ইহার পর টাউন-হলে ষ্টেজ খাটাইয়া গিরিশ বাবুর দল কর্তৃক অভিনয় চলিতে লাগিল।

এই নূতন ন্যাশনাল থিয়েটারের টাউন-হলে প্রথম অভিনয় 'নীলদর্পণ'—১৮৭৩ সনের ২৯এ মার্চ্চ। এই অভিনয় নেটিব হসপিটালের (বর্ত্তমানে মেয়ো হাসপাতাল) সাহায্যকল্পে হইয়াছিল। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' এই অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহাতে লেখা ছিল :—

To-night !　　To-night !!
Will Re-open
The National Theatre
For the Benefit of the Native Hospital
At the Town Hall,
NILDURPUN

থিয়েটারের সাহায্য-রজনীর দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। পরবর্ত্তী ৩১এ মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, এই অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু লোক খুব বেশী হয় নাই ; সর্ব্বসমেত আন্দাজ পাঁচ শত লোক হইয়াছিল, উহার মধ্যে জন-ত্রিশেক মাত্র ইংরেজ। ইংরেজদের সুবিধার জন্ম টাউন-হলে অভিনয় হইলেও অভিনয়স্থলে বেশী সাহেব যান নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যের জন্ম টাউন-হলে আর একবার অভিনয় করিতে উপদেশ দেন।

এই অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক 'ইণ্ডিয়ান্ রিফর্ম্ম অ্যাসোসিয়েশানে'র পরোপকার বিভাগের (Charity Section) সাহায্যার্থ টাউন-হলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ—৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩। 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ের শেষে সেই রাত্রিতেই 'ভারত-মাতা' প্রদর্শিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার ইহার পর টাউন-হল হইতে ষ্টেজ খুলিয়া আনিয়া শোভাবাজার রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৩, ১০ই এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় রাধাকান্ত দেবের নাট-মন্দিরে প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

* অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা—পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃঃ ১২৫।

NATIONAL THEATRE.
Calcutta Saturday, the 12th April 1873.
Michael M. S. Dutt's
Sublime Tragedy,
KRISTO COOMERY.

The performance to take place at the elegant Natmundir of the late Raja Radhakant Deb Bahadoor K.C.S.I. Shova Bazar.

Prices of Admission

Reserved Seats	...	Rs 4
First Class	...	Rs. 2
Second Class	...	Re. 1

Tickets can be had at the Theatre on Friday and Saturday from 9 A. M. to 5 P. M.

Doors open at 7 P. M.; Performance to commence at 8.

DHURMO DASS SOOR.
Stage Manager.

১২ই এপ্রিল 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইবার সাত দিন পরে (১৯ এপ্রিল) রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। অভিনীত নাটকখানি—নীলদর্পণ। অভিনয়-দিবসে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন :—

The Nil Durpan. A special performance of this drama will, we understand, be given to-night at the National Theatre, with a view to gratify the wish expressed by many Europeans to see it acted. The really conspicuous talent for histrionic art possessed by the Bengali cannot be seen to better advantage than in this drama, and we have no doubt the theatre will be well attended.

২১এ এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক অভিনয় ও অভিনেতাদের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, কলিকাতার ইউরোপীয়দের বিশেষ অনুরোধে এই অভিনয় হইলেও তাঁহাদের দু-পাঁচ জন মাত্র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

১৯এ এপ্রিল 'নীলদর্পণে'র অভিনয় করিয়া পরের সপ্তাহে (২৬এ) ন্যাশনাল থিয়েটার দুইটি প্রহসনের অভিনয় দেখান। উহাদের একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ,' অপরটি মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'। সেই দিন অভিনয়ান্তে দুইখানি প্রহসন—ডিস্‌পেন্সারি ও চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেনসারি—ও ভারতসঙ্গীত ['ভারতমাতা'র সঙ্গীত] হইয়াছিল। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ন্যাশনাল পেপার' বলেন :—

At the last National Theatre [26 April] several farces were played. The *Jut Kinchit Jalayog* was first acted on the stage. It elicited great cheers from the visitors. Other farces were also successfully acted,......We wish all references to the rival party were avoided on the stage. (April 30, 1873, Wednesday).

রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয় ১০ই মে। এই দিন 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হইবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকা চলিয়া যান। ১৮৭৩, ৮ই মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিদায় ও শেষ রজনীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

NATIONAL THEATRE.
Sobha Bazar.

Grand Farewell Night,
Last Night ! Last Night !!
Of this season
Saturday, 10th May 1873.
'KAPALA KUNDALA'
To conclude with the episode
'BHARAT SANGIT'
Attended by the Amateur Concert of Sham Bazar.

Prices of Admission

Reserved Seats	...	Rs. 2-0
First class	...	Rs. 1-0
Second Class	...	Rs. 0-8

DHURMO DOSS SOOR
Stage Manager.

এই অভিনয় হইয়া গেলে ২২এ মে তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

গত শনিবার ন্যাশনেল থিয়েটর কম্পানিও অভিনয়ার্থ ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

ঢাকায় যে-দল যায় তাহার মধ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন না। তিনি কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল

না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন।*

ন্যাশনাল থিয়েটারের ঢাকা যাইবার কারণ—ঢাকায় হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্য ও খ্যাতি। কিন্তু ঢাকায় গিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার তেমন কৃতকার্য্য হইলেন না। অমৃতলাল তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

> আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনী বাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবু) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর পাইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে লক্ষ্মী বাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবন বাবুর বাড়ীতে থিয়েটার করিলেন।

এই দলের ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার কাহিনী অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার অপ্রকাশিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন:—

> সেখানে তাঁহাদের [ন্যাশনাল থিয়েটারের] চার-পাঁচ রাত্রির অধিক অভিনয় করিতে হয় নাই এবং যে-সকল অভিনেতা গিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুতরাং অধ্যক্ষেরা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের নিকট ষ্টেজ ও পোষাক রাখিয়া চলিয়া আসেন। আমরাই অগত্যা ঋণপরিশোধে বাধ্য হইলাম। দু-এক জন অভিনেতা আমাদের সঙ্গে রহিয়া গেলেন। কিছু দিন ঢাকায় অভিনয় করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ন্যাশনাল থিয়েটার এবং হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের কয়েক জন অভিনেতা একত্র হইয়া দুইবার অভিনয় করেন। এই দুই অভিনয়ের একটি হয়—দিঘাপতিয়ার রাজকুমার প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং অপরটি হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যকল্পে। ইহাদের মধ্যে প্রথম অভিনয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি ১৮৭৩, ১০ই জুলাই তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় † ও ১৪ই জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ‡ প্রকাশিত হয়।

এই বিজ্ঞপ্তি পাঠে জানা যায়, মাইকেল মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্যকল্পে ১৬ই জুলাই তারিখে অপেরা হাউসে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হইবে এবং এই অভিনয়ে ভিন্ন দলের অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও অন্য কয়েক জন খ্যাতনামা অভিনেতা যোগদান করিবেন।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী অভিনয় দেখাইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যান § ও পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে উহার কাশীতে অভিনয় দেখাইবার সংবাদ ১৮৭৩, ২রা নবেম্বর তারিখের 'সাধারণী' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'সাধারণী' বলেন,—

> সংবাদ।—ন্যাশনাল থিয়েটর এক্ষণে বারাণসী ধামে অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। নীলদর্পণ ও কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হইয়াছে। তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পাকা পত্তন করিলেন না কেন? তাহা হইলে তাঁহাদের সম্ভ্রমের বৃদ্ধি হইত।

হিন্দু ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারের মফঃস্বল ভ্রমণে দেশে নাট্যাভিনয়ের যে প্রসার হয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

* বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট-চূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, পৃ. ২৪।

† "We are requested to announce that in the course of the next week the National Theatre gives a performance of *Krishna Kumari* for the benefit of the orphans of the lamented author. The object is highly laudable and we hope there will be a large audience on the occasion. We are glad to state that Baboo Ardhendu Sikhar Mastafi and some other excellent actors have rejoined the company."—*Amrita Bazar Patrika*, Thursday, July 10, 1873.

‡ THE WEEK.—*Saturday, 12th July.* We are requested to announce that the managers of the National Theatre will give a performance at the Opera House on Wednesday next for the benefit of the orphan children of the late Michael Mudhusudan Datta. We hope to see a bumper house."

—The *Hindoo Patriot* for July 14, 1873.

§ "THE WEEK.—*Tuesday, 4th September.* The National Theatre Company have proceeded to Moorshedabad. This plan of itinerant theatricals will create a taste for the drama in the Moffussil."—The *Hindoo Patriot* for September 8, 1873.

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরদিন সকালেই বাড়ীর জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'এগুলো সব মুটের মাথায় তুলে দিয়ে চল আমরা হেঁটে হেঁটেই চলে যাই—না কি বল? এই ত' এইটুকুখানি রাস্তা!'

স্ত্রী বলিল, 'সে কি গো! না বাপু, এই মেয়ে নিয়ে আমি পথে-পথে হেঁটে যেতে পারব না। কেন, সেই মানুষে-টানা একটা রিস্‌কা ডাকতেও ত' পার!'

'যাতে পয়সা খরচ হয় তুমি সেই পথ ছাড়া যাবে না দেখছি।' বলিয়া শ্রীহর্ষ বোধ করি মুটে ও রিক্সা ডাকিতেই যাইতেছিল, স্ত্রী বলিল, 'ওগো শোন!'

'কি?'

'যাবে যে, তা বাড়ীউলি ত' বাড়ীতে নেই, গেছে কালী-ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে। তাকে একবার বলে-কয়ে ভাড়া-টাড়া মিটিয়ে যেতে হবে ত!'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তবে আর মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের মত থাকতে বলি কেন! তোর সবেতেই কি বাড়াবাড়ি!'

'কেন, বাড়াবাড়ি আবার কোথায় কি করলাম গো? বলে' যেতে হবে না? লোকে বলবে কি?'

মুখ ভ্যাংচাইয়া স্ত্রীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'বলে যেতে হবে না? লোকে বলবে কি! কেন, বলে' বুঝি যাচ্ছি না? তোর মত হাঁদা কিনা! বলেছি, বলেছি, কাল রাত্রে বলেছি, ভাড়া দিয়েছি পনেরো দিনের, এক মাসের ভাড়াই চাচ্ছিল, কিন্তু হাতে ধরে মাসিকে বেশ ভাল করে' বুঝিয়ে বলতেই মাসি বললে—তা বেশ বাছা, অনেক দিন ছিলে, তোমার অনেক টাকা খেয়েছি, তোমার কাছে টাকা চাইতে আমার লজ্জা করে।'

এই বলিয়া শ্রীহর্ষ একরকম ছুটিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ঠিক তেমনি করিয়াই ফিরিয়া আসিল সঙ্গে চারজন মুটে লইয়া। আসিয়াই মুটেদের মাথায় জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া বলিল, 'এসো তোমার মেয়েকে নিয়ে, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, শীগ্‌গির এসো!'

বলিয়া স্ত্রীকে জোর করিয়া টানিয়াই সে ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া রিক্সার উপর বসাইয়া দিয়া বলিল, 'চালাও!'

শ্রীহর্ষ চলিল যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে পায়ে হাঁটিয়া সকলের আগে আগে, আর তাহার পশ্চাতে ঝাঁকার মাথায় জিনিষপত্র এবং রিক্সওয়ালা।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় চিরদিন সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! গলির মোড়টা তখনও তাহারা পার হয় নাই, এমন সময় দেখিল, হাতে কমণ্ডলু, গায়ে নামাবলী, বাড়ীউলি চপলা ঠাকরুণ বোধকরি গঙ্গাস্নান করিয়া সেই পথ ধরিয়াই বাড়ী ফিরিতেছে।

প্রথমটা শ্রীহর্ষকে সে ততটা লক্ষ্য করে নাই। পুরুষ-ব্যাটাছেলে কাজে কর্ম্মে হর্‌দম্। বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, তাহা আবার দেখিবে কি! কিন্তু ঠুং ঠুং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া যে রিক্সা-গাড়ীখানা আসিতেছিল, তাহার মধ্যে দেখিল শ্রীহর্ষের বৌ তাহার ছোট মেয়েটিকে কোলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য চপলা ঠাকরুণ আগাইয়া আসিয়া গাড়ী থামাইল। বলিল, 'এ কি! কোথায় যাচ্ছিস্ লা—উমা?'

দুজনেই অবাক্ হইয়া দু'জনের মুখের পানে তাকাইল। উমা বলিল, 'কেন ও বলেনি কাল রাত্রে?'

'কে বলবে লা? শ্রীহর্ষ? কই, কিছুইত' জানিনে!'

উমা যে এইবার কি জবাব দিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

চপলা ঠাকরুণ বলিল, 'অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে রয়েছিস্ কেন লা? কোথায় যাচ্ছিস্ বল্ না!'

উমার চোখ দুইটি তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে, সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'ওই যে এগিয়ে গেল মাসি, ডাকো না ওকে।'

মাসি কিন্তু সুমুখে তাকাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। শ্রীহর্ষ তখন তাহার মুটেদের লইয়া তাড়াতাড়ি কোনো রকমে পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

রিক্সাওয়ালা বলিল, 'আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইব মা-জি?'

চপলা ঠাক্রুণ বলিল, 'না মা আমি আর ডাকতে পারি না! কই কাউকে দেখতেও পাচ্ছিনে। এক্ষুনি ফিরে আসবি ত? যা আয়গে, তারপর শুনব।'

উমা বলিল, 'না মাসি, আমরা আর ফিরে আসব না। তোমার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য বাড়ীতে উঠে যাচ্ছি।'

চপলা ঠাক্রুণ যেন আকাশ হইতে পড়িল। 'সে কি লা! জিনিসপত্তর নিয়ে একেবারে ঘর আমার ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিস্? তা কই আমায় একবার মুখ ফুটে সেকথা না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত···শ্রীহর্ষর কাছে আমার দেড় মাসের ভাড়া বাকি···সে কি লা? সত্যি নাকি?'

ঘাড় নাড়িয়া উমা বলিল, 'হ্যাঁ মাসি সত্যি। কাল রাত্তিরবেলা তোমায় ও বলেছে, বললে, ভাড়া-টাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছি তুমি চল।'

চপলা ঠাক্রুণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'যা, আমি বুঝেছি। তা এমন চোরের মত চুরি ক'রে না পালিয়ে গিয়ে আমায় বললেই পারতো যে, মাসি, আমার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই, ভাড়াটা তোমার দিতে পারব না। আচ্ছা মা, আবার একদিন আসিস্ যেন, আমি সঙ্গে গিয়ে তোর নতুন বাড়ী দেখে আসব। যা!'

উমার চোখ দিয়া তখন দর্দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিয়াছে। রিক্সাওয়ালাকে সে যাইতে না বলিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

চপলা ঠাক্রুণ বলিল, 'যা মা, মেয়েটা এই সময় ঘুমিয়েছে, আবার জেগে যদি একবার ওঠে ত' তখন আমায় আর ছাড়তে চাইবে না।' বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সদর দরজা খোলা, ভিতরের উঠানে নোংরা কাগজপত্র ইতস্তত ছড়ানো, শ্রীহর্ষ যে ঘরখানা ভাড়া লইয়াছিল, তাহার দরজা জানালা উন্মুক্ত অবস্থায় হাঁ হাঁ করিতেছে, মাটির উনানটা ভাঙ্গিয়া পোড়া মাটিগুলা এদিক ওদিক ছড়াইয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে লোহার শিকগুলি পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া লইয়া গেছে।

তা যাক্, আহা, নূতন বাড়ীতে গিয়া উনান তাহাকে আবার পাতিতে হইবে, লোহার শিকই বা সে পাইবে কোথায়? কিন্তু আজ তাহার গঙ্গাস্নান করিয়া আসা বৃথাই হইল, ঘরদোর আবার কোমর বাঁধিয়া পরিষ্কার করিয়া আর একবার স্নান করিতে হইবে।

নিজের ঘরের তালা খুলিয়া কমণ্ডলু ও নামাবলীটি যথাস্থানে রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া চপলা ঠাক্রুণ ঝাঁটা হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখে—অবাক্ কাণ্ড! মেয়েটিকে কোলে লইয়া উমা তাহার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি লা? তুই যে চলে এলি?'

'হ্যাঁ মাসিমা, চলে' এলাম।' বলিয়া উমা সেই দাওয়ার উপর বসিল। দেখিয়া মনে হইল যেন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিতান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'আমায় নিতে ত' ও আসবে মাসি, তখন তুমি ওর কাছে ভাড়া চেয়ো।'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়া চপলা ঠাক্রুণ ঝাঁটা দিয়া নোংরা ঘর-দোর পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিন্তু উমার তাহা সহ্য হইল না। ঘুমন্ত মেয়েটাকে সেখানেই মাটির উপর শোয়াইয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাসির কাছে গিয়া তাহার হাত হইতে ঝাঁটাটা এক রকম কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'দাও মাসি দাও' আমাকে দাও। গঙ্গায় নেয়ে এসে আর নোংরা ঘাঁটতে হবে না, তুমি রান্না চড়াও।'

ঘরখানা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছে, এমন সময় একজন মুটে আসিয়া বলিল, 'মা-জি, বাবু আপনাকে যেতে বললেন।'

উমা মুখ তুলিয়া বলিল, 'বল্‌গে, মা-জি বললে, সে যাবে না।'

ঘাড় নাড়িয়া 'বেশ' বলিয়া লোকটি চলিয়া যাইতেছিল, উমা তাহাকে আবার ফিরিয়া ডাকিল,—'শোনো!' বলিল, 'বাবুকে গিয়ে বলো সে এ-বাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে যেন আমাকে নিয়ে যায়।'

'বহুৎ আচ্ছা মা, আমি তাই বলব।' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

চপলা ঠাক্রুণের উনান তখন ধরিয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'তোদের দুজনেরও চারটিখানি ভাত আমি এখানেই রাঁধি, নাকি বল্ উমা? ও-বাড়ীতে গিয়ে আজ ত' আর তোদের রান্না-বান্না কিছুই হলো না।'

উমা বলিল, 'না মাসিমা আজ আর আমি কিছু খাব না।'

'কেন কি হয়েছে কি ? খাবি না কেন লা। সধবা মানুষ, শুধু-শুধু খাব না বলতে নেই।'

এই বলিয়া চপলা ঠাকরুণ তাহাদের তিনজনের খাবার আয়োজনই করিতেছিল, পশ্চাতে হঠাৎ হাসির শব্দ পাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, উঠানের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীহর্ষ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।—'তুমি কি ভেবেছিলে মাসি—টাকাটা তোমায় না দিয়েই আমি পালিয়ে গেলাম। তোমার এ বাড়ী ছেড়ে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না মাসি, তবে আমার ওই এক বন্ধু হঠাৎ—'বলিয়া সে উমার মুখের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল,—অর্থাৎ বাড়ী সম্বন্ধে কিছু সে বলিয়াছে কিনা।...

মাসি কিন্তু একটি কথাও বলিল না, শুধু তাহার দুজনের খাবার কথা বলিয়া আপন মনেই রান্না করিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না মাসি, আমার আজ অনেক কাজ। খাওয়া আমাদের যেমন হোক্ হবে। সেজন্যে ভেবো না।' বলিয়া তাহার জামার পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া চপলা ঠাকরুণের পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার পনের টাকা পাওনা হয়েছে মাসি, তা এই পাঁচটি টাকা দিলাম কোনোরকমে জোগাড় করে', আর দশটি টাকা দেবো এর পর।'

মাসি কিন্তু না তাকাইল টাকার দিকে, না তাকাইল শ্রীহর্ষর দিকে। একমনে সে যেমন রান্না করিতেছিল, পিছন ফিরিয়া তেমনি রান্নাই করিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'টাকা পাঁচটা তুলে রাখ মাসি, আমি তা হ'লে খুকির মাকে নিয়ে চললাম।'

চপলা ঠাকরুণ বাঁ হাত দিয়া টাকা পাঁচটি সরাইয়া দিয়া বলিল, 'টাকা পাঁচটাও তুমি নিয়ে যাও শ্রীহর্ষ।'

'রাগ করলে মাসি ?' বলিয়া শ্রীহর্ষ হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার মাসির কাছে আগাইয়া গেল।

'না রে না রাগ করিনি। রাগ-অভিমান যার-তার ওপর করা চলে না বাছা, সেটুকু বোঝবার বয়েস আমার হয়েছে।' এই বলিয়া উনান্ হইতে এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটা টিপ্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া চপলা ঠাকরুণ বলিল, 'তবে তাই যা মা উমা, নিতেই যখন এসেছে তখন আর বেলা করছিস্ কেন, ওঠ।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উমা তাহার ঘুমন্ত মেয়েটিকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চপলা ঠাকরুণ টাকা পাঁচটি তুলিয়া লইয়া উমাকে একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'নে ধর্! শ্রীহর্ষকে ত' চিনি, শীতকাল আসছে, মেয়েটির গরম জামা একটি কিনে দিস্।'

উমা ভাবিল, মাসি হয়ত রাগ করিয়াই টাকা পাঁচটি ফিরাইয়া দিতেছে। বলিল, 'সে কি মাসি! না মাসি, ও টাকা নিতে আমি পারব না।'

'পারব না কি লা ? আমি দিচ্ছি, টাকা তোকে নিতেই হবে। শ্রীহর্ষকে বলিস্‌নি, নে।' বলিয়া টাকা পাঁচটি উমার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া চপলা ঠাকরুণ বলিল, 'সময় পেলে একদিন আসিস্ যেন, তোর নতুন বাড়ী দেখে আসব।'

রাস্তায় আসিয়া উমা বলিল, 'গাড়ী কোথায় ?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'গাড়ী কি জন্যে ? এইটুকু রাস্তা হেঁটে যেতে পার না ? চল একবার তুমি বাড়ীতে, তারপর তোমায় দেখাচ্ছি মজা!'

উমা ভয়ে ভয়ে বলিল, 'কেন, আমি কি করলাম ?'

ভেংচি কাটিয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'আমি কি করলাম! করলে আমার মুণ্ডু। কেন, বলতে পারলে না যে, গিয়েই আমি খুকির বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মাসি, তুমি বাড়ী যাও। তা নয়, ওই মাগীর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বসা হয়েছে। লোক পাঠিয়েছিলাম ত' লোককে কি বলা হয়েছে শুনি ? ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমায় যেন নিয়ে যায়! যদি না আসতাম ত' থাক্‌তিস্ ওই মাগীর বাড়ীতে না কি মতলব কি শুনি ?'

উমা তাহার পিছু পিছু চলিতে চলিতে বলিল, 'হ্যাঁগা, আমার দোষ দিচ্ছ কেন ? মাসির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, না গিয়ে কি করি বল! তুমি যে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ সে কথা ত' আমায় বলতে হয়, তা না, তোমায় জিগ্যেস্ করলাম ত' তুমি বললে, বলেছি কাল রাত্রে।'

শ্রীহর্ষ চট্ করিয়া একথার আর জবাব দিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি খানিক দূর আগাইয়া গিয়া বাঁহাতি একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, 'এসো। এই ত' চলে এলাম। এই টুকুর জন্যে আবার গাড়ী! জ্যাখো বাড়ীউলী মাগী আমার অনেক টাকা খেয়েছে। টাকা ও মাগী আমার

কাছে আবার চায় কোন্ লজ্জায়! তোমায় আনবার জন্যে আমায় যেতে হ'লো তাই, নইলে ও পাঁচ টাকাই কি আমি ওকে দিতাম ভেবেছ? কখ্খনো না।'

এত টাকার মালিক তাহার স্বামীর এই ছোট-লোকোমীর বিরুদ্ধে উমার অনেক কথাই বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু শ্রীহর্ষর ভয়ে সে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না। মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া সে তাহার পিছু পিছু পথ চলিতে লাগিল।

উমা যাহা কখনও তাহার স্বপ্নেও ভাবে নাই; তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। প্রকাণ্ড বাড়ী। এবং শুধু' বাড়ী নয়, বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর দামী দামী খাট, আলমারি, আর্শী তস্‌বির দিয়া সাজানো। আসবাবপত্রের অভাব নাই।

কলিকাতা শহরে এতবড় একখানা বাড়ীর দাম যে কত তাহা সে বাড়ীউলী চপলা ঠাকরুণের মুখে শুনিয়াছে।

কোলের ঘুমন্ত মেয়েটিকে উপরের একটি চমৎকার ঘরের মেঝের উপর শোয়াইয়া দিয়া উমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটি ঘর এবং ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব ভাল করিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মুটে কয়জনকে শ্রীহর্ষ তখনও পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাপ্য লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে।

শুনিতে শুনিতে উমার কান একেবারে ঝালাপালা হইয়া গেল। আজ আর গরীব ওই কয়টা মুটের সঙ্গে দু'একটা পয়সার জন্য ঝগড়া করা তাহার সাজে না। উপরের বারান্দা হইতে উমা বলিল, 'দিয়ে দাও না বাপু, ওদের ও সামান্য পয়সা।'

শ্রীহর্ষ চীৎকার করিয়া উঠিল—'চোপ রও!'

ভয়ে উমা একেবারে কাঠ হইয়া গিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু ছি, ইহা ভাল নয়। এ ঘর ও ঘর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে উমার মনে হইতে লাগিল,—ভগবান যখন না চাহিতেই তাহাকে এত দিয়াছেন তখন সেই বা অন্যকে কিছু দিবে না কেন? ছোটলোকের মত মুটেমজুরের সঙ্গে সামান্য ওই পয়সা লইয়া ঝগড়া করা তাহার স্বামী অন্যায়।

সমস্ত আসবাবপত্র সমেত এই এতবড় বাড়ীখানা যে তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, এখন হইতে সে এই বাড়ীর যেখানে সেখানে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে, উমার মন কিছুতেই সে কথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। দেখিল, সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্র বাড়ীতে সবই সাজানো রহিয়াছে, চপলা ঠাকরুণের বাড়ী হইতে মুটের মাথায় তাহাদের নিজেদের সংসারের যে জিনিষগুলি আসিয়াছে সে গুলা এ বাড়ীর নোংরা ময়লার গাদায় ফেলিয়া দিলেও চলে। আবার তাহারই জন্য মুটেদের সঙ্গে তাহার স্বামী ঝগড়া যে কেন করিতেছেন কে জানে।

উমার একটা রূপকথার গল্প মনে পড়িল। একদিন কোথাকার ঘুঁটেকুড়োনীর ছেলে পথের ধারে খেলা করিতেছিল, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড হাতী আসিয়া তাহাকে পিঠে তুলিয়া লইয়া গিয়া কোথাকার এক রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দিল। গল্পটা এম্‌নি। তাহাদেরও যেন ঠিক তাহাই হইয়াছে। আর তাহাদের অভাব নাই, দৈন্য নাই, গরীবের মত আর তাহাদের থাকিতে হইবে না। স্বামী বলিয়াছে তাহার জন্য ঝি রাখিয়া দিবে। সে শুধু এই ঘরে বসিয়া বসিয়া হুকুম চালাইবে।

রেলিং-দেওয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে উঠানটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড উঠান। চপলা ঠাকরুণের বাড়ীতে লম্বাচওড়া উঠান অভাবে ভিজা কাপড় শুকাইবার কষ্টের আর সীমা ছিল না। এখানে ওই উঠানের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত লম্বালম্বি একটা তার কিম্বা দড়ি টাঙ্গাইয়া দিলে এক সঙ্গে বিস্তর কাপড় শুকানো চলিতে পারে। ওদিকে একটা গোয়ালও রহিয়াছে। এককালে ওখানে হয়ত বাবুর গাইগরু থাকিত। তাহাদেরও এবার একটা গাই রাখিতে হইবে। তাহা হইলে মেয়েটার দুধের অভাবও হইবে না, গোবরের ঘুঁটে দিলে ঘুঁটেও কিনিতে হইবে না।

বাড়ীটার সুবিধা অনেক।

তবে অসুবিধার মধ্যে—এতবড় বাড়ী, কিন্তু বাস করিবার লোক মাত্র তাহারা দু'জন। ঘরগুলা খালি পড়িয়া থাকিলে খাঁ খাঁ করিবে, ধুলাবালি জড়ো হইয়া নোংরা হইয়া থাকিবে, তাহা ছাড়া একা একা রাত্রে হয়ত' তাহার ভয়ও লাগিতে পারে।

* * * *

সেদিন আর রান্না হইল না। শ্রীহর্ষ বাজার হইতে শাল পাতার ঠোঙায় করিয়া খানকতক লুচি, খানিকটা তরকারি আর খানিকটা ডাল কিনিয়া আনিল। যাহা আনিল তাহা দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট ত' নয়ই, বরং কম। উমার তাহাতে আপত্তি নাই। এ-সব তাহার গা-সওয়া হইয়া গেছে। নিতান্ত অবেলায় সেদিনের মত তাই দিয়া কোনো রকমে তাহাদের আহার সমাপ্ত করিয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'আজ আর রাত্তিরে রান্না করতে হবে না, কি বল? এত অবেলায় এই লুচি-তরকারি খেয়ে রাত্রে আর খাওয়া চলে না।'

বলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া আরও খানিকটা জল খাইয়া গদি-আঁটা একটা চেয়ারের উপর সে চাপিয়া বসিল।

উমারও খাওয়া তখন শেষ হইয়া গেছে। এঁটো পাতাগুলা ফেলিয়া দিয়া জায়গাটা পরিষ্কার করিতে করিতে সে মুখ নামাইয়াই ঈষৎ হাসিল।

হাসিটা যে শ্রীহর্ষ দেখিতে পাইবে তাহা সে ভাবে নাই। শ্রীহর্ষ বলিল, 'হাসলে যে?'

মুখ তুলিয়া উমা বলিল, 'হ্যাঁগা, এখনও তোমার কি ওই-কথা বলা সাজে? খারাপ অবস্থা আমার যদি সত্যিই হতো তাহ'লেও ত' তোমায় আমি না খাইয়ে ছাড়তাম না।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'খেতে যদি না পারি তাহ'লেও কি পয়সা খরচ করতে হবে নাকি? এ যে দেখছি বড়লোকের বাড়ীতে এসেই তুমি বড়লোক হয়ে গেলে।'

উমা বলিল, 'খেতে তুমি পারবে তা আমি জানি। পয়সা খরচের ভয়ে রাত্তিরে উপোস দিয়ে পড়ে থাকতে তোমায় আমি দেবো না।'

এই বলিয়া হাত ধুইবার জন্য উমা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বেশী কিছু ত' আনতে হবে না, চাল ডাল কিছু কিছু করে সবই আছে, শুধু দুটো তরি-তরকারি আর মাছ যদি পাও ত' ভালোই।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আজ রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা নাই বা করলে! ঘুঁটে কয়লা সবই আনতে হবে ত?'

উমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। ও-ঘরে একটা ষ্টোভ রয়েছে দেখলাম। রাত্তির মত ওইতেই চালিয়ে নোবো। কাল সকালে কিন্তু সবই চাই। এ-বাড়ীতে এসেও যে সেই দু'পয়সার তেল আর এক পয়সার নুনের জন্য পঞ্চাশবার বাজারে ছুটবে সে আমার ভাল লাগবে না বাপু, মাসকাবারী জিনিষ তুমি একসঙ্গে দোকান থেকে এনে দিও।'

শ্রীহর্ষ চুপ করিয়া আছে দেখিয়া উমা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ভগবান আমাদের ওপর এত দয়া যখন করলেন তখন তোমার দুটি পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি, তুমি আর ও-রকম কোরো না। কে কোন্ দিন মরে যাব তার ঠিক নেই, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সুখে থাকি। বুঝলে?'

শ্রীহর্ষ বুঝিল কিনা কে জানে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দাও তবে একটা জায়গা দাও।'

উমা বলিল, 'দাঁড়াও, শুধু ত' বাজার আনলেই চলবে না। মালতীর দুধ আনতে হবে। হ্যাঁগা, ও-বাড়ীর গয়লাকে যে বলে' আসা হলো না? সে হয়তো দুধ নিয়ে চপলা ঠাকরুণের বাড়ী গিয়ে হাজির হবে। ঠাকরুণও আমাদের ঠিকানা জানে না যে, বলে দেবে।'

কথায় কথায় পাছে অন্য কথা উঠিয়া পড়ে বলিয়া শ্রীহর্ষ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'তা হোক্, তা হোক্, দাও—দুধের জায়গা দাও, দেরি করলে দুধ হয়ত না পেতেও পারি।'

কিন্তু যাহার ভয় সে করিতেছিল, উমা তাহাই বলিয়া বসিল। বলিল, 'দুধওয়ালা দুমাসের দাম পাবে বলছিল, তার টাকাটাও ত' দিতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ কর না! ঠাকরুণের বাড়ীতেই যাও। গিয়ে গয়লার সঙ্গে দেখা হয় ভালই, না হয় ত' ঠাকরুণকে ঠিকানা দিয়ে এসো।'

শ্রীহর্ষ চীৎকার করিয়া এমনভাবে কথাটার জবাব দিল, মনে হইল যেন সে অত্যন্ত রাগিয়াছে। বলিল, 'দুমাসের টাকা পাবে কি রকম? টাকা পেলেই হ'লো কি না? ব্যাটা শয়তান! শিবপদবাবু সব টাকা ওর মিটিয়ে দিয়ে গেছেন আমি জানি। দরকার নেই ওর কাছে দুধ নিয়ে, আমি অন্য গয়লা ঠিক করব।'

উমা এই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল যে, গয়লা তাহার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, শিবপদবাবু টাকা তাহার দেন নাই। তাহা ছাড়া যে দুধ সে তাহার মেয়েকে খাওয়াইয়াছে সে দুধের দাম না দেওয়া অন্যায়, সুতরাং গয়লার টাকা মিটাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীহর্ষর মূর্ত্তি দেখিয়া উমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, ধীরে-ধীরে দুধের একটু জায়গা আনিয়া দিয়া বলিল, 'তুমি

বেরিয়ে গেলে এই এতবড় বাড়ীতে ওই কচি মেয়ে নিয়ে আমি একলাই বা থাকি কেমন করে! পার ত' তার একটা ব্যবস্থা কোরো।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে শ্রীহর্ষ বাহির হইয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, সে ঘটি ভরিয়া মেয়ের জন্য দুধ আনিয়াছে, বাজার হইতে তরি-তরকারি আনিয়াছে এবং উমা যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই—সঙ্গে করিয়া একজন ঝিও সে ডাকিয়া আনিয়াছে।

উমা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার ঝি আসিয়াছে। বলিল, 'তোমায় কিন্তু মা সারা দিনরাত এইখানে থাকতে হবে। আমার লোকজন কেউ নেই।'

বৃদ্ধা ঝি। নাম—সারদা। সেও ঠিক তাহাই চাহিতেছিল। বলিল, 'হ্যাঁমা, তাই থাকব। কিন্তু হ্যাঁগা মেয়ে, তোমরা ত' দেখছি দুটি মানুষ, তার জন্য এত বড় বাড়ী ভাড়া নিলে কেন মা? দেশ থেকে লোকজন সব এখনও বুঝি এসে পৌঁছোয় নি?'

উমা বলিল, 'না মা, বাড়ীখানি আমার নিজের বাড়ী।'

সম্ভ্রমে সারদার মাথা নত হইয়া আসিল। যাক্ কলিকাতা শহরে বোন্-ঝির কথা শুনিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিল, আসিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। চাকরি অভাবে আজ দু'মাস সে বসিয়া আছে, ভাল করিয়া পেট ভরিয়া দুবেলা খাইতেও সে পায় নাই। এতদিন পরে যাহোক তাহার হিল্লে হইয়া গেল।

কিন্তু হিল্লে হওয়া শ্রীহর্ষর কাছে এত সহজ ব্যাপার নয়।

সারদার কাজ তখন প্রায় একমাস শেষ হইতে চলিয়াছে। শ্রীহর্ষকে উমা বলিয়া রাখিয়াছে যে, মাস শেষ হইলেই তাহার টাকা চাই। বেচারা বড় গরীব। দেশে টাকা না পাঠাইলে দুইটি অল্প বয়সের বিধবা মেয়ে তাহার উপবাসে দিন কাটাইবে।

শ্রীহর্ষ বলিয়াছে, 'আচ্ছা।'

মাস শেষ হইতে তখনও দিন-দুই বাকি, সেদিন সকালে বেশ বাদল নামিয়াছে। শীতকালের সকাল। টিপি টিপি বৃষ্টির বিরাম নাই। শীতের চোটে মানুষগুলা একেবারে হিমসিম্ খাইয়া গেছে।

শিবপদবাবুর আলমারির তালা খুলিয়া যে কয়খানা দামী আলোয়ান পাওয়া গিয়াছে সেগুলা বিক্রি করিবার জন্য পাশের একটা টেবিলের উপর গাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল, শ্রীহর্ষ শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শীতের চোটে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারই একটা গায়ে দিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

উপরের এই সার্সী-দেওয়া খোলা বারান্দা হইতে নীচের বাগান এবং লাল কাঁকরের যে পথটা বরাবর ফটকে গিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথের কিয়দংশ নজরে পড়ে। শ্রীহর্ষ দেখিল সেই পথের উপর দিয়া টিপি টিপি বৃষ্টির ভিতর মাথায় একটি দামী শাল চাপা দিয়া কে যেন একটি স্ত্রীলোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ কি যেন সন্দেহ হইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, মেয়েটি তাহাদেরই সারদা ঝি।

তৎক্ষণাৎ সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া একরকম ছুটিয়াই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং তেমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে সারদাকে গিয়া যখন সে ধরিল, তখন সে ফটক পার হইয়া এদিকের বড় রাস্তার উপর একটা দোকানের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে।

কে একটা লোক তাহাকে এমন অতর্কিত পিছন দিক হইতে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়াছে দেখিবার জন্য সারদা পিছন ফিরিয়া দেখে তাহার মনিব শ্রীহর্ষবাবু। অমনি সে খানিকটা জিব কাটিয়া সসম্ভ্রমে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বাবু তখন তাহার মাথা হইতে শালটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে এক লাথি মারিয়াছে। একে বুড়া মানুষ, তার আবার সেই কোন্ ভোর রাত্রি হইতে উঠিয়া জলে ভিজিয়া ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাজ করিতেছে, লাথি খাইয়া বেচারা একেবারে রাস্তার মাঝখানে গিয়া গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীহর্ষ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চোর বদমায়েস্ মাগী কোথাকার! চল তোকে আমি পুলিশে দেবো।'

চোর? ব্যাপার দেখিয়া দোকানী তাহার দোকান হইতে টপ্ করিয়া লাফাইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তাও একেবারে নির্জ্জন ছিল না। যে যেখানে ছিল ছুটিয়া গিয়া ভিড় করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কি হয়েছে মশাই?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'চোর মশাই, এই শালখানা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

সর্ব্বনাশ!

'ধরুন মশাই, ধরে' দিয়ে আসুন থানায়।'

কিন্তু কাহাকেও ধরিতে হইল না, সারদা নিজেই উঠিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বারবার জলে ভিজে ভিজে দোকানে আসছিলাম বাবু, তাই মা আমায় ওটা দিলে, বললে, এইটে মাথায় নিয়ে যাও সারদা, আমি চুরি করিনি, বাবু, চুরি করবার মত লোক আমি নই।'

কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি আপনার বাড়ীর ঝি নাকি মশাই?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ওকে আমি নতুন বহাল করেছি মশাই, এখনও একমাস হয়নি।—কি বললি? মা তোকে দিয়েছিল? এই শাল মাথায় দিয়ে বাজার করতে বলেছিল? মিথ্যাবাদী চোর কোথাকার!'

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মোটেই নয়। এত দামী শাল বাড়ীর গিন্নি ঝিকে দিয়াছে জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া বাজার করিতে! কথাটাকে সকলে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল।

সারদা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'মাকে আপনি শুধিয়ে দেখবেন বাবু, আসুন।'

এই বলিয়া সে বাড়ীর দিকে যাইতেছিল; শ্রীহর্ষ বলিল, 'খবরদার বলছি মাগী, তুই আর আমার বাড়ী ঢুকিস্‌নি। তোকে আমি পুলিশে দিলাম না এই ঢের।'

কে একটা লোক তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, 'কেন মিছেমিছি সাধু সাজবার চেষ্টা করচিস বাপু, ভালোয় ভালোয় আপনার বাড়ী চলে যা। নইলে কি শেষে এই বুড়ো বয়সে—'

সকলে তাহাকে সেই পরামর্শই দিল। পুলিশে না দিয়া বাবু যখন তাহাকে ছাড়িয়াই দিলেন তখন আর বৃথা সাধু সাজিবার চেষ্টা করিয়া কোনও লাভ নাই, মানে মানে এইখান হইতে তাহার বিদায় লওয়াই উচিত।

সারদা আসিয়াছিল দোকানে এক পয়সার পাঁচফোড়ন্ কিনিতে। কাঁদিতে কাঁদিতে পয়সাটি সে বাবুর হাতে দিয়া বলিল, 'এক পয়সার পাঁচ ফোড়ং তাহ'লে আপনি—'

কান্নার ধমকে ঠোঁট দুইটা তাহার কাঁপিতে লাগিল, কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

শালখানা হাতে লইয়া শ্রীহর্ষ বাড়ী ফিরিতে উমা বলিল, 'সর্দ্দি হয়েছে বললে, ভাবলাম আদা দিয়ে একটু চা করে দিই। চা ইদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কোথায় গিয়েছিলে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'গিয়েছিলাম সেই চোর মাগীকে বিদেয় করে' দিতে। দিয়ে এলাম বিদেয় করে'। আর সে এ-পথ মাড়াবে না।'

কথাটা উমা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল 'চোর কে গো?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তোমার ওই সারদা ঝি। এই শালখানা নিয়ে পালাচ্ছিল।"

উমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'সে কি গো! ও যে আমিই ওকে মাথায় দিয়ে পাঁচফোড়ন্ আনতে পাঠিয়েছিলাম দোকানে! সেই কোন্ ভোর রাত্তির থেকে বেচারা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করছে। দোকানে যেতে বললাম ত' ও একটা শুকনো কাপড় চাইলে। তা তোমার বাড়ীতে না আছে একটা ছাতি, না আছে একখানা শুকনো কাপড়, ওই শালটা আমিই গায়ে দিয়ে ছিলাম, হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে বললাম, তা এই নাও বাছা, এইটেই একবার মাথায় দিয়ে নিয়ে এসোগে যাও। চুরি কেন করবে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তা বেশ হয়েছে। তুমি চুপ করে' থাকো।'

চায়ের বাটিটা উমা তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'চুপ করে' থাকব কি গো? সে যখন এসে বলবে—মা তুমি বল সত্যি কথা! তখন?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না না সে আর আসবে না। আসে ত' আমি আবার তাড়িয়ে দেবো। তুমি চুপ করে' থাকো। আমি তোমার অন্য ঝি এনে দিচ্ছি।'

উমা অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। সারদাকে এই লোকটি কেন যে তাড়াইল তাহা সে বুঝিয়াছে। সারদার অপরাধ—সে তাহার বেতন চাহিয়াছিল। আহা বেচারা! বুড়া বয়সে কলিকাতায় আসিয়াছে চাকরি করিবার জন্য। দেশে তাহার

দুইটা বিধবা মেয়ে—মা টাকা পাঠাইবে বলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া আছে।

উমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ঝি আর তোমার আনতে হবে না। আমি নিজেই যেমন করে' পারি চালাব। কিন্তু সারদার একমাসের মাইনে তুমি দিয়ে দিও।'

'আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি চুপ করে' থাকো।' বলিয়া শ্রীহর্ষ বোধ করি সেখান হইতে উঠিয়া পলাইবার জন্য চায়ের বাটিটা শেষ না করিয়াই নামাইয়া দিয়া বলিল, 'তোমায় নিয়ে আর পারলাম না দেখছি। সংসার করতে হ'লে এমন অনেক কিছু করতে হয়।'

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

উমা বলিল, 'কে জানে বাপু! আমার ত ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করে। এত অধর্ম্ম করলে মেয়েটা আমাদের বাঁচবে কেমন করে' কে জানে!'

'অধর্ম্ম না তোমার গুষ্টির মাথা!' বলিয়া শ্রীহর্ষ চলিয়া গেল।

পাছে বাড়ীতে থাকিলে সারদা আবার আসিয়া তাহার বেতনের জন্য কান্নাকাটি করে এই ভয়ে শ্রীহর্ষ সেই গরম কাপড়ের দামী দামী শাল কয়খানা একটা কাগজে জড়াইয়া লইয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উমার কাছে গিয়া বলিল, 'মাগী এলে তুমি যেন তাকে আবার কাজে গতিয়ো না বলে দিচ্ছি। বোলো—আমি কিছু জানি নে মা, বাবু এলে তার কাছে যা হয় কোরো!'

উমা একবার বাহিরের পানে তাকাইল। দেখিল, বৃষ্টি তখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই। বলিল, 'এই বৃষ্টির দিনে নাই-বা বেরোলে!'

কিন্তু সে-কথায় সে কর্ণপাত করিল না। উমা দেখিল, গরম কাপড়ের প্রকাণ্ড বাণ্ডিলটি বগল-দাবা করিয়া স্বামী চলিয়া যাইতেছে।

যাক্, কিন্তু উমা সেইখান হইতে হাঁকিয়া বলিল, 'বেশি দেরি ক'রো না যেন। রান্না হ'য়ে গেছে।'

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণা-চতুর্থী

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মন্দিরের পিছনেতে চাঁদ,
--চতুর্থীর কৃষ্ণা চাঁদ, সলজ্জ পাণ্ডুর!
দীঘির রহস্য-নীরে সে ফেলেছে মন্দিরের ছায়া,
কিম্বা তার স্বপ্ন বুঝি।

মন্দিরের স্বপ্ন দেখে চাঁদ কল্পনার মত গাঢ় অতল সলিলে
চাঁদ খোঁজে আত্মা মন্দিরের
নিরালা নিস্তব্ধ রাতে মন্দিরের অর্থ চাহে চাঁদ
জ্যোৎস্না দিয়ে নব-ব্যাখ্যা করে।

এখানেও উঠিয়াছে চাঁদ,
আলোর বিরহ গেছে,
আলো আজ ছায়ারি মতন।
সব সীমা গেছে মুছে,
বস্তু আর চেতনার সীমা।

সূর্য্যের অন্বয় জানি
জীবনের সুকঠিন, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান,
শূন্যতা সহেনা তার
আকাশ সে রাখে ঢাকি, নীলের ছলনা দিয়া।

জীবনেরে আর ধরণীরে,
দিতে চাহে প্রাঞ্জলতা,
সত্যেরে সীমানা।

রৌদ্রের দীক্ষায় মোরা তাই,
শুধু শেষ মূল্য খুঁজি,
সব কিছু চাহি মাপিবারে,
প্রেম ও জীবন,
—আত্মারও পরিধি খুঁজি।

তারপর চাঁদ আসে,
অকস্মাৎ,
আকাশ ভুলিয়া যায় সুনীল সমাপ্তি,
আকাশ অনন্ত হয় তারকার সঙ্কেত-শিখায়;
সৃষ্টি হয় অপরূপ!
জানারে ঘিরিয়া থাকে অজানার রহস্য-ইঙ্গিত
চাঁদের ব্যাখ্যায়।
সহসা বিস্মৃত হই মূল্যের অতীত লোকে
আপনার নিরুদ্দেশ বিস্ময়ের মাঝে।

প্রদর্শনী

কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা

[১] খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের দুইটী মুদ্রা

ভারতে মুদ্রার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। মোহেন্ জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একটী চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে সেই সময়ের লিপিতে কিছু উৎকীর্ণ আছে—বোধ হয় এইটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন মুদ্রা। প্রাচীন ভারতের মুদ্রা চতুষ্কোণ হইত,—নাতিস্থূল রজত বা তাম্রপত্রের চতুষ্কোণ খণ্ডের উপরে নানা প্রকার চিহ্ন বা লাঞ্ছন অঙ্কিত থাকিত। এই চিহ্নগুলি হয় কোনও রাজার, না হয় বিভিন্ন নগর-শ্রেষ্ঠীর, অথবা নাগরিকগণের হইত। এখন আমাদের পক্ষে এই চিহ্নগুলির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে অবধারণ করা কঠিন। এইরূপ শত শত চতুষ্কোণ মুদ্রা ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এ গুলিকে "পুরাণ" বলে। অধিকাংশই মৌর্য্য যুগের বলিয়া অনুমিত হয়, তবে কতকগুলি তাহার পূর্ব্বের কালেরও হইতে পারে।

প্রাচীন পারস্যের মুদ্রার প্রভাব ভারতে পড়িয়া থাকিতে পারে, মুদ্রায় সিংহাদি জন্তর রূপ দেওয়া এই প্রভাবের ফল হইতে পারে। ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে আলেক্সান্দর ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের পর হইতে কয়েক শতক ধরিয়া গ্রীক ও ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধ ও মিত্রতা উভয় সূত্রেই সংস্পর্শ ও মিলন ঘটে, এবং গ্রীক শিল্পের বিশেষ প্রভাব ভারতের শিল্পের উপরে পড়ে। ভারতের মুদ্রাতেও এই প্রভাব দেখা যায়। আলেক্সান্দরের ভারতে অবস্থানকালেই একজন ভারতীয় রাজা—ইঁহার নাম "সৌভূতি" (গ্রীকে Sophutes বা Sophytes), ইনি আলেক্সান্দরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন—নিজ প্রতিকৃতি দিয়া গ্রীক ধাঁজের একটী চমৎকার রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। গ্রীকেরা মুদ্রাপ্রণয়নে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা জগতে আর কোনও জাতি করিতে পারে নাই। গ্রীকদের দেখাদেখি ভারতের রাজা ও স্বাধীন জনগণ চতুষ্কোণ, নানা-চিহ্ন লাঞ্ছিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে মূর্ত্তি-চিত্র ও লেখ-যুক্ত বৃত্তাকার মুদ্রা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। আলেক্সান্দরের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতখণ্ডে ও আধুনিক আফগানিস্থানে কতকগুলি গ্রীক রাজা কিছুকাল ধরিয়া রাজত্ব করেন। ইঁহারা বিশুদ্ধ গ্রীক রীতির অনুমোদিত কতকগুলি মুদ্রার প্রচার করেন। ইঁহাদের মুদ্রায় একদিকে সাধারণতঃ রাজার প্রতিমূর্ত্তি, কচিৎ কোনও চিহ্ন বা লাঞ্ছন, এবং গ্রীক ভাষায় ও গ্রীক অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত থাকিত, আর অন্যদিকে ভারতীয় ভাষায় (দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাকৃতে) ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী অক্ষরে গ্রীক লেখাটীর অনুবাদ থাকিত। কখনও কখনও প্রাচীন ভারতীয় অর্থাৎ গ্রীক-পূর্ব্ব যুগের ধাঁজের মুদ্রা অর্থাৎ চৌকা আকারের মুদ্রা গ্রীক রাজারা প্রচার করিতেন। এইরূপ মুদ্রায় যেন ভারতীয় ও গ্রীক ভাবের একটা মিশ্রণ ঘটিত।

প্রদর্শ্যমান মুদ্রা-চিত্রাবলীর মধ্যে [১] ও [২] সংখ্যক চিত্র এইরূপ দুইটী মিশ্র ভারতীয়-গ্রীক তাম্রমুদ্রার এক দিকের চিত্র:—ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য ছবিগুলি আকারে বড় করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মুদ্রা দুইটী দুইজন গ্রীক রাজার—এক জনের নাম Pantaleon, অন্য জনের নাম Agathokles। এই রাজাদের রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ১৫৫ হইতে ১৪০ পর্য্যন্ত—ইঁহারা প্রাচীন গান্ধারের—কাবুল ও আধুনিক ভারত সীমান্ত অঞ্চলের রাজা ছিলেন। মুদ্রা দুইটীর একদিকে একটী কেশরহীন ভারতীয় সিংহের মূর্ত্তি আছে, এবং গ্রীক ভাষায় ও গ্রীক অক্ষরে রাজাদের নাম আছে—Basileos Pantaleontos ও Basileos Agathokleou (ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ); অন্য দিকে আছে একটী স্ত্রী মূর্ত্তি, ও ব্রাহ্মী অক্ষরে প্রাচীন প্রাকৃতে ষষ্ঠ্যন্ত করিয়া রাজাদের নাম—'পংতলেবস' (অর্থাৎ পন্তলেবস্স), ও 'অগথুক্লেয়েস' (অর্থাৎ অগথুক্লেয়স্স)।

মুদ্রাদ্বয়ের এই স্ত্রী মূর্ত্তিটী কাহার? ঈষদ্বিভিন্ন পরিকল্পনায় একই মূর্ত্তি এই দুইটী মুদ্রায় বিদ্যমান। একটী তন্বী সুন্দরী স্ত্রী—মুদ্রা দুইটী বিশেষ ক্ষয়িয়া গেলেও, মূর্ত্তি দুইটীর সুষমা ও লালিত্য লুপ্ত হয় নাই—অর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তে একটী ফুল (অগথুক্লেয়ের মুদ্রা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সেটী পদ্ম ফুল), বাম হস্ত মনোহর ভঙ্গীতে ক্ষীণ কটিদেশে নিবদ্ধ। মূর্ত্তিটীতে শিল্পী সুন্দর ভাবে একটী গতি ভঙ্গী বা নৃত্য ভঙ্গী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মূর্ত্তিটীর অলঙ্কারাদি বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু কানের গোলাকার বড় বড় দুইটী অলঙ্কার পরিস্ফুট, এবং মাথায় মুকুটাকার একটী অলঙ্কার আছে বলিয়া মনে হয়। কটিদেশের ঊর্দ্ধ অনাবৃত, অংসন্যস্ত উত্তরীয় বাহুপার্শ্ব দিয়া গতি-বেগে উড়িতেছে, পরিধেয়ের সমাবেশটী ঠিক বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু সম্মুখে আজানুলম্বিত দুই পাট করা বস্ত্রখণ্ড যেন কোঁচার আকারে ঝুলিতেছে, তাহার পাশ দিয়া কটি-বন্ধন বস্ত্র বা উত্তরীয়ের অংশ বায়ুবেগে উড়িতেছে। অগথুক্লেয়ের মুদ্রায় তাহাকে সামনের বস্ত্র খণ্ডেরই সহিত সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই পরিচ্ছদ কুষাণ যুগের মথুরার ভাস্কর্য্যে চিত্রিত স্ত্রী-মূর্ত্তির যে মনোহর পরিচ্ছদ দেখা যায় তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর, এই দুইটী মুদ্রার চিত্রিত স্ত্রী-মূর্ত্তি দুইটী যে অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কলারসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

সাধারণত মূর্ত্তি দুইটীকে 'ভারতীয় নর্ত্তকী' মূর্ত্তি বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক কি নর্ত্তকীমূর্ত্তি মুদ্রায় লাঞ্ছন-হিসাবে ব্যবহৃত হইত? অন্য গ্রীক রাজগণের মুদ্রায় এই রূপ স্থলে গ্রীক দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়, যথা আপোল্লো, আথেনা, দিওস্কোউরোই, জে উস্ ইত্যাদি। এই দুই গ্রীকরাজার মুদ্রায় স্বজাতির দেবতার পরিবর্ত্তে ভারতীয় নর্ত্তকী-মূর্ত্তি দিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অপিচ ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত হইবে যে, ভারতীয় রীতি অবলম্বন করিয়া যেমন ইঁহারা চতুষ্কোণ মুদ্রা প্রচার করিয়াছেন, তেমনি

ভারতীয় প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য, অথবা নিজেদের শ্রদ্ধা সেদিকে নীত হওয়ায় ইঁহারা গ্রীক দেবতার পরিবর্ত্তে ভারতীয় কোনও দেবতার মূর্ত্তি দিয়াছেন। এবং ভারতীয় দেবতাদের মধ্যে এই মূর্ত্তিকে শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া ধরাই সঙ্গত হইবে। কারণ পদ্মহস্তা দেবী, ইনি পদ্মা, কমলা বা লক্ষ্মী।

সমসাময়িক ভারতীয় ভাস্কর্য্যে—ভারহুৎ-সাঁচীতে ও অন্যত্র, এবং এই যুগের পরের যুগের অনুরূপ অন্য মুদ্রায়, এই প্রকারের এক হস্তে পদ্ম ও অন্য হস্ত কটিদেশ-নিবদ্ধ দেবীর মূর্ত্তি আছে। এবং তিনি কমলা বা শ্রী বা লক্ষ্মী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এই শ্রীদেবী ঐ যুগে বিষ্ণু-ভার্য্যা রূপে পরিকল্পিত হইতেন না—ইনি জগন্মাতা রূপেই পরিকল্পিত হইতেন, ইনি 'সিরিমা' বা 'শ্রী মা' দেবী।

এই গ্রীক রাজাদেরই ভক্তি-শ্রদ্ধার ফলে শ্রীদেবীর মূর্ত্তি এইরূপে মুদ্রায় প্রথম অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, ভারতীয় রাজারাই ও জনগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে শ্রীর মূর্ত্তি লাঞ্ছন-স্বরূপে নিজ মুদ্রায় ব্যবহার করিতেন, এবং গ্রীক রাজারা তাহার অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র। তবে সেই সময়ে যে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব ভারতের মুদ্রা-শিল্পে পড়িয়াছিল, তাহাও স্বীকার্য্য। প্রাচীন ব্রাহ্মী-লিপিযুক্ত একটী তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এক দিকে ডান হাতে পদ্ম লইয়া কোমরে বাঁ হাত রাখিয়া পদ্মের উপরে দণ্ডায়মানা একটী দেবী, তাঁহার পাশে অজ্ঞাতার্থ একটী চিহ্ন বা লাঞ্ছন; অন্য দিকে উপরে তিনটী লাঞ্ছন, নীচে ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার নাম লেখা—'ফগুনিমিত্রস' ('অর্থাৎ ফাল্গুনিমিত্রস্য')। এই ফাল্গুনিমিত্র পঞ্চাল দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এই মুদ্রার মূর্ত্তিটীর অঙ্কন-শিল্প অপকৃষ্ট, কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিল্প-ধারা অনুসারেই ইহাতে শ্রীদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রকারের ভারতীয় মুদ্রার অনুকরণে যে গ্রীক রাজারা শ্রীমূর্ত্তি মুদ্রার লাঞ্ছন-স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহা খুবই সম্ভব।

[২] গুপ্ত-যুগের মুদ্রা—প্রাচীন পরিচ্ছদ, তৈজস, অলঙ্কারাদি

নানা দিক্ দিয়া বিচার করিলে, গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটদের কালে ভারতবর্ষ যে চরম উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তা স্বীকার করিতে হয়। এই যুগের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে এই যুগের মুদ্রা। গুপ্ত-যুগের বহু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এগুলি নানা মনোহর চিত্র দ্বারা মণ্ডিত, এবং গুপ্ত-যুগের প্রৌঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের ধারা অনুযায়ী এই সকল মুদ্রা-চিত্র। বিষ্ণুভক্ত গুপ্ত সম্রাট্‌গণ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় তখনকার যুগে প্রচলিত ব্রাহ্মী অক্ষরে মুদ্রালেখ লিখাইতেন। এইরূপ তিনটী মুদ্রার একদিকের প্রতিলিপি বড় করিয়া প্রদত্ত হইল—চিত্রসংখ্যা [৩], [৪] ও [৫]।

তিনটীই সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা—সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ছিল খ্রীষ্টাব্দ ৩৩৫ হইতে ৩৮০। [৩] চিত্রে গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আসীন, ও বীণাবাদনে রত। সম্রাটের প্রশস্ত কপাটবক্ষ,—তাঁহার কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নাবলী, পরিধানে ক্ষুদ্রাকার ধুতি, পাদদেশে পাদপীঠ। সম্রাটের মাথা বেড়িয়া প্রভাজাল। সিংহাসনের আকারটী লক্ষণীয়। বীণাটী (harp) আমাদের পরিচিত বীণার মত নহে—ইহা ধনুকের আকারের বীণা, ইহাতে লাউ নাই। এইরূপ বীণাই সুপ্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল—অলাবু-যুক্ত বীণার প্রচলন পরে হয়,—ইহা মিসর ও অন্য প্রাচীন দেশের harp বা lyre জাতীয় বীণার মত। সম্রাটের মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে গোল করিয়া তাঁহার নাম লেখা—'মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তঃ'—সম্রাটের সামনে 'সমুদ্রগুপ্তঃ' বেশ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের ভারতীয় রাজার পরিচ্ছদের ও সিংহাসনের এবং বসিবার ভঙ্গীর চমৎকার চিত্র এটী। [৪] সংখ্যক চিত্রটী যোদ্ধ্‌বেশে দণ্ডায়মান সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের চিত্র। সম্রাটের মাথায় শিরস্ত্রাণ, মাথা ঘেরিয়া প্রভামণ্ডল; পরিধানে অশ্বারোহীর উপযুক্ত পরিচ্ছদ, উত্তান বাম হস্তে ধনু, নিম্নগ দক্ষিণ হস্তে তরবারী বা দণ্ড, সম্মুখে গরুড়ধ্বজ—কাষ্ঠময় দণ্ড, তাহার উপরে ধাতুময় গরুড়মূর্ত্তি, মূর্ত্তির নিম্নে রঙ্গীন কাপড় ফিতার মত করিয়া ধ্বজ-দণ্ডে বাঁধা। রাজার পরিধানে যোদ্ধার উপযোগী পাজামা, পদদ্বয় চর্ম্ম বা উপানৎ দ্বারা আবৃত। রাজার বাম দিকে তাঁহার নাম বেশ পড়া যাইতেছে ... উপর উপর তিনটী অক্ষর 'স মু—দ্র'। বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক সুশ্রী সুঠাম দেহ চিত্রিত হইয়াছে। [৫] সংখ্যক মুদ্রাটীও সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে প্রচারিত - কিন্তু এইরূপ মুদ্রা তাঁহার পিতা গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপত্নী লিচ্ছবি-দুহিতা কুমারদেবীর বিবাহের স্মারক বলিয়া ধরা হয়। যোদ্ধ্‌বেশে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বাম হস্তে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত ধ্বজদণ্ড লইয়া, নববিবাহিতা কুমারদেবীকে দক্ষিণ হস্তে একটী অঙ্গুরীয় বা বলয় অর্পণ করিতেছেন। কুমারদেবীর দেহের ঊর্দ্ধভাগ অনাবৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে—স্ত্রীলোকেরও এইরূপ পরিধেয়-বিরলতা আধুনিক মালাবার বা বলিদ্বীপের মত ভারতবর্ষে তখন সাধারণ ব্যাপার ছিল, রাজপরিবারেও এইরূপ ছিল। রাজার বামপার্শ্বে তাঁহার নাম লেখা;—উপর হইতে নীচে অক্ষরগুলি পড়া যায় 'চ—ন্দ্র' ও 'গু—প্ত'; এবং রাণীর দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার নাম অংশতঃ পড়া যায়—'শ্রীকুমারদেবী।' উপর হইতে নীচে অক্ষর লেখা চীনা লেখার রীতির অনুরূপ - হয় তো চীনা-লিপির সহিত পরিচয়ের ফলে ভারতবর্ষেও প্রাচীন কালে দেশীয় লিপির অলঙ্করণ-স্বরূপ এই কায়দা অনুসৃত হইতে থাকে।

[৩] সম্রাট্ আকবরের 'সীতারাম' চিত্রযুক্ত স্বর্ণ-মুদ্রা

মোহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম্ম-গ্রহণের পরে, অর্দ্ধ-বর্ব্বর আরবেরা আরবদেশের বাহিরের দুইটী প্রধান সভ্য জাতি, গ্রীক ও পারসীকগণের সহিত সংঘর্ষে ও সংস্পর্শে আসিল, এবং নানা দিক দিয়া এই দুই জাতি কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইল, ইহাদের প্রাচীন সভ্যতার অংশ লইয়া ক্রমে আরব সভ্যতা বা ইসলামী সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। নবী মোহম্মদের ব্যক্তিত্ব ও তৎপ্রচারিত আরবী কোরান-গ্রন্থ সমগ্র ইসলামীয় জগৎকে এমন একটী বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল যে এই ইসলামীয় সভ্যতা ও মনোভাব ক্রমে সত্যসত্যই দেশ ও জাতি-নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে চক্ষু-গ্রাহ্য শিল্পকে অন্তরায় বলিয়া মনে করা এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, ছন্দোময়

মণ্ডন বা অলঙ্করণ শিল্প, এবং স্থাপত্য, এই দুই প্রকারের শিল্প ভিন্ন অন্য শিল্পের স্থান ইস্‌লামীয় সভ্যতায় বড় একটা নাই—এবং মানবদেহকে আশ্রয় করিয়া যে শিল্প-সৃষ্টি আমরা প্রাচীন মিসরে, গ্রীসে ও ভারতবর্ষে দেখি, তাহাকে ইহাতে অনেকটা বর্জ্জনই করা হইয়াছে।

ইহার ফলে এক পারস্য ও ভারতবর্ষ ছাড়া ইস্‌লামাধ্যুষিত অন্য কোনও দেশে লক্ষণীয় চিত্র শিল্পের উদ্ভব হইতে পারে নাই—ভাস্কর্য্য কোথাও স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। মুদ্রা-সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। বিশুদ্ধ ইস্‌লামানুমোদিত মুদ্রায় কোনও মূর্ত্তি বা চিত্র থাকিতে পারে না; থাকে কেবল ঈশ্বরের নাম, কোরান হইতে উদ্ধৃত বচন, এবং মুসলমান কলমা বা ধর্ম্মবীজ। রাজার নাম ও বিরুদ, তারিখ, মুদ্রাপ্রস্তুতের স্থানের উল্লেখও সর্ব্বদা করা হয়।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া এইরূপ মুদ্রার মূল্য অত্যন্ত অধিক। শিল্পের দিক দিয়া মাত্র calligraphy বা সুন্দর-লিখন-শিল্পের নিদর্শন ছাড়া আর কোনও গুণপনা এইরূপ মুদ্রার নাই।

প্রথমটা পারস্য ও সিরিয়া-বিজয়ের পরে মুসলমান আরবেরা বিজাতীয় গ্রীকদের স্বর্ণমুদ্রা ও পারস্যের সাসানীয় রাজাদের রৌপ্যমুদ্রার নকলকেই নিজেদের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল নকলে মূল গ্রীক ও পারসীক মুদ্রার অনুরূপ মূর্ত্তি প্রতিকৃতি আদি থাকিত। দমস্ক নগরকে রাজধানী করিয়া ওমর্‌য়-বংশীয় খলীফাদের আমলে যখন এক মুসলমান আরব সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন ঐ বংশের পঞ্চম সম্রাট খলীফা আব্দুল মালিক (ইঁহার রাজ্যকাল ৬৮৪-৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশুদ্ধ মুসলমান কায়দায় নূতন এক প্রকারের মূর্ত্তি ও চিত্রহীন মুদ্রা প্রচলন করিলেন। সমগ্র মুসলমান জগতে এই মুদ্রার আদর্শই চিরকাল ধরিয়া বলবান্ রহিয়াছে।

কিন্তু এই রূপকর্ম্ম-বিহীন মুদ্রা সমস্ত মুসলমান জাতি ও রাজাদের খুশী রাখিতে পারে নাই। তুর্কী-জাতীয় সলজুক এবং ওরতুকী রাজাদের মুদ্রায় নানারূপ প্রতিকৃতি পাওয়া যায়;—গ্রীক্, রোমক, মধ্য যুগের ইউরোপীয় নানা চিত্রযুক্ত মুদ্রার নকলে এই সব মুদ্রা প্রস্তুত হইত (সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে)। ভারতবর্ষে দুই একটা চিত্রযুক্ত ভারতীয় (হিন্দু) মুদ্রার নকল এদেশের তুর্কী মুসলমান বিজেতা বা সুলতান দুই একজন প্রথমটা করিলেও, মূর্ত্তিবিহীন মুদ্রাই সর্ব্বজন-গৃহীত হইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারের ব্যত্যয় ভারতের মুসলমান রাজাদের আমলে দুইবার হইয়াছিল—সম্রাট্ আকবরের ও সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আমলে।

সম্রাট্ আকবর চিত্র-বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার আমলে ভারতীয় শিল্পের ও সাহিত্যের নানা বিষয়িণী উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রাগুলি সুন্দর ফারসী লেখার অনুপম সুন্দর নিদর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি চিত্র-যুক্ত তিন প্রকারের মুদ্রা প্রচার করেন—একটীতে বাজ-পাখীর ছবি আছে, একটীতে হাঁসের, ও আর একটীতে স্ত্রী-পুরুষের যুগল মূর্ত্তি পাওয়া যায়। বাজপাখী ও হাঁসের ছবি দুইটী অতি সুন্দর। শেষোক্ত স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তির মুদ্রাটী উপস্থিত আমাদের আলোচ্য। (এই তিন প্রকারের মুদ্রা ভিন্ন আকবর নিজ প্রতিকৃতিময় আর একটী চিত্রযুক্ত মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, এইরূপ একটী মুদ্রা লইয়া কিছুকাল হইল আলোচনাও হইয়াছে)।

এই মুদ্রাটী একটী অর্দ্ধমোহর—মূর্ত্তি দুইটী সীতা ও রামের। ইহার যে বড় প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল (চিত্রসংখ্যা [৩]), তাহার মূলটী পারিসে Cabinet de France নামক ফরাসীদের জাতীয় সংগ্রহে রক্ষিত আছে, R. B. Whitehead-এর Catalogue of the Coins in the Punjab Museum, Lahore, দ্বিতীয় খণ্ডের XXI সংখ্যক চিত্রে ইহার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পারিসে রক্ষিত এই মুদ্রাটীতে মূর্ত্তিদ্বয়ের উপরে দেবনাগরী অক্ষরে স্পষ্ট করিয়া 'রাম সীতা' লেখা আছে—সুতরাং তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। এই মুদ্রা খুব কমই আছে, ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে একটী আছে, কিন্তু তাহাতে দেবনাগরী 'রাম সীতা' লেখাটী নাই। অবগুণ্ঠনবতী সীতা মাথার ওড়না বাঁহাতে ধরিয়া ধনুর্ব্বাণধারী রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। সীতার পরিচ্ছদ আকবরের সময়ের রাজপুত মেয়েদের পোষাকের অনুরূপ; রামচন্দ্রের মাথায় মুকুট, অথবা জটাভার, এবং পরিধানে ধুতি। যে সব চিত্রকর আকবরের দরবারে 'রজ্‌মনামা' বা ফারসী মহাভারতের জন্য ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কাহারও হাতে মুদ্রার জন্য এই সীতা-রামের ছবির অঙ্কন ঘটিয়াছিল। এই সীতারাম-যুক্ত মুদ্রা আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে—১৬০৪ খৃষ্টাব্দে—প্রচারিত হইয়াছিল; তবে কোন্ স্থানের টাঁকশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। তখন আকবর স্বপ্রচারিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক ধর্ম্মকে নিজ রাজসভায় ইসলামের পরিবর্ত্তে স্থাপিত করিয়াছেন। এই মুদ্রাটীতে আর কিছুই না হউক, সম্রাট আকবরের মনে তাঁহার হিন্দু প্রজাদের সম্বন্ধে যে দরদ ছিল ও তাহাদের আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

[৪] সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতিময় মুদ্রা

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার বহু সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছবির প্রতি আন্তরিক টান ছিল একটী। তিনি নানা চিত্রযুক্ত মুদ্রা প্রচার করেন। মেষ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিচক্রের চিত্রযুক্ত সোনার মোহর ও রূপার টাকা একাধিক বার প্রচার করেন, এইগুলিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহ, বিশেষতঃ পশু মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর। মুদ্রায় মাসের নামের পরিবর্ত্তে মাসাশ্রিত রাশি চিহ্ন বা চিত্র দ্বারা মাস-নির্ণয় করা জাহাঙ্গীরের একটী বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের আবক্ষ মূর্ত্তিযুক্ত তিন চারি প্রকারের মুদ্রা জাহাঙ্গীর প্রচার করেন, এবং ইঁহার সম্পূর্ণ উপবিষ্ট মূর্ত্তিযুক্ত মোহরও দুই প্রকারের পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মদ্য পান করা জাহাঙ্গীরের প্রধান ব্যসন ছিল, এবং আবক্ষ ও উপবিষ্ট পূর্ণ মূর্ত্তিতে তিনি নিজেকে পানপাত্র হস্তে পাননিরত অবস্থায় চিত্রিত করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। এই প্রতিকৃতিময় মুদ্রাগুলিতে মোগল যুগের প্রতিকৃতি অঙ্কনের ধারা পাই। ধাতুময় মুদ্রার উপরে বলিয়া এগুলির মূল্য অসাধারণ। জাহাঙ্গীরের এই রাশিচক্রময় ও প্রতিকৃতিময় মোহরগুলি এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এবার জাহাঙ্গীরের

পূর্ব উপবিষ্ট মূর্তির প্রতিরূপ দেওয়া গেল (চিত্র সংখ্যা [৭])। সম্রাটের মাথার চারিদিকে প্রভা-মণ্ডল ; তিনি ভারতীয় পদ্ধতিতে গদীর উপরে উপবিষ্ট, দক্ষিণ হস্তে পানপাত্র। সম্রাটের চিত্রের দুই দিকে ফারসী শ্লোক—

'কযা বর্ সিক্‌হ্-ই-যর্ করদ্ তস্‌বীর।
শবিহ্-ই হজ্‌রৎ-ই-শাহ্-জহান্‌গীর॥'

অর্থাৎ 'ভাগ্যলক্ষ্মী সোনার মুদ্রার উপরে চিত্র আঁকিয়াছেন —
এই ছবি প্রভু রাজা জাহাঙ্গীরের।'

মুদ্রাটীর পিছন দিকে আছে, মাঝখানে সূর্য্য ও তাহার চারিদিকে ফারসী শ্লোকে মুদ্রা প্রস্তুত করার তারিখ, স্থান ইত্যাদি।

জাহাঙ্গীর এইরূপ মুদ্রা প্রচলন করিয়া এক হিসাবে নিতান্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। মুসলমান বাদশাহ হইয়াও তিনি এক তো নিজের চিত্র মুদ্রায় প্রচারিত করিলেন,—ইহা অন্ধবিশ্বাসী মোল্লাদের কাছে প্রথম অপরাধ ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি আবার নিজের চিত্র আঁকাইলেন পানপাত্র হাতে—এদিকে তাঁহার ধর্ম্মানুসারে মদ্য পান করা অন্যতম মহাপাতক। কিন্তু তিনি একাই যে এইরূপ দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহার বহুপূর্ব্বে 'অব্বাসী' বংশের এক খলীফা, সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্ম্মগুরুস্থানীয়—এই কাণ্ড করিয়াছিলেন। খলীফা অল্-মমুক্তদির বিল্লাহ্, বোগ্‌দাদে খ্রীষ্টাব্দ ৯০৮ হইতে ৯৩২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি নিজের প্রতিকৃতিময় একটি medal বা স্মারক-মুদ্রা করান—এটি জনসমাজে ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যাপারে প্রচলিত ছিল না। মুদ্রাটীর দুই দিকেই খলীফার নিজের প্রতিকৃতি। ইহার বড় প্রতিলিপি দেওয়া হইল (চিত্র সংখ্যা [৮] ও [৯])। এইরূপ মুদ্রা একেবারে অপ্রাপ্য —ইহার একটিমাত্র নিদর্শন এখন বার্লিনে জাতীয় মুদ্রা-সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে, জারমান লেখক Traugott Mann-এর Der Islam, einst und jetzt (অর্থাৎ 'ইস্‌লাম ধর্ম্ম—তখন ও এখন') নামক সুন্দর চিত্র-শোভিত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় ইহার চিত্র দেওয়া আছে। একদিকে সম্রাট 'খলীফাতুল্-মুমিনীন' বসিয়া আছেন, পান পাত্র হাতে ;—তাঁহার দুইপাশে কুফী ছাঁদের আরবী অক্ষরে তাঁহার নাম লেখা—'অল্-মুক্তদির বি-ল্লাহ্' ; অন্য দিকে তিনি বসিয়া—'উদ্' নামে পরিচিত আমাদের স্বরোদের মত একটি যন্ত্র বাজাইতেছেন। এখন হইতে ঠিক হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার, যৌবন-শক্তিতে পরিপূর্ণ মুসলমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজন মান্য সম্রাট্ ও ধর্ম্মগুরু নিজেকে এই ভাবে চিত্রিত করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। সামান্য এই মুদ্রাটী হইতে কত না প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয়! তবে কি তখন এসব বিষয়ে মুসলমান জগৎ আরও উদার ছিল? যাহা হউক, এই মুদ্রা ও জাহাঙ্গীরের উপবিষ্ট মূর্ত্তিময় মুদ্রা পরস্পর তুলিত হইবার যোগ্য। বিভিন্ন যুগের দুইটী বিরাট মুসলমান সংস্কৃতির প্রতীক স্বরূপ যেন এই দুইটী মুদ্রা—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ইরাকের বোগ্‌দাদ নগরীর—আরব মুস্‌লিম সভ্যতা, তাহার খলীফা, তাহার আরবী ভাষা, তাহার কুফী ধাঁজের আরবী অক্ষর ইত্যাদি লইয়া ; এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের উত্তর-ভারতের—আগরা-দিল্লী-লাহোরের ভারতীয়-মুস্‌লিম্ সভ্যতা, তাহার ফারসী ভাষা, তাহার নাস্তালীক ধাঁজের অক্ষর তাহার বিশুদ্ধ ভারতীয় ধরণের পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া। দেশে ও যুগে এতটা তফাৎ, কিন্তু একই মানব-সাধারণ মনোভাব দ্বারাই এই দুই দেশের সম্রাট অনুপ্রাণিত—একই ভাবে নিজেদের চিত্র আঁকাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পেড্রা গ্রান্দ,—রোরাইমা পর্ব্বতের নিম্ন অধিত্যকা।

বিচিত্র জগৎ

দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত পর্ব্বত

ব্রিটিশ গায়েনার ঘন অরণ্যের মধ্যে রোরাইমা পর্ব্বত

পর্য্যটকদিগের তাঁবু।

অবস্থিত। যদিও এই সকল অরণ্যসঙ্কুল স্থানের অনেক অংশ বিভিন্ন ভ্রমণকারী-দের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, রোরাইমা পর্ব্বত সম্বন্ধে বাহিরের লোকের জ্ঞান এখনও অল্পই। এখানে অসভ্য ইণ্ডিয়ান্ অধিবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ব্রেজিলের অন্য অন্য স্থানের বনবাসী ইণ্ডিয়ান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এজন্য নৃতত্ত্ববিদ্যার দিক হইতেও এ দেশ ভ্রমণের মূল্য বড় কম নয়।

সম্প্রতি American Museum of Natural Historyর তরফ হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রোরাইমা পর্ব্বত ও মালভূমিতে প্রেরিত হন সেখানকার জন্তু ও উদ্ভিদ্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে। বিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ্ মিঃ টি, ডি, কার্টার ইঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রোরাইমা মালভূমির সর্ব্বোচ্চ স্থান রোরাইমা পর্ব্বত—আগা গোড়া বেলে পাথরের, খাড়াই অসাধারণ, যেমনি ভীষণদর্শন, তেমনি দুরারোহ। এখানকার জীবজানোয়ার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই বলিয়াই অনেক দিন হইতে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এই প্রদেশ রহস্যময় ছিল। কার্টার সাহেবের দল ফিরিয়া আসিবার পর যে ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেশের অধিবাসী ও জন্তুজানোয়ারদের বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে।

ব্রিটিশ গায়েনা, ভেনুজুয়েলা ও ব্রেজিল—এই তিন দেশের সীমানা যেখানে মিশিয়াছে, রোরাইমা ঠিক সেখানে অবস্থিত। ভূতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পর্ব্বত অতি প্রাচীন, প্রায় ত্রিশ কোটী বৎসর পূর্ব্বে রোরাইমা পর্ব্বতের জন্ম হয়, কিন্তু তখন ইহা পর্ব্বত ছিল না এখনকার মত। আদিম যুগের বিশাল, অগভীর হ্রদের তলদেশে ভবিষ্যতের রোরাইমা পর্ব্বত ছিল সামান্য শুধু একটা মাটি ও কাদার ঢিবির মত।

ক্রমে বহুকাল চলিয়া গেল। ভূপৃষ্ঠের নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেকালের বড় বড় হ্রদ শুকাইয়া গেল। বহু বিস্তৃত

ইণ্ডিয়ান্ মেয়েরা কাসাভার রুটি তৈরি করিতেছে।

পলি মাটীর সঙ্গে বালি মিশিয়া রৌদ্রের তাপে সবটা জমাট বাঁধিয়া শক্ত সর পড়িয়া পাথরের আকার ধারণ করিল। পরবর্ত্তী কয়েক কোটী বৎসরের মধ্যে গলিত প্রস্তরের স্রোত উহার উপর পড়িয়া কঠিন স্তরের সৃষ্টি করিল—বর্ত্তমানে বুঝিবার কোনই উপায় নাই যে কোথা হইতে বা কি ভাবে এই লাভা-স্রোত আসিয়াছিল।

কালক্রমে নানা প্রাকৃতিক উৎপাতে এই শক্ত স্তরের চারিদিক খসিয়া ঝরিয়া ক্ষয়িয়া পড়িতে পড়িতে মাঝখানের খানিকটা অংশ নৈবেদ্যের মধ্যে আলো-চালের চূড়ার মত অবশিষ্ট রহিল—ইহাই বর্ত্তমান কালের রোরাইমা পর্ব্বত।

বহুকাল হইতে রোরাইমা পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিবার চেষ্টা চলিতেছে, এদেশের উদ্ভিদ্ ও জন্তু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলে অনেকেই বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে—তথাপি কেহই বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই

ইণ্ডিয়ানদের একটি গ্রাম।

পাহাড়ী নদীর উপর তাল গাছের গুঁড়ির সেতু তৈরি হইতেছে।

এতকাল পর্য্যন্ত। সর্ব্বোচ্চশিখরেও কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, এবং তাহারা সকলেই দু' এক ঘণ্টা উপরে কাটাইয়া তখনি নামিয়া পড়ে

জলযোগের জন্য ইণ্ডিয়ান্ মেয়ের উঁই সংগ্রহ।

এজন্য ইহাদের বিবরণপাঠে কোনো বৈজ্ঞানিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না।

রোরাইমা অঞ্চলের প্রাণীজগৎ সংবন্ধে যতটুকু ইহার পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, তাহাতে এই কৌতূহল বাড়িয়াছে বই কমে নাই। অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকেরা সামান্য কিছু নমুনা সঙ্গে করিয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিস। কার্টার সাহেব ও তাঁহার দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরও বেশী নমুনা সংগ্রহ করা এবং রোরাইমার প্রাণী ও উদ্ভিজ্জসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা।

ইঁহাদের পূর্ব্বে যাঁরা রোরাইমা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে **Sir Robert H. Schomburgk**এর নাম বিখ্যাত। ইনি ১৮৩৫-৩৯ সালে এ অঞ্চলে আসিয়া কার্য্য সুরু করেন, কিছুকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া সমস্ত জায়গাটার সীমানা নির্দ্ধারিত করেন। ১৮৮৪

ফড়িং-শিকারী ইণ্ডিয়ান্ বালক, ফড়িং খাইতে উদ্যত।

খৃষ্টাব্দে **Everard F. im Thurn** জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিবার সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হন নাই।

মিঃ কার্টার ও তাঁহার দল দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। আমাজন নদী বাহিয়া মানাওস্ পর্য্যন্ত ও তথা হইতে ব্রাঙ্কো ও বোয়া ভিষ্টা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সুরুমু নদীতে পড়েন। ষ্টীমার ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং

একটা বড় নৌকাতে জিনিস পত্র বোঝাই দিয়া দলটি সুরুমু ও কটিঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে পৌছায়। এখান হইতে নদীপথ

ফড়িং শিকারী বালকদল।

অতীব দুর্গম, নদী ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়াছে, ইণ্ডিয়ান মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া গুণ টানিতে টানিতে ভীষণ স্রোত ঠেলিয়া নৌকা উপরে উঠাইতে সুরু করিল।

লিমাও পৌছিয়া ইঁহারা বিলম্ব করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রেজিল গভর্ণমেণ্ট আর একটি দল এ অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান জাতি সমূহের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে দিলেন, Gen. Candido Mariano da Silva Rondon-এর অধীনে। ইঁহাকে এখানকার ইণ্ডিয়ান্‌রা অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ইঁহার আসিবার নাম শুনিয়া বহু স্থান হইতে তাহারা লিমাওতে জড় হইতেছিল, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সব ধরণের ইণ্ডিয়ান্। অনেক চেষ্টা করিয়াও মিঃ কার্টার কুলী জোগাড় করিতে পারিলেন না, General Rondon-কে না দেখিয়া কেহই এক পা নড়িতে রাজী নয়।

কয়েক দিন বৃথা চেষ্টা করিবার পর ইঁহাদের দলের অন্যতম বৈজ্ঞানিক মিঃ টেট্ অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে দুই দিনের পথ গিয়া General Rondon-এর তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে উভয় দলের উদ্দেশ্য প্রায় যখন একই, তখন দল দুইটি মিলিয়া একত্র রওনা হইলে সকল দিকেই সুবিধা ঘটিবে। General Rondon সানন্দে সম্মতি দিলেন, Sao Marcos হইতে এই দুই দল এক হইয়া রওনা হইল। সঙ্গে প্রায় তিন শত ইণ্ডিয়ান্ স্ত্রী-পুরুষ, অনেক ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক পিঠের দিকে থলিতে ছোট ছেলে ঝুলাইয়া চলিতেছিল।

এতগুলি লোক লইয়া রাস্তা চলা সহজ নহে, তার উপর পথ যখন এত দুর্গম, কাজেই পনেরো দিনের স্থলে এক মাস সময় লাগিয়া গেল।

General Rondon-এর ইচ্ছানুসারে দলটি কিছুদূর উঠিয়া তাঁবু ফেলিল। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক জার্ম্মান পণ্ডিত নূতন শ্রেণীর উদ্ভিদের সন্ধানে আসিয়া এখানে তাঁবু ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার নামে স্থানের নামকরণ হইল Phillip camp (৫২০০ ফুট)। এখানে কয়েক শ্রেণীর অদৃষ্টপূর্ব্ব পক্ষী ও উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহা রোরাইমা পর্ব্বত ভিন্ন অন্য কোথাও মেলে না। ইণ্ডিয়ান্‌রা বাঁশের চোঙের সাহায্যে তীর ছুঁড়িয়া অনেক পক্ষী সংগ্রহ করিল।

রোরাইমার সর্ব্বোচ্চ চূড়া (পূর্ব্ব দিক হইতে)।

এখান হইতে শিখরে আরোহণ করার উদ্যোগ চলিল। পথ অতীব দুর্গম ও বিপজ্জনক, সারাপথটি ধরিয়া বাঁ দিকে গভীর পাহাড়ী খড্—অনেক সময় আরোহণ পথটির একেবারে ধারে—কখনো বা ২৫ ফুট, ৩০ ফুট দূরে। দাবানলের প্রকোপ এখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, বৃহৎ বনস্পতিদের একটিও অক্ষত অবস্থায় নাই। নিম্নে জলপ্রপাতগুলির ঝারা কুয়াসায় অদৃশ্য হইয়াছে, গাছপালাও চোখে পড়ে না।

শিখরে উঠিতে পুরা একদিন লাগিল। টেবিলের মত সমতলভূমিতে তাঁবু ফেলা হইল। চারিধারের সৌন্দর্য্য যেমন অপূর্ব্ব, নিস্তব্ধতাও তেমনি অসাধারণ। মিঃ কার্টার লিখিয়াছেন, 'আমার মনে হইল প্রকৃতির এই গুপ্ত লীলা-ভূমিতে আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, এখানকার অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল, নিজেকে তুচ্ছ কীটানুকীট বলিয়া বুঝিলাম।'

এখান হইতে কুকেনাম পর্ব্বত পর্য্যন্ত একটা প্রস্তর সেতুর মত আছে, তার দুধারের সমতল ভূমি উপর হইতে সমুদ্রের মত দেখায়। সমগ্র অঞ্চলটাই অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রেণীর পাখী ও উদ্ভিদের আবাসস্থান, যদিও *Lost world*-এ উল্লিখিত অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল। তবুও ইঁহারা যে সকল জন্তু ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা রোরাইমা অঞ্চলের বাহিরে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পাহাড়ী ফাটলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত ব্যাং থাকে, যাহার গায়ে হাত দেওয়াও বিপজ্জনক, সে ব্যাং ইহারা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিন্দুরবর্ণ নক্ষত্রাকৃতি এক ধরণের অতি সুন্দর ফুল পাহাড়ের সর্ব্বত্র ফুটিয়াছিল। আইস্ক্রিম্ খাওয়ার চামচের মত ঝাড় বিশিষ্ট নতুন ধরনের ফার্ণ, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শ্রেণীর মক্ষিকাভুক্ গাছ, এক প্রকার খুব বড় বড় বৃশ্চিক, মাকড়সা, গুব্‌রে পোকা—প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীব ও উদ্ভিদ্ জগতের বিশেষত্ব। কয়েকদিন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া এ গুলির নমুনা ইঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এক ধরণের পাখী রোরাইমার পর্ব্বতশিখরে পাওয়া যায়, যার ডাক ঠিক ঘণ্টাধ্বনির মত—কামার-দোকানে নেহাই-এর উপর হাতুড়ীর ঘা মারিলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি ঠিং ঠং—ক্লিং ক্লাং। সন্ধ্যাকালে ছাড়া এ পাখীর ডাক অন্য সময় বড় একটা শোনা যায় না, নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে তখন এ অদ্ভুত রব এমন রহস্যময় মনে হয়!

রাত্রে তাঁবুতে আলো জালিলে কোথা হইতে বড় বড় অদ্ভুতদর্শন পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আলোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু দিনে ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।
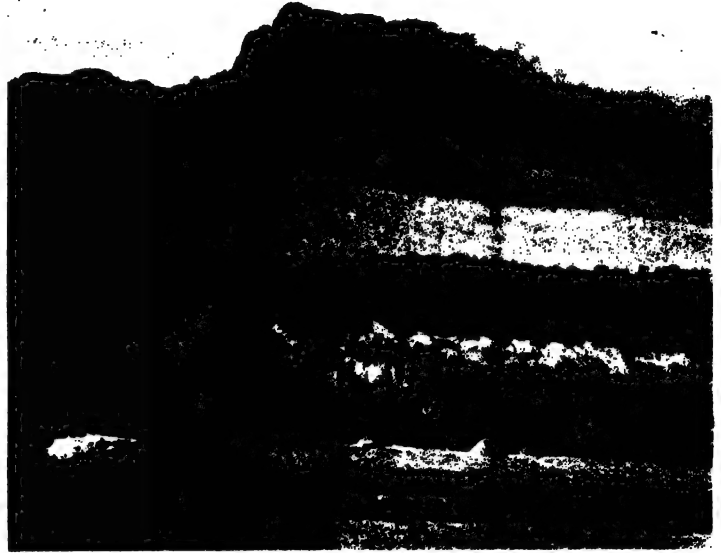
রোরাইমা-চূড়া (সম্মুখ হইতে)।

প্রথমে আধ-শুকনো ঘাসের জমি বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এ অঞ্চলে পানীয় জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন, ঘাসের জমি ছাড়াইয়া জলাভূমি ও চূড়াকৃতি ছোটখাটো অসংখ্য পাহাড়। তাল গাছের সারির মধ্যে পাহাড়ী নদী ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে. কখনো বা ইণ্ডিয়ান্ গ্রামের তাল পাতায় ছাওয়া কুটীর। একটু দূরেই ঘন জঙ্গল, জমি স্যাঁতসেঁতে, দীর্ঘ দীর্ঘ সাভানা ঘাসে গাছের গুঁড়ির অনেকটা পর্য্যন্ত ঢাকা।

আরণ্য ভূমি উত্তীর্ণ হইয়াই Serra Pacarima পর্ব্বত শ্রেণী ; ব্রেজিল ও ভেনেজুয়েলা রাজ্যদ্বয়ের সীমানা নির্দ্দেশ করিতেছে। উত্তর দিকের ঢালু অত্যন্ত দুর্গম, ইহার শিখরে উঠিতে সারাদিন কাটিয়া গেল। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর, দক্ষিণে বহুদূর নীল কুকেনাম পর্ব্বতমালা, নিম্নে সবুজ তৃণাবৃত পাহাড়ী ঢালুর পাদদেশে মিয়াং নদী, মাঝে মাঝে ঘন বন ও ধূসর রং-এর বড় বড় প্রস্তরখণ্ড।

ঘণ্টা-পক্ষী—ডাক দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির মত।

সান্ধ্য কুয়াসাচ্ছন্ন রোরাইমা পর্ব্বতচূড়া চল্লিশ মাইল দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চারদিন পাহাড়ের অপর দিকে নামিয়া আমরা নৌকায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। রোরাইমা পর্ব্বত কি ভীষণদর্শন ও অদ্ভুত মনে হইতেছিল! পাশাপাশি দুইটি সুবৃহৎ কুয়াসাবৃত চূড়া, একটি ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফুট ও অপরটি ৮৬০০ ফুট উচ্চ, দুইটিরই মাথা সমতল, ঠিক যেন দুখানি বিরাটকায় পাথরের টেবিল, নির্জ্জন অরণ্যে কোন্ দৈত্য যেন তাহার উপরে লেখা পড়া করে। নানা স্থানে চক্‌চকে রূপার সূতা ঝুলিতেছে, সেগুলি পাহাড়ী ঝর্ণা, তাহাদের মধ্যে একটী মিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়াং জলপ্রপাত।

বৈকালে দলটি রোরাইমার পাদদেশে পৌছিল।

পাদদেশের তাঁবু হইতে তিন হাজার ফুট খাড়াই উঠিলে তবে খানিকটা ছাদের মত সমতল স্থান পাওয়া যায়, সেখান হইতে উপরে উঠিবার পথ আরও দুর্গম, এই অংশটুকু নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা উলওয়ার্থ বিল্ডিং-এরও দ্বিগুণ উচ্চ। খাড়াই এমন ভয়ানক যে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই রোরাইমা পর্ব্বত ও এই অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত বনভূমিকে অবলম্বন করিয়া ওপন্যাসিক কোনান্ ডয়েল্ তাঁহার *Lost World* উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে যদি কোথাও সেকালের অধুনালুপ্ত অতিকায় জন্তুগণের আজও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয়, তবে সে এখানেই। যাহা কিছু অদ্ভুত ও রহস্যময় ঘটনা, নির্ব্বিবাদে তাহা এ অঞ্চলের ঘাড়ে চাপানো যাইতে পারে।

একটা ব্যাপারে ইঁহাদের বড়ই নিরাশ হইতে হইল। Im Thurn যে বিশাল অরণ্যের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, সে বন দাবানলে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রোরাইমার অধিত্যকার সে অপূর্ব্ব আরণ্যশোভার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। বছর দুই পূর্ব্বে একবার এ অঞ্চলে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়, বনের গাছপালা শুখাইয়া কাঠ হইয়া যায়, সেই সময় দাবানল আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বনানীকে ধ্বংস করিয়া ফেলে—এখন যে দিকে চোখ পড়ে, সে দিকেই দগ্ধ গাছের গুঁড়ি দাঁড়াইয়া আছে।

দাবানলের উৎপত্তি নানাভাবে হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান্‌রা পথ পরিষ্কার করিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া বন পোড়ায়, অনেক সময় বনে আগুন দিয়া সাপ মারে। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার ঘাসের ঝোপে আগুন দিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেয়। এই সব আগুন হইতেই সাধারণতঃ বনব্যাপী মহাদাবানলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনুকূল বায়ু বহিলে তো কথাই নাই!

তাঁবুতে নানা জাতীয় ইণ্ডিয়ান্ থাকায় তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের তুলনামূলক চর্চ্চা করার যথেষ্ট সুবিধা ইঁহাদের ঘটিয়াছিল। রোরাইমা পর্ব্বতের আশপাশে আকু‍্না

ইণ্ডিয়ান্‌দের বাস—ইহারা দেখিতে বেঁটে হইলেও খুব বুদ্ধিমান ও কৌতুকপ্রিয়। ইহারা নানা রকম বন্য পশুপক্ষীর ডাকের নকল করিতে সুপটু—শুধু পশুপক্ষীর ডাক নয়, ইহারা যে কোনো শব্দ একবার শুনিলে তাহার নকল করিতে পারে। টাইপ-রাইটারের টিক্ টিক্ শব্দ তাঁবুতে বার কয়েক শুনিয়াই ইহারা বেশ নকল করিয়া ফেলিল।

ইহারা ধনুর্ব্বাণ ছুঁড়িতে বিলক্ষণ পটু। বাঁশের লম্বা চোঙের মধ্যে ফুঁ দিয়া ইহারা এক রকম তীর ছোঁড়ে (blowpipe darts)—সেগুলি প্রায়ই তালের কাঠে তৈরী এবং লম্বায় বারো ইঞ্চির বেশী নয়—কিন্তু আগায় বিষ-মাখানো থাকে বলিয়া একবার গায়ে বিঁধিয়া গেলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বাঁশের চোঙ্‌গুলি আট ফুটের বেশীও লম্বা হইয়া থাকে।

রোরাইমা-শিখরের নানাবিধ অদ্ভুতদর্শন প্রস্তর-খণ্ড।

ইহাদের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন নাই। জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বদলে ইহারা কাপড় ইত্যাদি লয়। রং-এর মধ্যে লাল রংটাই ইহাদের খুব প্রিয়, কোমরে এক টুক্‌রা লাল কাপড় জড়াইয়া রাখা এদেশের পুরুষদের একটা সৌখীনতা। খাটাইয়া লইবার পরে ইহাদের বেতন মুদ্রায় দিতে হয় না, মুদ্রার পরিবর্ত্তে সুতা, সুঁচ, আয়না, বঁড়শী, লবণ প্রভৃতি দিলে চলে।

রোরাইমা পর্ব্বতের শিখরদেশ বারোমাস কুয়াসাবৃত থাকে, শীতও বেশী, এজন্য সেখানে বেশীদিন তাঁবু খাটাইয়া বাস করা মোটেই আরামের নয়। মিঃ কার্টার যতদিন সেখানে ছিলেন, নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশ একদিনও পান নাই। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মেঘে ও কুয়াসায় চারিদিক ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট—ক্যামেরার সাহায্যে ফটো লওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিখরদেশে প্রায়ই বড় গাছপালা নাই, বেলে পাথরের স্তরের ধারে ধারে এক প্রকার ছোট ছোট লাল রং-এর চারাগাছ ও দু' দশটা শীর্ণকাণ্ড বৃক্ষ সেখানকার একমাত্র উদ্ভিদ। এই অনুর্ব্বর পাথরের রাজ্যে যদিও জীবজন্তুর আহার্য্য অতীব দুষ্প্রাপ্য, তবুও মিঃ কার্টার সেখান হইতে ১২০ প্রকার প্রাণী ও ৯০ প্রকারের ফার্ণ ও গাছপালা এবং অনেক নতুন ধরণের শেওলা ও ছাতা-জাতীয় উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

প্রস্তরময় শিখরের নানাস্থানে রৌদ্র-বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নানা অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সাপ, ছাতা, ড্রাগণ—আবছায়া কুয়াসায় কি রহস্যময়ই যে দেখায়! এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীব-জন্তুসমাকুল কুয়াসাবৃত বিশালদর্শন পর্ব্বত মনে ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে—মনে হয় রোরাইমা শুধু নির্জ্জীব প্রস্তরস্তূপ নয়, সে জীবন্ত, তার ব্যক্তিত্ব আছে, সে সব দেখিতেছে, সব বুঝিতেছে—সাধে কি ইণ্ডিয়ান্ অধিবাসীরা রোরাইমাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, সাধে কি বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতকে পিতা রোরাইমার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন কল্পনা করিয়া ভয়ে কাঁপে!

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোস্-পরা নবী

—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

১৭৮৫ সন। নেপোলিয়ান তখন ভালেন্সে গোলন্দাজ দলের সামান্য সাব্-লেফ্টেন্যান্ট। মাত্র ষোল বৎসর বয়স—দারিদ্র্য ও দম্ভ দুয়েরই অন্ত নাই। কাহারও সহিত মেশেন না, কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই—দিনরাত কেবল পড়া আর পড়া। পাশের ঘরে বিলিয়ার্ড-টেব্‌লে সশব্দে বল চলাচল করে, নেপোলিয়ানের ভাল লাগে না। তিনি শুধু পড়েন আর লেখেন—প্লেটোর রিপাব্লিক, ম্যাকিয়াভেলীর বই, ভারতবর্ষ, চীন, সুইট্‌জার্লাণ্ডের ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র, পিরামিডের পরিমিতি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণভেদ, সমস্ত কিছু—। সাহিত্য-রচনার চেষ্টা নেপোলিয়ানের সেই সময়ে। কর্সিকার ইতিহাস, একখানি উপন্যাস, কয়েকটি ছোট গল্প, কবিতা, অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন কিন্তু সরস্বতীর মন্দিরে তাঁহার যশ মেলে নাই। কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয়। নীচে আমরা তাঁহারই একটি ছোট গল্পের অনুবাদ দিলাম। জীবন-যুদ্ধে জয়ী একজন মহামানবের ব্যর্থ সাহিত্য-প্রচেষ্টার নমুনা-হিসাবে এই গল্পটি অমূল্য। গল্পটি ১৭৮৭ সনে লিখিত; অনেকে বলেন ভল্‌টেয়ারের ভঙ্গীর অনুকরণে। ১৮২১ সনে, নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর ইহা মূল ফরাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালের এপ্রিমাস সংখ্যা 'পিয়ার্সন্‌স্ ম্যাগাজিন'-এ সিড্‌নি ম্যাটিংলি এই গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ বাহির করেন। নেপোলিয়ানের লেখা, ইহাই গল্পটির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অতি কৈশোরেই নেপোলিয়ান যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাইয়াছিলেন, এ গল্পে আমরা তাহারও প্রমাণ পাইব।

সন ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে, মক্কা হইতে নবী মহম্মদের পলায়নের ১৬০ বৎসর পর, মিকাদী বোগ্‌দাদের খলীফা হন্। তিনি সহৃদয় ও শক্তিমান শাসক ছিলেন, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে ভয় ও সম্মান করিয়া চলিত, তাঁহার উদার শাসনে আরব দেশ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ছিল। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানকে খলীফা মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যে সভ্যতা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল, কিন্তু নূতন এক নবীর অভ্যুদয়ে এই শান্তিতে গোল বাধিল।

এই ব্যক্তির নাম হাকিম, খোরাসানের লোক; অতি শীঘ্র ইহার দল জমিয়া উঠিল। দীর্ঘাকৃতি, বিধিদত্ত বিস্ময়কর বাগ্মিতাসম্পন্ন—এই ব্যক্তি নিজেকে আল্লার মুখপাত্র বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহার সব বক্তৃতার মূল কথা ছিল, সম্মানে ও সম্পদে মানুষে মানুষে ভেদ নাই। এই স্থূল নীতি জনসাধারণের অত্যন্ত মনে ধরিল। হাজারে হাজারে লোক তাহার পতাকার তলে সমবেত হইল। হাকিমের পিছনে বহু সৈন্যও জড় হইল।

সপার্ষদ খলীফা স্থির করিলেন, সূতিকাগারেই এই মারাত্মক বিদ্রোহের উচ্ছেদ সাধন করা দরকার। কিন্তু তাঁহাদের সেনাদলের পরাজয়ের পর পরাজয় হইতে লাগিল এবং দিনের পর দিন হাকিমের দলের লোক বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু তাহার জয়-গৌরবের পূর্ণ জোয়ারের মুহূর্তে যুদ্ধজনিত পরিশ্রম ও ক্লান্তির ফলে ভীষণ এক ব্যাধিতে * নবী শয্যা গ্রহণ করিল। ব্যাধি তাহাকে ত্যাগ করিল বটে কিন্তু আরব জাতির মধ্যে তাহাকে আর সুন্দরতম পুরুষ রাখিয়া গেল না। তাহার মুখমণ্ডলের পরুষ কান্তি চলিয়া গেল, অপরূপ দুই

সাহিত্য-যশোলিপ্সু নেপোলিয়ান।

চোখের জ্যোতি চিরকালের জন্য নিভিয়া গেল। হাকিম অন্ধ হইল। এই অঙ্গহানি, দলের লোকদের উপর তাহার প্রতিপত্তির হানি করিতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি রূপার মুখাবরণ প্রস্তুত করিয়া লইল।

---

* এই গল্পের সহিত ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনার অমিল আছে—কোন ব্যাধিতে নয়, ইতিহাসে লেখে, নিক্ষিপ্ত বাণের আঘাতে নবীর চোখ নষ্ট হয়। নবীর পুরা নাম হাকিম্-বেন্-আল্লা, খালিফ আল্‌মাহ্‌দির রাজত্বকালে তাঁহার অভ্যুদয়। এই গল্পে লিখিত তাঁহার পরিণাম ছাড়া এ সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

এইটি পরিয়া সে আবার তাহার দলে ভিড়িল। তাহার বাগ্মিতার হ্রাস হয় নাই, পূর্ব্বের মতই তাহাদিগকে সে আন্দোলিত করিতে পারে ইহা সে বুঝিতে পারিল। তাহাদিগকে বলিল, তাহার মুখমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত অলৌকিক জ্যোতি পাছে তাহাদিগকে ধাঁধাঁইয়া দেয়, তাই সে মুখোস্ পরিয়াছে। যে ধর্ম্মান্ধতা সে প্রজ্জলিত করিয়াছিল, পূর্ব্ব হইতে অনেক বেশী পরিমাণে তাহার উপর তাহাকে

হাকিম অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেছে।

নির্ভর করিতে হইল। কিন্তু অকস্মাৎ ভয়ানক এক পরাজয়ে তাহার দলবর্ত্তীদের নবাবিষ্কৃত এই ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচণ্ড রকমে আহত হইল। অনেকে তাহাকে পরিত্যাগ করিল এবং মুষ্টিমেয় যে কয়েক জন রহিল তাহাদিগকে লইয়া সে প্রাচীর-বেষ্টিত এক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু সেখানেও আক্রান্ত হইল।

মনে হইল হাকিমকে মরিতেই হইবে অথবা জীবন্ত শত্রু-হস্তে পড়িয়া তদপেক্ষাও কিছু দুর্ভোগ তাহার ভাগ্যে আছে। অনুচরবৃন্দকে প্রাচীরমধ্যে একত্রিত করিয়া সে বলিল,

"হে বিশ্বাসীদল, মানুষের সৎ প্রকৃতি এবং এই সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে ভগবান এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন। তবে কেন শত্রুদের সংখ্যাধিক্য আমাদিগকে বিচলিত করে? শুন। গত রাত্রে সমগ্র শহর যখন নিদ্রামগ্ন ছিল, তখন জানু পাতিয়া আল্লার নিকট আমি প্রার্থনা জানাইলাম। বলিলাম, 'পিতা, বহু বর্ষ ধরিয়া তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। আমি অথবা আমার দলভুক্ত কেহ কি তোমার কাছে কোন পাপ করিয়াছে যে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে?' কিছুক্ষণ পরে দৈববাণী শুনিলাম, 'হাকিম, যাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে নাই, তাহারাই তোমার প্রকৃত মিত্র, কেবল তাহাদেরই প্রাণ রক্ষা হইবে। তোমার সহিত তাহারা তোমার মদান্ধ শত্রুবৃন্দের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। অমাবস্যার প্রতীক্ষায় থাক, অনুচরবৃন্দকে বহু গভীর খাত খনন করিতে আদেশ দাও, উহাদের মধ্যে তোমার আক্রমণকারী শত্রুবৃন্দ পতিত হইবে'।"

দৈববাণী যেমন আদেশ করিয়াছিল, তেমনই কাজ করা হইল। খাত খনন করা হইল এবং তন্মধ্যে চূণ নিক্ষিপ্ত হইল, ধারে ধারে তরল দাহ্য পদার্থপূর্ণ তাম্রপাত্র সমূহ রাখা হইল।

তারপর হাকিম এক বৃহৎ ভোজের ব্যবস্থা করিল, এবং দলের সব লোকের ভোজনান্তে তাহাদিগকে যে-মদ সে দিল, সকলেই তাহা পান করিল। ফলে কঠিন যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া তাহারা সকলে প্রাণত্যাগ করিল। তখন হাকিম, —শুধু সেই ঐ বিষাক্ত মদ্য পান করে নাই,—সকলের শব গর্ত্তে ফেলিয়া দিল, সেখানে চূণে দেহগুলি বিনষ্ট হইল। তারপর তরল দাহ্য পদার্থ তদুপরি ছড়াইয়া সে আগুন ধরাইয়া দিল এবং নিজে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল।

প্রভাতে খলীফা তাঁহার সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন, কেননা নগরের তোরণ-দ্বার খোলা রহিয়াছে এবং সেখানে কোন প্রহরী নাই। সতর্কতার সহিত তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং নগরের ভিতরে কেবল একটিমাত্র স্ত্রীলোককে জীবিত দেখিলেন, সে হাকিমের উপপত্নী।

মানুষ যশোলিপ্সায় কতদূর বিতাড়িত হয়, তাহারই একটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত। *

* শ্রীকিরণকুমার রায় অনূদিত।

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

নিজের বৈরাগ্যোদয় সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে পরবর্ত্তীকালে শিষ্যদের কাছে এই কথা বলিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া যখন আমি দেখিলাম যে আমিও জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন তখন আমার মনে হইল যে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু দর্শনে আমার উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কথা ও আমাকেও এগুলি ভোগ করিতে হইবে একথা চিন্তা করিতে করিতে আমার যৌবনের স্ফূর্ত্তি (মদ) সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।" বুদ্ধ নিজের সংসার-বৈরাগ্যের কারণ সম্বন্ধে অন্য অন্য স্থানেও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে যাহা বলিয়াছেন ইহাই তাহার সার কথা। এ কথা কয়টি বড় মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা হইতে সিদ্ধার্থের মানসিক অবস্থা ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের বেশ একটু আভাস পাই। বড় বড় সাধক ও মহাপুরুষদের মনের পরিণতির ধারাবাহিক বিবরণ প্রায়ই পাওয়া যায় না। তাঁহারা পরিণতির ইতিহাস না বলিয়া ফলের কথাই অন্যকে বেশী বলেন এবং ভক্তরা পরে এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে অতিপ্রাকৃতের আশ্রয় লইয়া থাকেন বা ইহা অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। বাইবেলের যীশু জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই ঈশ্বরের স্বীয় ঔরসজাত পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; চণ্ডস্বভাব খৃষ্টদ্বেষী সল্ হঠাৎ দামাস্কসের ফটকে স্বর্গস্থ যীশুর দর্শন পাইয়া ও কথা শুনিয়া "সাধু পল" হইলেন; পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমাই পণ্ডিত গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দানের সময় বিষ্ণুপাদে কি যেন দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া শ্রীচৈতন্য হইলেন; আসিজি নগরের ধনীর উদ্দাম বিলাসী পুত্র হঠাৎ সাধু ফ্রান্সিস্ হইলেন—এইরূপ বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রচলিত বিবরণগুলি বোধ হয় আংশিক সত্য; আমরা ঝরণা হইতে নদীর উৎপত্তি হয় মনে করি কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের যে একটা ব্যাকুল কাহিনী থাকে তাহা ভুলিয়া যাই। যাহা মানুষের ভিতরে না থাকে তাহা তাহার জীবনে কখনও প্রকট হয় না; অবশ্য ভিতরের জিনিষ যে কখন কখন হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া বাহির হইয়া না পড়ে তাহা নয়, তবে বুদ্ধের জীবনে সেরূপ হয় নাই। অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

"জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কথা ও আমাকেও এইগুলি ভোগ করিতে হইবে এ কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার যৌবনের স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল"—ইহা হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে মন পরিবর্ত্তনের কথা নয়। যিনি পরজীবনে বুদ্ধ-তথাগতত্ব দাবি করিয়াছিলেন ও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মোহপাশবদ্ধ মানুষের মুক্তির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন তিনি যে বাল্যে ও যৌবনে সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। লঘুত্ব, চঞ্চলতা, জান্তব উদ্দামতা তাঁহার মধ্যে ছিল না, তিনি গম্ভীর, চিন্তাশীল ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন, চরিতলেখক ভক্তদের দ্বারা কথিত নানা গল্প হইতে ইহাই বুঝা যায়। জীব-সাধারণের মত তিনিও আনন্দ ও সুখ চাহিতেন, ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সাংসারিক সব সুখই তিনি সরল প্রাণে ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মনের অন্তরতম প্রদেশে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন সুখের প্রতি যাহা অপরিবর্ত্তনশীল, চিরস্থায়ী ও সত্য, অথচ লৌকিক অভিজ্ঞতায় তিনি দেখিলেন সংসারের লোক যাহাতে সুখ চায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল, এই আছে এই নাই, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সুখ, না থাকিলেই দুঃখ। তিনি বুঝিলেন যে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ তাহা সুখ নয় বরং প্রায়ই দুঃখময়, অতএব গীতা যেমন বলিয়াছেন "আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়, ন তেষু রমতে বুধঃ" সংসারের এই সুখের আরম্ভ আছে শেষ আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে সুখ পান না, তাই "চজে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলম্ সুখম্" বিপুল সুখ বা ভূমা আনন্দ পাইবার জন্য তিনি তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াছিলেন ততদিন সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। যাহাকে একবার তুচ্ছ বলিয়া জানা গিয়াছে তাহাকে আর কাহার ভাল লাগে? তিনি সংসারের বিলাস-সুখে প্রথমে খুব মাতিয়াছিলেন পরে তাঁহার ইহাতে বিরক্তি আসিল এ কথা কেহ বলেন নাই। যেটুকু লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই ইহার অসারতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধ চির-দিনই সরলপ্রাণ ছিলেন। সিদ্ধার্থ সরলভাবে তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা ও সংসারত্যাগের বাসনা আত্মীয়স্বজনকে

জানাইয়াছিলেন। পত্নীর সঙ্গে ও পিতার সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। শুদ্ধোদন প্রথমে অনেক বাধা দিয়া শেষে আর তত আপত্তি করেন নাই। মনের উচ্চ আশা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধার্থ পত্নীর কাছে উৎসাহ পাইয়াছিলেন এ কথাও কোন কোন বৌদ্ধ-লেখক বলিয়াছেন। বুদ্ধ পরে পত্নীর যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ সম্পর্কে আর একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে দেখিতে পাই এখনকার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় 'স্বরাজ'-সাধনার মত সেই যুগে অধ্যাত্মচর্চ্চার যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাতে সমাজের সকলের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে খুব বড় একটা আধ্যাত্মিক সামগ্রী লাভের জন্য বিপুল প্রয়াস চলিতেছিল। এই সামগ্রীকে বৌদ্ধ-জৈন শাস্ত্রে "নির্ব্বাণ", "বুদ্ধত্ব", "জিনত্ব", "তীর্থঙ্করত্ব", "অমৃত" প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারই কথা বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "যস্সত্থায় কুলপুত্তা সম্মদ্ এব অগারস্মা অনগারিয়ম্ পব্বজন্তি", যাহার জন্য বড় ঘরের ছেলেরা গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। মহাবীর ইহা লাভের জন্য বার বৎসর বহু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও মহাবীর ছাড়া ছোট বড় আরও অনেকে বুদ্ধত্ব জিনত্ব পাওয়ার দাবি করিতেন। অধ্যাত্ম-অধ্যবসায়ীরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিত "আয়ুষ্মন্, তুমি কি 'অমৃত' লাভ করিয়াছ?" অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে এই সামগ্রী লাভের চেষ্টা করিত, এখনও যেমন বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে "দেশের কাজে" যোগ দেয়। সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্য কি ছিল? জীবের দুঃখ দেখিয়া এই দুঃখ হইতে সংসারের পরিত্রাণের উপায় খুঁজিবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এই যে কথা প্রচলিত আছে, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে লোকের কাছে তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন কি না এ বিষয়ে বুদ্ধের মনে ঘোর সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল। বানাহত হংসের আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া যে বালক শুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া তাহার প্রতি মমতা (ইহা আমার) দেখাইয়াছিল সে যে দুঃখ হইতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিয়া অপর দশজনকে তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিবে না ইহা স্বাভাবিক। পরের সেবা, পরের উপকার ও বিশ্বপ্রেমের বীজ সিদ্ধার্থের মনে ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে, যখন তিনি সংসারত্যাগ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজের উপর, উদ্দেশ্য ছিল নিজের দুঃখ-বিমুক্তি-লাভ। জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যে তিনি পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন এ উদ্দেশ্য বা কল্পনা তাঁহার এ সময়ে ছিল না। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেন নাই, ঠিক অব্যবহিত সম্মুখের উদ্দিষ্ট সামগ্রী কি করিয়া লাভ করিবেন এই কথাই তাঁহার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ছিল। নবজাত শিশু পুত্র রাহুলের মুখ প্রাণ ভরিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইলে ও তাহার লালন পালনের দায়িত্বের কথা মনে হইলে তিনি এই ইচ্ছা ও ভাবনা দমন করিয়া মনকে বুঝাইয়াছিলেন "বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তারপর রাহুলকে দেখিব"; ইহা চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প লোকের কথা বলিয়া মনে হয় না।

সিদ্ধার্থের এই সময়ের বিমনাভাব দূর করিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুদ্ধোদন-নিযুক্ত চতুরা কামিনীরা গৃহে নৃত্যগীত ও প্রমোদ-উদ্যানে নিপুণ বিলাসরঙ্গবিভ্রমের দ্বারা তাঁহাকে উল্লসিত, আত্মবিস্মৃত ও ভোগলুব্ধ করিবার কত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁহার "বুদ্ধ-চরিত" কাব্যে এ সবের সুললিত বর্ণনা করিয়াছেন।

জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এগুলি মানবজীবনের পরিবর্ত্তনশীলতা ও দুঃখের চিরন্তন মূর্ত্ত প্রতীক। বুদ্ধ বহু উপদেশে বহু স্থলে এ গুলির কথা বলিয়াছেন, তাই এ গুলির উপর ভক্তদের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে যে তাঁহাদের মনে এগুলি জমাট বাঁধিয়া বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে ও অবশেষে তাঁহাদের বর্ণনায় তাঁহারা ইহাদের মনুষ্যরূপ ধরিয়া—ইংরেজিতে যাহাকে পারসনিফিকেশন বলে—সিদ্ধার্থকে দেখা দেওয়া কল্পনা করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই এই প্রতীকগুলিতে যাহা কিছু বুঝায় সে সব সম্বন্ধে খুব চিন্তা করিতেন। আমাদের দেশে বহু পরিজনপূর্ণ কোলাহলময় গৃহে একলা বসিয়া কেহ কোন কিছু ভাবিবার সুবিধা পায় না, সেই জন্য দেখিতে পাই প্রাচীনকালে কাহারও কিছু ভাবিবার বা করিবার থাকিলে, কেহ একটু মানুষের মত মানুষ হইলে, একটু ব্যক্তিত্ব একটু স্বাতন্ত্র্য সমাধান করিতে পারিলে, গৃহত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাইত! ভাবুক সিদ্ধার্থ বোধ হয়

নগরের বাহিরে প্রমোদ-উদ্যানে পালাইয়া গিয়া এ সব বিষয়ে চিন্তা করিতেন। আমরা অনেক সময় আমাদের মনের অনেক ভাবনার কথা বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া পুরাণ চাকর ঠাকুরের সঙ্গে করি, সিদ্ধার্থও বোধ হয় সারথির সঙ্গে প্রথমে এ সব বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ইহা হইতেই বোধ হয় দৈবজ্ঞের কথা, দেবতাদের নানা মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিবার কথা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে সিদ্ধার্থের একটি পুত্র জন্মে। পুত্রের জন্ম-সংবাদ শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাকি বলিয়াছিলেন "রাহুলো জাতো", শত্রু জন্মিল, অর্থাৎ সংসারের বন্ধন বাড়িল, তাই পুত্রের নাম "রাহুল" রাখা হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা মনে করেন জন্মের সময় সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ (রাহুগ্রস্ত) হইয়াছিল বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

পুত্রের জন্মে সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগের অভিপ্রায় কিছু দিন স্থগিত রাখেন। পৌত্রের জন্মে শুদ্ধোদন উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ মনোহরবেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দিতে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য শাক্য-নারীরা বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন। "কৃশা গৌতমী" (কিসা গোতমী) নামে একজন তন্বী শাক্য যুবতী সিদ্ধার্থের রূপের প্রশংসা করিয়া ধন্য (নিব্বুতো) এ ব্যক্তি, ধন্য (নিব্বুতো) ইহার জনকজননী এইরূপ কয়েকটি কথা বলিল। তাহার কথার মধ্যে "নিব্বুত" এই শব্দটি কয়েকবার ছিল বলিয়া সিদ্ধার্থ ভাবিলেন যুবতী তাঁহাকে নির্ব্বাণ লাভের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি নিজের গলার একটি মুক্তাহার কৃশা গৌতমীকে পাঠাইয়া দিলেন। কৃশা গৌতমী কিন্তু মনে করিয়াছিল সিদ্ধার্থ তাহাকে প্রণয়োপহার পাঠাইয়াছেন!

সিদ্ধার্থ স্থির করিলেন আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর গৃহত্যাগ করিবেন। গভীর রাত্রে নিদ্রিতা নর্ত্তকীদের স্রস্ত বসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি দেখিয়া ঘৃণায় সিদ্ধার্থের সেই মুহূর্ত্তেই পলায়নের "ললিত-বিস্তর" গ্রন্থের যে কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয়, কারণ পালিশাস্ত্রে এ ঘটনা "যশ" নামক একজন ধনী-পুত্র, বুদ্ধ-শিষ্যের জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এ ঘটনার "ড্রামাটিক্" মূল্যসত্তা বুঝিয়া পরবর্ত্তী গল্পকারেরা ইহা বুদ্ধের জীবনে চালাইয়া দিয়াছেন।

সিদ্ধার্থ পালাইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। সকলেই জানিত তিনি গৃহত্যাগ করিবেন। পালি শাস্ত্রের প্রাচীন যে যে অংশে তাঁহার গৃহত্যাগের কথা আছে সেখানে সহজ ভাবেই এ কথা বলা হইয়াছে, পলায়নের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে ছন্দক নামক একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে লইয়া বৈশালী-নগরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। গল্পকারেরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের পলায়ন নিবারণ করিবার জন্য চারিদিকে বহু সতর্ক প্রহরী রাখিলেন, এ কথা যদি সত্য হয় তবে ছন্দককে ডাকিবামাত্র সে বাড়ীর লোককে খবর না দিয়া সিদ্ধার্থের পলায়নে সাহায্য করিল কেন বুঝি না। ধরা পড়িবার ভয়ে সিদ্ধার্থ যদি তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়াছিলেন তবে ছন্দক পায়ে হাঁটিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল কি করিয়া? পলায়ন করেন নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ সকলের সামনে কান্নাকাটির মধ্যে গৃহত্যাগ করা তাঁহার সুকুমার চিত্তে রুচিকর মনে হয় নাই, তাই তিনি রাত্রে

গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে শিশুপুত্রকে একবার তাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া ও পত্নীর কক্ষে গিয়া পত্নীর বাহুতে শিশুর মুখ ঢাকা দেখিয়া পত্নীর বাহু সরাইতে গিয়া পাছে তিনি জাগ্রত হইয়া গমনে বাধা দেন, এই ভাবিয়া বিরত হইয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগের যে কথা প্রচলিত আছে তাহা এত স্বাভাবিক ও এত করুণ-সুন্দর, যে ইহা সত্য বলিয়া মানিতে দ্বিধা হয় না। পত্নীর কক্ষে প্রবেশ ও নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া আসাতে সিদ্ধার্থের অন্তরের যে সৌকুমার্য্য, সাধারণ-মানবসুলভ ভাবপ্রবণতা ও সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের উপযুক্ত অভিপ্রায়সিদ্ধির উদ্দেশ্যের যে দৃঢ়তা সূচিত হইয়াছে তাহা যে ভক্ত গল্পকারেরা বা মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীরা বিকৃত করেন নাই ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

বৈশালীর পথে অনুপ্রিয় (অনুপ্‌পিয় বা অনুম্‌পিয়) নামক গ্রামে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন। অঙ্গের বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া ছন্দকের হাতে দিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে একজন ব্যাধের সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধার্থ ব্যাধের বস্ত্র পরিয়াছিলেন ও

তরবারি দ্বারা মস্তকের কেশচ্ছেদন করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে ছন্দক কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হাতে সিদ্ধার্থের অলঙ্কার আভরণাদি দিলে মহাপ্রজাবতী শোকে দুঃখে তাহা নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণীতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অনুপ্রিয় গ্রামের একটি আম বাগানে কিছু দিন একাকী নির্জ্জনে বাস করিয়া শান্তচিত্ত হইয়া সিদ্ধার্থ বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। সংসারত্যাগের সময়ে তাঁহার প্রায় উনত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

সিদ্ধার্থের বাল্য, কৈশোর, যৌবনের কথা পালিশাস্ত্রে নাই বলিলেই হয়। পরবর্ত্তীকালে রচিত "জাতক-নিদানকথা", "বুদ্ধচরিত", "জিন চরিত", "ললিত বিস্তর" প্রভৃতি শাস্ত্রান্তর্গত নয় এমন গ্রন্থে এবং তিব্বতী, সিংহলী, কোন কোন গ্রন্থে কিছু কিছু পাওয়া যায়। [মজ্‌ঝিম নিকায়ের মাগন্দিয়-সুত্ত, অরিয়পরিয়েসন-সুত্ত, মহাসচ্চক-সুত্ত, বোধিরাজকুমার-সুত্ত ও সঙ্গারব-সুত্তে এবং অঙ্গুত্তর নিকায় ১।১৪৫ পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত আছে।]

বৈশালী (বেসালি) সে যুগে অতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সুরম্য হর্ম্ম্য, পদ্মসরোবর, প্রমোদউদ্যান প্রভৃতিতে ইহার শোভাবর্দ্ধন হইত। লিচ্ছবিবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এখানে বাস ও রাজত্ব করিতেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গণতন্ত্র শাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ গণের বা এই বংশের সকলে মিলিয়া রাজ্য চালাইতেন। শাক্যদের মত লিচ্ছবিদেরও খুব বংশ-গৌরব ছিল। বৈশালী খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ও ভোগ বিলাসের লীলাক্ষেত্র ছিল। এখানকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহারে মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত ও বসনভূষণের পারিপাট্যের জন্য তাহারা প্রসিদ্ধ ছিল। নানা বর্ণের বসন পরিহিত, নানা অলঙ্কারে শোভিত লিচ্ছবিদের দেখিয়া বুদ্ধদেব একবার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা দেবতাদের কখন দেখ নাই তাহারা এই লিচ্ছবিদের ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ও দেবতা-দের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য কর।" নানা স্থানের ধনীরা প্রকাশ্যে ও কোন কোন রাজা গুপ্তভাবে বিলাস প্রমোদের জন্য বৈশালীতে আসিতেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে বৈশালীর বিভব বিলাসের বর্ণনা পড়িয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের পারীনগরীর কথা মনে হয়।

সম্বোধিলাভ

ভোগবিলাসের ক্ষেত্র হইলেও বর্ত্তমান যুগের পারীনগরী যেমন সভ্য ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার একটি কেন্দ্র, সেই রূপ বৈশালীও সেই যুগের ধর্ম্মদর্শন আলোচনা আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মহাবীরের নিগ্রন্থ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র এখানেই ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষকেরা এখানে স্ব স্ব মত প্রচারের জন্য আসিতেন এবং সেই আন্দোলনে উৎসাহী অনেক যুবকরাও এখানে শিক্ষার জন্য সম্মিলিত হইত। সিদ্ধার্থও সেইজন্য প্রথমে এখানে আসিলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্ন্যাসীদের "শ্রমণ" বলা হইত; সিদ্ধার্থকে সাধারণ লোকে গোত্রনামে 'গৌতম" বা "শ্রমণ গৌতম" (সমন গোতম) বলিত।

সিদ্ধার্থ যে পরমদ্রব্য লাভের আশায় সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন এখন তাহা পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি নানা সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে লাগিলেন, বিভিন্ন মতের বিভিন্ন শিক্ষকদের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইয়া কোথায় কি আলোচনা, কি সন্ধান চলিতেছে সে সব জানিলেন। সাধকদের সম্বন্ধে আমরা স্থূল ভাবে জানি যে অমুক সংসার ত্যাগ করিলেন, অত বৎসর তপস্যা করিলেন ও শেষে সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই "তপস্যা" কথাটির মধ্যে যে কত পরিশ্রম, কত আগ্রহ, কত বিফলতার ইতিহাস লুকান থাকে তাহা আমরা তত দেখি না। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি-সাধনায় মহাত্মা গান্ধীর "নন্‌কোঅপারেশন" প্রচার ও সত্যাগ্রহ-নীতির কথাই বোধ হয় ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের মনে থাকিবে; দক্ষিণ-আফ্রিকার কঠোর পেষণ, গোখালের কাছে শিক্ষানবিশি, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র অফিসে বসিয়া মতিলাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের "শান্তি-নিকেতনে" বাস, লোকমান্য টিলকের সাহচর্য্য প্রভৃতির কথা অল্পলোকেই আলোচনা করিবে। গান্ধী যখন সাধনা আরম্ভ করেন তখন ভারতরাষ্ট্রক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রবল প্রতাপ, কিন্তু অনেক দিন মডারেট দলভুক্ত হইয়া কংগ্রেসের কাজ করা সত্ত্বেও বোধহয় প্রথমাবধি আদর্শের কিছু বৈষম্য থাকায় যেমন গান্ধী সাক্ষাৎভাবে কখনও সুরেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই, সেইরূপ শ্রমণ গৌতম বৈশালীতে নিগ্রন্থদের কাছে যাতায়াত করিলেও মহাবীরের কাছে যান নাই। অনেকের কাছেই গৌতম যাইতেন ও তাঁহার সমবয়সী ও সমচেষ্টাবান

অনেকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কালাম গোত্রের আলার নামক একজন ব্রাহ্মণ গুরুর কাছে তিনি ধ্যানের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিলেন। আলারের শিক্ষা দিবার যাহা ছিল সবই শিখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে দ্রব্য তিনি খুঁজিতেছেন এ পথে তাহা পাওয়া যাইবে না। তাই আলার কালামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি রাজগৃহ নগরে (কেহ বলেন শ্রাবস্তী নগরীতে) গেলেন। রাজগৃহ ও শ্রাবস্তী সেই সময়ে খুব বড় সহর ছিল। রাজগৃহ (রাজগহ) মগধ রাজ্যের ও শ্রাবস্তী (সাবত্থি) কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিম্বিসার মগধের ও প্রসেনজিৎ (পসেনদি) কোশলের রাজা ছিলেন। এই দুই নগরের কোন একটিতে উদ্রক রামপুত্র (উদ্দক রামপুত্ত) নামক আর একজন গুরুর কাছে গৌতম কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। উদ্রকের শিক্ষাতেও অভীষ্টলাভের পথ না পাইয়া তিনি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলার ও উদ্রক দুজনেই গৌতমকে খুব স্নেহ করিতেন, গৌতমও তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতেন। গৌতমের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও শিখিবার আগ্রহে প্রীত হইয়া তাঁহাদের যাহা শিখিবার ছিল, সযত্নে তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। তিনি যখন ছাড়িয়া আসেন তখন দুজনেই এমন বুদ্ধিমান ও যত্নশীল ছাত্রের চলিয়া যাওয়ায় দুঃখিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে বার বার থাকিতে বলিয়াছিলেন। গৌতম ইঁহাদের ছাড়িয়া গেলেন নিজের ঈপ্সিতবস্তু লাভের জন্য, ইঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধায় নয়। বোধিলাভের পর সকলের আগে ইঁহাদের কথা বুদ্ধের মনে হইয়াছিল ও কৃতজ্ঞভাবে তিনি ইঁহাদের স্মরণ করিতেন।

রাজগৃহের লোক শ্রমণ গৌতমকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। গৌতম দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সৌম্য মুখকান্তি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ক্ষত্রিয় রাজবংশের ধনীলোকের ছেলে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে ইহাও বোধ হয় রাজগৃহের লোক শুনিয়াছিল। রাজগৃহের পথে ভিক্ষায় বাহির হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভীড় হইয়াছিল। বিম্বিসার প্রাসাদের বাতায়ন হইতে তাঁহাকে দেখিয়া খবর লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। গৌতম ভিক্ষান্ন লইয়া নগরের বাহিরে গিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে গিয়া দেখিলেন অতি কদর্য্য অন্ন, তাঁহার বমনের উদ্রেক হইল। "যখন সন্ন্যাসী হইয়াছি তখন এইরূপ অন্নই আমাকে খাইতে হইবে" বলিয়া তিনি নিজেকে বুঝাইলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ও বর্ণিত আছে যে বিম্বিসার গৌতমকে জমিজমা দিয়া মগধে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু গৌতম স্বীকৃত হন নাই। বিম্বিসার গৌতমকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইবার পর যেন কিছুদিন রাজগৃহে আসিয়া বাস করেন।

এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে বিফলকাম হইয়া গৌতম বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে না। অতঃপর তিনি গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিলেন কিন্তু সেস্থান ভয়ঙ্কর ও প্রসন্ন চিত্তে সাধনার অনুপযুক্ত বলিয়া নৈরঞ্জনা (এখানকার ফল্গু) নদীতীরে উরুবিল্ব (উরুবেল) নামক গ্রামে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বপ্প, ভদ্রিয় (ভদ্দিয়), অশ্বজিৎ (অস্সজি), মহানাম, কৌণ্ডিণ্য (কোণ্ডঞ্ঞ) প্রভৃতি আরও কয়েকজন লোক ছিল। উরুবিল্ব সাধনার উপযুক্ত স্থান ছিল। নদীতীরে বনের মধ্যে গৌতম ও সঙ্গীরা কুটীর বানাইলেন। নিকটেই গ্রাম ছিল, ভিক্ষার অভাব হইত না। আরও অনেক সন্ন্যাসী এখানে ছিলেন।

উরুবিল্বে আসিয়া বা আসিবার আগেই গৌতমের তিনটি উপমা মনে হইয়াছিল। জলে নিমজ্জিত কাঠ অরনিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় না, ভিজা কাঁচা কাঠ জলে নিমজ্জিত না হইলেও অরণিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে তাহাতে অগ্নি উৎপন্ন হয় না, একমাত্র শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডেই অরণিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই উপমা মনে হওয়ায় কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীর শুষ্ক করিয়া তাহাতে পরমজ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন করার অভিপ্রায় তিনি স্থির করিলেন। সেই যুগে কৃচ্ছ্রসাধনের খুব প্রসার ছিল ; নির্গ্রন্থ, আজীবিক প্রভৃতি অধিকাংশ সম্প্রদায়ই কৃচ্ছ্র মার্গের সাধক ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে অন্য বিষয়ে মতভেদ হইলেও গৌতম বোধহয় এই সুপ্রচলিত পথে অভীষ্ট লাভের চেষ্টা সফল হয় কি না দেখিবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রমণ গৌতম ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মজ্ঝিম নিকায়ে তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বুদ্ধ নিজে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিকে যেমন মাথা বা ঘাড় ধরিয়া স্ববশে আনে সেইরূপ আমি দাঁতে দাঁত চাপিয়া, জিহ্বাকে তালুদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্তকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিলাম, আমার কক্ষদেশে স্বেদ নির্গম হইতে লাগিল। চিত্তের অভিনিবেশ অবিচলিত হইল কিন্তু দেহ অচঞ্চল হইল না, তথাপি আমি অপরাভূত রহিলাম। মুখ ও নাসিকা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিলাম; বলবান ব্যক্তি তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ হয়, আহত বায়ু সেইরূপ আমার মস্তকে আঘাত করিল। মস্তকে দৃঢ়ভাবে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিলে, বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা শরীর কাটিয়া ফেলিলে অথবা দুইজন বলবান লোক একজন দুর্ব্বল লোককে বলপূর্ব্বক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ধরিয়া রাখিলে যেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় আমার সেইরূপ যন্ত্রণা বোধ হইল। আমি অতি অল্প আহার করিতে লাগিলাম ও ক্রমে দিনে একটি মাত্র বদরী বা একটি মাত্র তিল বা একটি মাত্র তণ্ডুল আহার করিতাম। আমার শরীর এরূপ শুকাইয়া গেল যে যেখানে বসিতাম সেখানে উষ্ট্র-পদচিহ্নের মত ছাপ পড়িত, চক্ষুদ্বয় কোটরগত হইয়া গভীর কূপের তলদেশস্থ জলের মত বোধ হইত, উদর স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ড হাতে ঠেকিত, মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলে উদর হাতে ঠেকিত, গায়ে হাত বুলাইলে রোম ঝরিয়া পড়িত।"

এই কঠোর সাধনা করিতে করিতে একদিন গৌতম চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকে ভাবিল বুঝি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লোকমুখে শুদ্ধোদনের কাছে গৌতমের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিয়াছিল—দুঃসংবাদ খুব সহজেই ছড়াইয়া পড়ে। শুদ্ধোদন সংবাদবাহককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পুত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর মারা গিয়াছেন কি-না এবং সিদ্ধার্থের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন বলিয়া গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়াই মারা গিয়াছেন একথা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে গৌতম ভাবিলেন যে, তিনি মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু অভীষ্ট লাভের কোনও চিহ্ন দেখিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বুঝিলাম যে আমার চেষ্টায় ফল হইল না। তখন আমার মনে পড়িল যে বাল্যকালে আমার পিতা যখন কাজ করিতেছিলেন তখন জম্বুবৃক্ষের নীচে বসিয়া আমি কামনা-বাসনাবিরহিত সুখ ও আনন্দময় ধ্যানের প্রথম অবস্থায় বিহার করিয়াছিলাম।"

বিনা দ্বিধায় গৌতম কৃচ্ছ্র ত্যাগ করিলেন। যাহাতে লাভ হইবে না বা অভীষ্টসাধন হইবে না বুঝিতেন তাহা বিনা দ্বিধায়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া ত্যাগ করা বুদ্ধের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অতীতের প্রতি তাঁহার কোনও মিথ্যামায়া ছিল না। গৃহ, গুরুদ্বয় ও কৃচ্ছ্রত্যাগে আমরা তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই; পরজীবনেও এক-বার তিনি কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া বহুভক্তের অনুরোধ উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া একাকী সঙ্ঘত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। গৌতমকে কৃচ্ছ্রত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গী সেই পাঁচজন তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

গৌতম আবার আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শরীরে একটু বল পাইলে গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী আর একটি বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শারীর ক্লেশ নিরাকরণ করায় তাঁহার চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিল। সুস্থ ক্লেশহীন দেহে স্বচ্ছন্দ চিত্তে আনন্দে বিহার করিয়া তিনি ক্রমে ধ্যানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থার সুখ-দুঃখহীন অবিচলিত শুদ্ধ শান্তভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এ অবস্থায় উপনীত হইয়া গৌতম কিছুদিন বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিভোরভাবে কাটাইয়াছিলেন। এ সময়কার তাঁহার মনোভাবের বিশ্লেষণ মানুষের কল্পনারও অতীত। একদিন সারা দিনরাত্র এই ভাবে কাটাইয়া নিশা-শেষে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইল যে, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, যাহার অন্বেষণে ছয় বৎসর এত যত্ন এত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা লাভ করিয়াছেন। উপনিষৎ যাহার কথা বলিয়াছেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে"—সেই পরমবস্তুকে তিনি সাক্ষাৎ দেখিলেন, জানিলেন, অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল জগতের সকল সত্য তাঁহার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে, নিজ হৃদয়ের ও সকল বস্তুর তিনি মূল পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। তিনি বোধ করিলেন তাঁহার সকল দুঃখের অন্ত হইয়াছে, তিনি, "নির্ব্বাণ" ও পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন; একমাত্র যে-পথে গেলে এই পরম অবস্থা লাভ করা যায় সেই পথের

পথিক তিনি হইয়াছেন, তাই তিনি "তথাগত"; এই সম্বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাই তিনি "বুদ্ধ"।

বুদ্ধদেব গুরুদ্বয়ের কাছে, তাঁহার শিক্ষালাভের কথা, নিজের সাধন-প্রচেষ্টার কথা, কৃচ্ছ্রাভ্যাসের কথা ও বোধিলাভের কথা নিজ মুখে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু মারের প্রলোভন, বোধিদ্রুম প্রভৃতির কোন কথা নাই এবং পালিশাস্ত্রেও এ সবের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা খুবই সম্ভব যে, সে সময়ে তিনি যে সব গাছের নীচে বসিয়া ভাবিতেন তাহার মধ্যে একটা বড় বটগাছ ছিল, অথবা এরূপও হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী কালে যখন বুদ্ধদেবের নখদন্তাদির ও তাঁহার স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির পূজা আরম্ভ হইল তখন উরুবিল্বের বনে একটি বড় বটগাছ দেখিয়া তাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া তাহাকে লোকে পূজা করিতে লাগিল। মজ্‌ঝিম নিকায়ের "দ্বেধাবিতক্ক সুত্তে" বুদ্ধদেব বোধিলাভের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই বোধ হয় মার-প্রলোভন কাহিনীগুলির মূল। নিবৃত্তিমার্গের সাধকমাত্রকেই নিজ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কামক্রোধাদি পশুবৃত্তিগ্রামের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে হয়। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, তিনি এগুলির মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিয়াছেন; কেহ কেহ বাহ্যতঃ এগুলিকে এ জীবনের মত নিরোধ করিতে সমর্থ হন, আবার অনেককে সারা জীবন ধরিয়া ইহাদের সঙ্গে হাতাহাতি করিতে হয়। আধুনিক মনোবিশ্লেষণ বিজ্ঞানের মতে মানবমনের এই প্রবৃত্তিগুলিকে অতিমাত্রায় অযথা নিরোধের চেষ্টা করিলে ইহারা সাময়িক চাপা থাকে বটে কিন্তু সুবিধা পাইলেই যখন তখন হঠাৎ স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া অনেক অঘটন ঘটাইয়া থাকে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণের অনেক মুনিঋষির জীবনের ইহা তো নিত্যঘটনা। অতীতের ধর্ম্মভীরু লোকদের এ বিষয়ে এত সদাসন্ত্রস্ত থাকিতে হইত যে, পাপ তাঁহাদের কাছে একটা 'জলজ্যান্ত' জিনিস মনে হইত। নিজ অন্তঃপ্রবৃত্তির উদ্বেল আলোড়নকে তাঁহারা একটা বাহিরের দুষ্ট শক্তির আক্রমণ ভাবিতেন। যীশুর সঙ্গে শয়তানের তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল; খৃষ্টান সাধকেরা প্রায় প্রত্যহই নানা আকারে এই ব্যক্তিটিকে চাক্ষুষ দেখিতেন; মার্টিন লুথার বাইবেল অনুবাদ করিতে করিতে ক্লান্ত শরীরে হঠাৎ চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া অন্ধকার দেখিয়া শয়তান মনে করিয়া দেওয়ালে দোয়াত ছুঁড়িয়া মারিয়াছিবেন! বৌদ্ধরাও মানুষের প্রবৃত্তি-পরায়ণতা ও দুর্ব্বলতাগুলিকে মূর্ত্তিমান মারের "কারসাজি" মনে করিতেন। "মার" কথাটির অর্থ কিন্তু 'মৃত্যু', যাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ হয়।

গল্প আছে যে, সাধনকালের শেষ দিকে সুজাতা নাম্নী একটি নারী গৌতমকে আহার জোগাইত। সুজাতা গোপ-কন্যা ছিল, সে দেবতার কাছে মানসিক করিয়াছিল, তাহার যদি ভাল বিবাহ হয় ও প্রথমে পুত্র সন্তান জন্মে তবে সে দেবতাকে পূজা দিবে। যথাকালে তাহার দুই ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, তাই সে পরমান্ন রাঁধিয়া বনে গিয়া গাছতলায় দেবতার পূজা দিবে বলিয়া দাসীকে গাছতলা ঝাঁট দিয়া লেপিয়া মুছিয়া রাখিতে বলিল। দাসী গাছতলায় গিয়া গৌতমকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা মনে করিয়া দৌড়িয়া গিয়া সুজাতাকে খবর দিল। সুজাতাও এ কথা বিশ্বাস করিয়া পায়স লইয়া গিয়া গৌতমকে খাইতে দিল ও মধ্যে মধ্যে অন্য গোপকন্যাদের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে আহার্য্য দান করিত। তপস্যার দিনে বুদ্ধের পরিচর্য্যা করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যে এই সরলা গ্রাম্য নারীর বহু যশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কৃচ্ছ্রভগ্ন শরীরের নষ্টবল ফিরাইয়া আনিতে ও অন্নচিন্তার ভার লইয়া নবতপস্যার পথ সরল করিতে গৌতমকে এই গোপকন্যা যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

বোধিলাভ করিয়া গৌতম যে মহাসত্য ও পরমবস্তু পাইলেন তাহার কি বর্ণনা করিব? বুদ্ধ নিজেই তাঁহার সম্বোধিলব্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অয়ম্ ধম্মো গম্ভীরো দুদ্দসো দুরনুবোধো অতক্কাবচরো নিপুণো পণ্ডিতবেদনীয়ো", এই ধর্ম্ম গভীর, সহজে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বা বুঝিতে পারা যায় না, ইহা তর্কের অগোচর, কঠিন, এবং শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিই ইহাকে জানিতে পারে। ইহারই কথা উপনিষৎ বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" বুদ্ধ ইহার বিষয়ে লোককে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি মূলতথ্য পর পরিচ্ছেদে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। *

(ক্রমশঃ)

---

* সন্নিবিষ্ট চিত্র দুটি শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

রাধানামের ঐতিহাসিকতা

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যকুঞ্জে, মাধুর্য্যের রম্য-ব্রজে, কলনাদিনী কালিন্দীর তীরতরুতলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে বিলাস-লীলা,—ভারতের কবিচিত্তে কবে তাহা প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল আজি আর জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বরাগে, অনুরাগে, অভিসারে, উৎকণ্ঠায়, মানে-অভিমানে, বিরহে-মিলনে নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত যে প্রেমগীতি আজিও মানব-মনকে মুগ্ধ করে,—কাহার কণ্ঠে তাহা প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। বসন্তের কান্তশোভায় এবং সঙ্গীতে, বরষার গুরু গর্জ্জনে এবং ধারাসম্পাতে যে স্মরণাতীত দিনের স্মৃতি এদিনেও অন্তরকে বেদনাতুর করে,—সুধা-বিষের সেই জ্বালা কোন্ হৃদয়ে প্রথম অনুভূত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার সন্ধান মিলে না।

চরমপন্থী নেতি-বাদীগণের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালায় সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক এই লীলাকথার আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রথম—যাঁহারা ইতিহাসের নিকষে কষিয়া সমস্ত বিষয় যাচাই করিতে চাহেন। ইহাঁদের অধিকাংশের নিকট কবিত্ব, ভাবসম্পদ এবং আধ্যাত্মিকতা প্রায় গৌণ বস্তু। দ্বিতীয়—গদগদচিত্তের দল, ইহাঁরা 'ক' বলিতেই কাঁদিয়া আকুল। ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিকতা দুই-ই ইহাঁদের নিকট সমান উপেক্ষার বিষয়। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ইহাঁদের প্রচুর প্রতিপত্তি। ইহাঁরা নিজেরাও সাধারণ সমাজে শিক্ষিত বলিয়াই পরিচিত। তৃতীয়—যাঁহারা নিষ্ঠাসম্পন্ন, ভাবুক, রসিক এবং ভক্ত। এই লীলাকথা জীবনে সত্য, সার্থক ও রূপায়িত করাই ইহাঁদের নিকট বোধ হয় অবান্তরেরই প্রকারান্তর। মুষ্টিমেয় হইলেও সমাজে এই শ্রেণীর আজিও অপ্রতুল ঘটে নাই। ভগবৎপরায়ণ সাধকগণের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। এবং কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে লোকসংগ্রহার্থই হউক, অথবা আত্মতৃপ্তির জন্যই হউক শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে সহানুভূতির সহিত রাধাকৃষ্ণ-কথা আলোচনার উপযোগিতা আশা করি তাঁহারাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইতিহাসকে পাশ কাটাইলে চলিবে না। বরং সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য। যে কোন ধর্ম্মমতের আবির্ভাব, ক্রমবিকাশ এবং পরিণতির কথা জানিতে হইলে আমাদিগকে ইতিহাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কোন্ বিষয়ে কত রকমের বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সে গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কি প্রকার ইত্যাদি বিষয় প্রচারিত হইলে সমাজের পক্ষে লাভ বই লোকসান নাই। এ পথে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গীর বুদ্ধিভেদের আশঙ্কা হয়তো আছে, তাই বলিয়া অন্ধ বিশ্বাসও তো সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হয় না। যাঁহারা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে সেই একেরই খেলা দেখিতে পাইবেন। দেখিতে পাইবেন মানবের রুচি-বৈচিত্র্যের জন্যই এইরূপ ঋজু, কুটীল নানাপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা গদগদ চিত্তেরও নিন্দা করি না। তবে হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ সকল সময়েই—অন্ততঃ ব্যাবহারিক জগতে আমরা মঙ্গলজনক বলিয়াই মনে করি। বাঁচিতে হইলে হিন্দুকে আপন সাধনা ও সংস্কৃতির ধারার সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত হইতে হইবে। তীব্র মমত্ববোধ এবং সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ধারাকে যুগোপযোগী পথে জাতীয়তার খাতে চলমান ও বেগবান করিয়া তুলিতে হইবে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলিত শক্তিতেই তাহা সম্ভবপর হইবে।

হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস কিয়দংশ পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। পুরাণের প্রাচীন রূপ এখন আর পাওয়া যায় না। যুগ-প্রয়োজনে প্রাচীন পুরাণের যে নূতন সংস্কার সাধিত হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। আমাদের মনে হয় এইরূপ সংস্কারের ফলেই পুরাণের বহুলাংশ আজও বাঁচিয়া আছে। রাধাকৃষ্ণলীলাকথার আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাদৌ পুরাণেরই সাহায্য লইতে হইবে। পুরাণের বিভিন্ন মতবাদ হইতে, একই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হইতে আমরা বিষয়টীর ভিন্ন ভিন্ন ধারার অস্তিত্ব ও প্রাচীন রূপের কথা বুঝিতে পারি। রাধাকৃষ্ণলীলাকথার সম্বন্ধেও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। গোপীলীলা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং খিলহরিবংশ প্রধানতঃ একমত

হইলেও ঐ ঐ গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম পাওয়া যায় না। পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার নাম, তাঁহার পিতামাতার নাম, সখীগণের নাম এবং উপাসনাপদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং পদ্মপুরাণের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ঐতিহাসিকের চক্ষে এই দুই পুরাণোক্ত গোপীলীলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। আবার এই দুই পুরাণের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তিনি কল্পভেদের উল্লেখে তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি গান্ধর্ব্বিকা, প্রধানা গোপিকা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে তিনিই শ্রীরাধা। পদ্মপুরাণে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী যুথেশ্বরী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না, চন্দ্রাবলী রাধারই অপর নাম। গোপালতাপনী প্রভৃতি (শ্রুতি নামে পরিচিত) দুই একখানি গ্রন্থে এবং রাধাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণলীলা-কথার বর্ণনা আছে।

পুরাণের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ গোপীকথার প্রধান প্রস্রবণ, কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক তাহার রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ভাগবতপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী, আবার কেহ পরবর্ত্তীও বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রচনাকাল-তো কাহারও মতে খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী, এমন কি কেহ কেহ পঞ্চদশ শতকেও নামিয়াছেন। তাপনী ও তন্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ মতভেদ আছে। কেহই এগুলিকে চারি পাঁচ শত বৎসরের অধিক পুরাতন বলিতে চাহেন না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিকাল আজিও নির্ণীত হয় নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অদ্য হইতে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে বাসুদেব বা নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য মনিষী পল ডয়সেন উপনিষদের যুগের মধ্যভাগে সংকলিত উপনিষদগুলির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নাম করিয়াছেন। ইহাতে—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

এই শ্লোকে ভক্তির উল্লেখ পাই। ইহার পরবর্ত্তী কালের উপনিষদ মৈত্রায়ণীর মধ্যে বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ ব্রহ্ম রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারত এবং গীতার সঙ্কলন-কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অন্যতম ভক্তি-গ্রন্থ শাণ্ডিল্যসূত্রে গীতার শ্লোকাংশ পাওয়া যায়।

রামায়ণের সংকলন-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত রূপে কিছু বলা যায় না। রামায়ণে আদিত্য হৃদয় স্তোত্রে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুর নাম আছে। ত্রিবিক্রম বামন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। গয়ায় বিষ্ণুপদে বোধ হয় ইহাঁরই অর্চ্চনা হইত। নিরুক্তকার যাস্ক ঔর্ণবাভের একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণা-বাভঃ"। নিরুক্তকারের বয়স প্রায় সাতাইশ শত বৎসর হইবে। ঔর্ণবাভ তাঁহারও বয়োজ্যেষ্ঠ।

মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্র আছে। গৃহসূত্রকার বৌধায়ন বিষ্ণুসহস্রনামের উল্লেখ করিয়াছেন। অনুমিত হয় বৌধায়ন প্রায় তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁরই কিছু পরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে এক সূত্র করিয়াছেন ভক্তিঃ। তিনি অন্য সূত্রে বলিয়াছেন বাসুদেবভক্ত বাসুদেবক, অর্জ্জুনভক্ত অর্জ্জুনক হইবে। (বাসুদেবার্জ্জু-নাভ্যাং বুঞ্) খ্রীষ্টের দেড়শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বাসুদেব উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার ছিল বেসনগর নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডীর শিলালিপি হইতেও তাহা জানিতে পারা যায়। বাঁকুড়া জেলার পখরণার অধিপতি চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিতেন যে সাঁচী, কার্লী প্রভৃতি বৌদ্ধস্তূপ যখন নির্ম্মিত হয় তখন এদেশে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল তত্রত্য দানপতিগণের হরিদত্ত, গঙ্গাদত্ত প্রভৃতি নাম দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূজনীয় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়, "পাথুরে প্রমাণ" সংবলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐতিহাসিক পরিচয় মোটামুটী

এইরূপ। শ্রীরাধার নামের অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকথার এইরূপ কোন প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করা উচিত। আমাদের মতে রাধানামের প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রথম অথর্ব্ববেদের নাম করিতে হয়। অথর্ব্ববেদে বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা।

"রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রম্ অরিষ্ট-মূলম্।" (১৯।৭।৩)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিশাখাদ্বয়কে রাধা এবং অনুরাধা নক্ষত্রগণের অধিপত্নী ও ভুবনের শ্রেষ্ঠা গোপী বলা হইয়াছে। "নক্ষত্রানামধিপত্নী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিন্দ্রাগ্নি ভুবনস্য গোপৌ।" (৩।১।১।১১)

যদিও অপর কোন বেদ বা ব্রাহ্মণে বিশাখার রাধা নাম পাওয়া যায় না, তথাপি তাহার পরের নক্ষত্রটীর অনুরাধা নাম দেখিয়া অনুমিত হয় বিশাখার রাধা নামকরণের পরে অনুরাধা নাম স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কত কাল পূর্ব্বে নক্ষত্র মালার নামকরণ হইয়াছিল জানা যায় না। তবে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রণয়নকাল খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৩৫৪ অব্দ। তৈত্তিরীয়-সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক ২৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ। ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বলেন, "খ্রীঃ পূর্ব্ব ১১৫০ হইতে ১২০০ অব্দের মধ্যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল। এবং তাহারও পূর্ব্বে মহাবিষুব সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকটস্থ ছিল সেই সময় খ্রীঃ পূর্ব্ব প্রায় ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক পণ্ডিতগণ সমুদয় নক্ষত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। যাজুষ জ্যোতিষের সপ্তম শ্লোক হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনাকাল জানা যায়।"

আমাদের মনে হয় অথর্ব্ববেদের রাধা নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের গোপী শব্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরাণ কথায় স্থান পাইয়াছে। রাধ ধাতুর অর্থ—সফলকাম হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, আরাধনা করা, পূজা করা, প্রীতি করা। এতভিন্ন অংশ গ্রহণ করা, প্রস্তুত করা ক্ষেত্র বিশেষে ধ্বংস করা অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। রাধা শব্দ দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি, সিদ্ধি ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বৈদিক যুগে সাধারণতঃ সিদ্ধিদায়িনী, শত্রুধ্বংসকারিণী অর্থেই হয় তো ইহার ব্যবহার ছিল। পুরাণে আরাধনা, পূজা প্রভৃতি অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধা-ভাবের দুইটী দিক্ দেখিতে পাই। একটী দিক—আরাধনা, পূজা; অন্যদিক—সিদ্ধি, সাফল্য, সম্পূর্ণতা। অনেকের মতে শ্রীমদ্ভাগবতের—

> অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
> যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামানয়দ্রহঃ॥

এই শ্লোকের মধ্যে রাধা নামের মূল রহিয়াছে। ভাগবত পুরাণে ইনি প্রধানা গোপিকা, গান্ধর্ব্বিকা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীমদ্ভাগবত যখন রচিত হইয়াছিল তখনও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা প্রেয়সীরূপে গৃহীতা হন নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস কবির নাম সুপরিচিত। ভাসের বালচরিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীলীলার প্রসঙ্গে ঘোষ সুন্দরী, বনমালা, চন্দ্ররেখা, ও মৃগাক্ষী এই চারিজন গোপীর নাম পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ ১ম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে কোন সময়ে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন,—পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্কের ফলে এইরূপ মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

গাথাসপ্তশতীর একটী শ্লোকে রাধার নাম পাওয়া যায়। যথা—

> মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
> এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥

অর্থাৎ "মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্। এতানাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥"

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের মুখ্য-সম্ভোগে গাথাসপ্তশতীর এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> লীলাহিতুলিয় সেলো রকখউ বো রাহিআথণপ্‌ফংসে।
> হরিণো পঢমসমাগমসজ্‌ঝসবেবল্লিও হথো॥

শ্লোকটীর সংস্কৃত রূপ—

> লীলাভিতুলিত-শৈলো রক্ষতু বো রাধিকাস্তনস্পর্শে।
> হরেঃ প্রথম-সমাগম-সাধ্বস-কম্পিতো হস্তঃ॥

হাল-সপ্তশতীর অধুনা প্রচলিত সংস্করণে এই শ্লোক পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় রূপ গোস্বামী তাঁহার সময়ের কোন পুঁথি হইতে শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের অনুরূপ একটী শ্লোক সদুক্তি-কর্ণামৃতের মধ্যে পাওয়া যায়।

যো লীলয়া গোকুলগোপনায়
গোবর্দ্ধনং ভূধরমুদ্দধার।
খিন্নঃ স-কম্পং স বভূব রাধা-
পয়োধর স্পর্শবরদর্শনেন ॥

দুইটী শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে রূপ গোস্বামীধৃত শ্লোকটীই পুরাতন মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণে "হাল" অন্ধ্র ভৃত্য বংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং আমরা ইহাঁকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে রাখিতে পারি। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে গাথাসপ্তশতীর ভাষায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে পরবর্ত্তী প্রক্ষেপ ও সংযোজন যথেষ্টই হইয়াছে।

কালিদাসের মেঘদূতের "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপ-বেশস্য বিষ্ণোঃ" এই শ্লোকাংশ হইতে বৃন্দাবনলীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রঘুবংশে ইন্দুমতী-স্বয়ংবরে বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে। মথুরার রাজাকে দেখাইয়া সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছে—

সম্ভাব্য ভর্ত্তারমমুং যুবানং
মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে
নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ।

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি
শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং
কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু ॥

"পুষ্পবাণবিলাস" যদি মহাকবি কালিদাসের রচিত হয় তাহা হইলে বলিব কবি গোপীকথারও অনুরক্ত ছিলেন। পুষ্পবাণবিলাসের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী এই—

শ্রীমদ্গোপবধূস্বয়ংগ্রহপরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-
ব্যামর্দ্দাদ্ গলিতোঽপি চন্দনরজস্তঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চিজ্জাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং
বিভ্রৎ কামপি বেণুনাদরসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥

আমরা কালিদাসকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি বলিয়া মনে করি।

"পঞ্চতন্ত্র"এ এক তন্তুবায়পুত্র স্বীয় সূত্রধর বন্ধুর সাহায্যে নির্ম্মিত কাষ্ঠময় গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক কেমন করিয়া রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং রাজকুমারীর প্রণয়ভাজন হইয়াছিল, তাহারই উপাখ্যানের মধ্যে নিম্নের গদ্যাংশটুকু পাওয়া যায়।

"সুভগে, সত্যমবিহিতং ভবত্যাপরং কিন্তু রাধা নাম মে ভার্য্যা গোপকুল প্রসূতা প্রথমমাসীৎ।" পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে প্রণীত হইয়াছিল।

ভট্টনারায়ণ "বেণীসংহার" নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "শ্রীহরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ম্" অর্পণপূর্ব্বক পরের শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন,—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলীকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূত রোমোদ্গতে
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতা দৃষ্টস্য পুনাতু বঃ ॥

পণ্ডিতগণের মতে ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে রচিত "ধ্বন্যালোকে" অন্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এই দুইটী শ্লোকে রাধাকৃষ্ণলীলার পরিচয় পাওয়া যায়।

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরকল্পবন্ধনমৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥

টীকাকার অভিনবগুপ্তের মতে এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার কথা রহিয়াছে। ব্রজমণ্ডল হইতে দ্বারকাসমাগত কোন বার্ত্তাবহকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হে ভদ্র, গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃদ, রাধার নির্জ্জনকেলীর সাক্ষীস্বরূপ কালিন্দীতীরবর্ত্তী লতাকুঞ্জের কুশল তো? (কুশলই বা কি করিয়া বলিব, আমিতো বলিতেছি) কন্দর্পশয়ন রচনার জন্য নীল-তমালের কিশলয় চয়নের প্রয়োজন তো অধুনা নাই। সুতরাং সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।" আশীর্ব্বচন বা মঙ্গলাচরণমূলক দ্বিতীয় শ্লোকটী এই—

দুরারাধ্যা রাধা সুভগবদনে নাপিমৃজত-
স্তবৈতৎ প্রাণেশাজঘন বসনে নাশ্রু পতিতম্।
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ ॥

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে মনে হয় আনন্দবর্দ্ধন, ভট্টনারায়ণ এমন কি কালিদাসেরও পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণলীলা

ভারতের বহুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে পারি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাধা সম্প্রদায়বিশেষের উপাস্যারূপে গৃহীতা হইয়াছিলেন। নিম্বার্কসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের উপাসক। আচার্য্য নিম্বার্কের "বেদান্ত দশশ্লোকী" মধ্যে নিম্নের শ্লোকটী পাওয়া যায়।

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্।

নিম্বার্কাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্রজভূমে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে ইনি রামানুজের ও মধ্বের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামানুজের জন্মকাল ১০২২ খ্রীঃ। মধ্বের জন্মকাল ১১৯৩ খ্রীঃ। কাহারো কাহারো মতে ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিম্বার্ক জন্মগ্রহণ করেন।

"কৃষ্ণকর্ণামৃত" প্রণেতা কবি বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাহারো মতে ইনি নিম্বার্কের পূর্ব্ববর্ত্তী, কাহারো মতে পরবর্ত্তী। কৃষ্ণকর্ণামৃত রাধাকৃষ্ণলীলাকথায় ওতঃপ্রোত। কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি শ্লোক—

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশব-চাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিত বেণুগীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে।

বাঙ্গালার বর্ম্মরাজগণ আপনাদিগকে যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। ভোজবর্ম্মার বেলাব-লিপির নান্দীশ্লোকে গোপীশতকেলীকার, মহাভারতসূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ বন্দিত হইয়াছেন।

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অত্তঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্ব্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ।

বর্ম্মরাজগণ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে সমতটে (পূর্ব্ববঙ্গে) রাজত্ব করিতেন।

অতঃপর কবি জয়দেবের নাম করিতে হয়। ধোয়ীকবির পবনদূতেও রাধার নাম পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতের মধ্যে উদ্ধৃত প্রাচীন কবিদের প্রণীত শ্লোকেও রাধার উল্লেখ আছে। বিশাল বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে রাধানামের অথবা কৃষ্ণলীলার কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক।

ধাতু বা প্রস্তরনির্ম্মিত তেমন পুরাতন কৃষ্ণ, রাধা বা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের বাদামীগুহার নাম করিতে হয়। বাদামীগুহায় গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। তথায় কৃষ্ণ লীলার অপর কয়েকটী চিত্রও আছে। পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাদামীগুহায় শিলাচিত্রগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাদামীর পরে পূর্ব্ব-ভারতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে বগুড়া জেলার পাহাড়পুরের নাম করিতে হয়। পাহাড়পুর-স্তূপ খননকালে ইহার মধ্য হইতে গুপ্তযুগের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে এই স্তূপের নির্ম্মাণ বা অলঙ্করণ-কালকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফেলা যাইতে পারে। স্তূপটী বহুভূমিক, ইহার নিম্নতম ভূমি বা তলে, ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিত অংশে কতকগুলি চিত্রিত প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে—এগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবদেবীর চিত্র। এই সকল শিলাচিত্রের মধ্যে আছে যমুনা, বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার শিলাচিত্র, আর তাহারই মাঝখানে এই অনিন্দ্যসুন্দর রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, দেখিলেই গুপ্তযুগের সমুন্নত শিলাশিল্পের সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে সেই চিরপরিচিত মোহন ভঙ্গী, পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়জনিত বিশ্রব্ধ নির্ভরতা, একের প্রতি অঙ্গ লাগি অপরের প্রতি অঙ্গের আত্মহারা আকুতি, শিরোদেশে বিচ্ছুরিত জ্যোতির্মণ্ডল, মূর্ত্তিযুগলকে যে মধুরোজ্জল মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা দেখিবার বস্তু। বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালায় কেন—সমগ্র ভারতে বোধ হয় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলনের এই ধরণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিতগণ এই সমস্ত মূর্ত্তি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে প্রস্তুত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা দাক্ষিণাত্যের মহাবলিপুরের উল্লেখ করিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে এখানকার মূর্ত্তিগুলি

পাহাড়পুরের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি

বাদামী গুহার গোপীপরিবৃত কৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ চিত্রের দক্ষিণ ভাগ (মহাবলিপুর)

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইয়াছিল। মহাবলিপুরের শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণের বিরাট চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়াছেন। সুনিপুণ ভাস্কর্য্যের কোন্ পরিণতস্তরে অন্তরের কল্পনাকে এইরূপে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইয়াছিল, অভিজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। লীলাকথা জনপ্রিয় হইয়াছে, সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তবে তো ধনী ধন দিয়াছেন, ভাবুক আদর্শ রচিয়াছেন, শিল্পী শ্রম করিয়াছেন, হয় তো এইভাবে একটা যুগের সমবেত সাধনা মহাবলিপুরকে রূপদান করিয়াছে। কবে তাহার সূত্রপাত, কতদিনে তাহার পরিণতি কে বলিবে? মহাবলিপুরে মূর্ত্তি-গোষ্ঠীতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপগোপী, বলরাম ও ধেনুবৎসাদির চিত্রও ক্ষোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া যে গোপী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে রাধামূর্ত্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই গোপীমূর্ত্তির ভঙ্গিমায়, মুখশ্রীতে যে প্রণয়-প্রগাঢ় হৃদয়ের আশঙ্কা-কম্পিত আবেশ, যে বিস্ময়-গৌরবের স্মিতসোহাগ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থসাধিকা প্রিয়তমা রাধিকা ভিন্ন অন্য গোপীতে থাকিবার কথা নহে। সুতরাং বন্ধুবর সুনীতিকুমারের মত সমর্থন করিয়া বলিতে পারা যায় মহাবলিপুরে আমরা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি।

গয়া জেলার বরাকর পর্ব্বতের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি অশোকের খনিত গুহায় মৌখরীরাজ ঈশানবর্ম্মার বংশধর অনন্তবর্ম্মা কয়েকটী দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁর লোমশঋষি গুহায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় ইনি তথায় একটী কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপর লিপি হইতে গোপী গুহায় কাত্যায়নী দেবীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার জন্য একখানি গ্রাম দানের কথাও অবগত হওয়া যায়। গোপীগুহা, কাত্যায়নী দেবী ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি এই সমস্ত একত্রে মিলাইয়া দেখিলে শ্রীমদ্ভাগবত কথিত শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভাকাঙ্ক্ষিনী গোপীগণের কাত্যায়নী অর্চ্চনার চিত্র স্মৃতি-পথে উদিত হয়। অনন্তবর্ম্মা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে বর্ত্তমান ছিলেন।

মধ্য ভারত খাজুরাহোর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পুতনা-মোক্ষণ লীলাদির সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির একটী শিলাফলক

দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার আলোক-চিত্রও কিনিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি দুইটার অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হাতের বংশী, উভয় মূর্ত্তির অলঙ্কারাদি ও উর্দ্ধ ভাগ প্রায় অবিকৃত আছে। খাজুরাহোর মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক ও তাহার পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ওয়ালটেয়ারের প্রসিদ্ধ সীমাচলমের নৃসিংহ মন্দির গাত্রে কৃষ্ণের অপরাপর লীলাচিত্রের সঙ্গে গোপীলীলার চিত্রও ক্ষোদিত রহিয়াছে। এই মন্দির কত দিনের পুরাতন বলিতে পারি না।

বাঙ্গালায় ত্রিবেণীতীরে নারায়ণ অথবা কৃষ্ণের একটা মন্দির ছিল। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া একটী মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদ-গাত্র হইতে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৃণাবর্ত্ত-বধ, পূতনা-বধ, যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ প্রভৃতি পুরাণোক্ত কৃষ্ণলীলার চিত্রক্ষোদিত প্রস্তর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মন্দির সেন রাজাদের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ধোয়ী কবির "পবনদূতে" নিম্নোক্ত শ্লোকে—

> তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
> দেবঃ সাক্ষাদ্ বসতি কমলাকেলীকারো মুরারিঃ।

এই মন্দিরই উল্লিখিত হইয়াছে কিনা কে বলিবে?

বেসনগর লিপির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই লিপি হইতে জানিতে পারি গ্রীকদূত হেলিওদোর মালবের রাজা ভাগভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেবদেব বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শক; কুষাণ সম্রাটগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতেই ভগবান্ নারায়ণ বা বাসুদেবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া এই উদার বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরকে আপন করিয়া আসিতেছে। ইতিহাস আমাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপর যে দিক, তাহার দর্শন ও কবিত্বের দিক, তাহার আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য্যের দিক, মধ্যযুগের ভারতে,—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় রাধা-ভাবকে কেন্দ্র করিয়া এই দিক্‌টী পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। রাধা ভাবের পূর্ণ প্রতীক বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ। বাঙ্গালার প্রেমাবতার মানুষকে পূর্ণ হইতে সিদ্ধি লাভ করিতে, রাধা ভাবের উপাসনা করিতেই আহ্বান করিয়াছিলেন। রাধা ভাবে মাতোয়ারা হইয়াই নদীয়ার গোরা চণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন। কতকাল পূর্ব্বে কোন্ পুণ্য মুহূর্ত্তে কাহার ধ্যানধন্য হৃদয়ে শ্রীমতী রাধা উদিতা হইয়াছিলেন জানি না। তবে ইহা অতি সত্য কথা যে বাঙ্গালী শ্রীমতী রাধাকে পুরোভাগে রাখিয়াই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় জীবনে এক অভিনব বিপ্লবের বন্যা আনিয়াছিলেন। আজিকার এই দুর্দ্দিনে জাতিকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

আর এক দিক

বিখ্যাত 'সেন্ট জোয়ান' নাটকটি বার্ণার্ড শ লেখেন নি, বইখানা তাঁকে দিয়ে লেখান হয়েছিল এবং লিখিয়েছিলেন শ-গৃহিণী স্বয়ং। আলেকজান্দর উলকট এই গল্পটি রটিয়েছেন। সম্ভবত বাকচতুর বার্ণার্ড শ নিজেও পত্নীর কৌশলের কথা অবগত ছিলেন না।

শ-গৃহিণী স্বামীর প্রকৃতি জানতেন সুতরাং 'হ্যাগো, সেন্ট জোয়ানকে নিয়ে একটা নাটক লেখ না গো'। অথবা, 'বেশ নাই লিখলে'--ইত্যাদি ধরণের উপরোধ মান-অভিমান না করে জোয়ান অব-আর্ক সম্বন্ধে যেখানে যা কিছু বই প্রবন্ধ ছবি পেয়েছিলেন সব স্বামীর ঘরের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রাখলেন। শ সমুদ্রের ধারে হাওয়া বদলাতে গেছেন, যে সব বই-পত্র সঙ্গে যাবে বলে তিনি ঠিক করে দিয়েছেন—গিয়ে দেখলেন ভুলক্রমে সেগুলো সঙ্গে যায় নি; জোয়ান অব আর্কের বাণ্ডিলটা হোটেলে হাজির হয়েছে। অথবা এয়ট সেন্ট লরেন্সে এক রাত্রির জন্যে ফিরে দেখলেন, তাঁর ঝি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় অর্থনীতি বিষয়ক বই গুলি কোথায় সরিয়ে রেখে অর্লিন্সের কুমারী সম্বন্ধীয় খানকতক বই বিছানার পাশে গুছিয়ে রেখেছে। ট্রেনে কোথা চলেছেন, দেখলেন তাড়াতাড়িতে তাঁর গৃহিণী বইয়ের তাড়াটা বাড়িতে ফেলে এসেছেন। ট্রেনে পড়তে হবে, শ-গৃহিণী নিজের বোচকা থেকে দিলেন একখানা বই বের করে—জোয়ানের কাহিনী। এই করে করে শ'এর সহিষ্ণুতা যখন চরম সীমায় পৌঁছল তখনই শ'এর কলম থেকে সেন্ট জোয়ান নাটকখানি বেরিয়ে এল।

লোকে বলে, শ'এর কোনও নাটক যদি টেকে তো ওই খানিই টিকবে।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

একদিন দেবু নিজে সাধিয়া বিনুদের বাড়ি বেড়াইতে গেল। বিনুর আনন্দ আর ধরে না। রাস্তা হইতেই চীৎকার করিয়া সে সমস্ত পাড়াকে জানাইল যে দেবু তাহাদের বাড়ি আসিতেছে। মা উঠানের একপাশে বসিয়া কাপড় কাচিতে-ছিলেন। দেবুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সেখানে লইয়া গিয়া বিনু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "দেখেছ মা, দেবু এসেছে!"

এমন ভাবে মা তাহাকে হতাশ করিবেন বিনু ভাবিতে পারে নাই। এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মা অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে একবার মাত্র মুখ তুলিয়া শুধু বলিলেন—"তোদের সঙ্গে পড়ে বুঝি!"

তাহার পর আবার কাপড় কাচা চলিতে লাগিল।

বিনুর বুকটা অত্যন্ত দমিয়া গেল। এই-কি দেবুর অভ্যর্থনা! দেবুর কথা সে যে মার কাছে একবার নয় একশ বার গল্প করিয়াছে। মা একটু হাসিতেও কি পারিতেন না!

দেবুর অবশ্য এসব দিকে লক্ষ্য নাই। ভিজা উঠানের উপরেই বিনুর মায়ের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া সে একগাল হাসিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল, "আপনাদের বাড়ি দেখতে এলুম মাসিমা!"

দেবুর প্রণাম করায় ও 'মাসিমা' বলিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করায় বিনু একটু লজ্জাবোধ করিল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য। প্রথম দিন পরিচয়ের সময় সে ত কই দেবুর মাকে প্রণাম করে নাই? তাঁহাকেও মাসিমা বলা নিশ্চয় বিনুর উচিত ছিল। আজ পর্য্যন্তও ত দেবুর মাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে তা সে ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারে নাই।

দেবুর প্রণামে বিনুর মার মুখ একটু প্রসন্নই হইয়াছে দেখা গেল। বলিলেন, "কি আর দেখবে বাবা? টিনের ঘরে থাকি, একি আর তোমাদের রাজপ্রাসাদ?"

শেষ কথাগুলিতে কণ্ঠের প্রসন্নতাটুকু বুঝি আর ছিল না।

দেবু কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আমার টিনের ঘর ভারী ভালো লাগে মাসিমা!" তাহার পর বিনুর দিকে ফিরিয়া আবার বলিল, "বৃষ্টির সময় ভারী মজা না রে বিনু? আমাদের গ্যারেজটা টিনের কি না?—আমি বৃষ্টির সময় লুকিয়ে লুকিয়ে গ্যারেজে গিয়ে বসে থাকি, টিনের ওপর বৃষ্টির শব্দ এমন ভালো লাগে!"

দেবুর টিনের গ্যারেজের কথা শুনিয়া মা ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া আবার কাপড় কাচায় মনোনিবেশ করিলেন। দেবু ততক্ষণে বিনুর সহিত তাহাদের শোবার ঘরে ঢুকিয়া বলিতেছে—"তুই কোথায় পড়িস্ রে বিনু?"

এবার বিনুও একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। দেবুর পড়িবার ঘর সে দেখিয়া আসিয়াছে। সে ঘরে কত ছবি, কত ম্যাপ, টেবিল, চেয়ার, ব্লাক-বোর্ড, কতই না সরঞ্জাম। সে বলিল—"এই মেজের ওপর, দাওয়াতেও পড়ি, মাদুর পেতে।"

কিন্তু দেবু তাহাকে অবাক করিয়া দিল। হঠাৎ সে বলিল, "তোদের বাড়িটা ভাই বেশ! আমার ভাই বড় বাড়ী মোটে ভাল লাগে না।"

বিনু চুপ করিয়া রহিল। দেবু না হইয়া আর কেহ বলিলে সে কথাটা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত না। কিন্তু দেবু ত আর মিথ্যা কথা বলে না।

দেবু আবার বলিল—"আমার তাই জন্যে ভাই মামার বাড়িতে গিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে। মামার বাড়ি পাড়াগাঁয়ে কিনা—মাটির ঘর, খড়ের চাল। আমার ত সেখান থেকে আসতে ইচ্ছা করে না।"

ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেবু নানা জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। বিনু ইহাতেও কম অবাক হইল না। যাহাদের বাড়িতে অত রকমের অমন আশ্চর্য্য সব সরঞ্জাম তাহার আবার এই সমস্ত সামান্য জিনিষে কৌতূহল থাকিতে পারে! কড়ি দিয়া তৈয়ারী সামান্য একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি, তাহাদের বেঞ্চির ওপর রাখা কয়েকটা পিঠে তৈয়ারী করিবার মাটির ছাঁচ, ইহাই দেবুর এত ভালো লাগিবে কে জানিত।

মা তখন কাপড় কাচা সারিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন। দেবু হাসিয়া বলিল, "আপনাদের এখানে একদিন পিঠে খাব মাসিমা, এই রকম ছাঁচ দিয়ে তৈরী!"

"তুমি বাবা কত ভালো মন্দ জিনিষ খাও, আমাদের বাড়ির পিঠে কি তোমার ভাল লাগবে !"

"না মাসিমা, আমার পিঠে ভারী ভাল লাগে—মা তৈরী করে না বলে' মাকে কত বলি ! একদিন সরকার মশাই-এর বাড়িতে গিয়ে পিঠে খেয়ে এসেছিলাম যে !"

"তোমরা এখন সাহেব হয়ে গেছ, তোমার মা কি আর পিঠে তৈরী করতে জানে !"

কথাটার মধ্যে শ্লেষ হয়ত ছিল কিন্তু দেবু হাসিয়া বলিল, "না, মা জানে ত ! তবে মা তৈরী করতে চায় না ; বলে, 'কার জন্যে করব ; তুই ত মস্ত খাইয়ে, একটার বেশী দুটো খেলেই ত তোর অসুখ করবে' !"

দেবু আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে মোটর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বাড়িতে ফেরার পর মা বিনুকে বলিলেন—"তোর বন্ধু আর কি বললেরে বিনু ?"

মা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া বিনু সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল। মা আবার বলিলেন—"এক রত্তি ছেলের কি দ্যামাক বাপু ! আমাদের টিনের বাড়ি ওঁদের গ্যারেজের মত ! আবার বলে কিনা মা কখন পিঠে তৈরী করে না !"

বিনু অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, একে মা দেবুর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেন নাই তাহার উপর এই সমস্ত অন্যায় মন্তব্য ! সে বলিল—"দেবু ত তা বলেনি মা !"

"না বলেনি, তুই যেমন হাবা ছেলে ! ওসব বড় মানুষের ছেলের বাঁকা কথা তুই কি বুঝবি !"

তাহার পর মা অনেকটা যেন নিজের মনেই মন্তব্য করিলেন—"কিন্তু কি কুচ্ছিরি বাপু ! বড় লোকের ছেলে হলে কি হবে—সোণায় মুড়লেও ত আর রূপ ঢাকা দেওয়া যায় না !"

বিনুর মন একেবারে দমিয়া গেল। মা এমন রূঢ় ভাবে দেবুর নিন্দা করিতে পারেন ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাছাড়া এই প্রথম অবাক হইয়া সে শুনিল যে দেবু কুৎসিত। দেবুর চেহারার বিচার সে কখনও অবশ্য করে নাই, কিন্তু যে দেবুকে সে ভালবাসে তাহার কাছে ত নিজেকে বিনুর অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়।

আজ প্রথম বিনু মায়ের উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল ! প্রথম তাহার মনে হইল মায়ের সহিত তাহার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে কোথায় একটা বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। আর মার কাছে সহজ ভাবে নিজের সব কথা সে বলিতে পারিবে না। মার নিকট হইতেও সে এখন দূর হইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের ছুটি হইতে তখনও কিছু দেরী আছে এমন সময় বিনু ও দেবুর দীর্ঘকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হইল। দেবুকে শরীর সারাইবার জন্য চেঞ্জে যাইতে হইবে। তাহারা মুসৌরী যাইতেছে।

স্কুলে আজকাল আর দেবু একেবারে আসেনা। বিকালে রোজই বিনুকে দেবুর বাড়ী যাইতে হয়—না গিয়া সে থাকিতেই পারে না।

দেবু নূতন যায়গায় যাইবার আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। সেখানে কি রকম পাহাড় আছে, বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া কি রকম দেখায়,—তাহার বাবা যদি তাহাকে শীকারে লইয়া যান তাহা হইলে নিকটের জঙ্গলে কি কি জানোয়ার সে দেখিতে পারে ইত্যাদি অনেক কথা সে বিনুকে কয়দিন ধরিয়া শুনাইতেছে। কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে বিষণ্ণ মুখে সে বলে—"তোর সঙ্গে ভাই কতদিন দেখা হবে না ! তুই আমায় চিঠি লিখবি, কেমন ?"

বিনু ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয় ! দেবু উৎসাহ ভরে বলিয়া চলে—"আমি তোকে রোজ ভাই একখানা চিঠি দেব, দেখিস্। সেখানকার সব কথা লিখব।"

বিনু নিজে কিসের কথা যে লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়া একটু বিব্রত হইয়া বসিয়া থাকে।

দেবু বলিয়া চলে—"বাবা ত এবার একটা ক্যামেরা কিনে দেবে। তাইতে ফটো তুলেও তোকে পাঠিয়ে দেবখ'ন। তুই এখানে বসেই মুসৌরী দেখতে পাবি।"

বিনু এই বার ভাবিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে সে কি লিখিবে। সে লিখিবে রাজবাড়ির কথা। এক দিন সে একলা রাজবাড়ি যাইবে দুপুর বেলা। অবশ্য ভয় খুবই করিবে ; কিন্তু দেবুকে চিঠি লিখিবার বিষয় পাওয়ার জন্য সেটুকু ভয় পাইতে সে রাজী। সেই রাজবাড়ির পুকুরের কথা লিখিয়া সে দেবুকে একেবারে অবাক করিয়া দিবে।

দেবু খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ বলে—"তুই যদি আমার সঙ্গে যেতিস্ তাহলে বেশ হ'ত।"

কিন্তু বড় হইয়া দেবুর সঙ্গে বিলাত যাইতে যেমন সহজে রাজী হওয়া যায় মুসৌরী যাইবার বেলা তেমন হওয়া যায় না। দেবুও তাহা জানে, তবু একবার মাকে ডাকিয়া সে বলে—"মা, বিনু আমাদের সঙ্গে যেতে পারে না!"

দেবুর মা হাসিয়া বলেন—"তা কি হয় বাবা! বিনুর মা যেতে দেবে কেন! আর মাকে ছেড়ে বিনু কি থাকতে পারে অতদিন!"

যাইতে যে পারিবে না তাহা বিনুও জানে, তবু একথায় তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। আর সত্যি মাকে ছাড়িয়া যাইবার কথায় তাহার ত তেমন কষ্ট হয় না। তবু সে তাড়াতাড়ি বলে—"আমি যাবনা ভাই, তুই তার চেয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসিস্।"

দেবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—"এবার আমি সত্যি সেরে আসব দেখিস্! রোজ রোজ তাহলে আর অসুখ করবে না ভাই।" তাহার পর হাসিয়া আবার বলে—"এবার কিন্তু এমন মোটা হব যে তুই আর আমার সঙ্গে পারবি না।"

বিনু মনে মনে তাহাই কামনা করে। দেবু এত রোগা ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে বিনুর কষ্ট হয়। আজ কাল বিছানা হইতে উঠিয়া সে বেশী বেড়াইতে পারে না। দেবু ভাল করিয়া সারিয়া না আসিলে তাহাদের মেলামেশায় কোন আনন্দই ত হইবে না।

দেবুরা চলিয়া গিয়াছে। বিনু একেবারে নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে তাহার কোথাও যেন আর আশ্রয় নাই। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে কোন কালেই সে ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। গৃহে মার কাছে তার যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল সে আশ্রয়ও যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাবার ত আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

দেবুর সহিত বন্ধুত্ব হইবার আগে একলা একলা সে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করিয়া আনন্দে থাকিত সে জগৎও আর তাহাকে সান্ত্বনা দেয় না। সে যেন বড় তাড়াতাড়ি বড় হইয়া গিয়াছে। ইটের পাঁজাকে পাহাড় ভাবিতে তাহার আর ভাল লাগেনা। দেবুর কাছে পাহাড়ের সে সত্যকার গল্প শুনিয়াছে, অদ্ভুত সব ছবি দেখিয়াছে। নর্দ্দামায় কাগজের নৌকা চালানও আজকাল তেমন মজার খেলা বলিয়া মনে হয় না। ওইটুকু বয়সের ছেলের পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক বিনুর তাহাই হইয়াছে—দিন গুলা তাহার কাছে অত্যন্ত নীরস ঠেকে, মনের উপর তাহারা ভার হইয়া থাকে। সমস্ত দিন কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। সঙ্গীর মধ্যে কালীই তাহার একমাত্র সম্বল, কিন্তু কালীকে তাহার, সত্যকথা বলিতে কি, ভাল লাগে না। প্রথমতঃ সে মেয়ে বলিয়া ভাল লাগে না, দ্বিতীয়তঃ তাহার সহিত কথা বলিবার কিছু নাই। কালীর স্নেহের প্রকাশ গুলিতেই তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কালী যদি অমন করিয়া রাতদিন তাহার সহিত সাধিয়া মিশিতে না আসে তাহা হইলে সে যেন বাঁচে।

কালীর সহিত তাহার পরিচয়টা মাও পছন্দ করেন না। হয়ত তাহাকে ডাকিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলেন—"জেলেদের ও কালটি মেয়েটা তোকে ডাকছিল কেন রে?"

বিনু তাহার পূর্ব্বের স্বাভাবিক সরলতা হারাইয়াছে। নিজেকে এখন সে মার কাছেও গোপন রাখিতে চায়। প্রথমটা সে কথাটা লুকাইবার জন্য বলে—"ও অমনি এসেছিল।"

মা বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া বলেন—"তবু অমনিটা কি শুনি?"

বিনু মুখ ভার করিয়া বলে—"আমায় রাস দেখতে যেতে বলছিল।"

"হাঁ। রাস দেখতে যাবে না! হাড়ি, ক্যাওড়া, জেলে দুলের সঙ্গেই ত তোমার যত ভাব আজকাল। একেবারে উচ্ছন্নে গেছ যে!"

বিনু দুঃখে রাগে অভিমানে মুখ লাল করিয়া মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে নিজেই কালীকে, যাইতে পারিবে না বলিয়াছে। কিন্তু মা আজকাল এমনিই অবুঝ হইয়াছেন, অকারণে কোন কথা না বুঝিয়াই বকাবকি করেন। বহুদিন মার কাছ হইতে কোন আদর পাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। তাহার নিজের মনও ভিতরে ভিতরে একটু বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

মা আবার ধমক দিয়া বলেন, "চুপ করে আছিস্ যে বড়, খবরদার বলছি, যেতে পারবে না! আর ওই সব হাড়ি

ক্যাওড়ার সঙ্গে যদি কোন দিন মিশতে দেখি তাহ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, জেনো!"

বিনুর চরিত্রের স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা হরণের অনেক দিনের এত আয়োজন কেমন করিয়া নিষ্ফল হইবে! কোন দিন সে যাহা করে নাই আজ তাহাই সে করিয়া ফেলে। যে কালীকে তাহার ভাল লাগে না, যাহার সঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সে একরকম বাঁচিয়া যায়, মায়ের অন্যায় শাসনে হঠাৎ তাহারই স্বপক্ষে দাঁড়াইবার জন্য তাহার জেদ হয়। প্রথম মায়ের মুখের উপর উত্তর দিবার সাহস সঞ্চয় করিয়া মুখ ভার করিয়া সে যাহা বলে তাহাতে যুক্তি অবশ্য নাই কিন্তু প্রথম বিদ্রোহের সুচনা আছে।

বলে, "ওরা ত হাড়ি ক্যাওড়া নয়!"

সৌভাগ্যের বিষয় মা সে কথায় তেমন কান দেন না। নিজের কাজে চলিয়া যাইতে যাইতে বলেন—"অত জাতের ব্যাখ্যা তোমার কাছে শুনতে চাই না, তুমি যেতে পাবে না এই বলে গেলাম।"

বিনুর মনের বিদ্রোহ গভীর হইবার সুযোগ পায় না।

বিনু অবশ্য সেদিন কালীর সঙ্গে রাস দেখিতে গেল না। তবে মার অন্যায় নিষেধের জন্যই কালীর সহিত মিশিবার একটা জেদ তাহার মনে রহিয়া গেল। বেশী দিন কালীর স্নেহের আতিশয্য তাহাকে কিন্তু সহ্য করিতে হয় নাই। সামান্য একটা ঘটনার পর তাহার জীবন হইতে কালী একেবারে বিদায় লইল। সে ঘটনা সেদিন তাহার মনে এতটুকু দাগ রাখিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

বিকাল বেলা অত্যন্ত মন-মরা ভাবে এদিক ওদিক বেড়াইয়া বিনু বাড়ি ফিরিতেছিল। কালী তাহাকে বাড়ি ফিরিবার পথেই ধরিল। রাস্তার ধারে তাহারই জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল কিনা কে জানে!

বিনু অবাক্ হইয়া দেখিল কালীর চোখে জল, শুধু তাই নয় তাহার চুল এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, কপালের একটা জায়গা ফুলিয়া ঢিবি হইয়াছে এবং মুখে ও গায়ের নানা জায়গায় অঘাতের দাগ।

কালী তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কালী আজকাল মাথায় অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছে। এত বড় মেয়েকে এ রকম ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া বিনু কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। কি যে বলিবে, কি যে করিবে সে ভাবিয়া ভাবিয়া পাইতেছিল না।

কালী কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল ভাবে তাহাকে যাহা বলিল তাহাতে তাহার বিস্ময় আরো বাড়িল বই কমিল না। কালীর বাড়ির লোক তাহাকে এক দূর সম্পর্কের বৃদ্ধা আত্মীয়ার সহিত অন্য জায়গায় পাঠাইতে চায়। সে যাইতে রাজী নয় বলিয়াই তাহার এই লাঞ্ছনা। যে বুড়ি তাহাকে লইতে আসিয়াছে তাহার সহিত গেলে কালীর দুঃখের আর সীমা থাকিবে না—তাহাকে বিষ খাইয়া মরিতে হইবে। বিনু যদি তাহার বাবাকে বলিয়া কালীর যাওয়া নিবারণ করিতে পারে তাহা হইলে সে তাহাদের কেনা হইয়া থাকিবে। বিনুদের বাড়িতে সে চিরদিন বিনা মাহিনায় ঝি-গিরি করিতেও রাজী, তবু সে যাইতে চাহে না। তাহার আশ্রয় লইবার কোন জায়গা নাই, তাহার হইয়া কথা বলিবার কেহ নাই। শুধু বিনু যদি তাহার বাবাকে জানায় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। সে শুনিয়াছে যে পুলিশে খবর দিলে তাহারা তাহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সে কেমন করিয়া তাহা পারে!

এক নিশ্বাসে অমনি আরও অনেক কথা বলিয়া কালী কাতর ভাবে বিনুর মুখের দিকে চাহিল। বিনু অবশ্য ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না। কালী তাহার সৎমায়ের আশ্রয়ে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া থাকে ইহাই সে জানে। এরকম অপমানের স্থান পরিত্যাগ করিবার সুযোগ পাইয়াও যাইতে কেন তাহার আপত্তি বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যাবে না ই বা কেন?"

কালী খানিক নীরব থাকিয়া ম্লান মুখে বলিল—"সে তুমি বুঝবে না!" কিছুক্ষণ বাদে আবার সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমার দিদিকে অমনি করে ওরা নিয়ে গেছে।" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সমস্ত ব্যাপারটা বিনুর কাছে একেবারে রহস্যময়। তবু কালীর কান্নায় তখন তাহার মন গলিয়াছে। তাহার বাবা কালীর যাওয়া নিবারণ করিতে পারেন কিনা এবং পারিলেও করিতে চাহিবেন কিনা সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবু বাবা যদি বাড়ি আসে তাহা হইলে এসব কথা বলিবার

লজ্জা উপেক্ষা করিয়াও সে বাবাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিবে, সঙ্কল্প করিল।

কালী তাহার দুটি হাত ধরিয়া আবার কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিল, "লক্ষী ভাইটি, তোমার বাবাকে বলবে ত!"

বিনু মাথা নাড়িয়া বলিল, "বলব।"

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কালী বলিল, "আমার যে ভয় করে, নইলে আমি এখনি একলা কোথাও পালিয়ে যেতাম!"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। কালী সাশ্রুনেত্রে আর একবার বিনুকে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিনু বাড়িতে ফিরিলে মা বলিলেন, "তোর নামে একটা চিঠি এসেছে রে বিনু!"

বিনুর বুকের ভিতরটা আনন্দে কেমন করিয়া উঠিল। চিঠি আসিয়াছে! সত্যই দেবু চিঠি লিখিয়াছে! মোটা খাম খানা হাতে লইয়াও সে যেন নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এই তাহার প্রথম চিঠি! উপরে তাহারই নাম লেখা! পিয়ন আসিয়া তাহারই নাম ডাকিয়া চিঠি বিলি করিয়া গিয়াছে। চিঠি আসিতেছেও সেই কত দূর হইতে। কত রেলপথে ঘুরিয়া, কত হাত ফিরিয়া এ পত্র আসিল ভাল করিয়া জানিলে সে বুঝি আরও খুশী হইত। কিন্তু দেবু তাহারই নাম করিয়া তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া চিঠি লিখিয়াছে ভাবিতেও তাহার সমস্ত শরীরে আনন্দ-শিহরণ জাগে। দেবুর চাইতেও দেবুর চিঠির মূল্য যেন বেশী হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। চিঠিটি না খুলিয়া খানিকক্ষণ সে শুধু হাতে করিয়া রাখিয়া নিজের সৌভাগ্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিল। আজ সে সমস্ত সাধারণ লোক হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহার জানা-শুনা সকলের সে উপরে। তাহার নামে সত্যকার চিঠি আসিয়াছে।

চিঠি খুলিয়াও তাহার এ বিস্ময় ও আনন্দের ঘোর বজায় রহিল। কী চমৎকার চিঠিই লিখিতে পারে দেবু! সামান্য একটি কাগজের পাতায় দেবুর গোটা গোটা হাতের লেখার যাদুতে বিনুর কাছে নূতন এক অপূর্ব্ব জগৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। দেবু অনেক কথা লিখিয়াছে। তাহাদের ট্রেনে ওঠার কথা, ট্রেনে সারা রাত্রে তাহাদের যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কথা। ঘটনাগুলি এমন কিছু নয়, নিতান্ত সাধারণ; কিন্তু যে লিখিয়াছে ও যে পড়িতেছে, তাহাদের কাছে সেগুলির মূল্য অনেক বেশী। সবশেষে দেবু মুসৌরীর বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। লিখিয়াছে, ছবি এবার সে পাঠাইতে পারিল না, দিনকতক পরেই ক্যামেরা দিয়া সে ছবি তুলিয়া পাঠাইবে।

বিনু চিঠিটা অবশ্য অনেকবার পড়িল, তাহার পর তাহার কাঠের বাক্সে চিঠিটা সযত্নে সে তুলিয়া রাখিল, খামটা পর্য্যন্ত সে ফেলিল না—খামের দাম তাহার কাছে বুঝি চিঠির চেয়ে কম নয়। অর্দ্ধেক রাত সে চিঠিটার আনন্দে ভাল করিয়া ঘুমাইতেই পারিল না। বাক্সর ভিতর চিঠিটুকু আছে ভাবিতেই তাহার মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

সে রাত্রে বাবা বাড়ি ফিরিয়াছিলেন কিনা বিনুর মনে নাই। পরদিন হইতে যে কালীকে পাড়ায় দেখা গেল না ইহাও সে লক্ষ্য করিল না।

দেবুর পর পর কয়েকটি চিঠি আসিয়াছে। সত্যই মুসৌরীর ছবি সে পাঠাইয়াছে তাহার সঙ্গে। কিন্তু বিনু তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। শুধু যে কি লইয়া চিঠি লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে উত্তর দেয় নাই তাহা নয়। চিঠির উত্তর দিবার জন্যও খাম কিনিতে পয়সা লাগে। পয়সা সে কোথায় পাইবে। চিঠি দিবার প্রতিশ্রুতি দিবার সময় সামান্য এ পয়সার বাধার কথা তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু দেখা গেল এ বাধা দুরতিক্রম্য।

তবুও বিনু মার কাছে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া চিঠি পাঠাইবার খরচ সংগ্রহ করিল। এইবার দেবুকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে!

গ্রীষ্মের ছুটির এক দুপুর বেলা সে একলাই রাজবাড়ির দিকে চলিল। সেই প্রায়ান্ধকার পোড়ো বাড়ির নির্জ্জন জঙ্গলের কথা ভাবিয়া ভয় তাহার করিতেছিল অবশ্য, কিন্তু তবু তাহাকে যাইতেই হইবে। তাহার এই সাহসের কথা শুনিয়া দেবু কি অবাকই হইয়া যাইবে! যেখানে ভাঙা বাঁধান ঘাটের উপর তাহারা বসিত, যেখান হইতে তাহারা মাছের খেলা দেখিয়াছে সেই সমস্ত জায়গার কথা সে ভালো করিয়া লিখিবে। যদি একবার সেই পোড়ো বাড়ির ঘরগুলার ভিতর ঘুরিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে আরো ভালো হয়। কিন্তু বিনু মনে মনে জানে যে সে তাহা পারিবে না। রাজ-

বাড়িতে ঢুকিবার যেটুকু সাহস সে সঞ্চয় করিয়াছে ইহার অতিরিক্ত আর তাহার কিছু নাই।

বিনু এতক্ষণে রাজবাড়ির পথে আসিয়া পড়িয়াছে, আর একটা বাঁক ঘুরিলেই রাজবাড়ি। কিন্তু সে বাঁক ঘুরিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় তাহাদের সে রাজবাড়ি! মজুর-মিস্ত্রী লোক-জনে সমস্ত জায়গা গমগম করিতেছে। সে ভাঙা দেওয়াল ইতিমধ্যেই মেরামত হইয়া নূতন হইয়া উঠিয়াছে। ভারা বাঁধিয়া, চুণ সুরকি ইটের গাদা করিয়া ইতিমধ্যেই বহু লোক লাগিয়া গিয়াছে পুরাতন বাড়িটির সংস্কার-কার্য্যে।

রাজবাড়িকে আর চেনাই যায় না। বিনুর মন একেবারে দমিয়া গেল। রাজবাড়ির সেই রহস্যময় নির্জ্জনতায় তাহার ও দেবুর যেন কি অধিকার জন্মিয়া গিয়াছিল। ইহারা যেন জোর করিয়া সে অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে।

বিনু অনেকক্ষণ সেখানে হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বিষণ্ন মনে ফিরিয়া আসিল। দেবুকে চিঠিতে লিখিবার আর কিছুই যে নাই।

লিখিবার বিশেষ কিছু নাই তবু বিনু কোন রকমে দেবুর পত্র শেষ করিল। দেখা গেল, দেবু কেমন আছে এখন, কতদিনে সে আসিবে, সে মোটা হইয়াছে কিনা, সেখানে নতুন কাহারও সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে কিনা এই সমস্ত কথা লিখিয়াই সে চিঠিটিকে যতখানি সম্ভব বড় করিয়াছে। রাজবাড়ির কথা সে কিছুই লিখিল না। তাহাদের সে কল্পনার জগৎ যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে একথা লিখিতে তাহার কষ্ট হয়।

এবার কিছুদিন বাদে একটু দেরী করিয়াই দেবুর চিঠি আসিল। দেবু অনেক কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহার মনে হয় সে এবার সারিয়া উঠিতেছে। মোটা সে হয় নাই. কিন্তু শরীর তাহার ভালো হইয়াছে। সেখানকার ডাক্তারও তাহাকে তাই বলিতেছেন। এবার সারিয়া দেশে ফিরিয়া সে যে কত কি করিবে সবিস্তারে দেবু তাহার বর্ণনা দিতেও ভোলে নাই। মুসৌরি তাহার সত্যই আর ভালো লাগিতেছে না, দেশে ফিরিবার জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক কিন্তু বাবা মা আর একটু না সারিলে তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিবেন না। এমন করিয়া অসুখ সারাইবার জন্য কতদিন পড়িয়া থাকা যায়। এ সময়ে সে দেশে থাকিলে কত মজাই না হইত। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড় দেখিয়া তাহার আজ কাল কি রকম হাঁফ ধরে জানাইয়া শেষে দেবু কিনা সেই রাজবাড়ির কথাই লিখিয়াছে। সেই ঘন ছায়ার জঙ্গলে তাহার আবার একবার যাইতে ইচ্ছা করে। এখানে ফিরিয়াই সে বিনুর সহিত আর একদিন সেখানে যাইবে। সেই পুকুরের কালো নিথর জল সে যেন এখানেও চোখ বুঝিলে দেখিতে পায়। এবার তাহারা একদিন সাহস করিয়া পোড়ো বাড়িটার ভিতরেও ঢুকিয়া দেখিবে। নিশ্চয়ই সেখানে অনেক মজার জিনিষ আছে। বিনু কি একলা কোন দিন সেখানে গিয়াছে!

বিনু এ চিঠির উত্তর অনেক দিন দিতে পারিল না। পয়সার অভাবে ত বটেই তাছাড়া রাজবাড়ি সম্বন্ধে দেবুকে কেমন করিয়া সে হতাশ করিবে! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে চিঠি দিবার পরও দেবুর উত্তর আর আসিল না। বিনু অনেক দিন ব্যাকুল ভাবে পত্রের অপেক্ষা করিল। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হইয়াছে, তাহাদের স্কুল খুলিয়াছে। দেবু ফিরিয়া স্কুলেই তাহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া হয়ত চিঠি দেয় নাই এই ছিল বিনুর শেষ সান্ত্বনা। কিন্তু তাহাও তাহার ভাঙ্গিল।

দেবু স্কুলে আসে নাই।

প্রথম দিন স্কুলের দুপুর বেলাতেই ছুটি হইয়া গেল। বিনু স্কুল হইতে ঘরে না ফিরিয়াই একেবারে দেবুদের বাড়িতে গেল। দেবু ফিরিয়াছে কিনা সে নিজেই দেখিয়া আসিবে।

দেবুদের বাড়ির রাস্তাটা নির্জ্জন। প্রকাণ্ড বড় বড় বাড়িগুলা রাস্তার দুধারে অনেকখানি করিয়া জায়গা লইয়া নিঃসঙ্গ গৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাড়ার মত এখানে ঘেঁসাঘেঁসি নাই, বাড়িগুলা যেন পরস্পরের সহিত মিতালি পছন্দ করে না। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র।

দুপুর বেলা সমস্ত পাড়াটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ মনে হইতেছিল। বাড়িগুলার কোথাও কোন লোকজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

দেবুদের ফটক খোলাই ছিল। বিনু একটু সঙ্কুচিত ভাবে তাহার মধ্য দিয়া, ভিতরে ঢুকিল। অনেক দিন বাদে এ-বাড়িতে আসিয়া গোড়ার দিকের মত সে একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। বাড়ির চারিধারে ফুল ও শাকসব্জির বাগান।

একটি মাত্র মালি দূরে বড় কাঁচি লইয়া একটা গাছের পাতা কাটিতেছিল। সমস্ত বাড়িটায় তাহারই শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই।

বিনু ধীরে ধীরে গিয়া দেবুদের নীচের বাহিরের ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে কিনা ঠিক করিতে না পারিয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিল, "কি চাও খোকা?"

বিনু চমকাইয়া উঠিল। দেবুদের সোফার নিকটের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই লোকটাকে চিরদিন বিনু একটু ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। বিনুর সাহচর্য্যেও তাহা দূর হয় নাই। লোকটা কোনদিন যে তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই—একথা বিনু জানে। কেন যে লোকটা তাহার প্রতি এত বিরূপ তাহা বিনু কোনদিন ভাবিয়া পায় নাই। তাহাকে অসন্তুষ্ট করিবার মত কোন কাজ কখনও বিনু করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

একটু ভড়কাইয়া বিনু অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি—আমি দেবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি! দেবু এসেছে?"

"নাঃ—নাঃ—দেখা টেখা হবে না, যাও!"

সোফারের ধমকানিতে বিনু ভয়ও যেমন পাইল আশ্চর্য্যও হইল তেমনি। লোকটার কথায় দেবু আসে নাই এমন কোন আভাস ত পাওয়া গেল না এবং দেবু যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত বিনুকে দেখা করিতে দিতে কেমন করিয়া এ লোকটা বাধা দিতে পারে! দেবু একথা জানিতে পারিলে কি রকম রাগ করিবে সে কি জানে না।

দেবু যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে কোন বাধা নাই। তবু লোকটা যে রকম উগ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে বিনুর সাহস হইল না।

তাড়াতাড়িতে কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে বলিয়া ফেলিল, "দেবু, আমায় আসতে বলেছিল যে।"

ইহাতে এমন হিতে বিপরীত হইবে কে জানিত! লোকটা এবার তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত ক্রুর ভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বলেছিল? তোমায় আসতে বলেছিল না? কবে বলেছিল হে ছোকরা?"

বিনু ভয়ে একটু পিছাইয়া গিয়া বলিতে যাইতেছিল, "আমায় চিঠি লিখেছিল যে।"

কিন্তু সোফার তাহার কথার মাঝখানেই চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিল, "এই বয়সে খুব ওস্তাদ হয়েছ ত ছোকরা! যাও এখানে গোল কোরো না। মাজি শুনতে পাবেন।"

'মাজি শুনতে পাবেন!' কাঁদ-কাঁদ হইয়া দেবুদের দরজা হইতে ফিরিতে ফিরিতে বিনু এই কথাই ভাবিতেছিল। দেবুর মা যে আসিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ত আর নাই। তবু এতদূর আসিয়া দেবুর সহিত সে দেখা করিতে পাইল না। দেবু তাহাকে চিঠি না দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, স্কুলে তাহার সহিত দেখা করিতে যায় নাই, দেবুর সহিত বাড়িতে দেখা করিতে আসিয়াও সে অপমানিত হইল। তবে কি দেবুই তাহার সহিত দেখা করিতে আর চাহে না। কিন্তু বিনু সে কথা বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া?

ফটকের কাছাকাছি আসিয়া সে আর একবার দেবুদের বাড়ির দিকে ফিরিয়া চাহিল। মনে হইল দেবুর মা যেন উপরের রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াও বিনুর মনে হইল। তাহা হইলে সত্যই সে কি ইহাদের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে!

হতাশ ভাবে সে ফটকটা পার হইতেছিল এমন সময়ে পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল। বিনু পিছন ফিরিয়া দেখিল সেই সোফারই তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে তাহাকে ডাকিতেছে। নূতন কোন লাঞ্ছনা তাহার কপালে আছে কিনা বুঝিতে না পারিলেও বিনু ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। সোফার তাহার নিকটে আসিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "যাও, মাজি ডাকছেন!"

সমস্ত ব্যাপারটা বিনুর কাছে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। দেবুর মা সিঁড়ির উপরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন, "দেবুকে খুঁজতে এসেছিলে বাবা?"

প্রথমটা বিনু দেবুর মার মুখের দিকে লজ্জায় চাহিতে পারে নাই; এবার মুখ তুলিয়া অবাক হইয়া গেল। দেবুর মার সে চেহারা আর নাই। খুব যে শীর্ণ হইয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু

সমস্ত মুখের চেহারা তাঁহার কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁহার দুই গাল বাহিয়া দুটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

বিনু মুখ তুলিয়া চাহিতে তিনি আবার বলিলেন—"দেবু ত আর নেই বাবা!" মনে হইল গলাটা হঠাৎ একটু ধরিয়া গিয়াছে। তাছাড়া আর কোন উচ্ছ্বাসের পরিচয় তাঁহার কোথাও পাওয়া গেল না। সস্নেহে তিনি বিনুর মাথার উপর একটি হাত রাখিলেন।

একে ত এতক্ষণের ঘটনায় বিনু একেবারে বিমূঢ় হইয়াছিল, দেবুর মার কথায় প্রথমটা তাহার আচ্ছন্ন ভাব আরও বাড়িয়া গেল। কথাটার সত্যকার অর্থ সে যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। বুদ্ধিশুদ্ধি তাহার হঠাৎ লোপ পাইয়াছে।

হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া দেবুর মা এক জায়গায় বসাইলেন। তাহার পর অনেক ক্ষণ দু'জনেই নীরব! দেবুর মা এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল থেকেই এখানে এসেছ ত; কিছু খাবে বাবা?"

বিনু মাথা নাড়িল। দেবুর মাও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। এ রকম ভাবে বসিয়া থাকিতে কিন্তু বিনু আর পারিতেছিল না। দেবুর মা তাহা বোধ হয় বুঝিয়া খানিক বাদে বলিলেন, "বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে, না বিনু? আচ্ছা যাও। আবার একদিন আসবে ত!"

বিনু ম্লানমুখে ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিল এমন সময় পিছন হইতে ডাকিয়া দেবুর মা বলিলেন, "একটু দাঁড়াও ত বাবা!"

তিনি ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং খানিক বাদে যাহা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তাহা দেখিয়া বিনু একেবারে অবাক হইয়া গেল। দেবুর সেই পৃথিবীর নানা জন্তু জানোয়ারের ছবির বই। অনেক দাম দিয়া দেবুর বাবা এই বইটি দেবুকে কিনিয়া দিয়াছিলেন বিনু জানে। এই ছবির বইটি বিনুরও বড় পছন্দ। কতদিন সে দেবুর সঙ্গে বসিয়া ইহার পাতা উল্টাইয়াছে—দেখিয়া তাহার আশা মেটে নাই।

বিস্ময়-বিমূঢ় বিনুর হাতে বইখানি দিয়া মা বলিলেন, "দেবু তোমায় দিতে বলে গিয়েছে বাবা!"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত সে আমাদের ডাকেনি' শুধু তোমার নামই করেছে!" গলার স্বর এই প্রথম তাঁহার কান্নায় যেন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া যে বিনু সেদিন বাড়ী ফিরিল তাহার মনে নাই। যন্ত্রচালিতের মতই সে বইটি হাতে করিয়া রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছে।

তাহার জীবনে মৃত্যুর এই প্রথম পদক্ষেপ।

বাড়ীর দরজার কাছে যখন সে আসিয়া পড়িয়াছে তখনও তাহার আচ্ছন্ন ভাব কাটে নাই। দুইজন লোক যে তাহাকে ডাকিতেছে ইহা সে প্রথম শুনিতেই পাইল না। তাহাদের একজন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিতে যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। যেমন কুৎসিত লোকটার চেহারা তেমনি কর্ক'শ তাহার গলা। এই কর্ক'শ গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বিনুর গায়ে হাত বুলাইয়া লোকটা বলিল, "তোমার বাবা বাড়ি আছে কি না দেখে এস ত খোকা!"

'দেখছি।' বলিয়া বিনু বাড়ীতে ঢুকিল। কথা বলিবার সঙ্গে লোকটা কেন যে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়াছিল অন্য সময় হইলে সে হয়ত বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তখন তাহার মনে কোনো কৌতূহলের স্থান নাই।

লোকগুলা তাহার সঙ্গে বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়াই ঘরের দরজায় বাবাকে দেখিতে পাইয়া বিনু পিছন ফিরিয়া বলিল—"বাবা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিয়া গেল তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। লোক দুইটা সশব্দে দরজার গোড়ায় হাসিয়া উঠিল। তাহার বাবা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া আসিয়া সজোরে ঠাস করিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় মারিলেন। বিনু সে আঘাত সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার বাবার রাগ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। তাহার হাত হইতে ছবির বইটা টানিয়া লইয়া সবলে তাহা ছিঁড়িয়া তিনি দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বড় বাড় বেড়েছে তোমার না? স্কুলের পর কোথায় ছিলি এতক্ষণ রাস্কেল?"

দরজা হইতে কুৎসিত লোকটাই বুঝি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "খুব মারুন মশাই, চোরের ছেলের অত সাধু হওয়া ত ভাল নয়।"

বাবা এবার তাহাকে ছাড়িয়া লোক দুইটার সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিনু যেমন বসিয়া পড়িয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। বাবা বা মার হাতে ইহার আগে কখনও সে মার খায় নাই। কিন্তু তবু সে কাঁদিল না।

দেবুর শেষ উপহারের বই বাবা ছিঁড়িয়া দিয়াছেন, অকারণে অন্যায় ভাবে সে আজ বাবার কাছে প্রহৃত হইয়াছে, তবু তাহার চোখে অশ্রু নাই।

একদিনে সমস্ত পৃথিবী এই শিশুটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পালিত বিল্‌ডিংস

—শ্রীসীতা দেবী

আভার নামটা নিতান্ত কপালগুণে পাওয়া। প্রৌঢ় দীননাথ ঘোষালের ঘরে কন্যা এক এক করিয়া সাতটি যখন আসিয়া জুটিল, তখন মেয়ের নাম সম্বন্ধে উৎসাহ মা বাবা কাহারও কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। ছেলে একটা, তাও রুগ্ন, দুর্ব্বল, রোগ তাহার নিত্য লাগিয়া আছে। বাড়ীর সকলে তাহাকে লইয়া ব্যস্ত, মা আর চারটি বড় বোন তাহার সেবাতেই নিরন্তর নিযুক্ত। বড় মেয়ে দুইটির যদিও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবু বাপের বাড়ীই তাহারা বৎসরের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দেয়। দীননাথের টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা নাই, ভাল দেখিয়া বিবাহ দিতে পারেন নাই।

চারটি মেয়ে প্রথমে, তাহার পর কুলপাবন পুত্র, পরে তিনটি মেয়ে। আভার জন্ম-মুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ অবধি সকলের আশা ছিল যে এবারে ছেলেই হইবে, পিসীমা শাঁখ হাতে করিয়া বড় হাসি মুখে আঁতুড় ঘরের দরজায় বসিয়া ছিলেন। শিশুর কান্না শুনিয়া, গলা বাড়াইয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল গো ?"

ধাত্রী বলিল, "আর কি হবে মা ? তোমাদের বাড়ীর রাস্তা এরা বড় বেশী চিনে নিয়েছে।"

পিসীমা কথাটি না বলিয়া, শাঁখটা আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন।

মেয়ের মা চোখ মুছিতেছে দেখিয়া ধাত্রী বলিল, "আর কেঁদে কি হবে মা ? যা অদৃষ্টে আছে তাই ত হবে ? মেয়েটি কিন্তু চমৎকার হয়েছে মা, ঠিক যেন পদ্ম ফুল। তোমার আর মেয়েগুলোর মত না।"

মেয়ের মা বিরাজমোহিনী বলিলেন, "সুন্দর হয়েই আর লাভ কি বাছা ? মেয়ে মানে গলার ফাঁসী।"

যাহা হউক, পিসীমা ক্ষেন্তি এবং বাপ আন্নাতারা নাম রাখিতে চাহিলেও, খুকীর নাম শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল আভাময়ী। তাহার বড় দিদি বিনোদিনী বলিল, "আমাদের কালোর গুষ্টিতে এই এক ফরসা মেয়ে, এর নাম কি যা-তা একটা দেওয়া চলে ? ওর নাম থাক আভা।"

মেজদিদি প্রমোদিনী বলিল, "সত্যি, এমন রং যে কোথা থেকে পেল জানি না। যেমন বাবা, মাও তার চেয়ে কিছু কমে যান না। এ বোধ হয় ঠাকুরমার মত হল, তিনি শুনেছি টক্‌টকে ফরসা ছিলেন।"

যাহার মতই হোক, আভা সত্যই এ পরিবারে মেঘাবৃতা সৌদামিনীর মত শোভা পাইতে লাগিল। বাস তাহাদের একেবারে পাড়াগাঁয়ে নয়, সুদূর মফঃস্বলের ক্ষুদ্র এক সহরে। সুতরাং দরিদ্র পরিবারের দিন কষ্টেই কাটিত। গ্রামে থাকিলে দুই চারটা সুবিধা আলো বাতাসের সঙ্গে এমনিই পাওয়া যায়, সহরে তাও দুর্লভ। এখানে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হয়, তরি-তরকারী, শাক, পল্‌তাটুকুও কিনিয়া খাইতে হয়। মেয়েদের পরদার বাড়াবাড়ি না থাক, ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়ান চলে না। আদর অনাদর ঘরে যাহাই জুটুক, তাহারই আওতায় চব্বিশটা ঘণ্টা কাটাইতে হয়, পলাইয়া মাঠে ঘাটে আশ্রয় লইবার উপায় থাকে না।

আভার দিদি বিনোদিনীই তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিল। স্বামীর ঘর করিবার ভাগ্য তাহার ঘটে নাই, দীননাথের সঙ্গে দেনা পাওনার কি গোলমাল ঘটাতে বিনোদিনীর গোঁয়ার স্বামী তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া, আর একবার বিবাহ করে। আত্মীয় স্বজনের গোঁটা খাইবার জন্য বিনি আবার বাপের বাড়ীতেই ফিরিয়া আসে।

কাজের অভাব বাড়ীতে কিছু ছিল না, কারণ মানুষ অনেক, ঝি চাকরের বালাই নাই। কিন্তু মনটা আশ্রয় পায়, এমন কিছুর সন্ধান বিনি বৃথাই করিতে লাগিল এ বাড়ীতে। এমন সময় আভার জন্ম হইল।

যে ক'দিন বাধ্য হইয়া মা আঁতুড় ঘরে ছিলেন, সেই ক'দিনই আভা মায়ের কোল পাইল। তাহার পর মাটিতে ছেঁড়া কাঁথা পাতিয়া মেয়েকে শোয়াইয়া দিয়া, মা আবার সংসারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিলেন, আভার দিকে দৃষ্টি বা মন দিবার তাঁহার আর সময় রহিল না। দিদি আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর নিজের সন্তান হয় নাই, সুতরাং তাহার স্নেহ যতখানি অভিজ্ঞতা তাহার শত ভাগের একভাগও ছিল না।

আভার চুল আঁচড়ান, কাজল পরানতে কখনও ত্রুটি হইত না, তবে খাওয়া হয়ত এক আধবার বাদ পড়িয়া যাইত। বিনোদিনী নিজে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিত, ক্ষুদ্র আভাকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া ফিরিত, অবশেষে মা এক একদিন শিশুর অবস্থা দেখিয়া বড় মেয়েকে তাড়া দিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেন। সাত কন্যার শেষ কন্যা, আদর বা আভরণের বাহুল্য আভার হইবার কথা নয়, কিন্তু বিনোদিনীর আগ্রহাতিশয্যে সে ত্রুটীও অনেক খানি সংশোধন হইয়া গিয়াছিল। বিনোদিনী স্বামী থাকিতেও বিধবা, সাজসজ্জার চেষ্টা করিতে ভয় পাইত। তাই নিজের বিবাহের পারসী শাড়ী এবং চেলি কাটিয়া ছোট বোনের জামা করাইয়া আনিল, নিজের অনন্তজোড়া ভাঙিয়া খুকীর মালা এবং হার গড়াইয়া দিল। মা মুখে গালাগালি দিলেন, আড়ালে চোখ মুছিলেন। পিসীমা বলিলেন, "আ মর্ আবাগী, অনন্তজোড়া খোয়ালি কেন? ঐ সোণার টুকরো দুটো ত সম্বল। বাপ চোখ বুজ্‌লে যাবে কোন চুলোয়? তখন আহ্লাদী বোন দিতে আস্‌বে? লক্ষ্মীছাড়ীর ঢং দেখনা, বোনকে বিবি সাজান হচ্ছে। বিবি সাজ্‌বার কপাল নিয়ে কেউ এসেছিল?"

আভা সাজগোজ করিয়া বড় আনন্দে ঘুরঘুর করিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। পিসীমার প্রচণ্ড গর্জ্জনে সন্ত্রস্ত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে দেখিয়া, বিনোদিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তাহার নিজের অপরিতৃপ্ত নারী-জীবনের যত কামনা বাসনা, এই ক্ষুদ্র বালিকার ভিতর দিয়া তৃপ্ত হইবার কি যে অসম্ভব চেষ্টা করিতেছে, তাহা বাড়ীর কেহ ত বুঝিতই না, সে নিজেও বুঝিত কিনা সন্দেহ।

আভার কাপড়-জামা নিজে সেলাই করিতে পারিবে বলিয়া সে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাছে সেলাই শিখিতে লাগিয়া গেল। বাড়ীর কাজে একটু অবহেলা হইত, তাহার জন্য তাড়া খাইত, কিন্তু সেটা গায়ে মাখিত না। আভাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, পাছে তাহার অসাক্ষাতে পিসীমা বা ভাই তাহার উপর ঝাল ঝাড়িবার চেষ্টা করেন।

বিনোদিনীর অধ্যবসায় দেখিয়া শিক্ষয়িত্রী একদিন বলিলেন, "শুধু সেলাই শিখে কি হবে? পড়াশুনার চেষ্টা একটু করুন না? আপনার সেটাই ত বেশী দরকার? আমাদের বিবাহিতা মেয়েদের জন্যে বারোটা থেকে তিনটে অবধি আলাদা ক্লাস করবার কথা হচ্ছে। আপনার মত ছাত্রী গোটা তিন চার পেলেই আরম্ভ করা যায়।"

বিনোদিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার আর ও সব হবে না, এজন্মের মত যা হবার হয়ে গেছে। খুকীকে আপনাদের ইস্কুলে নেন ত' সত্যি বড় ভাল হয়। মাইনে দেবার ক্ষমতা আমার নেই, মাও দেবেনা। কিন্তু মেয়ে বড় বুদ্ধিমতী, আপনাদের নাম রাখবে।"

শিক্ষয়িত্রী হাসিয়া বলিলেন, "পড়াশুনা কি আর শুধু বিয়ের জন্যে দরকার? বরং যাদের বিয়ে হয়েও হয়নি তাদেরই ওটা বেশী দরকার। নিজের পায়ে দাঁড়াতে আপনার ইচ্ছে করেনা?"

বিনোদিনী হাসিয়াই কথাটা উড়াইয়া দিল, "এই বুড়ো বয়সে নতুন করে অ, আ, শিখতে বস্‌ব? আপনি পাগলা হয়েছেন?"

আভার স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া হইল না, তবে নানা ভাবে বাংলা লেখা এবং পড়া খানিকটা তাহার আয়ত্ত হইয়া গেল। বাড়ীর একমাত্র ছেলে কৃপাময়, স্কুলেও পড়ে, বাড়ীতেও একজন মাষ্টার আসে, অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটী নাই। আভা বসিয়া বসিয়া দেখে, দেখিয়াই শেখে। উল্টা দিকে বসিয়া দেখে বলিয়া প্রথমে বই উল্টা করিয়া ধরিয়া পড়ে, পরে আবার শুধ্‌রাইয়া যায়। ছেঁড়া খাতা, ভাঙা শ্লেট বিনোদিনী সংগ্রহ করিয়া দেয়, কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহাকে ক, খ, লিখিতে শিখায়। একদিন দেখাইয়া দেয় ত দুইদিন চড় মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। তবু আভা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই গেল।

পিসীমা আভাকে মোটে দেখিতে পারেন না। যে আসে সেই বলে, "ওমা, তোমাদের বাড়ী এমন মেয়ে কোথা থেকে এল গো? চুরি করে এনেছ নাকি?" কেহ বা রসিকতা করিয়া বলে, "ঠিক যেন চেড়ী-পরিবৃতা সীতা।" পিসীমার একেবারে গা জ্বলিয়া যায়। নিজে বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে কালো বলিয়া নিন্দাটা তিনিই বেশী গায়ে পড়িয়া নেন। বিনোদিনী আভার চুল বাঁধিতেছে বা ভাল কাপড় পরাইয়া সাজাইতেছে দেখিলেই যেন রসনার ঝালে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দিতে চান্। "শেখাও শেখাও, ঐ সবই শেখাও। নিজের পোড়া কপাল দেখেও শেখেনি মেয়ে। ভদ্দর লোকের

মেয়ের এমন চাল-চলন ? সারাক্ষণ পটের বিবি সেজে বসে আছে, কেন গা ? মেয়ে কি থিয়েটার করবে নাকি ? হাতে কখনও হাঁড়ির কালির দাগ লাগল না, এ মেয়েকে যে ঘরে নেবে সে এক দোর দিয়ে ঢোকাবে আর এক দোর দিয়ে ঝাঁটা মেরে বার করে দেবে।"

বিনোদিনীর আরও যেন জেদ চড়িয়া যায়। আভাকে সে রান্নাঘরের ধারে কাছে যাইতে দেয় না, গায়ে পড়িয়া বাড়ীর সব কাজ আগে ভাগে সারিয়া রাখে। আভার চুল বাঁধা একবারের জায়গায় দুইবার হয়, কোথা হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া আনা পাউডার স্নো ঘষিয়া তাহার উজ্জ্বল রূপকে দিদি আরো উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। আভা মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া বলে, "থাক ভাই দিদি কাজ নেই।"

বিনোদিনী কঠিন হইয়া বলে, "কেন, থাকতে যাবে কিসের জন্যে ? যে ক'দিন আমার হাতে আছিস্ একটু সুখ করে নে, তারপর কি হাল যে হবে তা ভগবানই জানেন। ছোট বেলা একখানা ভাল কাপড় পরতে চাইলে পিসিমা রাক্কুসী খেতে আস্‌ত, বল্‌ত আইবুড়ো মেয়েকে আবার অত কাপড় জামা কিনে দেওয়া কেন ? বিয়ের বেলা সেই ত এক কাঁড়ি বের করে দিতেই হবে। তা দেখনা বিয়ের পর কেমন মহারাণী সেজে আছি ? তোরই যে কপালে কি আছে তা কে জানে ? এক বাপ মায়েরই সন্তান ত ? বড় মেয়ে আমি, আমারই কেমন দেখে শুনে বিয়ে দিল দেখনা।"

দিদির ক্ষেদোক্তি শুনিয়া আভা চুপ হইয়া যাইত। সাজগোজ করিতে না পাওয়ায় দিদির দুঃখটা সে এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। উপভোগের জিনিষের মূল্য বাড়িয়াই চলে, যতদিন না তাহাকে উপভোগ করা যায়। আভা বালিকা মাত্র, কিন্তু তাহারও মনে বিনোদিনীর ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। পার্থিব সুখের পরমতম বলিয়াই সে ক্রমে ভোগসুখকে চিনিতে শিখিতেছিল।

আভার বয়স বাড়িয়াই চলিতেছিল, কিন্তু তাহার উপরের দুই দিদির বিবাহ বাকি, সুতরাং তাহার বিবাহের কথা কেহ এখনও ভাবিবার অবকাশও পায় নাই। বছর তিন চার হইতে তাহার বয়স দশের কোঠায় আসিয়া স্থির হইয়া আছে, আর বাড়ে না। পাড়ার লোকে হাসাহাসি করে, তবে তাহার বেশী আর কেহ কিছু বলেনা।

এমন সময় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাইজ উপলক্ষে হঠাৎ আভার ডাক পড়িল শকুন্তলা সাজিবার জন্য। আর কেহ বলিবার আগেই পিসীমা মারমুখো হইয়া ধাইয়া আসিলেন, "আ গেল যা, শকুন্তলা সাজবেন! মা, মা, মা, কালে কালে কতই দেখব! এরপর ঘাঘ্‌রা পরে নাচ্‌তে চাইবে মেয়ে। মানে মানে হাড় ক'খানা জুড়ুলে বাঁচি, আর কি যে এ পাপ কর্ণে শুন্‌তে হবে তাও জানিনা।"

বিনোদিনী কলহে সুপটু, সেও কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িল, "কেন, ইস্কুলের সব মেয়েরা ত গাইবে বাজাবে, কত কি সাজবে। তারা কি ভদ্দরঘরের মেয়ে না ? শুধু হাঁড়ি হাতে করে উনুন-কাঁধায় বসে না থাকলেই, তোমাদের জাত যেতে বসে। তেমনি ভগবান অদৃষ্টে মেপেও দিয়েছেন।"

পিসীমাও আজন্ম বাপের বাড়ী বাসিনী। স্বামীর ঘরে ঠাঁই তাঁহারও হয় নাই। ভাইঝির কথার ইঙ্গিতে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। পিসী ভাইঝিতে হাতাহাতি হইবার জোগাড় দেখিয়া, বিরাজমোহিনী মাঝে পড়িয়া থামাইয়া দিলেন। পিসীমা গর্জ্জন করিতে করিতে রান্না-ঘরে ফিরিয়া গেলেন, বিনোদিনী দুমদুম্ করিয়া শুইবার ঘরে ঢুকিয়া, বাক্স খুলিয়া আভার বাহিরে যাইবার জামা-কাপড় বাহির করিতে বসিল।

মা বলিলেন, "কাজ কি বাছা ? ও ত ইস্কুলের মেয়ে না, ওকে কেন টানাটানি ? আবার এই নিয়ে পাঁচ কথা উঠ্‌বে।"

বিনোদিনী বলিল, "আহা, ওদের সুনজরে থাকলে কত কাজ হয় তা তোমরা বোঝনা। ঐ যে সেলাই শেখাচ্ছে, গানের কেলাসে যেতে দিচ্ছে, তাতে লাভ নেই কিছু ? বিয়ের সম্বন্ধ ত করতে হবে মেয়ের না, না ? দেখতে এসে যখন জিগ্‌গেস করবে মেয়ে পড়তে জানে, গান জানে, সেলাই জানে ? তখন কি বল্‌বে, না, মেয়েকে আমরা শুধু ঘটি মাজতে শিখিয়েছি ? হবেও তেমনি বিয়ে। দেখেও তোমাদের আক্কেল হয় না।"

মেয়ের যুক্তি অকাট্য, কাজেই মা চুপ করিয়া গেলেন। আভা স্নান করিয়া, খাইয়া-দাইয়া, সাজ সজ্জা সমাপ্ত করিল, তাহার পর দিদির সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ে চলিল শকুন্তলার রিহার্সাল দিতে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাহাদের দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যাক্ ভাগ্যে আভাকে পাওয়া গেল। আমরাও ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম যে কাকে শকুন্তলা সাজাব। নিতান্ত কেলেভূত ধরে ত বসিয়ে দেওয়া যায়না, লোকে হাসবে।"

নিজের রূপের প্রশংসা শুনিয়া আভার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী বলিল, "ছাত্রীর কাজে যখন লাগাচ্ছেন, তখন ছাত্রীই করে নিন্ না? আমার ভারি সখ, আভা গাইতে শেখে, রেশমের কাজ, পড়া লেখা সব শেখে। আমরা সব ক'টা বোনই জানোয়ার হয়ে রইলাম। একখানা নাটক নভেল পড়বারও যোগ্যতা কারো নেই।"

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, কমিটিতে কথাটা পেড়ে দেখ্‌ব। ফ্রি দু একটা সীট্ করবার কথা একদিন হয়েছিল বটে।"

শকুন্তলাকে এত চমৎকার মানাইল যে একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বেণারসী শাড়ী এবং ঝুঁটা রত্নালঙ্কারে শোভিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দর্শকদের ভিতর একজন একটা রৌপ্যপদকই দিয়া বসিল। বিনোদিনী যখন বোনকে লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন আভা সত্যই সাম্রাজ্ঞীর পদে বৃতা হইয়াছে।

যাহা হউক, শকুন্তলা সাজিয়া রৌপ্যপদক ছাড়াও আভার একটা লাভ হইল, সে স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রী রূপে প্রবেশ লাভ করিল। তবে সব ক্লাসে নয়। পড়ার চাপে আদরিণী ভগিনীর কৈশোর-শ্রী বিলুপ্ত হইয়া যাক, এ ইচ্ছা বিনোদিনীর ছিল না। তাহার নির্দ্দেশ মত আভা খালি সেলাই, গান ও বাঙ্গলা পড়ার ক্লাসে যাইত। বালিকা বিদ্যালয় তাহাদের বাড়ীর অতি নিকটেই, খানিক পরে বিনোদিনী গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিত। বিনোদিনীর উপর কাহারও কথা কহিবার জো নাই, অন্ততঃ আভা সম্বন্ধে। মাও ভরসা করিয়া তাহার কাজের প্রতিবাদ করিতেন না। পিসীমা বৃদ্ধা হইয়া ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহার রাজদণ্ড খসিয়া গিয়া বিনোদিনীর হাতেই পড়িয়াছিল।

বাংলা পড়িতে ভাল করিয়া শিখিয়া, আভা বিনোদিনীর একটা বহুদিনের অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করিতে পারিল। নভেল পড়িতে না পারার দুঃখ বিনোদিনীর চিরকালই ছিল। পাড়ার সব বউঝিরাই পড়িতে জানে। আজকাল কত রকম রকম বই বাহির হইতেছে, এমন ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সুন্দর বাঁধান, দেখিলেই দুই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর কি রসাল করিয়া লেখা! বন্ধুরা কখনও মাধ্যাহ্নিক নিরালা অবকাশে বিনোদিনীকে দুই চার পাতা পড়িয়াও শুনাইয়াছে। শুনিতে শুনিতে বিনোদিনীর দেহের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত, কান দুটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকিত, মনে হইত এই হীন দরিদ্র, কঠিন সংসার ছাড়িয়া সে নন্দনকাননে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সেখানে যাহা কিছুর জন্য তাহার হৃদয় বুভুক্ষু, সকলই অজস্র ধারে তাহার হস্তে ঝরিয়া পড়িতেছে। সংগ্রাম নাই, সংঘাত নাই, কোনো বাধা নাই। এ যেন "সব পেয়েছির দেশ"।

কিন্তু ইন্দ্রলোক হইতে কঠিন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেও বিলম্ব হইত না। পাঠকারিণী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িত। সংসারের প্রহরী সদাজাগ্রত, তাহার ডাক আসিয়াছে। বিনোদিনী প্রখর দিবালোকে, দুই চোখে স্বপ্নের মোহ ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত।

আভা এইবার দিদিকে অজস্র খোরাক জুটাইতে লাগিল। বই চাহিয়া আনিত বিনোদিনী, তাহার পর দুপুর বেলা ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া দুই বোনে পড়া চলিত। আর কাহারও সেখানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। মা একদিন জোর করিয়া শুনিতে ঢুকিয়া খানিকবাদে বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "কি রকম লেখা বাছা? একে কি গপ্‌প বলে? কই ছেলে বয়সে বঙ্কিমের বই শুনেছি আমরা, সে ত এমন নয়?"

বিনোদিনী মায়ের সেকেলে পছন্দকে নাক সিঁটকাইয়া আবার দরজা ভেজাইয়া দিল।

বছরের পর বছর কাটিয়া চলিল। আভা যৌবনে পদার্পণ করিল। আর তাহাকে দশ বছরের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায় না, তাহার বিবাহও আর না দিলে নয়। কিন্তু তাহার আগের বোনটির বিবাহ দেওয়া যে আরো প্রয়োজন? একটি কোন মতে পার হইয়াছে।

কিন্তু সুন্দরী আভার হঠাৎ বর জুটিয়া গেল। বরের বয়স ঢের, কিন্তু টাকাও ঢের। মা একটু খুঁৎ খুঁৎ করিলেন, বিনোদিনী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ কচি বয়েস নিয়ে ধুয়ে খাবে, যেমন আমার বেলা খেয়েছিলে। এর হাতে দিলে মেয়ে রাজরাণীর হালে থাকবে সেদিকে খেয়াল নেই। মাটিতে পা দিতে হবে না।"

মা বলিলেন, "তা না হয় হল, কিন্তু উনি বলছেন উর্মির বিয়ে না হলে কি করে আভির বিয়ে হবে?"

বিনোদিনী বলিল, "ঘটে বুদ্ধি কিছু যদি আছে। এ বর তোমার উর্মির বিয়ের আশায় বসে থাকবে নাকি? কলকাতায় গিয়ে চুপিচাপি বিয়ে দিয়ে আসা যাক চল। তারপর বল্লেই হবে, ভাল করে পড়াবার জন্যে আভাকে কলকাতার বোর্ডিংএ রেখে এসেছি।"

তাহাই হইল। কলিকাতায় গিয়া, শুভ লগ্নে আভার বিবাহ হইয়া গেল প্রৌঢ় আনন্দ রায়ের সঙ্গে। বিবাহের ধুম কিছু হইল না, কিন্তু আভার নবনীতকোমল অঙ্গে হীরা জহরতের বোঝা দেখিয়া বিনোদিনীর দুই চক্ষু সার্থক হইয়া গেল। কনে-বিদায়ের সময়, বোনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া

বলিল, "তোকে নিজের মেয়ের বাড়া করে মানুষ করেছি ভাই, এতদিনে সব কষ্ট সার্থক হল। আমি যত দুঃখ পেয়েছি, তত সুখ যেন তোর হয়।"

আভা ঝল্‌মলে কিংখাবের জামা, জংলা শাড়ী ও হীরার গহনা পরিয়া স্বামীর ঘর করিতে চলিল। শ্বশুর শাশুড়ীর হাঙ্গাম তাহাকে পোহাইতে হইল না, তাহার স্বামী ফিরিঙ্গী পাড়ার নব-নির্ম্মিত সৌধ পালিত বিল্‌ডিংসএ ফ্ল্যাট্ ভাড়া করিয়া, তরুণী রূপসী ভার্য্যা লইয়া মধুচন্দ্র যাপন করিতে চলিল।

আনন্দ রায়ের চেহারা ভাল নয়, এবং তাহার যৌবন কাটিয়া গিয়াছে। না হইলে আর সকল দিকে, আভার দিদি এবং আভার মতে সে আদর্শ পুরুষ। ইহারই জন্য যেন বিনোদিনী জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছিল, নিজের জন্য নয়, কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য। আজ তাহার হাতে নবনীত-কোমলা, অপরিণত-বুদ্ধি, সুন্দরী ছোট বোনটিকে তুলিয়া দিয়া বিনোদিনী নিজের সকল শ্রম সার্থক মনে করিল।

পালিত বিল্‌ডিংস অভ্রভেদী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে তিনটা রাস্তার মোড়ে। তাহার দেহ হইতে এখনও চুন সুরকি, দরজা জান্‌লার রংএর গন্ধ যায় নাই। বিরাট অট্টালিকা, অসংখ্য ফ্ল্যাটে বিভক্ত—এক এক করিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। ইহার রূপ দেখিয়াই মানুষ ছুটিয়া আসে। ভাড়া দশ পোনেরো টাকা বেশী দিতে হইলে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে ধরে না। বর্ত্তমান জগতের আদর্শে নির্ম্মিত বাড়ী, ইহার আষ্টেপৃষ্ঠে কন্‌ক্রিটের জালি, কন্‌ক্রিটের ফুল লতা পাতা। ইহাতে বৈদ্যুতিক বাতি, টিউব্ ওয়েল, টেলিফোন, গ্যাসের বৈদ্যুতিক পাম্প, এমন কি লিফ্‌ট্ পর্য্যন্ত আছে। দেখিলে মনে হয়, বিরাট একটা অফিস, আদালত বা হোটেলের বাড়ী, ইহার খোপে খোপে যে মানব দম্পতি বাসা বাঁধিয়া আছে তাহা ভাবিতে ভরসা হয় না।

যাহারা ঘর ভাড়া করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সাহেব, ফিরিঙ্গী, আর্ম্মেনীয়ান এবং মুসলমান। বাঙালী বা অন্য জাতীয় হিন্দু বিশেষ কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ সামনের বারান্দায় ময়লা ভিজা শাড়ী ঝোলে না এবং জান্‌লার উপর অসংখ্য চিহ্নে চিত্রিত তোষক বালিশ শুখাইতে দেখা যায় না। উলঙ্গ ও অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশুর পাল যদৃচ্ছ বিচরণ করে না, সিঁড়িটা মোটের উপর পরিষ্কার থাকে এবং সদর দরজার সামনে ছেঁড়া কাগজ, ঘুঁটের ছাই, তরকারীর খোসার রাশি শোভা পায় না।

এখানে যাহারা বাস করে, তাহারা ঘরদ্বার সুন্দর করিয়া সাজায়, নিজেরা সুন্দর করিয়া সাজিয়া থাকে এবং পাড়াটা যাহাতে সুন্দর এবং পরিষ্কার থাকে তাহার জন্যও চেষ্টিত হয়। দেখিতে দেখিতে পালিত বিল্‌ডিংস-এর সামনের তিন কোণা জমির টুকরা দুইটা সুন্দর পার্ক হইয়া উঠিল। ঠেলা গাড়ীতে চড়িয়া ফুটফুটে শিশুর দল এখানে আয়াদের সঙ্গে হাওয়া খাইতে আসে। ফুলের গাছও বাগান হইয়া গেল, যদিও ফুল তখনি তখনি ফুটিল না। পাড়াটার আর চারিদিকেই কাঁচা ফুটপাথ এবং অসমতল রাস্তা থাকিয়া গেল, কেবল পালিত বিল্‌ডিংস-এর চটকে মুগ্ধ হইয়া মুানিসিপ্যালিটি রাতারাতি, ইহার সামনের ফুটপাথ বাঁধাইয়া দিল এবং রাস্তায়ও পিচ ঢালিয়া রোলার চালাইয়া মোটরকারের সুব্যবহার্য্য করিয়া দিল।

আভা ত প্রথম দিন এ হেন কুবেরপুরীতে পদার্পণ করিয়াই ভড়কাইয়া গেল। মানুষের বাড়ী, অন্ততঃ নিত্যকার বাস করিবার, খাইবার, ঘুমাইবার বাড়ী যে এ রকম হয়, তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। উপন্যাসে এক একটা সৌধের বর্ণনা পড়িয়াছে বটে, যেখানে নায়ক গোপনে নায়িকাকে লইয়া আসে, ক্ষণিক স্বর্গসুখ উপভোগ করিবার জন্য, কিন্তু সে কি কল্পলোক ছাড়া আর কোথাও সত্যই আছে? দরিদ্রের ঘরে পালিতা আভা এ যেন চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ীতেই বরাবর থাকতে হবে নাকি?"

আনন্দ বলিল, "তা না ত কি আর এক দিনের জন্যে এত খরচ করে বাড়ী নিলাম? কেন, তোমার ঘর পছন্দ হচ্ছে না?"

আভা বলিল, "পছন্দ হবে না কেন? এত চমৎকার যে দুই চোখ ঝলসে যাচ্ছে। এর উপর পা দিয়ে হাঁটতেই ভয় করছে। সব যেন থিয়েটারের মত সাজান।"

আনন্দ রায় ধনের গর্ব্বে, সুখের হাসি হাসিয়া বলিল, "ও ক্রমে সয়ে যাবে। কখনও কলকাতায় এ সব দিকে ত আস নি তাই সব নূতন লাগ্‌ছে। বেশ দুজনে নিরালায় আরামে থাকব বলে টাকা খরচ করে এই ফ্ল্যাটটা নিলাম, না হলে গোয়াবাগানে আমাদের পৈত্রিক বাড়ী ত পড়েই রয়েছে।"

যেমন ঝকঝকে নূতন ফ্ল্যাট্, তেমনি তাহা সাজাইবার জন্যও নূতন আসবাব, গালিচা, গৃহসজ্জার আমদানি হইল। আভা এক একটা জিনিষ হাতে ধরে, আর তাহার সুখ-বিহ্বল মুখ দেখিয়া মনে হয় অমরাবতীর একটা টুক্‌রা তাহার হাতে খসিয়া পড়িয়াছে। সুন্দরী পত্নীর আনন্দ দেখিয়া প্রৌঢ় স্বামী নিজের সকল ঐশ্বর্য্যকে আজ যেন প্রথম সম্পূর্ণ করিয়া উপভোগ করে।

কিন্তু আনন্দ রায়ের অবসর বেশী দিনের নয়। অনেক কষ্টে সে বিবাহ এবং মধুচন্দ্রের জন্য মাস খানেক ছুটি জোগাড় করিয়াছিল। কিন্তু প্রণয়-লীলার ফাঁকে ফাঁকে অবজ্ঞাতা বাণিজ্যলক্ষ্মীর ডাক তাহার কানে আসিয়া খোঁচাইতেছিল। কাজে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন আসিল,

তখন মনের একটা দিক যেন তাহার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যদিও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রেমের খেলার রঙীন নেশার জন্য বাকি অর্দ্ধেক মন উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল।

আভাকে একেবারে সারাটা দিন একলা রাখিয়া যাওয়া যায় না। পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকর আছে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক একজন প্রয়োজন। আভার বয়স কম, রূপ আছে এবং ইহা বাঙালী পাড়া নয়। আশে পাশে বাস যাহাদের, আনন্দ রায় তাহাদের বিশ্বাস করিতে পারে না। ইহাদের কেহ কাহাকেও চেনেনা, কেহ এক মাস থাকে, কেহ দুই মাস, সকলেই যেন পথিক, কাহারও ইহা চিরদিনের ঘর সংসার নয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নামিতে নিত্য নূতন মুখ দেখা যায়, কে বাহিরের মানুষ, কে এই অট্টালিকাতেই বাস করে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

আত্মীয়া এমন কেহ ছিলনা যে ঘর-সংসার ফেলিয়া নববধূর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আসিতে পারে। সুতরাং প্রৌঢ়া গোছের একটি ঝি রাখিয়াই আনন্দ রায় নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজে যাইবার আগে আভাকে বিধিমত উপদেশ দিয়া গেল, যাহাকে তাহাকে দরজা যেন না খুলিয়া দেয়, বারান্দায় গিয়া হাঁ করিয়া যেন দাঁড়াইয়া না থাকে। এমন কি ঝিকেও যেন অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া দরজা খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিবানিদ্রা না দেয়।

আভা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সব ত বুঝলাম, কিন্তু এতখানি সময় আমার একলা কাটবে কি করে?"

স্বামী বলিল, "কি আর করা যাবে বল? সব দিকে সুবিধা কি হয়? সাবেক বাড়ীতে তোমার একেবারে ভাল লাগত না, সে দশ জনের সংসার, দুজনে দুজনকে রাত বারোটার আগে দেখতেই পেতাম না। এখানে তবু এই একটা অসুবিধে। দু' একঘর হিন্দু বাঙালী থাকলে আর ভাবনা ছিল না।"

আভার সময় কাটান সত্যই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। নাটক নভেল এক গাদা স্বামী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু একলা একলা বেশীক্ষণ পড়িতেও আভার ভাল লাগেনা। দিদি থাকিলেও না হয় হইত। বিনোদিনীর সাহিত্যিক রসগ্রহণের ক্ষমতা আভার অপেক্ষা অনেকাংশে বেশী ছিল, তাহাকে শুনাইরাই আভার তৃপ্তি ছিল। দিদিই দুই জনের হইয়া উপভোগ করিত। কাজকর্ম্ম করিবার ঝি চাকর আছে। কিছু প্রয়োজন নাই তবু আভা এটা ঝাড়ে ওটা মোছে। আর যখন কিছু ভাল লাগেনা, তখন কাপড়ের আলমারী, গহনার বাক্স খুলিয়া বসে। দেখিয়া দেখিয়া তাহার সাধ আর মেটে না। একি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য! আঃ, বুড়ী বুড়ীকে যদি একবার দেখান যাইত।

কিন্তু জামা-কাপড় দেখিয়া, গহনার বাক্স উল্টাইয়া কতটা সময়ই আর কাটে? ঝিটাও তেমনি, দুপুর হইলেই স্বয়ং কুম্ভকর্ণ যেন তাহার উপর ভর করে। নাক ডাকানির চোটে তাহার ধারে কাছে টিঁকিবার উপায় থাকে না। একটু যে গল্প করিবে সে জো নাই। ভাল মানুষকেই স্বামী তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখিয়া গিয়াছে।

আভা আর ঘরে বন্দী হইয়া থাকিতে পারে না। বারান্দায় বাহির হয়, এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়ায়, এমন কি স্নানের ঘরের পিছন দিক দিয়া যে ঘোরান লোহার সিঁড়ি, তাহার উপরেও গিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। এখান হইতে পালিত বিল্‌ডিংস-এর ভিতর দিকটা সব দেখা যায়। মস্ত বড় বাঁধান চাতাল। বেশীর ভাগ, আয়া, খানসামা ও মোটরকারের চালক এখানে সভা করে। আভাকে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলে খানিক হাঁ করিয়া তাকায়, তাহার পর আবার আপন আপন গল্পে মাতিয়া ওঠে।

আভার ইহাদের দেখিয়া দেখিয়াও অরুচি ধরিয়া গেল। স্বামীকে বলিল, "দুচারটে মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দাও। এ রকম মুখ বুজে মানুষ থাকতে পারে? আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমরা ত পারি না।"

আনন্দ রায় বলিল, "তা বটে। যা কাজের চাপ, চোখে কানে দেখবার আর অবসর পাচ্ছিনা। মাঝে যাইনি এক মাস, সব যেন ছত্রাকার হয়ে আছে। আচ্ছা, কাপড়-চোপড় পরে নাও, চল তোমায় বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।"

আভা সাজিয়া গুজিয়া আমেরিকান ফিল্ম দেখিয়া আসিল। বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও জগতে আছে নাকি? পালিত বিল্‌ডিংসও তাহার চোখে ম্লান দীন হীন বোধ হইতে লাগিল।

স্বামীকে বলিল, "হ্যাঁগা এত ধন ঐশ্বর্য্য মানুষের হয়?"

স্বামী বলিল, "তা আর থাকবে না কেন? আমেরিকার ঘরে ঘরেই আছে।"

আভা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা সত্যি ওদের চালচলন অমনি না ওরা ও সব গল্প বানিয়েছে?"

আনন্দ রায় বলিল, "গল্প কি আর মানুষ আকাশ থেকে টেনে আনে? চারিদিকে যা দেখে, তাই দিয়েই না গল্প বানায়?"

আভা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সমাজে ওদের নিন্দে হয় না?"

তাহার স্বামী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা ছেলে মানুষ। সমাজ ত ওরাই, নিন্দে আবার বাইরের থেকে কে করতে যাবে? আমাদের দেশের বামুন ভট্‌চায্‌রা কি ওখানে বিধান দিতে যায়?"

এ বিষয়ে আর কথা হইল না, আভা খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইতে গেল। কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। সমস্তটা রাত আমেরিকান ছবির নায়ক নায়িকারা তাহাদের চলা বলা, হাব ভাব লইয়া তাহার মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিয়া রাখিল। তাহাদের মুখ, তাহাদের প্রেমলীলা আভার রক্তে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। ভোররাত্রে ক্লান্ত হইয়া সে যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখনও স্বপ্নে ইহারা তাহাকে সঙ্গদান করিতে বিস্মৃত হইল না।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে স্বামীকে বলিল, "কি সুন্দর জিনিষ! ইচ্ছে করে সমস্ত দিনরাত বসে বসে দেখি। আজকে আবার নিয়ে যাবে ?"

আনন্দ রায়ের এতটা বাড়াবাড়ি আবার ভাল লাগে না। কিন্তু তাহার বয়স এবং আভার বয়স এক নয়। জগত তাহার কাছে পুরাতন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে, আভার চোখে এখনও তাহা নূতন। নববিবাহিতা রূপসী তরুণী পত্নী, তাহাকে 'না' বলিতেও ইচ্ছা হয় না, এখনই তাহার হাস্যবিকশিত মুখখানি ম্লান হইয়া যাইবে। রফা করিয়া বলিল, "আজ আর হবে না, ফিরতে দেরি হবে। কাল শনিবারে বিকেলে শো আছে, তখন এসে নিয়ে যাব।"

আভা চুপ করিয়া গেল। ঘরে আর তাহার মন টিঁকিতে চায় না। দুপুরে সামনের ঘরের জান্‌লাটা খুলিয়া পালিত বিল্‌ডিংস-এর প্রকাণ্ড চওড়া প্রধান সিঁড়িটার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। এ দিকের দরজা জান্‌লা খোলা তাহার একেবারেই বারণ, সিঁড়িটা প্রায় রাজপথেরই সামিল, এখান দিয়া কে আসে, কে যায়, কিছুর ঠিক ঠিকানা নাই। কিন্তু অজানা অচেনার ডাক আভার শিরায় শিরায় বাজিতেছিল, সে আজ আর গম্ভীর নিষেধ মানিতে পারিল না।

একজন সাহেব দুইটি মেম নামিয়া গেল। সাহেবটি প্রৌঢ়, সে সোজা নামিয়া চলিয়া গেল, কোনোদিকে তাকাইল না। মেমদের ভিতর একটি বৃদ্ধা আর একটি তরুণী, শেষোক্তটি আভাকে বেশ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া লইল।

তাহার পর একজন যুবক চমৎকার জমকালো পোষাক পরা, সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিল। তাহার বাজপাখীর মত তীক্ষ্ন দৃষ্টির আঘাতে, আভা চকিত হইয়া জান্‌লাটা একটুখানি ভেজাইয়া দিল। কিন্তু আবার মিনিট খানিক পরেই খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। মানুষটা এখনও অদৃশ্য হইয়া যায় নাই, খুব ধীরে ধীরে উঠিতেছে। আভা আবার জান্‌লা খুলিবে, ইহা কি সে প্রত্যাশা করিয়াছিল? না হইলে অত উপর হইতে আবার ফিরিয়া তাকাইবে কেন? কি জ্বালা, এমন অদ্ভুত মানুষ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য চেহারা, ঠিক যেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট।

আরও মিনিট কয়েক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আভার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। আবার তিন চার জন মানুষ উঠিয়া আসিতেছে। ইহারা কোন জাতীয় কে জানে? কাজ নাই আর দেখিয়া, আভা জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিল। ঝিটাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সে বার দুই চার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া পাশ ফিরিয়া, আবার নাক ডাকাইতে লাগিল।

স্বামী বাড়ী ফিরিলে বলিল, "আমি যদি ইংরেজী জান্‌তাম ত বেশ হত। বইও সব পড়তে পারতাম, মেম টেমদের সঙ্গে কথাও বল্‌তে পারতাম।"

আনন্দ রায় বলিল, "শিখলেই পারতে। নিতান্ত গৌরী-দান ত তোমায় করেনি?"

বাপের বাড়ীকে খোঁটা দেওয়ায় আভা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আহা, পাড়াগাঁয়ে ওসব সুবিধে ভারি আছে কিনা? ইংরেজী শেখাবে! বলে বাংলা যে একটু-আধটু শিখেছি সেই ঢের।"

আনন্দ রায় বলিল, "ঐ ঢের হয়েছে। আমিই বা কত ইংরেজী জানি যে তুমি শিখবে? বেশী সাহেবীয়ানা আমাদের বাঙালী ঘরের মেয়েকে মানায় না, ওতে ওদের ঘরে আর মন বস্‌তে চায়না।"

এমনিতেই যে আভার মন খুব বেশী ঘরে বসিতেছিল তাহা নয়, তবে সে কথা ত আর স্বামীকে বলা যায় না।

বিবাহিত জীবনের নূতনত্বও কাটিয়া যাইতেছিল, গহনা, কাপড়, গৃহসজ্জার মোহও একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছিল।

কাজকর্ম্ম কেন কিছু তাহার নাই? এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া মানুষের দিন কাটে কি করিয়া? বাপের বাড়ীতেও যে তাহার কাজ খুব বেশী করিতে হইত, তাহা নয়, কিন্তু সেখানে সঙ্গীর অভাব একেবারে ছিল না, স্কুলেও অনেকখানি সময় আনন্দেই কাটিত। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে, সেখানে তাহাকে কেহ সোনার কৌটায় পূরিয়া বন্দিনী করিয়া রাখে নাই। সেখানে সে স্বাধীন মানুষ ছিল, আর পাঁচ জনের মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।

বিকালে বায়োস্কোপে যাওয়া হইবে, আভা ঘণ্টা দুই আগেই সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া বসিয়া রহিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনে, আর জান্‌লা খুলিয়া উঁকি মারে। স্বামী নয়, কিন্তু যেই যায়, এই বিদ্যুৎপ্রভ মূর্ত্তির দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া যায়। আভা মাঝে মাঝে সরিয়া আসে, মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়াই থাকে। দুইজন যুবক উঠিতেছে, একজন বাঙালী, আর একজন কোন দেশীয় আভা ঠিক বুঝিল না। কিন্তু কি সুন্দর চেহারা, যেন মহাভারতের ক্ষত্রিয় বীর। তেমনি বলবান, তেমনি দৃপ্ত। বাঙালীরা দেখিতে এত কুৎসিত কেন? এই দেখনা, তাহার স্বামী।

আভার মত সুন্দরীর স্বামী হইবার তাহার কি যোগ্যতা আছে, যতই কেননা টাকা থাক্। আভার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল।

যুবক দুইজন আভাকে খুব ভাল করিয়াই দেখিয়া গেল। দুই চার সিঁড়ি ওঠে আর ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়। তাহারই বিষয় যে উহারা কথা বলিতেছে, তাহাও আভা বুঝিতে পারিল। কিন্তু জানলার ধার হইতে নড়িতে পারিল না। ঐ পাগড়ী বাঁধা, চোগা চাপ্‌কানপরা মানুষটা যেন বায়োস্কোপের নায়কদের চেয়েও সুন্দর।

আনন্দ রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীকে একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, "অমন জানলা খুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক কেন? ছত্রিশ জাতের লোক যায়!"

আভা বলিল, "তুমি আসছ কিনা দেখ্‌ছিলাম।"

তরুণী ভার্য্যার প্রীতির নিদর্শনে প্রৌঢ় স্বামী খুসী না হইয়া পারিল না। আর কিছু বলিল না, দুজনে বায়োস্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল।

পরদিন রবিবার, আভা স্বামীকে সারাদিন ঘরেই পাইল, কিন্তু তাহার মন ভরিল না। একবার কথায় কথায় বলিল, "এতগুলো ঝি চাকর নাই বা রইল, ভারি ত দুজনের কাজ?"

যাহাকে খুসী করিবার জন্য এত অর্থব্যয়, সে যদি খুসী না হয়, তাহা হইলে রাগ হইতেও পারে। আনন্দ চটিয়া বলিল, "ঝি চাকর বাদ দিয়ে বহুকাল ত কেটেছে, এখন না হয় ঝি চাকর থাকলই কিছু দিন?" আভা আর কথা বলিল না। ভিতরে ভিতরে তাহারও রাগ হইতে সুরু হইয়াছিল। আনন্দ রায়ের না হয় টাকা আছে, তাহার কি কিছুই নাই? আভার রূপ যৌবন কি সাধারণ? ক'টা বাঙালীর ঘরে এমন রূপের পসরা আছে? এই যে মানুষ একবার তাহাকে দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে পারে না, সেটা কি শুধু শুধুই? তাহাদের নিজেদেরও রূপ আছে, তাই রূপের মূল্য তাহারা বোঝে।

পরদিন আবার একলা। আভা আজ খাওয়া-দাওয়া সারিয়াই জানলার ধারে আসিয়া বসিল। সে আজ মানুষ দেখিয়াই দিন কাটাইয়া দিবে। সব সময়ই সে সাজিয়া থাকে, আজ আবার একটু বিশেষ করিয়া সাজিয়া বসিয়াছিল।

কত মানুষ উঠিল, নামিল। সবাই চাহিয়া দেখে। হঠাৎ আভার বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল। ঐ ত সেই দুইটি মানুষ উঠিতেছে। নীচে হইতেই বিদেশীয়টি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখের দৃষ্টি তাহার অমন কেন? সে কি আভাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিতে চায়?

মানুষ দুইজন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। তাহারই জানলার ধারে দাঁড়াইয়া কেন? আভা পালাইতে চাহিল কিন্তু তাহার পা যেন মাটিতে গাঁথিয়া গিয়াছে, সে নড়িতে পারে না। কি চায় ইহারা?

বাঙালীটি জিজ্ঞাসা করিল, "রামেশ্বর বাবুর এই বাড়ী?"

আভার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না, সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তবু ইহারা যায় না কেন? আর ঐ অন্য মানুষটি, সে কি দৃষ্টি দিয়া আভাকে পান করিয়া ফেলিবে?

যুবক দুইজন পরস্পরের সঙ্গে কি বলাবলি করিল, তাহার পর বাঙালীটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "রামেশ্বরবাবু কি পালিত বিলডিংস-এ থাকেন না?"

আভা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "জানি না।"

সিঁড়িতে আবার পদধ্বনি, যুবক দুইজন নীচে তাকাইয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নামিয়া চলিয়া গেল।

আনন্দ রায় সেদিন বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর অস্থিরতা এবং উত্তেজনা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি অসুখ করেছে?"

আভা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "অসুখ কেন করবে?" স্বামী স্ত্রীতে এই প্রথম একটু মন কষাকষি হইয়া গেল।

মঙ্গলবার। অন্যদিন আনন্দ যথাসম্ভব দেরী করিয়া যায়, আজ বিরক্ত হইয়া আগেই চলিয়া গিয়াছে।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। রত্নালঙ্কারভূষিতা আভা জানলার ধারে বসিয়া। তাহাকে কেহ বলে নাই, কিন্তু সে জানে, আজও সে আসিবে। তাহার চোখের বাণী আভাকে এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। অফিস যাইবার যারা চলিয়া গেল। আয়া চাকর সব মাধ্যাহ্নিক ছুটি পাইয়া একতলায় নামিয়া গেল। সিঁড়ি ক্রমে নির্জ্জন হইয়া আসিল।

ঐ সে। আজ একলা। সেও কি আভার মন চোখে দেখিতে পাইয়াছে?

যুবক আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। মুখে তাহার অদ্ভুত হাসি, চোখে সম্মোহন-দৃষ্টি। আভার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সে দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল।

দ্বার খুলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে পালিত বিল্ডিংস হইতে টেলিফোনে ডাক পাইয়া আনন্দ রায় ছুটিয়া বাড়ী আসিল।

আভা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, কোমল গ্রীবায় কঠিন নিষ্ঠুর অঙ্গুলিচিহ্ন। দেহের রত্নালঙ্কার একখানিও নাই। পাশে ঝিটা বসিয়া হাঁউ মাঁউ করিয়া চীৎকার করিতেছে। সিঁড়িতে ছত্রিশ জাতের ভীড়।

ভারতের চা-শিল্প

বাঙ্গালী ও ভারতীয় চা-শিল্প

ভারতবর্ষের চা-শিল্পের ভবিষ্যতের সহিত বাঙ্গালীর স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত। সাধারণতঃ ব্যবসায়বিমুখ বাঙ্গালীর যে দু'একটী শিল্প-ব্যবসায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, চা-শিল্পকে তন্মধ্যে প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে বাংলা ও আসাম ছাড়া অন্য যে সব প্রদেশে এই শিল্পের প্রসার হইয়াছে, তুলনা করিয়া দেখিলে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ খুবই নগণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কাজেই চা-শিল্পে নিয়োজিত মোট ভারতীয় মূলধনের বেশীর ভাগ যে বাঙ্গালীরাই যোগাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ আসামেরও অধিকাংশ চা-শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর প্রচুর মূলধন খাটিতেছে, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য এই সকল কথা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলা হইতেছে, কারণ চা-শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় মূলধনের কত অংশ কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; কিন্তু এই শিল্পের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আছেন, তাঁহারা সকলেই এই অনুমানের যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

সে যাহাই হোক, ভারতীয় চা-শিল্পে দেশী ও বিদেশী মূলধন কি পরিমাণ নিয়োজিত আছে তাহার হিসাব হইতে দেখা যায় যে মোট মূলধনের শতকরা ২৩ ভাগ অর্থাৎ ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আমাদের দেশের লোকে যোগাইয়াছেন। এই টাকার অধিকাংশই বাংলা দেশ হইতে আদায় হইয়াছে, ইহা মনে রাখিলে চা-শিল্পের ভাগ্যের উপর আমাদের আর্থিক সঙ্গতি কতখানি নির্ভর করিতেছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে না।

চা-শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ

বর্ত্তমান পৃথিবী-ব্যাপী বাজার-মন্দার দরুণ অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ভারতবর্ষের চা-শিল্পেও মহা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু চা-শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য কেবলমাত্র এই বাজার-মন্দাকেই দায়ী করিলে ভুল হইবে। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এবং বিলাতে চা-বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, চা-শিল্পের বর্ত্তমান অবনতির জন্য তাহার দায়িত্ব নেহাৎ কম নহে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই চা-করদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে হয়। এই চা কলিকাতা আসিলে পর চারিটী য়ুরোপীয় কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে তাহা বিক্রয় হয়। এই চারিটী কোম্পানী ছাড়া অন্য কাহারও এই বিষয়ে কোনও ক্ষমতা না থাকাতে ইঁহারা যখন যে প্রকার চা'এর জন্য যে দাম স্থির করিয়া দেন, চা-করদিগকে বিনা আপত্তিতে তাহা মানিয়া নিতে হয়। ভারতবর্ষে চা-বিক্রয়ের এই ব্যবস্থা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে এবং উক্ত চারিটী কোম্পানী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন, এবং তাহার ফলে চা-করগণ সকলেই ইহাদের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন।

অপর পক্ষে বিলাতেও প্রায় একই অবস্থা। অনেকেই হয়ত জানেন না যে পৃথিবীতে যত চা বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই লণ্ডন ঘুরিয়া বিভিন্ন দেশে পৌছায়। কাজেই লণ্ডনে যত চা বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইবার জন্য প্রেরিত হয়, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ যদি কলিকাতার ন্যায় ৩।৪টী কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে চা'এর দাম নিরূপণে এই কয়টী কোম্পানীর একচেটিয়া প্রভাব কতখানি তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভারতীয় চা-করদের মধ্যে সঙ্ঘ-বদ্ধতার অভাবের জন্য তাঁহারা বিক্রেতাদের কার্য্যকলাপের প্রতিষেধক অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি দলবদ্ধ হইয়া কোনও সময় তৈয়ারী খরচার কমে চা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের এতটা দুরবস্থা হইত না।

চা-শিল্পের বর্ত্তমান অবনতির আরও কারণ আছে। ১৯২৯ সালের আগে হইতেই বিভিন্ন বাজারে জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষাকৃত খারাপ চা'এর আমদানী হওয়ার দরুণ সকল প্রকার চা'এর দাম কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার প্রতিকারকল্পে ১৯৩০ সালে বিভিন্ন দেশে চা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটী প্রস্তাব

সকল দেশেরই চা-করগণ গ্রহণ করেন। কিন্তু জাভার চা-করগণ ক'একটী ইংরেজ অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এই ব্যবস্থা অমান্য করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে চা উৎপন্ন করিতে থাকে; ফলে ১৯২৯ সাল অপেক্ষা ১৯৩০ সালে চা'এর বাজারের অবস্থা আরও খারাপ হইল। ইতিমধ্যে বর্ত্তমান বাজার-মন্দা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং ক্রমে তাহার তীব্রতাও বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ভারতীয় চা-শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থা

উপরে যে সকল কারণ উল্লেখ করা হইল তাহার ফলে ভারতীয় চা-শিল্পের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, দুই একটী তথ্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে চা'এর দাম যদি ১০০৲ টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ঠিক সম পরিমাণ চা'এর দাম ১৯২৮ সালে ১৫৪৲ টাকা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর হইতে কমিতে কমিতে ১৯৩১ সালে ৮৬ হইয়াছিল এবং গত ডিসেম্বর আরও কমিয়া ৫৭ হইয়াছে; অর্থাৎ চার বৎসরে চা'এর দাম কমিয়া এক-তৃতীয়াংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা হইতেই চা-শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থা কতকটা উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের দেশীয় চা-শিল্প-প্রতিষ্ঠান গুলির দুরবস্থার সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে জানা দরকার যে এই সকল কোম্পানীর অধিকাংশেরই আর্থিক সঙ্গতি বিশেষ সচ্ছল নহে। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে এই অবস্থা এখন খুবই বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বাজার-মন্দা কবে দূর হইবে সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এখনও কোনও প্রকারে টিকিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু শীঘ্র কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে তাঁহাদের যে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে, তাহা এক প্রকার জোর করিয়াই বলা যায়।

অটোয়া-চুক্তি ও ভারতীয় চা-শিল্প

ক'একমাস হইল অটোয়া কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে বাণিজ্যচুক্তি হইয়াছে, তাহার ফলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বাহির হইতে ইংলণ্ডে যে সব চা আমদানী হইবে তাহার উপর প্রতি পাউণ্ডে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহ হইতে যে সব চা আমদানী হইবে—তাহা অপেক্ষা দুই পেনী বেশী কর ধার্য্য হইয়াছে। অনেকে মনে করিতেছেন যে ইহার ফলে ভারতীয় চা-শিল্পের অনেক উপকার হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে ক'একটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ প্রতি পাউণ্ডে দুই পেনী, ভারতীয় চা-শিল্পকে জাভা, সুমাত্রার প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। দ্বিতীয়তঃ এই সুবিধা ভারতবর্ষের সঙ্গে সিংহলের চা-কর গণও পাইবেন; কাজেই ভারতীয় চা-শিল্পের সহিত সিংহলের চা-শিল্পের প্রতিযোগিতার তীব্রতা মোটেই কমিবে না। গত ক'এক বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের বাজারে সিংহলের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের তুলনায় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; অপর পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য বৃটীশ উপনিবেশে জাভা ও সুমাত্রার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে ক্রমশঃই হঠিয়া যাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী কিম্বা বৃটীশ সাম্রাজ্যে ভারতীয় চা রপ্তানীর ক্ষেত্র যে ক্রমেই কমিয়া আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতীয় চা-শিল্পকে টিকিয়া থাকিতে হইলে দেশের মধ্যে যাহাতে চা'এর বিক্রয় বেশী হয় এবং পার্শিয়া, আফগানিস্থান, চীন, জাপান প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী বিদেশগুলিতে যাহাতে ভারতীয় চা রপ্তানী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

চা-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে সকলেই ভারতীয় চা'এর নূতন নূতন চাহিদা সৃষ্টি করা সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের সমীচীনতা বিশেষ ভাবে স্বীকার করিবেন। চা'এর দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বিদেশ হইতে চা-রপ্তানী চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিবার একটি প্রস্তাব কিছুদিন হইল প্রায় সকল দেশের চা-করগণ গ্রহণ করিয়াছেন। গত ক'এক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে চা তৈয়ারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জাভা ও সুমাত্রাতে কম দরের চা এত বেশী তৈয়ারী হইয়াছে এবং বিনা বাধায় নানা দেশে রপ্তানী হইয়াছে যে সকল দেশেই, বিশেষতঃ লণ্ডনে, মজুদ চা'এর পরিমাণ এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আরও কিছুদিন যদি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চা-রপ্তানী চলিতে থাকে তাহা হইলে চা-শিল্পের বিষম সর্ব্বনাশ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই

সকলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন। অবশ্য এখনও এই বিষয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত কিছু হয় নাই; বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের সম্মতি ভিন্ন যে ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু অদূরভবিষ্যতে যে এই ব্যবস্থা সকল দেশেই গৃহীত হইবে তাহা আশা করা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে নূতন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমান বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে, ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী চা রপ্তানী করা যাইবে না; অপর পক্ষে আমাদের দেশে এই বৎসর ৪০ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা দেশের ভিতর বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথচ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ২ কোটি পাউণ্ডের বেশী চাহিদা নাই, কাজেই প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ৫।৬ কোটি পাউণ্ড চা বিক্রয়ের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আমাদিগকে এখন হইতেই ভাবিতে হইবে। আগামী ক'এক বৎসরে এই সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। কারণ বর্ত্তমানে যে সকল বাগানে কাজ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে যাহাদের কাজ প্রথম আরম্ভ হইয়াছে সেই সব বাগানে চা উৎপন্ন হইতে আরও ২।৪ বৎসর কাটিয়া যাইবে। কাজেই যদি ধরিয়াই নেওয়া যায় যে এখন হইতে আর কোনও নূতন চা-বাগান খোলা হইবে না তাহা হইলে প্রায় ৬।৭ কোটি অতিরিক্ত চা বিক্রয়ের সমস্যা আমাদের দেশের চা-করদিগকে সমাধান করিতে হইবে।

সুগঠিত চা-বিক্রয় সঙ্ঘের আবশ্যকতা

এখন প্রশ্ন হইল, কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইবে? সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স বাংলা দেশের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সুচিন্তিত বিবরণী পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বাংলার অন্যান্য সমস্যার ন্যায় চা-শিল্পের কথাও, বিশেষতঃ চা-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ-প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে, অতিরিক্ত চা বিক্রয়ের সমস্যার কথাও আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে চেম্বার যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন সকল চা বিক্রয়-ব্যাপারে কলিকাতার চারিটি য়ুরোপীয় কোম্পানীর, এবং লণ্ডন ঘুরিয়া যে সকল চা পৃথিবীর সকল দেশে যায় তাহার বিক্রয়ে বিলাতী তিন চারিটি কোম্পানীর একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের জন্যই অনেক পরিমাণে চা'এর বাজারে বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ চা-বিক্রয় ব্যাপারে চা-করগণের নিজেদের কোনও হাতই নাই; এবং অনেক সময়ই তাঁহারা উৎপাদন-খরচের অপেক্ষাও অনেক কমে চা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার প্রস্তাব করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া সকল চা-করগণের প্রতিনিধি নিয়া এমন একটি বিক্রয়-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করুন, যাহার উপর ভারতে উৎপন্ন সকল চা বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হইবে। এই সঙ্ঘ কলিকাতা, দিল্লী, অমৃতসর, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় স্থানে বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া সেই সকল স্থানে চা-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে ভারতে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হইলেও দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে বিদেশ হইতে আমদানী করা চা ব্যবহৃত হয়। এই সকল স্থানে যাহাতে ভারতীয় চা আরও বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্নসহকারে প্রচার-কার্য্য চালাইতে হইবে।

চা-সংমিশ্রণের ব্যবস্থা

কিন্তু কেবল প্রচার-কার্য্য চালালেই হইবে না। আমাদের দেশে চা-সংমিশ্রণের (blending) ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার চা'এর প্রয়োজন এবং তাহার জন্য নানা জাতীয় চা পরস্পরের সঙ্গে মিলাইতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই সংমিশ্রণের কোনও ব্যবস্থা নাই বলিয়াই আমাদের দেশে প্রস্তুত চা বিদেশে বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনের উপর আমাদিগকে এত বেশী নির্ভর করিতে হইতেছে। ফলে সেখানের চারিটি কোম্পানী আমাদের এই অসহায় অবস্থার পুরাপুরি সুবিধা ভোগ করিয়া লইতেছে। কাজেই ইহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদের দেশেও যাহাতে চা-সংমিশ্রণের ব্যবস্থা করা হয় সে দিকে আমাদিগকে এখন হইতে দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে আমাদের চা-করগণ সোজাসুজি বিদেশে—বিশেষতঃ পার্শিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে চা-রপ্তানী করিতে পারিবেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

চিনির কল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন

বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কথা ভাবলে মনে হয়, বাঙ্গালী এখন চিনির কল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এ দিকে সময় নষ্টও করা চলে না। কেননা টারিফ বোর্ড মাত্র ১৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ-(protection)-এর ব্যবস্থা করেছেন। এর পর আবার সংরক্ষণ-শুল্ক (protective duty) রাখা হবে, না আবগারী-শুল্ক (excise duty) বসান হবে, নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। লিমিটেড কোম্পানী হিসেবেই চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সোজা; কেবল চাই সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-পদ্ধতি। কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলার অভাবে আমাদের কোনও কারবার ভাল ভাবে চলে না।

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে একটা কর্ম্ম-পদ্ধতির তালিকা (organisation chart) দেওয়া হ'ল। যাঁরা কারবার প্রতিষ্ঠা করতে চান, এ তালিকা তাঁদের উপকারে লাগবে।

যে কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্যক উন্নতি করতে হলে, শ্রমবিভাগ (division of labour) এবং সুব্যবস্থিতি (co-ordination of work) আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্য কোন এক ব্যক্তির অর্থে এবং সামর্থ্যে চলতে পারে না। কতকগুলি মূল নীতি মেনে নিয়ে, বহুলোকের একত্র চেষ্টায় শিল্প গড়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর অভাবে অথবা টাকার অভাবে বাঙলা দেশে কোন কাজ হয় না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। Division of labour যত বেশী হবে, co-ordination of work তত নিবিড় হওয়া দরকার। প্রত্যেক চিনির কারখানায় একটা বড় রাসায়নিক পরীক্ষাগার (chemical laboratory) থাকে। সেখানে প্রতিদিন একাধিক বার আখ, রস, ছিবড়ে এবং চিনির রাসায়নিক পরীক্ষা হয়। কলের কাজ ভাল ভাবে চলছে কিনা বুঝবার এর চেয়ে ভাল ও সহজ ব্যবস্থা হতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে, চিনি খারাপ অথবা পরিমাণ কম হলে, উপরকার কর্ম্মচারীরা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেষ্টা করে থাকেন। ম্যানেজারের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যাতে চীফ ইঞ্জিনীয়ার, চীফ কেমিষ্ট এবং কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই একযোগে কাজ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের সহযোগিতার উপর কারখানার স্থিতি এবং উন্নতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। চীফ কেমিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক; তাঁকে বেশী মাইনে দিতে হলেও সেটা পুষিয়ে যায়। আবশ্যক হলে চীফ কেমিষ্ট বিদেশ থেকে আনা যায়নীয়। ম্যানেজার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি না হলেও চলতে পারে; তাঁকে হতে হবে শুধু করিতকর্ম্মা—যাকে ইংরেজীতে বলা হয়—man of affairs; বহু লোককে তাঁকে চালাতে হবে, বহু লোকের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে ভাল কাজ আদায় করতে হবে। এই রকম লোকের অভাবে বাঙ্গালীর অনেক কাজে লোকসান হয়েছে—বিশেষজ্ঞের অভাবে নয়।

চিনির কারখানা খুলতে গেলে প্রথমে দেখা দরকার, এমন কোন জায়গা পাওয়া যায় কি না যেখানে কারখানা না থাকলেও প্রচুর আখের চাষ হয়ে থাকে। যেখানকার আখের গুড়ের দাম খুব বেশী, সেখানে কারখানা খোলা উচিত নয়। কারণ বেশী দামের গুড় তৈরী না করে কৃষক কখনও আখ বিক্রি করতে চাইবে না। স্থান ঠিক করার পূর্ব্বে জানা আবশ্যক যে সেখানকার আখে কি পরিমাণ চিনির সারাংশ এবং আঁস আছে। সরকারী কৃষি বিভাগ (Agricultural Department) বিনি খরচায় এ পরীক্ষা করেন।

আখের দামের দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। বেশী দাম হলে কল চালান সম্ভব নয়। বৎসরের যে সময়ে কল চলে সে সময়ে অন্য কোন কৃষিকার্য্য না থাকায় স্থানীয় লোকেরাই কলের মজুরের কাজ করে, তথাপি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, তাদের কলের মজুরি করবার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে কিনা। মজুরি বেশী হলে চিনি তৈরী করবার খরচাও বেশী পড়ে। নিকটে জলাশয় অথবা জলের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। এঞ্জিনের বয়লার (boiler) ইত্যাদি এবং কণ্ডেন্সার (condenser) প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে জল আবশ্যক হয়। রেল ষ্টেসনের নিকট এবং বড় রাস্তার উপর কল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা নামক স্থানে বাঙ্গলা দেশের ভিতর সব চেয়ে ভাল আখ জন্মায়, নিকটে রেল লাইন না থাকাতে কল প্রতিষ্ঠা করা এখানে অসম্ভব।

চিনির কুটীর-শিল্প বিষয়ে আরও একটা কথা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেকে মনে করেন গুড় থেকে চিনি করতে পারলে বেশ লাভ হতে পারে। টারিফ বোর্ড এই প্রথার বিরোধী। গুড়ের দাম কম থাকলে একাজ খানিকটা হতে পারে বটে। কিন্তু গুড়ে সুক্রোস্ (sucrose) অপেক্ষা গ্লুকোস্-(glucose)-এর ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকাতে গুড় থেকে চিনি করতে গেলে আখের চাইতে কম চিনি পাওয়া যায়।

চিনির কারখানা করতে কাপড়ের কলের মত বেশী টাকার দরকার হয় না। ১৫ লাখ টাকা হলেই একটা বেশ ভাল

বড় কারখানা হতে পারে, তাতেই বেশ পৃথিবীর অন্যান্য কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা চলে। এমন কয়েকটি কল বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর টাকায়, বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। মাত্র ১৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Protection) হয়েছে; আশা করা যায় এর ভিতরে অনেক কল বাঙ্গালাতে হবে। বাঙ্গালী যদি পিছিয়ে থাকেও, অন্য জাতের লোক চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। চিনির কল একটা বড় রাসায়নিক পরীক্ষাগার (chemical laboratory) ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে লেখা পড়া জানা অনেক বাঙ্গালী ছেলের কাজ করবার সুবিধা হবে। বর্ত্তমান অর্থ-সমস্যার দিনে এদিকে আমাদের নজর দেওয়া খুবই দরকার। পাট মাটির দরে বিক্রি হচ্ছে, চাষী টাকা পাচ্ছে না, জমিদার খাজনা পাচ্ছে না এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বাঙ্গালীর যে দুর্দ্দশা হয়েছে তার প্রতিকার করতে হ'লে বাঙ্গলার যে যে জেলায় ভাল আখ জন্মে, সেখানে এরকম দু' তিনটে করে বড় মিল হওয়া দরকার। তাহলে বাঙ্গলার চাষী পাটের বদলে আখ চাষ করে দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে, বাঙ্গালীর অর্থ-সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে।

অনেকে চা-বাগানের সঙ্গে চিনির কলের তুলনা দিয়ে বলে থাকেন—চা বাগান করে সর্ব্বনাশ হয়েছে আবার কি চিনিতে সব নষ্ট করব, হাতে যে দু পয়সা আছে জোয়াতে যাব কেন? চা বাগান বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালী অন্য কোন শিল্পে অথবা বাণিজ্যে এত বড় কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। পৃথিবী-ব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের জন্য চা'র চাহিদা কমে গেছে, বাঙ্গালীর তাতে কোন হাত নেই। ভারতবর্ষে চিনির চাহিদা এত বেশী যে বছরে আট ভাগের সাত ভাগ চিনি আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। দেশের ভিতরেই এত বড় বাজার (home market) যেখানে আছে সে দেশে চিনির কল খুললে কোন রকম লোকসানের সম্ভাবনা নেই; বিশেষত চিনির চাহিদার একটা ক্রমবর্দ্ধমান অনুপাত (elasticity of demand) আছে যা চায়ের নেই।

গুড়ের সঙ্গে চিনির প্রতিযোগিতা কোন রকমেই হতে পারে না। আমরা যে সব জিনিষে গুড় ব্যবহার করি সে সব জিনিষে চিনি দেওয়া চলতে পারে না। রাজনৈতিক কারণে গুড় দিয়ে চা খেলেও কোন কালেই সেটা মুখরোচক হবে না।

পরিশিষ্ট

- অংশীদারগণ (Shareholders)
  - ডিরেক্টারগণ (Board of Directors)
    - ম্যানেজিং এজেন্টস্ (Managing Agents)
      - ম্যানেজার (Manager)
        - কারখানা (Factory)
          - চিফ ইঞ্জিনিয়ার (Chief Engineer)
            - কারখানা ইঞ্জিনিয়ার (Factory Engineer)
              - ফোরম্যান (Foreman)
                - মিস্ত্রিগণ (Mechanics)
                - কর্ম্মিগণ (Operatives) Unloading, Milling, Boiler,
            - মেরামত কারখানার ইঞ্জিনিয়ার (Workshop Engineer)
              - ফোরম্যান (Foreman)
                - মিস্ত্রিগণ (mechanics)
            - রেল ইঞ্জিনিয়ার (Loco Engineer)
              - ফোরম্যান (Foreman)
                - মিস্ত্রিগণ (Mechanics)
            - ইলিট্রিক ইঞ্জিনিয়ার (Electric Engineer)
              - ফোরম্যান (Foreman)
                - মিস্ত্রিগণ (Mechanics)
            - গুদাম রক্ষক (Store keeper)
          - * কারখানা পরিচালক ও চিফ কেমিষ্ট (Factory Superintendent & Chief Chemist)
          - কুলি পরিচালক + (Labour Overseer)
        - ¶ চালান (Transport)
        - ‡ যোগান (Supply)
        - § পরিচালন (General Administration)

* কারখানা পরিচালক ও চিফ কেমিষ্ট (Factory Superintendent & Chief Chemist).

- সহ পরিচালক (Asst. Superintendent)
  - কর্ম্মিগণ (Mechanics) clarification, concentration, curing, bagging.
- শাখা কেমিষ্টগণ Branch Chemists)
  - সহ কর্ম্মিগণ (Helpers)

\+ কুলি পরিচালক (Labour overseer)

- সহ পরিচালকগণ (Asst. overseer)
  - কুলিগণ (Unskilled labour)

† চালান (Transport)
- পরিচালক (Manager)
  - সহ পরিচালক (Asst. Manager)
    - কর্ম্মিগণ (Overseer)
    - কুলিগণ (Unskilled labour)

‡ যোগান (Supply)
- চিফ্ এগ্রিকালচাল অফিসার ও যোগানকর্ত্তা (Chief Agricultural Officer & Controller of Cane supply)
  - নিজ আবাদ বিভাগ (Estate Department)
    - এগ্রিকালচার্ল অফিসার (Agricultural officer)
      - বীজতলা (Nursery) cuttings for estates & farms
      - জমি (Estates)
        - কুলিগণ (Unskilled labour)
  - কৃষক বিভাগ (Farming)
    - আমিনগণ (Surveyors) survey, drafstmen, estimate of crops
    - এগ্রিকালচাল অফিসার (Agricultural officer)
      - কর্ম্মিগণ (Overseers) distribution of cuttings & watching progress of cultivation.
  - || আখ সরবরাহ বিভাগ (Cane supply dept.)

|| আখ সরবরাহ বিভাগ (Cane Supply department)
- সহ যোগানকর্ত্তাগণ (Asst. Controllers)
  - কর্ম্মিগণ (Overseers) Progress of harvesting and Regular and Continuous Supply.
- ওজন বিভাগ (Weighing)
  - ওজনাধ্যক্ষ Weighbridgeman
    - কেরাণীগণ (Clerks) tallying & bill making
    - কর্ম্মিগণ (overseers) weighing of canes

§ পরিচালন (General Administration)
- চিকিৎসা বিভাগ (Medical department)
  - চিফ মেডিকাল অফিসার (Chief Medical officer)
    - হাসপাতাল (Hospital)
      - চিকিৎসকগণ (Doctors)
      - কর্ম্মিগণ (Compounder)
      - ঔষধ (Medicines)
- কোষাধ্যক্ষ (Cashier)
  - হিসাব রক্ষকগণ (Accountants)
  - সহ কোষাধ্যক্ষগণ (Asst. Cashiers)
- কার্য্যাধ্যক্ষ (Business manager)

কার্য্যাধ্যক্ষ (Business manager).
- হিসাব রক্ষক (Accountant)
  - সহ হিসাব রক্ষকগণ (Asst. Accountants)
    - কেরাণীগণ (Clerks) Accounts, Bills, Vouchers, Budget
- হেড ক্লার্ক (Head Clerk)
  - কেরাণীগণ (Clerks) Correspondences, Statements Returns, Establishments,
- গুদাম রক্ষক (Storekeeper)
  - কর্ম্মিগণ (Overseers)
  - কেরাণীগণ (Clerks) Indent, Invoice, Bills, Record

বাংলার আর্থিক সঙ্কট ঘুচিবে কিসে?

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা ক্রমেই অধিকতর খারাপ হইয়া পড়িতেছে। কোথায় ইহার শেষ ও কবে আবার সুদিন আসিবে তাহার কিনারা পাওয়া যাইতেছে না। রাজনীতির চর্চ্চায় যে আশা পোষণ করা হইতেছিল অর্থনীতির ভাঙ্গনে সে আশা সুদূরপরাহত হইতে বসিয়াছে। কি চাষী, কি শিল্পী ও ব্যবসায়ী কাহারও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারসমস্যা সঙ্গীন হইয়াছে, জমিদারবৃন্দ প্রায় মরণোন্মুখ।

কি উপায়ে এই দারুণ দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা হয়তো আজ প্রায় একই পরিমাণে দুঃস্থ। কিন্তু তাহার মধ্যে বাংলার দুরবস্থা যেন সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য, এবং বাঙ্গালী আমরা আমাদের চারিপাশের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে, এজন্য বাংলার প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া দেখাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

বাংলার প্রত্যক্ষ সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটী, যথা—শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা, পাট ও চটকলের ব্যবসায়-মন্দা, চা'য়ের চাহিদার অভাব, কয়লার বাজার পড়িয়া যাওয়া এবং মফঃস্বলের লোন আফিসগুলির টাকা আটকাইয়া যাওয়া। সমস্যাগুলি বিভিন্ন দেখাইলেও প্রত্যেকটী এরূপ পরস্পরসাপেক্ষ যে ইহাদের কোন একটীর স্বতন্ত্র করিয়া সমাধানের চেষ্টা চলিতে পারে না।

যে সকল কারণে আমাদের বর্ত্তমান এই দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে প্রথমতঃ তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদেরা বলেন যে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সকল দেশের কাঁচা ও শিল্পজাত মাল প্রস্তুত এরূপ বেগে বাড়িয়া চলে যে পৃথিবীর চাহিদা তাহার সঙ্গে সমান তালে প্রসারিত হইতে পারে নাই। তাহার জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই জিনিষপত্রের আধিক্য দেখা যায় ও মূল্য কমিতে থাকে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের সময় নানা অবস্থার দরুণ জিনিষের যে মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহাও কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অথচ এই মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও ধনিক তাঁহাদের প্রাপ্য কমাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় কিছুদিন অস্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা কোন কোন দেশ অর্থনীতির ভিত্তি অটল রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিশ্চয়তা বাড়িয়াই যায়। বর্ত্তমানে যে পৃথিবীব্যাপী সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা এই অবস্থার একমাত্র পরিণতি এবং বাংলার চাষী ও মধ্যবিত্ত, মহাজন ও জমিদার সকলের দুরবস্থার মূলে রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী অর্থ-সঙ্কট।

কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-সঙ্কটই আমাদের দৈন্যের একমাত্র কিম্বা প্রধান কারণ নয় এবং পৃথিবীব্যাপী দুঃখ দৈন্যের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলেও আমাদের চলিবে না। অন্যান্য দেশে যখন সমৃদ্ধির আনন্দ ছিল তখনও তো বাংলায় নিরানন্দ বই আর কিছু দেখা যায় নাই। অতএব বাংলার বিশেষ কি অভাবে আমাদের এই চিরন্তন দুর্দ্দশা তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

বাংলায় প্রকৃতিজ দ্রব্যাদির অপ্রাচুর্য্য নাই। নদ, নদী, জলাশয়, কর্ষণোপযোগী ভূমি, পর্ব্বতমালা, খনি ও সমুদ্রোপকূল সবই রহিয়াছে। কিন্তু অভাব রহিয়াছে এগুলির উৎপাদনী শক্তি সম্যক্ ব্যবহারে লাগান'র। তাই দেখা যায় আমাদের ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জলাশয়গুলি দুর্ব্বল ও সংস্কারহীন; প্রকৃতি যাহা দান করিতে প্রস্তুত তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও আমরা আপনাকে তৈয়ারী করি নাই। ইহা হইতে মনে হয় বাংলায় নরনারীর দৈন্যের প্রধান কারণ আমাদের কর্ম্মকুশলতার অভাব। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন কেবলমাত্র উদ্দেশ্যহীন অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, এবং হয়ত দেখা যাইবে যে কোন কোন স্থানে অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও শ্রমিক অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সামান্য বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অন্যান্য দেশের নরনারীর তুলনায়

আমরা সাধারণতঃ পরিশ্রম করি কত কম। আর তাহা ছাড়া আমাদের সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে পরিশ্রমকারী স্ত্রীপুরুষের তুলনায় বসিয়া খাওয়ার লোক কত বেশী।

এই যে শ্রমবিমুখতা ইহার জন্য দায়ী আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও শিক্ষার অভাব। মানুষ হিসাবে বাংলার যুবক যে অন্যের তুলনায় খাট তাহা নহে, কিন্তু এমন ব্যবস্থার মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে যে তাহার ভিতরের শক্তি উৎসারিত হইবার অবকাশ পায় নাই, তাহার পরিশ্রমের উৎস শুখাইয়া গিয়াছে, ফলে সে তাহার আত্মবিশ্বাসও হারাইয়া ফেলিয়াছে। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে বাংলার যুবক, বাংলার শ্রমিক, বাহিরের আবহাওয়ায় গিয়া যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে আমাদের জনবলকে কর্ম্মপ্রিয় ও কার্য্যকুশল করিয়া তুলিতে হইবে। এবং এই কর্ম্মপ্রিয়তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় এ পরিবর্ত্তন হইবার নহে, সমস্ত সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে এই নূতন জীবন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হইতে হইবে।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর দৈন্য ঘুচাইতে হইলে যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা শুধু সাময়িক অর্থ-সঙ্কটের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলেই চলিবে না। আমাদের বেকার সমস্যা, চাষের উৎপাদনী শক্তির হ্রাস, কয়লা, চা, পাট প্রভৃতি ব্যবসায়ের দুরবস্থা, এগুলি সবই বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক জীবনের ব্যবস্থার পরিণাম। এ সকল সমস্যার সমাধান এককালে করা ততদিন সম্ভব হইবে না যতদিন দেশে ধনিকবৃত্তি থাকিবে, যতদিন কেবলমাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের উপর বাংলার চাষীর অন্নসংস্থান নির্ভর করিবে এবং যতদিন অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিবে। উপযুক্ত চেষ্টা ও বিশেষ অর্থব্যয় করিলে বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের কিছু উপশম হইতে পারে বটে কিন্তু বাংলার পাঁচ কোটি নরনারীর স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাই সুনিয়ন্ত্রিত বিত্তোৎপাদনের * ব্যবস্থা। যে যাহা পারে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া তাহাই করুক, এ নীতি অনুসরণ করিলে উপযুক্ত ধন বণ্টন হইতে পারে না এবং সেজন্য সকলের পরিশ্রমোপযোগী সমান আয়ের যোগাড় হয় না। ধনিক ও শ্রমিকের হৃদয়হীন ব্যবধান থাকিয়াই যায় ও দরিদ্রের দৈন্য ঘুচিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই আমাদের সমস্ত অর্থ-নৈতিক বৃত্তিকে একটি সুচিন্তিত ধারায় চালাইতে হইবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতির প্রত্যেকটার উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া জাতির প্রাকৃতিক ও মানবশক্তিকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়া ফেলিতে হইবে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সম্ভব হইবে তাহা লইয়া যে সকল আলোচনা ও পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দেশে হইয়া গিয়াছে ও এখনও হইতেছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিম্নলিখিত কয়টী, যথা :-

১। দেশের সমৃদ্ধি বা দেশবাসীর শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সুব্যবস্থিত করিতে হইলে এদেশে বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কথা ভুলিয়া গিয়া গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট শিল্পের, বিশেষতঃ কুটীর-শিল্পের প্রসার করিতে হইবে। সুবৃহৎ কারখানা শিল্পে অধিক লোক কাজ করিবার সুযোগ থাকে না, এবং আমাদের চাহিদার উপযোগী সকল দ্রব্য প্রতি গ্রামে যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থায় উৎপন্ন হয় তাহা হইলে বহু লোকের বেকার সমস্যা ঘুচিবে।

পাশ্চাত্য অর্থ নৈতিক হয়তো বলিবেন যে এ উপায়ে বিত্তোৎপাদন আরম্ভ করিলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির খরচ পড়িবে এত অধিক যে অন্যান্য দেশের বৃহৎ কারখানা সম্ভূত জিনিষের প্রতিযোগিতায় বাজারে সেগুলি বিক্রয় করা অসম্ভব হইবে। এ যুক্তির উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হয় তখনই যখন এক স্থানের উদ্বৃত্ত দ্রব্য অন্যত্র বিনিময়ের আবশ্যক হয়। যদি বিনিময়ে প্রাপ্তব্য জিনিষেরও ঠিক একই নিয়মে উৎপাদন সম্পন্ন হয় তাহা হইলে মূল্যের মাপ যাহাই হৌক না কেন ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। উপরন্তু শিল্প কেন্দ্রীভূত না হইয়া প্রসারিত হইলে কোন স্থানের উদ্বৃত্ত বাহিরে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। অতএব তাহার মূল্য যাহাই হৌক তাহাতে গ্রাম্য উৎপাদক ও ক্রেতা কাহারও বিশেষ যাইবে আসিবে না। এইরূপ মত পোষণ করেন প্রধানতঃ আমাদের দেশের পুরাতনপন্থী সমাজ সেবীগণ। সুইট্‌জারল্যাণ্ড, চীন ও মধ্য এসিয়ার কোন কোন

* Planned Production.

স্থানে এইরূপ প্রণালীতে বিত্তোৎপাদন এখনও সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে 'কম্যুনিসম্' অথবা চরম সাম্যবাদিত্বের প্রসারে সমস্ত উৎপাদনীশক্তি সমাজগত অথবা রাষ্ট্রপরিচালিত করিয়া ফেলা। এ পন্থার কর্ম্মীদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান ধনিক বৃত্তি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিতে পারিলে জনসমাজের স্থায়ী উন্নতির কোন সম্ভাবনা হইতে পারে না। এ উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যেকের 'অহমিকা' বিনাশ করিতে হইবে, কাহারও এতটুকু সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার রাখিলে চলিবে না, এবং জাতিগত, আভিজাত্যগত, বংশগত, অথবা পৈতৃক কোন বিশেষ সুযোগ বা ভোগাধিকার একজনের তুলনায় আর একজনের থাকিতে পাইবে না। এ অবস্থা আনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চাই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের মূল, প্রকৃতির দান ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত ও অরণ্য প্রভৃতির উপর ব্যক্তির অধিকার এককালে অগ্রাহ্য করিয়া এগুলিকে সমস্ত সমাজের অথবা রাষ্ট্রের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া ফেলা, এবং উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে সকল শ্রেণীর লোকের মনে পরস্পর—সাপেক্ষতা জাগাইয়া তুলিয়া ব্যক্তিগত বিত্তাধিকারের ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তা উভয়ই নষ্ট করা। এইরূপ উপায়ে রুশিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশ এই বিরাট পরীক্ষা বিস্ময়ের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস যে নানা বৈষম্যের বাধা ভাঙিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর হাতে কাজ মুখে অন্ন যোগাইবার শক্তি একমাত্র কম্যুনিজমেরই রহিয়াছে, অন্য কোন পন্থা অনুসরণে ইহা হইবার নহে।

৩। কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাশীল ভারতবাসী কম্যুনিজমের প্রসার ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেন না, এবং দেশকালপাত্র হিসাবে রুশিয়ার সাম্যবাদিত্ব এখানে সম্ভবপর বলিয়াও জ্ঞান করেন না। তাঁহারা চাহেন এ দেশকে একটি স্বাধীন অর্থ-নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে ও উপযুক্ত আইনের বলে বিদেশী দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করিয়া দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে, এবং একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল এই জাতির উৎপাদন-শক্তিকে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রসারিত করিয়া দেশবাসীর বৃত্তিহীনতা দূর করিতে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র ও নবীন ইতালী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন এ যাবৎ উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিয়াছে। আপাততঃ এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দেশের অর্থসঙ্কট কিয়ৎ পরিমাণে কমিতে পারে তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহার সুফল কতদিন স্থায়ী হইতে পারে তাহা বিচার্য্য।

৪। অনেকে মনে করেন যে আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ যেখানে শিক্ষার তেমন বিস্তৃতি হয় নাই সেখানে সমবায় নীতি অবলম্বনই জাতির দুঃখমোচনের একমাত্র উপায়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ছোট ছোট কুটীর-শিল্প ও কৃষির উন্নত প্রণালীতে পরিচালনা, এমন কি অবশ্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কারখানা-শিল্পও সমবায়-নীতিতে যেরূপ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে ও সকলের লভ্যাংশ যেমন সমান ভাবে বণ্টন করিবার সুযোগ হয় এরূপ সুব্যবস্থা আর কোন মতেই হইতে পারে না। বর্ত্তমান ধনিক বৃত্তি-মূলক আর্থিক জগতে সমবায়নীতিই একমাত্র সংশোধক ও ইহার উপযুক্ত প্রচার হইলে লোকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া হৃষ্ট চিত্তে বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে। সুইট্‌জারলাণ্ডে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) দ্বারা এরূপ প্রস্তাব আদৃত হইয়াছে এবং আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্র ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, এযাবৎ সমবায় মন্ত্রের প্রসার তেমন হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ সমবায় আন্দোলন জাতির অন্তর স্পর্শ করে নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি সরকারী বিভাগের আত্মম্ভরিতার সুযোগ দিয়াছে মাত্র। উপযুক্ত ভাবে সমবায় আন্দোলন চালাইতে পারিলে লোকে স্বাবলম্বী হইয়াই নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিয়া লইবে।

এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত ও ভিন্ন দেশের পরীক্ষার আলোচনা ও বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের জন্য হয়ত ইহার একটী পন্থাও সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে। ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার, লোক-চরিত্র, সামাজিক ব্যবস্থা, গ্রাম্য জীবন সবই অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনেক হিসাবে এখানকার পারিবারিক জীবন ধনিক বৃত্তির পরিপন্থী। সেজন্য ধনিকতার কুফল এদেশে ইউরোপ ও আমেরিকার মত অসহ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ

ব্যক্তি লইয়া সমাজ গড়ে নাই, উহার ভিত্তি পরিবারগত। পারিবারিক জীবনে ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ অনেক সময়েই বিসর্জ্জন দিতে হয় এবং আমাদের সনাতন সামাজিক প্রথানুসারে বহু ক্ষেত্রে পরিবারকে সমাজের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এক হিসাবে দেখিতে গেলে ভারত-বর্ষের সমাজনীতি এক বিশেষ সমষ্টিবাদের ভিত্তির উপরে গড়া। ভারতবর্ষের এই পুরাতন আদর্শকে বিজ্ঞানের নূতন প্রেরণায় উদ্বোধিত করিয়া জাতিকে সেই মত প্রস্তুত করিতে পারিলে হয়ত ইউরোপ ও আমেরিকার কোন মতবাদের অনুসরণ করা আমাদের মোটেই প্রয়োজন হইবে না।

ঠিক যে কি ভাবে আমাদের জাতীয় জীবন সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন তাহা বলা এখন কঠিন, এবং হয়ত যুক্তি-সঙ্গতও নহে। ভবিষ্যতে যে ভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠুক না কেন সম্প্রতি তাহার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া লাভ নাই। এখন অন্ততঃ কিছু দিন ধরিয়া জাতিকে সবল করিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হইবে প্রায় সকল প্রকার ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠনের পক্ষে তাহা একই প্রকার। বর্ত্তমানে আমাদের চাই স্বাস্থ্য, চাই অন্ন, চাই হাতের কাজ। ইহার জন্য যে যে ব্যবস্থা করিতে হইবে আগামী সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সুদূর ভবিষ্যতের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমানকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধে প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু চিন্তার ধারা নির্দ্দেশ করা গেল মাত্র।

লাল চুল

—শ্রীমনোজ বসু

ছ' মাস ধরিয়া বিয়ের দিনই সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল ত গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনের বাকী, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল—কাজি-ডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতে হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস; চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়া-ছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা ত যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাও পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জল-জঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ান ছাড়া করিবার আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে; জমিদারের ছেলে ঐ একটি মাত্র। অতএব এই ছ' মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়ি শুভকর্ম্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।—ঐ তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবোই—বার বার এইরকম গোছ-গাছ করে শেষ কালে যে…না হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল…

কিন্তু অত বড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যকও হইল না। সহরের প্রান্ত সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদার বাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর আশী জন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচ খানা গরুর গাড়ী বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে আটটায়।

রাণী বলিল—মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলা আপনি

বড্ড অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু—

মিনুর মা হাসিলেন।

—না, সে হবে না, মাসিমা। সমস্ত রাত আমরা বাসর জাগব; কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় ত বলুন, এক্ষুনি কেন গাড়ীতে উঠে বসি।

রসুই ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার উপরে কে জলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য করিতেছিল—বিনা অপরাধে তাহার গুরু দণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিন দিনের মধ্যে কলিকা মোটে সে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

—খবর কি? খবর কি?

শীতল কহিল—খবর ভাল। বর বরযাত্রী সব ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজ বাবুর বড় মোটর এনে সাজানো হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল—একশ' বরকন্দাজ গাঙের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আট দশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল—যাওয়া ভাই, অনর্থক। ছাত থেকে কিচ্ছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে; ঠাট্টাতামাসা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ; তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে?

রাণী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ, ঐ বর—দেখ—

—মরবি যে এক্ষুণি পড়ে'—ছাতের এখনো আলসে হয়নি দেখছিস্? বলিয়া আর একটি মেয়ে রাণীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটে পড়িয়া মরিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল—কই? ও রাণী, বর দেখলি কোন দিকে?

—গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাওনা—তুমি যেন কি রকম সেজদি!

সেজদি বলিল—মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুপ্‌থুড়ে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণ কোন কালে আসনে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসনে নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা।

নিরু বলিল—বলেছি ত অনর্থক। তার চেয়ে নীচে গোলকুঠুরীর জানালা দিয়ে দেখিগে চল্।

—চল্, চল্—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলা আলো, ঢাকের বাজনা…। সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙীন সাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ, উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

—ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা—মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই; পালিয়ে এসে চিলে কোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রাণী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল—আহা সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নীচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—গিন্নিপনা রাখ্ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে, রাণী?

বিশেষ করিয়া রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে যুক্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া বলিতে লাগিল—মিনু ভাই, আগো—আজকে রাতে ঘুমোতে আছে?

উঠে ঘর দেখসে এসে। তারপর মিনুর এলানো চুলে হাত দিতে যেন শিহরিয়া উঠিল—দেখেছ? সন্ধ্যেবেলায় আবার মেয়ে ঘুমেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকোনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম?

নীচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরাণী, শুভা ওদের সব গলা।

—চল্—চল্—

—চুল বাঁধতে হবে—ওঠ্ মিনু, শীগ্‌গির উঠে আয়—বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে এক টান দিয়া রাণী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রাণীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই। ঘুমচোখে প্রথমটা ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে; ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো; ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।...সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে...। হঠাৎ নীচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।—জল, জল...মোটর আনো...ভিড় করবেন না মশাই, সরুন—ফাঁক করে দিন...আহা-হা কি করো, মোটরে তোল শীগ্‌গির...

গামছা কাঁধে কোন দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

বর-বাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। [illegible] দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর [illegible]।

* * *

* *

রসুনচৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পূর্ব্বদিকে ছোট্ট লাল চাঁদরের নীচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাঁচা হলুদের মত রং, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজ রাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশ বহিয়া রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মতো খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা—বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্য হইতে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্ত্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মিমাণিক রাজরাণী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন—হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ যে—

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগ্নি-পালিশ খাট কজনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মুঠায় কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাঁচের মত স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দুটির দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—একবার ভাল করে' চা' দিকি·· চোখ তুলে চা'—ও খুকী,...

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—ও বেয়াই, বিনি দোষে যাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তাঁর সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথা কয়নি। ও খুকী, আর বকব না—চোখ তুলে চা' একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দেখবে তোমরা ? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে আটটায় লগ্ন ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, যেন্ শুভ লগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।···ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুঁড়িয়া দ্রুত বেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল ; সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল—চালাও এক্ষুনি—

গাড়ী চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ, একবোঝা কোট কামিজ, তার উপর সৌখীন ফুল-কাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষ্যে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম ! বেণুর মনে হইল, সর্ব্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ী—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ?

—যেখানে খুসী। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীর বেগে গাড়ী ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মতো বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণু শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দুধারের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ, ছোট শহর ইহারই মধ্যে নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা।···সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ বাজিয়া উঠিল, অতি মৃদু অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেক-গুলা কণ্ঠস্বর—বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো—

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ীগুলির ছাতের উপর, আম-বাগিচার এখানে সেখানে, ল্যাম্পপোষ্টের আবছায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহল-ভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটি বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদীর সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা,—মানবী নয়। এই গাড়ীতেই মেয়েটিকে হাঁসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল ; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত হয়ত গাড়ীর গদীতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেড-লাইট জ্বালিয়া গাড়ী ছুটিতেছে ; চারিদিকের নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এই দিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোন দিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দ-চারিণী মৃত্যুরূপা তার বধূ। লাল বেণারসীতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্ত্তের ঘটনার পরে এখন তার পথ হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতা—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরণের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকী ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল-ভরা মাথাটি—মাথার

চারি পাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলো চুল উড়ে,—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল!

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীর অনেকে মেল ট্রেন ধরিতে সোজা ষ্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—তাঁহারা খুব নিকট আত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভারী ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুর বাড়ীতে বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল—বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম—

—বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন। ছেলে নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়া চাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে-একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে; কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপ বাক্সের আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় চোখ দুটি অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।...

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল।

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল—বুদ্ধি শ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্ত্তাবাবু, সেই পাকা দেখতে গিয়ে আপনি বল্লেন। আমার মা নেই, একজন মা খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নীচু করে রইল—

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—থামো শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুজনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; জীবনকালের মধ্যে কোন দিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্ত্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানলা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জানলা খোলা, শেষ রাতে পূর্ব্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি ভুল হইয়া যাইতেছে...হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল...কে আসিয়া কতবার তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে; তাহার তন্দ্রাবিবশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক্—ঠক্—ঠক্

খিল-আঁটা কাঠের কবাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে

পায়। হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আদরের কথা কহিলে একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস্-ফিস্ করিয়া বধূ বলিতেছে—দুয়োর খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজী নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর-গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িয়াছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্শা হইয়া আসে। আম বাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘুমভাঙা পাখীর কলরব···ও ঘর হইতে কে কাসিয়া কাসিয়া উঠিতেছে···। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মত একটা ট্রেণ আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন। বেণু গিয়া কহিল—সাতটা বাজে —

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও—

—বাড়ী যাওয়া হবে না?

—না—বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল—কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি দেখিলেন, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন—শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে ত বলা যাচ্ছে না।

অনতিপরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকী রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আড় পারে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে; কিন্তু ইদানীং কৌলীন্য টুকু ছাড়া সে পক্ষের অন্য বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল—কশাই তোমরা সব।

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড—

একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসি মুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে দিল—পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘণ্টা দুই তিন আগে বেরুলে—কোন খবরাখবর দেওয়া নেই। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্ব্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটা থাবা মারিয়া কহিল—এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয় বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতে রাজী হয় না—হেনো তেনো কত কি আপত্তি। ফুস মন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম। বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল—আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল—তাই কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো মেয়ে··· ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসী বাঁদীর যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি যা বলবার বলে দিইছি শীতল, তুমি বাবাকে আমার কথা বোলো—

বলিয়া আর উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

* *

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন—শুনলাম, বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক ?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন—তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে বল ?

কোন প্রকারে মোরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল—কালকের সর্ব্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কি রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমার—বলিতে বলিতে স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত সামলাইয়া লইয়া বলিল—মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটু-খানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন—আর এদিকের সর্ব্বনাশটা ভাবো একবার। বাড়ীসুদ্ধ কুটুম্ব গিস্ গিস্ করছে, সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে সব হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদীর বিয়ে—আর চৌধুরীদের সেজকর্ত্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের সেজকর্ত্তা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে এক হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল্ দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙ্ল—মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে ?···

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ী ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশত, মাঝের এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।···

বারোয়ারীর মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা সুরু। বেণুধর সমবয়সী জন দুই তিনকে পাকড়াইয়া বলিল—চল যাই।

বিজয় বলিল—আমার যাওয়া হবেনা ত। বিস্তর জিনিষ-পত্তোর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন ?

—গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটো দিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমিই যাও বিজয়।

—গাড়ী সেই কোন রাতে—আমরা থাকব বড়জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা—চল চল—বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল ?

—হ্যাঁ—

—পরশু রাত্রে ?

তা ছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল—রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে-মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে—

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল—মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ আহ্লাদ ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুড়িয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে ?—মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল—তুমি এসব কথা আর বোলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

—ভয় করে ? তবে বলব না। বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল—কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয় নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল।

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুসী হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাশুদ্ধ তাহার অনেকগুলি ভাঙিয়া লইল। বলিল—খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেবো—

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—ফুলশয্যার দেরী আছে হে—

—কোথায়? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল—এ পক্ষের দিন রয়েছে ত কাল। আর তাহিরপুরের টার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যের দিন করেছ কবে?

বিজয় রীতিমত রাগিয়া উঠিল—ফের ঐ কথা? এ পক্ষ—ওপক্ষ—বিয়ে তোমার ক'টা হয়েছে শুনি?

—আপাততঃ একটা; কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি—। বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল—ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই!

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোরে জোরে বাহিরে পায়চারী করিতে লাগিল। খণ্ড চাঁদ ক্রমশঃ আম বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।···আবার সে ঘরে ঢুকিল! বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া লঘুপায়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছ পালা খস্ খস্ করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নতুন কোরা কাপড় পরিয়া খস খস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আশীর্ব্বাদের আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দুটা দিন সময়ের মধ্যেই মন তাহার আশ্চর্য্য রকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা লইয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মতো নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুণ-কাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মত খিলান-করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি অবধি সে বই পড়িতে লাগিল···একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ--তাহার মধ্যে এক বিন্দু সন্দেহ করিবার কিছু নাই—জানলার শিকের মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মত পাঁচটি আঙ্গুল লীলায়িত ভঙ্গীতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানলায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানলার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের উপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা-করা তালের গাছ···একটা মুখের আধখানা...ঝুঁটি-ওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে···ঝুল কালি ও মাকড়শা জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক যেন আটক হইয়া রহিয়াছে···

চোখ বুজিয়া বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার সারির মতো মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্ত্তকাল সব স্থির। সবার কি সঙ্কেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ-জঙ্গল আনাচ কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।···

এই রাত্রে আঙিনার ধুলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

—ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমাণিক রাজ-রাণী মা—

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট খুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।…

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবি খানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানলায় সহসা মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় শ্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা এবং চেনা-জানা সকল আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া ঐ জানলার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্দ্ধ দেরী করিল না; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে সুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

—এসো

—উঁহু—

—এসো

—না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায়; তবু সে যুক্তকরে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল—মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না; আমি যাবনা কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্ত্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক, অনেক—অনেক ক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎ-গতিতে খসিয়া পড়ে, ঝন ঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভাল বাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোকবাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মত বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

অন্তঃপুর

—বিষ্ণুশর্ম্মা

নারী-প্রগতি

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যেদিন সম্পূর্ণ লিখিত হইবে সেদিন আমরা বুঝিতে পারিব অতি অল্পকালের মধ্যে নারী-সমাজ কতখানি প্রগতি লাভ করিয়াছেন। নারীর প্রগতি বলিতে আমরা কি বুঝি, কি তাঁহারা চান এবং তাহা সমাজের পক্ষে শুভ কি অশুভ, তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির নারী-সমাজের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং এই চাঞ্চল্যের ফলে প্রাচীন সমাজের বহু ব্যবস্থার ওলট-

পালট হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তবে নারী কতক বিষয়ে যেমন অসাধারণ উন্নতি করিয়াছেন তেমনি আবার কতক দিক দিয়া পিছাইয়াও পড়িয়াছেন, ইউরোপের ও এদেশের নারী-সমাজের

মারিয়া, ১ বছর ৭ মাস।

বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা তাহার আভাস পাই। বর্ত্তমানে ইউরোপ জগতের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা আমাদের নিজেদের আদর্শকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণও করিয়াছি, কিন্তু তথাপি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রাণশক্তির প্রবাহ ওপার হইতে অনেকখানি আসিয়াছিল বলিয়াই আমরা বহু-কাল পরে নিজেদের চিনিবার ও জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। নারীর বর্ত্তমান প্রগতি-আন্দোলনের জন্যও ইউরোপ অনেক-খানি দায়ী।

আমাদের দেশের মেয়েরা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ললিত-কলায় জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আজ যে উদ্যম করিতেছেন তাহা শুভ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সংক্রামক বীজের মত বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের নারী-সমাজের মধ্যে যে ভাবে অলক্ষ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা যদি শক্তি-সঞ্চয় না করেন তাহা হইলে একদিন মানসিক ক্ষুব্ধতার অবধি থাকিবে না। ইউরোপের মহিলারা শিক্ষার জন্য এবং তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা গ্রহণ করিলে নারী-সমাজ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলেই যে প্রগতির মাত্রা বাড়িয়া যাইবে এ ধারণা যেন তাঁহারা না করেন। অবশ্য একথা বলি না যে আমাদের সকল সামাজিক ব্যবস্থাই অতি চমৎকার এবং তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠে নাই, কিন্তু পরিবর্ত্তন করিয়া যে ব্যবস্থা প্রচার করিতে চাহি তাহা কতকখানি কল্যাণকর তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সত্যই যদি তাহা নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে, এবং সে ব্যবস্থার অনু-মোদন-কর্ত্তারা স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া তাহার মধ্যে সত্যের সন্ধান পান তাহা হইলে একদিন না একদিন সকলকে সে সত্য গ্রহণ করিতেই হইবে। অত্যন্ত প্রাচীন-পন্থীদেরও কোন অন্যায় দাবী তাহার বিরুদ্ধে টিঁকিবে না। কিন্তু উৎসাহের ঝোঁকে আমাদের বিচার-শক্তি কি সকল সময় ঠিক থাকে?

মানুষ সমাজ গড়িয়াছে শান্তিতে থাকিবার জন্য। বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার মধ্যে সে সুখ পায় নাই, নারীও নহে, পুরুষও

বেবি রুস্, মাত্র ৬ মাস।

নহে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সহজাত দৌর্ব্বল্য আছে তাহা অসংযত হইয়া প্রতিনিয়ত বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিতে চাহিতেছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যুগে যুগে প্রত্যেক

কালে সামাজিক অনুশাসন রচিত হইয়াছে। কোন সময় হয়তো অবস্থা অনুযায়ী কঠোর সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন এখন আবশ্যক কিন্তু মাত্র সেই পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া মূল সামাজিক ব্যবস্থাকে শিথিল করিবার অধিকার কাহারও নাই।

এ ধারণা ভুল যে নারী চিরকালই অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে পুরুষ চিরকাল তাঁহার উপভোগের উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হয়তো কোন কোন সময়ে তাঁহারা সুবিচার পান নাই এবং প্রাচীন বর্ব্বর জাতি তাঁহাদের উপর অবশ্য অত্যাচারও করিয়াছে কিন্তু সভ্য জগতের পুরুষরা যে চিরকাল তাঁহাদের শুধু নিষ্পেষিত করিয়াই আসিয়াছেন একথা স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহাদের উপর কোথায় কোথায় অবিচার হইয়াছে এ দৃষ্টান্ত যাঁহারা ইতিহাস হইতে দেখান তাঁহারা সমগ্র পুরুষ-সমাজের প্রতি অনেকখানি অবিচার করেন, কারণ নারীর স্বাতন্ত্র্যকে পুরুষ কোথায় স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার মর্য্যাদা ও সম্মানরক্ষার জন্য যে কোথায় কতখানি ত্যাগ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের চোখে পড়ে না।

নারী এবং পুরুষের সকল দিক দিয়া একই কাজ কোন কালে হইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যে যে চিরন্তন বিভেদ আছে এবং চিরকাল থাকিবে তাহার উপরেই দুজনার কর্ম্ম-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। সংসারে ও সমাজে তাঁহাদের নিজ নিজ গণ্ডীতে যে স্বাতন্ত্র্য আছে, উভয়ের যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহাদের সমবায়েই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উভয়ের ব্যক্তিত্বকেই প্রত্যেক সভ্য সমাজ স্বীকার করিয়া থাকে। মধ্যযুগের ইতিহাসে নারীর স্থান জগতের সকল সমাজেই কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল এ কথা সত্য, কিন্তু প্রাচীন কালে প্রত্যেক সভ্য দেশেই নারী যথেষ্ট শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পুরুষ সে শক্তির নিকট মাথা অবনত না করিয়া পারে নাই। নারী কি ভাবে সমাজের ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন তাহা লইয়াই এবার আলোচনা করি।

অতি প্রাচীন যুগে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোন বন্ধনই ছিল না। বর্ব্বর পশুদের মতই ছিল তাহাদের জীবন-যাত্রা। পাশবিক বলের দ্বারা পুরুষ তাহার দাবী মিটাইতে চাহিত, নারীকে সে জানিত তাহার ইন্দ্রিয়-ভোগের একমাত্র উপাদান। তাহার পর ধীরে ধীরে সমাজের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সে নারীকে লইয়া ঘর বাঁধিল, তাহাকে নিজের পাশে রাখিল, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল। বিবাহ করিয়া মর্য্যাদা দান করিল। তাহার সন্তানসন্ততি সামান্য সংসার হইতে বিরাট জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিল।

তখন নারীর কর্ত্তব্য ছিল সন্তানকে লালন-পালন করা, ঘর বাঁধা এবং গৃহের আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন করা। পুরুষের সহিত মাঝে মাঝে শিকারেও সে বাহির হইত কিন্তু নিজে শিকার করিত না; তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সহকারিণী রূপে পাশে পাশে থাকিত। বাহিরের সকল কাজই করিত পুরুষ আর গৃহের কল্যাণে নিযুক্ত থাকিত নারী। জাতির বৃদ্ধির সহিত মানুষের কাজের পরিমাণও বাড়িয়া গেল, শুধু শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও তাহাকে কৃষিকর্ম্ম শিখিতে হইল। নারী বীজ বপন করিত, শস্য আহরণ করিত, পুরুষ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইত। সভ্যতার সেই প্রথম সূর্য্যালোকে নারীর অধিকার অতি অস্পষ্ট ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তখন নারীকে লইয়া পুরুষ ইচ্ছা করিলে যাহা খুসী করিতে পারিত, তাহার জীবনের সুখ শান্তি মাত্র তাহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা রাখিত। কোন অবিচারের কৈফিয়তের জন্য সেই যুগের বর্ব্বর মানুষ কাহারও নিকট দায়ী থাকিত না।

তাহার পর আসিল এক গৌরবময় যুগ যখন পুরুষ নারীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিতে লাগিল, পূজা করিতে লাগিল, তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। নারী যে পুরুষের জীবন ভরিয়া আছে এ শিক্ষা সে তখন পাইয়াছে, সংসারে যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাঁহার অভাব যে কত বড় তাহা অন্তরে অন্তরে তখন পুরুষ বুঝিতে পারিল। বহুকাল বিস্মৃত বৈদিক যুগের শ্যাম তপোবনের অন্তরাল হইতে এখনও নারীকণ্ঠের বেদধ্বনি যেন ভারতবর্ষের বুকে ধ্বনিত হইয়া উঠে। জগতের আদিম সভ্যতার এই বিশিষ্ট কেন্দ্রে তখন নারী যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বর্ত্তমান কালে দুর্ল্লভ। নিজের শক্তিবলে নারী আপনার আসন সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং পুরুষ তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিতে পারে নাই, কিন্তু যেদিন নারী তাঁহার সেই শক্তির চর্চ্চা করিতে

অবহেলা করিয়াছেন সেইদিনই তাঁহাকে সে অধিকার হারাইতে হইয়াছে।

শুধু এদেশের নারীদের মধ্যেই যে প্রগতি আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নয়,খৃষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইজিপ্টে, হিব্রু জাতির মধ্যে নারীদের প্রগতি কি ভাবে সুরু হইয়াছিল তাহাও ঐতিহাসিকদিগের নিকট অজ্ঞাত নয়। খৃঃ পূর্ব্ব ১২শ শতাব্দীতে এফ্রায়েম্ পর্ব্বতে ডিবোরা (Deborah) বলিয়া এক মহিমময়ী নারীর পরিচয় আমরা পাই—সমস্ত হিব্রু জাতি তাঁহাকে মাতার মত ভক্তি করিত এবং বিশ্বাস করিত যে ইস্রাইলের সন্তানদের তিনি জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার কাছে বিচারের জন্য, পরামর্শের জন্য উপস্থিত হইত। তাহা ছাড়া হিব্রু জাতির মধ্যে নারী শাসন-কর্ত্রী, বিচার-কর্ত্রী এবং যোদ্ধারও অভাব ছিল না।

প্রাচীন আরবের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে মুসলমান নারীরাও পুরুষের সহিত সমান শিক্ষা লাভ করিতেন এবং পুরুষের ন্যায় তাঁহাদের অধিকারও অনেক বিষয়ে একই ছিল। পর্দ্দা-প্রথার পর্য্যন্ত প্রচলন ছিল না। মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী খাদিজা সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তাঁহার স্বামীর অনুগমন করিতেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী আয়েষা কামাল যুদ্ধে স্বয়ং অবতীর্ণা হইতে পশ্চাদ্-পদ হন নাই। রাজনৈতিক আলোচনায় তাঁহার কন্যা ফতিমা যোগদান করিতেন এবং নিজ প্রতিভাবলে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্রী জৈনাব বাহিরে ও ঘরে সর্ব্বত্র আপন ক্ষমতাবলে প্রভূত সম্মানের অধিকারিণী হইয়া-ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু মহিলাদের শিক্ষার দিক দিয়া যেমন অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল ঠিক সেইরূপই উন্নতি হইয়াছিল মুসলমান মহিলাদের। তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছেন, শিক্ষা বিতরণ করিয়াছেন, দর্শন ও রাজনীতির কঠিন মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—কোন দিক দিয়াই তাঁহাদের অবস্থা অনুন্নত ছিল না।

সুলতান প্রথম বায়াজিদের রাজত্বকালে মহিলারা স্ত্রী-পুরুষকে একত্র শিক্ষা দিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে মসজিদে গিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন ইতিহাস তাহারও প্রমাণ দেয়।

৯২১ খৃঃ অব্দে যখন মুসলমান প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছিল সে সময়েও আমরা দেখিতে পাই যে বাইজা-ণ্টাইন যুদ্ধে সুলতান মনসুরের দুইটি ভগ্নী পুরুষের সহিত যুদ্ধে যাইতেছেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে কবি ও বিদুষী মহিলার অভাব ছিল না। আরব মহিলারাও অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে কখনও কাতর হইয়া পড়েন নাই।

বেবি জনি, মাত্র ৭ মাস।

হারুণ-অল্-রসিদের সহধর্ম্মিণী সম্রাজ্ঞী জুবিদা অসামান্য কবিত্বসম্পদের অধিকারিণী ছিলেন এবং নিজব্যয়ে মক্কায় জল সরবরাহের জন্য বিরাট খাল কাটিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়ার পুনর্গঠন করিয়া তাঁহার দানখ্যাতিকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে যতদিন না তাঁহাদের জাতির উপর বিদেশী তাতার দস্যুদের আক্রমণ সুরু হয় ও পরস্পরের মধ্যে বংশ ও ধর্ম্ম লইয়া বিচ্ছেদ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমান মহিলারা অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু যেদিন হইতে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধই একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল সেদিন হইতেই মুসলমান নারীদের সকল উন্নতির উপর যবনিকাপাত হইয়া গেল।

প্রাচীন ঈজিপ্টেও নারীর যথেষ্ট সম্মান ও কর্ত্তৃত্ব ছিল। রাজসিংহাসনে বসিবার অধিকার ও রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা যেমন তাঁহাদের ছিল তেমনি শিক্ষা প্রভৃতি অপর বিষয়েও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব হয় নাই। এমন কি ঈজিপ্টের প্রাচীন ধর্ম্ম-ইতিহাসে নারী-পুরোহিতেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাবে গ্রীসে রাণী পেনীলোপী, এণ্ড্রোম্যাকী, ক্লিটেম্নেস্ট্রা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাদের কার্য্যকলাপ অতীতের মহিলা

প্রগতির যে গৌরবময় সাক্ষ্য দিতেছে তাহা ভুলিবার নহে। গ্রীস, রোম, ঈজিপ্ট, ব্রিটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, চীন, আরব ও ভারতবর্ষ প্রত্যেক জাতির নারীসমাজ একদিন সর্ব্ব দিক দিয়া জগতকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটা সচেতনতা ছিল—তাঁহারা যে নারী

বেবি ভ্যালেরি, মাত্র ৬ মাস।

একথা প্রগতির যুগেও ভুলেন নাই। নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে তাঁহারা চিরকাল পূজা করিয়া গিয়াছেন।

শিশু-মৃত্যু

জন্ম দিয়াই পিতামাতার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। যাহাকে আবাহন করিয়া আনিলাম তাহাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি তাহা হইলে নিজেদের যে কতখানি পাপের ভাগী হইতে হয় এবং কি ভীষণ অপরাধ হইয়া থাকে তাহা যদি সকলে বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে জাতির ভবিষ্যৎ আশার সম্পদগুলি অঙ্কুরিত হইয়াই বোধ হয় এই ভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইত না।

আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যু যে কিরূপ দ্রুত গতিতে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার প্রতিকারের উপায় কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়—এবং আমাদের মত এ বিষয়ে এতখানি ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য বোধ হয় সভ্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে শিশুমৃত্যুর যে হার সরকারী রিপোর্টে বাহির হইয়াছিল তাহার বিবরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। সকল দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষ শিশু-মৃত্যুতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৯২৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে এক বৎসরের শিশুদের মৃত্যু ২৬১। সেই তুলনায় অপর সমস্ত দেশ শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা যে কতখানি হ্রাস করিয়া আনিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

আমরা নিজেরা খাইতে পাই না এবং শিশু পুত্রদের ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি না বলিয়াই যে শুধু দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া থাকে তাহা নয়, আসল কথা আমরা আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি সংসারে পাঠাইয়াছেন তিনিই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া অলসতার মাত্রাকে আমরা বাড়াইয়া চলি, ফলে আমাদের কাছে তিনি যাহাকে পাঠান তাহাকে আবার নিজের কোলে টানিয়া লন।

শিশু-মৃত্যুর জন্য পিতা ও মাতার দায়িত্ব সমান কিন্তু মায়েদের নিকট হইতে সে যথেষ্ট যত্ন পাইবার ভরসা রাখে বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে এ বিষয় অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুকে কি ভাবে রাখিতে হইবে এবং কি ভাবে যত্ন লইলে তাহারা নয়নানন্দকর হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সে বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। মাত্র মায়ের যত্নে কয়েকটি শিশু কিরূপ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়াছে এ সংখ্যায় তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

বেবি জোয়ান, বয়স ৮ মাস।

[চিস্‌উইক্‌ শিশু-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে একশত শিশুর মধ্যে প্রথম বিবেচিত হইয়া রৌপ্যকাপ লাভ করিয়াছে]

টোট্‌কা-সংগ্রহ

<u>মূর্চ্ছারোগের ঔষধ</u>:—বাদশাই কল্যাণীর শিকড় সিকি তোলা, কাল গোলমরিচ ২।০টা বেশ ভাল করিয়া শিলায় পিষিয়া লইয়া স্নানের পর খাইলে উক্ত রোগ আর কখনও হইবে না। অনেকে নাকি ইহা ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন।

বিষম জ্বর :—শ্বেত পাপড়া ও শিউলি পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে বিষম জ্বর ভাল হয়।

মাথাধরা :—আদা ছেঁচিয়া মাথার রগে দিলে মাথাধরা সারিতে পারে।

দাঁতের পোকা :—বড় পানার মূল ও কর্পূর বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাঁতের পোকা মরিয়া যায়।

হিক্কার ঔষধ :—অতি দুর্ব্বল রোগী যখন হিক্কা তুলিতে থাকে তখন সকলেরই ভয় হয়। সাধারণতঃ হিক্কার সময় কচি তালশাঁসের জল বা ডাবের জল খাওয়াইয়া উপকার পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আর একটি ভাল ঔষধ আছে। পাকা চালতা, অভাবে কাঁচা চালতার উপরটা ছাড়াইয়া ভিতরে যে ফুলের মত বস্তু থাকে তাহার ভিতর হইতে যতটা আঠা পাওয়া সম্ভব তাহা বাহির করিতে হইবে। তাহার পর ঐ আঠার পরিমাণের অর্দ্ধেক কাশীর চিনি বা পরিষ্কার চিনি উক্ত আঠার সহিত ভাল করিয়া ফেনাইয়া একটি পাথর-বাটীতে রাখিয়া দিবেন। হিক্কার অবস্থা অনুসারে ৫।১০ মিনিট অন্তর একটু একটু মুখে দিয়া চুষিতে দিলে খুব কঠিন হিক্কাও সারিয়া যায়।

পালাজ্বর :—নিসিন্দা মূল হাতে বাঁধিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও পালাজ্বর ভাল হয়।

পোড়ার ঔষধ :—হঠাৎ শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে সেইস্থানে যদি তৎক্ষণাৎ লঙ্কাগাছের পাতার রস দেওয়া যায় তবে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং ফোস্কা হইবার আশঙ্কা থাকে না।

হাতের কাজ

বাজারের আসন বা কার্পেট যে মূল্যে আমরা কিনিয়া থাকি তাহার অপেক্ষা অল্প খরচে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বাড়ীতে

(১) আসনের বর্ডার।

অবসর-সময়ে এই সমস্ত আসন বা কার্পেট তৈয়ারী করিতে পারেন। শোভনতা এবং ব্যয় দুই দিক দিয়াই ইহাতে লাভের পরিমাণ বেশী, উপরন্তু গৃহশিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি আমাদের মমত্ব-বোধ আরও বেশী হওয়া স্বাভাবিক। আজ-কাল অনেক মহিলা বাড়ীতে চটের উপর পাড়ের সূতা দিয়াও চমৎকার আসন তৈয়ারী করিয়া থাকেন। যাঁহারা মোটামুটি সেলাই ব্যতীত আর কোন কিছু জানেন না কিম্বা নূতন সেলাই শিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি কার্পেট কিনিয়া কিম্বা 'চট্' লইয়া নিম্নে প্রকাশিত চিত্রের অনুরূপ কিছু বুনিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অতি সহজেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। 'ক্রস্' ভাবে বুনিয়া গেলেই এইরূপ চিত্রাদি ফুটাইয়া তুলিতে
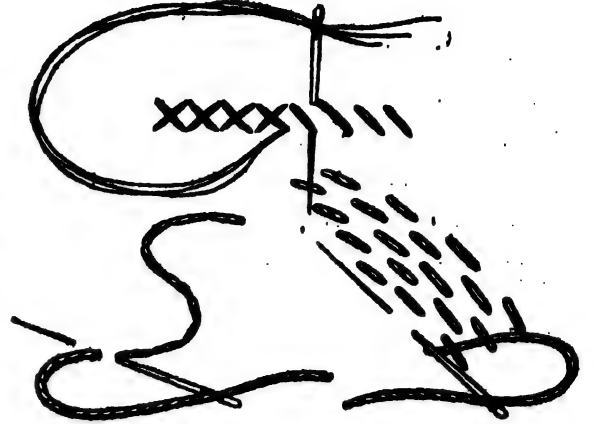
(২) কার্পেটে ক্রস্-ষ্টিচ্।

পারা যায়। ছবির যে যে লাইন গভীর, সেই রূপ গভীরতা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কাল সূতা বা পশম ব্যবহার করিবেন। অন্যান্য স্থানে ফিকা নীল ও লাল পশম বা সূতা নিজের রুচি অনুযায়ী দিতে পারেন। কি ভাবে 'ক্রস্-ষ্টিচ্' করিতে হইবে তাহা দ্বিতীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইল। প্রথম চিত্রে 'বর্ডার' রচনার ডিজাইন দেওয়া হইল ও তৃতীয় চিত্রে একটি সম্পূর্ণ ছবি দেওয়া হইল
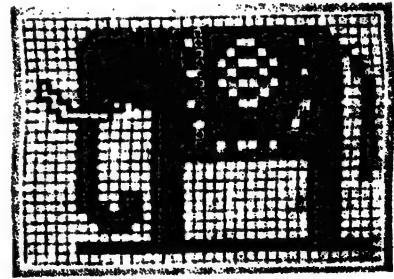
(৩) কার্পেটে বোনা হাতী।

নব-শিক্ষার্থীরা এই ভাবে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রাদি রচনা করিতে পারেন। চটের বা কার্পেটের ঘর বুনিয়া বুনিয়া যাহার উপর বুনিবেন তাহার আয়তন অনুযায়ী বুনিবার ঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিয়া লইবেন।

সৃষ্টিরহস্য

আলেকসান্দ্রা নগরীর ক্লডিয়াস টলেমিয়াস অনুমান ১৫০ খৃঃ অব্দে, বর্ত্তমানে গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকামণ্ডলী বলিয়া অভিহিত ঘূর্ণ্যমান পদার্থগুলি, অসীম শূন্যে ছোট বড় বুদ্বুদ-গোলকের ন্যায় আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া বারম্বার প্রদক্ষিণ করিতেছে, স্পষ্ট ভাষায় ইহা প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীকদর্শনে সূর্য্যই বিশ্বব্যাপারের কেন্দ্রস্বরূপ এই ধরণের অস্পষ্ট মতবাদের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী ব্যাপিয়া

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জন্মদাতা—
পোলাণ্ডের নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)।

টলেমিয়াস-এর ভ্রান্ত মতই পাশ্চাত্য মনস্বীরা মানিয়া চলিয়াছেন। সুবৃহৎ পৃথিবী নীলাকাশের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান —অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চন্দ্র, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, সূর্য্য, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; সর্ব্বশেষে তারকা-স্তর, অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণবলয় যেন। সেদিনকার মানুষের কল্পনা ইহার বেশী অগ্রসর হয় নাই।

কুসা নগরীর নিকোলাস অনুমান ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত মতবাদে সর্ব্বপ্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সন্দেহ মাত্র; নিকোলাসের কল্পনায় গ্রহ-উপগ্রহের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট রূপ ছিল না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোলাণ্ডে নিকোলাস কোপারনিকাসের জন্ম (১৪৭৩খৃঃ) ও ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অধুনা যে জ্যোতির্বিদ্যা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচলিত নিকোলাস কোপারনিকাসের মস্তিষ্কে তাহার উদ্ভব—তিনিই আদিগুরু। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী শুক্র বুধ মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে ঘুরিতেছে, কোপারনিকাস ইহা শুধু অনুমান করেন নাই, তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থে তিনি সূর্য্য ও তাহার গ্রহগণের ভ্রমণপথের যে চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তাহা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; উরেনাস ও নেপচুন শুধু তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

তারপর, আসিলেন পিসা নগরীর গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪—১৬৪২)—কোপারনিকাসের মৃত্যুর এক শতাব্দীরও অধিক পরে। কোপারনিকাসের তত্ত্ব গ্যালিলিওর অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা কঠোর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল; যাহা কল্পনা-লোকের বস্তু ছিল তাহাই গ্যালিলিওর ধ্যানে মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হইল—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারে মানুষ যেন তৃতীয় নেত্রের অধিকারী হইল।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের সৌরমণ্ডলের মত বিভিন্ন মণ্ডলীর গতি-পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে এইরূপ আশা মনে জাগিয়াছিল। আমরা ইহাও কল্পনা করিয়াছিলাম যে এই সকল মণ্ডলী বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে—আমাদের সৌরমণ্ডলের জন্মক্ষণেই একত্রে সবগুলির উদ্ভব হয় নাই। কোনটি আমাদের অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ, কোনটি বা তরুণ। বিভিন্ন বয়সের এই সকল গ্রহ-উপগ্রহের নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাদের এবং আকাশমার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর মনে হইয়াছিল—আমাদের

এই প্রাচীন পৃথিবীর জন্মকাহিনীও আমরা আয়ত্ত করিতে পারিব এইরূপ ভাবিয়াছিলাম।

কিন্তু আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত, জ্যোতির্লোকের রহস্য-সন্ধানী বিবিধ যন্ত্র আবিষ্কারের পরও আমাদের এই আশা
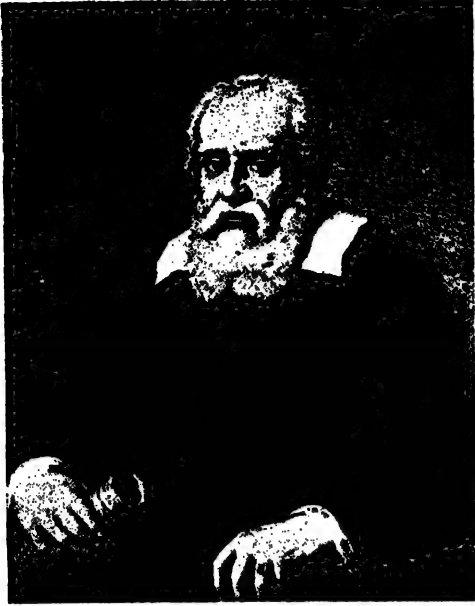
দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কারক—
পিসার গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪-১৬৪২)।

সফল হয় নাই। যে সকল গ্রহ-উপগ্রহ আমরা দূরবীক্ষণর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি তাহারা সকলেই আমাদের এই সৌর-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূ্ক্ত এবং ক্রমশঃ ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে এই গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের জন্মক্ষণ এক; আকারের পরিমাণ যাহার যেমন হউক বয়স সকলেরই সমান। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বা তরুণ গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইতে হইলে অন্য সৌরমণ্ডলের সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সৌর-মণ্ডলের নিকটতম সৌরমণ্ডল যেটি, গ্রহ-উপগ্রহ সমেত সেটিও আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণে আলোক-বিন্দুর মত প্রতীয়মান হয়—এত দূরে তাহা অবস্থিত! এখন পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে যে নিকটতম সূর্য্যের কোনও একটি গ্রহকে আমাদের বৃহস্পতির মত বড় করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কার করা মানবের সাধ্যায়ত্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে সৃষ্টিরহস্য-সন্ধানে এই পথে অগ্রসর হওয়ার বাধা আছে—যেদিক দিয়াই আমরা যাই না কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজেদের সৌরমণ্ডলেই ফিরিয়া আসিতে হয়; ইহার বাহিরের কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ আমাদের দৃষ্টি-পথে আসে না। ইহাদের জন্মক্ষণের তারতম্য নাই বলিয়া সৃষ্টির ইতিহাস-রচনায় ইহারা সাহায্য করে নাই।

এখন একটি মাত্র প্রণালী অবশিষ্ট থাকে—নিছক গণিতশাস্ত্রের গণনা-পদ্ধতি। ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান যেখানে পরাভূত হইয়াছে সেখানে গণিত বিজ্ঞানই একমাত্র সহায়; খড়ি পাতিয়া আঁক কষা ছাড়া উপায় নাই। আকাশ-লোকে যাহাদের বিহার,অনন্ত জ্যোতির্লোকের অধিবাসী তারকা গ্রহ-উপগ্রহরাজি সকলেই এক অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী—খেয়ালমত যখন যা-খুসী করিবার, নির্দ্দিষ্ট গতিপথের একচুল বাহিরে যাইবার উপায় কাহারও নাই। মানব-রচিত পদার্থ বিজ্ঞান (Physics ও Mechanics) সেই অখণ্ড নিয়মের সন্ধান জানে। নানা স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিপাদ্য ও উপপাদ্যের সাহায্যে, অবয়বের সহিত অবয়বের আকর্ষণ বিকর্ষণের অচ্ছেদ্য বিধির বলে জ্যোতির্লোকের যে কোনও

গ্যালিলিও নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্র (আর্চেত্রিতে রক্ষিত)

একটি গোষ্ঠীর বর্ত্তমান অবস্থান ও গতিপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান বিধির অনুসরণ করিয়া এই সকল গোষ্ঠীর অতীত ও ভবিষ্যতের ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন নহে।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির যুগেও আমাদিগকে এই পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে এই পদ্ধতি

অনুসারে কিরূপে গবেষণা পরিচালিত হয় তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পিয়েরে লাপ্লাস ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে কি ভাবে ইহার সাহায্যে তাঁহার সুবিখ্যাত নীহারিকা-তত্ত্ব (**nebular hypothesis**) গড়িয়া তোলেন তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

পিয়েরে সাইমন লাপ্লাস পরবর্ত্তী জীবনে মার্কুইস ডি লাপ্লাস নামে বিখ্যাত হন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গণিত বিদ্যায় ইনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সেই তিনি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের উপর

নীহারিকা-তত্ত্বের আবিষ্কারক, পিয়েরে সাইমন লাপ্লাস।

তাঁহার গ্রন্থ ছাপাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। লাপ্লাস আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত ছিলেন না; শুধু এইটুকু মাত্র জানিতেন যে সূর্য্য উত্তাপ বিকীরণ করে এবং তাহার দেহের উপরিভাগ কঠিন হইয়া যায় নাই—তাহা এখনও বাষ্পময়। সূর্য্যকলঙ্ক ইত্যাদি নৈসর্গিক বৈচিত্র্য দেখিয়াই তিনি শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম মানিতে হইলে একথা স্বীকার করিতে হয় যে, যে-নক্ষত্র (**star**) অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণ রূপে বাষ্পময় ছিল তাহা শাশ্বত কাল অবিকৃত থাকিয়া অর্থাৎ দৈহিক কোনও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া না গিয়া বরাবর উত্তাপ ছড়াইতে পারে না। লাপ্লাসের মনে এই সমস্যার উদয় হইয়াছিল। ইহার সমাধানে তিনি এই ধারণা করিয়াছিলেন যে উত্তাপ বিকীরণ করিতে করিতে নক্ষত্রের দেহ সঙ্কুচিত হয়; আমাদের এই সূর্য্য তাঁহার মতে আয়তনে বৃহত্তর ছিল। লাপ্লাসের মতে আদিম যুগের সূর্য্য ছিল বিরাট নীহারিকারূপী বাষ্পের মেঘের মত; তাহার আয়তন ছিল বর্ত্তমান আয়তনের সহস্র গুণ।

সূর্য্যকলঙ্কের দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় সূর্য্য আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রত্যেক সাতাশ দিনে একবার আবর্ত্তন করে। লাপ্লাস অনুমান করেন যে আদিম নীহারিকারূপী সূর্য্য ইহা অপেক্ষা অনেক ধীরে আবর্ত্তন করিত। তিনি ইহাও কল্পনা করিয়াছিলেন যে সূর্য্যের ব্যাস নেপচুন গ্রহের কক্ষপথ হইতেও দীর্ঘ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রের সহজ গণনা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে যদি ওইরূপ একটি নীহারিকা ২৭ দিনে নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে একবার আবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট গতি অপেক্ষা দ্রুত আবর্ত্তিত সাইকেলের চাকা যেমন চতুর্দ্দিকে কাদামাটি ছিটাইতে থাকে, উক্ত নীহারিকার উপরের দিকের স্তরগুলিও সেইভাবে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এই তথ্য বুঝিবার জন্য কোনও গণনারই প্রয়োজন নাই কারণ আমরা জানি নেপচুন তাহার প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে আমাদের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ১৬৫ বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে—অর্থাৎ ইহার দূরত্ব সূর্য্য হইতে বরাবরই প্রায় সমান থাকে। ইহা হইতে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যদি আদিম নীহারিকারূপী সূর্য্য নেপচুনের কক্ষ হইতে দীর্ঘ ব্যাসসম্পন্ন হইয়া ১৬৫ বৎসরের অপেক্ষা অল্প সময়ে একবার আবর্ত্তিত হইত অর্থাৎ তাহার গতি যদি দ্রুততর হইত, তাহা হইলে তাহার উপরের স্তর বিচ্ছিন্ন না হইয়া পারিত না।

এই কারণেই লাপ্লাস কল্পনা করিয়াছিলেন যে আদিম নীহারিকারূপী সূর্য্যের আবর্ত্তন-গতি অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। কিন্তু গতিবিজ্ঞানের একটি অতি পরিচিত নীতি—কন্জারভেশন অব অ্যাঙ্গুলার মোমেণ্টাম (**Conservation of angular momentum**)—অনুযায়ী মানিয়া লইতে হইবে যে কোনও ঘূর্ণ্যমান বস্তু আয়তনে যত ছোট হইয়া

আসিবে তাহার গতি তত বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং লাপ্লাস কল্পনা করিলেন, যে, আদিম নীহারিকারূপী সূর্য্য বৃহত্তম আয়তন ও অপেক্ষাকৃত অল্প গতিবেগ লইয়া অনন্ত শূন্যে

অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত নীহারিকা-পুঞ্জ।

জীবন সুরু করিয়া ক্রমশঃ আয়তনে ছোট ও অধিকতর গতিবেগ সম্পন্ন হইতে হইতে, একদা এমন অবস্থায় আসে যখন তাহার ব্যাস বর্ত্তমানে নেপচুনের কক্ষপথের সমান হইয়া পড়ে ও সে ১৬৫ বৎসরে একবার নিজের মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তিত হইতে থাকে ; এই অবস্থায় ইহার বাষ্পীভূত খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া নেপচুন গ্রহের সৃষ্টি হয় এবং সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত নবজাত নেপচুন সমান ভাবে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ও নির্দ্দিষ্ট গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আজিও তেমনটি আছে।

নীহারিকারূপী সূর্য্যের বাকী অংশ দ্রুততর গতিতে আবর্ত্তিত ও ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়তন হইতে হইতে তাহার ব্যাস যখন বর্ত্তমান উরেনাস গ্রহের কক্ষপথের সমান হয় ও সে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ৮৪ বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসিবার মত গতিবেগ লাভ করে, তখন আরও খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া উরেনাস গ্রহের জন্ম হয়। লাপ্লাস এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রহের জন্ম কল্পনা করিয়া সূর্য্যের বর্ত্তমান ক্ষুদ্র আয়তন কেমন করিয়া হইল তাহা স্থির করিয়া ফেলেন।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের জ্যোতির্বিদেরা পৃথিবীর তথা অন্যান্য গ্রহের জন্ম সম্বন্ধীয় লাপ্লাসের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অসংখ্য আপত্তির মধ্যে দুইটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

এক, যদি আদিম সূর্য্যের আবর্ত্তনগতি লাপ্লাসের কল্পনা-অনুযায়ী এমন হয় যে নেপচুন উরেনাস ও অন্যান্য গ্রহ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা কনসার্ভেশন অব অ্যাঙ্গুলার মোমেণ্টাম নীতি অনুযায়ী গণনা করিয়া ফেলিতে পারি সূর্য্য সঙ্কুচিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে যে আয়তন লাভ করিয়াছে তাহার আবর্ত্তন-গতি কত হইতে পারে। গণনা অনুযায়ী যে গতি হওয়া উচিত সূর্য্যের

অদৃশ্যের আলোকচিত্র (জর্জ্জ ডব্লিউ রিচি গৃহীত)

সত্যকার আবর্ত্তন-গতি তাহার কাছাকাছিও নহে। তুলনায় এই গতি এত কম যে সূর্য্য হইতে কোনও কালে যে কোনও অংশ গতির প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা মোটেই মনে হয় না।

দুই, যে নক্ষত্র ক্রমশ সঙ্কোচনের ফলে উত্তরোত্তর অধিক গতিবেগ সম্পন্ন (আবর্ত্তন-গতি) হইতেছে জ্যোতির্বিদগণের সহিত তাহার পরিচয় আছে; ইহা গ্রহ উপগ্রহে বিভক্ত হইয়া হইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে না, কখনও দুই ভাগে ভাগ হইয়া পরস্পরকে ঘিরিয়া চিরনৃত্যশীল দুইটি স্বতন্ত্র বৃহদাকার নক্ষত্রে পরিণত হয়। এইরূপ নক্ষত্রের দৃষ্টান্তের অভাব নাই; কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত নক্ষত্র সুদূরবিচ্ছিন্ন, কখনও

অতিকায় দূরবীক্ষণ (ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট উইলসন মান-মন্দিরে রক্ষিত)

ইহারা পরস্পর এত নিকট যে মনে হয় যে ইহাদের ভাগ-বাটোয়ারা সবে সুরু হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহারা এমন অবস্থায় আছে যে মনে হয় (নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা শক্ত) যে এখনও তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয় নাই; ভবিষ্যতের ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই নক্ষত্রেরা যেন এখনও কোনও প্রকারে এক অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে।

লাপ্লাসের সিদ্ধান্ত হইতে যদিও আমরা আমাদের পৃথিবীর জন্ম-রহস্য অবগত হই না, তথাপি তিনি পৃথিবীর জন্মের যে প্রণালী কল্পনা করিয়াছেন জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা যে যুগান্তকারী তত্ত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নভোমণ্ডলের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ইহা বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। এই কল্পিত নীতি এত দূরপ্রসারী যে স্বয়ং লাপ্লাস ইহার এবম্বিধ প্রয়োগ দেখিলে বিস্মিত হইতেন। অসংখ্য নীহারিকাপুঞ্জ নিরন্তর এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতেছে যে ইহাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বজায় থাকিতেছে না, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছে। এই সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশগুলি এত বৃহৎ ও বিরাট যে গ্রহ-গোষ্ঠীর উদ্ভব না হইয়া লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে আকাশ প্রতিনিয়ত আচ্ছন্ন হইতেছে। এই পদ্ধতিতে আমাদের সূর্য্যেরও জন্ম হইয়াছিল। লাপ্লাস সন্তানের জন্ম-রহস্যের সন্ধান করিতে গিয়া নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মাতার জন্ম-সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জ হইতে কি ভাবে নক্ষত্রের উদ্ভব হয় আমরা তাহার আভাস পাইলাম। যে মহামনীষীর উর্ব্বর কল্পনায় নক্ষত্র-জন্মের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে সেই সাইমন ডি লাপ্লাসই এই কল্পনা ভবিষ্যতে জ্যোতির্লোকের 'ইতি-রচনায় কতখানি সহায়তা করিবে তাহা ভাবিতে পারেন নাই। আমাদের পৃথিবীর জন্ম-রহস্যের সন্ধান না দিলেও আমাদের সূর্য্যের জন্ম-কথা তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন। মাতার জন্ম-কথা হইতে সন্তানের জন্মকথাও প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় তাহাই আলোচিত হইবে।

আমার দুইটি নীহারিকাপুঞ্জের দূরবীক্ষণসাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। এই নীহারিকা পুঞ্জই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের আদিমতম উপাদান। এক একটি নীহারিকাপুঞ্জে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রের বীজ নিহিত আছে। ইহাদের দূরত্ব পরিধি ও আয়তন আমাদের সুদূরবর্ত্তী কল্পনারও

অগোচর। প্রথম চিত্রটিতে মাঝখানে ঘূর্ণ্যমান বাষ্পাকার নীহারিকা; আদিম রূপ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোকবিন্দু গুলির প্রত্যেকটি আমাদের সূর্য্যের চাইতেও বৃহত্তর প্রজ্জলন্ত নক্ষত্র; এই বিন্দুগুলিরই অণু পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু সময়ের পরিমাণ কে করিবে? আমাদের হিসাবে প্রাথমিক অবস্থা হইতে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হইতেই কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্রটি চিরদিন মানবের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে—মানুষ যন্ত্র-বিজ্ঞানের যত উন্নতিই করুক, এই দৃশ্য কখনও চোখে স্পষ্ট দেখিবে না—দূরবীক্ষণের সাহায্যেও নয়। এই নীহারিকাপুঞ্জ আমাদের নিকট হইতে এত দূরে বর্ত্তমান যে অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন টেলিস্কোপের সাহায্যেও ইহা অস্পষ্ট দেখা যায়। ইয়ার্ক্‌সের মানমন্দিরে অধ্যাপক জর্জ্জ ডব্লিউ রিচি তত্রস্থ সুবিখ্যাত টেলিস্কোপের সাহায্যে এই আলোক-চিত্রটি তুলিয়াছেন।

গ্যালিলিওর ক্ষুদ্র টেলিস্কোপটিই একদা সৃষ্টি-রহস্যের যবনিকা তুলিবার কাজে অদ্বিতীয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনায় গ্যালিলিওর সেই যন্ত্রই কি অলৌকিক শক্তি লইয়া দেখা দিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে বলিয়াই আমরা আজ নক্ষত্রলোককে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছি—লাপ্লাস বর্ণিত নীহরিকাপুঞ্জকেও প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ পাইতেছি। মানবের এই তৃতীয় নেত্রটি কত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে নীহারিকাপুঞ্জের এই সকল চিত্রই তাহার প্রমাণ। কালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে অবস্থিত বিশাল-কায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির প্রতিলিপি দিয়া আমরা এবার বিদায় লইলাম। সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনে এই নির্জ্জীব যন্ত্রটি যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, মানুষের ইতিহাসে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

[এই বিভাগে আমরা প্রাপ্ত পুস্তকের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং বাংলাভাষার সাময়িক পত্রিকাগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও চিত্রাদির পরিচয় দিব এইরূপ স্থির করিয়াছি। প্রত্যেক সংখ্যায় সকল পত্রিকার সকল রচনার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যে সকল রচনা ও চিত্র আমাদের বিচারবুদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইবে, যে কোনও পত্রিকাতেই সেগুলি প্রকাশিত হউক আমরা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি এবং বাংলার সমাজ-জীবনের ইতিহাসের দিক দিয়া যদি কোনও লেখা বা চিত্র নিন্দনীয় বিবেচিত হয় 'টাইপ' হিসাবে ধরিয়া আমরা সেগুলির নিন্দা করিব; কাহারও ব্যক্তিগত আদর্শ বা রুচি লইয়া এই বিভাগে কোনও আলোচনা থাকিবে না। এই সকল রচনার দিকে 'বঙ্গশ্রী'র পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য—কোনও পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সার সংকলন প্রচার করার বাসনা আমাদের নাই। আমাদের ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক, অনেক ভাল রচনা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে। অজ্ঞাত অখ্যাত পত্রিকাতেও এমন রচনা বাহির হইতে পারে যাহা সত্যই মূল্যবান, অথচ সবগুলি আমাদের নজরে নাও আসিতে পারে, এই জন্য পত্রিকা-সম্পাদকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমাদের নিকট প্রেরিত পত্রিকার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি চিহ্নিত করিয়া দেন, তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এ বিভাগটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা দিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গত সংখ্যায় এবং বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তাহা দিতে পারিলাম না। এখন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য এমন কোনও পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই যাহার সমালোচনা আমরা করিতে পারি। প্রকাশক ও লেখকের নাম ঠিকানা অথবা পুস্তকের মূল্য ও পৃষ্ঠাসংখ্যা দিয়া এই বিভাগ সুরু করিতে চাহি না। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না তেমন ভাল বহি আমাদের হস্তগত হইতেছে ততদিন পুস্তক পরিচয় দিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিব। আশা করি, অচিরকালমধ্যে এই কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিব। আর একটি কথা, কেবলমাত্র সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকের আলোচনা করিয়া এই বিভাগের কাজ আরম্ভ করা দুরূহ হইবে বিবেচনায় আমরা স্থির করিয়াছি গত বৈশাখের পর যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সকলগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে। সঃ কঃ]

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৩৯

মানুষ যে তথ্য জিহ্বাগ্রে বা লেখনীর মুখে প্রচার করে তাহার সত্য উপলব্ধি যদি তাহার জীবনেও হয়, তখনই তাহার তথ্য প্রচার করার সত্যকার দাবী জন্মে। বহু কৌশলী মানব যুগে যুগে কথার উপর কথা গাঁথিয়া আর পাঁচজন মানুষকে ভুলাইতে চাহিয়াছে। নিজে যে পথ তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই, অন্তকে সেই পথের সন্ধান দিবার ব্যর্থ চেষ্টাও হয়তো এই সকল কথায় আবরণে লুকাইয়া আছে, কিন্তু মানুষ তাহাদের স্মরণে রাখে নাই। মানবের ইতিহাসে তাঁহাদেরই অক্ষয় আসন; জীবনের গভীরতম উপলব্ধি দিয়া যাঁহারা বাণী রচনা করিয়া আর পাঁচজনকে শুনাইয়াছেন। তাঁহারা ঋষি।

শুধু সাধকের বাণী নয়, কবির কাব্যও তো মানুষকে পথ দেখাইয়াছে অথচ কবির সাধনা আমাদের গোচর নহে! ইহার কারণ এই যে কবি যখন সত্যকার কাব্য রচনা করেন তখন তিনি আত্মবিস্মৃত; কবি-ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে কোনও অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে দিয়া কথা বলাইয়া লন—আমরা ইহাকে ঐশী প্রেরণা বলি। যে নামই ইহার দিই, সত্য কবি যিনি কাব্য-রচনাকালে তিনি দ্রষ্টা, তিনিও ঋষি, কাব্য-রচনার মুহূর্ত্তে তাঁহার উপলব্ধি সত্যকার উপলব্ধি—সাধকের সাধনালব্ধ বাণী হইতে কবির কাব্য তখন পৃথক নয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই প্রচারক রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক: প্রচারক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী শোনান তাহা তাঁহার জাগ্রত মনের বাণী, নিখুঁত বিচারের নিক্তিতে ওজন করা কথা; সারা জীবনের শিক্ষা ও সংস্কারের চাপে তাঁহার কবি-মন তখন পণ্ডিত, প্রচারক রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন না। ইঁহার সহিত কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিরোধ আছে।

বড়দিন—প্রচারক রবীন্দ্রনাথের বাণী, খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতা। পূজা-অনুষ্ঠান, স্তব-নৈবেদ্যের বিরুদ্ধে সংস্কারভীত রবীন্দ্র নাথের যুক্তিপূর্ণ অভিযোগ। মানুষ কেন দেবতাকে অথবা অন্ত মানুষকে দেবতার আসনে বসাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট কালে অথবা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূজা অর্চনা করিয়া তৃপ্তি পায়, ব্রাহ্ম-সমাজের গণ্ডীর ভিতরকার মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি তাই বলেন, "জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।" ব্যর্থতা সন্দেহ নাই অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বক্তৃতা দিয়া, কথা দিয়া সেই কার্য্য করিয়াছেন।

বক্তৃতার শেষ অংশে খৃষ্টের জীবনের আদর্শের সহিত বর্ত্তমান যুগের খৃষ্ট-পন্থীদের কার্যাকলাপের বিরোধের কথা বলা হইয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির জীবনের আদর্শ তাঁহার তথাকথিত ভক্ত অনুচরদের দ্বারা এই ভাবেই লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে; মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে; তবু সেই লাঞ্ছনার মধ্যেই তাঁহাদের সান্ত্বনা এবং এই ট্র্যাজেডীই পৃথিবীকে মহৎ ও সুন্দর করিয়াছে। খৃষ্ট তাঁহার পরবর্ত্তীদের জন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই—সেই যুগের প্রয়োজনেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

"দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করচে, তারাই কামানের গর্জ্জনে তাঁকে অস্বীকার করচে; আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করচে।" যাহারা আজ এই সব করিতেছে তাহাদের কাছেও খৃষ্ট যেমন সত্য নয়, শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে ম্যালেরিয়া-পীড়িত অন্নবস্ত্রহীন দুস্থ বাঙালী সন্তানের কাছেও তিনি তেমনই সত্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবেন না। বাঁচিয়া এবং মরিয়া খৃষ্ট সার্থক হইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর আবেষ্টনীতে তাঁহাকে আবাহন করিয়া আনিলেও তিনি অধিকতর সার্থক হইবেন না।

হিন্দুর অধঃপতন যে হইয়াছে সে বিষয়ে কোনও হিন্দুরই আর কোনও সংশয় নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ঐতিহাসিক 'পাথুরে' প্রমাণ দিয়া হিন্দু যে বর্ত্তমানে সত্য সত্যই অধঃপতিত তাহা দেখাইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি হতাশ নহেন। আদর্শবিচ্যুত অধঃপতিত জাতির সাহিত্যে এই ধরণের প্রবন্ধ যত অধিক প্রকাশিত হয় জাতির ততই মঙ্গল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ তাঁহাদের ভাস্কর্য্যে ও মূর্ত্তিতে প্রকট; তাঁহারা কোন যুগে কি ছিলেন তাহা আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—এইগুলি লইয়া আলোচনা করিতে করিতেই হয়তো আবার আমরা বাঁচিয়া উঠিব। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় বলিতেছেন—

"রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অধঃপতনের একমাত্র নিদর্শন নহে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা অনেক সময় যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মত আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করে।... জাতীয় চরিত্রের অবনতিই জাতীয় অধঃপতনের প্রধান নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আকস্মিক ঘটনার স্থায়ী ফল জাতীয় চরিত্রের অবনতি সূচিত করে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে ঘোরের মুইজুদ্দীন মোহম্মদ সাম এবং তাঁহার সেনানায়কগণ কর্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইয়াছিল। তারপর সাতশত বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরা আর কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। অথচ তাহার পূর্ব্বে গ্রীক্ বিজয়ের পরে, শক-কুষাণ বিজয়ের পরে, হুন বিজয়ের পরে, হিন্দুরা পুনঃ পুনঃ প্রবল রাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দে মুসলমান বিজয়ের পরে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা চতুর্দ্দশ শতাব্দে কর্ণাটে বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদিগের চরিত্রেরও যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

চন্দ মহাশয়, মুসলমান বিজয়কেই ইহার কারণ মনে করেন না কারণ মুসলমান বিজয়ের অনেক পরে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মতে অধঃপতনের দুইটি কারণ এই—

(১) "প্রাচীন মন্দিরের এবং প্রতিমার নির্ম্মাতা এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের বংশলোপ অথবা (২) বর্ব্বর জাতির শোণিতের মিশ্রণের ফলে হিন্দু চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন।"

প্রবন্ধটি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। চন্দ মহাশয় প্রবন্ধের শেষে কি করিয়া হিন্দু আবার জাগিতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মূল কথা এই—

"আমার মনে হয়, এদেশে যদি প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, নগরে নগরে যদি ধ্যানমগ্ন প্রতিমা অলঙ্কৃত অভ্রভেদী মনোরম শিখরযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে বোধ হয় জনসাধারণের মনে ধ্যানধারণার প্রবৃত্তি এবং শক্তি ক্রমশঃ পুনরায় জাগিয়া উঠিবে।"

এই প্রবন্ধটিই এই সংখ্যার প্রবাসীর গৌরব।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাউল অসমাপ্ত প্রবন্ধ। 'চণ্ডীদাস বলিয়াছেন' বলিয়া যে যে পদ অধ্যাপক মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখিতেছি তাহার প্রত্যেকটিই সহজিয়া-সাধক দীন চণ্ডীদাসের পদ। সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রবাসীতে লেখা প্রবন্ধ হইলেও অধ্যাপক মহাশয় এ বিষয়ে আর একটু অবহিত হইলে ভাল হইত। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন বলিলেই আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাসের কথা মনে করি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পারঙ্গম বলিয়াই একথা বলিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের নবযুগ-এ সেই চিরপুরাতন কথা—এ দেশের লোক মানুষের সত্যকার সেবা ভুলিয়া আচার নিষ্ঠা লইয়া পাগল; পথের ধারে মানুষ অনাহারে মরিতেছে তাহাকে না বাঁচাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া ইঁহারা পুণ্যলাভ করিতে চায়। পড়িয়া অনেক কথাই মনে পড়ে, দেশের লোক যখন দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রপীড়িত তখন কাহার অপব্যয়ের তালিকা কত দীর্ঘ হিসাব করিয়া বলিবার লোক নাই।

"মানুষকে মানুষ ব'লে দেখতে না পারার মতো এত বড় সর্ব্বনেশে অন্ধতা আর নেই।" একথা সত্য কিন্তু 'মানুষকে' বলিতে দেশের মানুষকে বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।

বাঙ্গালা টাইপ ও কেস—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় বিভিন্ন প্রকারের টাইপ সংখ্যা মোট ৫৬৩; ইঁহার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কোন্ গুলিকে রাখিয়া কোন্ গুলিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায় অজরবাবু তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

ভবানন্দের "হরিবংশ"—৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্পাদিত এই নামীয় গ্রন্থখানির সমালোচনা হইলেও শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অনেক মূল্যবান কথার অবতারণা করিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা এই প্রবন্ধের বিচার-পদ্ধতি অনুধাবন করিলে উপকৃত হইবেন।

ভারতবর্ষ—মাঘ, ১৩৩৯

ভারতবর্ষের এই সংখ্যাটিকে ভ্রমণ-কাহিনী সংখ্যা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ভারতবর্ষের সুবিপুল অবয়ব এবার নানা মতলবের ও ধরণের যাত্রীর পদচিহ্নে আপাদমস্তক লাঞ্ছিত—কিন্তু সবকটি বৃত্তান্তেরই বিশেষত্ব এই, যে, যাত্রীদের আসল মতলব প্রত্যেকটিতেই গোপন আছে।

প্রথমেই অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের শান্তির দেশ—ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন—কবিতা বলিয়াই হয় তো। 'নিশ্চুপ' 'নির্জ্জন' 'নির্ম্মম' 'নিগুণ' দেখিয়া যদি বা দেশটার একটা ছবি মনে জাগিয়াছিল হঠাৎ

"কেগো আছ! কোথা আছ? আছ ঈশ্বর?"

পড়িয়া নিরস্ত হইলাম। শান্তির দেশ হইলেও দেশটা সন্দেহজনক।

তারপর, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্যারিসের দেখা-শোনা করিয়াছেন; "কন্যা অমলা (অপরাজিতা)"র 'একটু ফরাসী শিখে' নেওয়ার কথা আছে, লেমনেড খাওয়ার কথা আছে, অনেক ছবিও আছে।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল একটু ভুল পথে গিয়া পড়িয়াছেন—মহাপ্রস্থানের পথে যাওয়ার সময় তাঁহার এখনও হয় নাই। মহাপ্রস্থানের পথের সমালোচনা ওই লেখার মধ্যেই আছে, এই যা ভরসা।

"কুকুরের মাথায় হঠাৎ লাঠি মারলে সে যেমন ওলোট পালট খেয়ে পাগলের মত অল্প একটুখানি জায়গায় মধ্যে ঘুরতে থাকে......" লেখকও তেমনই অল্প জায়গার মধ্যেই ঘুরিয়াছেন। অধিকন্তু—

"এদেশে নারী যেদিন আত্মপ্রতিষ্ঠায় সবল হয়ে উঠবে, সেদিন তাদের আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাবো।" পড়িয়া ভারতবর্ষের লোকেরা নারীপ্রগতির বিরোধী কেন বুঝিলাম।

শ্রীনিরুপমা দেবীর তীর্থকামীর পত্র—ক্রমশঃ।

তারপর ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহার দক্ষিণাপথ ছবিতে-ফুটনোটে সুখপাঠ্য। এবং সর্ব্বশেষ কিন্তু নিরেস নহে শ্রীনরেন্দ্র দেবের অতীতের ঐশ্বর্য্য মেক্সিকোর বিবরণী। 'সত্য সেলুকস কি বিচিত্র এই দেশ' বলিয়া সুরু করিয়া "মায়ার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় হিন্দু ছিলেন" বলিয়া শেষ।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়ের মনের স্বাস্থ্য যে সময়োপযোগী হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ—শ্রীগিরিজাকুমার বসুর কারণ-এ আছে। প্রথমে আধো আধো কথা 'চিটি' 'কোরেছ' প্রভৃতি দিয়া আরম্ভ করিয়া হঠাৎ

'তোমারে জানাতে চাই, হইনিকো অসতর্ক
মোর সেই ত্রুটি
একেবারে ইচ্ছাকৃত, গভীর চিন্তার ফল
ত্যজিও ভ্রুকুটি।'

ইত্যাদি বলিয়া 'প্রিয়তমা'কে ভয় দেখাইয়া কবি আমাদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছেন।

প্রবন্ধ আছে তিনটি। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত চণ্ডীদাস সমস্যা; শ্রীমন্মথনাথ বসু লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালার শাসন-বিভাগ ও শ্রীজগৎমোহন সেনের উৎকলের প্রাচীন কাব্যসম্পদ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি মাঘ সংখ্যা প্রবাসীর লেখক অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপকারে আসিবে। প্রবন্ধলেখকগণ সবিস্তারে প্রমাণ করিয়াছেন যে চণ্ডীদাস নামের অন্ততঃপক্ষে তিনজন পদকর্ত্তা ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা সর্ব্বপ্রাচীন; ইঁহার পদাবলীও আছে এবং দীন চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক চণ্ডীদাস।

আলাবক্স অঙ্কিত দূর-পথের যাত্রী চিত্রখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বিচিত্রা—মাঘ, ১৩৩৯

ঘনবসতিপূর্ণ শ্যামবাজার অঞ্চলে যদি দুইজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বিঘা পাঁচেক করিয়া জমি লইয়া হঠাৎ বাগানবাড়ী করিয়া বসেন, তাহা হইলে অধুনা অধিষ্ঠিত দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই লইয়া যে দুর্দ্দশা হয়, বিচিত্রায় মধ্যবিত্ত গরীব লেখকদের সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রবল প্রতাপে জাঁকিয়া বসিয়াছেন, বাকী জায়গাটুকুতে শ্রীমতী আশালতা দেবী, লীলাময় রায় ও পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছেন। কম্যুনিজ্‌ম—না, বলশেভিজ্‌ম কি ইজ্‌ম জানি না—কিন্তু একটা কিছুর আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি।

শরৎ বাবু নিজের মাপকাঠির মাপেই একটু বেশী জায়গা লইয়াছেন তবে তাঁহার মাপকাঠিটি ছোট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন—দুই বোন, পারস্যভ্রমণ, নূতন, আশীর্ব্বাদ এবং সামাজিক বিচার; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ—'রেখার মায়ায়' রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, মহামানব রবীন্দ্রনাথ—শ্রীসুখরঞ্জন রায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠান—শ্রীসতীশ রায়, এতদ্ব্যতীত 'অর্থনীতির ধারা'তে (ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ) রবীন্দ্রনাথ, আবার নানা কথায় রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধের মধ্যে শুধু ভ্রাতৃবিরোধে আওরংজীব প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের উপর নয়।

রবীন্দ্রনাথ এবার তাঁহার দুই বোনে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বের এক লাইন সমালোচনা করিয়াছেন; তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, সুতরাং আমরা আন্দাজে বুঝিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,

"মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।"

আশীর্ব্বাদ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কান বাদ দিয়াছেন বলিলে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইতে পারে সুতরাং চার লাইন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের উপর পড়িবার ভার দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

"তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব সমারোহে। সেই মতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।"

রবীন্দ্রনাথের ছবির সহিত কোন্ কোন্ বস্তুর তুলনা পাঠক দিতে পারেন? শেলী স্কাইলার্কের সহিত অনেক কিছুরই তুলনা করিয়াছেন কিন্তু শেলী শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী নন, 'রেখার মায়ায়' রবীন্দ্রনাথ-এ তিনি বলিতেছেন—

"তাঁর চির-সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের একটা বিশেষ প্রকাশ হয়েছে এগুলির মাঝ দিয়ে; আর দ্বিতীয় বিভাগে পাওয়া যায় তাঁর চিরানন্দময় প্রাণের, চিরন্তনী সবুজ প্রাণ-বীথির মাধবী মঞ্জরীর একটি দরদ-ভরা মঞ্জু কাকলী!"

শুধু তাই নয়—"এরা 'নিস্নাকের বাণীর' পরিপূর্ণ, মুখর আশীর্ব্বাদ।" কাত্যায়ন পাশে থাকিলে বলিতাম, কাত্যায়ন, নাড়ী দেখতে জান?

এই প্রবন্ধের শেষ মার ওস্তাদের মারের মত সমাপ্তিতে নিহিত। রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া লেখক বলিতেছেন—

"হে আমার অন্তরতম সুদূর!

তোমায় আমি বুঝেছি বল্‌লেও ভুল বলি', বুঝি নাই বললেও মিছে বলি!

চির রহস্যের দেবতা আমার, অন্তরের সবটুকু মৌনতার শান্ত প্রকাশে তোমায় অভিনন্দিত করি!"

'খুব করি' লিখিলেই ঠিক ভাবটি প্রকাশ পাইত!

মহামানব রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে শ্রীসুখরঞ্জন রায় বলিতেছেন, 'বাংলার আত্মশক্তির ও আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভের' একমাত্র পথ রবীন্দ্রনাথকে পড়া, বোঝা এবং সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে রবীন্দ্র-পরিষদ স্থাপিত করা।

দেখিতেছি, মহাত্মা গান্ধী বাংলার জন্য বৃথাই ভাবিয়া মরিতেছেন।

সম্ভবতঃ বিচিত্রার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচকের নাম জানিতে পারিলেই গোল চুকিয়া যাইত, প্রবন্ধে প্রবন্ধে এমন করিয়া ঘুরপাক খাইয়া মরিতে হইত না।

অনেকটা মীমাংসা করিয়া আনিয়াছেন শ্রীমতী আশালতা দেবী। আশঙ্কায় তিনি বলিতেছেন—

"এখানে ঘন ঘোর বর্ষা পড়েচে। তুমি ভাবচ আমি কি করছি, হয়ত মেঘ দেখে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' খুলে বসেচি। কিন্তু তা নয়। ফ্রেঞ্চের কঞ্জুগেসন্ মুখস্থ করছি।"

অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, দেখিতেছি আমাদিগকেও ফ্রেঞ্চের কঞ্জুগেশন মুখস্থ সুরু করিতে হইবে।

মাঘের বিচিত্রায় এতদুপরি শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের য়ুরোপীয়ানা ও শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের আমারে ভাসিয়ে নাও আছে। দুইটি রচনাতেই দুইটি বিশেষ খবর আছে; কান্তি বাবু বলিতেছেন—"ইংলণ্ডের পুরুষশ্রেণী গুম্ফশশ্রু (sic.) বিবর্জ্জিত। কিন্তু সেই গুম্ফশশ্রু (sic.) এখন আশ্রয় নিয়েছে নারীর কোমল মুখমণ্ডলে।"

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কিন্তু এখনও বর্ত্তমান!

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন—

"আমারে ভাসিয়ে নাও, ভাসিয়ে নাও, ভাসিয়ে নাও।
... ...
হে নীরদ ... ...
... ...
লয়ে যাও অচিন দেশে,
... ...
মাতিয়ে দাও,
... ...
খুব দোলাও।"

ঘটনা নূতন প্রকাশিত হইলেও পুরাতন।

মাসিক বসুমতী—পৌষ, ১৩৩৯

একটি ব্রীড়াবনতা স্থূলাঙ্গী যুবতীর হাতে একটি গোলাপ ফুল (সম্ভবতঃ কাগজের)—নীচে নাম লেখা 'গোলাপের কাঁটা' এবং তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িত এক বৃদ্ধ, কোমর অবধি বালাপোষ দিয়া ঢাকা, পাশে কল্‌কি ও নলশোভিত একটি গড়গড়া, নীচে লেখা 'যৌবনের স্বপ্ন'—ইহাই বসুমতী। যাঁহারা ছবি দেখা পছন্দ করেন না তাঁহারা কবিতা পড়িতে পারেন—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মুক্তিবাধন। ফল একই পাইবেন।

কবিতাটির প্রথম পংক্তি এইরূপ—

'বিশাল বিশ্বে প্রতি অণুপরমাণু-মাঝে
কি এক আসঙ্গ লিপ্সা রহিয়াছে ভরা—'

রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে কিন্তু শেষ পংক্তি

"মোহন মায়াবী ঐ নিখিল বিশ্বের ভূপ
প্রেমের বন্ধনে দেছে মুক্তি অবিনাশী।"

পড়িতে না পড়িতেই সব ঠাণ্ডা, হিম, বরফ—বসুমতী।

সন্ধানী

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

দুই

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের অবস্থা কম জটিল নয়, পাশ্চাত্যের মতই জটিল। মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব—প্রত্যেকটি প্রাচীন ধর্ম্মের গোঁড়া মতবাদের বনিয়াদ টলাইয়া দিতেছে। ধর্ম্মের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে বিবিধ কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে ভগবান মানুষের মনের ছায়া, হৃদয়ের স্বপ্ন মাত্র—এই সৌখীন মতবাদকে সমর্থন করে বলিয়াই মনে হয়। আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিভাবান বলিয়া খ্যাত, যাঁহারা 'পরলোক' সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়াছেন, তাঁহারা পাগলা-গারদে চিকিৎসাধীন হইবার যোগ্য। সনাতন যুক্তি-তর্ক আর আধুনিক মনে প্রত্যয় জন্মাইতে পারে না। সব কিছুরই যদি কারণ থাকে তবে ভগবানেরও কারণ আছে। ভগবান যদি কারণ বিনা সম্ভব হয় তবে জগৎটাও কারণ বিনা হইতে পারে। দোষ-ত্রুটীতে পূর্ণ আমাদের এই পৃথিবী কোন চতুর, করিতকর্ম্মা ভগবানের সৃষ্টি হইতে পারে না। ইতিহাসেও ভগবান বলিয়া কোন শক্তির উল্লেখ পাই না। লইজির কথায় "ঐতিহাসিক ভগবানকে ইতিহাস হইতে বিতাড়িত করেন নাই; সেখানে ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই হয় নাই।" আমরা চাই কোন উৎকৃষ্টতর জগতে যাইতে, যেখানে গেলে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি শুধরাইবে, চোখের জল মুছিয়া যাইবে; ইহা হইতেই আর কিছু না হোক, আমাদের এই জগৎটা যে নিকৃষ্ট, তার প্রমাণ পাই। ভগবানের সত্তার এমন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই যাহাতে আমরা বলিতে পারি "আরে, এই যে তিনি" অথবা "ঐতো উনি"; মানুষ তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ চাহিতেছে অথচ ভগবান নীরব; ইহাই নিরীশ্বরবাদের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। এ সত্ত্বেও যদি কেহ কেহ ভগবানে বিশ্বাসকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় তবে তাহা বিস্ময়ের যতটা না হোক দুঃখের বিষয় হইবে বটে। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থের খাতিরে যাহাই বলুন না, ইহাদের সে বিশ্বাস জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তির আশ্রয়-সম্বল তৃণের ন্যায়ই ক্ষীণ।

ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের সহজ বিশ্বাসকে নিয়া খেলা করিতেছে। যখন শুনি প্রতিশোধপরায়ণ ক্রুদ্ধ ভগবান শত্রুর সঙ্গে রফা করিয়া মানুষকে অনন্ত, অচিন্ত্যনীয় দুঃখের ভাগী করিয়াছেন, আবার অন্যরূপে তিনিই সদয় হইয়া কল্পিত অন্যায়ের কৃত্রিম প্রতীকার-ব্যবস্থাও করিতেছেন, কেননা জগৎটা সুরু হইবার আগেই তিনি নিয়তি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন—তখন বুঝি যে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের সহজ বিশ্বাসকে নিয়া খেলা করিতেছে। এই সব অতিপ্রাকৃতিক কাহিনী পৃথিবীর শৈশবাবস্থার রূপকথা মাত্র। অতীতের পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা আর এ যুগের সমস্যার সমাধান হয় না। মানুষের আধুনিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যার কোন প্রচেষ্টা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রমাণ করিলেও তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির সততার পরিচয় পাই না। শিশুস্তরের মনই ধর্ম্মানুসরণ করে। বলিষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ভগবান বলিয়া কোন কিছু নাই। আমরা অনাসক্ত, উদাসীন এক নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র—এ নিয়তির কাছে পুণ্যের কোন অর্থ নাই, পাপের কোন অর্থ নাই, ইহার কবল হইতে ছাড়া পাইয়া আমরা ঘোর তমিস্রার মধ্যে ঢলিয়া পড়ি।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে কিন্তু ভগবান নাই—একথাও আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কোন কিছুই স্বীকার কিংবা অস্বীকার করা চলে না। যাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি আর একটু বেশী টান তাঁহারা ভগবানকে এই বিপদে একা ফেলিতে চান না, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেন। খাঁটি সন্দেহবাদী যিনি তিনি কিন্তু বলিয়া থাকেন যে মানুষ যখন জানে না যে ভগবান কে কিংবা কি বস্তু তখন ভগবান নাই, ইহা বলা তাহার পক্ষে ঔদ্ধত্য। নিরীশ্বরবাদ ও মূলতত্ত্ববাদ (Fundamentalism)—দুই অতিশয়-বাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তিনি কথা কহেন। দুইটার কোনটার দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁহার নাই, অথচ সমস্যাটা যে তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন।

কেহ কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা অদৃশ্য শক্তির সহিত যোগাযোগ হিসাবে ধর্ম্মে কোন উপকারিতা না বুঝিলেও বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরবাদের একটি দার্শনিক মূল্য আছে। জগতের উন্নতিতে আমাদের যতটা আসে যায় আত্মার মুক্তিতে তেমন কিছু নয়। জগতের কল্যাণেই ধর্ম্মটা খাটানো যাইতে পারে বটে, কারণ তাহাতে সামাজিক শান্তি ও উন্নতির সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই ধর্ম্ম হইতে সুখ সুবিধা পাইতে চায়, চিন্তা করিয়া অশান্তি ভোগ করিতে চায় না, তাই তাহারা অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিতেছে। তাহারা দৃষ্টি দিয়াছে অতীতের দিকে; মানুষের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে সঞ্চিত জ্ঞান তাহা অতীতের ভাণ্ডারেই নিহিত আছে বলিয়া তাহাদের ধারণা। তাহাদের মতে শুধু মৃত ব্যক্তিরাই বাঁচিয়া আছে এবং জীবিতদের শাসন তাহাদেরই হাতে। আধ্যাত্মিক মুক্তি-লাভের চেষ্টায় তাহাদের অনেকেই অতিরিক্ত মাত্রায় সোহং বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; আর এক দল স্বভাব-বাদের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কেহ কেহ আবার নাস্তিক্যবাদের 'নেতি নেতি' করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এমনি করিয়া সব গোল পাকাইয়া যাইতেছে।

অনেকগুলি কারণ মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালীতে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে—যেমন গত মহাযুদ্ধের ভাঙ্গন, অর্থ-নৈতিক কারণে বিলম্বে বিবাহ, আত্মপ্রকাশের উন্মাদনা, পিতামাতার সন্তান-শাসনে শৈথিল্য, অতাল্প যৌনবিদ্যা, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব এবং জন্মশাসন প্রণালীর জ্ঞান, যাহা আমাদিগকে স্বাভাবিক পরিণামের আশঙ্কা হইতে মুক্তি দিয়াছে। নারীরাও ন্যায়তঃ পুরুষের বিধান হইতে স্বতন্ত্র বিধান মানিয়া লইতে চান না। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর মনে মূলগত যে পার্থক্যের ধারণা অতীতে ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুরুষ নারীকে যে নিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত তাহা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বলা হইতেছে নারীও পুরুষেরই ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, তাহাদেরও উদ্দাম কামনা আছে; গণ্ডীতে বাঁধা না পড়িয়া তাহারাও

পার্হস্থ্য-ধর্ম্ম

চায় প্রেম-বিলাস। তাহারা জোরের সহিত এই দাবী করিতেছে যে, তাহারা আমাদের উপরে উঠিতে কিংবা আমাদের নীচে পড়িয়া থাকিবে না; অনুরাগের ক্ষেত্রে তাহারা আমাদেরই মত এক কিংবা বহুকে বরণ করিবার সমান অধিকার চাহিতেছে এবং তাহাদের এই দাবী কতকটা সফলও হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল কাম-বিলাস আদিম অভ্যাস, মনুষ্য জাতির মতই আদিম—কিন্তু আমরা ইহাকে সমর্থন করিতে চাই একটি নূতন নামে—আত্মবিকাশের নামে। ভাল উপন্যাসে লাম্পট্যের প্রশংসা হইতেছে এবং সমাজের উচ্চ স্তরে তাহা স্বীকৃতও হইতেছে। *

আর্থিক প্রয়োজনে যে নারী "পাপ" করিতেছে তাহার ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে, কারণ—তাহার স্থানে আসিয়া পড়িতেছে সখের প্রত্যাশিনী—যে জ্ঞাতসারেই বিবেক ক্ষুণ্ণ না করিয়া ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে। অনেকে "পাপ" করে লালসার খাতিরে নয়, বিবাহিতা নারীর প্রেমিকের প্রয়োজন এই ধারণা হইতে। সমাজের কোন কোন স্তরে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ভোগ সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সমাজের নিয়ম-কানুন পুরুষের অনুকূল এবং নারীর প্রতিকূল বলিয়া নারীদের মধ্যে অনেকে চাহিতেছেন এ নিয়ম-কানুনের বাঁধন কাটিতে। সমাজের এই নিয়ম-কানুন যতই শিথিল, পক্ষপাত-দুষ্ট এবং সেই হেতু অন্যায় হোক্ না কেন, ইহার প্রতিকূলে দাঁড়ানো কঠিন এবং বিপজ্জনক। আজকালকার "ফ্যাসান-দুরস্ত" (smart set) অনেক তরুণী বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মাতৃত্বের ঝঞ্ঝাট না পোহাইয়া আর্থিক স্বাধীনতা পাইতে চাহিতেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং সন্তানসন্ততিগণ একবার পিতার কাছে এবং একবার মাতার কাছে ঠেলা খাইতেছে, পিতামাতার মধ্যে বাক্যালাপ চলিতেছে সলিসিটরের মারফৎ।

এ সম্পর্কে মানুষের চার রকম মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মূলতাত্ত্বিকগণ প্রচলিত মতের পরিপোষণ করিয়া বলেন—প্রেমহীন বিবাহ যদি দুঃখজনক হয় তবে বিবাহ না করিয়া প্রেম করা নরকভোগ তুল্য। প্রেমসিঞ্চিত হইলেও

* অপরাধী বালকবালিকাদের বিচারক হিসাবে জজ লিণ্ডসের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। ২৭ বৎসরের উপর তিনি আমেরিকার অন্তর্গত ডেনভারের শিশু-আদালতের বিচারক ছিলেন। বিচারক হিসাবে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার "The Rovolt of Modern Youth" (আধুনিক তরুণ বিদ্রোহ) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৪ হইতে ১৭ বৎসর বয়সের প্রত্যেক ১০ জন বালিকার মধ্যে একজনের চরিত্র-দোষ দেখা যায়; ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়সের বালিকাদের মধ্যে এ পাপ আরও বেশী। "যে সব তরুণ-তরুণী পার্টীতে যায়, নৃত্য করে, মোটর ইত্যাদিতে একসঙ্গে বিহার করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন চুম্বন-আলিঙ্গনের স্বাদ গ্রহণ করে এবং প্রথমটা যাহারা চুম্বন-আলিঙ্গনে রত হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৫০ জন কেবল ঐটুকু গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে না।" জজ লিণ্ডসে যদিও বলেন, একথা যে ডেন্‌ভারের পক্ষেই সত্য তাহা নয়, "আমেরিকার প্রত্যেক সহরের পক্ষেই সত্য—এমন কি আরও বেশী সত্য"; তথাপি আমাদের এই মনে হয় যে অবস্থা এত খারাপ নয়; বরং আমরা ইহাই মনে করি যে, তিনি কতকটা অতিরঞ্জন করিয়াছেন।

মিলন যদি অবৈধ হয় তবে তাহা অধর্ম্ম; পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ প্রেমহীন যে কোন প্রকার বিবাহই ধর্ম্ম।

সামাজিক আদর্শবাদীরা বলিয়া থাকেন—পরিবর্ত্তনশীল এই জগতে বাঁধা ধরা নিয়ম মানিয়া চলা অসম্ভব। আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে নামিলে আমরা শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট আদর্শ ও কর্ম্মের শৈথিল্য তুলনা করিয়া দেখিতে পাই।

আমাদের প্রচলিত ধারণা, অনেক নারীরই যৌন-কামনার পরিতৃপ্তি হয় না। যেমন, গ্রেটবৃটেনের মত দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ২০ লক্ষ অধিক। ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের কমিয়া যাওয়ায় এই অতিরিক্ত সংখ্যক নারীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় যদি আমরা এক-বিবাহের আদর্শই ধরিয়া থাকিতে বলি, তাহা হইলে বহু নারীকেই কুমারী-জীবন-যাপনের দায় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া কুমারী থাকিতে গেলে কুমারীত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। প্রচলিত বিধির কবলে পড়িয়াও তাহারা যৌন কামনা রোধ করিয়া থাকিতে ব্যগ্র নয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃ স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, কারণ, প্রবৃত্তির খোরাক না দেওয়ায় অন্তর ক্লিষ্ট হয়। যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে এবং বাধ্য হইয়া তাহাদের দোষ আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে হয়। বহু বিবাহ অবৈধ হইলেও কার্য্যতঃ বহু বিবাহ চালু হইয়াছে। কার্য্যতঃ এই বহুবিবাহ দ্বারা অশ্লীলতা, শঠতা এবং ব্যাধির পরিপোষণ হইতেছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অধঃপতন হইতেছে। তরুণ-তরুণীরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আমরণ আঁকড়াইয়া থাকিবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া নেওয়াও অর্থহীন। চির-দায়িত্বের বন্ধন-স্বীকারের চুক্তি যেখানে নাই, কেবল সেইখানেই প্রেম নিরাপদ। বিবাহার্থ নর-নারীর মিলন (trial marriages) সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার একমাত্র সমাধান বলিয়া বোধ হইতেছে।

সংশয়বাদীদের নিশ্চিত ধারণা যে আমরা অতীতে ফিরিয়া যাইতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমান তাহাদের হৃদয় দমাইয়া দেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় পারিবারিক বন্ধন প্রতিনিয়ত ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, নর নারী নূতন করিয়া আবার সম্বন্ধ-স্থাপনের স্বাধীনতা পাইতেছে এবং সন্তান-সন্ততিরা এখানে ওখানে ঠেলা খাইয়া নব নব গৃহে গিয়া পড়িতেছে,—যে সব স্থানে পিতামাতার স্নেহ-শাসন নাই, সৎ দৃষ্টান্ত নাই। সংশয়বাদীরা এই সব দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। প্রতীকার কি তাহা তাহারা জানে না, কাজেই অনিবার্য্যের কাছে তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে। তাহারা আগাইয়া চলিতেছে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে; কোন কিছু একটা ঘটিবে এই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যাহাদের আর একটু সাহস আছে তাহারা বলিয়া থাকে যতদিন বাঁচিয়া আছি সেই পর্য্যন্তই সব, মরিলেই সব ফুরাইল। যাহারা ভীরু—বাঁচিয়া থাকিতে ভয় পায়, তাহারা করুণার পাত্র; কারণ, জীবনে তাহারা আনন্দ, উত্তেজনা পায় না। জীবনটাকে কোন রকমে তাহারা এড়াইয়া চলিয়াই সুখী থাকে, ইহাকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে না। যাহারা বীর তাহারা দিব্য আনন্দে "পাপ" করিয়া যায়। প্রবৃত্তির আতিশয্য নিজেই নিজের সমর্থক। নির্দ্দোষ দৈহিক আনন্দভোগে আত্মা অশুচি হয় না। জ্ঞান-বুদ্ধি ও আত্মার দিক দিয়া যাহাদের সহিত আত্মীয়তা হইয়াছে তাহাদের সহিত দৈহিক-সম্ভোগে কোনরূপ অন্যায় নাই। এটা ন্যায়, ওটা অন্যায়, মানুষ হয়তো তাহা ভাবিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির কাছে সবই সুন্দর। স্বভাববাদীর নাস্তিক্যবাদকে ভিত্তি করিয়া তাহারা তর্ক করে যে, কতকগুলি শক্তির ক্ষণ-সংযোগের ফলেই মানুষের এই সুন্দর কায়াধারণ সম্ভব হইয়াছে; শক্তিগুলি যেমন অনায়াসে আসিয়া মিলিয়াছিল তেমনি অনায়াসেই একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কাজেই সুযোগ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহা ভোগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। সাহসভরে সম্পূর্ণ সুন্দর জীবনযাপনের অভিলাষী যদি আমরা হই, তাহা হইলে মৃত্যু আসিয়া জীবনকে ছিনাইয়া লইবার পূর্ব্বে জীবনের পাত্রখানি নিবিড়ভাবে আমাদের পান করা চাই। কামনাকে চাপিয়া ঢাকিয়া রাখা এই শ্রেণীর লোকের কাছে আর ভব্যতার লক্ষণ বলিয়া সমাদৃত হয় না। প্রবৃত্তিকে দমন করা বা তাহাকে লুকাইয়া ভোগ করার প্রয়োজন নাই। জীবনটা একটা দুঃসাহসিক অভিযান মাত্র। প্রাণশক্তির পরিচালনাই একমাত্র মঙ্গলজনক। যাহারা প্রচলিত নীতি মানিয়া চলে, তাহাদের রক্তে উন্মাদনা নাই, যে উত্তেজনায় প্রকৃতির কোন সাড়া নাই সেই উত্তেজনায় অপর সাধারণ লোকে কেমন করিয়া মাতিয়া উঠে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এই উদগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যাহারা পক্ষপাতী তাহারা কামনা-সংযম করিলে অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহাদের স্বাধীন জীবন-যাপনে অপরে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে কুপিত হইয়া উঠে। তাহারা নৈতিক সংযমকে সেকেলে, ধাপ্পাবাজি ও সাধুগিরি এবং শুধু কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ব্যভিচার অন্তরের মুক্তির শুধু বহিঃপ্রকাশ। সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু, কাজেই নূতন কোন সমাজ-ব্যবস্থা-গঠনের পূর্ব্বে সে শক্তিকে আমাদের নষ্ট করা চাই-ই।

সম্পাদকীয়

অস্পৃশ্যতা

চারিদিকে রব উঠিয়াছে, অস্পৃশ্যতা পরিহার কর, অস্পৃশ্যতা দূর কর; দিন ও রাত্রির সকল প্রহরে, পত্রিকার পৃষ্ঠায় ও সমাজ-মন্দিরের বেদীমঞ্চে শুধু অস্পৃশ্যতা আর অস্পৃশ্যতা। মহাত্মা গান্ধী কারাবন্ধনের ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, 'জাতির মুক্তি যদি চাও তবে অস্পৃশ্যতা ছাড়', কখনও বলিতেছেন, 'তোমরা অস্পৃশ্যতা না ছাড়িলে আমি অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব'; তাঁহার অনুচরেরাও তাঁহার জীবনের দোহাই দিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এতকাল ধরিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহারা যে সংগ্রাম চালাইতেছিলেন তাহা পরিহার করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় মন্দির-প্রবেশের বিল পাস করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাংলার রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই সোজা কথা সহজ করিয়া বলিতে ভালবাসেন না, তিনি নিত্য নূতন উপমার আশ্রয় লইয়া ভাষাকে ক্ষুরধার তরবারির মত করিয়া বলিতেছেন—

> "মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরে বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে?"

সমস্তই সত্যকথা, সমস্তই বুঝিতে পারি শুধু বঙ্গদেশবাসী বাঙালী আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না আমাদের সম্মুখে ইহাই কি এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা! বাঙ্গালা দেশে সত্যকার অস্পৃশ্যতা কোথায়? সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যবধান কি এত মারাত্মক যে ইহার জন্য হন্তদন্ত হইয়া আইনের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইবে? বর্ত্তমানে বাংলাদেশের কুত্রাপি (গড়িয়া-তোলা হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কথা স্বতন্ত্র) হিন্দুদের মধ্যে অবনত শ্রেণীদের প্রতি উন্নত শ্রেণীর এমন ঘৃণা প্রত্যক্ষ করি নাই, যাহাতে বলিতে পারি উন্নত অবনতের ভেদাভেদ তুলিয়া দিতে হইবে আইন করিয়া। ঘৃণার ভাব যদি সত্যই থাকে তাহা বহুযুগ ধরিয়া মানুষের মনের গভীরতম কোণে আশ্রয় লইয়া আছে। কাউন্সিলে বিল পাস হইয়া গেলেই মায়ামন্ত্রবলে তাহা দূর হইবে না; আইনের বলে অবনত শ্রেণীরা মন্দিরে প্রবেশাধিকারও হয়তো পাইতে পারে কিন্তু তাহাতে সত্যকার ফল হইবে কি? আমরা অবশ্য এই বিভেদ প্রচণ্ড আকারে আছে বলিয়া স্বীকার করি না। হয়তো শতাব্দী কয়েক পূর্ব্বে ছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘৃণার ভাব কমিয়া আসিয়া এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; দুইদিন পরে আপনা হইতেই এইটুকুও চলিয়া যাইবে—হঠাৎ এমন সময়ে অন্য দেশের দেখাদেখি বাংলা দেশ অস্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল কেন?

আমরা এখানে বসিয়া মান্দ্রাজের কথা, বোম্বাইয়ের কথা ভাবিতে পারি না, এই সকল প্রদেশের পক্ষে যাহা সমীচীন আমাদের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা না থাকিতে পারে—মন্দির প্রবেশের বিল পাস হইলেও আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ আমরা জানি, এই সম্পর্কে পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইবে তাহা আইনের দ্বারা হইবে না, যুগের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই হইবে। আমরা এই সকল কথা শুধু এই জন্যই বলিতেছি যে অস্পৃশ্যতা বা মন্দির-প্রবেশের সমস্যা বাংলাদেশের সমস্যা নহে; বাঙ্গালীর সমস্যা সম্পূর্ণ পৃথক।

অস্পৃশ্যতার মূল

এদেশের অস্পৃশ্যতার মূলে কি শুধুই ঘৃণা, ইহা কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুগান্তের সংস্কার, একটা গড়িয়া-তোলা শুচিতাবোধ এবং ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে? এই পরস্পরের সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলা কি শুধু অবনতদের বেলাতেই করা হয়? আমার মাতা আমার হাতের ছোঁয়া খান না, আমার বিধবা ভগ্নী সন্তর্পণে আমার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন, তিনি কি আমাকে ঘৃণা করেন বলিয়াই এরূপ করেন? তাঁহাদের বিরুদ্ধেও কি মামলা চালাইতে হইবে? আমরা একথা বিশ্বাস করি যে অতীত যুগে এই পাপের জন্য অনেক হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে অবনতদের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ধর্ম্মে ঠেলিয়া দিবার মত মনোভাব তো বাংলাদেশের কোথায়ও নাই; এই অস্পৃশ্যতা

আন্দোলনের ফলেই হয়তো তাহাদের সেই লুপ্ত বোধ জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহার দ্বারা কুফল ফলিবার সম্ভাবনাও আছে। শিকড় যেখানে শুকাইয়া আসিয়াছে সেখানে শুষ্ক শাখাপত্র লইয়া মাতামাতি করিবার আবশ্যকতা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ

সর্ব্বজনমান্য মহাত্মার কথায় যেখানে কাজ হইল না সেখানে আইনের বলে সুফলের আশা করা সঙ্গত নয়। আইনের ভয়ে মনের পাপ মনের ভিতর পাক খাইতে খাইতে প্রচণ্ড বেগে একদিন বাহির হইয়া আসিবে, সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া এখনই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। একথা কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে খাটে না।

'হরিজন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মহাত্মাগান্ধী যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে আছে—

কতিপয় বন্ধু আমাকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র দিয়াছেন—আপনি বরাবরই গবর্ণমেণ্ট ও আইন সভাগুলির সহিত অসহযোগের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, এখন অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ আইন ব্যবস্থা-পরিষদে পাশ করাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন কেন? ... ...আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে এমন কোনও নীতি নাই যাহা সকল ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রয়োগ করা যায়।...প্রশ্ন-কর্ত্তাদিগকে আমার অসহযোগ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে বলি ..অসহযোগের জন্যই আমি আমার আন্দোলনে তাঁহাদের সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি।...আমি যে উদ্দেশ্যকে পবিত্র ও হিতকর মনে করি সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি গবর্ণমেণ্টের সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি।

অপর পক্ষের লোকেরাও গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা চাহিয়া বা পাইয়া ঠিক অনুরূপ জবাব দিতে পারে, কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট সাধু। গবর্ণমেণ্ট উক্ত পক্ষকে সাহায্য করিলে তাহাকেই বা গবর্ণমেণ্টের চালবাজি বলা হইতেছে কেন?

বাংলা দেশ

বাংলা দেশে এখন অন্য সমস্যা গুরুতর—তাহার সব চাইতে বড় সমস্যা—অন্ন-সমস্যা। বাঙ্গালী জীবনযুদ্ধে ক্রমশ হঠিতেছে। ইংরেজ ছাড়াও ভারতের অপর প্রদেশের লোকেরা এখন ঘরে ও বাহিরে তাহার মালিক হইয়া বসিতেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই বাঙ্গালীকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

বস্তুতঃ অস্পৃশ্যতা সমস্যা বাংলার সমস্যা নয়। বাংলার অস্পৃশ্য ও বঙ্গেতর জাতির অস্পৃশ্যদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাংলায় অনুন্নত জাতি আছে, অস্পৃশ্য নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ধারায় বাংলার রক্ষণশীল উচ্চবর্ণ সমাজের মনোবৃত্তির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাংলা দেশে আজ যাহারা অস্পৃশ্য, হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশই বঙ্গের বাহিরের লোক। তাহাদের সমস্যা ও বাঙ্গালী অনুন্নতের সমস্যা এক নহে। অথচ বাংলার বাহিরে অস্পৃশ্যতা নিবারণের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে এখানেও সেই পদ্ধতিরই অনুসরণের চেষ্টা চলিতেছে।

বাংলার উন্নত ও অনুন্নত জাতির মধ্যে যে বিরোধ, চৈতন্যদেব ও পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিলেন—তাঁহারা বাংলার প্রাণের পরিচয় জানিতেন, তাই সঙ্কীর্ত্তন, মহোৎসব ও সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন; রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অধিকতর বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বসেন নাই।

গায়ের জোরে কোনও প্রদেশেই অস্পৃশ্যতা নিবারিত হইবে না, ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। ভেদ যে বাড়িতেছে তাহা সনাতনী ও সংগঠনীদলের বাক্যদ্বন্দ্ব দৈনিক সংবাদ পত্র মারফৎ পাঠ করিয়া অবগত হইতেছি। যাঁহারা হিন্দুজাতির ঐক্য অনিষ্টকর মনে করেন, তাঁহারা এই দ্বন্দ্বে বেশ কৌতুক অনুভব করিতেছেন বোধ হইতেছে। তাঁহারা ক্ষমতাপ্রভাবে অথবা কৌশলে একদল অস্পৃশ্য খাড়া করিয়া হিন্দু জাতির অখণ্ড ঐক্যের পথে বাধা সৃজন করিবার জন্য অস্পৃশ্য ও অনুন্নতের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপক সদস্যপদ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অনেক অনুন্নত জাতির পাণ্ডারাও মৎলববাজ অস্পৃশ্যের বন্ধুনামধেয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে কলের পুতুলের মত নাচিতেছেন। দলাদলির মোহে একথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে এই বিভেদের ফলে মূল হিন্দুজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও ক্ষতি হইবে।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন আমরা অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের বিরোধী; সমগ্র পৃথিবী

বর্ত্তমানে অন্ন-সমস্যা ও অর্থ-সমস্যার ভারে পীড়িত, অচির-কাল মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ধনিক ও শ্রমিক এই বিভাগ ছাড়া মানুষে মানুষে অন্য সকল পার্থক্য তিরোহিত হইবে। অস্পৃশ্যতা বলিতে মহাত্মা গান্ধী ঠিক যাহা বুঝাইতেছেন বাংলাদেশে তাহা নাই। যাহা নাই তাহা লইয়া নিরন্তর আন্দোলন করার আমরা বিরোধী। এই হতভাগ্য দৈন্য-প্রপীড়িত দেশে শুধু অস্পৃশ্যতা, অস্পৃশ্যতা করিয়া চাঁচাইলেই কোনও ফল হইবে না—হয়তো বিপরীত ফল দেখা যাইতে পারে।

অস্পৃশ্যতা-বিরোধী মহাত্মা গান্ধী কিন্তু আজিও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি-বিভাগ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। ১২ই ফেব্রুয়ারীর সকল সংবাদপত্রে এবিষয়ে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। 'হরিজন' পত্রের প্রথম সংখ্যায় ডক্টর আম্বেদকরের যে লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপর মহাত্মাজী একটি মন্তব্য লিখিয়াছেন। ডক্টর আম্বেদকর লিখিয়াছেন—

"অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথারই একটি ফল। যতদিন পর্য্যন্ত জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান থাকিবে, অস্পৃশ্যতাও ততদিন থাকিবে।"

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন—

"অনেক বিশিষ্ট হিন্দু এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের ওই মত সমর্থন করিয়া উঠিতে পারিনা। জাতিভেদ যে ঘৃণ্য এবং বীভৎস, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। ইহার দোষ আছে, ত্রুটি আছে কিন্তু ছুঁৎমার্গের মত ইহাতে পাপমূলক কিছুই নাই। যদি অস্পৃশ্যতা জাতিভেদের ফলস্বরূপই হয় তাহা হইলে ইহা কোনও অঙ্গের কুৎসিত বিকৃতি অথবা শস্যের আগাছার ন্যায় হইবে। দেহের কোনও অঙ্গের বিকৃতির জন্য দেহকে ধ্বংস করা অথবা আগাছার জন্য বলীয়ান্ শস্যকে ধ্বংস করা যেমন ভুল হইবে, তদ্রূপ অস্পৃশ্যতার জন্য জাতিভেদকে ধ্বংস করাও ভুল হইবে।"

মহাত্মা গান্ধীর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

"আমি যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, উহা সেই প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে পরিণত হইবে। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে চারিটি বিভাগ থাকিবে, কোন বিভাগই কোনও বিভাগের অপেক্ষা উচ্চ কিম্বা নীচু হইবে না। সমগ্র হিন্দু-সমাজ-দেহের পক্ষে সকল বিভাগই সমভাবে প্রয়োজনীয় হইবে।"

এভারেষ্টের উচ্চতা কে মাপিয়াছিল ?

ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে 'এভারেষ্টের উচ্চতা কে মাপিয়াছিল' শীর্ষক একটি মন্তব্য আছে। একজন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক এভারেষ্টের উচ্চতা নির্ণীত হইয়াছিল, বাঙ্গালীজাতির পক্ষে ইহা গৌরবজনক সন্দেহ নাই। মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,

এভারেষ্ট নাম শুনিয়া অনেকে মনে করেন যে এভারেষ্ট নামক কোনও ব্যক্তি হিমালয়ের এই চূড়াটি আবিষ্কার করিয়া তাহার উচ্চতার পরিমাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নয়। যে সময়ে গণনায় এই বিশেষ চূড়াটি উচ্চতম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, বাবু রাধানাথ শিকদার মহাশয় তখন ট্রিগনমেট্রিকাল সার্বে অব ইণ্ডিয়ার প্রধান কম্পুটার ছিলেন। তিনিই গণনা দ্বারা স্থির করেন যে অধুনা এভারেষ্ট নামে পরিচিত চূড়াটিই পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্ব্বতশিখর। মেজর কেন্নেথ ম্যাসন যখন 'হিমালয়ের কাহিনী' বিষয়ক বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন এই আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন ১৯২৮ সালের ১২ নভেম্বর তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকার ১৭ পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত আছে। স্থানটি এইরূপ—

উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের জরিপ তখন চলিতেছিল; ১৮৫২ সালের এক সকালের কথা, হঠাৎ একটি বাবু স্যার জর্জ্জ এভারেষ্টের পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী স্যার এণ্ড্রু ওয়াগের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'স্যার, আমি পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু পাহাড়ের খোঁজ পেয়েছি।' দূর পাহাড়ের জরিপের কাজে বাবুটি নিযুক্ত ছিল। স্যার এণ্ড্রু ওয়াগই প্রস্তাব করিলেন যে পর্ব্বত-চূড়াটির নাম মাউণ্ট এভারেষ্ট রাখা হউক; কারণ কি তিব্বত কি নেপাল কোনো দিকেই শৃঙ্গটির কোনও নামের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের আশ্রম

ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বোধনার ব্যথা ও বোধনার কথা' শীর্ষক একটি নিবন্ধের দিকে আমাদের পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে সকল শিশুরা যে কারণেই হউক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার বা দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব করিবার মত কোনও প্রতিষ্ঠান এদেশে নাই; অথচ ইহারা মূক বধির অথবা অন্ধ বালকবালিকাদের অপেক্ষা কম হতভাগ্য নয়। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে ইহাদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন, প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এ বিষয়ে

যাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহারা ইঁহাদের সহিত পত্রব্যবহার করিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

চিনির কারখানা

বিদেশী চিনির উপর পনের বৎসরের জন্য সংরক্ষণী শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় চিনির কারখানা পরিচালনা করিবার অনেক বেশী সুযোগ এদেশীয় ব্যবসায়ীগণ পাইলেন। এ বিষয়ে যাঁহারা নিজেদের অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্র-মোহন সেনের 'চিনির কল' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। ফাল্গুনের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় আগ্রা, অযোধ্যা বা বিহারে কারখানা খুলিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কথা বলিয়াছেন; নরেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন যে দিনাজপুর, রাজসাহী ও বগুড়া অঞ্চলে কারখানা খুলিবার উপযোগী নৈসর্গিক সকল প্রকার সুবিধাই আছে। যাঁহারা ওই সকল স্থানের আখের চাষের সঠিক বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবুর নিকট চিঠি লিখিলেই সকল খবর জানিতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা—শ্রীনরেন্দ্র-মোহন সেন, উকীল, বালুবাড়ী, দিনাজপুর।

বাংলা ভাষার পরিণাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্বের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 'বাংলা ভাষার পরিণাম' সম্বন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আজ কাল আর বঙ্গভাষা-জননী দীনবন্ধু বর্ণিত 'দীনা হীনা পিঁচুটি-নয়না' কাঙালিনী নহেন এইরূপ ভাবিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলাম, সুকুমার বাবু নির্ম্মম আঘাতে তাহা ভাঙিয়া দিলেন; জননীর বহিরাবরণ চাকচিক্যময় হইলেও ভিতরের গলদ বড় কম নয়। ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। বঙ্গ ভাষার লেখকেরা এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।

বাঙালীত্বের স্বরূপ

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বাঙালীয়ানা সম্বন্ধে অভিমানী যাঁহারা তাঁহারা আহত হইবেন জানিয়াও প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হইল এই জন্য যে প্রবন্ধটি নীরদ বাবুর বহু দিনের বহু চিন্তার ফল; নীরদ বাবুর মতের বিরুদ্ধ মতসম্পন্ন লোকের অভাব নাই, আমরাও সর্ব্বত্র তাঁহার সহিত একমত নহি। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব। এইরূপ একটা গুরুতর ব্যাপারের আলোচনা যত ব্যাপকভাবে হয় ততই ভাল।

পুষ্করণা বা পোখরণা

গতবারে আমরা মহাস্থানে আবিষ্কৃত শিখালেখ হইতে মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের আমলেও যে সমগ্র বঙ্গ একত্র হইয়া সংবঙ্গ হইয়াছিল তাহার সংবাদ দিয়াছিলাম, বর্ত্তমান সংখ্যায় শুশুনিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত পুষ্করণা বা পোখরণ জনপদ যে বাঙলা দেশের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পোখরণা গ্রাম এই সংবাদ দিতে পারিয়া আনন্দিত হইতেছি। গবর্ণমেণ্ট আর্কিওলজিকাল বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ইহা অনুমান করেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত দীক্ষিতের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহার মতই গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি স্বয়ং উক্ত গ্রামে গিয়া এ সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধশেষে তিনি বলিয়াছেন, পোখরণা বাঙ্গালী জনগণের তীর্থ-স্থান হইবার যোগ্য। বাঙ্গালীর অতীব গৌরবের সাক্ষ্য এ ভাবে যত আবিষ্কৃত হয় ততই মঙ্গল।

সংস্কৃত কলেজ ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল

বাঙ্গলা সরকার ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলকে হেয়ার স্কুলের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সম্প্রতি ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ রাখিতে হইলে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলও রাখিতে হইবে। কারণ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে উন্নততর প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপনা হইয়া থাকে এবং উক্ত স্কুল হইতে যাহারা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করে তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা লাভ করা অধিকতর সহজ হয়। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ উভয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির সদস্যেরা এ কথা না জানিতেন এমন নহে, কিন্তু তাহা জানিয়াও তাঁহাদিগকে এই অতি অদ্ভুত যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল মুখ্যতঃ হিন্দু বালকদিগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সেই জন্তই কমিটি স্কুলটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। শিক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসনকালের আরম্ভ হইতে সর্ব্বত্রই হিন্দুরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক অল্প সুবিধাই ভোগ করিয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দু মুসলমানের বিশেষ শিক্ষার জন্য বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক কিঞ্চিৎ ব্যয় বরাদ্দ আছে। কিন্তু হিন্দু দেশের রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ সরবরাহ করিলেও এই শিক্ষা-ব্যয়ের অতি অল্প পরিমাণই ভোগ করিয়া থাকে। বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা দেশের ২০০৪টি টোলের বৃত্তি ও অন্যান্য সংস্কৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক ব্যয় করিয়া থাকেন, এক লক্ষ এগার হাজার পাঁচশত একান্ন টাকা, অপর পক্ষে মুসলমানের মক্তব, মাদ্রাসা ও ইস্‌লামিয়া কলেজের জন্য ব্যয় করেন পনেরো লক্ষ অষ্ট আশী হাজার একানব্বই টাকা, ইহার মধ্যে এক মক্তব পুষিতেই দশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত চুরানব্বই টাকা বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে। অথচ এই মক্তবের শিক্ষায় যে প্রকার কাজ হয় তাহার বর্ণনা নিজে না করিয়া একজন খাস সরকারী শিক্ষ-পরিদর্শকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

These are extremely inefficient. This is not prejudiced criticism but is the unanimous verdict of the Mahamedan Inspectors.

Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for 1922-23 to 1926-27.

অথচ এই মক্তব পুষিতে সরকার বাহাদুর প্রতি বৎসর যে দশ লক্ষাধিক মুদ্রা অপব্যয় করিয়া থাকেন, ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির দৃষ্টিপথে তাহা পড়ে নাই। কিন্তু হিন্দুর অতি প্রাচীন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে।

আর প্রকৃত পক্ষে একমাত্র সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল ব্যতীত কেবল হিন্দুর জন্য সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় নাই, অথচ মুসলমানের পাঁচটি মাদ্রাসার (কলিকাতা, হুগলী, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, ও ঢাকায়) ব্যয় সরকার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজ, ঢাকায় ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও চট্টগ্রামের অনুরূপ আর একটি কলেজও আছে।

কিন্তু যুক্তি তর্ক সমস্তই নিষ্ফল। হিন্দু চিরদিন সকল প্রকার অবিচার সহ্য করিয়াছে, কারণ সময়োপযোগী কার্য্যকরী প্রতিবাদ সমবেত ভাবে করিতে শিখে নাই। আজ ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির এই নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ সর্ব্ব প্রকার উপায়ে তাহাকে করিতে হইবে, কারণ এই সিদ্ধান্ত অন্যায়, একদেশ-দর্শী ও অসঙ্গত।

ম্যালেরিয়া নিবারণ

কিছু দিন আগে বাংলার লাট বর্দ্ধমানে শফরে গিয়া সরকার কর্ত্তৃক এদেশের ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধনকল্পে নূতন এক প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছিলেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী এই উদ্যমের কর্ম্মপদ্ধতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার মেমারী থানার কিয়দংশে এই পদ্ধতিতে কাজ সুরু হইবে। প্রায় ২০,০০০ হাজার লোক এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসাধীনে আসিবে। আবালবৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেককে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করান হইবে এবং বর্ষার কয়েক মাস, এপ্রিল, মে ও জুন, কুইনিন ও প্লাস্‌মোকুইন সাহায্যে ইহাদের চিকিৎসা করা হইবে। এবং ইহার পরও যদি কোথাও উপকার লক্ষিত না হয়, তবে সেই সব স্থানে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। এই কল্পে সরকার একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও ছয় জন সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে মেমারীতে পাঠাইতেছেন। কুইনিনের জন্য ১০ হাজার ও প্লাস্‌মোকুইনের জন্য ১০ হাজার, মোট ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য দুইটি উপায়ের কথা বলা হয়, প্রথম, সম্মুখ যুদ্ধ ; দ্বিতীয়, পশ্চাদ্ধাবন। ডাঃ বেণ্টলি দ্বিতীয় উপায়ের পক্ষপাতী ছিলেন,—দেশের দারিদ্র্য দূর ও জলনিকাশের সুব্যবস্থার ফলে কৃষির উন্নতি ও মশা নিবারণ এই উপায়ের প্রধান অঙ্গ। সম্মুখ যুদ্ধ বলিতে বোঝা যায় মেমারীতে যে উপায় অনুসৃত হইতেছে, কুইনিন সাহায্যে ম্যালেরিয়ার বিষ তাড়ান। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সিনকোনাতে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না—প্লাজমোকুইনে হয় বলিয়া এবারে তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ ও শিক্ষিত শ্রেণীর সহযোগ ছাড়া এ পদ্ধতি কার্য্যকরী হইবে না, সরকারী ইস্তাহারে একথার উল্লেখ আছে। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি।

...দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক্তি

শিল্পী—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী

মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান

—শ্রীযদুনাথ সরকার

আধার-বর্ণনা

১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পাণিপতের মহাযুদ্ধে উত্তর ভারতে মারাঠা প্রভুত্ব ধ্বংস হইল। ঐ রণক্ষেত্রে পেশোয়ার তরুণ জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাস রাও, খ্যাতনামা পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও ভাউ, সিন্ধিয়া বংশের প্রধান এবং আরও অসংখ্য নেতা হত এবং লক্ষাধিক সৈন্য মৃত, আহত বা বন্দী হইল। যুদ্ধের এই বিষময় ফল শুনিয়া পেশোয়া নিজেই কয়েক মাস পরে ভগ্ন হৃদয়ে অকাল-মৃত্যুর মুখে পড়িলেন। পাণিপত মারাঠা ভাগ্য-সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস-গ্রহণ। ইহার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত মারাঠারা দিল্লীর নিকট আবার মুখ দেখাইতে পারিল না। সত্য বটে, এই যুদ্ধে ২৮ বৎসর পরে মাহাদজী সিন্ধিয়া দিল্লীর রাজদরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন; কিন্তু তাহাতে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল না,—সে আশা ১৭৬১ সালে পাণিপতের প্রান্তরে চিরদিনের জন্য সমাধিমগ্ন হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের কথা, ইউরোপে ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ ও তথায় নেপোলিয়নের পতনের মত, চিরদিন কৌতুহল জাগাইয়া রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্বদাই ইহার আলোচনা, নেতাদের দোষগুণ সম্বন্ধে তর্ক, ঘটনাগুলির কারণ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। কিন্তু "ভাউ সাহেবের বখর" এবং "পাণিপত বখর" ছাড়া মারাঠী ভাষায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই, এবং এই দুটি গ্রন্থই পরবর্ত্তী কালে এবং অনেক স্থলে প্রমাণের অভাবে লিখিত। মারাঠী-ভাষায় সহস্র সহস্র ঐতিহাসিক পত্র পাওয়া যায়, কিন্তু পাণিপতের শিবিরে অবরুদ্ধ অক্ষৌহিণীর দশা এবং যুদ্ধের দিনের বিস্তৃত বিবরণ দেয় এরূপ একখানি পত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও খুব কম।

কাশী রাও নামে একজন মারাঠা দূত পাণিপতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবদালীর সহায়ক অযোধ্যার নবাব শুজা-উদ্দৌলার অনুচর এবং নবাবের শিবিরে বাস করিতেন। যুদ্ধের ১৯ বৎসর পরে কাশী রাও পারস্য ভাষায় ঐ যুদ্ধের এক বিস্তৃত বিবরণ লেখেন; কাপ্তেন ব্রাউন কর্ত্তৃক তাহার ইংরেজী অনুবাদ ১৭৯৩ সালে ছাপা হয়। তাহাই এতদিন পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধের একমাত্র চাক্ষুষ সাক্ষীর কাহিনী বলিয়া লইয়া সব ইতিহাস এই উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। আর দুটি ছোট ছোট ফারসী বিবরণ এলিয়টের ৮ম ভলুমে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের মূল্য সামান্য মাত্র।

কিন্তু কাশী রাও অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান এক সাক্ষীর সন্ধান আমি পাইয়াছি। তাঁহার গ্রন্থ যুদ্ধের ৯ বৎসর মাত্র পরে লেখা; লেখক নজীব-উদ্দৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী উজীর ইমাদ-উল-মুল্‌কের কর্ম্মচারী, তথাপি তিনি নজীবের গুণগ্রামের নিরপেক্ষ ভাবে এবং কার্য্যকলাপের অতি বিস্তৃত ও সত্য বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সে যুগের আর কোন গ্রন্থে এই ঘটনাগুলির এত বিস্তৃত এবং চোখে দেখা বর্ণনা পাওয়া যায় না। শুধু নজীব কেন, রুহেলাগণ, জাঠ রাজা, শিখদের অভ্যুদয়, আবদালীর গতিবিধি, দিল্লীর রাজদরবারের অবস্থা, মারাঠাগণের কার্য্য ও নীতি, ইত্যাদি বিষয়েও এই গ্রন্থ বিস্তৃত অমূল্য ও মৌলিক সংবাদ দেয়। উত্তর ভারতের ১৭৫৭—১৭৭০ ব্যাপী যুগের ইতিহাস লিখিতে হইলে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

গ্রন্থখানি নজীব-উদ্দৌলার জীবনী। ইহার একমাত্র ফারসী হস্তলিপি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। নজীব-উদ্দৌলা নজীবাবাদ নামক সহর (বিজনৌর জেলায়, হরিদ্বারের ঠিক দক্ষিণ পূর্ব্বে) স্থাপন করেন। তিনি মারাঠাদের চির শত্রু, অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি যে প্রকৃত পক্ষেই মন্ত্রী, সেনানায়ক, ও জাতীয় নেতার সকল গুণে ভূষিত ছিলেন তাহা এই জীবনী ছত্রে ছত্রে প্রমাণ করে। ফলতঃ, এই ক্ষণজন্মা পুরুষ দশ বৎসর ধরিয়া দিল্লীর রাজশক্তির কেন্দ্র ছিলেন; তিনি কিরূপ ঘটনার মধ্যে কার্য্য করেন, কখন কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া কি ফল পান তাহা ইহাতে অতি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে সেই অদ্বিতীয় হস্তলিপির ফটো আনাইয়া তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি কিছু সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এ পর্য্যন্ত মূল গ্রন্থ অমুদ্রিত; এবং কোনও ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই। ইহা হইতে আমরা পাণিপত ক্ষেত্রের যুদ্ধ মাত্র নহে, সমস্ত সুদীর্ঘ সংঘর্ষ-পরম্পরা (campaign) যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই।

মারাঠাদের দিল্লী অধিকার

১৭৬০ সালের গ্রীষ্মকাল শেষ হইলে শুনা যাইতে লাগিল যে মারাঠারা দিল্লী আক্রমণ করিতে রওনা হইতেছে। নজীব-উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ হইতে নবাব শুজাউদ্দৌলাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আহমদ শাহ আবদালীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এদিকে, সদাশিব রাও ভাউ মথুরায় আসিতেই, সুরজমল জাঠ এবং বাদসাহের উজীর ইমাদ্ উল্ মুল্ক্ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ভাউ নিজে মথুরায় থাকিয়া, মলহর রাও হোলকরকে জান্‌কোজি সিন্ধিয়া এবং বলবন্ত রাও মেহেন্দেলের সহিত দিল্লীতে পাঠাইলেন। এই তিন সেনানী অনায়াসে দিল্লীর শহর অধিকার করিয়া দুর্গটি অবরোধ করিলেন। আহমদ শাহ নিজের উজীরের ভ্রাতা ইয়াকুৎ আলী খাঁকে ৩০০ অশ্বারোহী, একজন গোলন্দাজ সর্দ্দার, একজন জর্‌রাব্‌-বাশী এবং ৩০০ হিন্দুস্থানী পদাতিক সহ, ঐ দুর্গ রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া রাখিয়া যান।

মারাঠা সেনাপতিদের পৌঁছার তিন দিন পরেই অর্থাৎ ২৪ জুলাই ১৭৬০, ভাউ স্বয়ং দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তখনও দুর্গ দখল হয় নাই বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন। ইহার তের দিন পরে, বিনা যুদ্ধে তিনি দিল্লীদুর্গের দখল পাইলেন। দুর্গমধ্যে দেওয়ান্-ই-খাস্ প্রাসাদের ছাদের নীচের রূপার আবরণ খুলিয়া গলাইয়া ১৪ লক্ষ টাকা প্রস্তুত করাইলেন এবং কয়েক দিন দিল্লীতে কাটাইলেন।

কুঞ্জপুরা লুণ্ঠন

এদিকে আহমদ শাহ আবদালী কৈল (অর্থাৎ আলীগড়) হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লীর দুই ক্রোশ দূরে, যমুনার অপর পারে, শাহদরা নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তিনি স্বচক্ষে মারাঠা হস্তে দিল্লী শহরের নিগ্রহ দেখিলেন, কিন্তু যমুনার প্রবল স্রোত পার হইয়া দিল্লীরক্ষার জন্য আসিতে পারিলেন না। আবদালীর এই অবস্থা দেখিয়া, ভাউ দিল্লীর চারিদিকে নিজ থানা বসাইয়া, স্বয়ং সরহিন্দের পশ্চিমের অঞ্চলটা অধিকার করিবার ইচ্ছায় রওনা হইলেন, এবং দিল্লী হইতে ষাট ক্রোশ উত্তরে কুঞ্জপুরা শহরের নিকট পৌঁছিলেন।

এই শহরের অধিকারী নেজাবৎ খাঁ মারাঠাদের বাধা দিতে প্রস্তুত হইলেন। সমন্দ খাঁ নামক আবদালীর এক জন প্রধান সর্দ্দার লাখিজঙ্গল পরগণা হইতে পাঁচশত সৈন্যসহ এবং কুতব শাহ নামে একজন রুহিলা সর্দ্দার অল্প কিছু অনুচর লইয়া নেজাবতের সঙ্গে যোগ দিলেন। নেজাবৎ খাঁ উভয় দলকেই বলিলেন, "এই সামান্য বল লইয়া খোলা মাঠে থাকিয়া মারাঠা-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা বৃথা। তোমরা বরং আমার শহরের প্রাচীরের মধ্যে আইস। এখানে থাকিয়া আমরা মাস দুই মারাঠাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব। তাহার মধ্যেই আহমদ শাহ আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন।" কিন্তু সর্দ্দার দুইজন সেকথা শুনিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, "তুমি প্রাচীরের মধ্যেই থাক। আমরা বাহিরে থাকিয়া খণ্ডযুদ্ধ (skirmishes) করি। যদি পরাস্ত হই, তখন তোমার পুরী মধ্যে আশ্রয় লইব।"

ভাউ তাঁহার সমস্ত সৈন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মারাঠা-দলে এক লক্ষ অশ্বারোহী ও অনেক বড় তোপ ছিল। বারো হাজার গার্দ্দি—অর্থাৎ ফরাসী কায়দায় শিক্ষিত সিপাই—সহিত ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দিকে অগ্রগামী করিয়া ভাউ কুঞ্জপুরা আক্রমণ করিলেন। সমন্দ খাঁ দুই হাজারেরও কম সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ইব্রাহিম খাঁ ইউরোপীয় রণ-প্রণালীতে কামান চালাইতে লাগিলেন। সমন্দ খাঁর অশ্বারোহীগণ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ইব্রাহিম তাঁহার সমস্ত কামান একবার ছুঁড়িলেন, আর ভাউ তাঁহার সমস্ত বাহিনী ও হস্তী লইয়া আক্রমণ করিলেন। সমন্দ খাঁ মারা গেলেন, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলাইয়া নগর-দ্বারে আসিয়া জুটিল। নেজাবৎ খাঁ কিন্তু দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আফঘান সৈন্যগণ এমন কি স্বয়ং কুতব্ শাহ রাগ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা আহমদ শাহের সৈন্যদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিতেছ! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে

যে মারাঠাসৈন্যের সঙ্গে তোমাদের যোগ আছে। বেশ ত, আহমদ শাহ এখনও জীবিত আছেন, তিনি অবিলম্বে তোমাদের কৃতকর্ম্মের ফল দিবেন।" এই তর্কবিতর্কের ও তর্জ্জনের ফলে নগরদ্বার খোলা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠারা সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা গোলমালে পলাতকদিগের সহিত নগরে প্রবেশ করিল। তাহারা সমস্ত শহর লুঠ করিল। নেজাবৎ ও তাঁহার দুই পুত্রকে মারিতে মারিতে মারাঠা-শিবিরে লইয়া গিয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিল। দিলির খাঁ নামক নেজাবতের এক পুত্র মাত্র বাঁচিল। কুতব্ খাঁও বন্দী এবং দুই দিন পরে হত হইলেন। মারাঠারা সমস্ত শহর খুঁড়িয়া অনেক ধন পাইল। অগণিত, উট, ঘোড়া, শস্য এবং তোপ এখানে মারাঠাদের হাতে পড়িল। তাহারা শহরের স্ত্রীলোকদের লাঞ্ছনা করিয়া আনন্দে রহিল। [১৭ অক্টোবর, ১৭৬০]

বাঘপতে আহমদ শাহ যমুনা পার হইলেন

এই সংবাদ পাইয়া আহমদ শাহ ক্ষুব্ধ হইলেন, আফঘান প্রধানদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে আফঘান জাতির এই লাঞ্ছনা হইল, ইহা আমার সহ্য হয় না। যেমন করিয়া পার, হাঁটিয়া যমুনা পার হইবার স্থান শীঘ্র বাহির কর।" কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা তাহা করিতে পারিল না। তখন শাহ পার হইবার উদ্দেশ্যে নদীর তীর ধরিয়া মারাঠাদের অভিমুখে উত্তর দিকে চলিলেন, এবং দিল্লীর ১৪ ক্রোশ দূরে বাঘপৎ নামক স্থানে পৌছিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া ভাউ শঙ্কিত হইলেন; যমুনা নদী শত্রুর আগমনে বাধা দিবে বলিয়া তাঁহার যে আশা ছিল তাহাতে সন্দেহ জন্মিল। তখন সর্‌হিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংকল্প ছাড়িয়া দিলেন, এবং দিল্লী হইতে বিশ ক্রোশ দূরে শোণিপতের নিকট যমুনার ঘাটে শত্রু পার হইবে ভাবিয়া তথায় এক হাজার অশ্বারোহীকে দিনরাত পাহারা দিবার জন্য পাঠাইলেন।

এ দিকে আহমদ শাহ বাঘপতে চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করিয়া একদিন সমস্ত বাহিনী লইয়া নদীতীরে আসিলেন এবং রুহিলা সর্দার ও শুজাউদ্দৌলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা হিন্দুস্থানের প্রধান লোক। এটা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে আপনারা কেহই এই নদী পার হইবার স্থান জানেন না! কিন্তু আমার চক্ষে নিশ্চয়ই এইরূপ স্থান বাহির হইবে।" তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমরাত স্বার্থের দাস মাত্র। জাহাঁপনা আমাদিগের রক্ষার জন্যই এত দীর্ঘ পথের শ্রম ও দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছেন। আমরা অসহায়।" তখন আহমদ শাহ উত্তর করিলেন, "আমরা এখন আর মানবশক্তির উপর নির্ভর করিব না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি সেই স্থানেই নদী পার হইব। চল!"

এই বলিয়া আবদালী 'ফতেহা' পাঠ করিয়া নিজ ঘোড়া নদীমধ্যে চালাইয়া দিলেন। তাঁহার ঘোষণা-কারী কর্ম্মচারী উচ্চৈস্বরে সমস্ত সেনাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে হুকুম দিল। সকলেই তাহা করিল এবং কোথায় বা হাঁটিয়া কোথায়ওবা সাঁতরাইয়া অপর পারে গিয়া পৌছিল। সেখানে আর এক বাধা দেখা দিল, ঐ তীরে এত গভীর কাদা যে মানুষ বা ঘোড়া কেহই তাহার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। তখন শাহ সকলকে আজ্ঞা দিলেন যে প্রত্যেকে গাছের ডাল, ঘাস বা পাতা, যে যাহা পারে, আনিয়া ঐ কাদার উপর ফেলিয়া পথ তৈয়ারি করিবে। সেখানে অসংখ্য ঝাউগাছ জন্মিয়াছিল। আবদালীর উজীর ঘোড়া হইতে নামিয়া স্বহস্তে ঝাউএর ডাল কাটিয়া আনিলেন; শাহের নিজগোত্রীয় (fellow clansmen) আট হাজার অশ্বারোহীও সেইরূপ করিল; অপর সব সৈনিকেরাও আঁটি আঁটি ঝাউ আনিয়া কাদার উপর ফেলিল। এক ঘড়ী সময়ের মধ্যেই দুইগজ উচু পথ প্রস্তুত হইল, সমস্ত আফঘান সৈন্য পার হইয়া গেল, কেবল দশ পনর জন ডুবিয়া মরিল। কামানগুলি হাতীর কোমরে বাঁধিয়া পার করা হইল।

শোণিপতে খণ্ডযুদ্ধ

যমুনার পশ্চিম কূলে পৌছিয়া আবদালী নজীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ন্যাংটা-পিঠ প্রহরী সেনা এখান হইতে কত দূরে আছে?" মারাঠারা ছয় ক্রোশ উত্তরে ছিল। তখন আহমদ নিজ সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী খণ্ডযুদ্ধ-কারী (qurawwal) বিভাগের নেতা শাহ পছন্দ খাঁকে চারহাজার ঘোড়সোয়ার সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিঃশেষে বধ করিতে হুকুম দিলেন।

নজীবের লোক পথ দেখাইয়া চলিল এবং দুই ঘড়ীর মধ্যে আফঘান সেনাদলকে তথায় লইয়া গেল। মারাঠারা প্রথমে যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আফঘানেরা অগ্রসর হইতেই তাহারা নিজ ছাউনীর দিকে ছুট দিল। শাহ পছন্দ খাঁ বন্দুকের গুলি বর্ষণ করিয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়া, পরে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া তাহাদের উপর অসিহস্তে গিয়া পড়িলেন এবং এই মারাঠাদল সব নিহত হইল। তাহাদের মাথা কাটিয়া লইয়া আফঘানগণ রওনা হইবার ছয় ঘড়ীর মধ্যে নিজ শিবিরে ফিরিল।

পাণিপতে সৈন্য-সমাবেশ

আফঘান-রাজ পর দিনই পাণিপত অভিমুখে রওনা হইয়া তৃতীয় দিবসে সেখানে পৌছিয়া ঐ শহরের তিন ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিলেন। অপর পক্ষে উত্তর দিক হইতে ভাউ আসিয়া শহরটির গায়ে লাগাইয়া ছাউনী করিলেন। তাঁহার সৈন্যদের জন্য দিল্লীর মারাঠা দুর্গরক্ষক নারোশঙ্কর তথা হইতে রসদ পাঠাইতেন। পুণা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়া অবিরত গোলাগুলি, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং মালের গাড়ী আসিতে লাগিল

আহমদ শাহ প্রত্যহ প্রাতে নিজ পুত্র তাইমুর শাহকে সঙ্গে লইয়া ছাউনীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক জন সইস্ ভিন্ন অন্য কোন অনুচর থাকিত না। তাঁহারা মাথার পাগড়ীর উপর গুচ্ছ (জীঘা) অথবা অন্য কোন উজ্জ্বল ভূষণ পরিতেন না। সজ্জা ছিল কালো টুপি, তদুপরি একখানা শাল, দেহে লাল রঙ্গের পশমী জামা, কটিদেশে ধনুক ও তূণ। তাঁহার হুকুম ছিল যে স্বজাতীয় সৈন্য এবং ভারতীয় আফঘান সর্দ্দারদের এবং নবাব শূজাউদ্দৌলার অনুচরগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে কিন্তু তাঁহার আদেশ বিনা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নড়িবে না।

খণ্ডযুদ্ধ-কারী দলের নায়কেরা তাঁহাকে চারিদিক হইতে সংবাদ আনিয়া দিত। যখনই কোন মারাঠা দল নিজ শিবির হইতে বাহির হইত, তখনই আবদালী নিজের কোন এক অশ্বারোহী দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতেন এবং তাহাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতে থাকিতেন। যখন দেখিতেন যে দূরের ধূলা তাঁহার দিকে আসিতেছে তখন বুঝিতেন যে তাঁহার সৈন্যগণ হঠিতেছে, ধূলা অধিকতর দূরে গেলে বুঝিতেন যে মারাঠারা হারিয়া গিয়াছে; এবং সেই অনুসারে নিজের সেনা হইতে অপর একদল পাঠাইতেন যে অগ্রে গিয়া প্রথম দলকে পুষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা বা পশ্চাদ্ধাবনে সাহায্য করুক। যুদ্ধ কঠিন হইলে তিনি নিজে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সৈন্যদের পরিচালনা করিতেন। গুপ্তচরে-(হর্‌করা) র পরিবর্ত্তে এইরূপ খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত সেনাদের মধ্য হইতে লোক আসিয়া আবদালীকে পদে পদে যুদ্ধের অবস্থা জানাইত,—যেমন 'এখন গুলি চলিতেছে', 'এখন অসি চলিতেছে', 'এত সৈনিক মারা পড়িয়াছে', 'এত আহত হইয়াছে', 'শত্রুদের অমুক রঙ্গের পতাকা, বা অমুক রঙ্গের হাওদায় চড়া নেতা আমাদের বিরুদ্ধে আসিতেছে'।

এইরূপে দুপ্রহর বেলা অতীত হইত। তাহার পর আবদালীরাজ শৌচের জন্য একটি চৌকোণা ঘের এবং বাসের জন্য একটি ছোট তাম্বু সেখানে খাড়া করিতেন। যতক্ষণ শাহ ঘোড়ায় চড়িয়া থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিত; তিনি তাম্বুতে গিয়া বসিলেও তাহারা সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকিত; শুধু হাফিজ রহমৎ খাঁ যখন দরবার হইত না তখন বসিবার হুকুম পাইতেন, কারণ তিনি কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং এজন্য মান্যার্হ।

মারাঠাদের রসদ আগমনের পথ বন্ধ হইল

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী অন্তর্ব্বেদ (অর্থাৎ দো-আব্) এবং দিল্লী হইতে ভাউ সাহেবের শিবিরে রসদ পৌছিত। নজীব আহমদ শাকে জানাইলেন, "দোয়াবে আমার আমলারা আছে, কিন্তু দিল্লীর চারিদিকে দশ বারো ক্রোশের মধ্যে আমার ক্ষমতা নাই। আপনি কিছু সৈন্য দিলে আমি আমার কর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের শাহদরাতে পাঠাইয়া ঐ পথে মারাঠাদের কাছে শস্য আসা বন্ধ করিতে পারি।" আহমদ শাহ করিমদাদ খাঁ জারচীর দল হইতে এক হাজার অশ্বারোহী এজন্য নিযুক্ত করিলেন। নজীবের সিকান্দ্রাবাদ ও অন্যান্য পরগণার আমলাদের সহিত মিলিয়া এই দল দিল্লীর চারিপাশে শাহদরা পর্য্যন্ত লুট ও খুন করিতে লাগিল। দিল্লীর মারাঠা কেল্লাদার নারোশঙ্কর সেখান হইতে জীবাজী বখ্‌শী ও মির খাঁ নাথুর অধীনে কিছু পদাতিক উহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন,

কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারিল না, জনকত মারা যাইতেই তাহারা দিল্লীতে পলাইয়া আসিল। রসদের এই পথ বন্ধ হইল।

ইহার পর আহমদ খাঁ করিমদাদ খাঁ জারচী এবং মির আতাই খাঁকে বলিলেন, "আমার সৈন্যেরা আজ দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের শ্রম-ক্লেশ সহ্য করিতেছে। তোমরা সদ্য কান্দাহার হইতে আসিয়াছ। তোমরা অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া মারাঠাদের রসদ আসিবার পথ বন্ধ কর।" তখন ঐ দুই আফঘান সেনাপতি মুসা খাঁ নামক এক বলোচ্ সর্দ্দার এবং দিল্লীর আশপাশের কয়েক জন প্রধান লোকের সাহায্যে দুইবার মারাঠাদের রসদবাহী দলের উপর আক্রমণ করিয়া সকলকে মারিয়া ফেলিল। এইরূপে ভাউএর শিবিরে প্রকাশ্য ভাবে রসদ আসা বন্ধ হইল।

পাণিপতে এবং তাহার নিকটের স্থানগুলিতে অনেক বন্‌জারা বাস করিত। বেশী পারিশ্রমিক পাইলে তাহারা গুপ্ত পথে রাত্রিযোগে মারাঠাদের নিকট শস্য আনিয়া দিত। কিন্তু ক্রমে ভাউ সাহেবের ধন কমিয়া আসিল। তখন তাঁহার আদেশ অনুসারে নারোশঙ্কর পাঁচশত অশ্বারোহী সৈনিককে প্রত্যেকের কোমরে পাঁচ পাঁচ শত মোহর বাঁধিয়া রাত্রিযোগে দিল্লী হইতে পাণিপত অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাতের পূর্ব্বেই করিমদাদ খাঁ ও আতাই খাঁর সেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ গুলিবর্ষণে মারাঠাদের গতিরোধ করিয়া, পরে অসিহস্তে তাহাদের উপর পড়িল। প্রায় সকল মারাঠা সৈন্যই নিহত হইল, দুই তিন জন মাত্র প্রাণে প্রাণে দিল্লীতে ফিরিল। উহাদের সঙ্গের ধন লুণ্ঠিত হইল, উহাদের অশ্ব ও ছিন্নশির আহমদ শাহের নিকট আনা হইল। ভাউয়ের ছাউনীতে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

মারাঠা-রুহিলা সংঘর্ষ

এইরূপে একমাস গত হইল। একদিন নজীবের ভ্রাতা সুলতান খাঁ তাঁহার যুদ্ধরত সৈনিকদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "যদি আমার এই পদাতিকগণ সাহসভরে যুদ্ধ করে তবে আজই আমরা অসিবলে মারাঠাদের নিজ শিবির হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি।" তাঁহার সৈনিকেরা স্বীকৃত হইল।

মারাঠারা প্রত্যহ চারি ঘড়ী দিন থাকিতে তাহাদের কামান যুদ্ধক্ষেত্রের গড়খাই (trenches) হইতে ছাউনীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইত। সেদিন যখন এইরূপ করিতেছিল তখন রুহিলারা তাহাদের আক্রমণ করিল। মারাঠা অশ্বারোহীরা পলায়ন করিল। রুহিলারা তাহাদের তাড়া করিয়া মারাঠা ছাউনীর নিকট পৌছিল। তখন সমস্ত মারাঠা সেনা, অশ্বারোহী ও পদাতিক রুখিয়া বাহির হইল। এদিকে দিন গতপ্রায়; দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। রুহিলারা মাত্র দুই হাজার অশ্বারোহী ও তিন হাজার পদাতিক। অশ্বারোহীরা পলায়ন করিল। কিন্তু পদাতিকগণ ধ্বজা উচ্চ করিয়া মারাঠাদের মাটীর দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের গুলিবর্ষণে মারাঠা অশ্বারোহীরা তাহাদের নিকটে আসিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি ও ভাউয়ের তোপের সর্দ্দার বলবন্ত রাও পদাতিক লইয়া উপস্থিত হইলেন। রুহিলারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্বয়ং বলবন্ত রাও উদরে দুইগুলি বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইলেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ ও তাঁহার গোলন্দাজগণ ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পনের শত রুহিলা নিহত হইল। অবশিষ্ট রুহিলা যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি হইলে শিবিরে ফিরিল।

সন্ধির ব্যর্থ চেষ্টা

রুহিলা পদাতিকদিগের বিনাশে নজীব ম্রিয়মাণ হইলেন। এই সময় মারাঠাদিগের অনুরোধে উজির শাহ ওলি খাঁ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই ব্যাপারের মধ্যস্থ ছিলেন হাফিজ রহমৎ খাঁ। তিনি নজীবের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষা করিতেন। নজীব পূর্ব্বে এক দরিদ্র সামান্য আফঘান ছিল, এখন সে রহমতের উপরস্থ আমির হইয়াছে ও তাহারই যত্নে শূজাউদ্দৌলা আহমদ শাহের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। রহমৎ প্রস্তাব করিলেন যে নিজাম-উল্-মুলক্‌কে হিন্দুস্থানের উজির করা হউক। শাহ ওলি খাঁও আহমদ শাহকে বুঝাইলেন যে তাহাই করিয়া মারাঠাদিগের সহিত সন্ধি করা উচিত। শাহ সম্মত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রভাতে নজীব রাজসভায় আসিয়া শাহ ওলি খাঁর মুখের উপর বলিলেন, "গতকল্য আমার চারি সহস্র জ্ঞাতি-ভ্রাতা মারাঠা সৈন্যদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি শুনিতেছি যে কয়েকটি বলহীন

ব্যক্তি সন্ধি করিয়া আফঘানদিগকে মারাঠাদের হস্তে সঁপিয়া দিতে চায়। এরূপ লোক ঘোর কাপুরুষ, তাহারা আফঘান নয়। আমি আহমদ শাহের সম্মুখে স্পষ্ট বলিতেছি তিনিই ইস্লামের সর্ব্বময় অধিপতি, তিনি স্বজাতিগণকে মারাঠাদের হস্তে সঁপিয়া দিয়া কখনই আফঘানদিগের মান নষ্ট করিবেন না।" নজীব সন্ধি-প্রস্তাবকদিগের প্রতি আরও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। শাহ ওলি খাঁ রুষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন এবং পস্তু ভাষায় "গু মথোর্" (অর্থাৎ "মিছা বকিও না") এই মাত্র বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সর্দ্দার জাহান খাঁ ও কাজি ইদ্রিসের আহমদ শাহের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নজীব তাঁহাদিগকে এই যুদ্ধকে ধর্ম্মযুদ্ধ বুঝাইয়া শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। সর্দ্দার জাহান খাঁ বলিলেন, "জাঁহাপনার জয় হোক! বিধর্ম্মীদের সহিত সন্ধি করা জাঁহাপনার উচিত নহে। আমরা হীনবল হই নাই বা কোনও যুদ্ধে পরাজিত হই নাই; এই বিধর্ম্মী মারাঠারা লাহোরে আমাদের লোকদের কি না দুর্গতি করিয়াছে? এই সেদিন উহারা কুঞ্জপুরায় আফঘানদিগকে যথেচ্ছ অপমান করিয়াছে। ইমাদুল-মুলক্ দিল্লীর বাদশাহকে নিধন করিয়াই এই অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে।" শাহ উত্তর করিলেন, "আমি সমস্তই জানি এবং ইমাদকে ঘৃণা করি। কিন্তু এখন আমার ঘোর অর্থাভাব। মারাঠাদিগের হাত হইতে ভূমি উদ্ধার করিয়া তাহা আমি ভারতীয় আফঘান-দিগকে দিয়াছি। তাহারা নিজে স্বচ্ছন্দে আছে, অথচ আমার সৈন্যরা অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। আমি শুধু তাহাদের জন্যই এই দুই বৎসর যুদ্ধের ক্লেশ ভোগ করিতেছি, মারাঠারা ত আমার রাজ্য আক্রমণ করে নাই। শুধু ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়াই আমি ইহাতে ব্রতী হইয়াছি

তখন কাজি ইদ্রিস বলিলেন, "এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না। আপনার আধিপত্য ঈশ্বরদত্ত, উহা রুহিলাদিগের ধন-সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। আপনি নাদির শাহের দশা দেখিলেন—কেমন পলকে প্রলয় ঘটিল। আপনি ঈশ্বরে নির্ভর করুন। শত্রুর ভয় নাই, ধনাভাবের ভয় নাই।" এই সঙ্গে সমবেত দুরানি সর্দ্দারগণও বলিয়া উঠিলেন, "কাজি ঠিক বলিয়াছেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা কায়মনে জাঁহাপনার বাধ্য থাকিব। ভুক্ত বা অভুক্ত থাকি না কেন, কখনই আমরা চেষ্টার কম করিব না।" আহমদ শাহ বলিলেন, "সন্ধির প্রস্তাব ত্যাগ করিলাম, ফাতেহা উচ্চারণ কর।" মারাঠা দূতদিগকে বিদায় দেওয়া হইল।

গোবিন্দ পণ্ডিতের পরাভব

ইতিমধ্যে সংবাদ পৌছিল যে কাল্পি শুকোহাবাদ প্রভৃতি পরগণার কর্ম্মচারী গোবিন্দ পণ্ডিত বা গোবিন্দ বুন্দেলে মিয়ান-দোয়াবের পথে ভাউয়ের সহিত যোগ দিতে আসিতেছেন। তিনি দশ হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া নজীবের পরগণাগুলি লুণ্ঠন করিতে করিতে আসিতেছিলেন। আহমদ শাহের আদেশে জারজী করিমদাদ খাঁ ও মির আতাই খাঁ, করিম খাঁ নামে নজীবের এক জমাদারের সঙ্গে যমুনা নদী পার হইয়া এক দিবারাত্রে পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে সিকেন্দ্রাবাদ হইতে মিরাটে উপনীত হইল এবং প্রভাতেই গোবিন্দের শিবির আক্রমণ করিল। গোবিন্দ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। উহারা গোবিন্দের শিরশ্ছেদ করিল [২২ ডিসেম্বর ১৭৬০]।

গেবিন্দের পুত্র বালাজি কয়েকটি পার্শ্বচরের সহিত কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া শিবির হইতে পলায়ন করিল। এই দশ হাজার অশ্বারোহীর শিবির নিঃশেষে লুণ্ঠিত হইল। চতুর্থ দিবসে গোবিন্দের ছিন্নশির আহমদ শাহের শিবিরের বাজারে মঞ্জিল-ই-মুমার নীচে নিক্ষিপ্ত হইল।

ইহার পরে মারাঠা শিবিরে দারুণ অভাব উপস্থিত হইল। ভীত হইয়া উহারা চারিদিকে প্রাকার প্রস্তুত করিতে ও এক দক্ষিণী বল্লম পরিমিত গভীর পরিখা খনন করিতে লাগিল। প্রত্যহ কতিপয় সৈন্য বাহিরে আসিয়া খণ্ডযুদ্ধ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া যাইত। এইরূপে দুইমাস গত হইল। আহমদ শাহ তাহাদের খাদ্য আগমনের পথরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে তাহারা এক যুদ্ধেও প্রবল হইতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িতে লাগিল।

পাণিপতের যুদ্ধ (১৪ জানুয়ারী, ১৭৬১)

একদিন সমস্ত মারাঠা-বাহিনী ও তোপ পরিখার বাহিরে আসিল। এবং ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি, হোলকর ও সিন্ধে

মিলিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। আহমদ শাহ তাঁহার নিয়ম মত সকল সৈন্যদলকে বাহির করিয়া খণ্ড যুদ্ধ করিতে লাগাইলেন। প্রথমতঃ মারাঠাদের প্রাধান্য দেখা গেল। শাহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে সমস্ত মারাঠা-বাহিনী ও তোপ বাহির হইয়াছে। শূজাউদ্দৌলা, হাফিজ, রহমৎ, ডুণ্ডি খাঁ, আহমদ খাঁ বঙ্গশ প্রভৃতি হিন্দুস্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ যুদ্ধ করিতেছিলেন। নজীবের সম্মুখে হোলকর আসিলেন এবং সকল শরীর-রক্ষীগণ (মারাঠী ভাষায় 'হুজরাৎ') সহ ভাউ স্বয়ং আহমদ শাহের সেনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভাত হইবার পর তিন ঘণ্টা ধরিয়া কামান ও হাউইয়ের সাহায্যে যুদ্ধ হইল। তাহার পর অশ্বারোহীদের দ্বারা গুলি-বর্ষণ ও বল্লম চলিল। মারাঠাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আহমদ খাঁ বঙ্গশ, করিম খাঁ ও মির আতাই খাঁকে স্বীয় সৈন্যের সাহায্যে পাঠাইলেন। এই দুই দল সেনাই যুদ্ধ করিল।

আহমদ খাঁ বঙ্গশ ও ডুণ্ডি খাঁর সেনা ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি প্রমুখ মারাঠা পক্ষের নেতাদের অশ্বারোহীগণ কর্ত্তৃক ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইল। ডুণ্ডি খাঁর বহু সৈন্য নিহত হইল ও অবশিষ্ট সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এমন কি তাহাদের কয়েকজন পলায়ন করিল। ডুণ্ডিখাঁর নিজের হাতী পঞ্চাশ পদ পিছনে হঠিয়া আসিল। বঙ্গশ হঠিলেন না বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইলেন। শূজা বা নজীব কাহারও সৈন্য এই যুদ্ধে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয় নাই।

দ্বিপ্রহর সময়ে ভাউ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ও পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। বন্দুক, বল্লম ও অসির সাহায্যে যুদ্ধ চলিল। মির আতাই খাঁ নিহত হইলেন ও শাহের সেনা বিপদে পড়িল। 'বাশ্‌গোল্' নামে তিন দলে শাহের ছয় হাজার দাস-সেনা প্রস্তুত ছিল। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া শাহ বলিলেন, "বৎসগণ! এই তোমাদের সময়। শত্রুকে ঘিরিয়া ফেল।" তাহারা তিন দিক হইতে অগ্রসর হইয়া সমবেত গুলিবর্ষণে ভাউয়ের সেনার অগ্রভাগকে পশ্চাতের ভাগের উপর হঠাইয়া দিল। দারুণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং কতক সৈন্য পলায়নপর হইল; মাত্র ভাউয়ের স্বীয় সেনাদল স্থির থাকিল। ঐ তিন দল দাস-সেনা তখন ঐ এক লক্ষ মারাঠা সেনা বেষ্টন করিয়া, পালাক্রমে একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গিয়া গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। মনে হইল যেন উহারা চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। মারাঠারা ত্রস্ত হইল ও উহাদের কেহ কেহ পলায়ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আহমদশাহ স্বীয় উজিরের সৈন্যগণকে দাসসৈন্যদিগের সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া-পড়া মারাঠাগণ ক্রমে হঠিয়া মধ্যে গোলাকারে ঘন ভীড় করিয়া দাঁড়াইল; তাহাতে আবদালী সৈন্যের প্রত্যেক গুলি ঠিক লাগিল।

এই সময় ভাউয়ের বাহিনীর প্রকৃত নেতা বিশ্বাস রাও গুলিবিদ্ধ হইলেন এবং মারাঠাদিগের পরাজয় যে অনিবার্য্য তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। ভাউ আসিয়া দেখিলেন যে বিশ্বাস রাও-এর মৃতদেহ হস্তীর পৃষ্ঠে পড়িয়া আছে, তাঁহার পদদ্বয় হস্তীর মাথার পার্শ্বে ঝুলিতেছে। তিনি একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিজের প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ নেতাদিগের সঙ্গে করিয়া ভীষণ বেগে উজিরের সেনার উপরে গিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া আহমদ শাহ তাঁহার দেড় হাজার লম্বা Swivel-বন্দুকবাহী উষ্ট্র-সেনাকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাহাদের একত্র পনের শত গোলাবর্ষণে ভাউয়ের বহু অশ্বারোহী ও প্রধান ধরাশায়ী হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ হঠিয়া গেল। দাসসেনা ও উজিরের সেনা অবিরাম যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভাউ পুনরায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবারও উষ্ট্রবাহী কামানের গোলাবর্ষণে নিজের বহু সৈন্যের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পশ্চাতে হঠিতে বাধ্য হইলেন। এই দুই বারই মারাঠাদের হঠাইয়া উষ্ট্র-সেনাদল অগ্রসর হইল। আহমদ শাহ স্বয়ং এই দলের পশ্চাতে ছিলেন। যখন প্রায় তিন ঘণ্টা দিন অবশিষ্ট ছিল তখন মারাঠারা দলে দলে পলায়ন আরম্ভ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু ভাউয়ের অধীন কয়েকটি হস্তী ও পেশোয়ার প্রধান ধ্বজা এবং প্রায় ৫০০০ অশ্বারোহী সৈনিক প্রাণরক্ষার্থে ব্যাকুল ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আহমদ শাহ "খাঁদিগের দল" অর্থাৎ স্বীয় গোত্রের আট হাজার অশ্বারোহী সেনাকে উহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। ভাউ নিহত হইলেন। তাঁহার ও অন্যান্য প্রধানগণের শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

শাহের সমস্ত ফৌজ, আফঘান ও মোগল, রুহিলা, ইরাণী ও হিন্দুস্থানী জুটিয়া হত ও পলায়নপর মারাঠা সৈন্যদিগকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অগণিত ধন উহাদের হস্তগত হইল। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই পশ্চাদ্ধাবন ও লুণ্ঠন চলিল, তাহার পর উহারা স্ব স্ব স্থানে ফিরিল।

মারাঠা শিবিরের মধ্যেও অগণিত ধনসামগ্রী শাহের স্বগোত্রীয় সৈন্যগণের হস্তে পড়িল। এই লুণ্ঠনে ইরাণী বা

তুরাণীদিগকে উহারা যোগ দিতে দিল না। যাহা পাইল নিজেরাই লইল। হিন্দুস্থানী সৈনিকদিগের নিকট এক একটি ব্রাহ্মণ-নারী এক তুমান্ (পারস্যের টাকা) মূল্যে ও এক একটি অশ্ব দুই তুমান্ মূল্যে বিক্রীত হইল।

দুরানিরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাহাকে পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। যাহারা পাণিপত-গ্রামের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া বধ করিল। পরিখার মধ্যে শত শত মারাঠা সৈন্য ও অশ্বের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিল। বাহিরের ভূমিও অসংখ্য মৃতদেহে সমাকীর্ণ হইল। বহু বৎসর পর পর্য্যন্ত এই সকল দেহের কঙ্কালের জন্য এই ভূমির কর্ষণ কঠিন হইত।

যুদ্ধের পরিশেষ

নজীবের অনুগ্রহে মলহর রাও হোলকর নিরাপদে পলায়ন করিলেন। জান্‌কোজি সিন্দেও রণক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হরিয়ানা (Hariana) অঞ্চলের চাষীদের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশ জন অশ্বারোহী ছিল। তাহারাও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া প্রাণ হারাইল অথবা পলায়ন করিয়া বাঁচিল।

অন্তাজি (Antaji) মাণ্‌কেশ্বর নামে দুই হাজার অশ্বারোহীর এক নেতাকে হরিয়ানার লোকেরা লগুড়াঘাতে হত্যা করিল। যে সব মারাঠা প্রাণে বাঁচিল তাহারা জাঠদের গৃহে আশ্রয় লইয়া 'সের ভর আটা' পাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। যাহারা আহত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও পাণিপতের দারুণ শীতে প্রাণ ত্যাগ করিল।

পোষাকের চাকচিক্যে ভাউএর মৃত দেহ চিনিতে পারিয়া আহমদ শাহের নিকট নীত হইল। নজীব মারাঠা বন্দীদের মধ্য হইতে ভাউএর আত্মীয়দের আনাইয়া ঐ দেহ দেখাইলেন। তাঁহারা তাঁহার শরীরের চিহ্ন-বিশেষ দেখাইয়া বলিল যে "ইহাই ভাউএর দেহ।" আহমদ শাহ ঐ দেহ তাঁহার উজিরকে সমর্পণ করিলেন। ঐ সর্ব্বজনপ্রিয় উজির উহার সৎকারার্থে শূজাকে বলাতে, শূজার নির্দ্দেশমত গোঁসাইরা ঐ দেহ লইয়া দাহ করিল।

ভাউএর পত্নী পার্ব্বতী বাঈ এক মাদি ঘোড়ার পিঠে বসিয়াছিলেন। ভাউএর পতনের পরই তাঁহার সঙ্গের অশ্বারোহীরা কোন ক্রমে তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া অতি দ্রুত চলিয়া সাত প্রহরে যাট ক্রোশ অতিক্রম করিয়া দিল্লী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে বল্লমগড়ে পৌঁছিয়া, তথা হইতে ক্রমশঃ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

পেশোয়া ও জানোজি ভোঁসলা নর্ম্মদাতীরে মহেশ্বরে উপনীত হইয়া এই ভীষণ সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ফিরিলেন। পথে বাসোদায় পেশোয়ার মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। তিনি অবিরত সেই অষ্টাদশ বর্ষীয় মৃত পুত্র বিশ্বাস রাউএর জন্য কাঁদিতেন ও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন। কয়েক মাস মধ্যেই তিনি নিজেও প্রাণত্যাগ করিলেন।

সনেট

[Rupert Brooke এর ইংরেজী হইতে]

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বলিয়াছি মিথ্যা কথা, আমি তোমা বড় ভালবাসি—
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে;
সে দুরূহ দুঃখ সহে দেব কিম্বা মূঢ় মর্ত্ত্যবাসী
তোমা সম;—রুচি নাই সে নির্ম্মল মধু-হলাহলে।

প্রেমী ওঠে ঊর্দ্ধ স্বর্গে, অতি-সুখে মূর্চ্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে উল্কা সম অগ্নি-বেগবান;
আধো আলো-অন্ধকার মধ্য-শূন্যে ভ্রমে কত জনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে, এমনি অজ্ঞান—

ভালবাসে কি না বাসে; বাসে যদি, কেবা সেই প্রিয়া!
পুরাণো গানের বঁধু, কিম্বা কোনো চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ মুখ হেরি মুগ্ধ হিয়া;
বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল;

দুঃখ নাই সুখও নাই, দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া—
আমিও তাদের দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

কাব্য-সাহিত্যে অশ্লীলতা নামে যে দোষের কথা আমরা এত শুনিয়া থাকি, তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমেই বলিয়া রাখি আমি পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিতে চাই না; তথাপি যদি বিষয়টির আলোচনা-প্রসঙ্গে সেরূপ কিছু প্রকাশ পায় তবে তাহাকে আমার ব্যক্তিগত রুচির নিদর্শন মনে করিলে ভুল করা হইবে, আমি এ প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব বিষয়টির স্বাধীন মর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইব।

* * *

একালে এই প্রসঙ্গ-উত্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি কেন, তাহার কারণ বলি। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে যে বস্তুর এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, আধুনিক সাহিত্যে আমরা তাহাকে একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। এ যুগের প্রারম্ভে, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে যেরূপ সংগ্রাম চলিয়াছিল—সাহিত্যে এই অশ্লীলতা-নিবারণ কল্পে সেই মতই সংস্কার-আন্দোলন চলিয়াছিল, আধুনিক সাহিত্যের পত্তনকারী যাঁহারা তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই তথাকথিত ব্যাধির বিরুদ্ধে অতিশয় সতর্ক হইয়াছিলেন। যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের এই কুপ্রবৃত্তির উপরে কশাঘাত করিয়াছেন, গীতগোবিন্দ বা বিদ্যাসুন্দর সেই ইংরেজীশিক্ষিত রসিক-সমাজে জুগুপ্সার উদ্রেক করিত। যে-ভারতচন্দ্রের কাব্যরস দেশীয় সাহিত্য-রসিক-সমাজে তখনও অতিশয় উপাদেয় ছিল, সেই ভারতচন্দ্র বোধ হয় এই একটি মাত্র দোষে, এক ধাক্কায় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। অতঃপর এই অশ্লীলতা-বর্জ্জনই বাংলা কাব্যের উৎকর্ষনির্ণয়ে একটি আবশ্যিক লক্ষণ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। ইহার কারণ সুস্পষ্ট,—বিলাতী কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ ই আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল, রসিকতার যে সংস্কার জাতিগত ভাবে এতকাল টিঁকিয়া ছিল, তাহার সমূল উচ্ছেদসাধন সম্ভব হইয়াছিল—অন্ততঃ নব্যশিক্ষিত রসিক সমাজে আজও এই আদর্শ ই প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

ভারতীয় হিন্দু কৃষ্টির গৌরব আমরা এ যুগে একটু বেশি মাত্রায় করিয়া থাকি; সেই কৃষ্টির অধঃপতনও যে বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও আমরা জানি; কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে—সংস্কৃত ও ভাষা-সাহিত্যে—আমরা যতদূর পশ্চাতেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, এমন কোনও যুগের সন্ধান পাই না, যখন এই বিলাতী আদর্শে আমরা যাহাকে অশ্লীলতা বলি, তাহার প্রচুর নিদর্শন সাহিত্যে ছিল না। ইহাতে প্রমাণ হয়, যে কোন কারণেই হৌক, এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এ দেশীয় রসিকজনের কোনও অভিযোগ ছিল না, অথচ কোনও জাতির কৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষবিচারে তাহার রস-চর্চ্চার প্রকার ও পদ্ধতি সর্ব্বথা গণনীয়। এমত অবস্থায় সাহিত্যে ও তথা অন্যান্য কলায়, এই যে অশ্লীলতার অবাধিক প্রসার সর্ব্বযুগেই লক্ষ্য করা যায় তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির গৌরব কীর্ত্তন করিলে মিথ্যাচারী হইতে হয়; য়ুরোপীয় আদর্শে যাহাদের রুচি গঠিত হইয়াছে, তাহারা সেই আদর্শও বজায় রাখিবে, অথচ ভারতীয় সাধনার গুণগ্রাহী হইবে—এরূপ বিসদৃশ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। যাহারা মিউজিয়মে রক্ষিত ভারতীয় কলাকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া তারিফ করে সেই 'কাল্‌চার'-অভিমানী কলাবিলাসীদের কথা বলিতেছি না; ভারতীয় সাধনার সর্ব্বাঙ্গনিহিত আত্মাটির পরিচয়ে যাহারা মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত, তাহাদের কথাই বলিতেছি। আমি অন্যান্য কলাশিল্পের উল্লেখ করিব না; ভারতীয় সাহিত্যে এই যে অশ্লীলতা, বৈদিক সাহিত্য হইতে পৌরাণিক, পৌরাণিক হইতে ক্লাসিক্যাল, এবং তথা হইতে ভাষা-সাহিত্যে পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে বহিয়া আসিয়াছে, তাহারই সম্পর্কে এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি।

* * *

এই অশ্লীলতা শুধুই কাব্য-সাহিত্যে নয়, আমাদের নানা অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মগ্রন্থে, উৎকৃষ্ট উপদেশের প্রসঙ্গেও প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে দেখা যায়; যেন এ সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দু মনের কোনও সজ্ঞানতাই ছিল না—অন্নজল বায়ুর মত ইহা যেন একটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। সৃষ্টির আর সব

কিছুকে ইহারা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষের জীবন-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে ইহারা যে দৃষ্টির সাধনা করিয়াছে,—আসক্তি ও ঔদাসীন্য, উভয় মনোভাবকে যে একটি বৃহত্তর চিন্তার অধীন করিয়া সহজ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রভাবে শ্লীল অশ্লীলের কোনও গুরুতর বিরোধ ইহারা কখনও স্বীকার করে নাই; ভারতীয় কৃষ্টির সেই মূল সাধন-মন্ত্র বুঝিয়া লইতে পারিলে, আমরা তাহার রসরসিকতার এই বিষম প্রবৃত্তির জন্য লজ্জাবোধ করিব না, তাহাকে কোনও প্রকারে উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিব না। যে আদর্শের নির্ভীক অনুসরণ আমরা ভারতীয় সাধনার সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহার ফলে ভাবকে রূপ দিবার কালে ভারতীয় মণীষা যেমন বিরূপতাকেও গ্রাহ্য করিয়াছে (দেবদেবীর মূর্ত্তি-কল্পনায় ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে), তেমনই রূপ বা দেহকে ভাবকল্পনায় প্রকাশ করিবার কালে তাহাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই—ভাবসুষমার খাতিরে রূপের তথ্যগত সত্যকে খণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই; হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি-বিভাবনায় যদি অপ্রাকৃত, অতএব কদাকার, বলিয়া অনেক কিছুকে বহিষ্কার করিয়া দিতে না চাও, তবে ভারতীয় কাব্যরসে দেহের যে স্থান আছে তাহা অশ্লীল বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

* * *

খ্রীষ্টান-য়ুরোপ দেহ-শয়তানের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া যে নৈতিক শুচিতাকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছিল—তাহার মূলে আছে অতিরিক্ত দেহ-সচেতনতা। দেহ-আত্মার অতি স্থূল দ্বৈতবাদ তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; দেহকে পীড়ন করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া সে চিত্তের প্রসন্নতা সাধন করিতে চায়, তাহার ফলে দেহই তাহার সুপ্তচৈতন্যে স্বপ্ন-ব্যাকুলতার উদ্রেক করিয়াছে; দেহের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া মনের মন্দিরে তাহার একটি মায়া-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একদিকে অতি প্রবল প্রকৃতি-পারবশ্য, অপর দিকে দেহপীড়ন-মূলক বৈরাগ্যের আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া সে ভোগস্পৃহাকে যতদূর সম্ভব পাপ-ভয়ের দ্বারা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে; দেহসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে তাহার পাপ-সংস্কার সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া থাকায়, ভোগ বা ত্যাগ কোনটাকেই সে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরে একদা গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির আকস্মিক পরিচয় প্রভাবে খ্রীষ্টিয়ান য়ুরোপের জন্মান্তর লাভ ঘটিল—প্রকৃতি-ধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্ম ও স্বাধীন যুক্তিবাদের আশ্বাসে, কারামুক্ত কয়েদীর মত, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভাবুকতায় সাহিত্যে, শিল্পে ও বিজ্ঞানে—য়ুরোপ জগতে যুগান্তর আনয়ন করিল। সেই নবাবিষ্কৃত অখৃষ্টান দেহাত্মবাদ ও পুরাতন দেহ-আত্মার বিরোধ-বাদ, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে, সে যুগে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির উপরে বুদ্ধি-ধর্ম্মই প্রাধান্যলাভ করিল। রেণেসাঁস-যুগের য়ুরোপে যে এক ধরণের মনুষ্য-চরিত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহাতে মানুষের হৃদয় বা আত্মা বলিয়া কোনো কিছুর বালাই ছিল না; মনের চাতুর্য্য, বুদ্ধির প্রখরতা, রাষ্ট্রে ও সমাজে এক অভিনব শক্তি-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—একদিকে অতি সূক্ষ্ম শিল্প-রস-চর্চ্চা ও অপর দিকে ভোগ-লালসার হৃদয়হীন পৈশাচিকতা, স্বর্গ ও নরককে সম ভাবে উপহাস করিয়াছিল। পাপকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করাই ছিল পাপ; মন ও বুদ্ধির শক্তি-চর্চ্চাই ছিল ধর্ম্ম—প্রবৃত্তিকে দমন করা নহে, গোপনে চরিতার্থ করাই ছিল পৌরুষের আদর্শ। এইরূপে দেহ ও আত্মার মাঝখানে মন যে ব্যবধান রচনা করিল তাহাতে দেহ-আত্মার বিরোধ আর রহিল না – দেহের উৎকণ্ঠা আত্মার নিকটে আর পৌঁছিল না; সে উৎকণ্ঠা মন-বুদ্ধির অহংকারকে পরিতৃপ্ত করিয়া অর্দ্ধপথেই নিবৃত্ত হইল। দেহের নগ্নতাকে সুকৌশলে ঢাকিয়া, ইন্দ্রিয়-চেতনাকে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর করিয়া, যে নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইল তাহাতে রস-তত্ত্বও মনোবিজ্ঞানের অধিকারভুক্ত হইল। পূর্ব্বে দেহ ছিল শয়তানের লীলাস্থল—দেহঘটিত সব কিছু অশুচি ও অপবিত্র ছিল; এখন সাক্ষাৎ দেহকে স্বীকার না করিয়া, তাহাকে মানস-পিপাসার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া সাহিত্যে ও শিল্পকলায় যে আদর্শ ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিল, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মনীতি ও অখ্রীষ্টিয়ান দুর্নীতির মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে মানুষের মনোধর্ম্মই এক অপূর্ব্ব রসসাধনায় মুকুলিত হইয়া উঠিল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই দেহ-বাস্তব-বিমুখ মানস-আদর্শই উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে বিপ্লব সাধন করিয়াছিল—দেহের উৎকণ্ঠাই মানস-কল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া কাব্য-সাহিত্যে

যে স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—মুখ্যতঃ তাহারই মোহে আমরাও আত্মহারা হইয়াছিলাম। দেহের ক্ষেত্রে যে হৃদয়াবেগ ছিল সরল, সুস্থ ও বাস্তব জীবন-সত্যের স্বচ্ছতায় স্বাস্থ্যকর—অতিকর্ষিত মনোবৃত্তির পক্ষে তাহা আর রুচিকর রহিল না। পাপ এতদিন ছিল দেহের সীমায় আবদ্ধ, তাই তাহা ছিল সুস্পষ্ট অতএব কুৎসিত; মনের অসীমায় সেই পাপ যখন গূঢ়-গভীর জটিলতায় বিস্তার লাভ করিল তখন তাহাকে বড় নির্ম্মল, বড় সুন্দর দেখাইল—বিবেকের অস্বস্তিও অনেক পরিমাণে কমিল। এমনই করিয়া রসিকের রুচিও শুচি হইয়া উঠিল—প্রকট দেহ-সত্যকে আমল না দিয়া প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লালসার জয় হইল।

*　　*　　*

প্রধানতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে এই আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই আদর্শের মূলে যে দার্শনিক ও ধর্ম্মনৈতিক মতবাদ ছিল—হিন্দু চিন্তা ও হিন্দু সাধনার সঙ্গে তাহার পার্থক্য কি এবং সেই পার্থক্য কোন্ পক্ষের উৎকর্ষ প্রমাণ করে, এ সকল ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ মাত্র ছিল না। য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ যে শত গুণে শ্রেষ্ঠ, সে সাহিত্যের অন্তরালে যে মানস-উৎকর্ষের পরিচয় রহিয়াছে তাহা যে কত গভীর, কত উন্নত তাহাতে সংশয় করিবার উপায় ছিল না। হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার যে চাক্ষুষ পরিণাম তখন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, দেশীয় সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মনীতির তখন যে অবস্থা, তাহাতে এ বস্তু যে পরম উপাদেয় মনে হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। রস ও রুচির এই আকস্মিক আদর্শ পরিবর্ত্তন সম্ভব না হইলে আমাদের নব্য সাহিত্যের জন্মই হইত না। স্বধর্ম্ম যখন অতিশয় দুর্ব্বল তখন পরধর্ম্ম ভিন্ন গতি কি? আজ আমরা জীবনের সর্ব্বস্তরে আরও গভীর ভাবে য়ুরোপীয় চিন্তা ও ভাবধারার বশীভূত হইয়াছি, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় আদর্শ নবযুগের সমস্যা সমাধানে এখনও নূতন রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

*　　*　　*

তথাপি সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিকের রুচি-বিরোধ আলোচনার যোগ্য। প্রাচীন সাহিত্যের অশ্লীলতা আধুনিকের রুচিবিরুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তাহা এক কথায় উড়াইয়া দিবার নহে। আমরা আজ যে রুচির পক্ষপাতী, ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষের যুগেও আমাদের সে রুচি ছিল না, সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা যে অতীত কীর্ত্তির গৌরব করিয়া থাকি, সে কীর্ত্তির রসপ্রেরণায় আধুনিক অশ্লীলতা-সংস্কার ছিল না। আমরা সে কীর্ত্তির প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে সে রুচি ও রস-জ্ঞানও হারাইয়াছি সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্য পরধর্ম্মের আনুষঙ্গিক পর-রুচিরও আশ্রয় লইয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া এই রুচিভেদকেই খুব বড় করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা স্বীকার করি না। এই জন্যই তথাকথিত অশ্লীলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি।

*　　*　　*

অশ্লীলতার প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে এই শব্দের আধুনিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দেহঘটিত ব্যাপারের নগ্ন বিবরণ যাহাতে আছে, তাহাকেই আমরা অশ্লীল বলি—নর-নারীর যৌন সম্বন্ধের সুস্পষ্ট উল্লেখ মাত্রই অশ্লীল। অশ্লীল শব্দটি নূতন নহে—আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও অশ্লীলতা দোষের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা আধুনিক অর্থে নহে; ইংরেজীতে যাহাকে obscene বলে, তেমন কোনও অর্থে ইহার প্রয়োগ নাই, তেমন অর্থবাচক কোনও অপর শব্দও নাই। তাহার কারণ, খ্রীষ্টিয় নীতিধর্ম্মের মত কোনও নৈতিকতার আদর্শ হিন্দু কখনও স্বীকার করে নাই। তাহার সাধনা ছিল—সর্ব্ব দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধী তত্ত্বের সমন্বয়মূলক এক সত্যের উপলব্ধি। সে সৃষ্টির কিছুকেই বাদ দিতে পারে নাই; দ্বৈতবাদেও সে মিলন-রস-রহস্যের সন্ধান করিয়াছে, অদ্বৈতবাদে সে দুইকে মানেই নাই, সর্ব্ব বস্তুতে এক পরম সত্তার সাক্ষাৎকার করিয়াছে। দেহের বিরুদ্ধে তাহার যেমন কোনও অভিযোগ নাই, তেমনি দেহকে সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তিও তাহার নাই; আসলে, সে মনকে, অর্থাৎ দেহ-আত্মার বিরোধবুদ্ধিকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। এই সমান দৃষ্টির ফলে, ধর্ম্মব্যাখ্যা বা রসসৃষ্টি—কোনখানেই দেহের নামে সে সঙ্কোচ বোধ করে নাই; দেহঘটিত সকল ব্যাপারেই হিন্দুর দৃষ্টি খ্রীষ্টিয়ান আদর্শের বিপরীত। আজ মিস্ মেয়ো প্রভৃতি হিন্দুর বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটাইতেছে তাহার অর্দ্ধেক তথ্য হিসাবেই মিথ্যা; বাকি অর্দ্ধেকের অর্দ্ধাংশ তথ্য হিসাবে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য

দামী হিন্দুর আদর্শ নহে—সেই আদর্শের বিকার; বাকি টুকু সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তাহা খ্রীষ্টিয়ান নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া খ্রীষ্টিয়ান জাতির চক্ষে কুৎসিত হইতে পারে, হিন্দুর চক্ষে তাহা কিছুমাত্র অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমরা অন্য অনেক ব্যাপারে খ্রীষ্টান ধর্ম্মনীতির শাসন শিরোধার্য্য করিয়াছি, কাজেই ওই বাকিটুকুর জন্যও লজ্জা বোধ করি; ওটুকুও সংস্কার করিয়া ষোল আনা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চাই। মিস্ মেয়োর দল যদি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে অশ্লীলতার ভুরি ভুরি নিদর্শন সংগ্রহ ও উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে আরও একদফা গালি দিয়া বসে, তবে আমাদের মাথা কাটা যাইবে সন্দেহ নাই, আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইব। কিন্তু এ অশ্লীলতাকে আমাদের দেশের প্রাচীনেরা ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন; অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা-দোষের উল্লেখ আছে তাহা শব্দ বা অর্থগত; বিষয়-বস্তুগত নহে। সেকালে অশ্লীলতা বলিতে ভাষার refinementএর অভাব বুঝাইত; ভদ্রলোকের ভাষা ভদ্র হওয়া চাই; কাব্যের বাকি যাহা দোষ-গুণ রসিক চিত্তই তাহার প্রমাতা। আধুনিকেরা যাহাকে অশ্লীল বলেন তাহার সমস্যা রসবিচারে স্থান পাইত না; obscene বা অদ্রষ্টব্য বলিয়াই সাহিত্যে কোন কিছুর প্রবেশে নিষেধ ছিল না।

* * *

অতএব 'অশ্লীল'এর প্রাচীন অর্থ obscene নয়, vulgar। Vulgar বা ভাষার গ্রাম্যতা-দোষের দৃষ্টান্ত আজিকার দিনেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবি বা সাহিত্যিক হইতে হইলে সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম প্রয়োজন, ভাষার সৌন্দর্য্য বা সুষমাবোধ, চিত্রকরের পক্ষে যেমন বর্ণের বৈচিত্র্য ও সুষমা-জ্ঞান। মনে হয় এ দেশের আলঙ্কারিকেরা 'অশ্লীল' অর্থে এই যে দোষটিকে ধরিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় আছে। কারণ লেখকের ভাষাই যদি 'অশ্লীল' হয়, তবে তাহা যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়, সে লেখক যে রস-রচনার অধিকারীই হইতে পারেন নাই, তাহা অতিশয় সত্য। শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও লেখকের ভাষা অশ্লীলতাদুষ্ট হইতে পারে; কারণ শয্যা-গুণ অনুসারে শব্দের অভ্রান্ত প্রয়োগ, শব্দবিন্যাসের কৌশল প্রভৃতি প্রতিভাসাপেক্ষ; এজন্য অশ্লীলতা কেবল মাত্র কোনও একটি বিশেষ শব্দ বা বাক্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে না, অনেক সময় দেখা যায়—একই ভাষার ভিন্ন রীতির সংমিশ্রণে অথবা ছন্দের সহিত ভাব ও ভাষার বিরোধে অশ্লীলতা দোষ ঘটিয়াছে। এই দুই জাতীয় অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত দিব, তাহা হইতে অশ্লীলতার প্রাচীন সংজ্ঞা কতকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

* * *

সম্প্রতি সমালোচনার জন্য একখানি কাব্য-পুস্তক পাইয়াছি। এই কাব্যখানি মৌলিক রচনা নহে, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কাব্য হইতে কাব্যানুবাদ। গ্রন্থখানির নানা দোষের মধ্যে সব চেয়ে বড় দোষ ইহার 'অশ্লীলতা'—আলঙ্কারিকের অর্থে অশ্লীলতার যত প্রকার-ভেদ হইতে পারে তাহার প্রায় সবই ইহাতে আছে; তাহার কারণ, লেখকের শব্দার্থ-রীতি-বোধ নাই। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিব।

(১) কত মন হারায়েছে পতিতার <u>ক্রোড়ক্ষু দুয়ারে</u>

(২) যৌবন যার ঘন হয়ে উঠে—
ঝরে' পড়ে দেহবৃন্ত চুয়ে (Sic)।

(৩) তপের লাগি' পরল উমা মুঞ্জতৃণের চন্দ্রহার—
কত কঠিন তাহার সে তিন ঘের,
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গখানি কাঁপনে তাই ভরল তার
<u>ঝরল আরো রক্ত জঘনের</u>।

(৪) শঙ্কা কিসের? সঙ্গে আছেন বাণ হাতে <u>কাম-দেবতা</u> ভাই।

(৫) অধরটাকে কামড়ে দাঁতে দুলায়ে দুটি কোমল কর
'ছুঁয়ো না' কয় যখন প্রিয়া……

(৬) তনুতট তব তন্বী স্তনের ভারেই জেরবার

* * *

চারু চরণের ছন্দ উরুর চাপেই হিমসিম্।—

(৭) ছাঁচা হলুদ—তারই মত, রূপসী তোর অঙ্গ ঐ।

(৮) জনগণের বসনগুলো—
তাতেও পীতের নামল ঢল্।

* * *

উপরি উদ্ধৃত রচনাগুলির প্রথম চারিটি শব্দার্থগত অশ্লীলতার উদাহরণ; শেষ চারিটি বাক্যরীতিঘটিত অশ্লীলতার নিদর্শন। প্রথম দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; স্পষ্টই বোঝা যায়, এস্থলে ভাব-বিরোধী শব্দার্থের association‌এ অশ্লীলতা ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে 'যৌবন ঘন হ'য়ে

চুঁয়ে পড়া'র কথা আছে; কোন বস্তুর ঘন হওয়া ও চুঁয়ে পড়ার মধ্যে কার্য্যকারণ সঙ্গতি থাক্ বা না থাক্—যৌবন-পদার্থ টির এরূপ বর্ণনা আদৌ সুশ্রী হয় নাই। তৃতীয়টিতে লেখকের ভাষার শ্লীলতা চরমে উঠিয়াছে; লাইনটি কালিদাসের অনুবাদ, কিন্তু ওই রূপ স্থানে রক্ত ঝরাইতে কালিদাসের লেখনীও পারে নাই। চতুর্থ উদাহরণে 'কাম-দেব্‌তা' এই বাক্য-যোজনাটি শুনিতে কেমন হইয়াছে, তাহাতে কতখানি অশ্লীলতা বা **vulgarity** ঘটিয়াছে, তাহা বাংলাভাষার রীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও সংস্কার আছে তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ বুঝিবেন না। বাকি চারিটি উদাহরণে যে প্রকার অভব্যতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অশ্লীলতার মতই অশোভন। 'অধরটারে কামড়ে দাঁতে' যদিও বা কথা কওয়া সম্ভব হয় তবুও ওরূপ ভাবে 'দাঁতে কামড়ানো' প্রেমের কবিতার রসভঙ্গ করে—কাজটিতে নয়, ভাষার ভঙ্গিতে। এরূপ কামড়ানির চোটে অধরে রক্ত ঝরিতে পারিত, ঝরিল না কেন, তাহা লেখকই জানেন। তারপর যে-টি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ছন্দ 'হিম্‌সিম্‌' হইয়াছে—হউক্, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে ছন্দ চারুচরণের, তাহা হিম্‌সিম্ হইবে কেন? অথবা "তন্বীর তনুতট" "জেরবার" হইতেই বা চাহিবে কেন? বলা বাহুল্য এই উদাহরণটিতে ভাষারও যেমন রীতি-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়, তেমনই ছন্দের সঙ্গে ভাষার সঙ্গতি নাই—শব্দের ধ্বনি ও ঝোঁক যেন পরস্পরে তাল ঠুকিয়া বিবাদ করিতেছে, ফল যাহা হইয়াছে তাহা বর্ব্বরতার চূড়ান্ত। আবার, রূপসীর অঙ্গ যদি 'ছ্যাঁচা হলুদ' হয় তবে তাহা নয়ন-লোভন ত নহেই অধিকন্তু হলুদ যদি কাঁচা হয় তবে রস গড়াইতেও পারে! 'জনগণের বসনগুলো'—এখানে 'গুলো' শব্দটি ফর্সা কাপড়ে ময়লা তালির মত; 'পীতের' 'ঢল'ও তদ্রূপ।

* * *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে অশ্লীলতা ইহার অধিক কিছু নয়; ইহা ভাষাগত, রচনারীতিগত—বিষয়-বস্তু বা কল্পনার ভঙ্গিতে তাঁহারা অশ্লীলতার সন্ধান করেন নাই। আমরা যাহাকে অশ্লীলতা বলিয়া 'রসের' এলাকা হইতেই বহিষ্কার করিয়াছি, প্রাচীনেরা সে অশ্লীলতাকে রসের পরিপোষক বলিয়া, আদি-রস নামক একটি বিশিষ্ট রস-পদবী দান করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের ভাষায় যাহার নাম অশ্লীলতা, তাহা প্রাচীন কাব্যে আদিরসের অন্তর্ভুক্ত। আমরা যখন অশ্লীলতার সমর্থন করি না, তখন আসলে আমরা এই আদিরসের রস-পদবীকেই অস্বীকার করি। এই যে রুচি-বিরোধ ইহার মূলে আছে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির দিক-পরিবর্ত্তন; হিন্দুর গভীরতম তত্ত্ব-চিন্তায় যাহাকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় নাই, সত্যের যে আদর্শ আমাদের স্বভাব-সংস্কারে পরিণত হওয়ায় এতকাল আমরা যাহাকে অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম, আজ তাহাকে সেভাবে গ্রহণ করিতে বাধে; সর্ব্বজ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতি যে রসিকতায়, সেই রসিকতাও আজ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। রুচি বা রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার এ প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়—তাহা করিব না। আমার বক্তব্য কেবল ইহাই যে, যে-বস্তুকে আমরা আজ অশ্লীল বলিয়া রসের ক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, তাহারও মূলে একটা সত্য-দৃষ্টি ছিল—তাহা আধুনিক রুচিসঙ্গত না হইলেও, তাহার মূলে একটা সত্যকার রস-প্রেরণা ছিল। সেই রসিকতার বিচার করিতে হইলে, মনে রাখিতে হইবে যে, তাহার আদর্শ ছিল ভিন্ন; বিশেষ করিয়া তাহা সেমিটিক ধর্ম্মনীতির বিপরীত। এজন্য আজিকার দিনে, খৃষ্টান ধর্ম্মনীতির যে আদর্শ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার তুলনায় হিন্দুর ধর্ম্মনীতি যে মূলে 'নীতিহীন' বলিয়া নিন্দিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। হিন্দুর চতুর্ব্বর্গ-সাধনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; এই যে পর্য্যায় বা সোপান-পরম্পরা আছে, তাহাতেও ধর্ম্মের অর্থ একরূপ নীতি-শাসন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সাধনার অঙ্গভেদে, অর্থ ও কামকেও সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছে,—সকলের শেষ লক্ষ্য যে-'মোক্ষ' তাহার সাধনায় কোনটাকে বাদ দিয়া নয়, উত্তীর্ণ হইয়াই অগ্রসর হইতে হয়। হিন্দু মানুষের মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশকে যে এক তত্ত্বের আলোকে বুঝিয়া লইয়াছিল তাহাতে দেহকে বাদ দিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ, পরম সত্যের একটা লক্ষণ এই, যে, তাহা সর্ব্বাশ্রয়ী। অতএব জীবনের পথে যেমন, কাব্য-সাহিত্যেও তেমনই, জীব-জীবনের মূল প্রবৃত্তিকে হিন্দু স্বীকার করিয়াছে; এবং সর্ব্বরসের আদি বা আরম্ভ রূপেই আদি-রসকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। আমাদের একালের

শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারে এ রসের সহজ সুস্থ উপলব্ধি আর সম্ভব নয়, কাজেই প্রাচীনেরা যাহাকে আদিরস বলিতেন, তাহার স্ফূর্তিকে আমরা অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি।

* * *

কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকের একটা মত আজিও সত্য—আরও বেশী সত্য,—তাহা এই যে, ভাষার গুণে অশ্লীলও শ্লীল হইয়া উঠে। তথাপি ইহার মধ্যেও একটু প্রভেদ আছে। প্রাচীনের শ্লীলতা ছিল শব্দার্থের পরিচ্ছন্নতা বা পারিপাট্যে; আধুনিকের শ্লীলতা রক্ষা হয় ভাষার অর্দ্ধস্ফুটতায়—প্রচ্ছন্ন ভাব-ব্যঞ্জনায়। এইরূপ শ্লীলতার ভঙ্গিও এক ধরণের উৎকৃষ্ট আলঙ্কারিকতা; প্রাচীনেরা ইহাতে অল্প খুসী হইতেন না; কিন্তু রসাস্বাদনে তাঁহারা ছুঁৎমার্গী বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না; বিষয়-বিশেষে ভাবের নগ্নতাও তাঁহাদের রুচিকর ছিল। এই খানেই প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক কাব্যরীতির প্রভেদ। অতিরিক্ত শ্লীলতার মোহে তাঁহারা দেহকে দিবারাত্র শুভ্র বসনে আবৃত করিয়া ত্বকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেন না; সুন্দর বসনের শোভা যেমনই হোক, দেহের একটা নিজস্ব শ্রী আছে, একথা তাঁহারা মানিতেন। ভাষার যেটুকু শ্লীলতারক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করিতেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যৌনভাবমূলক বর্ণনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়—ভাষার এমন ভঙ্গি তাঁহারা পছন্দ করিতেন না; বর্ণনা প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাতে ইতর অশিক্ষিত জনসুলভ মুখভঙ্গি যেন প্রকাশ না পায়। আধুনিক রচনার শ্লীলতা রক্ষা হয় যে ভাষায়, তাহার প্রধান গুণ ভাবগোপন-পটুতা—ইঙ্গিত-কুশলতা; দেহ সম্বন্ধে সঙ্কোচেরও যেমন সীমা নাই, লোভেরও তেমনই অন্ত নাই।

* * *

এজন্য সেকালে যাহার নাম ছিল আদিরস, তাহাতে যে সুস্পষ্টতা ও সারল্য ছিল তাহা নীতি-দুর্নীতির সংস্কারে আঘাত করিত না—এখনও করে না; আঘাত করে আমাদের রুচিতে। কিন্তু আধুনিক কাব্যে সেই রসই যেভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের রুচি অক্ষত থাকে বটে, কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্ন বড়ই উগ্র হইয়া উঠে। এই দুর্নীতির প্রশ্ন এড়াইবার জন্য আধুনিক কালে, Aesthetics নামক শাস্ত্রের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহাতেও কূল পাওয়া যাইতেছে না। দেহকে এখন আমরা সাক্ষাৎভাবে আর স্বীকার করি না—মানস-কল্পনায় তাহার যে রসটুকু উপভোগ করিতে চাই, তাহার ভাষাও দেহের ভাষা নয়, মনের ভাষা। শ্লীলতার নাম সেই সুরুচি, যাহার কিছুতেই আপত্তি নাই একমাত্র আপত্তি প্রকাশ্য আচরণে বা স্পষ্ট ভাষায়। ইহার মধ্যে যে মিথ্যাচার আছে তাহাই মধুর, তাহাই তৃপ্তিকর—তাহাই বিশুদ্ধ রসিকতা।

* * *

বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে অশ্লীলতা শব্দটি আর প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; অশ্লীল অর্থে গ্রাম্যতাও নয়; আদিরসও নয়—এখন অশ্লীল অর্থে ইংরেজী obscene বুঝিতে হইবে। এই অর্থে এ শব্দটি সম্পূর্ণ আধুনিক। তখনকার আদিরসে obscene বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ সেকালের রসিকেরা obscene কাহাকে বলে জানিতেন না। এখনকার আদিরসেও obscene কিছু থাকিবার যো নাই, কারণ, obscene যে কি বস্তু সে জ্ঞান এখন বড়ই প্রখর; লেখকের ভুল হইতেই পারে না। যাহাকে একালের আদিরস নামে অভিহিত করা যাইতে পারে তাহাতে দেহকে আড়াল করিয়া তাহার লালসাটিকে মাত্র অতি সূক্ষ্ম কল্পনার কারুকার্য্যে চিত্রিত করাই কবির কৃতিত্ব। এ চিত্রে দেহের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না বটে, কিন্তু দেহঘটিত মানসিক উৎকণ্ঠা—অতি তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি—রসোদ্রেকের সহায়তা করে; আদি-রসের পরিবর্ত্তে এই অন্ত-রসই এখনকার রুচিসম্মত, ইহাতে obscenityর অর্থাৎ দেহ-বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এই ইন্দ্রিয়বিলাস বা sensuosness যদি মাত্রাধিক্য বশতঃ, ইন্দ্রিয়লালসা বা sensualityতে আসিয়া পৌছে, তাহাও ভাষার নৈপুণ্যে সুরুচিসম্মত হইতে পারে—এ হিসাবে আধুনিকেরা ভাষার শ্লীলতাকে প্রাচীনের শ্লীলতা অপেক্ষা অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও সুমার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। আজিকার দিনে কবির ভাষা নিপুণা নটিনীর মত হাবভাব-শালিনী হওয়া চাই; সকল ভাষার সে সামর্থ্য নাই বলিয়া কবিকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এ প্রসঙ্গে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচকের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

The English language is not perfect enough, not graceful and flexible enough, to admit of elegant immorality; and the English character is not refined enough. A Frenchman can say very daring things, very immoral things gracefully; an Englishman cannot.

*　　　　*　　　　*

'The English character is not refined enough'—তাই কি ইংরেজী ভাষাও তেমন রসময়ী নয়? না, ইংরেজ জাতটাই বড় বেরসিক, কাঠখোট্টা—moral বায়ুগ্রস্ত? আসলে ইহা ভাষার দোষ নয়, ভাষার প্রকৃতি জাতির চরিত্রের উপরেই নির্ভর করে। সংস্কৃত ভাষার শব্দার্থগৌরব, প্রকাশ-ক্ষমতা অল্প নহে, তথাপি elegant immoralityর পরিবর্ত্তে আমরা সংস্কৃত কাব্যে যাহা দেখিতে পাই তাহা elegant obscenity. Elegant obscenity!—কথাটা সোনার পাথরবাটির মতই শুনিতে হইল; কিন্তু এ দেশীয় কবিগণের তাহাই ছিল রস-রচনার একটা বড় কৌশল; তাহাতে তাঁহারা যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার কারণ obscenityকে হজম করিবার মত রসিকতা তাঁহাদের ছিল।

*　　　　*　　　　*

এ পর্য্যন্ত অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আমি দুইটি কথার অবতারণা করিয়াছি—vulgar ও obscene, অভব্য ও অকথ্য। অভব্যতা বা গ্রাম্যতা-দোষের দৃষ্টান্ত দিয়াছি; অকথ্যতার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবিতেছি। আদিরস বিষয়ে সংস্কৃত কবিগণের কতকগুলি বাঁধা কাব্যরীতি বা convention ছিল, রস-ব্যঞ্জনার পক্ষে সেগুলির উপযোগিতা কিরূপ ছিল তাহা একালের আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব না। আমরা যে তাহাতে এত বিক্ষুব্ধ হই, তাহার কারণ দেহ সম্বন্ধে আমরা কিছু বেশি সচেতন—দেহকে আমরা ঘৃণাও করি, পূজাও করি; ঘৃণা করি বলিয়া তাহার এতটুকু নগ্নতা বরদাস্ত করিতে পারি না, পূজা করি বলিয়া তাহাকে সর্ব্বদা আভরণ-মণ্ডিত করিয়া মনের সিংহাসনে বসাইয়া রাখি, তাহার কোনও রূপ সম্ভ্রমহানি সহ্য করিতে পারি না। নরনারীর যৌন সম্পর্ক সেকালে যতটা প্রকৃতি বা স্বভাব-অনুযায়ী ছিল, এখন আর তাহা নাই; যাহা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ছিল তাহা এক্ষণে অতিশয় জটিল হইয়া উঠিয়াছে; পুরুষের পুরুষ-ধর্ম্মও এক্ষণে স্ব-ভাব ত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়াছে, প্রকৃতির বিধান বাতিল হইয়া গিয়াছে। তথাপি আদিরস একালের কাব্যেও আছে—আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। নারীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় এখন আর সে convention-এর বাঁধাবুলি নাই; কারণ নারীর দেহ এখন কেবল দেহমাত্রই নয়, পুরুষের কামনার প্রকৃতি অনুসারে এখন তাহা নানা জনের নানা 'মনের মোহের মাধুরী'তে নানারূপে প্রতিভাত। সেকালে নারীর প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, পরম নিশ্চিন্ত মনে, নিঃসঙ্কোচে, নারীরূপের স্থির প্রতিমা লইয়া নানা উপমার সৃষ্টি হইত—যাহা নিতান্তই স্বাভাবিক তাহার সম্বন্ধে কোনও দ্বিধাবোধ ছিল না; দেহের যাহা কিছু তাহাকে অপর বস্তুরূপের সাদৃশ্য-সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া দেহের মহিমাকীর্ত্তন করিতে বড় ভালো লাগিত। এযুগে দেহ সম্বন্ধে কবিমানসের স্বাভাবিকতা আর নাই; প্রকাশ্যে তাহাকে অস্বীকার করিয়া অপ্রকাশ্যে শতগুণ ক্ষতি-পূরণ করিয়া লয়। আধুনিক কাব্যে নারীদেহের অর্দ্ধেকটুকু মাত্র নারীর নিজস্ব প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, বাকি অর্দ্ধেকে নারী এখন কবির কামনায় কামরূপা। অশ্লীল বলিয়া আমরা যাহার নিন্দা করি, তাহা মনকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুধার্ত্ত করিয়া তোলে না, তাহা নিতান্তই বাস্তব, তাই অরুচিকর। প্রাচীন কাব্যের অশ্লীলতার কিছু উদাহরণ না দিলে এবং তার সঙ্গে আধুনিক আদিরসের কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত না করিলে, কথাটা বেশ স্পষ্ট হইবে না।

*　　　　*　　　　*

আধুনিক রুচির পক্ষে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশ নিশ্চয়ই অশ্লীল?

"মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ"

(পর্ব্বতের শিখরে কুন্তলকলাপের মত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ উপান্তভাগ পরিণত-ফল আম্রবনের দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব পীতবর্ণ,—যেন পর্ব্বত নয়, পৃথিবীর স্তন; তাহার মধ্যস্থল শ্যাম ও বিস্তীর্ণ, পার্শ্বদেশ পাণ্ডুবর্ণ।)

উপমাটির মধ্যে নগ্নতা আছে; নারীর এমন একটি অঙ্গের বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে যাহা চিরদিন সুরুচির বিঘ্ন-কারক; তা' ছাড়া, পৃথিবীর বিরাট দেহের যে অসম্বৃত

অবস্থা ইহাতে সূচিত হইতেছে, তাহা আরও অশ্লীল। স্তন সম্বন্ধে আধুনিক কবিতা নীরব নহে; কিন্তু এমন করিয়া তাহার বাস্তব বর্ণ-বৈভব পর্য্যন্ত চাক্ষুষ করাইবার প্রবৃত্তি তাহাতে নাই। রবীন্দ্রনাথ, 'চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন। 'অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি'—সে ত' শুচিতার পরাকাষ্ঠা। আধুনিকেরা পাখীর সঙ্গেও স্তনের তুলনা করিয়াছেন; তাহাতেও চোখের উপরে স্তনের নগ্ন-মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে না; বরং তাহার সম্বন্ধে মনে একটি অপূর্ব্ব রহস্যময় অনুভূতিই জাগে। মোটের উপর, ঐ—'মধ্যে শ্যাম, শেষবিস্তারপাণ্ডু'—উহার মত নগ্নতা-বিলাস আধুনিক কাব্যে নাই।

* * *

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা অশ্লীলতার তেমন কিছু দৃষ্টান্ত নয়—তখনকার কবিদের সৌন্দর্য্য-পিপাসায় যে একটি স্থূল বাস্তবাসক্তি ছিল তাহারই উদাহরণ। এইবার একটু মাত্রাধিক্যের দৃষ্টান্ত দিব, যথা—

"যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ"

ইহার আর অনুবাদ করিব না; খাঁটি বাংলায় obscenityই ফুটিয়া উঠিবে, elegance থাকিবে না। ইহার মধ্যে বাক্যার্থের যে সুস্পষ্টতা আছে তাহাই আধুনিক রুচির অনুমোদিত নহে; অথবা, দেহকে এতখানি আদর মমতা করিতে আধুনিক মনোবিলাসী রসিক সম্মত হইবেন না। দেহ-সম্ভোগের অবকাশে এখানে যে একটি রসের উদ্ভব হইয়াছে—তাহা প্রণয়ী-হৃদয়ের সৌকুমার্য্য; লালসার মধ্যেও একটা স্নেহের আভাস আছে; এই স্নেহও দেহসম্পর্কিত, দৈহিক আসক্তিজাত। আধুনিক আদিরসে যে অতি গূঢ় কামনার আবেগ থাকে তাহা সম্পূর্ণ আত্ম-পরায়ণ, অপরকে অবলম্বন করিলেও একেরই আত্মরতি; তাই, একের সহিত অপরের প্রত্যক্ষ মিলন-সেতু যে দেহ—দানে বা গ্রহণে, সেই দেহের কোনও মর্য্যাদা তাহার মধ্যে নাই কিন্তু এখানে এ প্রসঙ্গ অবান্তর, পরে যথাস্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব আধুনিক আদিরসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি লাইন মনে পড়িতেছে—

ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী,
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

এখানে, ভাষার অশ্লীলতার লেশমাত্র নাই, অথচ যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ও তাহার সঙ্গে যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা কোনও প্রাচীন কবি, এত সংক্ষেপে, এত নিরাপদে এবং এত রুচিসঙ্গত [illegible] ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না। খুব বেশী বক্রোক্তি ইহাতে নাই, ইঙ্গিত যাহা আছে তাহাও ভাষার একটা আব্রু মাত্র; তথাপি আশ্চর্য্য হইতে হয় অপ্রকাশ্যের এই প্রকাশপটুতা দেখিয়া! ইহাকেই বলে elegant immorality. ইহাই আধুনিক আদিরস। আর একটি উদাহরণ দিব—কবি এখানে চুম্বন বর্ণনা করিতেছেন।—

Here he caught up her lips with his,...
And strained her to him till all her faint
breath sank
And her bright light limbs palpitated and shrank
And rose and fluctuated as flowers in rain
That bends them and they tremble and rise again
And heave and straighten and quiver all through
with bliss,
And turn afresh their mouths up for a kiss,
Amorous, athirst of that sweet influent love;

উপরি-উদ্ধৃত কয়েক ছত্রে যে রতি-পিপাসার বর্ণনা আছে, তাহা কি অশ্লীল? কিন্তু তাহাতে কবি যে চুম্বন-সম্ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র দেহের যে কম্পন-শিহরণ, কুঞ্চন-প্রসারণ, স্তম্ভন-স্পন্দনের কথা আছে—কামনার সে মূর্ত্তি প্রাচীন কবির পিতৃপিতামহেরও কল্পনাগোচর ছিল না। এই অতি তীব্র আত্মরতির আবেগ প্রাচীন কাব্যের আদিরস নহে। দেহই এ পিপাসার মূলাধার বটে, তথাপি দেহ এখানে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া লালা-পিচ্ছিল রাগরক্ত সরীসৃপের মত মনোবাসী মন্মথকেই দেখা যাইতেছে; এ কবিতায় আধুনিক আদিরসের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে।

* * *

অশ্লীলতার প্রসঙ্গে যে তিনটি দোষের কথা অপরিহার্য্য—vulgar, obscene ও immoral; তাহার প্রথম দুইটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; এইবার অশ্লীলতা ও দুর্নীতির সম্বন্ধবিচারে প্রাচীন ও আধুনিকের মতি-গতি তুলনা করিয়া দেখিব; কারণ, দেহটাই যখন দুর্নীতির আশ্রয়-স্থল এবং কাব্যরসে গৌণ বা মুখ্য ভাবে দেহ অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তখন আধুনিক রুচি অনুসারে যাহা অশ্লীল তাহার বিচারণায় দুর্নীতির প্রশ্ন না উঠিয়া পারে না, বরং তাহা বিশেষ করিয়াই আলোচনার যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[লেখক এই অধ্যায়ে কয়েকটি অপদেবতার অবতারণা করিবার সুবিধা পাইয়াও হারাইয়াছেন এবং তাঁহার তরুণ পাঠক পাঠিকাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন।]

অলক্ষ্যে থাকিয়া যে ভয়াবহ কথোপকথন মাতঙ্গিনী শুনিল তাহার প্রত্যেকটি কথা তাহার কানে প্রবেশ করিয়া আতঙ্কে তাহার বুকের রক্ত হিম করিয়া দিতে লাগিল। তবু কথাবার্ত্তা যতক্ষণ চলিল সে তাহার কম্পিত দেহলতাকে ভাঙিয়া পড়িতে দিল না, ভয়াবহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্তটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃতবৎ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল ভয় ও যন্ত্রণার আতিশয্যে মুহ্যমান হইয়া মূর্চ্ছিতের মত সে পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিতেই সে যাহা শুনিয়াছে তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল। তাহার স্বামীর চরিত্র ও জীবনের নূতন ও ভীষণ একটা দিক অকস্মাৎ আলোক-সম্পাতে তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে এতদিন পশু-প্রবৃত্তিসম্পন্ন স্বামীর কঠোর হৃদয় ও পশুর মত মেজাজের পরিচয়ই পাইয়াছিল, আজ দস্যুদলের সহকারী, সম্ভবত নিজে দস্যু, স্বামীর নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া কদর্য্য গ্লানিতে তাহার দেহ ও মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল ; তাহার স্মৃতি এই ভাবিয়াই পীড়িত হইতে লাগিল যে এই ব্যক্তিই এতকাল তাহার নিষ্কলঙ্ক বক্ষে বিহার করিয়াছে। ভবিষ্যতের কথাও তাহার মনে হইল—এখন হইতে জানিয়া শুনিয়াই এই ব্যক্তির বীভৎস আলিঙ্গনে তাহাকে ধরা দিতে হইবে, নিজেকে দূরে রাখিবার উপায় নাই। সে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। উপায় নাই, উপায় নাই, তাহাকে চিরকাল এই অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে হইবে।

এক একবার এই সকল চিন্তায় তাহার বক্ষ উদ্বেলিত ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল—পরক্ষণেই যে পাপকর্ম্মে তাহার স্বামী সহায় হইতে যাইতেছে, তাহার ভীষণতা তাহার মানসচক্ষে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই দুশ্চিন্তায় সে কম্পান্বিত-কলেবর হইতে লাগিল। এই ভীষণ দুষ্কার্য্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহারই হেমাঙ্গিনী এবং তাহারই মাধব। তাহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, শিরায় শিরায় যেন ফুটন্ত রক্ত প্রবাহিত হইল, সে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। তাহার অত্যন্ত প্রিয় আপনার জন, যাহারা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিদ্রাগত অথচ যাহাদের দ্বারে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ, সম্ভবত ভীষণতর কিছু, তাহাদিগকে দণ্ডকাল মধ্যে গ্রাস করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় সে নিজের অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ ও লাঞ্ছিত নারীত্বের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল। যদি নিজের জীবন দিয়াও তাহাদিগকে বাঁচাইতে হয়, তাহাও করিতে হইবে।

নিজেদের বাড়ীর সকলকে জাগাইয়া তুলিবার কথাই তাহার সর্ব্ব প্রথমে মনে হইল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে বুঝিতে পারিল তাহা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। রাজমোহন যে এরূপ করিতে পারে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? তাহার পিসীমা বিশ্বাস করিবে! তাহার বোন! তাহারা মনে করিবে নিশ্চয়ই তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন বা বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। যদি তারা বিশ্বাসও করে, মাধবকে বাঁচাইবার জন্য রাজমোহনের বিপদ তাহারা কখনও ডাকিয়া আনিবে না। তাও যদি তাহারা করিতে চায়, মাধবকে কি তাহারা বাঁচাইতে পারিবে? না, তাহারা আত্মীয় রাজমোহনকে এমনই ভয় করিয়া চলে যে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারিবে না। যদি তাহারা তাহাকে বিশ্বাস না করে এবং সে যাহা বলিয়াছে তাহা রাজমোহনের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কনকের কথা তাহার মনে হইল—মাধবের বাড়ীতে খবর দিবার জন্য কনককে পাঠাইলে হয় না? কনকদের বাড়ী বেশী দূরে নয়, চুপি চুপি নিজের ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজমোহনকে বিপন্ন না করিয়া মাধবের বিপদের কথা তাহাকে জানাইয়া দিবার মত খবর কনককে দিয়া আসিলেই হইতে পারে। একেবারে অসম্ভব না হইলেও এই উপায় সুবিধার মনে হইল না। কনকের মাকে না জাগাইয়া কনককে সে

জাগাইতে পারে না, কারণ সে জানে দুজনে এক ঘরেই শোয়। কনক বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কিন্তু তাহার মা তাহা করিবে না। তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইতে হইলে আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিতে হইবে, তাহাতে স্বামীও জড়াইয়া পড়িবেন। কিন্তু ঈশ্বর ও মানুষকে সাক্ষী করিয়া এক-দিন যাহার নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সে কিছুতেই কিছু বলিতে পারে না। কনককে একলা ডাকিয়া লইয়া এই মধ্যরাত্রির অভিযানের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। কনকের মা কন্যাকে মাঝরাত্রে একলা বাড়ীর বাহিরে যাইতে দিতে না পারে—সঙ্গে অন্য স্ত্রীলোক থাকিলেও ব্যাপারটাকে সে সমান খারাপ মনে করিবে। হিতে বিপরীতও ঘটিতে পারে—সে মাতঙ্গিনীদের ঘরের সকলকে জাগাইয়া তাহাদের হাতে মাতঙ্গিনীকে সঁপিয়া দিতে চাহিবে ইহাই স্বাভাবিক। মাতঙ্গিনী পাগল অথবা দুশ্চরিত্র হইয়াছে এরূপও ভাবিতে পারে। যদি তাহার মা অনুমতিও দেয় তাহা হইলেও কি কনক এত রাত্রিতে এমন পথে একলা অথবা তাহারই মত একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাইতে সাহস করিবে, বিশেষ করিয়া ডাকাতেরা বাহির হইয়াছে, পথের ধারে লুকাইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

মাতঙ্গিনী হতাশ হইয়া বুঝিল যে যাহা করিবার তাহাকে নিজেকেই করিতে হইবে। তাহাকেই যাইতে হইবে। ভাবিতেই, ভয়ে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। রাস্তায় সাক্ষাৎ বিপদ যদিও অনেক তবু সেগুলিই বড় বিপদ নয়। নিশীথ রাত্রের ভয়সঙ্কুল নির্জ্জনতায়, অরণ্যসঙ্কুল পথে একা যুবতী নারী সে,—স্বভাবতই সে সব কিছুকেই বিশ্বাস করিত—বনে বনে যে সকল অলৌকিক জীবের বিহার-ভূমি তাহাদের সম্বন্ধে শৈশবে অনেক গল্প সে শুনিয়াছে, তাহার কল্পনাপ্রবণ মনে সেগুলি আরও ভীষণ, আরও ভয়াবহ রূপ ধরিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে। তাছাড়া, ভীষণ একদল দস্যু নিকটেই কোথায় রহিয়াছে, যদি তাহাদের হাতে পড়ে! ফল কি হইবে কল্পনায় ভাবিয়া লইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। যদি এই দস্যু-দলে তাহার স্বামী থাকে! মাতঙ্গিনী আবার শিহরিল।

কিন্তু মাতঙ্গিনীর হৃদয়ে সাহস ছিল, তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতির জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল।

ভয়াবহ বিপদের কথা তাহার যতই মনে হইতে লাগিল তাহার হৃদয়ের মহৎ প্রেম ততই যেন বৃদ্ধি পাইয়া উদ্বেল হইতে লাগিল—এই প্রেমের বেদীতে সে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের দুঃসহ ভারস্বরূপ জীবনকেই উৎসর্গ করিতে চাহিল। কিন্তু নারী-হৃদয়ের অন্য এক অনুভূতি বাধার সৃজন করিল। নিশীথ রাত্রে একাকী মাধবের গৃহে সে যাইবে! তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে? মাধব নিজে কি ভাবিবে? ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—ঘরের গুমোঠ গরমে সে পীড়িত হইতেছিল—সাহস করিয়া সে ছোট জানালাটি খুলিয়া ফেলিল। গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং দূর চক্রবাল-সীমান্তে চাঁদ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার রশ্মি ক্ষীণ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চন্দ্র অন্তর্হিত হইবে, দস্যুদের উন্মাদ চীৎকার শ্রুত হইবে। মাতঙ্গিনী ভাবিল, তখন? তাহাদের প্রাণরক্ষার বহু বিলম্ব ঘটিয়া যাইবে। আসন্ন বিপদের শঙ্কা তাহার মনের সকল বিচারবুদ্ধি দূর করিল, তাহার ভালবাসা দশ গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল, মাতঙ্গিনী আর দ্বিধা করিল না।

নিজেকে আপাদমস্তক একটা মোটা বিছানার চাদরে আবৃত করিয়া মাতঙ্গিনী সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ঘরের বাহির হইয়া রাজমোহন যেমন করিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়াছিল ঠিক সেই ভাবে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত দরজা বন্ধ করিল। সীমাহীন শূন্যের তলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নীল আকাশের অনন্ত নীরবতা এবং দূরে বৃক্ষশ্রেণীর ঘন-সন্নিবিষ্ট শীর্ষদেশের নিঃশব্দতার মধ্যে তাহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, পা যেন চলিতে চাহিতেছিল না। বুকের উপর দুই হাত চাপিয়া সে আর্ত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "দেবতা, শক্তি দাও।" তারপর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদচারণা করিতে সুরু করিল। অরণ্যপথে চলিতে চলিতে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। অরণ্যের ভয়াবহ নীরবতা ও ছায়াময় অন্ধকার তাহাকে আতঙ্কিত করিল। বনস্পতিসমূহের গ্রন্থিল কাণ্ডগুলি যেন প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া সেই কুটিল অন্ধকারে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছিল। পত্রাচ্ছাদিত এক একটি বৃক্ষশাখা অন্ধকার পথে মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায় আর তাহার মনে হয় যেন

তাহাদের অন্তরালে এক একটি দৈত্য লুকাইয়া আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন বনস্থলীর এখানে সেখানে যেন এক একটি প্রেত অথবা দস্যু ওৎ পাতিয়া আছে—তাহাদের প্রজ্জ্বলিত চক্ষু। গল্পে শোনা যে সব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও পৈশাচিক হাসি গভীর নিশীথে পথিককে আতঙ্কিত করিয়া মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেয় সেই সব মূর্ত্তি ও হাসি যেন তাহার কল্পনায় ভিড় করিয়া আসিল। স্খলিত বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি; চকিত নৈশ বিহঙ্গের অন্ধকার বৃক্ষশাখার অদৃশ্য স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বসিবার নিমিত্ত পক্ষবিধুনন শব্দ; পতিত বৃক্ষপত্রের উপর সরীসৃপের সামান্য গতিশব্দ। এমন কি তাহার নিজের পদধ্বনিও তাহার হৃদয়কে ভয়চকিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি সে বুক বাঁধিয়া চলিতে লাগিল—মনে মনে সহস্র বার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে—কখনও বা অর্দ্ধোচ্চারিত মন্ত্র পড়িতে থাকে। দুই উচ্চ ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সমতল পথের উপরেই অন্ধকার নিবিড়তম; একদিকে ঘন কাঁটাগুল্মের বেড়াঘেরা বৃহৎ আম্রবন, অন্যদিকে একটি পুকুরের উঁচু পাড়—ছোট ছোট গুল্মে নিবিড়ভাবে আচ্ছাদিত এবং ইহাদিগকে ছাইয়া তিনটি বটগাছের পত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ শাখা আন্দোলিত হইতেছে। নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন পথ বটগাছের জন্য আরও অন্ধকার দেখাইতেছে। মাতঙ্গিনী সভয়ে চক্ষু ফিরাইল—আম্রবনের মধ্য হইতে একটা তীব্র আলোকরশ্মি আসিতেছিল এবং অশান্ত চাপাকণ্ঠের আওয়াজও যেন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। সে যাহা ভয় করিতেছিল তাহাই বুঝি শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়! এইতো সেই ডাকাতের দল। মাতঙ্গিনী চিত্রার্পিতের ছায় দাঁড়াইয়া রহিল—এক পা চলিতে পারিল না। বিপদের উপর বিপদ, পথশায়িত একটি কুকুর নিশীথ রাত্রের পথিকের পদশব্দে জাগরিত হইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার সুরু করিল। অমনই আমবাগান হইতে আগত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইল। এইটুকু বুঝিতে পারিবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাতঙ্গিনীর তখনও ছিল যে দস্যুরা কুকুরের ইঙ্গিত অবজ্ঞা করে নাই এবং তাহার ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। নূতন বিপদের আশঙ্কায় সে যেন শক্তি ফিরিয়া পাইল। হরিণের মত নিঃশব্দ চঞ্চল চরণে সে পুকুরের অন্ধকার পাড়ের দিকে ধাবমান হইয়া দ্রুত জলের ধারে পৌঁছিল। পায়ে চলার পথে যাহারা তাহাকে খুঁজিবে, পুকুরের খাড়া পাড় তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে আড়াল করিল বটে, কিন্তু দস্যুরা যদি যেপারে বটগাছগুলি ছিল সেই পাড়ে আসিয়া তাহার খোঁজ করে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কাছাকাছি ঝোপঝাড়ও ছিল না যে, সে লুকাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু মাতঙ্গিনী তখন সাহস সঞ্চয় করিয়াছে—সে কালবিলম্ব করিল না। কুকুরটা তখনও ঘেউ ঘেউ করিতেছিল। মাতঙ্গিনী চক্ষের নিমিষে জলের ধার হইতে খানিকটা ভারী কাদা তুলিয়া লইয়া গায়ের মোটা চাদরে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। এইভাবে আসন্ন বিপদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া রহিল—ভাবিল, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্রাদি সামলাইয়া লইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। পুকুরের অন্য পাড়ে পদশব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসিল। সে ধীরে ধীরে চাদরের পুঁটলিটি জলে ডুবাইল—জলে কোনও দ্রব্যপতনের শব্দমাত্র হইল না। তারপর বটগাছের ছায়া যেখানে ঘন হইয়া পড়িয়াছিল এমন একটা জায়গা বাছিয়া সে নিজেও জলে ডুব দিল। নিজের নাসিকার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া বসিয়া রহিল—কালো জলে বটগাছের কালো ছায়ায় যদি দেখিবার সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে তাহার মাথা ছাড়া আর কিছু দেখিবার উপায় রহিল না। তবুও পাছে তাহার কমলের মত মুখের গৌর বর্ণ তাহাকে বিপদে ফেলে, সে খোপা খুলিয়া ফেলিয়া আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া দিল—খুব নিবিষ্ট দৃষ্টিও এখন আর কালো জলের সঙ্গে সেই কালো কেশের পার্থক্য ধরিতে পারিবে না।

দেখিতে দেখিতে পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর পুকুরের সেই পাড়ে আসিয়া মাঝপথে থামিল। মাতঙ্গিনী শুনিল কিন্তু মাথা নাড়িল না।

একজন বলিল, "তাজ্জব ব্যাপার, আমি যে ঝোপের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম রাস্তায় আপাদমস্তক চাদর মোড়া একটা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে।"

অন্য একজন বলিল, "না হে না, তুমি গাছকে মানুষ ঠাউরে থাকবে—মানুষ হ'লে এর মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল কি করে? তা ছাড়া এই দারুণ গ্রীষ্মে অমন চাদরমুড়ি দিয়ে মাথা খারাপ না হলে তো কেউ বের হবে না।

জবাব শোনা গেল, "ঠিক বলেছ দাদা, হয়তো অপদেবতাই একটা দেখে থাকব।"

মাতঙ্গিনীও একবার চকিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, আগন্তুকেরা সেই নিরীহ শান্তিভঙ্গকারিণীর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী আরও কিয়ৎকাল জলের ভিতরে রহিল, যখন তাহাদের পদশব্দ দূরে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল, সে বুঝিল তাহারা আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সে সলিল-আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং ধীরে ধীরে সাড়ীর জল নিংড়াইয়া ফেলিল, চাদরটি জলাশয়েই রহিল। পুনরায় সেই ভয়াবহ পায়ে-চলার পথ ধরিয়া চলিবার দুঃসাহস না দেখাইয়া সে জলের ধারে ধারে চলিল—যে পাড় ছাড়িয়া আসিল তাহারই পাশের পাড় ধরিয়া। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে বার বার পিছনে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এখানকার পথঘাট তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত, কারণ মধুমতীতে স্নান করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ বারণ হইলেও এই পুকুরে স্নানাদির জন্য আসার নিষেধ ছিল না। দুঃসাহসিকা সুন্দরী এই পাড় হইতে যে-পাড় সে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে সেই পাড়ে যাওয়ার একটি সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিল—গভীর ঝোপের ভিতর দিয়া এই পথ। অবশেষে সে নানা আশঙ্কার কল্পনা করিতে করিতে সেই পরিত্যক্ত পাড়ে আসিয়া পৌছিল, যে আম্রকুঞ্জ এবং তৎ সন্নিহিত যে জানোয়ারটি তাহাকে বিপন্ন করিয়াছিল,তাহা হইতে অনতিদূরে সে দাঁড়াইল। কিন্তু নূতন এক বিপদ আসিয়া যেন তাহার পথরোধ করিল। রাধাগঞ্জে আসা অবধি সে মাত্র দুইবার তাহার বোনের বাড়ী গিয়াছে এবং কোনো বারেই পায়ে হাঁটিয়া যায় নাই, বন্ধ পাল্কীতে যাতায়াত করিয়াছে। পথের যতটুকু সন্ধান সে রাখিত তাহা লোকের মুখে মুখে শুনিয়া। সুতরাং চৌমাথার কাছে আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। নিতান্ত বিপন্নের মত সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হঠাৎ যেন ভাগ্যবলে দীর্ঘ দেবদারু গাছের মাথা দেখিতে পাইল। সে জানিত এই দেবদারু গাছটি মাধবের বাড়ীর ঠিক সম্মুখে অবস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ সেই দিকের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অনতিবিলম্বে মাধবের বৃহৎ প্রাসাদের নিকটে আসিয়া পড়িল এবং খিড়কির দুয়ার লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

শেষ বিপদ উত্তীর্ণ হইতে তখনও বাকী ছিল। সেই সময়ে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত। ভিতরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে ইহাই হইল সমস্যা। খিড়কির পাশের ঘরে করুণা শয়ন করিত, মাতঙ্গিনী তাহা জানিত। করুণা বাড়ীর দাসী।

কয়েকবার দ্বারে করাঘাত করিতেই করুণার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিরক্তিকঠোর কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "এতরাত্রে দুয়ার ঠেলে কে ?" মাতঙ্গিনী অধীর কণ্ঠে বলিল, "করুণা, তাড়াতাড়ি দরজা খোল।"

অসময়ে মধুর-নিদ্রা-ভঙ্গকারী আগন্তুকের প্রতি করুণার করুণা হইবার কথা নয়, সে কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল, "তুমি কেগো যে এতরাত্রে তোমাকে দরজা খুলে দিতে হবে ?"

নিজের নাম বলিতে অনিচ্ছুক মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির এস, দেখলেই বুঝতে পারবে।"

করুণা ধৈর্য্য হারাইল, চীৎকার করিয়া হাঁকিল, "কে গা তুমি ?"

মাতঙ্গিনী জবাব দিল, "আমি একজন সামান্য স্ত্রীলোক, চোর নই। দেখই না এসে !"

করুণার সহজ বুদ্ধি তখন ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার বোধ হইল, চোরের গলা এমন মিঠা হয় না। আর কথা কাথাকাটি না করিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল।

মাতঙ্গিনীকে দেখিয়া করুণার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঠাকরুণ তুমি ?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি হেমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।"

করুণার বুদ্ধি যেন আবার লোপ পাইতেছিল। সে বিস্ময়ের মাত্রা চড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল, "এতরাত্রে তুমি এখানে ? কি হয়েছে মা ? তোমার কাপড় ভিজে—ব্যাপার কি ?"

অধীর মাতঙ্গিনী তাহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, "হেমের কাছে আমাকে নিয়ে চল।"

করুণা বলিল, "সে ঘুমুচ্ছে। তাকে জাগাচ্ছি, কিন্তু ততক্ষণে তুমি ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল, মা।"

"পার তো শীগ্‌গির একটা সাড়ী দাও, কিন্তু দেরী কোরো না।"

করুণা হাতের কাছে যে সাড়ী পাইল তাহাই তাহাকে দিল। মাতঙ্গিনী চক্ষের নিমিষে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দোতলায় হেমাঙ্গিনীর কক্ষে যাইবার জন্য করুণার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সাহিত্যিক মর্য্যাদা, তিনি এই আটত্রিশ বৎসরের জীবনে যে সকল কীর্ত্তি পুস্তকাকারে এবং মাসিক, সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দারাই বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে সাহিত্যসেবীরা নির্দ্ধারণ করিবেন। অসম্পূর্ণ হইলেও এক্ষেত্রে তিনি নিজের পক্ষের সাক্ষীসাবুদ রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে হারাইয়াও পুনঃ পুনঃ পাইব, এই সান্ত্বনার অবকাশ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

কিন্তু, এই ব্যক্তিটির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় হয় তো খুব বেশী নন্; রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহাদের যে ক্ষতি হইল তাহার আর পূরণ হইবে না; এই দুঃখ মনে পোষণ করিয়াই তাঁহাদিগকে চিরটা কাল এই আক্ষেপ করিয়া কাটাইতে হইবে, যে, আমাদের রবি সর্ব্ব-সাধারণের রবি হইয়া যাইতে পারিল না; প্রাণের সে স্ফুলিঙ্গ সমস্ত জাতির প্রাণে আগুন ধরাইয়া গেল না।

সমগ্র জাতির প্রাণে আগুন ধরাইবার মত ক্ষমতা লইয়া রবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাই তাহার মৃত্যুকে এত বড় ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের জীবদ্দশায় অনেক বৃহৎকে, অনেক মহৎকে প্রত্যক্ষ করিলাম, কিন্তু এত ছোট একটা শিশুসুলভ প্রাণের মধ্যে এত অধিক আগুন আর কোথায়ও দেখিলাম না, তাই রবির মৃত্যুকে দেশের ও জাতির পক্ষে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিতেছি না।

রবিকে যাঁহারা চিনিতেন তাঁহাদের কাছে রবি ব্যক্তিটি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র অথবা দিবাকর শর্ম্মার চাইতেও ঢের বড় ছিল—তাহার সাহিত্যকে চাপা দিয়া তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার পৌরুষ, তাহার প্রাণ বড় হইয়া দেখা দিত; সে তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিত। রবি বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কখনও তাহার লেখাকে প্রাধান্য দিতে পারি নাই, সে তাহার অসম্বৃত কেশকলাপ, নীল চক্ষু, রোমশ বাহু ও মেঘগম্ভীর নিনাদে নিজেকেই এতটা জাহির করিয়া রাখিত যে তাহার লেখা দূরে থাকুক, অন্য সকলের ব্যক্তিত্বও তাহার নিকট ম্লান হইয়া যাইত। রবি তখন আমাদের নিকট একটা মানুষ মাত্র থাকিত না, একটা আইডিয়া হইয়া বিরাজ

করিত। সেই রবিকে আমরা হারাইয়াছি এবং এত আকস্মিক ভাবে হারাইয়াছি যে এখনও সহজ মনে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতেছে না। শুধু এইটুকুই মনে হইতেছে মৃত্যু বস্তুটা কিছু নয়; আমরা যে কেহ যে কোনও মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করিলেই মরিয়া যাইতে পারি। রবির মৃত্যুতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমরা জীবনের প্রতি স্পৃহা হারাইয়াছি।

রবিকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, রবির সহিত ক্ষণকাল মাত্র পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারাই রবিকে ভাল না বাসিয়া পারেন নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারি, যাঁহারা আশৈশব রবিকে কোলে-কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, শিশু রবীন্দ্রকে ধীরে ধীরে যাঁহারা যৌবনসীমান্তে উপনীত হইতে দেখিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধস্ফুট কলকাকলীকে যাঁহারা সাহিত্য-রস-রচনায় পরিণতি লাভ করিতে দেখিয়াছেন,তাহাকে তাঁহারা কতখানিই না ভালবাসিতেন। তাহার বৃদ্ধা জননী, প্রৌঢ় অগ্রজেরা এবং মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়াদের কথা তাই সাহস করিয়া ভাবিতে পারি না। রবির পত্নী ও সাতটি শিশু-সন্তানকে কে সান্ত্বনা দিবে?

রবি ছিল অদ্ভুতকর্ম্মা। হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, অনুন্নত কোল-ভীল ওঁরাও-সাঁওতালদের সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। এই কার্য্যে তাহার প্রাণের আশঙ্কা ছিল এবং দুই দুইবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে সে রক্ষা পাইয়াছিল তবু এই ব্রত সে ছাড়ে নাই। নিজের অন্নসংস্থানের কথা না ভাবিয়া, নিজের উপার্জ্জন, পৈত্রিক সম্পত্তি, অগ্রজদের উপার্জ্জিত অর্থ সে অকাতরে এই সকল অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়াছে। তাহারা তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। মানুষের এমন পূজালাভ অতি অল্পমানুষের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে রবির চেষ্টার অন্ত ছিল না। সমগ্র জাতি শিক্ষিত না হইলে জাতির মুক্তি নাই, দেশের কুসংস্কার ঘুচিবে না এই ছিল তাহার বুলি। সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার সুবিধার জন্য অনেক কিছু করিবার প্ল্যান তাহার মাথায় ছিল। একটি প্রথম ভাগ, একটি ওয়ার্ড বুক, একটি স্পেলিং বুক এবং একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এই জন্য সে নিজে রচনা করিয়াছিল। এইগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে পড়িয়া আছে। ওরাওঁদের জন্য বাংলা হরফে সে একটি পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ছিল রবির প্রাণ; এই পত্রিকা দেশের কতখানি, রবিকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ধারণা করিতে পারিতাম। হিন্দু জাতির অকল্যাণকর কোথায়ও কিছু ঘটিতে দেখিলে রবি হিংস্র ব্যাঘ্রের মত কঠোর হইত এবং যতক্ষণে আনন্দ বাজারের পৃষ্ঠায় প্রতিকারস্বরূপ কোনও লেখা বাহির না হইত, রবি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।

সকলে বসিয়া খোসগল্প করিতেছি, রাজা উজীর মারিতেছি, হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কির বন্যা বহিতেছে, হঠাৎ দেখিলাম রবি বিমর্ষ হইয়া গেল। অনুসন্ধানে বুঝিলাম, কাহারও মুখ দিয়া এমন কোন কথা বাহির হইয়াছে যাহা সে জাতির পক্ষে অকল্যাণকর মনে করিয়াছে। রবি তাহার পর আর সেখানে থাকিতে পারিত না। 'চলিলাম' বলিয়া চাদর উঠাইয়া সে প্রস্থান করিত।

সাহিত্যিক রবিকে জাতি স্মরণে রাখিবে, হউক না তাহার সাধনা অসম্পূর্ণ; কিন্তু মানুষ রবিকে জাতির সম্মুখে জাগ্রত রাখিবে কে? এই মহাপ্রাণ শিশুকে আমরা বিস্মৃত হইব, রবির মৃত্যু এই দুর্ভাগ্যই বহন করিয়া আনিল। ছাপার অক্ষরে তাহার উপন্যাস মায়াজাল, তাহার গল্প—থার্ড ক্লাস, উদাসীর মাঠ; নাটক—মানময়ী গার্লস স্কুল; তাহার ব্যঙ্গ রচনা—দিবাকরী, বাস্তবিকা; তাহার কবিতা—সিন্ধু-সরিৎ সে রাখিয়া গেল, আনন্দবাজার পত্রিকা ও শনিবারের চিঠি তাহার গৌরব লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, কিন্তু মানুষ রবিকে কি ততদিন বাঁচাইয়া রাখিতে কেহ পারিবে? পারিবে না, বিধাতার দরবারে এই টুকুই আমাদের নালিশ। সে নিজে বাঁচিয়া থাকিলে আনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিত।

চার পয়সা

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

হরিদাস দোতলা বাস হইতে পাকা আমটির মত টুপ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে দ্রুত কাছে আসিয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল,শুনেছ?

ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট সচকিত করিয়া অকস্মাৎ মাকে হারাইয়া-ফেলা শিশুর মত আর্ত্ত স্বরে বার তিনেক 'কেবলরাম, কেবলরাম' বলিয়া চেঁচাইয়া বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ও আরোহীগণকে সে ভীতচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার কান ও তাহার মুখ পরস্পর সান্নিধ্যে আসিতে এক মিনিট মাত্র সময় লইয়াছিল, দেখিলাম এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমার পাশে আট দশ জন লোক জড় হইয়া গিয়াছে। বাসের কণ্ডাক্টার হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিহ্বল ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। হরিদাস একবার আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া সমবেত জনতাকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই অবাক হইয়া গেল। একটু জোর গলায় বলিল, সত্যি বল্‌ছ, শোন নাই? অবাক কাণ্ড। এদ্দিন কলকাতায় ছিলে না নাকি?

বলিলাম, না থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু কলিকাতাতেই ছিলাম। এই মাত্র গৃহিণী এবং তাঁহার মাস্তুতো ভাই অবিনাশের সম্মুখেই দুই মাসের বাকী টাকার জন্য গয়লার নিকট যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে সে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না করিয়া বাসায় ফিরিব না, পথে হরিদাসের এই কাণ্ড।

ঠনঠনে কালীতলার মোড়, দেখিতে দেখিতে লোক বাড়িতে লাগিল, বাসটিও চলিয়া গিয়াছে। হরিদাসকে বলিলাম, চল, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে শুনছি।

কিন্তু হরিদাসেরই এই আকস্মিক সঙ্গ আমার ভাল লাগিল না। বাসা হইতে ঠনঠনে কালীতলার মোড় পর্য্যন্ত আসিতে আসিতেই একটা মতলব ঠাওরাইয়া ফেলিয়াছিলাম। দুহাজার টাকার একটা ইন্‌সিওরেন্স পলিসি ছিল, চার বছর ধরিয়া প্রিমিয়াম চালাইয়াছি, লোন যতটা লওয়া যায় লইয়াছি; ভাবিতেছিলাম গাড়ীচাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়া গয়লার টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিব—শেষ পর্য্যন্ত অন্য উপায়ে না হোক, এই রাস্তা কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। বুকে অনেকটা ভরসাও হইয়াছিল—হরিদাস ব্যাঘাত না ঘটাইলে মা-কালীকে একটা প্রণাম করিয়াই আসিতাম। গৃহিণীর একটু কষ্ট হইবে—তা হোক। না খাইতে পাইয়া সকলে মরার চাইতে বিধবা করিয়া স্ত্রীকে দুমুঠা খাইতে দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গৌরব আছে। একজন নিঃসন্তান বিধবার ১৯৮২৲ (গয়লার ১৮ টাকা বাদ) টাকা আজীবন ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল।

দুজনে চলিতে সুরু করিলাম দেখিয়া কুতূহলী জনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িল। হরিদাস একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া পরম স্নেহে আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, শোননি? সকাল থেকে এক কাপ চাও জোটে নি—খাওয়াবে এক কাপ চা?

আমার এক কাপ চা শুধু কেন, এক পাত্র হালুয়াও জুটিয়াছিল সুতরাং হরিদাসের সম্বন্ধে অনুকম্পা হইল। বলিলাম, এই এক কাপ চায়ের জন্যে এত কাণ্ড? বাস ছেড়ে নামতে হ'ল?

হরিদাস হাসিল, বলিল, নামতে হ'তই, না নামলে নামিয়ে দিত। রাস্তায় লোক খুঁজছিলাম, কণ্ডাক্টার আর একটু কাছে এসে পড়লেই অচেনা লোককেই চেনা নাম ধরে ডেকে নেমে পড়তে হ'ত তবু যাহোক তোমাকে পেলাম, মানটাও বাঁচল, চা'ও হবে। হবে না তাই?

আমি হাসিলাম, বলিলাম, হবে বৈকি, শুধু চা কেন, দুটো করে হাফ বয়েল—টোষ্ট! মরিতেই যখন বসিয়াছি তখন আর মায়া কেন! হরিদাসের সাধ মিটাইয়া তবে মরিব।

হরিদাস যেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল, যে মাগ্যিগণ্ডার বাজার ভাই, শুধু চা'ই জোটে না—ওসব নয়, ওসব নয়।

আমার মেজাজ তখন চড়িয়া গিয়াছে। বলিলাম, একদিন তো! তোমার সঙ্গে তো আর রোজ দেখা হচ্ছে না। একটা দিন না হয়—

হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতেছিলাম, হরিদাস হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া শ্যামবাজার-মুখো হইল। আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, খরচই যখন করবে, চল বাড়ী যাই। পয়সাটা গিন্নীকে ফেলে দিলে চা'ও হবে, দুচারখানা করে নিম্‌কি—

আমার মনটা ছোট হইয়া গেল। হিমালয়ের শীর্ষদেশ হইতে যেন তেরাইয়ের জঙ্গলে পড়িলাম। তবু আজ সবকিছু সহিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া হরিদাসকে বাধা দিলাম না। বলিলাম, চল।

নীটশে বা শোপেনহাউরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তবু মনে হইল আজ এই মুহূর্ত্তে জীবন সম্বন্ধে আমার মনে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, হয় তো গয়লার টাকা দিতে না পারার দুঃখ তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই। হরিদাসের প্রতি যেমন, তাহাদের প্রতিও তেমনই অনুকম্পা হইল।

হেদুয়ার মোড়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের তলায় পড়িয়া একটা পথের কুকুর রক্তাক্ত পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। হাসিয়া হরিদাসকে বলিলাম, কুকুর না হয়ে একটা মানুষ হলে ভাল হত। বলিয়া আবার হাসিলাম। হরিদাস কথা কহিল না, আমার দিকে একটা বিস্ময় ও ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া ছুটিয়া গিয়া কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার জল খাইবার একটা জলাধারের নিকট লইয়া গিয়া জল দিয়া পা ধোয়াইতে সুরু করিল। হরিদাসের প্রতি এবার আমার অত্যন্ত করুণা হইল, মনে মনে বলিলাম, fool! হাঁকিয়া বলিলাম, কি হে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকব?

হরিদাস কুকুরটিকে একটি গাছের ছায়ায় সন্তর্পণে নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, পয়সা থাক্‌লে একটা রিক্সায় চাপিয়ে ওটাকে বাড়ী নিয়ে যেতাম, পট্টি লাগিয়ে দিলেই সেরে উঠবে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, হাস্‌ছ কেন?

বলিলাম, পয়সা আছে, ডাক রিক্সা, এই—

হরিদাস অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, কথা বলিল না।

কুকুরসমেত হরিদাসের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা হইয়াছে। হরিদাসের বাসায় ইতিপূর্ব্বে কখনও আসি নাই—দেখিলাম, ছেলেতে-মেয়েতে কুকুরে-পাখীতে-খরগোসে এঁদো গলির চূণবালি-ওঠা একতলা বাড়ীখানা গম গম করিতেছে। বাইরের ঘরেই নাগোক বাইশ জন; ভিতরেও অন্ততঃ তিন জন যে আছে আভাস পাওয়া গেল।

দুইখানি নাত্র ঘর, হরিদাসের পৈত্রিক, হয় তো বন্ধক পড়িয়াছে, তবু ছিল বলিয়া এখনো অনন্ত নীলাকাশ হরিদাসের মাথার উপর চাঁদোয়া খাটায় নাই। হরিদাস কুকুরটাকে লইয়া ভিতরে যাইতে যাইতে বলিল, ননকুকে কিছু পয়সা দাও ভাই, ও ততক্ষণে ময়দা, একটু ঘি আর চিনি নিয়ে আসুক, বাকী জিনিষ বোধ হয় বাড়ীতেই আছে।

বাকী জিনিষ? অর্থাৎ চা এবং চুলা! এবার হরিদাসের উপর শ্রদ্ধা হইতে লাগিল। ননকু পয়সা পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে অন্তর্দ্ধান করিল। একটা ক্যাংলা গোছের মেয়ে বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে কয়েকটা ইষ্টকখণ্ড লইয়া ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম. এই, তোর নাম কি?

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কথা বলিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, হরিদাস তোর কে হয় রে?

জবাব নাই, তবু অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে মেয়েটি চাহিয়া রহিল। কেমন অস্বস্তি বোধ হইল, ভাবিলাম কালা বোবা নাকি? বেশীক্ষণ গবেষণা করিতে হইল না, ৮।১০ বছরের একটি ছেলে হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল, ও হাবী, কথা বলতে পারে না যে।

বলিলাম, বটে, কিন্তু ও তোমার কে হয়?

ছেলেটি বলিল, কেউ নয়, বাবা ওকে দেওঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছে। ওর কেউ নেই কি না!

মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আর কাহাকেও কিছু প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না। হরিদাস ততক্ষণে খালি গায়ে খেলো হুঁকোর কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত, বলিল, গিন্নির জিম্মা করে দিয়ে এলাম ভাই, সারবে বলেই মনে হচ্ছে।

প্রথম দর্শনেই মনে হইল, উঠিয়া হরিদাসের পায়ে টিপ করিয়া একটা প্রণাম করি, কিন্তু এই ভাব মুহূর্ত্ত মধ্যেই কাটিয়া গিয়া দারুণ বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, হরিদাসের গালে কসিয়া এক চড় বসাই, তার পর রাস্তাতো আছেই। তবু মানুষের দুর্ব্বলতা, জিজ্ঞাসা করিলাম, হাবীর মতো কতগুলি আছে?

হরিদাস হাসিল, বলিল, এর মধ্যেই খবর পেয়েছ, নটক্ গেজেট খবর দিয়েছে বুঝি, নতুন কেউ এলেই তাকে প্রথমেই সব খবর দেওয়া চাই। তা ভাই বেশী আর পারি কই? তিনটি মানুস আর পাঁচটি পশু।

বলিলাম, পশু ছটি তোমাকে নিয়ে—কিন্তু দেখ, আর নয়, এখানে আমার দেবতার অপমান হচ্ছে, আমি চল্লাম।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কোথা দিয়ে কি ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া হরিদাস থতমত খাইয়া গেল। বলিল, ননকু এল বলে ভাই, দেরী হবে না। চাটা না খেয়ে গেলে গিন্নি মনে ভাববেন আমারই দোষ—

বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে কাঁদিয়া ফেলিব ভাবিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। ঈশপের গল্প মনে পড়িল। অপদস্থ পীড়িত লাঞ্ছিত খরগোসেরা একবার দল বাঁধিয়া পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যাঙেরা ভয় পাইয়াছে দেখিয়া জীবনে তাহাদের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমার আবার বাঁচিতে সাধ হইতেছিল। গয়লার টাকা কষ্টে-স্বষ্টে শোধ দিলেই হইবে, না হয় একটু অপমানিত হইব। গিন্নিকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। থপ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া হাবীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। হাঁকিলাম, আনো তোমার নিম্‌কি, আজ খেয়েই ফতুর হব।

হরিদাসের মুখে আর হাসি ধরে না। নিম্‌কির প্লেট সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে দেখ, গিন্নি একেবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী—

—চোপ! বলিয়া হরিদাসের গালে এক চড় মারিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপ জল হইয়া গিয়া চোখের কোণা আশ্রয় করিল। পকেট হইতে চারটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলাম, এই নাও ভাই, আর কণ্ডাক্টারকে ফাঁকি দিওনা।

খোঁড়া কুকুরটা ততক্ষণে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিম্‌কির লোভে পাশে আসিয়া প্রার্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়াছে।

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

তৃতীয় পর্য্যায়

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার যে-সময়ে অভিনয় বন্ধ করে, সেই সময়ে কলিকাতায় আর একটি নূতন বৈতনিক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। এইটি বেঙ্গল থিয়েটার; ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক সাতুবাবুর দৌহিত্র—শরৎচন্দ্র ঘোষ, ইনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার কোন সাধারণ রঙ্গালয়েরই নিজের বাড়ি ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটার নিজের রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া অভিনয় আরম্ভ করে। তাহা ছাড়া এই রঙ্গমঞ্চে আর একটু নূতনত্বেরও আমদানী করা হয়। ইতিপূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ কর্ত্তৃকই গৃহীত হইত। এই নূতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই নাট্যশালা নির্ম্মাণের আয়োজন সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া ১৮৭৩, ২২এ ফেব্রুয়ারি (১২ ফাল্গুন ১২৭৯) তারিখের 'মধ্যস্থ' বলিতেছেন :—

> সংবাদ।...পয়সা দিয়া নাটক দেখিতে না পাওয়াতে সাধারণে বড় দুঃখিত ছিলেন, এক্ষণে সে দুঃখ মোচনের উপায় হইয়াছে এবং ক্রমে আরো হইতে চলিল। জাতীয় নাট্যশালাতো প্রসিদ্ধই হইয়াছে। আবার ওরিএন্ট্যাল থিয়েটর নামা নূতন নাট্যশালা আমাদের পাড়ায় খোলা হইয়াছে।...সম্প্রতি আবার শুনিতেছি, আঠারো জন বড় মানুষ অংশী যুটিয়া প্রত্যেকে এক হাজার করিয়া দিয়া অষ্টাদশ সহস্র টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক ইংরাজী ধরণে নাট্যশালা করিবেন। তজ্জন্য নাকি বাহাদুরি কাঠ প্রভৃতি ৺সাতুবাবুর বাটীর সম্মুখে পড়িয়াছে। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেন, সত্যকার স্ত্রীলোক লইয়া নাটক করিবার জন্য জনকত ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়াছেন। অমৃত বাজারের ভদ্রলোক এবং আমাদের ঐ আঠারো জন ইঁহারা এক কি স্বতন্ত্র দল জানি না।

এখন যেখানে বীডন ষ্ট্রীট ডাকঘর অবস্থিত, সেই জায়গায় এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনেত্রী লওয়ার ইতিহাস অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় আর একটু সবিস্তারে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

> এদিকে ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutt (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (হ্যাদাড়্ গিরীশ), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটু বাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাতুবাবুর ভাগিনেয়), অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩১)

অভিনেত্রী লওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি এবং আশঙ্কা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা সমকালীন সংবাদপত্রে কিছু কিছু পাই। ১৮৭৩, ২২এ আগষ্ট তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক পত্রে এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

> আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতু বাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে তথায় মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এপর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ আলোচনা ও মন্তব্য কয়েক মাস ধরিয়াই চলে। ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সে-সম্বন্ধে ১৮৭৪, ১১ই জানুয়ারি তারিখের 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিত হয় :—

সংবাদ। কতকগুলি স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রাজ্ঞিকা বেঙ্গল থিয়েটরে নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটরে দুইটি বেশ্যা অভিনেত্রী আছেন বলিয়া মিরর তাঁহাদিগকে পুনরায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই 'অমৃত বাজার পত্রিকা'ও লেখেন :—

> বেঙ্গল থিয়েটর সম্রান্ত বাঙ্গালী সমাজে একটী নূতন জিনিষ। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জন সমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কি না, তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। বেঙ্গল থিয়েটর কোম্পানী এই দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের রঙ্গ-গৃহে কলিকাতার অনেক লোকেই অভিনয় দর্শনার্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। নাটকাভিনয়ের উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের এক জন লোককেও আমাদিগকে পরিহার করিতে হয় তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না।

এই বিষয়ে ১২৮০ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখের 'মধ্যস্থে' একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক মনোমোহন বসু অভিনয়ের জন্য স্ত্রীলোক লওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন :—

> বেঙ্গাল থিয়েটরের অভিনয়। অথবা বিলাতী ধরণের মেয়ে যাত্রা!...বিলাতে রঙ্গভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। বঙ্গদেশে দাড়ি গোপধারী (হাজার কামাক!) জোঠা ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া কর্কশ স্বরে সুমধুর বামা-স্বরের কার্য্য করিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহ্য হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু কর্ত্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সভাকায় স্ত্রী লইয়া অভিনয়! রব উঠিল 'অভিনয় স্বভাবের প্রতিরূপ, পুরুষ দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃতি প্রদর্শন স্বভাবের প্রতিরূপ না হইয়া স্বভাবের হত্যা করা হয়।' অতএব 'আন্ স্ত্রী!'
>
> ... ...
>
> কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গীয় কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকাতে নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়া সম্ভব বিবেচনায় নবসংস্কারকগণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অকুলবতী জগৎস্বামিনী বার-রমণী-তনয়াগণকে লইয়াই স্বভাবানুযায়ী উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। ইহাতে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের নামে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছে। আমরাও ধন্য ধন্য লিখিলাম, বাস্তবিক তাহা ধন্য রব নয়, 'বাহবা' রব! এই সহরময় তাঁহারা এত বাহবা খাইতেছেন, যে, উন্নতির চেলা ও সভ্যতার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অন্য কেহ কখনো এত * ভোগ করিতে পায় নাই! লোকে কহিতেছে, এত দিনে রঙ্গপূর্ণ বঙ্গ আসরে যথার্থ মেয়ে যাত্রা একদল নামিয়াছে, এতদিনে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া যাহার যাহা অভিনয়ার্হ, তাহা সংসিদ্ধি দ্বারা যথার্থ আমোদ উৎপাদন করিবে—এত দিনে অভিনেতৃ বালক ও যুবকগণের মন সন্তুপ্ত থাকিয়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে রঙ্গভূমির পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইবে—এত দিনে তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা নিশ্চিন্ত হইলেন—এত দিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্র লোকের সঙ্গে ভদ্র সমাজে সমাধিকার প্রাপ্ত হইল—এতদিনে বঙ্গীয় দর্শকগণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় যথার্থ চরিতার্থ হইয়া সমাজের সাধারণ নীতি (কলিকাতার নব ড্রেনের জলের ন্যায়) সুপবিত্র নবগতিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল!
>
> অতঃপর ভাক্ত উন্নতির ভক্তগণের মনে মনে আরো কি অভিসন্ধি আছে, আমরা তাহাই দেখিবার আশায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম! বাঁচিয়া থাকিলে আরো কত কি দেখিতে পাইব! কিন্তু এত অতি-সভ্যতার তেজ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়!

সে যাহা হউক বেঙ্গল থিয়েটারে পেশাদার অভিনেত্রী লইয়াই অভিনয় চলিতে লাগিল। এই নাট্যশালায় অভিনীত প্রথম নাটক যে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' তাহা 'ভারত সংস্কারক' হইতে উদ্ধৃত বিবরণ হইতেই জানা যায়। মাইকেলের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থ এই অভিনয় ১৮৭৩ সনের ১৬ই আগষ্ট হয়। * উহার পরের সপ্তাহেও 'শর্ম্মিষ্ঠার'ই অভিনয় হইল। এই বিষয়ে অনেকেই ভুল করিয়া আসিতেছেন। † মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মাইকেল এই নাট্যশালার জন্য 'মায়াকানন' লিখিয়া দিলেও সেই নাটকটির অভিনয় হয় অনেক পরে। ১৮৭৩ সনের ২৮এ আগষ্ট তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে পর পর দুই সপ্তাহ 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইবার কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় :—

> কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটর নামে আর একটী থিয়েটর স্থাপিত হইয়াছে। তথায় গত দুই শনিবারে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়

* "সাপ্তাহিক সংবাদ।... বঙ্গ নাট্যাভিনয়ের দল মাইকেলের সন্তানগণের সাহায্য উদ্দেশে সে দিন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল।"—এডুকেশন গেজেট, ২২ আগষ্ট ১৮৭৩।

† শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পর ২৩এ আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে 'মায়াকাননে'র অভিনয় হয় ('গিরিশ-প্রতিভা', পৃ. ৫৭৭)। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম লিখিয়াছেন :—"মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়।" ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ৫২৭)

হইয়া গিয়াছে। থিয়েটর কোম্পানি অভিনয়ার্থ বৃহৎ একখানি গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে অন্যান্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর অংশ সকল সম্পাদিত হয় না। বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ এইটী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের দলে দুইটি স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে ইহারা একজন দেবযানী ও আর একজন শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকা সাজিয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে যযাতি ভিন্ন অপর সকলেই উত্তম অভিনয় করিয়াছিলেন।...আমরা অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছি।

১৮৭৪ সনের ১৪ই মার্চ্চ বেঙ্গল থিয়েটারে সমারোহের সহিত 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান্' পত্রে এই অভিনয়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ দিতেছি :—

গত শনিবার সায়াহ্নে বীডন ষ্ট্রীটের বেঙ্গল থিয়েটারে লোকারণ্য হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু পান্নালাল শীল, চকদীঘির ছকনলাল রায় এবং বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোককে দেখা গিয়াছিল। জন-ছয়েক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দর নাটক, এবং 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি প্রহসন অতীব নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। প্রত্যেক চরিত্রেরই অভিনয় স্বাভাবিক হইয়াছিল।

১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের 'মায়াকাননে'র অভিনয় হয়। * ইহাই 'মায়া-কাননে'র প্রথম অভিনয়। কিন্তু মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' বা 'মায়াকানন' লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই এই নাট্যশালায় 'মোহন্তের এই কি কাজ?' নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। নাটকখানি তারকেশ্বরের মোহান্ত ও এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া লিখিত। দেশে তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এ-বিষয়ে নাটক অভিনয় করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের কপাল ফিরিয়া গেল। †

এই বৎসরের শেষের দিকে বেঙ্গল থিয়েটার বর্দ্ধমান-মহারাজের আহ্বানে কালনার রাজবাটীতে অভিনয় করেন। ‡ বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে বর্দ্ধমানাধিপতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার অল্পদিন পরেই—ডিসেম্বর মাসে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। এই উপলক্ষ্যে ১৮৭৪, ১২ই ডিসেম্বর তারিখে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয় হয়। নাট্যশালার ভিতর ও বাহির পরিপাটিরূপে সাজান হইয়াছিল। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখিয়াছিলেন :—

Bengal Theatre.—We hear that the Maharajah of Burdwan has allowed his name to be connected with the Bengal Theatre as its patron. This concession on the part of the Maharajah was duly celebrated on Saturday last, when the

* ১৮৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে মাইকেলের 'মায়াকানন' নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকের 'বিজ্ঞাপনটি' উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বঙ্গ-কবি শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাটকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

.. গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।

কলিকাতা। পৌষ,—১২৮০।   শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ। শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক।"

† এই প্রসঙ্গে ১২৮০, ১১ই আশ্বিন তারিখের 'মধ্যস্থ' পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"বিবদূত বলেন, কলিকাতা ও হুগলীতে 'মোহন্তের কি এই কাজ?' নামক নাটক অভিনয় করাতে মোহন্তের ব্যারিষ্টার কলিকাতা বেঙ্গল থিয়েটরের অধ্যক্ষের নামে ক্ষতিপুরণের দাবীতে নালিস করিয়াছেন। যখন উক্ত নাটকাভিনয় আরম্ভ হয়, তখন আমরা এই রূপ আশঙ্কাই করিয়াছিলাম।"

‡ "*Bengal Theatre.*—A correspondent says that Maharaj Adhiraj of Burdwan had invited the company of the Bengal Theatre to give a few performances in his palace at Culna, and has volunteered to pay all the expenses attendant on the same."—*Indian Daily News* for Novr. 23, 1874.

well-known and favourite drama, 'Durgesh Nandini', or the Virgin of the Fortress, was repeated for the 11th time. The Theatre building was neatly decorated inside and out with festoons and flags, and, as usual, a bumper house rewarded the company for their exertions to please the public.

পর বৎসর (১৮৭৫) ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী,' ও আগষ্ট মাসে 'দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটার' নামে আর একটি কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন সম্মিলিত অভিনয় দেখান। দুইটি দলই 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' হইতে বিচ্ছিন্ন অভিনেতাদের সহযোগে গঠিত। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীতে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্ম্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি ছিলেন। দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটারে ধর্ম্মদাস সুর ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। এই দুইটি দলের কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১৮৭৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। এই দিন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামক গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

BENGAL THEATRE

Saturday, 6th February 1875.

With the united strength of both the Great National Opera Company and the Bengal Theatre Company.

Opera Opera Opera.

SATI KI KALANKINI

Wonderful Transformation.

Synopsis in English.

'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন—১৮৭৫, ১৪ই আগষ্ট তারিখে। এই দিন উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। ১৭ই আগষ্ট (মঙ্গলবার) তারিখে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন:—

An opposition company commenced their season on Saturday last at the Bengal Theatre with the new drama by Babu U. N. Das called Surendra Binodini. It was a great success but the theatre is too small.

পর সপ্তাহে—২১এ আগষ্ট 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ১৯এ আগষ্ট তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহার নিম্নদেশে লেখা আছে:—

The right of acting '*Surendra-Binodini*' is reserved to the New Aryan Theatre Company for 1875-76.

'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানী' যে ভূতপূর্ব্ব 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তাহা ১৮৭৫, ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বীরনারী' নাটক অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যাইবে:—

BENGAL THEATRE.

Attention Please!

Saturday 4th *September* 1875

On the Stage of the Bengal Theatre.

By the New Aryan (late *National*) Theatre Co.

... ...

বীরনারী।

...

উপরে যে-সকল অভিনয়ের উল্লেখ করা গেল তাহা ছাড়া বেঙ্গল থিয়েটারে আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল অভিনয়ের মধ্যে যেগুলির উল্লেখ আমি সংবাদপত্রে পাইয়াছি তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। এ-সকলের মধ্যে 'গুইকোয়ার নাটক'টি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার অপরাধে তদানীন্তন বড়োদা-রাজের বিচার হয়। এই বিষয়টি লইয়া নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুইকোয়ার নাটক' রচনা করেন। নাটকখানির সমালোচনাকালে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৮৭৫, ১৭ই জুন তারিখে লিখিয়াছিলেন:—

গুইকোয়াড় নাটক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ আনা। নগেন্দ্র বাবুও একজন প্রসিদ্ধ আক্‌টর। এই নাটকখানিতে অতি সংক্ষেপে গাইকোয়াড়ের বিচার সংক্রান্ত ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৮৭৬ সনের ২৬এ জানুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের নূতন বাড়ি নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। 'ইংলিশম্যানে'র সংবাদটি এইরূপ:—

A New Native Theatre.—We hear that the Bengal Theatre Company are getting up a new theatre [house] in Beadon Street, opposite the house of the late Babu Ashutosh Deb. The company expect to open the Theatre next month.

পরিশিষ্ট

বেঙ্গল থিয়েটার

(বীডন ষ্ট্রীট—কলিকাতা)

শর্ম্মিষ্ঠা — মাইকেল মধুসূদন দত্ত — ১৬ আগষ্ট ১৮৭৩
H. Patriot, 18. 8. 73

ঐ — ঐ — ২৩ আগষ্ট ১৮৭৩
অ. বা. পত্রিকা ২৮. ৮. ৭৩

[চক্ষুদান — রামনারায়ণ তর্করত্ন — ৫ অক্টোবর ১৮৭৩
রত্নাবলী — ঐ — ২২ নবেম্বর ১৮৭৩
কৃষ্ণকুমারী — মাইকেল — ২৯ নবেম্বর ১৮৭৩
নাট্য-মন্দির, ৪র্থ বর্ষ, পৃ. ১৪৯-৫০]

মোহন্তের এই কি কাজ ? 'সাপ্তাহিক সমাচার'-সম্পাদক বদ্মগোপাল চট্টোপাধ্যায় ? — ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩
Eng. 13. 12. 73.

দুর্গেশনন্দিনী — — ২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩
Eng. 20. 12. 73.

ঐ — — ২৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩
Eng. 27. 12. 73.

ঐ (৩য় অভিনয়) — — ৩ জানুয়ারি ১৮৭৪
এডুকেশন গেজেট ৩০. ১. ৭৪

অপূর্ব্ব কারাবাস — ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪
H. P. 19. 1. 74.

দুর্গেশনন্দিনী — ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
H. P. 16. 2 74.

ঐ — ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
Eng. 24. 2. 74.

রত্নাবলী — রামনারায়ণ তর্করত্ন — ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
এরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব — কস্যচিৎ বিস্তাশূন্য ভট্টাচার্য্য — *Eng.* 3. 3. 74

প্রভাবতী ('লেডী অফ দি লেকে'র অনুসরণে) — ৭ মার্চ্চ ১৮৭৪
H. P. 9. 3. 74.

বিদ্যাসুন্দর — যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর — ১৪ মার্চ্চ ১৮৭৪
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল — রামনারায়ণ তর্করত্ন — *Eng.* 17. 3 74.

[মালতীমাধব — ঐ — ২১ মার্চ্চ ১৮৭৪
নাট্যমন্দির, ৪র্থ বর্ষ, পৃ. ১৫১]

রুক্মিণীহরণ ; উভয়সঙ্কট — রামনারায়ণ তর্করত্ন — ১১ এপ্রিল ১৮৭৪
Eng. 11. 4. 74.

মায়াকানন (১ম অভিনয়) — মাইকেল মধুসূদন দত্ত — ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪
Eng. 18. 4. 74 ;
H. P. 20. 4. 74

ঐ (২য় অভিনয়) — ঐ — ২৫ এপ্রিল ১৮৭৪
Eng. 25. 4. 74.

দুর্গেশনন্দিনী — — ২ মে ১৮৭৪
Eng. 2. 5. 74

কৃষ্ণকুমারী — মাইকেল — ৯ মে ১৮৭৪
Eng. 9. 5. 74

পদ্মাবতী — ঐ — ৪ জুলাই ১৮৭৪
Eng. 4. 7. 74

দুর্গেশনন্দিনী — — ১৫ আগষ্ট ১৮৭৪
Eng. 18. 8. 74

পুরুবিক্রম — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — ২২ আগষ্ট ১৮৭৪
Eng. 22. 8. 74

দুর্গেশনন্দিনী — — ৩ অক্টোবর ১৮৭৪
প্রহসন :—Opera Troubles — *Eng.* 3. 10 74

কেরাণী দর্পণ — — ১০ অক্টোবর ১৮৭৪
প্রহসন :—Opera Troubles — *Eng.* 14. 10. 74

দুর্গেশনন্দিনী — — ৫ ডিসেম্বর ১৮৭৪
Eng. 8. 12. 74

ঐ — — ১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪
I. D. News 15. 12. 74

মণিমালিনী — ২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪
Eng. 28. 12. 74

মায়াকানন — মাইকেল — ২ জানুয়ারি ১৮৭৫
Eng. 2. 1. 75

কৃষ্ণকুমারী — ঐ — ৯ জানুয়ারি ১৮৭৫
(মৌলা বক্‌শের গান ও জলতরঙ্গ ও বীন্) — *Eng.* 9. 1. 75

আলালের ঘরের দুলাল — ১৬ জানুয়ারি ১৮৭৫
প্রহসন :—অপেরা — *Eng.* 16. 1. 75

শর্ম্মিষ্ঠা — মাইকেল — ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫
Eng. 23. 1. 75

সতী কি কলঙ্কিনী * — নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
(গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর সহিত মিলিত অভিনয়) — *Eng.* 6. 2. 75.

---

* অমৃতলাল বসু ('অমৃতমদিরা', পৃ. ২৮৩), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সতী কি কলঙ্কিনী'র গ্রন্থকার। কিন্তু ১ম সংস্করণের পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পাইতেছি।

কপালকুণ্ডলা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
(গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানীর সহিত মিলিত অভিনয়) *Eng.* 13. 2. 75

অপূর্ব্ব কারাবাস ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
গ্রে ন্যা. অ. কোম্পানী *Eng.* 20. 2 75

ওথেলো ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
গ্রে. ন্যা. অ. কোং *Eng.* 27. 2. 75

মেঘনাদবধ মাইকেল ৬ মার্চ্চ ১৮৭৫
গ্রে. ন্যা. অ. কোং *Eng.* 6. 3. 75

দুর্গেশনন্দিনী ২৫ মার্চ্চ ১৮৭৫
Eng 25. 3. 75

গুইকোয়ার নাটক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ মে ১৮৭৫
Eng. 22. 5. 75 ;
অ. বা. প. ২০. ৫. ৭৫।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী উপেন্দ্রনাথ দাস ১৪ আগষ্ট ১৮৭৫
(১ম অভিনয়) অ. বা. প. ১২ ৮. ৭৫ ;
দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার *Eng.* 17 Aug.

ঐ ২১ আগষ্ট ১৮৭৫
নি এ. থিয়েটার অ বা. প. ১৯-৮-৭৫

ঐ ২৮ আগষ্ট ১৮৭৫
অর্থাগমের নূতন উপায় বা মেয়ে মানুষে কি না হয় } দি নিউ এরিয়ান্ থিয়েটর অ. বা. প. ২৬-৮-৭৫

বীরনারী, ভারত-সঙ্গীত, কিঞ্চিৎ জলযোগ } দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটার ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
অ. বা প. ২. ৯. ৭৫

বঙ্গবিজেতা রমেশচন্দ্র দত্ত ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
(১ম অভিনয়) নি. এ… থিয়েটার *Eng.* 11. 9 75

বঙ্গবিজেতা, মাখাল ফল } নি. এ… থিয়েটার ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
অ. বা. প. ১৬-৯-৭৫

পলাশীর যুদ্ধ, মাখাল ফল } নবীনচন্দ্র সেন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
নি. এ… থিয়েটার *Eng.* 25. 9. 75

ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৭৩ সনের শেষের দিকে 'হিন্দু ন্যাশনাল' এবং 'ন্যাশনাল,' এই দুই নাট্যসম্প্রদায়ই মফঃস্বল-ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে হিন্দু ন্যাশনালের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল' নাম ধারণ করেন কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার পূর্ব্ব নামই বজায় রাখেন।

মূল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২। পর বৎসর এই তারিখে মূল দল হইতে বিভক্ত দুই সম্প্রদায়ই, অর্থাৎ 'ন্যাশনাল' এবং 'গ্রেট ন্যাশনাল' উভয়েই, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসব করেন। ১৮৭৩, ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমরা পাই :—

> *The Great National and National Theatres.*—On Sunday, the 7th instant, the first anniversaries of both the Hindu theatres were held with much *eclat* and enthusiasm. The Venerable Raja Kalikrishna Deva, Bahadur, K. C. S., presided. At the former he delivered a Sanskrit benediction, and at the latter suitable songs in the Sanskrit language were harmoniously sung by amateur performers.

ন্যাশনাল থিয়েটারের সভা চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে হয়। বিখ্যাত নাটককার মনোমোহন বসু এই সভায় একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি যথার্থ এবং জ্ঞাতব্য কথা বলেন। উহা হইতে বৈতনিক নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

> আ'জ্ কি আহ্লাদ! আ'জ্, আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব! জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্ম দিন! গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়।
>
> … … ..
>
> কিন্তু এই যত নাম ব্যক্ত করা গেল, তত্তাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল। তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছা সম্যগ্‌রূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। তাহাতে প্রদর্শক মহাশয়েরা বিপুলার্থ ব্যয়ের দায়ে পতিত হইয়াছিলেন। অথচ যে সে যাইয়া যে দেখিয়া আসিবেন, সে যো ছিল না। তাহাতে পূর্ব্ব অভাব কিয়দংশ বই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। তাহাতে যে বিষয় সভ্য সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, সে বিষয় সেরূপ না হইয়া যেন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত, সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে বিপুল বাধা ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি প্রতিবৎসর নূতন নূতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিল, সেই কয় বৎসর সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনা যাইত, যে, যদিও ইহা মন্দের ভাল বটে, কিন্তু যত দিন কোনো বৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রঙ্গভূমি নির্ম্মিত না হইতেছে, তত দিন অভাব নিবারণ ও আশা পূরণ হইল বলিয়া কোনো মতেই স্পর্দ্ধা করা যাইতে পারে না।
>
> এই জল্পনা চলিতেই ছিল, কোনো দিগে প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল না। বান্ধবমণ্ডলী যখনই একত্র মিলিতাম, এই কথা উঠিবামাত্র সকলেই এই বলিয়া নিরাশ্বাস

হইতাম, 'আমাদের সমাজ ততদূর উন্নত হয় নাই, যে, বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে।' আমরা আরো ভাবিতাম, যে, যদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু এমন বুকওয়ালা সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মধ্যে কৈ আছে, যাহারা সাহস করিয়া অগ্রে অগ্রসর হয়?

মনে ও বাক্যে আমরা এইরূপে ভাবিয়া ও প্রকাশ করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ও মা! এমন সময় গত বৎসর (ঠিক এম্‌নি সময়ের কিছু পূর্ব্বে) শুনিতে পাইলাম, যে, একদল সুসভ্য যুবক তদনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন! এই সংবাদকে 'ভাল কথার মিছাও ভাল!' এই রূপে গ্রহণ করিতে করিতে দেখি, যে, সত্যই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে! প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হইল, ঠিক্ পড়িতে পারি নাই কি ঠিক্ মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। এজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও ঐ বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সত্য সত্যই এমন সাহসী সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়াছেন! সে সম্প্রদায় আবার বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়! দেখিয়া পরমাহ্লাদিত ও তৎসঙ্গে একটু বিস্ময়ান্বিতও হইলাম। কিন্তু তথাপি ভাবিলাম, যে, এ উদ্যোগ কার্য্যকালে কতদূর তিষ্ঠিবে এবং পরিণামে কতদূর সফল হইবে তাহা বলা যায় না! দেশের অবস্থা বিবেচনায় সেরূপ সন্দেহমিশ্রিত চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সেরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম, যে, বাঙ্গালীর অসাধ্য কোনো কার্য্যই নাই। বাঙ্গালীর সম্মুখে যদ্যপি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না পড়ে (বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় পরাধীনতা পরাজয় করণে অক্ষম) তবে বাঙ্গালী সকল কর্ম্মেরই যোগ্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই! আরো ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের নিজমনে বিশুদ্ধ দৃশ্য-কাব্য-দর্শন লালসা যেরূপ বলবতী, এরূপ বুভুক্ষা আ'জ্ কা'ল্ সহস্র সহস্র হৃদয়ে অবশ্যই উত্তেজিতা আছে, অতএব কেনই বা এই সাহসী যুবকেরা সিদ্ধ-মনোরথ না হইবেন?

ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাই হইল! যেরূপে জাতীয় নাট্যসমাজ আপনাদিগের সুবিখ্যাত রঙ্গভূমির দ্বারোদ্ঘাটন করেন, যেরূপে তাঁহাদিগের প্রতি দেশস্থ লোক আশাতিরিক্তরূপে মহানাগ্রহ সহকারে বাক্যে, ব্যবহারে ও অর্থে আনুকূল্য করিতে অগ্রসর হয়েন, যেরূপে তাঁহারা আত্মদীক্ষিত অভিনেতৃ বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের আশা পূর্ণ ও আপনাদের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করেন, যেরূপে গতবৎসর হেমন্ত ঋতু ব্যাপিয়া জাতীয় নাট্যসমাজের আলোচনাতেই সমাজ হর্ষ-ব্যস্ত থাকেন, যেরূপে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন বিষয়ের দৃশ্যকাব্য প্রদর্শিত হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত উৎসাহ ও লোকানুরাগ আকর্ষিত হয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গ এস্থলে বাহুল্যরূপে বিবৃতি দ্বারা আপনাদের সময় ও শ্রবণকে ভারাক্রান্ত করা বাড়ার ভাগ, কেননা সে সব তত্ত্ব এই সভাস্থ সকলেই সুন্দররূপে অবগত আছেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের যোগ্যতা ও উদ্যমশীলতাকে আমরা প্রচুর ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগের ঐ দুটী গুণই তাঁহাদিগের সফলতার কারণ। তৎসঙ্গে 'জাতীয়' নাম ধারণও সামান্য সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে। এই নামটী গ্রহণ করাতে এই রঙ্গভূমিটী সাম্প্রদায়িক না হইয়া সাধারণের স্নেহস্থল রূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে।* এই নামটী সম্প্রদায়ের বিশেষণ

* অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া এ যাবৎ সকল লেখকই লিখিয়া আসিয়াছেন যে, বাগবাজারের দল কলিকাতায় 'লীলাবতী'র সপের অভিনয় ১৮৭১ সনে করেন এবং তখন হইতেই সম্প্রদায়ের নাম ছিল - ন্যাশনাল থিয়েটার। অর্দ্ধেন্দুর এই উক্তি যে নির্ভরযোগ্য নহে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে 'পঞ্চপুষ্পে' (পৌষ ১৩৩৯) দেখাইয়াছি। মনোমোহন বসুর উপরিউদ্ধৃত অংশ আমার মতই সমর্থন করে। তাহা ছাড়া আরও একটি নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। সম্প্রতি 'ইংলিশম্যান' পত্রের কতকগুলি পুরাতন ফাইল দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। ১৮৭২, ২০এ নবেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে ১৮৭২ সনের শেষাশেষি (১৮৭১ নহে) সম্প্রদায়ের ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ হয়:—

> *A New Native Theatrical Society.*—A few native gentlemen, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, named "The Calcutta National Theatrical Society," their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is a laudable one, and is the first of its kind. The first public performance is to take place on the 7th proximo, on the premises of the late Babu Maddusudan Sandel, Upper Chitpore Road.

অর্দ্ধেন্দুশেখর বলিয়াছেন, প্রথমে *Calcutta Nationl Theatre* নাম রাখা হয়, পরে মতিলাল সুরের কথায় 'Calcutta' কথাটি বাদ দেওয়া হয়।

'ইংলিশম্যান' পত্রের ফাইলগুলি দেখিবার সুবিধা হওয়ায় আরও একটি ভুল সংশোধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রবন্ধের প্রথম পর্য্যায়ে (মাঘ, পৃ. ১৪) লেখা হইয়াছে:—"অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন, নীলদর্পণের অভিনয়ের পর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল;…আমি এখনও 'ইংলিশম্যান'-এর এই সমালোচনা দেখি নাই, কিন্তু অমৃতলাল উহার বে-কয়েকটি ছত্র স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি এইরূপ,—'Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি।'"

'ইংলিশম্যানে' এরূপ কোন সমালোচনা আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

হওয়াতে হিন্দুমাত্রেই বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দু, (তন্মধ্যে আবার সুশিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দু মাত্রেই) ইহাকে আপনাদের যৌতো আনন্দ-ভূমিরূপে ভাবিয়া ইহার প্রতি মহা অনুরাগী হইয়াছেন। ফলতঃ এই জাতীয় নাট্যালয় সংস্থাপিত ও মুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে এদেশে এবিষয়ে যত কিছু অভাব ছিল, তাহা নিরাকৃত হওনোন্মুখ হইয়াছে। আমি যদি সময় পাইতাম, তবে ইহার দ্বারা দেশের যে যে উপকার হওন সম্ভব, তাহা বিস্তারিত রূপে দেখাইয়া আক্ষেপ নিবারণ করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত পরশ্ব মাত্র আমাকে এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।...অভিনয়ার্হ বিষয়, অভিনয়ের পদ্ধতি এবং মাতৃভাষায় টিকিট ও পত্রাদির প্রচলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল, তাহা অদ্য বলিবার সময় পাইলাম না। কেবল দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটী গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গ-ভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢপ, আখ্‌ড়াই, হাফ্‌ আখ্‌ড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতি-কাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিনভিকারী ও রা'তভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না, সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না। যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্ত্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটা মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন! আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টী গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক! এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃসম্প্রদায় যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অঙ্গরাগ বাড়াইয়া তুলেন!

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই, যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সত্যকার স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়ার্হ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। এ কথা আমরা আংশিক রূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্ব্ব প্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্য-মনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সমাজের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কি না তাহা কি আর বহু বাক্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে? এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যা-পল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গ-ভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে এই রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শত বর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয়

প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তি-সাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ-সমাজ অবলম্বন না করেন! অধিক আর বলিতে চাহি না!

* * *

এতক্ষণ যত কথা বলা হইল, সকলই সুখের কথা। এখন একটী দুঃখের কথা বলিবার পালা আসিল। সে দুঃখের কথা আর কিছুই না, সেই চিরকেলে বঙ্গীয় অনৈক্যের প্রসঙ্গ! যে অনৈক্যের জন্য আমাদের সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এখনও কত হইতেছে, দুর্ভাগা হিন্দু সমাজের সেই চিরন্তন অনৈক্য এমন আনন্দের কাজেও দেখা দিয়াছে! যে সুশিক্ষিত যুবক কয়েকজন সম্বদ্ধ হইয়া এই সুখময় পদার্থের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে ঐক্য দেবের অনুগত ও তদ্দ্বারা চালিত হইয়াই শুভোদ্দেশ্য সাধনে তৎপর থাকিতেন, তবে কি সৌভাগ্যই না ঘটিত! কিন্তু তাহা হইল না! গৃহ বিচ্ছেদরূপ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া এক সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভাজিত করিয়া দিল! তাহার ফল কি হইল? কেন, বিগত বর্ষে এত যে অর্থ ও সুনাম উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সে দুটীই অপব্যয়ে অপসারিত হইয়া গেল! জাতীয় নাট্যসমাজ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নানাস্থানী হইতে বাধিত হইলেন! শুদ্ধ যে অর্জ্জিত অর্থের ক্ষয় হইয়াই পর্য্যাপ্তি হইয়াছিল, বোধ করি তাহাও নহে। তদুপরি নিদারুণ ঋণদায়ে জড়িত হইয়া সমাজকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে ইঁহাদিগের সুপ্রতিষ্ঠাযোগ্য অসীম অধ্যবসায়কে ধন্য, যে তাঁহারা তদ্দ্বারা সেই ভীষণ ঋণজালে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এমন মূলধনের সংস্থাপন করণে সমর্থ হইয়াছেন, যে, ভবিষ্যতের পক্ষে সদাশা প্রবলা হইতেছে! ঈশ্বরানুগ্রহে ইঁহারা যে পুনর্ব্বার পদস্থ হইয়া আপনাদের মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ সুচারুরূপে গম্য পথে গমন করিতে পারিতেছেন, ইহাও পরম সৌভাগ্যের কথা!

অপিচ ইহাও সম্ভব হইতে পারে, যে, তাঁহারা যে দুই বৃহৎ অংশে বিভাজিত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেক শাখাই আবার অধ্যবসায়ের সহায় বলে ক্রমে মহামহীরুহ হইতে পারেন! আমাদের বড় মন্দ হইল না: পূর্ব্বে ইঁহারা এক ঘর ছিলেন, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া দুই ঘর হইয়া উঠিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে আমোদ পাইতাম, এখন দুই ঘরেই নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইব! প্রার্থনা করি, সর্ব্ব শুভ-প্রেরয়িতা তাঁহাদিগের উভয় সম্প্রদায়কেই মঙ্গলের পথে পরিচালন করুন! তাঁহাদের মন যেন নীচাশয় দ্বেষানলে প্রজ্বলিত না হইয়া সৎপ্রতিযোগিতা রূপ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তককে সহায় করিয়া উভয় পক্ষই কল্যাণের উচ্চ শেখরে আরোহণ করিতে পারেন!

এক্ষণে উপসংহার কালে এই প্রার্থনা, যে, তাঁহারা যত আমোদ করুন; যত প্রকার দৃশ্যকাব্যের অভিনয় প্রদর্শনদ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন; ধনে, মানে ও নামে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার শতগুণে কৃতকার্য্য হউন: কিন্তু যেন তাঁহাদের আদ্যাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্য-সমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য্য করিতে ত্রুটী না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ন না হয়েন—আবার যেন সেই কুরীতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া ওপক্ষের অন্তিম সীমায়, অর্থাৎ একবারে স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলই উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলই সংস্কার, পরিবর্ত্তন, বা মূলোৎপাটনের যোগ্য, এরূপ অতিগমনশীল ভয়ঙ্কর বুদ্ধির লোণাপানি খাইয়া রুগ্ন হইয়া না পড়েন!—যেন কেবলই আমাদের দিগে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের রুচিকে কদর্য্য পথে চালিত না করেন—যেন কুরসিকতা ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাততঃ ভাল লাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগকে উৎসাহ না দেন—যেন যথার্থ সৎকবি, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তুলেন—যেন মাদকোন্মত্ততাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবৎলোকে সেসব পাপের প্রতি ঘৃণা করে, এমন তেজস্বী, যশস্বী ও মনস্বী অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরম হিতৈষী নটসমাজ রূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন! ('মধ্যস্থ,' পৌষ ১২৮০)

ন্যাশনাল থিয়েটারের দল এই সময়ে আবার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষের 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধে (পৃ. ১৯৬) প্রকাশ, মতিবাবু বেলবাবু প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পাল এই দলের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর এখানে তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩ সনের ১৩ই ডিসেম্বর। ১৮৭৩, ১১ই ডিসেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাই:—

NATIONAL THEATRE
AT THE OLD LOCALE, JORASANK,
CHITPUR ROAD.

Grand Opening Night.
Saturday, the 13th December, 1873.
The most interesting & the Latest Published.

Martial Drama
HEMLATA
By Babu Hara Lal Ray

Prices of Admision:
First class, Rs 2; Second class Re 1 and
Third class 8 as.

Performance to commence at 8 P.M.
The above Drama to be had at the Theatre.
Price Re 1 only.

'হেমলতা' অভিনীত হইবার পর 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় (১৮ই ডিসেম্বর) এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

> বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি বীর-রস প্রধান পুস্তকের অসদ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি শ্রোতার অভাবে নহে।……গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে হেমলতা নাটকের অভিনয়ে আমরা ইহার আর একটী প্রমাণ পাইয়াছি। নাটক খানি যেরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, উহা সেইরূপ অভিনয়োপযোগী হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় রঙ্গভূমিতে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি হেমলতার ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্য্য হয় নাই। এই কৃতকার্য্যতা নাটকের গুণে হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় না। সত্যসখা, হেমলতা, বিক্রমসিংহ, কমলাদেবী প্রভৃতির অংশ গুলি যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারাও গুণবান লোক। নূতন বৎসরের আরম্ভে ন্যাশনাল থিয়েটরের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

১৮৭৪ সনের ৩রা জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :—
"In commemoration of our late lamented dramatist Roy Dono Bundhu Mittra Bahadoor."

পরবর্ত্তী ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সমারোহের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় (১২ই ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত এই অভিনয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

NATIONAL THEATRE
Saturday, the 14th February, 1874.
A Grand night.
For the first time
BABU BANKIM CHANDRA'S
FAMOUS AND UNPARALLELED PIECE
মৃণালিনী
With startling & exquisite scenic representations
On the stage
Among other extraordinary exhibitions
Lo! the thrilling
Cremation-scene of the minister
পশুপতি
And the self-immolation on his funeral pile
of his faithful and virtuous wife
মনোরমা।

ইহার অল্পদিন পরেই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র সহিত মিলিত হইয়া যান; 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ইহা জানা যাইবে :—

> The Week.—··· *Saturday, 18th April.*
> We observe that two of the native theatres are still a-going. This evening Hemlata was performed at the Great National with which the National has been amalgamated,...(The *Hindoo Patriot* for April 20, 1874.)

ন্যাশনাল থিয়েটারে যে-সকল অভিনয় হয়, সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহাদের একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ন্যাশনাল থিয়েটার যে দ্বিতীয়বার তাঁহাদের পুরাতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই সকল অভিনয় করেন তাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকদের অনেকেরই জানা নাই!

পরিশিষ্ট

ন্যাশনাল থিয়েটার

(পুনরায় সান্যাল বাড়িতে)

হেমলতা	হরলাল রায়		১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩
		অ. বা. প.	১১-১২-৭৩
কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র		২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩
		"	১৮-১২-৭৩
হেমলতা	হরলাল রায়		২৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩
		"	২৫-১২-৭৩
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র		৩ জানুয়ারি ১৮৭৪
		"	১-১-৭৪
আমিতো উন্মাদিনী ···	শ্রীনাথ চৌধুরী		১০ জানুয়ারি ১৮৭৪
কিঞ্চিৎ জলযোগ ···	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	"	৮-১-৭৪
মোহান্ত			
ভারতমাতা ···	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো		
কুসুমকুমারী *	চন্দ্রকালী ঘোষ		১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪
Exhibitions of *Chemical Operations* and Magical Entertainments by Chemical Professors, Lately arrived from Europe.		"	১৫-১-৭৪

* "Just Published. Kushuma Kumari Nataka. A Bengallee Drama in 5 Acts; got up in prose after Shakespeare's Cymbeline, and adapted to the Native Stage. Apply to the undersigned. Price 1 Rupee. Chunder Kally Ghose. Sobhabazar Calcutta "—(The *Hindoo Patriot* for June 29, 1868). পরবর্ত্তী ১৯এ অক্টোবরের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নাটকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠে জানা যায় চন্দ্রকালী ঘোষই নাটকখানির রচয়িতা।

{ হেমলতা	···	হরলাল রায়	২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪
{ বাজারের লড়াই *	···	শিশিরকুমার ঘোষ	অ. বা. প ২২-১-৭৪
{ বুঝলে কি না	···	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (?)	১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ বুধবার
{ বাজারের লড়াই	···	শিশিরকুমার ঘোষ	*H. P.* 9. 2. 74
মৃণালিনী	···		১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
			অ. বা. প. ১২-২-৭৪ ;
			H. P. 16. 2. 74
হেমলতা	···	হরলাল রায়	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
(রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটী)			মঙ্গলবার
			H. P. 23. 2. 74
লীলাবতী	···	দীনবন্ধু মিত্র	২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
			অ. বা. প. ১৯-২-৭৪

দ্রষ্টব্য ঃ—ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক ১৮৭৩ সনের ২৯এ মার্চ্চ তারিখে নেটিব হসপিটালের সাহায্যকল্পে টাউন-হলে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের কথা গত মাসে বলিয়াছি। এই অভিনয় দ্বারা নেটিব হসপিটাল কি পরিমাণ অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছিল, তাহা ১৮৭৩, ১৮ই এপ্রিল তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে জানা যাইবে ঃ—

সাপ্তাহিক সংবাদ।—···সম্প্রতি ন্যাশনেল থিয়েটার টাউন-হলে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়া যে ২১০ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত নাটকাভিনেতৃ সম্প্রদায় নেটিব হাসপাতালের হিতোদ্দেশে সম্প্রদান করিয়াছেন।

উমা

—শ্রীসুশীল কুমার দে

উমারে কাঁদায়ে ফিরায়ে দিয়েছ, অতি-নির্ম্মম হে সন্ন্যাসী,
যে-দেবতা জাগে মনের পদ্মে তাহারে করিয়া ভস্মরাশি।
　　পূজার পুষ্প এখনো রয়েছে বেদীর 'পরে
　　স্বহস্তে তুলি' এনেছিল যা' সে তোমার তরে;
প্রণতির কালে পড়েছিল খ'সে নীল-অলকের যে ফুলগুলি
এখনো শীর্ণ হয়নি ত তাহা,—লুপ্ত করেনি পথের ধূলি।

বসন্ত-সাথে বসন্ত-সখা তপোবনে পশে অকালে আসি',
দ্যুলোকে ভূলোকে প'ড়ে গেল সাড়া,—মনে আর বনে ফুটিল হাসি।
　　স্তবকিনী লতা ফুল-আভরণে ঈষৎ নতা,
　　সাজিল গৌরী, বুকে মধুময় সুরভিব্যথা;
মণ্ডন হ'ল অঙ্গে অঙ্গে মুক্তার মত সিন্ধুবার,
পদ্মরাগের মতন অশোক, সুবর্ণ সম কর্ণিকার।

---

* 'বাজারের লড়াই' পুস্তিকার প্রকাশকাল—"মাঘ, ১২৮০"।

মন্দাকিনীর পুষ্কর-বীজ যতনে শুকায়ে সূর্য্য-করে
অক্ষমালাটি এনেছিল রচি' সর্প-বলয় করের তরে।
চরণের দাগ এখনো রয়েছে পথের পাশে,
অঙ্গ-সুরভি এখনো তাহার বাতাসে ভাসে,
অশ্রু-সজল সে দু'টি করুণ নয়নের মায়া গিয়েছে রেখে,
পক্ক বিম্বফলের মতন অধরের ছায়া আঁখিতে এঁকে।

এখনো ধ্বনিছে তব হুঙ্কার, আকাশে অমর অভয় মাগে,
তপোভঙ্গের রোষে কর্কশ ভ্রূভঙ্গ তব এখনো জাগে।
এখনো হাসিছে পিশাচের দল রক্ত-আঁখি,
নীল নভোতল কালো হ'য়ে গেছে আঁধারে ঢাকি';
এখনো তীব্র রতি-হাহাকার ভুবন ছাপিয়া গগন ভরে,
পুরুষ-আকৃতি বিভূতির রেখা এখনো রয়েছে ক্ষিতির 'পরে।

সতীদেহ ল'য়ে স্কন্ধে একদা, হে দেহ-পাগল, এ ত্রিভুবন
কেঁদে ফিরেছিলে, তাই বুঝি আজ দেহ-বিদ্বেষী তোমার মন;
দেহ-দেউলের দেবতার দেহ, হে যতিরাজ,
কি কঠোর তব নিগ্রহ-দাহে দহিলে আজ;
দেহ পুড়ে হয় ভস্ম যেথায়, ভালবাস সেই শ্মশান তুমি—
ভস্ম-বিভূতি, দেহের ভস্মে করিবে এ ধরা শ্মশান-ভূমি?

নিন্দিল রূপ সুন্দরী উমা আপন হৃদয়ে বিষাদ ভরে;
রূপে অহার্য্য বিরূপ যে তুমি,— রূপ সে ত নহে তোমার তরে।
চির-অরূপের ধেয়ানে মগন, দিগম্বর,
বর্ণ-বিহীন মহাকাল তুমি, শ্মশান-চর;
রূপ কেঁদে যায় অরূপের দ্বারে,—রূপসী ধরণী শিহরি' কাঁপে
ভাঙ্গে যবে তা'র রূপের হর্ম্ম্য তব সংহার-শূলের চাপে।

হিম-আলয়ের বিবিক্ত মরু-শিখরে বসিয়া, হে ধ্যানলীন,
শিখেছ কি শুধু মারণ-মন্ত্র, মরণ-বিলাসী মমতাহীন?
যোগ-নিমগ্ন নয়নে কি শুধু অনল জ্বলে?
তাণ্ডব তব নিখিলের সুখ দু'পায়ে দলে?
কি ফল লভিলে করিয়া শুষ্ক শবের উপরে অধিষ্ঠান?
রূপ-সাগরের মন্থনে তুমি শুধু কালকূট করিলে পান।

নব বসন্ত-বন্যার স্রোতে তবু একদিন নয়ন মেলি'
কে জানে কখন বিশ্বের পানে চাহিলে, প্রাণের পাথর ঠেলি ;
বিষ-জর্জ্জর কণ্ঠ শুকাল সুধার তরে—
ভিখারী দৃষ্টি থমকিল আসি' বিম্বাধরে ;
ধ্যান পরিহরি' পলাইয়া দুরে, ওগো রূপ-ভীরু বাঁচিবে কিসে ?
চিরদিন তরে সব ধ্যানে তব সে-রূপের কণা গেছে যে মিশে।

ভেসে গেল বুঝি তপস্যা তব সে-দিনের সেই স্রোতের মুখে,
দক্ষিণ বায়ু উড়াল তোমার চির-সংযম কি কৌতুকে।
শ্মশান-বাহিনী নদী সে জটিল জটার তলে
কি করুণ তানে উছলি' উঠিল অশ্রুজলে ;
ললাট-নেত্রে বহ্নির শিখা হ'ল কি লুপ্ত সুপ্তি-বশে ?
সন্ন্যাসী, তব করের করোটি ভরিয়া উঠিল কি মধু-রসে ?

হে ঈশান, তব বিষাণে আর ত বাজিল না সেই প্রলয়-নাদ,
স্নিগ্ধ মধুর কিরণ বিথারি' জটার আড়ালে হাসিল চাঁদ।
একটি মুখের এক নিমেষের মধুর স্মৃতি
ধ্যান-নিমগ্ন নয়নে ভাসিয়া উঠিছে নিতি ;
বুঝি মদনের দাহ-অবশেষ ভস্মে এখনো অনল জ্বলে,—
তা'রি উত্তাপে কি যেন অজানা বেদনা জাগিছে বুকের তলে।

স্রষ্টার মনে উদিল যে-কাম সৃষ্টির সেই প্রথম দিনে,
সারা-বিশ্বের বাসনা-লক্ষ্মী রতিরূপে যারে লইল জিনে,
পুষ্প-মাসের সখা সে যে হ'ল পুষ্পধনু,
ধরণীর সব সুষমা তাহার গড়িল তনু ;
তাহারি বেদনা দেহের অতীত গুমরিছে আজ সকল দেহে,
সকল চিত্তে রতির বিলাপ ক্রন্দন করে নিবিড় স্নেহে।

তোমারি লাগিয়া অপর্ণা আজ হয়েছে তাপসী, হে তপোধন,
বল্কলে বাঁধি' পীন পয়োধর, তব ভাবরসে বেঁধেছে মন ;
শ্লথলম্বিনী জটায় ঢেকেছে নীল অলক ;
ঊর্দ্ধে নিহিত দৃষ্টিতে তা'র নাহি পলক ;
লীলা-উৎপল নাহি আর হাতে, ধরেছে রুদ্র-অক্ষমালা,
কুশ-অঙ্কুরে ক্ষত অঙ্গুলি,—তোমারি ধেয়ানে বিভোর বালা।

যে ললিত তনু করেছ তুচ্ছ, হের আজ তার কি আছে বাকি ?
শুধু অতনুর তনুর ভস্মে সে-তনিমা বুঝি রেখেছে ঢাকি'।
চরণ-কমলে অলক্ত-রাগ গিয়েছে মুছি';
সজল নয়নে কাজলের রেখা গিয়েছে ঘুচি';
কানে আর নাই কানের পদ্ম,—অরুণিমা নাই সে সুধাধরে
সৃষ্টি-বিলয় দৃষ্টি তোমার থেমেছিল যেথা ক্ষণেকতরে।

রিক্তের সেই উগ্র দর্প কোথা গেল আজ, হে সন্ন্যাসী,
কোথা গজাজিন, পিনাক তোমার, কোথা তাণ্ডব, অট্টহাসি ?
শ্মশানের সাথী কোথা আজ সেই প্রেতের দল,
কোথা বুকে জ্বালা, কণ্ঠে গরল, চোখে অনল ?
শিব হ'ল বুঝি অশিব সে আজ, সুন্দর হ'ল ভয়ঙ্কর,—
তাপসী প্রিয়ার লাগিয়া আবার ফিরে এলে তুমি, হে শঙ্কর।

এতদিন পরে বুঝি আপনার সন্ধান পেলে আপন মনে,—
বিশ্ব-ক্ষুধার সুধার পাত্র কে ধরিল হাতে সঙ্গোপনে ?
উমার সে-মুখ বিরহ-মলিন, বিলীন ধ্যানে—
বেদনা তাহার কি বেদনা আজ আনিল প্রাণে ?
স্মরজিৎ, আজ স্মরের গরলে কি রাগ আবার কণ্ঠে ঝরে ?
সে-তনুভস্মে, ভস্ম-ভূষণ, তব তনু আজ কি শোভা ধরে ?

উমার অধরে ফুটিল আবার সলজ্জ হাসি মধুরতর,—
বধূর দুকূলে তব গজাজিনে বাঁধিল গ্রন্থি কি সুন্দর।
সন্ন্যাসী, তব বক্ষের চিতা-ভস্মরাশি
হরিচন্দন-পত্রলেখায় মিশিল আসি ;
তাণ্ডব সাথে লাস্য মিশিল, হাস্য মিশিল অট্টহাসে,—
ভীমরূপে মিশে রূপের লক্ষ্মী, কঠোরে কোমল যুগ্মাভাসে।

ফুটাল রক্তপদ-কোকনদ শ্মশানের মাঝে কি মন্তর ?
শ্মশান সে হ'ল কৈলাসপুরী, শ্মশানের পতি মহেশ্বর।
মন্মথজয়ী, মন্মথ বুঝি জয়ী আবার,
কটাক্ষে জাগে কটাক্ষ—হত দুর্ণিবার ;
অকিঞ্চনের জাগে কি আবার নব-ভিক্ষায় আকিঞ্চন ?
অন্নপূর্ণা ঘরে এল, তাই হ'ল সে ভিখারী চিরন্তন ?

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ কিছুদিন সেই বনেই বাস করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেন, এক গাছের তলা হইতে আর এক গাছের তলায়, এক বন হইতে আর এক বনে যাইতেন, এবং বনের মধ্য দিয়া একটা পথ ছিল সেখানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন। কিছুদিন ধরিয়া এইভাবে তিনি তপস্যালব্ধ পরম-আনন্দ উপভোগ করিলেন। ভবিষ্যতে যে ধর্ম্ম তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে বিচার ও গবেষণা, তাহার দার্শনিক ভিত্তির পরিপুষ্টি সাধন, তাঁহার স্থাপিত "সঙ্ঘ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন, এই সব বিষয়ে তিনি এই সময়ে নিশ্চয়ই অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন

সুজাতাদের বাড়ীর রাধা নামে একজন দাসী এই সময়ে মারা গিয়াছিল। তাহার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি শ্মশানে পড়িয়াছিল, বুদ্ধ এই কাপড় উঠাইয়া লইয়া নিজহাতে ছিঁড়িয়া ও সেলাই করিয়া "চীবর" বানাইয়া নিকটের একটি জলাশয়ে তাহা ধুইয়া লইলেন। এই জলাশয় বৌদ্ধদের একটি তীর্থস্থান। এই সময় হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা রাস্তা, শ্মশান প্রভৃতি স্থান হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চীবর বানাইয়া লইতেন, অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য ও অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও এইরূপ বস্ত্র সংগ্রহ করিতেন।

ক্রমে লোকজনের সঙ্গে বুদ্ধের দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল। একজন দাম্ভিক ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার কাছে আসিয়া গর্ব্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ব্রাহ্মণ" কথার অর্থ কি। বুদ্ধের সঙ্গে তাহার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে এবং ইহার শেষাংশই বৌদ্ধেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ছিল সে যে একজন মস্তলোক তাহা বুদ্ধকে বুঝাইবে। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ উত্তর দিলেন যে, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে এবং যে কামনার বশীভূত নয় সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তবে ব্রাহ্মণ-নামধারী এমন লোকও আবার আছে যাহারা জাত্যাভিমানে অন্ধ হইয়া দম্ভভরে চলাফেরা করে, চেঁচাইয়া কথা বলে ও ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা করে না। বুদ্ধের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। তপুস্‌স ও ভল্লিক নামে দুইজন ব্যবসায়ী মাল বোঝাই গাড়ী লইয়া সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। কাদায় তাহাদের গাড়ীর চাকা আটকাইয়া গিয়াছিল। বর্ণিত আছে বুদ্ধের উপদেশে—আমার মনে হয় তাঁহার দৈহিক সহযোগিতায়—তাহারা গাড়ীর চাকা উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। এই দুই বণিকভ্রাতা বুদ্ধকে আহার্য্য দান করিয়াছিল ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল।

বোধিলাভ করিয়া বুদ্ধ যে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা কি শুধু তিনি নিজেই ভোগ করিবেন না অন্যকেও দিবেন ? - এই প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইল। একবার ভাবিলেন সাধারণ্যে ইহার প্রচার করিবেন কিন্তু মনে অনেক দ্বিধা, সংশয় ও সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহার তথ্য অতি গম্ভীর, অতি জটিল, অতি কঠিন, জ্ঞানী ছাড়া অন্যে ইহার মর্ম্ম বুঝিবে না, ইহা সংসারধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী, লোকে ইহাকে উপহাস করিবে; এই ভাবিয়া প্রচার না করাই সাব্যস্ত করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন মানিলনা। হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির আবার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে প্রচার করিলে বাস্তবিক উপকার কাহারও যে একেবারে না হইবে তাহা নয়, কারণ সংসারের লোককে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—একভাগ অজ্ঞানের মধ্যে আছে এবং

চিরকাল থাকিবেও, তাঁহার প্রচার বা অপ্রচারে তাহাদের অবস্থার তারতম্য হইবে না; দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞান পাইয়াছে বা পাইয়াছে মনে করিতেছে, ইহাদের, তিনি প্রচার করুন বা না করুন কিছু যাইবে আসিবে না; কিন্তু তৃতীয় ভাগের লোক জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝামাঝি দ্বিধার অবস্থায় আছে। তিনি প্রচার করিলে ইহারা জ্ঞান লাভ করিবে, প্রচার না করিলে অজ্ঞই থাকিয়া যাইবে। এই তৃতীয় ভাগের লোকের উপকারের জন্য, যাহারা জ্ঞান পাইতে চায় ও পাইতে পারে কিন্তু পায় নাই তাহাদের প্রতি অনুকম্পায় বুদ্ধ প্রচার করিবেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। হৃদয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বুদ্ধি পরাস্ত হইল। এই সময়ের কথা রূপকে বৌদ্ধ ভক্তেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে মার আসিয়া বুদ্ধকে বলিয়াছিল যে তাঁহার অভীষ্ট যখন লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার কার্য্য বা কাম্য আর কিছুই নাই, তিনি মৃত্যু স্বীকার করুন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা লোকসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বুদ্ধ মারের কথার উত্তর দিয়াছিলেন।

এই ঘটনাকে বুদ্ধের জীবনের চরম মুহূর্ত্ত মনে করি। মানব-সমাজের পক্ষে এইটিই বুদ্ধজীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা কারণ এখানে তিনি কেবল একলা নিজের না হইয়া বহুর হইলেন। এখানেই তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। মহানিষ্ক্রমণ খুব দামী ঘটনা সন্দেহ নাই কিন্তু সে সময়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন নিজের তৃপ্তির জন্য। গৃহত্যাগের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নবজাত পুত্র রাহুলকে ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইলে "বোধিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাহুলকে দেখিব" এই কথা ভাবিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন। রাহুল-মাতা সিদ্ধার্থের বোধিলাভের আশা আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে আসিলে রাহুল-মাতা তাঁহাকে সংসারে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন একথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন; শুদ্ধোদন রাজগৃহ হইতে বুদ্ধকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে আসিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলে শুদ্ধোদন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সব বিবেচনা করিলে মনে হয় ছন্দককে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সিদ্ধার্থ যখন গৃহ হইতে বৈশালী অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন তখন তিনি চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন একথা নিজেও ভাবেন নাই অপরেও মনে করে নাই। তাঁহার অতৃপ্তির কথা সকলেই জানিত এবং তিনি নিজে ও অপরে ভাবিয়াছিলেন যে বোধিলাভ যদিও সময়সাপেক্ষ ও কষ্টলভ্য তাহা হইলেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তিনি তৃপ্তির সঙ্গে আবার সংসার করিবেন। জ্ঞানাজ্ঞানের মাঝামাঝি দ্বৈধ অবস্থায় যাহারা আছে তাহাদের উপকারের জন্য প্রচারব্রত গ্রহণের এই যে সংকল্প বুদ্ধ করিলেন ইহার সময় পিছাইয়া দিয়া পরবর্ত্তী লেখকেরা জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া সংসারের দুঃখমোচনের জন্য সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ কল্পনা করিয়াছেন।

নিজের অতৃপ্তি নিবারণের জন্য সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, অভীষ্ট বস্তু লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধিলাভের পর তিনি যদি গৃহাশ্রমে ফিরিয়া ভোগে লিপ্ত হইতেন তবে মনে করিতাম তাঁহার শ্রম গলিতশবান্বেষী শকুনের গগনবিহারের মত বৃথা হইল। গৃহে না ফিরিলেও যদি তিনি উরুবেলের বনে কুটীর বানাইয়া নির্জ্জনে বোধির পরমানন্দ ভোগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিতেন তবে তাঁহাকে গুপ্ত স্থানে খনিত তৃষ্ণার্ত্তের অজ্ঞাত নির্ম্মলজলের কূপমাত্র মনে করিতাম। কিন্তু তিনি এখন হইলেন মহাসমুদ্রের মত—পুঞ্জীকৃত মেঘপটলের সৃষ্টি করিয়া প্রবল দক্ষিণ বায়ুবাহনে সমুদ্র যেমন আপনার রসধারা বিতরণ করিয়া শুষ্ক ধরিত্রীকে প্রাণ দান করে বুদ্ধও সেইরূপ নিজে দুঃখমুক্ত হইয়া দুঃখমোচনের পথ দেখাইবার জন্য প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। এইখানে তাঁহার চরম শ্রেষ্ঠত্ব, এইখানে তাঁহার পরম মহত্ব, এইখানেই তাঁহার বুদ্ধত্ব-লাভের সার্থকতা।

প্রচারে মনস্থ হইয়া বুদ্ধ আবার ভাবিলেন, কাহাকে প্রথমে নবলব্ধ এই গম্ভীর নির্ব্বাণধর্ম্ম বুঝাইবেন? কে ইহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিবে? ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকদ্বয় আলার কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কথা তাঁহার মনে হইল; ইঁহারা উভয়েই সুপণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন ও গৌতমকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু খবর লইয়া বুদ্ধ জানিলেন—শাস্ত্রে আছে, দেবতারা আসিয়া বলিয়া গেলেন—যে তাঁহারা উভয়েই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে বুদ্ধ দুঃখিত হইলেন; তাঁহার মনে আশা ছিল যে ইঁহাদের মত জ্ঞানী ব্যক্তিরা সহজেই তাঁহার শিক্ষা বুঝিবেন ও কখনই অবহেলা করিবেন না। এত বড় গুণীলোক যে নির্ব্বাণতত্ত্ব জানিতে পারিলেন না ইহাতে বুদ্ধ

ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র বিবরণটিতে আমরা বুদ্ধের সবল সরলতা ও সহজ আন্তরিকতা দেখিতে পাই। গুরুদ্বয়কে না পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গী পঞ্চভিক্ষুর কথা মনে হইল। তিনি কৃচ্ছ্রত্যাগ করিয়া আহার গ্রহণ করিলে এই পাঁচজন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা এখন বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তন (ইসিপতন) নামক স্থানের একটি বনে (মিগদায়) বাস করিতেছে শুনিতে পাইয়া তিনি সেখানে যাওয়া মনস্থ করিলেন। ঋষিপত্তনে তখনকার দিনে সাধুসন্ন্যাসীদের একটি ঘাঁটি ছিল। হইতে পারে এই জন্যই বুদ্ধ প্রথমে এখানে মতপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং এখানে আসিবার পর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভিক্ষুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

উরুবিল্ব হইতে গয়া আসিবার পথে উপক নামক আজীবিক সম্প্রদায়ের একজন নগ্ন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বুদ্ধের দেখা হইল। বুদ্ধের গম্ভীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া উপক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ুষ্মন্, তোমার মূর্ত্তি প্রশান্ত, তোমার বর্ণ সুন্দর ও উজ্জ্বল। কাহার কথায় তুমি গৃহ ছাড়িলে? কে তোমার গুরু?"

"আমি সকল পাপ নষ্ট করিয়াছি, সকল রিপু জয় করিয়াছি; আমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি; আমি সর্ব্বত্যাগী, সকল দেবতা ও মানব হইতে আমি শ্রেষ্ঠ; আমি বুদ্ধ। আমি নিজেই যখন পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছি তখন কাহাকে আমার গুরু বলিব?"

"তবে কি তুমি 'জিন'?"

"যাহাদের পাপের মূল (আসব) ক্ষয় হইয়াছে তাহারা সকলেই আমার মত 'জিন'; আমি সকল পাপধর্ম্ম জয় করিয়াছি, অতএব আমি জিনই।"

"আয়ুষ্মন, হইতে পারে!" এই বলিয়া উপক মাথা নাড়িয়া অন্যপথে চলিয়া গেল।

বুদ্ধ-উপক-সংবাদ শাস্ত্রে এই ভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু এখানে বলা দরকার যে উপকের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল ও উপক বুদ্ধের কথায় বিশ্বাস না করিয়া সন্দিগ্ধতায় মাথা নাড়া দিয়া পাশ কাটাইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলিয়াছেন উপকের প্রথম প্রশ্নের বুদ্ধ সগর্ব্ব উত্তর দিয়াছিলেন। আসলে কিন্তু ইহাতে গর্ব্ব নাই, জোর আছে। সেই যুগে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কিরূপ বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। আজীবিকদের উপর নির্গ্রন্থেরা খড়্গহস্ত ছিলেন। মহাবীর আজীবিকদলের অধিনেতা গোশালের প্রতি অতি কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন ও আজীবিকদের তীব্র নিন্দা করিতেন। বুদ্ধও আজীবিকবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করিতেন। বোধিলাভের পর অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে উপকের সঙ্গেই বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাৎ, কাজেই এহেন নগ্ন সন্ন্যাসীর সঙ্গে জোরের সহিত কথা বলার প্রয়োজন ছিল। "জিন" কথাটি আজীবিকরা প্রথমে ব্যবহার করেন, সাধনার চরম ফল লাভকে তাঁহারা "জিন"ত্ব-লাভ বলিতেন। পরে নির্গ্রন্থেরা এবং বৌদ্ধেরাও একই অর্থে এই কথাটির ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপকের ধারণায় বোধ হয় গোশাল ছাড়া অন্য ব্যক্তি কেহ "জিন" ছিল না এবং সে নিজেও এই পরমপদ লাভের প্রয়াস করিতেছিল তাই একজন অজ্ঞাতকুলশীল লোক যখন সকল পাপ নষ্ট করিয়াছে, সকল রিপু জয় করিয়াছে, সকল দেবমানব হইতে সে শ্রেষ্ঠ এইসব কথা বলিল তখন উপক ঠাট্টা করিয়া বলিল, "তবে বল যে তুমি একজন জিন!" এ সত্ত্বেও বুদ্ধ যখন জেদ করিতে লাগিলেন তখন সে অগত্যা অন্য পথে চলিয়া গেল উপক নিশ্চয়ই বুদ্ধকে উন্মাদ ভাবিয়াছিল! উপকের পরে যে হাস্যকর ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে বলিব

কয়েকস্থানে বিশ্রাম করিয়া বুদ্ধ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গায় তখন বর্ষার প্রবল স্রোত, নৌকায় পারাপার করিতে হয় অথচ তাঁহার কাছে একটি কড়িও ছিল না। তাঁহাকে পার করিতে খেয়ার মাঝি গোলমাল করিয়াছিল। পরে এই কথা জানিতে পারিয়া রাজা বিম্বিসার বিনা শুল্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের এই স্থানের খেয়ায় পারাপারের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

বারাণসীতে পৌঁছিয়া বুদ্ধ সোজা ঋষিপত্তনে গেলেন। পঞ্চভিক্ষু দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিল ও তাঁহার কান্তিময় মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিল নিশ্চয় তিনি কৃচ্ছ্রত্যাগ করিয়া আরামে খাওয়া-দাওয়া করিতেছেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, "শ্রমণ গৌতম ব্রতভঙ্গকারী সুখলিপ্সু লোক; তাঁহার সঙ্গে আমরা কথা বলিব না, তাঁহাকে গ্রাহ্য

করিব না, তিনি আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইব না বা কোনরূপ সম্মান দেখাইব না। একখানা আসন পাতিয়া রাখিব, ইচ্ছা হইলে উনি বসিবেন।" বুদ্ধ তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের কাছে আসিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যের এমনি প্রভাব যে তাঁহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া পঞ্চভিক্ষুর আগেকার যুক্তি সব বেঠিক হইয়া গেল। পাঁচজনই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, কেহ তাঁহার হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিল, কেহ পাদোদক আনিয়া দিল, কেহ আসন পাতিয়া দিল। বুদ্ধ পা ধুইয়া আসনে বসিলেন। তখন তাহারা পূর্ব্বের অভ্যাসানুযায়ী তাঁহাকে পরিচিত সমপদস্থের মত "আয়ুষ্মন্ গৌতম" বলিয়া সম্বোধন করিল। বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে নাম ধরিয়া ডাকিও না বা 'আয়ুষ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করিও না। ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ আমার কথায় কান দাও, অমতং অধিগতং—আমি অমৃত পাইয়াছি। আমি উপদেশ দিব, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিব। আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে সেই ধর্ম্ম নিজে বুঝিতে পারিবে ও সাক্ষাৎ জানিতে পারিবে [সয়ম্ অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহরিস্সথা)।"

"আয়ুষ্মন্ গৌতম, তুমি তো পূর্ব্বের চর্য্যাদ্বারা মনুষ্যোত্তর শক্তি বা জ্ঞান লাভ কর নাই। এখন তুমি পূর্ব্বের চর্য্যা ত্যাগ করিয়া বাহুল্যভোগের দ্বারা কেমন করিয়া তাহা পাইলে ?"

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বাহুল্যভোগে আসক্ত নহেন, তিনি চর্য্যা ত্যাগ করিয়া ভোগে লিপ্ত হন নাই। হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি অমৃত পাইয়াছি; আমি উপদেশ দিব, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিব। আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে সেই ধর্ম্ম নিজে বুঝিতে পারিবে ও সাক্ষাৎ জানিতে পারিবে।"

পঞ্চভিক্ষু আবার একই উত্তর দিল। দুই তিনবার এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের পর বুদ্ধ বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি স্বীকার কর যে আজ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি পূর্ব্বে কখনও এরূপ বলি নাই ?"

"হে ভদন্ত, আপনি এরূপ বলেন নাই।"

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি অমৃত পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিব, ধর্ম্ম শিক্ষা দিব; আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে…"

পঞ্চভিক্ষু এবার আপত্তি করিল না। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।"

বুদ্ধ বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, যে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছে তাহাকে দুইটি অন্ত পরিহার করিতে হইবে। এই দুইটি অন্ত কি কি ? প্রথমতঃ ভোগ ও কামসুখের পথ—ইহা হীন, গ্রাম্য, নীচ, অনার্য্য ও অনর্থক; দ্বিতীয়তঃ শরীর নিগ্রহের পথ—ইহা দুঃখকর, অনার্য্য ও অনর্থক। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই চরম পথ ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যপথের (মজ্ঝিমা পটিপদা) জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাহাতে চক্ষু হয়, জ্ঞান হয়, উপশম হয়, অভিজ্ঞা হয়, সম্বোধি হয় এবং নির্ব্বাণ লাভ হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, এই যে মধ্যপথ যাহার জ্ঞান তথাগত লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে চক্ষু হয়, জ্ঞান হয়, উপশম হয়, অভিজ্ঞা হয়, সম্বোধি হয় এবং নির্ব্বাণলাভ হয়, সেই মধ্যপথ কি ? ইহা "আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ" (অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো), অর্থাৎ

১। সম্যক্ দৃষ্টি (অর্থাৎ উচিত বা ঠিক বিশ্বাস)

২। সম্যক্ সংকল্প

৩। সম্যক্ বাক্য

পঞ্চ ভিক্ষু।

৪। সম্যক্ কর্ম্ম
৫। সম্যক্ জীবিকা
৬। সম্যক্ ব্যায়াম (অর্থাৎ চেষ্টা বা প্রয়াস)
৭। সম্যক্ স্মৃতি, এবং
৮। সম্যক্ সমাধি (বা চিন্তা)

"হে ভিক্ষুগণ, এই সেই মধ্যপথ যাহার জ্ঞান তথাগত লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে চক্ষু হয়, জ্ঞান হয়, উপশম হয়···নির্ব্বাণলাভ হয়।

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের আর্য্যসত্য (অরিয়সচ্চম্) এই—জন্মে দুঃখ, জরায় দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, মরণে দুঃখ, অপ্রিয়ের সংযোগে দুঃখ, প্রিয়ের বিয়োগে দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা হয় তাহা না পাইলে দুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে পাঁচটি উপাদান-স্কন্ধই (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) দুঃখ ;

আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়।

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের উদয়ের আর্য্যসত্য এই—তৃষ্ণা হইতে পুনর্জন্ম হয়, তৃষ্ণা হইলেই সুখভোগের কামনা হয়, তৃষ্ণাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তৃপ্তির অন্বেষণ করে। এই তৃষ্ণা তিন প্রকার, সুখতৃষ্ণা, ভাবতৃষ্ণা (অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা), ও বিভবতৃষ্ণা ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধের আর্য্য সত্য এই—এই তৃষ্ণার সম্পূর্ণ কামনাহীন নিরোধ, ইহার ত্যাগ, ইহার প্রতিবিসর্জ্জন, ইহা হইতে মুক্তি এবং ইহার উচ্ছেদ হইলে দুঃখের নিরোধ হয় ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনিরোধের পথের আর্য্যসত্য এই—ইহা সেই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্য্যসত্য অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল কিন্তু ইহাতে আমার চক্ষু জন্মিল, জ্ঞান জন্মিল, প্রজ্ঞা জন্মিল, বিদ্যা জন্মিল, আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্য্যসত্য যদিও পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল তবু ইহা যে আমাকে নির্ণয় করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল জ্ঞান জন্মিল, প্রজ্ঞা জন্মিল, বিদ্যা জন্মিল, আলোক জন্মিল।

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্য্যসত্য যদিও পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল তবু আমি যে ইহা নির্ণয় করিলাম এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল, জ্ঞান জন্মিল···আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্য্যসত্য পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল কিন্তু ইহাতে আমার চক্ষু জন্মিল···আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের উদয়ের আর্য্যসত্য যদিও পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল তবু আমাকে যে ইহা পরিহার করিতে হইবে···এবং আমি যে ইহা পরিহার করিলাম, এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল···আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধের এই আর্য্যসত্য পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল কিন্তু দুঃখ-নিরোধ সম্বন্ধে, আমাকে যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে হইবে এবং আমি যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিরোধ করিলাম, এই (তিন বিষয়) সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল·· আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধের পথের আর্য্যসত্য পূর্ব্বে অননুস্মৃত ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু সেই পথ সম্বন্ধে, সেই পথ যে আমাকে সাক্ষাৎ জানিতে হইবে এবং তাহা যে আমি সাক্ষাৎ জানিলাম এই (তিন বিষয়) সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল ·· আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, যত দিন পর্য্যন্ত তিন প্রকার ও বার রকমের এই আর্য্যসত্য-চতুষ্টয় সম্বন্ধে আমার জ্ঞানদর্শন যথাযথরূপে সুবিশুদ্ধ হয় নাই ততদিন আমি ঠিক জানিতাম না যে সেই সম্যক সম্বোধি, যাহা কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা বা মনুষ্য পূর্ব্বে লাভ করে নাই, তাহা আমি লাভ করিয়াছি কিনা। কিন্তু ভিক্ষুগণ, যখন এই আর্য্যসত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞানদর্শন যথাযথরূপে সুবিশুদ্ধ হইল, আমি জানিলাম যে দেব-মানব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কেহ যাহা লাভ করে নাই সেই সম্যক-সম্বোধি আমি লাভ করিয়াছি। এখন আমার সেই জ্ঞানদর্শন জন্মিয়াছে। আমার চিত্তের বিমুক্তি চিরস্থায়ী ; এই আমার শেষ জন্ম ;—আর আমাকে সংসারে আসিতে হইবে না।"

শাস্ত্রের বর্ণনার ইহাই সারাংশ। বুদ্ধ যে একবারে এক নিশ্বাসে এই ব্যাখ্যানটি দিয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি যে ঐ কথাগুলিই মাত্র বলিয়াছিলেন তাহাও নয়। বাইবেলবর্ণিত খ্রীষ্টের "পর্ব্বতের উপদেশ"ও একদিনে একেবারে প্রদত্ত হয় নাই। শাস্ত্রের বিবরণে দেখিতে পাই বুদ্ধ কিছু কাল ধরিয়া শ্রোতাদের বুঝাইয়াছিলেন ও তাহাদের সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্র-প্রণেতারা বিধিবদ্ধ ভাবে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা একাধিক বারের বহু

কথার সারসংগ্রহ। এই ব্যাখ্যানদ্বারা বুদ্ধ "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" করিলেন। ইহার গুরুত্ব যে অতি বিপুল শাস্ত্র-প্রণেতারা তাহা জানিতেন কাজেই বিধিবদ্ধ ভাবে বলিতে গেলে যেটুকু করিতে হয় তাহার বেশী কোন পরিবর্ত্তন ভগবানের উচ্চারিত এই মহাবাক্যে তাঁহারা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পালিভাষায় রূপান্তরিত হইলেও বুদ্ধের ব্যবহৃত অনেক শব্দ, অনেক বাক্য ও তাঁহার বাচনারীতি অনেক পরিমাণে এই ব্যাখ্যানে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা বুদ্ধপ্রচারিত নবধর্ম্মের মূলকথাগুলি জানিতে পাই ও তিনি তাঁহার শ্রোতা-দের কাছে বলিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়কে সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়াছিলেন, কাহাকেই বা তাঁহার শিক্ষার সারাংশ বুঝিয়াছিলেন তাহার আভাস পাই। এই উপদেশটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার উপযুক্ত। মূলের ভাব ও ভাষাসম্পদ অনুবাদে রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। মূল পালিতে এই উপদেশ যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা ইহার গাম্ভীর্য্য, সজীবতা, তেজস্বিতা ও সরলতায় বিমোহিত হইবেন। "আমি অমৃত পাইয়াছি—হে ভিক্ষুগণ! আমার কথায় কান দাও, অমতং অধিগতং"—এখানে বুদ্ধ খুব বড় একটা দাবী করিতে-ছেন এবং এই দাবীর কথা এই উপদেশের প্রতি বাক্যেই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ব্যাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কয়েকটি জিনিষ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তিনি একটা খুব বড় জিনিষ পাইয়াছেন যাহা কোন দেবমানব আগে পায় নাই; ইহা একটি নূতন তথ্য, পূর্ব্বে কেহ এধর্ম্মের অনুসরণ করে নাই; তিনি সাক্ষাৎ ইহাকে জানিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিলে সকলেই ইহাকে জানিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যাহা জানিয়াছেন তাহা বিষয়ভোগ বা কৃচ্ছ্রসাধন এই দুইয়ের দ্বারা জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, তিনি জানিয়াছেন যে সংসার দুঃখময়, তৃষ্ণা হইতে দুঃখের উৎপত্তি, তৃষ্ণাত্যাগে দুঃখের নিরোধ এবং "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" অনুসরণ করিলে মধ্যপথ অবলম্বন ও দুঃখনিরোধ হয়। আমরা ক্রমে বুদ্ধের সমগ্র জীবনের বাক্য ও কার্য্যাবলীর মধ্যে এই উপদেশের ক্রিয়া দেখিতে পাইব।

পঞ্চভিক্ষুর নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পাঁচজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে বটে কিন্তু ইহারা ছাড়া বুদ্ধের এই উপদেশ-শ্রোতাদের মধ্যে অন্তলোকও নিশ্চয় ছিল।

পঞ্চভিক্ষুর মধ্যে কৌণ্ডিণ্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কয়েকদিন বুঝাইবার পর আরও দুই জন বুদ্ধের সঙ্গে একমত হইলেন। এই তিনজন ভিক্ষায় বাহির হইতেন, বুদ্ধ কুটীরে বসিয়া বাকি দুইজনকে বুঝাইতেন, তাহাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেন। ক্রমে এ দুজনও তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই পূর্ব্বসঙ্গীরা সহজে বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। নূতন কথা সহজে কেহ গ্রহণ করেও না। সকলেই জানেন আত্মা বলিয়া কোনও জিনিষ আছে একথা বুদ্ধ মানিতেন না। পঞ্চভিক্ষু তাঁহার অনাত্মবাদ গ্রহণ না করায় বুদ্ধ এইভাবে তাহাদের বুঝাইয়া-ছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, শরীর (রূপ) আত্মা নহে; শরীর যদি আত্মা হইত তবে শরীরে রোগ হইত না এবং শরীর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারিত "শরীর এরূপ হউক" "শরীর এরূপ না হউক;" শরীর আত্মা নহে বলিয়াই তাহাতে রোগ হয় ও শরীর সম্বন্ধে আমরা এরূপ কথা বলিতে পারি না। [সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইভাবে দেখান যাইতে পারে যে ইহাদের কোনটিই আত্মা নহে]। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? শরীর নিত্য না অনিত্য"?

"ভদন্ত, শরীর অনিত্য"

"যাহা অনিত্য তাহাতে দুঃখ হয় না সুখ হয়?"

"ভদন্ত, তাহাতে দুঃখ হয়"

"যাহা অনিত্য, দুঃখময়, বিনাশশীল, তাহার সম্বন্ধে কি 'ইহা আমার,' 'ইহা আমি,' 'ইহা আত্মা' এরূপ বলা যায়?"

"ভদন্ত এরূপ বলা যায় না"

"হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান কিছুরই সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর এগুলি সম্বন্ধে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়; নির্ব্বেদ হইতে বৈরাগ্য হয়; বৈরাগ্য হইতে মুক্তি হয়। মুক্তি হইলে 'আমি মুক্ত হইয়াছি' এরূপ জ্ঞান হয় ও বোধ জন্মে যে আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না, ধর্ম্ম পালিত হইয়াছে (বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং), কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, আর সংসারে আসিতে হইবে না।"

এইখানে আমরা বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম্মের একটু পরিচয় অতি সংক্ষেপে দিব। বৌদ্ধদর্শন পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার সঙ্গে বুদ্ধের নিজের প্রচারিত বাণীর অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছিল এবং উত্তর কালের ধর্ম্মে ও দর্শনে এমন অনেক বিষয়ও স্থান লাভ করিয়াছিল যাহা হয়তো বুদ্ধ অস্বীকার করিতেন বা উহার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। এ গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, "অভিধর্ম্মে"র গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলে আমরা বুদ্ধের বাণীর মূল বৃক্ষটি হারাইয়া ফেলিব। "অভিধর্ম্মে"র সমৃদ্ধিবৈচিত্র্য যে মূলসূত্রগুলি হইতে জাত হইয়াছিল এবং যাহার আরম্ভ খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধের নিজের শিক্ষাতেও ছিল এরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় মাত্র বুদ্ধের জীবন ও বাণী বুঝিবার সুবিধার জন্য এখানে উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)

সন্নিবিষ্ট চিত্র দুইটি শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

লাউডগা

—৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অকস্মাৎ একটি কুকার্য্য করিয়া বসিলেন।

প্রতিবেশী বদন ঘোষের পোষা পাঠা কেলোকে ঢেঁকির মুগুর দিয়া এমনই প্রহার করিলেন যে বেচারীকে আর ঘোষের বাড়ী ফিরিতে হইল না, ঠাকুরাণীর খিড়কির পুকুর ঘাটেই সে 'ভ্যা' করিয়া জন্মের মত চক্ষু মুদিল। পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

* * *

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী দাওয়ায় আসন পাতিয়া তাঁহার জপের মালা লইয়া বসিয়াছিলেন এই সময় স্বয়ং বদন ঘোষ পাড়ার আর দুইজন মাতব্বর সহ ঠাকুরাণীর বাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরাণীর এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, —"মেরেছি! বেশ করেছি! ধান খায় কলাই খায় কিছু বলিনে তাতে, কিন্তু আমার ওই লাউগাছটা—এসে রোজ তার কচি পাতাগুলো মুড়িয়ে খাবে, আঃ মরণ!"

বদন ঘোষ পঞ্চায়েতে ঠাকুরাণীর নামে নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া সঙ্গিদ্বয় সহ প্রস্থান করিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী জপের মালা রাখিয়া তাঁহার লাউ-মাচার তলে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট ভাবে লাউগাছটির অবস্থা পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর গোবর-মাটি লইয়া কেলোর চর্ব্বিত স্থানটিতে প্রলেপ দিয়া স্বর্গীয় ছাগশিশুর উদ্দেশে দ্বিতীয় বার অভিসম্পাত বাণী উচ্চারণ করিলেন।

২

ঠাকুরাণী সত্য কথাই কহিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরের আঙ্গিনায় পল্লীর যাবতীয় চতুষ্পদ প্রাণীর অবাধ গতিবিধি ছিল। তাহারা সুবিধা পাইলেই ঠাকুরাণীর ধান চাল মায় বৈকালিক আহারের ফলমূল পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া যাইত, তাহাতে ঠাকুরাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে কেহ কোন দিন দেখে নাই কিন্তু ওই লাউগাছটি! লাউ-মাচার নীচে গোবৎস অথবা ছাগবৎস আসিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। ঠাকুরাণী সবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইতেন—তাহারা পলাইয়া যদি বা বাঁচিত কিন্তু তাহাদের মালিকরা এই মারাত্মক অপরাধের জন্য বুড়ী ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর বাক্যযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সে দিন চক্রবর্ত্তী বাড়ীর পাথ্‌রা বাছুর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর লাউ গাছের দুটি কচিপাতা চর্ব্বণ করিয়াছিল, ঠাকুরাণী তাহাকে তাড়া করিয়া চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন এবং অপরাধীকে না পাইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে আধ ঘণ্টা ধরিয়া তিরস্কার করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ীতে ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার সেদিন আর মাধ্যাহ্নিক আহার হইল না।

লাউগাছটির উপর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর এই উৎকট মমতার একটি হেতু ছিল।

বৎসর দুই পূর্ব্বেকার কথা। একদিন ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর 'শিবরাত্রির সলিতা' দৌহিত্র শ্রীমান নিতাই জেলেপাড়ায় তাহার প্রাতঃকালীন ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দত্তদের ছোট বাড়ীতে দেখিল, যে, তাহার বন্ধু শ্রীচরণ তেল লঙ্কা লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্ট সহযোগে একথালা মাড়ভাত উঠানে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। সহসা লাউ-ডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্টের প্রতি নিতাইয়ের দারুণ লোভ জন্মিল। সে দাঁড়াইয়া শ্রীচরণের আহার দেখিতেছে এমন সময় মুখ তুলিয়া শ্রীচরণ নিতাইকে দেখিল। পরক্ষণেই একগ্রাস ভাত শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া শ্রীচরণ কহিল—"তুই চোখ দিচ্ছিস্ নিতাই!"

নিতাই আহত হইল। তার পর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"আমার দিদিমা লাউঘণ্ট রাঁধে না বুঝি?" বলিয়াই নিতাই চলিয়া গেল।

বাড়ীতে গিয়াই নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে কহিল—"আমাকে লাউডগা সিদ্ধ আর লাউঘণ্ট দিয়ে মাড়ভাত রেঁধে দে শীগ্‌গির দিদিমা!"

তখন বেলা এক প্রহর। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অলাবুর সন্ধানে বাহির হইলেন এবং দশ বাড়ী ঘুরিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিলেন। নিতাই ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াই কহিল—"খিদে পেয়েছে ভাত দে শীগ্‌গির!" ভাতের থালার সম্মুখে বসিয়া নিতাই দেখিল লাউডগা সিদ্ধ ও লাউ-

ঘণ্ট নাই। তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—"এখনও লাউ হয়নি যে দাদু! আমি পাড়াময় খুঁজে এসেছি।" নিতাই কহিল—"তবে ছিচরণ খাচ্ছিল কি ক'রে?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী সে সন্ধান জানিতেন, কহিলেন—"মহকুমার হাট থেকে কাল দত্ত বাড়ীর বাবু আদালত ফেরতা কিনে এনেছে।" "তবে তুইও সেখান থেকে কিনে আন্!" বলিয়া নিতাই হাত ধুইতে বসিল। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া নিতাইকে গুড় অম্বল মাখিয়া সে বেলার মত ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভাত খাওয়াইলেন এবং সন্ধ্যাকালে গণেশ মাঝির হাতে একশ' পৈতা দিয়া পর দিনের মহকুমার হাট হইতে লাউ কিনিয়া আনিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। গণেশ চার পয়সা পুরস্কারের লোভে মহকুমায় যাত্রা করিল।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে একশ' পৈতা বেচিয়া গণেশ একটি বৃহদাকার অলাবু লইয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে খাইতে বসিয়া নিতাই কহিল—"এই যে লাউঘণ্ট! লাউডগা সিদ্ধ কৈ দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কহিলেন—"এখনও তো গাছ বড় হয়নি দাদু—এ পুরাণো গাছের লাউ। আসছে বছর বাড়ীতে গাছ ক'রে লাউডগা সিদ্ধ আর ঘণ্ট রেঁধে খাওয়াব, বুঝ্লি?"

নিতাই খুসী হইয়া আহার সমাপ্ত করিল।

৩

পর বৎসর নিজের হাতে বাঁশের বাখারি করিয়া বেড়া দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তিন রকম লাউয়ের বিচি পুঁতিলেন। চারা হইল। গাছ তিনটি যখন দাঁড়া আশ্রয় করিয়া মাচার দিকে উঠিয়াছে সেই সময় হঠাৎ একদিন নিতাইয়ের পিতামহের মাসতুত ভাই পাশের গ্রামে জমিদারী পরিদর্শনের অবকাশে আত্মীয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিলেন। নিতাই তখন পাড়ার সকল বাড়ী হইতে লক্ষ্মীপূজার ভুজা সংগ্রহ করিয়া আঙ্গিনার আমতলায় পা' ছড়াইয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে চর্ব্বণ করিতেছিল। মাসতুত ভ্রাতার কুলপ্রদীপকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আগন্তুক রোহিণীবাবু ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীমান্ নিতাইচরণের তখনও পুরাপুরি অক্ষর পরিচয় হয় নাই। দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া রোহিণীবাবু তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে নিতাইকে রাখিয়া পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অকস্মাৎ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন কিন্তু নিতাইয়ের হাকিম হইবার কল্পনায় আর রোহিণীবাবুর প্রস্তাবে বাধা দিলেন না।

কাজেই নিতাই কলিকাতায় গেল। গত বৎসর যখন লাউমাচা সবুজ লতায় আর সাদা ফুলে ভরিয়া গেল তখন ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একবার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখো গাছের কপালে খ্যাংরা মারি—মরেও না ছাই!" কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত সহিয়াও গাছ মরিল না, ফলও হইল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তখন একদিন আমূল গাছ তিনটিকে ছেদন করিয়া লাউ আর লাউডগাগুলি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলাইয়া কাঁথা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

গত বৎসর পড়াশুনায় ক্ষতি হইবে বলিয়া রোহিণীবাবু নিতাইকে বাড়ী পাঠান নাই—এবার পৌষে বড়দিনের ছুটিতে নিতাই বাড়ী আসিবে এই কথা ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে জানাইয়াছেন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কলুবাড়ী হইতে ভাল লাউয়ের বিচি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং নিজহাতে বিচি পুঁতিয়া বেড়া দিয়া পূর্ব্ব বৎসরের মত এক গণ্ডা হাঁড়িতে কালীচূণ মাখাইয়া লাউগাছের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে ঠাকুরাণী সন্ধ্যায় পল্লীভ্রমণে বাহির হইতেন কিন্তু লাউচারা দাঁড়া বাহিয়া উঠিবার পর হইতেই সে অভ্যাস ত্যাগ করিয়া মাচার নীচে মাদুর বিছাইয়া সন্ধ্যাকালটি পৈতা কাটিবার কাজে সেইখানেই ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রকম একটি দিনে বদন ঘোষের পাঁঠা কেলো এই লাউ গাছে দন্তবেধ করিবার অপরাধে ঠাকুরাণীর লগুড়াহত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।

বদন ঘোষকে তিরস্কার করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বিদায় করিয়া দিলেন বটে কিন্তু সমস্ত দিন পাঁঠাটির আর্ত্তনাদ তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল। শেষে সন্ধ্যাকালে ছিদাম মুদীর দোকানে দুইটি কলসী বাঁধা দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী গুটিতিনেক টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং বদনের ছেলের হাতে টাকা তিনটি গুঁজিয়া দিয়া জীবহিংসাজনিত অনুতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কেলোর ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে লাউগাছ কয়টি

অব্যাহতি লাভ করিল ভাবিয়া একটু আনন্দ না হইল তাহাও নহে।

শেষে গত বৎসরের মত এবারও লাউমাচা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিল—তাহার পর ফল। নিতাই বাড়ী আসিলে যে লাউটি ষষ্ঠী ঠাকুরাণী আগে কাটিবেন তাহাতে একটি চুণের ফোঁটা দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

* * *
* *

দেড় বৎসর পর নিতাই বাড়ী আসিয়াছে।

খাইতে বসিয়া নিতাই তাহার থালার পার্শ্বে স্তূপীকৃত সিদ্ধ লাউডগার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এগুলো কি রেঁধেছ দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী পরম উৎসাহের সঙ্গে হাসিয়া কহিলেন—"তোর লাউডগা সেদ্ধরে দাদু! বাড়ীর গাছের—"

নিতাই বাধা দিয়া কহিল—"তুলে নে, ওসব জঙ্গল আমরা কলকাতায় খাইনে। দু'বেলা আলু পটোলের ডাল্‌না—মুড়িঘণ্ট—"

অকস্মাৎ ষষ্ঠী ঠাকুরাণী উঠিয়া গেলেন দেখিয়া আর নিতাই আহারের পুরা ফর্দ্দটি তাহার দিদিমাকে শুনাইতে পারিল না।

আহারান্তে হাত ধুইতে বসিয়া নিতাই দেখিল ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভোঁতা বঁটিখানা দিয়া লাউমাচার নীচে দাঁড়াইয়া গাছের গোড়ায় ক্রমাগত আঘাত করিতেছেন। পকেট হইতে জাপানী সিল্কের রুমাল খানা বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া কহিল—"ও কি কর্চ্ছিস দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মুখ না ফিরাইয়াই কহিলেন—"জঞ্জাল রে জঞ্জাল! বাড়াটা একেবারে এঁদো ক'রে দিয়েছে।"

"তাই ভর দুপুর বেলা বাড়ী সাফ্ কর্চ্ছিস্!" বলিয়া নিতাই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ফিরিয়াও চাহিলেন না। *

আলোচনা

বাঙ্গলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

"বঙ্গশ্রী" কাগজখানির গত মাঘ মাসের সংখ্যা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আদর্শ অনুকরণীয়। অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা থাকিলেও সম্প্রতি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া যে বিষয়টি সম্বন্ধে আমি বহুদিন হইতে তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছি, তাহাই উপলক্ষ করিয়া দুই চারিটি কথার অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গলার রঙ্গালয় দেশের যে যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আজ সেই রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিখিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। সেই ইতিহাস যাহাতে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হয় তাহাতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গালয় সম্পর্কে নানা কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে অনেক তথ্য অবগত হইয়াছি, তজ্জন্য তিনি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু রঙ্গালয় সম্বন্ধে মাঘের "বঙ্গশ্রী"তে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা তল্লিখিত বিষয়ে পরিপূর্ণ নহে। তাই পাঠকের অবগতির জন্য - ব্রজেন্দ্রবাবুকে প্রতিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে নহে, তাঁহার প্রবন্ধের সহিত আরও আবশ্যকীয় প্রকৃত তথ্য সংযোজিত করিতে ইচ্ছা করি এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

(১)

১৪ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন:—"অমৃত বাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়া গিয়াছেন—নীলদর্পণের অভিনয়ের পর "ইংলিসম্যান" পত্রিকায় একটি বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল; লোকে বলিল উহা গিরিশবাবুরই লেখা। আমি এখনও "ইংলিসম্যানের" সমালোচনা দেখি নাই; কিন্তু অমৃতলাল উহার যে কয়েকটি স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি এইরূপ "up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings, ইত্যাদি......"

এই সামান্য কয়েকটি ছত্রে অনেকগুলি ভুল আছে, যথা—

(১) ইংলিশম্যান কাগজে ঐরূপ সমালোচনা বাহির হয় নাই।

(২) যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা ইণ্ডিয়ান মিররে।

(৩) যেটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ঠিক রকম হয় নাই।

(৪) অমৃতবাবুর সৈরিন্ধ্রি সম্বন্ধে একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে, তাহা অমৃতবাবুও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবুও বলেন নাই।

(৫) আরও অনেক কথা আছে, উদ্ধৃত হয় নাই।

আমরা পাঠকের অবগতির জন্য সম্পূর্ণ কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"Up goes the drop-scene and next outcomes the rickety stage with its repulsive hangings. I was

* লেখকের শেষ সম্পূর্ণ রচনা—বঃ সঃ

also touched at the tragic death of the author. Golok Bose's limping exit was simply ridiculous. The much-injured ryots vied with each other in comic preference. Sairindhri (Amrita Babu himself) belonged to some extinct race of mortals whose weeping tone some antiquary might recognise and it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved and head-beating tune..."

Indian Mirror 27th Dec. 1872.

এই সমালোচনা "Father"এর নামে বাহির হয়। কে জানে ইনি বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের Father বা জনক কিনা?

(২)

১৯ ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান মিররে "National Theatricals" নামে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু সেটি উল্লেখ করেন নাই। এখানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

"Golok and his wife were represented by the same author but though an adept was not so succesful in the wife as in the husband a comparatively very very inferior part. Sairindhri the heroine was not up to mark, her weeping tone was unnatural."

কেহ কেহ বলেন উহা গিরিশ বাবুর লেখা। হওয়াই সম্ভব। তবে অমৃতবাবুর স্মৃতিকথা ভিন্ন অপর কোনও প্রমাণ নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সংবাদপত্রাদি হইতে নজীর দিতে না পারিয়া অবশেষে কিরণবাবুর শোনা কথাকেই নজীর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিরণ বাবুর অনুমান সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যে প্রমাণে তাহা মনে হয় ব্রজেন্দ্রবাবু আদৌ তাহা উল্লেখ করেন নাই। সেই প্রমাণটি আমরা এখানে উল্লেখ করিব।

মতভেদ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র বৈতনিক ন্যাসন্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন না। তিনি তখন শর্ম্মিষ্ঠা উষা অনিরুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় সখের যাত্রার দল বসাইয়া নাট্যকলার চর্চ্চা জাগরুক রাখিলেন এবং সম্প্রদায়ের জন্য স্বয়ংই একটি farce বা সঙের পালা রচনা করিলেন। রাধামাধব কর মহাশয় প্রহসনের একটি ভূমিকা লইয়া সুকণ্ঠে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতেন। গানটি দ্ব্যর্থজ্ঞাপক। ত্রিবেণীক্ষেত্রস্থ ত্রিধারা ভাগীরথীর এবং নীলদর্পণ-সম্প্রদায়ের প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অভিনেতৃবর্গের বর্ণনা এই গানটিতে বেশ সুকৌশলে সংযোজিত রহিয়াছে। গীতটি "নাট্যশালা ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" বলিয়া আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

লুপ্তবেণী বইছে তেরো ধার
তাতে পূর্ণ, অর্দ্ধইন্দু, কিরণ, সিঁদুরমাখা মতির হার
নগ হতে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায়
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;
শিব, শম্ভুসুত, মহেন্দ্রাদি, যদুপতি অবতার
জলকেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্ম্ম, ক্ষেত্রস্থান
অবিনাশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান।
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার
কিবা বালুময় বেলা, পালে পাল রেতের বেলা
ভুবন মোহন চরে, করে গোপালে খেলা
মিছে করে আশা কত চাষা নীলের গোড়ায়
দিচ্ছে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে
জ্ঞানহয় বা দীনের গৌরব এতদিনে খসে,
স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার॥

(১) লুপ্তবেণী—বেণীমাধব মিত্র। প্রেসিডেণ্ট। রিহার্সেলের সময় একটি রোগীর গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষে ইঁহার সহিত দলের পরিচয় হয়। গিরিশ বাবু চলিয়া যাইবার পর ইঁহাকেই দলের নেতা করা হয়। লুপ্ত—নাম অপ্রকাশিত। অন্য অর্থ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—সঙ্গ। পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র মিত্র। অর্দ্ধইন্দু—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—master. কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঁদুরমাখা মতি—মতিলাল সুর। নগ—নগেন্দ্র-বন্দোপাধ্যায়। শিব—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শম্ভুসুত—কার্ত্তিকচন্দ্র পাল। (উৎসাহদাতা ও ড্রেসার)। মহেন্দ্র—মহেন্দ্রলাল বসু। যদুপতি—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য। বিষ্ণু—ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন। ধর্ম্ম—ধর্ম্মদাস সুর। ক্ষেত্র—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর। দীনবন্ধু—নাট্যকার। বেলা—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। পালেপাল—রাজেন্দ্র পাল প্রভৃতি কয়েকজন। ভুবনমোহন চরে—wanders, বেড়ায়, ভুবনমোহন বাবুর কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। অপর পক্ষে ভুবনমোহন চরে অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ ভুবনমোহন বসুর বৈঠকখানায়। গোপালে—গোপালচন্দ্র দাস। যত চাষা—সদ্গোপ জাতীয় অনেকেই এ দলে ছিলেন যেমন মতি সুর, ধর্ম্মদাস সুর। নীলের গোড়ায়—নীলদর্পণ নাটকখানির অভিনয়রূপ কৃষিক্ষেত্রে সার দিতেছে।

দিচ্ছে সার—সার বিষ্ঠা। এখানে কার্য্যনিপুণতার অভাব। শশী—শশীভূষণ দাস। অমৃত—অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য। দীনের গৌরব—দীনবন্ধুবাবুর পূর্ব্বযশঃ বুঝি বা লোপ পায়। স্থানমাহাত্ম্য আট আনা দিলেই সকলের সমানাধিকার।

(৩)

ব্রজেন্দ্রবাবু ঐ গানটির কথা উল্লেখ করেন নাই। আর গিরিশচন্দ্রের উক্তি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেও গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে মূল উক্তিটি সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক রহিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন:—

"যে সময় নীলদর্পণে অমৃতবাবু প্রভৃতি যোগ দেন সে সময় আমি না থাকিবার কারণ কোন বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান "লুপ্তবেণী বইছে তেরো ধার—" তাহার প্রমাণ। গানের শ্লেষ এই—"স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার"। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম ও বাক্য শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসন্যাল থিয়েটারে দেখিলে কিনা বলিবে—এই আমার

আপত্তি।...কিন্তু সে সময় টিকেট বেচিয়া টিকেটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই এক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না।..."

বাস্তবিক শত্রুতা যে ছিল না আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের উক্তি হইতেও পাই। অর্দ্ধেন্দু বলেন—"এই গানটাতে আমাদের সকলের নাম এমন সুনিপুণ ভাবে সংযোজিত যে গিরিশ বাবুর অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"

বিশ্বকোষও বলেন—"গিরিশবাবুর এই গান শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা ঘটে নাই।"

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলেন—"গিরিশবাবুর এই গানটী আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে গাহিলাম। তাহার ফলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইল ; তিনি বোধ হয় আমাদের উপর কতকটা প্রসন্ন হইলেন।"

পুরাণপ্রসঙ্গ ১০৮।

(৪)

যে কারণে প্রকৃত মত-ভেদ তাহার কারণ গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল উভয়েই প্রদান করিয়াছেন। অমৃতলাল বলেন—"থিয়েটারে আমাদের অভিভাবক স্বামীগণ সকলকে সন্তোষজনক রূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।" পুরাণ প্রসঙ্গ। ১২১।

গিরিশচন্দ্র বলেন—"দলের পরিচালক যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের অর্থ-পিপাসায় ন্যাসন্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।" অর্দ্ধেন্দু জীবনী।

(৫)

ব্রজেন্দ্রবাবু সত্যই লিখিয়াছেন যে নীলদর্পণ অভিনয় লইয়া "ইংলিসম্যান" কাগজের একটু গাত্রদাহ হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম ব্রজেন্দ্রবাবু এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবেন। তিনি নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন ইংলিসম্যান দেখেন নাই আমরা সেইটি উল্লেখ করিতেছি—

"Rev. Mr J. Long was sentenced to one month's simple imprisonment for having translated Nildarpan. It seems strange that Government would allow its representation in Calcutta without its libellous parts being removed..." *Englishman* Dec. 20, 1872.

ইহার উত্তরে সেক্রেটারী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন :—

"On the 21st Dec. Nildarpan was again staged. Its object is to represent village life and libellous parts have been omitted." *Englishman* Dec 23, 1872.

(৬)

অতঃপরে ব্রজেন্দ্রবাবু "মধ্যস্থ" হইতে একটি দীর্ঘ সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই সমালোচনাটি ১৩০১ সালের শ্রাবণ মাসে "পুরোহিত" কাগজে (১৯৬ পৃঃ) বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক বাহির হয়। অতএব এটি মৌলিক নয়। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রদত্ত অমৃতবাজারের সমালোচনাটি মৌলিক। কিন্তু এই সম্বন্ধে "দি ন্যাসন্যাল পেপার" প্রদত্ত সমালোচনাটি সংযোজিত হইলে ভাল হয়। আমরা নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The event is of national importance and we feel it an honour to record it in our columns.......

All the arts of the drama were satisfactorily performed. But preference is to be given to one or two or more other actors···Then certainly we see that the second act especially the first scene and the fifth act and also its first scene were far better played than the rest.

The actors also acquitted themselves admirably well. It would be invidious to draw any distinction between them. But still superior merit must have its superior reward. And we trust we echo the public voice if we give the palm of superiority to the following actors over the rest amongst the male—1st Torab, 2nd Golok Bose, 3rd Nabin Madhab, 4th Dewan, 5th the Ryots 6th the little boys and among the females Golok Bose's wife, Shairindhri, Khetromoni and Padi Moyrani. The actings of the females were most sympathetic."

অবশ্য সকলের পূর্ব্বে এই ন্যাসনেল কাগজেই এরূপ সুন্দর সমালোচনা বাহির হয়। ইহার পরে অমৃতবাজারে হয়। ন্যাসনেল আরও বলেন—"শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র অশ্রুবর্ষণ হয়। সকলেই অভিনেতাদের অভিনয় চাতুর্য্যে চমৎকৃত হন।" ন্যাসনেল ১১ ডিসেম্বর ১৮৭২।

অভিনয় সম্বন্ধে "মীরার" কাগজে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে আরও উল্লেখযোগ্য। ইনি বলেন :—

"Throughout the whole the acting was most excellent. We do not know what to admire best—whether Sadhoo Charan's ease of acting, Sairindhri's maidenly modulation of voice or the gentle motions and accents of the graceful Sarala. Torab acted his part very well, though in some instances Torab out-heroded the Herod"— *Indian Mirror* 26th Dec. 1872.

(৭)

নীলদর্পণই পাব্‌লিক ন্যাসন্যাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়। অভিনেতৃগণ সাধারণকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিস্তৃত ইতিহাসই দেওয়া প্রয়োজনীয়। এই জন্য আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল ও ধর্ম্মদাস সুরের মন্তব্য প্রদান করা সমীচীন মনে করি। অর্দ্ধেন্দুশেখর বলেন—"যাই হোক্ শেষে অভিনয় আরম্ভ হ'ল। সুশৃঙ্খলে শেষও হ'ল। দর্শকে কেঁদে কেটে সারা হ'য়ে গেল। সহস্র মুখে প্রশংসা বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। আমরা আনন্দে প্রত্যেকে যেন ডবল ফুলে উঠ্‌লাম। সে রাত্রিতে ৭০০৲ বিক্রী হয়।"

রঙ্গভূমি—১৩০১, মাঘ।

ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ও বলেন—"সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে অতি সুন্দর অভিনয় হইল। এমন কি সকলেই একবাক্যে বলিল যে এরূপ অভিনয়

কখনও হয় নাই আর কাহারাও যে করিতে পারিবে তাহা আশা করি না। সুখ্যাতির সহিত আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে অভিনয় করিতে লাগিলাম।"

নাট্যমন্দির ১৩১৭, ভাদ্র ১০১।

অমৃতবাবু বলেন:—"অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলক বসু ও উড্ সাহেব রূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন।......কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণে সৈরিন্ধ্রি হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আজ আমি একটু অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনের নীলদর্পণকে নিজের মতন করিয়া ষ্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষ ভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্য-সাধারণ গুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদী ময়রাণীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির রেবতীর সরলার সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রির বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ সুস্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে অমৃত বাজার সৈরিন্ধ্রির সমালোচনা করিয়া লিখিলেন, তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। রাত্রি বারোটার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না।" —পুরাণ প্রসঙ্গ—অমৃত স্মৃতিকথা।

অমৃত বাবু অন্যত্রও বলিয়াছেন, "মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিবে না।"

(৮)

অভিনেত্রীকুলসম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী তাৎকালীন অভিনেতাগণ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন:—

"উড্ সাহেব অর্দ্ধেন্দু বাবু, তোরাপ মতিলাল সুর আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশবাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন তার উপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাটকাট মারমার—গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের—তাই নীলকুঠীর সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারী সুন্দর মানাত। দেখলেই মনে হ'ত, হাঁ সত্যিকারের রোগ সাহেব। আর মানাত উড্ সাহেবের মুস্তাফি সাহেবকে। আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় লাসই চেহারা। তারপর মতিলাল সুরের সে তোরাপ আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর।"

—রূপ ও রঙ্গ—১৩৩১, ১৪ চৈত্র, শনিবার।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধেও তখনকার সাময়িক বিবরণ হইতে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মদাস বাবু লিখিয়াছেন—

যখন আমরা rehearsal দিই, তখন জানিতাম না যে টিকেট বিক্রয়ে অনেক টাকা পাইব। সেই জন্য আমরা মনে করিয়াছিলাম যে টিকেট বিক্রয়ে যাহা কিছু আয় হইবে, থিয়েটারের উন্নতির জন্য সে সমস্তই ব্যয় করিব। আমরা কেহ কিছু লইব না। আশার উপর নির্ভর করিয়া সুবিখ্যাত প্লাম্বার গৌরমোহন ধর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্যাস সংলগ্ন করিয়া লই ও তাঁহাকে বলি যে আমাদের আয় হইতে আপনার প্রাপ্য দিব। এখন যেরূপ প্লাকার্ড হইয়াছে তখন এরূপ কিছু ছিল না। এখনকার পুলিশ নোটীশের মত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া প্রথম অভিনয় খোলা হয়।

(৯)

বিশ্বকোষ বলেন—"ইংলিসম্যানের ছাপাখানা জোন্স কোম্পানী হইতে দস্তুর মত কেবল ইংরাজীতে প্লাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। সহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ সিটের টিকেট লইয়াছিলেন। তখন নাচের মজ্‌লিসে লোক যেমন পোষাক পরিচ্ছদ করিয়া যাইত এই থিয়েটার দেখিতেও সেইরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়াছিলেন। এখনকার মত যথেচ্ছাবেশে তখন কোনও মজলিসে যাওয়া ঘৃণাকর ছিল। সেদিন যে একতান বাদ্য বাজিয়াছিল তাহাতে কালিদাস সান্যাল হারমনিয়ম, নিমাই ওস্তাদজি, গৌরদাস বাবাজি ও বসু পাড়ার সুবিখ্যাত রাজাবাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন এবং শ্যামপুকুরের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঢোল বাজাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত প্লাকার্ড বা পুলিশ নোটিসের মত বিজ্ঞাপন কর্ত্তৃপক্ষগণই সমস্ত স্থানে লাগাইয়া আসিতেন।"

এ সম্বন্ধে অমৃতবাবুর একটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

সেকালে ছিল না বেণী কুলি কি চাকর
যারা ছিল কাজে যেতে পেত তারা ডর
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি ধারে
প্লাকার্ড ম'য়েন্তে উঠে 'ভুনিবাবু' মারে।
এখন হুকুমে কার্য্য হয় সমাধান
বেহারা বাঁধিতে পারে অপেরার গান।—অমৃত-মদিরা।

(১০)

অর্দ্ধেন্দুশেখর সে রাত্রির বাজনা সম্বন্ধেও একটু পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

অভিনয়ের পূর্ব্বে কনসার্ট বেজে উঠ্‌ল। কনসার্টে সে দিন কালিদাস সান্যাল হারমনিয়াম্, নিতাই ওস্তাদজী বেহালা, গৌরদাস বাবাজী বেহালা, বোস পাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত বেহালা বাদক রাজাবাবু বেহালা, আর শ্যামপুকুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাণা যোগে ঢোল বাজিয়েছিলেন, যোগেন্দ্র আমাদের দলস্থ অভিনেতাও বটে—তাহাদের বাজনার ধূম দেখে কে? বাজাতে বাজাতে এক একবার এক একটা উপেন বাজাতে লাগলেন আর অন্য সকলে তাঁকে অনুসরণ ক'রে সুর দিতে লাগলেন। শ্রোতারা মোহিত হ'য়ে গেলেন, কিন্তু অভিনয়ে বড় বিলম্ব হ'তে লাগল। আমরা মধ্যে মধ্যে বলতে লাগলেম আমরা প্রস্তুত আপনারা বন্ধ করুন; তখন তাঁরা মত্ত, কে সে কথা শোনে? সহরের অধিকাংশ গুণগ্রাহী বড় মানুষ এবং সঙ্গীতজ্ঞ লোক একস্থানে জড় হয়েছেন, বাহবা দিচ্ছেন, তাঁরা কি সে আসরে সে মত্ততা সহজে কাটাতে পারেন? যাই হোক শেষে অভিনয় আরম্ভ হ'ল। সুশৃঙ্খলে শেষও হ'ল। —রঙ্গালয় ১৩০১ মাঘ।

(১১)

"মধ্যস্থ" কাগজে আরও অনেক কথা বাহির হয়, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। নাট্যকলার ইতিহাসে সে কথা গুলি বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া আমি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে উদ্দেশ্যে জাতীয় নাট্য সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিতান্তই প্রতিষ্ঠার যোগ্য। যেরূপ জঘন্য রীতিতে স্বভাবের গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া যাত্রাওয়ালারা অভিনয় প্রদর্শন করিত—আ! এখনও করে! তাহা কোন কোন কারণে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। যাত্রাওয়ালাদের কোন গুণ যে ছিল না এবং সকলই যে দোষপূর্ণ একথা আমরা বলি না। এমন যাত্রা বহু হইয়া গিয়াছে যাহাতে সহস্র সহস্র লোককে এক কালে বিমোহিত করিতে পারিয়াছে। এমন মোহিনী শক্তি যাহার থাকে, তাহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন গুপ্ত গুণ থাকিবে, সন্দেহ নাই।' সে গুণ, শুদ্ধ গান—সুর, তাল, লয় ও গীত প্রণয়নের পারদর্শিতা। তন্মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের সঙ্গতি নাই। কিন্তু সাধারণ মনোমোহন করিবার উপকরণ যথেষ্ট।

...আজ কাল যেখানে যত অভিনয় হইতেছে শুদ্ধ বারুণীপ্রিয় অভিনেতৃ-দল ভিন্ন, আর সকলেই সহৃদয় মণ্ডলীর উৎসাহভাজন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজব্যয়ে সাধারণের আমোদ উৎপাদন, কয়দিন চলে? সেইরূপ নাট্যশালায় প্রবেশ টিকিট লইয়া যে গণ্ডগোল হইত এবং বহু বহু দর্শনার্থী নিরাশ হইয়া যেরূপ কষ্টভোগ করিতেন এই জাতীয় নাট্যালয় মুক্ত হওয়াতে, সেই অভাবের অভাব হওনের সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা টিকিট বিক্রয় দ্বারা বঙ্গীয় দৃশ্যকাব্য রচয়িতাগণকে উৎসাহ-সূচক উপহার প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং যাহাতে আয় দ্বারা নাট্যালয় স্থায়ী হয় তাহারও সঙ্কল্প করিয়াছেন, অতএব অবশ্যই তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করিতে হয়। —মধ্যস্থ ১২৭৯, ৮ পৌষ।

(১২)

অমৃতবাবুও এ বিষয়ে আত্মচরিতে বলিয়াছেন—

"আমরা পেশাদারই ছিলাম না। ভাল থিয়েটার নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্য টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল যে ষ্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে। এইজন্য থিয়েটারের জন্য যখন আমরা প্লাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতিরাত্রের প্লাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত "For the benefit of the Stage." —পুরাণ প্রসঙ্গ ১২০।

সঙ্গে সঙ্গে "For the improvement of Dramatic Literatureও লেখা থাকিত"—টাকাটা সাধারণের সম্পত্তি এবং যাহাতে লাইসেন্স দিতে না হয় তজ্জন্য ইহা করা হইয়াছিল বলিয়া পুরোহিত অনুমান করেন। —পুরোহিত, শ্রাবণ ১৩০১।

(১৩)

যাহা হউক প্রথম রাত্রিতে কত বিক্রয় হয় তাহা লইয়া একটু মতভেদ আছে। অর্দ্ধেন্দু বলেন ৭০০৲। অমৃতবাবু বলেন, "দলে দলে দর্শক আসিতে লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সকলে টিকেট পাইল না।"

মধ্যস্থ বলেন, "শুনিলাম উত্তম হইয়াছিল। ১৲ ও ॥০ করিয়া টিকেট বিক্রীত হইয়া ৪০০৲ উঠিয়াছিল।" —১লা পৌষ ১২৭৯।

১ শোনা কথা বলিয়া বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না। আর মধ্যস্থ ২৲ টাকার টিকেটের কথা উল্লেখ করেন নাই। ন্যাশনেল কিন্তু মধ্যস্থের ন্যায় বলিয়াছেন :—

"The total proceeds of the sale of tickets at the last performance was Rs.400/-."
The National Paper Dec 11, 1872 Wednesday.

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

হেমেন্দ্রবাবুর দীর্ঘ আলোচনাটির সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য আছে কি-না, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক মহাশয় জানিতে চাহিয়াছেন। বক্তব্য বিশেষ কিছু থাকিবার নয়, কারণ আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবুর যে আপত্তি তাহা উক্তি বা তথ্যবিশেষের সত্যাসত্য লইয়া নয়, একেবারে আমার রচনা-রীতি লইয়া। আমার প্রবন্ধটি সমসাময়িক সংবাদপত্র ও দর্শকদের বিবরণের সাহায্যে লিখিত। উহাতে তারিখ বা বর্ণনার ভুল থাকিবার কথা নয়। তবে হেমেন্দ্রবাবু চান, নাট্যশালা সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই আমি আমার প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করি। এ-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন লিখিবার বিষয়মাত্রই অনন্ত-পার, অথচ আয়ু এবং মাসিক-পত্রের প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য খুবই স্বল্প। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ যথাসম্ভব নির্ভুল কাঠামো প্রস্তুত করাই আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একটি অভিনয় সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও স্মৃতিকথায় যত-কিছু মন্তব্য আছে তাহার সবই যে মাসিকের প্রবন্ধে হুবহু উদ্ধৃত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমার প্রবন্ধে কোন কাজের কথা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নয়। এই রীতি অনুসরণ করার ফলে প্রবন্ধটি হয়ত হেমেন্দ্রবাবুর ঠিক মনঃপূত হয় নাই, হয়ত-বা আসলেও একটু নীরস হইয়াছে। কিন্তু যদি আমি অবিকল হেমেন্দ্রবাবুর মতই লিখিতে পারিতাম তাহা হইলে হেমেন্দ্রবাবুর নিজের আর কিছুই লিখিবার থাকিত না। আমি আমার ক্ষমতা-মত লিখিয়াছি, হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার কল্পনা ও লিপিকৌশল দ্বারা নাট্যশালার ইতিহাসকে রসালো করিয়া তুলিবেন ইহাই আমি কামনা করি।

দ্বিতীয়তঃ, হেমেন্দ্রবাবুর আলোচনার সবটুকুই প্রায় স্মৃতিকথা অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু কোন স্মৃতিকথাকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যে সব-সময়ে নিরাপদ নয়, হেমেন্দ্রবাবুর আলোচনার প্রথম দফাটিই তাহার দৃষ্টান্ত। অমৃতলাল বসু লিখিয়াছিলেন :—"নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটি বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয় ;—পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ও পুরাতন বিজ্ঞাপন পত্রের তাড়া।" ('রূপ ও রঙ্গ,' ৮ কার্ত্তিক ১৩৩১)। এ-কথাটি অতি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমি আমার প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। সেজন্য আমার প্রবন্ধগুলির সব জায়গাতেই অকাট্য প্রমাণকে ও স্মৃতিকথা বা কিংবদন্তীকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, হেমেন্দ্রবাবু যে-কয়েকটি নূতন বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও নির্ভুল নহে। দৃষ্টান্ত নীচে দিতেছি।

এই তিনটি কারণে হেমেন্দ্রবাবুর আলোচনার সবটুকুই প্রায় নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তবুও তিনি যে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অতিসংক্ষেপে দিলাম।

(১)

এই বিবরণে যদি কোন ভুল রহিয়া থাকে তবে তাহা অমৃতলালের, আমার নয়। আমি অমৃতলালের উক্তি অমৃতলালের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছি। উহা সত্য কি মিথ্যা তাহাও বলি নাই। তবে 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের প্রতিকূল সমালোচনাটি যে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই,—অমৃতলাল যে ভুলক্রমে 'ইংলিশম্যানে'র নাম করিয়াছেন তাহা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিবার কয়েক দিন পরেই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' আপিসে 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার ফাইল অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারি। এই বিষয় আমি বর্ত্তমান সংখ্যার ২৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

হেমেন্দ্রবাবু ১৮৭২, ২৭এ ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত পত্রখানির সবটুকু উদ্ধৃত করেন নাই; যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও নির্ভুলভাবে নহে; এমন কি অংশ-বিশেষ যে বাদ দিয়াছেন তাহাও চিহ্নিত করেন নাই। নিম্নে হেমেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত অংশটির সঠিক পাঠ দিলাম :—

"Up goes the drop-scene next, and out comes the rickety stage with its repulsive hangings... His [Goluck Bose's] limping exit was simply ridiculous. The much-injured ryots vied with each other for comic preference,... Syrendri, it seemed, belonged to some extinct race of mortals, whose weeping tone some antiquary might recognize ; and it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved and the head-beating time... I was also touched at the tragic death of the author."

হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "এই সমালোচনা 'Father'এর নামে বাহির হয়।" এখানেও তিনি ভুল করিয়াছেন; সমালোচনাটি "A Spectator"-এর নামে বাহির হয়।

(২) (৩)

'ইণ্ডিয়ান মিরার' হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত না করিলেও চলিত; কারণ এই ধরণের কথা আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সমালোচনায় আছে (মাঘ, পৃ. ১৩, ২য় পাটি)।

(হেমেন্দ্রবাবুর আলোচনার ৬ নং দফা সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি প্রযোজ্য)

এই দফায় হেমেন্দ্রবাবু ১৮৭২, ১৯এ ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' হইতে যে-কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ভুল আছে। নিম্নে সঠিক পাঠ দেওয়া হইল :—

"Native Theatricals......Goluck Bose and his wife were represented, we hear, by one and the same man, but he, though an adept, was not so successful in the wife as in the husband, a comparatively very inferior part. Syrindry, the heroine, was not up to mark ; her weeping tone was unnatural."

আমি কিরণবাবুর "শোনা কথাকেই নজীর বলিয়া গ্রহণ" করি নাই, অথবা তাহা দ্বারা নূতন কিছু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি নাই। অমৃতলালের একটি উক্তি সম্বন্ধে কিরণবাবু ও 'বিশ্বকোষ' যে ভিন্ন মত পোষণ করেন পাদটীকায় তাহার উল্লেখ মাত্র আছে।

(৩)

'নুপুরেণ' গানটির কথা আমি "উল্লেখ" করি নাই, এ-কথাটি ঠিক নহে। আমার প্রবন্ধের ২০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। তবে "উদ্ধৃত" করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই; কারণ গানটি বহুস্থলে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহাতে কোন নূতন কথাও নাই।

মতের অনৈক্যবশতঃ গিরিশচন্দ্র যে দল ছাড়িয়া যান তাহার উল্লেখ আমার প্রবন্ধের একাধিক স্থলে আছে (মাঘ, পৃ. ১১-১২ দ্রষ্টব্য); এমন কি এ-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছি।

(৪)

আমার প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে (ফাল্গুন, পৃ. ২৫০-৫১) সব কথারই উল্লেখ আছে। হেমেন্দ্রবাবু বোধ হয় আলোচনা লিখিবার পূর্ব্বে এই কিস্তিটি পড়েন নাই।

(৫)

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার উক্তির সারমর্ম্ম আমার প্রবন্ধে ও পাদটীকায় দেওয়া আছে (মাঘ, পৃ. ১৫ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর একটি গুরুতর ভ্রমের উল্লেখ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—"আমরা আশা করিয়াছিলাম ব্রজেন্দ্রবাবু ['ইংলিশম্যানে'র] এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিবেন। তিনি নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন ইংলিশম্যান দেখেন নাই, আমরা সেইটা উল্লেখ করিতেছি—"

কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত অংশগুলি পড়িয়া মনে হইতেছে, তিনি নিজেও এখন পর্য্যন্ত 'ইংলিশম্যানে'র এই পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখেন নাই। 'নীলদর্পণ' অভিনয় সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যানে'র উক্তির যথাযথ প্রতিলিপি দিলাম :—

"A Native paper tells us that the play of *Nil Darpan* is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised."

(*The Englishman*, Friday, Dec. 20, 1872.)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির যে সামান্য অংশটুকু হেমেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও ১৮৭২ সনের ২৩এ ডিসেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত অংশের অবিকল প্রতিলিপি নহে। ইহার প্রথম পংক্তিটি হেমেন্দ্রবাবু কোথায় পাইলেন?—ইহা ত 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত নগেন্দ্রবাবুর চিঠিতে নাই। আমরা সমগ্র চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম :—

THE NATIONAL THEATRE.

To The Editor of the *Englishman.*

Sir,—With reference to your remark in the *Englishman* of the 20th instant on the *Nil Darpan*, which is to be acted at the National Theatre this evening, allow me the liberty to say a word or two with a view to remove the erroneous impression which may be produced in the mind of the European community in consequence of the acting of the play. The object of the promoters of the National Theatre in acting the play of *Nil Darpan* is simply to represent village life, as beautifully depicted in it. The libellous portions contained in the work in question have been omitted

I have, moreover, to state on behalf of the Theatrical Society that, in acting the play of *Nil Darpan* and other plays, they have simply in mind the entertainment of the public by the performance of Bengali dramas. It is far from their object to traduce the character of Europeans, whose sympathy with, and encouragement to, the undertaking, they would hail with the greatest pleasure. I am glad to say that many European gentlemen have already expressed their appreciation of the movement by being present on the occasion of the last performance at the National Theatre.

NOGENDRO NAUTH BANERJEE,
Secretary.

(৭)

হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন :—"পাবলিক ন্যাসনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়।" এই "পাবলিক" কথাটি হইতে বুঝিতে হইবে, "সখের" ন্যাশনাল থিয়েটারও ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবেও হেমেন্দ্রবাবু এই মতই পোষণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিকথা অবলম্বনে তিনি বলেন, ১৮৭১ সনে বাগবাজারের দল যখন কলিকাতায় 'লীলাবতী'র সখের অভিনয় করেন তখনও সম্প্রদায়ের নাম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছিল ('পঞ্চপুষ্প,' মাঘ)। এ-বিষয়ে অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতিকথা অভ্রান্ত নয়। সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে বহু প্রমাণ-প্রয়োগে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে বাগবাজারের দল কর্ত্তৃক কলিকাতায় 'লীলাবতী'র অভিনয় হয় ১৮৭২ সনে ১৮৭১ সনে নহে এবং তখন সম্প্রদায়ের নাম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছিল না ('পঞ্চপুষ্প,' মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের ২৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমার মতের সমর্থক আরও একটি প্রমাণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। হেমেন্দ্রবাবু আমার পূর্ব্বে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ফাইল দেখিয়াছেন, অথচ 'ইংলিশম্যানে'র এই বিবরণটি তাঁহার নজরে পড়ে নাই ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়।

হেমেন্দ্রবাবু নীলদর্পণ অভিনয়ের বর্ণনা অভিনেতাদের স্মৃতিকথা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার প্রবন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত দর্শকদের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই আছে।

হেমেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই আমার প্রবন্ধগুলি ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই। অমৃতলালের স্মৃতিকথা হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"অমৃতবাজার পত্রিকা সরিক্ষ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন 'তাঁহার রোদন স্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।'—আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সমালোচনায় ঠিক এই কথাগুলি আছে (মাঘ, পৃ. ১৩, ২য় পাট দ্রষ্টব্য)।

পুনরায়, তিনি লিখিয়াছেন :—"অমৃতবাবু অন্যত্রও বলিয়াছেন 'মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিবেন না।' " অমৃতলালের ঠিক এই কথাগুলি কি আমার প্রবন্ধের ১২ পৃষ্ঠা, ২য় পাটিতে নাই?

(৮)

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম রজনীতে (১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর) 'নীলদর্পণ' অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনীর আত্মকথার এমন বিশেষ কি মূল্য আছে বুঝিতে পারিলাম না। কারণ এই অভিনয়ের দুই বৎসর পরে—১৮৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বিনোদিনীর অভিনেত্রী-জীবনের আরম্ভ; তখন ন্যাশনাল থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল না এবং তিনি কখনও ন্যাশনাল থিয়েটার দেখেন নাই। বিনোদিনী যে-'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিবরণ দিয়াছেন তাহা ১৮৭৫ সনের মে মাসে গ্রেট ন্যাশনাল কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌয়ে অভিনীত হয়। তাহার সহিত ১৮৭২ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ের সম্বন্ধ কি? সমসাময়িক সংবাদপত্রের বিবরণ কি অপরাধ করিল?

(৯) (১০)

'বিশ্বকোষ' এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিকথা হইতে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীতে কালিদাস সান্যাল প্রভৃতির কনসার্ট বাজাইবার কথা হেমেন্দ্রবাবু উল্লেখ করিয়াছেন। এই তথ্য সত্য হইলে আমার ভুল গুরুতর। কিন্তু কেন আমি এই বিবরণের উপর নির্ভর করি নাই তাহারও কারণ আছে। প্রথম রজনীর অভিনয় দেখিয়া একজন দর্শক 'হালিশহর পত্রিকা'য় লিখিয়াছেন :—"জাতীয় নাট্যশালায় বিজাতীয় কোন বস্তু দেখিলেই মনে দুঃখ ব্যতিরেকে আর কি উপস্থিত হইতে পারে? তৎপরে যখন দেখিলাম যে কতকগুলি ফৈরাঙ্গ আসিয়া একতান বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমাদের দুঃখ দ্বিগুণিত হইল।"

'কশ্চিৎ দর্শক' ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় দেখিয়া ১৮৭২, ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' যে পত্র প্রকাশ করেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠেও জানা যাইবে যে ঐ রাত্রে বাঙালীরা কনসার্ট বাজান নাই :—

"...বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৬কালাচাঁদ সান্যাল মহাশয়ের ভবনে বাগবাজারস্থ কতকগুলি যুবকবৃন্দ, 'কলিকাতা ন্যাশানেল থিয়েটর' অভিধেয় জাতীয় নাট্যালয়ে 'নীলদর্পণ নাটক' প্রথমে অভিনয় করেন।...

একতান বাদ্যটী আমাদের বঙ্গীয় হয় নাই। কতকগুলি চুনোগলির ফিরিঙ্গী দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বোধ হয় কেহই কিছুমাত্র আনন্দানুভব করেন নাই। ইহা অপেক্ষা যদি কতিপয় আমাদের ভদ্রযুবা দ্বারা কয়েকখানি আবশ্যকীয় যন্ত্র সহযোগে একতান বাদন হইত, তাহা বোধ হয় সকলেরই শ্রুতিমধুর হইত।"

দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর কনসার্টেও কোন বাঙালী ছিলেন না। 'ন্যাশনাল পেপার' (১৮ ডিসেম্বর ১৮৭২) লেখেন :—"The band played national tunes, and it was so done by Lucknow men."

বলা বাহুল্য, এই সব কথাই আমার প্রবন্ধে দেওয়া আছে (মাঘ, পৃ. ১৩, ১৫)। যেখানে যাহা মিলিবে নির্ব্বিচারে তাহা অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বাড়িত, কিন্তু মূল্য বাড়িত কি-না সন্দেহ।

(১১)

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় যাত্রা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(১২)

এই ধরণের কথা আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সমালোচনায় আছে (মাঘ, পৃ. ১৩, ১ম পাটি)।

(১৩)

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম রজনীতে চারি শত টাকার টিকিট বিক্রয় করেন, 'ন্যাশনাল পেপারে'র এই উক্তির উল্লেখ আমার প্রবন্ধে আছে (মাঘ, পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য)। ইহা প্রামাণ্য কথা, কারণ 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ন্যাশনাল থিয়েটারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরিশেষে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত যে-সকল তথ্যের হেমেন্দ্রবাবু উল্লেখ করেন নাই, অথচ যাহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান, সেরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমার প্রবন্ধগুলি এখনও শেষ হয় নাই, লিখিতে লিখিতে অনেক নূতন উপকরণ হস্তগত হইতেছে। সে-সকলই আমার প্রবন্ধের কোথাও-না-কোথাও সন্নিবিষ্ট হইত। উহা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আলোচনা লিখিলে আমারও উপকার হইত, আলোচকেরও অনেক বৃথা পরিশ্রম বাঁচিত।

১৮৭৩, ১৫ই জানুয়ারি তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম অভিনীত হয় (বঙ্গশ্রী, মাঘ, পৃ. ১৮)। প্রহসনখানির অভিনয়ে রাজীবের ভূমিকা লইয়াছিলেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর। তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৭৩, ২২ জানুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত একজন দর্শকের পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন :—

THE COMIC POWERS OF THE NATIONAL THEATRE.

Sir,...First of all came in the *Bia Pugla Booro Bor*. The principal character in the farce, Rajeeb Baboo, was represented by Baboo Audhoredro [Ardhendu] Mustuphy. From his first appearance on the stage, the applause was general and uninterrupted. It were endless to describe each particular beauty of the performances of this exquisite actor. The manner in which he rushed in, pursued by a gang of wicked country lads who pelted him with two lines of poetry for which he had a particular aversion, and restored to them with the full-mouthed asperity of a monomaniac, was admirable. Those to whom it has ever fallen to attempt an imitation of the ways and habits of others, must know how its difficulty increases in proportion to the oddity of those ways, and their dissimilarity to truth and nature, as we find them about us...The eye, the action, the changes of voice and expression, the slow gait, the feeble motion, and the assumed vivacity were exactly what one would expect to find them. But the master was 'in his art' when, lying down alone in his bed, he expatiated in a beautiful and well paused soliloquy on the prospect of the forthcoming nuptials, which opened on him like a new Elysium...Yours truly G. The 16th Jany. 1873.

১৮৭৩ সনের জানুয়ারি মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের মধ্যে যে-বিবাদ উপস্থিত হয় (বঙ্গশ্রী, মাঘ, পৃ. ১৯-২০) তৎসম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ জানা গিয়াছে। ১৮৭৩, ২৩এ জানুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ :—

A BREACH IN THE NATIONAL THEATRE

Sir.—Owing to a long existing ill-feeling among the members of the National Theatrical Society a disagreement has arisen amongst them. The cause of this faction, as the Secretary of the Society announces, is the failure on the part of the Treasurer to render the accounts. The other party ascribes the cause of this faction to some shortcoming on the part of the Secretary. A meeting was held on Sunday which was attended by both the parties and presided over by the Editor of the *Amrita Bazar Pattrika*. The worthy Editor, in spite of his earnest endeavours, failed to reconcile the divided parties. But, however, you will be glad to learn that on any account the theatrical performance will not be stopped on the ensuing Saturday. Both the parties, I am assured, will have recourse to law. Where are ye Nationalists?—come, stretch your helping hands to save from premature death the first "national Theatre"—the object of our National pride.

Believe me, yours truly,
BROJENDRA NATH BANERJEE

এই ব্যাপারের অল্পদিন পরেই—ফেব্রুয়ারি মাসে শিশিরকুমার ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হন। এ সম্বন্ধে ১৮৭৩, ১লা মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

THE NATIONAL THEATRE.

Dear Sir,—...The announcement, in the correspondence columns of your paper of the other day, of the names of the two persons as directors of the theatre, has filled us with hope;—one is the Editor of the *Amrita Bazar Patrica*, the other is Babu Grish Chunder Ghose, a young man who is himself one of the best Native amateur actors of the town, and who combines in himself a good education with an excellent taste, and a tolerable knowledge of the human nature. Under the superintendence of these two gentlemen we feel sure that the National Theatre will daily improve. We, therefore, exhort these gentlemen to take special interest in it, and to see that for the want of better management it does not, like many other Native institutions come to an untimely end. Yours faithfully,

S. P. C. Shampookur, The *28th February* 1873.

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র জগৎ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্‌ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা আশ্চর্য্য বস্তু

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্‌ দ্বীপপুঞ্জ বলিতে কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপের সমষ্টি বোঝায়। ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য জগতে অতুলনীয়, লোকসংখ্যাও অনেক এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল প্রকার জাতিই এখানে কিছু না কিছু আছে।

অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত সেণ্ট্‌ পিয়ের সহরের গির্জ্জা: দূরে মাউণ্ট পিলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

আমাদের মত লোক যাহারা কখনো কোথাও যায় নাই, তাহাদের কাছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বহু আশ্চর্য্য জিনিসে ভরা কিন্তু উহাদের মধ্যে কয়েকটা দ্বীপে এমন সব দ্রষ্টব্য বস্তু বা স্থান আছে, যাহা কি না নিতান্ত ঝুনো ভ্রমণকারীরও বিস্ময়ের ও আনন্দের উদ্রেক করিতে পারে।

প্রথমে মার্টিনিক্‌ দ্বীপের কথা ধরা যাক। মার্টিনিক্‌ উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত একটা বড় দ্বীপ, কারিব সাগর ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল, চওড়ায় ১৩ মাইল, এবং সমস্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাক্ষাৎ এই মার্টিনিক দ্বীপেই পাওয়া যায়।

মার্টিনিক্‌ দ্বীপের প্রধানতম দর্শনীয় বস্তু হইতেছে মাউণ্ট পিলি আগ্নেয় গিরি ও অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত সেণ্ট পিয়ের নগর। মাউণ্ট পিলির উচ্চতা দক্ষিণ আমেরিকার বা আফ্রিকার বড় বড় আগ্নেয় গিরিগুলির তুলনায় কিছুই নয়—মাত্র চারি হাজার চারি শত ফিট্‌ মাত্র, শিখরদেশ হইতে দূরের সুনীল কারিব সাগরের দৃশ্য অতি মনোরম—নিম্নের অধিত্যকায় সেণ্ট পিয়ের সহর, বর্ত্তমানে একটা বৃহৎ ধ্বংসস্তূপ হইলেও একসময় এখানে চল্লিশ হাজার লোক বাস করিত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের ফলের ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্যারিসে প্রচলিত সকল প্রকার ফ্যাশানের পোষাক পরিচ্ছদ সেণ্ট পিয়ের সহরের বড় বড় দোকানের জানালায় প্রদর্শিত হইত—নাট্যশালাগুলিতে ফরাসী নাটকের অভিনয় হইত। এখানকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা হাস্যজনক মিশ্র ফরাসী বুলি বলিত—পথে পথে ভাঙা ভাঙা অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে ফরাসী গান গাওয়া হইত—সর্ব্বপ্রকারেই ইহা প্যারিসের একটা ক্ষুদ্রকায় ট্রপিক্যাল সংস্করণ ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মাউণ্ট পিলি রুদ্রমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া নগরের সকল সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস-স্তূপের নীচে চাপা দিয়া ফেলিল।

মাউণ্ট পিলি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঘুমাইতেছিল। এই শান্তদর্শন পর্ব্বত যে কোনোদিন এমন একটা অঘটন ঘটাইতে

ট্রিনিদাদের পিচ্‌-হ্রদ।

পারে, এমন কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। পর্ব্বতের ঢালুতে ধনী ব্যবসায়ীরা প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল,

চাষবাসও চলিতেছিল। সেণ্ট পিয়ের সহর ধীরে ধীরে সমুদ্রবাণিজ্যের একটী প্রধানতম কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে মাউণ্ট পিলির অভ্যন্তর হইতে মেঘগর্জ্জনের মত রব শ্রুত হয় এবং সহর হইতে মেঘ ও উষ্ণ বাষ্প উঠিতে থাকে। দিন যত যাইতে

নিগ্রোসম্রাট ক্রিষ্টফের রাজপ্রাসাদ।

লাগিল এই বাষ্প ও মেঘ ক্রমেই এত ঘনীভূত হইতে থাকিল যে দিনমানেও সেণ্ট পিয়ের সহর প্রদোষের মত অস্পষ্ট অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িল। ৫ই মে উষ্ণ লাভাস্রোত প্রথম বহিতে সুরু করে এবং সহরের প্রান্তবর্ত্তী কয়েকটী গৃহস্থের বসতবাটী নষ্ট করিয়া দেয় ও দু চারটী লোককে আহত করে। গহ্বর-নিঃসৃত ভস্মরাশির চাপে অনেক গাছপালা ভাঙিয়া পড়িল, মার্টিনিক ও সান্তো ডোমিঙ্গো দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সামুদ্রিক টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গেল এবং ফলে মার্টিনিক্ দ্বীপ বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল।

কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও লোকের চৈতন্য হইল না। সেণ্ট পিয়ের সহরে ব্যবসা বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, নাচ থিয়েটার পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। বিজ্ঞ লোক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু হইবে না।' ৭ই মে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত হইল বটে কিন্তু বৃষ্টির জলে বায়ুমণ্ডল ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। পরদিন নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য উঠিল, প্রকৃতির মুখে অনেকদিন পরে হাসি দেখা দিল, সেণ্ট পিয়েরের অধিবাসীদের অনেকেই ঠিক করিল, এইবার বড় রকমের একটা উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে।

তারপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত ইতিহাস। পরদিন অর্থাৎ ৯ই মে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পরিবর্ত্তে আসিল নিষ্ঠুর ধ্বংসের ভয়াল লীলা—মাউণ্ট পিলি বজ্রগর্জ্জনে কালাগ্নি বর্ষণ করিতে সুরু করিল—অগ্নিস্রোত পাহাড়ের ঢালু বাহিয়া তর তর বেগে নামিয়া আসিয়া সহর ডুবাইল, বন্দর ধ্বংস করিল, গাছপালা, পশুপক্ষী পুড়াইল, বন্দরের জলে যত নৌকা ও জাহাজ ছিল মাত্র একখানি বাদে বাকীগুলি হয় পুড়িল, নয় ডুবিয়া গেল। এই জাহাজখানি ব্রিটিশ জাহাজ—কোন গতিকে নঙ্গর তুলিয়া এখানি বাহিরের সমুদ্রে আসিয়া পড়াতে বাঁচিয়া গেল বটে কিন্তু ডেকের উপরে সে সময় যাহা কিছু বা যে কেহ ছিল—রক্ষা পায় নাই।

সেণ্ট পিয়ের সহরের চল্লিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে একটী মাত্র লোক প্রাণে বাঁচিয়া ছিল। এই লোকটী একটী ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে বন্দী ছিল, দুদিন পরে তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করা হয়।

মুলি মঠের তীর্থক্ষেত্র মিট্‌জুগা পর্ব্বত।

সেণ্ট পিয়ের সহর একেবারে ধুইয়া মুছিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। ঘর বাড়ী, নাচঘর, থিয়েটার, গির্জ্জা সবশুদ্ধ। তার পরে বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে যেখানে সেণ্ট পিয়েরের সহর ছিল, এখন সেখানে বন্য দ্রাক্ষা ও অন্যান্য বন্য গাছ-

মুনী রাজ্যান্তর্গত গাড়ু ও ভেক গ্রামের মধ্যবর্ত্তী নির্ঝরিণী
[বিচিত্র জগৎ দ্রষ্টব্য

কঞ্চলিং পর্ব্বতের সানুদেশে দুই প্রকারের প্রিমরোজ পুষ্প।

পালার জঙ্গল—মাঝে মাঝে কঠিন লাভার স্তূপ, বিধ্বস্ত ইষ্টক-প্রস্তর স্তূপ।

শুচু নদীর ধারের একটি পাহাড়ী গ্রাম।

পুরাতনের এমনি আকর্ষণ যে মাঝে মাঝে লোকে এখনও ফিরিয়া আসিয়া বন্য আইভিমণ্ডিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছোট-খাট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, অসুবিধা দেখিয়া আবার চলিয়া যায়, হয় তো কিছুকাল পরে আবার আসে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে মাউন্ট্ পিলি আবার গর্জ্জন সুরু করিয়াছিল। লোকজন তখনই পলাইয়া গেল, বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল—কিন্তু যেই সব থামিয়া গেল লোকে আবার ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিল। আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ আজকাল মাউন্ট্ পিলি পর্ব্বতের উপরেই থাকেন, তাঁর আপিস্ হইতে হাজার হাজার ফিট্ তার পর্ব্বতের আগ্নেয় গহ্বরের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে—তাদেরই সাহায্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে তিনি আগ্নেয়গিরির মেজাজ বুঝিতে পারেন।

মার্টিনিক দ্বীপের দ্রষ্টব্য বস্তু দুইটি—মাউন্ট্ পিলি ও বিধ্বস্ত সেণ্ট্ পিয়ের সহর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পম্পেয়াই। হেইতি দ্বীপে নিগ্রো সম্রাট্ ক্রিষ্টফ্ নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ আর একটা দর্শনীয় বস্তু। ইহা টাওয়ার অফ্ লণ্ডনের দ্বিগুণ, তিন হাজার ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার দেওয়ালগুলির উচ্চতা আশী ফিট্ হইতে একশত ফিট্, দেওয়ালের উপর চারিধারে তিনশত পঁয়ষট্টিটা ব্রোঞ্জ কামান বসানো আছে—বৎসরের এক এক দিনের জন্য এক একটা। এই বিশাল প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কোনো অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে রাজা ক্রিষ্টফের রাজকোষ অবস্থিত—বহুকাল চলিয়া গিয়াছে, রাজা ক্রিষ্টফ্ও নাই, তাঁর রাজত্বও নাই—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার এই গুপ্ত ভাণ্ডার বহু অনুসন্ধানের পরও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আর একটি আশ্চর্য্য বস্তু ট্রিনিদাদের পিচ্ হ্রদ। এই হ্রদের পরিমাণ-ফল প্রায় একশত একার, আমাদের হিসাবে পাঁচশত বিঘার কিছু উপর। ইহার উপরিভাগ সমতল ও কঠিন, বেশ হাঁটিয়া যাওয়া চলে। এমন কি পিচ্ বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইহার উপর দিয়া ছোট রেল পাতা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে পিচ্ হ্রদের যে কোনো স্থানে মজুরেরা গর্ত্ত করিয়া আজ পিচ্ তুলিয়া লইল—কাল দেখা যাইবে ভিতর হইতে পিচ্ ঠেলিয়া উঠিয়া সে গর্ত্ত বুজাইয়া দিয়াছে। সার ওয়াল্টার র‍্যালে ট্রিনিদাদে এই পিচ্ দিয়া তাঁহার জাহাজের তক্তার জোড় বুজাইয়াছিলেন—সেই হইতেই এখানকার পিচ্ তুলিয়া লওয়া

শুচু নদীর উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু।

হইতেছে। বিশেষ করিয়া গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এখান হইতে লক্ষ লক্ষ টন পিচ্ তোলা হইয়াছে—কিন্তু চোখে দেখিয়া মনে হয় হ্রদে আগে যে পরিমাণ পিচ্ ছিল, এখনও

তাহাই আছে, বিন্দুমাত্র কমে নাই। হ্রদের গভীরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য কয়েক শত ফিট্ বোরিং করা হইয়াছিল, কিন্তু

ইংরাসি নদীর উপত্যকার এক অংশ।

তলদেশ বাহির করিতে পারা যায় নাই। কে জানে এই হ্রদ অতলস্পর্শ কিনা?

সার ওয়ালটার র‍্যালে ট্রিনিদাদ দ্বীপের গেছো ঝিনুক ও গাইয়ে মাছের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; সমুদ্রকূলবর্ত্তী ম্যানগ্রোভ বনের ডালে ডালে অজস্র গেছো ঝিনুক এখনও দেখিতে পাওয়া যায় ও সমুদ্রের জলে গাইয়ে মাছের দল এখনও গান করে।

তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর—কংকা

১৯২৮ সালে জনৈক ইংরেজ পর্য্যটক চীনদেশের অজ্ঞাত প্রদেশ সমুহ ভ্রমণ করিতে বাহির হন। বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অবশেষে এই ভ্রমণ কার্য্য সমাধা করেন। যে সকল স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনো ইউরোপীয় পর্য্যটক সেস্থান চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ অতীব কৌতূহলপ্রদ, চীনদেশের নানাবিধ অদ্ভুত অজ্ঞাত রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। এই সকল প্রদেশে বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেন্টের শাসন অচল, পথঘাট দুর্গম ও দস্যুসঙ্কুল—চীনদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এ সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে সাহস করে না, বিদেশী তো দূরের কথা।

এই ইংরেজ পর্য্যটকের নাম যোশেফ রক—১৯২৩ সালে একবার ইনি তিব্বত ও চীনের প্রান্তবর্ত্তী লামা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে সেই সময়েই যথেষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। একদিন দূরের তুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়া দেখাইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—ওগুলি কোন্ দেশের পাহাড়! রাজার উত্তরে অবগত হন যে সেগুলি চীনের কংকালিং প্রদেশের পর্ব্বতমালা, ভীষণ দুর্গম, ঘন অরণ্যময় ও দুর্দ্দান্ত চীন ও তিব্বতী দস্যুদলে পূর্ণ। সেই হইতেই মিঃ রকের মনে বাসনা জাগিল একদিন না একদিন কংকালিংয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ তাঁহাকে বেড়াইতেই হইবে।

জাম্বেইয়াং পর্ব্বতের পবিত্র গুহা

১৯২৮ সালের ২৩শে মার্চ্চ—পাঁচ বৎসর পরে তাঁর এই আশা সফল হয়। ইতিমধ্যে ইনি দেশ হইতে কিছু অর্থ

হিল্‌হিন রমণী।

সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং ইউনানফু হইতে জন কয়েক অভিজ্ঞ চীনা কুলি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হন। প্রথমেই তিনি মূলি রাজ্যের লামা-রাজার নিকট গেলেন—পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি কংকালিং-এর দস্যুসর্দ্দারদের যেন বলিয়া দেন যাহাতে তাহারা ভ্রমণের দলটীর উপর কোনো অত্যাচার না করে। মুলির লামা-রাজ তাহাতে সম্মত হইয়া দস্যুসর্দ্দারদের কাছে চিঠি দিয়া নিজের লোক পাঠাইয়া দিলেন ও মিঃ রক্‌কে ভরসা দিলেন যে তাঁহার কোনো বিপদ ঘটিবে না।

তাহার পর লামারাজ মিঃ রকের কাছে বহির্জ্জগতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯২৮ সালেও তিনি খবর রাখিতেন না যে কাইজার আর জার্ম্মানিতে রাজত্ব করেন না, বা রাসিয়ার জার ইহজগতে নাই। তারপরে তিনি এরোপ্লেনের বিষয় জানিতে চাহিলেন—আমেরিকায় এরোপ্লেনে চড়িলে সেখান হইতে চীনদেশ দেখা যায় কি না? লোকে এরোপ্লেনে করিয়া চাঁদে যাইতেছে না কেন?

১৩ই জুন মিঃ রক্ লোকজন লইয়া মূলি হইতে কংকালিং রওনা হইলেন। লামা-রাজ মঠের একজন শ্রমণকে সঙ্গে দিলেন। দস্যুরা দুর্দ্দান্ত হইলেও ধর্ম্মভীরু মঠের জনৈক ভিক্ষু দলের মধ্যে থাকিলে সে দলের উপর অত্যাচার না-ও করিতে পারে—রাজার অনুরোধ যদিও না রক্ষা করে, ধর্ম্মকে ভয় করিবেই। মূলি ছাড়াইয়া শুধু পর্ব্বত ও অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ—ফুলে ভরা রডোড্রেণ্ডন্ বনে ভরা।

খানিক দূর অগ্রসর হইলে অরণ্য আরও গভীর—ওক্ ও ফার গাছই বেশী, নানা জাতীয় রডোড্রেণ্ডন্ বনের সর্ব্বত্রই
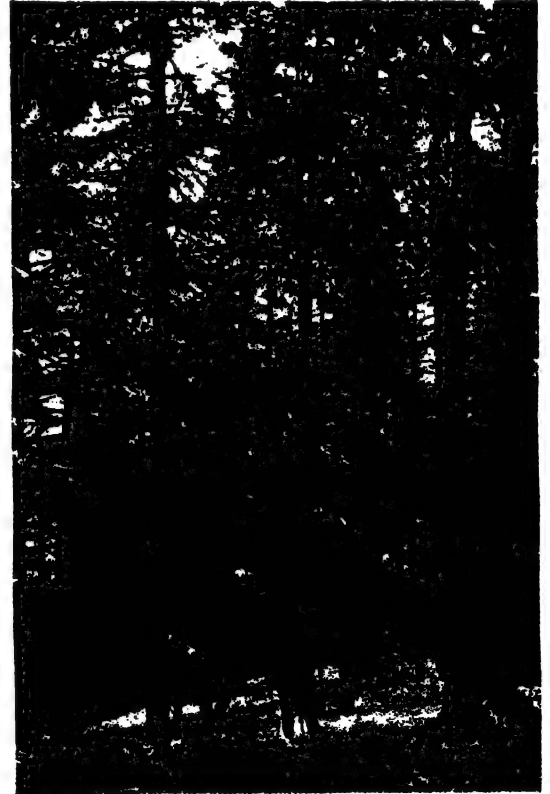
শুচু নদীর তীরে স্প্রুস্ গাছের অরণ্য।

দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতীয় পুষ্পিত লতা, নানা ধরণের অজানা বৃক্ষ ও বনমূল। কংকালিং পর্ব্বতমালার

শুচু নদীর উপরকার সেতু একটী দেখিবার জিনিস। শুচুর ন্যায় বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর উপর মাত্র একটা বড় গাছের গুঁড়ি আড় করিয়া পাতা আছে—তাহারই সাহায্যে পারাপার হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। লোকে গাধার পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সেতু পার হইতেছে।

কংকালিং পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকের ঢালুতে গারু জাতির বাস। ইহাদের মুখাবয়ব অনেকটা তিব্বতীদের মত, কিন্তু রং আরও ফর্সা, শক্তি সামর্থ্য আরও বেশী। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা নয়, শুচু নদীর উপত্যকায় ইহারা গম ও ধানের চাষ করে, নদীতে মাছ ধরে, ভেড়ার লোমের টুপি জামা ইত্যাদি তৈরী করিয়া বিক্রয় করে। গারু জাতি নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয়, কাহারও কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

এই স্থানে কুলীরা বনের শুষ্ক ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা আরম্ভ করিল—এই পর্ব্বত গারু জাতির বাসস্থান হইতে অস্পষ্ট দেখা যায় মাত্র। ইহার তিব্বতী নাম মিনিয়া কংকা—স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই পর্ব্বতে নানা জাতীয় ভূত ও অপদেবতার বাস, তাহাদের প্রসন্ন রাখিতে ইহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট।

জাম্বেইয়াং পর্ব্বতের অপর এক অংশ।

পাদমূলে শুচু নদী প্রবহমানা, 'শুচু' অর্থাৎ লৌহ নদী। এই নদীর উভয় তীরের মাটী ও পাথরের মধ্যে লৌহের ভাগ অত্যন্ত বেশী বলিয়া নদীর এই নাম। শুচুর জন্মস্থান কংকালিং হইতে আরও এগারো মাইল উত্তরে, সিয়াংচেং প্রদেশে।

শুচু নদী পার হইয়া পথ আরও দুর্গম, বনফুল আরও নানা ধরণের কিন্তু উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের ডাঁশ মাছির উপদ্রব এত বাড়িতে লাগিল, যে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। কংকালিং পর্ব্বতের ১৫,০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধরণের বনস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, তারও উপরে শুধুই রডোড্রেণ্ডন্ বন, নানা রংএর রডো-ড্রেণ্ডন্।

চানাদর্জ্জি পর্ব্বতের পাদদেশে অভিযানকারীদের তাঁবু।

শুচু নদীতে সোনা পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ধরণের উন্নততর যন্ত্রতন্ত্রের অভাবে সোনার কাজ এখানে লাভজনক হইতে পারে নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সুহিন্ জাতি এই কার্য্যে খুব পটু—নদীর বালি ধুইয়া সোনা বাহির করাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা, অবশ্য মাঝে মাঝে সুবিধামত দস্যুবৃত্তিও করে।

মিনিয়া কংকা হইতে একটা বড় তুষারনদী (glacior) নামিয়া আসিয়া এইখানে শুচু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে—সে দৃশ্য মহিমময়, অপূর্ব্ব, একবার দেখিলে সারা জীবনে তার গম্ভীর সৌন্দর্য্য ভুলিতে পারা যায় না।

চানাদর্জ্জি তুষারপ্রবাহ।

প্রকৃতির অপূর্ব্ব রাজ্য। যে দিকে চোখ যায়, শুধু বনফুলে ভরা পর্ব্বত সানু, চিরতুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শিখর রাজি, তুষার প্রবাহ, বেগবতী নদী, ওক্ ও হেমলকের ঘন অরণ্য! মাঝে মাঝে প্রিম্‌রোজে ছাওয়া সমতল ভূমিতে বন্য গয়াল চরিতেছে, জন মানুষের চিহ্ন বড় একটা নাই, যাহারা আছে তাহারা বড় একটা দেখা দেয় না, অন্তরালে থাকিয়া গুলি চালাইতে তাহারা সুপটু। কিছু দূরে ইয়াকা গিরিবর্ত্ম। এখানে পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে অপূর্ব্ব লাল রংএর প্রিম্‌রোজ অজস্র ফুটিয়া আছে, ফুল এত বড় যে ডাঁটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, প্রিম্‌রোজের থাকের উপরে ঘন নীল ফর্গেট-মি-নটের সারি। তাদেরও উপরে জাম্বেইয়াং শিখরের দুরারোহ, উত্তুঙ্গ খাড়াই—জাম্বেইয়াং এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বোচ্চ শিখর—উচ্চতায় বিশ হাজার ফিটেরও বেশী—অপর দুই শৃঙ্গ শেন্-রে-জিগ্ ও চানাদর্জ্জি প্রায় বিশ হাজার ফিটের কাছাকাছি হইবে।

জাম্বেইয়াং অত্যন্ত পবিত্র শিখর—এখানে সেদেশের বাগ্‌দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি, বহুদূর হইতে যাত্রীর দল পথের বিপদ তুচ্ছ করিয়া পূজা দিতে ও শিখর পরিক্রমা করিতে আসে। জাম্বেইয়াং-এর পাদদেশে, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটা বড় গুহায় যাত্রীর দল আশ্রয় লইয়া থাকে এবং প্রায়ই অনেকে দস্যুর হাতে প্রাণ হারায়। অন্যদিক দিয়াও এই গুহায় রাত্রিবাস নিরাপদ নয়—বড় একটা ঝড়ঝঞ্ঝার পরে উপর হইতে বড় বড় বরফের চাঁই প্রায়ই গড়াইয়া পড়ে, কত বিশাল বনস্পতি বরফের চাঁইয়ের মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—মানুষ তো নিতান্ত তুচ্ছ।

ইয়াক্ গিরিবর্ত্ম পার হইয়া একটী বৌদ্ধমঠ আছে। এই মঠটী এখানকার দস্যুদলের প্রধান আড্ডা। মুলির লামা-রাজের অভয় পাওয়ায় মিঃ রক এখানে কয়েকদিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন। এই মঠটী অতি প্রাচীন, কত দিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেওয়ালে চীনা ও তিব্বতী ছবি টাঙানো, বাহিরে যাত্রীদলপ্রদত্ত ঘণ্টা, মালা, পাপীর পালক প্রভৃতি খুঁটার গায়ে বাঁধা। ধূপ-ধুনার পরিবর্ত্তে দেবতার কাছে জুনিপার গাছের ডাল জ্বালানো হয়। উঠানে একটী বৃহৎ জপচক্র আছে, প্রত্যেক যাত্রী মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া একবার করিয়া জপচক্রটী ঘুরাইয়া দিতেছে।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রন্‌হিল্ড্

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[এই উপাখ্যানটী প্রাচীন Teutonic টিউটনীয় বা Germanic জরমানীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাখ্যান। অতি প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর ও পশ্চিম জরমানী, হলাণ্ড, ডেনমার্ক ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় আদি আর্য্য জাতির টিউটনীয় শাখার বাস। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলনয়ন এই টিউটন জাতীয় আর্য্যগণ, আদি আর্য্য জাতির সভ্যতা ও মনোভাব বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া, বহু বিষয়ে তাহাকে বিশুদ্ধ ও আদিম অবস্থায় রাখিয়াছিল; অন্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ হইতে বহুদূরে টিউটনগণ বাস করিত বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া তাহারা একটু আদিম অবস্থায়ই ছিল। টিউটনীয় জনগণ খ্রীষ্ট জন্মের কাছাকাছি সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে আসে, এবং পরে ইহারা সমস্ত ইউরোপময় এবং উত্তর আফ্রিকায় প্রসৃত হয়। বিরাট রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংস ইহাদের হাতেই ঘটে। পরে ইহারা ক্রমে রোমের সভ্যতা এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। আধুনিক ইউরোপের গঠন এই টিউটনীয় জাতির দ্বারাই অনেকটা হইয়াছিল। ইংরেজ, জরমান, ডচ্, দিনেমার, স্কাণ্ডিনেভীয় জাতির লোকেরা এই টিউটনীয় জাতিরই বংশধর। খ্রীষ্টান হইবার পূর্ব্বে টিউটনীয়দের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা আদি আর্য্যদের ধর্ম্মেরই রূপভেদ মাত্র। খ্রীষ্টান হইবার পরে এই ধর্ম্মের সমস্ত চিহ্ন ইহাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে—তবে সেই ধর্ম্মের স্মৃতি দুই চারিটী ইংরেজী জরমান ডচ্ ও স্কাণ্ডিনেভীয় শব্দের মধ্য দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। টিউটনীয় লোকেদের মধ্যে স্কাণ্ডিনেভীয়গণ (নরওয়ে, সুইডেন ও আইস্‌লাণ্ডের অধিবাসিগণ) সব শেষে খ্রীষ্টান হয় বলিয়া, প্রাচীন টিউটনীয় ধর্ম্মের কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন সাহিত্য ইহাদের মধ্যেই রক্ষিত ছিল ও আছে। প্রাচীন নরওয়ের ভাষায় রচিত Edda এড্‌ডা নামক দুইখানি গ্রন্থে ইহাদের দেবতা এবং প্রাচীন বীর ও বীরাঙ্গনাদের সম্বন্ধে অনেক কবিতা ও গাথা এবং কাহিনী রক্ষিত আছে।

টিউটনীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ইতিকথা ও বীরগাথা কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে। এই জাতীয় আখ্যানের মধ্যে Sigurd সিগুর্ড্ ও Brynhild (Brunhild) ক্রন্‌হিল্ড্-এর কথা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, এবং খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে ইহা সমগ্র টিউটনীয় জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কাহিনী রূপে প্রচলিত ছিল। এখন ইহা টিউটনীয়দের বংশধরদের মধ্যে লোক-সাহিত্য রূপে আর প্রচলিত নাই—ইহার স্মৃতিও প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল এখানে ওখানে জরমানীতে ও স্কাণ্ডিনেভিয়ায় রূপকথায় ও কবিতায় ইহার ক্ষীণ ধারা মাত্র বিদ্যমান; তবে প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে আজকাল ইস্কুলে ছেলেদের এই উপাখ্যান শেখানো হয়, এবং এখন নূতন করিয়া এই আখ্যান লইয়া আলোচনা হইতেছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়া নূতন কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল নূতন কাব্য ও নাটকের মধ্যে জরমানীর বিখ্যাত সঙ্গীতকার কবি Richard Wagner রিখার্ট্ ভাগ্‌নর্ রচিত গীতিনাট্য-চতুষ্ক Der Ring des Nibelungen (১৮৬০ সালের দিকে সম্পূর্ণ) এবং ইংরেজ কবি William Morris উইলিয়াম মরিস্ রচিত মহাকাব্য বা কাব্যেতিহাস The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) সর্ব্বপ্রধান। সিগুর্ড্-ক্রন্‌হিল্ড-এর আখ্যানকে প্রাচীন টিউটনীয় জাতির একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত বলা যাইতে পারে।

Edda এড্‌ডা নামে প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় দুই খানি বই আছে; ইহাদের মধ্যে একখানি প্রাচীন ও পদ্যময়, ইহা "জ্ঞানী" Sæmund সেমুণ্ড্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হয়, অন্য খানি গদ্যময় ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, Snorri Sturluson স্নোর্‌রি স্তুর্‌লুসন্ কর্ত্তৃক ইহা সঙ্কলিত। Sæmund-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১০৫৬ হইতে ১১৩৩, এবং Snorri-র মৃত্যুর তারিখ ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পদ্য-এড্‌ডা পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে আমাদের ঋগ্বেদের কথা মনে হয়—ইহা অনেকটা ঋগ্বেদের শ্রেণীর পুস্তক। এই পদ্য-এড্‌ডা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে দেবতাদের আখ্যান লইয়া গাথা ও কবিতা, অন্য ভাগে প্রাচীন রাজা, বীর ও

বীরাঙ্গনাদের কথা লইয়া অনুরূপ গাথা ও কবিতা। স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচারের পূর্ব্বে যে সকল টিউটনীয় দেবকথা ও ইতিকথা প্রচলিত ছিল, তাহার কতকটা অংশ এই এড্‌ডা গ্রন্থদ্বয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। পদ্য-এড্‌ডা খানি বিশেষ ভাবে অসম্পূর্ণ পুস্তক, অনেক কবিতা ইহাতে খণ্ডিত আকারে মিলিতেছে। পদ্য-এড্‌ডার দ্বিতীয় খণ্ডে সিগুর্ড্‌-ক্রন্‌হিল্ড্‌ উপাখ্যানের প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পদ্য-এড্‌ডায় সংগৃহীত কবিতাগুলির রচনা কাল খ্রীষ্টীয় ৮৫০ হইতে ১০৫০ এর মধ্যে। গদ্য-এড্‌ডায়ও এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। নরওয়ে দেশে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে, পদ্য-এড্‌ডায় রক্ষিত প্রাচীন গাথার মত নানা গাথার আধারের উপর **Volsunga Saga** নামে এই উপাখ্যানের একটি গদ্য-কাব্যময় রূপ রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন ইংরেজীর বিখ্যাত মহাকাব্য **Beowulf**-এ উদ্ধৃত একটী প্রাচীন গাথায় এই উপাখ্যানের একটী ঘটনার কথা আছে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় ও প্রাচীন ইংলাণ্ডে এই কয়টী পুস্তকে উপাখ্যানটীর যে রূপ আমরা পাইতেছি, সেইটীই হইতেছে ইহার আদিম বা প্রাচীনতর রূপ। মূল আখ্যানটীর প্রাচীনতম রূপ যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নাই। টিউটনীয় জাতির ধর্ম্ম ও দেবতাদের ভাঙ্গনের যুগে এই আখ্যানটী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাই ইহাতে নানা খুঁটিনাটী বিষয়ে বহু অসঙ্গতি দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর কাহিনীটীর মূল-কথা আমরা অনেকটা পাইতেছি। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় রক্ষিত এই আদিম রূপ ভিন্ন, জরমানীতে আর একটী রূপ পাওয়া গিয়াছে, সেটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক; আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন গাথার আধারের উপরে মধ্য-যুগের জরমান ভাষায় রচিত **Nibelungen Lied** নিবেলুঙ্গেন্ লীড নামক মহাকাব্যে, এই অর্ব্বাচীন রূপটী সুষঙ্গত অবস্থায় পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি কাব্যে ও গাথায় ইহা মিলে। **Nibelungen Lied**-এর পুনঃপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জরমান জাতি এই মহাকাব্যকে নিজেদের জাতীয় মহাকাব্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। **Nibelungen Lied**-এ গল্পটী অনেকটা রূপান্তরিত অবস্থায় মিলিতেছে।

নিম্নে আখ্যানটীর প্রাচীনতর অর্থাৎ স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটীই অনুসৃত হইল।

এই উপাখ্যানে দেব-কাহিনী ও মানব-ইতিহাস উভয় অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। দৈব অংশটুকু স্কাণ্ডিনেভীয় রূপটীতেই বিশেষ পরিস্ফুট। গল্পের নায়ক-নায়িকা ও প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে ইতিহাস-বহির্ভূত; আবার কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর ঐতিহাসিক ভিত্তিও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধের কতকগুলি টিউটনীয় ও হূণজাতীয় রাজা ও অন্য পাত্রদের এবং তাহাদের অনুচরদের কথা লইয়া।

সিগুর্ড্‌-ক্রন্‌হিল্ড্‌ উপাখ্যান পৃথিবীর প্রধান প্রধান গুটিকয়েক উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম—বিশ্বমানব-সভায় ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য জগতের নিকট হইতে আহৃত একটী শ্রেষ্ঠ অবদান।

এই উপাখ্যানের নায়ক সিগুর্ড্‌-এর পিতা **Sigmund** সিগ্‌মুণ্ড্‌-এর পূর্ব্ব-ইতিহাস লইয়া অনেক কথা আছে; সে-সব কথা এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত রূপে গৃহীত হইলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি না দিয়া মূল আখ্যানটী-ই দিতেছি।]

১। সিগুর্ডের জন্মকথা

Eylimi এইলিমি নামে পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন; তাঁহার এক কন্যা ছিল, কন্যার নাম **Hjordis** হিওর্ডিস্, হিওর্ডিস্ নারী মধ্যে রূপসী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। এদিকে রাজা **Sigmund** সিগ্‌মুণ্ড্‌ বয়সে প্রবীণ হইলেও শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিজ দোষে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হওয়ায়, সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি হিওর্ডিস্-এর নানা সদ্গুণের কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে হিওর্ডিস্-কেই বিবাহ করিবেন। হিওর্ডিস্-এর পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি বন্ধুভাবে তাঁহার বাড়ীতে যাইতেছেন। রাজা এইলিমি সাদরে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এবং সিগ্‌মুণ্ড এই আমন্ত্রণ পাইয়া উপস্থিত হইলে এইলিমি নিজ প্রসাদে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। **Lyngvi** লিঙ্গ্‌বি নামে আর এক রাজাও হিওর্ডিস্‌কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা লইয়া সেই সময়ে রাজা এইলিমির বাড়ীতে আসিয়া পহুঁছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা এইলিমি ভাবিয়া দেখিলেন, এই দুই রাজা তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী; দুইজনের মধ্যে যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে না, সে শত্রুতা করিতে পারে, এবং এই ব্যাপার হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তিনি নিজ কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে; আমি তোমায় ব'লছি, দু-জনের মধ্যে তোমার বর তুমি নিজে বেছে নাও, তোমার নির্ব্বাচন-মত আমি তোমার বিবাহ দেবো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "কঠিন সমস্যা; কিন্তু আমি রাজা সিগ্‌মুণ্ডকেই বিবাহ ক'রবো, তাঁর বয়স যদিও বেশী, শৌর্য্যে আর খ্যাতিতে তাঁর চেয়ে কেউ বড় নয়।"

এই রূপে হিওর্ডিস্ সিগ্‌মুণ্ডকেই পতিরূপে গ্রহণ করায় লিঙ্‌বি চলিয়া গেলেন। বিবাহ-উৎসব যথানিয়ম পালিত হইলে পরে, সিগ্‌মুণ্ড্ স্ত্রীকে লইয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন।

এদিকে রাজা লিঙ্‌বি সেনা সংগ্রহ করিয়া, হিওর্ডিস্ কর্ত্তৃক নিজের প্রত্যাখ্যান-জনিত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা সিগ্‌মুণ্ড্ নিজ দল বল লইয়া লড়াইয়ের জন্য আসিলেন। শত্রু-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, তিনি পত্নীকে ধনরত্ন-সহ আরণ্য-প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ হইল, এবং সিগ্‌মুণ্ড্ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইলেন; তিনি বার বার তরবারী সাহায্যে শত্রুদল ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন, কাঁধ পর্য্যন্ত তাঁহার দুই হাত রক্তে লাল হইয়া গেল।

সঙ্কুল যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময় দেবরাজ Woden উওডেন্ (বা Odin ওডিন্) দেখা দিলেন। নীল অঙ্গবস্ত্র পরিধান করিয়া, মাথায় কাত করিয়া পরা টুপী, হাতে খোলা তলওয়ার, একটি মাত্র চক্ষু। সিগ্‌মুণ্ড্ বহুপূর্ব্বে দেবরাজ ওডিনের প্রদত্ত এক দৈব তরবারী পাইয়া তদ্বারা অজেয় হইয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, যতদিন ওডিনের প্রসাদ-স্বরূপ এই তরবারী তাঁহার হাতে থাকিবে ততদিন তিনি অপরাজেয় হইয়া থাকিবেন। অচেনা বেশে অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ওডিন্ আসিয়া দাঁড়াইলেন; সিগ্‌মুণ্ড্ নিজ অস্ত্রদ্বারা এই প্রতিরোধী অপরিচিত পুরুষকে আঘাত করিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৈব তরবারী ওডিনের তরবারীর গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। তখন সিগ্‌মুণ্ড্ বুঝিলেন তাঁহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, জগতে তাঁহার আর কোনও কাজ নাই। তাঁহার দলের সৈন্যেরাও তখন হইতেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষা হইল না; তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা এইলিমি মরিলেন, সাংঘাতিক আহত হইয়া রাজা সিগ্‌মুণ্ডও নিপতিত হইলেন, শত্রুদের জয় হইল।

সিগ্‌মুণ্ডকে মৃত মনে করিয়া রাজা লিঙ্‌বি রণক্ষেত্র হইতে সিগ্‌মুণ্ডের প্রাসাদে গেলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হিওর্ডিস্‌কে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইবেন। সেখানে কাহাকেও না পাইয়া তিনি মনে ভাবিলেন যে সিগ্‌মুণ্ডের গোত্রে আর কেহই নাই—সিগ্‌মুণ্ডের রাজ্য শাসন করিবার জন্য নিজ লোক রাখিয়া তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাত্রে রণক্ষেত্রে হতাহতগণের স্তূপের মধ্যে যেখানে মৃতকল্প সিগমুণ্ড্ শায়িত ছিলেন, অরণ্যের আশ্রয় হইতে সেখানে হিওর্ডিস্ আসিলেন, এবং মুমূর্ষু স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তিনি স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা সিগ্‌মুণ্ড্ তাঁহাকে বারণ করিলেন। সিগ্‌মুণ্ড্ বলিলেন—"আমার সৌভাগ্য অস্তমিত, কারণ ওডিনের আর অভিপ্রেত নয় যে আমি বেঁচে থাকি বা লড়াই করি,—তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তরওয়াল তাঁরই হাতে ভেঙ্গে গিয়েছে; যতদিন তাঁর ইচ্ছা ছিল, ততদিন ধ'রে ল'ড়েছি।" রাণী বলিলেন—"যদি তুমি সেরে উঠে তোমার শত্রুদের নিপাত ক'রতে পারো, তাহ'লে মিছে নৈরাশ্য আন্‌ছ কেন?" রাজা বলিলেন—"আর একজন এসে এই বৈরিবিনাশ কার্য্য ক'রবে। তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা; আমাদের একটী পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হবে। ছেলেটীকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রবে, বড় হ'লে সে আমাদের কুলে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর বিখ্যাত পুরুষ হবে। আমার ভাঙা তরওয়ালের টুকরোগুলো রেখে দেবে, ছেলে বড় হ'লে এই টুকরোগুলো থেকে একখানা নোতুন তরওয়াল গ'ড়ে দেবে, সেই তরওয়ালের নাম হবে Gram 'গ্রাম'। আর এই তরওয়ালের সাহায্যে অনেক বীরোচিত কার্য্য সে সাধন ক'রবে। তার বীরত্বের গৌরব কাল-বশে কখনও লোপ পাবে না, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন তারও নাম থাকবে। যে অস্ত্রাঘাত আমার গায়ে হ'য়েছে তার ফলে

আমি ম'রবো—আমার পূর্ব্বে আমার পিতৃ-পুরুষ যাঁরা প্রয়াণ ক'রেছেন, এখন তাঁদের কাছে যাবো।"

রাজা মরণের সংকল্প লইয়া রহিলেন; রাণী হিওর্ডিস তাঁহার পাশে সারা রাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন।

যুদ্ধ সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে হইয়াছিল। ভোরের দিকে জাহাজে করিয়া কতকগুলি লোক রণক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া কূলে অবতরণ করিল। ইহারা ডেনমার্ক দেশের লোক। যুদ্ধাবসানে মৃত ও আহতের সংখ্যা দেখিয়া বুঝিল একটা-কিছু ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাদের নেতা রাজকুমার Alf আল্‌ফ্ সঙ্গে ছিলেন। হিওর্‌ডিস্ ও তাঁহার এক দাসীকে রণক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া, আল্‌ফ্-এর মনে করুণা হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উহাদের দুইজনকে রাজা সিগমুণ্ডের ধনরত্ন-সমেত সাদরে নিজ জাহাজে করিয়া লইয়া আসিলেন। আল্‌ফের পিতা বৃদ্ধ রাজা Hjalprek হ্যাল্‌প্রেক্ সমাদরের সহিত হিওর্ডিসকে গ্রহণ করিলেন। হিওর্ডিস্ হ্যাল্‌প্রেকের গৃহে আশ্রয় পাইলেন।

যথাসময়ে হিওর্ডিস্-এর একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম দেওয়া হইল Sigurd সিগুর্ড [১]।

বৃদ্ধ রাজা হ্যাল্‌প্রেক সিগুর্ডকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ চক্ষু দেখিয়া রাজা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কহিলেন যে এই নব শিশুর সমকক্ষ জগতে কেহই হইতে পারিবে না।

সিগুর্ড যত্নের সহিত লালিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, বিধবা রাণী হিওর্ডিস্ তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা রাজপুত্র আল্‌ফের সহিত পুনর্বিবাহিত হইলেন।

২। সিগুর্ডের শিক্ষা ও শৌর্য্য—ফাফ্‌নির্-বধ

হ্যাল্‌প্রেক, Regin রেগিন্ নামে এক বামনের নিকট সিগুর্ডের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই রেগিন নানা বিদ্যায় ও শিল্পে পারদর্শী ছিল, এবং যাদুবিদ্যা তন্ত্র-মন্ত্রও জানিত। সে সিগুর্ডকে সব বিষয়ে ভাল শিক্ষাই দিল। সিগুর্ডের পিতার তরবারীর খণ্ডগুলি লইয়া, তাহার জন্য একটা নূতন তরবারী প্রস্তুত করিয়া দিল; পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত এই তরবারীর Gram 'গ্রাম' এই নাম দেওয়া হইল। এই তরবারী এমন সূক্ষ্মধার ছিল যে স্রোতের জলে প্রবাহিত মেষলোমের গুচ্ছ ইহাতে লাগিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত, এবং এমন বজ্রকঠিন ছিল যে গঠনকালে রেগিনের লোহার নেহাইয়ের উপর উহার দ্বারা আঘাত করায় নেহাই দুই খানা হইয়া গেল, তরবারীর কোনও হানি হইল না।

সিগুর্ড্‌কে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য রেগিনের যত্নের বিশেষ কারণ ছিল। রেগিনের পূর্ব্ব ইতিহাস এই। ইহারা তিন ভাই—Otr ওৎর্, Fafnir ফাফনির ও রেগিন্; ইহাদের পিতার নাম Hreidmar হ্রেইড্‌মার। ইহারা বামন-জাতীয়। (টিউটনীয় বিশ্ব-কল্পনায় দেবতা, মানব, দৈত্য এবং বামন এই চারি জাতির দ্বারা যথাক্রমে স্বর্গলোক, মর্ত্ত্যলোক, তুষারমণ্ডিত দৈত্যলোক এবং পাতাল বা ভূগর্ভলোক অধ্যুষিত ছিল)। ওৎর্ মায়াবলে উদ্বিড়াল-রূপ ধারণ করিয়া একটী জল-প্রপাতের ধারে বসিয়া মাছ ধরিয়া খাইতেছে, এমন সময় তিনজন দেবতা—Odin ওডিন, Hoenir হোনির ও Loki লোকি—সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। দূর হইতে উদ্বিড়াল দেখিয়া, শিকার মনে করিয়া লোকি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ওৎর্‌কে বধ করিলেন। তিন জনে মিলিয়া ওৎর্-এর চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এবং রাত্রে ওৎর্-এর পিতার বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। হ্রেইড্‌মার ও তাহার অপর দুই পুত্র ফাফনির্ ও রেগিন এই চর্ম্ম দেখিয়া বুঝিল যে তাহাদের অতিথিত্রয় ওৎর্‌কে বধ করিয়াছে। তখন তাহারা এই বধের বিনিময়ে প্রতিদান স্বরূপ যথারীতি অর্থ চাহিল—ওৎর্-এর চর্ম্ম সোনা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণের সন্ধানে লোকি বাহির হইলেন। এখন Andvari আন্দবারি নামে আর একটা বামন বিপুল স্বর্ণ-সম্ভারের অধিকারী ছিল। আন্দবারিও মায়াবলে মৎস্যরূপে

[১] প্রাচীন নরউইজীয় ভাষায় Sigurdhr; প্রাচীন ইংরেজী রূপ Sigeweard, আধুনিক ইংরেজী Siward; আদি টিউটনীয় ভাষায় * Sigiwarduz; অর্থ, "বিজয় বা সাহসের সহিত যিনি রক্ষা করেন",—নামটীর প্রথম অংশ Sigi শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ "সহঃ,"—এই নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ হিসাবে "সহোবধঃ" শব্দ ধরিতে পারা যায়। জরমান্ ভাষায় নামটী একটু অন্য রূপে মিলে,—Siegfried সীগ্‌ফ্রীড্, অর্থাৎ "জয় ও শান্তি যুক্ত"।

গভীর জলে বিচরণ করিত। লোকি সমুদ্রের দেবী Ran রান্‌-এর নিকট হইতে একটী জাল সংগ্রহ করিয়া, আন্দবারিকে ধরিলেন, এবং আন্দবারিকে তাহার সমস্ত স্বর্ণ অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। আন্দবারির একটী সোনার আঙ্গটী ছিল, ঐ আঙ্গটী হইতে অনুরূপ আরও আঙ্গটী নির্গত হইত, লোকি সেটীও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া আন্দবারি অভিশাপ দিল, ঐ স্বর্ণ হইতে কেহই যেন সুখী না হয়, এবং ঐ স্বর্ণের জন্য যেন পৃথিবীতে কেবল হত্যা ও রক্ত-পাতই হয়। সোনা লইয়া লোকি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিন দেবতা সমস্ত সোনা দিয়া ওৎর্-এর চামড়া ঢাকিয়া দিলেন। লোকি আন্দবারির আঙ্গটীটী রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেটীও তাঁহাকে দিতে হইল। এইরূপে ওৎর্-হত্যার অপরাধ হইতে তাঁহারা মুক্ত হইলেন, কিন্তু লোকিও শাপ দিলেন যে এই স্বর্ণের জন্য হ্রেইড্‌মার ও তাহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটিবে। দেবতা তিনজন চলিয়া গেলে, দুই পুত্র রেগিন্‌ ও ফাফনির্‌ এবং পিতা হ্রেইডমার ইহাদের মধ্যে স্বর্ণের ভাগ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ হ্রেইডমার পুত্রদের ভাগ দিতে অস্বীকার করায়, ফাফনির নিদ্রিত পিতাকে হত্যা করিল, এবং সমস্ত স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করিল, রেগিনকে কিছু দিল না। ফাফনির একটী সুদূর জনহীন প্রান্তরে মাটীর ভিতরে গর্ত্ত করিয়া সমস্ত স্বর্ণ লইয়া এক ড্রাগন বা মহানাগের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার মাথায় এক ভীষণ শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং কেহ তাহার দিকে চাহিতে পারিত না। রেগিন কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু সে প্রতিশোধ-চিন্তা ও স্বর্ণ-লোভ উভয়ই হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে সিগুর্ডকে দিয়া ফাফনিরকে বধ করিবে, ও নিজে সমস্ত ধনরত্নের মালিক হইয়া বসিবে।

সিগুর্ড Grani 'গ্রানি' বলিয়া একটী অসাধারণ অশ্ব সংগ্রহ করিল—এই অশ্বটী দেবরাজের অশ্ব Sleipnir স্লেইপ্‌নির-এর বংশ হইতে উৎপন্ন। সিগুর্ডকে রেগিন এখন ফাফনির বধের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু সিগুর্ড আগে পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে চলিল। রাজা হাল্‌প্রেক্‌ জাহাজ ও সৈন্য দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন। রাজা লিঙ্গবির রাজ্য আক্রমণকালে পথে খুব ঝড় হইল, কিন্তু দেবরাজ ওডিন্‌ আসিয়া সহায় হইলেন, তাঁহার আগমনে ঝড় থামিয়া গেল, তিনি সিগুর্ডকে নানা উপদেশ দিলেন। রাজা লিঙ্গবিও সৈন্য লইয়া লড়িতে আসিলেন, কিন্তু সিগুর্ডের হাতে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিল, ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন সমস্তই বিজেতা সিগুর্ড ও তাহার সৈনিকগণের হাতে বিনষ্ট হইল। এইরূপে পিতার মৃত্যুর সমুচিত প্রতিশোধ লইয়া সিগুর্ড ফিরিয়া আসিল।

সিগুর্ড (সীগ্‌ফ্রীড্‌) [F. Lecke অঙ্কিত

রেগিন্‌ এইবার তাহাকে ফাফনির্‌-বধের জন্য উৎসাহিত করিল। ফাফনির বিরাট এক ড্রাগন অর্থাৎ কুম্ভীরাকৃতি সর্পের মূর্ত্তিতে থাকিত। যে পথ দিয়া সে যাইত সে পথে একটী পরিখার সৃষ্টি হইত; তিরিশ বাম উঁচু পাহাড়ের উপরে চড়িয়া লম্বা গলা দিয়া নীচেকার জল-প্রপাতের জল খাইত; তাহার নিঃশ্বাসে বিষের আগুণ ছুটিত, কেহ কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। রেগিনের পরামর্শ-মত যে পথ দিয়া ফাফ্‌নির জল খাইতে যাইত, সেই পথের মধ্যে এক জায়গায় একটা

গর্ত্ত খুঁজিয়া তাহার মধ্যে সিগুর্ড লুকাইয়া রহিল, এবং যখন ফাফ্‌নির সেই পথ দিয়া যাইতেছিল তখন গর্ত্তের উপর আসিয়া পড়িতেই সিগুর্ড নীচে হইতে নিজ তরবারী তাহার বাম বক্ষোদেশে বসাইয়া দিল। ফাফ্‌নির মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া সিগুর্ডের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এবং সিগুর্ডের ভবিষ্যৎ যে সুখের নয় সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিল, ও রেগিন্‌ও যে তাহার বিনাশ কামনা করে ইহা বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

ফাফনিরকে বধ করায় সিগুর্ডের উপনাম হইল Fafnisbana অর্থাৎ ফাফনি-হা।

ফাফনিরের মৃত্যুর পরে রেগিন আসিয়া সিগুর্ডকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল; পরে ফাফ্‌নিরের মৃতদেহের প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া বলিল—"আমার নিজের ভাইকে তুমি বধ ক'র্‌লে; এতে আমারও পাতক হ'ল।" সিগুর্ড বলিল—"তুমি তো আমায় এই ভীষণ ড্রাগন-বধে লাগিয়ে দিয়ে নিজে পালিয়ে রইলে—আমি একলাই তো শেষ ক'রলুম।" রেগিন বলিল, "তরওয়াল তো আমারই হাতে গড়া।" সিগুর্ড বলিল—"শত্রুতে শত্রুতে সাক্ষাৎ হ'লে তীক্ষ্ণ তরওয়ালের চেয়ে সাহসী হৃদয়ই বেশী কাজ দেয়।" রেগিন সিগুর্ডকে ফাফনিরের হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিয়া অগ্নি-দগ্ধ করিতে বলিল। সিগুর্ড হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া একটী কাঠিতে গুঁজিয়া আগুনে পোড়াইতে লাগিল। কতদূর পোড়ানো হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য সিগুর্ড হৃৎপিণ্ডে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দেখিল, অমনি তাহার আঙ্গুলে ছেঁকা লাগিল, সে জ্বালার চোটে আঙ্গুল মুখে পুরিয়া দিল। ড্রাগনের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তাহার মুখে লাগিতেই পাখীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হইল; পাশেই গাছের ডালে কতকগুলি পাখী যাহা বলিতেছিল সিগুর্ড তাহা বুঝিতে পারিল। একটী পাখী বলিতেছিল—"ঐ সিগুর্ড ব'সে ব'সে ফাফনিরের হৃৎপিণ্ড পোড়াচ্ছে; ও যদি নিজে ঐ হৃৎপিণ্ড খায়, তা হ'লে জগতে সকলের চেয়ে জ্ঞানবান হ'য়ে যায়।" আর একটী পাখী বলিল—"ঐ রেগিন শুয়ে ঘুমোচ্ছে—তাকে সিগুর্ড বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সিগুর্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে।" তৃতীয় পাখী বলিল—"রেগিনের মাথাটা কেটে ফেলুক্, পাপ চুকে যাক্; তারপরে সিগুর্ড নিজে গিয়ে সমস্ত ধনরত্ন দখল করুক্।" পাখীদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা শুনিয়া সিগুর্ড বলিল—"রেগিন যে আমায় হত্যা ক'রবে—সে সময় আর আসছে না; তার চেয়ে বরং রেগিনকেও তার ভাইয়ের পথেই পাঠাই।" এই বলিয়া সিগুর্ড গিয়া রেগিনের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

সিগুর্ড তারপরে ফাফনিরের হৃৎপিণ্ডের কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল, এবং ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ফাফনিরের বাসভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ফাফনিরের বাসভূমি ভূগর্ভে বহু নিম্নে গঠিত ছিল; তাহার ছাত দরজা প্রভৃতি সমস্ত লোহার তৈয়ারী। সিগুর্ড সেখানে প্রচুর স্বর্ণ পাইল; কতকগুলি প্রাচীন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ছিল, সোনার কবচ প্রভৃতি নানা আশ্চর্য্য বস্তু ছিল। দুইটী সিন্দুক এই সব জিনিসে ভরিয়া, ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া ও নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া, সিগুর্ড আবার শূরোচিত নূতন কার্য্যের সন্ধানে যাত্রা করিল।

Walkyrie বা 'কাকুরি' দেবী

৩। ব্রুন্‌হিল্ড ও সিগুর্ড

Walkyrie "বল্‌কুরি" নামে টিউটনীয় দেবলোকে দ্বাদশ-জন দেবী ছিলেন, ইহাঁরা কবচ চর্ম্ম প্রভৃতি রণসাজে সজ্জিত হইয়া দেবরাজ ওডিনের অনুচরীরূপে অবস্থান করিতেন। গগন-চারী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপরে অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া কোন্ কোন্ সাহসী যোদ্ধা সম্মুখ-সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইবে, এই বল্‌কুরী দেবীগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন —এই জন্য ইহাঁদের নাম, নামের অর্থ, "যুদ্ধে নিহতদের যাঁহারা বরণ করেন বা নির্ব্বাচন করেন।" সম্মুখ-যুদ্ধে কোনও যোদ্ধা নিহত হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া Walhalla "বল্‌হাল্লা" নামে দেবসভায় আনয়ন করাও ছিল ইহাঁদের অন্যতম মুখ্য কার্য্য। ইহাঁরা সুন্দরী ও চিরযৌবনা। Brynhild বা Brunhild ব্রুন্‌হিল্ড[২] এই বল্‌কুরিদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। কোনও কারণে একবার ব্রুন্‌হিল্ড দেবরাজ ওডিনের অবাধ্য হওয়ায়, ব্রুন্‌হিল্ডকে কন্যাবৎ স্নেহ করিলেও ওডিন তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন। তিনি ব্রুন্‌হিল্ডকে নিদ্রাবিষ্ট করিয়া, এক সু-উচ্চ গিরিশিখরে চতুর্দ্দিকে অগ্নিমালা প্রজ্জ্বালিত করিয়া এই অগ্নিময় প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক প্রাসাদের মধ্যে তাহাকে শায়িত করিয়া রাখিয়া দিলেন, আর এই বলিয়া দিলেন যে দূর ভবিষ্যতে কোনও দিব্যশক্তি-সম্পন্ন বীর যুবক অগ্নিময় প্রাচীর ভেদ করিয়া যখন আসিয়া ব্রুন্‌হিল্ডের চেতন করাইবে, তখনই ব্রুন্‌হিল্ডের নিদ্রা ভাঙ্গিবে, ব্রুন্‌হিল্ড মনোমত বর পাইবে,তাহার এই শাপের অন্ত হইবে। পাহাড়ের উপরে অগ্নিমালার মধ্যে এই নিদ্রিতা বল্‌কুরির কথা সিগুর্ড ইতিপূর্ব্বে ফাফনির-বধের পরে পাখীদের কাছে শুনিয়াছিল। এ বিষয় সিগুর্ডের কৌতূহল হইল। ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সিগুর্ড এই পাহাড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নিজ অমানুষিক শক্তির প্রভাবে অগ্নিময় প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে শয্যায় ব্রুন্‌হিল্ডকে শায়িত দেখিল। ব্রুন্‌হিল্ডের গায়ের সঙ্গে কবচ এত কঠিন ভাবে আঁটিয়া ছিল, যে দেখিয়া মনে হইল তাহা যেন সহ-জাত কবচ। নিদ্রিতা ব্রুন্‌হিল্ডের মুখের দিকে সিগুর্ড বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল; পরে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। অন্য উপায়ে কন্যার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়ায়, সিগুর্ড তাহার বর্ম্ম খুলিতে চেষ্টা করিল, এবং নিজ তরবারী-দ্বারা কাপড়ের মত বর্ম্ম কাটিয়া ফেলিল। তখন কুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিস্মিত-নেত্রে সিগুর্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার গায়ের বর্ম্ম কাটিয়া ফেলিয়া কে সে বীর—কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল ?

"কে কাটিল গায়ের সানা*, কে টুটাইল নীঁদ ?
কে বা আসি' দূর করিল আমার মরণ-ঘুম ?"

"সত্যই কি সিগ্‌মুণ্ড-তনয় ফাফনি-হা সিগুর্ড আসিয়াছে—মাথায় তার ফাফনিরের শিরস্ত্রাণ, হাতে তার ফাফনির-ঘাতক অস্ত্র ?"

সিগুর্ড বলিল—"হাঁ, আমি Volsung বোল্‌সুঙ্গ-বংশধর সিগ্‌মুণ্ড-পুত্র সিগুর্ড-ই বটে—আমিই এই আগুন আর ধোঁয়ার দেওয়াল ভেদ ক'রে এসেছি।"

ব্রুন্‌হিল্ড তখন বলিল—

"বহুদিন আমি ঘুমিয়েছি, বহুদিন ধ'রে নিদ্রা গিয়েছি।
মানুষের দুঃখও অনেক বহুদিনের।
ওডিনের প্রভাবে আমাকে শক্তিহীন হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছে—
নিদ্রার মোহ আমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি॥

"জয়, দিনের আলো! জয়, আলোকের পুত্রগণ!
জয়, কৃষ্ণা রজনী! জয়, রজনীর কন্যা (পৃথিবী)!
আমরা দুজনে এখানে র'য়েছি, তোমরা স্নেহের চোখে আমাদের প্রতি চাও;
আমরা যেন অবশেষে জয়যুক্ত হই॥

"জয় দেবগণ! জয় দেবীগণ!
সমৃদ্ধা মুক্তহস্তা ভূদেবীর জয়!
আমাদের দুজনকে জ্ঞান দাও, শ্রেষ্ঠ বাক্ দাও,
যতদিন আমরা জীবিত থাকি, রোগ-নিবারক হস্ত দাও॥"

এইরূপে দেবতাদের আবাহনের পর ব্রুন্‌হিল্ড নিজ পরিচয় দিল। বহু যুগ পূর্ব্বে, ওডিনের অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও, ব্রুন্‌হিল্ড কোনও যুদ্ধে একজন যোদ্ধাকে সাহায্য করিয়াছিল; তাই দেবরাজ শাস্তি-স্বরূপ তাহার গায়ে ঘুমের কাঁটা ফুটাইয়া তাহাকে অচৈতন্য করিয়া রাখেন,—আর তাহাকে দেবলোকে চিরকুমারী দেবী হইয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত

২ আদিম টিউটনীয় ভাষায় Brunja-hildiz—নামটির অর্থ, "বভ্রু বা ধূসরবর্ণা রণ-কুমারী"।

* সানা, অর্থাৎ বর্ম্ম (প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ—সংস্কৃত 'সন্নাহ'-শব্দ-জাত)।

করেন,—তাহাকে মানুষের সঙ্গে মানুষী হইয়া ও বিবাহ করিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ শাস্তি তাহাকে দেন। এই শাপের কথা শুনিয়াই সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, নির্ভীক বীর পুরুষ ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না।

ক্রন্‌হিল্‌ডকে দেখিয়া দেবী বুঝিয়া সিগুর্ড বলিল "তুমি আমাকে জ্ঞানের কথা শেখাও—ত্রিভুবনে কোথায় কি হ'চ্ছে, আর কি হ'য়ে থাকে আমায় বলো।"

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"তুমি হয় তো আমার চেয়ে বেশী জানো; তাহ'লেও আমি যা জানি তোমায় ব'লছি। এখন এসো,এখন আমরা দুজনে এক সঙ্গে পান করি;যেন দেবতারা আমাদের দুজনকে আনন্দের দিন দেন, যেন তুমি আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান থেকে সাহায্য পেতে পারো, যশ পেতে পারো,—এখন দুজনে মিলে আমরা যে কথা-বার্ত্তা ক'র্‌ছি, সে সব যেন তুমি মনে রাখতে পারো।"

ক্রন্‌হিল্ড পানপাত্র ভরিয়া মধু লইয়া সিগুর্ডের নিকটে আনিল, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে পান-পাত্র দিল। তারপর প্রাচীনদের নিকট হইতে শ্রুত বহু উপদেশময় সূক্ত ক্রন্‌হিল্ড সিগুর্ডকে শুনাইল। শেষে ক্রন্‌হিল্ড ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে জানাইল যে সিগুর্ডের জীবন অল্প-দিনের; সে ক্রন্‌হিল্ডকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে কি না—কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের উভয়ের জীবন ঘোরতর দুঃখময় হইবে। ইহা জানিয়াও সিগুর্ড তাহার জন্যই প্রতীক্ষমাণা এই দেব-কন্যাকে নিজ পত্নীরূপে পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

"আমি কখনও পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবো না—
যদিও তুমি আমাকে নিয়তির দ্বারা আকর্ষিত ব'লেই জেনে থাকো;
ভয় পেয়ে চোখ বুজবার জন্য আমি জন্মাই নি;
তোমার ভালবাসার দান এই উপদেশাবলী
আমি চিরতরে মনে গেঁথে রাখ্‌লুম,
যতদিন আমি বাঁচবো।"

সিগুর্ড আরও বলিল—"তোমাকেই আমি চাই, আমার মনের নিভৃততম স্থানে তুমিই রইলে।"

ক্রন্‌হিল্ড তখন উত্তর দিল—"জগতের সমস্ত পুরুষের মধ্যে তোমাকেই আমি বরণ করি, তুমিই আমার প্রিয়তম।"

এইরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইল। বামন আন্দবারির আঙ্গটী যেটা ফাফনিরের রত্ন-ভাণ্ডারে সিগুর্ড পাইয়াছিল সেটি সে ক্রন্‌হিল্ডকে অর্পণ করিল।

৪। নিয়তির গতি

কতকগুলি প্রাচীন গাথা অনুসারে, সিগুর্ড ও ক্রন্‌হিল্ড একত্র কিছুকাল বাস করে এবং উহাদের একটি কন্যাসন্তান হয়, তাহার নাম দেওয়া হয় Aslaug আসলাউগ। এই কন্যার কথা লইয়া একটি সুন্দর গাথা আছে। কিন্তু মূল উপাখ্যানের সঙ্গে এই কন্যার কোনও যোগ বা ইহাতে তাহার কোনও স্থান নাই। সিগুর্ড পুনরায় বিজয়যাত্রায় বাহির হইল, এবং নানাস্থান ঘুরিয়া Rhine রাইন-নদের তীরে Giuki গিউকি৩ নামে এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাজার গোত্র বা কুলের নাম হইতেছে Nifiung নিফলুঙ্গ, বা Niblung নিবলুঙ্গ বা Nibelung নিবেলুঙ্গ কুল। সোনার কবচ গায়ে, বাঁ হাতে সোনা-মোড়া ঢাল, মাথায় সোনার টোপর বা শিরস্ত্রাণ, দেবরাজের ঘোড়ার মত সুন্দর তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া বীর-বপু সুন্দর-কান্তি দেবোপম সিগুর্ড যখন গিউকির নগরে আসিয়া পঁহুছিল, সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, ও বিশেষ সম্মানের সহিত তাহার স্বাগত করিল। সিগুর্ড সম্মানিত অতিথি-রূপে গিউকির বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাজা গিউকির রাণীর নাম Grimhild গ্রিম্‌হিল্ড।

---

৩ Giuki ও তৎপুত্র Gunnar ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন মনে হয়—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধে Burgundian বর্গণ্ডীয়-গোত্রের টিউটনগণের রাজাদের মধ্যে Gibica গিবিকা ও Gundaharius গুন্দাহারিউস্ বা Gundicarius গুন্দিকারিউস্ নামে দুই জনের নাম পাওয়া যায়—ইঁহারাই আখ্যায়িকার Giuki (অন্যরূপ Gibich) ও Gunnar (জরমান-জাতির মধ্যে প্রচলিত রূপ Gunther, প্রাচীন ইংরেজদের মধ্যে Guthhere) সিগুর্ড-আখ্যায়িকার আছে যে Gunnar গুন্নার নিজ সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত হূণ-রাজ Atli আট্‌লির হাতে নিহত হন; এবং ইতিহাসে আমরা পাই যে ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা Gundicarius নিজ সমগ্র কুল বা জাতির সহিত হূণদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। Nibelungen Lied-এ Gudrun-এর নাম নাই, এই বইয়ে Gunther অর্থাৎ গুন্নারের ভগ্নীর নাম Kriemhild: স্কান্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত আখ্যানে মাতার Grimhild নাম জরমানীতে প্রচলিত আখ্যানে Kriemhild-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ও কন্যার নাম রূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং মাতার অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

গিউকি ও গ্রিমহিল্ডের তিন সন্তান, দুই পুত্র Gunnar গুন্নার্ ও Hogni হোগনি, এবং এক কন্যা Gudrun গুডরুন্। গ্রিমহিল্ডের পূর্ব্ব স্বামীর এক পুত্র Guttorm গুটোর্ম্ গিউকির আশ্রয়ে-ই পালিত হইত।

স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাজকুমারী M. E. Winge

রাণী গ্রিমহিল্ড বিশেষ অভিসন্ধিময়ী রমণী ছিলেন। সিগুর্ডের মত বীর যুবককে দেখিয়া তাঁহার বাসনা হইল যে তাহার সহিত নিজ কন্যা গুডরুনের বিবাহ দেন। পর্ব্বতোপরি অগ্নিবেষ্টিত প্রাসাদে অবস্থিতা দেবকুমারী ব্রুন্‌হিল্ডকে সিগুর্ড কত গভীর ভাবে ভালবাসে, তাহা গ্রিমহিল্ড বহুবার ব্রুনহিল্ডের সম্বন্ধে সিগুর্ডের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সিগুর্ডের মনের পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যাদুবিদ্যা জানিতেন। ব্রুন্‌হিল্ডের কথা ভুলাইয়া দিবার জন্য তিনি মন্ত্র-পূত সুরা প্রস্তুত করিয়া সিগুর্ডকে পান করিতে দিলেন, বিস্মৃতচিত্ত সিগুর্ড তাহা পান করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রুন্‌হিল্ডের সমস্ত কথা তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। মন্ত্র-চালিত হইয়া সে গ্রিমহিল্ডের বশ্যতা স্বীকার করিল

ইহার পরে যখন রাজকুমারী গুডরুন্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মাতা ও পিতার নির্দ্দেশ-মত গুন্নার সিগুর্ডের নিকট প্রস্তাব করিল, সিগুর্ড তখন সহজেই সম্মত হইল। গুন্নার ও হোগনি সিগুর্ডের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হইবার জন্য তাহার সহিত রক্ত-সম্বন্ধ পাতাইল—তাহারা যেন এক মায়ের পেটের ভাই হইল—তিন জনে এক চাবড়া মাটি কাটিয়া একটী ঢালের উপরে রাখিল, এবং সেই ঢালের নীচে তিন জনে দাঁড়াইয়া, নিজ নিজ দক্ষিণ হস্ত হইতে একটু করিয়া রক্ত লইয়া মাটীর মধ্যে কাটা গর্ত্তে ফেলিল, পরে তিন জনে চির-মিত্রত্বে বদ্ধ হইবার শপথ করিল, এবং মাটীর চাবড়াটি যথাস্থানে তিন জনের মিশ্রিত রক্তের উপর স্থাপিত করিল।—এই ভাবে তাহারা রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করিল।

গুডরুনের সহিত সিগুর্ডের যথারীতি বিবাহ হইল—নিবলুঙ্গ-জাতির মধ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। সিগুর্ড এখন যেন কতকটা কলের পুতুল—গ্রিমহিল্ডের মন্ত্র-পূত সুরা তাহাকে বদলাইয়া দিয়াছে। সে তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত সুন্দরী রাজকুমারী গুডরুন্‌কে পত্নী-রূপে পাইয়া খুশীই হইল—ব্রুন্‌হিল্ডের কথা তাহার কিছুই মনে রহিল না।

কিছুকাল পরে গ্রিমহিল্ড নিজ পুত্র গুন্নার্‌কে বলিলেন—"এখন তো সবই বেশ হ'ল, সিগুর্ডকে পাওয়া গেল; কিন্তু তোমার বিবাহ করা চাই। পাহাড়ের উপরে দেবকুমারী ব্রুন্‌হিল্ড র'য়েছে; তুমি গিয়ে তাকে বিবাহ করবার চেষ্টা কর; সিগুর্ড সওয়ার হ'য়ে তোমার সঙ্গে যাবে, তোমায় সাহায্য ক'রবে।"

গুন্নার বলিল—"শুনেছি তো ব্রুন্‌হিল্ড অসামান্য সুন্দরী, তেজস্বিনী; তাকে বিয়ে ক'রতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য হবে।" সে ব্রুন্‌হিল্ডকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সিগুর্ডের পরামর্শ চাহিল। আত্ম-বিস্মৃত সিগুর্ড তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

দলবল লইয়া Hindfell হিণ্ডফেল্-এর পর্ব্বতে গুন্নার্ গেল, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গুন্নার আগুয়াইতে পারিল না—তাহার এবং তাহার অশ্বের সাধ্য হইল না যে অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া ভিতরে যায়। গুন্নার তখন সিগুর্ডের

ঘোড়া লইয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু নিজ প্রভু সিগুর্ড ভিন্ন অন্য লোককে পিঠে চড়ায় সিগুর্ডের ঘোড়া নড়িতে চাহিল না। শেষে গুন্নারের অনুরোধ মত সিগুর্ড গুন্নারের সহিত পোষাক বদলাইল, এবং গুন্নারের বেশ ধরিয়া গুন্নারের হইয়া ক্রন্‌হিল্ডকে জয় করিতে চলিল। সিগুর্ডের জুতার সোনার কাঁটার ঘা খাইয়া তাহার ঘোড়া আগুনের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল ; ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত আগুন দ্বিগুণ তেজে জলিয়া উঠিল, ভূমি কম্পিত হইল, অগ্নিশিখা আকাশে গিয়া ঠেকিল ; কিন্তু সিগুর্ড না দমিয়া এই অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া ক্রন্‌হিল্ড যেখানে বসিয়াছিল সেখানে আসিয়া পঁহুছিল।

ক্রন্‌হিল্ড জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি ?"

পূর্ব্ব-কথা সিগুর্ডের মনে নাই—সে মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলিল যে সে গিউকি রাজার পুত্র গুন্নার, অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়াছে ; ক্রন্‌হিল্ড যে প্রচার করিয়া দিয়াছিল, যে অগ্নি-প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাকে জয় করিবে তাহাকেই সে বিবাহ করিবে, তদনুসারে সে ক্রন্‌হিল্ডের পাণি-প্রার্থী।

ক্রন্‌হিল্ড গুন্নারের বেশে সিগুর্ডকে চিনিতে পারিল না, তাহারও যেন মতিভ্রম হইল। শুধু সে বলিল—"তোমার কথার কি উত্তর দেবো ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পারছি না।" তাহার মনে সংশয় জাগিতেছিল, সিগুর্ড-ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই প্রাচীর ভেদ করিয়া আসা তো সম্ভব নয়, তবে এ কে আসিল ?

গুন্নার-বেশী সিগুর্ড বলিল—"তুমি আমাকে বিবাহ ক'র্‌বে না ? নানা ধনরত্ন স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদির বিরাট যৌতুক দিয়ে তোমার বিবাহ ক'রে নিয়ে যাবো।"

ক্রন্‌হিল্ড মাথায় শিরস্ত্রাণ, গাত্রে কবচ ও হস্তে তরবারী লইয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিল। সংশয়পূর্ণ হৃদয়ে উপবিষ্টা অবস্থায় সে উত্তর দিল—তাহার ভঙ্গী হইল যেন জলের তরঙ্গের উপরে দোদুল্যমানা রাজহংসী—"গুন্নার, ধনরত্নের কথা ব'লো না। সোনা দিয়ে আমার মন ভুলিয়ে আমায় নিয়ে যেতে পারবে না, যদি তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ হও, নর-শ্রেষ্ঠ হও, তবেই তোমার সঙ্গে যাবো। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সবাইকে বধ ক'রে আমায় নিয়ে যেতে হবে—তুমি পারবে ? আমি গ্রীকদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলুম, আমাদের অস্ত্র রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছিল—লড়াইয়ের জন্য আমি পাগল।"

সিগুর্ড তখন বলিল—"হাঁ, তুমি বীরাঙ্গনা বট, বীরের উচিত কার্য্য দেখিয়েছ। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার কথা-মত যে অগ্নি-প্রাচীর পেরিয়ে এসে জন-সমাজে তোমাকে পত্নী ব'লে দাবী ক'র্‌বে, তাকেই তো তোমায় পতি ব'লে মান্‌তে হবে।"

ক্রন্‌হিল্ড অগত্যা উঠিয়া গুন্নার-বেশী সিগুর্ডকে অভিবাদন করিল, এবং যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিল। সিগুর্ড অগ্নি-প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদে তিন রাত্রি অবস্থান করিল, কিন্তু সে গুন্নারের হইয়া ক্রন্‌হিল্ডকে জয় করিতে আসিয়াছে, সে কথা তাহার মনে ছিল, তিন রাত্রি ক্রন্‌হিল্ডের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু মাঝে ব্যবধান-স্বরূপ তরবারি রাখিল। ক্রন্‌হিল্ড এই "অসিধার-ব্রত" পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সিগুর্ড বলিল এই ভাবে তাহার স্ত্রীর সহিত প্রথম তিন রাত্রি যাপন না করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।

তার পরে ক্রন্‌হিল্ড সিগুর্ডের প্রদত্ত আন্দবারির আঙটী লইয়া গুন্নার-রূপী সিগুর্ডকে অর্পণ করিল ; সিগুর্ডও তাহাকে আর একটী আঙটী দিল।

ক্রন্‌হিল্ড প্রতিশ্রুতি দিল যে সে গুন্নারকে বিবাহ করিবার জন্য নয় দিনের মধ্যে আসিবে। সিগুর্ড পুনরায় আগুনের মধ্য দিয়া গিয়া গুন্নারের সহিত মিলিত হইয়া গিউকির নগরে ফিরিয়া আসিল।

সিগুর্ড চলিয়া গেলে, ক্রন্‌হিল্ড তাহার বিশ্বস্ত এক বৃদ্ধের নিকটে গেল : এই বৃদ্ধের নাম Heimir হেইমির। তাহাকে বলিল—"এক রাজা আমায় বিবাহ করিবার জন্য আসিয়াছিল ; আমার প্রাসাদের পরিবেষ্টন শিখাময় অগ্নিমালা ঘোড়ায় চড়িয়া পার হইয়া সে আমার নিকটে আসিল, আমায় বলিল যে আমাকে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে, এবং গুন্নার নামে নিজ পরিচয় দিল। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই জানি যে এক-মাত্র সিগুর্ড-ই এই বীরকার্য্য করিতে সমর্থ, আর কেহই নহে ; এই সিগুর্ডের সঙ্গেই পূর্ব্বে আমি বাগ্‌দত্তা হইয়াছি, আমি তাহারই ধর্ম্ম-পত্নী, সেই আমার প্রিয়তম।"

ক্রন্‌হিল্ডের মনে মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, গুন্নার নামে যে আসিয়াছিল সে সিগুর্ডই বটে। অথচ জটিল ঘটনা-চক্র তাহার বোধ-বিচারের অগম্য। সে সিগুর্ডের কন্যা আস্‌লা-উগকে লালন-পালনের জন্য হেইমিরের হাতে সমর্পণ করিয়া যেন নিয়তির আকর্ষণে গিউকির নগরে গিয়া উপস্থিত হইল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

নিশির ডাক

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
রাত্রিটা দেখ, ঘুমন্ত চোখে কি যেন কাহিনী বলে,
অশ্রু তাহার করে ঝিক্‌ঝিক্ নিথর গাঙের জলে!
দ্বাদশীর চাঁদ ঢলে পশ্চিমে শিরীষসারির ফাঁকে,
দূরে বালুচর চাঁদের আলোয় হাতছানি দিয়ে ডাকে,—
চারিদিক নিঃঝুম,
অজানা পাখীর ডানার ঝাপটে আকাশের ভাঙে ঘুম!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
বাতাসে ভাসিয়া এল বুঝি কার ব্যথাভরা নিশ্বাস,
কার এলোচুলে এখনো কাঁদিছে হারাণো মালার বাস—
কে যেন খুলিয়া ফেলেছে নূপুর, হাতের কাঁকন দুটি,
আঁধারের বুকে কে গো অভিমানে মাটিতে পড়েছে লুটি',
কৃষ্ণচূড়ার তলে
ঝরাফুলে কে গো মুছেছে সিঁদুর শিশির-অশ্রুজলে!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
নিশীথবাতাস পথ ভুলে যায় বেউড়-বাঁশের ঝাড়ে,
থেকে থেকে তার আকুল কাকুতি কাঁদিছে অন্ধকারে,—
কোথা কতদূরে মাঠের ওপারে জলে আলেয়ার আলো,
দীঘির কিনারে দেবদারুসারি হ'য়ে গেছে আরো কালো,
চারিদিক নির্জ্জন,
থম্‌থমে রাতে ঝম্ ঝম্ করে শ্মশানে তালের বন!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
ঐ শোন দূরে দিশাহারা পথে কে যেন কাঁদিয়া ওঠে,
কার নিরক্ত তৃষাতুর ঠোঁটে বেদনার বাণী ফোটে!
মাঠে মাঠে ঘোরে কোন্-সে পাগল ঘূর্ণিহাওয়ার সাথে
সোঁদালের বনে দেয় করতালি তন্দ্রা-নিশুতি রাতে!
ধরা সম্বিৎ-হারা,
কালপুরুষের অসির ফলকে কেঁপে ওঠে নীলতারা!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
আড়ি পেতে কা'রা চুপিচুপি যেন ফেলিতেছে নিঃশ্বাস,
ঝিল্লী-নূপুরে ধরা পড়ে যায় কুতূহলী উল্লাস!
বকুল-বীথিতে কা'দের সিঁথিতে জোনাকি-মাণিক জ্বলে,
সাড়া পেয়ে কা'রা বনের আড়ালে মুখ ঢেকে ছুটে চলে।
নিশীথিনী-অন্তরে
কৌতুকভরা কলহাসি শুধু জাগে বনমর্ম্মরে!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
সপ্ত-ঋষির শিয়রে কাঁদিছে বন্দিনী ধ্রুবতারা,—
কার পথ চাহি' অনিমেষ আঁখি আজো ফেরে দিশাহারা!
আকাশ-গঙ্গা মথি' চলে কোন্ সাহসিকা অপ্সরী
লীলার ছন্দে খসে মণিহার উল্কার রূপ ধ'রি'!
কোন্ সে অলকাপুরে
রতন-নূপুর ছিঁড়িছে কাদের গগন-পথটি জুড়ে'!

চাঁপার গন্ধ আরো যে নিবিড় হ'ল,—
খোল বধূ, দ্বার খোল!
বিবশা ধরণী উতলা রজনী মহুয়া ফুটেছে বনে,—
আজিকার রাতে ঘুমায়ো না বধূ, পুরাতন গৃহকোণে!
ফাগুনোৎসবে আনিয়াছি লিপি তোমারি আমন্ত্রণ,
রূপময়ী নিশা ডাকিছে তোমার রূপময় যৌবন!
সাড়া দাও একবার,—
চাঁপার গন্ধ হয়েছে নিবিড়, খোল বধূ, খোল দ্বার!

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই। গরম কাপড়ের বাণ্ডিলটা প্রথম যে দিন সে বিক্রি করিতে যায় দোকানদার সেদিন তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। দোকানদারের দোষ নাই। শ্রীহর্ষের হাতে অত দামী কাপড় দেখিলে তাহাকে চোর ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে দিন সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বাড়ীখানি তাহার দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই আজ আর তাহাকে শুধু হাতে ফিরিতে হইল না।

টাকা লইয়াই শ্রীহর্ষ বাড়ী ফিরিতেছিল; ফটক পার হইয়া বাগানের মাঝামাঝি আসিয়াছে, এমন সময় দেখিল, সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে সারদা তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে।

শ্রীহর্ষকে আসিতে দেখিয়া তাহারা একটুখানি পাশ কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহাদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার এসেছিস?'

সারদা কোনও কথা বলিল না। সঙ্গের মেয়েটি বোধ করি তাহার বোন্‌-ঝি। সে-ই জবাব দিল। বলিল, 'মাইনে নিতে এসেছিনু বাবু, চুরি করতে আসিনি।'

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া শ্রীহর্ষ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মাইনে কিসের? মাইনে! পুলিশে দিই নি এই তোদের বাবার ভাগ্যি, তার ওপর আবার মাইনে! মাইনে আমি দেবো না, পারিস ত নালিশ করে' আদায় করে' নিগে যা।'

মেয়েটি বলিল, 'না বাবু, মাইনে আমরা পেয়েছি। মিছে কথা বলবার মানুষ আমরা নই।'

'মাইনে পেয়েছিস? কোথায় পেলি?'

'গিন্নি-মা'র কাছে নিয়ে এনু।'

শ্রীহর্ষ তাহাদের আর কোনও কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া সরাসর উপরে উঠিয়া গেল। উমা তখন তাহার মেয়েকে খাটের উপর বসাইয়া নিজে নীচে দাঁড়াইয়া খেলা করিতে করিতে তাহাকেও হাসাইতেছিল, নিজেও হাসিতেছিল।

রুক্ষ কণ্ঠে শ্রীহর্ষ ডাকিল, 'এই!'

পিছন ফিরিতেই স্বামীর মুখের চেহারা দেখিয়া হাসি তাহার সহসা বন্ধ হইয়া গেল। বলিল, 'কি?'

'আমার টাকা চুরি করেছ?'

'টাকা?' ঘাড় নাড়িয়া উমা বলিল, 'না। কোথায় ছিল তোমার—'

কথাটা শ্রীহর্ষ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, তৎক্ষণাৎ একখানা হাত তাহার চাপিয়া ধরিয়া উল্টা দিকে মুচড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'এখনও বল্‌ বলছি সত্যি কথা, নইলে কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি।'

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উমা বলিল, 'আঃ, এ কি করছ? ছাড়ো না! লাগে, লাগে, উঃ! সত্যি বলছি, টাকা আমি তোমার নিই নি। কি হয়েছে তাই বল না খুলে।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'টাকা তুই পেলি কোথায়? নিসনি ত' কি রোজগার করে' এনেছিস? কত টাকা নিয়েছিস বল্‌ নইলে এ হাত আমি তোর ভেঙ্গে ফেলব।'

মা'র অবস্থা দেখিয়া মেয়েটা ওদিকে কাঁদিতে কাঁদিতে তখন একেবারে খাটের কিনারে আসিয়া হাত বাড়াইয়াছে। উমার হাতখানা ছাড়িয়া না দিলে মেয়েটা ঐ উঁচু খাট হইতে পড়িয়া যায় দেখিয়া শ্রীহর্ষ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মালতীকে তৎক্ষণাৎ কোলে তুলিয়া লইয়া উমা বলিল, 'টাকা তোমার কোথায় থাকে আমি আজ পর্য্যন্ত তাও জানিনে। গেছে কিনা আগে গুণে ছ্যাখোগে, তারপর আমায় বোলো।'

মুখ ভ্যাংচাইয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'গুণে ছ্যাখোগে! একটি দুটি টাকা কিনা···কিছু জানে না যেন! ছ্যাকা! না নিয়েছিস ত' সারদাকে দিলি কোত্থেকে শুনি?'

সারদাকে সে যে পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহারই কাছে টাকার কথা শুনিয়া আসিয়া স্বামী যে তাহাকে এরূপ করিতেছে, এতক্ষণ পরে উমা তাহা বুঝিতে পারিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাই বল! ও টাকা পাঁচটির কথা তোমায় কোন দিন বলব না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ তাও বলতে হলো। চপলা-ঠাক্‌রুণের বাড়ী থেকে যে দিন আমরা আসি, ঠাক্‌রুণের ভাড়ার দরুণ পাঁচটি টাকা

তুমি তাকে দিয়েছিলে মনে আছে? সে টাকা ঠাকরুণ নেয় নি; আমারই আঁচলের খুঁটে বেঁধে দিয়ে বলেছিল, মালতীকে দুধ খাওয়াস্। সেই পাঁচটি টাকা আমি আর কিসে খরচ করব, কাছেই ছিল। সারদা গরীব মানুষ, মাইনে না পেলে শাপ-শাপান্ত করবে, ভাবলাম তাতে আমাদের অমঙ্গল হ'তে পারে, তাই তোমাকে না জানিয়ে সেই টাকা পাঁচটি সারদার বোন-ঝির হাতে দিয়ে বললাম, যাও মা, যা হবার তা হয়ে গেছে, এর জন্যে তোমরা যেন আর গাল-মন্দ দিয়ো না।—এই ত' ব্যাপার! এরই জন্যে হাতটা তুমি আমার মুচ্‌ড়ে দিলে? উঃ! সত্যি বলছি, এখনও লাগছে।'

এই বলিয়া উমা আবার একটুখানি হাসিল।

হাসিয়া তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'আচ্ছা, সত্যি যদি আমি দু' একটা টাকা তোমার নিই তা হ'লে তুমি কি আমায় এমনি করে' মারবে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না বলে' নিলে কিন্তু সত্যি আমি রেগে যাব। জানো ত' আমার রাগ ভারি খারাপ।'

উমা বলিল, 'কিন্তু কি লাভ? এমন করে' টাকা তোমার জমিয়ে রেখে কি হবে গো?'

কথাটা সে এমন ভাবে বলিল যে, তাহার উত্তরে কঠিন ভাবে জবাব দেওয়া শ্রীহর্ষের পক্ষে সম্ভব হইল না। সে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

উমা বলিল, 'নাও আর দেরি কোরো না, খাবার হয়ে গেছে। চান-টান করবে ত' ওঠো।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'বাবাঃ, এই শীতে চান!'

'তা বেশ, তা হ'লে কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে খাবে এসো।'

শ্রীহর্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না, তোমার একটা নতুন ঝি আমি আগে এনে দিই।'

উমা বলিল, 'তোমার পায়ে পড়ি লক্ষীটি, ঝি তুমি আর এনো না। আনলেও আমি রাখব না, এবার থেকে নিজেই যা পারি করব। শুধু বাজারটা যাওয়া আমার দ্বারা হবে না, তাছাড়া সবই পারব।'

শ্রীহর্ষ বুঝিল ইহা তাহার রাগের কথা। বলিল, 'ঝি না হ'লে তোমার কষ্ট হবে।'

উমা তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'আমার কষ্ট তুমি বোঝো?'

'বাঃ, তা বুঝি না?'

উমা বলিল, 'বেশ, তাহ'লে লোকে যাতে আমাদের অভিশাপ দেয় তেমন কাজ তুমি কোরো না। তাতে আমার বেশি কষ্ট হয়।'

কিন্তু যাহার যা স্বভাব সে তাহা ছাড়িবে কেন?

ঝি না আসিয়া এবার ক্রমাগত চাকর আসিতে লাগিল। এক একটা আসে, দিনকতক বেশ কাজকর্ম্ম করে, তাহার পর হঠাৎ একদিন দোষ ধরিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর আবার আর একটা আসে বেতন তাহাদের কাহাকেও শ্রীহর্ষ দেয় না।

উমার মনে সুখ শান্তি কিছুই নাই। এত বড় যে বাড়ী, স্বামীর যে তাহার এত ঐশ্বর্য্য, এত টাকা, তবু তাহার দিবারাত্র মনে হয়—স্বামীর ব্যবহারে কে কোথায় তাহাদের অভিশাপ দিয়া গেল, কে কোথায় গোপনে অশ্রুপাত করিল কে জানে! এবং তাহার জন্য মনে-মনে এক-একদিন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াই উমা তাহার স্বামীকে উপদেশ দিবার চেষ্টা করে, মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বলে, 'চিরকাল বাঁচব বলে' ত' আমরা আসিনি, হ্যাঁগা, এমনি করে' হঠাৎ যদি কোনোদিন মরে যাই ত' দেখো তোমার আফ্‌শোষের আর সীমা থাকবে না।'

কিন্তু শ্রীহর্ষের তীব্র তিরস্কারে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে চুপ করিতে হয়।

মেয়েটার এতটুকু অসুখ করিলে উমা একেবারে উন্মাদিনীর মত ছট্‌ফট্ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। ভাবে বুঝি মেয়েটা আর বাঁচবে না। বিনা দোষে স্বামী তাহার কত লোককে কাঁদাইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে হয়ত তাহারা অভিশাপ দিয়াছে, এবং সে অভিশাপ বুঝি এম্‌নি করিয়াই ফলিয়া যাইবে।

এক-একবার মনে হয়—স্বামীর কিছু টাকা সে চুরি করিবে, চুরি করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিবে। সারদা ঝিকে যেমন করিয়া বিদায় করিয়াছে তেম্‌নি করিয়া গোপনে

সে সকলকেই বিদায় করিবে, তাহা হইলে অভিশাপ কেহ আর দিতে পারিবে না।

কিন্তু চুরি করিবার কথা সে মনেই করে মাত্র, কাজে সে কিছুতেই করিতে পারে না। উমা তাহার জীবনে মিথ্যা কথা কখনও বলে নাই, বলিতে গেলেই মনে হয় যেন সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছে, মনের মধ্যে তাহার সব কিছু যেন গোলমাল হইয়া যায়, সত্য কথাটা সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলে। একবার একটা পাথরের বাটি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, আর একবার তাহার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে চার-পাঁচটা কাঁচের গ্লাস একসঙ্গে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কাহাকেও কিছু না বলিলেও চলিত। দু'দিন সে চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু তিন দিনের দিন অপরাধ গোপন করিবার গ্লানি সে আর সহ্য করিতে পারে নাই, অপরাধ স্বীকার করিয়া তবে যেন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

সুতরাং চুরি অমনি করিব বলিলেই হয় না, চুরি করিয়া আবার যদি সেকথা তাহাকে বলিয়াই ফেলিতে হয় ত' চুরি করিয়া লাভ নাই।

কাজেই এখন সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।—যা হবার তাই হোক্!

শুধু যে ঝি-চাকরের বেলাই শ্রীহর্ষ কৃপণ করে তাহা নয়, এমনিই তাহার স্বভাব।

বাজারের জিনিষপত্র সে নিজেই কিনিয়া আনে অন্য কাহাকেও তাহার বিশ্বাস হয় না।

পাড়াপড়শী সকলেই প্রায় জানিয়াছে যে, শিবপদ বাবুর ওই অতবড় বাড়ীখানা তিনি শ্রীহর্ষকে দান করিয়া গেছেন। অথচ ওই অতবড় বাড়ীর মালিক শ্রীহর্ষই যখন বাটি হাতে লইয়া দোকানে জিনিষ কিনিতে যায়, দোকানদার বলে, 'আপনি নিজে কেন এলেন বাবু, চাকর পাঠিয়ে দিলেই ত' হ'তো।'

শ্রীহর্ষ বলে, 'এ ব্যাটা চাকরও আবার কোথায় পালিয়েছে নিতাই, ভাল চাকর একটা পাচ্ছি না কোথাও।'

বলিয়াই সে তেলের দর করিতে বসে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, 'সরষের তেলটা কি তুমি মিল্ থেকে নাও না বাজারের মহাজনদের কাছ থেকে টিনবন্দি কিনে আন?'

নিতাই বলে, 'আজ্ঞে না, বাজার থেকে কিনলেও তেল খুব ভালো, এক আধটিন আপনি নিয়ে দেখতে পারেন।'

''দরটা কি রকম শুনি?'

নিতাই বলে, 'ষোল টাকা মণ আমার কেনা পড়েছে বাবু, তা আপনি ওই ষোল টাকাই দেবেন খারাপ হয় আমি ফেরত নেবো।'

শ্রীহর্ষ চোখ বুজিয়া মনে মনে হিসাব করিতে থাকে।

নিতাই বলে, 'কত দেবো বাবু, এক মণই পাঠিয়ে দেবো কি?

শ্রীহর্ষ তাহার হাতের বাটিটি আগাইয়া দিয়া বলে, 'আড়াই পোয়া দাও। দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক আছে ত নিতাই? তোমাদের বিশ্বাস নেই বাবা, দাম হয়ত ঠিকই বলেছ, কিন্তু ওজনে মেরে দিওনা দেখো।'

একমণ হইতে আড়াই পোয়া! নিতাইয়ের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। অবাক্ হইয়া গিয়া নীরবেই সে বাটিটা ওজন করিয়া তাহার উপর তেল ঢালিয়া দেয়।

শেষে এমন হয় যে, পাড়ার দোকানদারেরা শ্রীহর্ষকে আর জিনিষ দিতে চায় না। যাহা চায় তাহাই বলে, 'বাবু ফুরিয়ে গেছে।'

এমনি করিয়া পাড়াপড়শী কাহারও আর তাহাকে চিনিতে বাকি নাই! কেহ-বা ভাবে লোকটা কৃপণ, আবার কেহ-বা ভাবে, কপালগুণে ওই বাড়ীখানা মাত্র সে কোনরকমে পাইয়া গেছে, তাহা ছাড়া লোকটার পয়সাকড়ি কিছুই নাই। আহা, বেচারা পাইবেই বা কোথায়?

পাশের বাড়ীর বুড়া বৈকুণ্ঠ সাজি হাতে লইয়া অতি প্রত্যূষে শিবপদ বাবুর বাগানে আগে যেমন ফুল তুলিতে আসিত এখনও তেমনি আসে। তবে আগে যেমন ফুল তুলিতে আসিয়া শিবপদ বাবুর বৈঠকখানায় এক পেয়ালা চা খাইত এখন অবশ্য তাহা বন্ধ হইয়াছে। চাও পাওয়া যায় না, ফুলগাছের যত্নও আর নাই। ভাল ভাল ফুলের গাছগুলি জল অভাবে শুকাইয়া মরিয়া গেছে, তাহার জায়গায় উঠিয়াছে অযত্নবর্দ্ধিত অতসী আর নাক-কাটা হরগৌরি ফুলের গাছ। বৈকুণ্ঠর বাড়ীতে নিত্য নারায়ণের পূজা। ভাল ফুলেও যেমন পূজা হইত, এখন খারাপ ফুলেও ঠিক তেমনি পূজা হয়।

পাথরের ঠাকুরের আপত্তি কিছুতেই নাই। তবু সে প্রত্যহ শ্রীহর্ষকে একবার করিয়া উপদেশ দিয়া যাইতে ছাড়ে না।

বলে, 'এবার বর্ষায় ভাল ভাল গোটাকতক ফুলের গাছ এনে বাগানটায় পুঁতো বাবা, গাছে ফুল ফুটলে জায়গাটার শোভাও বাড়ে, আমাদের মত গরীব দুঃখীর উপকারও করা হয়।'

শ্রীহর্ষ বলে, 'আমি মনে করছি ওখানে তরি-তরকারির গাছ লাগাব।'

মহা উৎসাহিত হইয়া বুড়া বৈকুণ্ঠ তাহার পাকা পাকা দাড়ি নাড়িয়া বলে, 'বেশত বেশত' সে আবার আরও ভাল। নিয়ে যাচ্ছিলাম ফুল, না তার বদলে নিয়ে যাব দুটো লাউ, দুটো কুমড়ো.........'

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে শ্রীহর্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বাড়ীটার পানে একবার তাকাইয়া বলে, 'তোমরা ত' বাবাজি দু'জন মাত্র মানুষ, ক'খানাই বা ঘরের দরকার! বাকিটা তুমি ত' অনায়াসে ভাড়া দিতে পারো। মাসে মাসে কিছু আসে তাহ'লে।'

শ্রীহর্ষ বলে, 'বাড়ীটা বিক্রি করে ফেলব ভাবছি। এত বড় বাড়ীর আমার কোনও দরকার নাই।'

বৈকুণ্ঠ ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না বাবাজি, ও-কাজ তুমি কোরো না, ঠক্‌বে। বুড়োর কথা শোনো।'

'কেন বলুন দেখি?'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'কলকাতার জায়গার দর দিনে দিনে কি রকম বাড়ছে দেখছ ত' বাবাজি, আমরা বয়েসকালে যা দেখেছি এখন তার পঞ্চাশ গুণ বেড়েছে। যত দিন যাবে তত আরও বাড়বে। কিছু দিন চুপ করে' বসে থাক বাবা, তখন বুঝবে যে, হ্যাঁ, বুড়ো বৈকুণ্ঠ বলেছিল বটে।'

কথাটা শ্রীহর্ষের মনে ধরিয়া গেল। বুড়া মিথ্যা বলে নাই।

পরদিন সকালে দেখা গেল, শিবপদবাবুর লোহার ফটকে ঘর ভাড়া দিবার নোটিশ ঝুলিতেছে। নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া হইবে শুনিয়া উমা অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। যাক্, এতদিন পরে দুটা মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে। লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া বাঁচিবে।

কিন্তু ভাড়া লইবার জন্য যাহারা আসে ঘর দেখিয়া পছন্দ হইলেও ভাড়ার অঙ্ক শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া যায়। ভাড়া কমাইতে শ্রীহর্ষ রাজি নয়। বলে, 'রাজার মতন থাকবেন মশাই, কিরকম বাড়ীখানা দেখুন আগে, ভাড়া শুনেই চম্‌কে উঠলেন যে?'

চম্‌কাইবার কথাই।

উমা বলে, 'তাই বাপু একটু কমিয়েই বা বলছ না কেন?'

শ্রীহর্ষ বলে, 'তুমি মেয়েমানুষ, তুমি চুপ কর না!'

উমা সরিয়া দাঁড়ায়।—নীচে একটি বাবু আসিয়াছেন।

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দরকার? বাড়ী ভাড়া নেবেন?'

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না। শুনলুম এ-বাড়ী আপনি বিক্রি করবেন···'

শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'করব।'

'ক' কাঠা জায়গা আছে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'সে সব জানিনে মশাই, এই বাড়ী ঘর বাগান—সবই ত' দেখতে পাচ্ছেন।'

তাহার এই বাড়ী পাইবার ইতিহাস তিনি শুনিয়াই আসিয়াছেন। তাহার উপর যে-লোক কয় কাঠা জমির উপর বাড়ী—তাহা জানে না, তাহাকে হয়ত' ফাঁকি দেওয়া সহজ। তাহা ছাড়া শ্রীহর্ষের চেহারাটাও বাড়ীর সঙ্গে কেমন যেন খাপ্ খায় না।

ভদ্রলোক বলিলেন, 'চলুন একটু ভাল করেই কথাবার্ত্তা বলা যাক্, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুবিধে হবে না।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'চলুন।'

বলিয়া তাঁহাকে নীচের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। শিবপদবাবুর সেই বসিবার ঘর। সেই চেয়ার, সেই টেবিল—সবই আছে। সেই আর্শী, সেই তসবির এখনও দেওয়ালের গায়ে তেমনি টাঙ্গানো। লোকজন কেহ বসে না বলিয়া আসবাবপত্রে ধূলা জমিয়াছে।

তা জমুক্। আগন্তুক তাঁহার ফর্সা কাপড় জামা পরিয়াও সেই ধূলার উপরেই ভাল করিয়া চাপিয়া বসিলেন, 'আমার নাম বোধ হয় শুনেছেন? আমার নাম—সুবোধ মল্লিক। এই ত' পাড়াতেই থাকি, কাছেই বাড়ী।'

বোকার মত শ্রীহর্ষ তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'ও।'

কিন্তু এতদিন এ পাড়ায় আসিয়াছে এখনও সে সুবোধ মল্লিককে চেনে না শুনিয়া সুবোধবাবু বোধকরি একটুখানি বিস্মিত হইলেন।

পকেট হইতে রূপার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া নিজে একটি সিগারেট মুখে দিয়া কেসটা তিনি শ্রীহর্ষের দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'নিন্।'

শ্রীহর্ষ কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

তার পর সিগারেট ধরাইয়া আবার দুজনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

সুবোধবাবু আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন, 'ওই যে হরিনাথ সিংহি লেনে যতগুলো বাড়ী দেখছেন, ওখানে প্রায় অধিকাংশ বাড়ীই আমার।'

বলিয়াই একটুখানি কাশিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, 'এই বাড়ী কেনা-বেচার কারবার আমাদের তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। আমার ঠাকুরদা করে' গেছেন, বাবা করেছেন, তারপর আবার আমি করছি। যাক্ সে কথা। এখন আপনার সঙ্গে পরিচয়টা হোক্। শিবপদবাবুর সঙ্গে এক একদিন সন্ধ্যায় আপনিও বেরোতেন দেখতাম। সেই তখন থেকেই আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। কতদিন ভেবেছি পরিচয় করি, কিন্তু হঠাৎ গায়ে পড়ে পরিচয় করতে এলে আপনি কি মনে করবেন ভেবে আর পারিনি।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না না মনে আর কি করতাম···দেখুন দেখি।'

সুবোধবাবু বলিলেন, 'অল্ রাইট্, তাহ'লে আজ সন্ধ্যেয় আমার বাড়ী আপনার নেমন্তন্ন। এখন আমি উঠি।'

বলিয়া সুবোধবাবু সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পকেট হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া শ্রীহর্ষের হাতের কাছে সেখানি নামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এতে আমার নাম-ঠিকানা সবই আছে। সন্ধ্যেয় আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব শ্রীহর্ষবাবু, না গেলে কিন্তু আমার ক্ষতি হবে, বুঝলেন ?'

কোথাও কাহারও আহারের নিমন্ত্রণ শ্রীহর্ষ আজ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তৎক্ষণাৎ সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যাব।'

কিন্তু কিসের নিমন্ত্রণ কৌশলে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। একবার একটা নিমন্ত্রণে সে ঠকিয়াছিল, সেই অবধি শ্রীহর্ষের শিক্ষা হইয়া গেছে। তাই সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'ক'টার সময় যাব বলুন ত ? বাড়ীতে আজ রাত্রির খাবার তাহ'লে বন্ধ করে' যেতে হবে, না কি বলেন ?'

সুবোধবাবু বলিলেন, 'খাবার ত' বন্ধ করবেনই, তাছাড়া বলেন ত' সন্ধ্যায় আমার গাড়ীটা আপনার এখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তাহ'লে বড় ভাল হয় সুধীর বাবু।'

সুবোধবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে না, সুধীরবাবু নয়, আমার নাম—সুবোধ মল্লিক।' বেশ তাই হবে। আমি গাড়ী পাঠিয়েই দেবো। আমার ওখানে আজ আপনার খাবার নেমন্তন্ন।

শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

শ্রীহর্ষ সাজগোছ করিয়া বসিয়া ছিল। সুবোধ মল্লিকের গাড়ী ঠিক সন্ধ্যায় আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। যাইবার সময় উমা বলিল, 'চট্ করে' এসো কিন্তু, আমি একা রইলাম।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আসব।'

সুবোধবাবুর গাড়ীও যেমন, বাড়ীখানাও ঠিক তেমনি। প্রকাণ্ড বাড়ী। চমৎকার সাজানো।

শ্রীহর্ষকে তিনি যে কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, কোথায় বসাইবেন কিছুই যেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে দোতলার যে নির্জ্জন ঘরে তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া বসিলেন, দেখা গেল, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর সে ঘরে প্রচুর। মার্ব্বেল পাথরের মেঝে, তাহার উপর দামী কার্পেট বিছানো, তাহার উপর প্রত্যেকটি আসবাবপত্র অত্যন্ত মূল্যবান। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যে কোথায় গিয়া পৌছিতে পারে শিবপদ বাবুর কল্যাণে শ্রীহর্ষ তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু সুবোধবাবু যেন তাঁহাকেও হার মানাইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বেয়ারা একটা ট্রে হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ট্রের উপর দামী বিলাতী মদের বোতল। দেখিয়া শ্রীহর্ষ কেমন যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুবোধবাবুর মুখের পানে তাকাইতেই তিনি হাতের ইসারায় বেয়ারাকে বিদায় করিয়া দিলেন। টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া দিয়া বেয়ারা চলিয়া গেল। সুবোধবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'আমি জানি এতে আপনার আপত্তি নেই।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কেমন করে' জানলেন ?'

'শিবপদ বাবুর সঙ্গে আপনাকে আমি খেতে দেখেছি একটা হোটেলে।'

শ্রীহর্ষ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর যাহা হইল সেকথা আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। সুবোধবাবু যে এরকম সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন শ্রীহর্ষ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কিন্তু নিরুপায় শ্রীহর্ষ তখন তাঁহার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীখানির এক নির্জ্জন কক্ষে ধরিতে গেলে এক রকম বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

মেরুপথে অসাধ্য সাধন

রুসিয়ার 'সিবিরিয়াকভ থার্ড' জাহাজ সেদিন মেরুপথে অসাধ্য সাধন করিয়া ফিরিয়াছে। রুসিয়ার আর্কএঞ্জেল হইতে উত্তর মেরুর তুষারস্তূপ ভেদ করিয়া অন্ততঃ তিন সহস্র মাইল পথ অতিক্রমের পর এ জাহাজ জাপানের না মানিয়া তিন মাসে এই তুষার-পথ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে- তাহাও আবার ইতিহাসে নাম রাখিবার জন্য নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধায় একটি সহজ পথের সন্ধানে। জাহাজে সব সমেত ৬৫ জন লোক ছিল,—উহার জন কয়েক বৈজ্ঞানিক এবং তিন জন স্ত্রীলোক। মেরু দেবতা অবশ্য জাহাজকে অনায়াসে
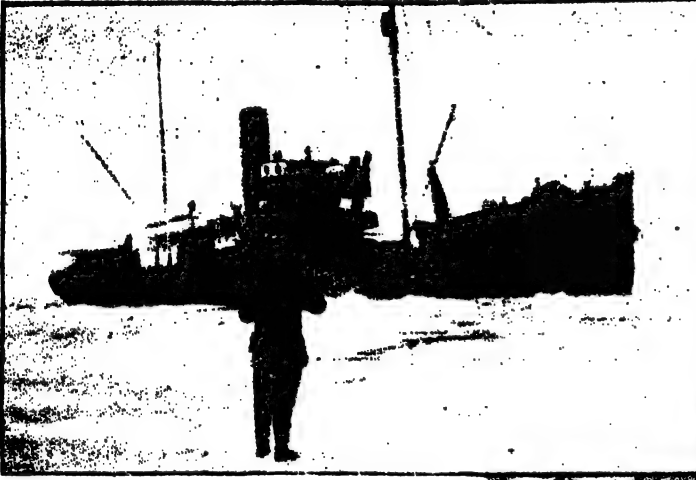
তিন হাজার মাইলব্যাপী মেরুপথ-জয়ী রুস জাহাজ সিবিরিয়াকভ থার্ড।

বরফের চাপে দড়ি বাঁধিয়া ভগ্নচক্র জাহাজকে তাহারই সাহায্যে জমাট তুষারস্তূপ ভেদ করিয়া টানা হইতেছে।

ইয়োকোহামা বন্দরে উপনীত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ পথে যত জাহাজ আসিয়াছে, অন্ততঃ শীতকালটি তাহাদিগের বরফের রাজ্যে কাটিয়াছে—চারি মাসে এ সময়ে বরফ এখানে এমন জমাট বাঁধে যে জাহাজের চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। 'সিবিরিয়াকভ থার্ড' সে বাধা নিষ্কৃতি দেন্ নাই—পথে ইহার দুইটি চাকাই চূর্ণ হইয়াছে। পাল খাটাইয়া, বরফের চাপে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-টুনিয়া জাহাজসমেত যাত্রী বুকে হাঁটিয়া এই যাত্রা সাঙ্গ করিয়াছে। এই ছবিতে জাহাজের এই দুরবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

অতিকায় দূরবীণ

পাশে জার্ম্মানির জেনাস্থিত জাইস্ কারখানার একাংশ দেখানো হইয়াছে। দৃশ্য দ্রব্যগুলি কামান নয়, পৃথিবীর নানা স্থানের পরীক্ষণাগারের জন্য

স্থূলাঙ্গী ও দীর্ঘাঙ্গী দূরবীণের জন্মভূমি-ত্যাগ।
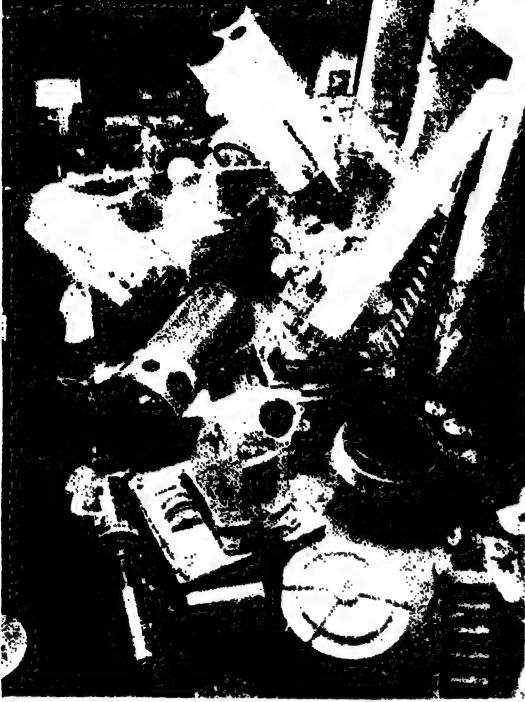
কয়েকটি অতিকায় দূরবীণ তৈয়ারী হইয়া আছে। পিছনে মোটর চোঙ্ দেখা যাইতেছে, মোটর ব্যাস হাতদেড়েক; বেলজিয়ামের ব্রুসেল্‌স অবজার্ভেটরিতে উহা প্রেরিত হইবে। সম্মুখের দীর্ঘাঙ্গীটি ফিলাডেল্‌ফিয়ার জাহাজে চড়িবেন।

দূরবীণ-চশমা

যাঁহারা জন্মান্ধ নন, কেবল চক্ষের কোন কঠিন পরিশ্রমের ফলে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন—তাঁহাদের জন্য এই দূরবীণ-চশমার সৃষ্টি। ইহাতে খুব জোরালো শক্তির পাথর আছে। শতকরা দুই মাত্রা দৃষ্টিশক্তিও যাঁহাদের অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাও এ চশমা পরিয়া সহজ কাজ-কর্ম্ম করিতে পারিবেন। আমেরিকার আকাডেমি অব অপ্‌টোমেট্রিতে ইহা পরীক্ষার্থে গৃহীত হইয়াছে।

ধূমকেতু ও পৃথিবী

ওক্‌লাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক মিঃ মেল্টন সম্প্রতি দক্ষিণ ও উত্তর ক্যারলিনার ভূগাত্রে অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী কতকগুলি অদ্ভুত চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। বিমান হইতে যে ফ'টো তোলা হইয়াছে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। মিঃ মেল্টন বলিতেছেন, এই চিহ্ন হইতে বোঝা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে কক্ষচ্যুত কোন দ্রুতগামী ধূমকেতুর সহিত আমাদের এই পৃথিবীর সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। তিনি হিসাব করিয়া বলিতেছেন, এই ধূমকেতুর গতি সেকেণ্ডে ছয় মাইল—সংঘর্ষণের ক্ষণ এক মিনিট কাল—কিন্তু ঐ সামান্য সময়ে পৃথিবীর যে অবস্থা হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনায় গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসকে ছেলেখেলা বলিতে হইবে।

দূরবীণ চশমা।
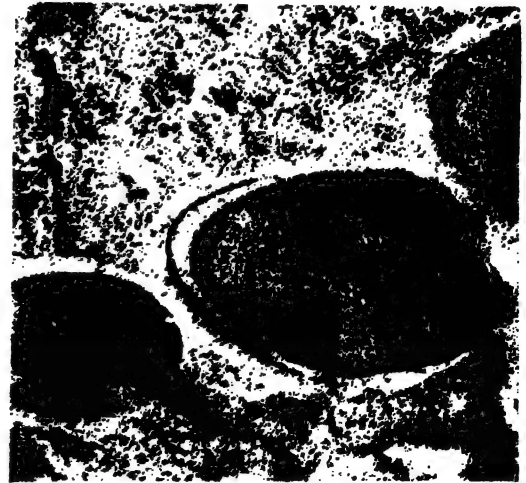
ধূমকেতু আহত ভূগাত্র।

পর্ব্বতারোহণের পোষাক

এই বৎসর এভারেষ্ট অভিযানের যে সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাতে এই রকম পোষাক ব্যবহার করা হইবে। পাহাড়ের ২৯ হাজার ১৪১ ফিট উপরে

এবার উঠিবার কথা—উপরের সেই হিমেল হাওয়া হইতে যতখানি সম্ভব রক্ষা পাইবার জন্য এই উইণ্ডপ্রুফ পোষাক তৈয়ারি হইয়াছে। পিঠে অক্সিজেনের ব্যাগ ঝুলানো আছে দেখা যায়।

পিঠে অক্সিজেন ব্যাগ, আপাদমস্তক উইণ্ডপ্রুফ পোষাক পরা, এক হাতে দড়ি, অন্য হাতে ছড়ি—এই বৎসরের এভারেষ্ট-আরোহণেচ্ছু দুঃসাহসী বীর।

ভ্রমণকারীর যষ্টিতে বেতারযন্ত্র।

বেতার ভ্রমণ-যষ্টি

একজন জার্মান আবিষ্কারক এই 'বেতার ভ্রমণ-যষ্টি' তৈয়ারি করিয়াছেন। দেখিতে সাধারণ একটি ছড়ির মতো, কিন্তু ইহার মধ্যে বেতার শুনিবার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা সমস্তই আছে। পথে বেড়াইতে বেড়াইতে বেতার শুনিতে হইলে কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া ছড়িটি মাটিতে পুঁতিয়া, কানে 'রিসিভার' লাগাইলেই হইল। আবিষ্কর্তা বলিতেছেন,—না পুঁতিয়া বেড়াইতে বেড়াইতেই যাহাতে বেতার শুনিতে পাওয়া যায়, শীঘ্রই এ ছড়িকে তাহার উপযোগী করিবার আশা আছে।

নিউইয়র্ক রেডিয়ো পেট্রল

আমেরিকায় পুলিস ও চোর-ডাকাতে যেন পাল্লাপাল্লি চলিয়াছে। দুর্বৃত্তের দুঃসাহসের যেমন সীমা পরিসীমা নাই, পুলিসের বেড়াজালের পরিধিও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। সেখানকার পুলিসের সতর্কতার আধুনিক এক রকমফের হইতেছে এই বেতার প্রহরা (Radio Patrol)। ছবিতে একটি বেতার পুলিসের আড্ডা দেখানো হইয়াছে। টেলিফোঁ হাতে যিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে নিউইয়র্ক সহরের ম্যাপ রহিয়াছে। ইঁহার খবরদারীতে সহরের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মোটরকার শিকারের অপেক্ষা করিতেছে। সহরের যে কোন স্থানে সন্দেহজনক কিছু ঘটিলে মুহূর্তে তাহার সংবাদ ইঁহার কাছে পৌঁছে। পৌঁছানো মাত্র ইনি ম্যাপ দেখিয়া শহরের সেই প্রান্তের মোটরগাড়ীকে বেতারে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। সেই মোটরে বসিয়া বেতার বার্ত্তা কেমন করিয়া লিখিয়া লওয়া হয়, স্বতন্ত্র ছবিতে তাহা দেখানো হইল। এই মোটরগাড়ীর ছাদে লুকায়িত অবস্থায় বেতারের এরিয়েল রহিয়াছে। গাড়ীটি আশে-পাশে সম্মুখে নীচে নানা প্রকারে সুরক্ষিত—বোমা, বন্দুক, টিয়ারগ্যাস

সম্মুখে সহরের ম্যাপ—কোন্ স্থানে কত নম্বরের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে চাবিতে তাহা বুঝা যাইবে।

যে গাড়ী কাজে লাগিল, কালো চাবিতে তাহা চিহ্নিত করা হয়।

পুলিসের লোক আসিয়া দুর্ব্বৃত্ত-দিগকে পাকড়াও করিয়াছে।

ইত্যাদি সমস্তই গাড়ীতে মজুদ আছে। অন্ততঃ চারি জন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পুলিসের লোক এই গাড়ীতে বসিয়া আছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁহারা অবিলম্বে গাড়ী ছুটাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন্। সেখানে দুর্ব্বৃত্তদের কি অবস্থা হয়, তাহা সংলগ্ন ছবিতে দেখানো হইয়াছে। কোন্ গাড়ী কাজে ব্যস্ত আছে এবং কোন্ গাড়ী কাজের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা টেবিলের উপরকার চাবি দেখিলেই বোঝা যায়। যে গাড়ী কাজে লাগিল, তাহাকে চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত কালো চাবি আছে—শাদা চাবিতে বোঝা যায় এ গাড়ীর কাজ নাই।

অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ ছাড়া বেতার-প্রহরী গাড়ীকে ছুটাছুটি করিতে হয় না। মার্চ্চ সংখ্যার 'পপুলার সায়ান্স মান্থলি'তে বেতার প্রহরীদের সহিত এক রাত্রির একটি রোমাঞ্চকর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবরণ পাঠে বোঝা যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিয়া একটি

রেস্তঁরায় এক টুক্‌রা রুটি চিবাইবার জন্য ঢুকিবারও ইঁহাদের জো নাই—মিনিট কাটিতে না কাটিতেই হয়ত শোনা গেল—"১২১৪, ১২১৫ আর ৭৫

দুই মাইল দূর হইতে বেতারে বার্ত্তা আসিয়াছে…৭৫ নম্বর—ব্রডওয়েতে ছোট।

নম্বর। ২০১০ ব্রডওয়েতে ছোট। সঙ্কেত ৩১ অর্থাৎ রাহাজানি, নামজাদা গুণ্ডার দল, অত্যন্ত সাবধানে যাইবে, গ্রেপ্তার কর।" রুটির টুক্‌রা ও চায়ের বাটি যেমন তেমনই পড়িয়া থাকিল—গাড়ী আবার ছুটিল।

প্রমোদ-বিহারীর দুর্দ্দশা

হাওয়াই দ্বীপের হামাকুয়াতে যাঁহারা প্রমোদ-বিহারে যান—তাঁহাদিগকে কঠিন রকম পরীক্ষা দিয়া তবে উপকূলে নামিতে হয়। উপকূল হইতে জাহাজ অন্ততঃ আধ মাইল দূরে থামে। সেখান হইতে নৌকায় পাহাড়ী উপকূলের নিকট আসিতে হয়। অতঃপর ভূলাভর্ত্তি বস্তার মতো 'ক্রেন'এ করিয়া প্রমোদ-বিহারীকে স্থলে টানিয়া তোলা হয়। জীবন-মরণ সমস্যা সন্দেহ নাই।

হামাকুয়ার লছ্‌মণ-ঝোলা।
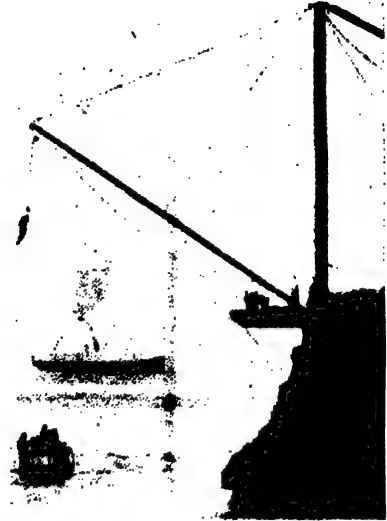
পোর্টল্যাণ্ডের মিঃ ব্লোড আকাশযানের নকলে জলযান তৈয়ারী করিয়া জলপথের অনেক বাধাবিঘ্ন মিটাইয়াছেন।

ব্যোমযানের নকলে জলযান

সাধারণতঃ যে শক্তিসাহায্যে মোটর বোট চালানো হয়—সেই শক্তিতেই, অথচ অন্ততঃ ঘণ্টায় ৭০ মাইল চলিবার উপযোগী করিয়া এক প্রকার জলযান তৈয়ারি হইয়াছে। জলযান হইলেও ইহা সর্ব্বতোভাবে এরোপ্লেনের মতো প্রস্তুত—এরোপ্লেনের ডানা বিস্তৃত, ইহাতে সে ডানা অল্প-পরিসরে শেষ করা হইয়াছে। ঘণ্টায় ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত গতিবেগে ইহা সাধারণ জলযানের মত চলে—তাহার বেশী শক্তি প্রয়োগ করিলেই ইহার সমস্ত অবয়ব জল ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া পড়ে—মাত্র হালটি জল ছুঁইয়া থাকে। ফলে জলের ধাক্কা না লাগায় ইহার গতি অনায়াসে দ্রুত হইতে দ্রুততর হয়। পোর্টল্যাণ্ডের মিঃ ভিক্টর ব্লোড ইহার আবিষ্কর্ত্তা। এ যান এখনও পরীক্ষার অবস্থায়—সফল হইলে ইহাতে অনেক অভাব ঘুচিবে।

সর্প ও রজ্জু

—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

১

তাদের নাম প্রকাশ না হওয়াই ভালো। ধরা যাক স্বামীর নাম ছিল সুপ্রিয় আর স্ত্রীর নাম ছিল শশিপ্রভা। বাংলা দেশের অন্যান্য স্বামীস্ত্রীদের সঙ্গে কিছুই তাদের তফাৎ ছিল না, কেবল শোনা যায় ছয় বছর জোর রোমান্স চালিয়ে একনিষ্ঠতার পুরস্কারস্বরূপ শ্রীমান সুপ্রিয় শশিপ্রভা-রত্ন লাভ করেছিলেন।

বাংলা-দেশে দুটো-একটা রোমান্স যা হয়, তার সঙ্গেও সুপ্রিয়ের রোমান্সের তফাৎ ছিল না বেশী, কেবল লোকে বলে যে এই দীর্ঘ ছয় বৎসর শশিপ্রভার সঙ্গে তার একটিও কথার আদানপ্রদান হয়নি। শশিপ্রভার পিতা দেশমান্য অনন্তমোহনের সুপ্রিয় ছিল সহকারী। স্বদেশী সভা-সমিতিতে তাঁর পার্শ্বচররূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাকে দেখা যেত। সঙ্গে শশিপ্রভাও থাকত, তাকে সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টির আঘাত থেকে নানা বিচিত্র উপায়ে আড়াল ক'রে, ভিড়ের পেষণ থেকে বাঁচিয়ে সুপ্রিয় অনন্তমোহনের সহকারিতা করত। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে দরকারী বই, নোট ইত্যাদিও তাঁকে এগিয়ে দিত। শশিপ্রভাদের গাড়ীতে ব'সে তাদের বাড়ী থেকে সভা এবং সভা থেকে বাড়ী সে আসা-যাওয়া করতে পেত, এবং তাই নিয়েই সে খুসি ছিল। এর পর যখন শশিপ্রভার সঙ্গে মাঝে মাঝে অপাঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতে আরম্ভ হলো, তখন আর তার মনের মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক রইল না।

কথা দিয়ে যে মন-জানাজানি এক মিনিটে হয়, কেবল চোখের চাওয়ার উপর নির্ভর করলে তা হতে কিছু বেশী দেরি হওয়াই স্বাভাবিক। সুপ্রিয়ের বেলায় দেরির পরিমাণ হয়েছিল ছয় বৎসর। কিন্তু তা নিয়ে তার মনে কোনোরকম ক্ষোভ ছিল না। সব ভালো যার শেষ ভালো, এবং চোখ-চাওয়া-চাওয়ির দিনগুলিও সুপ্রিয়ের যে কিছুমাত্র মন্দ লেগেছিল তা নয়।

একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি ব্যক্তি, একটি তরুণ এবং একটি তরুণী, হঠাৎ পরস্পরের সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় দেখা হ'লে কিপ্রকার ব্যবহার ক'রে থাকে বাংলাদেশে সে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। সুতরাং দীর্ঘকালের নীরব মন-জানাজানির পরে হঠাৎ বাসর-ঘরে শশিপ্রভাকে একেবারে কাছে পেয়ে সুপ্রিয় কি করেছিল তা ভেবে বিশেষ কৌতূহলী হবার কোনো কারণ নেই। প্রথমত শশিপ্রভাকে যথারীতি সে চুমো খেয়েছিল, তারপর দুজনে নীরবে কিছুক্ষণ হেসে নীরবেই দুজন দুজনকে আবার চুমো খেয়েছিল, তার পর নীরব হাসির বিনিময়। বাসর-ঘর ত মোটে এক রাত্রির ব্যাপার, তা নিয়ে বেশী কথা ব'লে কিছু লাভ নেই।

যেটা জানা দরকার তা হচ্ছে এই, যে নীরব-প্রেমের অবসানে পরস্পরকে তারা কাছে পেল বটে, কিন্তু প্রেমটা যেমন রইল, নীরবতাটাও তেম্নি মোটের ওপর থেকেই গেল। বিয়ের পর শশিপ্রভাকে নিয়ে সুপ্রিয় তার কাকার বাড়ীতে বাস করতে এল। কাকার বাড়ীই সে আগেও থাকত। সে ছিল শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, এই কাকাই তাকে শৈশব থেকে মানুষ করেছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া সত্বেও তার উপার্জ্জন ক্ষমতা বিশেষ কিছু বাড়ল না যখন দেখা গেল, তখনও তার প্রায় সমস্ত ভরণপোষণের ব্যয় তিনিই নির্ব্বিরোধে বহন করতেন। সুপ্রিয়ের দিকেও এ বিষয় নিয়ে বিরোধ কিছুমাত্র ছিল না। বিবাহ করার পর ত সেটা আরও রইল না।

কিন্তু বিরোধটা প্রকাশ পেতে লাগল শশিপ্রভার তরফ থেকে। প্রথমত স্বামী পরের গলগ্রহ এ ব্যাপারটাতে তার লজ্জা এবং অগৌরব যথেষ্টই ছিল, তদুপরি বাড়ীতে স্থানাভাব। সমস্ত দিন স্বামী-স্ত্রীর দেখাসাক্ষাৎ ত হ'তই না, রাত্রেও স্বামীর সঙ্গে একটু নিশ্চিন্ত মনে প্রেমালাপ বা কলহ জনাবার উপায় ছিল না। তেতলার সিঁড়ির নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা কাঠের পার্টিশান দিয়ে ঘিরে তাদের শোবার ঘর তৈরি হয়েছিল, সেখানে নিতান্ত কানাকানি ক'রে কথা বললেও বাইরের প্রায় যে কোনো জায়গা থেকেই শুনতে পাওয়া যেত। সুপ্রিয়ের কথা বলবার আগ্রহ যে বেশী কিছু ছিল তা নয়, সেটাকে সে নিতান্ত সময়ের অপব্যবহার ব'লেই জ্ঞান করত। কিন্তু শশিপ্রভার মনটা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল। রোজই কানাকানি ক'রে সে স্বামীকে বলত, "চল আমরা আর কোথাও চ'লে যাই।"

স্বামী বলত, "কেন, কি হয়েছে ?"

স্ত্রী বলত, "একটু গলা ছেড়ে কথা না বলতে পেলে মানুষ বাঁচে কি ক'রে ?"

স্বামী বলত, "আমি বেঁচে আছি কি করে ?"

স্ত্রী বলত, "আহা, তোমার আর আমায় অবস্থাটা বুঝি এক ? তুমি যে সারাদিন বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়াও, স্বদেশী-সভায় চেঁচিয়ে বক্তৃতা দাও।"

স্বামী বলত, "তুমিও বক্তৃতা দিতে চাও যদি বল, তোমাকেও নিয়ে যাই।"

স্ত্রী বলত, "তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।"

তবুও রোজই পুরানো তর্কটা নতুন ক'রে সে করত। সুপ্রিয় এক-একদিন বিরক্ত হত, বলত, "সব মেয়েরই এক স্বভাব। সর্দারি না করতে পেলে তোমরা বাঁচ না। এখানে ভাবনা নেই, চিন্তে নেই, খাচ্ছ দাচ্ছ দিব্যি আরামে রয়েছ, তা তোমার সহ্য হবে না। ওপরে গুরুজন রয়েছেন, একটু শাসন আছে, যা খুসি তাই করতে পাচ্ছ না, আর অমনি দম আটকে আসছে। যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না।"

শশিপ্রভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। পাছে কেউ শুনতে পায় এই ভয়ে সুপ্রিয় তাকে ভালো ক'রে সান্ত্বনা দিতেও পারত না।

এরকম ক'রে সুপ্রিয়ের মতো আরামপ্রিয় লোকের দিনও বেশীদিন আরামে কাটে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাকে রোজগারের ভাবনা ভাবতে সুরু করতে হলো। চাকরীবাকরী দুটো একটা ক'রে নিল এবং হয় বড্ড বেশী খাটুনী, নয়ত সাহেব লোক ভালো নয়, ইত্যাদি অজুহাতে দুদিন না যেতেই এক এক ক'রে সেগুলিকে ছাড়ল। শেষটা তার এক বড়-লোক বন্ধুর সহায়তায় সে একটা নতুন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ পেল। বেশ মোটা মাইনে আর কমিশন, লোক জুটিয়ে কাজ করানো, নিজের কাজ বেশী কিছু নেই। লোক জোটাবার বিদ্যা সুপ্রিয়ের বেশ ভালোই আয়ত্ত ছিল, শশিপ্রভা তার প্রমাণ। সুতরাং কাজটাতে মোটামুটি সুবিধা হলো। মাইনে নিয়ে ত কোনো গোলই ছিল না, নিজের জোটানো লোকদের কাজের ওপর কমিশনও দুপয়সা বেশ আসতে লাগল।

শশিপ্রভা বললে, "এবার হয়েছে ত? এখন চল।"

সুপ্রিয় বললে, "তুমি বল কি? তোমার কি কাণ্ড-কাণ্ড জ্ঞান লোপ পেয়েছে? এতদিন কাকার ওপরে খেলুম, আর যেই দুপয়সা রোজগার করতে আরম্ভ করেছি অমনি কেবল নিজের ভাবনা ভাবতে সুরু করব?"

শশিপ্রভা বললে, "তুমি তোমার কাকাকে নিয়ে থাকো। আমার কাকা নেই, কিন্তু বাবা আছেন, আমি চললুম তাঁর বাড়ী।"

তখনই গাড়ী ডেকে সুপ্রিয়ের খুড়তুত ভাই রমেশকে নিয়ে শশিপ্রভা তার বাবার কাছে চলে গেল।

কাকার চেয়েও শশিপ্রভাকেই যে তার বেশী দরকার তা বুঝতে সুপ্রিয়ের বেশী দেরি লাগল না তা বলাই বাহুল্য। দুইরাত অনিদ্রার পর সে কাকার কাছে বাড়ী ছাড়বার কথাটা তুলবে ভাবছে এমন সময় তিনি নিজেই এসে কথাটা পাড়লেন। বললেন, "বৌমার বাবার কি কিছু অসুখবিসুখ করেছে?"

সুপ্রিয় বললে, "কই, না ত।"

কাকা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "তোমায় আমি বলব ভাবছিলাম, তোমার যদি এখনও নিজের রোজগারে না কুলোয়, আমি বরং তোমায় কিছু কিছু প্রতিমাসে দেব, তুমি একটা আলাদা বাড়ী দেখে নিলে সকলেরই খুব সুবিধে হয়। তোমার কাকীমা বলছিলেন—"

সুপ্রিয় বললে, "আমার নিজের রোজগারেই খুব কুলোবে। আমি এখুনি যাচ্ছি বাড়ী দেখতে।"

কিন্তু গেল সে অনন্তমোহনের বাড়ী। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে, "দিদিবাবু আছেন?"

দারোয়ান বল্‌লে, "দিদিবাবুত আভি চলি গেই।"

সুপ্রিয় বললে, "কোথায় গিয়েছেন জানো?"

দারোয়ান বললে, "নেহি মালুম। এক বাবু বাহারসে আয়া রহা উনকে সাথ নিকাল গেই—"

কাঁপা গলায় সুপ্রিয় বললে, "বাবুকে চেন?"

দারোয়ান বললে, "কভি ত দেখা নেই। আপসে থোড়া কম্‌তি উমর্, আপসে থোড়া জেয়াদা সাফা।"

সুপ্রিয় চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। এইরে! যে সন্দেহ এতদিন তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়েছে কিন্তু সে নিজেই যাকে আমল দেয়নি, তাই বুঝি সত্য হতে চল্‌ল এইবারে। এরই জন্যে আলাদা বাড়ী করতে শশি-প্রভার এত আগ্রহ, এরই জন্যেই হয়ত এমন অকস্মাৎ অতি তুচ্ছ কথাকাটাকাটির সূত্র ধ'রে বাপের বাড়ী চ'লে আসা! একটু স্থির হয়ে নিয়ে দারোয়ানকে সে একটি টাকা বক্‌শিস্ করলে, বললে, "দেখো, আমি এসেছিলাম কাউকে বোলো না, দিদিবাবু ফিরে এলে তাঁকেও না, বুঝলে?"

দারোয়ান সেলাম ঠুকে বললে, "বহুৎ আচ্ছা হুজুর।"

আবার পথ চলতে সুরু ক'রে প্রথমেই ভাবতে লাগল এবার কি করা তার কর্তব্য। আলাদা বাড়ী নেওয়া চুলোয় যাক, সে ত' আর এর পরে হওয়াই অসম্ভব। কাকাকে কোনোরকম করে সে বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু তার চেয়েও 'কম্‌তি উমর' এবং 'জেয়াদা সাফা' এই অভিনব রহস্যটির কি উপায়ে সে উচ্ছেদ করবে? চলতে চলতে বেশ খানিকটা দূর এসে আর দূরে যেতে তার পা সরল না, আবার সে ফিরে চলল। স্থির করল, যে উপায়েই হোক, তার সন্দেহ সত্য কি মিথ্যা সেটা তাকে জানতে হবে এবং যদি সত্য হয় তবে শশিপ্রভার এই তরুণ ও সুপুরুষ বন্ধুটি কে সেটাও না জেনে নিলে চলবে না। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করবে না, একথা ত শাস্ত্রেই আছে; অবিশ্বাসীকে হাতেনাতে ধরতে পারবার এত বড় সুযোগ আজ পেয়ে সেটাকে নষ্ট হতে দেওয়া অতি বড় মূর্খতা হবে। স্ত্রীবুদ্ধির সঙ্গে পেরে ওঠা কি পুরুষের কাজ? হয়ত শশিপ্রভা টের পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে, এবং এ সুযোগ এ জীবনে আর কখনো আসবে না। এই সন্দেহ নিয়েই তাকে আমরণ কাটাতে হবে।

শ্বশুরবাড়ীর সমুখকার রাস্তাটা বেশ দেখা যায় অথচ সে-বাড়ীর থেকে তাকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই, এমন জায়গায় একটা গাছের ছায়ায় অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। পাছে পাড়ার লোকেরা কিছু ভাবে এজন্যে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কারুর জন্যে সেখানে সে পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ মতো অপেক্ষা করছে, যে কোনো ট্রাম বাস বা গাড়ীতে তার এসে পড়বার সম্ভাবনা। খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রত্যেক ট্রাম, বাস ও গাড়ীর মধ্যে শুধুশুধুই সে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল। কেউ সত্যি সত্যি তাকে লক্ষ্য করছিল না, তবু যত সময় যেতে লাগল ততই তার মনে হতে লাগল, যে, তার ব্যবহারে তার চারদিককার সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি সে আকর্ষণ করছে। একটা গাড়ীওয়ালা তিনবার তাকে ঘুরে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে, "গাড়ী চাই হুজুর ?" তিনবার তাকে "না" বলে ফিরিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়ের ভয় হতে লাগল যে সে যদি আরও একবার আসে তবে তার চোখে চোখে চাওয়া মুস্কিল হবে। তাকে সেই থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা ভাবছে কি ? হয়ত এবারে ফিরে গিয়ে সে তার দোস্তবেরাদরদের ডাকবে। গাড়োয়ানের জাত, একটা হল্লা বাধাতেই বা কতক্ষণ ?

তবু চ'লে যেতে তার পা উঠল না। প্রেম জিনিষটার গন্ধ যাতে আছে তারই বোধ হয় একটা মাদকতা আছে। প্রেম থেকে উদ্ভব যে-সন্দেহ এবং ভয়ের, তারও মাদকতা কম নয়। স্ত্রী অবিশ্বাসিনী এ সন্দেহ যার কাছে শত বৃশ্চিক দংশনেরই মতো বেদনাদায়ক, সেও সেই সন্দেহের প্রমাণ চাক্ষুষ করবার জন্যে আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অগত্যা সুপ্রিয় এগিয়ে গিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ীর গেটে ঢুকে পড়ল।

দারোয়ানকে ডেকে বললে, "দিদিবাবু ফিরেছেন ?'

দারোয়ান বললে, "নেহি।"

সুপ্রিয় বললে, "বাবু কোথায় আছেন ?"

দারোয়ান বললে, "বাবুভি ত নিকাল্ গয়া, নও বাজেকা বাদ্ লোটেগা।"

সুপ্রিয় বললে, "দেখো, আমি এই পাশের ঘরটায় বসব, দরজাটা ভেতর থেকে গিয়ে খুলে দাও।"

নটা বাজতে যখন আর অল্পই বাকি, তখন পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে সুপ্রিয় উঠে পড়ল। বাবা, স্ত্রীজাতির অসাধ্য কিছুই নেই। এই সেদিন অবধি যাকে নিতান্ত সংসারানভিজ্ঞ অনুরাগবিহ্বল ভেবে বুকে ক'রে চুমো খেয়েছে. আজ কোথা থেকে কাকে জুটিয়ে নিয়ে রাত দুপুর অবধি সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আর দেরি করাও চলতে পারে না, হঠাৎ শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অত্যন্ত অপ্রস্তুতিতে পড়তে হবে, তাছাড়া শশিপ্রভা তাহলে জানতে পারবে যে সে এসেছিল, এবং সাবধান হয়ে যাবে। তাহলে ত সব মাটি। ভাবল, আজ না হোক কাল, একদিন তাকে সে ধরবেই। ও-সমস্ত ব্যাপার কি আর একদিনে মেটে ? তার বেলায় যার পরমায়ু ছিল ছয় বৎসর, অপরের বেলায় তা ছ'মাস ত অন্ততঃ টিঁকবে ? ছয়দিন হলেও মুস্কিল কিছু নেই। নিজে না পারে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, ডিটেক্‌টিভ লাগিয়ে হ'লেও এ রহস্যের কিনারা সে করবেই।

বাড়ী গিয়ে জামা খুলতে নিজের ঘরে গিয়ে দেখে, শশিপ্রভা ব'সে আছে। বললে, "তুমি আবার কখন এলে ?"

শশিপ্রভা হেসে বললে, "বিরহটা আমার ধাতে মোটেই সইবে না দেখতে পাচ্ছি, বেহায়ার মতো নিজে থেকেই এসে পড়েছি।'

সুপ্রিয় ব'ললে, "কার সঙ্গে এলে ?"

শশিপ্রভা বললে, "শেষ অবধি আশা ছিল, তুমি নিশ্চয়ই আমায় নিতে আসবে, কিন্তু আজ বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বুঝলাম সেটা নিতান্ত বড্ড বেশী আশা করা। রমেশ গিয়েছিল বেড়াতে, তার সঙ্গেই চ'লে এসেছি।"

সুপ্রিয় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আপ্‌সে কম্‌তি উনর, আপ্‌সে জেয়াদা সাফা—শেষটা রমেশ ? হতভাগাটা কি ভোগটাই না তাকে আজ ভুগিয়েছে, লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর। উঃ, ব'সে ব'সে কোমরটা চড়্‌চড়্ করছে একেবারে।

শশিপ্রভা বললে, "মশায়ের কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

সুপ্রিয় থতমত খেয়ে বল্‌লে, "এই একটুখানি ঘুরে এলাম।"

শশিপ্রভা বললে, "কোথায় ? জায়গাটার নাম নেই ?"

সুপ্রিয় বললে, "বিশেষ কোথাও নয়; এই রাস্তায় একটু ঘুরছিলাম।"

শশিপ্রভা বললে, "হুঁ, দুদিন চোখের আড়াল হয়েছি আর রাতদুপুর অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা হচ্ছে। পুরুষ মানুষকে দুদিনেরও বিশ্বাস নেই। এতরাত অবধি রাস্তায় ঘুরে কি হচ্ছিল শুনি ?"

সুপ্রিয় বল্‌লে, "কি আবার হবে ?"

শশিপ্রভা বল্‌লে, "তা কি ক'রে জানব বল। আমার ত আর গিয়ে খোঁজ নেবার উপায় নেই। স্ত্রী হয়ে জন্মেছি যখন স্বামীর কথাই শিরোধার্য্য ক'রে নিতে হবে।"

সুপ্রিয় ভাবছিল একটা ইঁদুরের গর্ত্ত সেখানে থাকলে তার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে আত্মরক্ষা করা যেত, কিন্তু গর্ত্তও নেই এবং থাকলেও তাতে ঢুকে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত না, সুতরাং নীরবে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শশিপ্রভার বাক্যবাণগুলি সে হজম করতে লাগল। বাপের-বাড়ী বেড়িয়ে এসে এমনিতেই শশিপ্রভার লুপ্ত সাহসটা অনেকখানি ফিরে এসেছিল, তদুপরি সুপ্রিয়কে অপরাধীর মতো কাঁচুমাচু করতে দেখে তার মুখের বাঁধন আরোই আল্‌গা হয়ে গেল।

গালাগাল এত খেল যে সেদিন আর-কিছু সুপ্রিয়ের মুখে রুচ্‌ল না। অনেক রাত্রে হঠাৎ মনে পড়ল শশিপ্রভার মুখবন্ধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র তার হাতে থাকা সত্ত্বেও এতক্ষণ সে সেটার প্রয়োগ করেনি, সত্যিসত্যিই আজ তার মাথা খারাপ হয়েছে। বাড়ী বদ্‌লানো ঠিক হয়ে গিয়েছে, এবং কালই সকালে গিয়ে সে বাড়ী ঠিক ক'রে আসবে এ সংবাদ শশিপ্রভাকে দেওয়া মাত্র সত্যই সন্ধি স্থাপিত হয়ে গেল।

শশিপ্রভার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে এমন সময় হঠাৎ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে সুপ্রিয় বললে, "রমেশটা কি সত্যিই আমার চেয়ে অনেক ফর্‌সা ?"

শশিপ্রভা বল্‌লে, "হঠাৎ ও কথা যে ? কি হয়েছে আজ তোমার ? আমার চোখে তোমার চেয়ে ফর্‌সা পৃথিবীতে কেউ নেই।" ব'লে পরম আদরে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে কাছে টেনে নিলে।

নূতন বাড়ীতে একেবারে নূতন ক'রে সংসার পাতবার ঝঞ্ঝাটে কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে যে কেটে গেল কেউ বুঝ্‌তে পারলে না। দুজনে সারাক্ষণ প্রেমগুঞ্জন করে নবতর হানিমুন করবার সঙ্কল্পটা কাজে লাগল না। আজ চাকর পালায়, কাল চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করে ঝি এসে কেঁদে পড়ে। সকাল থেকে জিনিসপত্রের ফর্দ্দ ধরা, ঘুরে ঘুরে সেগুলি কেনা, তবু শিল আসে ত নোড়া আসে না, খাট আসে ত খাটের চাবি বাদ যায়, শশিপ্রভাকে সমস্ত দিন এবং রাতেরও বেশীর ভাগ সময় নানা কাজে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে, প্রেমালাপ তো দূরের কথা, অনেক দরকারি কথা সুপ্রিয়কে বলতে শুদ্ধ সে ভুলে যায়। তার নানা কাজে সাহায্য ক'রে, বাজার ঘুরে জিনিসপত্র কিনে, ঘর সাজিয়ে, বাড়ী মেরামতের তদারক ক'রে সুপ্রিয়েরও আর কিছু ভাববার অবসর হাতে থাকে না। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে এসে বিছানায় সে শুয়ে পড়ে, কোনোদিন শুয়ে শুয়ে শশিপ্রভার অপেক্ষা করে, সে এলে তাকে একটা চুমো খেয়ে পাশ ফিরে ঘুমোয়, কোনো দিন আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সংসার গোছানো শেষ হয়ে গেলে একদিন নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস নিয়ে সেই আগেকার মতো সুপ্রিয় শশিপ্রভাকে অসীম আদরে কাছে টেনে নিল। তারপর হাসিভরা মুখে শশিপ্রভার মুখের ওপর মুগ্ধ দৃষ্টিকে একবার বুলিয়ে নিয়ে দুটি টুকটুকে ছোট ঠোঁটে ধ্যান-গভীর একটি চুম্বন সে মুদ্রিত ক'রে দিল। কিন্তু হঠাৎ সেই ধ্যান ভেঙে গিয়ে তার মনে হলো, কোথায় যেন কি অভাব ঘটেছে। স্ত্রীকে ঠিক আগেকার মতো ক'রে সে যেন পাচ্ছে না। একটু ভড়্‌কে গেল। আবার একবার শশিপ্রভার ঠোঁট দুটিতে চুমো খেয়ে সে বুঝতে পারলে, অভাবটা কোথায় ঘটেছে। শশিপ্রভা আগের মতো ক'রে তার চুম্বনের প্রতিদান দিচ্ছে না। শুধু তাও নয় বারবার স্বামীর আদরভরা লোলুপ ঠোঁট-দুটির নীচে তার ঠোঁট আড়ষ্ট কাঠ হয়ে আস্‌ছে। দু একবার সে মুখটিকে সরিয়ে নিয়ে গেল মনে হলো। সুপ্রিয় দুই হাতে তার মুখ দুহাত দিয়ে চেপে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তে সে দুহাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিলে, বললে, "আঃ, কি করছ ? ছাড়, লাগে।"

সুপ্রিয়ের সমস্ত মনটা তোলপাড় ক'রে আবার সেই পুরানো সন্দেহটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। প্রাণপণে সেটাকে চেপে বললে, "চুমো খেলেও লাগে ?"

শশিপ্রভা বললে, "বুড়ো বয়সে আর বেশী রসে কাজ নেই। ঢের ত খেয়েছ।"

দুঃখে অভিমানে সুপ্রিয়ের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সে একথার আর কিছু জবাব দিল না। কিন্তু সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল, কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। হায়রে, দুবৎসরও পূরো হয়নি তাদের বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যেই তার স্ত্রীর আদরেও অরুচি ধ'রে গেছে। মনে আছে তার এক বন্ধু বলেছিল, "একটি ছেলে হলেই সব প্রেম তাকে উঠে যাবে," তার সঙ্গে সে কেবল ডুয়েল লড়্‌তে বাকী রেখেছিল। আজ যদি সে শোনে যে প্রেম তাকে উঠতে ততটা দেরীরও দরকার হয়নি! তবু এই দুই বৎসরও যদি স্ত্রীকে ভালো করে সে কাছে পেত ত কথা থাকত না। এইটুকুর জন্যেই কি দীর্ঘ ছয় বৎসর একাগ্র মনে সে তপস্যা করেছিল ? শশিপ্রভাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাকার বাড়ীতে এতদিন রেখে সে যে অপরাধ করেছে, তার জন্যে যে এমন গুরুদণ্ড তাকে পেতে হবে তা ত আর তখন সে জানত না। প্রেমকে চিরজীবী মৃত্যুঞ্জয় বলেই যে তখন সে বিশ্বাস করত।

এরপর আরও কয়েকটা দিন কাটল, সুপ্রিয় রোজ অবসর পেলেই শশিপ্রভাকে পরীক্ষা করতে লাগল, এবং শশিপ্রভাও সবক'টা পরীক্ষাতেই একই উত্তর দিয়ে একই রকম নম্বর পেতে লাগল। একই রকম ক'রে তার ঠোঁট শক্ত হয়ে চেপে আসে, একই রকম ক'রে সে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকে, এবং একটু দেরি হলেই প্রাণপণে মুখ সরিয়ে নেয়। ক্রমে এমন হলো যে সুপ্রিয় এর পর আদর সুরু করবে বুঝতে পারলেই মুখে হাত চাপা দিয়ে সে ব্যাকুল হয়ে বলতে থাকে, "না গো না, থাক্, ঢের হয়েছে, আর আদরে কাজ নেই।" আদরে অরুচি হতে পারে, হোক, কিন্তু কেবল সেই কারণে আপত্তিটা এত বেশী ঘোরতর হবার কথা ছিল না। শশিপ্রভার মন থেকে তার প্রতি সব ভালোবাসা যে উবে গিয়েছে, হয়ত নিদারুণ বিরাগ আজ তার স্থান

অধিকার করেছে, এবিষয়ে সুপ্রিয়ের মনে সন্দেহের লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট রইল না। প্রথমটা কিছুদিন অভিমান ক'রে রইল, তারপর নানা তুচ্ছ কথা নিয়ে শশিপ্রভার সঙ্গে খিটি-মিটি সুরু করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হলো না। বেশ রাত ক'রে বাড়ী ফিরে সে যখন বিছানায় এসে নীরবে শশিপ্রভার দিকে পেছন ফিরে শোয়, তখন মনে হয় শশিপ্রভা বুক ভ'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। কোনো কথা নিয়ে তার প্রতি কটূক্তি করলে দিব্যি হাসিমুখেই বলে, "ত্রবছর না পুরতেই এই, বাকী দিন ত পড়েই আছে।" বাস্, আর কিছু না। কোনো রাগ না, অভিমান না, একটু চোখের জল না, যার সূত্র ধ'রে সুপ্রিয় তার সঙ্গে নূতন ক'রে ভাব করতে পারে।

আপিসের কাজে অত্যন্ত কামাই হতে লাগল। বন্ধু বললে, "তোমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে, আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি মাস-খানেকের ছুটি নিয়ে একটু জিরোও, আমি কোনোরকম করে চালিয়ে নেব এদিকে।"

সুপ্রিয় বুঝতে পারছিল যে তার এখনকার এই অবস্থায় আপিস করতে এসে লাভ ত কিছু হচ্ছেই না, বরং ক্ষতিই হচ্ছে বেশী। তার দেখাদেখি আপিসে তার সহকারী-রাও একজোট হয়ে কাজে গাফিলি সুরু ক'রে দিয়েছে। সুতরাং ছুটিতে তার নিজের প্রয়োজন কিছু না থাকলেও আপিসের প্রয়োজনেই তখুনি সেটা সে নিয়ে নিল। পথে বেরিয়ে বাড়ী ফিরতে তার খুবই ইচ্ছা করতে লাগল, কিন্তু ঠিক করল, ঠিক সেই কারণেই বাড়ী সে যাবে না, মনটাকে সে শক্ত করবে। শশিপ্রভা যা পারে, সে পুরুষ মানুষ হয়েও তা পারবে না? যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ পুরুষের জন্যে ত নয়। অবাধ্য হৃদয়কে সে সংযত করবে, নিজেকে এবং শশিপ্রভাকে সে বুঝতে দেবে যে শশিপ্রভাকে না হলেও তার চলে।

গলির মোড়ে রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। সময় কাটাবার জন্যে সেইখানে সে ঢুকে পড়ল। অনেকগুলি বই নেড়ে-চেড়ে দেখলে, কোনোটাই ভালো লাগল না। সংযম-শিক্ষা, **How to Dovolop your Will, Way to Peace,** ইত্যাদি ধরণের বই যেখানে যেটা পেল, নামিয়ে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখল, কিন্তু কোনোটার থেকেই তার সত্যিকারের সাহায্য কিছু হবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। হঠাৎ একটা বইয়ের নাম চোখে পড়ল, "মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বোধি-সত্ত্বাবদান-কল্পলতা।" কে ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র, বোধিসত্ত্বই বা কারা, এবং অবদান বলতেই বা কি বোঝায় কিছুই সে জানত না, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে এই বইটিতেই সে যা খুঁজছে তা পাবে। এই বাসনা-কলুষ-ভরা সংসারে এক অপূর্ব্ব মুক্তির বাণী নিয়ে বুদ্ধ একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন তা সে জানত, সেই বাণীকে নিজের রক্তাক্ত হৃদয়ের গায়ে সে বুলিয়ে নেবে। বাসনার সঙ্গে সংগ্রাম করেই ত তার হৃদয় আজ ক্ষতবিক্ষত, তারই মতো অবস্থার মানুষেরই ত বুদ্ধের বাণীতে আসল প্রয়োজন।

নিরিবিলি বসে পরম আগ্রহে সে বইটির পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল।

প্রথমটা তার বৈরাগ্যোন্মুখ মনের অনুকূল বিশেষ কিছু কথা বইটিতে সে পেল না, তবু তার ভালোই লাগতে লাগল। ক্রমে সেরকম কথারও অভাব রইল না। বান-প্রস্থাবলম্বী রাজা মণিচূড়ের মুনিপরিচর্য্যার্থে পত্নী-পরিত্যাগের বৃত্তান্ত তার বিশেষ ক'রে ভালো লাগল। বিজন বনে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ নিজ মহিষীর রোদনধ্বনি শুনতে পেয়ে মণিচূড় ছুটে গিয়ে তাকে শবরগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন, তারপর প্রথমেই যাকে দেখলেন, তিনি শান্তি-বিদ্বেষ্টা কামদেব। "হে রাজীবলোচন মহারাজ! আপনার প্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপে বিজন বনে ত্যাগ করা উচিত নহে। হে রাজরাজ, ইনি আপনার মনোবৃত্তি অনুসারেই রাজ্য-ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ভালো দেখাইতেছে না।" এমনি সব কথা ব'লে কামদেব মহা-অশান্তি সৃষ্টি করবার উদ্যোগ করলেন দেখে সুপ্রিয়ের তাঁর উপর অত্যন্ত রাগ হতে লাগল। রাজা মণিচূড়ের জবাব এবং তারপর দুই পৃষ্ঠা ধরে অঙ্গরাগচন্দনাদিরহিতা, কজ্জল-পরিগ্রহবর্জ্জিতা, হাররহিতস্তনমণ্ডলা ও অশ্রুকষায়নয়না পদ্মাবতী-দেবীর উদ্দেশ্যে সম্ভোগসংযোগের অনিত্যতা বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ-বক্তৃতা বারবার ক'রে সে পড়ল এবং পরম পরিতৃপ্তি লাভ করল। কিন্তু উপাখ্যানের শেষ ভাগে তার সমস্ত উৎসাহে একেবারেই ভাঁটা পড়ে গেল। পড়ল, "প্রত্যেক বুদ্ধগণ দেহপ্রভা দ্বারা দিগন্ত পূর্ণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ও সহাস্য বদনে রাজাকে কহিলেন, রাজন্, বহু কালের পর বিরহের অবসান হইয়াছে, এখন পদ্মাবতী অসহ্য পরিত্যাগ দশা সহ্য করিতে পারিবেন না। দুঃখ পরম্পরা বারম্বার উপর্য্যুপরি হইতে পারে না। যিনি শরণাগত ব্যক্তির দুঃখনাশার্থে নিজদেহ অর্থীকে দান করেন, তিনি স্বজনের প্রতি কিরূপে উপেক্ষা করিবেন। ইহাও পরোপকার ধর্ম্ম জানিবে।"

অত্যন্ত দমে গিয়ে বইটিকে আবার যথাস্থানে রেখে দেবে ভাবছে এমন সময় হঠাৎ চোখে প'ড়ল, "স্ত্রীগণ সরলতা ও মৃদুতা বশতঃ লতা যেরূপ সমীপস্থ পাদপকে আশ্রয় করে তদ্রূপ সমীপবর্ত্তী প্রণয়বান্ জনকে স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া থাকে।"

বইটিকে বন্ধ ক'রে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাটা ধারণা করতে চেষ্টা করলে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠল। শশি-

প্রভা তাকে ভালোবাসে না, সেটা নিশ্চয় ক'রে জেনেও যে সে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল, এই ভেবেই তার আশ্চর্য্য লাগতে লাগল। আজ কতকাল শশিপ্রভাকে সে জানে, কাকেও আশ্রয় করতে না পেলে, কেউ তাকে ভালোবাসছে না জানতে পেলে সে বাঁচতে পারে না। বিয়ের আগেও তাকে যেমন দেখেছে, বিয়ের পরেও ঠিক তেমনি। এমন মানুষের দু'বৎসরেই ভালোবাসায় অরুচি ধরতে পারে না। অরুচি আসলে ভালোবাসাতে মোটে নয়ই, অরুচি সুপ্রিয়তে। এই সহজ কথাটা এতদিন তার মনে হয়নি, মায়াবিনীর মায়া এমনই ভাবে তাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল! আজ সমস্ত মায়াজাল দুহাতে ক'রে সে ছিঁড়বে, শশিপ্রভার কোনো ছলনায় আর সে ভুলবে না। দুপুরের আগেই সে কাজে বেরোয়, তারপর সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে, এর মধ্যে কত কি ঘটতে পারে, কত কি হয়ত ঘটেছে, ভাবতে গিয়ে তার মাথা ঘুরতে লাগল।

ভাবল, ছুটি নেওয়ার কথাটা স্ত্রীকে আপাততঃ বলা হবে না। যেমন নিশ্চিন্ত সে আছে, তেমনই তাকে থাক্‌তে দিতে হবে। তাকে তাকে থেকে হঠাৎ একদিন সময় বুঝে বাড়ী ঢুকে তাকে ধরতে হবে। শশিপ্রভা কিছুতেই আর ফাঁকি দিতে পারবে না, আর কিছু না হোক, একটা চিঠিও সুপ্রিয়ের হাতে এবার এসে পড়বেই।

একেবারে সেদিনই শশিপ্রভার অবিশ্বস্ততার একটা কিছু প্রমাণ তার হাতে আস্‌বে তা সে মনে করেনি, তবু বাড়ী ঢুকবার বেলায় নিজেরই অজ্ঞাতে পা টিপেটিপে ঢুকল। দুতলার সিঁড়ির নীচে এসেই স্পষ্ট শুনতে পেল, উপরে বসবার ঘরে শশিপ্রভা কার সঙ্গে গল্প করছে। চট্ ক'রে সিঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে কান পেতে রইল। বেশ বোঝা গেল অপর ব্যক্তি পুরুষ, এবং সে চাকর লক্ষ্মণ নয়। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, জামা কাপড় ঘামে ভিজে উঠল।

কতক্ষণ এভাবে কাটল জানে না। অনেক চেষ্টা ক'রেও উপরের কথাবার্ত্তার একবর্ণও বুঝতে পারল না। হঠাৎ শুনল জুতোর শব্দ হচ্ছে। আরও একটু স'রে গেল। শুনল, শশিপ্রভার সঙ্গী সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, "কালই না-হয় আবার আস্‌ব। তুমি বাড়ী থাকবে ত?"

বাবা, একটা দিনও ফাঁক গেলে চলে না, কালই আসতে হবে! তাছাড়া এরই মধ্যে 'তুমি' শুদ্ধ হয়ে গেছে! বিয়ের পর অনেকদিন নিজের স্ত্রীকেই তুমি বলতে তার বাধছিল। ক্ষেমেন্দ্রের কি আর অপরাধ? যিনি এতবড় একখানা শাস্ত্র রচনা ক'রে গিয়েছেন, ভালো ক'রে না জেনেই কিছু কি আর তিনি লিখেছেন? স্ত্রীলোক না-করতে পারে এমন কাজ নেই। জুতোর শব্দ আবার আরম্ভ হতেই সুপ্রিয় দরজা ঠেলে সিঁড়ির পাশের ঘরটায় ঢুকে গেল। নিস্তারিণী ঝি সে ঘরটায় শুত, তখন আর সে কথা তার মনে ছিল না। একবার ঢুকে প'ড়ে তারপর আর চট্ ক'রে বেরুনোও তার সাধ্য ছিল না। বের হতে গেলেই একেবারে ঐ লোকটির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়ে। কাজেই সে-ব্যক্তি বের হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই তাকে থাক্‌তে হ'ল।

অতিথি বিদায় হয়ে গেলে শশিপ্রভা কি কাজে একবার সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ স্বামীকে নিস্তারিণীর ঘর থেকে বেরুতে দেখে দুইচোখ বিস্ফারিত ক'রে ব'লে উঠল, "তুমি ওঘরে কি করছিলে?"

সুপ্রিয় অত্যন্ত কাতর মুখ ক'রে বল্‌লে, "কিছু না, অম্‌নি একটা জিনিষ খুঁজছিলাম।"

শশিপ্রভা সিঁড়ি নামতে নামতে বললে, "জিনিষ আবার কেউ অম্‌নি খোঁজে তা ত জান্‌তাম না; কি জিনিষ?"

সুপ্রিয় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জিনিষের নাম এক এক ক'রে মনে করতে লাগল, কিন্তু একটাও সে অবস্থায় লাগসই মনে হ'ল না। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লে "এই—এই—" কি বল্‌বে? ছবি, ছাতা, ছালা, জাঁতি, জামা, ঝাড়ু, টাকা, টেপ্............

শশিপ্রভা বল্‌লে, "কি জিনিস, বল, না-হয় আমিও খুঁজে দেখছি।"

সুপ্রিয় বল্‌লে, "না, থাক, এখন না হলেও চলবে।"

শশিপ্রভা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলে নিস্তারিণী ঘুমুচ্ছে। বললে, "চাকর-বাকরের ঘরে অমন চট্ ক'রে ঢুকো না, ওদের কাউকে ডেকে বল্‌লেই ত হত, খুঁজে দিত।" কিন্তু যে-রকম চোখে সুপ্রিয়র দিকে চেয়ে সে উপরে উঠে গেল সে সত্যিই ভয়াবহ। অগত্যা রাত্রে বিছানায় শুয়ে আবার যখন সে প্রশ্ন করবে, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল ত তখন ওঘরে তুমি কি করছিলে? কি খুঁজছিলে?" "তখন সত্য কথাটাই বলবে ঠিক ক'রে সুপ্রিয় বল্‌লে, "সত্যি কথাটা বলব?"

শশিপ্রভা বললে, "তোমার অভিরুচি।"

সুপ্রিয় বললে, "কিছুই খুঁজছিলাম না।"

শশিপ্রভা বললে, "তা ত আমি জানিই, কিন্তু কি করছিলে?"

সুপ্রিয় কাঁপা গলায় বললে, "উপর থেকে কে-একজন নেমে যাচ্ছে দেখলাম, তাই স'রে গিয়েছিলাম।"

শশিপ্রভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল না, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল না, বাতাহত কদলীর মতো নিজেকে সে সুপ্রিয়ের পদতলে নিক্ষেপ করল না, উচ্চকণ্ঠের কলহাসিতে ঘর ভ'রে তুলে সে বললে, "ওমা! তোমার মত পাগলও ত আমি দেখিনি! কি হত বিজনদার সঙ্গে তোমার দেখা হ'লে?

তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তেই ত' বেচারা কাজকর্ম্ম ফেলে দুঘণ্টা ধ'রে ব'সে ছিল।"

সুপ্রিয় বললে, "বিজনদা আবার কে? আমি ত কই চিনি না।"

শশিপ্রভা বললে, "তুমি তাকে চিনবে কোথা থেকে? আমিই ত প্রথমটা চিনতে পারিনি। দশ বছরেরও বেশী তাকে দেখিনি।"

সুপ্রিয় বললে, "সম্পর্কে তোমার ভাই বুঝি?"

শশিপ্রভা বল্‌লে, "ভাই নয়, কিন্তু ভায়ের চেয়ে বেশী। কলকাতায় এক বাড়ীতেই বহুকাল আমরা ছিলাম। মা মারা যাবার পর পিসীমাই আমাকে মানুষ করেছিলেন। আমার ত ভাই নেই, জ্ঞান হয়ে অবধি বিজনদাকেই ভাই ব'লে জানি। বিলেত গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে বছর-দশেক এলাহাবাদে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছে।"

একটা গভীর নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস নিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে শশিপ্রভাকে সুপ্রিয় কাছে টেনে নিল। শশিপ্রভা অকস্মাৎ এই ব্যাকুলতার কোনো অর্থ না পেয়ে একটু অবাক্ হলো, কিন্তু সুপ্রিয়কে বাধা দিলে না। কেবল সুপ্রিয় তাকে যখন চুমো খেতে চাইল তখন ডানহাত মুখের উপর চেপে বাঁহাতে তাকে ঠেলে দিয়ে আগের মতো সে বললে, "থাক্ গো মশাই, ভালোবাসার ত অবধি নেই, তার আবার অত!"

পরদিন বিজন এল, এবং সুপ্রিয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। বিজন লোকটিকে মোটের উপর সুপ্রিয়র মন্দ লাগল না। কিন্তু তাকে নিয়ে শশিপ্রভা একটু বাড়াবাড়ি করছে ব'লে তার মনে হতে লাগল। ছেলেবেলার জানাশোনা, এই ত? সত্যিকারের ভাই নয়। তাছাড়া দশ বছরের ছাড়াছাড়ি; এর মধ্যে মানুষের কত রকম হতে পারে, চোরের দায়ে জেল খেটে আসতে পারে; ভালো ক'রে খোঁজ-খবর না নিয়ে, না জেনেশুনে এতটা আত্তি দেখানো উচিত? একটু র'য়ে স'য়ে দেখালে ক্ষতি কি?

বিজন বিদায় নিয়ে যাবার পরেও শশিপ্রভাকে অনেকক্ষণ ধ'রে খুব খুসি দেখাতে লাগল। সুপ্রিয় দেখলে, থেকে থেকে হাসিতে তার মুখ ভ'রে উঠছে, ঘরের কাজ করতে করতেও সে গুন্‌গুন্ ক'রে গান ক'রে চলেছে, কিছু বলবে না ভেবে অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু শেষটা আর পারলে না, বললে, "কি গো সুন্দরি, অনেকদিন পর ভাইকে পেয়ে খুব খুসি হয়েছ?"

শশিপ্রভা বললে, "তা আর হইনি!"

সুপ্রিয় মুখে একটু কাষ্ঠহাসি এনে বললে, "ভালো! ভাই কি নিজে থেকে খবর নিতে এসেছিলেন, না তুমি খবর দিয়ে আনলে?"

শশিপ্রভা বললে, "আমিই আনলাম। কতকাল দেখা-শোনা নেই। পরের সংসারে বাস করি, আপনার জনরা কেউ খোঁজ না নিক, প্রাণের দায়ে আমাকেই খোঁজ নিতে হয়।"

"হুঁ" বলে' সুপ্রিয় সে জায়গা ছেড়ে চ'লে এল! রবিবাবুর কবিতায় পড়েছিল, "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজি চোর বটে।" আজ কোথাকার কে ঠিক নেই সে-ই হলো শশিপ্রভার আপনার জন, আর সুপ্রিয়র সংসার তার কাছে পরের সংসার! আশ্চর্য্য যে, বলতে শশিপ্রভার মুখে বাধল না! মায়ের পেটের ভাইকেও মানুষ স্বামীর চাইতে আপনার মনে করে না, অন্ততঃ মনে করলেও মুখে প্রকাশ করে না।

এরপর বিজন একটু ঘনঘন যাতায়াত সুরু করলে। কোনোদিন সকালে, কোনোদিন সন্ধ্যায়, কোনোদিন দু'বেলাই। কিছু কথা না, এম্‌নি ছেলেবেলার গল্প, কে বেঁচে আছে, কে মরেছে, কে কি করছে, কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে সুপ্রিয় উঠে পড়ত, জোরে জোরে পা ফেলে পাশের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বস্‌ত, তারপর আবার সেখান থেকে কান পেতে তাদের প্রত্যেকটি কথা শুন্‌ত, কার ক'টি ছেলে মেয়ে, তাদের মধ্যে কে বাপের মতো দেখতে, কে মায়ের মতো, কে হবার সময় মাকে প্রায় পার ক'রে দেবার জোগাড় করেছিল, ইত্যাদি।

দুপুরে নিত্যকার মত খাওয়াদাওয়া ক'রে সে বেরিয়ে যেত, মনটাকে বোঝাত ইন্‌সিওরেন্সের কেস্ জোগাড় করতে যাচ্ছে, আসলে কিছুই করত না। প্রায়ই নিজেরই বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, কখনো কোনো উপলক্ষ্যে আর কোথাও যেতে হ'লে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসত। শশিপ্রভা রোজ খাওয়াদাওয়ার পর বেশ একপালা ঘুমিয়ে নিত, কাজেই মাঝে মাঝে তার শোবার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসাও কিছু শক্ত ছিল না। যখন আর ঘুরতে ভালো লাগত না, একতলায় তার পড়বার ঘরটিতে এসে চুপচাপ ব'সে থাকত। শশিপ্রভার ঘুম ভাঙলেও সে-ঘরে তার হঠাৎ এস পড়বার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। এত ক'রেও একদিনও বিজনকে দুপুর বেলা তার বাড়ীতে ঢুকতে দেখতে পেল না।

তখন একটু একটু ক'রে তার মনটার প্রকৃতিস্থতা ফিরে আসতে লাগল। স্ত্রীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ মনে পোষণ করেছিল ব'লে একটু একটু অনুতাপও হতে লাগল। কতকাল বেচারী শশিপ্রভার সঙ্গে হাসিমুখে সে দুটো কথা বলেনি। আগে মাঝে মাঝে তাকে একগোছা রজনীগন্ধা বা একজোড়া চন্দ্রমল্লিকা বা একবাক্স রুমাল এনে সে উপহার দিত—কতদিন কিছু সে তাকে দেয়নি। উপহার ত দূরের কথা, তার কোনো প্রয়োজনের কথাও তাকে সে জিজ্ঞাসা করেনি। যে ভালোবাসার আতিশয্য থেকে স্ত্রীর প্রতি

নানা সন্দেহে সারাক্ষণ সে পাগলের মতো ব্যবহার করত, সেই সন্দেহের বাধা এতটুকু অপসৃত হবা-মাত্র বহুকালের রুদ্ধ চিত্তবেগ নিয়ে সেই ভালোবাসাই তাকে আবার পাগল ক'রে দিলে। পকেটে টাকাকড়ি যা ছিল সব খরচ ক'রে সে স্ত্রীর জন্যে ভালো দেখে একখানা জরীপাড় শাড়ী কিনলে, একটা ভালো হাতঘড়ি, একটা পার্কারের কলম, ম্যুনিসিপাল মার্কেটে একঘণ্টা ব'সে থেকে বাছাবাছা ফুলের একটা বাস্কেট সে তৈরি করিয়ে নিলে। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে আবেগ-কম্পিত বুকে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে, উপহারের জিনিসগুলো চাদরঢাকা দিয়ে যতটা সম্ভব লুকিয়ে পা টিপে টিপে সে উপরে উঠতে লাগল, উদ্দেশ্য শশিপ্রভার সাম্‌নে হঠাৎ সব উজাড় ক'রে ঢেলে তাকে একেবারে অবাক্ করে দেবে। কিন্তু নিজেই অত্যন্ত বেশী অবাক্ হওয়া সেদিন তার ভাগ্যে ছিল। সিঁড়ির যতটুকু উঠ্‌লে বসবার ঘরের মধ্যেটা বেশ দেখা যায়, সেই-খান থেকেই সে দেখতে পেল ওদিককার দেয়াল ঘেঁসে একটা চেয়ারে শশিপ্রভা বসে' আছে, আর দুহাতে তার মুখখানি তুলে ধরে' সিঁড়ির দিকে পেছন করে' ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বিজন। শশিপ্রভার বিজনদা! শশিপ্রভার সুন্দর মুখখানির উপর ন্যস্ত তার বিমুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিকে কল্পনায় সুপ্রিয় স্পষ্ট দেখতে পেল। চোখে সে অন্ধকার দেখতে লাগল, মনে হতে লাগল সেইখানে সিঁড়ির উপরেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে যাবে। কষ্টে রেলিং ধ'রে নিজেকে সম্বরণ ক'রে পড়তে-পড়তে সে আবার নীচে নেমে এল। পড়বার ঘরের খোলা দরজায় উপহারের জিনিষগুলো ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে পড়তে-পড়তেই সে বাড়ী ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। ভূত দেখলে লোকে যেমন ক'রে পালায় তেমনি ভাবে যেদিকে দুচোখ যায় বিহ্বলের মত সে পালাতে লাগল।

হায়রে, এতদিন স্ত্রীর প্রতি তার যে সন্দেহ ছিল, সে ত সন্দেহ ছিল না, সে ছিল তার বিলাস। কোনো অলক্ষিত উপায়ে তারই মধ্যে সে আনন্দ পেত। হয়ত নিত্যকারের অবিচিত্র জীবনযাত্রার মধ্যে শশিপ্রভার প্রতি নিজের অগাধ অনুরাগকে নিবিড় ক'রে, সত্য ক'রে অনুভব করবার ঐ ছিল তার এক ছলনা। নিজেকে নিয়ে ক্রীড়াচ্ছলেই যেন সেই ছলনা সে করত। উত্তেজনায় বুক কাঁপত, রক্তস্রোত দ্রুততর হয়ে বইত, চোখে কিছু দেখতে পেত না, পাগলের মতো ব্যবহার ক'রত, কিন্তু সারাক্ষণ এ বিশ্বাস তার মনের কোনো কোণে দৃঢ় হয়েই জেগে থাকত, যে শশিপ্রভা আর যাই হোক্, সে সাধ্বী, সে সুচরিতা, এই পৃথিবীর সমস্ত কলুষের সে অনেকখানি উপরে।

আজ ত আর এ বিলাস নয়, ছলনা নয়, এ একেবারে নগ্ন, ক্রূর সত্য। আজ বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে বইছে না, মনে হচ্ছে রক্তগতি এখনই যেন থেমে যাবে, বুক ভ'রে আজ এ কি গুরুভার হিমস্পর্শ। যতদিন খেলা মাত্র ছিল, ততদিন যা নিয়ে সারাক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে, রং চড়িয়ে, কল্পনায় বাড়িয়ে খেলার আনন্দে তার বুক ভ'রে উঠত, আজ প্রাণপণ ক'রে নিজের কল্পিত সম্ভব অসম্ভব নানা যুক্তি দিয়ে তাকেই সে অস্বীকার করতে চেষ্টা করতে লাগল। নিজেকে নানা ছলনায় আজও সে ভোলাতে লাগল। ভাবতে লাগল, হয়ত ভুল দেখেছে, হয়ত বিজনই সেখানে কেবল ছিল, শশিপ্রভা ছিল না, হয়ত আর যে ছিল সে শশিপ্রভা নয় আর কেউ, বিজন হয়ত আজ তার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে এসেছিল, তাকেই সে শশিপ্রভা ব'লে ভুল করেছে। কিন্তু আতঙ্কের কোনো ছলনাই তার কাজে লাগল না।

বহুক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হয়ে সে ময়দানের একটা নিভৃত জায়গায় এসে বস্‌ল। না, উত্তেজিত হয়ে কিছু লাভ নেই। এখনই ত তার স্থির হয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার সময়। অনাবশ্যক দুঃখ ক'রে কি লাভ? সম্ভবতঃ পৃথিবীর নিয়মই এই। মানুস সত্যই দুর্ব্বল, কতকদূর অবধি তাকে বিশ্বাস করা যায়, তার পর যায় না। প্রেম সত্যই ক্ষণস্থায়ী। বসন্তের সুখস্পর্শ বাতাসের মতো, কোনো মন্ত্র বলেই তাকে চিরকালের ক'রে বেঁধে রাখা যায় না, তার সময় অতীত হ'লেই নিদাঘের উষ্ণ নিঃশ্বাসে সে মিলিয়ে যায়। শশিপ্রভার আর দোষ কি? সেও মানুষ ত? তা ছাড়া সুপ্রিয় কি করেছে যার জোরে শশিপ্রভার প্রেমকে চিরকালের জন্যে ধ'রে রাখতে সে আশা করে? বিয়ে হয়ে অবধি স্ত্রীকে এক দিনের জন্যে সে শান্তি পেতে দেয়নি। তার অত্যন্ত তুচ্ছ সাধগুলিও কোনো দিন মেটাবার চেষ্টা সে করেনি, বরং কথায় কথায় তাকে তিরস্কার করেছে, উঠতে বসতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাকে কারণে অকারণে কাঁদিয়েছে, তারপর তাকে আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা ব'লে সান্ত্বনা শুদ্ধ সে দিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। এ-সমস্ত ত ছিলই, তারও উপরে কিছু দিন ধ'রে ক্রমাগত তাকে এই অকারণ সন্দেহ। একটা মানুষের মনের উপর আর একটা মানুষের মনের প্রভাবও ত আছে? ক্রমাগত একজনকে সন্দেহ করতে থাকলে যে-কোনো মানুষ ক্রমে বিগড়ে যেতে পারে, শশিপ্রভা ত নারী, অতি কমনীয় তার মন। এতদিন এত অপরাধ যে সে করেছে, তার শাস্তি কি কিছু থাকবে না? আজ সে যা পাচ্ছে এ ত শাস্তি হিসাবে তার পাওনাই, এ নিয়ে অন্যকে দোষ দিলে চলবে কেন?

কিন্তু বিজন, বিজনদা···নাই বা হ'ল মায়ের পেটের ভাই, জ্ঞান হয়ে অবধি তাকেই ভাই ব'লে শশিপ্রভা জান্‌ছে ত?···তরুণ লেখকদের কথা মনে পড়ল। তারাই তা হ'লে ঠিক কথাটা বলে। পতনের মুখে মানুষ যা হাতের কাছে পায় তাই ধ'রেই পড়ে, কিছুতেই তখন আর কিছু যায় আসে না। এ ত ঠিক কথাই।

কিন্তু অন্যকে দোষ দেওয়া যায় না এটা নিঃসংশয়ে জেনেও তার মন কিছুমাত্র শান্ত হল না। শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীন, ভাই বোন কেউ তার নেই, পৃথিবীতে শশিপ্রভা ছাড়া তার আর আপনার বলতে কেউ ছিল না। নিজের মমতা-ভিক্ষু সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঐ একটি মানুষকেই সে আশ্রয় করেছিল, উপবাসী চিত্তের সমস্ত সুখ-কামনা ঐ একটি মানুষকেই লতার মতো ক'রে চারদিক দিয়ে জড়িয়ে ছিল। আজ পৃথিবীতে সে সর্ব্বস্বহারা, তার আর কোথাও কোন অবলম্বন নেই, জীবনে কিছু তার আর কাম্য নেই, বেঁচে থাকার আর কোনো অর্থ নেই।

স্থির করল রাস্তা পার হবার সময় একটা বাস-এর নীচে প'ড়ে সে এই ধিক্কৃত জীবনের অবসান করবে। দাঁতে দাঁত চেপে বেদনাবিবর্ণ মুখে, পাথরের মূর্ত্তির মতো স্থিরদৃষ্টি চোখ নিয়ে সে উঠে প'ড়ল। একটা একটা ক'রে কয়েকটা রাস্তা সে পার হ'ল, কিন্তু গাড়ীর নীচে পড়া হয়ে উঠল না। ক্রমে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে এসে উঠল। সেখানে বেগবান্ বিচিত্র জীবনপ্রবাহের মাঝে প'ড়ে একটু আগেকার ভীষণ সঙ্কল্প মনে ক'রে নিজেরই তার ভয়-ভয় করতে লাগল। ক্রমে তার মনে পড়ল, যে সে ম'রে গেলে শশিপ্রভার কোথাও আর কিছু বাধা থাকবে না, তার স্বেচ্ছাচারিতা তখন নিরঙ্কুশ হয়ে উঠবে। যখন ভাবল যে তার মৃত্যুসংবাদ পেলে তার জন্যে একফোঁটা চোখের জল ফেলা দূরে থাক্, হয়ত শশিপ্রভা নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলবে, তখন মরতে আর তার কিছুমাত্র উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না।

ভাবল, আর দেরি নয়, এখনই সে বাড়ী ফিরে যাবে। সব যখন শেষ হয়েই গিয়েছে, তখন ভালোরকম বোঝাপড়া ক'রেই শেষ করা ভালো। বিজনকে হয়ত এখনই গেলে সেখানে পাওয়াও যেতে পারে। তারও সেখানে থাকা আবশ্যক। একেবারে তিনজনে এক সঙ্গে ব'সে সমস্ত হেরফের মিটিয়ে এই দুঃসহ অবস্থাটার অবসান করবে। কোথাও আর কিছু রাখা-ঢাকা চ'লবে না। বাড়ী গিয়ে সে কি করবে, কি বলবে তাও বেশ ক'রে ভেবে ঠিক ক'রে নিল। কোথাও কোনো দুর্ব্বলতা ধরা না পড়ে তা দেখতে হবে। সে যে কিছুমাত্র অবাক্ বা দুঃখিত হয়েছে তা যেন কিছুতে কেউ বুঝতে না পারে। রাগ করা ত চলবেই না। খুব সহজ স্বাভাবিক সুরে সে কথা বলবে, ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে নেবার বেলায় লোকে যে-রকম সুরে কথা বলে তেম্‌নি। অন্যদেরও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক সেই রকম ব্যবহারই সে করতে বলবে।

তখন সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরি নেই। পথের আলো-গুলো জ্বলে উঠেছে। বাড়ী ঢুকেই দেখল উপরের ঘরে তখনো আলো জ্বলেনি। ভাবল, হয়ত উপরে উঠে দেখবে অন্ধকারে হাত ধরাধরি ক'রে চুপচাপ দুজনে ব'সে আছে; বিয়ের পর সে যেমন অনেকদিন থাকত। সেই একদিন, আর—কঠোর তিরস্কারে নিজের মনকে শাসন ক'রে সে উপরে এসে উঠল। দেখল বস্‌বার ঘরে কেউ নেই। উপরের সব কটা' ঘরই খালি। ছাতে উঠে দেখল সেখানেও কেউ নেই।

ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল। এবার মন কোনো শাসনই আর মানল না। শশিপ্রভার সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত, তার সুন্দর শুভ্র দুটি হাতের যত্নভরা নিপুণতা দিয়ে সাজানো ঘরগুলির দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারল, শশিপ্রভা যদি যায় কতখানিই সত্যি তার যাবে। সে যাই হোক, যে অপরাধই সে করুক, তাকে না হ'লে সুপ্রিয়র কিছুতেই চলবে না। বিজন ত দূরের কথা, সমস্ত পৃথিবী একসঙ্গে হয়েও তাকে সুপ্রিয়র বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তাকে সে ফিরিয়ে আনবেই, তারপর যেমন একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ ছয় বৎসর সাধনা ক'রে তার প্রেমকে একবার সে লাভ করেছিল, প্রয়োজন হ'লে তার শতগুণ একাগ্রতায় তার প্রেমকে নূতন ক'রে পাবার জন্যে সমস্ত জীবন সে আবার সাধনা ক'রবে।

নীচে এসে চাকরদের কাছে খবর নিয়ে জানল শশিপ্রভা বিজনের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছে। তা যাক্, তাতে কিছু যায় আসে না, এখন বিজনের ঠিকানাটা কোনোরকম ক'রে পেলেই হয়। কলুটোলায় থাকে সেকথা বিজনই কথাপ্রসঙ্গে তাকে একদিন বলেছিল, কিন্তু ক' নম্বর কলুটোলা তা ত জানা নেই? শশিপ্রভার দেরাজের মধ্যে তার চিঠিপত্র ধোপার হিসাব, খরচের খাতা, ইত্যাদির মধ্যে ক্ষিপ্রহাতে সে খোঁজ ক'রে দেখতে লাগল, যদি বিজনের. একটা চিঠি বা ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরাও কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত দেরাজ ওলটপালট ক'রেও কিছুই পাওয়া গেল না।

তাড়াতাড়ি একটা গাড়ী ডেকে অনন্তমোহনের কাছে গেল। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁকে প্রণাম ক'রে প্রথমেই বললে, "বিজনবাবুর ঠিকানাটা আপনি জানেন?"

অনন্তমোহন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "বিজনবাবু কে?"

কোনো-কিছু নিয়ে নূতন ক'রে বিস্মিত হবার মতো মনের অবস্থা সুপ্রিয়ের আর তখন ছিল না, তবু শশিপ্রভার আশ্চর্য্য গল্প বানাবার শক্তির এই পরিচয় লাভ ক'রে একটুখানি বিস্মিত না হয়ে সে পারল না। বিজনের পরিচয় শুদ্ধ সে তার কাছ থেকে গোপন করেছে। দুজনে ব'সে ছেলেবেলাকার যে-সমস্ত গল্প তারা করত সেগুলোও তাহ'লে আগাগোড়া সব বানানো!

বললে, "শশিপ্রভার বিজনদা, ছেলেবেলায় এক বাড়ীতে তারা থাকৃত, তার পিসীমার ছেলে—"

"ও! আমাদের নান্‌কু? তাই বল। বিজনবাবু বললে আমি বুঝতে পারব কেন?" ব'লে অনন্তমোহন উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, "তা নান্‌কুর ঠিকানা আমার নোট বইয়ে ত আছে। দাঁড়াও বলছি।···এই যে এইখেনে রয়েছে···নান্‌কু, কলুটোলা, ২২-এ কলুটোলা। চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছেই।"

তাঁকে আর কিছু বল্‌বার অবকাশ না দিয়েই এবং কিছু না ব'লেই সুপ্রিয় আবার ছুটে পথে বেরিয়ে পড়ল। তখন চোখে সত্যিই সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, শশিপ্রভার মুখ কেবল তার সমস্ত অন্তরের নির্ণিমেষ দৃষ্টি ভ'রে জেগে ছিল; কানে কিছু শুনছিল না, শশিপ্রভার প্রিয় নামখানি তার সমস্ত চেতনা ভ'রে একই সুরে ক্রমাগত বাজছিল, কি নিবিড় আগ্রহভরা, ব্যাকুল আহ্বানভরা সেই সুর!

২২-এ কলুটোলা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। সিঁড়ির দরজার উপরে নম্বরটা কেবল দেখে' নিয়েই ছুটে সে উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির পরেই বারান্দা, দেখলে বারান্দা থেকে বাড়ীতে ঢুকবার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দুবার সে কড়া নাড়ল, কেউ সাড়া দিল না। "বেয়ারা, বেয়ারা," ব'লে বার কয়েক সে চেঁচিয়ে ডাকল, তবু ভেতর থেকে কোন জবাব এলনা, তখন অধীর হয়ে দরজার কপাটের ওপর প্রাণপণ জোরে সে ঘুঁসি চালাতে লাগল।

এতখানি শব্দ বাড়ীতে ডাকাত না পড়লে হঠাৎ বড় একটা হয় না। একসঙ্গে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করবার পর দরজার হুড়কো উঠল শোনা গেল। কপাট দুটোকে ফাঁক ক'রে ধ'রে যে মুখ বাড়াল সে বিজন। সুপ্রিয়কে দেখে দুহাতে দরজা খুলে ধ'রে সে বললে, "সুপ্রিয়বাবু যে! আসুন, আসুন।"

সুপ্রিয় দেখলে বিজনের ঠিক পিছনেই একটি সুন্দরী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী তরুণী, ইনি নিশ্চয়ই বিজনের স্ত্রী, তাঁরও পশ্চাতে একজন শুভ্রশির বৃদ্ধা, ইনিই পিসীমা। লজ্জায় তার জিহ্বা জড়িয়ে আসতে লাগল, তবু কোনোরকম ক'রে প্রশ্ন করলে, "শশিপ্রভা আছে এখানে?"

বিজন বললে, "শশি ত এখানেই আছে, কোথায় আর যাবে? কেন, চাকররা আপনাকে বলেনি?"

সুপ্রিয় বললে, "বলেছে।"

বিজন বললে, "দুদণ্ড না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছেন বুঝি?"

পিছন থেকে অবগুণ্ঠনবতী ব'লে উঠলেন, "না-দেখতে পেয়ে অস্থির না আরও কিছু। ভয় হ'ল, ভাবলেন শশিপ্রভা তোমার সঙ্গে elope করেছেন, তাই ছুটে এসেছেন দেখতে!"

একটা হাসির রোল উঠল। সুপ্রিয়র মনে হ'ল পিসীমাও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। নীরবে নত নেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য লজ্জার আবেগে সে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

বিজন বললে, "আসুন আমার সঙ্গে।" ব'লে হাত ধ'রে তাকে সে ভেতরে নিয়ে এল। পাশের একটা ঘরের স্প্রিং-এর দরজা ঠেলে ঢুকতেই প্রথমটা একটা উৎকট গন্ধ এসে সুপ্রিয়র নাকে যেন আঘাত করলে। ঘরের তীব্র আলোয় মুহূর্ত্তেকের জন্যে তার চোখও ঝল্‌সে গেল। কেবল দেখলে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে শশিপ্রভা শুয়ে আছে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখলে, ঘরের দেয়ালের গায় কাচের আলমারিতে নানা-রকমের ওষুধ, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সাজানো। একটা ছোট আলমারিতে বাঁধানো দাঁত কয়েকপাটি রয়েছে। আর শশিপ্রভা যে চেয়ারটিতে ব'সে আছে সেটা সাধারণ আরাম-কেদারা নয়, dentist-এর চেয়ার।

তার দিকে আর লক্ষ্য না ক'রেই বিজন শশিপ্রভাকে বললে, "কেমন, দাঁতের শির্‌শিরানিটা গেছে এতক্ষণে?"

শশিপ্রভা মাথা নেড়ে জানালে, "হ্যাঁ।"

বিজন বললে, "আচ্ছা, এখন এই লোশনটা দিয়ে বেশ ক'রে কুলকুচো ক'রে উঠে পড়; এরপর মুখের কাজ যা-কিছু সব নির্ব্বিঘ্নে করতে পারবে।"

কাছেই একটা চেয়ার ছিল, দুই হাতে চোখ ঢেকে সুপ্রিয় তার উপর বসে পড়ল। বিজন বললে, "কি, ওরকম ক'রে বস্‌লেন যে?" সুপ্রিয় তার সে কথার কোনো জবাব দিলে না।

বিজন হেসে উঠে বললে, "শশির যত সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড, পাইয়োরিয়া হয়েছে তা স্বামীকে কিছুতেই বলবে না, ভয়, পাছে স্বামী তার জন্যে তাকে নাক সিঁটকোন। লুকিয়ে তার অসুখ ভালো ক'রে দিতে হবে, দাঁত তুলে দিতে হবে, মুখের গন্ধ সারিয়ে দিতে হবে। সবই ক'রে দিলুম ত, শেষ অবধি ব্যারামটা লুকোনো রইল না, এই যা।"

একপাশ থেকে সেই মুখরা অবগুণ্ঠনবতী ব'লে উঠলেন, "আর বেশী লুকোতে গেলে ফলটা শশিপ্রভা যা আশা করেছিলেন, তার একেবারে উল্টো হতে পারত, এম্‌নিতেই যতটা হয়েছে তাই ঢের।"

বিজন বললে, "ও, এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় ক'রে দেওয়া হয়নি বুঝি? ইনি আমার—বুঝতেই পারছেন। আর এই আমার মা,—মা, এসো এদিকে।"

কাঁপা হাতে বিজনের গৃহিণীকে নমস্কার জানিয়ে সুপ্রিয় পিসীমাকে প্রণাম করলে। শশিপ্রভা ধীরে তার পাশে এসে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অন্তদের উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে, "এইবার তাহলে আমরা যাই।"

বিজন বললে, "যাবে বৈকি, একটু আরো দাঁড়াও। মা, তুমি একটু ও-ঘরে যাও ত।"

পিসীমা বেরিয়ে গেলে সুপ্রিয়কে ধ'রে এনে সে শশিপ্রভা যে চেয়ারটাতে বসেছিল সেইটেতে বসিয়ে দিল। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে প্রায় বিছানায় শোয়ানোর মতো সটান ক'রে শুইয়ে আলোটা তার মুখের উপর টেনে ঝুঁকে প'ড়ে তার মুখের মধ্যে দেখতে লাগল। শশিপ্রভা বললে, "কি দেখছ ?"

বিজন হাতলটাকে আবার ঘুরিয়ে চেয়ারটাকে ঠিক ক'রে দিতে দিতে বললে, "না, ঠিক আছে।"

তার স্ত্রী বললেন, "কি ?"

বিজন বল্‌লে, "আক্কেল দাঁত।"

সকলে আবার একবার হেসে উঠল। বিজনের স্ত্রী বললেন, "এইমাত্র উঠল বোধহয় ?"

বিজন হাসতে হাসতেই বল্‌লে, "সেই রকমই ত বোধ হচ্ছে।"

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, বলা বাহুল্য গাড়ীতে আস্‌তে আসতে গভীর আগ্রহে শশিপ্রভার ঠোঁট দুটিতে বারবার সুপ্রিয় চুমো খেল। আজও বারবার শশিপ্রভা তাকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল, বললে, "কি যে কর, কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে তার ঠিক নেই, তা ছাড়া মুখময় লোশনের গন্ধ।"

আজ বাধা পেয়েও সুপ্রিয় কিছুমাত্র দুঃখিত হ'ল না। শশিপ্রভার কোনো ব্যবহারেই এর পর আর সে দুঃখ পাবে না, এই দৃঢ় সঙ্কল্প আরো আগেই সে করেছিল।

তরুবীথি, "কলিকাতা ময়দানের একাংশ"

চিত্রটি তরুণ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়ের কাঠ-খোদাই শিল্পের একটি নমুনা। উড-কাট (Wood-cut) এবং লিনো-কাট (Lino-cut) চিত্রে ইনি ইতিমধ্যেই দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যার "সম্পাদকীয়" দ্রষ্টব্য।—সঃ বঃ

ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বিন্-বক্তিয়ারের তিব্বত-অভিযান

—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মুহম্মদ বিন্‌বক্তিয়ারের নাম না জানেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন ব্যক্তি বোধ হয় কমই আছেন। সেন বংশের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া মুহম্মদ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি অন্যত্র* দেখাইয়াছি যে এই ঘটনা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সংঘটিত হয়। এই আমলের প্রায় সমসাময়িক এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মিনহাজুদ্দিন প্রণীত তবকত্-ই-নাসিরি। এই প্রকাণ্ড পুস্তকখানি রেভার্টি সাহেব অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাটিপ্পনীর সহিত বহুদিন হইল অনুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে এই অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তবকতে দেখা যায়, ইখতিয়ারুদ্দিনের বাঙ্গালা আক্রমণের সময় লক্ষ্মণ সেন নুদিয়াহ্ নামক সহরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইখতিয়ারুদ্দিন কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া তিনি সঙ্কনট বঙ্গে (সম্ভবতঃ সমতট বঙ্গে) প্রস্থান করিলেন। ইখতিয়ারুদ্দিন নুদিয়াহ্ লুণ্ঠন করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। নুদিয়াহ্ বিধ্বস্ত ও জনহীন হইয়াই পড়িয়া রহিল।

ইখতিয়ারুদ্দিন বাঙ্গালা দেশের কতখানি অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়। মোট কথা, আদি যুগের মুসলমান রাজ্য লক্ষ্মণাবতী রাজ্য নামে প্রথিত ছিল। উহার চারিদিকে জাজনগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত এই কয়টি রাজ্যের নাম করা হইয়াছে (Raverty, p. 587)। তবকতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই যুগে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই শাখা ছিল। গঙ্গার দুই পারে এই দুই শাখা অবস্থিত, এক শাখার নাম রাঢ়, উহাতে নগর নামক সহর অবস্থিত। আর এক শাখার নাম বরিন্দ, উহাতে দেবকোট অবস্থিত। দিনাজপুর জেলার দক্ষিণস্থ মশিদা ও সন্তোষ পরগণা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত ছিল (Raverty. p. 576)। সন্তোষ বর্ত্তমান বালুরঘাটের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে এখনও একটি মৃদ্দুর্গ এবং ইখতিয়ারুদ্দিনের সহচর মুহম্মদ-ই-শেরাণের সমাধি বর্ত্তমান। এই সকল প্রমাণ হইতে নিশ্চিত রূপে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে রাঢ়ে গঙ্গার দক্ষিণস্থ এবং ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী ও বীরভূম জেলা এবং বরেন্দ্রীতে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা মুসলমান অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। দিনাজপুর মালদহের দক্ষিণে রাজসাহী বগুড়ার কতক অংশও সম্ভবতঃ মুসলমানেরা দখল করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু ইহার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। বর্দ্ধমান হুগলীর দিকেও তেমনি মুসলমান অধিকারের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

যাহা হউক, লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন বিজিত রাজ্যাংশ সুস্থির করিতে মনোনিবেশ করিলেন। নানাস্থানে মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইল, দরবেশদের জন্য স্থানে স্থানে আস্তানাও নির্ম্মিত হইল। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে ইখতিয়ারুদ্দিনের মনে তিব্বত জয়ের বাসনা উদিত হইল। এই তিব্বত-অভিযানে ইখতিয়ারুদ্দিন সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হইয়া, কাম-রূপের রাজার সহিত দ্বন্দ্বে সমস্ত সৈন্য হারাইয়া দেবকোটে ফিরিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, শেষ শয্যায় আলিমর্দ্দন নামক ইখতিয়ারুদ্দিনের এক পার্শ্বচর তাঁহাকে ছুরিকার আঘাতে হত্যা করিয়াছিল।

ইখতিয়ারুদ্দিনের তিব্বত-অভিযান এক বিশিষ্ট এবং বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনাটি নানাবিধ গোলযোগজালে জড়িত। রেভার্টির অনুবাদ প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই ঘটনাটি লইয়া আলোচনা চলিতেছে, রেভার্টি নিজেও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরে পণ্ডিতবর ব্লখ্‌ম্যান সাহেবও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ১৩২০ সনের "সাহিত্য" পত্রিকায় রায় শ্রীযুক্ত

---

* "*Determination of the Epoch of the Parganali Era*", *Indian Antiquary* 1923, p. 314.

† মদীয় "মহীপালপ্রসঙ্গ—মহীসন্তোষ"—(প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২১) প্রবন্ধে সন্তোষের ভগ্নাবশেষের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরও এক প্রবন্ধে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করেন। কিন্তু তবু আজিও, ইখতিয়ারুদ্দিন কোন্ পথে গিয়াছিলেন, কোথায় কতদুর গিয়াছিলেন, কামরূপের রাজার সহিত কোথায় সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ইত্যাদি কোন বিষয়েই স্থির মীমাংসা পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সকল সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে গৌহাটি সহরের অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে এই ঘটনা সম্পর্কিত একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কার-স্থানটির নাম কানাইবড়শীবাওয়া। কৃষ্ণের স্মৃতিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য আজিও ভরপুর। কোথাও স্থানের নাম অশ্বক্রান্ত—কারণ কৃষ্ণের অশ্ব ঐ স্থানে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; শিলালিপির পাহাড়টির নাম কানাইবড়শীবাওয়া, কারণ কৃষ্ণ এই পাহাড়ে বসিয়া (সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র নদে) বড়শী বাহিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গৌহাটি সহরের পূর্ব্বাংশের ঠিক বিপরীত পার হইতে স্থানটি মাইল খানেক উত্তর-পূর্ব্বে; ১৯২৭ সনের ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়াটারলি পত্রিকার ৮৪৩ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গেইটের আসামের ইতিহাস ২য় সংস্করণের সমালোচনা উপলক্ষ্যে প্রথম এই শিলালিপি আবিষ্কারের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করেন। এই লিপিতে অঙ্কে এবং কথায় লিখিত আছে যে ১১২৭ শকের ১৩ই চৈত্র তারিখে তুরুষ্কগণ কামরূপে আসিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল—অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিলালিপিটি বঙ্গীয় ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'কামরূপ শাসনাবলি' নামক পুস্তকে এই শিলালিপিটি আবার সচিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই চমৎকার পুস্তকখানা যদি ইংরেজিতে সম্পাদিত হইত এবং ইংরেজি অনুবাদ সহ মুদ্রিত হইত তবে সমগ্র পৃথিবীর ভারততত্ত্বজ্ঞগণের নিকট মহা সমাদর লাভ করিত। কিন্তু মাতৃভাষায় গোঁড়া ভক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুস্তকখানা বাঙ্গালায় সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়াছেন।

আসামের স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত কণকলাল বড়ুয়া বাহাদুরের অনুগ্রহে এই কানাইবড়শীবাওয়া শিলালিপির নূতন একখানা ফটোগ্রাফ আমার হস্তগত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায়কৃত পাঠ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। নিম্নে এই পাঠ সানুবাদ প্রদত্ত হইল।

শাক ১১২৭

শাকে তুরগ যুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ ॥

অনুবাদ :—শকাব্দা ১১২৭

তুরগ, যুগ্ম এবং ঈশ দ্বারা নির্দ্ধারিতব্য শাকে (তুরগ=৭; যুগ্ম=২; ঈশ=১১) মধু (=চৈত্র) মাসের ত্রয়োদশ তারিখে কামরূপে সমাগত হইয়া তুরুষ্কগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১১২৭এর ১৩ই চৈত্র, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শকাব্দ সাধারণতঃ অতীতাব্দ বলিয়া গণিত হয়। অর্থাৎ ১১২৭এর ১৩ই চৈত্র মানে, যখন ১১২৭ শকাব্দ শেষ হইয়া ১১২৮এর ১৩ই চৈত্র চলিতেছিল। এই যুগে সৌর বৎসর ২৫শে মার্চ্চ তারিখে আরব্ধ হইত। কাজেই বৎসরের শেষ দিন ৩০শে চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ হইত। এই হিসাবে ১১২৭ শকাতীতাব্দের পরবর্ত্তী ১৩ই চৈত্র ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চের সমান,—২৭এ মার্চ্চের নহে।

এই তুরুষ্কগণ যে ইখতিয়ারুদ্দিনের সহচর তুরুষ্কগণ, এবং এই লিপি যে তিব্বত-অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইখতিয়ারুদ্দিনের সমগ্র বাহিনীর শোচনীয় ধ্বংসেরই স্মারক, এই বিষয়ে সম্ভবতঃ কাহারও দ্বিমত হইবে না। তবকত-ই-

নাসিরি হইতেও এই ঘটনার তারিখ হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। তবকতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এই দুর্ঘটনা ৬০২ হিজরিতে ঘটিয়াছিল (রেভার্টির অনুবাদ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)। মাস ও তারিখ নিম্নের উক্তি হইতে বাহির করা যায় :—

"(অনুবাদ) এই দুঃসময়ে বক্তিয়ারপুত্র মুহম্মদকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত—'সুলতান-ই-গাজীর কি তবে কোন বিপদ হইল? নচেৎ আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে ছাড়িয়া গেল কেন?' প্রকৃত পক্ষেই ঐরূপই ঘটিয়াছিল কারণ এই সময় সুলতান-ই-গাজী মুইজ্জুদ্দিন্ মুহম্মদ-ই-সাম শহীদ হইয়াছিলেন।" (রেভার্টি—৫৭১ পৃষ্ঠা)। কামরূপরাজ-সজ্ঘর্ষে সমগ্র বাহিনী হারাইয়া দেবকোটে পৌছিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন ঐরূপ অনুশোচনা করিতেন বলিয়া লিখিত আছে। এদিকে মুইজুদ্দিন মুহম্মদ ই-সাম ৬০২ হিজরির ১লা শাবন তারিখে আততায়ীর হস্তে নিহত হ'ন। (রেভার্টি, ৪৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা), ৬০২ হিজরি ১লা শাবন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চের সমান। ১৩ই মার্চ্চ এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে ইহার অব্যবহিত পরেই দেবকোটে বসিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন নিজের ভাগ্যহীনতার কথা চিন্তা করিয়া থাকিবেন। কাজেই কানাই-বড়শীবাওয়া লিপিতে ৭ই মার্চ্চ তারিখে অর্থাৎ মুইজ্জুদ্দিনের মৃত্যুর মাত্র ৬ দিন পূর্ব্বে যে তুরুষ্ক বাহিনীর ক্ষয়প্রাপ্তির কথা আছে তাহা ইখতিয়ারুদ্দিনের বাহিনী ভিন্ন অন্য কোন বাহিনী হইতে পারে না।

বর্ত্তমান গৌহাটি সহরের এক রকম বিপরীত দিকে ব্রহ্ম-পুত্রের উত্তর পারে কানাইবড়শীবাওয়া লিপিটি অবস্থিত। এই লিপির অবস্থান দেখিয়া মনে হয় যে মুসলমানদের সহিত কামরূপ সেনার সংঘর্ষ হয়ত এই লিপির পাহাড়টির অদূরেই ঘটিয়াছিল। বিজয়ী পক্ষের নায়কগণ যে স্থানে সজ্ঘর্ষকালে অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানেই তাঁহারা সানন্দে এই প্রবল শত্রুনাশবার্ত্তা, বাঙ্গালা বিহারের ভাগ্য-গগনের এই ধূমকেতুর পতন-বার্ত্তা পাথরের গায়ে খুদিয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইখতিয়ারুদ্দিন কোন্ পথে তিব্বত অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহা নির্ণীত হয় নাই। রেভার্টি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের আলোচনায় গোলযোগের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই আমাদের আবার অতি সাবধানে তবকত পাঠ করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব,- ইখতিয়ারুদ্দিনের তুরুষ্ক বাহিনী বিনষ্ট হইবার বার্ত্তা আমরা গৌহাটি সহরের বিপরীত দিকে শিলাগাত্রে ক্ষোদিত দেখিতে পাই কেন। রেভার্টির অনুবাদের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল,—সঙ্গে মদীয় মন্তব্যও লিপিবদ্ধ হইল

(তবকত্—মূল। রেভার্টি—৫৫৯ পৃষ্ঠা।)

"বক্তিয়ারপুত্র মহম্মদ (রায় লক্ষ্মণিয়ার) ঐ রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া নুদিয়াহ্ নগর জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যে স্থান (অধুনা) লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন।

"কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর লক্ষ্মণাবতী (রাজ্যের) পূর্ব্বদিকস্থ তুর্কিস্থান ও তিব্বতের বিবিধ পার্ব্বত্য অংশ সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের মস্তিষ্ক ঐ দেশ গুলি জয় করিবার কল্পনায় মত্ত হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন এবং দশ হাজার অশ্বারোহীর বাহিনী প্রস্তুত হইল। আলি মেচ্ নামক কোচ ও মেচ্ জাতির একজন নায়ক মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের হস্তে পতিত হয় এবং তাঁহারই হস্তে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সে মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারকে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হয়। সে মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারকে পথ দেখাইয়া এমন এক স্থানে লইয়া আসিল যথায় বর্দ্ধন (কোট) নামক এক সহর ছিল।"

মন্তব্য। এই অভিযানে কোন্ পথে মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা স্থির করিতে হইলে রেনেলের বেঙ্গল এটলাসের ৫নং মানচিত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এই মানচিত্র ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়।
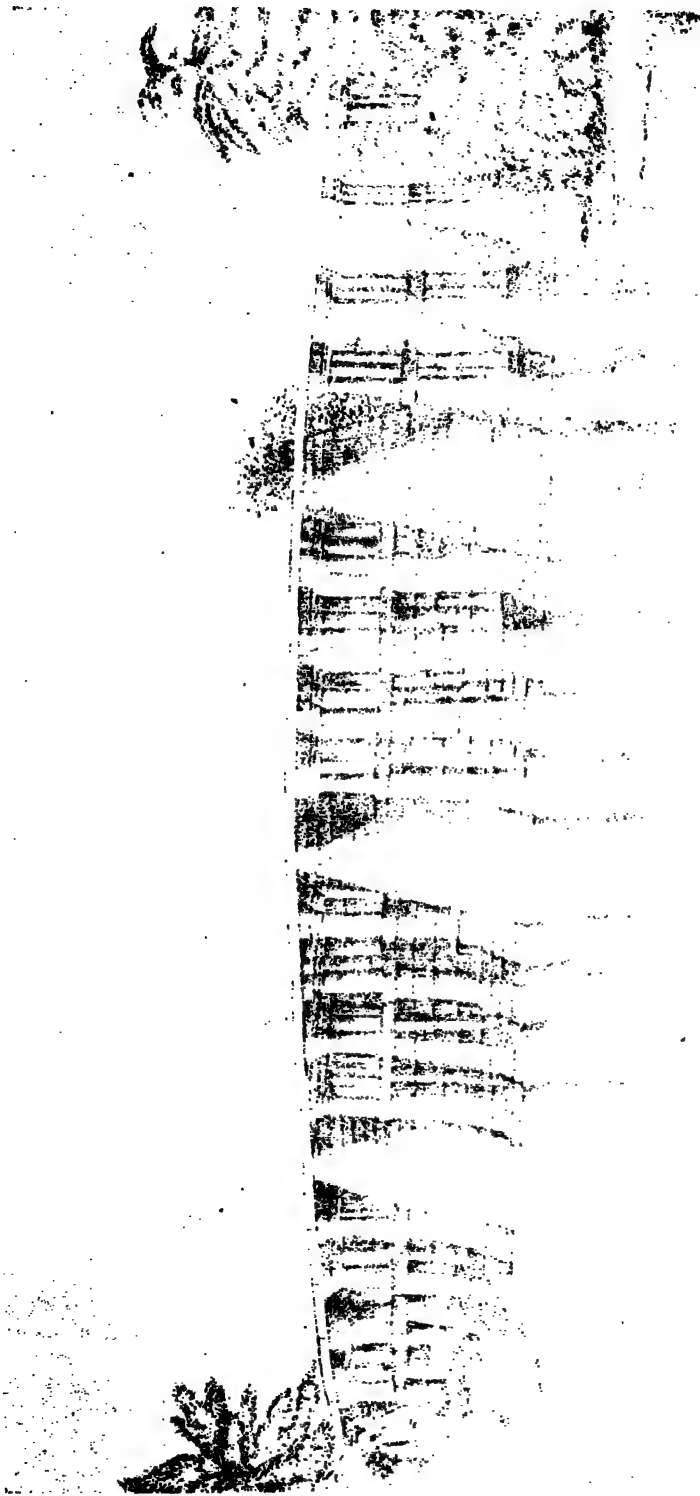
শিলহাকোর প্রস্তর-সেতু।

[Drawn by Captain E. T. Dalton, B. N. I. Asst. Commissioner, Assam]

মোহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অভিযানপথ
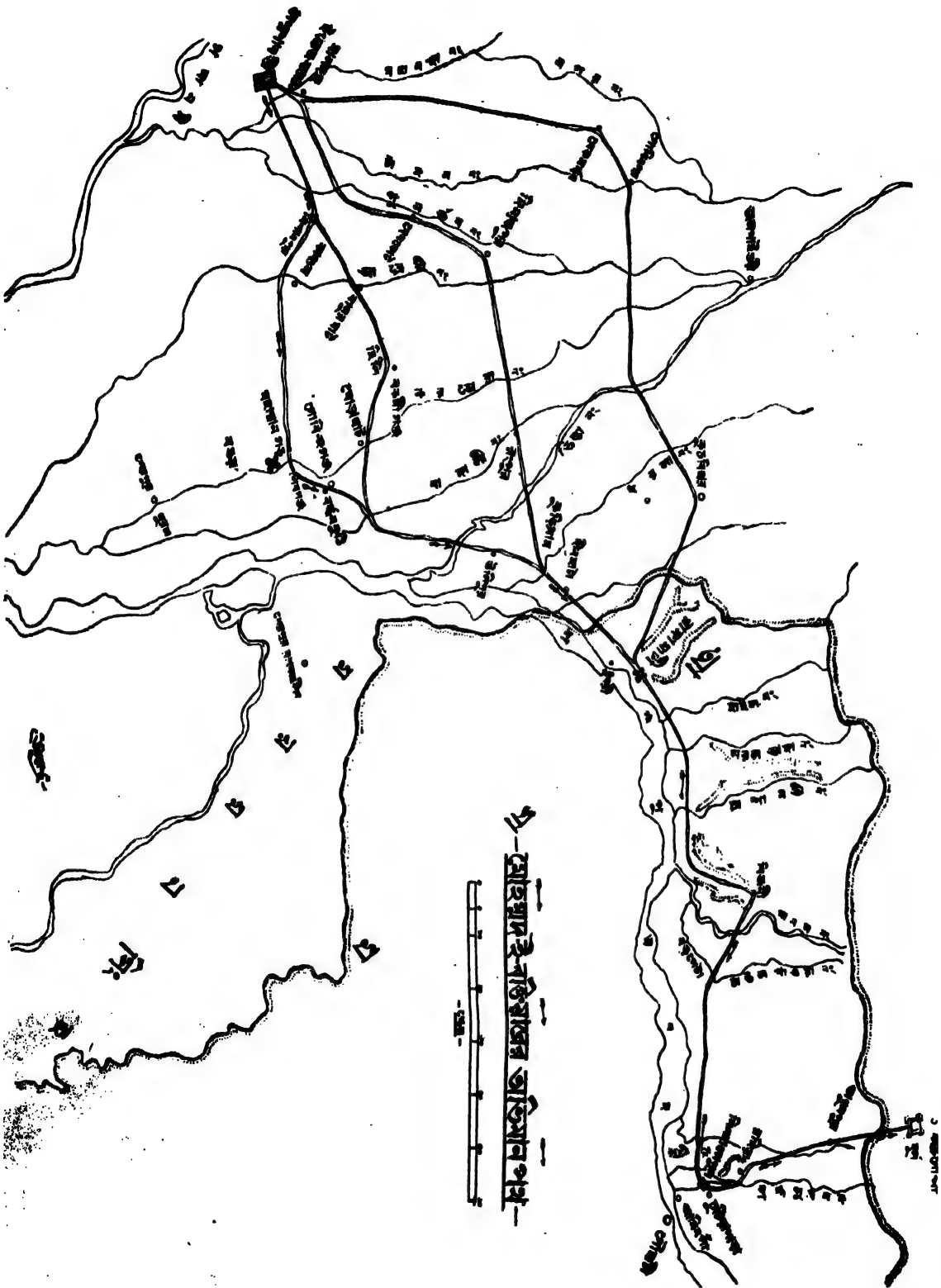
-স্কেল-

কোন্ স্থান হইতে মুহম্মদ রওনা হইলেন, রেভার্টি সাহেব তাঁহার আলোচনা করেন নাই ব্লথ্ম্যান সাহেব বলেন—"মুহম্মদ লক্ষ্মণাবতী অথবা দেবকোট হইতে রওনা হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।" (J.A.S.B. 1875. p. 282) কিন্তু ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদের ইতিহাসে দেবকোটের প্রসঙ্গ এই স্থানে তবকতে নাই। কামরূপ রাজসঙ্ঘর্ষে মুসলমান বাহিনী বিনষ্ট হইলে পর মুহম্মদ দেবকোটে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন সত্য—কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে ইহাই ধরিতে হইবে যে তিব্বত-অভিযান রাজধানী লক্ষ্মণাবতী হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল।

অভিযান যাত্রা আরম্ভ করিয়া কোন্ দিকে অগ্রসর হইল, তবকতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তবকতের উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতেই দেখা যাইবে যে অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মুহম্মদ লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পথে কামরূপরাজের দূত আসিয়া কামরূপরাজের নিবেদন তাঁহাকে জানাইয়াছিল এবং প্রত্যাবর্ত্তনপথে কামরূপ-রাজসঙ্ঘর্ষেই তাঁহার বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কাজেই লক্ষ্মণাবতী হইতে যে মুহম্মদ কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রেণেলের ৫নং মানচিত্রে বহু রাস্তার চিত্র দেখা যায়। পূর্ব্বাভিমুখে,—কামরূপাভিমুখে অগ্রসর হইতে ঐ মানচিত্রে তিনটি প্রধান রাস্তা দেখা যায়। সকলের উত্তরস্থ রাস্তা মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবকোট হইয়া দিনাজপুরে পৌঁছিয়াছে এবং তথা হইতে রঙ্গপুর কুড়িগ্রাম এবং দিনহাটা হইয়া রাঙ্গামাটি পৌঁছিয়াছে। উহার দক্ষিণস্থ রাস্তা নিশানপুর, বক্সিগঞ্জ ঘোড়াঘাট এবং উলিপুর হইয়া কুড়িগ্রামে প্রথম রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। সর্ব্ব-দক্ষিণস্থ রাস্তাটি নিশানপুরে দ্বিতীয় রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চন হইয়া সোজা পূবদিকে চলিয়া মহাস্থানের উত্তরস্থ শিব-গঞ্জে পৌঁছিয়াছে। এই স্থানে এই রাস্তা করতোয়া পার হইয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া গোবিন্দগঞ্জ ও বর্দ্ধনকুঠির মধ্য দিয়া দ্বিতীয় রাস্তায় যাইয়া মিশিয়াছে। এই সর্ব্বদক্ষিণস্থ রাস্তাটি বর্দ্ধনকুঠি নামক স্থান হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, মুহম্মদ এই রাস্তা ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। কারণ তবকতেই আছে যে অভিযানে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই মুহম্মদ বর্দ্ধন (কোট) নামক সহরে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধনকোট ও বর্দ্ধনকুঠি অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই বার এই বর্দ্ধনকোট সম্বন্ধে তবকত কি বলে শোনা আবশ্যক।

(মূল।) "এইরূপ কথিত হয় যে প্রাচীন কালে শাহু গুষ্ঠাসিব চীনদেশ হইতে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই রাস্তা ধরিয়াই হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া এই (বর্দ্ধনকোট) সহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সহরের সম্মুখে একটি বিপুল-কায়া নদী বহিয়া যাইতেছে—ইহার নাম বেগমতী। যখন এই নদী হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে তখন হিন্দু ভাষায় ইহার নাম হয় সমুন্দ (সমুদ্র)। আয়তনে, বিস্তারে এবং গম্ভীরতায় ইহা গঙ্গানদীর তিন গুণ। মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার এই নদীর তীরে আসিলেন এবং আলি মেচ ইসলামের বাহিনীর সহিত যোগ দিল।"

মন্তব্য। এইখানে মূলে যে গলদ আছে তাহা রেভার্টি সাহেব নিজেও অনুমান করিয়াছেন। এই স্থানে একটি পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন :—"পাঠক লক্ষ্য না করিয়াই পারেন না যে এই নদী এবং পরে পাথরের পুল সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নানা প্রকার গোলযোগ আছে।"

মূল হইতে ইহার পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, আলি মেচ মুসলমান সৈন্যগণকে পথ দেখাইয়া বর্দ্ধনকোটে লইয়া আসিল, যে বর্দ্ধনকোটের সম্মুখে গঙ্গার অপেক্ষা তিন গুণ প্রশস্ত নদী বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু উপরে মূলের যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে দেখা যায়, মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার সসৈন্যে এই নদীর তীরে আসিলে পরে আলি মেচ মুসলমান সৈন্যের সহিত যোগ দিল। এই দুইটি উক্তি পরস্পরের বিরোধী। কোন্‌টা সত্য বলিয়া ধরা যায়?

তবকতের বর্দ্ধনকোট, খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বগুড়া রঙ্গপুর জেলার সীমানায় স্থিত বর্দ্ধনকুঠি। ইহা বর্ত্তমানে রঙ্গপুর জেলায় অন্তর্গত, গোবিন্দগঞ্জ নামে বিখ্যাত গঞ্জের মাত্র এক মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী। বগুড়া সহর হইতে ইহা সোজা প্রায়

২০ মাইল উত্তরে এবং বগুড়া জেলাস্থ বিখ্যাত মহাস্থানগড় হইতে ইহা ১২ মাইল উত্তরে। গোবিন্দগঞ্জ করতোয়ার পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। রেনেলের পাঁচ নম্বর মানচিত্রে গোবিন্দগঞ্জ বেশ বড় অক্ষরেই দেখান আছে। ক্ষুদ্রতর অক্ষরে উহার নিকটস্থ বর্দ্ধনকুঠিও প্রদর্শিত হইয়াছে—কিন্তু বানান ভুল করিয়া বর্গন কুঠি লিখিত হইয়াছে। এই বর্দ্ধনকুঠি সুপ্রাচীন স্থান। এই স্থানে এক ঘর প্রাচীন জমীদারের বাস। এই জমীদারের পূর্ব্বপুরুষ প্রকাণ্ড জমীদারীর মালিক ছিলেন। এই জমীদারগণকে ঘোড়াঘাটের জমীদার বলিত। রঙ্গপুর গেজেটিয়ারে দেখা যায় (১৩৭ পৃষ্ঠা), এই জমীদারী বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলায় অধিকাংশ, রঙ্গপুর জেলায় কতকাংশ এবং বগুড়া ও মালদহ জেলায় প্রায় সমস্তটা লইয়া গঠিত ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর রাজের জমীদারী এই ঘোড়াঘাট জমীদারীর অংশ মাত্র লইয়া গঠিত।

মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে রঙ্গপুর বগুড়া সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল,—দিনাজপুর জেলা যে ছিল সেই বিষয়ে প্রমাণই রহিয়াছে। কাজেই বর্দ্ধনকুঠি আর বর্দ্ধনকোট যদি অভিন্ন হয় তবে সেই স্থান মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের রাজ্যান্তর্গত না হইলেও রাজ্য-সীমা হইতে বড় বেশী দূর ছিল না; এবং এই বর্দ্ধনকোট পর্য্যন্ত পৌছিতে মুহম্মদের কোন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না।

মিনহাজ বলেন, বর্দ্ধনকোটের সম্মুখে গঙ্গার তিন গুণ বেগমতী নামক নদী বহিয়া যাইতেছে। নদীর এই নামটি এবং বর্ণনা বিস্তর গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। রেভার্টি বলেন (পৃঃ ৫৬১-৬২, পাদটীকা), এই বর্ণনা ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য কোন নদীতে প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং রেভার্টির এই কথা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ব্লখ্‌ম্যান সাহেব কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করিতেন। তিনি বলেন :—"মিনহাজের উক্তিতে দেখা যায় একটি বৃহৎ নদী ঐ সহরের (বর্দ্ধনকোটের) সম্মুখে বহিয়া যাইত। এই নদী করতোয়া ভিন্ন আর কোন নদী হইতে পারে না। করতোয়া বহুদিন মুসলমান বাঙ্গালা রাজ্য এবং কামরূপের মধ্যস্থ সীমানা রূপে গণ্য হইত। পরে উহা কোচ রাজ্য এবং কোচ হাজো রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমানা বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুতঃ মহাভারতের সময় হইতে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের সীমানা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। যদিও বর্দ্ধনকোটের সম্মুখস্থ নদীর নাম মিনহাজের মতে বেগমতী, তবু উহা করতোয়া ভিন্ন অন্য কোন নদী হইতেই পারে না।" (অনুবাদ)

J. A. S. B. 1875. p. 282–83।

ব্লখ্‌ম্যান সাহেবের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণতঃ অত্যন্ত সারবান এবং প্রায়শঃ অভ্রান্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উপরে উদ্ধৃত স্থলটি ঐরূপ নহে। গোবিন্দগঞ্জ এবং বর্দ্ধনকুঠি যে করতোয়ার পূর্ব্ব পারে, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ গঙ্গার তিনগুণ বড় বেগমতী নদী যদি করতোয়া হয় তবে এই নদী পার হইলেই যে বর্দ্ধনকুঠিতে উপনীত হওয়া যায়, সেই কথা ব্লখ্‌ম্যান সাহেব খেয়ালই করেন নাই। অথচ তবকতে বর্দ্ধনকুঠিতে নদী পার হইবার কোন কথা নাই; বরং বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে আগে বর্দ্ধনকুঠি, পরে—ঐ গঙ্গার তিন গুণ প্রশস্ত নদী। তবকতে আছে, বর্দ্ধনকুঠিতে পৌছিয়া এই নদীর পারে পারে দশদিন চলিয়া মুসলমান সৈন্য একটি পাথরের পুল পাইল—তাহার সাহায্যে ঐ পুলের নিম্নস্থ নদী পার হইল। গঙ্গার তিনগুণ বড় নদীর উপর যে কোন পুল নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব, তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়।

করতোয়া বর্ত্তমানে বিশুষ্ক খাতমাত্র, উহাতে অতি অল্পই জল থাকে। মহাস্থানগড়ের দুর্গ-প্রাচীরের অতি নিকট দিয়াই আজিও ইহা বহিয়া যাইতেছে। প্রাচীরের পরে কিছুটা চরা ভূমি, তাহার পরেই করতোয়ার শুষ্কপ্রায় খাত। ঐ চরাভূমির উপরে পৌষনারায়ণী স্নান উপলক্ষ্যে বৃহৎ মেলা বসে। করতোয়ার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু দুর্গ-প্রাচীর নিম্নস্থ প্রবাহ দেখিয়া বুঝা যায়, করতোয়া এইস্থানে পুরাতন খাতেই বহিতেছে। এইস্থানে অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে চরাভূমি অতিক্রম করিয়া বিপরীত তীরের স্থির ভূমিরেখা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এবং বুঝা যায় যে করতোয়া কোন দিন মাইল খানেকের বেশী প্রশস্ত ছিল না। ইহা আমার নিজ চোখের দেখা; বগুড়ার গেজেটিয়ারকারও করতোয়ার প্রাচীন স্থির তীর-রেখা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তেই

উপনীত হইয়াছেন যে এই নদীটি কোন দিনই মাইলখানেকের বেশী প্রশস্ত ছিল না।

রেণেলের মানচিত্রে (১৭৮৩ খ্রীঃএ অঙ্কিত) করতোয়া অতি শীর্ণকায়া নদীরূপেই চিত্রিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী একমাত্র অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য মানচিত্র ভেনডেনব্রুকের মানচিত্র, সম্ভবতঃ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত (*Akbar*, by Dr. V. A. Smith, ৪৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই মানচিত্রেও করতোয়ার চিত্র দেওয়া আছে এবং ঘোড়াঘাট ও শেরপুর মুরচা বিশুদ্ধ রূপে এই নদীর তীরবর্ত্তীরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মানচিত্রে করতোয়া অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত দেখা যায় বটে তবে ইহা ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উদ্ভূতরূপে চিত্রিত এবং ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় ইহা অনেক ক্ষীণতর।

অনেক পুস্তকে একটি অদ্ভুত প্রবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। করতোয়া না কি এক কালে এত প্রশস্ত ছিল যে বগুড়ার শেরপুর উহার পশ্চিম পারে ছিল এবং ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার শেরপুর উহার পূর্ব্ব পারে ছিল। মধ্যস্থিত নদী পার হইতে দশ কাহন কড়ি আবশ্যক হইত বলিয়া ময়মনসিংহের শেরপুরের নাম হইয়াছে দশকাহনীয়া শেরপুর! এই দুই শেরপুরের মধ্যস্থ ব্যবধান বর্ত্তমানে প্রায় ৪৫ মাইল! কোন নদীই কস্মিনকালেও এত প্রশস্ত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। 'দশকাহনীয়া' বিশেষণের নিশ্চয়ই অন্য ব্যাখ্যা আছে—এই গাঁজাখুরী প্রবাদকে প্রাচীন করতোয়ার অসাধারণ প্রশস্ততার প্রমাণ বলিয়া খাড়া করা নিতান্তই বালকোচিত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩২০ সন ৩১২ পৃষ্ঠা) এই সমস্যা লইয়া একবার আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে বর্দ্ধনকোট ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অভিন্ন এবং বর্ত্তমান মহাস্থানগড়ই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। মহাস্থানগড় করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্ত্তী, কাজেই করতোয়ার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বর্দ্ধনকুঠি সম্বন্ধে যে আপত্তি খাটে, মহাস্থানগড় সম্বন্ধে সেই আপত্তি টিকে না। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে কখনও বর্দ্ধনকোট নামে অভিহিত হইত এমন প্রমাণ কোথাও নাই। আর মিনহাজ বর্ণিত গঙ্গার তিনগুণ বড় নদী যে করতোয়া হইতে পারে না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কাজেই এই ক্ষেত্রে রেভার্টির অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে এই নদী ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য কোন নদী হইতে পারে না। কিন্তু বর্দ্ধনকুঠি হইতে ব্রহ্মপুত্র প্রায় ১৪।১৫ মাইল দূরবর্ত্তী। তারপর, ব্রহ্মপুত্র স্বনামখ্যাত নদ, লৌহিত্যই ইহার অপর একমাত্র বিখ্যাত নাম। এই নদীকে বেগমতী বলিবার সার্থকতা কি? এই সকল সমস্যার বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে মূলে এইখানে নিশ্চয় কোন গলদ আছে। তবকতের বিভিন্ন পুথিতে বেগমতী নামের যে রূপান্তরগুলি আছে, রেভার্টি সাহেব তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—বেগহাটি, বাকমতী, বাগমতী, বাঙ্‌মতী বা বাঙ্‌গাটি, মাগনদি, নাঙ্গমতী বা নাঙ্গমাটি।

আমার মনে হয়, এই সমস্যার মীমাংসার সূত্রটি তবকতের নিম্নলিখিত বাক্যটিতে প্রচ্ছন্ন আছে যথা—"এই স্থানের সম্মুখে একটি বিশালস্রোতা নদী বহিয়া যাইতেছে, যাহার নাম বেগমতী। যখন এই নদী হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে তখন হিন্দু ভাষায় ইহার নাম হয় সমুন্দ্‌ বা সমুদ্র।" ইহা হইতে বুঝা যায়, যে স্থানের কথা বলা হইতেছে, তখন সেই স্থান পর্য্যন্তও এই নদী হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ এইস্থান হিন্দুস্থানের অন্তর্গত নহে। মহাস্থানের মাত্র বার মাইল উত্তরবর্ত্তী বর্দ্ধনকুঠি সম্বন্ধে কি এই কথা বলা চলে যে উহা হিন্দুস্থানের অন্তর্গত নহে? যে স্থানটির সম্মুখে গঙ্গার তিনগুণ বড় নদী বহিয়া যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানের অর্থাৎ বঙ্গরাজ্যের সীমার বাহিরে, সম্ভবতঃ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। বেগমতী নামটির দুইটি রূপান্তর বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য, যথা—বাঙ্গমাটি এবং নাঙ্গমাটি। পারস্য লাম্‌ এবং রে অক্ষর দুইটি প্রাচীন পুথিতে, বিশেষতঃ অপরিচিত স্থান বা মানুষের নাম লিখিবার কালে বে, তে, ছে, এবং নুন্‌ অক্ষরের সহিত গোলমাল হইয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমার সদ্য প্রকাশিত "লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন এবং প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বীরভূমের প্রসিদ্ধ নগর এইরূপে নুন্‌ এবং লাম্‌-এর গোলযোগে এতকাল লাখনোর বলিয়া পরিচিত হইতেছিল। এই ক্ষেত্রেও, এই সাত শত বৎসরের প্রাচীন পুথি তবকতের শতশত নকল পরম্পরার ফলে বেগমতী নামে অমনি গোলযোগ ঢুকিয়াছিল। বেগমতীর রূপান্তর বাঙ্গমাটি এবং নাঙ্গমাটি হইতে অনুমান

করা যায় যে কামরূপের প্রবেশদ্বার বিখ্যাত রাঙ্গামাটির কথা হইতেছে এবং রাঙ্গামাটি নামটিই বাঙ্গমাটি ও নাঙ্গমাটি হইয়া অবশেষে বেগমতীতে পরিণত হইয়াছে। রাঙ্গামাটি কামরূপের অন্তর্গত এবং ঐ রাজ্যের প্রবেশদ্বার এবং রাঙ্গামাটির সম্মুখে গঙ্গার তিনগুণ প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র আজিও বহিয়া যাইতেছে।

নামটি রাঙ্গামাটি বলিয়া পড়িবামাত্র সমস্ত সমস্যার এক কালে সমাধান হয়। তবকত প্রকৃত পক্ষে রাঙ্গামাটিরই নাম করিয়াছে—উহার সম্মুখস্থ প্রশস্ত নদীটির নাম করে নাই। বাঙ্গালা হইতে কামরূপগামী সমস্ত রাস্তা যাইয়া রাঙ্গামাটিতে মিশিয়াছে। এই স্থান হইতে প্রকৃত পক্ষে কামরূপের আরম্ভ তাই পথ-প্রদর্শক আলি মেচ এই স্থানেই আসিয়া মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল, বঙ্গান্তর্গত বর্দ্ধনকুঠিতে নহে। রাঙ্গামাটির সম্মুখে সত্যই গঙ্গা অপেক্ষা তিনগুণ প্রশস্ত একটি নদী বহিয়া যাইতেছে। এই রাঙ্গামাটি হইতে আরম্ভ করিয়া মুহম্মদ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরিয়া কামরূপে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন, করতোয়ার পশ্চিম তীর ধরিয়া দার্জ্জিলিং বা জলপাইগুড়ি অঞ্চলে যান নাই। বাঙ্গমাটি অথবা নাঙ্গমাটির বে অথবা নুন্ রে রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া নামটি রাঙ্গমাটি বা রাঙ্গামাটিরূপে পড়িবামাত্র সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। তবকতের মূলে এইস্থানে যে গলদ ঢুকিয়াছে তাহার নিম্নলিখিত রূপ সংশোধন এবং সংযোজন প্রস্তাব করা যায়। সংযোজন স্থানগুলি বৃহত্তর অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

সংশোধিত মূল :—

"সে মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারকে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হয়। **মুহম্মদ এমন একস্থানে আসিলেন** যথায় বর্দ্ধন কোট নামক এক সহর ছিল। এইরূপ কথিত হয় যে প্রাচীনকালে সাহ গুষ্ঠাসিব চীন দেশ হইতে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই রাস্তা ধরিয়াই হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া এই (বর্দ্ধন কোট) সহর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। **এই রাস্তা অনুসরণ করিয়া মুহম্মদ এমন একস্থানে আসিলেন যাহার নাম রাঙ্গামাটি।** এই সহরের সম্মুখে একটি বিপুলকায়া নদী……বহিয়া যাইতেছে, যখন এই নদী……আলি মেচ ইসলামের বাহিনীর সহিত যোগ দিল।"

মানচিত্রে রাঙ্গামাটির অবস্থান দেখিলেই বুঝা যাইবে, উহা প্রাচীন কালে কামরূপ রাজ্যের প্রবেশদ্বার রক্ষা করিত। এই জন্য রাজনৈতিক হিসাবে এবং সামরিক হিসাবে উহার গুরুত্ব খুব বেশী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে উহার গুরুত্ব এতই কমিয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমান কালের মানচিত্র গুলিতে উহার অবস্থিতি পর্য্যন্ত দেখান হয় না। বুকানন হামিল্টন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান পরিদর্শন করিয়া ইহার নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"কথিত আছে যে পূর্ব্ব পশ্চিমে রাঙ্গামাটি সহর ছয় মাইল বিস্তৃত ছিল এবং এই স্থানের মধ্যে ৫২টি বাজার বসিত। বর্ত্তমানে সরকারী দালান কোঠার মধ্যে একটি দুর্গমাত্র অবশিষ্ট আছে, একটি মসজিদও আছে। দুর্গটি বিশেষ দুর্ভেদ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না, মসজিদটিও ছোট এবং শিল্প-নৈপুণ্যবিহীন।"

Martin's Eastern India. Vol. III. p. 472.

এইবার আবার তবকতের মূল অনুসরণ করা যাউক।

মূল। "মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার এই নদীর তীরে আগমন করিলেন এবং আলি মেচ আসিয়া মুসলমান বাহিনীর সহিত যোগ দিল; এবং দশদিন পর্য্যন্ত সে ঐ বাহিনীকে নদীর প্রতিলোমে পর্ব্বতের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়া এমন একস্থানে উপনীত হইল, যথায় প্রাচীন কাল হইতে বিশটিরও অধিক খিলান-যুক্ত এক প্রস্তর-সেতু বিদ্যমান ছিল। মুসলমান বাহিনী ঐ সেতু পার হইলে মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার ঐ সেতুর পাহারার জন্য সেতুর মুখে তাঁহার স্বকীয় দুই জন আমীরকে স্থাপিত করিলেন। ইহাদের একজন তুর্কি ক্রীতদাস। আর একজন খল্জ জাতীয়। মুহম্মদ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত ঐ সেতুর পাহারার জন্য ইহাদের সহিত (উপযুক্ত) সৈন্য রহিল। অতঃপর মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার তাঁহার বাকী সৈন্য সামন্ত সহ ঐ

পুল পার হইলেন! কামরূদের * রাজা যখন অবগত হইলেন যে বিজয়ী মুসলমান বাহিনী প্রস্তর সেতু পার হইয়াছে তখন তিনি বিশ্বাসী দূতগণের মুখে এই বার্ত্তা মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের নিকট প্রেরণ করিলেন:—'তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইহা প্রশস্ত সময় নহে। এইবার ফিরিয়া যাওয়া এবং (আগামী বারের জন্য) যোগ্য আয়োজন করাই কর্ত্তব্য। আমি কামরূপের রাজা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আগামী বৎসর আমি আমার নিজের বাহিনী লইয়া মুসলমান বাহিনীর সহিত যোগ দিব এবং মুসলমান বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইব ও ঐ রাজ্য (তিব্বত) জয় করাইয়া দিব।' মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার এই পরামর্শ একেবারেই গ্রহণ করিলেন না এবং তিব্বতের পর্ব্বতাভিমুখী হইয়া অগ্রসর হইলেন।"

মন্তব্য। তবকতের এই অংশের রেভার্টিকৃত অনুবাদ সম্ভবতঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কারণ ১৮৭৫ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ব্লখম্যান সাহেব এই অংশের সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহার ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৫১ সনের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় চতুর্থ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় মেজর হেনে নামক একজন সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী বঙ্গ হইতে কামরূপ-গামী সদর রাস্তার উপরিস্থিত এবং গৌহাটির অদূরে অবস্থিত ২১ খিলান ফাঁকযুক্ত একটি পাথরের সেতুর বর্ণনা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কুতর্ক তুলিয়া রেভার্টি সাহেব এই সেতুই যে মুসলমান বাহিনী কর্ত্তৃক অতিক্রান্ত বিংশত্যধিক খিলানযুক্ত পাথরের সেতু হইতে পারে—এই সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। আর ব্লখম্যান সাহেব তো করতোয়া অনুসরণ করিয়া মুসলমান বাহিনীকে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নিয়া ফেলিয়াছেন! পরলোকগত ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ব্লখম্যানের নির্দ্ধারণই মানিয়া লইয়াছেন! এই সকল কারণে মেজর হেনে বর্ণিত ২১ খিলানের পাথরের সেতুটির কথা ঐতিহাসিক-গণ যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন! এইস্থানে কামরূপীয়গণের আশ্চর্য্য স্থাপত্য-কুশলতার নিদর্শন এই প্রস্তর-সেতুটির কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করা যাউক

আসামের প্রধান নগর গৌহাটি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কলিকাতার যেমন হাওড়া, তেমনি ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরেও সহরের বিস্তৃতি আছে। ইহাকে উত্তর গৌহাটি বলে। এই উত্তর গৌহাটি হইতে প্রায় ৮মাইল উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী পুষ্পভদ্রা নদীর উপর এই প্রস্তর-সেতুটি অবস্থিত ছিল। ছুটিয়াপাড়া ষ্টেসন হইতে সেতুটি মাইল তিনেক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র তীরে আমিনগাঁও বিখ্যাত ষ্টেশন। ছুটিয়াপাড়া আমিনগাঁও হইতে মাইল পাঁচেক উত্তরে। ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই আশ্চর্য্য প্রস্তর-সেতুটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। নদীর মধ্যস্থ স্তম্ভগুলি হয়ত এখনও কয়েকটা আছে। বিচ্ছিন্ন প্রস্তর খণ্ডগুলি কয়েক জন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ব্রহ্মপুত্র যোগে ৪০ মাইল দূরস্থিত বড়পেটা লইয়া গিয়া মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে লাগাইয়াছেন বলিয়া অবগত হইলাম। †

মেজর হেনের প্রবন্ধের সহিত প্রস্তর-সেতুটির একখানি চিত্র আছে, উহা এই স্থানে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল। বর্ত্তমানে এই বিধ্বস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির পূর্ণ বর্ণনা একমাত্র মেজর হেনের প্রবন্ধেই প্রাপ্তব্য। উহা হইতে দরকারী অংশগুলি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-সেতুটি উত্তর গৌহাটির ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। পশ্চিম কামরূপ হইতে প্রাচীন গৌহাটি বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরের দিকে অগ্রসর হইবার যে প্রধান রাস্তা ছিল, এই সেতুটি তাহারই উপরে অবস্থিত। যে নদীটির উপরে ইহা নির্ম্মিত তাহা সম্ভবতঃ এক সময় বড়নদীর খাত ছিল। মনে হয়, এক সময়ে ইহা স্পষ্ট সীমাবচ্ছিন্ন নদী ছিল এবং সেতুর গায়ে চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যায় যে বর্ষায় এক সময় এই নদীটি দিয়া যথেষ্ট জল ব্রহ্মপুত্রে নামিত। স্থানীয়

---

* এই যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কামরূপকে সর্ব্বত্র কামরূদ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

† এই প্রস্তর-সেতু সম্বন্ধে নানা খবর আসাম গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রায় শ্রীযুক্ত কণকলাল বড়ুয়া বাহাদুরের নিকট হইতে এবং ডাকঘরের পরিদর্শক মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আমি এই দুইজনের নিকটই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

লোকেরা বলে, বর্ষায় আজিও ব্রহ্মপুত্রের জল এই নদীতে প্রবেশ করে।

"সেতুটির গাঁথুনী অতি দৃঢ়। খিলান নাই—সেতুর ছাউনী সামান্য রকম কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি এবং ১৪০ ফিট্ লম্বা। এই ছাউনী ৮ফিট্ প্রশস্ত,—পাঁচখানি প্রস্তরের তক্তা পাশাপাশি বসাইয়া এই ছাউনী গঠিত। তক্তাগুলি ১০ ইঞ্চি পুরু এবং ৬ ফিট্ ৯ ইঞ্চি লম্বা। তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত স্তম্ভসারির উপর এই ছাউনী স্থাপিত। প্রথমে অনেক খানি স্থান গোলাকৃতিতে বাঁধাইয়া তাহা হইতে একটি অর্দ্ধপিণ্ড বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই অর্দ্ধপিণ্ড হইতে পুলের ছাউনি আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পরে সমান ফাঁক রাখিয়া পূর্ব্ব-কথিত তিনটি স্তম্ভের সারির উপর দিয়া ছাউনী চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরে আবার ফাঁক এবং পরে একটি বিশাল পিণ্ড নির্ম্মিত এবং তাহার উপরে ছাওনী স্থাপিত। এইরূপে ১৬টি স্তম্ভের সারি, তিনটি বিরাট পিণ্ড এবং আরম্ভে ও শেষে দুইটি অর্দ্ধপিণ্ডের উপর সম্পূর্ণ পুলটি স্থাপিত এবং পুলের নীচে জল-নির্গমের জন্য ২১টি ফাঁক্ আছে।

"......যদি ধরা যায় যে ১২০৫ ৬ খ্রীষ্টাব্দের মুসলমান অভিযান রাঙ্গামাটিতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল এবং তাহার পরে মনাস নদী অতিক্রম করিয়া উত্তর কামরূপের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, যাহাতে কামরূপের রাজা বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—তবে ইহা অসম্ভব নয় যে বক্তিয়ার খিলিজি এবং তাঁহার তাতারী অশ্বারোহী সেনাদল এই পুলের উপর দিয়াই রণযাত্রা করিয়াই প্রচীন গৌহাটি সহরের বহির্দুর্গগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গৌহাটির উত্তর পশ্চিম দিক রক্ষা করিয়া যে পাহাড়ের শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্য দিয়া রাস্তা যাইয়া গৌহাটি পৌছিয়াছে। গৌহাটিগামী রাস্তা যে স্থানে গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে পাহাড়ের উপরে অনেক মাইল ধরিয়া রাস্তার দুইধারেই শত্রুর আক্রমণ নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকশ্রেণী স্থাপিত। ঐ সঙ্কট হইতে পুলটি বড় বেশী দূর নহে।

"মুসলমান সেনাপতিকে অনেক দুর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। সম্ভবতঃ তিনি চারদুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে কামরূপের রাজা পুলটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। পুলের ছাউনীর তক্তাগুলি পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এইগুলি একবার খুলিয়া লইয়া পরে আবার বিশৃঙ্খল ভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়াছে।"

হেনের বর্ণনা হইতে বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম। হেনে বেগমতী রাঙ্গামাটির অভিন্নত্ব আলোচনা করেন নাই। কিন্তু রেভার্টি, ব্লখম্যান ইত্যাদি বড় বড় পণ্ডিত যেখানে শুধু গোলযোগের উপর গোলযোগ চাপাইয়াছেন, তথায় সামরিক কর্ম্মচারীর স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতিবলে তিনি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলেন যে এই সমরাভিযানে মুসলমান বাহিনী রাঙ্গামাটিতে প্রথম ব্রহ্মপুত্রের দেখা পাইয়াছিল। বাঁশের ছোট ছোট সাঁকো বাঙ্গালা ও আসামের স্থানে স্থানেই দেখা যায় কিন্তু একটি আস্ত নদীর উপরে পাথরের সাঁকো যেখানে সেখানে নির্ম্মিত হওয়ার কথা নহে। বস্তুতঃ এত বড় পাথরের সাঁকো বাঙ্গালা ও আসামে আর একটিও আছে বলিয়া অবগত নহি। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন মুহম্মদ কর্ত্তৃক অতিক্রান্ত প্রস্তর-সেতুটির বিংশতি বা তাহারও অধিক খিলান ছিল। এই শিলহাকোর প্রস্তর-সেতুতে জল-নির্গমের জন্য ২১টি ফাঁক আছে। সেতুটি আবার গৌহাটি যাইবার সদর রাস্তার উপরেই অবস্থিত। হেনের প্রবন্ধে মুসলমান সৈন্যের রাঙ্গামাটিতে ব্রহ্মপুত্র দর্শনের অনুমানও আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রেভার্টি অথবা ব্লখম্যান বা অন্য কাহারও এত মিল সত্ত্বেও খেয়াল হইল না যে নাঙ্গমাটি বা বাঙ্গমাটি রাঙ্গামাটি হওয়াই সম্ভব এবং শিলহাকোর সেতুই তবকত বর্ণিত সেতু হইতে পারে। রেভার্টি বরং মতিভ্রান্ত উকিলের মত এই সমীকরণের বিরুদ্ধেই তর্ক করিয়া গিয়াছেন। এই সেতু হইতে মাত্র বার মাইল দূরে কানাই-বড়শীবাওয়া লিপিতে মুসলমান বাহিনী ধ্বংসের সন তারিখওয়ালা লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই শিলহাকোর সেতুই যে তবকত বর্ণিত সেতু সেই বিষয়ে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই সমীকরণের বিরুদ্ধে রেভার্টি ও ব্লখম্যানের সমস্ত তর্কের উত্তর দিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যাইবে। তবে দুই একটি প্রশ্নের বিচার না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

ব্লখম্যান করতোয়া ও তিস্তা অনুসরণ করিয়া মুসলমান বাহিনীকে দার্জ্জিলিংএর নিকটে নিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই শিলহাকোর সেতু এবং তবকত বর্ণিত সেতুর একত্ব গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু বেগমতী ও রাঙ্গামাটির অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে এখন স্পষ্টই বুঝা যায়, মুসলমান বাহিনী রাঙ্গামাটি হইয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরিয়াই পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

বেগমতী ও রাঙ্গামাটির অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে রেভার্টির অধিকাংশ আপত্তির সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে। রেভার্টি বলেন, সেতুর দুইটি খিলানের মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩ ফিট্ ৯ ইঞ্চি। কামরূপের রাজা সেতুর দুইটি খিলান মাত্রই ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই সামান্য স্থান ভাঙ্গাতে মুসলমান বাহিনী এত বিপন্ন হইয়া পড়িল কেন? উহাতো অনায়াসেই গাছ বা বাঁশ দিয়া মেরামত করা যায়!

কামরূপরাজের সাধারণ রকম বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল—এই টুকুও স্বীকার না করিলে তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। পুল যখন তিনি ভাঙ্গিয়াছিলেন তখন তিনি মুসলমান বাহিনীর

সহিত কিঞ্চিৎ পরিহাস মাত্র করিবার জন্য উক্ত কার্য্য করেন নাই। তবকতে আছে, যে আমীর দুইজনকে মুহম্মদ পুলের পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিয়া পুল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সেই অবসরে কামরূপ রাজের সৈন্যগণ আসিয়া পুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। ভাঙ্গিলে নিশ্চয়ই এমন করিয়াই ভাঙ্গিয়াছিল যেন ঐ ১৩ ফিট্ ৯ ইঞ্চি ভগ্ন স্থান মেরামত করাও সহজে সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ উপরের তক্তাতো সরাইয়াছিলই, নীচের স্তম্ভ বা পিণ্ডও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। মুহম্মদ যখন পুলের নিকট ফিরিয়া আসেন তখন রণশ্রমে, পথশ্রমে, অনাহারে, পীড়ায় তাঁহার হতাবশিষ্ট বাহিনী একান্ত অবসন্ন। কামরূপের সৈন্যগণ অনবরত তাহাদের পিছনে লাগিয়াই ছিল। এই অবস্থায় ঐ অবসন্ন সৈন্যগণের সহায়তায় পাথরের ভগ্ন পুল মেরামত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় নাই।

মুসলমান বাহিনীকে যে রাজধানীর অত নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতেও কেহ কেহ বিস্ময় অনুভব করিয়াছেন। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সমগ্র উত্তরাপথ তখন মুসলমানের করতলগত হইয়াছে এবং বঙ্গ-বিহার-বিজেতা মুহম্মদের ভয়ে তখন একমাত্র অবশিষ্ট হিন্দুরাজা কামরূপ কম্পান্বিত। এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাকে কামরূপের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কামরূপ-রাজ নিশ্চয়ই বিষম ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানিলেন যে মুহম্মদের উদ্দেশ্য তিব্বত, কামরূপ নহে, তখন তিনি মুসলমান বাহিনীকে সাহায্য করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলেন। আরও এক কথা। কামরূপ-রাজের সহিত পরবর্ত্তীকালে মুসলমান সেনাপতিগণের যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখা যায়, কামরূপের যুদ্ধপ্রথাই এই রকম ছিল। শীতকালে আততায়ীকে যথেচ্ছ অগ্রসর হইতে দেওয়া হইত। বর্ষা আসিলেই চারিদিকে চাপিয়া আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করা হইত।

মুহম্মদের তিব্বত-অভিযানের পরবর্ত্তী কাহিনী অতি করুণ। প্রস্তরসেতু পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য রাস্তা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়া ১৫ দিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মুহম্মদ সমতল দেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই খানে একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গের নিকটে শত্রুসৈন্যের সহিত সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল এবং বহু মুসলমান সৈন্য হত হইল। বন্দী শত্রুসৈন্যগণের নিকটে শুনা গেল যে করপত্তন, করমপত্তন বা করার পত্তন নামক এক অদুরবর্ত্তী নগরে ৫০ হাজার অশ্বারোহী সমবেত হইয়াছে—তাহারা রজনী-প্রভাতেই আসিয়া মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করিবে। এই সংবাদে ভীত হইয়া মুহম্মদ প্রত্যাবর্ত্তনই শ্রেয় মনে করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে কিন্তু দেখা গেল যে দেশ সম্পূর্ণ জনশূন্য হইয়াছে, মানুষের অথবা পশুর কোন খাদ্যদ্রব্যই প্রাপ্তব্য নহে। অকথ্য কষ্ট ও অনশন সহ্য করিয়া মুসলমান বাহিনী পাথরের সেতুর নিকট আসিয়া দেখিল—উহার পাহারায় যে দুইজন আমীরকে রাখা হইয়াছিল তাহারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিয়া সেতু ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং কামরূপের সৈন্য আসিয়া সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। নদী পার হইবার কোন উপায়ই নাই। নিরুপায় মুসলমান বাহিনী নিকটবর্ত্তী এক বৃহৎ প্রস্তর-মন্দিরে * আশ্রয় গ্রহণ করিল। কামরূপের সৈন্য আসিয়া দুর হইতে বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া মন্দিরের চারি দিকে এক শক্ত বেড়া তুলিতে লাগিল,—খাঁচায় হিংস্র পশু যে ভাবে আটকায়, মুসলমান বাহিনীকে তেমনি আটকাইবার মতলবে। এই বেড়া ভাঙ্গিয়া মুসলমান বাহিনী বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীর পারে চলিয়া গেল। এমন সময় এক মিথ্যা রব উঠিল যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় এমন অল্প জলবিশিষ্ট স্থান নদীতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া মুসলমান বাহিনী নদীতে নামিয়া পড়িল, কামরূপের সেনা নদীর পার হইতে অনবরত তীর চালাইতে লাগিল। নদীতে প্রকৃত পক্ষে অথই জল ছিল—সমস্ত মুসলমান বাহিনী উহাতে ডুবিয়া মরিল। শুধু মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দুই চারিজন অনুচর সহ উত্তীর্ণ হইয়া দেবকোটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকদিন পরে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মুহম্মদ সম্ভবতঃ ১৫ দিনে মাইল পঞ্চাশের বেশী তিব্বতের দিকে যাইতে পারেন নাই। প্রথম পাহাড় শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তিনি সম্ভবতঃ ভুটানে মাত্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। শিলহাকো হইতে একটি রাস্তা আজিও সোজা উত্তরে যাইয়া ভুটানে প্রবেশ করিয়াছে। উহার নিকটে কারুগোজা নামক স্থান দেখা যায়। ইহাই তবকতের করারপত্তন হইতে পারে।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে মুসলমান বাহিনী বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কানাইবড়শীবাওয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই এই সনের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে অথবা ১২০৫ সনের ডিসেম্বরের শেষ দিক দিয়া মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার তাঁহার তিব্বত-অভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

---

* আসামের স্বায়ত্ত-শাসন-মন্ত্রী প্রত্নরসিক রায় শ্রীযুক্ত কণকলাল বড়ুয়া বাহাদুর অনুমান করেন যে এই মন্দির শিলহাকোর ৬ মাইল উত্তরস্থ গোপেশ্বর মন্দির। শিলহাকোর দক্ষিণে হাজো নামক স্থানেও পুষ্পভদ্রা নদীর প্রায় মুখে বড় বড় পাথরের মন্দির আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমান বাহিনী হাজোর মন্দিরেই আশ্রয় লইয়াছিল।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বিনুর জীবনে এবার দ্রুত দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের পালা। এত দ্রুত বেগে ঘটনার স্রোত বিনুর উপর দিয়া বহিয়া গেল যে সে ভাল করিয়া তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল কিনা সন্দেহ। তাহার মনে একটি ঘটনা ভাল করিয়া ছাপ রাখিতে না রাখিতে অপর ঘটনা নূতন ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া গেল।

সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে যে চিত্রটি সৃষ্টি করিল তাহা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল কয়েকটি দৃশ্যের টুকরা মাত্র,—খাপছাড়া কয়েকটি ঘটনা,—আপাতঃ অসংলগ্ন কয়েকটি ছবি। তাহার শিশুমনের ধারণাশক্তি আর কত, সে শক্তির উপর চূড়ান্ত অত্যাচার হইয়া গেছে।

প্রথম তাহার বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার দিন। বিনুর কি আর এমন মনে পড়ে!

স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। মাহিনা দিতে বাবা পারেন নাই। স্কুলে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ধমকাইয়াছেন। সে ইচ্ছা করিয়াই হয়ত বাড়ী হইতে টাকা আনেনা ভাবিয়া কড়া করিয়া চিঠি লিখিয়া দিয়াছেন তাহার হাতে। বলিয়াছেন—"যদি কাল মাইনে না আনিস্ তাহলে শুধু নাম কাটা যাবেনা তোরও হাড়মাস একত্র রাখব না! বুঝেছিস্?"

বিনু নীরবে বুঝি ঘাড় নড়িয়াছিল।

"ও ঘাড় নাড়া নয়! মিটমিটে ডান ছেলে, তোমার মত আমি অনেক চরিয়ে খেয়েছি। এই একান্ন বছর বয়স হ'ল, ছেলে দেখে দেখে মাথার চুল পেকে গেছে। কাল যদি টাকা না আনিস্ তাহলে বুঝব এ চিঠি তোর বাবা পায়নি!"

বাবাকে চিঠি দিবে কেমন করিয়া বিনু সারা রাস্তা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল। বাবা যে রাগ করিবেন তাহার জন্যই তাহার ভাবনা নয়—বাবার রাগও আজকাল তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু বাবার দেখা সে কোথায় পাইবে! বাবা আজকাল কোন দিন যে আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় বাবার দেখা মিলিল। বাবা গম্ভীর হইয়া চিঠি পড়িলেন এবং দৈবের অনুগ্রহে আজ বিনুকে দাঁত না খিচাইয়া তাহার স্কুলের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

"হুঁ, নাম কাটা যাবে! ভারী ত স্কুল তার আবার মাস মাস মাইনে চাই! চোর; বেটারা সব চোর! পড়াশোনা শেখায় না ছাই শেখায়! যা তোকে কাল থেকে আর স্কুল যেতে হবে না! কাটুক বেটারা নাম।"

বিনুর পক্ষে এ ব্যবস্থা এক প্রকার ভাল। মাহিনা না লইয়া স্কুলে যাওয়ায় যে কি গ্লানি, কি লজ্জা তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। সব মাষ্টার সমান নয়। তাহার যে ক্লাশে মাহিনা না দিয়া বসিবার অধিকার নাই, দয়া করিয়াও নয়, ঘৃণা ভরে তাহাকে যে শিক্ষা ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে মাত্র, একথা কেহ কেহ তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দেন।

রাম বাবুর রাগটাই যেন বেশী। স্কুলটা যেন তাঁহারই সম্পত্তি এবং বিনু যেন ফাঁকি দিয়া তাঁহারই খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছে। প্রথমে আসিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কি রে বেটা, মাইনে এনেছিস্!"

উত্তর আর দিতে হয় না। তিনি আগে হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লইয়া বলেন—"হাঁ, আজও আনা হয় নি! এদিকে আয়!"

রাম বাবু মারিতে জানেন না এই টুকু যা সৌভাগ্য। কিন্তু হুলের মত তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্যে বিষ এতই বেশী যে বিনুর মনে হয় ইহার চেয়ে মারিলে বুঝি ভাল হইত!

রাম বাবু বলেন—"ঠিক করে বল দেখি, মাইনের টাকায় লজঞ্চুস খেয়েছিস কিনা! বল!"

বিনু কাতর ভাবে বলে, "না স্যার!"

"না, স্যার! তবে টাকা গেল কোথায়?"

"বাবা মাইনে দেয়নি স্যার!"

"না দেয়নি। দুমাস হয়ে গেল, তোর বাবা ঘুমিয়ে আছে, না? বল না কেন দুমাস তোকে খেতেও দেয়নি।"

বিনু চুপ করিয়া থাকে।

রাম বাবু বলেন—"এটা ফ্রি স্কুল নয় বুঝেছিস। বাবাকে বলিস, এখানে ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়ে।"

বিনু বিমর্ষ ভাবে বেঞ্চিতে গিয়া বসে। কিন্তু তাহার লাঞ্ছনার এই খানেই শেষ নয়।

মাষ্টার মহাশয় দাঁত খিঁচাইয়া বলেন—"ওখানে নয়, ওই লাষ্ট বস গে যাও। মিনি মাগনা অত বিদ্যে হয় না।"

বিনু তাহাই বসে। মাষ্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের ডিক্টেশন্ দেন এবং ইচ্ছা করিয়াই সকলের খাতা দেখিয়া বিনুর খাতাটা শুধু নাম পড়িয়াই তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন।

এ অপমানে বিনু একেবারে মরমে মরিয়া যায়। সুতরাং স্কুলে না যাইতে হওয়ায় বিনু একরকম খুশীই হইয়াছে।

বাড়ীতে অবশ্য সারাদিন থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। কোন কাজ নাই, খেলিবারও সাথী নাই। মা আজকাল অত্যন্ত খিটখিটে হইয়াছেন, পদে পদে বকুনি খাইতে খাইতে তাহার প্রাণ যায়। তবু স্কুলের অপমানের চেয়ে এ ভাল।

সেদিনও সে দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া দেবুর দেওয়া সেই বাবার ছেঁড়া বইখানি অন্যমনস্ক ভাবে উল্টাইতেছিল।

মা প্রদীপের সলিতা পাকাইতে পাকাইতে তাহাকে অকারণে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন।

"দিনরাত ও ছবির বই দেখে কি হবে শুনি! স্কুল নেই বলে বাড়িতে দুদণ্ড কি পড়ার বই মুখে করা যায় না। আর স্কুল নেই বা কেন! মাইনে দেওয়া হয় নি বলে মাষ্টার আর স্কুলে যেতে দেবে না—ওসব তোর মিথ্যে কথা। সব বানানো—আমি আর কিছু বুঝিনা! দুমাস মাইনে না দিলে কি হয়। সবাই অমনি মাস মাস মাইনে দেয়—আমায় একেবারে জল বুঝিয়ে দিলি তুই! কাল যদি স্কুলে না যাস্ ত তোর ভাত নেই!"

বকুনির কোন অর্থও নাই উদ্দেশ্যও নাই। বিনু এসবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে আপন মনে ছবি দেখিতেছিল।

হঠাৎ ঝড়ের মত বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বাবার চেহারা অনেক দিনই খারাপ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল, ভীত কোনো দিন বিনু দেখে নাই।

সমস্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত, রুক্ষ চুল গুলি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বাবা ঘরে ঢুকিয়াই মাকে ডাকিলেন—"ওগো শীগ্‌গীর শুনে যাও।"

সে কণ্ঠস্বরে এমন গভীর আশঙ্কার আভাস দিল যে বিনু ছবির বই হইতে মুখ তুলিয়া তাকাইতে বাধ্য হইল।

মাও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন,—কাছে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো, তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

বাবা কাতর স্বরে বলিলেন—"না না অসুখ করেনি, কিন্তু আমায় এক্ষুণি যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তুমি কি বলছ, কি! পাগল হলে নাকি?" মার গলা দিয়া যেন কথা আর বাহির হইতে চায় না। স্বামীর এমন চেহারা তিনিও কখন বুঝি দেখেন নাই। মাতাল হইয়া তিনি আজকাল প্রায় বাড়ি আসেন—এক একদিন কেলেঙ্কারী করিতেও কিছু বাকী রাখেন না। বিনুর মা বাহিরে স্বামীর সে রুদ্র রূপ ভয় করিলেও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু সহজ অবস্থায় তাঁহার এরকম কথাবার্ত্তা কেন!

বিনুর মা আবার বলিলেন—"তুমি বোস গো, ঘরে এসে বোস। মাথায় বাতাস করব?"

বিনুর বাবা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"তুমি ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না লীলা না! বুঝি এর চেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেলেই ভালো ছিল।"

বিনুর বাবা একবার বাহিরের দরজার দিকে সভয়ে চাহিয়া ক্ষণিক কি ভাবিয়া লইয়া আবার বলিলেন—"কিন্তু তোমাদের কি ব্যবস্থা হবে!"

বিনু বাবার অদ্ভুত ভাবগতিক দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিনুর মা কাতর মিনতি করিয়া বলিলেন—"ও গো তুমি একটু ঘরে এসে বস না গো।"

"বসবার সময় নেই লীলা—বুঝতে পারছ না! শোন তা হলে! আমায় এক্ষুনি চলে যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।"

শেষের কথা গুলি বলিতে বলিতে বাবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার চোখের জলও বাধা মানিল না। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"এসব তুমি কি বলছ!"

হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বিনুকে কাছে টানিয়া বাবা বলিলেন, —"আমি তোমাদের শুধু শত্রুতাই করে গেলুম লীলা, আজ থেকে তোমরা পথে বসলে।"

মা চুপ করিয়া রহিলেন। বিনুর বাবা অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলিতে লাগিলেন—"অফিসের টাকা ভেঙেছিলাম অনেকদিন। এতদিনে সব ধরা পড়েছে। ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেছে। এখন না পালালে আর উপায় নাই।"

একটু থামিয়া হঠাৎ আগ্রহভরে বাবা বলিলেন—"কিন্তু তোমরাও ত' সঙ্গে যেতে পার লীলা! নাও নাও, শীগ্‌গির গুছিয়ে নাও তা হ'লে। এখনও সময় আছে! তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

বিপদের মুহূর্ত্তে বাবা যেন আবার পূর্ব্বের সেই স্নিগ্ধতা ফিরিয়া পাইয়াছেন। বাবার এই অসহায় রূপ দেখিয়া বিনুর সত্যই কষ্ট হইতেছিল। মা কি বুঝিয়াছিলেন কে জানে, ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এসব জিনিষপত্র কি ফেলে যেতে হবে?"

"সব ফেলে যেতে হবে লীলা, বুঝতে পারছ না যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিস আসতে পারে আমায় ধরতে!"

পুলিসের কথায় মা প্রথম সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব যেন উপলব্ধি করিলেন। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"কোথায় যাব?"

"তা কি জানি! এখন বেরিয়ে ত পড়ি চল!" বাবার বুকের তলদেশ হইতে যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মা তখনও বিমূঢ় হইয়া দাড়াইয়া ছিলেন। বাবা আবার বলিলেন—"একবস্ত্রে বেড়িয়ে পড়তে হবে লীলা—জিনিষ পত্রের কথা ভুলে যাও।"

মার সমস্ত মুখ ভয়ে দুঃখে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"চল তাহলে!"

"তবু একটা পুঁটুলি করে বাসন-কোসন কিছু নাও, পথে লাগবে! আর তাছাড়া জিনিষপত্র কিইবা আছে।"

যন্ত্রচালিতের মত মা বাবার আদেশ পালন করিতে গেলেন। বিনুকে কোলের কাছে লইয়া বাবা মাথায় হাত দিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন।

মার প্রস্তুত হইতে তেমন দেরী হইল না। ফিরিয়া আসিয়া হতাশ ভাবে ঘরদোরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সবই ত' পড়ে রইল!"

"তা থাক্, এখন কোন রকমে মানে মানে পালাতে পারলে হয়। একটু দাঁড়াও আমি বাইরেটা একবার দেখে আসি। কেউ দেখে না ফেলে।"

বিনুর বাবা বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর বাবাকে আর ফিরিতে হইল না।

বাহিরে গোলমাল শুনিয়া মা ভয়কম্পিত কণ্ঠে বিনুকে একবার দেখিয়া আসিতে বলিলেন। বিনু দরজার কাছে গিয়া একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

কয়েকজন পুলিস সঙ্গে করিয়া কোট-প্যাণ্টপরা এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে কি কথা কহিতেছে।

বিনুর মা ছেলেকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। নিজেও দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পুলিস দেখিয়া সেই খানেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবা কথা কহিতে কহিতে কান্না শুনিয়া থামিয়া গেলেন। দরজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি ভেতরে যাও। যা বিনু, মাকে ভেতরে নিয়ে যা।"

কিন্তু মা ও ছেলে কেহই সেখান হইতে নড়িল না।

বিনুর বাবা এবার কাছে আসিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ভয় কি লীলা, আমি এক্ষুণি ফিরে আসব।" কিন্তু সে হাসি একান্ত অসহায় কান্নার চেয়েও করুণ। স্বামীর হাত ধরিয়া বিনুর মা আরও জোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হ্যাট-কোটপরা লোকটি যেন বিব্রত বোধ করিতেছিল। দূর হইতে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "ভয় কি মা, আপনার স্বামীকে আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিনা। থানায় শুধু একবার দেখা করে ফিরে আসবেন।"

বাবা নির্ব্বোধের মত বলিলেন—"দেখুন দিকি! এতে আর ভয় কিসের!"

কিন্তু মা যে ইতিপূর্ব্বেই সব কথা শুনিয়াছেন। মান লজ্জা সরমের কথা ভুলিয়া রাস্তার উপরেই কাঁদিয়া কাটিয়া, স্বামীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পুলিস কর্ম্মচারীর পায়ে ধরিয়া একাকার করিলেন।

কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইলই। পুলিসের লোক শেষ পর্য্যন্ত এক রকম জোর করিয়াই মার হাত ছাড়াইয়া বিনুর বাবাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি তখনও নির্ব্বোধের মত হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন—"ভয় কি লীলা, আমি আবার ফিরে আসব।"

তাহার পর কয়েকটি মাস কি নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়া যে কাটিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিনু শুনিয়াছে তাহার বাবার জেল হইয়াছে। পাঁচ বছর না ছয় বছর সে ভাল করিয়া জানেনা, এইটুকু শুধু বোঝে যে বহুদিন আর বাবার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না।

মা প্রথমটা কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিয়াছিলেন। দিনে রাত্রে পাগলের মত ছটফট করিয়া বেড়াইতেন। যখন তখন মেঝেয় মাথা ঠুকিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে তিনি একেবারে গুম হইয়া গিয়াছেন। মার এই চেহারা দেখিয়া বিনুর বেশী ভয় করে। ইহার চেয়ে মার কান্না সহ করা সহজ। মা যে সারাদিন মুখ বুজিয়া থাকেন, অন্যমনস্কের মত কোন কথাতেই ভাল করিয়া কান দেন না ইহাতে বিনুর কি রকম যেন হইতে থাকে।

তাহাদের দিন কেমন করিয়া চলিতেছে কে জানে! মানুষ সবাই বোধ হয় খারাপ নয়। বাড়ীওয়ালা দূরে থাকে। ভাড়া চাহিতে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। পরে একদিন নিজে হইতে আসিয়া বিনুকে ডাকিয়াছে এবং তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী বিনুর মার উদ্দেশে বলিয়াছে—"আপনার কাছে ভাড়া আমি চাইনা; এ বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতেও বলিনে। কিন্তু আমিও ছাঁপোষা মানুষ সামান্য আয়, একেবারে এ বাড়ির ভাড়া না পেলে আমার চলে না।"

বিনুর মা আড়াল হইতে বলিয়াছেন—"ওঁকে বল বিনু, আমরা বেশীদিন আর ওঁর ক্ষতি করব না। তোমার মামার চিঠি এলেই আমরা চলে যাব।"

বাড়িওয়ালা বলিয়াছে—"সে কথা বলছিলাম না। আমি বলি কি—আপনাদের এখন ত দুটো ঘর দরকার নেই। একটায় আপনারা থাকুন, আর একটায় ভালোলোক দেখে আমি ভাড়া দিই। আমারও তা হ'লে ক্ষতি হয় না আপনাদেরও সুবিধে হয়।"

এই ছোট সঙ্কীর্ণ বাড়িতে আবার অপর ভাড়াটের সঙ্গে থাকিবার কথায় বিনুর মা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? বাড়িওয়ালা তাঁহাদের দয়া করিয়া যে থাকিতে দিতেছে ইহাই যথেষ্ট। তিনি চুপ করিয়াই ছিলেন।

"আচ্ছা আপনি ভেবে দেখবেন! আমি আবার আসব!" বলিয়া বাড়িওয়ালা চলিয়া গিয়াছিল।

বিনুদের নিকট আত্মীয় কোন দিকে কেহ নাই। মা তাঁহার পিসতুত ভাই-এর কাছে চিঠি লিখিয়াছিলেন, অনেক মিনতি করিয়া একটু আশ্রয় চাহিয়াছিলেন মাত্র। পিসতুত ভাই গ্রামে থাকে। চাষবাস জমি জোরাত করিয়া সুখেই আছে বলিয়া বিনুর মা শুনিয়াছিলেন।

কিন্তু পিসতুত ভাই-এর গৃহে অসহায় নারীর আশ্রয় নাই। সে বিনয় করিয়া লিখিল—এ বিপদে তাহার আপন মামাত' ভগ্নীকে সাহায্য করিতে পারিলে সে অত্যন্ত সুখী হইত। কিন্তু তাহার অবস্থা বড় খারাপ। ক্ষেত খামার জল অভাবে জ্বলিয়া গিয়াছে। বাজারে ফসলের দর নাই। এবার যেন তাহাকে মাপ করা হয়।

আশ্রয় মিলিতে পারে সম্ভব অসম্ভব এমন আরো অনেক জায়গায় বিনুর মা কাতর আবেদন জানাইলেন। ফল কিছু হইল না। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় খবর পাইয়া দেখা করিয়া গেল। যাইবার সময় সামান্য কিছু টাকা এবং প্রচুর আশ্বাস দিয়া যাইতেও ভুলিল না। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। তাহার পর আর তাহার সাড়াশব্দ মিলিল না।

বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যে আবার আসিল। বিনুর মা কথাটা নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। তাই তিনি ভাড়াটে কে একেবারে সঙ্গে করিয়া ঘর দেখাইতে আনিয়াছেন।

ভাড়াটে সস্ত্রীক সেখানে থাকিবে। বেশী হাঙ্গাম নাই। শুধু স্বামী আর স্ত্রী। কিন্তু পুরুষটির চেহারা আড়াল হইতে দেখিয়া বিনুর মা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। লোকটার চেহারা অত্যন্ত চোয়াড় গোছের। ঘর দেখিবার ছুতায় অত্যন্ত অভদ্রভাবে সে এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

ভাড়াটে ঘর দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর বাড়িওয়ালা বিনুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার মাকে বল খোকা, ওদের ঘর পছন্দ হয়েছে। কাল থেকেই আসবে। জিনিষপত্রগুলো যেন ওঘর থেকে সরিয়ে রাখেন।"

বিনুর মা আড়াল হইতে এবার সোজাসুজি বাড়িওয়ালাকেই উদ্দেশ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"আপনি অন্য কোন ভাড়াটে ঠিক করতে পারেন না?"

অক্ষয়বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—"কেন? কেন? ওত খুব ভালো লোক! আমার জানা লোক না হলে কি আর আমি এ বাড়িতে জায়গা দিতে চাইতুম। আপনার কিছু ভাবনা নেই।"

ইহার পর বিনুর মার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব।

সুখের বিষয় ভাড়াটে পরদিন আসিল না। আসিলেন বাড়িওয়ালা নিজে। আজ আর বিনুর মধ্যস্থতার সাহায্য না লইয়া সোজাসুজি তিনি বিনুর মার সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিনুর মা এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া লজ্জায় মাথায় কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন।

অক্ষয়বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আর লজ্জা করবেন না! আমি আপনার আত্মীয়ের মত। দেখুন আমি শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলুম, আপনার যখন অমত তখন ও ভাড়াটে বসিয়ে কাজ নেই।"

বিনুর মা চুপ করিয়া রহিলেন।

বাড়িওয়ালা আবার বলিলেন, "আমার একটু ক্ষতি হবে, তা হোক। আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, বিপদে পড়েছেন, আপনার অসুবিধে ত' করতে পারিনে।"

বিনুর মা তেমনি নিরুত্তর।

অক্ষয়বাবু খানিকক্ষণ জবাবের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন প্রকার সাড়াশব্দ না পাইয়া একবার এদিক ওদিক পায়চারী করিলেন। তাহার পর কাছে আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমাকে ওভাবে লজ্জা করলে ত আপনার চলবে না। আপনার এখন একজন অভিভাবক দরকার! নইলে একলা মেয়ে মানুষ, বিপদ আপনার পদে পদে। আমায় পর ভাববেন না।"

একটা কিছু না বলিলে বাড়িওয়ালা নড়িবে না বুঝিয়াই বোধ হয় বিনুর মা মৃদুস্বরে বলিলেন—"বেশ।"

এই সামান্য কথাতেই অক্ষয়বাবু একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে আজ আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আপনি সেলাই জানেন?"

বিনুর মা তেমনি মাথা নীচু করিয়া বলিলে—"সামান্য!"

"তা হোক্ তাতেই হবে! এখন আপনাদের সংসার খরচ' চালাতে হবে! আমি বলি কি, আপনি যদি সেলাই করতে পারেন, তা হলে আপনাকে জামা কাপড়ের কাজ আমি এনে দিতে পারি। ঘরে বসেই কিছু রোজগার হবে তাতে!"

এ প্রস্তাবে সত্যই বিনুর মা খুশী হইলেন। নিজের ও ছেলের জন্য দু বেলা দু মুঠা ভাত কেমন করিয়া জোগাড় করিবেন তাহা ভাবিয়া তিনি কোথাও কূল পাইতেছিলেন না।

সে সমস্যার যদি যদি এত সহজে মীমাংসা হয় তাহা হইলে তিনি বাঁচিয়া যান। বাড়ীওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মন ভরিয়া গেল। এই প্রথম তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—"আপনি যদি দয়া করে সে ব্যবস্থা করেন—"

তাঁহাকে আর কথা শেষ করিতে হইল না। অক্ষয়বাবু এক গাল হাসিয়া বসিলেন—"দয়া আবার কিসের! এত আমার কর্ত্তব্য!"

অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা হইল বটে কিন্তু প্রথম বারেই সামান্য একটা সেমিজ-সেলাই-এর পারিশ্রমিক বাবদ একেবারে পাঁচ টাকার নোট পাইয়া বিনুর মা অবাক হইয়া গেলেন।

মনে যাহা হইল সে কথা মুখ ফুটিয়া তিনি প্রকাশও করিলেন।

"সেমিজের সেলাই-এর জন্যে পাঁচ টাকা দিলেন?"

অক্ষয়বাবু হাসিয়া বলিলেন—"না, না, পাঁচ টাকা সেলাই-এর জন্যে সব দেবে কেন! আরো কাজ দেবে, তাই টাকাটা অগ্রিম দিয়ে রাখলে।"

বিনুর মার মন খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এই নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর পাঁচ টাকা হাতে পাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন। প্রয়োজনের কাছে আত্মসম্মান শেষ পর্য্যন্ত হার মানিল।

তাহার পর হইতে সেলাই-এর কাজ চলিতেছে। কাহারা তাঁহার কাজ লইতেছে কে জানে! কিন্তু কাজ করাইবার চাইতে অগ্রিম মূল্য দিবার আগ্রহই তাহাদের বেশী বলিয়া মনে হয়।

বাড়িওয়ালা আজকাল সকাল বিকাল খোঁজ লইতে আসে। বিনুর মা একদিন স্পষ্ট বলিলেন—"অগ্রিম টাকা আর দেবেন না। যা নিয়েছি কাজ দিয়ে আগে তা শোধ করি।"

অক্ষয়বাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শোধ দেবার জন্যে আপনি যে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখছি। শোধ দেওয়া কি অত সহজ!"

কিছুদিন হইতে অক্ষয় বাবু একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিনুর মা ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। আজও তাঁহার কথার ধরণ বিনুর মার ভালো লাগিল না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা ছাড়া আপনি যখন বাড়ি ভাড়া দয়া করে নেন না, তখন আমাদের কতই বা খরচ দু জনের!"

বাড়িওয়ালা অদ্ভুত ভাবে চাহিয়া বলিল, "বেশ আপনার যদি দরকার না হয়, আমি তাদের বারণ করে দেব। আপনাকে অগ্রিম টাকা দেবার জন্য আমায় দোষী ঠাওরাবেন না!"

এ কথার উত্তর দিতে গেলে কথা বাড়ে। বিনুর মা তাহা চান না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

আর্থিক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা বন্দরের আর্থিক সঙ্কট

কলিকাতা বন্দরের আর্থিক সঙ্কট চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ক্রমাগত বজেট-ঘাটতির দায় সামলাইবার জন্য উক্ত বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ অভাবনীয় রূপে এই ব্যবসা-মন্দার দিনেও প্রতি বৎসর শুল্ক-বৃদ্ধির আয়োজন করিতেছেন। ইদানীং কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট-এর চেয়ারম্যান বন্দরের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে বিবৃতি করিয়াছেন তাহাতে ব্যবসায়ী এবং জন-সাধারণ মাত্রই আশঙ্কান্বিত হইবে। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দরের আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা,—ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ঘাটতি বাবদ ৪৭৷৷০ লক্ষ টাকা রেভেনিউ রিজার্ভ ফণ্ড হইতে খরচ করিতে হইয়াছে। এই লোকসানের দায় সামলাইয়া উক্ত রিজার্ভ ফণ্ডের সমষ্টি-পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের বজেটে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ও ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অতিরিক্ত পরিমাণ ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা পুনরায় রিজার্ভ ফণ্ড হইতেই মিটাইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ মূল সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কার্য্যতঃ এই সকল অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্যবসা-মন্দা কোন রূপে হ্রাস না পাইবার দরুণ, সম্প্রতি পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে মোট আয়ের পরিমাণ মূল-অনুমান ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার স্থলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ দাঁড়াইবে; অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১০৷৷০ লক্ষ টাকার স্থলে ৪২ লক্ষ টাকা হইবে। এই পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ফণ্ড হইতে মিটাইয়া দেওয়া যে মোটেই নিরাপদ হইবে না, পোর্ট-ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন,—কারণ ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের ক্ষতির পরিমাণ মিটাইয়া উক্ত ফণ্ডের সমষ্টি-পরিমাণই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৫৬ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য তাঁহাদের লোকসানের পরিমাণ কমাইবার জন্য এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে বন্দরের সিংকিং ফণ্ডে যে-সকল সিকিউরিটি গচ্ছিত আছে, তাহার মূল্য বর্ত্তমান চড়া বাজার-দর অনুসারে নির্দ্ধারণ করিলেই বন্দরের আয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এ ব্যবস্থার ফলে বন্দরের অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ হিসাবে করিয়াছেন—অর্থাৎ এই পরিমাণ আনুমানিক বৃদ্ধি-মূল্য আয়ের হিসাবে গণ্য করিলে ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে বন্দরের বজেট-ঘাটতির ৪২ লক্ষ টাকার স্থলে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে, এবং এই টাকা রিজার্ভ ফণ্ড হইতে খরচ করিলে ফণ্ডের মোট পরিমাণ দাঁড়াইবে কিঞ্চিদধিক ৪৫ লক্ষ টাকা।

এই সকল ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবের মধ্য দিয়া কলিকাতা বন্দরের আর্থিক দুরবস্থা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা হউক, পোর্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা আরও আশঙ্কাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান নিকট ভবিষ্যতে কলিকাতা বন্দরে নীত বাণিজ্যের আয়তন বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না, এই প্রকার অনুমান করিয়াছেন। ব্যয়-সঙ্কোচের দিক দিয়াও তিনি বিশেষ ভরসা পান নাই। কেবল মাত্র সিংকিং ফণ্ডে অবশ্যরক্ষিতব্য টাকার পরিমাণ এবং গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত কর্জ্জের উপর দেয় সুদের পরিমাণ কিছু কমাইয়া দেওয়া সম্ভব বলিয়া তিনি অনুমান করেন। এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলেও মোট ব্যয়-সংক্ষেপের পরিমাণ মাত্র ১৯৷৷০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। অপর পক্ষে ১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫ এবং ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দের বজেট্-ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ৫১ লক্ষ, ৪২ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা হইতে ক্রমাগত এই বিপুল পরিমাণ বজেট-ঘাটতির দায় সামলানো অসম্ভব হইবে বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাই বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন যে যাবতীয় আমদানী মালের উপর ধার্য্য

শুল্কের পরিমাণ মূল্য অনুসারে এরূপ ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে অতিরিক্ত শুল্ক হইতে অতিরিক্ত আয় যথাক্রমে ১৯৩৩-৩৪, ১৯৩৪-৩৫ এবং ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ লক্ষ, ২৭ লক্ষ এবং ৩০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। এই হিসাবে ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের বজেট-ঘাটতির পরিমাণ হইবে ২৬ লক্ষ টাকা, ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের আয়তন কিঞ্চিৎ বাড়িবার সঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তৎপর ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে আর মোটেই ঘাটতি থাকিবে না বলিয়া বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন। বলা বাহুল্য যে রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণের দিকে নজর রাখিয়াই এই সকল হিসাব করা হইয়াছে।

আমরা এই সকল ব্যবস্থা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় বলিয়া মনে করি। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ নানা প্রকার অনিশ্চিত ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপে সমধিক সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা না করিলেও ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত শুল্ক-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবার কারণ রহিয়াছে। বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ সাময়িক বিপত্তি নিবারণ করিবার জন্য ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে পর পর দুইবার শুল্ক-বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ বর্ত্তমানে ভারতের অন্যান্য বৃহৎ বন্দরের তুলনায় কলিকাতা বন্দরের ধার্য্য শুল্কের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই সকল সাময়িক বৃদ্ধি-শুল্ক কমাইবার জন্য বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন না, বরং ক্রমাগত অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিবার আয়োজন করিতেছেন। যানবাহনের ব্যয়াধিক্য হইলে দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে কেবলমাত্র বন্দর নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া অধিকার আছে বলিয়াই বারংবার শুল্ক-বৃদ্ধি করিয়া ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন?—বিশেষতঃ এই ব্যবসা-মন্দার দিনে? কলিকাতা বন্দরের ব্যয়াধিক্যই কর্ত্তৃপক্ষকে এই সকল ব্যবস্থা করিতে প্রেরণা দিতেছে। আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কলিকাতা বন্দরের আয়-ব্যয় যাহাতে সু-নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাট-অনুসন্ধান কমিটি ও পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ

বিগত ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাট সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশ্নগুলিকে কতকগুলি পৃথক বিভাগে সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যথা:—পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ, ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা, পাট-নিয়ন্ত্রণ সমিতি সংস্থাপন এবং পাটের নূতন ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার। পাট-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাই এই কয়েকটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অনুসন্ধান কমিটি যেভাবে প্রশ্নগুলি তৈয়ারী এবং সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা, এবং বিচক্ষণতা পরিলক্ষিত হইবে। আমরা আশা করি যে, উক্ত কমিটি যাঁহাদের নিকট এই প্রশ্নপত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সু-চিন্তিত উত্তর দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা পাট-সমস্যার সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। বারান্তরে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কিন্তু অনুসন্ধান কমিটির প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আপাতঃ সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাজারে অতিরিক্ত পাট-যোগানের দরুণ পুনরায় মূল্যহ্রাসের আশঙ্কা রহিয়াছে। ১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে পাটের ফসল ৫৮½ লক্ষ গাঁইট হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন। উক্ত ফসলের পরিমাণ আগামী জুনমাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় আমদানী হইতে থাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় ৬২ লক্ষ গাঁইট কলিকাতার বাজারে আমদানী হইয়াছে; আরও প্রায় ১৫।২০ লক্ষ গাঁইট জুন মাসের মধ্যে আমদানী হইবে বলিয়া অনুমান হয়।—অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের অনুমান অপেক্ষা প্রকৃত আমদানীর পরিমাণ অনেক বেশী হইবে। অপর পক্ষে বিদেশে পাট-রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে কম হইবে বলিয়া আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আগামী বৎসরের পাট-শস্যের উৎপাদন সমধিক কমাইয়া না দিলে চট-কলওয়ালারা স্বভাবতঃই পাটের ক্রয়-মূল্য হ্রাস করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। এজন্য আগামী বৎসরে পাটের চাষ

যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য পুনরায় প্রচারকার্য্যে উদ্যোগী হওয়া দরকার। আমরা এ বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠা যাঁহারা পূর্ব্ব বৎসরে এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন,—তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ভারত গভর্ণমেণ্টের 'পরিবর্ত্ত-ঋণ'

বিগত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট এক নূতন 'পরিবর্ত্ত-ঋণ'গ্রহণের প্রস্তাবই ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঋণের সর্ত্তগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে :—

(ক) উক্ত ঋণ বাবদ কেবল মাত্র গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বকৃত ঋণসূচক বণ্ড গৃহীত হইবে। নগদ টাকা লওয়া হইবে না।

(খ) পূর্ব্বকৃত ঋণসূচক বণ্ড গ্রহণ বিষয়েও কেবলমাত্র নিম্নলিখিত প্রকার বণ্ড লওয়া হইবে, যথা—(১) ১৯২৯-৪৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরিশোধনীয় ৫% সুদে গৃহীত ওয়ার লোন সূচক বণ্ড (২) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পরিশোধনীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের ৫% বণ্ড (৩) ১৯৩১-৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরিশোধনীয় ৬% ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্জ্জসূচক বণ্ড।

(গ) যাঁহারা ওয়ার লোন বণ্ডের পরিবর্ত্তে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে প্রতি এক শত টাকার বণ্ড বাবদ ৭৷৷০ বোনাস্ প্রদান করা হইবে; ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বণ্ড পরিবর্ত্তকারীগিকে দেওয়া হইবে প্রতি এক শত টাকার বণ্ডে ৮৷৷০। ১৯৩১-৩৬ খৃষ্টাব্দের বণ্ড প্রদানকারীকেও এই পরিমাণ বোনাস দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) যে সকল 'ওয়ার লোন' বণ্ডের মালিক স্ব স্ব বণ্ড পরিবর্ত্ত করিতে চাহিবেন না, তাঁহাদিগকে আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে সুদসমেত টাকা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ এবং ১৯৩৩-৩৬ খৃষ্টাব্দে পরিশোধনীয় 'বণ্ড'এর যে সকল মালিক নূতন পরিবর্ত্ত ঋণগ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিবেন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ও ১৫ই আগষ্ট তারিখে সুদসমেত টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(ঙ) অপরপক্ষে যাঁহারা পরিবর্ত্ত ঋণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে ১৪ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত স্ব স্ব বণ্ডের উপর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সুদ কষিয়া প্রদান করা হইবে।

বর্ত্তমান পরিবর্ত্ত ঋণের সুদ ধার্য্য হইয়াছে শতকরা ৪৲; ১৯৬০ হইতে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী যে কোন সময়ে ইহা পরিশোধনীয় থাকিবে। টাকার বাজারে ব্যবসা-মন্দার জন্য সুদ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার অল্প সুদে পরিবর্ত্ত-ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছেন। উক্ত ঋণের সাফল্য সম্বন্ধেও বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। অনধিক ৩০ কোটি টাকার পরিবর্ত্ত ঋণ গৃহীত হইলেই, ইহা খুব সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার ঋণগ্রহণের পদ্ধতি ভারতীয় করদাতা মাত্রই সমর্থন করিবে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট করদাতাগণের উপর যে দুর্ব্বহ সুদের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে দেশবাসীকে আংশিক রেহাই দিয়া তাঁহারা অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বজেট পেশ করিবার সময় অর্থ-সচিব স্যর জর্জ্জ স্যুষ্টার এই প্রসঙ্গে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে নরম টাকার বাজারের সুযোগ লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বল্পতর সুদে পর পর যে ৪টি ঋণ ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে সুদের দায় বাবদ সরকারের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ হইবে। এই হিসাবে পরিবর্ত্ত-ঋণ বাবদ মাত্র ২২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

ব্যবসায়ে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার-নিরোধ

ভারতবর্ষের আসন্ন রাষ্ট্র-সংস্কারে ইংরেজদিগের ব্যাবসায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা লইয়া যে তীব্র বাদানুবাদ চলিতেছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ অমীমাংসিতই রহিয়াছে। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ইহার একটা রফা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয়গণের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে ইংলণ্ডে ভারতীয়গণকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, এরূপ কোন অসুবিধা ভবিষ্যৎ ভারত গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ প্রজাগণের উপর আরোপ করিতে পরিবে না। কেবল তাহাই নহে, ব্যবস্থা-শিল্প সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানকে সরকারের রাজস্ব হইতে সাহায্য দিবার ব্যাপারেও বর্ত্তমান কোন বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য-

মূলক ব্যবহার করা চলিবে না। অর্থাৎ দেশীয় কোন শিল্প-কারখানাকে সাক্ষাৎভাবে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যাপারেই হউক বা পরোক্ষভাবে তাহাদের উৎপন্ন মাল খরিদ করিয়া সাহায্য করিবার ব্যাপারেই হউক, ভারতীয় কোম্পানীর তুল্য ব্যবহার করিতে হইবে। দেশীয় ব্যবসা-শিল্পের সহিত বিদেশীয়গণের স্থানীয় ব্যবসা-স্বার্থের এইপ্রকার সমন্বয় করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে অসমীচীন বলিয়াই মনে হইবে। ইদানীং কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বারের বাৎসরিক সভায় প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে ভারতীয়গণের ব্যবসা-শিল্পের উন্নতির আশা যে সুদূরপরাহতই থাকিবে, তিনি সে বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন; কারণ তাহা হইলে ইংরেজদিগের সহিত ভারতীয়গণ কোনমতেই প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। ইংলণ্ডে ভারতীয়গণের প্রতি ব্যবহারের সহিত ভারত-বর্ষে ইংরেজদিগের প্রতি ব্যবহারের যে আপেক্ষিক যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে এইপ্রকার আপেক্ষিক সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইহার তাৎপর্য্য বরং ইহাই হওয়া উচিত যে স্বীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক-গণের উপর যেরূপ বৈষম্য-মূলক ব্যবহার করিবে, ইংলণ্ডেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সম্বন্ধে তুল্য ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের এই স্পষ্ট-বাদিতার প্রশংসা করি। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে সিংহ তাহার গহ্বরে মেষকে নিমন্ত্রণ করিলেই মেষ সিংহ-প্রবরকে পাল্‌টা নিমন্ত্রণ করা নিরাপদ মনে করিবে কেন?

যুক্ত রাষ্ট্রের স্বর্ণ-মান বর্জ্জন

বিগত ৬ই মার্চ্চ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বর্ণ বা রৌপ্য বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে না। এই ঘোষণার ফলে পৃথিবী-ব্যাপী এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান বর্জ্জন করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

আমেরিকার প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল কেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আজ বৎসরাধিক কাল হইতে ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অনেক দেশই পর পর স্বর্ণমান বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব অর্থের বিনিময় মূল্যে হ্রাস ঘটাইয়াছে। ফলে এই সকল দেশ অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল রপ্তানী করিতেছে এবং যে সকল দেশ স্বর্ণমান অব্যাহত রাখিয়াছে তাহারা ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। যুক্তরাষ্ট্র এই সকল দেশের মধ্যে অন্যতম ছিল, এবং উক্ত সমস্যার ফলে তথায় শিল্প-কারখানার দুর্দ্দশা ও বেকার সমস্যা ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে থাকে। ইহার উপর কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যের দরে গুরুতর পতন হইবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক মহলে এক বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটে। বস্তুতঃ কয়েকটি প্রদেশে অনেক সংখ্যক ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়, এবং কোন কোন প্রদেশে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় ব্যাঙ্ক আমানতকারীর টাকা দেওয়া স্থগিত রাখে। এই প্রকার ব্যাঙ্ক-বিপর্য্যয়ের ক্রমশঃ বিস্তৃতি আশঙ্কা করিয়া আমানত-কারীরা তখন বিদেশে স্ব স্ব পুঁজি প্রেরণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই প্রকারে স্বর্ণ-রপ্তানী করিয়া দিবার বিপত্তি সামলাইবার জন্যই মিঃ রুজভেল্ট তাঁহার নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ সংঘাত সৃষ্টি হইবে তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের 'ষ্টার্‌লিং'-এর অতঃপর 'ডলার'-এর সহিত বিনিময় মূল্য বাড়িয়া যাইবে, ইহাই অনেকে অনুমান করেন। ভারতীয় টাকার সহিত 'ষ্টারলিং'-এর স্থিরীকৃত বিনিময়-সম্বন্ধ থাকিবার জন্য, ইহার পর ডলার-এর সহিত টাকারও বিনিময় মূল্য বাড়িয়া যাইবে, বুঝিতে হইবে।— অর্থাৎ আমেরিকার মাল ভারতের বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে বিকাইবে। অপর পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষ একই প্রকার যে সকল দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে, অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের দ্রব্যে স্বর্ণ-বিনিময় মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবার দরুণ ভারতবর্ষেও উক্ত প্রকার মালের দাম কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান জগতের স্বর্ণ-ক্ষুধার দিকে লক্ষ রাখিয়া ইহাই অনুমান করিতে হয় যে,

যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ-রপ্তানী-রদ বহাল থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া যাইবে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন আভাস না পাওয়া গেলেও ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা 'ফ্রাঙ্কে'র সহিত 'ষ্টার্‌লিং-এর স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের সঙ্গে এই প্রকার অনুমানের সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে। কারণ স্বর্ণের মূল্য অতঃপর এই 'ফ্রাঙ্ক-ষ্টার্‌লিং' বিনিময় সম্বন্ধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার উপর যে সব সময়ই গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সঙ্গতি নির্ভর করে না, ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বৎসরের বজেট হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। নিছক রাজস্বের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা খুব বেশী খারাপ হয় নাই। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিবার কারণ এই যে সেই সময় ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা অভূতপূর্ব্ব রূপে সঙ্গীন হইয়াছিল। সেই সময় ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরে ভারত গভর্ণমেণ্টের বজেটে ৩৯ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া এবং অতিরিক্ত কর বসাইয়া এই ঘাটতির পরিমাণ ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ পর্য্যন্ত কমানো যাইবে, সেই সময় রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু ছয় মাস পরে অর্থাৎ গত বৎসর মার্চ্চ মাসে যখন আবার হিসাব করা হয়, তখন দেখা গেল যে দুই বৎসরের মোট ঘাটতি বাড়িয়া ১১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটিয়াছে; দেশের সৌভাগ্যবশতঃ এই আশঙ্কা আংশিক রূপে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদে সার জর্জ্জ সুষ্টার যে বজেট পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যদিও ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরের অনুমানের তুলনায় অবস্থা খুবই খারাপ বলিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, গত এক বৎসরে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার প্রায় দুই কোটি টাকা পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে—অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য এই ঘাটতি ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ এই দুই বৎসরের সম্মিলিত আয়-ব্যয়ের হিসাবের ফল। আলাদা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৩১-৩২ সালের ঘাটতির পরিমাণ ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ এবং ১৯৩২-৩৩ সালের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২ কোটি ১৭ লক্ষ। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বাজেটে অনুমান করা হইয়াছিল যে সেই বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালে ঘাটতি পড়িবে ১০ কোটি ১৭ লক্ষ এবং বর্ত্তমান বৎসরে উদ্বৃত্ত থাকিবে ৫ কোটি ২৩ লক্ষ; এই হিসাবের তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা খুবই খারাপ বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গত বৎসর মার্চ্চ মাসে অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও খারাপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক আর্থিক সঙ্গতির পরিচয় আরও একটি ব্যাপারে বুঝা যাইবে। টাকার বাজারে গভর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম ইতিমধ্যে অনেকখানি বাড়িয়াছে। গত বৎসরের বজেট পেশ করিবার সময় রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান বৎসরে ৭॥০ কোটি টাকা পরিমাণ স্বল্প-কাল-স্থায়ী ঋণ (Treasury Bills) এবং ২৬॥০ কোটি টাকা পরিমাণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা হইবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বৎসরে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার ঋণ শোধ করা হইয়াছে; প্রথমোক্ত ঋণের পরিমাণ কমানো হইয়াছে ১৯॥০ কোটি টাকা, এবং দ্বিতিয়োক্ত ঋণ প্রায় ৭৮ কোটি টাকা।

অপর পক্ষে পুরাতন ঋণশোধের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঋণের বহরও গত বৎসরের অনুমানিক হিসাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। গত বৎসর হিসাব করা হইয়াছিল যে সর্ব্বশুদ্ধ ২২॥০ কোটি টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইবে; সেই তুলনায় বাস্তবিক পক্ষে প্রায় ৯৩ কোটি টাকার নূতন ঋণ গ্রহণ করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে; সাধারণতঃ অন্যান্য বৎসর ভারতবর্ষে একবার এবং বিলাতে একবার বৎসরে মাত্র দুইবার নূতন ঋণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে চারিবার এবং বিলাতে একবার সর্ব্বসমেত পাঁচবার নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ এই জন্য গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় নাই; বরঞ্চ বৎসরের প্রথম ভাগের তুলনায় শেষ ভাগে সুদের হার শতকরা ৫৮০ হইতে কমিয়া ৪॥০তে দাঁড়াইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের বাজার-সম্ভ্রমবৃদ্ধির আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাঁহাদের গত "পরিবর্ত্ত-ঋণের" সাফল্য হইতে। এই "পরিবর্ত্ত-ঋণে"র সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অদূরভবিষ্যতে পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

উপরে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সঙ্গতির উন্নতির পরিচয় পাইবেন। এই সন্তোষজনক অবস্থার জন্য আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্টের এই স্বচ্ছল অবস্থার সহিত দেশের আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই। কৃষিশিল্প বাণিজ্য কোনও ক্ষেত্রেই উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের গতিবদ্ধ হয় নাই, ফলে ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ার দরুণ সকল সম্প্রদায়ই, বিশেষতঃ কৃষিজীবীরা—যাহারা জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ—দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি, এই একই কারণে, তাহাদের তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী কমিয়াছে; আমরা বরাবরই আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অনেক বেশী করিয়াছি—কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে তিন চারি মাস রপ্তানী বেশী হইলেও এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে নাই, যাহা হইতে আমরা সহজ উপায়ে আমাদের বিদেশী বাৎসরিক দেনা শোধ করিতে পারি। ১১৪ কোটি সোনা বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ মিটাইতে হইয়াছে; কিন্তু এই ভাবে চিরকাল যে আমরা সোনা চালান করিতে পারিব এবং আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ আরও বেশী বাড়াইতে না পারিলে যে আমাদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন হইবে, সার জর্জ্জ স্যুষ্টারও তাঁহার বক্তৃতায় প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে সার জর্জ্জ স্যুষ্টারের আর একটি মন্তব্য আলোচনাযোগ্য। সার জর্জ্জ ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল এই দশ বৎসরের গড়পড়তা হিসাবের সহিত ১৯৩২ সালের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই কয় বৎসরে আমাদের দেশে কাপড়ের চাহিদার পরিমাণ শতকরা ১৮, কেরোসিনের চাহিদা শতকরা ১ এবং লবণের চাহিদা শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছে; ইহা হইতে সার জর্জ্জ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বাজার-মন্দার তীব্রতা থাকা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ লোকেরা তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহার করিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের অবস্থা খুব বেশী খারাপ হয় নাই। আপাতচক্ষে দেখিলে রাজস্ব-সচিবের যুক্তি অকাট্য বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বাস্তবিকই সার জর্জ্জ স্যুষ্টারের এই কথায় উল্লসিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ পরিমাণ বাড়িলেও মূল্য বাড়ে নাই বরং অনেক বেশী কমিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কাপড়ের চাহিদার পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িলেও মূল্য কমিয়াছে শতকরা ২৪, কেরোসিনের চাহিদার পরিমাণ যেমন শতকরা একভাগ বাড়িয়াছে, মূল্য কমিয়াছে শতকরা ৮ এবং লবণের চাহিদার মূল্য ও পরিমাণ উভয়ই শতকরা সাত ভাগ কমিয়াছে ও বাড়িয়াছে। এই তথ্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অভূতপূর্ব্বভাবে না কমিলে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ জিনিষ ব্যবহৃত হইত না; পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িলেও মূল্য অনেক পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং ইহা হইতে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার অবনতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের বজেট আলোচনা করিলে তাঁহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য উল্লাস করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই বলিয়াই মনে হইবে। অতিরিক্ত চড়া হারে কর বসানো না থাকিলে গভর্ণমেণ্টেরও রাজস্বে যথেষ্ট ঘাটতি পড়িত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান করের হার বজায় রাখিয়া আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবে যে মাত্র ৪২ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ কম) উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা হইতেই ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রেল-বজেটে ঘাটতি

উপরে যে কথা বলা হইল, রেলওয়ে-বজেট হইতেও তাহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির উপরই রেলওয়ে কোম্পানীগুলির আর্থিক অবস্থা

নির্ভর করে, তাহা সকলেই জানেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্যের চালান করিবার জন্য যে মাশুল দিতে হয়, রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ের অধিকাংশই আদায় হয় এই মাশুলের সমষ্টি হইতে। কাজেই ব্যবসা-মন্দার সময় যখন লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া যাওয়ার দরুণ পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও কমিয়া যায়,তখন স্বভাবতঃই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম চালান দেওয়া হয়, কাজে কাজেই সেই সময় মাশুলের মোট পরিমাণ কমিয়া যাইতে বাধ্য। এই কথা মনে রাখিয়া যদি আমরা বর্ত্তমান বৎসরের রেলওয়ে-বজেট আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে রেলওয়ে বজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ ৯ কোটি ২৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালে ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে এবং আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে এইরূপ অনুমান করিয়া হিসাব করা হইয়াছে যে ঘাটতি কমিয়া ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ দাঁড়াইবে। এই আর্থিক উন্নতির অনুমান কতখানি শেষ পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহা বলা শক্ত; কিন্তু যদি মানিয়াও নেওয়া যায় যে বাস্তবিকই এইবার অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা হইলেও উপরি উপরি তিন বৎসরের মোট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি দাঁড়ায়; আর যদি অবস্থা আরও খারাপ হয়, তাহা হইলে যে মোট ঘাটতি ইহা অপেক্ষাও বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বাণিজ্য-সচিব সার জোসেফ ভোরের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর রাজস্ব-সচিব সার জর্জ্জ স্যুষ্টারের আশ্বাস-বাণীর যে কোনও মূল্যই নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান বৎসরে রেলওয়ে কোম্পানীর আয় মাত্র ৮৫ কোটি ২৫ লক্ষ হইবে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে; ১৯২১-২২ সালের পর এত কম আয় আর কোনও বৎসর হয় নাই, যদিও ইতিমধ্যে রেল মাশুল অনেক বেশী পরিমাণে বাড়ানো হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানীগুলির অবস্থা বরাবরই খুব ভাল ছিল। প্রতি বৎসর "ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড" (Depreciation Fund) ও "রিজার্ভ ফাণ্ডে" (Reserve Fund) যথোচিত টাকা জমা দিয়াও তাহারা নির্দ্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় বজেটে ন্যূনাধিক ৫ কোটি টাকা করিয়া দান করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজ ক'এক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় বজেটে কোনও টাকা জমা দেওয়া দূরে থাক্, বাৎসরিক ঘাটতি পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা রিজার্ভ ফাণ্ডে সঞ্চিত টাকা সব নিঃশেষ করিয়া সবশেষে ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডেও হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিন বৎসরে এই ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড হইতে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ করিয়া ঘাটতি পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; এইরূপ খরচ করার পর আগামী বৎসরের শেষে ফাণ্ডে মাত্র ১৪ কোটি টাকা থাকিবে। সকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানী গুলিরও বৃহৎ ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড থাকার সার্থকতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। রেলওয়ে লাইন, গাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তিগুলি স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয় পাইলে কিম্বা অব্যবহার্য্য হইলে যাহাতে সহজে নূতন লাইন ও গাড়ী কেনা যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেলওয়ে কোম্পানী গুলি তাহাদের প্রতি বৎসরের আয় হইতে ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে নিয়মিত ভাবে নির্দ্ধারিত হারে টাকা জমা দিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই; কিন্তু জমা দিয়া পরে আবার তাহা খরচ করার ব্যবস্থা হওয়াতে এই জমা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

আর একদিক

ছয় বৎসর আগে একটি ইংরেজ মেয়ে রমাঁ রলাঁ লিখিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করেন। পড়ে তিনি গান্ধীজীকে লেখেন, 'আমাকে আপনার আশ্রমে নিন্।' মহাত্মাজী তাঁকে নিরুৎসাহ করবার জন্য একটি অনুজ্ঞা লিখে পাঠান। তিনি লিখেছিলেন, 'অন্ততঃ এক বৎসর কাল তিনি যদি লণ্ডনে থেকে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভক্ষণ করে কাটাতে পারেন এবং চরকা কাটতে ও হিন্দুস্থানী বলতে শেখেন, তবে তাঁকে তিনি আশ্রমে নেবার কথা বিবেচনা করবেন।' এর ঠিক এক বৎসর পরে মহাত্মাজী এই মেয়েটির কাছে থেকে একটি তার পান যে তাঁর কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন।...এই মেয়েটিই আজ মীরাবাই নামে সুপরিচিত হয়েছেন। এঁর বাবা আড্‌মিরাল স্যর্ এড্‌মাণ্ড স্লেড ইষ্ট-ইণ্ডিজে চাকরি করতেন।

অন্তঃপুর

—বিষ্ণুশর্ম্মা

শিশু-মঙ্গল

আমরা জাতীয়তার গর্ব্ব করিয়া থাকি। জাতির ভিত্তিমূল যে দিন দিন ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিতেছে সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ আমাদের নাই। যাহাদের লইয়া জাতি, যাহারা আমাদের সকল আশা-ভরসার স্থল, যাহাদের জন্য আমাদের সংসার-ধর্ম্ম, তাহাদের দিকে আমরা চাহি না অথচ জাতির মুক্তি কিসে হইবে, তাহার জন্য আমাদের ভাবনার অন্ত নাই।

রুগ্ন, শীর্ণকায়, পাণ্ডুর দেহ লইয়া যাহারা জীবনের উদ্বোধন করে, তাহারা জীবনধর্ম্ম পালন করিবে কোন্ শক্তিবলে, সংসারে টি঳কিবে কয় দিন এই সকল বিষয় লইয়া হয়তো আমরা কিছু ভাবিয়াছি কিন্তু কি করিয়া শিশুদের বাঁচাইব, তাহাদের দুর্ব্বল দেহ-মনকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিব, তাহার জন্য চেষ্টা করি কয় জন?

বক্তৃতা অনেক হইয়া গিয়াছে, লেখালেখিও কম হয় নাই কিন্তু আসল কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মাতৃজাতি যদি এখনও না এ বিষয়ে অবহিত হ'ন্, তাহা হইলে জাতির এই অসহায় আশামুকুলগুলি এমনি করিয়াই অকালে ঝরিয়া পড়িবে।

"ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু মরে, ঘণ্টায় দুই শত চল্লিশটি, প্রতিদিন পাঁচহাজার সাত শত ষাটটি"—ইহাই আধুনিকতম সংবাদ। সহস্র জননীর বুকভরা স্নেহের রসাস্বাদন করিবার পূর্ব্বেই তাহারা বিদায় লইতেছে, তাহা ছাড়াও যাহারা থাকে তাহাদের মধ্যে শতকরা সত্তর আশিটির শীর্ণ-দুর্ব্বল শরীর পিতামাতার চক্ষের সম্মুখে সদা-জাগ্রত আশঙ্কার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই কঙ্কালদলের আবাহনের জন্য দায়ী এই দেশেরই পিতামাতা এবং এই পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জাতিকে করিতে হইতেছে এবং হইবে।

শিশুর সহিত দেবতার তুলনা হইয়া থাকে, কিন্তু দেবতাকে আবাহন করিবার পূর্ব্ব হইতে যে নিষ্ঠার সহিত আয়োজন করা হয়, সেই নিষ্ঠার অসদ্ভাব দেখা যায় তখনই, যখন শিশুর আগমন-চিহ্ন সূচিত হয়। অথচ ইহার আবশ্যকতা যে কতখানি তাহা সকলেই মনে মনে বোধ করেন।

গর্ভাবস্থায় যে জননী সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তিনি নিজে যে কষ্ট পান তাহা নহে, তাঁহার শিশুরও অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাহা অবশ্যপালনীয় তাহা না মানিয়া চলিবার জন্যই শিশু-মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে গর্ভিণীদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা লইয়া সামান্য আলোচনা করিতেছি।

সর্ব্ব-প্রথম, প্রসূতির স্বাস্থ্য-পরীক্ষা। পিতামাতার কাহারও যদি কোন রূপ ব্যাধি থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। চিকিৎসকেরা বলেন, প্রসূতির গর্ভসঞ্চারের সাত মাসের সময় এবং আট মাসের সময় দুইবার প্রস্রাব পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি কোনরূপ বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে প্রস্রাব-পরীক্ষার পর সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারা যায়। পিতামাতার কোন নিদারুণ ব্যাধি থাকিলে তাহা সন্তানে অধিকাংশ সময়ে বর্ত্তাইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় হয়তো ইহার প্রতীকার হইতে পারে কিন্তু তাহার পর আর কোন উপায় নাই। হয়তো নয়নানন্দকর একটি পুত্র হইল, সকলে দেখিয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিল কিন্তু জন্মের কিছুকাল পরেই সে দৃষ্টি হারাইল —ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে হয়তো এমন কিছু পাওয়া যাইবে যাহা পিতা বা মাতার পক্ষে লজ্জার কথা।

প্রসূতির সকলের চেয়ে আবশ্যক সেবা এবং তাঁহার বাসস্থলের সুব্যবস্থা। আমরা যে প্রসূতির সেবা করি না এমন নহে কিন্তু অনেক সময় আমাদের কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অভাব বশতঃ ঠিক মত সেবা করা হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়তঃ বাস করিবার জন্য প্রসূতিকে আমরা যে ঘরটি দিয়া থাকি তাহা বাসের অযোগ্য বলিলেই চলে। সকলেই যে এইরূপ করেন তাহা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের কর্ত্তব্য বাটীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যে ঘরে প্রচুর আলোবাতাস আসে সেই ঘরটি তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট

করা। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দেওয়া আছে, আমাদের পক্ষে হয়তো অতটা করা সম্ভবপর হইবে না, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে ভাল ঘরে প্রসূতিকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি।

প্রসূতি যেন এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখেন যে সন্তানের জীবন ও মরণ মাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে এবং তিনি যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবেন ঠিক সেইরূপ ভাবে সন্তানও গড়িয়া উঠিবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা আলস্য, উপবাস, দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি যতটা বর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব তাহা তিনি করিবেন। তাঁহার অনিয়মে হয়তো শিশুর কোন অঙ্গ চিরকালের মত বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। জন্মের কিছুদিন পরেই যে সমস্ত শিশু মারা যায় তাহারা বেশীর ভাগ সময়ে জননীর অবহেলার ফলেই মৃত্যু বরণ করে।
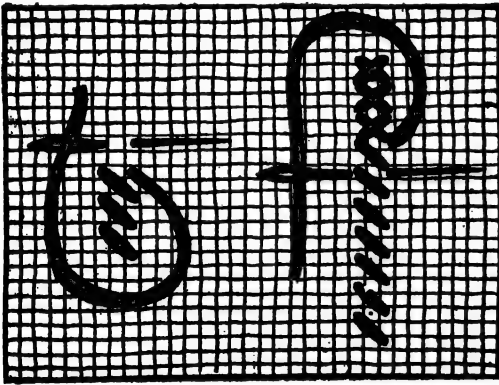
১নং চিত্র।

মায়ের শোণিত হইতে শিশুর মেদ, মজ্জা ও দেহ গড়িয়া ওঠে। অতএব মায়ের কর্ত্তব্য সন্তানকে শক্তিমান করিয়া তুলিবার জন্য নিজের শরীরের প্রতি যত্ন লওয়া। তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর শিশুর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রসূতি গর্ভসঞ্চারের পর হইতেই লঘু, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীরকে ঠিক রাখিবেন। প্রতিদিন অল্প অল্প পরিশ্রম করাও আবশ্যক। দিবারাত্র অলস ভাবে বসিয়া থাকিলে প্রসবের সময় কষ্টের অবধি থাকে না। সুখ-প্রসবের একমাত্র উপায় প্রাত্যহিক অল্প পরিশ্রম। ইহা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যাহারা দৈহিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে যথা কুলী-মজুরের মেয়েরা, তাহারা প্রসবের সময় মোটেই কষ্ট পায় না, কিন্তু ধনীর দুলালীদের পক্ষে অধিকাংশ স্থলে প্রসব করার সময় জীবনমরণের সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। অল্প পরিশ্রমের ফলে প্রসূতি বাহিরের মুক্ত বাতাস আরও সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন এবং বাতাসে যে অক্সিজেন থাকে তাহা গ্রহণে শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। আর একটি প্রাণীকে ধারণ করিবার সহজ শক্তি তখন থাকে।

তাহার পর পরিচ্ছদ যাহাতে অত্যন্ত ভারী না হয় তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং খুব আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করা অনুচিত। ইহাদ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের অত্যন্ত ক্ষতি হয় এবং দেখা গিয়াছে ইহার জন্য সময়ে সময়ে সন্তানের অঙ্গবৈকল্য ঘটে।

গর্ভিণীর যেমন দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তেমনি তাঁহার মনের স্বাস্থ্যকেও অবহেলা করা উচিত নয়। মনকে সদাসর্ব্বদা প্রফুল্ল না রাখিলে গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি অবিচার করা হয়, আচম্‌কা ভয় পাওয়া বা অতিরিক্ত হাস্য করা বা ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁহার ও শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। গর্ভিণীর শরীর সুস্থ না থাকিলে শুধু ভ্রূণের শরীর যে অসুস্থ হয় তাহা নহে, গর্ভপাতের আশঙ্কাও পদে পদে এবং অনেকের এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে যে একবার গর্ভপাত হইলে বার বার ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে গর্ভিণীর দেহ চিরকালের মত রোগগ্রস্ত হইয়া যায়, এমন কি রক্তশূন্যতার জন্য মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নহে। আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এইখানে বলা উচিত যে গর্ভাবস্থায় প্রসূতি যেন সকল বিষয়ে অত্যন্ত সংযত থাকিবার চেষ্টা করেন; এই সময়ে যে কোন বিষয়ে অসংযম তাঁহার সন্তানের পক্ষে অমঙ্গল-দায়ক।

সন্তান প্রসূত হইবার সময় কিরূপ গৃহে থাকিবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অনেকে হয়তো বলিবেন যে দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু এই কথা বলিলে আমাদের দায়িত্ব ঘুচে না, যাহাকে পূজা করিবার ক্ষমতা নাই তাহাকে আবাহন করিবার যে কি সার্থকতা তাহা বুঝি না। দারিদ্র্যের দুঃখ আছে জানি কিন্তু অসুস্থ, দুর্ব্বল সন্তান লইয়া এবং ঔষধপত্র ও চিকিৎসার জন্য

প্রভৃত ব্যয় করিয়া দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেও বোধ হয় কেহ চাহেন না। অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সুব্যবস্থা করিতে হইবে, যেরূপ করিয়াই হউক; যাঁহাদের পল্লীতে বা গ্রামে মেয়েদের চিকিৎসালয় আছে তাঁহারা অনেকে প্রসূতিকে সেখানে পাঠাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন, কিন্তু অন্ধকূপের মধ্যে ভিজা মাটিতে প্রসূতিকে রাখিয়া দুইটি প্রাণীকে যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যে যে কতখানি পাপ সঞ্চিত হয় তাহাও যেন সকলে বুঝিয়া দেখেন। খরচপত্র করিবার ক্ষমতা না থাকিলে মেয়েদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন ভাল পন্থা নাই।

প্রসবের সময় আমরা নীচজাতীয়া ধাত্রীকে ডাকিয়া আনি, কিন্তু সে পরিষ্কার, ব্যধিগ্রস্ত কি সুস্থ তাহার খোঁজ করিনা। ইহার ফলে অসংখ্য শিশুকে প্রাণদান করিতে হয়। নাড়ী কাটিবার পরে যে সমস্ত শিশু মারা যায়,

২নং চিত্র।

অধিকাংশ স্থলে ধাত্রীরাই তজ্জন্য দায়ী হইয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় যে বাঁশের চেঁচাড়ি ব্যবহার করে তাহা অপরিষ্কার থাকিলে শিশুদেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়া যায় এবং ইহার জন্য যে কত শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রাণত্যাগ করে, তাহার সংখ্যা নাই। ধাত্রী উৎকৃষ্ট কার্ব্বলিক সোপে হাত ধুইয়া ও তাহার নাড়ী কাটিবার যন্ত্রটিকে পরিষ্কার করিয়া, ভাল পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিয়া যাহাতে আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আঁতুড় ঘরের দরজা জানালা দিবারাত্র রুদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। সর্ব্বদা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া বিশুদ্ধ আলোবাতাস যাহাতে প্রচুর পরিমাণে তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রসূতির শয্যার জন্য যাঁহারা নূতন গদি তৈয়ারি করিয়া দিতে না পারেন, তাঁহারা যেন প্রথমে বেশ মোটা করিয়া খড় বিছাইয়া দেন। সেই খড়ের উপর একটি লেপ বা কাঁথা পাতিয়া ও একখানি শুভ্র চাদর দিয়া শয্যাটিকে সুকোমল করিয়া তাহার উপর প্রসূতিকে শোয়াইবেন। শিশুর জন্য আর একটি শয্যা করিলেই ভাল হয়। ভিজা কাঁথায় কখনও শিশুকে শুয়াইবেন না। প্রতি সপ্তাহে প্রসূতির বিছানার চাদর ও কাপড়-চোপড় সাবান দিয়া বা সাজিমাটী দিয়া পরিষ্কৃত করা আবশ্যক।

আঁতুড় ঘরের ভিতরকার তাপ রক্ষা করিবার জন্য অগ্নি রাখার প্রথা আমাদের দেশে আছে, কারণ প্রসূতি ও শিশু কাহারও পক্ষে ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে। কিন্তু আমরা অনেক সময় ঠাণ্ডাকে এড়াইবার জন্য দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কাঠ-কয়লা জ্বালাইয়া থাকি। ইহা অত্যন্ত অহিতকর। ঘরের মধ্যে এই কয়লার ধোঁয়া জন্মিলে শিশুর চক্ষুকে পীড়িত করিতে পারে—তাহা ছাড়া কয়লা হইতে কার্ব্বণ মনোক্সাইড্ বলিয়া একরূপ গ্যাস উঠে, সেই গ্যাস বাহিরে যাইবার সুযোগ না পাইলে রুদ্ধ গৃহাভ্যন্তরের অধিবাসীদের যে কোন সময়ে শ্বাস রোধ করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে। যতক্ষণ কক্ষে আগুণ রাখা হইবে ততক্ষণ যেন জানালা খোলা থাকে। কয়লা জ্বালিয়া প্রসূতি যেন সারারাত্রি নিদ্রা না যান্। এইটুকু জানিয়া রাখিবেন যে আলোবাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে কখনও অহিতকর নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতেছি না যে, ঠাণ্ডা লাগান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। শীতকালে বা বর্ষাকালে গরম কাপড়চোপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা খুবই কর্ত্তব্য।

প্রসূতির খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে প্রসবের পর অতি লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য তাঁহাকে দেওয়া উচিত। পানীয় জলে ফট্‌কিরি দিয়া গরম করিয়া লইবার পর যদি কোন পাত্রে রাখা যায় এবং পরে ঠাণ্ডা হইলে তাঁহাকে পানের জন্য দেন তাহা হইলে প্রসূতির পক্ষে খুব উপকারক হইতে পারে।

সদ্যোজাত শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে বলিতে হইলে এই কথাই বলিতে হয় যে মাতৃদুগ্ধের চেয়ে পুষ্টিকর ও হিতকর খাদ্য

তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। মাতা সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া না পড়িলে শিশুকে কখনই স্তন্যদান করিতে বিরত হইবেন না। শিশুর শারীরিক পুষ্টির সকল উপাদান মাতৃদুগ্ধের মধ্যে থাকে। মাতৃদুগ্ধ পান না করিয়া কোন শিশুর পক্ষেই খুব সবল হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মাতৃদুগ্ধে জীবনীশক্তি (vitamines) অত্যন্ত বেশী থাকে এবং বাহির হইতে কোনরূপ বীজাণুর সংস্পর্শদোষে দুষ্ট নয় বলিয়া শিশুর পক্ষে হজম করিতেও কষ্ট বোধ হয় না। কৃত্রিম দুগ্ধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া যাঁহারা ভাবেন যে ইহার মধ্যেও বোধ হয় পুষ্টিকর উপাদান অনেক পরিমাণে আছে, তাঁহারা যে কত বড় ভুল করেন তাহা বলিতে পারি না।

মাতৃদুগ্ধ ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত অনায়াসে শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পর মাতৃদুগ্ধে চূণের পরিমাণ কমিয়া আসে এবং সন্তানরা যদি তখনও মাতৃ-দুগ্ধের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে রিকেট্‌স হইবার খুব সম্ভাবনা।

প্রসূতি যাহাতে সন্তানকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ খাওয়াইতে পারেন তাহার জন্য তাঁহাকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে এবং প্রতিদিন অল্প অল্প দৈহিক পরিশ্রম করিয়া তিনি দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

প্রসবের পূর্ব্বে যেমন পরেও তেমনি প্রসূতির পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে মাতৃদুগ্ধও সময় সময় বিষাক্ত হইয়া উঠে। ইহার কারণ অতিরিক্ত মানসিক চাঞ্চল্য, ভয় ও উদ্বেগ। এইগুলি সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখা সু-মাতার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রসবের পর দিন শিশুকে ছয় ঘণ্টা অন্তর এবং তাহার পর পাঁচ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদান করিবেন। যদি স্তন্যদুগ্ধ পরিমাণে বেশী হয়, তাহা হইলে কিছু দুগ্ধ বাহির করিয়া দেওয়া ভাল।

কাপড়ের কাজ

গত বারে চটের উপর, কাঁথার উপর বা কার্পেটের উপর সুতা বা পশম দিয়া কয়েকটি ডিজাইন প্রস্তুত করিবার রীতি

৩নং চিত্র।

বলিয়াছিলাম। এই সংখ্যাতেও তদনুরূপ তিনটি ডিজাইন দেওয়া হইল। এগুলিও একই পদ্ধতিতে সেলাই করা বা বয়ন করা যাইতে পারে। নব শিক্ষার্থীরা অনায়াসে আড়াআড়ি ভাবে সুতা লইয়া এইরূপ চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন। এই ভাবে সেলাই করার ধরণকে ইংরাজিতে ক্রস্‌ষ্টিচ্ বলিয়া থাকে।

আর একদিক

রোলিন্স কলেজের প্রেসিডেণ্ট হ্যামিল্টন হোল্ট এই প্রশ্নের জবাবে বলিতেছেন, আমি যখন পত্রিকা সম্পাদকের কার্য্যে শিক্ষানবিশি সুরু করিয়াছিলাম, সম্পাদকীয় বিভাগে আমার সহকারীদের ব্যবহারে আমি অবাক না হইয়া পারি নাই—তাঁহারা আমাকে কখনও কিছু শিখাইবার ইচ্ছা না করিলেও আমাকে সব কিছু শিখাইয়া দিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপকদের সম্বন্ধে ঠিক উল্টা কথা বলিতে হয়—তাঁহারা আমাকে শিখাইবার জন্য মাহিনা খাইয়াও আমাকে কিছুই শেখান নাই। লেকচার প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদান কার্য্যকে এক কথায় বলা যায় ইহা সেই প্রণালী, যাহার সাহায্যে অধ্যাপকের নোটবুকের লেখা একটি ফাউণ্টেন পেনের মধ্যস্থতায় ছাত্রের নোটবুকে আশ্রয় লয়—কাহারও মস্তিষ্ক-প্রয়োগের কোনও বালাই এই পদ্ধতিতে নাই। স্পঞ্জের মত হইয়া কেহ কি কোনকালে শিক্ষালাভ করিয়াছে ?

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য

১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য ছাত্র-মঙ্গল-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় হইলেন, এই সমিতির অবৈতনিক সেক্রেটারী। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার বহু বর্ষের গবেষণার ফলস্বরূপ বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানি অতি-প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।* তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের প্রত্যেকের এই নিত্য তিল-তিল অপমৃত্যুর হাত হইতে জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি এইরূপ—

(১) প্রত্যেক দশজন বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে মাত্র তিন জন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম। ছয় জনকে স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়া অক্ষম গণ্য করা যাইতে পারে। কোনও না কোন বিশেষ দৈহিক বিকৃতি বা দুর্ব্বলতা তাহাদের আছে। অবশিষ্ট একজন কোন প্রকার শারীরিক শ্রমের পক্ষে একেবারে অপটু।

(২) পাশ্চাত্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় বাঙ্গালী ছাত্রদের দৈহিক ওজন তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম; বক্ষের বিস্তৃতি তুলনায় ৩৩ ভাগ কম।

(৩) পাশ্চাত্য ছাত্রদের তুলনায় বাঙ্গালী ছাত্রদের জীবনী-শক্তি ১৪·৮ ভাগ কম।

(৪) ১৬ বৎসরের পর বাঙ্গালী ছাত্রদের দেহ আর বাড়ে না। য়ুরোপীয় ছাত্রদের সাধারণতঃ ঐ বয়সের পর হইতে দেহ বাড়িতে থাকে।

(৫) দেহ যখন বাড়িবার সময়, তখন বাঙ্গালী ছাত্রদের দৈহিক ওজন দৈহিক উচ্চতার তুলনায় কম বৃদ্ধি-লাভ করে।

(৬) শতকরা ২৫ জন ছাত্রের সাধারণ ব্যায়াম করিবার মত শারীরিক যোগ্যতা নাই।

এই শোচনীয় অবস্থার কারণ সম্বন্ধে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন,—

(১) সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে উপযুক্ত খাদ্য-উপাদানের ত্রুটি। প্রোটীন, ভাইটামিন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ-বাঙ্গালীর খাদ্যে খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

(২) বাঙ্গালী ছাত্রদের একাদিক্রমে দীর্ঘকাল স্কুল-কলেজে থাকিতে হয়।

(৩) বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুণ বাঙ্গালী ছাত্রদের অনেক সময় শক্তির অপব্যয় ঘটে।

(৪) উপযুক্ত শরীর-চর্চ্চার অভাব।

(৫) স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

(৬) বাঙ্গলা দেশের স্কুল-কলেজে দিনের যে-সময় পড়া হয় (অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে গরমের সময়) তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

সর্ব্বশেষে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোকের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থাই এই মারাত্মক অবস্থার জন্য দায়ী।

জাতির এই অর্থনৈতিক দুর্গতি এত দিক দিয়া জাতিকে বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং এই সমস্যার সমাধানের পথ আজও অন্ধকারের নিবিড় অরণ্যে এমন ভাবে রেখা-হীন, যে, সহজে অল্পকালের মধ্যে তাহার মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা নাই। বহুদিনের তিল তিল সঞ্চিত অপরাধ আর অবসাদের পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই দারিদ্র্য আজ আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। জাতির অন্তর এবং বাহিরের সমগ্র মুক্তির সঙ্গে এই সমস্যা বিজড়িত। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্য হইতে, এই গড়-পড়তা মাসিক চল্লিশ টাকা আয়ের মধ্য হইতেই পথ বাহির করিতে হইবে। ন্যূনতম সম্পদের মধ্য হইতে বৃহত্তম কল্যাণের পথ বাহির করার জন্য একটা বিশেষ জাতীয় প্রতিভা আছে। যাঁহারা বিগত মহা-যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-নিরত য়ুরোপীয় জাতিদের আভ্যন্তরিক ইতিহাস অবগত

---

* First studies on the health and growth of the Bengali Students by Dr. A. N. Chatterji by the Calcutta University.

আছেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় জাতির এই বিশেষ প্রতিভার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। একটা জাতি যখন নিরুপায় হইয়া পড়ে তখন একমাত্র এই প্রতিভাই তাহাকে বাঁচাইতে পারে। আহার্য্য নাই—বৈজ্ঞানিকগণ বসিয়া গেলেন চলন-সই নূতন আহার্য্য কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা। অস্ত্র গড়িবার উপাদান ফুরাইয়া গিয়াছে—বৈজ্ঞানিকগণ আকাশের চিন্তা ত্যাগ করিয়া বসিয়া গেলেন, নূতন উপাদানের সন্ধানে। যোদ্ধাদের নূতন জুতা নাই—ফেলিয়া-দেওয়া পুরাণো জুতা সংগ্রহ করিয়া সাত-তালি দিয়া, সেই হইল নূতন জুতা। পায়ে একটু লাগিবে? সাহিত্যিক ছন্দের মিল স্থগিত রাখিয়া, দার্শনিক লোকাতীত চিন্তা সরাইয়া ঘোষণা করিলেন, লাগুক্—শুধু বাঁচিয়া থাকাই যেখানে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে সেখানে অতটুকু তো লাগিবেই। এই যে একটা বিশেষ জাতিগত প্রতিভা, মৃত্যুকে জয় করিবার এই যে একমাত্র পথ—আজ আমাদের সকল নিরবলম্বতার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের একমাত্র অস্ত্র। আজ আমাদের বৈজ্ঞানিকদের উচিত—নব খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সৃষ্টিমূলক গবেষণা করা - আজ জাতির অবসন্ন প্রজ্ঞাকে জাগাইয়া তোলা উচিত—যাহার দ্বারা আর্কট-অবরোধের সিপাহিদের মত তাহারা বলিতে পারে, অন্ন গোরারা খা'ক, ফ্যান খাইয়াই আমরা যুঝিব।

এই কথাটা এখানে উল্লেখ করিবার একটা তাৎপর্য্য আছে। আমরা চার পয়সা একখানা চপের জন্য খরচ না করিয়া এক পয়সায় তাহার অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি। সহসা যখন আমাদের আয় বাড়িবার কোনও উপায় নাই—তখন আহার-সামগ্রী সম্বন্ধে আমাদের নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। স্বীকার না করিলেও, আহার সম্বন্ধে আমাদের মনে এমন একটা ভব্যতা-বোধ আছে এবং তাহারই সঙ্গে খাদ্য-খাদ্য-বিচার সম্পর্কে এমন অজ্ঞতা আছে যে, অনেক সময় অল্প মূল্যের স্বাস্থ্যকর খাদ্য আমরা গ্রহণ করিতে লজ্জা-বোধ করি। এই মানসিকতার পরিবর্ত্তন করিলে আমাদের মনে হয়, অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য যে-সব কারণ দেখাইয়াছেন—তাহার সমাধানের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়, আমাদের বহু সমস্যার মত, এই সমস্যাকেও আমরা সত্যকারের জাতিগত সমস্যা বলিয়া এখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই আমাদের নিজেদের আত্মীয় অসুস্থ হইলে আমরা যেভাবে চঞ্চল হই, সেই আন্তরিক চঞ্চলতা, সরকারী ব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায় না। তাহা না হইলে, শুধু কতকগুলি নিয়ম-রক্ষার দ্বারা—অর্থাৎ স্কুলের প্রাঙ্গণে দুই একটি "প্যারালাল বার" বসাইলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সংস্কার হইবে না। যাহাদের দেশে এইরূপ মমতা-বোধ আছে—তাহাদের দেশের স্কুলে co-operative kitchen পর্য্যন্ত আছে।

(৩৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ভিয়েনার পথে সুভাষচন্দ্র

২৩শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে ট্রিষ্টিনো কোম্পানীর "গাঙ্গে" জাহাজে বোম্বাইএর উপকূল হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য য়ুরোপের ভিয়ানা শহরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যতক্ষণ তিনি এই ভারতবর্ষের মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি ছিলেন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বন্দী। ভারতের সীমানার বাহিরে জাহাজে তাঁহাকে জানান হইল যে, ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে তাঁহার উপর যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইল।

জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে জাহাজের ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। আশ্বাস দিলেন, অচিরেই তিনি রোগ-মুক্ত হইবেন। বোম্বাইএর দুইজন ডাক্তার তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। অনুমতি মিলিল না।

বৃদ্ধ মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলে, আমাদের অনুমান হয়, ভারতে বৃটিশ-শাসনের কোনও ক্ষতি হইত না।

আত্মীয়গণ জাহাজে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন, পুলিশকে সাক্ষী রাখিয়া সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বসু জানাইলেন, পুলিশের সাক্ষাতে কাহারও সহিত তিনি দেখা করিবেন না। মাত্র তিনজন আত্মীয় জোর করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে ফ্রী প্রেসের নিকট শ্রীযুক্ত বসু একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে বলেন,—

দেশের সর্ব্বত্র আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণ আমার সম্বন্ধে যেরূপ স্নেহমমতা ও উদ্বেগ দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার শয্যাশায়ী অবস্থা সত্ত্বেও আমাকে মুক্তি প্রদান করা বা যতক্ষণ ভারতের কোন অংশে থাকিব ততক্ষণ কোনরূপ স্বাধীনতা দেওয়া গবর্ণমেণ্ট সমীচীন মনে করেন নাই। ইহার কারণ একমাত্র গবর্ণমেণ্ট জানেন। বিশেষ অনুনয় পূর্ব্বক অনুরোধ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট আমাকে আমার বৃদ্ধ ও পীড়িত জনক-জননীর সহিতও সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দেন নাই।

তাহা সত্ত্বেও আমি বিবেচনা করি, যে টুকু সুবিধা গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছার সহিত দিয়াছেন তাহা হইতেছে দেশের সর্ব্বত্র আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণের এবং বিশেষ করিয়া জাতীয় সংবাদপত্র-সমূহের অবিশ্রাম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

জনসাধারণ জানেন যে, আমার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের উপর পড়িলেও সরকারী খরচায় ইউরোপে আমার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন নাই। পক্ষান্তরে ভারতে চিকিৎসার জন্য আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণকে ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন নাই।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কারারুদ্ধ থাকার জন্য আমার আত্মীয় স্বজন এক বৎসরেরও অধিক কাল যেরূপ অর্থকষ্টে আছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভবই হইত। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ইউরোপে আমার অবস্থান ও চিকিৎসার জন্য আবশ্যক অর্থ যোগাইবার দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলেই স্বাস্থ্যের সন্ধানে ইউরোপ যাত্রা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে।

(৩৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আমি আমার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইব কি না, এখন তাহা বলা যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, যাঁহারা আমার ইউরোপ যাত্রা সম্ভবপর করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

আমি যদিও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তথাপি আমার বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আমাকে যে সাহায্য প্রদান করিতে চাহিয়াছেন আমি তাহা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই, কারণ আমি সকল সময়েই বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি যে, আমার পরিবার আমার রক্তসম্পর্কগণকে লইয়াই সীমাবদ্ধ

নহে, আমার দেশ লইয়া আমার পরিবার। আমি যখন আমার ক্ষুদ্র জীবন চিরকালের জন্য আমার দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছে, তখন আমার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখার অধিকার আমার নিকটতম আত্মীয়গণের যেরূপ আছে, আমার দেশবাসিগণেরও সেইরূপ আছে।

আমি শুধু এই আশা করি ও প্রার্থনা করি যে, সকল শ্রেণীর ভারতীয় সম্প্রদায় আমার উপর যে ভালবাসা ও স্নেহ বর্ষণ করিয়াছেন, ভগবান যেন তাঁহার অনন্ত করুণায় আমাকে তাঁহার উপযুক্ত করেন।

জাহাজ ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত আমার উপর ধার্য্য সমুদায় বাধানিষেধ সত্বেও আমি আমার দেশবাসিগণের শুভেচ্ছা ও প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি বলিয়াই আমি মনে করি।

আমি প্রতিদানে তাঁহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতেছি যে, তাঁহাদের চিন্তা ও প্রার্থনা আমার রোগমুক্তির (যদি ইতিমধ্যেই তাহার সময় না গিয়া থাকে) সাহায্যের পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী উপাদান হইবে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারগণ যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন উহা তাহা অপেক্ষা অধিক ফলোপকারক হইবে।—আনন্দবাজার পত্রিকা।

৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বসু ভিয়ানায় পৌঁছিয়াছেন। দীর্ঘ যাত্রার দরুণ তাঁহার দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তিনি একরূপ ভালই আছেন।

সমুদ্র-পথ হইতে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট আনন্দবাজার পত্রিকার মারফৎ একটি মর্ম্মস্পর্শী বিবৃতি পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন,—

* * আমি সেই সম্মিলিত বিরাট বাঙ্গলাকেই স্বপ্ন দেখিতেছি—যে বাঙ্গলা মুসলমান বা হিন্দু, খৃষ্টান বা বৌদ্ধের নয়, উহা সকল বর্ণ, সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বাঙ্গলা। সেই বাঙ্গলা একদিন সমগ্র ভারত তথা মানব-সভ্যতার জন্য নিজকে বিলাইয়া দিবে। এই স্বপ্ন আমার দিবসের চিন্তা, নিশীথের স্বপ্ন, জীবনের আনন্দ।

এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা আমার জীবনের সাধনা ও সঙ্কল্প। ইহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য আমাদের তনু-মন অর্পণ করিতে হইবে, ইহাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে কোনও-ত্যাগই শ্রেষ্ঠ নয়, কোন নির্য্যাতনই চরম নয়। * *

সকল কল্যাণের একমাত্র বিধায়ক, সকল সঙ্কটের সর্ব্বশেষ ত্রাণকর্ত্তা ভগবানের নিকট একান্ত অন্তঃকরণে আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী প্রার্থনা করিতেছে—অপহৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া হৃত-শাবক জননীর শেষ সন্তান ফিরিয়া আসুক।

পরলোকে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং ভারত-মাতার সুসন্তান শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—সাধারণত যিনি মিঃ আই, বি, সেন নামে পরিচিত—ফ্রান্সে অবস্থানকালে প্যারী শহরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার বিপুল আনন্দ ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আমেরিকা, চীন, জাপান এবং পূর্ব্ব এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল হইল, মিশর, তুরস্ক, আরব, জর্জ্জিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে দুই তিন বৎসর পরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণের মধ্যপথেই তাঁহাকে বিদেশের মাটীতে দেহ-রক্ষা করিতে হইল। অথবা অমরা বলিতে পারি, ভ্রমণে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইত, পথকে তিনি ভাল বাসিতেন—পথকে যিনি ভাল বাসেন, বিদেশ তাঁহার কাছে নাই!

মিঃ সেন অতি দরিদ্র অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের অধ্যবসায়গুণে নানা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচ তাঁহাকে জোগাইতে হইয়াছে। বাল্যের এবং কৈশোরের সেই সংগ্রামের স্মৃতি তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে একটা মধুর মহত্ত্ব আনিয়াছিল—যাহার ফলে বহু দরিদ্র ছাত্র, বহু অনাথ পরিবার তাঁহার অকুণ্ঠ দানে জীবন-সংগ্রামে যুঝিবার শক্তি পাইয়াছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মামলা-নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

যদিও কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে মিঃ সেন সাক্ষাৎ ভাবে দেখা দেন নাই—তবুও তাঁহার চরিত্র-বল, সৎ সাহস এবং যুক্তি বর্ত্তমান কালের বহু রাজনৈতিক সঙ্কটের অন্তরালে শক্তি জোগাইয়াছে। ভারতের নেতাদের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ কর্ম্ম-সচিব। তিলক, আনি বেশান্ত, দেশবন্ধু এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জীবনের সঙ্গে মিঃ সেনের জীবন বিশেষ ভাবে বিজড়িত ছিল। বেশান্ত কংগ্রেসের পর তিনি ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। তারপর কংগ্রেসের পরবর্ত্তী আন্দোলনের ধারার সহিত একমত হইতে না পারায়, তিনি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন।

তাঁহার পাণ্ডিত্য, উদার অমায়িক ব্যবহার, ঋণ-করিয়াও-দান-করিবার মত হৃদয়, সহজ বাঙ্গালীয়ানা তাঁহার চরিত্র ও জীবনকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই সব লোকের তিরোধানের সঙ্গে এই ধরণের বলিষ্ঠ-হৃদয়, ভাব-রসিক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ লোকের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। হয়ত অচিরেই এমন দিন আসিবে—যখন এই সব ব্যক্তির তিরোহিত জীবনের দিকে চাহিয়া বলিতে হইবে—the great lost generation.

তরুণ শিল্পী সুধাংশু কুমার রায়

বাঙ্গলা দেশের চিত্র-শিল্পের নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রেখাঙ্কন-বিদ্যার নানা বিভিন্ন প্রকাশ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি তরুণ-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় কাঠের খোদাই এবং-লিনো-কাট চিত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'র ৩৪১,৩৬৯ ও ৩৭০ পৃষ্ঠার সংলগ্ন চিত্র তিনখানি দেখিলেই তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শ্রীযুক্ত রায় মশলীপট্টমে বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে এই বিষয়ে তাঁহার প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন অন্ধ্র জাতীয় কলা-শালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও প্রেরণালাভের সৌভাগ্যও ইহাঁর ঘটে। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতাস্থ সরোজনলিনী নারী শিল্প-বিদ্যালয়ে শিল্পকলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন।

কাঠের খোদাই চিত্র যদিও সম্প্রতি প্রসার লাভ করিয়াছে—তাহা হইলেও ইহার ভবিষ্যত অতীব উজ্জ্বল। সুধাংশুকুমারের কাঠের খোদাই মূর্ত্তিচিত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রগুলি দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই তরুণ শিল্পী তাঁহার চিত্রের জন্য বহুবার স্বর্ণ-পদকে সম্মানিত হইয়াছেন এবং আমরা বলিতে পারি, তাঁহার ভবিষ্যৎ দিন-গুলিও তাঁহার প্রতিভার বিকাশে হেম-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি যেমন সীমান্ত-রেখায় সুস্পষ্ট এবং সহজ আলঙ্কারিতায় অনুপম, মূর্ত্তিগুলিও বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় প্রাণবন্ত। বিষয়-নির্ব্বাচনের দিক দিয়াও তাঁহার প্রতিভা আদৌ সঙ্কীর্ণ নয়। আমরা এই যশস্বী তরুণ-শিল্পীর নিত্য যশোবৃদ্ধি কামনা করি।

আগামী কলিকাতা কংগ্রেস

আগামী কলিকাতা কংগ্রেস সম্পর্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

আসন্ন সরকারী "হোয়াইট পেপার" সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্যবশতঃ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত আণে, আমি ও আর কয়েক ব্যক্তি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির আগামী বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল নির্দ্ধারিত করিয়াছি—এই মর্ম্মে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দুইটি প্রেস টেলিগ্রামের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের তারিখ প্রথমে ১৮ই ও ১৯শে মার্চ্চ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন ২৯শে মার্চ্চ তারিখে হইবে বলিয়া অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতিকে জানানো হয় যে, ঐ নির্ব্বাচন না হইয়া গেলে কলিকাতার বহু দেশসেবক কর্ম্মীকে পাওয়া সম্ভব হইবে না। তাঁহাদের সুবিধার জন্যই জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তিত করিয়া নির্ব্বাচনের পর যত শীঘ্র সম্ভব অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে। "হোয়াইট পেপার" সেই সময় নাগাদ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা নিশ্চয়ই ইহা জানিতাম, কিন্তু কেহই বলিতে পারি না যে, "হোয়াইট পেপার" সেই সময়ে প্রকাশিত হইবেই এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় মহাসমিতি তাহা বিবেচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিবেন।

সকলেই জানেন যে, জাতীয় মহাসমিতির বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি (ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি) জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশন কালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিষয় আলোচনা করা হইবে তাহা বিবেচনা করেন ও জাতীয় মহাসমিতির নিকট তাহা উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস তাহা গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করিতে পারেন। জাতীয় মহাসমিতির যে সময় অধিবেশন হইবে, সেই সময়ের পূর্ব্বে যদি "হোয়াইট পেপার" প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় মহাসমিতি তাহা বিবেচনা বা প্রত্যাখান যাহা ভাল বুঝেন করিতে পারিবেন। উহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন হইতে কেহ কিছু বলিতে পারেন না।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

বনমর্ম্মর—শ্রীমনোজ বসু, প্রবাসী কার্য্যালয় ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ; দাম এক টাকা বারো আনা।

'বনমর্ম্মর' বইখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি, প্রথম গল্পের নামে বইএর নামকরণ হইয়াছে। 'বনমর্ম্মর' গল্পটিকে প্রথম স্থান দিয়া ও সমগ্র বইখানিতে তাহার নাম আরোপ করিয়া গ্রন্থকার নিজের সাহিত্যিক রুচি ও প্রকৃতির অনেকটা পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তাই প্রথম গল্পটিকে বিশ্লেষণ করিলেই সমস্ত বইখানির স্বরূপ খানিকটা ধরা পড়িবে বলিয়া আমরা আশা করি। একজন বিপত্নীক ডেপুটিকে লইয়া গল্প আরম্ভ হইয়াছে। ডেপুটি আসিয়াছেন জরীপের মোকদ্দমা করিতে। মোকদ্দমার আবহাওয়ার ভিতর কৌশলে ডেপুটি বাবু ও তাঁহার মৃতা স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য জীবনের একটু চিত্র দিয়া লেখক তাঁহার আপন বিষয় লইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের প্রান্তে প্রাচীন স্মৃতিসমৃদ্ধ এক জঙ্গল—সেই জঙ্গলের ভিতরকার ভগ্ন গড়ের চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার অধিকারীদের পতনের দিনের কাহিনীই তাঁহার বক্তব্য। বিপত্নীক ডেপুটির স্বপ্নাবেশের ভিতর আবছায়া কল্পনার রঙে চার শতাব্দী আগেকার দুর্গাধিপ জানকীরাম ও তাঁহার সুন্দরী পত্নীর বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনী লেখক চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পত্নী-বিয়োগ-বিধুর শঙ্কর ডেপুটির মানসিক অবস্থার সঙ্গে জানকীরামের কাহিনীকে বেশ খাপ খাওয়ান হইয়াছে। লেখকের বলিবার ভঙ্গী সহজ, বাক্য দ্বারা চিত্র রচনা করিবার ক্ষমতা অনিন্দনীয়, কিন্তু তবু সমস্ত গল্প পড়িয়া মন কেমন যেন ভরিয়া ওঠে না। এ ধরণের গল্প লেখার সার্থকতা যেখানে, সেখানে লেখক পৌঁছিতে পারেন নাই—মনের মধ্যে সত্যকার একটি মোহাবেশ সঞ্চারিত করিতে গিয়া তিনি বিফল হইয়াছেন। ত্রুটি কোথায় খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাই স্থানে স্থানে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে লেখক অতিরিক্ত রঙ ঢালিয়া ফেলিয়াছেন। গোড়ায় শঙ্কর ও তাঁহার মৃতা স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের চিত্র, শেষে জানকীরামের দীঘি হইতে কনক-চাঁপা তুলিয়া আনিবার ব্যাকুলতা কেমন যেন নাটুকে মনে হয়—মন নিজের অজ্ঞাতেই পীড়িত হইয়া ওঠে। এই অশোভন ভাবপ্রবণতা সমস্ত বইখানির সৌন্দর্য্য অনেক স্থানেই ম্লান করিয়াছে। অধিকাংশ গল্পই এক ধরণের দাম্পত্য-জীবন আশ্রয় করিয়া লিখিত। বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবে ভাবপ্রবণতার আতিশয্য আরো বেশী করিয়া চোখে পড়ে। ভাষা অত্যন্ত সহজ করিতে গিয়া লেখক কোথাও কোথাও ব্যাকরণের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তবে প্রায় সব গল্পগুলি সুখপাঠ্য। আজকালকার দিনে এ প্রশংসা করিবার সৌভাগ্য সমালোচকের বড় একটা হয় না।

বিদ্যুৎ-শিখা—শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল্ প্রণীত, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত—দাম এক টাকা।

'বিদ্যুৎ শিখা' গল্পের বই, সব শুদ্ধ বইখানিতে বারটি গল্প আছে। গ্রন্থকার প্রাচীনপন্থী। লেখার ভঙ্গী ও ভাষা সেকেলে ধাঁজের হইলেও জোরালো ও প্রাঞ্জল, গল্পগুলি একঘেয়ে নয়—বিষয় নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্য হইতে লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পগুলির কোনটিই মনে দাগ রাখিয়া যায় না। সামান্য একটু কৌতূহল জাগ্রত করে মাত্র। লেখক ভাষার দ্বারা আখ্যান-বস্তুকে অনেক স্থানেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। গল্পকে গতি দিতে পারেন নাই। অশোভন ভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াও লেখক অনেক গল্পকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষা লেখকের একেবারে অনায়ত্ত বলিয়া মনে হইল। চরিত্রগুলি তাহাদের কথাবার্ত্তায় আড়ষ্টতার দরুণ শুধু যে অনেক স্থলে ফুটিতে পারে নাই তাহা নয়, কোথাও কোথাও হাস্যকর হইয়াও উঠিয়াছে। ভিতরের ত্রিবর্ণ ছবি ও মলাটের শোভা দেখিয়া প্রকাশকের রুচি সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়।

স্বপন খেয়া—গান ও স্বরলিপির বই—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত—১০।১বি নেবুতলা লেন হইতে শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বড়াল কর্তৃক প্রকাশিত—দাম এক টাকা।

বাঙ্গলা দেশে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, সব সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের সহিত তুলনা করিবার মত না হইলেও এ দেশেও ওস্তাদ গুণীর কখনও অভাব হয় নাই। অভাব ছিল জনপ্রিয় সাধারণ গানের ও সুরের। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সেকালের টপ্পা প্রভৃতিতেই সাধারণকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পর পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় সুরগুলিকে বাঙ্গলা গানে সংযোজনা করিয়া অতুল সেন, নজরুল ইসলাম বাঙ্গলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গলায় সঙ্গীত চর্চ্চার এক নূতন জোয়ার আসিয়াছে। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সেই জোয়ারেই তাঁহার স্বপন খেয়া দিয়াছেন। খেয়া তাঁহার সার্থকও হইয়াছে। জোয়ারের জলে শুধু তরণী চলে না। নানা প্রকার জঞ্জালও ভাসিয়া আসে। বাঙ্গলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থহীন কথার সমষ্টি, অনেক বাতুলের বেসুরা প্রলাপও গানের নামে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু নির্ম্মল বাবুর গানগুলি সে জাতীয় বলিয়া ভুল করিবার

কোন উপায় নাই। গানগুলির রচনায় সত্যকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুর সংযোজনায় তাঁহার অপরূপ কৃতিত্ব। বইখানি সঙ্গীত-রসজ্ঞদের নিকট আদৃত হইবে একথা জোর করিয়া বলা যায়।

ধান খেত—কবিতার বই; জসীম উদ্দীন; এম্পায়ার বুক হাউস হইতে প্রকাশিত—মূল্য এক টাকা।

আদি ও অকৃত্রিম গাঁয়ের কবি জসীমউদ্দীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছেন। আর কিছুর জন্য না হউক শুধু এই কীর্ত্তির জন্যই বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কবি জসীমউদ্দীন 'ধান খেত' বানান করিতে 'ক' ব্যবহার করেন নাই। মন্দ লোকে যাহা বলে বলুক আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, ইহা কবির অনেক দিনের অনেক গবেষণার ফল। সহুরে ভাষায় জটিলতা ও কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযান অনেক দিন হইতেই সুরু হইয়াছে, প্রকাশ্য ভাবে 'ধান খেত'এ তাঁহার প্রথম বিজয়-পতাকা এইবার প্রোথিত হইল। 'ধান খেত'এর মাঝে বানান-বিদ্রোহী কবি হাইফেনের বালাই রাখেন নাই। 'খেত'কে ক্রিয়াপদ হিসাবে ধরিয়া পাছে কেহ কবি জসীমউদ্দীনের আহার বিহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং প্রাণীবিদ্যায় নূতন আলোকসম্পাতের আশা করেন, সেইজন্য আগে হইতেই আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি যে আমরা কবিকে দেখিয়াছি, হাইফেন বর্জ্জিত 'ধান খেত'এর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সত্যই homo sapiens.

'ধান খেত' বই খানির সূচিপত্রে কবিতাগুলির নামের ভিতর 'কবি-পরিচিতি' বলিয়া একটি নাম পাইলাম। অনেক আশা করিয়া পাতা উল্টাইয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত নামের কোন কবিতা না পাইয়া প্রথমে হতাশ ও পরে উল্লসিত হইলাম। 'কবি-পরিচিতি' কোনও কবিতা নয়, কবি জসীমউদ্দীনের প্রশংসাপত্রের সমষ্টি। 'ধান খেত'এর পাঠকদের সৌভাগ্য অনেক; তাহারা শুধু কবিতাই পড়িতে পাইবেন না, ৮০ পৃষ্ঠায় বঙ্গ-ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত কবির ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রশস্তিও পড়িতে পাইবেন। প্রশংসা-পত্রগুলির ভিতর বিখ্যাত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখাটিই উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে পৃথিবীতে এক দামুস্থসিরো ছাড়া জসীমউদ্দীনের জোড়া কবি আর নাই। কিন্তু সে বুড়ো আর কতদিন? তিনকাল গিয়া তাহার এককালে ঠেকিয়াছে—শীঘ্রই টঁাসিবেন। তাহার পর জসীমউদ্দীনেরই রাজ-পাট। আর পোনেরোটা বছর অপেক্ষা করিলেই হইবে।

মার্কিন মুখুজ্যে মহাশয়ের এই উক্তির পর নিজেদের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আবার গোড়া হইতে 'ধান খেত' পড়িতে সুরু করিলাম। দেখিলাম সত্যই ভুল করিয়াছি। কবির জোড়া নাই সত্যই। যেমন তাঁহার টনটনে ছন্দজ্ঞান, তেমনি অসাধারণ তাঁহার ভাষার উপর অধিকার ও কবিত্বশক্তি, কবি লিখিতেছেন—

কাজল ভাঙার বহির মিএা—মুলী যদিও খেতাবী তার
তবু তাহার এলেম দেখে মৌলবীরা মানে যে হার।

এ কবিতায় মাত্রা-বিশ্লেষণ করিবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই। কৃষাণী দুই মেয়ের বর্ণনায় কবি, কালিদাসকে হার মানাইয়াছেন—

সেই মুখেতে কে দুখানি তরমুজেরি ফালি,
বেঁধে রাঙা ঠোঁটের শোভা দেখছে যেন খালি।

তরমুজের ফালির মত সুন্দর ঠোঁটের আকর্ণবিস্তৃত বাহার দেখিয়া কবির রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কবি এক যায়গায় মেঘের 'ষাঁড়ে' রোদকে ঘুম পাড়াইয়াছেন এবং পথের 'কেনারে' ধানের খেতকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছেন; আমরা হাসিব কি চোখের পানি ফেলিব বুঝিতে পারিতেছি না। কবি-পরিচিতিতে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ কবির রচনাগুলিকে 'খাঁটি জিনিষ' বলিয়াছেন। কবিগুরু নিশ্চয়ই ব্যঙ্গ করেন নাই!

প্রবাসের কথা—শচীন সেন প্রণীত—আর্য্য পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত—দাম এক টাকা চার আনা।

'প্রবাসের কথা' বই খানির গোড়ায়, প্রকাশক প্রমোদ সরকারের কৈফিয়ৎটি কোন পাঠক যেন অবহেলা করিয়া ফেলিয়া না যান। বাঙ্গলা দেশে অনেক বই-ই বাহির হয়, কিন্তু এমন সারবান তথ্যপূর্ণ প্রকাশকের কৈফিয়ৎ কয়খানি পুস্তককে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে? এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাঙ্গলা ভাষায় অনেকগুলি নামজাদা পুস্তক কেন আমাদের ভালো লাগে নাই—তাহাতে এমন সরস প্রকাশকের কৈফিয়ৎ ছিল না। বাঙ্গলা দেশের লেখকগণ এখন হইতে বই বাহির করিবার পূর্ব্বে যেন কৈফিয়ত লিখিবার মত এইরূপ উপযুক্ত প্রকাশক খুঁজিয়া বাহির করেন। তা না করিলে তাঁহাদের আশা নাই। কৈফিয়তে প্রমোদ বাবু বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"পুস্তকের সংখ্যা যতই প্রচুর হোক্ না কেন, পাঠোপযোগী পুস্তকের সংখ্যা সেই অনুপাতে অতি বিরল। একথা বোধ করি অতি বড় সাহিত্য-বিলাসীও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না।" প্রকাশক বিনয়ের আতিশয্যে যে কথা বলিতে পারেন নাই, আমরা তাহা চাপা দিয়া রাখিতে পারিলাম না। বাংলা পুস্তককে পাঠোপযোগী করিবার জন্য এমনি কৈফিয়ৎ চাই।

প্রকাশক জানাইয়াছেন যে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া যখন তিনি হতাশ হইয়াছিলেন তখন শচীন সেনের 'প্রবাসের কথা' তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ার আনন্দ দেয়। এ সংবাদে আমরা বিস্মিত হই নাই, কমল ও কুমড়ো ফুলের পার্থক্য বোঝে না এমন জীবও পৃথিবীতে আছে—বিধাতার সৃষ্টিকে নইলে বিচিত্র বলে কেন!

কিন্তু 'প্রবাসের কথা'কে উপন্যাস বলিয়া প্রকাশক মহাশয়ের চালাইবার চেষ্টা হজম করা একটু কঠিন। তিনি লেখককে বলিয়াছেন—"...আপনি ত উপন্যাসই লিখেছেন—এমন রসের জিনিষকে আপনি উপন্যাস বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?" লেখক কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন শুনিয়া তবু একটু আশ্বস্ত

হইলাম। সুদীর্ঘ জ্ঞান তাঁহার একেবারে লোপ পায় নাই। 'কৈফিয়ৎ'-রহস্য আর প্রকাশ করিয়া বইখানির ক্ষতি করিতে চাহি না।

'প্রবাসের কথা' পড়িতে পড়িতে প্রথমেই মনে একটি সন্দেহ জাগে। লেখকের প্রবাস-বাস কত দিনের! কারণ সমস্ত বইখানিতে—"কি তুগগি দেখলাম চাচা"র সুর অত্যন্ত পরিস্ফুট। কালাপানি পার হইয়া লেখক মার্জ্জারাক্ষিদের মাঝে পড়িয়া আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন! একেবারে বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছিঁড়িবার মত ঘটনা না হইলে এতখানি বেসামাল হইবার কথা নয়। দীর্ঘ হইলেও বইখানি হইতে একটি জায়গা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। এইটুকু পড়িবার পর আশা করি লেখকের মনস্তত্ব সম্বন্ধে আর টীকার আবশ্যক হইবে না।

"রবিবারের বাজার—সঙ্গীহীন, কেউ নেই—শুধু আমরা যেন দুজনে ছিলাম একা! আমরা ভারতবর্ষের লোক—মেঘলা আকাশে মন ওঠে না। এমন সময় হাসতে হাসতে একটি যুবতী আমাদের বেঞ্চে এসে বসল। বন্ধুবর রাগে লাল হ'য়ে গেল। মেয়েটি "হনুমান চরিত" পড়েনি—তাই বন্ধুর মনের কথা টের না পেয়ে তার সঙ্গে ভারতবর্ষের আলাপ সুরু করে দিল—এমন কি তাকে একটি চকোলেটও দিতে হ'ল। মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল—"আচ্ছা একটা fun করা যাক্!" বন্ধুবর উৎসুক হ'য়ে উঠল। মেয়েটি বললে—"আচ্ছা শুধু funএর খাতিরে তোমাকে আমি 'কিস্' করি।" বন্ধুবর প্রমাদ গণল—তার মনে পড়ল শ্যামাসঙ্গীত ও স্ত্রীর ছবির কথা—তার মনে হ'ল এই ব্রাইটনের মেঘলা আকাশে সমুদ্রের উপরে অশুচিতার পোকা-গুলো হয়তো তার সংযমকে নষ্ট করে দেবে। এমন সময় আর একটি মহিলাকে দেখে সেই যুবতীটি হাসতে হাসতে 'good bye' ব'লে যৌবনের সৌরভে বন্ধুটাকে পাগল ক'রে চলে গেল। যুবতী চলে গেল বটে কিন্তু বন্ধুর মন থেকে সে গেল না। বন্ধুটী আজও বলে—"মেয়েটি বোধ হয় খুব খারাপ ছিল না!

ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বন্ধুবরকে আঘাত দেওয়া নয়—শুধু এই কথাটিই বলা যে ওরা জীবনকে কত সহজ ভাবে গ্রহণ করে।"

হিমালয়ের ডাক—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্‌স্, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সাহিত্য মানুষের স্বপ্নের সঙ্গী, ইতিহাসে তাহার জ্ঞান-স্পৃহা মেটে। জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়াইয়াও স্বপ্ন—কিন্তু এই স্বপ্নকেও মানুষ জ্ঞানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিবার যে দুঃসাহস অর্জ্জন করিয়াছে, 'হিমালয়ের ডাক'এ আমরা সেই পরিচয় পাই। ইহাকে সাহিত্য-ধর্ম্মী ইতিহাস কি ইতিহাস-ধর্ম্মী সাহিত্য বলিব জানিনা, কেননা ইহাতে উপন্যাস পড়িবার আনন্দ এবং ইতিহাস পড়িবার জ্ঞান দুই-ই এক সঙ্গে পাইলাম। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে যে তিনটি অভিযান হিমালয় আরোহণের চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের সুন্দর বিবরণে বইখানি শুধু সুপাঠ্য নয়, রসাল হইয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে ভুল হয়, কোনও অলৌকিক কাহিনী পড়িতেছি কি না। প্রবোধ বাবুর রচনাশক্তির পরিচয় ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

মনের খেলা—উপন্যাস। শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী লিখিত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

নায়ক অনল রায় নায়িকা ব্রততী সেনের দাদার বন্ধু। বিলাত ঘুরিয়া আসিলেও নায়ক নারী-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নয়। নায়িকা কলেজে-পড়া অতি-আধুনিকা। নায়কের পরিচয় দিতে তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখিতেছেন, 'ভদ্রলোকটির নাকি স্ত্রীস্বাধীনতার উপর বেজায় রাগ, আর আমাদের মত আল্‌ট্রা মডার্ণ মেয়েদের নাকি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।' কিন্তু কয়েক দিনের জন্য বন্ধুর আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়া ভদ্রলোক এই অসহ্য মেয়েটির প্রেমে পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তাঁর জ্বর হইল, জ্বরের বিকারে তিনি নিজের গোপন প্রেমের কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল। মেয়েটি বন্ধুকে চিঠিতে লিখিল, "পুরুষগুলো কি বল্ দিকি ভাই? অসুস্থ দেখে একটু সেবা ক'রেছি অমনি প্রেমে পড়ে গেছে।" ইহার পর একটি মেম সাহেবের লেখা চিঠির ভুল অর্থ বুঝিয়া ব্রতী ঈর্ষ্যায় ক্ষেপিয়া গেল এবং অনলের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু সচরাচর যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহা ঘটিতে দেরী হইল না। অতি শীঘ্রই মেয়েটি ভুল বুঝিয়া নায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিল। অবশেষে একদিন এলাহাবাদে ধর্ম্মঘটী কুলীদের সেবাতে ব্যস্ত নায়কের সহিত নায়িকার মিলন আসন্ন হইয়া উঠিল। পুস্তকের নায়ক গভীর রাত্রে বেহালাতে রবীন্দ্র-নাথের গান বাজাইয়া মনো-বেদনা প্রকাশ করে। নায়িকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার প্রেমে আবেগবিহ্বল হয়। এমন কথা বলিতেছি না যে এমন ঘটনা বাংলা দেশে ঘটে না—কিন্তু এ পুস্তকে লেখক সে ব্যাপার যেমন ভাবে ঘটে দেখাইয়াছেন, তেমন ভাবে ঘটে না।

অপটু লেখনী ও অপরিণত মনের ছাপ বইখানির চরিত্র-চিত্রণে ও লিখিবার ভঙ্গীতে এত সুপরিস্ফুট যে ধৈর্য্য ধরিয়া ইহা শেষ করাও কঠিন। এ বই ছাপাইবার এমন বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল বুঝিলাম না।

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রেমের সোনা' কবিতায় যে তথ্য প্রচার করিতে চাহিয়া-ছেন তাহা পুরাতন হইলেও শুনিবার মতো। তিনি বলিতেছেন, রবিদাস চামারও চিতোরের রাজরাণীর গুরু হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে এবং আচারের হাজার গ্রন্থিতে বাঁধা রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত স্মৃতি-শিরোমণিও অস্পৃশ্য অন্ত্যজের তুল্য হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়। বড়

কথা হইতেছে, গুরু রামানন্দের প্রেমের পরশ। সকলের ভাগ্যে এই স্পর্শ জোটে না বলিয়াই আমাদের আক্ষেপ।

'প্রেমের সোনা'র থিয়োরী কিন্তু 'পত্রধারা'র রবীন্দ্রনাথ কাজে খাটাইতে পারেন নাই। তিনি প্রেম দিয়া হৃদয় জয় করিতে পারেন না। তর্ক করেন, তর্কে হারেন অথবা জেতেন এবং ক্লান্তও হইয়া পড়েন। এইজন্য শেষ পত্রের শেষাংশ সকলকেই স্মরণে রাখিতে বলি। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে বোধ হয় এ সম্বন্ধে অসতর্ক হইয়া পড়েন বলিয়া গোল বাধে। তিনি বলিতেছেন—"গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি, নানা ভাবে নানা দিকে আমার মন সঞ্চরণ করে, আমার স্বভাবের বৈচিত্র্যবশতঃ নিজেকেও নিজে বুঝিনে, অন্যেও আমাকে বোঝে না।"

আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনকে একদিকেই সঞ্চরণ করিতে দেখি।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাউল' প্রবন্ধ এই সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের এই প্রবন্ধে এই সংখ্যায় উদ্ধৃত একটি পদ মনে পড়িতেছে—

> "ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরি।
> নিকষে কষয়ে কমল, আ-মরি মরি।"

'আ মরি মরি'ই বটে, এ যেন অল-বাউল-রেলওয়ের গাইড-বুক—এখানে পাহাড় দেখ, ওখানে জলাশয়; ওখানে প্রাচীন মন্দির, এখানে লোহার কারখানা। ট্রেণ কিন্তু থামে না।

'বাঙ্গালা অক্ষর'—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকারের বাংলা টাইপ ও কেস বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বয়ং এ বিষয়ে কি ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস ও এই সঙ্গে নূতন করিয়া তাঁহার যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'এমিলিয়া গালোত্তি'—অনুবাদ নাটক, অনুবাদক শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী। অনুবাদক যে সৌভাগ্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাজারে প্রবাসীর মত পত্রিকায় ২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক অনুবাদ নাটিকা প্রকাশ করিতে পারা এবং গৌরীশঙ্কর অভিযানে সফলকাম হওয়া একই কথা। গাঙ্গুলী দেখিয়া যে সন্দেহ মনে উদিত হয় তাহা সত্য হইলে কিন্তু ব্যাপারটা ভাল নয়।

ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৩৯

বাংলার ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলেও চলে। খুব বেশী ঐতিহাসিক এই যুগের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করেন নাই। অথচ এক হিসাবে ইহাকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা চলে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিতে' ও পরলোকগত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য' নামক পুস্তকে এই সময়কার অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর বেশী নির্ভর করা চলে না। অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ মহাশয় তাঁহার 'প্রতাপাদিত্যের কথা' নামক প্রবন্ধে এই সময়কার ইতিহাস অনেকখানি উদঘাটিত করিয়াছেন এবং তিনি তথ্য প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা বলেন না। বাংলার এই লুপ্ত ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা কৌতূহলী তাঁহারা এই প্রবন্ধটিতে অনেক মালমশলা পাইবেন।

'মহাপ্রস্থানের পথে' এখনও চলিতেছেন শ্রীপ্রবোধ সান্যাল মহাশয়। এ সংখ্যায় আটাশ পৃষ্ঠাব্যাপী পথ চলিয়াও তিনি হাঁপাইয়া পড়েন নাই, এখনও ক্রমশঃ। এক জায়গায় পড়িয়া কেমন খটকা লাগিল—লেখক কি ফিরিয়া আসেন নাই? তিনি লিখিয়াছেন—'ছুটে চল্, ওরে ছুটে চল্, এ পৃথিবী পার হয়ে পালিয়ে চল্: এই লজ্জা কপটতা ছলনা বিশ্বাসঘাতকতা, এই মনুষ্যত্বের চরম অপমান—সমস্ত অতিক্রম করে মহাপ্রস্থানের পথে ছুটে চল্।' তিনি ফিরিয়া আসিয়া থাকিলে পৃথিবীর এই সকল গ্লানি নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে!

বিচিত্রা—ফাল্গুন, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' শেষ হইয়াছে, বিচিত্রার প্রথম আট পৃষ্ঠা সাদা থাকিবে কিনা এখনও জানা যায় নাই। প্রবাসীর 'পত্রধারা' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের মনের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই এখন আর নূতন উপন্যাস লিখিতেছেন না।

'পারস্য-ভ্রমণ' লইয়া প্রবাসীর শ্রীযুক্ত কেদার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বিচিত্রার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পাল্লা এখনও চলিতেছে। উনি যদি দিতেছেন হোটেলের খাওয়ার মেনু, ইনি দিতেছেন ছবি। মাঝ হইতে ব্লক-মেকাররা বড়লোক হইয়া গেল।

'বিপ্রদাস'—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্লকের দৌলতে শরৎবাবু 'বিচিত্রা'র শ্রী বাঁচাইয়া চলিতেছেন এইটেই তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁহার বিশেষত্ব তিনি রাখিতেছেন, কিন্তু আমাদের ভয় আছে। ছেলেবেলায় পরীক্ষায় তৈয়ারী হইবার জন্য যখনই কোনও বই লইয়া বসিতাম, খুব তোড়জোড় করিয়া প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার পর উৎসাহ কমিয়া আসিত, পরে আবার সেই বইয়ের পড়া তৈয়ারী করিবার জন্য সুরু হইতে শুরু করিতে হইত। শরৎবাবুর বিপ্রদাসেরও সেই বইয়ের অবস্থা। বেণুতে তিনি দুই দুইবার মহা উৎসাহের সহিত বিপ্রদাস লিখিতে সুরু করিয়া থামিয়া গিয়াছেন; এবারে পুঁথি সমাপ্ত হইলে বিচিত্রার জোর কপাল বলিতে হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
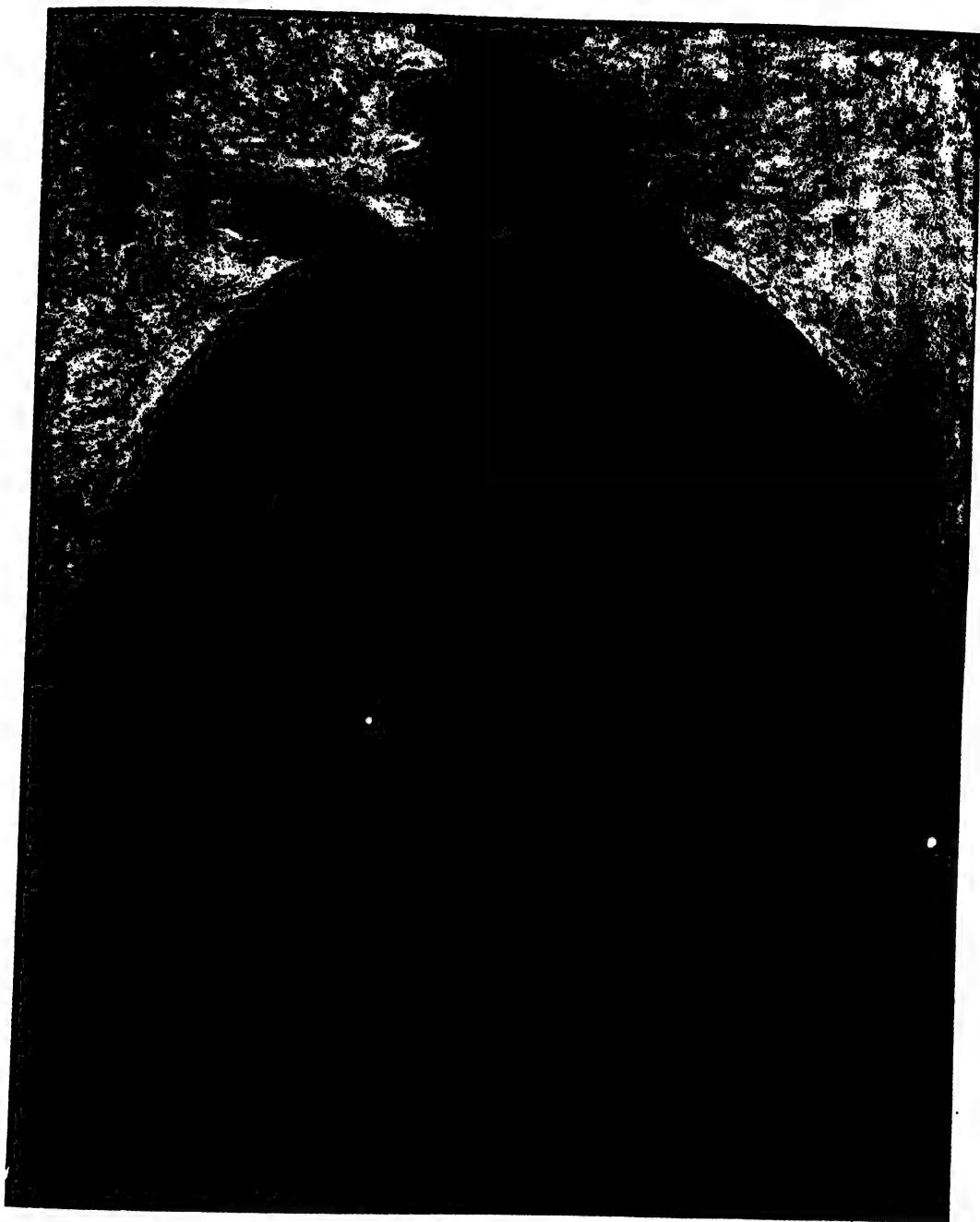
নটীর পূজা

শিল্পী - শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভবদর্শন

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৬ অব্দের জুলাই সংখ্যার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে পার্জ্জিটার সাহেব এক খেলার 'ছক্' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই 'ছক্' ক্যাপ্টেন রবার্টসন ১৮৩১ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপহার দিয়াছিলেন। পার্জ্জিটার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ছক্' অবলম্বনে আমি এক নূতন 'ছক্' প্রস্তুত করিয়াছি। সেই 'ছক্' এই সঙ্গে দেওয়া গেল। 'ছকে'র বিবৃতি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাঙ্গালাদেশের গানে আছে—

(১) বৃথা ভবে খেল্‌তে এলি তাস,
ও তোর মন্ত্রী করলে সর্ব্বনাশ।

(২) এ মায়া-প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে......ইত্যাদি।

'ভবে'* আসাটা বাঙ্গালীর মনে খেলা করিতে আসা বা অভিনয় করিতে আসা বলিয়া কখনও কখনও বোধ হইয়াছে। ভবে আসিয়া খেলিতে খেলিতে চক্ষু খুলিয়া রাখিলে ভবের দর্শনটা বেশ ভালই হয়। যিনিই এই ভবে আসিয়াছেন তাঁহারই চরম লক্ষ্য আনন্দপ্রাপ্তি; কিন্তু ক্ষুদ্রে বা অল্পে আনন্দ নাই, বৃহতে বা ব্রহ্মেই আনন্দ আছে; তাই, প্রত্যেক ভবখেলার খেলোয়াড়কে ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহৎ বা ব্রহ্মের দিকে যাইবার জন্য প্রবৃত্ত দেখা যায়, ক্ষুদ্র বা অল্প লইয়া তৃপ্ত থাকিতে কাহাকেও দেখা যায় না। যে যে-বিষয়েই ব্রতী থাকুক না কেন, তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে নিজেকেই ছাড়াইয়া যাইবার জন্য; 'আরও চাই', 'আরও দাও',—এই প্রকার মনোবৃত্তির মূলে আছে নিজেকে সীমার বাহিরে লইয়া যাইবার প্রবৃত্তি। যে ভবে আসিয়াছে, তাহারই মনের অন্তরতম প্রদেশে সর্ব্বদা জাগ্রৎ আছে—আনন্দ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ভবখেলার ছকের শেষ ঘর 'পর-ব্রহ্ম'।

আমাদের সাধারণ হিসাবে, ভবে সৃষ্ট-পদার্থের বা ভূতের† মধ্যে অচল জড়পদার্থই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভব-খেলার ছকে প্রথম ঘর 'তামসভূমি'। রজোগুণের স্ফুরণ অচল জড়ে নাই বলিয়া ইহাতে কোন প্রকার গতি নাই, সত্ত্বগুণের স্ফুরণ নাই বলিয়া চৈতন্যস্ফূর্ত্তি নাই। এই অবস্থার নির্দ্দেশক 'তামসভূমি' ছকে প্রথম ঘর। এই (১) তামসভূমি ও (১২৪) পরব্রহ্মের মাঝে নানা ঘর আছে। পরমানন্দ পাইতে হইলে জীবকে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ঘরের ভিতর দিয়া চলিতে হয়। এই সকল ঘর একটি বৃহৎ ডিম্বাকৃতি বৃত্তাভাসের (ellipse)* মধ্যে অবস্থিত। বৃত্তাভাসটি তিন ভাগে† বিভক্ত;—তামসভূমি হইতে রাজসভূমির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, ইহাতে ৪১টি ঘর আছে; রাজসভূমি হইতে সত্ত্বভূমির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, ইহাতে ৪৭টি ঘর; সত্ত্বভূমি হইতে পর-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ, ইহাতে ৩৬টি ঘর। এতদ্ভিন্ন ডিম্বের একদেশে একটি বৃত্তাকার অতি সুন্দর ঘর‡ আছে, সেটি লইয়া ঘরের সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ১২৫।

পাঞ্চভৌতিক§ দেহ লইয়াই জীবকে পর-ব্রহ্মলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, পাঞ্চভৌতিক দেহকে বাদ দিয়া নহে—এবং তিনটি স্তর—ভৌতিক, মানসিক ও আত্মিক ভূমি—সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া শেষ-লক্ষ্যে পৌছিতে হয়। পাঞ্চভৌতিক দেহ-দ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞানের সঙ্কেত (symbol) ধরিয়া লওয়া যাক্ ৫। সর্ব্বনিম্ন ভূমির সকল অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ ৫) লইয়া দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করিতে হয়, এবং দ্বিতীয় ভূমির সকল অভিজ্ঞতা লইয়া তৃতীয় ভূমিতে আরোহণ করিতে হয়। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্ জ্ঞান বলিতে বুঝা যায় তিনটি ভূমিরই সম্যক্ জ্ঞান। এখন নিম্নভূমির জ্ঞান=৫, তাহা লইয়া দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ এবং এই

* ভব=জন্ম

† ভূত=ভূ+ক্ত, যাহা হইয়াছে

* ব্রহ্মাণ্ড=ব্রহ্ম+অণ্ড (ডিম্ব)

† ভৌতিকভূমি, মানসিকভূমি, আত্মিকভূমি

‡ স্বর্গ

§ ৫টি কড়ি লইয়া খেলা

৫-দ্বারা দ্বিতীয় ভূমির সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জন=৫×৫, অথবা ৫² অথবা ২৫ ; দ্বিতীয় ভূমির সম্যক্ জ্ঞান বা ২৫ লইয়া তৃতীয় ভূমিতে আরোহণ এবং এই ২৫-দ্বারা তৃতীয় ভূমির সম্যক্ জ্ঞান অর্জ্জন=২৫×৫ অথবা ৫³ অথবা ১২৫। ৫+৫+৫ নহে, কিন্তু প্রত্যেক পাঁচের প্রত্যেক একের সঙ্গে অপর পাঁচের প্রত্যেক একের সম্বন্ধ ঘটে বলিয়া ৫×৫×৫=১২৫।

এই ভবখেলা অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। দু-একজন খেলায় 'জিৎ' করিয়া খেলা বন্ধ করিলেও অন্যেরা ঠিক খেলিয়া চলিয়াছে। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই—এই হিসাবে যে, দু-একজনের 'ভব' শেষ হইলেও সকলেরই ভব একসঙ্গে শেষ হয় না; কাজেই খেলা চলিয়াছে অনন্তকাল ধরিয়া। আমরা এই অনন্তত্বের সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না; কেননা, আমরা—যখন বহুবচন-দ্বারা নিজেদের নির্দ্দেশ করি—plurality বা individualityর (বহুত্ববাদ বা ব্যষ্টিবাদ) মধ্যে গিয়া পড়ি—তখন আমরা সান্ত; সান্ত আমরা সান্ত কিছুরই ধারণা করিতে পারি। যে মুহূর্ত্তে আমরা 'ভবে' প্রবেশ করিয়াছি—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের অভিজ্ঞতা 'সান্ত' লইয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই 'সান্তে'র জ্ঞান আমাদের এমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে যে, যখন আমরা অনন্তের অনুসন্ধান করিতে যাই তখন অনন্তকেও ব্যাবহারিক-ভাবে সান্ত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, যে অনন্ত তাহারও একটা কোনওরূপ আদি বা শেষ কল্পনা করিতে বাধ্য হই। এই হিসাবে আমাদের এই ভবখেলারও একটা আরম্ভ করিতে হইয়াছে।

জীব অভিজ্ঞতার সাহায্যে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ও কল্পনার সাহায্যে যখন অনন্তের আদি খুঁজিতে যায় তখন নিম্নরূপ স্থানে গিয়া থামিয়া যায়:—সৃষ্টির এমন একটা স্তর যেখানে মানুষ নাই, পশু নাই, পক্ষী নাই, কীট-পতঙ্গ নাই, বৃক্ষ-লতা নাই,—সৃষ্টি বুঝিতে বিভিন্ন যে সমস্ত পদার্থ আমাদের সাহায্য করে—তাহারা কেহই নাই; আলোকও যে আছে তাহাও বলা যায় না, কেননা, আলোক থাকিলেই প্রকাশ থাকিল, বীক্ষণ থাকিল, দ্রব্যসকল যে পরস্পর বিভিন্ন এই বোধের সম্ভাবনা থাকিল; তবে সে স্তরে কি আছে? বোধ হয় কেবল অন্ধকার, দ্রব্যাদির অস্তিত্ব নাই, থাকিলেও বোধের সম্ভাবনা নাই;—chaos বলিতে পারা যায় বা তামস কিছু—তথাপি অস্তিমান কিছু—এইরূপ বলিতে পারা যায়। আমাদের জ্ঞানে ইহাই হইল সৃষ্টির আদিস্তর। ইহার পশ্চাতে সান্ত—আমাদের জ্ঞান পৌঁছায় না। এই স্তরে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে ক্রমোন্নতি-(evolution) স্রোতে জীব চলিতে আরম্ভ করিল। খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। খেলার ছকে তামসভূমি ঘর নং ১।

পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়াই আমাদের সকল কারবার। পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়াই তামসভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে। উপনিষদে পঞ্চভূতের যে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বিকাশ-ক্রম দেখা যায় তাহা এই,—আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী। * পঞ্চভূত আধুনিক বিজ্ঞানের হিসাবে elements বা উপাদান নহে; সৃষ্ট পদার্থসমূহের অবস্থা-বিশেষই এই পাঁচ শব্দের লক্ষ্য। (১) আকাশ,—পদার্থের সূক্ষ্মতম অবস্থা—যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, স্পর্শ করিতে পারা যায় না, যাহা আমাদের গতিবিধিতে বাধা দেয় না বরং অবকাশ দেয়—অথচ প্রমাণ-(proof) দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারা যায় এমন একটি অবস্থা—আকাশ; ইহা একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য (২) এতদপেক্ষা স্থূল অবস্থা—বায়ু; বায়ু দুইটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। (৩) বায়ু অপেক্ষা স্থূল অবস্থা—অগ্নি; অগ্নি তিন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। (৪) অগ্নি অপেক্ষা আরও স্থূল অবস্থা—জল; জল চারি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। (৫) জল অপেক্ষাও স্থূল অবস্থা পৃথিবী; ইহা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা-কিছু কঠিন—তাহার নাম পৃথিবী (Earth নহে); তদপেক্ষা ব্যাপক ও তরল যাহা-কিছু তাহার নাম অপ্ (water নহে); এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম অতএব অধিকতর ব্যাপক যাহা তাহার নাম তেজ বা অগ্নি; ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অতএব আরও বেশী ব্যাপক যাহা তাহার নাম বায়ু এবং সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অতএব সর্ব্বব্যাপক যাহা তাহার নাম আকাশ। এই হইল আমাদের জড়জগতের পদার্থবিন্যাস। ইহার পরেও কি কিছু নাই যাহা জড় নহে, যাহা জড়ে আবদ্ধ নহে? আছে, তাহার নাম আত্মা বা ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ (২।১।১)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—অস্তি ভগব

* তৈ, উপ. ২।১।১

আকাশাদ্ ভূয় ইতি? আকাশাদ্ ভূয় অস্তীতি (৭।১২।১)। আকাশ অপেক্ষাও মহৎ কিছু আছে কি? হাঁ, আছে। আবার, ৭।২৬।১—আত্মত আকাশঃ। আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত। আবার বৃহদারণ্যকে (৩।৮।৭) কস্মিন্ন্ খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ?—(৩।৮।১১) এতস্মিন্ন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।—আকাশ কোথায় ওত এবং প্রোত?—হে গার্গ এই অক্ষরে আকাশ ওত এবং প্রোত। সকলকেই যাইতে হইবে এই 'অক্ষরে'র নিকটে,—পাঞ্চভৌতিক 'ক্ষর' আশ্রয় করিয়া।

তামসভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে তমোগুণযুক্ত অর্থাৎ এক হিসাবে চঞ্চলতাবিহীন, চলচ্ছক্তিবিহীন কঠিন ঘন জড় পদার্থের প্রাধান্য থাকিবে।* স্মরণ রাখিতে হইবে—বৃত্তাভাসের (ellipse) বাহিরে কিছুই নাই, যাহা-কিছু আছে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের বা বৃত্তাভাসের ভিতরেই আছে। যে মুহূর্ত্তে তামস-ভূমিতে প্রবেশ হইয়াছে—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই 'খেলোয়াড়ের' অভিজ্ঞতা কতকটা 'ভূত' বা অতীত, কতকটা 'ভবৎ' বা বর্ত্তমান এবং কতকটা 'ভাবী' বা ভবিষ্যৎ। তবেই, সে রীতিমত √ভূ ধাতুর সহিত পরিচিত হইয়াছে। এমন কি সে √ভূ ধাতুর অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সকল অভিজ্ঞতার সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে √ভূ+অপ্ =ভব। আর, সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে যাহার দ্বারা তাহার সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে দর্শন। খেলার নাম ভবদর্শন, আমাদের জীবনের নামও ভবদর্শন।

এখন 'ভূতের' মুখে খেলার হিসাব লওয়া যাক। 'ভূতের' উক্তি।—কতবার জন্মিয়াছি, কতবার মরিয়াছি, কোন্ জন্মে কি ভাবে কাটাইয়াছি—সব যদি মনে করিয়া বলিতে পারিতাম তাহা হইলে এই ভবখেলাটা আমার কাছে বা জগতের কোনও ভূতের কাছেই সমস্যা বলিয়া বোধ হইত না। যাহাই হউক, এই সমস্যার খেলাটা কেমন খেলিয়াছি তাহা শোন।

(২ ঘর) অল্প অল্প মনে পড়ে—বিস্তীর্ণ পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্যই যেন তাহার বুকে তৃণ হইয়া জন্মিয়াছিলাম। দেখিতাম—ছোট-বড় রকম-বেরকম কত রকমের আত্মীয়-স্বজন আমার চারিদিকে বাস করিত। কাহারও হরিৎ-দেহ পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া থাকিত, কাহারও কোমল দেহলতা হেলিয়া-দুলিয়া বাতাসে নাচিত। কেহ-বা সুদৃঢ় দেহসৌষ্ঠবে ভূষিত হইয়া গর্ব্বিত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কাহারও নাম ছিল শৈবাল, কাহারও নাম ছিল বল্লী, কাহারও নাম ছিল বনস্পতি, কাহারও ওষধী, কাহারও নাম ছিল সাধারণ বৃক্ষ, আর লোকে আমাদের নাম রাখিয়াছিল তৃণ। সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারি না—তবে একটু আধটু বুঝিতে পারিতাম—নানা রকমের জীবজন্তু আমাদের সাহায্যে জীবন-ধারণ করিত, আমাদিগের ফল ভক্ষণ করিত, আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনের হাত-পা কাটিয়া লইয়া গিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে নিজেদের দেহরক্ষা করিবার মত আশ্রয় প্রস্তুত করিত। আর নিন্দার বেলায় আমাদেরই নিন্দা করিত। কত প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিতাম, ঠিক-মত পারিতাম না। কেমন একটা মোহ আমাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন শুনি—মনু নামে কে একজন মহাপুরুষ নাকি অনুগ্রহ করিয়া বলেন—কর্ম্মদোষেই আমাদের এই অবস্থা—

> তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
> অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥—মনু ১।৪৯

যাক, দুঃখ করিয়া লাভ নাই। এক এক করিয়া সকল আত্মীয়েরই নাম আমাকে বহন করিতে হইল।* মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়ি আর জাগিয়া দেখি লোকে নূতন নাম দিয়াছে। এইরূপে বহুদিন যাইবার পর একদিন বড় বেশী নিদ্রা আসিল। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখি যে,

(৩ ঘর) আমি উদ্ভিদ্ হইতে 'পর' হইয়া গিয়াছি এবং দংশ, মশক, যূকা, মক্ষিকা, মৎকুণ প্রভৃতি জীবেরা আমার আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখানেও পূর্ব্বেরই ন্যায় আমার কত নাম যে হইল তাহার সংখ্যা করা বিষম ব্যাপার। শাস্ত্রাদিতে নাকি এই সকল নামধারী জীবকে স্বেদজ বলা হইয়াছে। বহুদিন যায়, একদিন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া দেখি যে,

(৪ ঘর) স্বেদজ হইতে 'পর' † হইয়া গিয়াছি। এখানে এক নূতন অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কি একটা

* পাঁচ কড়া কড়ির মধ্যে একটি মাত্র চিত্, হইলে খেলা আরম্ভ হইবে।

* পুরাণের মতে স্থাবর ৩০ লক্ষ যোনি।

† মনু—১।৪৪, অণ্ডজ

কঠিন আবরণ আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, ভিতর হইতে যতই চেষ্টা করি না কেন, বাহির হইতে পারি না। হঠাৎ একদিন আবরণ খসিয়া গেল; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার প্রাণী আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষী, সর্প, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ—এইরূপ আরও কত জলচর, স্থলচর, খেচর প্রাণী আদর করিয়া আমাকে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে স্থান দিতে লাগিল। বহুদিন এইরূপে কাটিবার পরে একদিন নিদ্রাভঙ্গে দেখি যে,

(৫ ঘর) আমার আবরণ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন সেই আবরণের মধ্যে বাস করিয়া একদিন বাহির হইলাম। * এবার আনন্দের মাত্রা কিছু বাড়িয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ চালনা করিতে পারি, ইচ্ছামত ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে পারি। এই অবস্থায় আত্মীয়ের সংখ্যাও বেশ বাড়িয়া গেল।

পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মানুষাশ্চ জরায়ুজাঃ॥—মনু ১।৪৩

—ইহারা সকলেই আমার আত্মীয়। দিন যায়। একদিন মনে হইল, আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে মানুষনামধারী যে জীবটি রহিয়াছে—ওই যেন আমাদের সকলকে চালাইয়া লইয়া বেড়ায়। ওর গায়ে তেমন বেশী বল নাই, ওর চক্ষুও আমাদের কাহারও কাহারও চক্ষু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু তবু ও আমাদিগকে চালায়। মনের মধ্যে এই ভাবটা বেশ প্রবল হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়ি—জাগিলেই নূতন নাম হয়, আর দেখি মানুষটা আমাদের উপরে সমানেই প্রভুত্ব করিয়া চলিয়াছে। বহুদিন এইভাবে গেল। মানুষ হইবার জন্য আগ্রহ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া দেখি যে,

(৬ ঘর) যাহার প্রভুত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতাম সেই দলের † মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু এখানে এক নূতন বিপদ্ উপস্থিত; এখানে ভেদ নানাপ্রকারের;—আমি কোন্ মানুষটা হইব তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে। খুঁজিতে খুঁজিতে

(৭ ঘর) এক চণ্ডালের গৃহে উপস্থিত হইলাম। অন্য কাহারও গৃহে যাইলে আমাকে বিতাড়িত হইতে হইত, কেননা অন্য সকলেই স্ব-স্ব অধিকার রক্ষায় সদা অবহিত। চণ্ডালকে বা নিষাদকে চারি বর্ণের মধ্যে গণ্য করা না হইলেও সমাজে তাহার স্থান ছিল—একথা ঠিক জানিতাম না; পরে শুনিয়াছি যে, যে 'পঞ্চজন' পৃথিবী অধিকার করিয়া আছে নিষাদ তাহাদেরই অন্যতম। যথা—

পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্—ঋগ্বেদ, ১০।৫৩।৪।
যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থে 'পঞ্চজনা' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঔপমন্যবের মত উদ্ধার করিয়াছেন—

চত্বারো বর্ণা <u>নিষাদঃ পঞ্চম</u> ইত্যৌপমন্যবঃ। ৩।৭-৮;
আরও শুনিয়াছি—

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥

—ঋগ্বেদ ১।৮৯।১০

নিষাদও (পঞ্চজনের অন্যতন) অখণ্ডনীয়া শক্তি অদিতির বিকাশমাত্র, নিষাদকে তবে ত ঘৃণা করিতে নাই। আমি অদিতির বিকাশমাত্র! এ কথা তখন জানিতে পারিলে হৃদয়ে বিশেষ বল পাইতাম। যাই হোক, মানুষ যখন একবার হইতে পারিয়াছি তখন দেখি আর কোথায় যাই! নিজের কাজ (স্বকর্ম্ম) করিয়া যাইব—সে কাজ অন্য মানুষের চোখে হেয় বা শ্লাঘ্য যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। স্বকর্ম্ম করিতে করিতে যখনই আলস্য বোধ হইত তখনই কে যেন পিছন হইতে টানিয়া নামাইয়া লইতে চেষ্টা করিত। বড় ভয় হইত। ৮০ লক্ষ * যোনি পার হইয়া মানুষ হইয়াছি, ঠিক-মত স্বকর্ম্ম করিতে না পারিলে কি আবার নামিয়া যাইতে হইবে! জ্ঞান রহিত হইয়া যাইবে, আবার জড় হইয়া যাইব! মানুষ হইয়া যদি মানুষের কাজ না করি তবে ত নিশ্চয়ই আর মানুষ থাকিতে পারিব না! ভীষণ ভয় হইত (৮নং ঘর 'নরক-ভয়')। অমনি কার্য্যে উৎসাহ আসিত,

---

* অণ্ডাণ্ডজ

† মহাভারত, অনু, ২৮ অধ্যায়

* পুরাণে ৩০ লক্ষ স্থাবর, ১১ লক্ষ কৃমি, ৯ লক্ষ জলচর, ২০ লক্ষ পশু ১০ লক্ষ পক্ষী—৮০ লক্ষ; মনুষ্যযোনি ৪ লক্ষ সহিত ৮৪ লক্ষ। পুরাণে যে চুরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা আছে তাহা আনুমানিক হইলেও ভিত্তিহীন নহে। জীবতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে—জলের ক্ষুদ্র মৎস্যজাতীয় জীবের গুণধর্ম্ম বাড়িতে বাড়িতে মানুষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে মোট—৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ পার হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র জলচরের পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব জন্তু নিশ্চয়ই আরও কয়েক লক্ষ যোনি হইবে। *The Last Link, by Ernst Haeckel with Notes, by Dr. Gadow* দ্রষ্টব্য।

স্বকর্ম্মে পুনর্ব্বার রত হইতাম। কতদিন যে চণ্ডালের গৃহে ছিলাম তাহা জানি না। একদিন খুব বেশী ঘুম আসিল; এই বেশী ঘুমের পরে কি হয় তাহা মানুষ বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম দিয়াছে মৃত্যু। আমার নিদ্রাভঙ্গের পরে জাগিয়া দেখিলাম যে, চারি বর্ণের মধ্যে (৯ ঘর) শূদ্র বর্ণে আমার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। আমি হিসাব করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম—আমি শূদ্র কেন? মনের বা বুদ্ধিবৃত্তির তেমন উন্নতি হয় * নাই বলিয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বুঝি আর নাই বুঝি—স্বকর্ম্ম অর্থাৎ কায়িক চেষ্টার দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বজীবনে অনুভূত ভয় (নরক-ভয়) সদাই আমাকে স্বকর্ম্ম-সম্বন্ধে সজাগ রাখিত, স্বকর্ম্মে আল্‌গা দিতে দেয় নাই। কিছুদিন এইরূপে কাটিবার পর (১০ ঘর) সচ্ছূদ্রেরা আমাকে তাঁহাদের মধ্যে স্থান দিলেন। এখন আমি নিজেকে একটা মানুষ বলিয়া কিছু ভাবিতে শিখিয়াছি; জাতিভেদ প্রভৃতি 'হাঙ্গামা'গুলির অর্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিলেও আভাস কিছু কিছু পাইতেছি। এমন সময়ে কে একজন (১১ ঘর) কাণের কাছে বলিয়া গেলেন—নিজের কাজ ভাল করিয়া করিবে, গুরুজনের অবাধ্য হইবে না, তাঁহাদের সেবা করিবে, সকাল-সন্ধ্যায় সামান্য একটু অবসর করিয়া লইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নাম উচ্চারণ করিবে, ইত্যাদি। যাঁহারা আমার পূর্ব্বে এদিকে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ইঁহার নাম 'নারদ'। † সাধারণ মানুষ যাহাতে সৎপথ অবলম্বন করে, কুপথে না যায় এ সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য ইনি নাকি সকলেরই পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ান। এমন কি, সাধারণের রাস্তার পার্শ্বেই নিজের সুন্দর আশ্রমটি স্থাপন করিয়া সকলের প্রতীক্ষাও করিয়া থাকেন। যিনিই উপর দিকে যাইতে চাহিবেন, তাঁহাকেই এই আশ্রমের ভিতর দিয়া বা নিকট দিয়া যাইতেই হইবে। ভাবিলাম—লোকটি ত বড় সুন্দর। ‡ কেহ মন্দ না হয় এই জন্যই ইনি ব্যস্ত!

সাধুজনের সেবা (১২ ঘর) সুচারুরূপে করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায়, আর তাঁহাদের সেবা না করিলে বা তাঁহাদের প্রতি কোনও অপরাধ (১৩ ঘর) করিলে পুনর্ব্বার চণ্ডাল হইতে হয়—এ কথা তিনিই (নারদ) আমার কাণে কাণে বলিয়া দিলেন। সুচারুরূপে সাধুসেবা,—সে মহাভাগ্যের কথা! সে ভাগ্য আমার নাই; তবে সাধুজনের প্রতি কোনও দুর্ব্ব্যবহার না করি—এ বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলাম। মনের ভিতর তলায় যে মন আছে সেখানে নিরন্তর জপ চলিতে লাগিল—স্বকর্ম্ম, স্বকর্ম্ম। একদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি যে, আমার নূতন ঘর-দ্বার হইয়াছে; যাহা ছিলাম তাহা হইতে ভাল হইয়াছি, নামও বদলাইয়া গিয়াছে। এখন হইয়াছি (১৪ ঘর) বৈশ্য। কৃষ্যাদি কার্য্য নিয়মমত করিতে লাগিলাম, রাজকর নিয়মিত সময়ে দিলাম, অধ্যয়ন একটু একটু করিলাম; আর নিজে ধনগর্ব্বিত হইয়া না পড়ি এ জন্য যাগযজ্ঞে ও জনহিতকর কার্য্যে অর্থের ব্যবহার করিতে লাগিলাম। দিন বেশ সুখে ও আনন্দে কাটিতে লাগিল। যথা সময়ে মৃত্যু আসিয়া আমাকে অন্য স্থানে লইয়া গেল। সেখানে পৌছিবার পর আমার নাম হইল (১৫ ঘর) ক্ষত্রিয়। একটু আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। ছিলাম কোথায়, এক এক ধাপ করিয়া বেশ উঠিতেছি ত! বৈশ্যের ঘরে অবস্থান-সময়ে একটু একটু অধ্যয়ন করিতাম,—এখনও করি। একদিন মহাভারতে দেখিলাম—

শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥
অনু—১৪৩ অধ্যায়

নারদের কৃপায় স্বধর্ম্মে অনুরাগ বাড়িয়াছে, স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, কাজেই যথা সময়ে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ ঘটিয়াছে। আশ্চর্য্য আর কি?

এখন আমি বেশ বলবান্; কেবলই মনে হয়, বলে পৃথিবীর সকলকেই শাসন করি। কিন্তু পড়াশুনা যাহা করিয়াছি তাহার ফলে কোথা হইতে একটা ক্ষীণ ধ্বনি যেন কাণে প্রবেশ করে—"বলে শাসন করে পশুরা, বলকে যে নীতি ও ধর্ম্ম-দ্বারা সংযত করিতে পারে সেই-ই ক্ষত্রিয় নামের উপযুক্ত। তুমি এত বল পাইয়াছ কেন, তাহা জান? কি ভাবে সেই বলের প্রয়োগ কর—তাহা জগৎ দেখিবে বলিয়া। একটা দৃষ্টান্ত দিই, শোন। পিতা পুত্রের হাতে কিছু অর্থ দিলেন

* জীবচৈতন্যের উন্নতিক্রমের একটা স্তরের নাম শূদ্রচৈতন্য; যে জ্ঞানে হীন বা দুর্ব্বল সেই শূদ্র।

† নৃ+অণ=নারং, অজ্ঞানম্ দ্যতি জ্ঞানোপদেশেন। নর। অণ=নারং জ্ঞানং দদাতি=নারদঃ। যিনি জ্ঞানোপদেশ-দ্বারা মানুষের অজ্ঞান নাশ করেন।—ভানুজি দীক্ষিত টীকা, অমরকোষ—১।৪৮। সহজে যে মানুষ জ্ঞানের পথে না যায় তাহাকে শান্তির পথ দিয়া ইনি জ্ঞানে লইয়া যান।

‡ ছকের নিম্নভূমিতে মাত্র এই একটি ঘর (১১নং) দেখিতে সুদৃশ্য।

ও বলিয়া দিলেন—'তোমার যে ভাবে ইচ্ছা ইহা ব্যয় করিতে পার।' যদি পিতা দেখেন পুত্র সদ্ব্যয় করিতেছে, তবে আরও অর্থ দেন; আর যদি দেখেন যে পুত্র অসদ্ব্যয় করিতেছে—তবে পূর্ব্বপ্রদত্ত সমস্ত অর্থই কাড়িয়া লন। তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য; এর ব্যতিক্রম করিলে তুমি আর ক্ষত্রিয় থাকিতে পারিবে না।"—এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার বোধ হইল যেন, আমার চারিপার্শ্বে নানাবিধ গণ্ডী রহিয়াছে, তাহারা যেন আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। গণ্ডী কয়টার মোটামুটি হিসাব দিই। প্রথমেই (১৭) আশ্রিতরক্ষণ ও দুষ্টদমন; কিন্তু তাহা করিব কেন? পরের গণ্ডী (১৮) ধর্ম্মজ্ঞান সে বিষয়ে সাহায্য করিবে। যদি এই ধর্ম্মজ্ঞান না থাকে তবে স্বার্থপর হইয়া পরস্বর্ণ লুণ্ঠন (১৯)* করিয়া ফেলিব; ইহার ফল শুনিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়! কোনওরূপে না হয় এটা সামলাইলাম। দেহের বলের রক্ষা ও বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যায়াম আবশ্যক,—ঐ যে এক গণ্ডীতে মৃগয়াও (২০) অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু যদি মৃগয়াকে ব্যসনে পরিণত করি? নানাবিধ লোকের সঙ্গে মিশিলে নানারূপ দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে (২১); আবার দ্যূতক্রীড়ায় (২২) মজিলে ধন জন রাজ্য সবই হারাইতে হইবে বা অন্যের এইগুলি কাড়িয়া (২৩) লইতে প্রবৃত্তি হইবে। তবে উপায়? পুরাণ (২৪) প্রভৃতি শাস্ত্র-শ্রবণ ও আলোচনা-দ্বারা ভূতদয়া শিখিতে হইবে, সমদর্শিত্ব লাভ করিতে হইবে। কিন্তু, এমন হইয়া গিয়াছি যে, নিজেকে পরের আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না—যদি এমন অবস্থা হয়? (২৫) মহাতীর্থযাত্রা করিতে হইবে। দেহে বল আছে, অর্থসামর্থ্যও আছে—তবে ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া নানা দেশে নানা তীর্থস্থানে গিয়া ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সুস্থকায় রোগী সকলেরই সহিত আত্মীয়তা করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে? যাক্, গণ্ডীগুলির হিসাব লইয়া সাবধানে যাত্রা করিলাম। কতবার পড়িলাম, কতবার কতপ্রকারের সন্দেহ আসিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল; কখনও-বা কোন গণ্ডী অনুকূল মূর্ত্তি ধরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। এইভাবে গণ্ডী কয়টি অতিক্রম করিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি—বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র! এখানে দাঁড়াইয়া (২৬) নিত্যকর্ম্ম করিতে হইবে। সুচারুরূপে নিত্যকর্ম্ম করিতে পারিলে নাকি (৩২) নিষ্কামকর্ম্মকরণের অধিকার শীঘ্রই পাওয়া যায়। সুচারুরূপে যে নিত্যকর্ম্ম করিতে পারিব এমন মানসিক বল নিজের আছে—তাহা মনে করিতে পারিলাম না। তাই আমার কর্ম্মক্ষেত্রকে আমি (২৭) ব্রহ্মচর্য্য, (২৮) গার্হস্থ্য ও (২৯) বানপ্রস্থ এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইলাম। এই তিনের ভিতর দিয়া কাজ করিতে করিতে নিত্যকর্ম্ম করা—ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া করা, অভ্যস্তমত হইয়া যাইতে লাগিল। ফলে ধীরে ধীরে (৩২) নিষ্কামত্ব-এর আভাস মনে পড়িতে লাগিল। মাঝে দুইটা ভয়ঙ্কর বিপৎসম্ভাবনা যে ছিল না তাহা নহে; একটার নাম (৩০) হিংসাবৃত্তি, সে আমাকে টানিবার চেষ্টা যে না করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার হাত সামলাইতে না সামলাইতে দ্বিতীয়টা মনোহর বেশে আসিয়া বলিল—কেন নিষ্কাম হইতে চাও? (৩১) সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ভাল করিয়া করিতে পারিলে স্বর্গে* যাইয়া পরমসুখ ভোগ করিতে পারিবে। ভাবিলাম সত্যই কি চাই? আমি কি সুখের জন্য লালায়িত? পৃথিবীর দ্রব্যাদি হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, স্বর্গে তদপেক্ষা মাত্রাধিক্য বৈ ত নহে! সে স্বর্গসুখেরও ত একদিন শেষ হইবে! † আমি যাহা চাই, সে যে স্বর্গের বাহিরে অবস্থিত। স্বর্গে অবস্থান করিয়া ভোগের দ্বারা তাহা ত পাওয়া যায় না। ‡ কাজ নাই আমার স্বর্গে। এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করায় সকাম কর্ম্ম আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বের কথাই বলি। নিত্যকরণীয় কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে পারিলে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় (৫০) হইয়া যায়, এটা বুঝিলাম। কিন্তু নিষ্কামত্বের আভাস মাত্রই ত আর নিষ্কাম হওয়া যায় না। কাজেই, উপায় অবলম্বন করিলাম (৩৩) সর্ব্বভূতহিত। দুর্ব্বলতা যখনই উপস্থিত হইত তখনই (৩৪) কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করিতাম, আর সকল সময়ে সর্ব্বভূতহিত কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও

* ছা. উপ. ৫।১০।৯, মহাপাতক

* বৃত্তাভাসের একদেশে বৃত্তাকার সুন্দর ঘরটি স্বর্গ।

† ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা

‡ ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াম্ ইত্যাদি—কৈবল্যোপনিষৎ ১।৩

হৃদয়ের মধ্যে (৩৫) মৈত্রীভাব পোষণ করিতাম। একজন সাধু বলিয়াছিলেন—যে মৈত্র সেই নাকি ব্রাহ্মণ। * হৃদয়ে মৈত্রী সদা উগ্র রাখিবার জন্য (৩৬) করুণা-সম্বন্ধে উপদেশ লইতাম, আর মৈত্রীর ব্যাঘাতক মমত্বভাব ত্যাগ করিবার জন্য (৩৭) চিন্তা করিতাম--'আমার' বলিতে সত্যই কি কিছু আছে? খুঁজিয়া পাইতাম না। মনে হইত—আমার আমিত্ব বা porsonalityটা ত আছে, সেটাকে বিসর্জন দিতে পারিলে লাভ হয় বৈ কি। বাধা কি? আমার 'আমি'টার খোঁজ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, বাহিরের জগৎ অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে যে সকল বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে 'আমি' নাই (৩৮)। তবে মৈত্র হইব না কেন? কথাটা বেশ! বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বন্ধুত্ব প্রকাশের অবসর অনেক পাওয়া যায়। দুঃখ প্রকাশ করাও যায়; কিন্তু পরের অভ্যুদয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়া—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যে বন্ধুতা—সেটা ত সহজ নহে। সহজ হইলে ভগবান্ বলিতেন না—অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া যে ব্যক্তির আনন্দ হয় সে ভক্তশ্রেষ্ঠ। † কেননা, অন্যের উন্নতিতে কাহারও ক্ষতি না হইলেও—অন্যের উন্নতিতে লোকে মাৎসর্য্য প্রকাশই করিয়া থাকে। মৈত্র হইবার জন্য আমাকে (৩৯) নির্ম্মৎসর হইতে হইল। নির্ম্মৎসর হওয়ার সাধন যে কি দারুণ তাহা বুঝান কঠিন। ইহার পাশে পাশে উঁকি মারিতেছিল দুই ভীষণ বিপদ্—(৪০) পৈশুন্য এবং (৪১) ভূতদ্রোহ; ইহাদিগকে দমিত রাখাই বিষম ব্যাপার। ইহাদের প্রথমটি মানসিক খলতা ও দ্বিতীয়টি ব্যাবহারিক নির্দ্দয়তার পরিচায়ক। ইহাদের হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ‡

নির্ম্মৎসরত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মৈত্রীপ্রতিষ্ঠা; অমনি সম্মুখে মনোরম উচ্চস্থান আমার জন্য উন্মুক্ত হইল। সেখানে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে একবার পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণ করিলাম—কোথা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, আর আজ আমি কোথায়! সব দেখিয়া একটা কথাই আমার মনে আলোড়িত হইতে লাগিল;—এরা, যাহারা নীচে রহিয়াছে পরস্পরকে এমন পর ভাবে কেন! প্রত্যেক বস্তুটি, প্রত্যেক প্রাণীটি অন্য হইতে নিজেকে পৃথক্ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, ব্যক্তিত্ব বা পৃথকত্ব বজায় রাখিতে গিয়া অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কোন দুটি বস্তু বা কোন দুটি প্রাণী বাহ্য আকারে বা মানসিক বৃত্তিতে সমান নহে। এখানে আছে কেবল প্রভেদ,—সঙ্কীর্ণতা; এর বাতাস গায়ে লাগিলে কেহ সরলভাবে চলিতে পারে না; সকলেই সঙ্কীর্ণ প্রাণ লইয়া বাঁকাভাবে চলিতে বাধ্য হয়।* নিজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম; যিনি আমার যাত্রাপথের সহায়, তাঁহাকে না দেখিলেও উদ্দেশে প্রণতি জানাইলাম, তিনি আমায় উদ্ধার করিয়াছেন এই বাঁকার হাত হইতে। সম্মুখে যে স্থানে আমাকে যাইতে হইবে সেখানে একটা সুবিধার কথা এই যে, সেখানে যে যাহাই করুক না, সরলভাবেই করে,—মনের মধ্যে খোঁচ রাখে না। †

এখন আমি রাজসভূমিতে (৪২) প্রথম প্রবেশ করিলাম। এখন যে স্তর আরম্ভ হইল—ইহা কর্ম্ম করিবার প্রকৃষ্ট ভূমি। এখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা বেশী করিতে হয় না, মানসিক কর্ম্মই খুব বেশী—মন লইয়াই এখানে কারবার বেশী। মন বা চিত্তের নামই সংসার, মনকেই শুদ্ধ করিতে হইবে; মনের বা চিত্তের প্রসাদ জন্মিলে সকল কর্ম্মের শেষ হইবে। ‡ নতুবা কায়ের ছায়ার ন্যায় কর্ম্ম নিয়তই বর্ত্তমান থাকিবে।

---

* কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।—মনু ২।৮৭

† অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ।
……তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥
—বৃহৎ-নারদীয় পুরাণ ৫।৪৯

‡ পৈশুন্য—খলতা, নিন্দাপ্রবৃত্তি
গুর্ববজ্ঞা মনুষ্যাণাং রাক্ষসত্বপ্রদায়িনী।
বৃ. না, পু. ৯।৮৬
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি অবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
মহৎস্ব তস্য নশ্যন্তি শ্রেয়োঽপত্যাধনক্রিয়াঃ॥
শ্রেয়োঽপত্যাদিহীন—চণ্ডাল।

* নিম্নভূমির ঘরগুলি সবই কাৎ-করা (oblique) রেখা-দ্বারা বিভক্ত; এই ভূমিতে একটিও সমকোণ (right angle) নাই।

† দ্বিতীয় ভূমির ঘরগুলি এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে, কোণগুলি সবই সমকোণ (right angle)।

‡ চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
মৈত্রায়ণী উপনিষৎ ৬।৪

যখন এ ভূমিতে স্থান পাইয়াছি—তখন মনটাকে প্রসন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সহায় জুটিল। (৪৩) সদনুগ্রহ লাভ হইল। যেমনই মনে ভাবিয়াছি—মন ত জয় করিয়াছি, অমনই সাধু আমার কাণে কাণে বলিয়া গেলেন, (৪৪) "মর্কটের মত ও কি হইতেছে, ভিতরে বিষয়চিন্তা—বাহিরে শান্তভাব? সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে ও কি উঁকি মারিতেছে? প্রাধান্যলাভেচ্ছায় পরহিংসার কথা মনে হইতেছে না? সাবধান, ওটা যদি স্বভাবে পরিণত হয় (৪৫), তবে তোমার পঞ্চভূত একযোগে চেষ্টা না করিলে তোমাকে কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না।" * সাবধান হইয়া ভাবিলাম—মনে যে ভাবই থাকুক, বাহিরের আচরণ নিশ্চয়ই সাধু রাখিব। কিন্তু এও কি মিথ্যাচারিত্ব নহে? (৪৬) কপূয়াচরণ † আর কাহাকে বলে! অমনি পূর্ব্ব পরিচিত ছান্দোগ্য বলিয়া উঠিলেন—যাহারা কপূয়াচরণ করে তাহারা নিকৃষ্ট যোনিতে—কুক্কুর যোনি, শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনিতে গমন করে। তবে আমার উপায়? আমার (৪৭) সর্ব্বস্বদান করিতেও প্রস্তুত আছি—কেহ আমাকে রক্ষা কর—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখি আমাকে সর্ব্বস্বদানের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে,আমি (৪৮) রাজা হইয়াছি। রাজ্যশাসন করিব, ভোগের সমস্ত উপকরণ আমার চারিদিকে বর্ত্তমান থাকিবে, অথচ ভোগ করিব না—সব দান করিব—এইরূপ ভাব মনে উদিত হইবা মাত্র কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম—রাজা হইয়া ভোগের কামনা করিলে এমন ভোগ (স্বর্গসুখ, বৃত্ত দ্রষ্টব্য) করিতে হয়, যে-ভোগের শেষ হইলে কোথায় গিয়া কি ভাবে পরিণতি হয় তাহার কিছুই স্থির থাকে না। ‡ ভয়ে ভয়ে নিজের কর্ত্তব্যগুলি করিয়া গেলাম; মনে লক্ষ্য রাখিলাম—রাজ্য আমার নহে, রাজ্যের আমি—অর্থাৎ আমি রাজ্যের সেবক মাত্র। এই ভাব মনে দৃঢ় থাকিতে থাকিতে একদিন মহানিদ্রানুভব হইল। নিদ্রান্তে দেখি আমার মন (৪৯) ব্রাহ্মণ * হইবার অধিকার পাইয়াছে। এখন খুব সাবধানে চলিতে হইবে। সাধনবলে (৫০) পাপ ক্ষয় হইতে লাগিল, (৫১) ধর্ম্মসঞ্চয় হইল, (৫৩) জীবে দয়ার ভাব জাগিল, সন্ন্যাসের অধিকার † পাইলাম। যখন ধর্ম্মসঞ্চয় হইতেছিল তখন শুনিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় (৫২) ক্রোধ নামে এক বিপদ্ আসিয়া ভূতকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে; যিনি অভিভূত হন তাঁহাকে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় হইতে হয়, আবার অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিতে হয়। আবার, দয়ার ভাব সঞ্জাত হইবার সময় কাহারও কাহারও (৫৪) ভ্রম উপস্থিত হয়,- দয়া কেন করিব, আত্মীয়কে দয়া করিব, উপকারী দেখিয়া দয়া করিব ইত্যাদি ভ্রম আসিলে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ সম্পাদন করিতে হয়। আমার অশেষ সৌভাগ্যবশতঃ এ দুইটা বিপদের অধিকারে আমাকে আসিতে হয় নাই। যখন সংন্যাসের অধিকার পাইলাম—তখনই শিখিলাম, মন লইয়া যখন এ ভূমিতে কারবার তখন সংন্যাস অর্থে মনের মধ্যেই সংন্যাস বুঝিতে হইবে। তবেই, কোনও বিষয়ে আসক্তি (৫৬) থাকিতে পারিবে না; থাকিলে বুঝিতে হইবে ঠিক ভাবে ব্রহ্মচর্য্য সাধন করা হয় নাই, পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য সাধন (২৭) করিতে হইবে। আরও শিখিলাম, সংন্যাসের নিয়মের ব্যতিক্রম (৫৭) করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনকে বিশেষ কষ্ট দিতে হইবে (৩৪ কৃচ্ছ্র)। যাক, সংন্যাসের অধিকার পাইয়া (৫৮) দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম ও সম ‡ (৫৯) অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম করিতে হইবে। যদি (৬০) স্খলন হয়—তীর্থযাত্রা করিতে হইবে। শমদম সাধন হইলে ষট্‌সম্পত্তির মধ্যে (৬১) সমাধান § সম্পত্তিলাভের অধিকার পাইব। যাত্রা ত করিলাম—দেখি, কোথায় গিয়া বিরাম লাভ করিতে পারি।

সংন্যাস সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত নানা ভাবের মধ্য দিয়া

* এ ঘরে ঘুঁটি আসিলে, পাঁচ কড়া কড়িই চিত্‌ না পড়িলে ঘর হইতে বাহির হওয়া যাইবে না।

† ছা. উপ. ৫।১০।৭ শঙ্করভাষ্যে ক্রৌর্য্যানৃতমায়াবর্জ্জিতদিগকে রমণীয়-চরণা বলা হইয়াছে; ক্রৌর্য্যানৃতমায়াকে কপূয়াচরণ বলা যায়।

‡ ছা. উপনিষৎ ৫।১০।৩-৬ এর উপর শঙ্করভাষ্য। বৃ. উপনিষৎ ৬।২।১৬

* ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র কালের জন্য নহে; এই জগতে কৃচ্ছ্র তপস্যা করিয়া পরলোকে পরম সুখ লাভের জন্যই ব্রাহ্মণ দেহ। ভাগ, ১১।১৭।৪২

† শ্রীমদ্ভাগবত—১১।১৭।৩৮ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ। শ্রীধর স দ্বিজোত্তমশ্চেৎ প্রব্রজেদিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণেরই সংন্যাসে অধিকার আছে।

‡ সদানন্দ-বেদান্তসার ৩

§ ঐ

যাইতে হইল। সকল ভাব প্রকাশ নাই বা করিলাম। মোটামুটি বলিয়া যাই। (৬৩) সত্যের আভাস পাইবা মাত্র (৬৪) চিত্তভ্রম ঘটিবার উপক্রম হইল, তখনই (৬৫) গুরুর নিকট উপদেশ লইলাম। মনে একটু (৬৬) গর্ব্ব হইল, বুঝি কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছি! সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযম হয় নাই (৫৮) বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইল। এবার ইন্দ্রিয়দিগকে বিশেষরূপে সংযত করিবার চেষ্টা করিলাম। এখন জ্ঞানোন্মেষ (৬৭) হইতে লাগিল। কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

জগতের চেষ্টা আদি একজন করেন দর্শন;
হইয়া মোহেতে অন্ধ নাহি দেখে অন্য একজন।
একজন চাহে সদা করমের ফল,
অন্যজন ফলদান করেন কেবল।
একজন কর্ম্মফলে হয় গো শাসিত;
অন্য জন শরীরীর শাস্তা গো নিশ্চিত।
নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি, কেমনে বলনা—
তাঁহাতে কর্ত্তার ভাব হয় সম্ভাবনা? *

আবার শ্রুত হইল—

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর
এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর
তার মধ্যে একজন সুপক্ব পিপ্পল ফল করেন ভক্ষণ,
অন্যে অনশনে থাকি শুধুমাত্র তাহারে গো করেন দর্শন॥ †

এখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিধ্বনি করিলেন—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ১১।১১।৬

—যিনি অনশনে থাকেন, তিনিই বলে মহান্! এ কি রহস্য! জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে লাগিল—আমি কত ক্ষুদ্র, আর তিনি—যিনি ভূমা হইয়াও আমাদেরই মত দেহ লইয়া—কার্য্যমানুষ হইয়া, মায়ামানুষ হইয়া ‡ কতবার আসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া চালাইয়াছেন—তিনি কত বৃহৎ! কোটি কোটি জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও যিনি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছেন, তিনি কত দয়ালু! তাঁহাকে না পাইলে যে আমার ক্ষুদ্রতা ক্ষুদ্রই থাকিয়া গেল। তাঁহাকে যে চাই-ই, নহিলে যে আমার আর চলে না। আমি যে আর একলা থাকিতে পারিতেছি না, কাঁদিয়া তাঁহাকে ডাকি, আর তিনি সুন্দর সাজিয়া আমার চারিদিকে নাচিয়া বেড়ান; ধরিতে পারি না, ধরিবার জন্য লালায়িত হই। হঠাৎ (৯৮) তাঁহাকে পাইলাম—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥ ঋগ্বেদ ১০।৯০।১

একমাত্র ভগবদ্‌ভক্তি (৬৮) দ্বারাই তাঁহাকে পাইলাম। নতুবা আমার সামর্থ্য কৈ? যাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি প্রকাশ না হয়, তাঁহার পথ—(৬৯) গঙ্গাস্নান, (৭০) তীর্থযাত্রা, (৭৩) প্রাণায়াম, (৭৫) প্রত্যাহার, (৭৬) অহঙ্কার-বর্জ্জন, (৭৭) ধারণা, (৭৮) ধ্যান, (৮০) শ্রবণ, (৮৪) মনন, (৮৭) নিদিধ্যাসন। এ পথে মাঝে মাঝে শত্রু দেখা দেয়, তাহাদিগকে এড়াইতে হইবে। মননের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ (৮৫) সহজ হইবে। পরে প্রারব্ধ কর্ম্মেরও শেষ (৮৬) হইতে পারে। এখানেও শত্রুর একেবারে অভাব নাই। ধ্যান-ধারণা-দ্বারা যখন ভূতের বিভূতিদর্শন আরম্ভ হয় তখন ঐহিক ভোগেচ্ছা (৮৮) * জন্মিতে পারে। এই ইচ্ছা জন্মিলে তাঁহাকে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—ভোগের এমন অনুকূল অবস্থা আর নাই। শত্রুর হাত এড়াইতে পারিলে—নিদিধ্যাসন-দ্বারা (৮৯) সত্ত্বভূমিপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এখানে আসিলে আর নীচে নামিতে হয় না, বিপদ্ আর নাই। এখন মন বশীভূত, যাহা বলা যায় সে তাহা শোনে। এখন দেবযান (৯০) অবলম্বন করিয়া (৯১) নির্ব্বেদ লাভ করিলে (৯২) শুক্লাগতি ৯৩) উত্তরায়ণ-দ্বারা তাঁহার (৯৪) দেবলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সেখান হইতে (৯৫) বৈদ্যুত ও (৯৬) সূর্য্যলোক অতিক্রম করিলে (৯৭) মানস † (৯৮) পুরুষ আসিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যান। এইরূপে ইঁহার পুরুষ সাক্ষাৎকার ঘটে।

* প্রবোধচন্দ্রোদয়, জ্যোতিরিন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

† শ্বে. উপ. ৪।৬

‡ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ (ভাগ. ১০।১৬।৬০), মায়ামনুষ্য (ভাগ. ১০।১।৭)

* অন্য প্রকারেও ভোগেচ্ছা জন্মিতে পারে—যথা মধুসূদন টীকা, গীতা ৬।৪৩—প্রাগুপচিত-ভোগ-বাসনা-প্রাবল্যাদল্পকালাভ্যস্ত-বৈরাগ্যবাসনা দৌর্ব্বল্যেন প্রাণোৎক্রান্তিসময়ে প্রাদুর্ভূতভোগস্পৃহঃ।

† বৃ. উপ. ৬।২।১৫ তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। যোগশাস্ত্রে 'তনুমানসা' কি এই মানস?

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখানে আসিলে আর পতনের সম্ভাবনা নাই। মানসিক স্তরে দ্বিতীয় স্তরে সমকোণে জীব চলিলেও—তাহাতে কোণ ছিল বলিয়া পরের ভাবনা কিছু চলিতে থাকিলেও কোণে বসিয়া নিজের ভাবনা বা স্বার্থচিন্তারও অবসর ছিল। তাই মানসিক ভূমিতে উত্থান-পতন দুই-এরই সম্ভাবনা ছিল। এখন যে ভূমিতে আসিয়াছি এই আত্মিক ভূমিতে বা সাত্ত্বিক ভূমিতে স্থূল 'আমি'র সন্ধানই নাই। এখানে এক তরঙ্গ চলিয়াছে; যে-ই এ ভূমিতে আসিবে, সেই-ই এই তরঙ্গে আপনাকে সমর্পণ করিয়া ফেলিবে এবং তরঙ্গ তাহাকে নিজের বুকের উপর রাখিয়া নাচাইয়া-দোলাইয়া তাহার প্রার্থিতের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। *

আমার পূর্ব্বের কথা অনুসরণ করি, আর বেশীক্ষণ কথা বলিবার মত অবস্থা থাকিবে না। পুরুষ দর্শন করিয়া এক তথ্য শিখিলাম—পুরুষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যের মধ্যে ধ্রুব অবস্থিত, সেই ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া সমগ্র বিশ্ব চলিতেছে। (৯৯) সপ্তর্ষিদের নিকটে গিয়া প্রশ্ন করিলাম—অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা—ঐ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত—ওটি কি করিতেছে? ইহারা নীরব থাকিয়া ধ্রুবের দিকে দৃষ্টি করিয়াই রহিলেন। বুঝিলাম—ধ্রুবই তাঁহাদের লক্ষ্য। (১০০) অরুন্ধতী নিজ ধ্রুবকে (পাতিব্রত্য) দৃঢ়রূপে বুঝিয়া বশিষ্ঠের পার্শ্বে ধ্রুবভাবে অবস্থান করিয়া ধ্রুবের চারিদিকে ঘুরিতেছেন। তবে ত ধ্রুব যাহা তাহা লক্ষ্য করিয়া চলাই ত সত্য পথ। সত্যম্ভরা- † (১০১) লাভ এইরূপে হইল, অমনি নিখিল ভোগস্থানে (১০২) উপস্থিত হইলাম; কৈ আমার ভোগের ত আর কিছুই নাই। তখন পুণ্য (১০৩) বলিলেন, ভরসা ছিল, তুমি আমাকে একটুও আদর করিবে; হাসিয়া উত্তর দিলাম—তোমাতে আমার ত কোনও প্রয়োজন নাই, ভোগের মাত্রা বাড়াইয়া ত লাভ নাই, ভাই; পুণ্য বিদায় লইলেন। আর আমাকে বাঁধিয়া রাখে কে? ঋতম্ভরার ‡ (১০৪) সহিত পরিচিত হওয়াতে একটা অনাবিল (১০৫) আনন্দে আমি ভরিয়া উঠিয়াছি। আমি কে? আর ভাষায় কুলায় না। যদি বলিতে পারিতাম তবে হয়ত বলিতাম অহং ব্রহ্মাস্মি (তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ১০৫)। আমি যে কত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছি তাহা অনুমান করিতে পারিবে না। বিরাট্, ভূমা, যাহাই বল না আমার এখনকার (১০৬) অবস্থা ঠিক বর্ণনা করিতে পারিবে না। আমি আর নিজেও কিছু বলিতে পারিতেছি না। নিজেকে পৃথক্ দেখিতে যে ভুলিয়া গেলাম—আর "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া কারকবিভক্তির * প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। এখন শুধু 'অহম্' বা 'ত্বম্' বা 'তৎ' একটা বলিতে পারি। এতদিন হিসাব করিয়া বুঝিতাম, এখন অপরোক্ষ ভাবে বুঝিতেছি কেবল আমি আছি, আর কেহ নাই, কিছু নাই (১০৭)। এইবার কি হইল—তাহা তোমাদের কল্পনা লইয়া বলি। ব্রহ্মপথ † (১০৮) আমার সম্মুখে প্রসারিত, তাহাতে প্রবেশ করিলাম। চতুর্দ্দিকে সম্মোদ (১০৯)—কেবল একটা সৌগন্ধ - তাহাতে আমি ডুবিয়া গেলাম; চারিদিকে প্রমোদ (১১০) – অসীম আনন্দ —আনন্দে হারাইয়া গেলাম; তারপর আমোদ (১১১) প্রশান্ততা – সকল নিস্তব্ধ—সকল শান্ত – "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ণ বন্ধো ন চ শাসনম্, ন মুমুক্ষা, ন মুক্তিশ্চ" ‡ – সে কেমন শান্ত ভাব! এখন যাহা কিছু আবরণ—যদি থাকিবার মত আবরণ কিছু থাকে—সব খসিয়া পড়িল (১১২)। তপোলোকের ভিতর পৌঁছিলাম (১১৩), আর ব্যক্তিত্বের কোন নিদর্শন রহিল না—নিরঞ্জন § (১১৪)—ব্যঞ্জনারহিত হইয়া গেলাম। এখন সত্যলোকে (১১৫) প্রবিষ্ট হইবামাত্র "সত্যস্য সত্যম্" আমাকে (?) বরণ করিয়া লইলেন। তিনি স্বয়ং বরণ ¶ (১১৬) করিয়া না লইলে যে তাঁহাকে আর

---

* তৃতীয় ভূমিতে ঘরগুলিতে কোণ নাই, সবই তরঙ্গায়িত।

† সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাযুক্ত না হইয়া সত্যের আভাসপ্রাপ্তিকে সত্যম্ভরা বলা হইতেছে।

‡ পূর্ণ প্রজ্ঞাযুক্ত সত্যস্ফূর্ত্তি "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।" যোগদর্শন

---

* কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে তু কারকব্যাপৃতিঃ কুতঃ॥

বার্ত্তিককার

† ছা. উপ ৪।১৫।৬ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে।

‡ ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ ১০

§ ভাগবতে ৪।২৫-২৯ পুরঞ্জনের উপাখ্যান আছে, ইঁহার এক নামহীন সখা আছেন—নিরঞ্জন। ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ ৭৭।৭৮—সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ইত্যাদি।

¶ যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

মুণ্ডক. উপ. ৩।২।৩, কৌষী. —২।২৩

ধরা যায় না। অমনি (১১৭) বিশ্বসঙ্গীত অনুভূত হইতে লাগিল,—আর জড় নাই, চেতন নাই, পশু নাই, মানব নাই, ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই, ধনী নাই, নির্ধন নাই,—কোনও প্রকার ভেদের বেসুরো ধ্বনি নাই; আছে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত একত্বের অনন্ত অবিরত শ্রুত সাম্যধ্বনি। জড়জগতের ভাষায় বলিতে গেলে—পরমাণুর নৃত্যের তালে, আকাশতরঙ্গের বাদ্যে এবং চৈতন্যের গীতে এই সঙ্গীত * বিশ্বকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া আবার কোথায় চলিলাম! (১১৮) ধ্রুবমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেখি—সে আমারই স্ফূর্তি, একবারও তাহাকে পর ভাবিতে পারিলাম না। এখানে চতুঃসন আমাকে এক দ্বারের নিকটে লইয়া গেল। দ্বারে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে জয়-বিজয়-স্থান (১২৩)। † জয় ও বিজয়—এখন আমার কিছুই নাই, অথবা উভয়ই সম্পূর্ণ আছে—এই ভাবেই দ্বারপ্রবেশের অধিকার দিল। প্রবেশ করিলাম, কোথায়?—এইবার ঠেকিয়াছি, উত্তর দিতে পারিতেছি না। ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ, পরব্রহ্ম (১২৪) অর্থে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ; তাহাতেই ত সকল বিধৃত, আহিত, তবে আবার প্রবেশ করিলাম কিরূপে? এখানে আসিয়াই-বা কি জানিলাম? কোন উত্তরই দিতে পারিতেছি না। ‡ ভাষা নাই, বাচক শব্দের বাচ্য বা অভিধেয় নাই, কি বলিব? বলিবার মত ভাষা থাকিলে বলিতাম—

> বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতিবৃন্দে
> করি প্রশমিত;
> আমিও নির্ম্মল হয়ে নিজ সদানন্দ পদে
> হনু অধিষ্ঠিত।
> —প্রবোধচন্দ্রোদয়, জ্যোতিরিন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

পরিশিষ্ট

১। বৃত্তাভাসের একদেশে স্থিত বৃত্ত—স্বর্গ। এই স্বর্গলোক ভোগের স্থান; কল্পবৃক্ষের দ্বারা এই স্থান ধৃত। এই বৃক্ষে সকল ফলই ফলে, কেবল মোক্ষ ফল ফলে না। দেহান্তে পুণ্যবান্ জীব স্বর্গে গমন করে, সেখানে পুণ্যের মাত্রা-অনুসারে সুখভোগ করে; পরে পুণ্যের শেষ হইলে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। স্বর্গকামীর মুক্তি নাই। যে জীব মুক্তিকামী, সে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না। স্বর্গ সকল প্রকার সুখের স্থান, সুন্দর স্থান; ছকে বৃত্তের আকারে—অন্য ঘর হইতে সুন্দরতর করিয়া দেখান হইয়াছে।

ভাগবত ৩।৩০।২৯ শ্লোকে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

> অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে।
> যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥

এই জগতেই স্বর্গ ও নরক অবস্থিত, সুখের নামই স্বর্গ এবং যাতনাই নরক।

যিনি আনন্দের প্রয়াসী তাঁহাকে স্বর্গ, নরক দুই-ই এড়াইয়া চলিতে হইবে, পুণ্য ও পাপ দুইয়েরই উপরে উঠিতে হইবে।

২। ভবদর্শনের প্রধান উপায়—

> তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসু হইয়া, সেবার দ্বারা গুরুর প্রসন্নতা অর্জ্জন করিয়া ভিতরের রহস্য অধিকার করিতে হইবে।

৩। বৃত্তাভাসের বাহিরে চারিটি সাঙ্কেতিক বৃত্তাকার চিহ্ন সৃষ্টির বাহিরের অবস্থার নির্দেশক। ঊর্দ্ধমুখী ত্রিভুজ—(তিন শক্তির দ্বারা বেষ্টিত)—উৎক্রান্তি-evolution নির্দ্দেশক, অধোমুখী ত্রিভুজ লয়ের involution নির্দ্দেশক। একই সময়ে evolution ও involution চলিতেছে—সাঙ্কেতিক হিসাবে ইহাই সৃষ্টির বাহিরের অবস্থা, এরূপ কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম আছেন, সৃষ্টজগৎ নাই বা সৃষ্টজগৎ আছে, ব্রহ্ম নাই—এরূপ কখনও হয় নাই, কখনও হইতে পারে না। তর্কে, আলোচনায় এরূপ একটা কল্পনা চলিতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না।

The absolute can never be comprehended apart from its functioning.

—S.Radhakrishnan, *Hist. of Ind.Phil.* Vol I.

(মনু ও পুরাণে) নার=মূলকারণ (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ) এই নারে যাঁহার অয়ন (ই+অনট্ গতি বা ক্রিয়া) অনবরত চলিতেছে=তিনি নারায়ণ। তিনিই উপনিষদে ব্রহ্ম। ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র তিনি পরিব্যাপ্ত (immanent) হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও (যেন) আছেন (transcendent), নতুবা তাঁহাকে উপাধিগ্রস্তের মত বোধ হইত; তাই ব্রহ্মাণ্ডাতীতের কল্পনা।

---

* গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।

† ভাগবত ৩।১৬।২—"এতৌ তৌ পার্ষদৌ।" জয় ও বিজয়—ইঁহারা শ্রীভগবানের দুই পার্ষদ।

‡ What Consciousness is or will be when entirely separated from *Upadhi* is a thing utterly inconceivable to any intelligence which has a distinct individualized existence.—S. Row, *Philosophy of Bh. Gita.*

বিধাতার বর

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আগুনে জ্বলিছে ঘৃত-ইন্ধন—আলো তার ভাল লাগে,
সুখী নর-নারী সেবি' সে অনল মৃদু উত্তাপ মাগে।
সমিধের মেধ যত হীন-সার, তত উজ্জ্বল আলো,
সোণার শিখায় প্রাণ পুড়ে' যায়, দেহ অঙ্গার-কালো !
দহনের লাগি, দেহ যার যাচে কামের যজ্ঞ-হবি—
দীপ্তির তলে অঙ্গার জ্বলে—লোকে কয় তারে কবি।

লালা ক্লেদময় গলিত পঙ্ক কৃমিকীটসঙ্কুল,
তারি অন্তরে পশে সুগভীর রসপায়ী যার মূল—
মজ্জাবিহীন ক্ষীণ তনু যার স্রোতোবেগ নাহি সহে,
তারি মুখে ফোটে শোভা-শতদল, মধুর মাধুরী বহে !
জীবন যাহার অতি দুর্ব্বহ, দীন দুর্ব্বল সবি—
রসাতলে বসি' গড়িছে স্বর্গ—সেই জন বটে কবি।

অবাধ অগাধ সিন্ধুমাঝারে শতশুক্তির বাস—
কঠিন কবচে ঠেকায় সকলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ;
ব্যাধি-বালুকণা পশিল কেমনে কোন্ সে রন্ধ্র দিয়া
একটির বুকে—ফোটকে ফলিল মুক্তা সে মোহনিয়া !
সুস্থ নহে যে সবার মতন সহজ জীবন লভি'—
—অন্তরে যার অসুখ অপার, সেই জন হয় কবি

কত জ্যোতিষ্ক জ্বলে' নিবে যায় দিশাহীন মহাকাশে,
রশ্মি তাদের কত যুগ পরে ধরণীতে পরকাশে !
কেমন আছিল কেহ তা' জানেনা, ছিল যবে হেরি নাই ;
আজ কিবা তার—জ্যোতি-পরিচয় আমরা পাই না পাই !
কবিও কচিৎ জীয়ে যশ পায় ; স্মৃতি যবে ছায়াময়,
মৃত তারকার মত রটে তার প্রতিভার পরিচয় !

*　　　*

তুলনা যাহার ইন্ধন হ'তে নির্ব্বাণ শশী-রবি—
বিধাতারি বরে মানুষ না হ'য়ে সেজন হয়েছে কবি !

সাহিত্যে অশ্লীলতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কাব্যে দুর্নীতির প্রসঙ্গ প্রাচীনের বিচার-বহির্ভূত ছিল; তার কারণ, যে নীতির আদর্শ একালে আমরা স্বীকার করিয়াছি তাহা হিন্দুর চিন্তায় কখনও স্থান পায় নাই। তথাপি আজকাল সুন্দর-বোধকে (aesthetic sense) মঙ্গল-চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া, সাহিত্য যে অর্থে নীতি-নিরপেক্ষ বলিয়া একটা নূতন মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, হিন্দুর রসতত্ত্বে ঠিক সেই ধরণের কোনও সুস্পষ্ট বিতর্কের অবকাশ নাই। কবিকর্ম্মের প্রশ্রয় বা প্রসার ছিল যে রাজ্যে তাহা লোকোত্তরচমৎকারের লীলাক্ষেত্র; যিনি রসিক তিনি কাব্য-জগতে লোক-ব্যবহারের অতিক্রান্ত বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য একটা ভাবাবস্থার প্রত্যাশাই করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষেও কবির কল্পনা যাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে বাস্তবের প্রতিকূল না হয়, এজন্য সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী কোনও আদর্শ বা মতবাদ কাব্যে স্থান পাইবে না, এমনই একটা বিধি যেন কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত রূপে বিদ্যমান ছিল; অন্ততঃ কাব্যগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল লক্ষ্য করিলে ইহাই মনে হয়। কিন্তু ইহাকে আধুনিক নীতি-শাসন বলা যায় না। আধুনিক নীতিবাদের মূলে আছে দেহ-শুদ্ধির আগ্রহ, ব্যক্তি-মানসের স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠা; খ্রীষ্টিয়ান একেশ্বরবাদের যে theology তাহারই প্রভাববিশিষ্ট একটা চারিত্রিক শুচিতার স্পৃহা। জীবন ও জগতের অসীম বৈচিত্র্য ও সুগভীর রহস্যকে পরম রস-বোধের দ্বারা আত্মসাৎ না করিয়া, তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র শক্তির উপযোগী একটা অন্ধ-ভক্তি-মূলক আদর্শের অধীন করিয়া, এক বিশিষ্ট জাতির বিশিষ্ট মনোবৃত্তি যে ধর্ম্ম ও ভগবানের উদ্ভাবনা করিয়াছে, তাহাতে সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অতিশয় সহজ ও সরল হইয়াছে; অসীমাকে সীমায় বাঁধিয়া সকল বৈচিত্র্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, বিধাতার সৃষ্টি-কর্ম্মকে ছয় দিনের মধ্যে শেষ করাইয়া এবং যত কিছু গোলযোগ শয়তানের স্কন্ধে চাপাইয়া, এমন একটি ধর্ম্মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যাহাতে মানুষের হিতাহিত-বোধ ও কর্ত্তব্য-চিন্তায় কোনও সংশয় থাকিতে পারে না; অজ্ঞানের অন্ধকারই চতুষ্পার্শ্ব আবৃত করিয়া রাখে, কেবল একটি মাত্র পথ খোলা থাকে,—সে পথে মানুষের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কোনও সংশয় নাই, রহস্যবোধ নাই; যুদ্ধ-যাত্রাকালে গোঁয়ার সৈনিক যেমন আর কিছুই ভাবে না, নেতার আদেশ-পালনকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, ঠিক সেই মত এইরূপ বিধি-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় মানুষ কেবল পাপ-রূপ শত্রুর সম্বন্ধেই সজাগ থাকে, এবং তাহার বিরুদ্ধে আপনার ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী করতে পারিলেই চরিতার্থ বোধ করে। একালে এই ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিগত বিবেকের দ্বারা পরিচালিত; এ বিবেক কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রেরণা নয়, স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধিই বিবেকের সহায়,—ইহার দৌলতে আমরা শুচি-অশুচি, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার একটি সুস্পষ্ট আদর্শ বা মাপকাঠি গড়িয়া লইয়াছি। খ্রীষ্টিয়ান বা সেমিটিক ধর্ম্ম-নীতিই, ইংরেজী শিক্ষার মারফতে, আমাদের চিত্তে এই দেহ-শুদ্ধিমূলক নব আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুর চিন্তায় এইরূপ নৈতিকতা কখনও স্থান পায় নাই একথা আমি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতে চাই। এই সৃষ্টির সত্য যে ব্রহ্ম এবং কাব্যের সত্য যে রস—তাহা যে অভেদ, কাব্যরসাস্বাদ যে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইহা মানিয়া লইতে হিন্দুর পক্ষে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনযাত্রার জন্য যে আপেক্ষিক কল্যাণকে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সে স্থান দিয়াছিল, কাব্যকলার অনুশীলনে তাহাকে অশ্রদ্ধা করার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে নাই। তথাপি ইহা আধুনিক নীতি-শাসনের নিদর্শন নয়; কারণ, হিন্দুর এই সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ এমন সকল ব্যাপারের সমর্থন করে, যাহাতে এই বিবেকমূলক নীতি-জ্ঞান বা চরিত্র-নিষ্ঠার মর্য্যাদা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না।

* * *

তথাপি এই যে একটা সংস্কার—কল্যাণের আদর্শ যেমনই হৌক, রসসৃষ্টিতে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই; ঠিক চরিত্র-

নৈতিক না হইলেও ইহাও একটা নীতি এবং ইহার বিপরীত যাহা, সেই দুর্নীতি প্রাচীন কাব্যগুলির মধ্যে কোথায়ও প্রশ্রয় পায় নাই। আধুনিক নৈতিক সংস্কার যাহার বিরোধী এমন অনেক কিছু তখনকার কাব্যে রসের পুষ্টিসাধন করিত বটে, কিন্তু সমাজ-বিধানের মূলে কল্যাণের যে আদর্শ ছিল, কবি-কল্পনা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিত না। এ নীতি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা ব্যক্তিগত বিবেকের নীতি নয়—আধুনিক চরিত্র-নীতির ভাল-মন্দ বা সত্য-মিথ্যা সেকালের কবিকে সংশয়াকুল করিত না। সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার শকুন্তলা-নাটকে কল্যাণের যে আদর্শকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর সমাজবিধিকে যে সম্মান দিয়াছেন, মেঘদূত কাব্যেও সেইরূপ একটা আদর্শ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাতে কবি-কল্পনা আধুনিক আদর্শ-সম্মত সুরুচি বা সুনীতির মর্য্যাদারক্ষায় অবহিত হয় নাই। তথাপি, একালের বাঙ্গালী মহাকবি এই মেঘদূতের মধ্যেই একটা সুদূর-দুর্লভ সুন্দর-লোকের বিরহ এবং তাহারই সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক-তার সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু এই কাব্যে যে স্থূল দৈহিকতার প্ররোচনা রহিয়াছে, তিনি কি তাহার সমর্থন করিবেন? মেঘদূতের কবি দেহের আরতি করিয়াও উৎকৃষ্ট কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন; নীতিবাগীশের পক্ষে তাহার অনেক খানিই হজম করা দুঃসাধ্য; সে কাব্য যতই সুরচিত হোক, তাহাকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন পাঠক বোধ হয় কখনই রাজী হইবেন না।

* * *

অশ্লীলতা যদি কেবল রুচি-বিগর্হিত হয় তবে রস-রচনা হিসাবে কাব্যের মূল্যহানি হয় না; কারণ, রসবিচারে রুচিই সর্ব্বেসর্ব্বা নয়। তথাপি রস-সৃষ্টির মধ্যেও একটা বৃহত্তর নীতির প্রেরণা আছে। যে নীতি সৃষ্টিকে ধরিয়া আছে, যে সত্য, বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃকরণ উভয়ত্রই একই নিয়মে সুন্দরকে সুপ্রকাশ করিতেছে—ইহা সেই নীতি। এই নীতি অশ্লীলকেও শ্লীল করে, আবার অতিশয় শ্লীল যাহা তাহারও কদর্য্যতা প্রকাশ করিয়া দেয়। এ নীতি রসের অন্তরায় নহে, বরং পরিপোষক। জীবনকে সমগ্র ভাবে দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহাতে দেহগত অশ্লীলতাও অশ্লীল নয়। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ বা গুণ নয়; অর্থাৎ অশ্লীলতার জন্যই কোনও কাব্য বর্জ্জনীয় অথবা সেই কারণেই বরণীয় নহে। রুচির কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি কোনও কাব্যের অশ্লীলতা দোষাবহ হয়, তবে তাহার বিচারে যে একটি মাত্র নীতির কথা উঠিতে পারে তাহা এই যে, সে কাব্য মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে কিনা।

* * *

যে গভীর ও বৃহত্তর নীতি কাব্যরস-মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা-ভূমি, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; আমি কেবল দেহঘটিত ব্যাপারে সেই নীতির সন্ধান করিব। অশ্লীলতা ও দুর্নীতি এক নয় বটে, তথাপি আধুনিকের নিকট অশ্লীলতা কেবল রুচিবিরুদ্ধ নহে, দুর্নীতিদুষ্টও বটে; এজন্য আমি একদিকে **obscene** ও **vulgar**, এবং অপর দিকে **elegant** ও **immoral** এই দুই প্রবৃত্তির কাব্যরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিব। বলা বাহুল্য, আমি এ আলোচনায় তথাকথিত নৈতিকতার দোহাই দিব না।

* * *

নরনারীর প্রেম কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য; এ বস্তু যে কামমূলক তাহা কোনও কবির স্বীকার করিতে বাধা নাই। এই কামই মাত্রা ও প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি যে প্রেম, তাহার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়। শেক্সপীয়ার তাঁহার কয়েকখানি নাটকে এই কামের বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করিয়াছেন; সর্ব্বত্রই ইহা রিপুর আকারে পুরুষকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও এইরূপ শেক্স্পীরীয় ট্র্যাজেডির ছায়াপাত হইয়াছে। এই কাম-প্রেমের বর্ণনায় দেহকে বাদ দেওয়া যায় না, দিবার আবশ্যকও নাই। দেহকে এড়াইয়া চলিলেই প্রেমের মহিমা বৃদ্ধি হয় না; যেখানে দেহ নাই, সেখানে আত্মার আত্মপরীক্ষাও নাই—সে প্রেম একটা মানসিক মোহ বা অহং-বিলাস মাত্র। "শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"—ইহা বড় সত্য কথা, প্রেমের ব্যাপারে ইহা আরও সত্য।

কিন্তু আধুনিক রুচিবাগীশ তাহা মানিবেন না; তার কারণ প্রেমের এখন যে আদর্শ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রাণের গভীরতর উৎকণ্ঠা আর নাই। এই প্রকৃতি বা সৃষ্টির রহস্য মানুষের দেহ-চেতনায় যে মর্ম্মান্তিক রূপে ধরা দেয়, আধুনিক

মানুষ সে রসের রসিক নয়। প্রেম এখন মনের ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম নয়—হৃদয়-বৃত্তি নয়, অহংকার-প্রসূত মনোবৃত্তির লীলা। এখনকার প্রেমে 'যুগল' নাই, আছে 'ব্যক্তি'—মিলন নাই, আছে স্বার্থের সমান অধিকার। এ প্রেমে সমপ্রাণতার আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, একপ্রাণতার প্রয়োজন নাই; তাই এ প্রেমে দেহের স্থান খুব উচ্চ নয়; দেহ যুগল-মিলনের সেতু নয়, আত্ম-পূজার উপচার মাত্র। একটি কবি-বাক্য আমার প্রায়ই মনে পড়ে—"দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন"। জীবন অর্থে মানুষের মন, প্রাণ, আত্মা সবটাই বুঝিতে হইবে। আমি দার্শনিক নই, কাব্যও দর্শন নয়, অতএব এই বাক্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিব না। যে সত্যকে মানুষ চিন্তা দ্বারা নয়;—পূর্ণপ্রবুদ্ধ ভাব-চৈতন্যের মাহেন্দ্রক্ষণে চকিতে উপলব্ধি করে, এই বাক্যটির মধ্যে সেই intuition বা অপরোক্ষ জ্ঞানের আভাস আছে। জীবন বা মানুষের সমগ্র সত্তা দেহময়; যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহা, আকাশে তড়িৎ-প্রবাহের মত, দুগ্ধে নবনীতের মত, এই দেহেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে, আলোড়ন-বিলোড়ন সাহায্যে এই দেহেরই মর্ম্মস্থলে তাহার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এ রহস্য দুরবগাহ, তাই জ্ঞানাভিমানী মনোধর্ম্মী পুরুষ ইহার সম্বন্ধে নাস্তিক। যাহার দেহ-স্বভাব অবিকৃত, যাহার মধ্যে সৃষ্টির গূঢ় প্রেরণা সুস্থ ও সবল,—পদ্মকোষে মধুসঞ্চারের মত তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংস্থানে ইহার উন্মেষ হয়, মথিত দেহ-চেতনা হইতে অমৃতের উদ্ভব হয়। যে শক্তিকে আমরা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ বলিয়া বুঝি, তাহা দেহেরই এই রহস্যময় সত্তার চূড়ান্ত পরিচয়—তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভঙ্গিই প্রেম। যাহারা জীবনে এই তত্ত্বের অন্ধ সাধক তাহারাই প্রেমিক; যাহারা কাব্যে ইহার ভাব-সাধক তাহারাই কবি।

*   *   *   *

কাব্যে দেহঘটিত ব্যাপারের অবতারণা ও তাহার মূলে কাম-প্রেমের যে কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, অতঃপর, তাহার দুইটি বিপরীত ভঙ্গির দৃষ্টান্ত দিব; দুইটিই প্রাচীন। এই দুই জাতীয় কাব্যেই দেহঘটিত অশ্লীলতা বিদ্যমান, দেহকে স্বীকার করিয়াই পরম-সুন্দরের আরতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শেক্সপীয়ারের 'অ্যাণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা' মহাকবির উৎকৃষ্ট নাটকগুলির অন্যতম। এই নাটকে দেহ-সম্ভোগের উদ্দাম প্রবৃত্তি যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অবধি নাই। কিন্তু রূপজ মোহের প্রবল প্রভাবে কাম-বিষ-মূর্চ্ছিত পুরুষবীরের যে পরিণাম ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে কাম যেন নিজের অনলে নিজে দগ্ধ হইয়া অপরূপ শুচিতা লাভ করিয়াছে। এই যে প্রেমের কাহিনী শেক্সপীয়ারের মত কবির প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তাহার মূলে আছে - সকল ক্ষুদ্র নীতি-সংস্কার-বিলোপী মানব-হৃদয়-মহিমা, যার চেয়ে বড় জগতে আর কিছুই নাই। ইহাকে প্রেমই বল, আর কামই বল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না—যদি তাহার মধ্যে সেই সর্ব্বত্যাগের দিব্যোন্মাদ আপনাকে নিঃশেষে নাশ করিবার অদ্ভুত আকিঞ্চন প্রকাশ পায়। শেক্সপীয়ারের কল্পনায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল অ্যাণ্টনীর জীবন-কাহিনীর এই একটি কথা :—

> The triple pillar of the world transformed
> Into a strumpet's fool.

এই আত্মঘাতী কাম, রূপ-মোহের এই বিষ-বিসর্পই উৎকৃষ্ট কাব্যের রস-প্রেরণা হইয়াছে।

*   *   *   *

ইহা সত্য যে, ট্র্যাজেডির রস-পুষ্টির জন্য নায়ক অ্যাণ্টনিকে সাধারণ অবস্থার মানুষ হইলে চলিবে না—triple pillar of the world হওয়াতে, ভাবের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে। যুরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-কীর্ত্তি নাটক; নাটকে জীবনের যে দিকটিকে আশ্রয় করা হয়; তাহা বিশেষ ভাবে প্রবৃত্তির দিক। ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া পরিণাম পর্য্যন্ত, এই প্রবৃত্তির লীলায় মানব-চরিত্রের ও তথা জীবনের গভীর রহস্য রস-রূপে প্রকাশিত করাই নাটক-রচনার সার্থকতা। এই কারণে, এবং বিশেষ করিয়া ট্র্যাজেডির প্রয়োজনে নায়ক-নায়িকার অবস্থা ও পদমর্য্যাদা একটু বড় করিয়া কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাব্যের রস-সত্য শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে—মানুষের সাধারণ মনুষ্যত্ব ও দেহের নিয়তিকে। এই নাটকের প্রেম-কাহিনীতে প্রবৃত্তির যে প্রজ্জ্বলন্ত প্রভায় জীবনের মহিমা-বিকাশ হইয়াছে, তাহা অতি সাধারণ দেহ-ধর্ম্মেরই পরিণতি; 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা' নাটকে দেহাধিষ্ঠিত কামই শ্মশানচারী মহেশ্বরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়াছে। কারণ এই প্রবল ভোগস্পৃহার অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-পরিণাম সহজ নয়; সেই দুঃখের সংঘাত সহ্য করিবার শক্তিও এই কাম-প্রবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। এ ধরণের ভোগ-পিপাসা একরূপ মৃত্যু-পিপাসা—আত্মনাশের দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকারের সাধনা। তখন সাধারণ মানুষের অতিসাধারণ জীবন-রহস্যই মানুষের অন্তরতম অনুভূতির মধ্যে ধরা দেয়; যাহা আদিম ও সার্ব্বজনীন, তাহারই আবেশ-প্রভাবে মানুষ আপনার সত্তায় সৃষ্টির বিরাট সত্তা উপলব্ধি করে—ব্যক্তি-চেতনা বিশ্ব-চেতনার দ্বারা অভিভূত হয়। তাহা না হইলে মানুষ মৃত্যুকে এত সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই সেই চরমক্ষণে ক্লিওপেট্রাও বলিয়া উঠে—**I have immortal longings in me;** সহচরী যখন তাহাকে **"Royal Egypt! Empress!"** বলিয়া শেষ সম্বোধন করে, তখন 'নীল-নদের সর্পিণী' রাণী ও বারাঙ্গনা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারী-কুহকিনী বলিয়া উঠে:—

> No more but e'en a woman and commanded
> By such poor passion as the maid that milks
> And does the meanest chare.

ইহাই পরম সত্য, কিন্তু এ সত্যকে এমন ভাবে উপলব্ধি না করাইলে 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' এত গভীর রসোজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

* * *

একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—

> How can he (Shakespeare) bring them both to end so nobly that all contempt forgotten, even our pity is purged into a sense of human majesty? How from the orts and ravages of this sensual banquet shall he dismiss us with 'an awed surmise' that man is, after all, master of circumstance and far greater than he knows?

লেখক যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন সে বিস্ময় কখনও ঘুচিবার নয়; এ রহস্যের অন্ত নাই, বিচারবুদ্ধি বা নীতিজ্ঞান ইহার নিকট চিরদিনই পরাজিত। মানুষের যে দেহভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, মহাকবি তাহারই অতল হইতে জীবনের একটা বড় সত্য উদ্ধার করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব রসে মণ্ডিত করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন—**'all contempt forgotten, even our pity is purged into a sense of human majesty'—'from the orts and ravages of this sensual banquet'** ইত্যাদি,—অর্থাৎ, দেহ-সম্ভোগের পঙ্কশয্যা হইতে মানুষ একি মহিমায় উঠিয়া দাঁড়ায়! সকল ঘৃণার ভাব দূর হইয়া, হৃদয় ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে; মনে হয়, মানুষ যে কত বড়, সে যে নিয়তি-নিয়মের কত উর্দ্ধে, তাহা সে নিজেই জানে না। এই বিস্ময়ের কারণ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, কবি তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে জীবনের একটি দিক দৃঢ় ও সমগ্রভাবে ধরিতে পারিয়াছেন, দেহের আধারেই প্রাণের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

* * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ট্র্যাজেডির প্রয়োজনে এই দেহ-রহস্য একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠে। এ-নাটকে দেখিতে পাই, প্রেম যেন দেহে আগুন জ্বালাইয়া তাহাকে ভাস্বর করিয়াছে। এ প্রেম রিপু বটে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের কথায় ইহা যে-সে প্রেম নয়, সাধারণ রসিকের পক্ষে ইহার মর্ম্ম বোঝা কঠিন—

> For it is of Love: not the pretty amorous ritual played on a time by troubadours and courtiers, not the delicate sighing languishment which the Elizabethans called Fancy; not the business as understood by eighteenth century sentimentalists: but Love the invincible destroyer—destroying the world for itself—itself too, at the last: Love voluptuous, savage, perfidious, true to itself though rooted in dishonour, extreme, wild, divine, merciless as a panther on its prey.

এক কথায় এ প্রেম শাক্ত সাধকের আদর্শ, বৈষ্ণবের নয়। ইহা সেই শক্তির আরাধনা যাহাকে সৃষ্টির পরমতত্ত্ব-রূপে, আমাদের দেশের সাধকেরা বহুদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বভয় ও সর্ব্বসংশয়ের পারে পৌঁছিয়া আত্মস্থ হইতে চাহিয়াছে। এই **'extreme, wild, divine, merciless'**-এর যে সাধনা তাহাতে নীতি-দুর্নীতির চিন্তাই নাই। শেকস্‌পীয়ার, এই নাটকে, প্রেমকে সেই শাক্ততন্ত্রের আদর্শে কল্পনা করিয়াছেন, তাই পরম তত্ত্বের একমাত্র অধিষ্ঠান-ভূমি যে পরম-বাস্তব দেহ, তাহা এই নাটকে এতখানি স্থান অধিকার করিয়াছে।

অশ্লীলতা ও দুর্নীতির প্রসঙ্গে এই যে দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম—ট্র্যাজেডির এই নাটকীয় রূপ ছাড়া, প্রেম যে আর এক রূপে, আর এক ভঙ্গীতে আমাদের কাব্যে এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিয়াছে, এইবার তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমি বাংলার বৈষ্ণব কবিতার কথা বলিতেছি। সে-ও আত্মহারা প্রেমের গান; কিন্তু সেখানে বাসনার প্রবল ঝড়ে বাহিরে আকাশ বাতাস বিক্ষুব্ধ হয় নাই। ভোগ এখানে অন্তর্মুখী, বাসনা আত্মস্থ—দেহ আত্মবশ। তাই বিরোধ নাই, মৃত্যু নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত আদর্শে মৃত্যু যে অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইয়াছে, এখানে দুর্ল্লভ-বল্লভ-বিরহই সেই অমৃতের নিদান। ওখানে যাহার শেষ, এখানে তাহার আরম্ভ; ওখানে যাহা একটি মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত ও অবসিত হইয়াছে, এখানে তাহা অনন্ত কালে প্রসারিত; একটিতে প্রেমের অস্থির নাটকীয় রূপ, অপরটিতে তাহার অতি-স্থির গীতি-সৌন্দর্য্য শেষোক্ত সাধনাই আমাদের দেশের—ভারতীয় প্রকৃতির উপযোগী, তাই আমাদের সাহিত্যের আদর্শও এত বিপরীত। য়ুরোপ শাক্ত—প্রকৃতির শক্তিমূর্ত্তির উপাসক, তাই সেখানকার সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটককারই শ্রেষ্ঠ কবি। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে বীর-বীর্য্যের সাধনা—কর্ম্মক্ষয় নয়, কর্ম্মভারে নিজেকে নিপীড়িত নিষ্পেষিত করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহার ফলভোগ করার যে আত্মপ্রসাদ, তাহাই সে জাতির আধ্যাত্মিকতা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের আদর্শও তাহাই। আমাদের আদর্শ যুদ্ধ নয়, বাহিরকে জয় করা নয়—সকল কর্ম্ম সংহরণ করিয়া, অহংমদমত্ততার উচ্ছেদ। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র। ইহারই প্রভাবে প্রেমের সাধনাতেও যে একটি অপূর্ব্ব রস আমাদের সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের সাধনা, অথবা ভোগ-ত্যাগের বিবাদ মিটাইয়া নিজের পিপাসাকে পাত্রান্তরিত করিয়া পরের পিপাসা রূপেই তাহার যে পরিচর্য্যা, তাহাতে মৃত্যুকে জয় করার মতই কামকে জয় করার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি যাহাকে শাক্ত-সাধনা বলিয়াছি, তাহাতে, স্বভাবের পথে কামকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার চরম ফল পরমানন্দে ভোগ করিবার সামর্থ্যই এক প্রকার সিদ্ধিলাভ; এই বৈষ্ণব সাধনায় কামকে স্ববশে আনিয়া তার চোখে যেন ধূলা দিয়া, তাহাকে সেবক ভৃত্যরূপে পরমান্ন পরিবেশনে নিযুক্ত করা হয়। মদন এখানে মূর্চ্ছিত; মদনের মূর্চ্ছাবস্থায় প্রেমে কোনও বাধা নাই, পরাজয় বা মৃত্যু নাই। ইহা আত্ম-পরীক্ষার শক্তি-সাধনা নয়, প্রথম হইতেই আত্মবিস্মৃতির প্রীতি-সন্ধান।

* * *

বৈষ্ণব কবি যখন বলেন "রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়"—তখন আমরা তাহার মধ্যে যে নৈতিকতা বা দেহ-বৈরাগ্যের ইঙ্গিত পাইয়া আশ্বস্ত হই, তাহা আমাদের অর্থে সত্য নহে। বৈষ্ণবের সাধন-মন্ত্র অনুসারে, দেহকে মানিয়াও "কামগন্ধ নাহি তায়" বলা সম্ভব। পিপাসাকে পাত্রান্তরিত করার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইবার তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে। বৈষ্ণব বড় পৌত্তলিক—দেহবিগ্রহের পূজারী; প্রেমের পূজায় তাহাকে অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য সাজাইতে হয়—দেহ দিয়া। সে কেবল মনে-মনেই পূজা নিবেদন করে না, হাতে করিয়া দিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। তাই 'দান' তাহার সাধনার একটা বড় অঙ্গ। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিতে পরিণত করার যে সাধনা তাহাতে দেহের মূল্য কম নয়; এই দেহ-নিবেদনের রস-মাধুরী বৈষ্ণব বিশেষ করিয়া জানে—তখন কামে আর কামগন্ধ থাকে না, তাহা 'নিকষিত হেম' হইয়া দাঁড়ায়। বৈষ্ণব বলেন, "দেহঘটিত বলিয়াই এ সেবা নিন্দনীয় নহে; প্রেমের সম্পর্কে 'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং' প্রভৃতি যে অষ্টবিধ ব্যাপারের উল্লেখ করা হয় তাহা আদি-রসের লক্ষণ মাত্র, তাহারা রস নহে; ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া রস আপনাকে ব্যক্ত করে মাত্র। এ গুলি অভিপ্রায়-ভেদেই বীভৎস বা প্রশংসনীয় হয়; রক্তের উত্তাপ জ্বরের লক্ষণও হইতে পারে, আবার তাহা অতি প্রশংসনীয় শ্রমের লক্ষণও হইতে পারে। যদি কেহ কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ সুখের জন্য তাঁহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করে তবে তাহা ঘৃণ্য কাম: কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এতটা ভালবাসিতে পারে যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি মুখ্য না হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিই মুখ্য হইয়া উঠে, এবং তাহার কারণে নিজ দেহপ্রাণকুলশীল অকাতরে দিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহা অনবদ্য রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ সুখী হইলেই সে সুখদর্শনে

কৃষ্ণপ্রণয়িনীও অবশ অতুলানন্দে আনন্দিত হয়—কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলে নিজেও অপরিহার্য্যরূপে সুখ অনুভব করে, কৃষ্ণকে অবশে ভালবাসিয়া অবশে সুখ পায়। ইহারই নাম পীরিতি—ইহাকে আনন্দ-পরিণাম বলে। ইহা ব্রজের কথা, কিন্তু ব্রজে যাহা আছে জগতে তাহা নাই এমন নহে—মাত্রারূপে আছে; সেই মাত্রাই আসল বস্তুর পরিচায়ক হিসাবে অমূল্য।" শেষের কথাটি প্রণিধানযোগ্য; এই মাত্রা হইতেই সেই পূর্ণ আনন্দের আভাস আমরা পাই, বৈষ্ণবের ভাব-বৃন্দাবনের এই আদর্শ ও সাধনরীতি লৌকিক জগতের সকল সত্যকার প্রেমলীলায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—পরিণাম যেমনই হউক, প্রেরণা একই; তাহা না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী গুহ্য সাধন-কাহিনী হইয়াই থাকিত, উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে প্রাকৃত জনের মনোহরণ করিত না।

* * *

এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিব। বৈষ্ণব সাধনার মূলতত্ত্ব এই যে, "আনন্দটিকে পাইতে গেলে সামান্য (genaral universal) ভাবে পাইবার উপায় নাই। একটা বিশেষের (particular) ভিতর দিয়াই পাইতে হয়—হয় একাকার বিশেষ রূপ, না হয়, বিশিষ্টাকার বিশেষ রূপ, যেমন সামান্য মাটিকে পাইতে হইলে, হয় পিণ্ডাকারে, নয় ঘটাকারে পাইতে হয়। সামান্যে বিশেষ নাই, কিন্তু বিশেষে সামান্যও আছে, বিশেষও আছে। তবেই সামান্য অপেক্ষা বিশেষের মর্য্যাদা অধিক।" ইহা হইতে প্রেম-রসাস্বাদে ব্যক্তি ও তথা দেহের মর্য্যাদা কতখানি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। নির্ব্বিশেষের বিশেষ রূপই এই জগৎ—এই সৃষ্টি। বৈষ্ণব এই সৃষ্টিকে রাধার কায়ব্যূহরূপে কল্পনা করিয়াছেন—আনন্দকে বিশিষ্ট করিবার জন্যই এই কায়ব্যূহের প্রকাশ। বৈষ্ণব বলেন, সুষুপ্ত ব্রহ্মের সুপ্তিভঙ্গই এই সৃষ্টি—

> কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোণার বরণ পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে—হ্লাদিনী ভালবাসা ঠাকুরাণী শ্রীরাধা। ঠাকুরাণী বলিলেন, পরাণ বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি।...আমার ষোল কলার এক এক কলা হইতে তোমার জন্য সহস্র প্রণয়িনী সৃষ্টি করিব। আমার অংশে আমার পরিণাম তাহারা, আমার ধাতু আমার স্বভাব পাইবে, তুমি যাহার সহিত সঙ্গত হইয়াই সুখ পাও তাহারা তাহাতেই অনুকূল হইবে, সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া তোমার ভোগের উপযুক্ত নৈবেদ্য করিয়া তোমার নিকট অভিসার করাইবে।...
>
> আমি নন্দমহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাটবাজার করিব এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন-পালন ও শাসন করিব। ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব, বনে তোমাকে ঘন দুগ্ধ পান করাইব; বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধা-নাম গাহিব; তোমাকে আমার নয়ন-তারা করিয়া রাখিব, তোমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তোমার বনমালা হইব; কদম্বতরু হইয়া গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মলয় পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব; অঙ্গ-পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব।...নানা ঋতুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান, লতাবিতানে সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, রাসস্থলী, ময়ূরের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব; তুমি সকল রকম রসের কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না।...এইরূপে কৃষ্ণের সকল রকম সুখের উপকরণ-সমষ্টি ব্রজনির্ম্মাণ শেষ হইল। ঠাকুরাণী ব্রজনির্ম্মাণ করিলেন, সমগ্র ব্রজটি ভালবাসা ঠাকুরাণীর কায়ব্যূহ।*

* * *

রাধার এই বিরাট কায়ব্যূহ নির্ম্মাণের মূলে যে তত্ত্ব রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তি-দেহের তত্ত্বও তাহাই। একাকার সামান্যের বিশিষ্ট রূপই, এই দেহ—যে আনন্দ নিখিল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রেমিক দেহী তাহাই আস্বাদন করিয়া থাকে এই দেহের পাত্রে; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি যে কাম তাহা যখন অপরেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিচর্য্যায় আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন কামে আর কাম-গন্ধ থাকে না; তখন আদি-রসের বর্ণনায় অশ্লীলতা বা দুর্নীতিই উৎকৃষ্ট রসের পুষ্টি সাধন করে। তাই বিদ্যাপতির রাধা যখন বলে—

> আলিপন দেয়ব মোতিম হার,
> মঙ্গল-কলস করব কুচভার।
> সহকার-পল্লব চুচুক দেবি,
> মাধব সেবি মনোরথ নেবি।
> ধূপদীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে,
> লোচন-নীরে করব অভিষেকে।
> আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কয় আগে,......

---

* উদ্ধৃত অংশগুলি ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরাণীর কথা' হইতে লইয়াছি—লেখক।

কিম্বা—

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি' কুচযুগ রাখি.
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে,
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব,
আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প ॥

—তখন দেহকে ঘৃণা করা দূরে থাক, প্রেমের অভিষেকে তাহা যে কতখানি পবিত্র হইয়া উঠে রসিক মাত্রেই তাহা বুঝিবেন। তখন বুঝি, দেহ আছে বলিয়াই প্রেমের এই আত্মনিবেদন—এই মহাদান, সর্ব্বস্ব পণের এই পরমানন্দ সম্ভব হইয়াছে। এই দেহেরই অধিকারে কবি সেই পরমানন্দের দাবী জানাইয়া, রাধার জবানীতে, যখন ফুকারিয়া কাঁদিয়া বলেন—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু
দয়া না ছোড়বি মোয় ॥

তখন, বৈষ্ণব কবিতায়, বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীতে, দেহ-সম্ভোগের যে বর্ণবাহুল্য আছে, তাহার নৈতিক মূল্যবিচার বেরসিকতার চূড়ান্ত বলিয়াই মনে হয়। এ কবিতাও সাধারণ রসিকের অধিকারভুক্ত নয় বলিয়াই, ইহা এতকাল কাব্য-সাহিত্যের বাহিরেই বাস করিতেছিল।

* * *

বৈষ্ণব কবিতার কাম-প্রেমের আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই হৌক, বিশিষ্ট সাধনার অঙ্গরূপে তাহার মূল্য যেমনই হৌক, আমি তাহার অন্তর্গত মানবতার দিকটিই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে চাই। [জীবনের যাহা সত্য, তাহারই কাব্য রসরূপ হিসাবে, মানবীয় প্রেমের উচ্চতত্ত্ব হিসাবেই, আমি এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের স্বভাবের মধ্যে, প্রাণ মূলে, যে প্রেরণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহাকে আমরা প্রেম বলি, তাহার পরিণাম যতই আধ্যাত্মিক হউক, তাহা যে দেহেরই ধর্ম্ম, এবং সেই জন্য তাহার বিকাশে, সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত, দেহের স্থান যে আছেই, এবং কি ভাবে আছে তাহাই দেখাইবার জন্য আমি কাব্যরসের দুই বিভিন্ন, ও প্রায় বিপরীত ভঙ্গির দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম।] প্রেম মাত্রেই উৎকৃষ্ট সম্ভোগ-রস; এ রসের আস্বাদনে দেহকে দমন করিবার জন্য ব্যস্ত ব্যাকুল হইতে হয় না—সে দিকে দৃষ্টিই থাকে না। বিকাশের মাত্রা অনুসারে এই প্রবৃত্তি বিভিন্ন ভঙ্গি আশ্রয় করে—কিন্তু কুত্রাপি দেহকে অতিক্রম করে না। বৈষ্ণবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি হইতেই জন্মে; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিও অজ্ঞান অবশ হইতে পারে, সেই অবশ অজ্ঞান ভোগস্পৃহা যদি দুর্নিবার হইতে পায়, তবে মানুষ কেমন আত্মহারা হইয়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে—'all contempt forgotten, even our pity is purged into a sense of human majesty'—তাহাও আমরা দেখিয়াছি। অতি সাধারণ প্রেম, যাহাকে অপরিপক্ক কামই বলা যাইতে পারে,—সেখানেও এই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি যেটুকু চকিত রসাস্বাদের অনুকূল হয়, তাহাও এই দেহের প্রসাদে; দেহদানের অবকাশেই অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ইংরেজী কাব্যের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

She had nor sight nor voice ; her swooning eyes
Knew not if night or light were in the skies ;
Across her beauty sheer the moon dawn shed
Its light as on a thing as white and dead ;
Only with stress of soft fierce hands she prest
Between the throbbing blossoms of her breast
His ardent face, and through his hair her breath
Went quivering as when life is hard on death ;
And with strong trembling fingers she strained fast
His head into her bosom ; till at last,
Satiate with the sweetness of that burning bed,
His eyes afire with tears, he raised his head
And laughed into her lips ; and all his heart
Filled hers ; then face from face fell, and apart
Each hung on each with panting lips and felt
Sense into sense and spirit in spirit melt.

—উপরি-উদ্ধৃত লাইন গুলিতে সম্ভোগের যে চিত্র আছে কোনও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি তাহা বরদাস্ত করিবেন না; কিন্তু ইহার মধ্যেও যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে, তাহা মানুষের পক্ষেই সম্ভব, পশুর পক্ষে নহে। ইহারই নাম পূর্ণাহুতি, এবং বিগলিত বেদ্যান্তর স্পর্শ যে রস, কবি এই দেহ-সম্ভোগের মধ্যেও তাহাকে ধরিতে চাহিয়াছেন, এ জন্য কাব্য হিসাবে এই লাইন কয়টি নির্দ্দোষ

* * *

এ প্রেমের রসিক সর্ব্বকালেই আছেন, মানুষের মানবতার মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত আছে। কিন্তু আজিকার সাহিত্যে প্রেমের নামে যে নূতন বস্তুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; রুচি ও নৈতিকতার সমর্থন লাভ করিয়াও যে আত্মপরায়ণ মনো-বিলাস—অহং-দেবতার আরাধনা, প্রেমের নামে কাব্যেরও আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অসারতা ও রসবিকার প্রদর্শন করিবার আগে কাম-প্রেমের এই বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, প্রসঙ্গ সেই জন্য দীর্ঘ হইয়া পড়িল। প্রাচীন কবির প্রেমের আদর্শ কি ছিল, তাহাতে দেহসংক্রান্ত অশ্লীলতা ও নীতিদোষ কি কারণে মার্জ্জনীয় সে আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে একখানি বহুবিখ্যাত আধুনিক কাব্যে প্রেমের আদর্শ কত উচ্চে উঠিয়াছে, এবং তাহাতে কোন্ উৎকৃষ্ট সত্য-নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাই দেখিব—সত্যকার অশ্লীলতা যে কবির কল্পনা-ভঙ্গির উপরেই নির্ভর করে, তার জন্য দেহ ততটা দায়ী নয় যতটা মন; এবং কাব্যে দুর্নীতি বলিয়া যদি কিছু থাকে তার কারণ দেহের সঙ্গে মনের লুকাচুরী—আশা করি, আমার এই প্রধান বক্তব্য তাহাতেই পরিসমাপ্ত হইবে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

ঘুমন্ত শিশু।—প্রদর্শনী বিভাগ দ্রষ্টব্য।

ব্রুন্‌হিল্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। সিগুর্ড ও ব্রুন্‌হিল্ডের মর্ম্মান্তিক দুঃখ, এবং উভয়ের মৃত্যু

খুব ঘটা করিয়া গুন্নার ব্রুন্‌হিল্ডকে বিবাহ করিল—ব্রুন্‌হিল্ডও মন্ত্রচালিত-মত সমস্ত ব্যাপারে অংশ-গ্রহণ করিল। বিবাহ-উৎসব চুকিয়া গেলে পরে, ব্রুন্‌হিল্ডের সহিত মিলনের পূর্ব্ব-কথা সিগুর্ডের স্মরণে আসিল ; কিন্তু এখন আর পথ নাই—সমস্ত কথা মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া সিগুর্ড আর সকলের সহিত দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু ব্রুন্‌হিল্ড ও সিগুর্ড উভয়েরই মনের ভিতরে নিদারুণ অস্বস্তি ও অশান্তি। গুন্নারের বেশ ধরিয়া যখন আগুন ভেদ করিয়া সিগুর্ড ব্রুন্‌হিল্ডকে জয় করিয়া ফিরিয়া আসে, তখন সিগুর্ড সমস্ত কথা পত্নী গুডরুনকে বলিয়াছিল। সুতরাং গুডরুন সব রহস্য জানিত। এক দিন ব্রুন্‌হিল্ড ও গুড্‌রুন্ উভয়ে রাইন নদে স্নান করিতে গেল। সেখানে দুই জনের মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে কাহার স্বামী শ্রেষ্ঠতর, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ ও শেষে কলহ হইল। ব্রুন্‌হিল্ড বলিল যে গুন্নারের মত বীর আর কেহ নাই, কারণ গুন্নার অগ্নি-প্রাচীর পার হইয়া তাহার মত বীরাঙ্গনাকে জয় করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে স্বামি-গর্ব্বে গর্ব্বিতা গুডরুন্ ক্রুদ্ধা হইয়া সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল ; অধিকন্তু আন্দবারির আঙ্গটী, যে আঙ্গটী সিগুর্ড প্রথম ব্রুন্‌হিল্ডকে দেয় ও পরে গুন্নার-বেশী সিগুর্ডকে ব্রুন্‌হিল্ড প্রত্যর্পণ করে, তাহা গুডরুনের কাছে সিগুর্ড রাখিয়াছিল, সেই আঙ্গটীও অভিজ্ঞান-স্বরূপ গুডরুন্ ব্রুন্‌হিল্ডকে দেখাইল। আঙ্গটী দেখিয়া ব্রুন্‌হিল্ডের মুখ ক্রোধে মৃত্যুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল, আর কোনও কথা বলিল না। তাহার মনে এই ধারণা হইল যে সিগুর্ড সজ্ঞানে তাহাকে অপমানিত করিয়াছে—গুড্‌রুনের জন্য-ই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

ব্রুন্‌হিল্ডের নিদ্রা গেল, বিশ্রাম গেল। প্রাচীন গাথায় তাহার অবস্থা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"তার সারা জীবনে সে দুঃখ পায় নাই ;
মানুষের মধ্যে যে অশান্তি, তার কিছুই সে জান্‌ত না।
তার অপযশ কখনও হয় নি,—অপযশ সহা তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল ;
কিন্তু তাদের (উভয়ের) মধ্যে ভাগ্যদেবীগণ কার্য্য ক'রলেন,—তাঁরা নিষ্ঠুর।

দিনের শেষে সে একলা ব'সে থাক্‌ত,
আর এইরূপ বিলাপে সে হৃদয় উন্মুক্ত ক'র্‌ত ;—
'তরুণ বীর সিগুর্ড্‌কে আমার চাই-ই—
আমার দুই বাহুপাশে যদি তার মৃত্যু হয়, তবুও তাকে চাই।
আমার মনের কথা এই, আমি প্রকাশ ক'রছি ; এর জন্য আমাকে অনুতাপ ক'রতে হবে ;
ওর স্ত্রী হ'চ্ছে গুড্‌রুন, আর আমি হ'চ্ছি গুন্নারের অধীন ;
হায় হায়! পাপ ভাগ্যদেবীত্রয় আমার মনে কি অপূর্ণ প্রেমই না দিয়েছে!'

বেদনাতুর হৃদয়ে সে বার বার ঘরের বাইরে চ'লে যেত,
রাত্রিবেলায় সে পাহাড়ে বরফের নদীর ধারে ঘুর্‌ত—
সে সময়ে গুড্‌রুন্ গিয়ে তার শয্যায় শয়ন ক'র্‌ত,
আর সিগুর্ড তার স্ত্রীর গায়ের চারিদিকে শয্যা-বস্ত্র গুছিয়ে দিত।
'গিউকির কন্যা তার স্বামীর কাছে গিয়েছে—
বীর সিগুর্ড এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে মনের আনন্দে র'য়েছে।
একা আমি নিরানন্দ, আমার ধর্ম্ম-সাক্ষী পতি নেই—
দুঃখের ভারে পীড়িত আমার হৃদয় ফেটে যেন আর্ত্তনাদ বা'র হ'তে চাচ্ছে।'"

ব্রুন্‌হিল্ড শয্যা আশ্রয় করিল। ব্রুন্‌হিল্ডের অসুখের কথা শুনিয়া গুন্নার তাহাকে দেখিতে আসিল। তাহার কুশলপ্রশ্নের কোনও উত্তর ব্রুন্‌হিল্ড দিল না ; শেষে ক্রোধ-স্ফুরিত কণ্ঠে বলিল—"যে আমাকে অগ্নিমালার মধ্য থেকে জয় ক'রে নিয়ে যাবে তাকেই আমি বিবাহ ক'রবো, এই ছিল আমার ব্রত। বীর সিগুর্ড আমাকে এইভাবে এসে প্রথমে ধর্ম্মপত্নীত্বে বরণ ক'রে যায় ; সিগুর্ড ড্রাগন ফাফনিরকে বধ ক'রেছে, সে পাপী রেগিন্‌কে মেরেছে, সে বিখ্যাত যোদ্ধা, সে নরশ্রেষ্ঠ। আর তুমি গুন্নার নীচ প্রকৃতির, মিথ্যাচারী,—তুমি কোনও শূরোচিত কাজ করোনি, তুমি মৃত-জনের মত বিবর্ণ-মুখে পালাও। আমি জান্‌তুম যে সিগুর্ড ছাড়া আর কেউ

অগ্নি ভেদ করে আমার কাছে আস্‌তে পারবে না, তাই আমি আমার ব্রত প্রচার করি যে যে আমায় ঐ ভাবে জয় করবে তাকেই বিবাহ ক'রবো। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে যে কথা ব'লেছি, তুমি তাথেকে আমায় নিপাতিত ক'রেছ। আমার সিগুর্ডকে তোমরা আমার হ'তে দাওনি—আমি এই জন্য তোমাকে হত্যা ক'র্‌বো; আর গ্রিম্‌হিলডের মত পাপীয়সী হৃদয়হীনা স্ত্রীলোক আর কেউ নেই, আমি তার এই পাপাচরণের প্রতিশোধ নেবো।"

গুন্নার বলিল—"তুমি অতি কুপ্রকৃতির স্ত্রীলোক, তুমি মিছামিছি একজন সর্ব্বজন-মাননীয়া স্ত্রীলোককে গা'ল দিচ্ছ।"

ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—'আমি গোপনে কখনও কু-মতলব আঁটি নি—কোনও অনুচিত কাজও করি নি; কিন্তু তোমাকে আমি বধ ক'রবো।'

ব্রুন্‌হিল্ড এই বলিয়া গুন্নারকে বধ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু গুন্নারের ভাই হোগনি আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। গুন্নারের মনে ব্রুন্‌হিল্ডের প্রতি একটা সম্ভ্রম ও আকর্ষণ ছিল, সে বলিল, "ব্রুন্‌হিল্ডকে বেঁধে রাখা হয়, আমি তা চাই না।" মিষ্ট কথায় সে ব্রুন্‌হিল্ডকে তুষ্ট করিতে চাহিল।

ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"আমায় বেঁধে রাখুক না রাখুক, তোমার সহানুভূতি চাই না। আর আমাতে কখনও আনন্দের ভাব দেখ্‌বে না, কখনও আর মিষ্ট কথা এ বাড়ীতে কেউ শুন্‌বে না—কাপড়ে সোনার কাজ করা—কার্য্যে পরামর্শ দেওয়া আর আমা হ'তে হবে না। আমি সিগুর্ডকে পেলুম না—আমার দুঃখ কি বুঝ্‌বে!"

তার পরে ব্রুন্‌হিল্ড তাহার আরব্ধ যত শিল্প-কার্য্য টানিয়া ছিঁড়িয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল—ঘরের দরজা খুলিয়া দিল—বহু দূর পর্য্যন্ত তাহার বিলাপের ধ্বনি শোনা গেল। গুডরুনের দাসীরা আসিয়া ব্রুন্‌হিল্ডকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গুডরুন্‌কে তাহার কাছে যাইতে বলিল। গুডরুন বলিল—"না, না, আমি তো মোটেই তার কাছে যেতে পারিনা, তাকে জাগাতে বা তার সঙ্গে কথা কইতে পারিনা। কত দিন হ'ল সে মধু বা অন্য পানীয় পান করে নি—নিশ্চয়ই দেবতাদের রোষ তার উপরে প'ড়েছে।" গুড্‌রুন ভ্রাতা গুন্নারকে বলিল—"তুমি যাও, আর তাকে বলো যে আমি তার দুঃখে বিশেষ দুঃখ অনুভব ক'রছি।" গুন্নার বলিল—"না, তার কাছে এখন আমার যাওয়া বারণ, তার সুখদুঃখে ভাগ নেওয়ার আমার অধিকার নেই।" তথাপি গুন্নার ব্রুন্‌হিল্ডের নিকট গেল, কিন্তু অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াও ব্রুন্‌হিল্ড্‌কে কথা কহাইতে পারিল না। বিফল-মনোরথ হইয়া গুন্নার হোগনিকে পাঠাইল, ব্রুন্‌হিল্ড হোগনির সঙ্গেও কথা কহিল না। তাহারা তখন সিগুর্ডকে অনুরোধ করিল, সে গিয়া যদি ব্রুন্‌হিল্ডকে শান্ত করিতে পারে। সিগুর্ড তাহাদের কথার কোনও উত্তর দিল না।

এই ভাবে দুই চারি দিন যাইতে সিগুর্ড গুড্‌রুনকে ডাকিয়া বলিল—"দেখে শুনে মনে হ'চ্ছে, এই ব্যাপার থেকে একটা ভীষণ কিছুর উদ্ভব হবে, আর ব্রুন্‌হিল্ড প্রাণ দেবে।" গুডরুন বলিল, "প্রভু, তার চারি দিক ঘিরে অপার্থিব ব্যাপারের লীলা চ'লছে— সাত দিন ধরে সে যেন ঘুমোচ্ছে, কেউ তাকে জাগাতে বা কথা কওয়াতে পার্‌ছে না।" সিগুর্ড বলিল—"না, ঘুমোচ্ছে না; আমার মনে হয়, আমারই সম্বন্ধে একটা ভয়ানক কিছু সে ক'রবে।" এই কথা শুনিয়া গুড্‌রুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার বালাই দূরে যাক্! তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করো; কথা ক'য়ে দেখ, তার ক্রোধ শান্ত হবার মত কি না। তাকে যত রত্নালঙ্কার দাও—তার মনের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করো।"

ঘরের দরজা খোলা; সিগুর্ড ব্রুন্‌হিল্ডের ঘরে গেল। তাহার মনে হইল, যেন ব্রুন্‌হিল্ড নিদ্রিতা। সে বলিল—"জাগো, ব্রুন্‌হিল্ড, সারা বাড়ী রোদ্দুরে ভ'রে গিয়েছে, খুব তুমি ঘুমিয়েছো; দুঃখ ক'রো না—মনে আনন্দ আনো।" ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"কি সাহসে তুমি আমার কাছে এসেছো? এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যাপারে তোমার চেয়ে পাতকী কেউ নেই।" সিগুর্ড বলিল—"তুমি আর পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কইবে না? এত দুঃখ তোমার কিসের?" ব্রুন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"উঃ, তোমাকে আমার দুঃখের কারণ বুঝিয়ে ব'লতে হবে!" সিগুর্ড—"তুমি এখন মন্ত্র-চালিতের মত হ'য়ে আছ; তোমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব আমার কিছুই নেই; তুমি অন্ততঃ একজন বীর স্বামীকে বরণ ক'রেছ তো!" ব্রুন্‌হিল্ড বলিল—"না না, গুন্নার কখনও আগুনের মধ্য দিয়ে যায় নি, আর লড়াইয়ে শত্রু নিপাত করে নি। আমার প্রাসাদের অগ্নিমালা

১। সিগুর্ড্ ও ব্রুন্‌হিল্ড্।

১। মৃত সিগুর্ড ও গুড্রুন। [Franz Stassen কর্তৃক অঙ্কিত

১। সিগুর্ডের হত্যা। ২। ক্রুন্‌হিল্ডের মৃত্যু। [Franz Stassen কর্তৃক অঙ্কিত
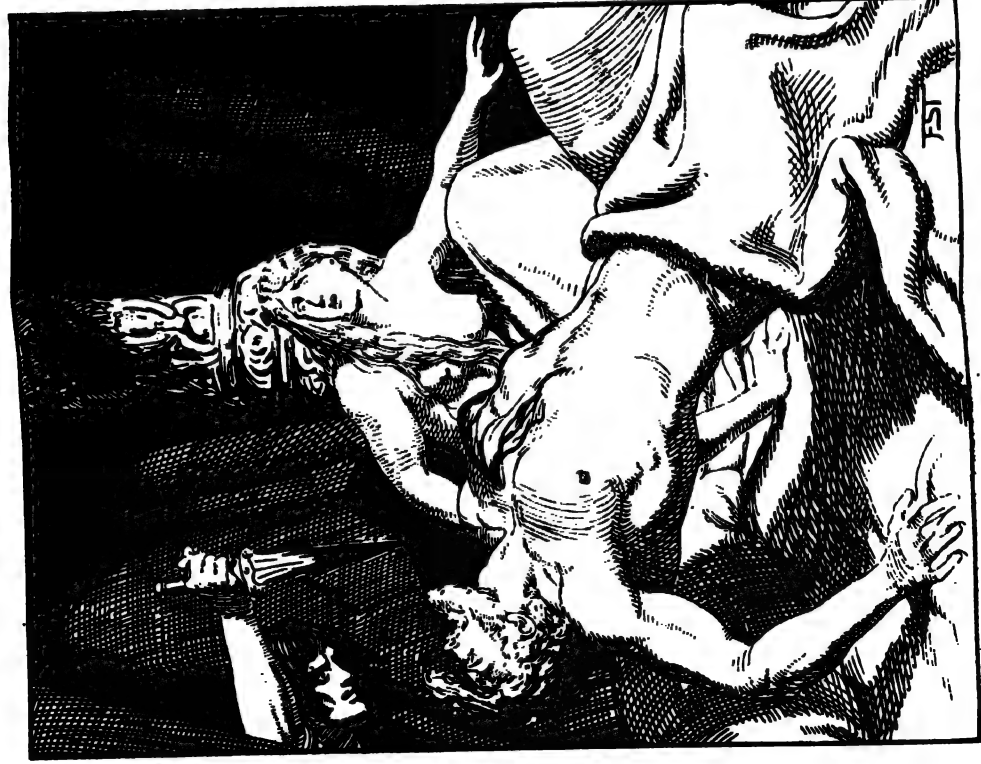
উল্লঙ্ঘন ক'রে কে এল, আমি বিস্মিত হ'য়ে ভাবছিলুম; মনে হ'য়েছিল, অচেনা গুন্নারের বেশে এলেও আমি যেন তোমারই চোখের চাউনি দেখছি; কিন্তু আমার অদৃষ্ট —আমার ভাগ্যের উপরে যে বিষম কুহেলিকা প'ড়েছিল তাতে সব আমার চোখে অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, ভাল মন্দ আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।"

সিগুর্ড তবুও গুন্নারের পক্ষ লইয়া দুই এক কথা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"তার অন্যায় আর মিথ্যাচারের জন্য সাজা হওয়া উচিত। আমার দুঃখের কথা ভেবো না; কিন্তু দেখ সিগুর্ড, তোমার কি মনে হ'ল না যে তুমি আমার জন্যই যে ড্রাগন ফাফনির্‌কে মেরেছিলে, আমার জন্যই যে আগুনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলে; তুমি গিউকির ছেলেদের সেবার জন্য তো করো নি।"

সিগুর্ড বলিল; "সে কথা থাক্; এখন তো আমি তোমার স্বামী নই, তুমিও আমার স্ত্রী নও।" ক্রন্‌হিল্ড উত্তর দিল—"আমি কখনও এমন চোখে গুন্নারের দিকে তাকাই নি যাতে আমার মনে আনন্দ আস্‌তে পারে; তার সম্বন্ধে আমি অন্তরে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করি।"

সিগুর্ড বলিল—"এমন উদার-হৃদয় রাজা—একে তুমি ভাল বাস্‌তে পারো না?"

সিগুর্ডের এই কথায় ক্রন্‌হিল্ড শুধু বলিল, "তোমার রক্তে নিষ্ঠুর তরবারী যে কেন রঞ্জিত হ'চ্ছে না, এখন এই হ'ল আমার কাছে বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।"

সিগুর্ড বলিল—"তার জন্য চিন্তা তুমি ক'রো না; আমার শেষ হ'লে তুমিও আর বাঁচতে পার্‌বে না; বুঝছি, আজ থেকে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার আর আমার দু'জনেরই শেষ।"

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"তোমার কথাগুলো আমায় কতটা বিঁধ্‌ছে তুমি বুঝতে পারছ না? তুমি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছ, আমার সব সুখ শান্তি তুমি দূর ক'রেছ—আমার কাছে আর জীবন-ই বা কি আর মরণ-ই বা কি? তুমি এখনও আমায় চিন্‌লে না, আমার হৃদয়কেও বুঝলে না! তুমি তো হ'চ্ছ পুরুষদের মধ্যে প্রথম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—আর আমি হ'য়ে গেলুম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য।"

এইবার সিগুর্ড বলিল—"সত্য কথা শোনো; তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভাল বেসেছি; কিন্তু আমি ভীষণ মায়াজালে জড়িয়ে প'ড়েছিলুম, সে মায়াজাল থেকে আমাদের দুজনের এ জীবনে আর উদ্ধার নাই। যখন আমি সব ব্যাপার বুঝতে পারলুম, তখন আমি বুঝলুম, জীবনে আমার কি দুঃখ—তোমাকে পেয়েও হারালুম। কিন্তু আমি যথাশক্তি মনকে দৃঢ় ক'রে দুঃখের বোঝা মনের মধ্যেই রাখলুম। মনে এই টুকুও হ'চ্ছিল,—যাক্, তুমি তো আছ, আর আমার কাছে কাছেই আছ। যা ভবিতব্য, তা হ'য়েছে; যা হবার, তা হবেই—আমার তার জন্য ভয় বা চিন্তা নেই।"

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"আর এখন তোমার দুঃখের কথা ব'লে লাভ কি? তোমার জন্য আর আমার মায়া-মমতা নেই।"

সিগুর্ড বলিল—"তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারি না। এখনও বলো, তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?"

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"ওরকম কথা আর মুখে এনো না। দ্বিচারিণী হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। গুন্নারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে নিজেই ম'র্‌বো।

তার পরে ক্রন্‌হিল্ড পূর্ব্ব কথা স্মরণ-পথে আনিল—প্রথম সাক্ষাতে পাহাড়ের উপরে তারা দুইজনে কি ভাবে মিলিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে পরস্পরকে পতিপত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

—"এখন সে সব চুকে গিয়েছে। আমি আর বাঁচতে চাই না।"

সিগুর্ড বলিল—"আমার প্রাণের দুঃখ এই, যে তোমার বিবাহ হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমায় দেখেও আমি তোমাকে চিন্‌তেও পারি নি, আর তোমার নামও আমার মনে আসে নি।"

তখন ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"আমার ব্রত ছিল, যে আগুনের দেওয়াল পেরিয়ে আমার কাছে আস্‌বে, তারই স্ত্রী হ'য়ে থাকবো। আমার সে ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে; আমি এ প্রাণ আর রাখবো না।"

সিগুর্ড বলিল—"দেখ, তুমি ম'র্‌বে কেন? তার চেয়ে আমি গুডরুন্‌কে ত্যাগ করি, আর তার পরে তোমায় আবার বিবাহ ক'রবো।"

এই সব কথায় সিগুর্ডের বক্ষোমধ্যে যে অসহ্য কষ্ট হইতেছিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার মত

হইল—তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষঃস্থলের চাপে তাহার গায়ের সাঁজোয়ার লোহার আঙ্গটাগুলি ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"তোমায় চাই না! কারুকেও আমি চাই না!"

তখন সিগুর্ড আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

প্রাচীন গাথায় আছে—

"তখন সিগুর্ড বাহিরে চলিয়া গেল—
সিগুর্ড, মহান্ রাজার প্রিয় বন্ধু;
এই আলাপের ফলে, এবং তাহার মহৎ দুঃখের ফলে
কি নিস্প্রভ, এবং কি কাতর হৃদয়ে চলিয়া গেল!

"তাহার গায়ের সানা—
লোহার আঙ্গটায় তৈয়ারী তাহার সানা
দুই দিক্‌কার পাঁজরার চাপে ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—
যুদ্ধে সাহসী বীর সিগুর্ডের।"

সিগুর্ড বাহিরে আসিতেই গুন্নার জিজ্ঞাসা করিল ক্রন্‌হিল্ড কথা কহিতেছে কিনা। সিগুর্ড বলিল যে কথা সে খুবই কহিতেছে। তখন গুন্নার ভিতরে গিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং বলিল যে যাহা করিলে সে একটুও খুশী হয়, গুন্নার সানন্দে তাহা করিবে।

ক্রন্‌হিল্ড বলিল—"সিগুর্ডের মৃত্যু চাই।"

গুন্নারের মনে বিদ্বেষ-ভাব আনয়ন করিবার জন্য ক্রন্‌হিল্ড সিগুর্ডের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিল যে গুন্নারের বেশে সিগুর্ড তাহার প্রতি পতিবৎ ব্যবহার করিয়াছে।

তারপরে ক্রন্‌হিল্ড বাহিরে চলিয়া গেল, এবং প্রাসাদের প্রাচীরের তলে বসিয়া বসিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। সিগুর্ড আর তাহার হইবে না, এই কথা চিন্তা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে পৃথিবীর সব জিনিস তাহার কাছে বিষবৎ বোধ হইতেছে।

গুন্নার পুনরায় তাহার কাছে আসিতে সিগুর্ডের প্রাণ লইবার জন্য ক্রন্‌হিল্ড তাহাকে প্ররোচিত করিল। সিগুর্ড বাঁচিয়া থাকিতে সে কিছুতেই গুন্নারের স্ত্রীরূপে বাস করিবে না।

গুন্নার ভাবিল, সিগুর্ড আমার হিতৈষী বন্ধু, পাতানো ভাই—কিন্তু ক্রন্‌হিল্ড-ই জগতের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু, সমস্ত রমণীগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী—তার জন্য প্রাণও দেওয়া যায়, বন্ধু কোন্ ছার।

সে ক্রন্‌হিল্ডকে খুশী করিবার জন্য সিগুর্ডকে হত্যা করাই স্থির করিল। এ বিষয়ে সে ভ্রাতা হোগনির সহিত পরামর্শ করিল। হোগনি তাহাকে ভগ্নী-পতি ভ্রাতৃকল্প সিগুর্ডের বধ রূপ মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, অনেক উপদেশ দিল। কিন্তু গুন্নার তখন ক্রন্‌হিল্ডকে পাইবার ও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য পাগল, সে কৃত-নিশ্চয়। রাগ করিয়া হোগনিকে বলিল, "সিগুর্ড না ম'রলে আমিই ম'রবো।"

শেষে গুন্নার ও হোগনি স্থির করিল যে তাহাদের দুইজনের কেহ সিগুর্ডকে প্রাণে বধ করিবে না, কারণ তাহার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক পাতাইয়াছে। তাহারা তাহাদের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা গুট্টোর্‌ম্‌কে অর্থ-লোভ দেখাইয়া এই বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে রাজী করিল। যাহাতে এই ভীষণ কার্য্যে তাহার মতি স্থির থাকে, তজ্জন্য গুট্টোর্‌ম্‌কে তাহারা দুইজনে সাপের মাংস ও নেক্‌ড়ে-বাঘের মাংস খাওয়াইতে লাগিল। গুট্টোর্‌ম্ অবশেষে সিগুর্ডকে বধ করিবে স্থির করিল।

সিগুর্ড এ-সব ব্যাপার কিছু জানিত না। রাত্রে সে স্ত্রী গুডরুনের সহিত নিজ ঘরে বিছানায় শুইয়া আছে। গুট্টোর্‌ম্ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুই দুইবার তাহার সাহস হইল না—সিগুর্ড জাগিয়া ছিল, সিগুর্ডের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও ছিল না। তৃতীয় বার সে দেখিল, সিগুর্ড ঘুমাইতেছে; তখন সে ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত সিগুর্ডের বক্ষে নিজ তরবারী আমূল বিঁধাইয়া দিল—তাহার দেহ ভেদ করিয়া তরবারী বিছানার কাঠে গিয়া ঠেকিল। এই মরণ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সিগুর্ড জাগিয়া উঠিল, এবং হাতের কাছে তাহার নিজের তরবারী পাইয়া তাহা পলায়মান গুট্টোর্‌মের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল; এই আঘাতের চোটে গুট্টোর্‌মের দেহ দুই খানা হইয়া গেল—তাহার ধড় ও মাথার দিক ঘুরিয়া ঘরের ভিতরে পড়িল, ও পায়ের দিক ঘরের বাহিরে পড়িল।

গুডরুন্ সিগুর্ডের পাশেই নিদ্রিত ছিল, এই ব্যাপারে জাগিয়া উঠিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা বর্ণনার অতীত; স্বামীর রক্তে তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গেল, পাগলের মত সে আর্ত্তনাদ

করিয়া উঠিল; এত জোরে সে হাত কচলাইতে লাগিল যে অশ্বশালের ঘোড়াগুলি ভয়ে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের হাঁস ও অন্য পাখীরাও কলরব করিয়া উঠিল। সিগুর্ড অতি কষ্টে উঠিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাকে মারিয়া গিউকির পুত্রেরা যে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বলিল:—"আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হ'য়েছিল, যে অল্প বয়সেই আমি ম'র্‌বো, তা ঘ'ট্‌ল; ভবিতব্য আমার চোখের আড়ালে গুপ্ত হ'য়ে ছিল,—কেউই অদৃষ্টের বিরুদ্ধে ল'ড়ে জিততে পারে না। যে ক্রনহিল্ড আমাকে সকলের চেয়ে ভালবাসে, সেই ক্রনহিল্ডের জন্যই আমার প্রাণ গেল। আমি কিন্তু গুন্নারের কোন ক্ষতি করি নি। আগে যদি টের পেতুম, আর অস্ত্র হাতে খাড়া থাক্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে এই ভাবে শুয়ে শুয়ে ম'রতুম না,—তিন ভাইও আমার হাতে শেষ হ'ত, আর অনেকেও শেষ হ'ত। সব চেয়ে বিশাল ষাঁড় বা বৃহৎ বরাহ বধের চেয়ে আমাকে বধ করা আরও গুরুতর ব্যাপার হ'ত।"

এই প্রকারে কথা বলিতে বলিতে সিগুর্ড প্রাণত্যাগ করিল।

ওদিকে গুডরুনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ক্রনহিল্ড অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিল। গুন্নার বলিল—"কি নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক! তোমারও দিন শেষ হ'য়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

ক্রনহিল্ড বলিল—"এখনও রক্তপাত সাঙ্গ হয় নি!"

গুডরুন সিগুর্ডের মৃতদেহের পার্শ্বে পাষাণমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। অন্য স্ত্রীলোকের মত সে বিলাপ করিল না, কিন্তু তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। স্ত্রীলোকের প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের শোকতাপের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—সব চেয়ে বেশী দুঃখ যাহা পাইয়াছে তাহার কথা গুডরুন্‌কে শুনাইল: কাহারও পতি পুত্র ও ভ্রাতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, বা সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ বা বন্দিনী হইয়া কাল কাটাইয়াছে, কাহাকেও বা ক্রীতদাসী করা হইয়াছে। কিন্তু গুডরুন্ কাঁদিতে পারিল না; পাথরের মত হৃদয় করিয়া মৃতদেহের পাশে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে একজন স্ত্রীলোক সিগুর্ডের মুখ-ঢাকা চাদরখানা খুলিয়া দিল। গুডরুন চাহিয়া দেখিল—তাহার বীর স্বামীর সোনালী রঙের সুদীর্ঘ কেশ-পাশে রক্ত লাগিয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ঘোলা হইয়া গিয়াছে, বুকে তরবারী বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িল, মাথার খোঁপা আল্‌গা হইয়া চুল খুলিয়া পড়িল, তাহার মুখ ফুলিয়া উঠিল, এবং অশ্রুজলের ঝড় যেন বহিয়া তাহার জানুদেশ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল।

নিহত সিগুর্ড [F. Leeke অঙ্কিত

ক্রনহিল্ড মরিবার সংকল্প করিয়াছিল। এখন সে গুন্নারকে ও গুন্নারের গোত্রকে শপথ-ভঙ্গকারী বলিয়া অভিশাপ দিল—সিগুর্ডের গুণাবলী বর্ণন করিল—কি ভাবে তাহার সঙ্গে ও সিগুর্ডের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করা হইয়াছিল তাহাও বলিল। গুন্নার উঠিয়া দুই বাহু দ্বারা ক্রনহিল্ডের গলা জড়াইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল,—আর সকলে আসিয়া ক্রনহিল্ডকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রনহিল্ড সকলকে সরাইয়া দিল। গুন্নার তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় প্রচুর স্বর্ণ-সম্ভার আনাইয়াছিল, সে সমস্ত সে

উপস্থিত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া বিতরণ করিল। তার পরে সে গুন্নারকে শেষ অনুরোধ জানাইল, তাহার মৃত্যুর পরে তাহাকে যেন তাহার প্রিয়তম সিগুর্ডের সঙ্গে পাশাপাশি এক চিতায় দাহ করা হয় (প্রাচীন টিউটনগণের মধ্যে মৃতের অগ্নি-সংস্কার হইত), এবং তাহাদের দুইজনের মধ্যে যেন সিগুর্ডের তরবারীখানি ব্যবধান-স্বরূপ রাখা হয়—তাহারা দুইজনে একসঙ্গে Walhalla বা দেবলোকে বীরপুরুষগণের স্বর্গে সগৌরবে যাইবে।

এই প্রার্থনা জানাইয়া, ব্রুন্‌হিল্ড একখানি তরবারী লইয়া আমূল নিজ বক্ষে বসাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সমাজে বীর সিগুর্ড ও দেবী ব্রুন্‌হিল্ডের অবিনশ্বর প্রেমের এইরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল।

৬। গুড্‌রুনের কথা; গুড্‌রুনের ভ্রাতৃদ্বয় এবং নিব্‌লুঙ্গ্‌ কুলের বিনাশ

এই সকল ভীষণ ব্যাপারের অবসানে নিবলুঙ্গ রাজকুল হইতে সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইল। গুডরুন্ পতি-শোকে মুহ্যমান হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হুণদিগের রাজা Atli আট্‌লি[৪] নিবলুঙ্গ-রাজের বিধবা কন্যা বলিয়া গুডরুনের পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। গুডরুন্ এই বিবাহে আপত্তি করিল। শীঘ্রই আবার একটা ভীষণ রক্তারক্তি হইবে ইহা সে অনুভব করিতেছিল। গুডরুনের মাতা গ্রিম্‌হিল্ড আবার তাঁহার যাদুবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন, তিনি মন্ত্রপূত পানীয় গুডরুন্‌কে পান করাইয়া পূর্ব্ব-কথা তাহার মানস-পট হইতে দূর করিয়া দিলেন, বিশেষতঃ সিগুর্ডের স্মৃতির প্রতি তাহার আকর্ষণ ভুলাইয়া দিলেন। আট্‌লির সহিত গুডরুনের বিবাহ হইয়া গেল।

গুডরুন্‌কে বিবাহ করিয়া আট্‌লির উদ্দেশ্য ছিল যে সিগুর্ড ফাফনির্‌-কে মারিয়া যে স্বর্ণ-ভাণ্ডার পাইয়াছিল গুডরুনের সঙ্গে সঙ্গে আট্‌লি নিজে তাহারও অধিকারী হইয়া বসিবে। কিন্তু এই স্বর্ণ-ভাণ্ডার গুডরুনের ভ্রাতৃদ্বয়, গুন্নার ও হোগনি দখল করিয়া বসিয়াছিল। আট্‌লি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে সপরিজনে গুন্নার ও হোগনিকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিল। গুন্নার ও হোগনি বুঝিতে পারিল যে এই আহ্বান মৃত্যুর আহ্বান, কিন্তু বীরোচিত দম্ভের সহিত এই আহ্বান তাহারা উপেক্ষা করিল না, নানা অনিমিত্ত দর্শন করিয়া ভীতও হইল না—তাহারা সদর্পে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। যাইবার পূর্ব্বে তাহারা সিগুর্ডের ধনরত্ন রাইন-নদের জলে ডুবাইয়া দিয়া গেল--জলের ধনরত্ন পৃথিবীতে অনেক অনিষ্ট, রক্তপাত ও হত্যা সাধন করিয়া আবার জলে গেল। তাহারা নদীপথে হূণ-রাজার রাজধানীতে পহুঁছিয়াই তাহাদের নৌকা ভাসাইয়া দিল – তাহারা যে ফিরিবে না একথা যেন জানিত।

একটী প্রাসাদে তাহাদের থাকিতে দেওয়া হইল। সেখানে আট্‌লির লোকেরা তাহাদের আক্রমণ করিল। গুডরুন্‌ও ভাইয়েদের অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আসিল, বর্ম্ম পরিয়া তাহাদের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিল। কিন্তু নিবলুঙ্গদের সকলেই একে একে হত ও আহত হইয়া পড়িল, এবং আট্‌লির লোকেরা গুন্নার ও হোগনিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিল।

আট্‌লি গুন্নারকে জিজ্ঞাসা করিল, সিগুর্ডের ধনরত্ন কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। গুন্নার বলিল—"আগে হোগনির হৃৎপিণ্ড এনে দাও, তবে ব'ল্‌বো।"

---

[৪] আট্‌লি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বিখ্যাত হূণরাজ Attila আট্টিলা-র নাম ও কার্য্যকলাপ টিউটনদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ইউরোপ-আক্রমণকারী হূণদের সঙ্গে রোমানদের ও টিউটনদের যে মরণ-পণ সমর হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি টিউটন-জাতি ভুলিতে পারে নাই; তাহাদের জাতীয় ইতিকথার মধ্যে হূণেরা ও বিশেষতঃ রাজা আট্টিলা (স্কাণ্ডিনেভিয়ায় Atli রূপে ও জরমান ভাষায় Etzel রূপে এই নাম পরিবর্ত্তিত হয়) একটা স্থান করিয়া লয়। আট্টিলা ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে Hildico হিল্‌ডিকো নামে একজন টিউটন-জাতীয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করে, এবং বিবাহের পরের দিন তাহাকে রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয় যে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করায় অনিচ্ছুক কন্যা আট্টিলাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লয়। হূণরাজ কর্তৃক জরমান রাজকুমারী-বিবাহ ও হূণদের হাতে একটি টিউটনীয় গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিনাশ—এই দুই ব্যাপার ঐতিহাসিক, এবং এই ঐতিহাসিক কথা এই উপাখ্যানের উপাদান হিসাবে আসিয়াছে। Atli-কে আবার ব্রুন্‌হিল্ডের ভাই বলিয়া বর্ণনা করিয়া উপাখ্যানে আরও গোলমালের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তাহারা একজন ক্রীতদাসকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড আনিয়া দিল—তাহা দেখিয়াই গুন্নার বলিল—"এ তো ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ড—এখনও ভয়ে কাঁপছে।" তখন তাহারা জীবন্ত অবস্থায় হোগনির বুক হইতে হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিল; এই ভীষণ মৃত্যু বীর হোগনি হাসিতে হাসিতে সহ্য করিল। তখন গুন্নার বলিয়া উঠিল—

"এই আমার সামনে র'য়েছে কষ্টসহিষ্ণু হোগনির হৃৎপিণ্ড;
ভয়-কম্পিত ক্রীতদাসের হৃৎপিণ্ডের মতন এ একেবারেই নয়;
থালার উপরে রক্ষিত এই হৃৎপিণ্ড কত অল্পই বা কাঁপছে!
যখন এই হৃৎপিণ্ড বীরের বুকের মধ্যে ছিল, তখন আরও কম কাঁপ্‌ত॥

রাজা আট্‌লি, তুমিও লোকচক্ষু থেকে তত দূরে স'রে যাও—
তোমার বাঞ্ছিত স্বর্ণ-ভাণ্ডার থেকে তুমি যতটা দূরে থাক্‌বে॥

দেখ, আমার হৃদয়ের ভিতরে চিরতরে গুপ্ত রইল
নিব্‌লুঙ্গ্‌দের স্বর্ণ-ভাণ্ডারের খবর—এখন হোগ্‌নি যখন ম'রেছে।
আমার মনে সন্দেহ দ্বিধা-ভাব আন্‌ছিল, যতক্ষণ আমরা দুজনেই বেঁচে ছিলুম;
এখন আমার মনে আর সন্দেহ বা আশঙ্কা নেই, কারণ আমি একা বেঁচে আছি।

রোমান-জয়ী টিউটন বীরগণের প্রত্যাবর্ত্তন। [Paul Thumann অঙ্কিত

মহান্ রাইন-নদ এখন থেকে হিংসা-উদ্রেককারী স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে রক্ষা ক'রবে—
নিব্‌লুঙ্গ্‌দের সোনা, যাহা দেবতাদের দান ছিল।
জলের আবর্ত্তের মধ্যে স্বর্ণ-সম্ভার চিরতরে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রতে থাক্‌বে;
হুণবংশের ছেলেদের হাতে এই সোনা কখনও জ্ব'ল্‌বে না॥"

তখন আট্‌লি গুন্নারকে হাত বাঁধিয়া সাপের গর্ত্তে ফেলিতে আদেশ দিল, কিন্তু গুন্নারের কাছে তারের বীণা ছিল, পায়ের আঙুল দিয়া গর্ত্তের মধ্যে সেই বীণায় ঝঙ্কার দিতে লাগিল, বহুক্ষণ সাপেরা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে সাপের কামড়ে গুন্নার মরিল।

গুডরুন্ এখন পাগলের প্রায় হইয়া পড়িল। আট্‌লির ও তাহার উভয়ের দুইটি পুত্র হইয়াছিল, সে এই পুত্রদের হত্যা করিল, এবং তাহাদের মাথার খুলি হইতে পাত্র তৈয়ারী করিয়া তাহাতে করিয়া পুত্রদের রক্ত সুরার সঙ্গে মিশাইয়া আট্‌লিকে পান করাইল। রাত্রে আট্‌লির বক্ষে তীক্ষ্ণধার বর্ষা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল, এবং পরে প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দিল। কাঠের প্রাসাদের বড় বড় গুঁড়ি কাঠগুলি আগুন লাগিয়া ফাটিয়া পুড়িয়া গেল, এবং আগুনে প্রাসাদের মধ্যে যাহারা ছিল তাহাদের সকলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

শকুন্তলা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না চূতমঞ্জরী, ঝরায়ো না মিছে পুষ্পধূলি,
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
কুরুবক থাক্ কোরকে বন্ধ—হায় পিক তুমি কণ্ঠ খুলি'
গাহিবে যে সুর, আঁখি ভরপূর,
আজি কতদূর—শকুন্তলা!

মালিনীর তীরে চরণের ছায়া ঢাকিয়াছে লোভী দূর্ব্বাঘাস,
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
বন-জ্যোৎস্নার কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে বায়ু ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
মাঠেও তো নাই, বাটেও তো নাই
ঘাটেও তো নাই—শকুন্তলা।

শচীতীর্থের বারি কাঁদে আজ ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পনেতে,
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
তরল বাঁধনে রবে নাকো প্রেম—রবে প্রেম দৃঢ় বন্ধনেতে!
দূরে গেলে হায়—চোখে পড়ে যায়
তাই তো কাঁদায়—শকুন্তলা।

এখনো তাহার পরশতপ্ত অঙ্গুরী হানে অঙ্গে সুধা
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
এই যে তাহার কবরীর ফুল বক্ষে জাগায় স্মৃতির ক্ষুধা!
ভালবাসাহীন—স্মৃতি চির-দিন
বজ্রকঠিন—শকুন্তলা!

থামাও থামাও, কঠিন বাঁশরী, থাক্ বীণা বেণু, সেতার থাক্,
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
উপবন হোক্ উৎসব-হারা, অশোক পলাশ দীপ নিভাক্—
থামায়ে দে গান—কুসুমের ঘ্রাণ
জ্যোৎস্নার দান—শকুন্তলা!

অঙ্গুরীহারা একাকিনী প্রিয়া না জানি গো আজ সে কোন্ দেশে
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
সীঁথির প্রান্তে ডোবে রাঙা রবি, আঁধার ঘনায় নীরব কেশে—
রবি ডুবে যায়, আঁধার ঘনায়,
একাকী কোথায়—শকুন্তলা।

বনের আড়ালে হঠাৎচন্দ্র, নিশি নির্জ্জনে হঠাৎগীতি,
(চপলিকা, চারু নীলোৎপলা)
সকল জীবন মন্থিয়া তোলে গতজনমের সুখের স্মৃতি;
অতীত কেবল—ঘেরা আঁখিজল
রক্তকমল—শকুন্তলা!

গতদিবসের রৌদ্রকিরণে তপ্ত আজিও বনের কুঁড়ি
(চপলিকা, চারু, নীলোৎপলা)
সহসা সে কেন জাগায় অমৃত—গন্ধে যাহার ভুবন জুড়ি'
লক্ষ ভ্রমর—স্মৃতিজর্জ্জর—
গাহে মর্ম্মর—শকুন্তলা।

———

বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

চতুর্থ পর্য্যায়
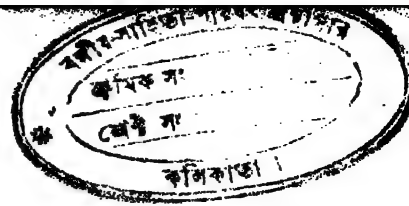
—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

মূল ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙিয়া যে-দুইটি দল হয় তাহার একটি যেমন মফঃস্বল ভ্রমণ সারিয়া আবার পুরাতন বাড়িতে পুরাতন নামে প্রতিষ্ঠিত হইল, আর একটিও তেমনই মফঃস্বলে অভিনয় দেখাইয়া পুনরায় কলিকাতায় অভিনয় দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই দল এইবারে নাম গ্রহণ করিল —গ্রেট ন্যাশনাল। উহার জন্য ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে, বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে, গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের অনুকরণে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। এই কাজের ভার ছিল ধর্ম্মদাস সুরের উপর। তিনি স্বরচিত 'আত্ম-জীবনী'তে লিখিয়াছেন :—

> ...আমার চেষ্টায় ও ভুবনমোহন নিয়োগীর পয়সায় বিডন ষ্ট্রীটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমী ভাড়া লইয়া (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) এক কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করি ও উহার নাম দেওয়া হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এই বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপ সিন ও আর দু-চারখানি সিন মিঃ গ্যারিক্‌কে দিয়া আঁকান হয়। ('নাট্য-মন্দির', ভাদ্র ১৩১৭, পৃঃ ১০৩)

১৮৭৩ সনের ২৯এ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে এই নাট্য-শালার মূলপ্রস্তর স্থাপন কার্য্য শেষ হয়। এই ব্যাপারে বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় (৩রা অক্টোবর, শুক্রবার) এই ব্যাপারের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়,—

> The National Theatre.—The ceremony of laying the foundation-stone of the 'Great National Theatre' was held on Monday at half-past four in the afternoon. The spot was well filled with a large member of educated natives. Before the commencement of the ceremony, a European band, with flags bearing the inscription, "The laying of the foundation-stone of the Great National Theatre," etc, came to the spot, playing along Beadon Street, which served to attract the attention of the passers-by, and drew them in crowds to the place. The business of the day opened with hymns, after which two of the members of the Theatrical Company cited, in a very eloquent and impressive manner, a Sanskrit passage, containing an account of almost all the great men and women of the Indian past, and lamented deeply the wretched condition of her present sons. Then Babu Nobo Gopal Mitra, the editor of the *National Paper*, who was elected to preside on the occasion, stood up and addressed the meeting in an able speech, congratulating the members on the great success

৺মনোমোহন বসু

which, after a year's trouble, they had attained in establishing the theatre on a firm footing, and he also recommended them to act such plays as would improve society. The stone was then laid, and after some music, played by the members of the Company, the ceremony was brought to a close.

নাট্যশালা সম্পূর্ণ হইতে মাস-তিনেক লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল উভয়েরই সাম্বৎসরিক উৎসব রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়; উহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে ১৮৭৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইবে বলিয়া ২৫এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

GREAT NATIONAL THEATRE
Grand Beadon Street Pavilion.
Wednesday, the 31 December 1873.
50 voices'
Welcome Song,
Accompanied with instrumental music.
The romantic, interesting and original Drama
"Kamya Kanana."
Or the
Enchanted Garden.
To conclude with the Laughable farce
"Young Bengal."
Tasteful sceneries by D. Garik.
Orchestra and Music under the leadership
of some of the real
Masters of the Sublime Art.
Dharmadas Soor,
Manager.

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম রাত্রিতেই আগুন লাগিয়া 'কাম্যকানন'-এর* অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৪, ২রা জানুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' নামক সাপ্তাহিক পত্র এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন :—

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর।—গত বুধবার রজনীতে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর নামক নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় দর্শনার্থ অনেক লোকের সমাগম হয়। দুঃখের বিষয় যে বন্দোবস্ত দোষে অনেক গুলি ভদ্র লোকে উচ্চশ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়াও আসনাভাবে মূল্য ফিরিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। ৮॥ ঘটিকার পর পঞ্চাশৎ স্বরে একটী সংগীত হইয়া 'কাম্য কানন' নামক নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সংগীতটী শ্রুতিমধুর হয় নাই। অভিনয়ের দৃশ্য গুলি যার পর নাই সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় নাটকের দোষে অভিনীত ব্যক্তি বর্গের অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। প্রথম সূচনায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক মনোনীত করা উচিত ছিল। অভিনীত বর্গের মধ্যে কথোপকথনের অংশ গুলি অত্যন্ত স্বল্প ক্ষণস্থায়ী হইলে, তাহাদের অভিনয় কোন মতেই সুন্দর হইতে পারে না। ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য গুলির পরিবর্ত্তন কালে দর্শক গণকে প্রতিবারেই বহুক্ষণ ধরিয়া যবনিকা সম্মুখীন করিয়া থাকিতে হয়। এস্থলে এই সকল দোষ সংঘটিত হওয়াতে দর্শক গণকে বিরক্ত হইতে হইয়াছিল। বিরক্তির অপর কারণ এই যে রঙ্গভূমিটী নিতান্ত প্রকাণ্ড ও অভিনীত ব্যক্তি বর্গের কণ্ঠস্বর কথঞ্চিৎ মৃদু হওয়াতে, কথা বার্ত্তা গুলি সকলের শ্রুতিগোচর হয় নাই। প্রথম অনুষ্ঠানে এ সকল দোষ অবশ্যই মার্জ্জনীয়। দুঃখের বিষয় আমরা শেষ পর্য্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে পাইলাম না। দৈবই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল। সবে পাঁচটী মাত্র দৃশ্য অভিনীত হইতে না হইতেই, নাট্যশালায় উত্তর দিকস্থ প্রবেশ দ্বারে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সকলেই মহা শঙ্কিত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যদিও নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমির যাবতীয় আলোক নির্ব্বাণ করিয়া অবশেষে উক্ত জ্বলদগ্নি নির্ব্বাপণে কৃতকার্য্য হইলেন, তথাপি অভিনয়ের পুনরধিবেশন হইল না।

প্রথম উদ্যমে, এরূপ বিঘ্ন ও অকৃতকার্য্যতা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে কর্ম্মাধ্যক্ষগণের ভগ্নোদ্যম হওয়া কখন বিধেয় নহে।

একটী বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্র বেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও কোলাহল পূর্ব্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, বেঙ্গল থিয়েটারের সভ্যগণ ইহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ এপ্রকার আগুন লাগাতে অনেকের সন্দেহ হয় যে ইহা কোন বিপক্ষ পক্ষের কার্য্য, তাহারা গ্যাসের কল টিপিয়া আলোকের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে।

---

* অমৃতলাল বসু তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Talesই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩৪)

এই দুর্ঘটনার পরদিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভিডিয়ারে সখের বাজারে (Fancy Fair) নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন। 'ভারত-সংস্কারক' (২ জানুয়ারি ১৮৭৪) লিখিয়াছিলেন :—

> গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর নাট্যশালা ৩১ এ ডিসেম্বর হইতে খুলিয়াছে। ইংরাজী নববর্ষের দিন আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রাসাদে বেলবিডিয়ারে যে শকের বাজার হইবে, তাহাতে ইহাদিগের নাট্যাভিনয় হইবে। বেশ্যাদ্বারা অভিনয় কার্য্য করেন বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটর অগ্রাহ্য হইয়াছেন।

১৮৭৪ সনের ১০ই জানুয়ারি হইতে গেট ন্যাশনাল নিজ রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অভিনয় সুরু করিলেন। এই তারিখে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' অভিনীত হয়। ১৯এ জানুয়ারি 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> কলিকাতায় বীডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেটন্যাশনেল থিয়েটর' নামে একটী নাট্যশালা খুলিয়াছে। নাট্যমন্দিরটী কাষ্ঠময় কিন্তু অতি মনোহর ও পরিপাটী হইয়াছে। গত ৩১এ ডিসেম্বরে তথায় 'কাম্যকানন' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অভিনয়টী সুসমাহিত হয় নাই। রঙ্গালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগাতে, অর্দ্ধাভিনয় সময়েই সভ্যগণ ভঙ্গ দিয়া গমন করেন। যাহা হউক আহ্লাদের বিষয় এই, অভিনেতৃবর্গ ইহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া গত ১০ই জানুয়ারিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত 'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাম্যকাননের ন্যায় এ নাটকখানি নীরস নহে। ইহার অভিনয় দৃষ্টে বোধ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল। দৃশ্য পটগুলি 'লুইস অপেরা হাউসের' ন্যায় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের 'কনসার্ট' এদেশীয় সকলেরই নিকট পরম আদরণীয় হইয়াছে।

গ্রেট ন্যাশনালে দ্বিতীয় বার অভিনয়ের পর কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (১৮৭৪, ১৫ই জানুয়ারি) যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধৃত করিবার মত। গ্রেট ন্যাশনাল সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন :—

> কলিকাতার রঙ্গভূমি।—গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের বিষয় আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। কলিকাতায় তখন উহা এক মাত্র প্রকাশ্য রঙ্গ-ভূমি ছিল। অভিনয় দর্শনানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই উহার অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমরা বলিতে পারি যে ন্যাশানেল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ আরম্ভের বৎসরেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটরের কয়েক জন অভিনেতৃ উক্ত থিয়েটর ছাড়িয়া দিয়া এক জন ধনী ব্যক্তির সাহায্যে গ্রেট ন্যাশনাল নামে আর একটী থিয়েটর স্থাপন করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যাশনাল থিয়েটরের উৎকৃষ্ট অভিনেতৃগণের কয়েক জন এ দলে আছেন, কয়েক জন অন্য দলে গিয়াছেন। দুই দলেই নূতন অভিনেতৃ আনিতে হইয়াছে। তবে ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, গ্রেট ন্যাশনালের নূতন অভিনেতৃগণ আজও সেরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণে এবং অনুপযুক্ত নাটক নির্ব্বাচন দোষে গ্রেট ন্যাশন্যাল দল প্রথম দুই রাত্রে লোকের তত মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই। গ্রেট ন্যাশনালের রঙ্গ গৃহটী অপূর্ব্ব ও চিত্র-পটগুলি সুন্দর। ন্যাশনালের নিজের গৃহ নাই ও চিত্র-পটগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গ্রেট ন্যাশনালের কনসার্টটী জাঁকাল বটে, কিন্তু উহা আমাদের শ্রুতিসুখকর হয় নাই। ইংরাজি গতে মিষ্টতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা বাঙ্গালীর কাণে শুষ্ক কর্কশ লাগে না, অনেক সময় বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। ন্যাশনালের বাগুটী অতি মনোহর। যবনিকা পড়িলে সংগীত শুনিবার লালসায় রঙ্গগৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।...

পরবর্ত্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়-সম্বন্ধে 'ভারত-সংস্কারক' (১৮৭৪, ২৩এ জানুয়ারি) লিখিয়াছিলেন :—

> ...নটবরের কালী-মন্দিরের দৃশ্যাভিনয়টী আমরা শীঘ্র ভুলিব না। ইহার স্বাভাবিক অভিনয় আমরা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। দাসী কাজলার অভিনয়ও প্রশংসনীয় বটে। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয় কালে আমরা রেনল্ড্‌স্‌কে সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার কোন বিশেষ ঘটনা কল্পনা যে প্রণয় পরীক্ষার এরূপ একটী সুন্দর দৃশ্যের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দানুভব হইল। সেই কল্পনায় সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আরও স্বসংবেদ্য হর্ষোৎপন্ন হইল। প্রথমোক্ত কালীবাড়ির দৃশ্যাভিনয়ে যেমত দর্শক মণ্ডলীর সহানুভূতি উৎপাদিত হইয়াছিল, চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যাবলীর সুন্দর অভিনয়ে লোকের কল্পনাকে তদ্রূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। তৃতীয়াঙ্কের রাম গিরি দৃশ্যের সঙ্গীতাবলী যেমন কবিত্ব পূর্ণ, তেমনি সুমধুর লাগিয়াছিল। তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য এই যে চন্দ্রকলার গীতগুলি যেন কোমল কামিনী কণ্ঠ বিনিঃসৃত বোধ হইল, তাহাতে বিশেষ ওস্তাদি ছিল না, এজন্য তাহার গীতগুলি কামিনী মুখেরই উপযোগী বটে; রসিক বাবুর গীতগুলি পুরুষকণ্ঠ নিঃসৃত তানলয় বিশুদ্ধ হওয়াতে রসিক বাবুর খ্যাতিরই উপযোগী হইয়াছিল।......

ইহার পরের সপ্তাহে, ১৮৭৪, ২৪এ জানুয়ারি গ্রেট

ন্যাশনালে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ৩০এ জানুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লিখিয়াছিলেন :—

…ধনদাস জয়পুর রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে এবং দরিদ্র বেশে চমৎকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রবেশী ধনদাস যে প্রকারে রঙ্গভূমিতে দেখা দিয়াছিল, তাহাতে সে সকলেরই অনুকম্পার পাত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সখী মদনিকা উত্তম অভিনয় করিয়াছে। দূতী এবং পুরুষবেশিনী মদনিকা উৎকৃষ্টতর। প্রথম কতিপয় দৃশ্যের অভিনয়ে ভীমসিংহ কিছুই জীবন সঞ্চার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ভীমসিংহ যত দূর চমৎকার বোধ হইল তাহা বলিবার নহে। এই দৃশ্যে তাহার প্রকৃত অভিনয়-শোভন স্বগতবাক্যে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় কুশলতা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইল। বলেন্দ্র সিংহ যখন কৃষ্ণাকে নিহত করিতে আসিতেছেন, তখন তাহার প্রবেশ যথার্থ হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।… …

এই জায়গায় দুইটি কথার উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত। গ্রেট ন্যাশনাল যখন প্রথম অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র দলে ছিলেন না। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় প্রকাশ, প্রথম রাত্রিতে অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন।* কিছুদিন পরে দুই জনেই এই দলে যোগদান করেন। আর একটি কথা এই,—স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম প্রথম পুরুষের দ্বারাই হইত, পরে অভিনেত্রী লওয়া হয়।

১৮৭৪, ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা সমারোহের সহিত গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' পত্র এই অভিনয়ের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

গ্রেট ন্যাশান্যল থিয়েটর, কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট। ২৩ এ মাঘ শনিবার ১২৮০। কপালকুণ্ডলা নাটকাভিনয়।

প্রতি শনিবারে অভিনয় খুলিয়া আমাদিগের নাট্যসমাজ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আমাদিগের নাট্যসাহিত্য অদ্যাপি এত সম্পন্ন হয় নাই, যে নাট্যসমাজের এতাধিক বুভুক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এভন-তীরবাসী কবি কহিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ জম্বু ফলের মত গুণীগণ কিছু প্রচুর পরিমাণে জন্মেন না কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আইসে, মহম্মদ অবশ্য পর্ব্বতের নিকট যাইবে। নাট্যসাহিত্য সম্পন্ন না হউক, আমাদিগের অভাব পূরণার্থ তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদিগের নাট্যসমাজের এই ইচ্ছা বলবতী। এই ইচ্ছা নিবন্ধন তাহারা সময়ে সময়ে যে কার্য্য করেন, তাহার দুই একটী ফল তিক্ত হইলেও তাহার দমন করা ভাল বোধ হয় না। এই জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের নাট্য সাহিত্যের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে পারে।

এই ইচ্ছা সম্পূরণার্থ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর এই রজনীতে কপালকুণ্ডলাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে যে রেখাটি সম্পাত হইয়াছে, অতি সুস্পষ্ট। সেই রেখাটি যাঁহারা না দেখিতে পাইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে এতদুভয়ের প্রভেদ জ্ঞান নাই। এই প্রভেদজ্ঞান না থাকিলে উপন্যাসকে কখন নাটকে পরিণত করা যায় না। কপালকুণ্ডলা যেরূপ নাটকাকারে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই প্রভেদজ্ঞান তত লক্ষিত হয় নাই। এজন্য অভিনয় কালে আমাদিগের মনে উদিত হইতেছিল, আমরা যেন বঙ্কিম বাবুরই কপালকুণ্ডলা সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয়। সে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণতা আছে, যে সৌন্দর্য্য আছে, নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল। মতিবিবি এবং কাপালিককে আমরা চিনিতে পারি নাই।

নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন ভাগগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই বুঝি নাটক প্রস্তুত হইল। উপন্যাসে যে সমস্ত কর্ত্তা বার্ত্তা থাকে, নাটকে তাহা আবশ্যক না হইতে পারে। উপন্যাসকে নাটকরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করা চাই। পরে কল্পনাকে এমত সকল অঙ্কে এবং গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র, আন্তরিক কার্য্য ও ভাব তাহাদিগের রিপুদোষ ও হৃদয়ের মহত্ত্বাব সকল এবং পরিশেষে নাট্যকাব্যের সমুদায় কল্পনার বৃহত্ত্বাবগুলি অভিনয় কালে পরিস্কৃতরূপে হৃদগত হইতে পারে। এজন্য নাটকে যে সমস্ত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইবে, উপন্যাসে তাহা না থাকিতে পারে। উপন্যাস-লেখক এমত সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করিয়া দিলেন, যাহাতে নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার সম্মিলন ঘটিল, কিন্তু নাটককার দেখাইবেন, তৎপরে ইহারা পরস্পর কেমন হৃদয়ে মিলিয়া গেল, একজন অন্যের জন্য কেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিল। উপন্যাসরচয়িতা, কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিলেন; দিয়া দেখাইলেন, একজনের চিত্তগতি এরূপ ছিল, যে অপরকে দেখিয়া তিনি কেমন স্বাভাবিক ভাবে বিমোহিত হইলেন। তৎপরে নাটককার দেখাইবেন, বিমোহিত ব্যক্তি অন্যজনের কথা-

* প্রথম অভিনয়-রাত্রে নাট্যশালায় আগুন লাগিলে দর্শকবৃন্দ বাহিরে আসিয়া মহা কোলাহল করিতে থাকে। অমৃতলাল বলিয়াছেন, সেই সময় "অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।" (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ১৩৫)

বার্ত্তায় এবং কার্য্যে কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছে। অস্ত-জনই বা বিমোহিত ব্যক্তির ভাব প্রকাশে কিরূপ ব্যথিত বা অব্যথিত হইতেছে। ব্যথিত অব্যথিত হইয়া কিরূপ কার্য্য করিল।

নবকুমারকে যথার্থ যখন কাপালিক লইয়া যাইতেছে, তখন সহসা কপালকুণ্ডলা যখন নবকুমারের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল, তাহাতে নবকুমারের বিস্ময়-ভাব পাঠকেরও মনে উপন্যাসিক সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপন্যাসরচয়িতা ইহার পূর্ব্বকার একটি দৃশ্য নাটক-কারের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। নাটককার সেই শ্মশান দৃশ্যে দেখাইতে পারিতেন, কপালকুণ্ডলা কিরূপে কাপালিকের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়াছিল, অবগত হইয়া কাপালিককে তিনি কি বলেন, এবং কাপালিকও বা কি প্রকার ভয়ঙ্কর প্রত্যুত্তরে কপালকুণ্ডলাকে নিরস্ত এবং ভয়সঙ্কুলা করেন। কিন্তু আমাদিগের নাটককার সে দৃশ্যটী কল্পনা করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, উপন্যাস এবং নাটকের এইরূপ প্রভেদ সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা সে বিষয় জানিতে চান, উত্তমোত্তম নাটক এবং উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া দেখুন, পাঠ করিয়া উভয়ের প্রকৃতি ও কবিত্ব বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। কপালকুণ্ডলা নাটকের অধিকাংশে আমরা উপন্যাসের ভাব বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি; কেবল শেষ অঙ্কে কিয়ৎপরিমাণে নাট্য ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে একটী দূষিত ধর্ম্ম নৈতিক উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে।……কিন্তু আমাদিগের নাটককারও এ বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই। তিনি উপন্যাসের কল্পনাটি প্রদর্শন করিতে গিয়া সেই বিষময় অদৃষ্টবাদও তন্মধ্যে সংগ্রথন করিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মতটি অনায়াসে পরিবর্জ্জিত হইতে পারিত।

১৮৭৪, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পর-পর চারিটি শনিবারে নিম্নলিখিত নাটকগুলি অভিনয় করিবেন বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন দেন :—

১৪ই ফেব্রুয়ারি	…	কপালকুণ্ডলা
২১এ "	…	মৃণালিনী
২৮এ "	…	নগরের নবরত্ন সভা
৭ই মার্চ্চ	…	বিষবৃক্ষ

পরে ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ্চ তারিখের অভিনয়ের বিষয় বদলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দুই তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত দুইটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২৮এ ফেব্রুয়ারি ও ৭ই মার্চ্চ যথাক্রমে 'মৃণালিনী' ও 'নগরের নবরত্ন সভা' নাটকের অভিনয় হয়।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রথম অভিনীত হয়—১৮৭৪, ২১এ ফেব্রুয়ারি; সকলেই ভুল করিয়া লিখিয়াছেন—১৪ই ফেব্রুয়ারি। ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রেট ন্যাশনালে নহে,—সান্যাল-ভবনে স্থাপিত ন্যাশনাল থিয়েটারে!

১৮৭৪, ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে পুনরায় 'মৃণালিনী'র অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ১৩ই মার্চ্চ (শুক্রবার) তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বিগত শনিবার [২৮ ফেব্রুয়ারি] গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে মৃণালিনী কাব্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বঙ্গসমাজ যে রূপ জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ পূর্ব্বক মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতেছে, সেইরূপ সামাজিক ব্যক্তি সমূহদ্বারা বীররস ও করুণরস প্রধান উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য অভিনীত হওয়াতে তাহার ভাব বিশুদ্ধ ও কল্পনা পরিমার্জ্জিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রথমোদ্যমে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নহে, এই হেতু উক্ত নাটকাভিনয়ে যে সমস্ত সদ্ভাব লক্ষিত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়া পরে তাহার অভাব বিচার শ্রেয়ঃ। হৃষিকেশের গৃহে মৃণালিনী মতিমালিনীর সখ্য ভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার বিদায়ান্তে মতিমালিনীর সহিত মৃণালিনীর হর্ষোৎফুল্ল মুখনির্গত আনন্দোদ্বেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থান কালে অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রিয়বয়স্যার নিকট সরলা বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদসুলভ, স্বভাবসিদ্ধ, আকস্মিক আনন্দ প্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি। কাব্য রচয়িতা এস্থলে উপস্থিত থাকিলে স্বীয় সুন্দর কল্পনা ও রচনাকৌশলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া চরিতার্থ হইতেন ও যাঁহারা বারাঙ্গনাদ্বারা নিষ্কলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাঁহারাও স্ব স্ব ভ্রান্তিমূলক আত্মশ্লাঘার খর্ব্বতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। যাহাহউক মতিমালিনীর সময়োচিত কুলবালাসুলভ ভাব ও আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয়। মৃণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোত্তম ও ঘৃণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্ত্তনাদ এবং অবশেষে যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন ও পতন এবং মৃত্যুকালে আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কোন রিপুপরতন্ত্র মূর্খ চঞ্চলমতি ভীরু ভদ্র সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল।

নদী ও টলমলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত কথোপকথন ও গিরিজায়া কর্তৃক বসন্ত কূজন সদৃশ তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুমধুর সুভাব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতামূলভ ভাব ব্যঞ্জক কথোপকথন ও সুন্দর সঙ্গীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয় গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার অপূর্ব্ব প্রণয় আলাপন এবং প্রাসাদোপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃত বেশে ও স্থির গম্ভীর ভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লম্ফপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয় গুলি সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয় গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

এই অভিনয়ে যে যে স্থলে ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নাটককার একখানি বীররস ও আদিরস প্রধান শ্রাব্য কাব্যকে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন। এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে মূল কাব্য রচয়িতার কাব্যের কোন কোন অংশ দৃশ্য কাব্য সম্বন্ধে অনাবশ্যক ও অসম্বদ্ধ বিবেচিত হইলে তাহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে এবং স্থল বিশেষে মূল কাব্যের ত্রুটি ও অনবধানতা দৃষ্ট হইলে এবং নাটককে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন করিতে হইলে কোন কোন স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক ভাব ও বিষয় নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় নাটকাভিনয়ের এই একটি প্রচলিত প্রথা আছে যে অভিনয়ের পূর্ব্বে নটনটী অথবা সূত্রধার ও তাহার কোন বয়স্য রঙ্গাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া উপস্থিত অভিনয়ের প্রস্তাবনা করিবে অর্থাৎ নাটক ও নাটক রচয়িতার নাম উল্লেখপূর্ব্বক অভিনয়ের অবতারণা করিয়া দিবে। শ্রাব্য কাব্যে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নাটকে ইহা আবশ্যক। উপস্থিত অভিনয়ে এই অভাবটি জনৈক অভিনেতৃ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে তিনি স্বাভাবিক বেশে উপস্থিত হইয়া সাধারণের শোক সূচক সংবাদ অনরেবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু উল্লেখ করিয়া কহিলেন অদ্য আমাদিগের ও আমাদিগের শ্রোতৃবর্গের হর্ষের দিন নহে, বিষাদেরই দিন, কিন্তু উপযুক্ত কালে সংবাদ না পাওয়াতে অভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগভঙ্গ দোষ নিবারণ হেতু আমাদিগকে অগত্যা অঙ্গীকার প্রতিশ্রুত কার্য্য শোকসন্তপ্ত হইয়াও সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কার্য্যটি নট নটীদ্বারা সম্পন্ন হইলে আরও সুন্দর হইত। এই নাটকে মূল কাব্যের অংশ বিশেষ পরিত্যাগ করাতে নাটককার সুবিচার করিয়াছেন। কিন্তু মূল গ্রন্থখানি যেরূপ আদিরস ও বীররস প্রধান, অভিনয়ে প্রধান নায়ক হেমচন্দ্র ও প্রধান নায়িকা মৃণালিনীর মধ্যে তদুপযোগী অবিচলিত প্রণয় ও ঐকান্তিক অনুরাগের মুগ্ধকর ভাব প্রকটিত হয় নাই। কোন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কহিয়াছেন যে প্রণয়ের ভাব নাট্যশালাকে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যুক্ত করে, লোকের প্রকৃত জীবনকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু আমরা এই গূঢ় বাক্যের যাথার্থ্য এই অভিনয়ে সম্যক্ সমর্থন হইতে না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। অভিনেতা হেমচন্দ্র অবস্থা বিশেষে কখন বা বিষাদে অভিভূত হইয়াছিলেন, কখন বা উদ্যোগপরায়ণ হইয়া সাহসপূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অসিচালন কার্য্যে বিশেষ বিশারদ না হওয়াতে এবং প্রকৃত শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তির স্বভাবসুলভ বীরদর্প সম্যক্ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়াতে দর্শকবর্গের অন্তরে প্রকৃত বীররসের উদ্রেক হয় নাই। হেমচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী তেজস্বী পুরুষের গুরু ও নেতা মাধবাচার্য্য কৃষ্ণ যাত্রার মুন্সিগোঁসাইয়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কৃষকায় পুরুষ নাটকাভিনয়ে ভাল শোভা পায় না। তাঁহার কলেবর প্রশান্ত ও তেজস্বী ; বাক্য গম্ভীর এবং উপদেশ সকল সময় বিশেষে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও অধিকতর জ্ঞানপূর্ণ ও উৎসাহপ্রদ হওয়া আবশ্যক। পশুপতির বাক্য ও শরীরগত ভাবভঙ্গী সকল অনেক সময় তাঁহার চিন্তাকুলিত ও সন্দেহান্দোলিত অন্তঃকরণের ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অভিনয়ের স্থানে স্থানে জীবন্ত ভাব ও তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্কিম বাবু ভিখারিণী গিরিজায়ার শরীরে তাহার অবস্থোচিত যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, নাটককার অভিনেতাকে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে পারি না। মনোরমার সহিত হেমচন্দ্রের যে পরস্পর অপূর্ব্ব ভ্রাতা ভগিনীভাব, তাহাতে মনোরমার অনেক সময় হেমচন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করাতে সরলা মনোরমার স্ত্রীসুলভ কোমলতা প্রকাশ পায় নাই, হেমচন্দ্রকে সর্ব্বদা ভাই বলিয়া সম্বোধন করাই স্বাভাবিক। হেমচন্দ্রের সরলা নিষ্কলঙ্কা পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী অল্পবয়স্কা সুন্দরী ভগ্নী মনোরমা তাঁহার সম্মুখ হইতে বিদায় লইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন ও হেমচন্দ্র অম্লানমুখে তাহা দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিছুমাত্র দুঃখ শোক প্রকাশ করিলেন না ইহা অতি অস্বাভাবিক ভাব। মৃণালিনীর অভিনয়ের স্থানে স্থানে করুণারস উদ্দীপক ভাব প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমাদিগের দেশের লোকগণ শিক্ষিত হইলেও সুসভ্য সমাজের নিয়ম জানেন না। দর্শকগণ অনেক সময় এরূপ গোলযোগ করিয়া উঠেন ও অশিষ্ট ব্যবহার করেন যে আমরা অভিনেতাদিগের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ থাকিয়াও অনেক কথা শুনিতে পাই নাই। এ বিষয়ে উত্তম তত্ত্বাবধান আবশ্যক।

১৮ই এপ্রিল তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'হেমলতা'

নাটক অভিনীত হয়। এই সময় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্প্রদায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

> গ্রেট নেশনেল থিয়েটার। হেমলতা নাটকাভিনয়। ৬ই বৈশাখ ১২৮১-রজনী। এই রাত্রির সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনোহর, সত্যসখা, বিক্রম সিংহ, তেজসিংহ এবং হেমলতার অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। অভিনয়ে মনোহরের চরিত্র অনুরূপই ছিল, সত্যসখার স্থানে স্থানে চরিত্র রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সেনাগণের উদ্বোধন কার্য্যাভিনয়টি অতি চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু তাহার রাজপুত্ রাজোচিত বীরভাবের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অভিনয় চলিয়াছিল এটা এক্ষণকার কালে নিতান্ত অনুচিত বলিতে হইবে। (২৪ এপ্রিল ১৮৭৪)

১৮৭৪, ৩০এ মে তারিখে 'কুলীনকন্যা বা কমলিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর প্রায় চারি মাসের জন্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়-কার্য্য বন্ধ থাকে। ৫ই জুন 'ভারত-সংস্কারক' লিখিয়াছিলেন :—

> গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি। কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী নাটকাভিনয়।
>
> এই রাত্রে গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর সাধারণ্যে আগামী শীত ঋতু পর্য্যন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রমোদদাতা বন্ধুবর্গকে বিদায় দিবার সময় অবশ্য আমরা বিষন্ন হইয়াছি। তাহারা এদেশে যে শুভ কল্পনা স্থাপন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা সাধারণ জনগণের সহিত কৃতজ্ঞ আছি। বিশেষতঃ তাহারা সামাজিক সুনীতি বর্দ্ধন উদ্দেশে বরাবর উত্তমোত্তম নাটকাদির অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। এ কারণ আমরা প্রতি শনিবারে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিলাম। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা নূতন উৎসাহে, নূতন বলে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমাজ তাহাদিগকে বরাবর উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, সেই বঙ্গ সমাজকে পুনরায় যথাসাধ্য সন্তোষ প্রদান করিতে যত্নশীল হইবেন। এ বৎসর যে সমস্ত ভ্রম ও ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া যাহাতে এই নাট্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।
>
> এ বৎসর গ্রেট ন্যাসনাল নাট্য সমাজ যে সমস্ত অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই উন্মাদ ও নায়ক নায়িকার প্রণয় অভিনয় অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কুলীনকন্যাখানা বোধ হয় তাহারই একশেষ দেখাইবার জন্য এই পুস্তিকাখানি শেষ বারে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কুলীন কন্যার নায়ক নায়িকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করাতে সৎ প্রেমের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাতে গ্রন্থ বিরচিত ভাব সমূহ সুন্দর রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা দিননাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় বোধ করিলাম।

মফঃস্বল-ভ্রমণ

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও মফঃস্বল-ভ্রমণে বাহির হয়। এই দল ১৮৭৪ সনের ১২ই ও ২৫এ জুন তারিখে বহরমপুরে যে-অভিনয় প্রদর্শন করেন, সে-সম্বন্ধে ৫ই জুলাই তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রটি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার মত :—

> বহরমপুর গ্রেট ন্যাশেনেল থিয়েটর।—প্রেরিত। আমাদিগের বাঙ্গালীর সকল কার্য্যের বাড়াবাড়ি। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতীয় নাট্যশালা না থাকায় সকল সম্বাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল কিছুকালের মধ্যে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে সে অভাব মোচন হইল এবং কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির পরিদর্শনে ইহার কার্য্য প্রণালী কিছুকাল অতি সুনিয়মে চলিয়াছিল, তাহার পর লোকে 'থিয়েটর' একটি ব্যবসা বিবেচনা করাতে কলিকাতায় নানা দলের সৃষ্টি হইল এবং এই অবধিই পাপের স্রোত বৃদ্ধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অজাত শ্মশ্রু বিদ্যালয়ের বালকগণ পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের তাড়না তুচ্ছ বোধ করিয়া বিদ্যালয় যমালয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করতঃ থিয়েটরের দলে মিশিল এবং 'এয়ারকি' জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া অকুতোভয়ে মদ্যপানে ও নানা কুক্রিয়ায় রত হইল। প্রথমে কলিকাতা সহরেই ইহার অবতারণা হয় পরে এই সকল দল মপস্বলে যাত্রার দলের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য গমন করাতে পাপ স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্প্রতি গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটরের দল বহরমপুরে আগমন করিয়াছে। এই দল আসিবা মাত্র অলস ও অকর্ম্মণ্য বালকগণের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, তাহারা নটগণকে কলির প্রকৃত দেবতা বোধে নানা মত উপাসনা আরম্ভ করিল কেহ বা বাজার সরকারের ভার, কেহ বা বিজ্ঞাপন বিতরণের ভার এবং কেহ বা 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়লের' ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্মে পরিদর্শনের ভার লইয়া রাত্রি দিন তাহাদের বাসায় গমনাগমন করিয়া অসৎ কর্ম্মে বিলক্ষণ পরিপক্কতালাভ করিয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন কি করিবেন, তাঁহারা বিশেষ শাসন করিলেই বালকেরা নটগণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া অমূল্য জীবনকে কলুষিত করিবে। নটগণ সকলকে বলিতেছেন যে তাঁহারা বঙ্গ মাতার দুর্দ্দশা উপনীত করিতে নিতান্ত বদ্ধ পরিকর, ইহাতে

তাহারা সকল বাধাকে তুচ্ছ করে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা গোঁপ কামাইয়া 'পাছা পেড়ে' কাপড় ও 'জলতরঙ্গ' মল পরিয়া দেশের উপকারে প্রবৃত্ত—আর পায় কে? উৎসাহ দাতা ভুবন বাবু কল্পতরু, তিনি অজস্র অর্থ বৃষ্টি করিতেছেন সুতরাং নটগণের আহার ব্যবহারের কোন কষ্ট না থাকায় ক্রমেই দলের পুষ্টি হইতেছে এবং নটগণ (Recruit) 'রিক্রুট' সৈন্য সংগ্রহের ন্যায় নানা কুহক মন্ত্রে বালক সংগ্রহ করিতেছেন; এদিগে সমাজের উন্নতি এই পর্য্যন্ত।

'গ্রেট ন্যাসানেল' প্রথম অভিনয় গত সোমবার ৯ই তারিখে এখানকার ষ্টেসন থিয়েটরে আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেসন থিয়েটর প্রকাশ্য নাট্যশালা নহে এখানকার সাহেব লোক উহা অতি যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দোদুল্যমান চিত্র পট অতি সুন্দর তাহাও 'গ্রেট ন্যাশানেল' অভিনেতাগণ ব্যবহার করিতে পাইয়াছেন। প্রথম রাত্রে হেমলতা অভিনয় হয়। হেমলতা দীনবন্ধু বাবুর কমলে কামিনীর ছায়া মাত্র। কমলে কামিনী যদিও ভাল নাটক নহে, তথাপি উহার রচনা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন২ স্থান যথার্থ বীররস উদ্দীপক কিন্তু হেমলতার রচনা ইহার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না, এখানি বাঙ্গালা অনেক দৃশ্য কাব্য হইতে ভাল হইয়াছে। ইহার নাট্যাভিনয় দেখিতে অতি অল্প মাত্র ব্যক্তি গিয়াছিলেন। হেমলতার অভিনয়ে মনে যত শোক উদ্রেক হউক বা না হউক অভিনেতা বালকটীর অবস্থা মনে করিয়া আমাদিগের অশ্রু নির্গত হইয়াছিল। অভিনয় শেষ হইলে একটি যুবক নর্ত্তকী সাজিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটকের বীর রস সকল মনে স্থান পায় না আমাদিগকে হীন বল ভীরু বাঙ্গালি বলিয়াই বোধ হয়। 'হারবতী পরিণয়' নাটক লেখক উপস্থিত ছিলেন, তিনি ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট ১০ টাকা দিয়াও একটি স্ত্রীলোকের বসিবার আসন চাহিয়াছেন বোধ করি তিনি তাহা পাইতেও পারেন। সম্পাদক মহাশয় ইনি দেশের হিতকর কতিপয় কমিটির মেম্বর অথচ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও একটি পয়সা চাঁদা দেন নাই!

দ্বিতীয়বার গত বৃহস্পতিবার ১২ই তারিখ রাত্রে কপালকুণ্ডলার অভিনয় হইয়াছিল এ রাত্রেও দর্শক সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা না গিয়াছিলেন তাঁহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন কেন না এরূপ অভিনয় দেখিতে রাত্রি জাগরণ বৃথা কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করা অপব্যয় ভিন্ন নহে। কপালকুণ্ডলা বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনা প্রণালী এবং গল্পটি আদ্যোপান্ত মধুর ও নির্দ্দোষ কিন্তু নাটকখানি তেমনি কদর্য্য হইয়াছে, এখানি মুদ্রিত হইলে বঙ্কিম বাবুর কাব্যের অপমান করা হইবেক। প্রথম গঙ্গাসাগর যাত্রা, নবকুমার ও তাঁহার দুই সঙ্গী এবং দুটি নাবিক দৃষ্ট হইয়া যাত্রার দলের 'সং' মনে হইল, তাহারা যে সমুদ্র যাত্রায় বিপদে পড়িয়াছে তাহা তাহাদিগের অভিনয়ে কিছুই বুঝা গেল না। নাবিকগণের মনের মুখে বিপদের সময় 'শারিগান' কখনই স্বাভাবিক নহে। নবকুমারের আদ্যোপান্ত অভিনয় কেবল মুখস্থ মাত্র, তাঁহার মুখে মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর আলুলায়িতা কেশা চির যোগিনী কপালকুণ্ডলাকে দেখিলে মনোমধ্যে শান্তি রসের উদয় হয় কিন্তু অভিনয়ে শীর্ণ জরাজীর্ণ কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহীর গল্পের সঙ্খিনী বা পেত্নী বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন মতিবিবি সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন আমরা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কাপালিকের বেশ ভয়ঙ্কর কিছুই হয় নাই কিন্তু তাহার ও মন্দির রক্ষক পুরোহিতের অভিনয় ভাল হইয়াছিল। মতিবিবির অভিনয়ে তাহার গোঁপের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহার স্বর কর্কশ কিন্তু বেশ মন্দ হয় নাই, অন্য সকল অভিনেতার বেশ পুরাতন জরাজীর্ণ। দুটি সংগীত হইয়াছিল তাহা প্রীতিকর নহে এরূপ গান দুই একটি স্ব২ বন্ধুর নিকট গান করাই ভাল। প্রকাশ্য নাট্যশালায় ভাল শুনায় না। শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলার জলে লম্ফ প্রদান স্বাভাবিক হয় নাই। অভিনয় শেষ হইলে আমরা অবাক হইয়া থাকিলাম এবং কি জন্য যে আমরা অর্থ দিয়া আসিয়াছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছিন্ন কদর্য্য চিত্র পট এবং নটগণের অভিনয় তদুপযুক্ত দৃষ্টে কাহার আহ্লাদ বোধ হয়? ম্যানেজার বাবু আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি জানিতে পারিয়া 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসন অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার অভিনয় মন্দ হয় নাই কিন্তু সুধীর বাবুর গলা বড় কর্কশ ও মুনসফ বাবুর বেশ স্বাভাবিক, সুমতি অনেক অশ্লীল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, গ্রন্থে এ সকল কথা নাই। অভিনেতা বাবুরা অভিনয়ের অনেক আফালন করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যে কিছুই হইল না তাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা বলিতেছেন এবারে শীতকালে কতিপয় বেশ্যা ও যাত্রার দলের 'ছোকরা' রাখিয়া 'অপেরা' কোম্পানী খুলিবেন—তাহা খুলিতে পারেন, ভুবন বাবু ব্যয়ে কাতর নহেন কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে তাঁহার অর্থ ব্যয় সার্থক হইত।……

একজন দর্শক॥

পরিশিষ্ট

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

(৬, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

কাম্যকানন ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩, বুধবার অ. বা. পত্রিকা ২৫-১২-৭৩
প্রহসন :—ইয়ং বেঙ্গল

নীলদর্পণ দীনবন্ধু মিত্র ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ ভারত-সংস্কারক, ১৯ পৌষ ১২৮০

(বেলভিডিয়ার প্রাসাদে সখের বাজারে)

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

(শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে)

নাটক	গ্রন্থকার	তারিখ	
বিধবা-বিবাহ নাটক	উমেশচন্দ্র মিত্র	১০ জানুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সোমপ্রকাশ ১৯-১-৭৪
প্রণয়পরীক্ষা	মনোমোহন বসু	১৭ জানুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সাধারণী ৮-১-৭৪ ; *H. Patriot* ১৯-১-৭৪
কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল	২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সোমপ্রকাশ ২-২-৭৪
{ নন্দবংশোচ্ছেদ / উচিত ফল—প্রহসন }	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	ভারত-সংস্কারক ৬ ২-৭৪
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র	৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	ভারত-সংস্কারক ২০-২-৭৪।
ঐ	ঐ	১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সোমপ্রকাশ ২৩-২-৭৪ ; *H. P.* ১৬-২-৭৪
মৃণালিনী	ঐ	২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, বুধবার	সোমপ্রকাশ ২-৩-৭৪
মৃণালিনী	বঙ্কিমচন্দ্র	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, শনিবার	ইংলিশম্যান ২৮-২-৭৪
নগরের নবরত্নসভা		৭ মার্চ ১৮৭৪, শনিবার	ইং. ৭,১১-৩-৭৪ ; *H.P.* ৯-৩-৭৪
কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র	১৪ মার্চ ১৮৭৪, শনিবার	ইং. ১৭ ৩-৭৪
{ সধবার একাদশী / কমলে কামিনীর একটি দৃশ্য }	দীনবন্ধু মিত্র	২৮ মার্চ ১৮৭৪, শনিবার	ইং. ৩১-৩-৭৪
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র	৪ এপ্রিল ১৮৭৪, শনিবার	ইং. ৭-৪-৭৪
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু	১১ এপ্রিল ১৮৭৪, শনিবার	ইং. ১৭-৪-৭৪
হেমলতা	হরলাল রায়	১৮ এপ্রিল ১৮৭৪, শনিবার	*H. P.* ২০-৪-৭৪
শকুন্তলা (মূল সংস্কৃত)		২ মে ১৮৭৪, শনিবার	এ. গেজেট ৮-৫-৭৪ ; *H. P.* ২৭-৪-৭৪

(দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অভিনয়)

নাটক	গ্রন্থকার	তারিখ	
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩০ মে ১৮৭৪, শনিবার	অ. বা. প. ২৮-৫-৭৪

দ্রষ্টব্য ঃ—গত চৈত্র সংখ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠায় বেঙ্গল থিয়েটারের কতকগুলি অভিনয়ের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তালিকাটিতে নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ করিতে হইবে :—

নাটক	গ্রন্থকার	তারিখ
{ শর্ম্মিষ্ঠা / উভয়সঙ্কট }	মাইকেল / রামনারায়ণ তর্করত্ন	২৩ আগষ্ট ১৮৭৩ ; *I. Mirror* ৩০-৮-৭৩
মোহন্তের এই কি কাজ ?		৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ ; *I. M.* ১১-৯-৭৩
ঐ		১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ ; *I. M.* ১৬-৯-৭৩

ইহা ছাড়া তালিকাটির দুইটি স্থলে একটু ভুল আছে। ২৭৮ পৃষ্ঠায় "ওথেলো"র স্থলে "ভীমসিংহ (ওথেলোর মর্ম্মানুবাদ)" হইবে। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের গ্রন্থকার 'উপেন্দ্রনাথ দাস' না হইয়া 'দুর্গাদাস দাস' হইবে।

জনসনের স্বদেশ প্রীতি—

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ডাঃ জনসন্ যখন তাঁর অভিধান একাই তৈরী করবেন স্থির করিলেন তখন তাঁর একজন ভক্ত এসে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, এত বড় কাজ আপনি একা কতদিনে শেষ করতে পারবেন মনে করেছেন ?

"কেন, তিন বছরে !"

"সে কি সম্ভব ! ফ্রেঞ্চ একাডেমী থেকে যে অভিধান বেরিয়েছে—সেটা তৈরী করতে চল্লিশজন লোকের চল্লিশ বছর লেগেছিল !"

হেসে জনসন্ বল্লেন, "তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি ? ৪০কে চল্লিশ দিয়ে গুণ করে হয়, ১৬০০। ১৬০০এর সঙ্গে ৩এর যে সম্বন্ধ, ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজের সেই সম্বন্ধ ! ৩ জন ইংরেজ—১৬০০জন ফরাসী !"

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বৌদ্ধ-দর্শনের কয়েকটি মূলকথা

বুদ্ধদেব দার্শনিক তর্কজাল মোটেই পছন্দ করিতেন না। নির্ব্বাণলাভের জন্য ইহার কোন প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিতেন না। তাঁহার কাছে সব চেয়ে বড় কথা ছিল নির্ব্বাণলাভ ও নির্ব্বাণলাভের মুখ্য প্রয়োজন ছিল দুঃখ-নিরোধের জন্য। যাহাকে নিরোধ করিতে হইবে তাহার উৎপত্তি জানা দরকার, রোগের নিদান না জানা থাকিলে চিকিৎসা করিয়া রোগ দূর করা যায় না। কাজেই দুঃখ-উদয়ের হেতু আলোচনাতেই বুদ্ধের দার্শনিক মতের উদ্ভব।

দুঃখ-উদয়ের হেতু নির্ণয় করিতে বুদ্ধ দুঃখের কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য-কারণের একটি সূত্র পাইয়াছিলেন, বৌদ্ধ-দর্শনে ইহাকে প্রতীত্যসমুৎপাদ (পটিচ্চসমুপ্পাদ) বলা হয়। এই কার্য্য-কারণ-ধারার একটি অন্তে দুঃখ অর্থাৎ জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, কষ্ট, অশান্তি ও উপদ্রব (জরা-মরণ-সোক-পরিদেবন-দুক্খ-দোমনস্সো-পয়াসা)। এই দুঃখ কেন হয়? সংসারে জন্মগ্রহণ করি বলিয়াই এই দুঃখ ভোগ করিতে হয় অতএব জন্ম (জাতি) ইহার কারণ। জন্ম কেন হয়? অস্তিত্ব (ভব) হইতে জন্ম হয়। অস্তিত্ব কি করিয়া হয়? আমরা ইন্দ্রিয়সুখ, কুবিশ্বাস, ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস এবং আমাদের একটা আত্মা আছে এই ধারণাগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি (উপাদান) বলিয়া অস্তিত্ব আসে। এই ধারণাগুলি আঁকড়াইয়া ধরি কেন? তৃষ্ণার (তন্‌হা) জন্য আঁকড়াইয়া ধরি। তৃষ্ণা কোথা হইতে জন্মে? সুখ দুঃখ অনুভব (বেদনা) হইতে তৃষ্ণা জন্মে। অনুভবের কারণ কি? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ (ফস্‌স) হইতে অনুভবের উৎপত্তি। স্পর্শ কোথা হইতে হয়? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনোরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয় দ্বার বা ষড়ায়তন (সলায়তন) দিয়া বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয়। ছয় ইন্দ্রিয় কোথা হইতে আসে? সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহী ব্যক্তি (নামরূপ) হইতে ছয় ইন্দ্রিয় জন্মে। ব্যক্তি কোথা হইতে আসে? চেতনা (বিঞ্ঞাণ) হইতে ব্যক্তিত্ব জন্মে। চেতনার কারণ কি? নামরূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধ (খন্ধ) হইতে সকল পদার্থের উদ্ভব, ইহাদের সমষ্টিকে "সংখার" বলে, ও "সংখার" হইতে চেতনা জন্মে। সংখার কোথা হইতে আসে? অবিদ্যা (অবিজ্জা) হইতে "সংখারের" উৎপত্তি। অতএব অবিদ্যাই দুঃখের মূল। মূল হইতে আরম্ভ করিলে বলা হয় অবিদ্যা হইতে "সংখার", "সংখার" হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, এবং জাতি হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-উপায়াস জন্মে। এই কার্য্য-কারণ-ধারার বিভিন্ন তরঙ্গগুলি সব সময়ে একভাবে বলা হয় না, কখন কখন পর্য্যায়ের কিছু ক্রমভেদ করা হয়, কখনও বা কয়েকটি বাদ দেওয়া হয়।

বুদ্ধের কাছে দর্শনের উপরে ছিল ধর্ম্মের স্থান। ধর্ম্ম শুধু তর্ক বা বিচারের বস্তু নয়, অভ্যাস ও ব্যবহারের বস্তু। ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে হইলে পাঁচটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইত যথা (১) জীব হিংসা করিব না (২) অদত্ত গ্রহণ করিব না (৩) অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবা করিব না (৪) অসত্য বলিব না (৫) মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিব না। এই পাঁচটি ব্রত পালন

ও মানসিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সাধক আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেন। এই প্রগতি-মার্গ চারিটি স্তরে বিভক্ত ছিল, যথা—

(১) স্রোতাপন্ন (সোতাপন্নো)—অর্থাৎ এখানে সাধক উন্নতির স্রোতে প্রবেশ করিতেন। এখানে শরীরস্থ অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস, সন্দিগ্ধতা ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে বিশ্বাস এই তিনটি বন্ধন ছিন্ন করিতে হইত। ইহা দ্বারা স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আর দুঃখযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না ও বোধিলাভের নিশ্চয়তা জন্মিত ;

(২) সকৃদাগামী (সকদাগামী)—পূর্ব্বোক্ত বন্ধনত্রয় ছিন্ন করিলে, ইন্দ্রিয় দমন করিলে, ঘৃণা ও মনোবিকার ত্যাগ করিলে সাধক এই স্তরে প্রবেশ করিতেন। এই স্তরে পৌছিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই মৃত্যু হইলে সাধককে দুঃখ-নিরোধের জন্য 'সকৃৎ' অর্থাৎ আর একবার মাত্র সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইত ;

(৩) অনাগামী—পূর্ব্বোক্ত বন্ধনত্রয় এবং ইন্দ্রিয়বশ্যতা ও দ্বেষ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিলে সাধক উচ্চতর জন্ম লাভ করিতেন ও সেখানেই নির্ব্বাণ লাভ করিতেন, আর তাঁহাকে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না। এই তিনটি স্তরে পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া কোন জিনিষের স্থান নাই। নৈতিক উন্নতিই ইহার সার কথা। অবৈধ কর্ম্ম যে মনোবৃত্তি হইতে প্রসূত হইত তাহার উচ্ছেদ করিতে হইত এবং তাহার চেয়েও প্রয়োজনীয় ছিল সংসারে থাকিবার তৃষ্ণা, তাহা যে কোনও প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন। দুঃখ-উদয়ের কারণ ও দুঃখ-নিরোধের পথ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে এই তৃষ্ণার উচ্ছেদ হইত। তৃষ্ণা দুর হইলে চতুর্থ স্তর ;

(৪) অর্হৎ—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক, যদি আগেই না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় সংসার ত্যাগ করিতেন। সংসারের লোক যে তৃষ্ণার বশে সংসারে থাকিতে চায় সে তৃষ্ণা এ স্তরে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। চিত্তের বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা এই দুই-এর অনুভবের আনন্দেই তিনি মগ্ন থাকেন। অর্হত্ত্ব লাভই সাধনার চরম ফল, ইহাই নির্ব্বাণ—এবং ইহা লাভ করিবার পথ হইতেছে "অষ্টাঙ্গ মার্গ" অনুসরণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে খুব বড় স্থান অধিকার করিয়াছে এরূপ আর দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই দুইটি বিষয় ধ্যান (ঝান) ও প্রজ্ঞা (পঞ্‌ঞা)।

ধ্যান—ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করিয়া, লোভ ও ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া, অবৈধ চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া, নিষ্কলুষ আনন্দের সহিত, দ্বেষহীন হইয়া, সর্ব্বজীবের প্রতি সানুকম্প হইয়া, আলস্য, প্রমাদ ও সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সাধক নির্জ্জন স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া সুখ ও প্রীতির উদয় অনুভব করিবেন। মনে যখন আনন্দ অনুভব হইবে শরীর তখন স্থৈর্য্য ও সুখ লাভ করিবে ও চিত্ত একাগ্র হইবে। তখন সাধক ক্রমে একটির পর একটি করিয়া ধ্যানের চারিটি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। প্রথম অবস্থায় বিতর্ক ও বিচার থাকিবে এবং সমগ্র দেহমন আনন্দে পূর্ণ হইবে ; দ্বিতীয় অবস্থায় বিতর্ক ও বিচারের অবসান হইবে, চিত্ত একাগ্র হইয়া স্থির হইবে এবং সমগ্র দেহ মন সুখ ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইবে ; তৃতীয় অবস্থায় প্রিয় ও অপ্রিয়ের প্রতি মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিয়া সমগ্র দেহ মন সুখ প্রীতিতে পূর্ণ হইবে ; এবং চতুর্থ অবস্থায় সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ সমনস্কতা ও মধ্যস্থতার সহিত সাধক সমগ্র দেহকে শুদ্ধ ও পবিত্র মন দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিবেন।

প্রজ্ঞা—ধ্যানের সাহায্যে সাধক জ্ঞান-অন্তর্দৃষ্টিতে মনঃসংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা স্থূল শরীরের উপাদান, উপকরণ, জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ বুঝিবেন। তাহার পর তিনি একটি মনোময় দেহ সৃষ্টি করিয়া বিভূতি (ইদ্ধি) লাভ করিবেন, এক হইতে বহু হইবেন, বহু হইতে এক হইবেন, প্রাচীর বা পর্ব্বতাদির বাধা ভেদ করিয়া যাইবেন, পৃথিবী হইতে বাহিরে যাতায়াত করিবেন, জলের উপর দিয়া, আকাশের মধ্য দিয়া যাইবেন, চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শ করিবেন এবং অপরের মনোভাব জানিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি নিজের পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিবেন। তাহার পর অপর জীবের বিনাশ ও জন্মান্তর গ্রহণ জানিবেন। তাহার পর তিনি দুঃখ-উদয়ের কারণগুলি বিনাশের জ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন।

এখন আমরা আবার বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিব।

ঋষিপত্তনে বুদ্ধ কিছুদিন থাকিলেন। একদিন প্রত্যুষে তিনি তাঁহার কুটিরের সামনে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন এমন সময় দেখিলেন যে একটি ভদ্র-সন্তান তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধ কুটিরের ভিতর গিয়া আসনে বসিলেন।

প্রচার-ব্রত

যুবক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "কি উপদ্রব, কি বিপদ!" যুবকের এরূপ বলিবার কারণ ছিল। সে বারাণসীর একজন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র, তাহার নাম ছিল যশ (যস)। সে বিলাসে লালিত পালিত হইয়াছিল কিন্তু ভোগসুখে বিরক্তি বোধ হওয়ায় সে বাড়ী হইতে পলাইয়া সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে ঋষিপত্তনে আসিয়াছিল। নিদ্রামগ্ন নর্ত্তকীদের আলুথালু বসন, বিকট অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া বুদ্ধের সংসার-বিরক্তির যে কথা প্রচলিত আছে তাহা পালিশাস্ত্রে যশের জীবনে ঘটিয়াছিল বলা হইয়াছে। এই কারণেই যশ পলাইয়া ঋষিপত্তনে চলিয়া আসিয়াছিল। যশের কথার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন "এখানে কোন বিপদ নাই, কোন উপদ্রব নাই। এস যশ, এখানে বস, আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিব।" বুদ্ধ উপদেশ দিতে লাগিলেন ও যশ বিনীতভাবে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল।

এদিকে যশের মাতা পুত্রকে না পাইয়া স্বামীকে খবর দিলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্রের খোঁজে বাহির হইয়া তাহার জরির জুতার দাগ ধরিয়া ধরিয়া ঋষিপত্তনে উপস্থিত হইলেন। যশের পিতা আসিতেছেন শুনিয়া বুদ্ধ যশকে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন—শাস্ত্রে আছে মায়াবলে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন—ও শ্রেষ্ঠী আসিয়া যশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহপতি, এখানে বস, এখানে বসিয়া থাকিলে যশকে দেখিতে পাইবে।" তারপর তিনি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে ধর্ম্মালাপ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে ভক্তি জানাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যশের পিতাই বুদ্ধের প্রথম গৃহী শিষ্য। তারপর তিনি যশকে বাহির করিয়া শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্রকে এই বলিয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন যে তাহার শোকে মাতা মৃতপ্রায় হইয়াছেন। যশ কিছু না বলিয়া বুদ্ধের মুখের দিকে তাকাইল। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন যে শ্রেষ্ঠীর মত তাঁহার পুত্রেরও জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে ও সংসারের মায়া কাটাইয়াছে, কাজেই কি করিয়া আবার গৃহে ফিরিবে? শ্রেষ্ঠী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন ও পুত্রকে বুদ্ধের কাছে থাকিতে অনুমতি দিলেন। গৃহে ফিরিবার সময় শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ মৌন থাকিয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বুদ্ধ চীবর ধারণ করিয়া ও ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া যশের সঙ্গে তাহার গৃহে গেলেন। সেখানে যশের মাতা ও পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও নানাবিধ ভোজ্য দ্বারা আহার করাইলেন। আহারান্তে সকলে তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বুদ্ধ স্ত্রীলোকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। যশের মাতা ও পত্নীও তাঁহার গৃহী শিষ্যা হইলেন। ক্রমে যশের বন্ধু বারাণসীর চারজন শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের পরামর্শ অনুযায়ী বুদ্ধের শিষ্য হইল ও তাহাদের দেখাদেখি আরও পঞ্চাশজন লোক ভিক্ষু হইল। এখন পঞ্চভিক্ষু, যশ, যশের চার বন্ধু ও শেষের পঞ্চাশ, মোট এই ষাট্ জন ভিক্ষু-শিষ্য বুদ্ধ পাইলেন। একদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া বুদ্ধ বলিলেন,

"হে ভিক্ষুগণ, আমি দৈব ও মানুষিক সকল প্রকার পাশ হইতে মুক্ত; তোমরাও দৈবমানুষিক সকলপ্রকার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। অতএব এখন "চরথ ভিক্‌খবে, চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্‌সানং"—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, সংসারের প্রতি অনুকম্পার জন্য, দেবমানবের মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও। তোমাদের মধ্যে এক এক জন এক এক দিকে যাও। হে ভিক্ষুগণ, এই যে ধর্ম্ম যাহা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা কৈবল্যময়, পরিশুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্য্য, সেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়া প্রচার কর। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের চক্ষুতে অল্পই ধূলি আছে, কিন্তু তাহাদের কাছে ধর্ম্ম প্রচারিত না হইলে তাহাদের মুক্তি হইবে না। ইহারা এই ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।"

তাঁহার কথামত ভিক্ষুরা চারিদিকে প্রচারে বাহির হইল। কিছুদিন পরে তাহারা শিষ্যসংগ্রহ করিয়া দীক্ষার জন্য বুদ্ধের কাছে লইয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে ভিক্ষু ও দীক্ষার্থী উভয়েই পথশ্রমে ক্লান্ত হইত, বিশেষতঃ ভিক্ষুদের বার বার নূতন নূতন শিষ্য লইয়া বুদ্ধের কাছে যাতায়াতে কষ্ট পাইতে হইত। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ এবিষয়ে চিন্তা করিলেন ও একদিন সন্ধ্যাকালে সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন যে ভিক্ষুরা দূরবর্ত্তীস্থানে

নিজেরাই দীক্ষাদান করিতে পারিবে। বুদ্ধ নিজে কাহাকেও দীক্ষা দিতে হইলে বলিতেন, "এস ভিক্ষু, সুপ্রচারিত এই ধর্ম্ম, সকল দুঃখের অন্ত করিবার জন্য শুদ্ধ মার্গে বিচরণ কর।" কালক্রমে সংঘ গঠন ও বৃদ্ধির সঙ্গে এ বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন হইয়াছিল যে দীক্ষার্থীকে মাথা মুড়াইয়া গোঁফদাড়ি কামাইয়া চীবর ধারণ ও ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া এক কাঁধে উত্তরীয়বসন ও অন্য কাঁধ অনাবৃত রাখিয়া দীক্ষাদাতাকে প্রণাম করিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিয়া যোড়হাতে আসনে বসিতে হইবে। দীক্ষার্থীকে প্রথম প্রথম বোধ হয় "ধম্মং সরণং গচ্ছামি, আমি ধর্ম্মের শরণ লইতেছি" এই কথা উচ্চারণ করিতে হইত ও ইহা কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি" এই ত্রিশরণ মন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ঋষিপত্তনে বুদ্ধ প্রথম বর্ষাযাপন (বস্‌সো) করিয়াছিলেন। সে যুগে সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা সারা বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বর্ষার কয়মাস একস্থানে বাস করিতেন। বর্ষাকালে যাতায়াতে অসুবিধা হইত, শরীর ও বস্ত্রাদি ভিজিয়া যাইত ও সাধনার নিয়ম পালনে ব্যাঘাত ঘটিত। আরও একটি কারণ এই যে বর্ষাকালে কীটপতঙ্গাদির অজস্র বংশ-বৃদ্ধি হইত ও তৃণলতাদি উদ্ভিদও যেখানে সেখানে জন্মিত; লোকের চলাচলে ইহাদের অনেক মারা পড়িয়া বহু জীব হত্যা হইত। বুদ্ধ-শিষ্যেরা প্রথমে "বস্‌সো" পালন করিতেন না, কিন্তু ইহাতে লোকে তাহাদের নিন্দা করায় বুদ্ধ বর্ষাপালন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা বর্ষাকালে একস্থানেই থাকিতেন; ইহাতে তাঁহাদের বিশ্রামও হইত। বৌদ্ধেরা বর্ষাবাস হইতে অর্থাৎ কোন্ বর্ষা বুদ্ধ কোথায় যাপন করিয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করিয়া তাঁহার জীবনের ঘটনা-বলীর সময় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ষার পর ভিক্ষুরা প্রায় সকলেই কোন কারণে অসম্ভব বা অসমর্থ না হইলে বুদ্ধ যেখানে থাকিতেন সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। এই প্রথম বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুদের তিনি বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত চিন্তাদ্বারা ও উপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি; তোমরাও উপযুক্ত চিন্তা ও চেষ্টার দ্বারা মুক্তিলাভে প্রযত্ন কর।"

বর্ষার পর সকলে প্রচারে বাহির হইলেন। বুদ্ধ উরুবিল্বের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে রাস্তা ছাড়িয়া একটি বনের মধ্যে তিনি গাছের তলায় বসিয়াছিলেন। কয়েকজন যুবা সেই বনে আমোদ প্রমোদ করিতে আসিয়াছিল, একজন ছাড়া তাহাদের সকলের সঙ্গে নিজ নিজ স্ত্রী ছিল; যাহার স্ত্রী ছিল না তাহার জন্য অন্য বন্ধুরা একজন গণিকাকে লইয়া আসিয়াছিল। যুবকেরা যখন আমোদে মত্ত ছিল সেই অবসরে গণিকাটি তাহাদের জিনিষপত্র যাহা পাইল সব লইয়া পলায়ন করিল। যুবকেরা সারা বন গণিকাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোন স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিয়াছেন কিনা। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রীলোকে তাহাদের কি প্রয়োজন। তাহারা চুরির ব্যাপার জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ যুবকগণ, কোন্‌টা তোমাদের পক্ষে বেশী ভাল হইবে স্ত্রীলোকের খোঁজ করা না নিজেদের খোঁজ করা?" যুবকেরা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া বলিল, যে, আত্ম-অন্বেষণই বেশী ভাল। বুদ্ধ বলিলেন, "বেশ,তাই যদি হয় তবে তোমরা এখানে বস, আমি তোমাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছি।" এ যুবকেরাও বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কয়েকস্থানে ঘুরিয়া বুদ্ধ আবার উরুবেলে আসিলেন। উরুবেল গ্রাম, নৈরঞ্জনা নদীর তীর ও গয়া এই তিন স্থানে কাশ্যপগোত্রের জটাধারী (জটিলো) বানপ্রস্থাবলম্বী তিন জন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল, তাঁহাদের তপঃ-প্রভাবও লোকে জানিত, এজন্য তাঁহারা বড় গর্ব্বিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে নানাবিধ অলৌকিক কাণ্ড যথা জলে না ডোবা, আগুনে না পোড়া, একটি বিষধর সাপকে দমন করা প্রভৃতি দেখাইয়া বুদ্ধ ইহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। যাহা হউক বোধ হয় অনেকদিন ধরিয়া ইঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের বাদানুবাদ হইয়াছিল। অবশেষে এই জটাধারীরা সশিষ্যদলে বুদ্ধের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহাদের মত খ্যাতিমান লোকে বুদ্ধের দলে যোগ দেওয়ায় লোকের কাছে বুদ্ধের নাম খুব প্রচারিত হইয়া গেল। উরুবেলে তিন মাস বাস করিয়া বুদ্ধ গয়াশীর্ষ পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের একটি বড় সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশটি এই—

"সব্বং ভিক্খবে আদিত্তং—হে ভিক্ষুগণ, সবই আদীপ্ত, বা দহ্যমান,কিঞ্চ ভিক্খবে আদিত্তং? হে ভিক্ষুগণ সব যাহা

আদীপ্ত তাহা কি কি? ভিক্ষুগণ, চক্ষু দহ্যমান, রূপ দহ্যমান, চক্ষুর্বিজ্ঞান দহ্যমান, চক্ষুঃসংস্পর্শ দহ্যমান, চক্ষুঃসংস্পর্শ জনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাও দহ্যমান। কিসে দহ্যমান? আমি বলি সবই রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে দহ্যমান, জন্মে জরায় মৃত্যুতে শোকে পরিদেবনে দুঃখে দৌর্মনস্যে উপায়াসে দহ্যমান। শ্রোত্র দহ্যমান, শব্দ দহ্যমান, ঘ্রাণ দহ্যমান, গন্ধ দহ্যমান, জিহ্বা দহ্যমান, রসাদি দহ্যমান, কায় দহ্যমান, স্পর্শাদি দহ্যমান, মন দহ্যমান, মনোধর্ম্মাদি দহ্যমান, মনোবিজ্ঞান দহ্যমান, মনঃসংস্পর্শ দহ্যমান, মনঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাও দহ্যমান। কিসে দহ্যমান? আমি বলি রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে দহ্যমান, জন্মে, জরায়, মৃত্যুতে, শোকে·· দহ্যমান। হে ভিক্ষুগণ ইহা দেখিয়া জ্ঞানবান আর্য্য শিষ্যের (সুতবা অরিয়সাবকো) চক্ষুতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, রূপে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, চক্ষুর্বিজ্ঞানে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, চক্ষুঃসংস্পর্শে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, চক্ষুঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাতেও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। শ্রোত্রে নির্ব্বেদ হয়, শব্দাদিতে নির্ব্বেদ হয়, ঘ্রাণে নির্ব্বেদ হয়, গন্ধাদিতে নির্ব্বেদ হয়, জিহ্বাতে নির্ব্বেদ হয়, রসাদিতে নির্ব্বেদ হয়, কায়ে নির্ব্বেদ হয়, স্পর্শাদিতে নির্ব্বেদ হয়, মনে নির্ব্বেদ হয়, মনোধর্ম্মাদিতে নির্ব্বেদ হয়, মনোবিজ্ঞানে নির্ব্বেদ হয়, মনঃসংস্পর্শে নির্ব্বেদ হয়, মনঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাতেও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়; নির্ব্বেদ হইতে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য হইতে বিমুক্তি হয়, বিমুক্তি হইতে 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান হয়, আর সংসারে জন্মিতে হয় না (খীনা জাতি), ধর্ম্মকার্য্য শেষ হয় (বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং), কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় (কতং করণীয়ং), আর তাহাকে ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। (মহাবগ্‌গ, ১৷২১)

গয়াশীর্ষ পাহাড়ে কিছুদিন থাকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধ রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে একটি বাঁশ বনে (লট্‌ঠিবন) আসিয়া আশ্রয় লইলেন। বোধিলাভের পর রাজগৃহে আগমন করিবেন রাজা বিম্বিসারের কাছে বুদ্ধের পূর্ব্বের এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি রাজাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইলেন। বিম্বিসার সমন্ত্রিপরিষৎ বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন ও এই খবর পাইয়া রাজগৃহের বহু নাগরিকও রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বুদ্ধের রাজগৃহ গমন

বাঁশবনে ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া বিম্বিসার তাঁহার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করিলেন ও তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থতা জানাইলেন। সাধারণ লোকের কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে খ্যাতনামা উরুবেলের জটিলকে দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল যে কে কাহার শিষ্য। বুদ্ধ লোকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যে জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জটিল বানপ্রস্থীর অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিলেন কেন। জটিল বলিলেন, অগ্নিহোত্রের বলে স্বর্গে গিয়াও সংসারের শব্দরসকামিনী প্রভৃতি ভোগ করা যাইবে ইহা তিনি আগে মনে করিতেন কিন্তু এখন সংসারের অসারতা বুঝিয়া এবং নির্ব্বাণের আস্বাদ পাইয়া তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সকলের সামনে জটিল যখন এই ভাবে বুদ্ধের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন তখন লোকে বুঝিল, কে গুরু কে শিষ্য। রাজা বিম্বিসার বিদায় লইবার সময় বলিলেন, "ভদন্ত, ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে ভগবান কাল আমার গৃহে কৃপা করিয়া আহারে সম্মতি দান করুন।" বুদ্ধ মৌন থাকিয়া সম্মতি জানাইলেন। রাজা যখন বুঝিলেন যে বুদ্ধ সম্মতি জানাইয়াছেন তখন তিনি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন যখন বিম্বিসার খবর পাঠাইলেন যে আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন চীবর ভিক্ষাপাত্রধারী বুদ্ধ সশিষ্যে রাজগৃহ নগরের মধ্য দিয়া প্রাসাদে গেলেন। বিম্বিসার স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে নানাবিধ ভোজ্য আহার করাইলেন। পালিবর্ণনায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই সেকালে নিমন্ত্রণকর্ত্তা যত বড় লোকই হউন না কেন বহু পরিবেশক থাকিলেও স্বহস্তে নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করিতেন। আহারান্তে বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে আসিয়া বসিলেন ও বলিলেন—এ ঘটনা সম্ভবতঃ এই দিনেই হয় নাই, পরে অন্য কোন সময়ে হইয়াছিল—যে, তিনি বুদ্ধের বাসের জন্য এমন একটি স্থান করিয়া দিতে চান যাহা নগরের বেশী কাছেও না হয় দূরেও না হয়, যেখানে যাতায়াত সহজে করা যায়, বুদ্ধের দর্শনার্থীদের সকলের সুবিধা হয়, যেখানে দিনে বেশী ভিড় হইবে না, রাত্রে গোলমাল বা ভয় থাকিবে না। লোকের ভিড় হইতে দূরে, সাধুর বাসের

উপযুক্ত মনে করিয়া বিম্বিসার তাঁহার "বেণুবন" (বেলুবন) নামক প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধকে দিতে চাহিলেন। বুদ্ধ আপত্তি না করায় বিম্বিসার স্বর্ণময় ভৃঙ্গার হইতে বুদ্ধের হাতে জল ঢালিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই বেণুবন উদ্যান আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলাম।" সেকালের এই প্রমোদ-উদ্যানগুলিতে পুরান কলিকাতার বড়লোকদের বাগানবাড়ীর মত ঘরবাড়ীও থাকিত। এখন হইতে বুদ্ধ রাজগৃহে আসিলে এই "বেণুবন-আরামে"ই সশিষ্যে বাস করিতেন। বোধিলাভের পর রাজগৃহই প্রথম নগর যেখানে বুদ্ধ প্রথম আসিলেন এবং এখানেই জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় আরম্ভ হয়। সাধারণ্যে তিনি "শ্রমণ গৌতম" (সমণো গোতমো) ও তাঁহার শিষ্যেরা "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ" (সক্যপুত্তিয়া সমণা) নামে পরিচিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে এবং ভক্তিভাজন ব্যক্তিমাত্রকেই—"হে ভদন্ত" (ভন্তে) বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হইলে "ভগবান" বলিত। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু তাঁহাকে শুধু "গৌতম" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, সম্মানের তারতম্যে ইহা "হে গৌতম" বা বড় জোর "ভদন্ত গৌতম" পর্য্যন্ত উঠিত, তার বেশী নয়। বুদ্ধ নিজেকে "তথাগত" বলিয়া উল্লেখ করিতেন বলিয়া মনে হয়।

রাজগৃহ-নগরের নিকটবর্ত্তী নালন্দা-গ্রামে কোলিত ও উপতিষ্য (উপতিস্স) নামে দুইজন সম্পন্ন অবস্থার ব্রাহ্মণ-যুবক ছিলেন। ইঁহারা দুজনেই সুপণ্ডিত, প্রতিভাবান ও মেধাবী ছিলেন ও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুদ্বয় একবার রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর হইতে কোন পর্ব্বোপলক্ষে সম্মিলিত নীচের জনসমুদ্র দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে হইল এত যে লোক ইহাদের সকলকেই একদিন মরিতে হইবে! তাঁহারা মৃত্যু ও জীবনের অন্যান্য গভীর বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও এই সময়ের পর হইতে পরস্পরকে নিজ নিজ চিন্তার ফল জানাইতে লাগিলেন। তাঁহারা এইভাবে স্থির করিলেন যে সব জিনিষের যখন বিনাশ আছে তখন অবিনাশীও কিছু থাকা সম্ভব। তদবধি তাঁহারা এই অ-মৃতের সন্ধানে রহিলেন এবং পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন যে একজন অমৃতের সন্ধান পাইলে অপরকে জানাইবেন। সেই সময় সঞ্জয় নামে একজন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক-আচার্য্য ছিলেন; বন্ধুদ্বয় সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সঞ্জয়ের শিষ্যদলের মধ্যে অনেকেই এই ব্রাহ্মণ-দ্বয়ের বিদ্যাবুদ্ধিতে মুগ্ধ ছিল ও সঞ্জয় নিজেও তাঁহাদের খুব খাতির করিতেন। অশ্বজিৎ নামে বুদ্ধের সেই পঞ্চভিক্ষুর একজন একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন ও তাঁহার নম্র, সংযত, গাম্ভীর্য্যময় ভাব দেখিয়া পথে উপতিষ্য তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং তাঁহার গুরু কে, তিনি কি শিক্ষা দেন এসব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বজিতের মুখে বুদ্ধ ও বুদ্ধের বাণীর কথা শুনিয়া উপতিষ্যের ভাল লাগিল ও তিনি বুদ্ধের বাণী গ্রহণ করিলেন। উপতিষ্যের সঙ্গে যখন কোলিতের সাক্ষাৎ হইল তখন উপতিষ্যের মুখে আনন্দের আভা দেখিয়া কোলিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আয়ুষ্মন, তবে কি তুমি অমৃত পাইয়াছ?"

"হাঁ আয়ুষ্মন, আমি অমৃত পাইয়াছি।"

"আয়ুষ্মন, কি করিয়া অমৃত পাইলে?" উপতিষ্য বন্ধুকে অশ্বজিতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের কথা বলিলেন। উপতিষ্যের মুখে বুদ্ধের বাণী শুনিয়া কোলিতেরও বিশ্বাস হইল। এই বন্ধুদ্বয়ের মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক যে অপরের মুখে শুনিয়া একজনের বাণীতে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। সেই কালে তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা একগুরুর অধীনে থাকিলেও অপর বহু আচার্য্যের উপদেশ শুনিতে যাইতেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কও করিতেন, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে আছে। বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিয়া উপতিষ্যের সঙ্গে ও তাঁহার কাছে শুনিয়া কোলিতেরও বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে আসিয়া বুদ্ধের সঙ্গে বোধ হয় আলাপ হইয়াছিল ও ইঁহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া বুদ্ধ সাগ্রহে ইঁহাদের শিষ্য করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বুদ্ধ ইঁহাদের খ্যাতি শুনিয়া অশ্বজিৎকে পাঠাইয়া ইঁহাদের দলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজগৃহের লোকের বুদ্ধের প্রতি বিদ্রূপের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় এই অনুমান অসম্ভব নয়।

যাহা হউক বন্ধুদ্বয়ের বুদ্ধশিষ্যত্ব গ্রহণের কথা শুনিয়া আচার্য্য সঞ্জয় বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক অনুযোগ করিলেন, দলপতি করিয়া দিবার লোভ

দেখাইলেন, কিন্তু বন্ধুদ্বয় নিজেদের অভীষ্ট ত্যাগ না করিয়া বুদ্ধের সঙ্গে যোগ দিলেন। বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে সঞ্জয়ের আরও অনেক শিষ্য বুদ্ধের দলে যোগ দেন। নবীন প্রচারক বুদ্ধের ইহাতে উৎসাহ হইবারই কথা। গুণী লোক গুণের মর্য্যাদা বুঝেন, বুদ্ধ এই শিষ্যদ্বয়ের গুণবত্তা ও শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন ও প্রথম হইতেই ভিক্ষু দলের মধ্যে ইঁহাদের প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। অন্য ভিক্ষুরা ইহাতে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু বুদ্ধ বুঝাইয়া তাহাদের শান্ত করিয়াছিলেন। উপতিষ্যের মাতার নাম ছিল রূপসারি, এই জন্য লোকে তাঁহাকে সংক্ষেপে "সারিপুত্র" (সারিপুত্ত) বলিয়া ডাকিত ; কোলিত গোত্রনামে "মৌদ্গল্যায়ন" (মোগ্গল্লান) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহারা এই নামেই অভিহিত হইয়াছেন ও আমরাও তাঁহাদের অতঃপর এই নামে উল্লেখ করিব। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন ও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের কথা আমাদের অনেকবার অনেক উপলক্ষে বলিতে হইবে ও ক্রমে আমরা তাঁহাদের পদমর্য্যাদার গুরুত্ব বুঝিতে পারিব। এই দুইজন না হইলে বুদ্ধের প্রচার কার্য্য বোধ হয় অতি অল্পই প্রসার লাভ করিত।

মগধের অনেক বড় ঘরের ছেলেরা বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রসার ও বহুলোক সংসার ছাড়িয়া ভিক্ষু হইতেছে দেখিয়া রাজগৃহের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "শ্রমণ গৌতমের জন্য লোকে পুত্রোৎপাদন করিতেছে না, শ্রমণ গৌতমের জন্য বহু স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশা হইয়াছে ও তাঁহার জন্য অনেক পরিবার নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। জটিলেরা, সঞ্জয়ের পরিব্রাজকেরা ও মগধের কুলপুত্রেরা সবাই তাঁর শিষ্য হইতেছে।" বুদ্ধের শিষ্যেরা পথে ভিক্ষায় বাহির হইলে লোকে একটা ছড়া বলিয়া তাহাদের ক্ষেপাইত—

"মাগধীদের গিরিব্রজে (অর্থাৎ রাজগৃহে) মহাশ্রমণ আসিয়াছেন ; তিনি সঞ্জয়ের সব শিষ্যদের ভাগাইয়া লইয়াছেন, —এবার তাঁহার কাহাকে ভাগাইয়া লইবার পালা ?"

ভিক্ষুরা একথা বুদ্ধকে জানাইলে তিনি তাহাদের বিরক্ত হইতে বারণ করিলেন ও বলিলেন যে অচিরে এই নিন্দাবাদ কাটিয়া যাইবে। তিনি নিজে আর একটা ছড়া বাঁধিয়া দিলেন ও বলিলেন, লোকে ক্ষেপাইলে যেন ভিক্ষুরা উহা আবৃত্তি করে। ছড়াটি এই,

"মহাবীর তথাগতেরা সদ্ধর্ম্ম দ্বারা লোককে চালান ; যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মের দ্বারা লোককে চালান তাঁহাকে কে নিন্দা করিতে পারে ?"

ভিক্ষুরা পথের লোকের ছড়ার উত্তরে এই ছড়া বলিতে লাগিল। তখন লোকে বুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারই চাহেন, আর কিছু নয়, বুঝিয়া নিরস্ত হইল। রাজগৃহের লোকের উত্তেজনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে বুদ্ধের শিক্ষা সমাজের মধ্যে কিরূপ চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

রাজা বিম্বিসারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বুদ্ধ উপর্য্যুপরি তিন বর্ষা রাজগৃহে "বেণুবন-আরামে" যাপন করিয়াছিলেন। বোধিলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর কিছু কিছু সময় নির্ণয় করা যায়, তাহার পরের প্রায় পঁচিশ বৎসরের কোন্ ঘটনা কখন হইয়াছিল তাহার কথা জানা যায় না। ইহার কারণ, যে ঘটনাবলীর সময় নির্ণয়ের সূত্র হইতেছে তিনি কোন্ বর্ষা কোথায় যাপন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ। জীবনের শেষের প্রায় পঁচিশ বৎসর তিনি কোথায় কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, অনুমান হয় তিনি ইহার সব না হইলেও অধিকাংশ শ্রাবস্তীতে কাটাইয়াছিলেন। প্রথম কুড়ি বর্ষার সম্বন্ধেও পালি তিব্বতী ও সিংহলী গ্রন্থে মতভেদ আছে।

বোধিলাভের পর হইতে রাজগৃহে ফিরিবার সময়ের ঘটনা পর্য্যন্ত বিষয়গুলি বিনয়-পিটকের "মহাবগ্গ" নামক অংশের প্রথমভাগে বর্ণিত আছে।

———

বিচিত্র জগৎ

উত্তর কানাডায় রেডিয়ম খনি আবিষ্কার

রেডিয়ম বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান খনিজ দ্রব্য। উত্তর কানাডায় হঠাৎ রেডিয়মের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় সভ্যজগতে কিরূপ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে আমরা তার বিশেষ কোন খবর রাখি না। কি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই খনি আবিষ্কৃত হোল, সে কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর কানাডার গ্রেট বিয়ার লেক।

উত্তর কানাডার তুষারাবৃত পার্ব্বত্যভূমি ও বিরাট সমতল-ক্ষেত্র নানা ধাতুর ভাণ্ডার। **Kootenay, Klondike, Porcupine** প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত খনির কথা ছেড়ে

গ্রেট বিয়ার লেক-এর রেডিয়াম-খনি।

দিলেও ছোট বড় নানা ধরণের খনিতে এই দেশ পরিপূর্ণ। উত্তর কানাডার খনিজ সম্পদ সত্যই অতুলনীয়। এর সবটা এখনও অনাবিষ্কৃত—হাড্‌সন ও পিস্‌ নদীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে এমন সব স্থান আছে যেখানে আজও পর্য্যন্ত কোনো সভ্যমানুষ যায় নি। সে সব জায়গায় আরও কত মূল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার আছে, কে তার খবর রাখে।

রৌপ্য ওদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় একশত ফুট উঁচু তামার পাহাড় চীনদেশের প্রাচীরের মত দেশের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে—যদিও দৈর্ঘ্যে অত বড় নয়, মাত্র ৪০ মাইল—খনির মালিকের পক্ষে তাই বা কম কি? সোনা, লোহাও প্রচুর পাওয়া যায়।

কিন্তু বর্ত্তমানে উত্তর কানাডায় তুষার-মরুতে যে সকল এরোপ্লেন অনবরত যাতায়াত আরম্ভ করেছে, সভ্যজগত থেকে ১৪০০ মাইল দূরে—তাদের উদ্দেশ্য সোণা বা রূপো খোঁজা নয়—এদের চেয়ে লক্ষগুণ দামী জিনিসের সন্ধানে এরা বার হয়েছে—সেই মূল্যবান জিনিষটি রেডিয়ম।

এরোপ্লেন হইতে গ্রেট বিয়ার লেকের দৃশ্য।

ক্যান্‌সার রোগের চিকিৎসার জন্য রেডিয়ম্‌ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রেডিয়ম ছাড়া ক্যান্‌সারের আজকাল আর কোনো চিকিৎসা নেই—পৃথিবীর বাজারে এই জন্য রেডিয়ম্‌ খুব চড়া দামে খরিদবিক্রী হয়—আরও বিশেষ করে এর দাম এই জন্য বেশী যে সারা পৃথিবীর বাজারে রেডিয়ম পাওয়া যায় মাত্র পৌনে এক সের। এক আমেরিকাতেই ক্যান্‌সার চিকিৎসার জন্য যতগুলি হাঁসপাতাল আছে, তাতে এর তিন গুণ পরিমাণের রেডিয়ম দরকার—কিন্তু পাওয়া যায় কোথায়? পৃথিবীর রেডিয়াম ভাণ্ডারের খবর এমন অবস্থা সেই সময়

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে উত্তর কানাডায় রেডিয়ম খনি আবিষ্কৃত হয়েচে—পৃথিবী শুদ্ধ একটা সোরগোল পড়ে গেল।

গিল্‌বার্ট বাইন নামে একজন লোক ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে রৌপ্য-খনি খুঁজে বেড়াত, এ দিকের প্রত্যেক পাহাড়পর্ব্বত তার সুপরিচিত। আরও কতকগুলি ব্যাপার গিলবার্ড বাইনের সুপরিচিত ছিল।

সংক্ষেপে সে ব্যাপারগুলি এই—

উত্তর কানাডাতে যখন সর্ব্বপ্রথম সভ্যমানুষে আসতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে এখানকার বৃদ্ধ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মুখে তারা প্রবাদ শোনে যে বহুদূরে উত্তরে চিরতুষার-ভূমির মধ্যে কোথায় একটা নদী আছে, যার তীরে তামা পাওয়া

[illegible] আবিষ্কার করেন—চিহ্নগুলিতে পিচব্লেণ্ডের গতি [illegible]

যায়। তাদের কাছে বিশুদ্ধ তামার গড়া কুড়ালি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল হার্ণ নামে হাড্‌সন্ বে কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী জনৈক বৃদ্ধ রেড্ ইণ্ডিয়ান্ পথ-প্রদর্শককে নিয়ে এই অজ্ঞাত তামার খনির সন্ধানে বাহির হন।

বহু বিপদ উত্তীর্ণ হবার পরে হার্ণ এই নদী বার করেন ও এর নাম রাখেন Coppermine ; সেই নামেই এখনও এ নদী পরিচিত। উত্তর মেরু প্রদেশে তিনিই প্রথমে পদার্পণ করেন ইউরোপীয়দের মধ্যে—কিন্তু তামার খনির কাজ তিনি আরম্ভ করতে পারেন নি—নানা কারণে কানাডা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে, কিছুদিন সেখানে থাকবার পরে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে কানাডা গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একজন কর্ম্মচারী এই অঞ্চল জরীপ কর্ত্তে প্রেরিত হন—তিনি রিপোর্ট করেন যে মেরু প্রদেশের প্রান্তসীমাবর্ত্তী বিশাল হ্রদটির (Great Bear Lake) চারধারে বহু পাহাড় আছে, সবগুলিতেই কোবাল্ট ও তামার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাতেও গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোনো কর্ণপাত করেন না। মাত্র বছর দশেক আগে চার্লি স্লোয়ান নামে আর একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি একাই Great Bear Lake-এর তীরে ধাতুর সন্ধানে গিয়েছিল এবং সে ফিরে এসে ধনী ব্যক্তি-

লা বাইন নিজে খনির কাজ পরিচালনা করিতেছেন—সম্মুখে [illegible] লা বাইনকে দেখা যাইতেছে।

দের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতো আর বলতো, কিছু টাকা হোলেই সে একেবারে প্রথমশ্রেণীর খনির সন্ধান সবাইকে দিতে পারে ও খনির কাজ আরম্ভ করে দিতেও পারে—কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

এ সব অতীত কাহিনীর মধ্যে পড়লো। ইতি মধ্যে আকাশপথে চলাচল সহজ হয়ে গেল এরোপ্লেনের অদ্ভুত

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং এর আগে উত্তর কানাডার অজ্ঞাত বিশাল তুষারাবৃত অঞ্চলে যাওয়ার যে কষ্ট ছিল—তাও দূর হয়ে গেল। ১৯২৯ সালে গিল্‌বার্ট বাইন এরোপ্লেনে রওনা হয়ে Great Bear Lake-এ পৌঁছান ও Hunter Bayর ধারে তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন থাকেন। দিন পনেরো পরে চার্লি স্নোয়ান এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাঁরা দুজনে হ্রদের চারধার ঘুরে বেড়িয়ে অনেক তামার খনির সন্ধান পান।

টুনা-শিকারের দৃশ্য।

কিন্তু তামার সন্ধান পেলে কি হবে, তাঁরা ভেবে দেখলেন এ তামা সভ্যজগতের বাজারে গিয়ে পৌঁছানোর কোনো বন্দোবস্ত হবার উপায় নেই—এত খরচ পড়ে যাবে যে তাতে লাভ বিশেষ কিছু থাকবে না। Hunter Bay তামার খনির নিকটতম রেলওয়ে ষ্টেশন এড্‌মণ্টন্ ১৪০০ মাইল দূরে,

ক্যালিফোর্ণিয়ার নীচে ম্যাগ্‌ডালিন্ বে : এই উপসাগর টুনাদের একটি বড়ো রকমের আড্ডা—সম্মুখে টুনা শিকারী জাহাজের দল।

এক টন তামা গেলে তুলতে ৪০০ ডলার খরচ পড়ে—সব দিক বিবেচনা করে গিলবার্ট বাইন দেখলেন যে Great Bear Lake-এর ধারে তামার যত বড় পাহাড়ই থাকুক না কেন—ব্যবসা হিসেবে তা একেবারে অচল। ঠিক এই সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল। অদ্ভুত ব্যাপার—মানুষের ভাগ্যে তা সচরাচর ঘটে না।

তখন আগষ্ট মাসের শেষ—মেরু প্রদেশের শীত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসচে—দিন ক্রমশ ছোট হয়ে পড়চে। বাতাস অসহ্য হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। শীতকাল আসবার বেশী দেরী নেই বুঝে গিল্‌বার্ট বাইন তাঁবু তুলে ফেলে এরোপ্লেনে সভ্য জগতের দিকে রওনা হলেন।

এরোপ্লেন থেকে সে বছরের মত শেষবার Great Bear Lake দেখবার জন্যে নীচের দিকে চেয়ে গিলবার্ট বাইন অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁর নীচে হ্রদের উভয় তীরের পর্ব্বত-শ্রেণী বিস্তৃত—কিন্তু ওপর থেকে তাদের চেহারা দেখাচ্চে অদ্ভুত—পর্ব্বতমালার রং নানা ধরণের, এ যেন রঙের হোলিখেলা—সোনালী, হল্‌দে, সবুজ, ফিকে সোণালী—চারধারে রং-এর ছড়াছড়ি! প্রকৃতি লক্ষ বছর ধরে রঙীন হরফে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে, যে তার ভাণ্ডারে এই সব মূল্যবান জিনিস সঞ্চিত আছে যে পারো নিয়ে
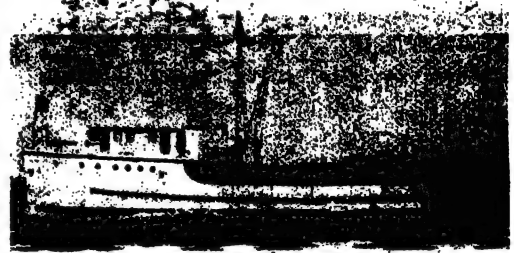
টুনা-শিকারী জাহাজের একটি—নাম ম্যাগেলান।

নাও—কিন্তু এতকাল সে বিজ্ঞাপন কারুর নজরে পড়ে নি, আজ পড়লো গিল্‌বার্ট বাইনের নজরে। গিলবার্ট অভিজ্ঞ খনিতত্ত্ববিদ্, তাঁর বুঝতে দেরী হোলো না যে ঐ সব রঙের অর্থ এই যে ঐ শৈলমালা বিবিধ ধাতুর আকর, ধাতুর রেণু সকল বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে oxidised হয়ে ঐ সব রঙের সৃষ্টি করেচে।

কিন্তু সে বছর আর সময় ছিল না। পরের বছর মার্চ্চমাসে গিলবার্ট বাইন আবার ফিরে এলেন এবং পায়ে হেঁটে হ্রদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আকরের সন্ধান কর্ত্তে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল—তুষারাবৃত শুভ্র ভূমিতে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে অস্বাভাবিক ভাবে

ধক্‌ধক্‌ কচ্ছিল, অনবরত সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর সাথী অন্ধ (snow-blind) হয়ে গেলেন। তবুও তাঁরা অনুসন্ধান করা থেকে বিরত না হয়ে অনবরত চলতে লাগলেন। Echo Bayর তীরে একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে তাঁরা দেখলেন ন' ইঞ্চি চওড়া সবুজ ও কালোরঙের একটা ধাতুর পাড় বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—এ পাথর থেকে ও পাথরে ওঠা-নামা করে যেতে যেতে পাড়টা শেষে হ্রদের জলের তলায় ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। গিলবার্ট নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারলেন না—সেটা যে পিচ্‌ব্লেণ্ড্

জাহাজের গা-ঘেঁষা পাটাতন হইতে 'তিন-ছিপে'র সাহায্যে একটি টুনা-মাছ শিকার।

তা বুঝেও তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস কর্ত্তে সাহস হোল না। পিচ্‌ব্লেণ্ড্ থেকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু রেডিয়ম্ পাওয়া যায়—শুধু মূল্যবান নয়, সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্যও বটে।

গিলবার্টের আবিষ্কৃত খনি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেডিয়ম ভাণ্ডার। ন' ইঞ্চি চওড়া ছুটো পিচ্‌ব্লেণ্ডের পাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়ম পাওয়া যাচ্চে, যার প্রতি গ্র্যামের দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার থেকে পঁচাশি হাজার ডলার। কানাডা গবর্ণমেণ্টের খনিবিভাগের কর্ম্মচারী হিউ স্পেন্স্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে Great Bear Lake খনির একটন পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে দেড়শত মিলিগ্রাম রেডিয়ম পাওয়া যেতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত রেডিয়ম ছিল বেলজিয়ামের একচেটে—বেলজিয়ান কঙ্গো ছাড়া আর কোথাও এতদিন রেডিয়ম পাওয়া যেত না, তাই রেডিয়মের দামও ছিল অত্যন্ত বেশী, উত্তর কানাডায় এই আবিষ্কারের ফলে বোধ হয় রেডিয়মের দাম কমবে।

শুধু তাই নয়, কানাডা গবর্ণমেণ্ট এখন এ অঞ্চলে রেলপথ খুলবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন—নিয়মিত ভাবে এরোপ্লেন চালাবার জন্য কোম্পানী গঠিত হচ্চে, কালে এই দুর্গম ভূভাগে মানুষের যাতায়াত সহজ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

হলদে-ডানা টুনা মাছ শিকার

কালিফোর্ণিয়ার উপকূল থেকে মোটর বোটে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টার পথ দূরে সমুদ্রের মধ্যে টুনা মাছ ঘুরে বেড়ায়। এদের ভ্রমণপথ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত—অনেক সময় টাহিটি, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে টুনা দেখা যায়—

'দুই-ছিপে'র টুনা-শিকার।

টুনা মাছ-ধরা শুধু সৌখীন আমোদ নয়, বিশেষ একটি লাভজনক ব্যবসাও বটে।

আমেরিকান, পর্ত্তুগিজ, ইটালিয়ান, জাপানী সব জাতির ধনী জেলেরা কালিফোর্ণিয়ার উপকূলে বড় বড় দামী মোটর বোট রেখেছে টুনা মাছ ধরার জন্যে। এই সব মোটর বোটের তোড়-জোড় ও আসবাব পত্র যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য এবং

শুধু টুনা শিকারের উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরী—তিমি মাছ শিকারের জন্যে যেমন তিমি-ধরা জাহাজ (whaler), টুনা-ধরার জন্যে তেম্‌নি এই সব বোট (tuna-clipper)।

টুনা-শিকারের বিপদ পদে পদে। টুনা খুব বড় ও জোরালো মাছ—বোটের ডেক থেকে অনেক সময় শিকারীকে টেনে নিয়ে জলে ফেলে দেয়—আর একবার ও অঞ্চলের সমুদ্রে পড়ে গেলে প্রাণ বাঁচানো দায়—মানুষ-খেকো হাঙর, নিষ্ঠুর করাত মাছ,খুনী তিমি প্রভৃতিতে উষ্ণমণ্ডলের মহাসাগর পরিপূর্ণ থাকে—কতবার কত হতভাগ্য শিকারী জলে পড়ে রাঙা রক্তের ফেণার মধ্যে অতল তলে ডুবে গিয়েছে আর ওঠে নি।

টুনা মাছ যাযাবর জাতীয় এবং বহুদূরবিস্তৃত সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে। টুনা মাছের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় এক জাতি ইংলণ্ডের উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়—এর আরও দুই শ্রেণী আছে—'নীল ডানা' ও skip jack—এই দুই শ্রেণীর মাছ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। হলদে-ডানা টুনা অত্যন্ত জোরালো মাছ, ওজনেও প্রায় ৫০০ পাউণ্ডের উপর। বঁড়শীতে বিঁধ্‌লেও এদের টেনে বোটে তোলা খুব সহজসাধ্য মোটেই নয়—অনেক সময় মোটর-বোট শুদ্ধ উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

টুনা মাছের টোপের জন্যে এক একটা বোটের চৌবাচ্চার মধ্যে দশ বারো হাজার শার্ডিন মাছ জীয়ানো থাকে। উপকূল থেকে দূরে বোট নিয়ে গিয়ে এই সব শার্ডিন চার পাশের জলে ছড়ানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে টুনা মাছ প্রকাণ্ড হাঁ করে শার্ডিন গুলোকে খেতে আসে। অল্পক্ষণের জন্য একটা বিপুল হলদে রঙের প্রাণীদেহ দৃষ্টিগোচর হয়, নতুন রূপোর টাকার মত চক্‌চকে উজ্জ্বল তার পেটটা, তার বিপুল হাঁ দেখে মনে হয় বুঝি ত্রিভুবন গ্রাস করে ফেলতে চায়—এই হোল বিখ্যাত হলদে-ডানা টুনা। বঁড়শীতে ধরা পড়লে নানা কলকৌশলে একটু একটু করে তাকে বোটের ওপর ওঠাতে হয়—অনেক সময় মাছের মর্জ্জি ও খেয়াল মত ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্ত তার পেছনে পেছনে বোট নিয়ে ঘুরতে হয়, তবুও তাকে কায়দার মধ্যে ফেলা যায় না, এমনি একগুঁয়ে দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির মাছ এই টুনা।

টুনা মাছের সঙ্গে সঙ্গে আসে মানুষ-খেকো হাঙর ও মার্লিন জাতীয় করাত-মাছ। করাত মাছের আক্রমণ-পদ্ধতি অভিনব ধরণের, শিকারের সাম্‌নে এসে এরা জল থেকে লাফ মেরে শূন্যে ওঠে, তার পর শিকারের ওপর আছড়ে পড়ে পেছন থেকে তীক্ষ্ণধার করাত তার পিঠে বিঁধিয়ে দেয়। হাঙর আসে ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের সাম্‌নে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই, ক্ষুধার জ্বালায় তারা হিংস্র উন্মত্ত হয়ে বেড়ায়। সামনে যা পড়ে তাকেই আক্রমণ করে। টুনা-শিকারী জেলে এই মৃত্যুসঙ্কুল সমুদ্রের মাত্র কয়েক ফুট ওপরে লোহার জাল্‌তিতে পা রেখে মাছের সন্ধানে জলের দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—একটু বোটের দুলুনিতে যদি পা পিছ্‌লে যায়—তাহোলে নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু।

জাহাজের ডেকে ধৃত টুনার রাশ।

শুধু বোটের দুলুনির জন্যে নয়, অনেক সময় টুনামাছের গায়ে কলের বর্শা ছুঁড়তে সামান্য দেরী হোলে কিংবা ঠিক জায়গায় না বেঁধাতে পারলে, মাছের বিপুল লাফানি-ঝাঁপানিতে জেলেকে বোট থেকে জলে পড়তে হয়—৫০০।৬০০ পাউণ্ড ওজনের সুবৃহৎ সামুদ্রিক মাছকে বোটে তোলা সহজ ব্যাপার নয়।—এ সকল কার্য্যে যারা অভ্যস্ত নয়—তারা আধঘণ্টা লোহার জাল্‌তির পাটাতনে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার পরে কিংবা দু'তিনটা মাছ গেঁথে তুলবার পরে একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে, তার পর আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবে না, পা কাঁপতে থাকবে, এ অবস্থায় তার জলে পড়ে যাবার আশঙ্কা খুব বেশী। কিন্তু একজন পাকা টুনা-শিকারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানে দাঁড়িয়ে মাছ মারবে, হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাড়া থাকবে পাটাতনের ওপর, ক্লান্তি অনুভব কর্‌লেও তাকে সে আমল দেবে না।

কি ক'রে তারের সমতা ঠিক রাখতে হবে, কোন্ অবস্থায় কি ভাবে মাছের গায়ের কোন্ অংশে বর্শা বেঁধাতে হবে—এইটাই টুনা শিকারের আসল কথা। অভিজ্ঞ শিকারী চোখে মাছটা একবার এক চমক দেখেই সব বুঝে নেবে—আনাড়ি লোক যেখানে ব্যগ্র ভাবে বর্শা ছুঁড়ে নিজেকে ও বোটটাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে—অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেখানে বর্শা তুলবেও না যত বড় মাছই হোক্ না কেন। এই বিচারের ক্ষমতা একদিনে গড়ে উঠে না। ধীরে ধীরে বহুদিন-ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে জন্মায়।

টুনা শিকারে এই রকম বঁড়শী, আঁকড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়—মাথার টোপও দ্রষ্টব্য।

ব্যাপার যদিও খুব সহজ নয়, তবুও অনেক আনাড়ি লোকে টুনা মাছ ধর্ত্তে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার ডলার উপার্জ্জন করা টুনা-মাছ-শিকারীর পক্ষে খুব কঠিন নয়—অর্থের লোভে চীন ও জাপানের উপকূল থেকে অনেক সময় গরীব জেলেরা ছোট ছোট নৌকায় টুনা ধর্ত্তে আসে—এসে কত সময় প্রাণ হারায়। তবুও আসতে ছাড়ে না।

অনেক সময় টুনাকে বঁড়শীতে গেঁথে তুলবার আগেই হিংস্র হাঙরে তার পিঠের কি পেটের খানিকটা অংশ তীক্ষ্ণ দাঁতে কেটে নেয়—রক্তে সমুদ্রের জল লাল হয়ে যায়—মাছটা যন্ত্রণায় ঝটাপটি কর্ত্তে থাকে—জেলে হুম্‌ড়ি খেয়ে জলে পড়ে যেতে যেতে অতি কষ্টে বেঁচে যায়, ছোট নৌকা উল্টে যাবার উপক্রম করে—সে এক সঙ্কটজনক মুহূর্ত্ত। ওদিকে হাঙরের ঝাঁক ওৎ পেতে আছে মানুষটা একবার জলে পড়লে হয়, ঠিক সময়ে মাছটাকে বর্শায় না বিধ্‌লে—পর মুহূর্ত্তেই সেটা আবার জলে গিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি তাকে জল থেকে তুলবার চেষ্টা কর্ত্তে হয়—নৌকার লোকে তখনি বড় বড় বাঁশের লগি জলে আছড়াতে থাকে ও চীৎকার কর্ত্তে থাকে—অনেক সময়ে এতে হাঙরের দল ভয় পেয়ে জলমগ্ন ব্যক্তির কাছে আসতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা চামড়ার ছোট ডোঙ্গা জলে ফেলে দেওয়া হয়—তার ওপর চড়ে বসে লোকটা জল থেকে উঠে আসে।

অনেক সময় হাঙরের মুখ থেকে টেনে বার করে টুনা-শিকারীকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিবাষ্টিয়ান গুলার্ড খুব নাম-জাদা জেলে ও অভিজ্ঞ শিকারী, সে একবার টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়—সেই জাহাজের কাপ্তেন তখনি হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে গুলার্ডের দুই হাত ধরে তাকে টেনে তুলতে যান—তখন একটা ক্ষুধার্ত্ত হাঙরে গুলার্ডের একখানা পা ধরেচে—হাঙরটার সঙ্গে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তবে গুলার্ডকে টেনে তোলা হয়।

'অর্কা' হাঙরের কর্ত্তিত মুড়া ও ডানা।

জোয়োকিম মেডিনা একজন বিখ্যাত টুনা-শিকারী। সে একবার বোটের জালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে

হঠাৎ জলে পড়ে ও পায়ে ভারী বুট থাকায় তখনি জলে ডুবে যায়। জলে হাঙরের দল গিজ্‌গিজ্‌ করছিল; সবাই ভাবলে মেডিনাকে আর পাওয়া যাবে না—কিন্তু একটু পরেই সে জলের ওপর ভেসে উঠল ও গোটা দুই হাঙরের মুখে ঘুসি মেরে তাদের সরিয়ে দিয়ে সাঁত্‌রে এসে বোটে উঠ্‌ল—কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার খুবই কম ঘটে।

কালিফোর্নিয়ার উপকূলের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এক ধরণের বিশালকায় সামুদ্রিক জন্তু প্রায়ই দেখা যায়—তাদের নাম leopard shark বা বাঘা হাঙর। এদের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ১০০ ফুটের বেশীও হয়ে থাকে। এরা খুব হিংস্র নয়, টুনা মাছের ঝাঁকের কাছে জলের ওপর ভেসে এদের প্রায়ই রোদ পোয়াতে দেখা যায়—এরা একটু অলস প্রকৃতির কিংবা শরীরের বিশালতার জন্যে বোধ হয় তেমন নড়তে চড়তে পারে না। কিন্তু তবুও এদের উপস্থিতি অন্যদিক থেকে বোটের লোকজনকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে—এদের বিরাট পুচ্ছ আন্দোলনে নৌকার হাল কিংবা স্ক্রু ভেঙে যেতে পারে। Leopard sharkকে তাড়িয়ে দেওয়াও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়—একবার 'এমা' নামক মোটরবোটের কাপ্তেন একটা leopard sharkকে কোনো কৌশলেই তাড়িয়ে না দিতে পেরে, তার ভাসমান পিঠটার ওপরে লাফিয়ে পড়ে লাথি, কিল, ঘুঁসি অজস্রবর্ষণ করেও তাকে তাড়াতে পারে নি। হাঙরটা তাকে গ্রাহ্যও করে নি—সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবেই তেমনি রোদ পোয়াতে লাগ্‌ল—একটুও নড়্‌ল না।

এদের শত্রু হচ্ছে অর্কা জাতীয় অতি হিংস্র হাঙর। অর্কা আকারে বেশী বড় নয়, কিন্তু জলের মধ্যে তীর বেগে ছুটে leopard sharkএর পিছনে দাঁত বসিয়ে বসিয়ে রক্তপাতে তাকে দুর্ব্বল করে ফেলে, সামনের দিকে কিছুতেই যায় না—leopard sharkএর মুখের হাঁ অতি ভয়ানক জিনিস, তার সামনে এরা টিঁকৃতে ভরসা করে না, তাই কাপুরুষের মত বার বার পেছন থেকে আহত করে, leopard shark ভারী শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে তেমন পারে না বা মুখ ঘুরিয়ে কামড়াতে পারে না—অজস্র রক্তপাতে দুর্ব্বল হয়ে শেষে ক্ষুধার্ত্ত অর্কার ঝাঁকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

টুনা-শিকার অতীব লাভজনক ব্যবসা। দু' তিন মাস মাছ ধরে জেলেরা প্রায় এ থেকে গড়ে ত্রিশ চল্লিশ হাজার ডলার আয় করে। ১৯২৯ সালে লুসিটানিয়া মোটরবোটের কাপ্তেন দেড় মাসের মধ্যে তের শো টন টুনা মাছ ধরে ছিলেন, যার দাম অন্ততঃ পক্ষে এক লক্ষ বিশ হাজার ডলার। সাধে কি লোকে টুনা-শিকারে যায় এত বিপদ সত্ত্বেও!

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

থেল্‌সের বাণী—

থেল্‌স্ ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং প্রথম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে পাঁচটি প্রশ্ন করে। তিনি সেই সব প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, বহুযুগের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েও, সেগুলি অপরিবর্ত্তনীয় হয়ে আছে।

সৃষ্টির মধ্যে কি সব চেয়ে সুন্দর?

এই পৃথিবী।

সব চেয়ে শক্তিশালী কি?

প্রয়োজন।

সব চেয়ে সহজ কি?

উপদেশ দেওয়া।

সব চেয়ে কঠিন কি?

নিজেকে জানা।

সুখের জন্য সব চেয়ে কি প্রয়োজন?

সুস্থ দেহ এবং প্রশান্ত অন্তঃকরণ।

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুবোধ মল্লিক অনেকক্ষণ হইতেই বলিতেছিলেন, 'বাঃ, আপনি ত' বেশ খেতে পারেন মশাই ! আমার বেশ লাগে ভাই, এ-সব জিনিস যারা বেশি খেতে পারে তাদের আমি বড় ভালবাসি। আর ওই সব পেঁচি মাতাল যেগুলো, একটু খেয়েই মাতলামি করতে থাকে, ওদের আমি দেখতে পারি না। নিন্—ধরুন।'

বলিয়া এক গ্লাস শেষ করিতে না করিতেই আবার আর একটি গ্লাস তিনি শ্রীহর্ষের হাতে ধরাইয়া দিলেন।

ভাবিয়াছিলেন, এমনি করিয়াই তাহাকে মাতাল করিয়া ফেলিয়া তিনি তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিবেন।

কিন্তু কূট বুদ্ধিতে শ্রীহর্ষ তাঁহার মাথায় চড়িতে পারে।

সে একবার আড়-চোখে তাকাইয়া দেখিল, সুবোধবাবু তাঁহার নিজের গ্লাসটা কৌশলে টেবিলের নীচে ঢালিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে সমান সমান খাইবার ভাণ করিতেছেন।

চমৎকার !

শ্রীহর্ষ তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে কথা কহিতে সুরু করিল, দেখিয়া মনে হইল, নেশায় যেন সে চুর হইয়া গেছে। এবং সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবোল-তাবোল্ বকিতে বকিতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। দেওয়ালের কাছে একটা সাদা মার্ব্বেল পাথরের টেবিলের উপর নানা রকমের কয়েকটি সেণ্টের শিশি সাজানো ছিল, সেইখানে গিয়া একবার দাঁড়াইল, এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিল, আর্শীতে একবার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর সেণ্টের একটি শিশি খুলিয়া এসেন্সটুকু মাথায় ঢালিতে যাইতেছিল, সুবোধবাবু হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিলেন।—'করছেন কি মশাই, সেণ্ট কখনও মাথায় নেয় নাকি ? দাঁড়ান্।' বলিয়া ভায়োর-লোশনের শিশি হইতে ছিপি খুলিয়া খানিকটা লোশন্ তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া, জামায় খানিকটা অডিকোলন্ ছিটাইয়া বলিলেন, 'বাস্ এইবার চলুন ত' দেখি বসুন ওইখানে। আমার একটি ভারি গোপনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে।

এই বলিয়া একরকম টানিতে টানিতে সুবোধবাবু আবার তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

কিন্তু শ্রীহর্ষ চেয়ারে কিছুতেই বসিবে না। বলিল, 'না, আমি দাঁড়িয়ে থাকব। পা ঝুলিয়ে বসা আমার অভ্যেস নেই।"

অথচ সুবোধবাবু তাহাকে বসাইবেই।

দু'জনে রীতিমত ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইয়া গেল।

সুবোধ মল্লিক এই রকম একটা কিছু করিবার জন্য আগে হইতে বোধহয় প্রস্তুত হইয়াই ছিল। পকেট হইতে তৎক্ষণাৎ একটা পিস্তল বাহির করিয়া বলিল, 'বাস্, দিই তাহলে এইখানেই শেষ করে'! আমার কথা শোনো বলছি, চুপ করে' বসে' বসে যা করতে বলছি কর।'

বলিয়া এক হাতে সে তাহার বুকের কাছে পিস্তলটা ধরিয়া আর এক হাত দিয়া টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা কাগজ ও একটা ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া বলিল,—'এইখানে এই টিকিটের ওপর আপনার একটা নাম সই করে' দিন।'

কাগজের উপর চার পয়সার একটি টিকিট পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখা হইয়াছে, ফাউণ্টেন পেনটাও খোলা।

একেত' শ্রীহর্ষর নেশা এমন বিশেষ কিছুই হয় নাই, তাহার উপর লোকটার ব্যাপার দেখিয়া নেশা তাহার যেটুকুও বা হইয়াছিল তাহাও ছুটিয়া গেল। তবু সে নেশার ভাণ করিয়া তাহার মুখের পানে একবার মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল, 'সহি করে' দিতে হবে ? কেন বাবা ?'

সুবোধবাবু এইবার একটুখানি জোর গলায় বেশ রুক্ষ-কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'যা বলছি করুন, কৈফিয়ৎ পরে হবে।'

বলিয়াই গলার আওয়াজ এবং মুখের চেহারা তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সুকৌশলে পাল্টাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই, আজ আপনাকে কিছু টাকা দেবো। বাড়ীটা কেনবার বায়না। তাই একটা রসিদ লিখিয়ে নিচ্ছি। নিন, চট্ করে' সইটা করে' দিন।'

শ্রীহর্ষ চোখ দুইটা তাহার বড় বড় করিয়া এমনি ভাব দেখাইল, মনে হইল যেন টাকা পাইবার নামে সে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'টাকা! কত টাকা আজ দেবেন? দিন।'

বলিয়া সে হাত পাতিয়া বসিল।

সুবোধবাবু বলিলেন, 'দিচ্ছি, আগে সই করুন না।'

'এই যে, সই আমি করে দিচ্ছি মাই ডিয়ার সার্, কিন্তু কত টাকা লিখব বলুন সার্!'

'সে সব আমি ঠিক করে' নেবো শ্রীহর্ষ বাবু, আপনি শুধু নামটি সই করে' দিন।'

শ্রীহর্ষ তৎক্ষণাৎ টিকিটের উপর তাহার নিজের নামের পরিবর্ত্তে লিখিল শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ নাম সে কেন লিখিল জিজ্ঞাসা করিলে কি যে সে বলিবে তাহার জবাবটাও সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, বলিবে—ইহাই তাহার আসল নাম। শ্রীহর্ষ বলিয়া সকলে তাহাকে ডাকে বটে, কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহার নাম নয়।

সুবোধবাবু কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করিলেন না। টিকিটের উপর সে নাম লিখিয়াছে তাহারই আনন্দে তিনি তখন আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন। কালই তিনি এই কাগজের টুকরাটাকে মোটা টাকার একটা হাণ্ডনোট তৈরি করিয়া লইবেন ভাবিয়া কাগজ ও কলম শ্রীহর্ষের হাত হইতে একরকম কাড়িয়া লইয়াই ড্রয়ারের ভিতর বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। রিভলভারটা অন্যত্র রাখিয়া দিয়া সুবোধবাবু হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আপনার নেশা একটু বেশি হয়ে পড়েছিল, তাই পিস্তলটা বের করেছিলাম, বুঝলেন? নেশা ছুটিয়ে দেবার এমন সুন্দর জিনিস আর কিছু নেই।'

শ্রীহর্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত পাতিয়া বলিল, 'কিন্তু টাকা ত' কই দিলে না সার্।

সুবোধবাবু বলিলেন, 'বায়নার টাকা কত আর দেবো? দশ-পনেরো টাকা? কি বলেন?'

শ্রীহর্ষ আপত্তি করিল না। বলিল, 'তাই দিন। আমার শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে, আমি বাড়ী যাব।'

সুবোধবাবুও তখন তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচেন, শ্রীহর্ষও পালাইতে পারিলে বাঁচে।

সুবোধবাবু ডাকিলেন, 'বেয়ারা!'

বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলেন; 'সোফারকে ডেকে দাও।'

সোফার আসিল। সুবোধবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গাড়ী ঠিক আছে?'

সোফার বলিল, 'জি, হাঁ।'

'এই বাবুর বাড়ীতে এঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

আদেশ পাইয়া সোফার চলিয়া গেল।

সুবোধবাবু ভাবিয়াছিলেন, টাকার কথা শ্রীহর্ষ বোধ হয় আর তুলিবে না। কিন্তু সোফার চলিয়া যাইবামাত্র সে আবার হাত পাতিয়া বসিল। বলিল, 'কই, দিন।'

সুবোধবাবু তাঁহার পকেটে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন।—'আমার মণিব্যাগ?'

শ্রীহর্ষ হাঁ করিয়া বসিয়াছিল। বলিল, 'ও-সব চালাকি রাখুন সুবোধবাবু, টিকিটের উপর আমি লিখে দিয়েছি আপনি টাকা দিন।'

কিন্তু সুবোধবাবু এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। মণিব্যাগ তাঁহার সত্যই হারাইয়াছে।

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আমি কাল সকালে আর একবার আসব সার্, টাকাটা কালকেই দেবেন তাহ'লে।'

'তাই দেবো। কিন্তু মণিব্যাগটা—তার ভেতর... অনেক কিছু...' বলিতে বলিতে তিনি একবার নীচের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ভিতর বাড়ীতে সন্ধান করিতে গেলেন।

সেখানেও না পাইয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীহর্ষ চলিয়া গেছে। জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, দরজায় তাঁহার গাড়ীটাও নাই।

শ্রীহর্ষ বাড়ী ফিরিতেই উমা বলিল, 'এরই মধ্যে এলে? খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল?'

শ্রীহর্ষের হাতে একটি শালপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙা। আসিবার পথে গাড়ী থামাইয়া খাবার সে দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। ঠোঙাটা উমার হাতে দিয়া বলিল, 'নাঃ খাবার শেষে রাস্তা থেকে কিনে আনলাম। ভারি ক্ষিদে পেয়েছে।'

উমা বলিল' 'সে কি গো? এই যে বলে গেলে খেয়ে আসবে।'

'নাঃ, খেয়ে আর আসলাম না।' বলিয়া শ্রীহর্ষ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

খাবার ঠোঙাটা খুলিয়াই উমা কিন্তু একটুখানি বিস্মিত হইয়া গেল। দেখিল, প্রচুর খাবার। এত খাবার সে নিজের পয়সা খরচ করিয়া আনিয়াছে উমা সেকথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, 'নিজে এই এত খাবার কিনে আনলে? নিজের পয়সায়?'

শ্রীহর্ষ হাসিতে লাগিল। বলিল, 'যারই পয়সায় হোক্ তুমিও খাও না!'

'হাসছো যে?'

'আজ কিছু লাভ করেছি।'

উমা বলিল, 'নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে লাভ?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'হ্যাঁ। ব্যাটা ভেবেছিল আমি মুরুক্ষু মুরুক্ষু মানুষ, বাড়ীটা আমার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে বাগিয়ে নেবে। কিন্তু উলটে জব্দ হয়ে গেল।'

এই বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে শ্রীহর্ষ তাহার পকেট হইতে সোনার একটি চেন-ঘড়ি ও একটি মণি-ব্যাগ বাহির করিয়া কত টাকা সে আজ লাভ করিয়াছে তাহারই হিসাব করিতে লাগিল। সোনার চেনটা হাত দিয়া আন্দাজি ওজন করিয়া বলিল, 'ভরি-চারেক্ হবে। তাই বা মন্দ কি! আর এই মণি-ব্যাগের ভিতরে ছিল সাড়ে চার শ' টাকার নোট, দু'খানি গিনি, আর কয়েকটা খুচরো টাকা। লাভ আজ একরকম ভালই হলো, তুমি কি বল?'

ব্যাপারটা উমা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তবু তাহার কেমন যেন একটা বিশ্রী সন্দেহ হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি ও-সব না বলে ওর বাড়ী থেকে চুরি করে' নিয়ে এলে নাকি?'

শ্রীহর্ষ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, আচ্ছা বোকা মেয়েত! বলে কয়ে আনতে গেলে এ-সব কেউ কখনও দেয়? তুমি দিতে?'

উমা বলিল, 'ছিঃ এ তোমার ভারি অন্যায়।'

'অন্যায়?' বলিয়া শ্রীহর্ষ তাহাকে জোর করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। বলিল, 'শোন তবে কি হয়েছিল, খাবার দেবে এর পর। ব্যাটা সাঙ্ঘাতিক লোক।' এই বলিয়া সুবোধ মল্লিক কেমন করিয়া তাহাকে মাতাল করিয়া পিস্তল দেখাইয়া একটা টিকিটের উপর নাম সহি করিয়া দিতে বাধ্য করিল এবং সে-ই বা কেমন করিয়া মদ না খাইয়া নিজের নামের পরিবর্ত্তে টিকিটের উপর অন্য নাম লিখিয়া দিয়া কৌশলে এই সব জিনিষ লইয়া তাহারই মোটরে চড়িয়া বাড়ী আসিয়াছে সবিস্তারে তাহাই বর্ণনা করিয়া বলিল, 'এবার কই বল ত' দেখি কার দোষ?'

পিস্তলের নাম শুনিয়া উমা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বলিল, 'এমন করে' কেউ ডাকলে তুমি আর যেয়ো না কিন্তু। সর্ব্বনাশ!'

উমা খাবার ধরিয়া দিল। বলিল, 'ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে, বোসো।'

শ্রীহর্ষ খাইতে বসিস। উমা কিন্তু তখন তাহার চুরি করার অপরাধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। শুধু তাহার মনে হইতেছিল, স্বামী যদি তাহার বুদ্ধিমান না হইত তাহা হইলে লোকটা হয় ত' এই বাড়ীটা পাইবার লোভে স্বামীকে তাহার গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতেও পারিত। কলিকাতা শহরে এমন কত হয়

উমা তাহার কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'হ্যাঁগা ওই সব লোকগুলো এমনি করে বুঝি? গুলি করে' মানুষ মেরে ফেলে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'না না, মারবে কেন? ভয় দেখায়। ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেয়।'

উমা বলিল, 'ওই একই কথা। ভয় যারা দেখাতে পারে তারা মারতেও পারে!—ছাখো তুমি যেন এমন করে' আর কোথায়ও যেয়ো না বাপু! ছি ছি, বাড়ীঘর দোর থাকলেও জ্বালা, না থাকলেও জ্বালা।'

এই বলিয়া শ্রীহর্ষের মুখের পানে তাকাইয়া কি যেন সে চিন্তা করিতে লাগিল।

শ্রীহর্ষ দেখিল, ভয়ে মুখখানি তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। হাসিয়া বলিল, 'কি ভাবছ?'

উমা বলিল, 'আর যদি কোনোদিন এমনি বিপদ-আপদ হয় ত' এই আমি তোমাকে বলে রাখলাম বাপু, যা লিখতে

বলবে তাই যেন তুমি লিখে দিয়ে এসো। জীবনের চেয়ে বেশী কিছু নয়। না হয় জানব আমাদের কিছুই ছিল না।'

শ্রীহর্ষের নেশা যে একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। নেশার ঝোঁকেই উমাকে আজ সব কথাই সে খুলিয়া বলিয়াছে তাহা না হইলে তাহার সঙ্গে হয় ত' সে কোনও কথাই বলিত না। উমার কথা শুনিয়া শ্রীহর্ষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উমা বলিল, 'হাসি নয়। সত্যি বলছি, এমন বিপদে পড়ার চেয়েও এ বাড়ী তুমি বিক্রি করে' দাও। তারপর আমরা যেমন গরীবের মতন ছিলাম বরং তেমনি থাকব।'

শ্রীহর্ষ এইবার যেন আরও একটুখানি উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'হেঁ হেঁ বাবা, এইবার পথে এসো! গরীব হ'য়ে থাকার সুখ কত! এ-সব কোনও হাঙ্গামা থাকবে না, কিচ্ছু না—'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, উমা কিন্তু তাহার মুখের উপরেই এমন ভাবে হাসিয়া ফেলিল, মনে হইল শ্রীহর্ষ যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেছে। প্রচুর টাকার মালিক হইয়াও কৃপণতা করিয়া গরীব সাজিয়া থাকার মধ্যে কি সুখ সে যে আবিষ্কার করিয়াছে সেই জানে, উমা কিন্তু তাহাতেও সুখ পায় নাই। বলিল, 'তাই বলে তোমার মত গরীব সেজে থাকতেও চাই না। এই এত বড় রাজবাড়ীর মতন বাড়ীটা দেখলেই যখন লোকের চোখ টাটাচ্ছে, তখন এই বাড়ী তুমি দাও বিক্রি করে', তারপর চল একখানি ছোটো খাটো বাড়ী তৈরি করে অন্য কোথাও থাকি গে।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'বিক্রিই করব, কিন্তু যাকে-তাকে যা-তা দামে ত' বিক্রি করতে পারি না।'

শেষ পর্য্যন্ত ইহাই স্থির হইল যে, কালই শ্রীহর্ষ একজন এটর্নীর কাছে গিয়া সব বুঝিয়া-সুঝিয়া বাড়ীখানি বিক্রি করিবার জন্য একজন দালাল নিযুক্ত করিবে।

কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে সব সময় তাহা হয় না। কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া যে সব কিছু গোলমাল হইয়া গিয়া তালগোল পাকাইয়া যায় কাহারও বলিবার উপায় নাই।

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া গেল।

একে ত' সুবোধ মল্লিকের বাড়ী হইতে ফিরিতেই শ্রীহর্ষের রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর খাওয়া শেষ হইতে আরও রাত্রি হইল, শুইল যখন—তখন যে কত রাত্রি কে জানে। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গেছে, দম দিলেও সেটা আর চলে না। সম্ভবত সারাইবার দরকার।

শ্রীহর্ষ শুইয়া পড়িল। উমার তখনও খাওয়া শেষ হয় নাই। ঘুমন্ত মেয়েটাকে পাশের ঘরে শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উমার তখনও অনেক কাজ। শুধু খাওয়া শেষ হইলেই হইবে না, সকড়ি মুক্ত করিতে হইবে, হেঁসেল গুছাইতে হইবে, রান্নাঘর পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার পর ছুটি।—তা হোক্। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে কোনো দিনই সে কুণ্ঠিত নয়। তাহার উপর মনে তাহার আজ খুশীর আর অন্ত নাই। স্বামী আজ তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিয়াছে, পরামর্শ করিয়াছে। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া উমা আজ বহুদিন পরে এঁটো বাসন-কোসন পরিষ্কার করিতে করিতে আপন মনেই গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একবার সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, ঘরের দেওয়ালের গায়ে তসবিরগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইলেক্‌ট্রিকের আলোটা দুলিতে আরম্ভ করিল।

তবে কি ভূমিকম্প হইতেছে নাকি?

পাড়াপড়শীর বাড়ী হইতে একসঙ্গে অনেকগুলা শাঁক বাজিয়া উঠিল। ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘরের জিনিসপত্র পড়িতে লাগিল!

উমা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওগো, ভূমিকম্প হচ্ছে যে! ঘুমোচ্ছ নাকি?'

শ্রীহর্ষের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।　　　(ক্রমশঃ)

মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন সাধনার ধারা

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

১

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে উত্তর ভারতে যে সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার মূলসূত্রগুলির পরিচয় ইতি-পূর্ব্বে দিয়েছি।* সেই সম্পর্কে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক কবীরের সাধনার মূলকথাগুলিও আলোচনা করেছি। কবীর ছিলেন যোগ-সাধনায় সিদ্ধ—সে যোগ তিনি পেয়েছিলেন নাথ-পন্থীদের থেকে, কারণ তাঁর দোহায় নাথ-পন্থীদের আদিগুরু গোরখনাথ, রাজা ভর্তৃহরি প্রভৃতি সাধকের নাম পাওয়া যায়। কবীরের কাম্য ছিল সহজজ্ঞান, আর তাঁর দেবতা ছিলেন রামচন্দ্র, সে রামচন্দ্র নির্গুণ ও শূন্যস্বভাব।

ঠিক ঐ যুগে দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্রদেশে যে এক প্রবল ভক্তিসাধনা প্রসার লাভ করেছিল তারই কিছু পরিচয় এ প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করব। এ সাধনারও উদ্ভব হয়েছিল ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ভিতর—আর এ'র সব চেয়ে বেশী প্রসার হয়েছিল নামদেব তুকারাম প্রভৃতির হা'তে—যাঁরা ছিলেন শূদ্র। রামানুজ আচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রভাব এ সম্প্রদায়ের ওপর যে না পড়েছিল তা' নয় তবে বর্ণাশ্রমের কোন ছাপ তা'তে নেই।

মহারাষ্ট্রদেশে এই নূতন সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব কোন সময়ে হয় তা' সঠিক বলা যায় না। তবে এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানদেব ত্রয়োদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন—নামদেব খুব সম্ভবতঃ জ্ঞানদেবের অব্যবহিত পরেই তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করেন। আর তুকারাম ও তাঁর শিষ্যা বহিনা-বাইয়ের কাল সপ্তদশ শতক।

এই সম্প্রদায়কে সাধারণতঃ 'বিথলভক্ত' বলা হয়। 'বিথল' বা 'বিথোবা' বিষ্ণু শব্দ থেকেই উদ্ভূত—প্রাকৃতে ছিল বিঠ্‌ঠু। বিথলকে মহারাষ্ট্রীয় সাধকেরা 'পাণ্ডুরংগ' আখ্যাও দিয়ে থাকেন। পাণ্ডুরঙ্গ হচ্ছে ভীমানদীর তীরবর্ত্তী পণ্ঢার-পুরের প্রাচীন নাম—আর এই পণ্ঢারপুরই হ'ল বিথলভক্তদের প্রধান তীর্থ। অন্যতীর্থে এঁদের বিশ্বাস নেই—সেই জন্যই বিথলভক্তরা বলেন যে—পণ্ঢারপুর পরিত্যাগ করে যা'রা অন্যতীর্থ ভ্রমণ করে তা'দের হীরক পরিত্যাগ করে বালুকা-রাশি গ্রহণ করা হয়, গোদুগ্ধ পরিত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে তণ্ডুলোদক ভিক্ষা করা হয়। তাই বহিনাবাই এই পাণ্ডুরংগ-ক্ষেত্র বা পণ্ঢরীপুর দর্শনে আনন্দে বিভোর হ'য়ে বলেছেন—

> তীর্থী তীর্থরাব তী এক পংঢরী।
> পাহতা পৃথ্বীবরী আণিক নাহীঁ॥
> ধন্য তে দৈণাচে যেথী প্রেমসুখ।
> সদা নাম ঘোষ মুখী বসে॥
> ভীমা চংদ্রভাগা দোহীঁচা সংগম।
> নাংদে মেকধাম পাংডুরংগ॥
> পুণ্যপুষ্পাবতী তীর্থী বেণুনাদ।
> সপ্রেম গোবিংদ ক্রীড়া করি॥

অথবা অন্যত্র—

> ধন্য ধন্য তে পুংঢরী। জেথেঁ নাঁদতো শ্রীহরি।
> ধন্য ধন্য চন্দ্রভাগা। জেথেঁ বসে পাণ্ডুরংগা।
> ধন্য ধন্য কে পদ্মাল। জেথেঁ রাহিলে গোপাল।
> ধন্য ধন্য বেণুনাদ। জেথেঁ ক্রিড়ৎসে গোবিন্দ।
> ধন্য ধন্য বালুবট। জেথেঁ উভ পাখীঁ বিট।
> ধন্য ধন্য পুষ্পাবতী। জেথেঁ বৃন্দা হে শ্রীপতি।
> বহিণী মৃহণে ধন্য ধন্য। পাণ্ডুরংগী জে অনন্য।

এই সম্প্রদায়ের হাতেই মহারাষ্ট্র দেশে এক নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি হয়। কবীরের ন্যায় সংস্কৃতকে 'কূপজল' ও ভাষাকে 'বহতানীর' স্পষ্ট করে না বললেও এ সম্প্রদায়ের লেখকদের মনের ভাব ছিল অনেকটা তাই। সেই জন্য জ্ঞানদেব প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করে সংস্কৃতে রচনা না করে মহারাষ্ট্রী ভাষাতেই শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার এক বিপুল টীকা প্রণয়ন করেন। সে টীকা ছন্দোবন্ধে লেখা। এ ছন্দের নাম হচ্ছে 'অভঙ্গ' এবং অভঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এই সম্প্রদায়ের লেখকদের হাতে। জ্ঞানদেবের রচিত টীকাই বোধ হয় ভারতে গীতার প্রথম ভাষ্য-টীকা। উত্তর ভারতে মধ্যযুগের সাহিত্যে 'দোহা'

* উপাসনা—১৩৩৯, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮১-৮৭।

যে স্থান অধিকার করে মহারাষ্ট্রী সাহিত্যে অভঙ্গেরও সেই স্থান। নামদেব, তুকারাম, বহিনাবাই প্রত্যেকেই অভঙ্গ রচনা করে গেছেন। আর জ্ঞানদেব গীতার টীকা ব্যতীত তাঁর অন্যান্য বাণীও অভঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এই সব অভঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুর স্থান নাই—তার মধ্যে অনেক মর্ম্মস্পর্শী কবিতারও সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সম্প্রদায়ের সাধকেরা জাতিবিচার মান্‌তেন না। বেদ ও বর্ণাশ্রমেও তাঁদের কোন আস্থা ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ওপর তাঁরা বহু স্থানে কটাক্ষপাত করেছেন। প্রাচীন পন্থানুযায়ী পূজাতেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। নামদেব বলেছেন—পাথরের দেবতা কখনো কথা বলে না, কি করে সে সংসার থেকে ভক্তকে মুক্ত করবে? সত্যদেবতা পৃথক। তাই তাঁর মতে বাইরের পূজায় মোক্ষলাভ হয় না, তীর্থব্রতেও পুণ্যসঞ্চয় হয় না। কিন্তু সেই নামদেবই পণ্ঢারপুরের বিঠ্‌ঠলকে পূজা করতেন। এ পূজায় তিনি যে বিঠ্‌ঠলের শিলামূর্ত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তা' নয়। তাঁর বিঠ্‌ঠল সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে বিরাজমান। যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই তাঁর বিঠ্‌ঠলের লীলা চল্‌ছে। তাঁর নিকট বিঠ্‌ঠল ব্যতীত আর কিছুর সত্তা নেই। এই বিঠ্‌ঠলের সঙ্গে মিলিত হওয়াই ছিল নামদেবের প্রধান কাম্য—সেই মিলন-সাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে মানস-পূজা। যমনিয়মে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না—তা'তে যে প্রকৃত চিত্ত-শোধন হয় না সে কথা তিনি জান্‌তেন। তাই তাঁর মতে বিনয় ব্যবহার, স্বার্থত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম প্রভৃতি গুণই হচ্ছে সব চেয়ে বড়। এই সব গুণ লাভ করলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়—বিঠ্‌ঠলে তন্ময়তা আসে ও তার সঙ্গে মিলন ঘটে।

তুকারামের সাধনাও নামদেবের শিক্ষার অনুসৃতি। তুকারাম জাতিতে শূদ্র, কিন্তু বহুদিন ধরে পুরুষানুক্রমে বিঠ্‌ঠলের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে ছিলেন গৃহস্থ। পরে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন ও পণ্ঢারপুরে বিঠ্‌ঠলের ভক্ত হয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। অভঙ্গ রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত প্রায় ১৩০০০ হাজার অভঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। তিনিও অন্যান্য সাধকদের ন্যায় বেদ-প্রামাণ্যে বিশ্বাস করতেন না ও জাতিবিচার মান্‌তেন না। ভক্তিমার্গই ছিল তাঁর নিকট সর্ব্বপ্রধান। বিঠ্‌ঠলে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর প্রেমে ভরপুর হ'য়ে তন্ময় থাকাই ছিল তাঁর সহজ সুখের অবস্থা।

বিথল সম্প্রদায়ের সাধিকাদের ভিতর বহিনাবাই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম ও ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি নিজের রচিত অভঙ্গ সমূহে তাঁর জীবনের ও সাধনার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এই অভঙ্গগুলি প্রাচীন মহারাষ্ট্রী সাহিত্যের রত্নবিশেষ। ইলোরার নিকটবর্ত্তী দেবগ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে বহিনার জন্ম হয়। শিশু বয়সে বহিনার বিবাহ হয় ও বিবাহের পরেই তিনি কোলাপুরে যান। কোলাপুর ছিল তৎকালীন ধর্ম্মপ্রচারের এক বড় কেন্দ্র—আর বহিনা ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণা। কোলাপুরে তুকারামের ধর্ম্মোপদেশ শুনে তাঁর ধর্ম্ম-পিপাসা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল ও তিনি তুকারামের থেকে মন্ত্রগ্রহণ করলেন। এ'তে তাঁকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ তুকারাম ছিলেন জাতিতে শূদ্র ও বহিনার স্বামী ব্রাহ্মণ। বহিনা কিছুতেই বিচলিত না হয়ে তাঁর ধর্ম্মজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

বহিনার অধ্যাত্ম জীবনের যে পরিচয় পাই তাতে প্রাচীন পন্থার কোনই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না। বহিনা জাতিবিচার মান্‌তেন না, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—

> শ্বেত তো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আরক্ত।
> বৈশ্যবর্ণ পীত নাহীঁ ঐসে।
> কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র নাহীঁ ঐসা ভেদ।
> আবৃত্তাজা বাধ সারিখাচী।
> বহিণী ম্হণে বর্ণ ব্রাহ্মণ তো নহে।
> বিবেচুনি পাহেঁ মনামাজীঁ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় আরক্ত, বৈশ্য পীত আর শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এ সব ভেদ নাই। সবার আকৃতিই এক প্রকার। বহিনা বলেন রং নিয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—একথা সত্য। আকৃতিতে ব্রাহ্মণের চিহ্ন থাক্‌লে যদি ব্রাহ্মণ না হয় তাহ'লে সত্য ব্রাহ্মণ কে?

> ব্রহ্মভাব দেহীঁ সদা সর্ব্বকাল।
> ব্রাহ্মণ কেবল তোচি এক ॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা দেহ মধ্যে ব্রহ্মভাব পোষণ করেন তিনি একা ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণত্ব কোন বিশেষ বর্ণে নিবদ্ধ নয়—স্বকীয় সাধনার প্রভাবে সকলেই এ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। সাধনমার্গে যে সব উপায় অবলম্বন করে সিদ্ধিলাভ

করতে হয় সেগুলি হচ্ছে বহিনার মতে নামকীর্ত্তন এবং প্রেম ও ভক্তি সাধনা। নামকীর্ত্তন করতে হবে বিঠ্ঠলের, প্রেম ও ভক্তির আধারও হচ্ছেন বিঠ্ঠল। তাঁর প্রেমে পাগল হতে পারলেই তন্ময়তা আসে—আর তন্ময়তাই হচ্ছে সাধকের কাম্য। পথ-প্রদর্শক হচ্ছেন গুরু সুতরাং—গুরুও শুদ্ধ ভক্তির পাত্র।

কিন্তু নামদেব, তুকারাম ও বহিনার কোন রচনাতেই যোগমার্গের কথা নাই—তা'ই মনে হয় যে তাঁ'দের সাধনায় যোগের কোন স্থান ছিল না। অথচ বহিনা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার হিসাব দিতে গিয়ে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধদের নাম করেছেন। এই সব গুরুদের প্রবর্ত্তিত সাধনমার্গে হঠযোগ প্রবল ছিল। জ্ঞানদেবের অভঙ্গে সেই সাধনার ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই মনে হয় উত্তর ভারতে কবীর যেমন প্রাচীন সাধনা ও নূতন রামানন্দী মর্ম্মবাদের সামঞ্জস্য বিধান করে এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্মবাদ প্রচার করেছিলেন মহারাষ্ট্র দেশে জ্ঞানদেবও তাই করেছিলেন। কবীরের শিষ্য-সম্প্রদায়ের ভিতর যেমন সে সাধনার আর সম্পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যায় না, জ্ঞানদেবের পরবর্ত্তী সাধক নামদেব তুকারাম ও বহিনার সাধনায়ও তেমনি প্রাচীন সিদ্ধদের অথবা জ্ঞানদেবের শিক্ষার ছাপ আর স্পষ্টভাবে ধড়া পড়ে না।

২

জ্ঞানদেব স্বরচিত গীতাভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তি-নাথ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন। সে প্রমাণ তাঁর অনেক 'অভঙ্গের' ভণিতা থেকেও পাওয়া যায়। এই সব ভণিতায় কোথাও নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব উভয়েরই নাম পাওয়া যায়—যেমন "নিবৃত্তি জ্ঞানদেব উভয়তাঁচে বোলু", আবার কোথাও বা জ্ঞানদেব নিবৃত্তিনাথের থেকে প্রাপ্ত 'গুহ্যাতিগুহ্য' প্রকাশ করছেন এ কথারও উল্লেখ আছে—যেমন—

> গুহ্যার্চে হী গুহ্য নিবৃত্তিনেঁ দাবিলেঁ।
> মীচ বাচা হো বোলেঁ বোলতসেঁ।

নিবৃত্তিনাথের গুরুপরম্পরার পরিচয় বহিনাবাইয়ের অভঙ্গে পাওয়া যায়। বহিনার মতে "আদিনাথ শিব পার্ব্বতীকে এক মন্ত্র দিলেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ মৎস্যগর্ভ থেকে সেই মন্ত্র শুন্‌তে পেলেন, তাঁর প্রগাঢ় ভক্তিযোগে সেই শিবমন্ত্র প্রভাবসম্পন্ন হ'ল। মৎস্যেন্দ্র সেই মন্ত্র গোরখনাথকে দান করলেন। গোরখনাথের কৃপায় সে মন্ত্র গৈনী নাথ পেয়ে দয়াপরবশ হয়ে নিবৃত্তিনাথকে তা' প্রদান করেন ও জ্ঞানদেব নিবৃত্তির থেকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।"*

এই গুরুপরম্পরার উল্লেখ জ্ঞানদেবও তাঁর 'জ্ঞানেশ্বরী'তেও করেছেন। সেখানে গুরুপরম্পরার যে নামগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে—ত্রিপুরারী, মৎস্যেন্দ্র, চৌরঙ্গী, গোরক্ষ, গীন, গৈণি, ও নিবৃত্তিনাথ।

> ক্ষীরসিন্ধু পরিসরীঁ। শক্তীচ্যা কর্ণকুহরীঁ॥
> নেণোঁ কৈ শ্রীত্রিপুরারীঁ। সাঁগিতলে জেঁ॥
> তেঁ ক্ষীরকল্লোলা আঁত। মকরোদরীঁ গুপ্ত॥
> হোতা তয়াচা হাত। পৈঠেঁ জালেঁ॥
> তো মৎস্যেন্দ্রসপ্তশৃঙ্গী। ভগ্নাবয়বা চৌরঙ্গী॥
> ভেটলা কীঁ তো সর্ব্বাঙ্গীঁ। সংপূর্ণ জালা॥
> মগ সমাধী অব্যত্যয়া। ভোগাবী বাসনা যা॥
> তে মুদ্রা শ্রীগোরক্ষায়া। দিধলী মীনীঁ॥
> তেনেঁ যোগাব্জিনী সরোবর। বিষয়বিধ্বংসৈকবীর॥
> তিয়ে পদীঁ কা সর্ব্বেশ্বর। অভিষেকিলে॥
> মগ তিঁহী তে শাম্ভব। অদ্বয়ানন্দ বৈভব।
> সম্পাদিলে সপ্রভব। শ্রীগৈণিনাথা॥

এই গুরুপরম্পরা যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতে হ'বে যে জ্ঞানদেব প্রাচীন সিদ্ধপন্থীদের সাধনার ধারাই পেয়েছিলেন। এ গুরুপরম্পরা যে কল্পিত এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। জ্ঞানদেব

> * আদিনাথেঁ উপদেশ পার্ব্বতীসী কেলা।
> মৎস্যেন্দ্রেঁ একিলা মচ্ছগর্ভী॥
> শিবহৃদয়ীঁচা মন্ত্র সৈঁ অগাধ।
> জালাসে প্রসিদ্ধ ভক্তি যোগেঁ॥
> তেণেঁ ত্যা গোরক্ষা কেলেঁ কৃপাদান।
> তেথোনি প্রকট জ্ঞাণ গহিণী প্রতি॥
> গহিনীলেঁ দয়া কেলী নিবৃত্তিনাথা।
> বালক অসতা যোগরূপ॥
> তেথোনী জ্ঞানেশ পাবলে প্রসাদ।
> জালে তে প্রসিদ্ধ সিদ্ধাসনী॥

ত্রয়োদশ শতকের লোক, সেই হিসাবে মৎস্যেন্দ্রনাথের কাল দশম শতকে টেনে নেওয়া চলে; আর মৎস্যেন্দ্রের কাল যে দশম শতকের চেয়ে প্রাচীন নয়—তা'র অন্যান্য প্রমাণও আছে। সিদ্ধপন্থীদের শিক্ষা ভারতের নানাস্থানে অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্যাপৃত হয়েছিল। সে শিক্ষার প্রভাব রামানন্দ ও কবীরের অধ্যাত্মবাদে বহু পরিমাণে ধরা পড়ে, আর জ্ঞানদেবের অভঙ্গগুলি আলোচনা করলেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনিও সিদ্ধপন্থীদের সাধনার মূলসূত্রগুলি পেয়েছিলেন।

জ্ঞানদেবের অধ্যাত্মবাদের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে যোগ—আর সে যোগ প্রাচীন সিদ্ধপন্থীদের প্রচারিত হঠযোগ। এ'তে ইড়া পিংগলা সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী, আধার মণিপুর অনাহত প্রভৃতি ষটচক্র, সহস্রার, ও নাদবিন্দুর কথা আছে। মন পবন যখন দক্ষিণ ও বামমার্গ বা ইড়া-পিংগলাতে বিচরণ করে তখন মায়া বিদ্যমান, চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না—উন্মনী অবস্থাও লাভ হয় না। কিন্তু মন পবন যখন সুষুম্নাগত অর্থাৎ মধ্যস্থিত নাড়ী দিয়ে ঊর্দ্ধে চালিত হয় তখন চিত্তে সম্পূর্ণ স্থিরতা আসে, মায়ার লীলা বন্ধ হয়; নাদ ও বিন্দু সহস্রদলে মিলিত হয়—ধ্যাতা ধ্যেয়ে বিলীন হয়। এই সকল তত্ত্বের পরিচয়ই জ্ঞানদেবের নানা অভঙ্গ থেকে পাওয়া যায়।

ইড়াও পিংগলা নামক দুই নাড়ীর স্থান দেহমধ্যে—একটী দক্ষিণে অন্যটী বামে সে দুটী হচ্ছে বিপথ।—কিন্তু প্রণব বা অনাহত নাদের স্থান মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীতে। সিদ্ধপন্থীরা তা'কে অবধূতী বলেছেন—জ্ঞানদেব তা'কে অবঘড় বাট বলেছেন—

ইড়া বাম দক্ষিণে পিংগলা।
দোহীঁত যা কলা ব্রহ্মস্থানীঁ।
প্রণব সৈয়া বাপা ধাঁবে অবঘড় বাটে।
নাসিকাচা প্রাণ কোণিঁ মার্গী যেত।
নাদ ছুমছুমিত অনুহাতী।
ইড়ে পিংগলেচা ওব সৈরাঁ দিসতসে।
ত্যাবরী প্রকাশে আত্মতেজ॥

আর যখন মন পবন সুষুম্নাগত হয় তখন অপূর্ব্ব তেজের প্রকাশ হয়—তখন আদি মধ্য অন্ত প্রভৃতি সমস্তই অন্তে বিলীন হয়, আর তেজোময় যোগীর তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি হয়—

ভ্রবা মধ্যে তেজ চন্দ্র সূর্য্যা বিরহিতে।
আদিমধ্য অন্ত সংচলেঁ সে॥
তুর্য্যারূপেঁ তে সুষুম্না প্রকাশলী।
নববিধ অমৃতজলীঁ তয়া তেজা॥

চন্দ্র সূর্য্য সাঙ্কেতিক শব্দ। কবীর ও সিদ্ধপন্থীরা সকলেই যোগের এই সব সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন—জ্ঞানদেবও যোগের কথা বল্‌তে গিয়ে এই সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন। চন্দ্র সূর্য্য বা রবি শশী ইড়া পিংগলা এই দুই নাড়ীর প্রতীক। তার কারণ ইড়া পিংগলাতে যখন প্রাণ বায়ু সঞ্চরণ করে তখন বহির্জগতের সঙ্গে যোগীর সম্বন্ধ অটুট ও তখন দিবা রাত্রি বা কালজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সমাধির অবস্থায় যোগীর কালপ্রবাহ সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না—তখন যোগীর চিত্ত-জগতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতি ত্রিকালের চিত্রের একত্র সমাবেশ হয়—সে সব চিত্রের পারম্পর্য্যক্রমে কোন প্রবাহ থাকে না—সাঙ্কেতিক ভাষায় বলা হয় 'চিত্ত তখন উদয়াস্ত-বিবর্জ্জিত'—এই সব সাঙ্কেতিক শব্দ জ্ঞানদেব বহুস্থানে ব্যবহার করেছেন—

রাত্রি সূর্য্য বাহে দিনু চন্দ্র জারে।
বিপরীত গোমায়ে দেখী পেলেঁ।
উদয় না অস্ত তেথঁ কৈচেনি ত্রিগুণ।
অপনাচি দর্পণ হোউলি ঠেলা॥ —

সারাসার দোঞী ন দিসতী নয়নীঁ।
অবচিতা গগনীঁ বিংবলা দিসে।
লোপলে রবিশশী-তেজ ন মায়ে আকাশীঁ।
মেবশ্যামেঁ মেগাসি লপবিলেঁ।
দিব্যরূপ তেজ তীব্র না তেজবীজ।
কুণ্ডলী বিরাজে লোপলে সূর্য্য॥—

এই সাঙ্কেতিক ভাষায় ইড়াপিংগলাকে কখন কখন গঙ্গা-যমুনা আখ্যা দেওয়া হয়—আর সুষুম্না বা মধ্যনাড়ীকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী জলধারা বলা হয়। গঙ্গা-যমুনার এই অর্থ প্রাচীন সিদ্ধপন্থীদের রচিত বাংলা চর্য্যাতেও ধরা পড়ে। ডোম্বীপাদ বলেছেন—

গঙ্গা জঁউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি জোইআ লীলে পার করেই॥

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্য দিয়ে যে স্রোত বইছে বৃদ্ধা মাতঙ্গি সেখানে নৌকা বাইছেন ও হেলায় যোগীদের পার করছেন।

এ'র গূঢ় অর্থ হচ্ছে যে যোগীজনেরা ইড়া ও পিংগলার মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নায় শক্তিকে প্রবেশ করিয়ে হেলায় মায়াকে অতিক্রম করে সহজানন্দ লাভ করেন। এই কথা জ্ঞানদেবও অনুরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

আলাড়ু আড়ু পালাড়ু আড়ু মধেঁ বহে পাণী।
তিহি সঙ্গী খেলু মণ্ডিলা সিতাদেবী রাণী।
সুখাতি চাংদিনে রাতি।
বহুতেঁ খেলতী যেহু দেখে॥

চর্য্যার মাতঙ্গি ও জ্ঞানদেবের সীতাদেবী একই—যোগীর অধ্যাত্মশক্তির প্রতীক কুণ্ডলিনী। তাই দুজনেই মধ্যবর্ত্তী স্রোতে বা সুষুম্নায় প্রবেশ করে নৌকা বাইছেন ও নানাবিধ ক্রীড়া করছেন—সহজানন্দে বিভোর যোগীর নানাবিধ অনুভূতি হচ্ছে।

শক্তিকে এই পথের শেষ গন্তব্যস্থলে বা সহস্রদলে পৌঁছুতে হ'লে যে ষট্চক্র অতিক্রম করতে হয় তার পরিচয়ও জ্ঞানদেবের অভঙ্গে রয়েছে—

ষট্চক্রেঁ বন্দ নিঘুনিয়া গেলী।
পাহোঁ জো লাগলী তথা গাবা॥

অন্যত্র জ্ঞানদেব এসব চক্রের বিশদ বর্ণনাও করেছেন ও তা'দের নানা তীর্থস্থানের আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে যে তিনি প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র ও সিদ্ধপন্থীদের অনুসরণ করেছেন তা'তে সন্দেহ নাই।

মণীপুর চক্র নাভিস্থান কমল।
সহা অংগুলাচা খেল অসে তেথেঁ॥
বায়ুচক্র অনুহাত হৃদয় অসে এক।
প্রাণাসী নিঃশংক জেথেঁ নেইঁ॥
অগ্নাচক্র ভ্রুবাংগ শোভতেঁ প্রকাশত।
প্রাণাসী উলথাচেঁ তয়াবরী॥
সহস্রদলীঁ ব্রহ্মরন্ধ্র শোভতসে নিলেঁ।
প্রকাশাকে উমালেঁ জেথেঁ অসতী॥—

চহুঁ শূন্যাচা ভেদ কৈসা পহাবা দেহীঁ।
ব্রহ্মরন্ধ্রীঁ নিসন্দেহীঁ নিজবস্ত॥
সাঁবলেঁ সকুমার বিন্দুচেঁ অন্তরীঁ।
অর্দ্ধমাত্রেবরী বিস্তারলেঁ॥
ত্রিকূট শ্রীহাট গোল্লাট তিসরেঁ।
ঔঠপিঠাদী সারে ব্রহ্মাণ্ডাসীঁ॥—

এই সমস্ত চক্র অতিক্রম করে শক্তি যখন শীর্ষদেশে সহস্রদলে পৌঁছে তখন যোগীর সম্পূর্ণ সমাধি লাভ হয়। তখন জ্যোতিরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়—এ ব্রহ্ম শূন্যস্বভাব অর্থাৎ তিনি বর্ণনাতীত, শুধু অনুভবের বস্তু। এই হচ্ছে যোগীর নির্ব্বিকল্প অবস্থা। তখন দ্বৈতজ্ঞান থাকে না ধ্যেয় ধ্যান ও ধ্যাতার মধ্যে প্রভেদ থাকে না—

শূন্যাচা শেবট ডোলাঁ পাহা নিরালা।
নিলবিন্দু সাঁবলা প্রকাশলা।
ব্রহ্ম জ্যোতিরূপ বিসাবলেঁ জেথ।
অনুভব সাণ্ডন্ত পাহা তুম্হী॥
চহু শূন্যা আরুতেঁ মহাশূন্যা পরুতেঁ।
সর্ধাসী পহাতেঁ তেঁচী তেঁগা॥
দিসে তেঁহী শূন্য পহা তেঁহী শূন্য।
দেহা মাজী নিরন্তর ভিন্নরূপ॥
শূন্য নিরশূন্য দোন্হী হারপলীঁ।
তেথুনী পাহীলী নিজবস্তু॥
ধ্যেয় ধ্যান ধ্যাতা নিরসুনী তিন্হী।
ঝালোঁ নিরঞ্জনী অতী লীন॥

এই অবস্থা উন্মনী অবস্থা। তখন অনুভূতি সম্পূর্ণ আনন্দময়। ধ্যেয় ও ধ্যাতায় তখন কোন প্রভেদ থাকে না বলেই চৈতন্য 'সোঽহমস্মি' ছন্দে পরিপূর্ণ। জ্ঞানদেবের কথায় বল্তে গেলে তখন—

উন্মনী সংযোগেঁ গোসাবী বিরাজে।
চহুঁ দেহাচেঁ ওঝেঁ নিবারণী।
সোহমস্মীচে ছংদে পরিপূর্ণ।
বিজ্ঞান হে খুণ জেথেঁ নাহীঁ।
চন্দ্রসূর্যাহুনী তেজ তেঁজগলেঁ।
অব্যক্তেঁ ব্যাপিলেঁ অনুভবেঁ॥

তখন অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয় আর সে ধ্বনি কৃষ্ণের পায়ের নূপুরশব্দের ন্যায় মধুর, যোগীজনের চিত্তহরণকারী। সেই মধুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানদেব বলেন—

হমামারে পোয়া হমামা।
ঘুমরী বাজে ঘুমামা॥
ঘুমরী চা নাদ কানীঁ।
ঘুমরী ঘাল রাণীঁ।
রাণীঁ শীতল ছায়া।
মেলী তুম্হী মায়া।
মারেচে ঘর দুরী।
তুজ মজ কৈঁচী জরী রে পোয়া॥

এই উন্মনী অবস্থা থেকে যোগীর যখন বিচ্যুতি ঘটে তখন তাঁর বিরহের অবস্থা। জ্ঞানদেবও তাই বলেছেন যে সেই সৎ-চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেই বিরহিণীর অবস্থা হয়—সে অবস্থা সাধকের পক্ষে ক্লেশজনক। আমরা কবীরকে এ অবস্থায় দেখেছি—জ্ঞানদেবও যখন সেই বিরহে কাতর হ'য়ে ওঠেন তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণকে পাগলের ন্যায় খোঁজ করেন—

নন্দনন্দনু ঘড়ি ঘড়ি আণা।
তয়া বিণ ন বচতী প্রাণ বো মায়ে।

কৃষ্ণ নীলবর্ণ তাই তখন কৃষ্ণপ্রেমে অধীর জ্ঞানদেব নীলবর্ণ ব্যতীত চোখে আর কিছু দেখ্তে পান না—সমস্ত জগৎ তখন নীলিমাময়—

নীলবর্ণ রঙ্গে নীলবর্ণ বুঝে।
লিলিমা সহজে অকারলী॥
নীলপ্রভা দিসে নীলপণে বসে।
নিলিয়ে আকাশ হরপলে॥

কখনও বা জ্ঞানদেব এই বিরহের অবস্থাতে তুলসীবৃন্দাবন বা মনোপদ্মমধ্যে অতসী-কুসুমকোষের ন্যায় শ্যামল কৃষ্ণের সন্ধান করেন—

অতসিকুসুমকোশ শাম তনু।
তুলসী বৃন্দাবন মাজী॥
মুনীমনোপদ্মদল বিশালজিরে আয়ো।
জলধিশয়ন কমলালয় জীবনু॥
রখুমাদেবীবর বিঠঠলু ঘনানন্দমূর্ত্তি॥

এর থেকে মনে করা উচিত হ'বে না যে জ্ঞানদেব পরবর্ত্তী বৈষ্ণবদের ন্যায় সগুণ দেবতার উপাসক ছিলেন—সিদ্ধপন্থীদের ন্যায় নিরঞ্জন নিরাকার শূন্যস্বভাব হচ্ছে জ্ঞানদেবের প্রধান কাম্য। নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করলেই সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তখন সহজানন্দময় শূন্যস্বভাব ও চৈতন্যময় ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃত স্বভাবের প্রকাশ হয়। আর সেই সমাধি থেকে বিচ্যুতি হ'লেই যোগী যখন নিম্নস্তরে নেমে আসেন তখনই শুধু তিনি নীলবর্ণ অথবা 'অতসীকুসুমকোশ শাম তনু' কৃষ্ণকে দেখ্তে চান। তাই জ্ঞানদেব বলেছেন—

সগুণ দেহ বাপা নির্গুণ মাঝে শীর।
ছাতো ভেদাকার কৈসা পরী॥

দেহ ও 'শীরে'র মধ্যে যে সম্বন্ধ সগুণ ও নির্গুণেও সেই সম্বন্ধ—সেখানে সত্যই কোন ভেদ নাই। আর

নির্গুণাচে রংগী রংগলে হে মন।
সাঁবলে সগুণ ব্রহ্ম তেঁচী॥
মতাভিমানী ঐসা বিশ্বাস ন ধরিতী বচনী।
নির্গুণ সগুণ দোন্ত্রী ভিন্ন অসতী॥

নির্গুণের রঙে যখন মন রঞ্জিত হয় তখনই সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। মতাভিমানীরা সে কথা বিশ্বাস করতে চায় না ও বলে যে সগুণ নির্গুণ দুই পৃথক।

এই হচ্ছে জ্ঞানদেবের সাধনার মোটামুটি কথা। যে ধারা অনুসরণ করে তিনি এই সাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন তা' মধ্যযুগের ভারতের নিজস্ব। খৃষ্টীয় দশম শতক কিম্বা তা'র কিছু পূর্ব্ব থেকেই সিদ্ধপুরুষেরা এই সাধনার ধারা উত্তর ভারতে প্রবাহিত করেন, প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করে সংস্কৃতে এই অধ্যাত্মশিক্ষা প্রচার না করে তাঁরা প্রাকৃত জনের ভাষায় তাঁদের এই গূঢ় শিক্ষা ব্যক্ত করেন—তাই তা' অল্পকালের মধ্যেই ভারতের নানাস্থানে সাধারণের দ্বারে এসে পৌঁছায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় জীবনে তখন ভাঙ্গন সুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তার পিছনে যে অধ্যাত্মসাধনার অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহ চল্‌ছিল তারই—নানা শাখা উপশাখাকে অবলম্বন করে ভারতবাসী বহু শতাব্দী ধরে তার অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটিয়েছে। তাই বর্ত্তমান কালে আমাদের চিত্তজগতে নানা কারণে স্থিরতার অভাব ঘট্‌লেও কবীর নানক দাদু প্রভৃতি সাধকের দোহা—জ্ঞানদেব নামদেব প্রভৃতির অভঙ্গ, বাউল ও রামপ্রসাদের সঙ্গীত আমাদের মর্ম্মে পৌঁছায়, উদাসীযোগীর চিত্র আমাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করে। সেই উদাসী বাউলকে কবীর ও জ্ঞানদেব যে ভাষায় চিত্রিত করেছেন তা' উদ্ধার করেই এ প্রবন্ধ শেষ করব।

বাবা জোগী এক অকেলা, জাকে তীর্থ ব্রত ন মেলা॥
ঝোলী পত্র বিভূতি ন বটবা, অনহদ বেন বজাবৈ।
মাঁগি ন খাই ন ভূখা সোবৈ, ঘর অঙ্গনা ফিরি আবৈ॥
পাঁচ জনা কো জমাতি চলাবৈ তাস গুরু মৈঁ চেলা।
কহৈ কবীর উনি দেসি সিধায়ে, বহুরি ন ইহি জগি মেলা॥

*　*　*

পৈল মেরুচ্যা শিখরী।
এক যোগী নিরাকারী॥
মুদ্রা লাবুনি খেঁচরী।
ব্রহ্মপদী বৈসলা॥
তেণে সাংডিয়েলী মায়া।
ত্যজিয়েলী কন্থা কায়া॥
মন গেলে বিলয়া।
ব্রহ্মানন্দা মাঝারী॥
অনুহত ধ্বনি নাদ। তো পাবনা পরমপদ॥
উন্মনী তুর্য্যা বিনোদে। ছন্দে ছন্দে ডোল তুসে॥

বিক্রমখোল

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন ছিল রবিবার। হাতে কোনো কাজকর্ম্ম ছিল না। স্নান সারিয়া বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় একটা সংবাদ চোখে পড়িল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ঝার্সাগুড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ের গুহায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখিয়া বলিয়াছেন ওটার বয়স অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর। নিকটেই আর একটা গিরিগুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানবের আঁকা ছবিও নাকি আছে।

৭ই মার্চ্চ, সকাল আটটায় সোমড়া হইতে গ্রিণ্ডোলার পথে। সম্মুখে দুইটি মুটে—তাহাদের পৃষ্ঠবিলম্বিত ঝাঁপানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ্ আছে। ইহাদের মজুরী অত্যন্ত কম। ইহাদের একজন মাসে দুই টাকা রোজগারে দিব্য খুসী আছে দেখিলাম, মাসে দশ টাকার প্রলোভনেও সে স্বগ্রাম ছাড়িতে রাজী নয়।

অনেকদিন কোথাও যাই নাই। একঘেয়ে কলিকাতার কর্ম্মক্লান্ত, বৈচিত্র্যহীন জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু যাই বা কোথায়? মনে মনে ভাবিতেছিলাম না হয় একদিন শনি রবিবারে ট্রেণে চাপিয়া ডায়মণ্ডহারবার লাইনে কোথাও বেড়াইয়া আসিব, তবুও প্রথম ফাল্গুনে নতুন ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের দল দেখা যাইবে, ফুলে-ভরা শিমুল গাছও দু'দশটা চোখে পড়িবে। আমের বউলের গন্ধ পাওয়াও বিচিত্র নহে। তা ছাড়া space!—ক'ল্‌কাতায় যা একেবারেই নাই, যার অভাব মনকে সর্ব্বদা পীড়া দেয়, সঙ্কুচিত করিয়া রাখে—ও লাইনে দুধারের দিগন্তপ্রসারী মাঠ ও ঝুঁকিয়া-পড়া নীল আকাশে সে অভাবটা পূর্ণ হইবে।

সোমড়ার হাট। প্রখর রৌদ্রে আশ্রয় ও ছায়া দিবার মতো একটি শালবনের তলে এই হাট সপ্তাহে একদিন বসে। দোকানীদের অধিকাংশই যুবতী স্ত্রীলোক, পুরুষদের সহিত তাহাদের ব্যবহার সহজ, অথচ শালীনতারও অভাব নাই। এ হাটে এখনও 'বার্টার' চলে—এক কুন্‌কী ধানের পরিবর্ত্তে এক পালান্ তিলের তেল পাওয়া যায়। মুদ্রার তেমন প্রচলন হয় নাই। এ হাটেও সস্তা কাঁচের চুড়ীর আমদানি দেখিয়া আসিয়াছি।

হঠাৎ সেদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মনে হইল ডায়মণ্ডহারবারে না গিয়া এখানেই কেন যাই না? এদিকটা আমার একেবারেই অজানা, আর কখনো যাই নাই—সম্বলপুরের নাম শুনিয়াছি বটে—সে রকম তো টোকিও, মেক্সিকো ও হাওয়াই দ্বীপের নামও শুনিয়াছি কিন্তু সম্বলপুর কোন্ দিকে, কেমন জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন—এসব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমার কাছে বলিভিয়া ও সম্বলপুর একই পর্য্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি বা তাদের খোদিত শিলালিপি—নির্জ্জন জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে [illegible] হাজার বৎসর আগে! বেদের মন্ত্র তখন মুখে মুখে রচিত হইতেছে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূভাগে আর্য্য সভ্যতা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে—এত সুপ্রাচীন অতীত দিনের সম্পর্কবিজড়িত স্থানে এই বসন্তের আরণ্য শোভার আবেষ্টনীর মধ্যে দু' একদিন কাটাইয়া আসা—কলিকাতার ট্যাক্সি ও ট্রামের শব্দমুখর রাজপথের ধারের বাসায় বসিয়া সেকথা ভাবিতেও মন কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল!

বিক্রমখোল। উপরে নীচে ও দুপাশে ঘন জঙ্গল। শায়িত অবস্থায় পথ-প্রদর্শক মজুরের দল।

ঠিক করিলাম যাইতে হইবেই, তবে একা গিয়া সুখ নাই, দু' একজন বন্ধুবান্ধবকে দলে টানিতে হইবে। কয়েকজন বন্ধু যাইতে সম্মতও হইলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া ৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইলাম।

যাঁহারা পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে ভালবাসেন এবং যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে বেশী দূর যান নাই, তাঁহাদের একবার এ পথে অন্ততঃ বিলাসপুর পর্য্যন্ত যাইতে অনুরোধ করি। এরূপ অপূর্ব্ব আরণ্যশোভা ঈ-আই-আর-এ দেখা যাইবে না—একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমি মধুপুর হইতে কিউল ও গোমো হইতে গয়ার কথা ভুলিতেছি না, যায়া লুপ লাইনেও অন্ততঃ বার পনেরো বেড়াইয়াছি, তবুও বলি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা হইতে (২৮৭ মাইল) বিলাসপুর পর্য্যন্ত দু' ধারের জনহীন ঘন অরণ্য ও ধূসর শৈল-মালায় দৃশ্য অতুলনীয়, বিশেষতঃ এই প্রথম

বেলা ২॥০ টায় বিক্রমখোলে পৌঁছাইয়া ক্লান্তি অপনোদনের পর।

প্রবেশ-পথের অন্য পার্শ্ব হইতে খোলের দৃশ্য। 'গিরিয়ালি' ফুলের ঘনবন দেখা যাইতেছে। লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে খোলের এপাশে একটি এবং ওপাশে একটি বোর্ড ঝুলিতেছে। একটি বোর্ডে ইংরেজীতে অন্যটিতে উড়িয়ায় লিখিত, দর্শকদিগকে উৎকীর্ণ লিপিগাত্র স্পর্শ করিবার নিষেধাজ্ঞা। দুই বোর্ডের মাঝখানের সমস্ত স্থলটি লইয়া শিলালিপি।

দিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হইলাম। পথে ত্রিগোলা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, সেখান হইতে আমরা দু' তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে পাইলাম। বিক্রমখোল পৌছিতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। এস্থানের কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নাই- গভীর অরণ্যের মধ্যে যে পাহাড়ের গুহায় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুহাটির নামই বিক্রমখোল। স্থানটির দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব---তবে যে পূর্ব্বে খবরের কাগজে বিবরণ পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম বিক্রমখোলের চারিপাশের বনে দলে দলে বন্যহরিণ, সম্বর ও বন্যমহিষ বিচরণ করিতে দেখিব বা দিনে-দুপুরে বাঘকে বনের পথে ওৎ পাতিয়া থাকিতে দেখা যাইবে ইত্যাদি।

বসন্তে, যখন বনে বনে বিকশিত বন্য-পুষ্পের অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য, শাখায় শাখায় নব কিশলয়, আকাশ সুনীল, বাতাসে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর দেহ-সৌরভ—যখন বড় বড় আঁকা-বাঁকা অর্দ্ধশুষ্ক পাহাড়ী নদী গৈরিক বালুরাশির উপর যেন বন্য অজগরের মত অলস ভাবে পড়িয়া রোদ পোহায়, আর্দ্রতাহীন নৈশ আকাশে নক্ষত্র-রাজি লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতে থাকে,' দিনে সামান্য গরম কিন্তু রাত্রির বাতাসে আরামদায়ক শৈত্য—আমার মনে হয় পশ্চিম উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের ঐ সব অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পক্ষে ফাল্গুন চৈত্র মাসই প্রশস্ত সময়।

লেখের কিয়দংশ। ছবি তুলিবার অসুবিধা ছিল বলিয়া সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি লওয়া হয় নাই। লেখের প্রকৃতি ইহা হইতেই স্পষ্ট হইবে। নীচে একটি পশুমূর্ত্তি আছে—মেষ কিংবা গণ্ডার হইতে পারে। এই বিচিত্র লেখ আর যাহাই হোক্ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে। যে কঠিন প্রস্তরগাত্রে ইহা খোদিত হইয়াছে—সুকঠিন অধ্যবসায় ও কঠিনতর অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া এইরূপ লেখা সম্ভব নয়। আমাদের পরিচিত অস্ত্রের কোনও একটির সাহায্যে ইহা খোদিত বলিয়া মনে হয় না।

বেলপাহাড় ষ্টেশনে (৩৮৭ মাইল) আমরা পৌছিলাম পরদিন বেলা দুইটার সময়। রাত্রে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সোমড়া গ্রামের ডাক বাংলায় বিশ্রাম করিয়া পর-

—গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া সে সব কিছু না দেখিতে পাইয়া বোধ হয় বা নিরাশ হইয়া থাকিব।

গ্রিণ্ডোলা গ্রামের ডেরা ঘরের পার্শ্ব পথ।

দৈর্ঘ্যে ২ ফিট্ ও প্রস্থে প্রায় ৩৬ ফিট্ পরিমিত স্থান জুড়িয়া এই লিপিটি কঠিন প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ। এই লেখে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে তাহার বয়স ৪০০০ বৎসর। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত জয়সোওয়াল বলেন ইহা মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত অক্ষর ও অশোকানুশাসনের ব্রাহ্মী অক্ষরের মাঝামাঝি সময়ের—যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্ত্তমান। যাহা হউক সে সকল বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ—লেখের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী বিক্রমখোল-লিপি ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যের যে কয়খানি ফটো তুলিয়াছিলেন, তাহা এখানে মুদ্রিত হইল। স্থানটির অবস্থান ফটো তুলিবার অনুকূল নহে বলিয়া ফটোগুলি আশানুরূপ হয় নাই।

বিক্রমখোল শিলালেখের বয়স ও প্রকৃতি যাহাই কেন হউক না আমার বক্তব্য এই যে,—সম্মুখে ইষ্টারের ছুটি আসিতেছে—যাঁহারা বিদেশে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গতানুগতিক পন্থার পথিক না হইয়া যদি পশ্চিম উড়িষ্যার এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে একবার বেড়াইয়া আসেন—তবে তাঁহাদের অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার বৃথা হইবে না, একথা বলিতে মনে কোথাও বাধে না।

কিন্তু যাঁহাদের হাতে প্রচুর অবসর আছে, অথচ যাঁহারা প্রকৃতিকে ভাল বাসেন তাঁহাদিগকে যাইতে বলি ইষ্টারের ছুটির পূর্ব্বে যে শুক্লপক্ষ শেষ হইয়া যাইবে—সেই সময়ের মধ্যে কোনো একদিনে। ফিরিবার পথে তাঁহারা যেন গ্রিণ্ডোলা হইতে ছই-বিহীন গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার পর রওনা হন এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম শুক্লা নবমীতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় তাঁহারা এমন কিছু লইয়া ফিরিবেন, যাহার স্মৃতি এই কর্ম্মব্যস্ত জনাকীর্ণ সহরের এই কোলাহলের মধ্যে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবসর-বিনোদন করিবে—এমন কিছু আনন্দ, যাহা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট—যাহার অনুভূতি দশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিলেও মিলিত কিনা সন্দেহ—মুক্তরূপা প্রকৃতির ধ্যানমূর্ত্তি বুঝি শুধু ঐ রকম নির্জ্জনে জ্যোৎস্না রাত্রেই মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়—অন্য সময়ে অন্য অবস্থায় নহে।

ভ্রাম্যমান নট ও নটীর দল। পুরুষে ও মেয়েতে দল বাঁধিয়া ইহারা নাচিয়া গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গ্রিণ্ডোলা গ্রামে একটি গাছের তলে কয়েকদিনের জন্য ছাউনি ফেলিয়াছিল। ইহাদের নৃত্যে ও সঙ্গীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই নাই।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[এই বিভাগে কিশোর-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর পাঠযোগ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। বঃ সঃ]

কীর্ত্তি-কাহিনী

প্রাচীন ভারতের এঞ্জিনীয়ার

তাঁর নাম ছিল সূর্য্য। কে তাঁর পিতা, কেই বা দিয়েছিলেন তাঁকে শিক্ষা, তার কথা ইতিহাসে কোথাও লেখে না। শুধু এইটুকু জানা যায় এক দরিদ্র চণ্ডালের ঘরে তিনি লালিতপালিত হয়েছিলেন।

কাশ্মীরে তখন অবন্তীরাজ রাজত্ব করছেন। ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ সেই সময়ে কাশ্মীরের এক নামহীন গ্রামে তখনকার সব চেয়ে বড় এঞ্জিনীয়ার সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রমাগত বন্যার অত্যাচারে কাশ্মীরের তখন মহা-দুর্দ্দিন। দুর্ভিক্ষ তখন নিত্য হয়ে উঠেছে। প্রতি খাড়ি (১০ মণ ১২ সের) ধানের মূল্য ১০৫০ স্বর্ণমুদ্রা হ'ল। ঘরে ঘরে লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করতে লাগল।

বন্যার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কিছুতেও মুক্তি নেই। রাজ্যের যত বিজ্ঞ লোক সকলেই চিন্তিত। কিন্তু কি করে সেই বন্যার হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করা যায় তা তাঁরা কেউ ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলেন না। যজ্ঞ হ'ল যাগ হ'ল, দেবতার নামে বহু জিনিষ উৎসর্গ করা হ'ল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের অত্যাচার দিন দিনই বেড়ে চল্‌ল

এ হেন সময়ে একদিন রাজ-সভায় চণ্ডাল-গৃহে প্রতিপালিত সূর্য্য এসে উপস্থিত হলেন। দ্বিধা না করে বললেন, এই বন্যা আর দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আমি রক্ষা করতে পারি কাশ্মীরকে!

সবাই চমকে তার দিকে চাইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কি উপায়ে?

সূর্য্য বললেন, রাজ-কোষ থেকে মুক্ত হস্তে আমার পরামর্শ মত আপনাকে শুধু অর্থ প্রদান করতে হবে। সভাসদরা সকলে হেসে উঠলো। পাগল!

কিন্তু অবন্তীরাজ সূর্য্যের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাই হবে!

বিতস্তা নদীর তীরে নন্দক গ্রাম। বন্যার জলে নন্দক একেবারে জলমগ্ন হয়েছিল। প্রথমে সূর্য্য সেই গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজকোষ থেকে থলে থলে স্বর্ণমুদ্রা এনে উন্মাদের মত সূর্য্য সেই বন্যার জলে ফেলতে লাগলেন। তারপর নন্দক গ্রাম ছেড়ে যক্ষোদর নগরে এলেন। যক্ষোদরও ছিল জলমগ্ন। সেখানেও তিনি স্বর্ণমুদ্রা তেমনি ভাবে জলের মধ্যে ছড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর এই পাগলামির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাজসভায় সভাসদরা অবন্তীরাজকে তিরস্কার করতে লাগলেন, মহারাজ, একটা পাগলকে নিয়ে আপনি একি ভুল করলেন!

কিন্তু অবন্তীরাজের মন বল্‌ল, তবুও এমন পাগল তো আর দেখিনি! প্রকাশ্যে বললেন, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর! রাজকোষের দ্বার বন্ধ করতে কতক্ষণ?

যক্ষোদর নগরের দুদিকে দুই পাহাড়। এক পাহাড়ের ওপর উঠে সূর্য্য দেখলেন, পঙ্গপালের মত লোক নন্দক আর যক্ষোদর গ্রামের দিকে আসছে! তারা খবর পেয়েছে বন্যার জলের তলায় অজস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আছে। গল্প-কথা নয়—সূর্য্য এখনও দাঁড়িয়ে বন্যার জলে স্বর্ণ-বৃষ্টি করছে!

সেই বন্যার জলের তলায় ছিল পাহাড়-থেকে-খসা বড় বড় পাথর! অর্থের লোভে উন্মাদ হয়ে হাজার হাজার লোক জীবনমরণ পণ করে—সেই সব পাথর সরাতে লাগল! একে দুর্ভিক্ষ, তাতে স্বর্ণমুদ্রা! অসাধ্য সাধন করবার এর চেয়ে বড় প্রেরণা দুর্ব্বল মানুষের আর কি হতে পারে?

সূর্য্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। আনন্দে, আশায় তাঁর বুক ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল।

রাজসভায় বসে কিন্তু লোকেরা যখন পরামর্শ করছিলেন, তখন সূর্য্য বিতস্তা নদীর তীর ধরে জলমগ্ন গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছেন। যক্ষোদর নগরে এসে দেখলেন, দুই পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই দিনের পর দিন পড়ে বিতস্তার ক্ষীণ গতি রোধ করেছে। তাই যখন নদীতে বন্যা আসে, বন্যার জল বেরুবার রাস্তা না পেয়ে, সমস্ত গ্রাম গ্রাস করে ফেলে। সেই পাথর সরিয়ে শীর্ণা নদীকে সংস্কার না করলে বন্যার হাত থেকে মুক্তি নেই! সূর্য্য জানতেন, সহজ ভাবে এই কথা জানালে, সেই ভয়াবহ কাজে হয়ত কাউকেই পাওয়া যেতো না!

স্বর্ণের লোভে বহু লোক সেই জলে দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু দেখতে দেখতে পাথর সরে গেল, বিতস্তার জল বন্ধনমুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। জল নিঃশেষ হওয়া মাত্র সূর্য্য সাতদিনের মধ্যে বিতস্তার মুখে একটা পাথরের বাঁধ বাঁধলেন। তারপর সেই শীর্ণা নদীর তলা থেকে আবর্জ্জনা আর মাটী তুলিয়ে ফেলে বাঁধ আবার ভেঙ্গে দিলেন। বিপুল গৌরবে বিতস্তা সাগরের দিকে ছুটে চলল। জলমগ্ন গ্রাম গুলো আবার মাথা তুলে উঠল। মাঠে মাঠে সোণার ফসল আবার দেখা দিল। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কবি কহ্লণ পণ্ডিত বলছেন, স্নান শেষ করে শ্যামাঙ্গিনী আবার সোণার আঁচল গায়ে জড়াল।

চণ্ডাল-গৃহে পালিত সূর্য্য হলেন রাজ্যের এঞ্জিনীয়ার। তাঁর আদেশে কাশ্মীরে বহু খাল কাটান হ'ল। বামদিকে সিন্ধু আর দক্ষিণে বিতস্তা প্রবাহিত ছিল। এই দুই নদীর ধারাকে তিনি বয়স্বামী বলে এক যায়গায় নিয়ে এসে মিলিত করিয়ে দিলেন। এযে কত বড় দুরূহ কাজ তা বলা যায় না। কিন্তু কহ্লণ পণ্ডিত যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি এই কৃত্রিম সংযোগ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। মহাপদ্ম-হ্রদের জল-প্রবাহকে রোধ করবার জন্যে তিনি ৫৬ মাইল ব্যাপক পাথরের বাঁধ তৈরী করান এবং বিতস্তাকে এনে এই হ্রদের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন। যেখানে মহাপদ্মহ্রদের সঙ্গে বিতস্তাকে তিনি মিলিয়েছিলেন, সেইখানে তাঁর নামে একটা বৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই নগরের নাম হয়, সূর্য্য কুণ্ডল। তিনি এক বিরাট সেতু করেন। সেই সেতুর নাম ছিল সূর্য্য-সেতু। বহুদিন পর্য্যন্ত সেই সূর্য্য-সেতু বিদ্যমান ছিল।

অসমাপ্ত কর্ত্তব্য

একজন বিদেশী পর্য্যটক তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন যে, নগর ছাড়িয়ে এক সুদূর অরণ্যের মধ্যে তিনি বহুকালের পুরানো একটা বাড়ী দেখতে পেলেন। লোকজন কোথাও কেউ নেই। সেই বাড়ীর দরজায় শুধু লেখা, যদি শেষ না কর, তবে আরম্ভ ক'র না।

কোন্ খেয়ালে কে সেই কথা কয়টি লিখেছিল, জানি না। কিন্তু জীবনের সব চেয়ে বড় কথা সে লিখে রেখেছিল, যদি শেষ না কর, তবে আরম্ভ ক'র না।

অসমাপ্ত খণ্ড খণ্ড কর্ত্তব্য পরাজিত জীবনের লক্ষণ। আজ যে কাজ আরম্ভ করলাম, বাধা-বিঘ্ন এল, এল আলস্য। পরের দিন সে কাজ ছেড়ে দিলাম। এমনি করে জীবনের পথে যারা চলে, পথার ধূলার সঙ্গে, তাদের অসমাপ্ত কাজগুলোর মতই, তারাও অদৃশ্য হয়ে যায়। জগতে তাদের দ্বারা কোন কাজ কখনও হবার সম্ভাবনা নেই।

এডিসন যেদিন প্রথম ইলেক্‌ট্রিক আলোর বাতি জাল্‌তে পারলেন, তার পূর্ব্বে তাঁকে ৩৫ হাজার বার পরীক্ষা করতে হয়েছিল। ৩৫ হাজার বার পরীক্ষার ফলে, যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সে কাজ শেষ করলেন।

ডাহ্‌লিয়া গন্ধ-হীন ফুল। মায়াবী লুথার বারব্যাঙ্ক বললেন, ডাহ্‌লিয়াকে গন্ধ-যুক্ত করবো। কুড়ি বৎসর ধরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করার পর ডাহ্‌লিয়াকে তিনি সৌরভময় করে তুললেন।

তুমি, আমি, সবাই পারি, এমনি করে গন্ধহীন এই জীবন-কুসুমকে সুগন্ধে ভরে তুলতে, যদি মনে রাখি, সেই নির্জ্জন অরণ্যের ধারে, সেই পরিত্যক্ত কুটীরের দ্বারে পরিব্রাজক যে কথাটি লেখা দেখতে পেয়েছিলেন—যদি শেষ না কর, আরম্ভ ক'র না!

নব কথা-মালা

সাহিত্যিকের দায়িত্ব

যম-পুরীতে দণ্ড-হস্তে স্বয়ং যমরাজ বিচার করিতেছেন। বিচার-প্রার্থীরূপে সম্মুখে একজন দস্যু এবং একজন গ্রন্থকার উপস্থিত।

প্রথমে দস্যুর বিচার হইল। পৃথিবীতে তাহার বাস করিবার সময় সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। বিচারে,একমাস কাল উত্তপ্ত লৌহ-কটাহের ঢাকনির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার শাস্তি হইল।

তাহার পর আসিল, গ্রন্থকার। যমরাজ তাহার সকল বিবরণ শুনিলেন। বিচারে, অনন্ত কাল জ্বলন্ত লৌহ-কটাহে রাখিবার আদেশ হইল।

একান্ত বিস্মিত হইয়া গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু, একজন নর-ঘাতী দস্যুর সামান্য শাস্তি হইল আর আমি কোনও হত্যা বা চুরি করি নাই—আমার অনন্ত কাল এই কঠোরতম শাস্তি হইল কেন?

তখন যমরাজ বলিলেন, তুমি কি ভয়াবহ অপরাধ করিয়াছ—তুমি জান না! ঐ দস্যু যে অপরাধ করিয়াছিল —পৃথিবীতে চাহিয়া দেখ—তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পরিপূরণ হইয়া গিয়াছে। তুমি যে সমস্ত মিথ্যা-কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছিলে, চাহিয়া দেখ, তাহা পাঠ করিয়া লোকে বিপথ-গামী হইতেছে। তোমার মৃত্যু ঘটিয়াছে কিন্তু তোমার সৃষ্ট মিথ্যাকে তুমি পৃথিবীতে স্থায়ী করিয়া আসিয়াছ। যতদিন পৃথিবীতে তোমার সৃষ্ট সেই সব মিথ্যা-বাণী লোক-জীবনে অনর্থ ঘটাইবে ততদিন এই জ্বলন্ত লৌহ-কটাহে বসিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে।"

মৈত্রী-নির্ব্বাচন

শীতকালের সকাল বেলা। পার্ব্বত্য-প্রদেশে তখনও চারিদিকে বরফ জমা।

একটি গাছের তলায় গতরাত্রিতে একদল যাত্রী তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাত্রে শুক্‌না ডালপালা দিয়া তাঁবুর ভিতরে তাহারা একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া ছিল। প্রভাতে নির্ব্বাপিত অগ্নি ভস্মাকারে পড়িয়া ছিল।

সেই ভস্ম স্তূপের মধ্যে তখনও একটি অগ্নিকণা বাঁচিয়া-ছিল। বাঁচিয়া থাকিবার তাহার বড় সাধ। সেই ভস্ম-স্তূপের মধ্যে থাকিয়া সে ভাবিতেছিল—কোনও বন্ধুর সাহায্য ব্যতিরেকে আর অধিকক্ষণ জীবিত থাকা অসম্ভব। রাত্রিতে যে-সব বন্ধু বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল—তাহারা তো প্রভাতে ভস্মে পরিণত হইয়াছে। শুক্‌না ডালপালা না হইলে তো আর বাঁচা যায় না!

কিছুক্ষণ পরে চাহিয়া দেখিল, মাথার উপরে একটি গাছ রহিয়াছে—একটিও পাতা নাই তাহাতে!

বিরক্ত হইয়া অগ্নি-কণা জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু, তোমার অঙ্গে একটিও পাতা নাই কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রিক্ত-পত্র বৃক্ষ বলিল, আমার যাহা কিছু ছিল, উত্তরী বায়ুকে দান করিয়াছি। এখন এই দীর্ঘ শীতের দিন, সূর্য্যের আলোর অপেক্ষায় আছি।

গাছের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অগ্নিকণা বলিল, এই তোমার দুঃখ? আমি তোমার এই দুঃখ দুর করিয়া দিব। জান, আমি সূর্য্যের সহোদর। এই শীতের আকাশে আমিই তাঁহার প্রতিনিধি। যদি বিশ্বাস না কর, শহরের ফুল-বাগিচার খবর লইও। সেখানে আমারই সাহায্যে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া ফুল-ফুটান হয়। তুমি তোমার দুইটি শুক্‌না ডাল ফেলিয়া দাও, আমি তোমাকে উত্তাপ দিতেছি।

তাড়াতাড়ি ফুল ফুটাইবার আশায় বৃক্ষ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল। অজস্র শুকনা ডাল সে নীচে ফেলিয়া দিল।

আহার পাইয়া অগ্নি-কণা নব-জীবনে জাগিয়া উঠিল। যে ছিল অগ্নি-কণা, সে হইল দাবানল। শিখা বৃক্ষের মস্তকে গিয়া উঠিল। সমগ্র বৃক্ষ তাহাতে জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।

শীতের দ্বিপ্রহরের স্তিমিত সূর্য্য মেঘের আড়াল হইতে তাহা দেখিয়া একটু হাসিলেন।

ধৈর্য্য

একদা বৃদ্ধ এব্রাহাম সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার কুটীরের সম্মুখে বসিয়া আছেন। নিত্য তাঁহার এই কাজ। সেই পথ দিয়া পথ-শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত যে-সমস্ত পথিক যাইত, তিনি তাঁহাদের আহার দিতেন, প্রয়োজন হইলে আশ্রয়ও দিতেন। ভগবানের নাম লইয়া সারারাত্রি ধ্যান করিতেন।

একদিন তাঁহার কুটীর দ্বারে এক অতিবৃদ্ধ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সাগ্রহে এব্রাহাম তাঁহাকে বরণ করিলেন। স্বহস্তে জল দিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। নিজে

সম্মুখে বসিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। প্রতিদিন এব্রাহাম এই কার্য্য করেন কিন্তু আজ তিনি বিস্মিত হইলেন। যে কেহই আসে, সে ভগবানের নাম গ্রহণ করে। আহার-অন্তে ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। কিন্তু এব্রাহাম দেখিলেন, বৃদ্ধ একবারও ভগবানের নাম গ্রহণ করিল না। আহার-অন্তেও বৃদ্ধ ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাইল না।

ক্রুদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিক-প্রবর এব্রাহাম বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপ লোক, একবারও ভগবানের নাম গ্রহণ করিলে না ?

বৃদ্ধ এব্রাহামের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের ভগবানকে আমি এই একশো বছর অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি—"

সেই কথা শুনিয়া ক্রোধে এব্রাহাম বৃদ্ধকে তাঁহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শীতের রাত্রে বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে এব্রাহাম স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার কুটীর আলো করিয়া ভগবান আসিয়াছেন। স্বপ্নে শয্যা ত্যাগ করিয়া এব্রাহাম তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শীতের রাত্রে তুমি বৃদ্ধকে বাহির করিয়া দিলে কেন ?

এব্রাহাম উত্তর দিলেন, প্রভু, সে নাস্তিক, তোমাকে স্বীকার করে না !

প্রশান্ত হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, আজ এই একদিনের একটি কথা তুমি সহ্য করিতে পারিলে না—আমি কিন্তু একশো বছর ধরিয়া উহাকে সহ্য করিয়াছি !

মুদ্রা-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে

আজকাল নিত্য নতুন কত বই-ই না প্রকাশিত হচ্ছে। এত বেশী বই প্রকাশিত হচ্ছে যে, লোকে বলতে বাধ্য হচ্ছে সংখ্যায় বই বেশী বেরুলেও, সারবত্তায় আগেকার লেখার চেয়ে আমাদের যুগের লেখার কম মূল্য। এত যে বই নিত্য প্রকাশিত হতে পারছে, তার অবশ্য একটা বড় কারণ—ছাপাখানার আবিষ্কার। কিন্তু ছাপাখানা এবং টাইপ সৃষ্টি হবার আগেকার যুগে আজকালকার মত অনেক লোকে অবশ্য লিখত না কিন্তু যাঁরা লিখতেন, ছাপাখানা না থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের লেখার আয়তন আজকালকার যুগের সব চেয়ে বড় লিখিয়ে-দের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কি পরিশ্রমই না তাঁদের করতে হয়েছে—তা আজকাল এই সহজ ছাপার যুগে আমরা ভেবে উঠতে পারি না। ছাপাখানা সত্যিকারের গ্রন্থকার তৈরী করে নি। তার কারণ গুটেনবার্গ আসবার আগে এসেছিলেন দান্তে; ক্যাক্‌সটন আসবার আগে এসেছিলেন চসার। গুটেনবার্গের নাম বোধ হয় তোমরা জান—বর্ত্তমান যুগে তিনি মুদ্রাযন্ত্র এবং টাইপ সৃষ্টি করেন। ক্যাক্‌সটন তাঁর ছাপাখানায় কাজ শিখে ইংলণ্ডে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মুদ্রাযন্ত্র আসবার আগেকার সাহিত্যিকের পরিশ্রম এবং লেখার আয়তনের বিষয় আলোচনা করতে হলে—প্রথমে দুজন লোককে নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে—একজন হলেন, দান্তে—ইতালীর মহাকবি, যিনি বিখ্যাত Divina Commedia লিখে জগতে অমর হয়ে আছেন—আর একজন মিল্টন, ইংলণ্ডের মহাকবি। দান্তে হলেন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের আগের যুগের লোক—মিল্টন হলেন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরে প্রথম মহাকবি। এই দুজনের লেখার আয়তন যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, দান্তেই মিল্টনের চেয়ে বেশী লিখেছিলেন।

দান্তের মহাকাব্য তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, (১) Hell (২) Purgatory (৩) Paradise। প্রথম অংশ ৩৪ সর্গে বিভক্ত, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশ প্রত্যেকটি ৩৩ সর্গে বিভক্ত। মোট লাইনের সংখ্যা হচ্ছে ১৪ হাজার। মিল্টনের মহাকাব্য দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত, একটির নাম হ'ল Paradise Lost, অপরটির নাম হ'ল Paradise Regained, মোট লাইনের সংখ্যা হল ১০,৫৫০। এর সঙ্গে তাঁর আর একখানি কাব্য Samson Agonistes যদি ধরা যায়—তা হ'লে তাঁর প্রধান লেখাগুলির লাইন-সংখ্যা হয়, ১২,৩১০। এই দুই মহাকবির আসল কাব্যগুলির আয়তন তুলনা করলে দেখা যায়, যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য না পেয়েও দান্তে মিল্টনের চেয়ে বেশী লিখে গিয়েছেন।

ইংলণ্ডের প্রথম বড় কবি চসারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তাঁর বিখ্যাত Canterbury Talesএর গল্প হয়ত

তোমরা পড়ে থাকবে। তাঁর জীবন এবং সাহিত্যিক সৃষ্টি দেখলে, বেশ বোঝা যায়, কি পরিশ্রমই না তাঁকে করতে হয়েছিল। তিনি রীতিমত একজন ব্যস্ত লোক ছিলেন। রাজ-দরবারে দফতর নিয়ে তাঁকে কেরাণীর কাজ করতে হ'ত; রাজ-দরবারের কাজে দেশ-বিদেশে ছুটতে হ'ত। তাঁর সময়েও মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। মিল্টন আর দান্তে দুজনে যত লিখে গিয়েছেন, চসার একা তার চেয়েও বেশী লিখেছেন। সব শুদ্ধ তিনি প্রায় ৪০ হাজার লাইন লিখেছেন।

এরও ঢের আগেকার যুগের কথা ধরা যাক। ইংলণ্ডে রাজা আলফ্রেডেরও আগে একজন মহাপণ্ডিত লোক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো Bede। তিনি হলেন ইংলণ্ডের প্রথম লোক-গুরু। তিনিই প্রথম দেশের ভাষায় দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে ইংলণ্ডে সেই সময়কার ইংরেজী ভাষায় বই লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর জীবনের অপূর্ব্ব কথা আর একদিন তোমাদের বলব। তাঁর পরিশ্রমের কথা ভাবলে এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও আমরা স্তম্ভিত হই। ত্রিশটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বই লেখেন। এবং প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তিনি অন্ততঃ ১২ খানা করে বই লিখে গিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি সেই সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের একখানা ইতিহাস লেখেন। তাতে তিনি ১ লক্ষ ২০ হাজার শব্দ প্রয়োগ করেন।

দারিদ্র্য আর মহাজনদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে ডাঃ জনসন একা একটা বিরাট অভিধান লেখেন। কিন্তু তাঁর জন্মাবার প্রায় সতেরো শ' বছর আগে ইটালি দেশে প্লিনি বলে এক মহাজ্ঞানী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দারিদ্র্যের তাড়না ছিল না—অর্থ-সংগ্রহের জন্য লেখার তাগিদ্ ছিল না—তিনি ছিলেন সেই সময়কার একজন ধনী ব্যক্তি। কিন্তু জ্ঞান-সাধনায় তাঁর সব চেয়ে বড় প্রেরণা ছিল—তাঁর নিজের অন্তর। তিনি একা কারুর সাহায্য না নিয়ে, একটা অভিধান নয়, একটা সমগ্র Encyclopedia গড়ে' তোলেন এবং ঐ কথাটা তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। জ্ঞান-সাধনার কোন দিকেই গবেষণা করতে তিনি বাকি রাখেন নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি নিজে গবেষণা করে সমস্ত তথ্য নিরূপণ করেন এবং এই সাধনাতেই তিনি অবশেষে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেন। আগ্নেয়গিরির গঠন এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে তিনি বিখ্যাত বিসুবিয়াস্ আগ্নেয়-পর্ব্বত পরিদর্শন করতে বেরন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি যখন বিসু-বিয়াসের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছেন, তখন সহসা সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল। অগ্ন্যুৎপাতের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হল। কিন্তু জ্ঞান-সাধক ভাবলেন, এই তো বিচারের উপযুক্ত সময়! তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সেই রুদ্রলীলা দেখতে লাগলেন। বিসুবিয়াস্ এত রুদ্র আর কখনও হয় নি। তার গলিত-অগ্নি-ধারায় পম্পিয়াই আর হারকিউলেনিয়াম শহর ডুবে গেল এবং সেই সঙ্গে সেই অগ্নি-প্রবাহে ডুবে গেলেন রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধক।

প্লিনি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখে গিয়েছেন—শুধু সেই সব বিষয়ের নাম এক যায়গায় করলে একখানা বড় বই হয়। এক মুহূর্ত্তও তিনি লেখা বা পড়া ছাড়া থাকতেন না। খাবার সময়, হয় পড়তেন, না হয় বলে যেতেন, অন্য লোকে লিখত। স্নানের সময়ও তাঁর সঙ্গে একজন করে লোক থাকত। তার কাজ ছিল তিনি যা বলতেন তা লিখে নেওয়া। রাজ্যের কাজে যখন যাতায়াত করতে হ'ত—তখনও তাঁর সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী থাকতো। রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবে পরিশ্রম করতে হ'ত কারণ তিনি ছিলেন সেই সময়কার একজন বড় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা।

প্রাচীন রোমে আর একজন অদ্ভুত-কর্ম্মা প্রতিভা ছিলেন-তিনি হচ্ছেন ঐতিহাসিক লিভি। ১৪২ খণ্ডে তিনি রোমের ইতিহাস লেখেন। এত বড় এবং এত সুন্দর ইতিহাস প্রাচীন যুগে আর নেই। দুঃখের বিষয়, এই বিরাট সৃষ্টির মাত্র ৩৫ খণ্ড আজ বেঁচে আছে, অপর সমস্তগুলো হারিয়ে বা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এঁদের আগে গ্রীসের অমর নাট্যকারদের দিকে ফিরে চাইলে দেখা যায় যে, যেমন ছিল তাঁদের প্রতিভা, তেমনি ছিল তাঁদের পরিশ্রম করবার অসাধারণ ক্ষমতা। বর্ত্তমান যুগে শেক্‌স্‌পীয়ারের সৃষ্টি দেখে—আমরা বিস্মিত হই। শেক্‌স্-পীয়ার সবশুদ্ধ ৩১ খানা নাটক লিখেছিলেন এবং তা ছাড়া তাঁর যে-সমস্ত কবিতা আছে, সেগুলি মোট ৫০২৫ লাইনের হবে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের নাট্যকারদের দিকে চাইলে—শেক্‌স্‌পীয়ারের সাহিত্যের এই আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে যায়। সফোক্লিস্ ১১৩ খানি নাটক, এস্‌কাইলাস্ ১০০ খানি,

ইউরিপাইডিস্ ৭৫ খানি, এরিস্টোফেনিস্ ৪০ খানি নাটক লিখেছিলেন। অতি দুঃখের বিষয় এই সব নাটকের অধিকাংশই মহাকালের সমুদ্র-তরঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে।

শুধু যে সংখ্যায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা নয়, তাঁদের লেখা সৌন্দর্য্য এবং ভাব-গৌরবে অতুলনীয় ছিল। ইউরিপাইডিসের লেখার সম্বন্ধে সেকালের লোকের ধারণা ছিল যে, ইউরিপাইডিস্ পড়া থাকলে মানুষ মৃত্যুকেও এড়াতে পারে। একবার সিরাকিউস্দের সঙ্গে এথেন্সের ভয়ানক সংগ্রাম হয়। সিরাকিউস্দের এক বিরাট বাহিনী এথেন্স আক্রমণ করল। কিন্তু যুদ্ধে সিরাকিউস্রা হেরে গেল এবং তাদের বহু সৈন্য বন্দী হ'ল। এই বন্দীদের মধ্যে যারা ইউরিপাইডিসের কাব্যের কোন অংশ বলতে পারত—তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ত। আহত হলে, তাদের সেবা করে, সম্মানিত অতিথির মত পরিতৃপ্ত করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত!

* * * *

এমনি করেই যুগে যুগে, বাইরের প্রেরণা বা উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে, প্রতিভা আর পরিশ্রম সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মনে হয়, এই বিংশ শতাব্দীতে, এই গঙ্গার কূলে, সেই নিয়ম, আজ উল্টো হয়ে যেতে বসেছে। প্রতিভা আজ স্বয়ম্ভূ; সৃষ্টি আজ, শুধু ইচ্ছা এবং প্রেসের কম্পোজিং খরচের সংস্থান।

অজানা ভবিষ্যৎ—

ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্কুল ইটনে একজন হেড-মাষ্টার ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ক্লাসে ঢুকেই প্রথম ছাত্রদের অভিবাদন করতেন। একদিন সেই স্কুলের শিক্ষকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি এ রকম করেন কেন? ছাত্ররাই তো আপনাকে প্রথমে অভিবাদন করবে—

বৃদ্ধ হেড-মাষ্টার গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, কে জানে, এই ছাত্রদের মধ্যে আর একজন নিউটন, আর একজন ফ্যারাডে কিম্বা আর এক জন মিল্টন আছে কি না! আমি সেই অজানা ভবিষ্যৎকে অভিনন্দন করি।

লেখনীর ব্যবসায়—

প্রাচীন মিশরের কবর খুঁড়ে যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে কয়েকখানা প্রাচীন বইও ছিল। একটা বই-এ **Tuanf** বলে একজন লোক তাঁর ছেলে **Popi**কে উপদেশ দিচ্ছেন। ছেলে কি ব্যবসায় করবে—তাই নিয়ে **Tuanf** উদ্বিগ্ন। তিনি সকল রকম ব্যবসার বিষয় বিচার করে দেখলেন যে, প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু গলদ আছে। অবশেষে তিনি ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমার জননীকে যে রকম ভালবাস ঠিক সেই রকম ভালবাসবে তোমায় বইকে! এই লেখনীর ব্যবসায় হ'ল মহত্তম শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি।

শেষ দীক্ষা

—শ্রীমুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া

বৈশাখের পূর্ণচন্দ্র স্থির উর্দ্ধে সুনীল অম্বরে,
ভাসায় ধরণীতল অন্তহীন জ্যোছনা-সাগরে।
বিশ্বব্যাপী মহা শান্তি, ধ্যানমগ্ন ঋষির মতন
একাকী জাগিয়া আছে, পাতি শুভ্র বিরাট আসন
নিশীথিনী বক্ষমাঝে। চারিদিক নীরব নিথর,
মন্দগতি সমীরণ, ক্ষীণকণ্ঠ পত্রের মর্ম্মর।
মল্লদের শালবনে আজি বুদ্ধ লভিবে বিরাম
নির্ব্বাণ-আনন্দলোকে—চিরশান্তি জ্যোতির্ম্ময়-ধাম
অদূরে বসিয়া আছে শিষ্যবৃন্দ শিশুর মতন
অসহায়, নীরবে কাঁদিছে সবে, ঝরিছে নয়ন
শ্রাবণের ধারা সম, বনভূমি বিষাদে মগন।
একাকী আনন্দ শুধু—চিরসাথী শিষ্য প্রিয়তম,
বুদ্ধের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট নির্ব্বাক্ নিশ্চল,
শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি, বক্ষ প্লাবি মুক্ত অশ্রুজল।
"আনন্দ!" ডাকিল বুদ্ধ মৃদুকণ্ঠে ধ্যানের আবেশে
অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি, ম্লান হাসি ওষ্ঠ-প্রান্তদেশে।
"কেন বৎস! অকারণে মোর তরে করিছ ক্রন্দন,
কেন বা কাতর সবে, এতো নহে ভিক্ষুর লক্ষণ!
সত্য বটে যাব চলি মর্ত্ত্যলীলা করি সম্বরণ
লোকচক্ষু অন্তরালে, ছিন্ন করি সকল বন্ধন—
জন্ম মৃত্যু রুদ্ধ মম, সিদ্ধ আজি সাধনা আমার;
ব্যথিত মানব-আত্মা শান্ত তৃপ্ত, লুপ্ত অন্ধকার
ধরণীর বক্ষ হতে, নব প্রাণ পেয়েছে মানব
জ্ঞানালোকে মেলি আঁখি, ভুলিয়াছে তুচ্ছ গ্লানি সব।

কর শোক পরিহার, কি আনন্দ আজি শুভক্ষণে
বুদ্ধের শ্রাবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত অচল আসনে—
কণ্ঠে কণ্ঠে সত্যবাণী, বক্ষে জ্বলে প্রেম-হোমানল,
কুণ্ঠাহীন চিত্ত সদা, অকলঙ্ক শুভ্র শতদল—
জগতের দ্বারে দ্বারে মুক্তি-বার্ত্তা করিয়া বহন
বিতরে সুধার অন্ন, আর্ত্তজনে দেয় আলিঙ্গন।
বুদ্ধের প্রতীক সঙ্ঘ, সত্য পথে রবে যতদিন
সাধিয়া আপন ব্রত, ধরাতলে থাকিবে নবীন—
বুদ্ধের অনন্ত সত্তা - বুদ্ধ-বাক্য ধ্রুব সনাতন
আবরি রহিবে সঙ্ঘ, লক্ষ্যপথে বর্ম্মের মতন।
সময় আসন্ন মম, ওই শোন দেবতারা মিলি
অন্তরীক্ষে গাহে গান উচ্চ কণ্ঠে জয়নাদ তুলি,
ঘোষিয়া বিদায়-বার্ত্তা 'তথাগত লভিবে নির্ব্বাণ,
আসিবে না আর ফিরে, জগতের কর্ম্ম অবসান।'

হেনকালে মুখরিয়া শান্ত স্তব্ধ শাল অরণ্যানী
ধ্বনিয়া উঠিল কার ভগ্ন কণ্ঠে সকরুণ বাণী,
"হতভাগ্য আমি অতি বৃথা কাল করেছি হরণ,
মত্ততায় ভুলে গেছি পূজিবারে বুদ্ধের চরণ,
নিষ্ফল মানব-জন্ম, অন্ধকারে আমি শুধু একা
জগতের এক প্রান্তে, সায়াহ্নের রক্তরাগ-রেখা
জীবনে এসেছে নামি, মৃত্যুদূত করাঘাত হানি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে। ঘাটে বাঁধা জীর্ণ তরীখানি,
তব পদতলে বসি ওহে বুদ্ধ, কত নরনারী
লভিয়াছে নব জন্ম, দাও মোরে এক বিন্দু বারি
তব সুধাপাত্র হতে, তাপদগ্ধ দীন অভাজনে,
ধন্য হব নিবেদিয়া শেষ অর্ঘ্য তোমার চরণে।"
সহসা আনন্দ আসি দৃঢ়স্বরে কহিল তখন,
"শান্ত হও! কেবা তুমি এ নিশীথে করিছ ক্রন্দন
বুদ্ধের দর্শন লাগি? নাহি আর সময় তাঁহার,
নির্ব্বাণ-সমাধি-মগ্ন, যাও ফিরে গৃহে আপনার।"

"আমি বৃদ্ধ সুভদ্রক," কহিল সে গদগদ ভাষে,
"দীর্ঘ পথ অতিক্রমি আসিয়াছি, দেখিবার আশে
অনুত্তর বুদ্ধদেবে, দেখি নাই জীবনে কখন,
বিফল হইবে মোর অন্তিমের সাধের স্বপন?"
বৃদ্ধের কাতর ভিক্ষা সিদ্ধার্থের পশিল শ্রবণে,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ, স্নেহপূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণে।
আনন্দে কহেন ডাকি, "বৃদ্ধ দ্বিজে ক'র না বারণ
আসিতে নিকটে মম, অনুতাপে দহিছে জীবন,
জরাজীর্ণ, পথশ্রমে ক্লান্ত অতি; বহুদিন হতে
সে যে মোর প্রিয় বন্ধু, দেখা হবে শেষ যাত্রা-পথে।"
শুনিয়া আশ্বাস-বাণী যুক্তকরে অধীর উল্লাসে
ত্বরিত গমনে বৃদ্ধ সমাগত বুদ্ধের সকাশে,
ভূমিতে লুটায়ে শির ভক্তিভরে প্রণমি চরণে
একদৃষ্টে চেয়ে রয়, অশ্রুপূর্ণ যুগল নয়নে।
প্রসারি দক্ষিণ কর ব্রাহ্মণের মস্তক উপরে
স্মিতহাস্যে বুদ্ধদেব কহিলেন সুমধুর স্বরে,—
"কেন কাঁদ বৃথা বন্ধু। জানি আমি কিসের কারণে
দিলে দেখা অবেলায়, জীবনের গোধূলি-লগনে।
শোন তবে শেষ বাণী শান্তচিত্তে কর অবধান,
দুঃখই চরম সত্য, চিরন্তন আছে বিদ্যমান
সৃষ্টির সর্ব্বত্রব্যাপী "আর্য্য সত্য" এই তত্ত্বজ্ঞান
ভাতিবে হৃদয়ে যবে, কি বিশাল মুক্তির সোপান
হেরিবে সম্মুখে তব "অষ্টমার্গ" ঋজু সুমহান।
ধীর পদে অতিক্রমি যাও চলি, দেখিবে তখন
তৃষ্ণা হবে চির লুপ্ত, জন্মান্তের চক্র আবর্ত্তন
থেমে যাবে চিরতরে ফিরিবে না আর মর্ত্ত্যলোকে,
নির্ব্বাণ-অমৃত-তীর্থে উত্তরিবে উজ্জ্বল আলোকে।"
এতেক বলিয়া বুদ্ধ পুন হন সমাধি-মগন
নিমীলিত যুগ্ম আঁখি, শান্ত স্নিগ্ধ প্রশান্ত বদন।
ক্লান্ত শশী পড়ে ঢলি পশ্চিমের সীমান্ত-রেখায়,
জাগিল না আর বুদ্ধ পাখী কণ্ঠে নবীন উষায়। *

---

* চতুরার্য্য সত্য :—১। দুঃখ ২। দুঃখের উৎপত্তি ৩। দুঃখের নিরোধ ৪। দুঃখনিরোধের উপায়।
দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ :—১। সম্যক দৃষ্টি ২। সম্যক সঙ্কল্প ৩। সম্যক বাক্ ৪। সম্যক কর্ম্মান্ত ৫। সম্যক জীবিকা, ৬। সম্যক ব্যায়াম (exeition) ৭। সম্যক স্মৃতি ৮। সম্যক সমাধি।

তথাগত

শিল্পী—শ্রী নন্দলাল বসু

যস্মিন্ দেশে

—শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত ও
শ্রীহরগোবিন্দ দত্ত চিত্রিত

মহিম চাটুজ্জে প্যাঁকাটির মত শীর্ণ পা দুখানি সবেগে আন্দোলিত করিতে করিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, আরে রাখুন মশাই, হ'লই বা সাহেব, খেলই বা গরু—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ এটা তো মানতেই হবে। স্থান-মাহাত্ম্য ব'লে তো একটা কথা আছে!

হরগোবিন্দ মেলিন্সফুডের শিশির নক্সা আঁকিতে ব্যস্ত ছিল। তেরছা চোখে চাটুজ্জে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া উদ্গত হাসি গোপন করিয়া কহিল, যারা পাহাড় আর সমুদ্রকে শাসন ক'রে উড়োজাহাজে চেপে সারা দুনিয়াটাকে লেবেল করে ছেড়েছে মশাই, ভারতবর্ষে বসে লণ্ডনের টম্যাটো সসের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার গরুর হাড় যারা আকছার চিবোচ্ছে তাদের কথা আলাদা বই কি! তারা আপনাদের এই চটাওঠা চুণবালি-খসা দেশের পাঁজি-পুঁথি মেনে চল্‌বে কেন?

চাটুজ্জে মহাশয়ের মুখ ছিল উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দিকে, টাইপিষ্ট মিস টেরি ওই কোণটাতেই বসে, তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই চাটুজ্জের উত্তেজনা দ্বিগুণিত হইল। ডেস্ক চাপড়াইয়া ঘাড়টা ৭৫ ডিগ্রি এংগেলে বাঁকাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হরগোবিন্দকে দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, আরে বাবা, আপিসটা তো আর শুধু ওরাই চালাচ্ছে না, এই চুণবালিখসা দেশের হতভাগ্য আমরাও তো আছি! ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করতে হয়—দুটো দিন সবুর করলে কি এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হ'ত—তা না এই ভরা পৌষ মাসে—

বোকা সাজিয়া লোক মজানো আর্টিষ্ট হরগোবিন্দের পেশা; পেটে পেটে দুষ্টামি লইয়া এমন নিরীহ গোবেচারি ধরণের মুখ করিতে শিখিতে তাহাকে পাক্কা সাড়ে তিন বছর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল—অন্ততঃ সে নিজে তাহাই রটনা করে। দূর হইতে মিস টেরির প্রতি একটি প্রাণঘাতী নয়নশর ছাড়িয়া মহিম চাটুজ্জেকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, দাদা ঠিক বলেছেন। আবার শুনছি নাকি নতুন আপিসবাড়ী যে জায়গাটার ওপর হয়েছে সেটা ছিল মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে যত বনেদি মুসলমান ওমরাওদের কবর-খানা। মাম্‌দো ওমরাও ভূতেরা—

ডিপার্টমেণ্টাল হেড গ্রিয়ার্সন সাহেবের জুতার মসমস্ আওয়াজ শোনা গেল। হরগোবিন্দ কথা না থামাইয়াই বলিয়া চলিল—প্রোপোরশনটা কি বিপিন বাবু, তিন বাই চার, না, আট বাই দশ?—শালা—মেজাজটা দেখলেন মশাই, মরবি ব্যাটারা। রাজত্বি কেড়ে নেওয়ার মজাটা এবার টের পাবি। ওমরাওরা কি আর সহজে ছাড়বে?

ননীগোপাল দেশপ্রেমিক, কিন্তু জুজুর ভয় দেখিতে দেখিতে মানুষ হইয়াছে বলিয়া ভূতকে তাহার বড় ভয়। হরগোবিন্দের কথায় সেও ভূতের ভয় ভুলিয়া লেজারের পাতায় ব্লটার চাপা দিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, ঠিক হবে, আমাদের সঙ্গে ওদের সাতশো বছরের পরিচয়, কটা চামড়াদের হাতের কাছে পেলে আমাদের কিছু বলবে না, কি বলেন হরগোবিন্দ বাবু?

নূতন টাইপিষ্ট মিস এলিসন সম্বন্ধে ক্যাশবাবু রতিকান্ত মিত্রের কিঞ্চিৎ দৌর্ব্বল্য ছিল। তিনি কলমের ডগা দিয়া কান চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, তাহ'লে তো মিস এলিসনকেও—উঁহু, উল্টোডিঙ্গির পীরের তাবিজ একটা তাকে পাঠাতেই হবে, জেনেশুনে তো আর এমন বিপদের মুখে—

টিফিনের ঘণ্টা পড়ে আড়াইটায়—ঘণ্টা পড়িতেই টিফিন ঘরে গিয়া পৌষমাসে বাড়ী-বদল সম্বন্ধে একটা রীতিমত আলোচনা করিবার প্রস্তাব হইল। অন্য ডিপার্টমেণ্টের বাবুদেরও পরামর্শ লইতে হইবে।

বিরাট আপিস—ষোলটা ডিপার্টমেণ্ট। কম করিয়া সাদায় কালোয় মিলিয়া নাহোক হাজার লোক এই আপিসে প্রত্যহ হাজিরা দেয়। শোনা যায়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে দৈনিক খবরের কাগজের এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আর নাই। ইংরেজ পরিচালিত ও সম্পাদিত ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল ইংলণ্ডের যে কোনও দৈনিকের সহিত টেক্কা দিতে পারে। কোনও

অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই—সমস্ত ব্যাপারটা ঘড়ির মত নিয়ম রাখিয়া চলে, একচুল এদিক ওদিক হইবার জো নাই। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—বাহিরের কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। রয়টার, এসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট পাঠায়, টেলিগ্রাফ আসে, টেলিফোন আসে—নিজস্ব সংবাদদাতারা খবর পাঠায়, এডিটার, সাবএডিটরেরা লীডার লেখে, নিউজ এডিট্ করে, ঘরের আর্টিষ্ট, ঘরের ব্লক, ঘরেই টাইপ-কাষ্টিং—ঘরের রোটারীতে ছাপা—ঘণ্টায় কমসেকম পঞ্চাশ হাজার। বিকটাকার দৈত্যটা তেল মাখিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিয়া থাকে, তাহার অনুচরেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে, হাতের কাছে সব আগাইয়া দেয়—ঘরের ভিৎ কাঁপাইয়া দৈত্যটা ঘণ্টাখানেকের জন্য গোঁ গোঁ করিতে করিতে গাঝাড়া দেয়, পঞ্চাশ হাজার ফোঁটা ঘামের মত পঞ্চাশ হাজার কাগজ সকাল হইতে না হইতে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

এমন ব্যবসা আর হয় না—মাটি ফুঁড়িয়া টাকা, ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা। অভাব ছিল নিজেদের একখানা বাড়ীর —ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স কমাইয়া তাহাও সম্পূর্ণ হইয়া আসিল—একখানা সুবৃহৎ প্রাসাদ; চারতলা বাড়ী, তিনতলা মেশিন—একটা দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারতলায় জেনারেল ম্যানেজার আপ্‌টন সাহেবের কোয়ার্টার - ভাড়াটে বাড়ী ছাড়িয়া এই বাড়ীতেই উঠিয়া যাইবার আয়োজন চলিতেছিল।

টিফিন ঘরের সভায় স্থির হইল, সকলে মিলিয়া বেশ নরম সুরে বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে—ভাষাটা অনেকটা এই ধরণের হইবে - হুজুর, আমরা ছাপোষা গৃহস্থ লোক, দিনক্ষণ মানিয়া আমাদের চলিতে হয়—আপনারা দেবাশ্রিত, বিপদের আশঙ্কা আপনাদের নাই কিন্তু আমাদিগকে অল্পেই বড় কাবু হইতে হয়, সুতরাং হুজুর এই অল্প কয়েকটা দিনের জন্য আর কেন, একেবারে ২রা মাঘ তারিখে—

সেদিন সকালে সিলেটের এক চাবাগানের ছোট সাহেবকে খুন করার সংবাদ আসিয়াছিল, আপটন সাহেব দরখাস্তটি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া হুকুম দিলেন, তাম্বু উঠাও। মুখে অভিশাপ দিতে দিতেও ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাবুরা নিজের নিজের ডেস্ক-ড্রয়ার গুছাইতে বসিলেন। হাতে কাজ না থাকিলেই আর্টিষ্ট হরগোবিন্দ সহকর্ম্মী বাবুবিবিদের পোর্ট্রেট অথবা ক্যারিকেচার আঁকিত। সেদিনও সে মিস টেরির একটা ছবি আঁকিয়া ফেলিল।

* * *

নূতন বাড়ীতে সবাই উঠিয়া আসিয়াছে, মালপত্রও সব আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তখনও গোছগাছ হয় নাই। নূতন রোটারী মেশিন নূতন বাড়ীতেই বসিয়াছে সুতরাং ছাপার কাজে কোনও বিঘ্ন হয় নাই। শুধু বত্রিশ বছরের পুরাতন দারোয়ান পক্ককেশ রামলেহড় সিং তখনও পুরাতন বাড়ীর দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল তাহার চৌকাবর্ত্তন তখনও কালিঝুলি মাখিয়া পুরাতন বাড়ীর দেউড়ি-ঘরে পড়িয়া। তাহার মনে সুখ ছিল না। এতদিন যেখানে সুখে দুঃখে কাটিয়াছে পরের বাড়ী হইলেও তাহা ছাড়িয়া যাইতে তাহার বুকে বাজিতেছিল। সাহেবদের কি, বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যেখানে খুসী থাকিলেই হইল। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; রামলেহড় সিং ভয় কাহাকে বলে জানিত না, তাই তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। বিশেষ করিয়া হরগোবিন্দবাবু বলিয়াছেন, নৌতুন বাড়ীতে একটু হুসিয়ারির সহিত থাকিতে, মুসলমান কবর-খানায় দীর্ঘ শ্মশ্রু সমন্বিত জীনের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎকার মোটেই অসম্ভব নয়। বুড়ী নানিয়ার কথা বুড়ার মনে হইতেছিল।

নূতন বাড়ীতে তখন হৈ হৈ ব্যাপার—ছোকরা সাহেব সাব-এডিটার আর বিজ্ঞাপন-বিভাগের ফচ্‌কে সাহেবেরা টাইপিষ্ট মেমসাহেবদের সঙ্গে লইয়া এক একটা খালিঘরে ঢুকিয়া কড়িবড়গা দেখিয়া দু'চার মিনিট পরে পরে হাসিয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের অট্ট ও চাপা হাসিতে নূতন বাড়ী মুখর—জেনারাল ম্যানেজার চারতলায় কোয়ার্টার সাজাইতে ব্যস্ত।

বাবুরা দুর্গানাম স্মরিয়া মনে মনে শ্রীগণেশ ফাঁদিয়া যে যার জায়গা সাজাইতেছে—হরগোবিন্দ ততক্ষণে মিস এলিসন ও রতিকান্তবাবুকে জড়াইয়া তিনটা কার্টুন আঁকিয়া ফেলিয়াছে —তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদ-মাঝারে ওগো বিদেশিনী—আমি আকাশে পাতিয়া কান—

লেজার-কীপার অটলবাবু ঠিক সাড়ে তিনটার সময় এক পয়সার পকেট পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অপরাধ নিয়ো না মা, অপরাধ নিয়ো না, উজীর সাহেবরা। চাকরী বড়ো বালাই—
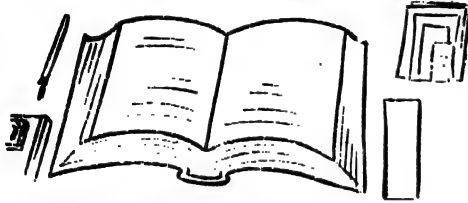
অপরাধ নিয়ো না মা—

বিজ্ঞাপন-বিভাগ হইতে পরমেশবাবু হাঁকিলেন, কি হ'ল অটলবাবু?

অটলবাবু চিং-হওয়া ছারপোকার মত চেয়ারে বসিয়া দুই হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, ত্র্যহস্পর্শ পড়ল কি না — যদি কিছু হবার হয় এখনই হবে—

মেশিনটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করিতেছিল, অটল বাবুর কথার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সকলের অজ্ঞাতসারে কান পাতিয়া সেই গোঙানি শুনিতে লাগিলেন। বিজ্ঞাপন-বিভাগের হেড গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার নিজস্ব ফোনটা ঠিক কোন জায়গায় বসাইলে জুৎসই হয় সে বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে অটলবাবুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে সেদিকে অগ্রসর হইতেছিল—হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিয়া মেশিনটা থামিয়া যাইতেই সেও থামিল। তিনতলার সিঁড়ি দিয়া বড় সাহেব দ্রুতবেগে নীচে নামিতেছেন দেখা গেল। চারিদিকে 'কি হইল, কি হইল', রব উঠিল; মিস বার্কমায়ারের ফিটের ব্যারাম ছিল। দেখা গেল, মিস টেরি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে। দেখিতে দেখিতে চার পাঁচটা লম্বা লম্বা মোটর গাড়ী সদর গেটের সামনে আসিয়া থামিল, মেশিন-ডিপার্টমেণ্ট বলিল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা আসিতেছেন। ব্যাপার কি? মেশিন ঘরের পাথরের মত দেওয়াল চিড় খাইয়াছে। সর্ব্বনাশ! মহিম বাবুকে সম্বোধন করিয়া হরগোবিন্দ বলিল, দেখছেন দাদা, ওনারাওরা চুপ করে নেই, কবরে নিশ্চয়ই তাঁরা পাশ ফিরছেন। মহিমবাবু ভুঁড়ি হইতে ময়লা গেঞ্জী তুলিয়া পৈতা হাতড়াইতে হাতড়াইতে কাঁপিতেছিলেন, হঠাৎ হরগোবিন্দকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ইয়ার্কি কোরো না ছোকরা, এটা ইয়ার্কির সময় নয়।

তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে।

মিস এলিসনকে খুঁজিতে খুঁজিতে রতিকান্তবাবুর দৃষ্টি দেওয়ালের এক জায়গায় গিয়া থামিল, আঙ্গুল বাড়াইয়া তিনি শুধু বলিলেন, ওই, ওই। সকলের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হইল। সে দেওয়ালেও ফাট ধরিয়াছে। অটলবাবু বলিলেন, তারা শঙ্করী, রক্ষা কর মা।

আধঘণ্টা হৈ হৈ, তারপর সব চুপ। ডিপার্টমেণ্টের সাহেবরা সর্ব্বত্র টহল দিতেছেন। শোনা গেল, মেশিন চালু হওয়ার ফলে লেভেলে গোলমাল ঘটিয়া এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু গোখাদকদের আশ্বাস বাবুদের মনঃপুত হইল না। আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিবে এরূপ প্রত্যাশা লইয়া সেদিনের মত তাঁহারা বিদায় লইলেন।

রামলেহড় সিং ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। নূতন বাড়ীতে নিশিযাপন করিবার জন্য সে দুইজন দেশওয়ালী ভাইয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল।

* * * *

পর দিন সাড়ে দশটায় হরগোবিন্দ আপিসে ঢুকিতেছে, রামলেহড় সিং ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। হরগোবিন্দ কাছে আসিলে তাহার কানে কানে বলিল, বাবুজী, উলোক

বাবুজী, উলোক তো কাল রাতমে—

তো কাল রাতমে আয়া রহা। বৃদ্ধের মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিশ্চয় ঘুমায় নাই। হরগোবিন্দ শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, উজীর লোক্?

—নেহি বাবুজী, উন্ লোক্‌কা আওরাৎ হোগা—রাত ভর রোতী রাহী আউর কল-ঘরমে কাপড়া ধোতী রাহী, ঔর—

—তোম দেখা ?

—দেখে গা কোন্ বাবুজী! দেখ্‌নেকা চীজ নেহি—শুনা হ্যায়।

হরগোবিন্দ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, পাঁড়েজি, তোম তো বাম্ভন হ্যায়—ক্যা পরোয়া।

মহিমবাবু রুমাল দিয়া ডেস্ক ঝাড়িতেছিলেন, হরগোবিন্দ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, শুনেছেন ?

নূতন কোনো ইয়ার্কি মনে করিয়া মহিমবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, শুন্‌বো আবার কি ?

—শোনেন নি ? তাঁরা কাল রাত্রে এসেছিলেন যে! আমাদের কলঘরে কাপড় কেচে গেছেন আর সারা রাত্রি কেঁদেছেন।

মহিমবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, হরগোবিন্দের কাছে আসিয়া বলিলেন, কারা হে ?

—ওমরাওদের বেগমরা। প্রাণে বাঁচা দায় হলো মশাই, অনেক কাল তাঁরা না খেয়ে আছেন!

মহিমবাবু কাঠ হইয়া বলিলেন, যাও যাও ইয়ার্কি কোরো না। ওঁরা এখানে এসেছিলেন, তুমি বাড়ীতে বসে টের পেলে, না ?

—বিশ্বাস না হয়, রামলেহড় সিংকে জিজ্ঞেস করুন।

ততক্ষণে কথাটা চাউর হইয়া গিয়াছে, রামলেহড় সকলের নিকট গোপনে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। রতিকান্ত কাঁধের চাদরখানা চেয়ারের হাতলে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, প্রাণ নিয়ে চাকরী করা পোষাল না দাদা,অপদেবতাদের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল।

শেয়ার মার্কেটের রিপোর্টার ইংরেজী-নবীশ পি ডি ডাটো খাস ইংরেজীতে ব্যাপারটা মিস টেরিকে জানাইল, মিস টেরি খবর পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া খোদ গ্রিয়ার্সন সাহেবের কাছে তাহা নিবেদন করিয়া বলিল, হরগোবিণ্ড্ এই গল্প রটাইতেছে। হরগোবিন্দের প্রতি বরাবরই মিস টেরির নেক-নজর ছিল।

একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ, গ্রিয়ার্সন গ্যট্ গ্যট্ করিয়া হরগোবিন্দের পাশে গিয়া জোর গলায় হাঁকিল, ওয়েল—

হরগোবিন্দ যেন কিছুই জানে না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনীত ভাবে বলিল, ইয়েস স্যার।

সাহেব মেজেতে পা ঠুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হোয়াট আর ইউ আফটার? ফের যদি এসব আজগুবি গল্প রটাচ্ছ শুনতে পাই তোমাকে ফায়ার—

হঠাৎ টপ করিয়া উপরের ছাদ হইতে এক ফোটা জলীয় পদার্থ হরগোবিন্দের মাথায় পড়িল। হরগোবিন্দ চমকাইয়া মাথায় হাত দিতেই থতমত সাহেব প্রশ্ন করিল, হোয়াট'স্ ছাট্?

মুখ কাচুমাচু করিয়া হরগোবিন্দ বলিল, অয়েল্ স্যার্।

অয়েল? সাহেব উপরের দিকে চাহিল, ব্লকঘরের এসিড আর গ্যাসের পাইপ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে—গ্রিয়ার্সন সাহেব সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে বড় সাহেবের কামরার দিকে চলিয়া গেল। পনের মিনিটের মধ্যেই তিনগণ্ডা লম্বা মোটরগাড়ী গেটে হাজির। ইঞ্জিনিয়াররা আসিলেন, বড় সাহেব আসিলেন, ছোট সাহেবরা উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। এসিডের পাইপে লিক হইয়াছে। সকলের মুখ লাল, সকলের মুখ বিমর্ষ—হরগোবিন্দ খালি মাথায় হাত বুলাইতেছে। এমন হইবার কথা নয়। সাহেবেরা সকলে বড় সাহেবের কামরায় গেলেন, উড়ে মিস্ত্রী আসিয়া মইয়ে উঠিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে লীক সারিতে লাগিল। হরগোবিন্দ চোক পাকাইয়া মিস টেরিকে দেখিতে লাগিল।

রতিকান্ত 'গতিক ভাল নয়, ভায়া' বলিয়া মিস এলিসনকে খুঁজিতে লাগিল।

বৈকালে আবার হুলস্থুল, ডেস্‌প্যাচ ডিপার্টমেণ্টের হেড্ লেকী সাহেব, ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি বিরাট চেহারা—ইয়া ছাতি! গায়ে কোট নাই, সার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক হরিধনের কাঁধে হাত দিয়া হিড় হিড় করিয়া নীচে তাহাকে টানিয়া আনিতেছেন দেখা গেল। নীচের ঘরে পৌঁছিয়া চ্যাচাইয়া সাহেব বলিলেন, কোথায় সে বেয়ারা, তাকে আইডেন্টিফাই কর। হরিধন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে। নূতন বাড়ী, অনেক বেয়ারা বদল হইয়াছে, নূতন বেয়ারাদের সকলকেই সে চেনে না। মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতে-ছিল কে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে, লেকী সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। সে হাতের কাজ সারিয়া প্রথমবারে বিনীতভাবে সাহেবের কাছে গিয়া শুনিয়াছে, তিনি ডাকেন নাই। দ্বিতীয় বারেও সাহেবের মেজাজ ভাল ছিল, তিনি বলিয়াছেন, ভুল হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় বারে সাহেব ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। হরিধনকে যে কেউ ডাকিয়া দিয়াছিল, সে বিষয়ে সাহেবের সন্দেহ নাই—কিন্তু কোথায় সে?

হিড় হিড় করিয়া নীচে—

উপরে বড় সাহেবের কামরাতেও এই ব্যাপার, নিউজ-এডিটার প্রফুল্ল সোম গোবেচারী মানুষ, তিনি তাহাকে লইয়া পড়িয়াছেন। কে তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছে সাহেব জানিতে চান। সে বেয়ারাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। চারিদিকেই বেয়াড়া ব্যাপার।

অফিসে সাহেব, ফিরিঙ্গি, হিন্দু, মুসলমান সকলের মনেই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে; কোথায় কি একটা অঘটন ঘটিতেছে—কিন্তু কি ধরণের অঘটন কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। মিস টেরির অদ্ভুত মুখভঙ্গী দেখিয়াও হরগোবিন্দ সেদিন কার্টুন আঁকিতে পারিল না।

ছুটির সময় বড় সাহেব এক সার্কুলার জারি করিলেন, অফিসের কোনও কথা যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়। ইহা লইয়া যে কেহ 'গসিপ' করিবে তাহার চাকুরী থাকিবে না।

* * *

পরদিন রামলেহড় সিং যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া বলে, একটা ছুটির দরখাস্ত লিখিয়া দিতে। বলিল, কালরাত্রে বড়সাহেব পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কি ব্যাপার? রাত্রি এগারোটার সময় তিনি নিজে বাহির হইতে গাড়ী হাঁকাইয়া হল ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, একটু রঙীন হইয়া আসিয়াছিলেন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল কিন্তু তিনি সহজে ভয় পাইবার পাত্র নন। রামলেহড় সিং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিয়া হুজুর? সাহেব স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, হল ঘরের ঠিক মাঝখানে তিনি একটা চাদরঢাকা কাফন দেখিয়াছেন—মাটির উঁচু ঢিবিও হইতে পারে। এ বাড়ীতে চাকুরী করা রামলেহড় সিংয়ের পোষাইবে না। ছুটি না পাইলে সে ইস্তফা দিবে।

বড় সাহেব সমস্ত দিন নীচে নামেন নাই, ডিপার্টমেণ্টাল হেডদের নিজের কামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লেকী সাহেবের খানসামা আসিয়া খবর রটাইল যে সাহেব গান্ধীজীর এক তসবীর ঘরে টাঙাইয়াছেন। সাহসী যাহারা, পা টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া আসিল, সত্যই গান্ধীজীর তসবীর লেকী সাহেবের কামরায় টাঙানো হইয়াছে।

মহিমবাবু বলিলেন, তখনই বলেছিলাম দাদা, একে পৌষ মাস—তায় কবরখানা, এখন ঠ্যালা সামলাও। পঞ্চাশ লাখ টাকা জলে গেল!

রতিকান্ত মিস এলিসনকে আফিসে আসিতে বারণ করিবার উপদেশ দিয়া এক চিরকুট লিখিয়া কেমন করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবে ভাবিতেছিল এমন সময়ে ক্যাশ সাহেবের কামরা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ উমাচরণ বাবুকে আসিতে দেখা গেল। ছেষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, আজ বিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া ক্যালকাটা ক্রনিকেলের হিসাব বিভাগে খরচের ঠিক দিয়া আসিতেছেন—কখনও ভুল হয় নাই। নূতন বাড়ীতে আসিয়া অবধিই নাকি তাঁহার ঠিকে ভুল হইতেছে—এক পাতায় যোগ মিলাইতে যেখানে পাঁচ মিনিট লাগিত সেখানে এক ঘণ্টাতেও গোল থাকিয়া যাইতেছে। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। সাহেবের কাছে তিনি খোলাখুলি নিজের অক্ষমতা জানাইয়া আসিয়াছেন। সাহেব স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহারও 'কনসেণ্ট্রেশন' আসিতেছে না, তিনি সর্ব্বদাই কেমন একটা একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনিতেছেন, মেশিনের আওয়াজ নয়। যেন খুব নিকটে কোথায়ও কাহারা একসঙ্গে নামাজ পড়া সুরু করিয়া দিয়াছে। বড় সাহেবও এই আওয়াজ শুনিয়াছেন, সই করিতে তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। গোঁয়ার-গোবিন্দ গ্রিগ্‌সর্ন সাহেব পর্য্যন্ত ভয় খাইয়াছে। এক লাইন টাইপ করিতে টাইপিষ্টরা হিমসিম খাইয়া যাইতেছে—তাতেও ভুল।

বৃদ্ধ উমাচরণ বাবুকে আসিতে দেখা গেল।

উমাচরণ বাবুর কথা শুনিবা মাত্র সকলেই কান পাতিয়া যেন সেই গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনিতে লাগিল—কেহ কথা বলে না। হরগোবিন্দ একটা মোটরকারের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিতেছিল, সে মিস টেরির মুখ আঁকিয়া বসিল।

সাড়ে তিনটা বাজিতে তিন মিনিট বাকী—লেকী সাহেবের কামরা হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন শোনা গেল—কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়, কে তুমি?

সাহেবের কামরার দরজায় ভিড় জমিয়া গেল, দেখা গেল লেকী সাহেব শূন্য দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বড় সাহেবের কোয়ার্টারে লইয়া যাওয়া হইল! মদ নয়, লেকী সাহেব দিনে মদ খান না।

আপিস বুঝি আর টেঁকে না, সকলেই বিমর্ষ, ক্যালকাটা ক্রনিকল আপিসের হাসি কোথায় উবিয়া গিয়াছে। হরগোবিন্দও হাসে না। সাহেবেরা লজ্জিত হইয়া চলাফেরা করেন। দু মিনিট অন্তর কাগজের রীল পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িতেছে—অনেক কাগজ একেবারে সাদা অবস্থায় মেশিন হইতে বাহির হইতেছে।

বেয়ারারা আর কাজে আসিতে চাহে না, কোনো জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই তাহারা নাকি দেখিতে পায়, বিচিত্রবেশা স্ত্রীলোকেরা দেয়ালের ভিতর হইতে, আলমারীর মাথা হইতে, ছাপা কাগজের বাণ্ডিল হইতে তাহাদিগকে ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। তাহারা সব করিতে পারে কিন্তু দেশে জরু থাকিতে—যাক্ চাকুরীর মায়াটাই বড় নয়।

একদিন শোনা গেল বেচারা মিস বার্কনায়ারকে কে যেন তাহার বিশ্রাম-ঘরে চাপিয়া ধরিয়াছিল—তাহার প্রণয়-ক্ষিপ্ত চারী সাহেব নয় কারণ চারী সাহেবের দাড়ী ছিল না। ফিটের গোঙানি শুনিয়া টোরি আর এলিসন গিয়া মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে বটে কিন্তু পরদিন হইতে মেমেরা আর কেহ আপিস আসে না। রসের যেখানে যত-টুকু 'স্কোপ' ছিল ধীরে ধীরে সব কমিয়া আসিতে লাগিল। বাবুরা ভয়েই কাঁপিয়া মরেন শুধু। হরগোবিন্দ মডেল খুঁজিয়া পায় না।

দাঁড়িয়ে আছে, দু'সারি।

রাত্রে মেশিনে ও এডিটোরিয়াল ঘরে যাহাদের থাকিতে হয় তাহারা যেন হাতে প্রাণ লইয়া কোনও রকমে কাজ সারিয়া যায়। কালো বিড়াল দেখিলে সাহেবরা লাফাইতে থাকে, সাদা কাপড় দেখিলে বাবুরা মূর্চ্ছা যান। গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনিলেই মেশিনম্যানরা 'ইয়া আল্লা' বলিয়া নামাজ পড়িতে বসিয়া যায়।

শেষে একদিন চরম একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রাত্রি আড়াইটার সময় বড় সাহেব আর নাইট এডিটর সুধাকৃষ্ণ বাবুকে জড়াজড়ি করিয়া বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। দুজনেই সংজ্ঞাহীন।

সুধাকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী হরগোবিন্দের পাড়ায়। হরগোবিন্দ শুনিল, সুধাকৃষ্ণ বাবুর ঘোর জর-বিকার, যায় যায় অবস্থা। হরগোবিন্দ তাঁহাকে দেখিতে গেল। সকাল বেলা, জ্বর আছে, বিকার নাই। সুধাকৃষ্ণবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—রয়টার শেষ করে সবে এসোসিয়েটেড প্রেসে হাত দিয়েছি, রাত কটা হল দেখবার জন্য ঘড়ি দেখতে যাব। স্পষ্ট দেখলাম, এডিটোরিয়াল ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত বোরখা-ঢাকা মূর্ত্তি অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, দুসারি। বোরখা-ঢাকা হলে কি হবে, যৌবন যেন সর্ব্বাঙ্গ ফুঁড়ে বের হচ্ছে। ভুল দেখলাম মনে করে পরীক্ষা করবার জন্য উঠে সেখানে গেলাম, তাদের মাঝ দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে কার সাধ্য। বললাম, মা সকল ছেড়ে দাও, সিন্নি দেব—সবাই

তারস্বরে বললে, সাহেবদের এখান থেকে যেতে বল, আমাদের কষ্ট হচ্ছে! রাত তখন আড়াইটা। বড় সাহেবকে উঠিয়ে একথা বলে এলাম। বড় সাহেব বল্‌লেন, ইউ আর ড্রাঙ্ক। সাহেবের হাত ধরে বল্‌লাম, মাইরি না সাহেব, দেখবে এসো। সাহেবকে ঘর পর্য্যন্ত পৌছতে হ'ল না, মাঝ পথ থেকেই তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। তারপর কি যে হল, জ্ঞান হলে দেখি বাড়ীতে শুয়ে আছি। হয়তো বাঁচবো না। সাহেব ভাল আছেন তো?

হরগোবিন্দ মনে মনে বলিল, কে জানে! প্রকাশ্যে সুধা-কৃষ্ণবাবুকে সান্ত্বনা দিয়া দোনামোনা হইয়া সে আপিস গেল। গেটে ঢুকিতেই রামলেহড় সিং বলিল, বাবুজী জান নিয়ে পালাতে হলে এই সময়—এরপর·········

আপিসে কোনও শৃঙ্খলা নাই; কাজকর্ম্ম লেজার প্রুফ ফেলিয়া বাবুরা সব গোল হইয়া বসিয়া আছেন। হরগোবিন্দকে দেখিয়াই মহিম চাটুয্যে চিঁ চিঁ করিয়া বলিলেন, এই যে ভায়া, মুখের হাসি গেল কোথায়? এদিকে তো আপিস উঠ্‌ল। বড় সাহেবের হাই ফিভার, বিলেতে কেব্‌ল গেছে। ওয়াণ্টার থার্ষ্টন সাহেব আসছেন—স্পিরিচুয়ালিষ্ট থার্ষ্টন সাহেব হে—

রতিকান্ত বলিল, স্পিরিচুয়ালিষ্টের কাজ নয় দাদা, বরঞ্চ উল্টোডিঙ্গির পীরকে খবর দাও, সে একটা রাস্তা বাৎলাবেই—

মেশিন চলিতেছিল, হঠাৎ তিনবার গোঁ গাঁ শব্দ করিয়া তাহাও বন্ধ হইয়া গেল—অতবড় বাড়ীখানা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ বোধ হইল। হরগোবিন্দ কি একটা দেখিয়া 'মাগো' বলিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে লাগিল।

পরদিন রামলেহড় সিং প্রচার করিল যে সে স্পষ্ট দেখিয়াছে, সিঁড়ি দিয়া পাঁচজন খপসুরৎ আওরৎ পাজামা পরিয়া নীচের ঘর হইতে সেদিন রাত্রে বড় সাহেবের কামরার দিকে গিয়াছে। বড় সাহেবের কামরায় সমুচ্চা রাত মোগলাই ধরণের গান বাজনা চলিয়াছে। বড় সাহেবকেও সে খাস উর্দ্দুতে গান করিতে শুনিয়াছে।

বড় সাহেবের বিবি বিলাতে, আইন-বহির্ভূত আমোদ-আহ্লাদ করাটা তাঁহার পক্ষে দোষের নহে, কিন্তু অটল বাবু পকেট পঞ্জিকায় শুভদিনের নির্ঘণ্টের পাতাটা খুলিয়া বলিলেন, সাহেবের কিন্তু হয়ে এল, মহিম দা। অনেক দিনের বুভুক্ষা ওঁদের—বলিয়াই সে দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

পরদিন দশটা হইতে ডিরেক্টরদের মিটিং বসিল। বড় সাহেব কোন রকমে যোগ দিলেন। বৈকালে হুকুম পাওয়া গেল, আবার তাম্বু উঠাইতে হইবে। পুরানো ভাড়াটে বাড়ীটাই ভাল। থার্ষ্টন সাহেবের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই।

রামলেহড় সিংয়ের নৃত্য দেখে কে! কাপড়টা তাহার কোনও রকমে কোমরে জড়ান ছিল। হরগোবিন্দ কার্টুন আঁকিয়া ফেলিল।

* * * *

পুরোনো মেশিনে ছাপা ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল আবার বাজারে বাহির হইতে লাগিল। থার্ষ্টন সাহেব আসিয়া নূতন বাড়ী দেখিতে গিয়া দিনের বেলাতেই এমন তাড়া খাইয়া আসিলেন যে পরদিনই এয়ার মেলে বিলাতে যাত্রা করিলেন। নূতন বাড়ীটা? ডিরেক্টররা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ওটা লটারীতে উঠাইতে হইবে, ২০ টাকা টিকিট, পৃথিবী জুড়িয়া টিকিট বিক্রয় হইবে। খরচ যে উঠিয়া আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার ভাগ্যে উঠিবে নূতন রোটারি মেশিনটাও তাহার হইবে কিন্তু তাহার ভাগ্যকে ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল অফিসের কেহ ঈর্ষ্যা করিতেছে না।

এখনও লটারির টিকিট পাওয়া যাইতেছে। কবে লটারি হইবে, যথাসময়ে ক্যালকাটা ক্রনিকলে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মিস টেরির ক্যারিকেচার আঁকিয়া আর্টিষ্ট হরগোবিন্দের হাত পাকিতেছে, এইটাই তাহার সান্ত্বনা।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : প্রথম যুগ

—শ্রীসুকুমার সেন

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের কোন স্থান ছিল না। তাহা থাকিবারও কথা নয়, কেন না তখনকার দিনে সাহিত্যিক রস-বোধের প্রেরণা ছিল মুখ্যতঃ আবেগ ও গৌণতঃ অনুভূতির মধ্যে। আর গদ্য সাহিত্যে রস-বোধের প্রেরণা আসে প্রধানতঃ বোধ ও যুক্তিজ্ঞান হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান সকল আর সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ লোককে খুসী করা, যে সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ, সুবিধা বা যোগ্যতা লাভ করে নাই। আরও একটা কথা আছে, তখনকার সাহিত্য ছিল কাব্যমূলক এবং সেই কাব্য ছিল সঙ্গীতমূলক। অর্থাৎ এখনকার মত সেকালে কাব্য পড়া হইত না, গাওয়া হইত। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, এই কারণে সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত লোকও এই "পাঁচালী"[১] সাহিত্যে আনন্দ লাভ করিত।

গীতিমূলক হওয়াতে সাহিত্যর বিকাশ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নূতন কথা-বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর না থাকায় কেবলই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ চলিতেছিল এইরূপ বোধ হয়। আর কথা-বস্তুর মধ্যেও পৌরাণিক অপেক্ষা লৌকিক বা ছদ্ম-পৌরাণিক কাহিনীর আদর অত্যধিক ছিল। সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতার অভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে সেকালের লোকের সাহিত্যিক রুচির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই মুখ্যতঃ হীন-কথামূলক সাহিত্যে লোকের রুচি বিগড়াইয়া দিয়াছিল আর ইহাতে যে দেশের নৈতিক অবনতির বৃদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম বঙ্গের এক সুসভ্য অঞ্চলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক রুচি ও আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়া বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বলিয়াছেন—

> ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
> মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
> দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
> তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
> ধন বংশ বাড়ুক বলিয়া কাম্য মনে।
> মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
> যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
> ইহা শুনিবারে সর্ব্ব লোক আনন্দিত॥
> অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
> গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
>
> [অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়]।

এই সাহিত্যে বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ও করুণ রসের একটা দিক ছিল। তাহা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্য-গীতি। সীতা-রাম-গীতির মধ্যেই তখন সাহিত্যে বিশুদ্ধ রস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে রামায়ণ কাহিনী শুনিয়া যবনেরও মন করুণ রসে আর্দ্র হইয়া যাইত।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে বলিয়াছেন—

> কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
> পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর।

যাহা হউক পঞ্চদশ শতকের শেষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য মোড় ফিরিতে আরম্ভ করে। গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বসু খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩—১৪৮০ সালে "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আগমনে ও প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর হইয়া গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালায় যে সুর আনিয়া দিল তাহার প্রতিধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও, এখনো পর্য্যন্ত বাজিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানতঃ আবেগমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটী শাখা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটী নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-

---

১ পুরাতন বাঙ্গালার এই ছন্দঃ-গীতি-মূলক সাহিত্যকে "পাঁচালী" বলা হইত। মালাধর বসু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে' (১৪৭৩—১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) রচনার কৈফিয়তে বলিয়াছেন—

> ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
> লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া।

সাহিত্য। বোধ ও যুক্তিমূলক সাহিত্যের সূত্রপাত ইহারই মধ্যে। এই সাহিত্যও ছন্দে রচিত। তাহার কারণ, সাধারণ লোক ছন্দঃ বা গীতি না হইলে গ্রাহ্য করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, অনতিস্বল্প-পরিসর পয়ার ১ ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার সরলবাক্যমূলক রীতি সুন্দর অবকাশ পায়। বাঙ্গালা গদ্যের তালের সহিত পয়ারের আট ও ছয় মাত্রার মতের সহিত সুসঙ্গতি ও ঐক্য আছে। সুতরাং পয়ারের মধ্যে দিয়া ভাবপ্রকাশের বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। বরঞ্চ সুবিধাই হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের জড়তামুক্তি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। ষোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা অনুমান করিতেও ভয় হয়। পয়ারের মধ্যে সংস্কৃতমূলক অব্যয়, অথবা অসমাপিকার প্রাচুর্য্য অথবা তালবিহীন বাক্যজালপ্রয়োগের সুযোগ একেবারেই নাই, এজন্য পয়ারের ছাঁদে পর পর সরল বাক্যের মধ্য দিয়া স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। সকল রকম ভাবপ্রকাশে পয়ার ছন্দের কতদূর ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহার প্রমাণ মিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে।

তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠিপত্রাদিতে ও দলিল দস্তাবেজে। ষোড়শ শতকে লেখা চিঠি শুধু একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে।২ পত্রটী ১৪৭৭ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৫৫৫ সালে) লিখিত হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটী আহোমরাজ চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে লেখেন। এই পত্রটীর মধ্যে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব প্রত্যন্তের উপভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে। তৎসত্ত্বেও দেখা যাইতেছে যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে সাধু ভাষার রূপ বাঙ্গালা গদ্যে একরকম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আরও একটী লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। সপ্তদশ শতক হইতে চিঠিপত্রাদিতে কিছু কিছু আরবী ফারসী কথা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই পত্রটীতে কিন্তু সে সব কিছুই নাই। পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

… … লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।… …

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে রচিত নিজেদের সাধনা বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে এইরূপ পুস্তক কেবল পদ্যেই রচিত হইত। গদ্যে রচিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ গুরু শিষ্যের মধ্যে কথোপকথনমূলক হইত। সপ্তদশ শতকের কোন হস্তলিপি না পাওয়া যাওয়ায় এই গদ্যের ভাষাকে ঠিক সপ্তদশ শতকের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এইরূপ বৈষ্ণব সাধন-গ্রন্থের প্রাচীনতম পুঁথির তারিখ অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বে নহে। সুতরাং এই গদ্যের ভাষা পরে আলোচনা করা যাইবে।

শূণ্যপুরাণে অল্প কিছু গদ্যাংশ আছে। শূণ্যপুরাণ সপ্তদশ শতকে লেখা। অনেকে ইহাকে সুপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শূণ্যপুরাণের গদ্যাংশ ছড়া মাত্র, ইহাকে গদ্য বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। এই ছড়া বা মন্ত্রগুলি ভাঙ্গা পয়ারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কিছু তুলিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে পয়ারের রেশ বিলক্ষণ অনুভূত হইবে।

পচ্ছিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুঁকার। আস বাছা চন্দ্র পহরি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত ঘাটে নির্ম্মান করি দিব।১

১ পয়ারই বাঙ্গালার মূল ও বিশিষ্ট ছন্দঃ, আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারেরই সবিশেষ প্রাধান্য। ত্রিপদীর প্রয়োগ খুবই অল্প ছিল, ইহার প্রয়োগ হইত প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের জন্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পয়ারের প্রাধান্যের দরুণ ছন্দের আর এক নাম দাঁড়াইয়া যায়, 'পয়ার'। মালাধর বসুর উক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭২ দ্রষ্টব্য।

১ "শূণ্যপুরাণ," পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ৮১।

ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে পোর্ত্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালা দেশে আগমন ঘটে। ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ দুইখানি পুস্তক যে খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।১ পোর্ত্তুগীসদের রচিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ষোড়শ শতকের শেষপাদে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অবধি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। এই খ্রীষ্টানি সাহিত্যের উদ্ভব ঢাকা অঞ্চলে হইয়াছিল, সুতরাং ইহার মধ্যে যে উক্ত অঞ্চলের উপভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যরীতি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অধিকন্তু এই সাহিত্যের উদ্ভব পোর্ত্তুগীস পাদ্রির হাতে এবং ইহার মূল পোর্ত্তুগীস ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে, সেই জন্য ইহার বাক্য-রীতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ঢঙ্গ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই সকল সত্ত্বেও দেখা যায় যে তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাধুভাষায় গদ্যের একটা মোটামুটি কাঠামো খাড়া হইয়া গিয়াছে। এই গদ্যের ভঙ্গি ও বাক্যরীতি পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভূষণার রাজপুত্র দোম্ আন্তনিও প্রণীত প্রশ্নোত্তরমালা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। ভূষণার এই রাজকুমারকে ১৬৬৩ সালে মগেরা বন্দী করিরা আরাকানে লইয়া যায়। এক পোর্ত্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে মগেদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লয়েন ও তাঁহাকে রোমান কাথালিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ["পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ", প্রবেশক, পৃষ্ঠা ৶৹]। দোম্ আন্তনিও রচিত এই বইখানি একটী খ্রীষ্টান পাদ্রি ও এক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিচার লইয়া রচিত। বইখানি ছাপা হয় নাই। ইহার মূল পাণ্ডুলিপি পোর্ত্তুগালের এভোরা নগরে আছে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এভোরা নগরে গিয়া এই বইটীর অধিকাংশ নকল করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং তাহার কিয়দংশ ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার "উপাসনা" পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই বইটীর সাহায্য অপরিহার্য্য। বইটীর সম্পূর্ণ মুদ্রণ অত্যাবশ্যক। বইটী রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ। পোর্ত্তুগীস পাদ্রিরা এই রকমই করিতেন।

দোম্ আন্তনিওর বইটীর নাম অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—"জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান কাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা জেণ্টুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার; ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় জেণ্টুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র কাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সম্বন্ধ আছে।" ১

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাম্ এই পুস্তকটী পোর্ত্তুগীস ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই বইটীর যতটুকু অংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের গদ্য-রীতির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ দিয়াই বাক্যের সমাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুস্তকের ভাষায় ল্যবর্থ, তুমর্থ বা শত্রর্থ অসমাপিকাযুক্ত বাক্যাংশ অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হইয়াছে, কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদের ব্যত্যাসও (inversion of the normal word order) যথেষ্ট রহিয়াছে। নঞ্ শব্দ ক্রিয়ার পূর্ব্বেই বেশী ভাগ ব্যবহৃত হইয়াছে, কচিৎ ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তো' 'সে' ও 'যে' শব্দের বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ সুপ্রচুর। 'কহ্' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট, 'বল' বা 'বোল' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম; আর এই ধাতুটী ইংরেজী tell বা command এইরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'করিলা,' 'পাইবা' ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ সম্মানসূচক অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে। সম্মানসূচক 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ এখনও আসে নাই। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি 'রে', 'কে' নহে। পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী প্রশ্নার্থক 'নি' ও নিশ্চয়ার্থক ও

১ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ৬৭-৬৮; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* পৃঃ ২৩৩; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত "পাদ্রি মানোএল্ দা-আস্সুম্পসাম্ রচিত বাঙ্গালা-ব্যাকরণ" প্রবেশক, পৃঃ ৷৹ দ্রষ্টব্য।

১ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ", উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃঃ ৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

সমর্থনসূচক 'হয়' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রকাশিত অংশটুকুর মধ্যে কোন আরবী ফারসী শব্দ নাই। প্রকাশিত অংশ হইতে কিছু এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম১।

[ব্রাহ্মণ] হয়; বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারো কপালে শুদা(,)২ লিখন দেখি নাহি(;) আমিও এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারণ কি? তুমি কহ কি কারণ কারো এমত থাকে, কারো এমত না থাকে?

[রোমান কাথলিক] কারণ এই (,) কারো কপালের হাড় ৩ জোড়া ৪ থাকে তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা কপালের হাড়ের৫ জোড়া৪ কসাইরা৬ চাও এইখনে খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে; তিনি এমত গড়িয়াছেন৭, যাহার হাড়৩ জোড়া না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখ তাহার শিরপীড়া৮ অধিক না জন্মে, যাহার কপালে জোড়া৪ হাড়৩ তাহার জোড়াতে৪ জল ভর করিয়া মুণ্ডে বেদনা৯ করে; এহার অর্থ এই; লিখন যে কহে এ মিথ্যা১০ দেখ; সেই মস্তকের চৌদ্দরা জোড়া৪, সেও সেইরূপ জোড়াগঠন১১ (,) এহাতে বুঝিবে লিখন হয় কি নহে; এ কথা অতি মূঢ়ের১২, যে কহে কপালের লিখন।

দোম্ আন্তনিওর পুস্তকে রোমান লিপ্যন্তরীকরণ হইতে ঢাকা অঞ্চলের তৎকালীন কথ্যভাষার উচ্চারণতত্ত্বের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার কিছুকিছু বিশিষ্ট পদ বা বাক্যরীতির পরিচয় থাকিলেও ইহা স্থূলতঃ সার্ব্ববঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহাও অবশ্য সত্য যে ষোড়শ শতকে শেষের দিকে উচ্চারণভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিত পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার বর্ত্তমান সময়ের মত এত তফাৎ ছিল না।

আর একটী পুস্তকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া পোর্ত্তুগীস প্রভাবান্বিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালার প্রস্তাব শেষ করিব। যে পুস্তকটীর কথা বলিতেছি, ইহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। বইটীর নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এবং ইহার রচয়িতা (বা পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদকারী) পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম। বইটী ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া লিসবন সহর হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানিতে খ্রীষ্টানধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আস্‌সুম্প্‌সাম ঢাকা অঞ্চলে থাকিতেন সুতরাং ঐ অঞ্চলের ভাষার ছাপ ইহার মধ্যে যথেষ্টই আছে। আস্‌সুম্প্‌সামের রচনারীতির প্রধানতম দোষ হইতেছে পোর্ত্তুগীস রীতির অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ। তাহা অবশ্য সর্ব্বত্র নহে।

দোম আন্তনিওর পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে নঞ্‌ শব্দের প্রয়োগ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে পরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর ভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। আস্‌সুম্প্‌সামের ভাষা দোম আন্তনিওর ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষার অনেক বেশী কাছাকাছি। পোর্ত্তুগীস হইতে অনুবাদ বলিয়া আর পোর্ত্তুগীসের রচনা বলিয়া স্থিত পদ সমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের ব্যত্যাস (inversion of the normal word order) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"কে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

'করুক', 'করিবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, দোম আন্তনিওর পুস্তকে এই প্রয়োগ দেখা যায় নাই। সুতরাং এই প্রয়োগ যে সাধুভাষাসম্মত নহে, পরন্তু প্রাদেশিক কথ্যভাষামূলক, ইহা নিঃসন্দেহ। 'আমার গো' (=আমার), 'আছিল', 'জপন না যায়', 'পাইবার' (=পাইতে), 'আঠু করিয়া' (=হাঁটু গাড়িয়া) ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষা হইতে গৃহীত। 'আমারদিগের', 'তাহারদিগকে' ইত্যাদি প্রয়োগ দুই পুস্তকেই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত-'দিগ',-'দে' বিভক্তির প্রয়োগ পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যে উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে মিলে না। ইহা কি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার দান? "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"এর ভাষার আর একটী বড় গলদ-'ইবা' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার মূলক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃপদের সহিত প্রয়োগ। আরও, আস্‌সুম্প্‌সাম্ অনেকক্ষেত্রেই বর্ত্তমান অনুজ্ঞার সহিত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্ত গলদ সত্ত্বেও আস্‌সুম্প্‌সামের ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

১ উপাসনা, কার্ত্তিক ১৩৩৯ পৃষ্ঠা ৩৪৯।

২ বন্ধনীস্থিত বিরামচিহ্ন মূলে নাই।

৩ har হার। ৪ zora জোরা। ৫ harer হারের। ৬—খসাইয়া। ৭ gariassen গরিয়াছেন। ৮ xirpira শিরপীরা। ৯ bedena বেদেনা। ১০ mitha মিথা ১১ zoragothon জোরাগঠন। ১২ murer মুরের।

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" হইতে একটী কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আধুনিক বাঙ্গালার গল্প সাহিত্যের এক পূর্ব্বতম রূপ বলিয়া ইহাকে নেওয়া চলে।

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ সহরে দুই কুলীন১ পুরুষ শত্রু২ আছিল; বিস্তর দিন তাহারা এক জনে আর জনেরে তালাস করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি৩ দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল; লাগাল পাইয়া দুই জনেও তরোয়াল খসিয়া৪ মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজোবন্ত সে আরো এক চোট, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয়৫ হইল। পরাজয় হইয়া শত্রুরে৬ মাফ চাহিয়া কহিল: ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, আমারে জিনিলা, আর কি চাহ? খ্রীস্তর লাগিয়া আমারে মাফ কর; তবে খ্রীস্ত তোমারে মাফ করিবেন। জিননিয়া৭ কহিল; খ্রীস্তর লাগিয়া তোমারে মাফ করি, যেন তিনি আমারে মাফ করুক। পরে তাহারে উঠাইল, রক্তও পোঁছাইল৮, ঔষধ৯ও দিল, পরে দুই জন মিলিয়া বড়১০ দোস্ত হইল। জিননিয়া ধর্ম্ম ঘরে গেল। ধর্ম্ম ঘরেতে স্তব করিল, স্তব করিয়া যে খ্রীস্তর আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঁঠু১১ করিয়া খ্রীস্তর আকৃতির কাছে তাহান পদেতে চুম দিল। তখন আকৃতিএ আঠের১২ খিল খসিয়া৪, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন। এ মহা অপূর্ব্ব সে আপনে দেখিল, এবং যত লোক ধর্ম্ম ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিননিয়া পরমেশ্বরের পূজ্য ছিল; যত দিন বাঁচিল১৩ অনেক পুণ্য করিল। বৃদ্ধ১৪ কালে পুণ্যে পূর্ণিত মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে।১৫

দোম আন্তনিওর পুস্তক রচনাকাল হইতে আসসুম্প-সামের পুস্তক রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ বছরের অনধিক নহে। ইহারই মধ্যে এত বিদেশী (আরবী ফারসী) শব্দ ঢুকিয়া গেল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে। দোম আন্তনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক সাধু ভাষার লেখকদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার ভাষায় বিদেশী শব্দের অপ্রাচুর্য্য বা অসদ্ভাব।১৬ আর আসসুম্পসাম কথ্যভাষার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত সুপরিচিত বিদেশী শব্দগুলিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দোম আন্তনিওর বিষয়বস্তুও বিদেশী শব্দপ্রয়োগের সুযোগ দেয় নাই, ইহাও স্বীকার্য্য।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত যে কয়েকখানি চিঠি বা দলিল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গদ্যের সরল রূপ একেবারেই নাই। প্রথমতঃ ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহার হইত না, তাহাতে বাক্যের আদি ও অন্ত বুঝা দায় হইয়া উঠে। একই বাক্যের মধ্যে বিবিধ কর্তৃপদযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্য ও সংযোজক অব্যয়ের প্রাচুর্য্যে পাঠককে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। খ্রীষ্টীয় ১৭১৭ সালে লিখিত একটী দলিল হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

…আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন…

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় নিজেদের সাধন-প্রণালীর উপর বই লিখিতেন। প্রথমে এইরূপ বই পদ্যে লিখিত হইত। পরে, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষ হইতেই, গদ্যে বা মিশ্র গদ্যে পদ্যে এই সকল পুঁথি রচিত হইত। এইরূপ কতকগুলি পুঁথি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কতক-গুলি বৈষ্ণব মোহান্তের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। খুব সম্ভব এইগুলি এত প্রাচীন নহে। সপ্তদশ শতকে লিখিত কোন অনুলিপিও পাওয়া যায় না, তবে ভাষার ভঙ্গিটি হইতে অনেক সময় ইহাদের রচনাকালের একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। গদ্যে লিখিত এই সব গূঢ়তত্ত্ব সংবলিত পুস্তক গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত। ছোট ছোট বাক্য, ক্রিয়া পদ প্রায়ই উহ্য থাকে। বাক্যে পদের পারম্পর্য্য অনেক সময় বিপর্য্যস্ত দেখা যায়, তাহার কারণ অজ্ঞান বা অক্ষমতা নহে। গদ্যের ভিতর পদ্যের ছন্দঃ বা তাল আনিবার চেষ্টা। যেমন—

মানুষের আচার ব্যবহার ছাড়িলে ঈশ্বর ছাড়া হয়। তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কর। ঈশ্বর সে মানুষের বশ। ইহা কেহো নাই জানে।

অষ্টাদশ শতকের লেখা গ্রন্থে বাক্যরচনার জটিলতা পর পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব সাধকদিগের লেখায় অসমাপিকার অপপ্রয়োগ নাই, পদের বা বাক্যাংশের অযথা ব্যত্যাসও নাই। একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সরল বাক্যের প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে। ক্রিয়াপদের মধ্যে কেবল ভবিষ্যৎ কালের রূপে কিছু কিছু আধুনিক রূপ পাওয়া যায়। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ অথবা দুর্ব্বোধ্য নহে, বরং গাম্ভীর্য্যময় ও ওজস্বী। নিম্নে এইরূপ একটা গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অজ্ঞানী জীবে কহে এখন বুঝিলাম কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারেন না। ইহা সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি। যখন মনের সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব কর্ণ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং যখন মনের সহিত চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন বায়ু ভূতের স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ম্ম জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না।

১ colim. ২ xotro. ৩ soe gori. ৪=খসাইয়া। ৫ pora zoe. ৬ xotrere. ৭ যে জিতিয়াছে; 'জিস্নুনে'। ৮ ponsfailo. ৯ oxodio. ১০ boro. ১১ anthu. ১২ ather. আনুনাসিকের অভাব লক্ষণীয়। ১৩ banxilo. ১৪ Birdho. ১৫ "আসসুম্পসামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবেশক, পৃঃ ২১, ৩.

১৬ দোম্ আন্তনিওর গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হইলে এই সম্বন্ধে দৃঢ় করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না।

এই রচনাটী হইতে দেখা যাইতেছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙ্গালায় সাধুভাষার গদ্যরীতি সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে সাহিত্যে গদ্যের এই সম্পূর্ণাঙ্গপ্রায় রূপ উদ্ভুত হইয়াছিল তাহা ভিক্ষুক বৈষ্ণবের রচিত ও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ও 'ভদ্র' সমাজের নজরে পড়ে নাই। ফলে সাধুভাষায় সাধারণ সাহিত্যের গদ্যের উৎকর্ষ সাধন হইতে আরও পঞ্চাশ বৎসর বেশী লাগিয়া যায়। সাহিত্যিক গদ্য রচনার প্রচেষ্টা খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের গোড়া হইতে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আশ্রয়ে নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। যাঁহারা এই নূতন গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর বৈষ্ণব গদ্য সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল, সেই কারণ, হয় তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বা ইংরেজীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইল, অথবা নিজের মনগড়া ছাঁদে সংস্কৃত, ফারসী, সাধু ভাষা ও কথ্যভাষার খিচুড়ী করিয়া এক অদ্ভুত গদ্যের সৃষ্টি করিতে হইল। তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যবহারোপযোগী ব্যাকরণ লিখিত হয় নাই, সুতরাং এই নূতন গদ্যস্রষ্টাদের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা মূলতঃ কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পথ অনেকটা সুগম ছিল এবং তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের—ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদিগের সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি।

রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভাষা বড়ই অদ্ভুত রকমের; ইহার জন্য তখনকার ভাষা দায়ী নহে, দায়ী গ্রন্থকার ও তাঁহার অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান। তৎসম শব্দ অনেক ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু তৎ সকল প্রায়ই অপপ্রযুক্ত ও বানানদুষ্ট। তদ্ভব শব্দকে অনেক সময় ভ্রান্ত তৎসম রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন 'গাত্র মোচন' ('<মোছা') করিতেছিলেন' ইত্যাদি। 'পদার্পণ হইলেন' ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদেরও যথেষ্ট অপপ্রয়োগ আছে। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা অনেক ক্ষেত্রে '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত হেতুবাচক, অতীত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'করিতেছেন' 'করে' (=করিতে লাগিলেন), 'হইয়াছিল না' (=হয় নাই) ইত্যাদি অসাধু প্রয়োগও নিতান্ত কম নহে। তবে ইহার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ দায়ী করা সঙ্গত নয়, কারণ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহারের বাঁধাধরা নিয়ম তখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ক্রিয়মান বর্ত্তমান (present progressive) তখনকার দিনে প্রায়ই (বিশেষ করিয়া কোন ঘটনা বা গল্পের বর্ণনায়) সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহার হইত। বিধিলিঙের অর্থে এখন আমরা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকি। রামরাম বসুর পুস্তকে কিন্তু ঐ অর্থে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদেরই প্রয়োগ হইয়াছে। 'আসিয়া' 'যাইয়া' এই দুই পদের ক্রিয়াপদের সহিত নিরর্থক (enclitic) প্রয়োগ খুব লক্ষণীয়।

'অস্তি' বা 'ভবতি' বাচক ক্রিয়াপদ প্রায়ই বাক্যমধ্যে বা বাক্যশেষে লুপ্ত করা হইয়াছে, ইহাতে সম্পূর্ণ বাক্যকে বাক্যাংশের সহিত গোলমাল করিয়া দিয়াছে। "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"-এর দুর্ব্বোধ্যতার ও অদ্ভুতত্বের প্রধান কারণ হইতেছে বিধেয় বিশেষণ, কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারক এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যাংশের ক্রিয়াপদের পরে প্রয়োগ। কর্ত্তৃপদও অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাক্যমধ্যে অসংযুক্ত বাক্যান্তরের প্রয়োগ (parenthesis) উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙ্গালা গদ্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ রামরাম বসুর পুস্তকে এত বেশী করা হইয়াছে যে পাঠককে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, রামরাম বসুর ভাষায় দেখা যায় যে ভাষা সরলতর হয় নাই, উপরন্তু জট আরও বেশী করিয়া পাকাইয়াছে।

'কহ' ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ কিছু বাড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ইহার অর্থের স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই।

"রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"-এ সম্ভ্রমার্থক মধ্যম পুরুষ সর্ব্বনাম পদ "আপনি" শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত, সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালাতে হিন্দীভাষা হইতে আসিয়াছে।[১] অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই প্রয়োগের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৎসত্ত্বেও উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক, এমন কি তাহার পরেও, সম্ভ্রমজ্ঞাপনার্থ 'আপনি' শব্দের সহিত 'তুমি' শব্দেরও প্রয়োগ যথেষ্ট হইত।

রামরাম বসুর লিখিত গদ্যের নমুনা স্বরূপ "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> এই মতে কতককাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুণানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনাদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অধিক ক্ষমতাপন্ন।

---

১ *Orgin and Development of the Bengali Languag* পৃ ৮৪৬-৮৪৮ দ্রষ্টব্য।

কানুনগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কার্য্যকর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তিদার কান্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের "কথোপকথন"[১]ও প্রকাশিত হয়। এই বইটীর রচনাকার্য্যে কেরি কতিপয় দেশীয় ভদ্রলোকের সাহায্য লইয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কেরির কত দূর দখল ছিল তাহার সাক্ষ্য এই পুস্তকে প্রচুর পাওয়া যায়। এক হিসাবে কেরিকে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের অন্যতম জনক বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। যাহা হউক, এখন "কথোপকথন"-এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থে সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চলিত ভাষায় লিখিত প্রস্তাব গুলির ভাষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল। ইহাতে অনুমান হয় যে এইগুলির রচনায় কেরি দেশীয় লোকের বিশেষ সাহায্য লইয়াছিলেন। আর চলিত ভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলির মধ্যে একাধিক অঞ্চলের কথ্য ভাষা অবলম্বিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ "তিয়রিয়া কথা" সন্দর্ভটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহার ভাষা মূলতঃ হাবড়া হুগলি অঞ্চলের উপভাষা। 'হাড়ে', 'আতি', 'কড়ে' ইত্যাদি রূপে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-ভঙ্গির ছাপ রহিয়াছে, এ গুলিকে উপভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। 'করিছে' ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে শুদ্ধীকরণের চেষ্টা দেখা যায়।

হাড়ে (=হারে২) ভেগো মাচকে যাবি কিনা (,) আতি (=রাতি) তো কোয়া কোয়া করিছে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

য়া এক কাপ কড়ে (=করে) আইয়াছে। হাঁ ম্যাগ পড়েছে এখন কি জালে যাবাড় (=যাবার) সময়। যা চেঁদে তুই (,) মুই তো এখন যাব না। কালি ঢেড় (=ঢের) আতি থাকতে গিয়াছিনু। যাড় বলে থাবার মাচ পেনু না (,) তাতো আজি ম্যাগ পড়েছে।

হাড়ে ভাই ম্যাগের ভয়ে মোদের কাম চলে না। ত্যাবে তো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেখি সুকবাসের (='সুখ বাসা'র) শড়ীল হইয়াছে। [পৃঃ ৫৬]।

সাধু ভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলিতেও কেরি মাঝে মাঝে কথ্য ভাষার রীত্যানুযায়ী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে গদ্যের ভাষায় বৈচিত্র্য হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করায় ভাষার গৌরবহানি ঘটিয়াছে, যেমন 'সারথিকে (=কোচম্যানকে) হুকুম দেহ'; 'মদিরা আমার সঙ্গে খাইবা।'

কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি '-কে', '-রে' বিভক্তির প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সম্ভ্রমার্থক 'আপনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহাশয়' শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। সামান্ত অতীত অনেক সময় সম্পন্ন অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। '-বা' প্রত্যয়ান্ত তুমর্থ বা চতুর্থ্যর্থক শব্দের পরিবর্ত্তে '-অন (-ওন)' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বাক্য মধ্যে অসংলগ্ন বাক্যান্তরের প্রয়োগ (parenthesis) নাই বলিলেই হয়। সামঞ্জস্যহীন দুই বা তদধিক বাক্যের সংযোজন খুবই কম। মোটের উপর বলিতে গেলে "কথোপকথন"-এর গদ্যে জটিলতা আদৌ নাই। নিম্নে উদ্ধৃত "ঘটকালি" শীর্ষক সন্দর্ভটী পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল। সেই সময়ের সাহিত্যের গদ্যরচনার সহিত তুলনা করিলে ইহার ভঙ্গি অনবদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে বন্ধনীমধ্যে বিরাম-চিহ্ন বসাইয়া দিলাম।

ঘটক মহাশয় (,) আমার বড় পুত্রটির বিবাহ দিব (;) আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আমুন (;) বিস্তর দিবস গৌণ না হয় (,) বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাহে। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্যস্থলে যাব[১] (;) এখন না হইলে যে খবর পত্র আনিয়াছি সে ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় (,) তাহার ঠেক কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জাগায় কন্যা উপস্থিত আছে (;) যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়া আসি। কুলীনগ্রামে হরহরি একটি কন্যা আছে (;) সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ (,) যেন দুধে আলতায় গোলা (;) আর কর্ম্মাও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে (;) তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস (;) আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।

ঘটক যাইয়া হরিহর বসুকে বলিতেছেন (:) বসুজা মহাশয় হে (,) তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোসের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য (;) তাহারা জাত্যাংশেও যেমন আর অন্ন যোগ স্বচ্ছন্দ আছে (;) সে ব্যক্তি নিজে বরেহাঁ চাকুরা। পুত্রটি অতি সুজন (১) লিখিতে পড়িতে মুর্ত্তিমন্ত (,) দৃশ্য ভব্য সভ্য (,) অল্প বয়স (;) এমন পাত্র আর পাবা না (,) ইহা বুঝিয়া জবাব দেহ (;) কিন্তু তাহারা দেরি সহিবে না (,) এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে।

আমার এ কার্য্য অবশ্য করা বটে (,) কিন্তু এ মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না (।) যদি অগ্রহায়ণাদিতে কার্য্য করেন তবে আমি পারি (,) নতুবা হয় না।

শুনহে বসুজা (,) এমন বর আর মিলিবে না (।) তুমি যদি কর এমন হয় (,) তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি (।) তাহা কল (;) আমি তাহাদিগকে আনিয়া পত্র করিয়া যাই।

ভাল। যাও আন যাইয়া (।) এই মাসের দশক্রি এক দিন আছে (;) তোমরা পরশু ডাকাতি (=ডাকাডাকি) আইস।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বসিলেন (।) পত্রাদি লেখাপড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাগ্দান করিলেন।

১ *Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language.* By W Carey D. D. ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ অবলম্বনে এই আলোচনা করা হইতেছে।

২ বন্ধনীস্থিত অংশ প্রবন্ধকারের সংযোজন।

১ সপ্তদশ শতকের শেষ হইতেই ভবিষ্যৎ কালের সংক্ষিপ্ত (contracted) রূপ সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দোম্ আন্তনিও ও আসুম্পসামের লেখায় ইহা দেখা যায়।

তোমরা সকলে শুন (:) ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল (।) যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশক্রি রোজ দেড় প্রহর রাত্রির পর বিবাহ হবেক।

বর কর্ত্তাও বলিলেন (।) তোমরা শুন (:) ইহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইল (;) যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে তবে হবে (।) উনিও আয়োজন করুন গা আমিও করি গা। [পৃঃ ৪৮, ৫০, ৫২]।

"কথোপকথন" প্রকাশের এগার বৎসর পরে (১৮১২ সালে) কেরির "ইতিহাসমালা" প্রকাশিত হয়।১ ইহার ভাষা সরল বটে তবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের মত নহে। ইহাতে সাধুভাষার প্রতি কেরির ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা বোধহয় "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের" আবহাওয়ার দরুণ। কেননা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়ও দেখা যায় যে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সাধুভাষার প্রতি পক্ষপাতিতা ও সেই হেতু ভাষার কৃত্রিমতা ও জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেরির এই বইখানিতে মধ্যে মধ্যে '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার অসমানকর্তৃক (absolute) প্রয়োগ ও বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণমূলক বাক্যাংশের (adjectival and adverbial clauses aud phrases, বিপর্য্যস্ত প্রয়োগ ছাড়া ব্যকরণঘটিত অন্য জটিলতা বিশেষ কিছু নাই। 'করিলেক', 'কহিলেক' ইত্যাকার ক্রিয়া পদের প্রয়োগ

গোলোকনাথ শর্ম্মা কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদও ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়।১ এই পুস্তকের বাক্যবিন্যাসরীতি হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী। জিজ্ঞাসার্থক সর্ব্বনামের যুক্ত প্রয়োগ এই গ্রন্থের ভাষায় অনন্যসুলভ বিশেষত্ব।২ অসম্পন্ন বর্ত্তমান সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গোলোকনাথের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলায় ন্যায় (;) অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় (,) তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে (।) যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না যায় তবে কখন পাবে না ; অতএব যে পিতা মাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় (,) যেমন হংসের মধ্যে বক।৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখকদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান খুবই উচ্চে, এমন কি প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইনি চারিখানি গ্রন্থের রচয়িতা —"বত্রিশসিংহাসন", "রাজাবলী", "হিতোপদেশ"৪ ও "প্রবোধ-চন্দ্রিকা'। "বত্রিশ সিংহাসন" ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়, "রাজাবলী" ১৮০৮ সালে ও "প্রবোধচন্দ্রিকা" ১৮৩৩ সালে।১

মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে সাধুভাষার ও সংস্কৃত রীতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ গদ্যের ভঙ্গি সরলতা হইতে জটিলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল।

বত্রিশ সিংহাসনের ভাষা বেশ সরল। 'ছিল' অর্থে 'হইয়াছিলেন', 'থাকে' ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। শীলার্থ অতীত (habitual past)-এর স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ খুবই লক্ষণীয়। সংযোজক অব্যয় 'ও' 'এবং' প্রত্যেক শব্দের সহিত যোগ করা হইয়াছে। 'যে' শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ উক্তি (direct speech) সুরু করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।

"রাজাবলী" ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহা তিন বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে রচিত হয় [রাজাবলী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৭]। এই গ্রন্থে আরবী ফারসী শব্দ যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজাবলীর ভাষা মোটামুটি সরল তবে সংস্কৃতমূলক জটিল রীতি স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রাজাবলীর রচনা-রীতির নমুনা হিসাবে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গোরের বাদশাহ গয়াসুদ্দিন যবনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন হিজরি ৫৬৯ সনে আপন বিক্রমে গজনেন অধিকার করিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মুলতান দেশ জয় করিয়া তথায় আপনার জনেক অন্তরঙ্গকে নায়েব করিয়া রাখিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। তাহার পর দ্বিতীয় বারে ৫৭০ হিজরি সনে রেতস্থান দিয়া গুজরাট দেশে আসিলেন, সে দেশে রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া গজনেনে পলাইয়া গেলেন।

"রাজাবলী"র অধিকাংশই এইরূপ সুখপাঠ্য সরল রীতিতে লিখিত।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠচিত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত হইতেন, এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন, এ দুষ্ট কুজ্ঞানী পরদার-মাত্র-নিষ্ঠ-চিত্ত হইয়া নির্লজ্জ ছিল, অতএব দিগম্বর হইয়াছিল, এবং সাংসারিক যাবৎ বিষয়েতে পরম বৈরাগ্য সম্পন্ন সাধুপুরুষেরা ভস্ম বিভূষিত হইতেন, এই ভ্রষ্ট কুযোগী বেশেতে বৈরাগী, কিন্তু ব্যবহারেতে মহারাগী ছিল, এমন লোকের মুখে ছাই উপযুক্ত হয়, অতএব আপনি মুখে ছাই মাখিত।২

এই অংশটীর রীতি সংস্কৃতানুগ হইলেও সরলতার ও সুবোধ্যতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

"হিতোপদেশ"-এর ভাষা খুবই সংস্কৃতানুগ, প্রায় প্রবোধ-চন্দ্রিকার মতই। ইহার ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভাবার্থক

---

১ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩০।

২ যেমন, 'কোন কাহার মুখে শুনিলেন।'

৩ বন্ধনী মধ্যস্থ বিরাম চিহ্ন প্রবন্ধকার প্রদত্ত।

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে "হিতোপদেশ" ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল [লং (Long) সাহেবের মতে ইহা ১৮০১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল] *History of Bengali Literature in the 19th Century*, পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য।

১ সুশীলবাবু অনুমান করেন যে "প্রবোধচন্দ্রিকা" ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ১৮১৩ সালে ছাপা হইয়াছিল।

২ রাজাবলী হইতে উদ্ধৃত এই অংশ দুইটীতে যে কমা (comma) চিহ্ন আছে তাহা বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই মনে হয়।

বিশেষ্যপদের কর্ম্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ (যেমন, 'মতি সমতাকে পায়') আর বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের অব্যবহিতপূর্ব্বে গৌণকর্ম্ম এবং তাহার পূর্ব্বে মুখ্যকর্ম্মের প্রয়োগ।

"প্রবোধচন্দ্রিকা" লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। "প্রবোধচন্দ্রিকা" মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার মধ্যে তিনি অনেক বিষয় এবং অনেক রীতি দেখাইয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্য গ্রন্থকার এই বইটীর মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছু ঢুকাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার মধ্যে অনেক কিছু আমাদের নিকট তুচ্ছ অথবা অবান্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বিচিত্রতা ও রচনার বিভিন্ন ভঙ্গি বইটীকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে—(১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যের রীতি এবং (৩) সংস্কৃতরীতি। মৌখিক রীতি কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় অথবা সর্ব্বলোকের বোধগম্য করিবার জন্য কতকগুলি মাত্র বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধুরীতিতেই পুস্তকখানির অধিকাংশ রচিত। সংস্কৃত রীতি কেবল সংস্কৃত হইতে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক বা আলঙ্কারিক তথ্যে বা বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা এযাবৎ "প্রবোধচন্দ্রিকা" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই তৃতীয় রীতিকে এই পুস্তকখানির মূল রচনারীতি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রীতি কেবল বিদেশীয় ছাত্রদিগকে সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থের বা তত্ত্বের সারসংগ্রহ জানাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই (স্থানে স্থানে মাত্র) অবলম্বিত হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক ভাষার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কথ্যভাষামূলক রচনা স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ম্বর। স্থানে স্থানে অবশ্য (এখনকার রুচির হিসাবে) অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু রচনার সৌন্দর্য্যের হ্রাস না করিয়া বৃদ্ধি সাধনই করিয়াছে। মার্শম্যান (Marshman) সাহেব প্রবোধচন্দ্রিকার ভূমিকায় ঠিকই বলিয়াছেন যে ইতর শ্রেণীর ভাষায় মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে সরলতার (humour) সঞ্চার করিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন।[১] ইতর ভাষার মধ্যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় ইতরশ্রেণীর ভাষাকে জোরাল করিয়া তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয়। এই রীতির উদাহরণ হিসাবে এখানে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

পুত্রস্নেহে অন্তর্ব্যস্তা হইয়া মহারাজ মাতা কুন্তী মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, ওলো দাসীরা! দেখ তো সে সর্ব্বনাশে অন্নায়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ খেঙরা, কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জ্জন তর্জ্জন ভৎর্সন করত, যে রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! স্ববংশ-পাংশুল রণকাতর যুদ্ধ পরাঙ্মুখ নির্লজ্জ খট্টারূঢ় ব্যলীক নিঃসাহস সহিস কুড়িয়া বেটা! তোর নিমিত্তে আমারদের তীয়,—মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র, খুড়া, খুড়ী, জ্যেঠা জেঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, পিসী, মাহুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহায়ী, বেহানী, শালা, শ্যালী, ভাউজ, ভাইবউ, ভাএয়া ভাই, ভাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতাভ্যাগে অপারক হইয়া, তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্। ছি! ছি! ধিক্ তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন। ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে কুক্ষণজন্মা! তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোলায় যা, চুলায় যা, মারুতো বা পাতে, নাতি মার, ঝাটা মার, জুতা মার, বেত মার, তোর জন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দূর হ, দূর হ, এবম্বিধ বহুবিধ কটুকথায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।[১]

"প্রবোধচন্দ্রিকা"-য় সাধুরীতির মধ্যে দুইটা ধারা আছে—একটী সরলতর অপরটী জটিলতর। সরলতর ধারাটী কাহিনী বা বর্ণনায় (narration) অনুসৃত হইয়াছে, আর জটিলতর ধারাটী বিবরণে (description, statement) অবলম্বিত হইয়াছে। এই দুইটী ধারার উদাহরণ পর পর দেওয়া গেল।

(১) অতিবড় দরিদ্র এক ব্যক্তি থাকে, তাহার নাম সেকঝিল্লি। সে এক দিবস কয়েক পয়সা কোথা হইতে পাইয়া কুক্কুট-কুক্কুটী এক যোড়া হট্ট হইতে ক্রয় করিয়া নক্রচক্রকুল অতিশয় স্রোতোগভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল।—তাহা বেচিয়া ছাগছাগী ও ভেড়াভেড়ী কিনিব, তাহারদেরও বৎসবৎসা যথেষ্ট হইবে, সে সকল বাচ্চাবাচ্চি ও তারদের দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব, তাহাতে গরু বলদ মহিষ ক্রয় করিব, তাহাতে বয়ার ও দুগ্ধ দধি ঘৃত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহারদের চর্ম্ম ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও বলীবর্দ্দেতে চাস করিয়া যে শস্য পাইব, তাহার বিক্রয়ণে বহু টাকা কড়ি পাইব।—তাহাতে ঘোড়া-ঘোড়ী অনেক কিনিব, তাহারদের বাচ্চা বিক্রয় করিব, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি হইবে। তদনন্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া পরম সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যাতে ঐ ভার্য্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সূপকার অন্নব্যঞ্জন পরমান্ন কৃষর, অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া যখন আমাকে ডাকিবে যে কর্ত্তা মহাশয়! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি কহিব, যা বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না।

---

১ The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower order, the vulgarity of which however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour.

১ প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত সকল অংশই বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে। কমা (comma) ও বিস্ময়-চিহ্ন মূলে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হয় মার্শমান নয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপে মনে মনে করত যেমন মাথা নাড়া দিয়াছে, তেমন ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরগ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল।

(২) অতএব ইদানী ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্কপটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয়, অন্তথা বিশ্বাসের অভাব-প্রযুক্ত কার্য্যারম্ভে নিষ্কম্পাপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট। যত্তপি অন্যোন্যে বাধ্যবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজনবিশেষে সমবায়ে তৈলবর্ত্তি-শিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির ন্যায় অর্থসিদ্ধি হইতে পারে। অতএব উভয় বিশ্বাসে পরস্পর সখ্য হইলে পরস্পরের সাহায্যে শত্রু হইতে দুয়ের ত্রাণ সম্ভাব্যমান হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের তৃতীয় অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক রীতি প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রায়ই তৎসম শব্দঘটা ও সমাসপরম্পরা আছে, তাহা হইলেও বাক্যরীতি বাঙ্গালারই, দৈবাৎ দুই এক স্থলে সংস্কৃতের অনুকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতে মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদপ্রণালী বুঝা যাইবে।

হে রাজপুত্র! সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিষ্য! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্রশূন্যা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী তোমার মানসেতে সতত বিলাস করুন। পাণিন্যাদি- মুনি-কর্ত্তৃক অনুশাসিত স্বয়ংসৃষ্ট যে বাক্য সকল, তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত্ত হয়। যেহেতুক যদি শব্দনাম জ্যোতি এজগতের শেষ পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান না হইত, তবে এ সকল ভুবন অন্ধকারময় হইত। দর্পণেতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দেখ বাঙ্ময়রূপ দর্পণের এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান বস্তু সকল, তাহাও দেখা যাইতেছে। 'ইত্যাদি'।

ইহার মূল দণ্ডীর "কাব্যাদর্শ"-এর এই শ্লোকগুলি—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজবনহংসবধূর্ম্ম
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
ইহ শিষ্টানুশিষ্টানাং শিষ্টানামপি সর্ব্বথা।
বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্রা প্রবর্ত্ততে॥
ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে
আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ম্।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্যনশ্যতি॥ [১, ১, ৩-৫]

ইত্যাদি

কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলনিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরণাত্যচ্ছ-নির্ঝ রাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

ইহাও "কাব্যাদর্শ"স্থিত এই শ্লোকটীর অনুবাদ—

কোকিলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ।
উচ্ছলচ্ছীকরাচ্ছাচ্ছনির্ঝ রাম্ভঃকণোক্ষিতঃ॥ [১, ৪৮]।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। 'দ্বারা' প্রভৃতি কর্ম্মপ্রবচনীয় প্রয়োগ না করিয়া '-তে' বিভক্তির দ্বারা করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। কর্ম্মকারকের '-কে' বিভক্তি অনেক সময় ভাববাচক ও জড়বস্তু-বাচক বিশেষ্যের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুবচনান্ত পদের সহিত পুনর্ব্বার বহুবচনের বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্টই দেখা যায় (যেমন, স্ত্রীবর্গেরা, পক্ষিসমূহেরা, মুনিগণেরা, ধাত্রীদিগেরা, ইত্যাদি)। গৌণকর্ম্মে '-রে' বিভক্তির প্রয়োগ খুবই কম। সম্মানবাচক মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনাম পদ 'আপনি' শব্দের রূপে '-আপনকারা,' 'আপনকাকে,' 'আপনকার,' 'আপনকার-দের,' ইত্যাদি প্রয়োগ। 'নিমিত্ত'বাচক 'জন্ত' শব্দের প্রয়োগ খুবই অল্প। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাতেই এই প্রয়োগ প্রথম মিলিল। '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার পরিবর্ত্তে 'পাওত,' 'করত,' 'হওত' ইত্যাদি ক্রিয়ামূলক পদ ও 'পূর্ব্বক' 'করণক' 'প্রযুক্ত' প্রভৃতি পদের দ্বারা সমাস-যুক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। শীলার্থ অতীতের (habitual past) স্থলে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। '-তে' প্রত্যয়ান্ত ভাববচন '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, কিন্তু সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল নহে)। 'রহ' ধাতুর পরিবর্ত্তে 'থাক' ধাতুর প্রয়োগ। 'পারিয়াছিল না,' 'না হও' (=হইও না), 'হও না' (=নহ) ইত্যাদি প্রয়োগ। আরম্ভ বুঝাইতে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ। লাজা (লাজ শব্দের বহুবচন, =খই), কীশ (=বানর), অপত্রপা (=লজ্জা), কহ্ব (=বক), অক্রুবাণ (=বাক্যহীন), একপদে (=শীঘ্র) ইত্যাদি অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাক্যসমূহের সংযোজন (যথা, স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগ করিয়া নব্য লোকেতে অনুরাগ যে করে তাহার ভাল হয় না ও স্বামীদ্রোহ যে করে, সে দুরবস্থা-প্রাপ্ত অবশ্য হয়, ও ভাবী আশ্রয়কে সম্যক পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করিবে না)।

গিলক্রিষ্ট (Dr. J. Gilchrist) সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮০৩ সালে ইংরেজী হইতে ৬টী দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সমেত "ঈশপ্‌স্‌ ফেব্‌ল" রোমান হরফে প্রকাশিত হয়।১ বাঙ্গালা অনুবাদ অংশ তারিণীচরণ মিত্র রচিত। ইহার ভাষা সরল ও সুবোধ্য তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজীর রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহা হইতে একটী গল্প২ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দাঁড়কাক ভাল এক টুকরা পোনীরের আপন মুখে লইয়া গাছের ডালের উপর বসিয়া রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ খেঁক-শিয়ালী বিবেচনা করিতে লাগিল যে এমন সুস্বাদু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার সুন্দর মূর্ত্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতিঃ, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে। আনন্দোন্মত্ত কাক এই অনুনয় কথাতে ভুলিয়া তাহাকে

---

১ *History of Bengali Literature in the 19th Century.* পৃঃ ১৮৫। ২ ঐ, পৃঃ ১৮৬-৮৭।

আপন স্বরের পরিপাটি দেখাইবার জন্তে মুখ খুলিলেক তখন পোনীর নীচে পড়িল, তাহা তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিল, আর দাঁড়কাককে অবসরক্রমে আপন মিথ্যা গরিমায় খেদ করিতে রাখিয়া গেল।

ইহার ফল এই, যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।

এই পুস্তকেই বোধ হয়, দেশীয় ভাষার পক্ষে ইংরেজী বিরাম-চিহ্নের প্রথম প্রয়োগ।

হরপ্রসাদ রায়ের "পুরুষ-পরীক্ষা"১ ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, "পুরুষ-পরীক্ষা" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এই পুস্তকের ভাষার বিশেষত্ব এই। বিশেষণ পদকে যে সে শব্দের দ্বারা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে (যেমন, নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়)। '-ইয়া ও '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে 'করত' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ। 'করণক' শব্দের সহিত সমাস করিয়া করণ কারকের পদ নিষ্পন্ন করা। একই বাক্যের মধ্যে সম্ভ্রমসূচক 'তুমি' ও 'আপনি' শব্দের প্রয়োগ (যেমন, হে ভূপাল, তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিবেনও না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাহার আগমনের কহিতে পারি আপনি কিছু ভয় করিবেন না)। একটী খুব লক্ষণীয় প্রয়োগ হইতেছে 'কহ' ধাতুর স্থলে 'বল' ধাতুর প্রয়োগ। এইরূপ প্রয়োগ অবশ্য অল্প স্থলেই করা হইয়াছে। অন্যত্র 'বল' ধাতুর প্রয়োগ যদিও পাওয়া গিয়াছে, তথাপি তথায় ইহার অর্থের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, সেখানে 'বল' ধাতুর অর্থ ইংরেজী ক্রিয়া tellএর ন্যায়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে প্রয়োগ খুবই অল্প। 'বটে' এই ক্রিয়াপদ জিজ্ঞাসাসূচক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে)। একাধিক বাক্যের পর ছেদচিহ্ন স্থাপন প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের একটী বিশেষত্ব বটে, কিন্তু "পুরুষ-পরীক্ষা"-য় ইহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৩৯।৪০ দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে রাজা রামমোহনের স্থান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরেই। রামমোহনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। রামমোহন সাহিত্য রচনা বিশেষ কিছু করেন নাই, তাঁহার লেখা প্রায় সবই তর্ক বা বিবাদমূলক। তথাপি তাঁহার হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তখনকার দিনের বাঙ্গালা গদ্যের দুর্বোধ্যতা নষ্ট করিবার জন্য রামমোহন বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের গদ্যে সাহিত্যিক গুণ কিছু থাক বা না থাক, ইহা যে তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন এক একটী বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। খুব অল্প স্থলেই তিনি একাধিক বাক্যের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। রামমোহনের ভাষার বিশেষত্ব এই গুলি। অন্ত্যর্থক ক্রিয়া পদের প্রয়োগ (যেমন, কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজ্যপ্রাপ্তি হয়)। 'না' শব্দের ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রয়োগ। 'করা' এই ভাববচনের পরিবর্ত্তে 'করিবা' এই ভাববচনের প্রয়োগ (যেমন, তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন; অর্থবোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না)। গুণবাচক বা জড়বস্তুবাচক শব্দের কর্ম্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। গৌণ কর্ম্মের পূর্ব্বে মুখ্য কর্ম্মের প্রয়োগ। কর্ত্তৃহীন ক্রিয়াপদের (impersonal verb) প্রয়োগ।

রামমোহনের ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহ পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়।

রামমোহনের পরেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথা বলিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে বাঙ্গালা

---

১ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। উহাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার রচনারীতি মৃত্যুঞ্জয়ের রীতির অনুযায়ী নহে। ১৮৩০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণেও ইহা হরপ্রসাদ রায়ের রচনা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য যে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "সমাচার-দর্পণ" তখনকার দিনের প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিতেছি। (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (প্রথম ভাগ) পুস্তকে উদ্ধৃত অংশগুলি অবলম্বন করিয়া এই আলোচনা করা যাইতেছে)। ১

একাধিক বাক্যের পরে ছেদ ব্যবহার হইয়াছে। 'ও' 'এবং' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতির বাক্যের যোজনা করা হইত। অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ কম। বড় বড় সমাসের ও অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। -'অন' প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব ভাববচনের প্রয়োগ যথেষ্ট। আরম্ভবাচক 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ। 'যে' শব্দের দ্বারা মুখ্য উক্তির (direct speech) আরম্ভ। বিধিলিঙের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ খুবই কম। 'আমারদিগের' ইত্যাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। ক্রিয়াপদের বিভিন্নকালের প্রয়োগ স্থিরীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

সংবাদ পত্রের রচনার নমুনা হিসাবে ১৮২৫ সালের 'সমাচার-দর্পণ' হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসী রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়্গী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যাযাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহ মধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল (ইত্যাদি)।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের আলোচনা এক রকম হইল। মাসিক পত্রিকার কলেবরে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে বলিয়া অনেক লেখকের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারিলাম না। যাঁহারা প্রধান লেখক তাঁহাদের রচনারীতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই যুগের অবসান হয় খ্রীষ্টীয় ১৮৪৭ সালের দিকে। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হয়।

"বেতাল পঞ্চবিংশতি"র প্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইল। এই যুগের ইতিহাস প্রবন্ধান্তরসাপেক্ষ। এইবার প্রথম যুগের রচনায় বৈশিষ্ট্যের একটা মোটামুটি হিসাব দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

[শব্দরূপ ও প্রয়োগ] ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের পর 'দিগ', 'দের' বিভক্তির প্রয়োগ। এই প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম রামমোহন রায়ের লেখায়। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে -'রে' ও -'কে' এই দুই বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলেও -'রে' বিভক্তির প্রয়োগ পর পর কমিয়া আসিয়াছে। গুণবাচক ও জড়বস্তুবাচক বিশেষ্য পদের কর্ম্ম কারকে -'কে' বিভক্তির প্রয়োগ। 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতি করণ কারকবাচক শব্দের অপ্রয়োগ, তৎস্থলে '-তে' বিভক্তির সুপ্রচুর প্রয়োগ। আধুনিক বাঙ্গালার চতুর্থী বিভক্তিতে নিমিত্তবাচক 'জন্য' শব্দের অপ্রয়োগ (মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় ও তারিণীচরণ মিত্রের লেখায় দুই একবার পাওয়া গিয়াছে)। দুই বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'অপেক্ষা' 'চাহিয়া' প্রভৃতি পদের অপ্রয়োগ, শেষের দিকে 'হইতে' শব্দের চলন আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভ্রমবাচক 'আপনি' শব্দের রূপে 'আপনকার', 'আপনকারদের,' 'আপনকাকে', 'আপনকারা' পদের চলন যথেষ্ট ছিল। 'তুমি' শব্দের সম্ভ্রম-বাচকতা তখনও ছিল, কারণ ইহা 'আপনি' শব্দের সহিত একত্রে প্রযুক্ত হইত। আরম্ভ অর্থে 'অবধি' শব্দের প্রয়োগ।

[ক্রিয়া পদের প্রয়োগ] অসম্পন্ন বর্ত্তমানের সামান্য অতীতের স্থলে প্রয়োগ। শীলার্থ অতীতে- (habitual past)-র স্থলে বর্ত্তমানের প্রয়োগ। 'পারিয়াছিল না', 'না হও', ইত্যাকার অপপ্রয়োগ; (ইহার উদাহরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়)। সম্ভাবনা অর্থে অনুজ্ঞা পদের সহিত 'যদ্যপি' শব্দের প্রয়োগ। অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার (copula) প্রয়োগ; প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে 'অত' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ, অর্থ বা 'পূর্ব্বক' ইত্যাদি শব্দের সহিত সমাস। '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার স্থলে সপ্তম্যন্ত ভাববচনের প্রয়োগ। 'কহ' ধাতুর প্রয়োগ। 'বল' ধাতুর প্রয়োগ অত্যল্প; 'বল' ধাতুর অর্থ 'কহ' ধাতু হইতে একটু পৃথক ছিল।

[বাক্যাংশ ও বাক্যের প্রয়োগ] বিশেষণ শব্দ ও বাক্যাংশ ঘুরাইয়া বলা (periphrasis)। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের স্থান বিপর্য্যয়। এক বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ (parenthesis)। 'ও' বা 'এবং' শব্দের দ্বারা বিভিন্ন ধাঁচের বাক্যের সংযোজন। এক ছেদের মধ্যে একাধিক বাক্যের প্রয়োগ। কমা (comma) প্রভৃতি ইংরেজী বিরামচিহ্নের অসদ্ভাব।

---

১ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা. পৃঃ ৮৬-৮৭।

মেলা

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে নয়, কোন্ এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহা-প্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ্য।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা, দোকানের জিনিষও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাঁকের পয়সাও না।

সিউড়ীর ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগার শো টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার ছশো টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের অপর খানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মণিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোষের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফি যেন পাথরের জালি; রঙীন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেত পাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই ডালায় মুড়ী-মুড়কী চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই দশটা যাত্রী এদিক ওদিক যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা কিছু কাল থেকেই সুরু হবে, কি বল সিং?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জমজমাট—দেখেছ তুমি?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশো চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়ে গুলো দেখতে শুনতে ভাল হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হ্যাঁ গোটা বিশ পঁচিশেক ওরই মধ্যে বেশ। চার পাঁচটা খুবই খপ্‌সুরৎ।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কম্‌লি আর পটলি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ! ফেশান কি তাদের। টেরী-বাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে।......কি চাই গো তোমাদের?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে সুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস্ কত টাকায় ডাক হ'ল জানেন?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এ্যাঁ? ডাইস্? দেড় হাজার।

—কে ডাকলে?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ এগার বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল। তাহার পিছনে একটি ছয় সাত বছরের ফুট-ফুটে মেয়ে। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলানো নাগরদোলায় মেম পুতুল তখনও দমের জোরে বন্‌বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এস খুকী এস। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর ফর শব্দে ঘোরে, এরো-প্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা!

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্ত্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুসী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কত দাম?

—কিসের? পুতুল না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোনটা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিয়া লইল। পর মুহূর্ত্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মাণিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব্‌, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—"রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হ'ল না।"

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্ত্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দুপাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসার লোভে সংকীর্ত্তনের পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী।

সংকীর্ত্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল না বাপু, আমাদের কাছে দুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে।—আঃ যাওনা ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে—তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল—এস ভাই দাদা চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চেখে দেখুন আগে, ভাল না হয় দাম দেবেন না আপনি।

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা খাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন? বাসী? ফল কি কখনও বাসী হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল—চাখ না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বল্লেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকা বাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বল্লেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম বাড়ী বলতে যেয়োনা। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে ত। খবরদার!

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে—লাগিয়ে দিই।

জুতার পটীর পথের দুপাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটার অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোঁড়ালী-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর দল কিন্তু নাছোড়বান্দা। অমর যত আগাইয়া চলে দুপাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু! দিন না বাবু! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ী থেকে—

অর্দ্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকা বাবু, হিলটা আমি ঠুঁকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস্‌ করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু ছুঁয়ো না তুমি, অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই। কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে ব'লে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ী যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয় বাজী দেখিগে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখমলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভাল চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে ত তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে, নয় দাদা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশঃ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল,

—শাঁক আলু, পালং শীষ!

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত ক'রে ভাই—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাব্‌লা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছোট একটি কাঁচের কেসে কেমিকেলের গয়না লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্ন শ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—

তিন পাথরের আংটী একটি ক'রে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা! বেশী নয় চার পয়সা ক'রে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটী দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল - বসো দাদা, বসো।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঞ্জে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিয়াছিল—চার হাত কার দু পয়সা, বড় বড় কার দু'পয়সা, রকম রকম দু'পয়সা—জামাই বাঁধা কার দু পয়সা। টান্‌লে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না……দু দু পয়সা, দু দু পয়সা।

পটীটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলোরল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিবেগ দুই দিকে চালিয়াছিল। একদিকে বাজীর বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলা দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজীর ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে সুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্য-স্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া বড় চারিটি ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড় ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙ্গালী খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গেছে।

এইটাই আনন্দ-বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের দেহ লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্ততঃ পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এই এখানে, তারপর ওই দরজায়, আবার আর একটা দরজায়···মোট কথা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্য্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডার উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়া খেলা চলিতেছে। কোন ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরে জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্ব্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহুর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কেথোয় শব্দ হইল—ওয়াক—ওয়াক!

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাসা নারীর দেহ।

বমির উপর পড়িয়াই মেয়েটা গান ধরিয়া দিল—

'মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব।'

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো।

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনমোহিনী খিলি বাবু, মনমোহিনী খিলি। যে যে বয়সে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঞ্জন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—পান খেয়ে যাও হে বঁধু,—

একজন দর্শক সঙ্গীকে কহিল—দেখেছিস্?

অপরজন কহিল—এর চেয়েও ভাল আছে। তার নাম কম্‌লি। ফড়িং বল্‌লে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম গো তোমার?

মেয়েটি কহিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী। বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন-শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমলমালা গলায় পরা হয় না নাগর। গোটা-গোটা—

—একজন কহিল—মদ খাবে ত!

—খাওয়ায় কে? বলি বকে বকে মুখ তেত হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর!—

একটা ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোন বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্ব্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কম্‌লি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্ত কণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালবাসবি না তুই? তোর নামে আমি নালিশ করব। ডিফামেশন সুট!

মেয়েটি কহিল, যা যা যাঃ, আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন্ খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্ন্যেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকেই আমি জেলে দেব। ব্যারিষ্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্ন্যেসী হয়ে!

বাজীর ওখানে আসিয়াই মণি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভীড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজী-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোস পরিয়া নাচিতেছে। পরণের পোষাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মণি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত, দাদা ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলা বড় বড় চামচিকার মত ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজী।"

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা; দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সব চেয়ে ভাল বাজীটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রং-এর তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত ঠিং ঠিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এসো ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান...'। তারপর কি অমর তাহা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—পি, ইউ, ডাবল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে সুরু করিয়াছে।

—ও দাদা, ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মত দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোক্‌লা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সায়েবের পোষাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল—কাটা মুণ্ডু অফ বোম্বাই। এক পাশে একটা কবন্ধ, ও পাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরিজী বাজনা বাজছে। আয়, আয়! ও দিকে বড় বড় বাজী আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতে ছিল। নির্বিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিয়াছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্দ্ধমগ্ন কুটার মত। বাজীর তাঁবুর সম্মুখে

একটু পরিসর জায়গায় আসিয়া তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিং-এর খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চলো, চলো, দো-দো পয়সা! দো-দো পয়সা!

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক।

—হাঁ-হাঁ। ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবচেন কি?

—কি ভাবচেন মশা? ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। ওই দেখুন খেলা সুরু হোয়ে গেল যে!

তাঁবুর সম্মুখের পর্দ্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রং-চং-এ ষ্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

ষ্টেজের উপর তখন নর্ত্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম, রকম্ রকম্ দেখবেন। ভিতর যান, ভিতর যান।

কজন ঢুকিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার ক'জন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, সরে যাও, হাতী—হাতী!

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্য্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোকরা!

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারি পাশে চাহিল।

কিন্তু কোথায় মণি?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁস হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারি পাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝক্ মক্ করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল।

মণি! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় যে আসিয়া পড়িল কিছু সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিয়াছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে দু'টাকা, দুটাকায় চার টাকা!

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ?

অমর দেখিল আঠারো উনিশ বছরের একটি খদ্দর-পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপী।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুণে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু ঘুঁটিতে চার গুণ, তিন ঘুঁটিতে ছগুণ পাবে। ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এস আমার সঙ্গে এস। কি, হয়েছে কি তোমার? পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীবকে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা! ধর ভাই ধর। ভীড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ী কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে। সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না টয়না আছে নাকি?

—হাতে দুগাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনী বাঁধা আছে।

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্ত্তা দুই চারিটা শুধু স্পষ্ট ভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায় সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজীকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারী ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই! থাক্ সে বাহিরে দাঁড়াইয়া! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে!

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল ষ্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের দুপায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কুকুরে ডিগবাজী খায়, বাঁদরে ঘোড়ায় চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোড়ে! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া ষ্টেজের উপর পর্দ্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিকে দেখিল, দাদা ত নাই!

কয়েক মুহূর্ত্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারী দুষ্টু, তাহার দাদাটা!

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়া সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে!

পথে একটা দোকানে দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এসো ভাই, চলে এসো। কাবাব রুটী। গোস্ পরেটা! চিংড়ী-কাঁকড়া এই এই, ভীড় ছাড়ো ভীড় ছাড়ো।

ভীড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল—এ-ই বড়ো বাঘ!

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্ত্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল—এই সরোই বটেরে বাবা—গাড়ী আসছে, গাড়ী আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাট ভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভীড়ের মধ্যে সে কেমন করিয়া কোন দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দ্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্ গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াসার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে। মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক' ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাহাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকার পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ও পাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোর আলোময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে সে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তত্ক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশলাই জ্বালিয়া কে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল; মণির ফুটফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া আসিল। মণিরও ভয়ার্থ ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী?

তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না!

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি? তুমি কেঁদ না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে।

—হোক্ না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো!

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—ব'সত মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি? চেঁচাচ্ছ কেন? কে একজন কহিল—পূজো করব বলে'।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ। কমল!

কমল কহিল—অনেক নরকের দোর ত' খোলা রয়েছে, যাও না। আমি পারব না।

—একবার শোনই না!

কমলি কহিল—বেশী উপদ্রব করলে পুলিশ ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল। কম্‌লি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদ না খুকী, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম ত' খুকী নয়, আমার নাম মণি!

—মণি! তা হ্যাঁ মা মণি তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

কমলি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—।

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়া দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্য্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানীটার কথা পর্য্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগরদোলা, পুতুল দুটি কত ভাল তাহাও সে বলিল। মখমলের চটিও কেমন তা'ও অপ্রকাশ রহিল না।

কম্‌লি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক ত মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ড রূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কমলি ফিরিয়া আসিল। মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি।

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উ।

কমলি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিষ বাহির করিয়া দিল।

মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্ত গুলা কাছে টানিয়া লইল।

এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই!

নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভাল।

মখমলের চটিটা নতুন ধরণের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমল সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কম্‌লি কহিল—তোমার মা ভাল না আমি ভাল!

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভাল, তুমিও ভাল।

কমলি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী! মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল—তুমি শোও।

হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কম্‌লি!

কম্‌লি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কম্‌লি কহিল—মাসী!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল—হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস্ যে? কি হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বল্লে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুণ্‌তে হবে।

কম্‌লি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো? কার মেয়ে?

কম্‌লির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কম্‌লি জবাব দিল, না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভাল ক'রে আগড়টা দিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কম্‌লি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই একটা উচ্চ, জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহাকেও কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজী, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গেছে।

কম্‌লি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কম্‌লি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর এক মুহূর্ত্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

প্রদর্শনী

আধুনিক ফ'টোগ্রাফি

আধুনিক শিল্প-কলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি শিল্প অপর যে কোন শিল্পের রীতি ও ধাজ দক্ষতার সহিত আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। এ যুগের কাব্যে আমরা সঙ্গীতের রীতি অনুসৃত দেখিতে পাইতেছি —চিত্রকলায় স্থাপত্যের ধারা ধরিয়া লইবার প্রচেষ্টাও দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেক শিল্পকলা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও সমৃদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এ তো কেবল শিল্প-কলার নিজেদের ভিতরকার কথা, যেন একই জাতের বিভিন্ন পরিবার বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া পরিবার বৃদ্ধি করিতেছে। যখন দেখি চিত্রকলার রকম-সকম লইয়া ফ'টোগ্রাফি অপরূপ হইয়া উঠিতেছে তখন মনে হয় ইহা শুধু একই জাতির বিভিন্ন পরিবারের বন্ধন নয়, বিভিন্ন জাতির ইহা সংমিশ্রণ। চিত্রকলায় মানুষ নিজেই সৃজনকর্তা, ফ'টোগ্রাফিতে মানুষ যন্ত্রের সাহায্য লইতে বাধ্য। কিন্তু এই যন্ত্রকে নিজের সৃজনী-প্রতিভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষ আজ ফ'টো-গ্রাফিকে শিল্প-কলার স্তরে উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারই প্রমাণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি আলোকচিত্রের প্রতি-কৃতি এখানে দিলাম।

ফ'টোগ্রাফিকে সাধারণতঃ দৃশ্য জগতের নিখুঁৎ প্রতিকৃতি বলিয়াই অনেকে মনে করেন—একটি ব্যক্তিকে রাম-শ্যাম-যদু যেমন দেখে, ফ'টোতে তাহাকে তেমন দেখিতে পাইলেই ফ'টোগ্রাফি সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অপর পক্ষে সেই ব্যক্তির চিত্রই যদি কোন নিপুণ শিল্পী

অঙ্কিত করে, তবে ঐ সার্থক ফ'টোর সহিত এই অঙ্কিত মূর্ত্তির অনেক পার্থক্য লক্ষিত হইবে। এই পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। কেননা যে-শিল্পী, সে কেবল রাম-শ্যাম যদুর চোখ লইয়া ঐ ব্যক্তিকে দেখে না, সে স্রষ্টার দৃষ্টি লইয়া ঐ ব্যক্তির স্বকীয়ত্ব নিজের তুলির সাহায্যে ফুটাইয়া তোলে। ফ'টোগ্রাফিতে এই দৃষ্টির স্থান কই?—ফ'টোগ্রাফ তুলিতে ক্যামেরার প্রয়োজন, ক্যামেরা যন্ত্র মাত্র এবং যন্ত্ররাজ্যে স্বাধীন মানুষের গতিবিধি একটু খর্ব্ব হয়ই। কিন্তু ক্যামেরা-যন্ত্রকে নিতান্ত যন্ত্রবৎ চালানো এক কথা এবং ইহাকে শিল্পীর নৈপুণ্যে চালানো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। যখন দেখি ক্যামেরা যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তিনি রাম-শ্যাম-যদুর মতো তাহা যন্ত্রবৎ চালনা না করিয়া শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়াছেন, তখন সেই ফ'টোকে আমরা চিত্রকলার সম-স্তরের বলিতে বাধ্য হই।

যেমন এই উলঙ্গ-শিশুর চিত্রে দেখি। পিছনে বিকৃত উদ্যানের অ-শই ইঙ্গিত সম্মুখে বিক্ষিপ্ত দুই একটি পুষ্প-পত্র, শিশুটি যে-আসনে বসিয়া আছে আলো-ছায়ার আলপনা-রেখায় তাহা বিচিত্র, অর্দ্ধেক ফলটির দিকে সানুরাগ দৃষ্টিতে চাহিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে উপবিষ্ট শিশু, তাহার একটি দিকে ছায়া পড়িয়াছে —সমস্ত মিলিয়া ইহা মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধকে তৃপ্তি করে। মাত্র ফ'টোগ্রাফের (অর্থাৎ সাধারণত ফ'টোগ্রাফ বলিতে যাহা গ্রাহ্য) গণ্ডী ইহা নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়াছে।
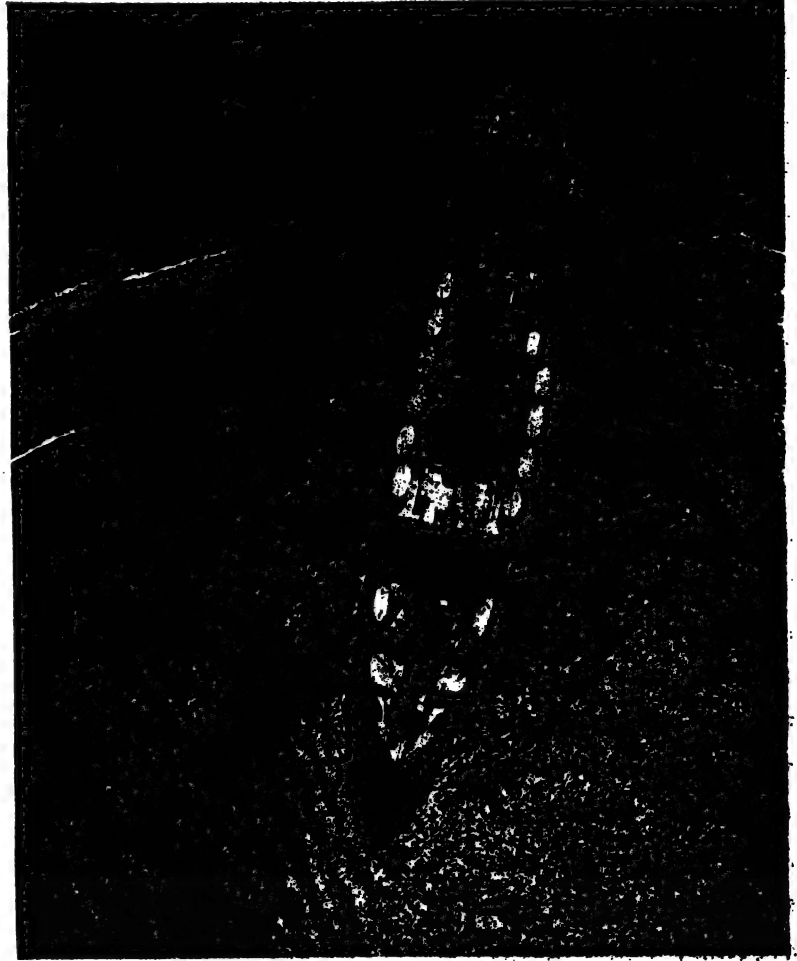
বিংশ শতাব্দীর আলোক-চিত্র আর সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তু-জগৎ দেখিয়া খুশি নয়, একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর সাহায্যে ইহা দৃশ্য জগৎকে রূপান্তরিত করিয়া দেখিতেছে। অত্যন্ত কুশ্রী-দর্শন বিকট ভয়াবহ বস্তুকে এতদিন মানুষ তুলির সাহায্যে যে-সৌন্দর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিতেছিল, আজ ক্যামেরার পক্ষেও তাহা করা সম্ভব হইয়াছে। বীচি-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রজলে ভাসমান জাহাজকে ব্যোমযান হইতে ক্যামেরার সাহায্যে সে অলৌকিক করিয়া দেখিতেছে ও দেখাইতেছে—কোথায় গিয়াছে ইহার ধূম্রায়মান চিম্‌নির ভীষণতা, মাস্তুলের অভ্রভেদী উচ্চতা, বিপুল জলরাশির পারিপার্শ্বিকে অত্যন্ত নিরীহ অবস্থানে ইহা সেই জলরাশিকে অপূর্ব্ব-শ্রীতে ফুটাইয়া তুলিয়া নিজে স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ফ'টোগ্রাফি যদি কেবল চিত্রকলার চাতুর্য্যের অনুকৃতিতেই ব্যস্ত থাকে তবে ফ'টোগ্রাফির সত্যকার যে কাজ তাহা অবজ্ঞাত হইবে। মোটা-মুটি ভাবে বলিতে গেলে ফ'টোগ্রাফি ভাষায় লিখিত না হইয়াও ইতিহাস-ধর্ম্মী। কিছু মাত্র বিকৃত না করিয়া ইতিহাস যেমন সময়ানুযায়ী ঘটনাকে ভবিষ্যতের জন্য মজুদ রাখিয়াছে—এক হিসাবে ফ'টোগ্রাফের প্রয়োজনীয়তাও সেই দিকেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। আজ যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহার

পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিত বিবরণ পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সেই ঘটনা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের চোখে ছবিতেও ফুটিয়া উঠিয়া পাঠককে বিষয়-বস্তুর অধিকতর পরিচয় দিতে পারে—ফ'টোগ্রাফারের ধর্ম্ম ও লক্ষ্য হইবে তাহাই। সে হিসাবে ১৯৩২ সনের জুলাই মাসের তপ্ত দ্বিপ্রহরে ফিন্‌ল্যাণ্ডে তোলা এই জিপ্সিদ্বয়ের ছবি অতুলনীয়; ইহাদের পরিধানে, তাহার বৈচিত্র্যে সমসাময়িকতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু ইহাদের মুখে-চোখে চিরন্তন ভ্রাম্যমাণের যে পরিচয়, তাহা ইহাকে কেবল ফ'টোগ্রাফির গণ্ডীতে বাঁধিতে পারে নাই, চিত্রকলার পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছে।

আধুনিক যুগের ফ'টোগ্রাফি এই নির্দ্দিষ্ট দিকে দিনের পর দিন যে-সব অপূর্ব্ব সুন্দর চিত্র উপহার দিতেছে, আমরা প্রদর্শনীতে মাঝে মাঝে তাহাদের পরিচয় দিব।

এই সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ঘুমন্ত শিশুর শান্ত মুখশ্রী—তাহার চূর্ণ কুন্তল, আঁখি-পল্লবে, ভ্রূযুগের, অধরোষ্ঠের, চিবুকের সৌন্দর্য্যকে বিংশ শতাব্দীর আলোক-চিত্র-শিল্প যে অভিনব মাধুর্য্যে প্রকাশ করিয়াছে—তাহা যে কোন শিল্পীর গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে। জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—The position of the pictorial photography as an art becomes more assured every year. As medium of self-expression it is ever finding a greater number of exponents as its processes are simplified.

আমাদের দেশের ফ'টোগ্রাফ সম্বন্ধে এখনও অবশ্য একথা বলা যায় না।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বাড়ীওয়ালা যে কি রকম লোক বোঝা কঠিন। টাকা ফিরাইয়া দিবার পর দিন হইতে সেই যে গিয়াছে আর তাহার দেখা নাই। দুইবেলা যে খোঁজ লইতে আসিত তাহার এই ভাবে হঠাৎ দীর্ঘদিনের জন্য অন্তর্ধান হওয়া একটু বিস্ময়কর বই কি!

বিনুর মা বলিয়াছিলেন, খরচ তাঁহার সামান্য, বেশী টাকার দরকার নাই। কিন্তু সামান্য খরচেও ধীরে ধীরে একদিন হাতের পুঁজি ফুরাইয়া আসে। বিনুর মার দিন চলা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রত্যেক দিনই বিনুর মা অক্ষয় বাবুর আসিবার অপেক্ষা করেন। অসুখ বিসুখ করিবার দরুণ হয়ত এতদিন ভদ্রলোক আসিতে পারেন নাই ভাবেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু একেবারে নিরুদ্দেশ।

হাতে যাহা কাজ ছিল সাঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু অক্ষয় বাবু ছাড়া কেই বা তাহার দাম আনিয়া দিবে। অর্থোপার্জ্জনের আর কোন পথও তাঁহার জানা নাই। বিনুর মা রীতিমত শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। অক্ষয় বাবুর উপর কতখানি যে তিনি নির্ভর করিতে হঠাৎ বাধ্য হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অশান্তি অনুভব করিলেও তাঁহার আগমন এইবার তিনি সমস্ত মন দিয়া কামনা করেন।

সেদিন এই ভাবে টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্যই হয়ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ভদ্রলোক আসিতেছেন না এ সন্দেহ তাঁহার মনে জাগে। মনে হয় অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেও হইত। ভদ্রলোকের উদারতাকে অপমান করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার জন্য নিজেকে তিনি তিরস্কার করেন।

মাথা গুঁজিবার যাহার ঠাঁই নাই তেমন নিঃসম্বল অসহায় স্ত্রীলোকের অত স্পর্দ্ধাই বা কেন! বিপন্ন স্ত্রীলোককে ভদ্রলোক প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন মাত্র। তাহাতে দোষ ধরিবার কি আছে! বিনুর মার কাছে অনুপস্থিত অক্ষয় বাবুর রূপ ধীরে ধীরে বদলাইয়া যায়। মনে হয়, সত্যই এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক আজকালকার দিনে কয়টা দেখা যায়। অক্ষয় বাবুর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই তবু ভদ্রলোক নিজে হইতে তাঁহাদের যে সাহায্য করিয়াছেন কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে তাহা ত পাওয়া যায় না। আর এই লোককে তিনি কিনা সন্দেহ করিয়াছিলেন! টাকা ফিরাইয়া দিয়া এরকম লোকের মনে আঘাত দেওয়া যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে তাহা সহসা বুঝিতে পারিয়া বিনুর মার অনুশোচনার আর অন্ত থাকে না।

এখন অবশ্য অনুশোচনা করিয়া লাভ কি? অক্ষয়বাবু কিছু ত' আর জানিতে পারিতেছেন না। উপায় থাকিলে বিনুর মা অক্ষয়বাবুকে খবর পাঠাইতেন। কিন্তু তাঁহার ঠিকানা জানা নাই।

বিনুর মা এইবার চারিদিকে অন্ধকার দেখেন। মুদিখানায় বিনুকে ধারে কিছু জিনিষপত্র আনিতে কয়েক বার পাঠাইয়াছিলেন। মুদি ধারে দিতে রাজী হয় নাই।

নিরুপায় হইয়া বিনুর মা কখনও যাহা করেন নাই তাহাই এইবার করেন। লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই একদিন ছেলের হাত ধরিয়া তিনি বাহির হন।

সামনের মাঠটুকুর ওপারেই উকিল বাবুর বড় দোতালা বাড়ী, দুপুর বেলা বিনুকে লইয়া মা তাঁহাদের দরজায় গিয়া দাঁড়ান।

একেবারে ঠিক ভিখারীর বেশে কিন্তু বিনুর মা কিছুতেই যাইতে পারেন নাই। ট্রাঙ্কের ভিতর ছেঁড়া হইলেও পরিষ্কার একটা শাড়ী ছিল সেইটাই শেষ পর্য্যন্ত পরিয়াছেন। বিনুকে একটু ফরসা কাপড় না পরাইয়াও পারেন নাই।

নীচে হইতে ঝি বলে, "কাকে চাই গা।"

বিনুর মার লজ্জায় সঙ্কোচে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসে। অস্ফুট স্বরে বলেন, "তোমাদের গিন্নিমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

বিনুর মার চেহারা ও বেশভূষায় ভিক্ষুকের কোন ছাপ থাকিলে হয়ত ঝিই নীচ হইতে ফিরাইয়া দিত। কিন্তু ঝি, গিন্নীর কোন পরিচিত লোক ভাবিয়া উপরের একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া বলে—"যাওনা, মা ওপরে আছেন।"

বিনুর মার সেইখান হইতেই ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। উপরে যাইতে সাহস হয় না। বাড়ীর কোন পুরুষ মানুষের সামনেও হয়ত পড়িতে পারেন ভাবিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করেন।

কিন্তু না যাইলেও যে চলেনা। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিনুর মা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাড়ীর গৃহিনীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়ান। ঘরের সামনে পরদা ফেলা। লজ্জা দমন করিয়া সে-পরদা সরাইয়া তাঁহাকে উঁকি মারিতে হয়।

চমৎকার সুসজ্জিত ঘর। তাহারই ভিতর গদি-আঁটা আরাম-কেদারায় বসিয়া অল্পবয়স্কা একটি সুন্দরী মেয়ে কি একটা বই পড়িতেছে। ইনিই গৃহিণী কিনা বিনুর মার সন্দেহ হয়। গৃহিণীর এত অল্প বয়স ও এতটা রূপ বিনুর মা আশা করেন নাই।

পর্দ্দা সরাইবার পর মেয়েটিও বই হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহাদের দিকে অবাক হইয়া ক্ষণিক চাহিয়া থাকে, তাহার পর ইজি-চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—"আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বিনুর মা কুন্ঠিত ভাবে বলেন, "আমরা এই কাছেই থাকি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

মেয়েটির মুখ তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলে,—"আসুন, আসুন।"

বিনুর মা মেঝের উপর পাতা কার্পেটের উপরই বসিতে যান। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই শোনে না। তাঁহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া একটা চেয়ার আনিয়া কাছে বসিয়া বলে, "দুপুর বেলা কথা কইবার একটা লোক পাইনা, কি কষ্টে যে থাকি! আজ আমার খুব সৌভাগ্য।"

বিনুর মা কথা কহিবার কিছু খুঁজিয়া পান না।

মেয়েটি বিনুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিতে করিতে বলে, "আমার বাপের বাড়ীতে দুপুর বেলা মেয়েদের খুব মজলিস হয়। পাশাপাশি বাড়ি—আমরা ত' রোজ যাওয়া আসা করতাম। এখানে এসে দেখছি উল্টো রকম। কেউ কারুর বাড়ী আসে না। আমি নতুন মানুষ, কে কি মনে করবে ভেবে নিজে যেতেও সাহস হয় না।"

মেয়েটি যেমন অমায়িক তেমনি আমুদে। তাহার অনর্গল কথার স্রোত বন্ধ হইবার নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে বিনুর মাকে তাহার বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীর খবর হইতে তাহার মনের গোপন কথা পর্য্যন্ত সমস্তই জানাইয়া দেয়। বিনুর মা যে এপর্য্যন্ত একবার দুই বারের বেশী মুখ খোলেন নাই তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। সে বোধ হয় তাহা লক্ষ্যও করে নাই।

জীবনের সৌভাগ্যের আনন্দ মেয়েটির সমস্ত মুখ চোখ ও কথায় বার্ত্তায় পরিস্ফুট। তাহার মনের কোথাও কোন দুঃখ-বেদনার ছায়া নাই।

বিনুর মা ইতিমধ্যে সব কথাই জানিয়াছেন। সে যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহার স্বামী যে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক দিন অবিবাহিত থাকিবার পর তবে বিবাহ করিয়াছেন, এখনও যে সে তপস্যাভঙ্গের কথা বলিয়া স্বামীকে ঠাট্টা করে, স্বামী যে মহাদেবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করেন, তাহার স্বামীর সত্যই যে বয়স কম এবং প্রথম পক্ষের স্ত্রী যে বিবাহের মাস ছয়ের মধ্যেই মারা গিয়াছিল—কোন কথাই মেয়েটি বলিতে ভোলে নাই।

এত কাছে থাকিলেও বিনুদের কোন খবরই সে রাখে না দেখা গেল। জানিবার তাহার অবসরও নাই। নিজের কথাতেই সে মত্ত।

কথায় কথায় বিকাল হইয়া আসিয়াছে। ঝি আসিয়া বলে—"মা বিকেলে তুমি যে কি কাট্‌লেট ভাজবে বলেছিলে, ঠাকুর কি মশলা-টশলা বাটতে হবে জিজ্ঞেস করলে!"

মেয়েটি রাগের ভাণ করিয়া বলে—"না, না, কিছু ভাজব-টাজব না, তুই বলগে যা।"

ঝি ফিরিয়া যাইতেই কিন্তু মেয়েটি তাহাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলে, "তাকে এখন কিছু করতে হবে না। ঠাকুরকে বল্ আমি যাচ্ছি।"

সে চলিয়া যাইবার পর মেয়েটি সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বিনুর মাকে বলে, "ওঁর ঠাট্টার জ্বালায় ভাই আজ কাট্‌লেট ভেজে খাওয়াব বলেছিলাম। আমার বাক্স খুলে কবে আমার স্কুলের সার্টিফিকেট দেখেছিলেন কে জানে। সেই থেকে আমায় কেবল ঠাট্টা—'রান্নার জন্য দ্রৌপদী না কি একটা টাইটল পেয়েছিলে যে!' স্কুলের রান্না শেখা ত জান ভাই—একটা ফ্রেঞ্চ টোষ্ট ভেজেই বড় রাঁধিয়ে—আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। আজ শুধু রাগ করে বলেছিলাম—তা বলে তোমার হোটেলের চেয়ে ভাল রাঁধতে পারি, আজ খেয়ো।"

একটু থামিয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ ভাই, বিস্কুটের গুঁড়োর চেয়ে আলো চাল বাঁটা দিয়ে নাকি ভালো কাটলেট হয়? আমি ভাই সত্যি ওসব কিছু জানি না।"

বিনুর মা যেমন জানেন তেমনি পরামর্শ দিয়া এইবার উঠিয়া পড়েন। মেয়েটি নীচে পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলে—"আলাপ হয়ে গেল, এবার থেকে সময় পেলেই কিন্তু আসতে হবে। আমিও শীগ্‌গীর একদিন যাচ্ছি মনে থাকে যেন।"

হতাশ হইয়া বিনুর মা বাড়ী ফেরেন। এত সৌহার্দ্দ্য ও আদর-আপ্যায়নের ভিতর সামান্ত ভিক্ষার কথা তিনি কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই।

হঠাৎ অক্ষয়বাবু আসিয়া দেখা দেন একদিন। তাহার আগে একবেলা বিনুকে পর্য্যন্ত উপবাস দিতে হইয়াছে।

অক্ষয়বাবু আসিয়া একেবারে গোড়ার দিকের মত বাহির হইতেই বিনুকে ডাকিতেছিলেন। গলার স্বর শুনিয়া মা বিনুকে দিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠান।

অক্ষয়বাবু যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ভিতরে আসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলেন—"এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই। আপনারা ভালো আছেন ত?"

বিনুর মা আজ লজ্জা-সরম ভুলিয়া অনেক কথাই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর কথার ধরণে তিনি একেবারে দমিয়া যান। একথার উত্তরে নিজেদের দুর্দ্দশার কাহিনী কেমন করিয়া জানান যায় তাহা তিনি ভাবিয়া পান না।

শুধু বলেন—"আপনি অনেক দিন আসেন নি।"

"হ্যাঁ, কাজ কর্ম্ম সব একাই করতে হয়, সময় পাই না।" অনাত্মীয় পুরুষকে এ কথার পর আর কিছুই বলা যায় না। সময় যদি তাঁহার সত্যই না থাকে তাহা হইলে বলিবার আর কি আছে! তাঁহার উপর ত আর জোর চলে না। তবু মনে মনে বিনুর মা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। অক্ষয়বাবুকে এখন স্বল্প কথায় বিদায় দিলেই কোন রকমে আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখা যায়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। অক্ষয়বাবুর ঔদাসীন্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেও বিনুর মাকে গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে হইবে। ভদ্রলোকের সাহায্য ছাড়া তাঁহার কোন গতি নাই। এবার চলিয়া গেলে অক্ষয়বাবু আর আসিবেন কিনা সন্দেহ। হয়ত এবার এ আশ্রয় ত্যাগ করিতেও তাঁহাকে হইতে পারে।

অক্ষয়বাবু খানিক উস্‌খুস্ করিয়া বলেন—"আচ্ছা আজ তবে আসি!"

বিনুর মা তথাপি মাথা নীচু করিয়া কোন রকমে বলেন—"আমার সে কাজগুলো শেষ হয়েছে!"

"ওঃ সেই সেলাই-এর কাজ!"

সে ব্যাপার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর কোন প্রকার আগ্রহ যে নাই এ কথায় তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়।

খানিক নীরবে মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া বিনুর মা আবার বলেন,—"সে গুলো দিয়ে আসতে পারলে ভাল হয়।"

"হুঁ, তা ত হয়! তাদের টাকাটা এখনও শোধ হয় নি।"

কিন্তু টাকা শোধ দেওয়ার জন্য বিনুর মা এখন ব্যস্ত হন নাই। এখন তাঁহার কিছু অর্থের প্রয়োজন। বলেন—"আর কিছু কাজও যদি পেতাম…"

অক্ষয়বাবু চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলেন, "এতদিন বাদে আর তারা কি কাজ দেবে? অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলাম।"

বিনুর মা একেবারে অকূল পাথারে পড়েন। সত্যই যদি আর কাজ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে—ভাবিতেও তিনি শিহরিয়া ওঠেন।

অক্ষয়বাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলেন—"আচ্ছা বলে দেখব যদি হয়!"

অক্ষয়বাবু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া মরিয়া হইয়া বলেন—"আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।"

অক্ষয়বাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলেন—"অগ্রিম টাকা!" তাঁহার কণ্ঠের স্বরে সরল বিস্ময় না নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কি আছে বিনুর মা ভাল বুঝিতে পারেন না। কিন্তু লজ্জায় অপমানে তাঁহার একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

এবার অক্ষয়বাবুর কণ্ঠস্বরে যে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাতে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলেন—"আমি ভেবেছিলাম অগ্রিম টাকা নিতে আপনার ভয়ানক আপত্তি!"

বিনুর মা চুপ করিয়া থাকেন।

অক্ষয়বাবু আবার বলেন—"আপনার মত বদলেছে দেখে আমি অবশ্য সুখীই হলাম। কিছুদিন আগে বদলালে আরও ভাল হ'ত।"

অক্ষয়বাবুর কথায় বিনুর মা মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া তিনি চোখ নামাইয়া ল'ন। তাঁহার চোখমুখ লাল হইয়া ওঠে। অক্ষয়বাবুর মুখে চোখে হাসিতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে অতিবড় নির্বোধেরও তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে ভুল হইতে পারে না। অক্ষয়বাবুর দৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত শরের মত বিদ্ধ করিতে থাকে।

নিকটে সরিয়া আসিয়া পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া অক্ষয়বাবু তাহা বিনুর মার হাতে দেন। বলেন—"তাদের হয়ে আমিই আজ কিছু আগাম দিয়ে গেলাম। হিসেব নিকেশ আজ সন্ধ্যের পর এসে করব; দিনের বেলা আমার সময় হবে না।"

বিনুর মাকে সত্যই এবার অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করিতে হয়। নিজে দু'বেলা উপবাসী। বিনু একবেলা অভুক্ত আছে। তবুও শেষ পর্য্যন্ত টাকাটা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। মুখেও তিনি কিছু হয়ত বলিতেন কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অক্ষয়বাবু এ আচরণে মৃদু একটু হাস্য করেন মাত্র। নোটটা কুড়াইয়া লইবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তিনি নিম্নস্বরে শুধু বলিয়া যান—"আসতে বোধ হয় আমার একটু রাত হবে।"

অনেক দিন বাদে মা বিনুকে আজ অত্যন্ত আদর করেন। মা আজ অনেক কিছু রাঁধিয়া তাহাকে সন্ধ্যার পরই খাওয়াইয়াছেন। সে যাহা যাহা ভালবাসে কিছুই মা ভোলেন নাই। জিনিষপত্র বিনুকেই কিনিয়া আনিতে হইয়াছে। পয়সা ব্যয় সম্বন্ধে মায়ের এই আকস্মিক উদারতা দেখিয়া বিনু অবাক হইয়া গিয়াছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা তাহাকে কাছে লইয়া বাহিরের দাওয়ার উপর বসিয়াছেন। বিনু জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"মা তুমি খেলে না ?"

মা হাসিয়া বলিয়াছেন—"খাবখ'ন। মা না খেলে তোর ভাবনা হয় বিনু ?"

বিনু লজ্জিত হইয়া কিছু বলিতে পারে নাই। মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ওঁর জন্যে তোর মন কেমন করে বিনু ?"

এ প্রশ্নে বিনুর অবাক হইবারই কথা। মাতাপুত্রের মধ্যে পরস্পরের অস্ফুট সম্মতিক্রমেই এ প্রসঙ্গ যেন এতদিন চাপা ছিল। মা কখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বিনুও আবছা আবছা অনেক কিছু জানিলেও দুর্জ্ঞেয় কোন প্রেরণায় বাবার কথা স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় বুঝিয়াছে।

আজ প্রথম মা বাবার কথা তুলিলেন। বিনু প্রথম চমকিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারে না। খানিক বাদে প্রায় চুপি চুপি মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া বলে—"করে।"

তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করিবার চেষ্টায় তাহার ফোঁপানি শোনা যায়। মা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকেন; সান্ত্বনার কোন কথা বলেন না।

বিনু কি জন্য কাঁদিতেছে জানিতে পারিলে মা বোধহয় একটু অবাক হইতেন। বাবা জেলে গিয়াছেন বলিয়া দুঃখ বিনুর আছে, কিন্তু সে দুঃখ বড় নয়। বাবার দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়াও সে কাঁদিতেছে না। বাবার কথা উঠিতেই তাহার মনে বাবার সেদিনকার অসহায় কাতরতার যে ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই তাহার সমস্ত বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাবার সে উদ্‌ভ্রান্ত হতাশ চেহারা স্মরণ করিলেই কি যেন কেন তাহার পক্ষে কান্না সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অনেকক্ষণ বাদে বিনু শান্ত হইলে মা বলেন—"এবার ঘুমোতে চল বাবা।"

বিনু চোখ মুছিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে—"তুমি যাবে না ?"

"যাবখ'ন রে পাগলা" বলিয়া মা হাসেন।

বিনু নিজের বিছানায় শুইতে যাইতেছিল হঠাৎ মা তাহাকে আবার টানিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করেন। মায়ের আদর আজ যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে। শব্দ নাই তবু বিনুর মনে হয় মা কাঁদিতেছে।

বাবা জেলে যাইবার পর প্রথম প্রথম মা অত্যন্ত ছটফট করিতেন, সারাদিন কাঁদিতেন। কিন্তু তখনকার কান্নার সহিত এ কান্নার তফাৎ বিনুও বুঝিতে পারে।

সান্ত্বনা দিবার ভাষা সে জানে না। কাতর ভাবে সে শুধু মাকে একবার ডাকে।

একটু স্থির হইয়া মা বলেন, "তোকে আজকাল বড্ড বকি, মারি। মাকে আর তোর ভাল লাগে না, নারে বিনু!"

একথার বিনু কি জবাব দিবে! অকারণে তাহারও অশ্রুতে দুচোখ ভরিয়া আসে।

আজ যেন তাহাদের কি হইয়াছে। মা হঠাৎ কোথা হইতে কি কথা টানিয়া আনিয়া বলেন, "তুই যদি আর একটু বড় হতিস্ বিনু, তাহলে আজ আমাদের কিছু ভাবতে হত না। রোজগার করে এনে মাকে খাওয়াতে পারতিস্ ত!"

এসব কথার কোন অর্থ নাই, তবু একটা কিছু উত্তর দিবার জন্য বিনু বলে—"পারতাম।"

মা এই কথাতেই যেন অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলেন, "তোর বড় হতে কিন্তু এখনো অনেক দেরী বিনু! ততদিন কি হবে?" শেষ কথাগুলি বলিবার সময় মার গলার স্বর একটু নামিয়াই আসে।

অনেকক্ষণ তাহার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিতেছিল বিনু এইবার তাহা প্রকাশ করে। জিজ্ঞাসা করে—"আজ এত খরচ করলে কেন?"

মা হাসিয়া বলেন—"তা করলেই বা একদিন! তোর বুঝি ভাবনা হচ্ছে ভাই!"

একটু থামিয়া মা যেন নিজের মনেই বলেন—"তোর ভাবনা কি বাবা! বেটাছেলে! পরমায়ু থাকলে বড় হয়ে নিজের রোজগারে একদিন স্বাধীন হতে পারবি। কারুর মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, কিছু ভয় করতে হবে না। এখন কিছুদিন হয়ত কষ্ট আছে!"

একথাগুলা মা নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলেন কিনা কে জানে!

খানিক বাদে সে শুইতে যাইবার সময় মা হঠাৎ বলেন—"আজকাল তোর একা শুতে ভয় করে না, নারে বিনু?"

বিনু সরল ভাবে বলে, "না"।

পিছন হইতে মার মুখ সে দেখিতে পায় না।

বিনুর জীবনের একটি দিনের পাতা বিস্ময় বেদনা ও আতঙ্কের স্মৃতির টুক্‌রা টুক্‌রা অসংলগ্ন চিত্রে সব চেয়ে ভয়াবহ হইয়া আছে। এখনও সে পাতা সে সজ্ঞানে খুলিতে সাহস করে না। তন্দ্রার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে কখনও স্মৃতির সে-পাতা উল্টাইয়া যায়। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সে জাগিয়া ওঠে।

পরের দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে সে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে যেন অনেকে মিলিয়া ডাকিতেছে। অত্যন্ত রূঢ় ভাবে তাহাকে যেন অনেকে মিলিয়া জাগাইতে ব্যস্ত। জাগিয়া ওঠার পর লোকগুলার চোখে সে যাহা দেখিয়াছিল এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই। কোন মানুষের মুখের কথা তাহার মনে পড়ে না। কেবল কতকগুলা চোখ—সে চোখের নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর কৌতূহল, সামান্য বুঝি একটু বেদনা, পরিপূর্ণ আতঙ্ক, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

কিছু সে বুঝে নাই, কিন্তু বুকের ভিতর পর্য্যন্ত সেই সমস্ত চোখের ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে তাহার কেমন করিয়া হিম হইয়া গিয়াছিল।

তাহার পর সে বুঝি বাহিরে আসিয়াছিল। ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল কিনা তাহাও তাহার স্মরণ হয় না। কিন্তু না দেখিতেই তাহার মনে সে ছবি যেন বহুপূর্ব্বেই আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ ছবিও নয়—সামান্য একটু আধটু অংশ মাত্র, কিন্তু তাহাই যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকায় ক্ষত করিয়া কে তাহার হৃদয়ে চিরদিনের মত খোদাই করিয়া দিয়াছে। শাড়ীর নীচে মায়ের শীর্ণ আলতা-পরা পা অসহায় ভাবে শূন্যে ঝুলিতেছে। মাথায় অপর্য্যাপ্ত সিন্দুর গড়াইয়া বেদনাবিকৃত পাণ্ডুর মুখে ও গলার কাছে শাড়ীতে পড়িয়াছে।

পুলিস ডাকা হইয়াছে। তখনও কেহ লাশ নামাইতে সাহস করে নাই। পাড়াশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে।

বিনুকে যেন অনেকে আদর করিতেছে, কুৎসিত বিতৃষ্ণাকর আদর। আবার সবাই যেন তাহাকে ভুলিয়া ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

কে যেন তাহাকে কোলে করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বিনু উঠিবে না, কিছুতেই উঠিবে না। আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া সে সেই জঘন্য আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইল।

তাহার গায়ে মাথায় কেবল মানুষের হাত—হাত নয় যেন পশুর থাবা। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত হইয়া যাইতেছে—ইহারা কি বুঝিতে পারে না।

কেমন করিয়া কে প্রথম খবর পাইয়াছিল কে জানে! এসব খবর রাষ্ট্র হইবার অসাধারণ সব পন্থা আছে। প্রথম দেখার গৌরব লইয়া চারিধারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তর্কও বুঝি হইয়াছিল।

মানুষের জঙ্গলের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বিনু কখন একবার বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর ভিতর থাকা অসহ্য। কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিল, কেহ আবার করিল না।

বিনু সে বাড়ীতে আর ফিরিল না। (ক্রমশঃ)

টমাস আল্‌ভা এডিসন

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

টমাস আল্‌ভা এডিসন সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া উল্লিখিত হন। তিনি ১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমেরিকার মিলানের ওহিয়ো সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে শত সহস্র বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ও বিচিত্র আবিষ্কারের দ্বারা মানবের সুখ ও সুবিধা এত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইত, যাহা করিবার তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানের নূতন কোনও বিভাগে নূতন কিছু করিবার অবকাশ তাঁহারা রাখিয়া যান নাই। অলস কর্ম্মবিমুখ যাহারা তাহারা সহজেই বলিতে পারিত, করিবার আর আছে কি? যে দিকেই মাথা খাটাইতে যাই, দেখি, পূর্ব্বগামীরা কাজ সারিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিছু কম আবিষ্কার করিলে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবী, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য মহাদেশ শুধু এই ধরণের আরামপ্রিয় নিরুদ্যম ব্যক্তিদের অধিষ্ঠানভূমি নয়, বিপুল উদ্যমশালী মহাপুরুষেরা জন্মিয়াছেন এবং সকল অসুবিধা সত্ত্বেও নিরলস চেষ্টার দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীতে নূতন কিছু করিবার অবকাশ সব সময়েই আছে, আজও আছে এবং কালও থাকিবে। এডিসন গত শতাব্দীতে এই উদ্যোগী পুরুষদের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বগামীদের সকল কীর্ত্তি সত্ত্বেও গত শতাব্দীতে কত নূতন আবিষ্কার হইয়াছে শুনিলে বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয় এবং এই বিশ্বাস জন্মে যে পরিষ্কার মাথা এবং সুস্থ কর্ম্মপ্রেরণা থাকিলে মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি বন্ধ্যা থাকিতে পারে না। একা এডিসন কি অঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স পেটেণ্ট অফিসে তাহার পরিচয় আছে। ১৮৭৯ সাল (তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২২বৎসর) হইতে গত বৎসরে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি পনের শতেরও অধিক আবিষ্কারের পেটেণ্টের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন; আরও ১২০টি দপ্তরে তাঁহার দেড় হাজারেরও অধিক আবিষ্কারের উল্লেখ আছে। বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট হইতেও তিনি মোট ১২৩৯টি আবিষ্কারের পেটেণ্ট করাইয়াছেন। এই গুলিতেই তাঁহার উদ্ভাবনী-প্রতিভা সম্পূর্ণ নহে, ভবিষ্যৎ আবিষ্কর্ত্তাদের সুবিধার জন্য তিনি অসংখ্য নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

টমাস আল্‌ভা এডিসন (মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে)।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও যুদ্ধকার্য্যে স্বদেশকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল কাজ করিয়াছেন আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট সেজন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এগুলি বৈজ্ঞানিকের দেশপ্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি নিজ গবেষণাগারের ভার তাঁহার কর্ম্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করিয়া দেশের সেবায় মাতিয়াছিলেন। আমেরিকান নৌবিভাগ তখন তাঁহার নিকট ৪৫টি বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপিত করে, তিনি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে সবগুলিরই সমাধান করিয়া দেন। ডুবো জাহাজ (সাবমেরিন) সম্বন্ধে এই সময়েই তিনি অনেক নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কার্ব্বলিক এসিড, এনিলিন অয়েল, এনিলিন সল্ট, বেনজল, প্যারাফেনিলিনডাইএমিন প্রভৃতি যুদ্ধকার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে ইয়োরোপ হইতে আনাইতে হইত, স্বদেশেই তিনি সেগুলি উৎপাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

এডিসনের আবিষ্কারগুলি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে ভাবে কাজে লাগিতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে এই অসাধারণ মানুষটির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই আবিষ্কারগুলির সাহায্যেই মানবীয় সভ্যতার উৎকর্ষসাধনকারী বহু চারুশিল্পকলা ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই গুলিতে বর্ত্তমানে ৩৫০০ লক্ষের অধিক টাকা খাটিতেছে। এই সকল ব্যবসায়ের বাৎসরিক মুনাফা ৪২৫ লক্ষ টাকারও অধিক ; এবং ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ লোক এই সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। সবগুলিই যে এডিসনের নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেকটির মূলে যে তিনি আছেন, মূল সূত্রগুলি যে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ না পাইলে যে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এডিসন দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সবল পরিবারের সন্তান। কিন্তু শৈশবাবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির হইলেও অত্যন্ত জিজ্ঞাসু ছিলেন—প্রশ্নে প্রশ্নে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের অস্থির করিয়া তুলিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই তাঁহার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ লক্ষিত হইত। দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া বাল্যে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে দিয়া ছাড়াইয়া আনা হয়; তাঁহার মাতা স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়া তোলেন।

দশ এগার বৎসর বয়সে রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যায়। তিনি কেমিষ্ট্রি সম্পর্কীয় বহু পুস্তক সংগ্রহ করেন এবং বাড়ীর একটি ছোট কুঠরীকে তাঁহার গবেষণাগার করিতে দিবার জন্য মাতার অনুমতি লন। স্থানীয় ঔষধালয়ে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন সেইগুলির সাহায্যেই তিনি পরীক্ষা চালাইতেন। এইভাবে এই ক্ষুদ্র কুঠরীতে ছোট বড় আকারের প্রায় দুইশত বোতল ও শিশি সজ্জিত ছিল- পাছে কেহ সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে এই জন্য প্রত্যেকটির গায়ে 'বিষ' এই লেবেল লাগাইয়া রাখিতেন। সেই বয়সেই তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত যে নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়া তিনি কোনও বইয়ের কোনও কথাই বিশ্বাস করিবেন না।

বার তের বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে, হাত-খরচার টাকায় মালমশলার খরচ আর কুলাইতেছে না, তখন তিনি রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ বেচিয়া পয়সা উপার্জ্জনের জন্য পিতামাতার অনুমতি লইলেন। পোর্ট হারণ হইতে ডেট্রয়েট পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়ের ট্রেণে ট্রেণে তিনি সংবাদপত্র, মাসিকপত্র ও অন্যান্য খুচরা জিনিষ বিক্রয় করিতে সুরু করিলেন। তাঁহার জিনিসের ষ্টক রাখিবার জন্য মালগাড়ীর একটি কামরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তিনি সেখানেই বাড়ী হইতে তাঁহার গবেষণাগার তুলিয়া আনেন এবং অবসর সময়ে পরীক্ষা করিতে থাকেন। এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরাতন মুদ্রাযন্ত্র ও কিছু টাইপ কিনিয়া তিনি একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিয়া ট্রেণে বেচিতে সুরু করেন। এই সাপ্তাহিকের নাম দেওয়া হয় উইক্‌লি হেরাল্ড এবং এডিসন হন এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, সম্পাদক, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান ও ডিষ্ট্রিবিউটার। ঐ পত্রিকায় সাধারণত স্থানীয় বাজার-দর ও রেলের খবরা-খবর থাকিত এবং এক সময় উহার নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকসংখ্যা হইয়াছিল ৪০০। যতদূর জানা যায়, চলতি ট্রেণে ছাপা ইহাই প্রথম সংবাদপত্র ও এডিসনই সম্ভবত ছাপা সংবাদ-পত্রের তরুণতম সম্পাদক।

এই ভাবে এডিসন দুই তিন বৎসর কাগজ ফিরি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা চালাইতে থাকেন কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একদিন ফস্‌ফরাস সমেত একটি শিশি গাড়ীর মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় ও কামরায় আগুন ধরে। ট্রেণের কণ্ডাক্টার শিশি বোতল সমেত বালককে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় ও তাঁহার কর্ণমূলে এমন ঘুষি মারে যে সেই দিন হইতেই তাঁহার কানের দোষ ঘটে। ইহার ফলেই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বধির হইয়া যান।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে এডিসন এক ষ্টেশনের কর্ম্মচারীর কন্যাকে রেল লাইনের উপর সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞ পিতা পরিবর্ত্তে এডিসনকে টেলিগ্রাফী গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। নিজের 'গতি' (speed) বাড়াইবার জন্য তিনি দিনে অফিসের কাজ করিয়াও রাত্রে প্রেস-অপারেটারের কাজ করিতেন। এইরূপে এই কার্য্যে তিনি এমন দক্ষতা লাভ করিলেন যে তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ টেলিগ্রাফার বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং খ্যাতি অনুযায়ী বেতনও পাইতে লাগিলেন।

তিনি পাঁচ বৎসর এই ভাবে কাজ করেন। এই সময়ে ছোটখাটো কয়েকটি আবিষ্কার ছাড়া তিনি টেলিগ্রাফীর দ্বিত্ব প্রণালী অর্থাৎ একই তারের সাহায্যে দুই দিক হইতে দুই সংবাদ একসঙ্গে প্রেরণ করার প্রণালী আবিষ্কার করিয়া

বৈজ্ঞানিক এডিসনের দৃষ্টি।

শিখাইতে রাজী হন। এডিসন এই সুযোগ না ছাড়িয়া যত্নসহকারে রেলওয়ে টেলিগ্রাফী শিখিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণাও যথারীতি করিয়া যান। 'খবরের কাগজের ছোকরা'র জীবন এইখানেই তাঁহার শেষ হয় এবং পনের বৎসর বয়সে এক ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ অপারেটার নিযুক্ত হন।

নূতন কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের বিভিন্ন স্থানে তিনি টেলিগ্রাফীর কাজ করিয়া দক্ষতা লাভ করেন। অল্প ঘুমাইলেই তাঁহার চলিত বলিয়া তিনি দৈনিক প্রায় ২০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন। রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়াও তাড়িৎ-বিদ্যা ও টেলিগ্রাফী বিষয়ে তিনি পেটেণ্ট বিক্রয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা কারণে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোষ্টন সহরে 'টিকটিকার' নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অপর কয়েক জনের চাঁদার সাহায্যে সেটিকে ব্যবসায়ের সামগ্রী করিয়া তোলেন। আরও কিছুদিন বাহিরে বাহিরে কাজ করিয়া তিনি অবশেষে নিউ ইয়র্ক সহরে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য যাত্রা করেন।

১৮৬৯ সালের এক শুভ প্রভাতে এডিসন নৌকাযোগে নিউইয়র্ক সহরে উপস্থিত হন। তিনি যখন তীরে অবতরণ করেন তখন তাঁহার কাছে প্রাতরাশের উপযুক্ত অর্থও ছিল না। এই সাংঘাতিক অবস্থায় সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে থাকেন। কোন্ চা ভাল, চাখিয়া দেখিবার জন্য

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে টি-টেণ্টার বলে। ইহাদেরই একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া এক কাপ চা খাইতে দেন। সন্ধ্যা নাগাদ একজন টেলিগ্রাফ অপারেটারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার কাছ হইতে এক ডলার ধার লইয়া তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় তিনি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর একটি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন ও যতদিন না চাকরী পান ততদিন গোল্ড ইণ্ডিকেটার কোম্পানীর ব্যাটারী ঘরে রাত্রিবাস করিবার অনুমতি পান।

দরখাস্তের জবাবের আশায় থাকার সময় দিনের বেলায় তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটার কোম্পানীর অপারেটিং ঘরে কাটাইতেন। তৃতীয় দিনে একটা দুর্ঘটনার ফলে সেণ্ট্রাল ট্রান্‌সমিটিং মেশিনটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের খরিদ্দারদের প্রায় তিনশত মেশিনও বন্ধ থাকে। সে এক মহামারী কাণ্ড। কি যে ঘটিয়াছে কেহই স্থির করিতে পারে না। নবাগত অপরিচিত যুবক এডিসন হঠাৎ প্রেসিডেণ্টের সম্মুখীন হইয়া বলিয়া বসেন, তিনি মেশিন চালাইয়া দিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে সেই বিরাট যন্ত্র আবার চলিতে থাকে। মাসিক তিন শত ডলার বেতনে তিনি সেখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতে পারিবেন কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এডিসন যেন হাতে চাঁদ পাইলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কোনও রকমে বলিয়া ফেলিলেন, তিনি কাজ লইবেন।

এখন হইতেই এডিসনের আসল কাজ আরম্ভ হইল—তিনি এই কোম্পানীর কাজে যে অল্প কয়েক দিন ছিলেন তাহার মধ্যেই কোম্পানীর বহু উন্নতি সাধন করিলেন এবং 'টিক-প্রিণ্টার' সম্পর্কিত কয়েকটি আবিষ্কার করিয়া এক সঙ্গে ৪০০০০ ডলার পুরস্কার পাইলেন। তাঁহার বয়স তখনও বাইশ অতিক্রম করে নাই। তাঁহার প্রতিভার মূল্য এই তিনি প্রথম পাইলেন। এই অর্থের সাহায্যে তিনি নেওয়ার্কে এক বৃহৎ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রায় ১৫০ জন লোককে নিযুক্ত করতঃ টেলিগ্রাফ সম্পর্কীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে সুরু করিলেন।

ইহার পরেই আবিষ্কারের বন্যা, এডিসন বিখ্যাত হইলেন, তাঁহার টাকা আর ধরে না। একটার পর একটা নূতন জিনিষ তিনি আবিষ্কার করিতে থাকেন। পেটেণ্ট বিক্রয় হয়, টাকা আসে, সেই টাকা তিনি নূতন আবিষ্কারে ব্যয় করেন, শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইহাই তাঁহার ইতিহাস। তাঁহার সমুদয় আবিষ্কারগুলির কথা বলিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। আমরা তাঁহার বিখ্যাত আবিষ্কারগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব।

দ্বিত্ব (Duplex) টেলিগ্রাফ-প্রণালীকে তিনি এই সময়ে চতুর্গুণ (Quadruplex) টেলিগ্রাফ-প্রণালী করিয়া ফেলেন —অর্থাৎ একই তারের দুই দিক হইতে এক সঙ্গে একই কালে দুইটি করিয়া চারটি সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা তিনি করেন। ইহাতে লাইননির্ম্মাণে কোম্পানীর অসংখ্য টাকা বাঁচিয়া যায়। তারপর, তিনি ইলেক্‌ট্রোমোটোগ্রাফ (Electromotograph) আবিষ্কার করিয়া দি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ান টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট এক লক্ষ ডলারে বিক্রয় করিয়া তদানীন্তন পেজ পেটেণ্টকে (Page patent) ঘায়েল করেন।

বেল (Bell) নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে টেলিফোন আবিষ্কার করিয়াছিলেন কিন্তু এই আবিষ্কারকে বিস্তৃত ভাবে কাজে খাটাইবার অসুবিধা গুলি তিনি দূর করিতে পারিতে-ছিলেন না। এডিসন ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইহার সাফল্য আনয়ন করেন। কার্বন ট্রান্‌সমিটার তাঁহার আবিষ্কার; ইহার সাহায্যেই দূরে দূরান্তরে সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই প্রণালীই অনুসৃত হয়। এই আবিষ্কার বেচিয়া তিনি দি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট এক লক্ষ ডলার প্রাপ্ত হন।

১৮৭৭ সালের শরৎকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন আবিষ্কার করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। ফনোগ্রাফ আবিষ্কার বিস্তারিত বর্ণনাসাপেক্ষ।

বর্ত্তমানে আমরা যে ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট ইলেকট্রিক ল্যাম্প ব্যবহার করি তাহাও এডিসনের আবিষ্কারের ফল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখে তিনি প্রথম ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট ল্যাম্প নির্ম্মাণ ও ব্যবহার করেন। তৎপূর্ব্বে ধোঁয়াটে কার্ব্বন ল্যাম্প ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ।

এডিসন ইলেকট্রিক লাইটিং-এর এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ডাইনামোও এইজন্য তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে হয়। ১৮৯১ সালে তিনি কয়েকটি নূতন জেনারেটার ও মোটর নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮০-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন।

১৮৯১ সালের পর তিনি চলচ্চিত্র গ্রহণের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া যে অপূর্ব্ব যন্ত্র নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন তাহার প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী।

সুবিখ্যাত এডিসন ষ্টোরেজ ব্যাটারী, পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুতের প্ল্যাণ্ট, ডিস্ক ফনোগ্রাফ—কত নাম করিব ? নরদেহী বিশ্বকর্ম্মার কার্য্যকলাপের পরিচয় দিতে হইলে গণেশের লিখন-ক্ষমতা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধপাঠে এডিসনের জীবন ও তাঁহার আবিষ্কার সমূহ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার বাসনা যাঁহাদের হইবে তাঁহাদিগকে ডব্লিউ. কে. এল. ডিকসন, এফ. এ. জোন্‌স ও এফ. এল. ডায়ার প্রণীত জীবনী পাঠ করিতে বলি।

এডিসনের ব্যক্তিগত জীবনও অদ্ভুত; তাঁহার জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের মত মোটেই ছিল না। এবিষয়ে সুবিখ্যাত হেনরী ফোর্ড ও স্যামুয়েল ক্রাউথার অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা হইতেই কিছু সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। মনে রাখিতে হইবে এডিসনের জীবিতকালে ইহা লিখিত হয়।

"—এডিসনের ঘুম লইয়া অনেক কথা বলা হইয়া থাকে। লোকে বলে, তিনি কখনও ঘুমান না। অত্যুক্তি হইলেও একথা সত্য যে তিনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘুমান না। কোনও দিন চার ঘণ্টা, কোনও দিন ছয় ঘণ্টা, আবার কোনও দিন বা তিনি একেবারেই নিদ্রা যান না। যেদিন যেমন প্রয়োজন তিনি সেদিন সেই পরিমাণেই ঘুমাইয়া থাকেন। তিনি বলেন, যখন কোনও বিষয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন তখন বিছানায় শুইতে যাইবার অথবা পরিমাণ মত ঘুমাইবার প্রয়োজনই অনুভব করেন না। যতক্ষণ তাঁহার মস্তিষ্ক কাজ করে ততক্ষণ জাগিয়া থাকেন। যখন দেখেন মাথা আর কাজ করিতেছে না, যেখানেই থাকুন্ না কেন খানিকটা ঘুমাইয়া লন। তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন না। ঘুমাইবার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। আসলে সময়ের পরিমাণ দেখিলেই হয় না, ঘুমের গাঢ়তার উপরই সবটা নির্ভর করে। যখন তাঁহার কিছু করিবার থাকে না, তিনি ঘুমাইয়া শক্তিসঞ্চয় করেন।

তাঁহার খাওয়া সম্বন্ধেও এইরূপ—তিনি লম্বা-চওড়া বিরাটকায় পুরুষ—শক্তিশালীও কম নন। কখনও নিয়মিত ব্যায়াম করেন নাই; স্বভাবতই অত্যন্ত কর্ম্মঠ বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। সেদিন পর্য্যন্ত যখন

বিশ্বকর্ম্মা এডিসনের দক্ষিণ হস্ত।

যাহা খুসী খাইয়াছেন। যৌবনে তাঁহার পয়সায় যতটা কুলাইত, ততটাই খাইতেন। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য ভাল তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছেন। তিনি তামাক খান চিবাইয়া—সিগারেট খাওয়া অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মদ খান না।

তাঁহার সমস্ত জীবন এমন ভাবে পরিচালিত যে তিনি তাঁহার শক্তিকে কিছুমাত্র অপব্যয়িত হইতে দেন না—

যে কাজ করার তাঁহার প্রয়োজন নাই সে কাজ কখনও করেন না। সময়কে যথাসম্ভব কাজে লাগাইবার অভ্যাস হইতেই তাঁহার ঘুমের মাত্রা কমিয়াছে। পূর্ব্বে ল্যাবরেটরীতে একটি ঘড়ি থাকিত কিন্তু তাহা চলিত না। তিনি বলিতেন যে তিনি সময়ের দাস নহেন—ঘড়ির মাপে মাপে চলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

তাঁহার হাতের লেখা গোটা গোটা, প্রত্যেকটি অক্ষর স্বতন্ত্র অথচ তিনি বিনা আয়াসে স্বচ্ছন্দে দ্রুত লিখিতে পারেন। টেলিগ্রাফিক 'মেসেজ' ধরিবার অভ্যাস হইতেই তিনি এইরূপ লিখন-ভঙ্গি আয়ত্ত করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অক্ষরগুলি খাড়া ভাবে লিখিলেই সব চাইতে দ্রুত লেখা যায়।

এডিসনের অভ্যাসগুলি একমাত্র তাঁহারই নিজস্ব—অন্যের পক্ষে এই সকল অভ্যাস অনুযায়ী চলা সম্ভব নয়।

এডিসন অত্যন্ত সহৃদয় কিন্তু মোটেই নরম প্রকৃতির নন। কোনও লোককে নিছক দয়া দেখাইয়া বাঁচাইয়া রাখা যায় ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না—তিনি বলেন, যে নিজেকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহাকেই সাহায্য করা চলে। ম্যাকেঞ্জি নামক যে ষ্টেশন কর্ম্মচারীর কন্যাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া তিনি একদা টেলিগ্রাফী শিখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন, উত্তরজীবনে সেই ব্যক্তিই সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হয়। সে চাকুরী প্রার্থনা করে।

এডিসন তাহাকে চাকুরী না দিয়া বলেন, যে, নিউইয়র্কে একটি ফার্ম্ম একটি বিশেষ ধরণের 'ফায়ার এলার্ম' তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য ৫০০০ ডলার মূল্য ঘোষণা করিয়াছে।—'তুমি সেই কাজ করিয়া টাকাটা উপার্জ্জন কর না কেন?' সে ব্যক্তি বলে, 'আমি এ ধরণের কাজ কখনও করি নাই। তা ছাড়া আমার টাকা কোথায়, ল্যাবরেটারীই বা কোথায়?'

এডিসন তাহাকে তাঁহার ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে দিয়া কি ভাবে কাজটা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন। ম্যাকেঞ্জি নিজের চেষ্টায় উক্ত পুরস্কার শেষ পর্য্যন্ত লাভ করে, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এডিসনের ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট ল্যাম্প নির্ম্মাণ-কার্য্যে ম্যাকেঞ্জির ও যথেষ্ট হাত ছিল।

এডিসন অত্যন্ত রসিক—প্রত্যেক জিনিষের হালকা দিকটা তিনি সহজেই ধরিতে পারেন এবং প্রত্যেক কথাকে গল্প দিয়া সরস করিতে ভালবাসেন। যাহাদের রসবোধ নাই তাহাদের তিনি এড়াইয়া চলেন।

যে যেমন মানুষ তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দেখিতে ভালবাসেন। কাজে অক্ষমতা ছাড়া আর সকল কিছুকে সহ্য করার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

এডিসনের কাছ হইতে কোনও উপকার পায় নাই, তাঁহার নিকট ঋণী নহে এমন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে গভীরতম অরণ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। মানব-সভ্যতা যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এডিসনের প্রভাব ততদূর পর্য্যন্ত। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হিসাবে তাঁহাকে নমস্কার করি।"

বঙ্গীয় শব্দকোষ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, বঙ্গভাষায় একখানি অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বহু বৎসরের সাধনা ও পরিশ্রমের ফল। এই সঙ্কলন-কার্য্যে লেখকের সাতাশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিতের একত্র সমাবেশে যে কার্য্য সাধারণত সাধিত হয় তাহা তিনি একাই করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। বাস্তবিক পক্ষে বাঙলা ভাষায় এরূপ বিরাট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ৪০০০ হাজার পৃষ্ঠায় এই বৃহৎ অভিধান সম্পূর্ণ হইবে এবং ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইহা খণ্ডাকারে প্রতিমাসে নিয়মিত বাহির হইতে থাকিবে। এই অভিধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

(১) বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য সংস্কৃত শব্দ। (২) প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্‌লা শব্দ। (৩) সংস্কৃত শব্দের পাণিনি অনুসারে ব্যুৎপত্তি ও সমাস। (৪) বাঙ্‌লা তদ্ভব শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে পালি ও প্রাকৃতের রূপ এবং বাঙ্‌লা শব্দের অনুরূপ, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, সিন্ধী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার শব্দ। (৫) জমিদারী, মহাজনী, আদালত, চিঠিপত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত আরবী ও ফারসী শব্দ। (৬) ইংরেজী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় বাঙ্‌লায় প্রচলিত শব্দসমূহ ও ঐ সকল ভাষার শব্দের বিশুদ্ধ মূল রূপ। (৭) সংস্কৃত এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্‌লার প্রচুর শিষ্ট প্রয়োগ। (৮) বাঙ্‌লা প্রবচন অর্থ ও প্রয়োগ সহ, সংস্কৃত ধাতুর রূপ ও গুণ নির্দ্দেশ এবং মূল সংস্কৃত ধাতু ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ধাতুর সহিত বাঙ্‌লা ধাতু ও তাহার প্রয়োগ সহ অর্থ। (৯) সংস্কৃত বিদ্যার্থীর জন্য সংস্কৃত কাব্যাদিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সমাস ও অর্থসহ প্রয়োগ। (১০) সংস্কৃত শব্দের আবেস্ত ভাষায় আকৃতি ও গ্রীক্, লাটিন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য ভাষায় তুলনীয় সমপর্য্যায় শব্দ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নানা বিষয়।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম—এই ঠিকানায় পুস্তক পাওয়া যাইবে। আমরা উক্ত অভিধানের বহুল প্রচার এবং এরূপ বিরাট কর্ম্মে দেশবাসীর সহৃদয় সহানুভূতি কামনা করি।—বঃ সঃ
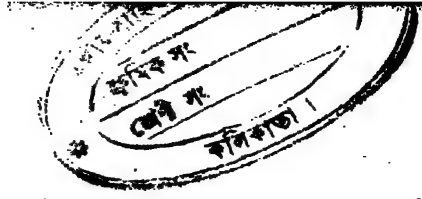
রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[Rajmohun's Wife ১৮৬৪ সনে 'Indian Field' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম উপন্যাসটির প্রথম তিন পরিচ্ছেদ যে-কয় সংখ্যা 'Indian Field'এ বাহির হইয়াছিল আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই সুতরাং চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে এই উপন্যাসের প্রথম তিন পরিচ্ছেদও পাওয়া গিয়াছে—মূল নহে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কৃত অনুবাদ পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে Rajmohun's Wifeএর অনুবাদ আরম্ভ করেন, কবে করেন তাহা বলা কঠিন। তিনি সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন—৪র্থ, ৫ম, ষষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদের বঙ্কিমচন্দ্র কৃত অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা আমরা দেখাইয়াছি, অবশ্য ইহা আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে উপন্যাসের যে অংশ বাহির হইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র সে-অংশের অনুবাদ করেন নাই।

আমাদের এই ভুলের জন্য বঙ্কিম-জীবনী লেখক বঙ্কিম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অংশতঃ দায়ী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের বঙ্কিমকৃত অনুবাদাংশকে সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস কল্পনা করিয়া শেষাংশের ইংরেজী টুকুর অনুসন্ধান করেন নাই। বঙ্কিমকৃত উক্ত সাত পরিচ্ছেদের অনুবাদকে নয় পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া নিজে আরও ২৩টি পরিচ্ছেদ যোগ করত 'বারিবাহিনী' নামক উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন। ২১ অধ্যায়ে সমাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত Rajmohun's Wifeএর শেষাংশের সহিত শচীশ বাবু লিখিত অংশের কোনই সম্পর্ক বা মিল নাই। 'বারিবাহিনী'র শেষ ২৩ পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ শচীশ বাবুর কল্পনাপ্রসূত। বারিবাহিনীর প্রথম নয় পরিচ্ছেদের সহিত আমরা এই সংখ্যা হইতে যে অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি তাহা যুক্ত করিয়া লইলেই বঙ্কিমকৃত মূল উপন্যাসটির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইবে।

শচীশ বাবুকে এই ভুলের জন্য দায়ী করিবার কারণ এই যে তিনি বঙ্কিম-জীবনীর নূতন সংস্করণের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন Rajmohun's wife নামক গল্প ইংরেজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল।" পরে ঐ গ্রন্থেরই ১৫২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র (শেষ) তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্যসেবার্থ আর কিছু করেন নাই। কিছু করেন নাই বলিলে ঠিক চলিবে না। তিনি একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে না হইতে কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তাহার কয়েক বৎসর পরে উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি।"

এই উপন্যাসই বারিবাহিনী'—শচীশ বাবু এই উপন্যাসখানি বঙ্কিম-পত্নীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন—'মা, স্বামীর শেষ সম্পদ্, পুত্রের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ কর।' ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'পরমারাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে ১৩০০ বঙ্গাব্দে (২৬শে চৈত্র ১৩০০ সনে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে—বং সঃ)—এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ও শিষ্য আজ তাহা··· শেষ করিল।'

শচীশ বাবুর ভুল এইখানে, আসলে উপন্যাসটি নূতন মোটেই নয় বরং ভাষাদৃষ্টে মনে হয় এই অনুবাদ-অংশটুকুই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা গদ্য রচনা। শচীশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাকে অনুবাদ বুঝিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাধারণ ভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক অভিনব ভাষায় এই পুস্তক খানির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" প্রথম রচনাকে শেষ রচনা কল্পনা করিয়া শচীশ বাবু বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

আমরা যে অংশ বাহির করিয়াছি ও করিব তাহার সহিত 'বারিবাহিনী'র প্রথম তিন পরিচ্ছেদ যোগ দিলেই 'রাজমোহনের স্ত্রী' সম্পূর্ণ হইবে।
—সম্পাদক, বঙ্গশ্রী]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[সতর্ক করা না সশস্ত্র করা]

মাতঙ্গিনী একটা খোলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভগিনীকে জাগাইয়া তাহার কাছে লইয়া আসিবার জন্য করুণাকে আদেশ করিল। হেমাঙ্গিনী তখনও ঘুমায় নাই, মুহূর্ত্তকাল পরে সে উপস্থিত হইল। তাহার মুখে চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন পরিস্ফুট, সাগ্রহ-সম্ভাষণে অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে মাতঙ্গিনীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, তোমাদের বাড়ীতে আজ ডাকাতি হবে, আমি তোমাদের সাবধান করতে এসেছি।

বিমূঢ় হেমাঙ্গিনী অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, ডাকাতি!

করুণাও 'মাগো' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী বলিল, করুণা, চুপ কর, হেম, গোল করিস না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। তোমার স্বামীকে সাবধান করে তৈরী হতে বল গিয়ে।

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর সে কার্য্য করিবার সাধ্য ছিল না। সে ভয়ে বিবর্ণ ও কম্পান্বিতকলেবর, তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না, পা চলিতে চাহিল না। মাতঙ্গিনীও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। সে দেখিল, তাহার ভগিনী আতঙ্কে আত্মহারা হইয়াছে। এদিকে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। মুখরা করুণা অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন ভয়ঙ্কর একটা সংবাদ-বহনের প্রথমা দূতী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, তা ছাড়া এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে তাহার আতঙ্ক এমন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল যে সে নিজেই মাতঙ্গিনীর দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্ম ব্যাকুল হইল। মৎস্যকুল-বিনাশিনী করুণা অমঙ্গলের দূতী হওয়াটা মহাগর্ব্বের ব্যাপার মনে করিয়া যে কার্য্য ন্যায়তঃ হেমাঙ্গিনীর করা উচিত ছিল সেই কার্য্য সাধন করিবার জন্ম মাধবের শয়নকক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল।

অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া সে মাতঙ্গিনীকে জানাইল, মাধব তাহার কথা বিশ্বাস করিতেছে না; বিশেষত মাতঙ্গিনী মাধবের বাড়ীতে উপস্থিত এবং সেই এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে করুণার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মাধব আরও অবিশ্বাসী হইয়াছে, মাধব বলিয়াছে, সে যদি এখানে এসে থাকে, তার কাছ থেকেই খবরটা শুনতে চাই। তাকে আমার কাছে নিয়ে আয়, তার মুখে শুনলেই বুঝতে পারব বিপদ কতখানি। তাকে এখানে আসতে বল্।

মাতঙ্গিনী ভগিনীকে বলিল, তুই যা হেমা, মাধবকে বল গিয়ে যে আমি এসেছি এবং যা বলছি তা সত্যি। তোর কথা সে বিশ্বাস করবে।

হেমাঙ্গিনী বলিল, সে আমি পারব না, তুমি নিজে যাও দিদি, তিনি যা জিজ্ঞেস করবেন, তার জবাব আমি দেব কেমন করে? তুমিই সব কথার জবাব দাও গিয়ে। আর সময় নষ্ট ক'র না। তুমি যা বলছ তাই যদি হয় তা হলে—

—আমার না যাওয়াটাই ভাল হেম। তাকে বল্ গিয়ে আমি এসব কথা বলেছি আর সত্যি কথা বলেছি।

অনিচ্ছুক হেমাঙ্গিনী বালিকার মত গোঁ ধরিয়া বলিল, না দিদি, তুমিই যাও।

মাতঙ্গিনী অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিচলিতস্বরে বলিল, আমি যেতে পারি না, আমি যাব না, হেম।

করুণা হাসিতে হাসিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, হায় কপাল, তাহলে এসব কিছু নয়। তোমার দিদি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে মা।

হেমাঙ্গিনীর মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সত্যি দিদি, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ শুধু? আমার কিন্তু বড্ড ভয় হয়েছে। এখন বল না, কেন এসেছ।

মাতঙ্গিনী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কি চিন্তা করিল, তার পর মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া সে বলিল, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। হেম, তুই আমার সঙ্গে আয়।

দিদির সম্মুখে স্বামীসন্নিধানে যাইতে লজ্জাশীলা হেমাঙ্গিনী কিছুতেই রাজী হইল না, যদিও মুখ ফুটিয়া সে সে কথা বলিতে পারিল না। তাহলে এখানে থাক্, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমার কথা বা এই খবর ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না—এই কথা বলিয়া মাতঙ্গিনী ঝড়ের মত বারান্দা পার হইয়া গেল। ইতিমধ্যেই সে লক্ষ্য করিয়াছে বৃক্ষশীর্ষের অন্তরালে চাঁদ ডুবিতে বসিয়াছে। কিন্তু মাধবের কক্ষের দ্বারে আসিয়া মাতঙ্গিনীর পা কাঁপিতে লাগিল—আম বাগানে ডাকাতদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দাঁড়াইয়াও তাহা এমন করিয়া কাঁপে নাই। সাড়ীর আঁচলটা মাথার উপর খানিকটা টানিয়া দিয়া সে ধীরে যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে অগ্রসর হইল। একবার পিছাইয়া, আবার আগাইয়া, খানিক থামিয়া সে দরজা ঠেলিল, আবার থামিল এবং অবশেষে কক্ষে প্রবেশ করিল। সুসজ্জিত কক্ষে একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছিল এবং মূল্যবান সোফার উপর হেলান দিয়া যুবক মাধব উপবিষ্ট ছিল। মাতঙ্গিনী দেওয়াল ঘেঁষিয়া যুবতীসুলভ লজ্জায় নতশির হইয়া দাঁড়াইল, ভগিনীপতির দিকে সে কচিৎ নেত্রপাত করিতেছিল। মাধব চমকিয়া উঠিল এবং অর্দ্ধশায়িত অবস্থা হইতে আপনাকে কিঞ্চিৎ উত্থিত করিল।

কিন্তু উভয়ের কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; একজন যে ভয়াবহ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিতে উৎসুক, অপরে সে সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্যও আগ্রহান্বিত। এই নীরবতায় উভয়েই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। পরিশেষে মাধব পরস্পরের সম্পর্কজনিত পরিহাসের সুবিধা লইয়া কহিল, তুমি ইংরেজ মেমসাহেব হলে

ভাল হত দিদি, তাহ'লে তোমাকে আসন এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করতাম।—মাধবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

—তা, দিদি, তুমি বস্‌ছ না কেন? এই——এখানে—

মাতঙ্গিনী মাধবকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া অত্যন্ত চাপা গলায় কহিল, আমি যা বলেছি শুনেছ?

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিল, শুনেছি। সত্যি?

সেইরূপ অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠেই মাতঙ্গিনী জবাব দিল, সত্যি।

—আজ রাত্রেই?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই, চাঁদ ডুবলেই তারা আক্রমণ করবে, চাঁদ ডুবতেও আর আধদণ্ডের বেশী দেরী নেই।

—তাই নাকি? তাহলেই তো সর্ব্বনাশ! কিন্তু দিদি, তুমি এসব খবর পেলে কি করে?

মাতঙ্গিনী এবার পরিষ্কার কণ্ঠে অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া কহিল, ও কথা জিজ্ঞেস ক'র না।

মাধব বলিল, তোমার কথার কূল-কিনারা পাচ্ছি না। ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা আমার নেই।

মাতঙ্গিনী এবার মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া মাধবের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিল, আমাকে কি তুমি ভুলে গেছ মাধব? তোমাকে আমি মিথ্যে বলতে পারি? আর এই অসময়ে তোমার বাড়ীতে একা যে আমি এসেছি—

মাধব বলিল, সত্যি, আমার ভুল হয়েছিল। তুমি এখানে দাঁড়াও দিদি, আমি লোকজনকে ডাকি।

মাধব উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু মাতঙ্গিনী তাহার প্রতি একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিরস্ত্র করিল, বলিল, আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও।

মাধব বলিল, বল।

—তোমার খুড়োর উইল কোথায় আছে? সেটার বিষয়ে সাবধান থেকো। ওদের মতলব উইল চুরী করা।

মাধব বলিল, হুঁ।—খুড়ীমার মকর্দ্দমার কথা ভাবিয়া সে হঠাৎ যেন এই ব্যাপারের একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইল। বলিল, সে গুড়ে বালি।

—এই ঘরে একটা হাতীর দাঁতের বাক্সে তুমি সেটা রাখ, না?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি সে খবর পেলে কোথায়?—মাধবের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মাতঙ্গিনী জবাব দিল,—আমি কেন, তারাও এ খবর জানে।

মাধব বলিল, বুঝতে পারছি, তুমি অনেক কথাই শুনেছ। মাধব উঠিল।

—কিন্তু আর একটা কথা, আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবে?

—বল। নিশ্চয়ই রাখব।

আমি যে তোমাকে এ খবর দিয়েছি কিম্বা এবাড়ীতে রাত্রে এসেছি যেন আর কেউ না জানতে পারে। জানতে পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

মাধব তাচ্ছিল্যভরে গলা চড়াইয়া বলিল,—প্রাণ? তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করবে কে শুনি?

মাতঙ্গিনী বলিল, চুপ!

মাধব নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, ওঃ, আমার খেয়াল ছিল না। আর ভুল হবে না।

—করুণা আর হেমকেও বলে যাও তারা যেন গোল না করে।

—করুণাকে সামলানোই মুস্কিল—আমি মাগীকে দাব্‌ড়ি দিয়ে চুপ করিয়ে রাখ্‌ব। তুমি হেমের সঙ্গে দরজায় খিল দিয়ে থাকবে—বাড়ীর আর কেউ যেন তোমায় না দেখ্‌তে পায়। আমি ফিরে এসে তোমাকে আরও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব।

এই কথা বলিয়া মাধব তাহার পত্নী এবং করুণার নিকটে গিয়া মাতঙ্গিনীর বিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নীরব থাকিতে বলিয়া দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীর দিকে ধাবিত হইল ও অচিরাৎ দারোয়ানমহলে উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গিনীর বুদ্ধিকে মাধব শ্রদ্ধা করিত, সে যে প্রতারিত হয় নাই ইহা ঠিক, তাছাড়া তাহাকে ঠকাইতে সে এত ক্লেশ স্বীকারই বা করিবে কি জন্য? সুতরাং ডাকাতদলকে বাধা দিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। ধরণী-বক্ষ নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল গৃহের ছাদে বহু মনুষ্যাকৃতি জীব আকাশের পটভূমিতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ইহারা জমিদারের বাছা বাছা প্রজা, জমিদার-বাড়ীর সন্নিকটেই বাস করে এবং যে কোনও সময়ে দেখিতে দেখিতে

ইহাদের মধ্য হইতে একদল লাঠিয়াল সংগ্রহ হইতে পারে। লাঠি, সড়কি, ইঁট প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে ইহাদের প্রায় সকলেই সজ্জিত ছিল—আক্রমণকারীরা প্রাচীরের ধারে আসিলে অথবা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলে এগুলির প্রয়োগে তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য তাহারা উদ্যত হইয়া রহিল। একথা আমরা বলি না যে নিশীথরাত্রের এই যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই তাহাদের হস্তধৃত লাঠির মত কঠিনহৃদয় ছিল, অনেকেই যে অকালনিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের জমিদারের ঘন ঘন কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া যদি না তাহারা বুঝিতে পারিত যে পলাইয়া তাহার বিরক্তির উদ্রেক করা অপেক্ষা সেখানে দণ্ডায়মান থাকাই অধিকতর নিরাপদ, তাহা হইলে অনেকেই মহানন্দে পলায়নপর হইত। অবশ্য সকলের মনেই যথেষ্ট সাহস ছিল, কারণ, বাড়ীর ছাদে লোভনীয় কিছু না থাকাতে ডাকাতেরা সেখানে পৌঁছিবে না, একথা তাহারা জানিত—সুতরাং আশ্বস্ত হইয়া সাহসী বীরেরা সদম্ভে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঁড়ে ও চৌবে বংশের পাঁচ ছয় জন তরোয়াল, ঢাল, সড়কি ও গাদাবন্দুক হাতে সদর দরজায় পাহারা দিতে লাগিল। চার পাঁচজন সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল, প্রয়োজন বুঝিলেই তাহারা অন্যদের সতর্ক করিবার জন্য আদিষ্ট হইল। বাড়ীর ভিতরে যে সমস্ত বাক্স ও সিন্দুকে মূল্যবান তৈজসাদি, গহনা, নগদ টাকা, ক্ষুদ্রায়তন অথচ বহুমূল্য বাসন-কোসন ছিল পূর্ব্বোক্ত হাতীর দাঁতের বাক্সটিসহ সেগুলি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। সেই সুবৃহৎ প্রাসাদের অসংখ্য কক্ষশ্রেণীর মধ্যে গুপ্ত স্থান-সমূহে সেগুলি আশ্রয় লাভ করিল—এই সকল গুপ্ত স্থানের সন্ধান যাহারা জানে না তাহাদের পক্ষে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। বাটীস্থ অনেকেই এসবের খবর জানিত না।

সাধারণত মাধব মৃদুস্বভাব ও নমনীয়, কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তাহার শক্তি ও কার্য্যতৎপরতা এমন প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিত যে ভীরু ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন স্ত্রীলোকের অভাব হইল না, যাহারা এক হাতে উলঙ্গ শিশুদের টানিতে টানিতে অন্য হাতে বড় বড় বোচকা সামলাইতে সামলাইতে সেই বিপন্ন গৃহ ত্যাগ করিয়া গোপনে প্রতিবেশীদের কুটীরে আশ্রয় লইতে ছুটিল না—তাহারা ভাবিল, সেই অনাড়ম্বর কুটীরগুলিতে দস্যুরা হস্তক্ষেপ করিবে না, সুতরাং তাহাদের সম্পত্তিগুলি রক্ষা পাইবে। গত সন্ধ্যায় যে বিবেকসম্পন্না পাচিকা কর্ত্রীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, দেখা গেল বোচকাবুচকী সমেত সেইই সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলে দ্রুত ধাবিত হইল। গত সন্ধ্যার যুদ্ধজয়ের বিজয়-মাল্য স্বরূপ ঘিয়ের পাত্রটি সে সঙ্গে লইতে ভুলিল না।

উদ্যোগ-পর্ব্বের কলকোলাহল প্রশমিত হইল, আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া অধীর লোকজন নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে—মাতঙ্গিনীর কথার সত্যতা সম্বন্ধে মাধবের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই সন্দেহ মাধবের মনের মধ্যে ভাল করিয়া রূপ ধরিতে না ধরিতেই একজন দারোয়ান তাহার কাছে আসিয়া হিন্দীতে বলিল, যাহারা পাহারা দিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে একজন পুরানো বাগানের দিকে একটা আলোক দেখিয়াছে—মাতঙ্গিনী যে আম বাগানে দস্যুদের হাতে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছে সেইটিকেই পুরানো বাগান বলা হইত। সে আরও বলিল যে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া বাগানের কাছাকাছি গিয়া দেখিয়াছে কয়েকজন সশস্ত্র লোক সেখানে সম্মিলিত হইয়াছে।

সংবাদবাহক জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর, হুকুম দিন্, আমরা আগে ওদের উপর লাঠি চালাই।

মাধব বলিল, না ভূপসিং, তার দরকার নেই; তোমরা কম লোক গেলে ওদের কাছে কাবু হয়ে পড়বে, বেশী লোক গেলে বাড়ী পাহারা দেবে কে? হয় তো ওদের আর একটা দল কোথায়ও আছে।

দারোয়ান বলিল, মহারাজের যা হুকুম। তা'হ'লে আমরা যেমন আছি, তেমনি থাকি?

—হাঁ, আর এক কাজ কর, তোমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে হাঁক দাও, ওদের সমঝিয়ে দাও যে আমরা তৈরী আছি।

মাধব এই কথা বলিতে না বলিতে একটানা প্রচণ্ড হুঙ্কারে নিশীথ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ হইল। স্ত্রীলোকেরা কক্ষাভ্যন্তরে কম্পান্বিতকলেবরে, আতঙ্কিত বিস্ময়ে সেই হুঙ্কার শুনিয়া ভাবিল, বিপদ আসন্ন। পরক্ষণেই চারিদিক স্তব্ধতায় থম থম করিতে লাগিল।

মাধব বলিল, আর একবার, আর একবার।

আবার সেই হুঙ্কারে নিশীথিনী যেন কাঁপিতে লাগিল। ইহার প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে নির্জ্জন বনভূমি হইতে এক হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল, যেন মধ্য রাত্রির অন্ধকারে পিশাচদের উল্লাসধ্বনি। সেই আর্ত্তনাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতার শোণিত-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিল।

মাধব চীৎকার করিয়া বলিল, আবার, আবার, আরও জোরে হাঁক দাও।—তাহার ভয় হইতেছিল পাছে দস্যুদলের চীৎকারে তাহার লোকজন আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। অনুচরেরা সোল্লাসে এবং সোৎসাহে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে না করিতে পুরানো বাগান হইতে তাহার জবাব আসিল। কিন্তু এবার তীব্র আর্ত্তনাদ নয়, পলায়নপর দস্যুদলের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি।

তারস্বরে অনেকে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরা পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে—হঠে যাবার শব্দ ওটা।

মাধব বলিল, হবে, কিন্তু তোমরা তা বলে নিশ্চিন্ত থেকো না—এখনও খাড়া থাক। মাধব অনুচরদের সহিত বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল কিন্তু আর কিছু ঘটিল না। মাধব আর একবার তাহার পাইক-বরকান্দাজদের পাহারা কড়া রাখিতে ও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হুকুম দিয়া যে দুঃসাহসিনী রমণী তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশঃ)
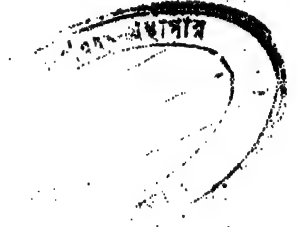
প্রত্যাবর্ত্তন। খোলের উপরে বিশ্রামার্থে খড়ের এই গৃহ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। মোটর গাড়ী চলিবার মত যে পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের উপর রচিত হইয়াছে—সেই পথ এখানে শেষ হইয়াছে। এই গৃহের ঠিক পিছনে খোলটির শীর্ষাংশ। বাম পার্শ্বে খোলে যাইবার প্রবেশ-পথ। বিশ্রাম-গৃহের অনতিদূরে শঙ্খধবল গ্রিওোলা বৃক্ষ দুই একটি আছে—এই বৃক্ষের গাত্রদেশে হাত দিলে খড়ির মতো শ্বেত চূর্ণ লাগিয়া যায়।—'বিক্রমখোল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

—বিষ্ণুশর্ম্মা

চীনদেশের মেয়েরা

চীনদেশের মহিলাদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে তাঁহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব নাই। এক হিসাবে কথাটা সত্য। চীনের দর্শন-শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের সামাজিক রীতি নীতি সমস্তই পুরুষের অখণ্ড আধিপত্যের মহিমা প্রচার করিতেছে। চীনা মেয়েদের বাহিরের অবয়বে যেমন কয়েকটি বিষয়ে অপরিপূর্ণতা দেখা যায়, তেমনি অন্তরের দিক দিয়াও কয়েকটি বিষয়ে অপরিপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাহির হইতে একটি জাতিকে বিচার করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা ইঁহাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর সংবাদ রাখেন তাঁহারা মেয়েদের এই অসহায় অবস্থার কথা স্বীকার করিতে চাহেন না।

তাঁহারা বলেন চীনামেয়েদের সহিত বাঙ্গালী মহিলাদের পারিবারিক জীবনের সাদৃশ্য আছে এবং যদিও সেখানকার মেয়েরা সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধা, এমন কি প্রকাশ্য কোন মজলিসে কোন ভদ্রমহিলার নামোল্লেখ করাও অসভ্যতা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, তথাপি মা ও ভগ্নীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে চীনের পুরুষ-সমাজ অত্যন্ত সচেতন ও শ্রদ্ধাবান। চীনা মহিলারা নিজেরাও কখনও নিজেদের অসহায় অবস্থা লইয়া আক্ষেপ করেন না। যাহা হউক, কয়েকটি বিষয়ে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরিকাদের সহিত তাঁহাদের আশ্চর্য্য রকমের সৌসাদৃশ্য আছে এবং তাঁহাদের কয়েকটি প্রথার সহিত আমাদের আচার-পদ্ধতির খুবই মিল দেখা যায়।

চীনদেশে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান। যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা সে দেশের বনিয়াদী বংশের স্রষ্টা ও যাঁহাদের বিশেষ আর্থিক স্বাচ্ছল্য নাই তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর পর্য্যায়-ভুক্ত—ইহার মধ্যে মধ্যবিত্তের স্থান নাই। চীনদেশে প্রথম পদার্পণ করিলে মনে হয় যেন সেই দেশটি মেয়েরাই চালাইতেছে। প্রত্যেক বন্দরে নীল পায়জামা ও জামা পরিয়া অসংখ্য মেয়ে মাল নামাইতেছে, উঠাইতেছে, নৌকার দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছে, অধিকাংশ মেয়ের পৃষ্ঠদেশে একটি করিয়া শিশু-সন্তান বাঁধা, তাহাদের লইয়া কাজ করিতে যে কোন কষ্ট হয় তাহা এই সমস্ত শ্রমিক মেয়েদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় না। পথেঘাটে সর্ব্বত্র শ্রমিক মেয়েদের ভীড় এবং বহুপ্রকারের শ্রমসাধ্য কার্য্য তাহারা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের একটি মহিলাকেও বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের বনিয়াদী ঘরের মেয়েরা কখনও পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হন না।

যদিও কঠোর পর্দ্দা-প্রথার প্রচলন সেখানে নাই তথাপি সামাজিক সভ্যতা অনুসারে অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষে প্রকাশ্যে বাহির হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। মহিলারা গৃহে বসিয়া বহুপ্রকারে পুরুষদিগকে সাহায্য করিতে পারেন কিন্তু বাহিরে গিয়া কোন কিছু করিতে পারেন না। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন মেয়েরা সেই জন্য গৃহশিল্পে সুনিপুণা হইয়া থাকেন এবং অবসরকালে সূচীশিল্পাদি লইয়া সময় অতিবাহিত করেন।

চীন-সমাজে ব্যক্তির অপেক্ষা পারিবারিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বেশী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাটীর গৃহিণীরাই সেই পারি-বারিক গোষ্ঠীর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যতদিন না মেয়েরা গৃহিণী পর্য্যায়ভুক্ত হন ততদিন তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবে কোন স্বাধীনতা নাই। পিত্রালয়ে মেয়েদের যে খুব ভাল অবস্থায় কাটে তাহাও নহে। কন্যার আগমনে বাটীর কেহই খুসী হইয়া উঠেন না—ইহার কারণ, পুত্র বংশের ধারাকে প্রবাহিত করিতে পারে এবং পিতৃপুরুষের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, কিন্তু কন্যার বিবাহ হইলেই তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায়। অপর এক পারিবারিক গোষ্ঠীর সে অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশ মত চলিবে, পিত্রালয়ের কোন অধিকার খাটিবে না; এই হিসাবে তাহাদের মূল্য যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ধারণার জন্য মেয়েদের কন্যাকাবস্থায় ভাল করিয়া লেখাপড়া পর্য্যন্ত কেহ শেখান না, কারণ অপরের কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা স্বীকার করেন না। অবশ্য অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা বর্ত্তমানে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন।

বধূদের যে মর্য্যাদা আছে কুমারীদের সেখানে সে মর্য্যাদা নাই, এমন কি কন্যারা পিতার বা মাতার কোন সম্পত্তির তাহারা উত্তরাধিকারিণী পর্য্যন্ত হইতে পারে না। এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকাতে ওখানকার মেয়েদেরও একমাত্র কাম্য বিবাহিত হওয়া। স্বামীর পরিবারের মধ্যে একজন হইতে পারিলেই তাহারা নারী-জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পায়। ওদেশে গরীবের ঘরে মেয়ে হওয়ার চেয়ে পাপ বোধ হয় আর নাই। চীনের কয়েকটি প্রদেশে মেয়ে জন্মাইলে অবশ্য পিতা-মাতার লাভ আছে, কারণ পাত্রপক্ষের কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-প্রথা

সেখানে প্রচলিত, কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশে মেয়ের বিবাহে যৌতুক প্রদান করিতে করিতে পিতাকে আমাদেরই মত সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তাই অনেকে গোপনে এই সব প্রদেশে গিয়া কন্যা-বিক্রয় করিয়া আসে। দুর্ভিক্ষের সময় বহু শিশুকন্যাকে হত্যা করিতেও অনেকে দ্বিধা বোধ করে না বলিয়া রটনা। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়—অনেক সময় শিশু-কন্যার স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলেও তাহারা সমাধির খরচের হাত এড়াইবার জন্য মৃতা কন্যাকে চুপি চুপি ফেলিয়া দিয়া আসে।

কন্যাকে বাহিরে লইয়া বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে হাজির করায় কোন গৌরব নাই বলিয়া চীনের পুরুষদের ধারণা এবং এই জন্য তাহারা কন্যাদের জন্মকালে কোন উৎসব করে না। তাই বলিয়া তাহারা কন্যাদের যে অত্যন্ত অযত্ন করে এবং স্নেহ করে না এ অপবাদ দেওয়া যায় না। সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাদের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় এবং তাহার পর হইতে তাহারা আর অন্তঃপুরের বাহিরে আসে না। সাধারণতঃ চৌদ্দ পনেরো বৎসরে মেয়ের বিবাহ হইয়া যায়। অনেক সময় অতি শিশুকালেই কন্যার পাত্র নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কন্যা বাগদত্তা হইলে তাহার পক্ষে বাহিরে আসা অসম্ভব। চীনদেশের নিয়ম এই যে পাত্র বা পাত্রপক্ষের কোন লোক ভাবী বধূকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইবে না, পাছে পাত্রপক্ষীয় কাহারও নজরে পড়িয়া যায় এইজন্য মেয়েদের অতি বালিকা হইলেও অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে বিবাহের পাত্র নির্ব্বাচন ভিন্ন গ্রাম হইতে করা হয় কারণ গ্রামের লোকেরা হয়তো মেয়েদের পূর্ব্বে কোন সময় না কোন সময় দেখিয়া থাকিতে পারে।

কন্যা বিবাহোপযোগী হইয়া উঠিলেই পিতা মাতা ঘটককে ডাকিয়া আনেন। ঘটক গ্রামান্তরে গিয়া পাত্র ঠিক করিয়া আসে। আমাদের এ দেশীয় ঘটকের মতই তাহারা দুপক্ষের নিকট প্রচুর মিথ্যা কথা বলে এবং বিবাহ দিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। চীনদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মেয়েদের সংখ্যা কম বলিয়া পাত্রপক্ষই কন্যাকে প্রচুর অর্থাদি দিয়া লইয়া যায় কিন্তু অন্য প্রদেশে কন্যার পিতাকে নগদ টাকাকড়ি, খাট, বিছানা প্রভৃতি যৌতুকস্বরূপ দান করিতে হয়। অবশ্য স্বামীও বধূকে কিছু অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দান করেন।

পাত্র-পাত্রী পছন্দ হইলে দু'পক্ষই লাল রংয়ের সুবৃহৎ নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাইয়া সকলকে আমন্ত্রণ করেন এবং বিবাহ উৎসবে সমাগত স্বজনবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের মধ্যে নিমন্ত্রিতেরাই সঙ্গে সঙ্গে করিয়া খাদ্যদ্রব্য বা টাকাকড়ি লইয়া আসিয়া পাত্রীর পিতাকে দায় হইতে উদ্ধার করেন।

আমাদের দেশে যেমন বর কন্যাকে আনিতে যায় তেমনি ও দেশে কন্যা বরের গলায় মাল্য দান করিতে যায়। বিবাহকালে কন্যার মাথায় লাল রংয়ের একটি আচ্ছাদন থাকে এবং শ্বশুর-গৃহে যাইবার জন্য বিশেষ একটি গাড়ীর (আমাদের পাল্কীর মত) প্রচলন আছে। এই গাড়ীতে চাপিয়া যাত্রা করিতে অনেক মেয়ে গলদঘর্ম্ম হইয়া মারাও পড়ে। একটি ছোট্ট চেয়ারের চতুর্দ্দিক ঢাকা এবং তলদেশে দুটি বড় চাকা লাগানো—ইহাই কন্যার চতুর্দ্দোলা এবং এই বিচিত্র গাড়ীটিকে একটি মাত্র বাহক ঠেলিয়া লইয়া যায়। একবার এ গাড়ীতে চাপিলে দ্বিতীয়বার চাপিবার বাসনা কাহারও হয় বলিয়া মনে হয় না।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে কয়েকদিন ধরিয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত কাঁদিতে হয়—কান্না সত্যকার না হউক ক্ষতি নাই কিন্তু ইহাই চিরাচরিত সামাজিক প্রথা। পাত্রের গৃহে গিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের কাছে কন্যা বসে, বরও তাহার কাছে আসন গ্রহণ করে, তৎপরে বন্ধুবান্ধব ও স্বজনগণ অভিনন্দন জানাইতে আসেন। কন্যা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাহার পক্ষে ক্লান্ত ভাব দেখানো অত্যন্ত লজ্জার কথা। বিবাহ চুকিয়া গেলেই বধূ শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে বাস করিতে থাকে।

স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। শ্বশুর-গৃহে বধূরা মাঝে মাঝে যে অত্যাচারিতা ও না হয় এমন নহে। কিন্তু সমাজের অনুশাসন এতই কঠিন যে প্রকাশ্যে কেহ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। স্বামীস্ত্রীর মিলন না হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হইতে পারে। পত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয় কিম্বা স্বামীর আদেশ পালন না করে তাহা হইলে তো বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াই থাকে, তাহা ছাড়া স্ত্রী অত্যন্ত বাচাল হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু পত্নী যদি পিতৃহারা হয় কিম্বা তাহার কোন আত্মীয়স্বজন না থাকে কিম্বা তাহাকে বিবাহ করিয়া যদি স্বামী ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া উঠে তাহা হইলে স্ত্রীকে বর্জ্জন করা চলে না। যদি স্ত্রী প্রমাণ করিতে পারে যে, স্বামী ও তাহার পিতা মাতাকে যত্ন করা সত্ত্বেও তাহাকে পরিত্যাগ করা হইতেছে, তাহা হইলে স্বামী সমাজে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয় এবং পরিবারকে উপযুক্ত ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য থাকে। যত দিন না স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান লাভ করে বা গৃহিণীর পদাভিষিক্ত হয় ততদিন তাহার ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। শিশুর মাতা হইলে তাহার মর্য্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়।

চীন দেশে পুরুষকে নারী কোন দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না—মহিলারা নিজেরা যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন ইহা বিশ্বাসও করেন না। চীনের লোকেদের ধারণা যে প্রকৃতির মধ্যে ইয়াং অর্থাৎ মৃত্যুর যে বীজ রহিয়াছে নারী তাহারই প্রতিমূর্ত্তি এবং

গৌরবের ও সৌভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি পুরুষ, অতএব নারী পুরুষের অপেক্ষা সকল দিক দিয়া অবনত।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে চীনা মহিলারা অবশ্য শিক্ষাবিস্তারের দিকে মন দিয়াছেন কিন্তু তথাপি দেশের বিরাট নারীসমাজ এখনও অশিক্ষিত রহিয়াছে। চীনে সামাজিক নিয়মানুসারে মেয়েদের শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলন না থাকাতে আরও অসুবিধা হইয়াছে। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা তবুও লেখাপড়া শিক্ষা করে কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে শিক্ষার কল্পনা করাও অসম্ভব। বিবাহ সম্বন্ধে চীনে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম থাকিলেও শিক্ষিতা প্রেমিকারা কবিতায় প্রেম নিবেদন করিতে সময় সময় পশ্চাদ্‌পদ হন না।

নিউইয়র্ক শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে আমেরিকা, বিশেষতঃ নিউইয়র্ক সহর অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ও এখনও করছেন। এদের কাজ, এদের উৎসাহ ও তার সুফল দেখে আমার এত আনন্দ হয়েছে যে আমি আমার বাংলা দেশের ভাই-বোনদের এ বিষয়ে কয়েকটি কথা না জানিয়ে পারছিনে। সেদিন নিউইয়র্কের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। যদিও এ প্রতিষ্ঠানটি গত কয়েক বছর থেকে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে চালাচ্ছেন, তবু মনে রাখা দরকার যে যারা প্রথম এ মহৎ কাজ আরম্ভ ক'রেছিল তারা সাধারণ কর্ম্মী, কাজ ক'রে তারা দেখিয়েছে যে শিশুদের বাঁচাতে গেলে এই রকম বহু প্রতিষ্ঠানের দরকার এবং এ কাজ গভর্ণমেণ্টেরই করা উচিত। আমি প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠাতাদেরকে মৌখিক অনেক প্রশ্নই ক'রেছিলাম। সব প্রশ্ন আমার মনে নেই। যতটা মনে পড়ে তা লিখব—এবং তার উত্তরও যতটা মনে আসে তা লিখব। সুদূর বাংলা দেশ থেকে এসেছি ও বাংলা দেশের ভাই-বোনদের জন্য লিখতে চাই শুনে প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার আমাকে অনেক ক'রে তাঁদের কাজের অনেক কথা বললেন। নীচে প্রশ্নোত্তরগুলি দিতে চেষ্টা ক'রলাম।

প্রশ্ন :—এই শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান কত দিন আরম্ভ হ'য়েছে?

উত্তর :—প্রকৃত আরম্ভ বহু বৎসর আগে হ'য়েছে। প্রথমে কয়েকজন উদারহৃদয় লোক—বিশেষতঃ কয়েকজন মহিলা—যখন দেখলেন যে বহুশিশু শৈশবেই মারা যায়, তখন তাঁদের চেষ্টা হ'ল যে কোনও রকমে ঐ শিশু-মৃত্যু বন্ধ করা যায় কি না। তখন আমাদের শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা দুই শ'রও উপর। একদল আরম্ভ ক'রলেন শিশুদেরকে ভাল দুধ সরবরাহ ক'রতে, আর একদল আরম্ভ ক'রলেন মায়েদের শেখাতে, কেমন ক'রে সন্তান পালন ক'রতে হয়। একদল নিজেদের খরচে গরীবদের শিশুর জন্য বিনা ব্যয়ে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রলেন। এ সব কাজ আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই। গভর্ণমেণ্ট ১৯০৮ সালে এই রকম সব ছোট প্রতিষ্ঠান একত্র ক'রে একটি বড় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান খোলেন এবং সব কাজের ভার হাতে নেন। তারপরে নানা বিষয়ের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। প্রথমে আমরা হাতে নিয়েছিলাম মাত্র ৪টি প্রতিষ্ঠান কিন্তু বর্ত্তমানে সহরের আবশ্যক মত আমরা ৭০টি প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছি। দরকার হ'লে যে আরও খোলা হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন :—এতগুলি কেন্দ্রে খরচ কি খুব বেশী হয় না?

উত্তর :—খরচ বেশী হয় বটে, কিন্তু সহরের লোকসংখ্যা ও আয়তন এত বেড়েছে যে সংখ্যা বেশী না ক'রে উপায় নেই। তা ছাড়া আমরা দেখেছি যে পাড়ায় পাড়ায় শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান না ক'রলে অনেক সময় দূরত্বের জন্যই মা শিশুকে পরীক্ষার্থ আনতে পারে না। সুতরাং খরচ বেশী বললে এ কাজ চলে না। শুধু কেন্দ্র করে ব'সে থাকার চাইতে মায়ের কাছে যেয়ে কাজ দেখান'তে আমরা ভাল ফল পেয়েছি।

প্রশ্ন :—শিশু-মৃত্যু কমাবার প্রধান উপায় আপনার কি ব'লে মনে হয়?

উত্তর :—আমার বোধ হয়, দুধকে বিশুদ্ধ করা। প্রথম প্রথম আমরা মায়ের স্তন্য-দুগ্ধ খাওয়ানর জন্য বিশেষ করে বলি। তার ফল ভালই হয়; কিন্তু তবু শিশু-মৃত্যুর হার খুব কমে নি। তখন আমাদের দৃষ্টি গরুর দুধের উপর পড়ে। দুধ বিশুদ্ধ (pasteurization) করা আরম্ভ করার পর থেকে শিশু-মৃত্যু আশ্চর্য্য রকমে ক'মে যায়। এখন আর আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে আগে রুগ্ন গরুর দুধই বহু শিশুকে ধ্বংস ক'রেছে। এ ছাড়া, জল বিশুদ্ধ করার কথাও ভুললে চলবে না। জল বিশুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে টাইফয়েড্ ও অন্যান্য পেটের অসুখে মৃত্যুহার অতি আশ্চর্য্য রকমে কমে গেছে।

প্রশ্ন :—আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমায় কি সংক্ষেপে কিছু ব'লতে পারেন?

উত্তর :—নিশ্চয়, সেইত আমাদের আসল কাজ। আমাদের কাজগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—কেন্দ্রে বসে যে কাজ করা হয়। দ্বিতীয়—বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে যে কাজ করা হয়। প্রতি কেন্দ্রে কাজের পরিমাণ বুঝে—অগত্যাপক্ষে একজন ডাক্তার ও একজন ধাত্রী (nurse) নিযুক্ত করা হয়। গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রের সমস্ত খরচ অর্থাৎ ভাড়া, বেতন, শিশুমঙ্গল-শিক্ষার খরচ ইত্যাদি

সব বহন করেন। (অবশ্য ট্যাক্স থেকে এ টাকা আসে এ কথা বলাই বাহুল্য)। ধাত্রীরা সকলে কেন্দ্রের সেরে বিকালে প্রত্যহ বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে মাদের কি করতে হবে না হবে তা দেখিয়ে বুঝিয়ে ও দরকার হ'লে হাতে-কলমে করে দেয়। এদের প্রধান চেষ্টা, যাতে মাদের পূর্ণ সহানুভূতি পায়। অনেক সময় তাদের বাজার করার পরামর্শ, কাপড় সেলাই-এর মন্ত্রণা, এমন কি কেমন ক'রে বিছানা করতে হয় তার নমুনাও দেখাতে হয়।

প্রশ্ন :—কেন্দ্রে কি কি কাজ সাধারণতঃ করা হয়?

উত্তর :—শিশুদের ওজন নেওয়া, শরীর পরীক্ষা, খাবার কি দেওয়া দরকার, কি খাবার বন্ধ করা দরকার এই সব। প্রত্যেক শিশুর পারিবারিক ইতিহাস, জীবনের ইতিহাস, ওজন বৃদ্ধির বা স্বাস্থ্যের উন্নতির ইতিহাস ইত্যাদি সব রাখা হয়।

প্রশ্ন :—রুগ্ন শিশুর কথা ত আপনি কিছুই বললেন না?

উত্তর :—এসব কেন্দ্রে রুগ্ন শিশুকে স্থান দেওয়া হয় না; রুগ্নকে নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে পাঠান হয়, যদি না, তার মা বাবা তাকে তাঁদের নিজেদের চিকিৎসকের অধীনে রাখতে চান।

প্রশ্ন :—সংক্রামক ব্যাধির বেলায়ও কি ব্যবস্থা তাই?

উত্তর :— না। সংক্রামক ব্যাধির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক, তার হাঁসপাতালও পৃথক—যতদিন না সম্পূর্ণ সেরে যায় এবং তার থেকে অন্য কারও সেই রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে ততদিন রোগীকে ঐ বিশেষ হাঁসপাতালে রাখা হয়। আমাদের শিশুমঙ্গল কেন্দ্রগুলি শুধু সুস্থ শিশুদের জন্য।

প্রশ্ন :—শিশুদের কত বয়স পর্য্যন্ত আপনারা তত্ত্বাবধানে রাখেন?

উত্তর :—শিশুর ২ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমরা তাদের তত্ত্বাবধান করি। কেন না, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে শিশুর প্রথম বছরই হল সব চেয়ে বিপজ্জনক। কোনও রকমে যদি একটি বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়, তারপর সে অনেকটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ঐ প্রথম বছরের প্রথম দিকটা আবার সব চেয়ে বেশী বিপজ্জনক।

প্রশ্ন : - বর্ত্তমানে কি গভর্ণমেণ্টের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও শিশু প্রতিষ্ঠান নেই?

উত্তর :—আছে, তবে তাদের কাজ কতকটা অন্য রকমের, যেমন পিতৃমাতৃহীন শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা বা রুগ্ন শিশুকে স্থানান্তরে পাঠান, তার আহার ও পথ্যের বা কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আমরা শুধু সুস্থ শিশুকে সুস্থ রাখতে চেষ্টা করি।

প্রশ্ন :—এরকম সুস্থ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের জন্য গভর্ণমেণ্টের খরচ হয় কত?

উত্তর :—ঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন, কেন না, বাড়ীভাড়া কতকটা পাড়ার উপর নির্ভর করে। ধনী-পাড়ায় তেমন বেশী কেন্দ্রের দরকার হয় না। কেন না, তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন। মুস্কিল হয় গরীবদের বেলায়। তবু গড়ে আমরা প্রতি কেন্দ্রের ভাড়ার জন্য মাসিক ৫০ ডলার খরচ করি। ঘর ঠিক হ'লে সাজসরঞ্জাম ঠিক ক'রতে তেমন বেশী সময় লাগে না। ডাক্তার ও নার্সেরও অভাব হয় না, ডাক্তার সাধারণতঃ সকালের দিকে তাঁর সময় দেন। নার্সও সকালে ডাক্তারকে সাহায্য করে—বিকালে পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে যায়। কোনও কোনও জায়গায় শিশুর সংখ্যা বেশী হ'লে অতিরিক্ত নার্সও রাখা হয়।

প্রশ্ন :—দুধের কোনও ব্যবস্থা করা হয় কি?

উত্তর :—নিশ্চয়, সেকথা ভোলা হয় না। এই সমস্ত কেন্দ্রেই দুধের ব্যবস্থা আছে। আমরা দুধের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি করি। তারা পরীক্ষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুধ সরবরাহ করে। দাম বাজারের চেয়ে প্রতি কোয়ার্টে ৩ সেণ্ট কম। অনেক কেন্দ্রে দুধওয়ালারা তাদের নিজেদের লোক রেখে দুধ বিক্রী করে—কোথাও কোথাও আমাদের নার্সদের উপর ভার থাকে।

প্রশ্ন :—নিতান্ত গরীবদের উপায় কি?

উত্তর :—ছেলের দুধ কিনতে পারে না—এমন গরীব একেবারে নেই বলি না, তবে খুব কম। যাদের অবস্থায় কুলায় না, তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে। কয়েকটি যায়গায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দুধ সরবরাহ করাও হয়। শুধু শিশুদের জন্য নয়, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন :—স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বললেন, তাদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয় না কি?

উত্তর :—হ্যাঁ, তাদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য সপ্তাহে দুইবার ক্লিনিক (clinio) করা হয়। প্রতি স্কুলেই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ব'লে স্কুলে বসেই আমরা সমস্ত ছেলে মেয়ের পরীক্ষা করতে পারি। তা ছাড়া প্রত্যেক স্কুলে একজন করে নার্স কায়েমী ভাবে থাকে। ছেলে মেয়ের কোনও অসুখ করলেই নার্স ডাক্তারকে খবর দেয় ও আবশ্যক মত চিকিৎসা বা হাঁসপাতালের ব্যবস্থা করে। এজন্য বাপ-মাকে কোনও খরচ দিতে হয় না।

এতক্ষণ সময় নষ্ট করার জন্য আমি সকলকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। পথে ভাবলাম এদের আর আমাদের ক্ষমতা, এ দুটোতে কত পার্থক্য!

—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি
ইনষ্টিট্যুট অব পাব্লিক হেল্থ

আলোচনা

'রাধানামের ঐতিহাসিকতা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন লিখিত 'রাধানামের ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর ন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যে অশেষ পাণ্ডিত্যশালী লেখকের কাছে যে গবেষণা বা অনুসন্ধিৎসা আশা করিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি। তবে তাঁহার প্রবন্ধে দুই একটি ত্রুটি থাকায় তাহা মারাত্মকভাবে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানকালে তিনি বহুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া অতি পরিচিত জিনিষ হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সত্যই, খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি, তাহাদের ভেদাভেদবাদের মূল ভিত্তি শ্রীরাধিকার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত, এমন কি বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায় না। হরেকৃষ্ণবাবু তাঁহার ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যবলে অথর্ব্ববেদ হইতে রাধানামের উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু হাতের কাছে বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এ ভুলটি অতি অন্যায় হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বৃহদ্গৌতমীতন্ত্রে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে :—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

এই সূত্ররূপে বর্ণিত রাধাতত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিস্তারিত হইয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের এই সূক্ষ্ম বচনটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশদীকৃত ও পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই সকলের ধারণা। হরেকৃষ্ণবাবুর এই ত্রুটি স্বেচ্ছাকৃতই হউক বা অনিচ্ছাকৃতই হউক, উচিত হয় নাই।

তার পর, হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন—'পদ্মপুরাণে শ্রীরাধিকার নাম, তাহার পিতার নাম, সখীগণের নাম এবং উপাসনাপদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় করিয়াছেন।'—ইত্যাদি।

আমরা বুঝিতে পারিলাম না হরেকৃষ্ণবাবু এই সত্য কেমন করিয়া আবিষ্কার করিলেন! পদ্মপুরাণে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা যথেষ্টভাবে আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীরাধিকার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। তিনি যে লিখিয়াছেন—পদ্মপুরাণে রাধা, তাহার পিতা, তাহার সহচরী সকলেরই বর্ণনা আছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি রাধার নাম পদ্মপুরাণে কোথায় আছে, তাহা দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। তবে একটা কথা—হরেকৃষ্ণবাবু বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে চৈতন্যচরিতামৃতে পদ্মপুরাণের বলিয়া

"যথারাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়া তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

এই যে শ্লোকটি আছে তাহা মোটেই পদ্মপুরাণের অন্তর্গত নহে।

আমার মনে হয় হরেকৃষ্ণবাবু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা লিখিতে গিয়া ভুলে পদ্মপুরাণের কথা লিখিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বর্ণনায় পরমেশ্বর ভাব ফুটিয়াছে। উক্ত পুরাণ-বর্ণনায় শ্রীরাধার মধ্যে বৈষ্ণবমতানুযায়ী, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দিষ্ট পরাশক্তির স্বভাব সূচিত হইয়াছে। যদি কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পদ্মপুরাণের সমন্বয় সাধন করিয়া থাকেন তাহা হইলে ভুলক্রমে মাত্র ঐ পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্লোকটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই করিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, পরে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোক অলঙ্কারগ্রন্থ হইতে দুইটি শ্লোকের মধ্যে রাধিকার উদ্দেশ হরেকৃষ্ণ বাবু পাইয়াছেন। শ্লোক দুইটিতে খণ্ডিতা শ্রীরাধার ও পরিত্যক্তা শ্রীরাধার তত্ত্ব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দশম শতাব্দীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিতের কথা কি হরেকৃষ্ণবাবু শোনেন নাই? ক্ষেমেন্দ্রের নামোল্লেখ করিতে তাঁহার যে ভুল হইয়াছে তাহা আমাদিগকে পীড়া দিয়াছে। দশাবতারচরিতের মধ্যে কৃষ্ণাবতারচরিতে নিম্নলিখিতভাবে রাধার স্বরূপ বর্ণিত আছে :—

ন স সখি যমুনায়াস্তীরবানীর কুঞ্জে
গহন ভুবি ভবত্যা মৎপ্রিয় কাপি দৃষ্টঃ।
সুমুখি সফলমিয়ন্তু স্নেহমোহাৎ ত্বয়াপ্তং
যদুরসি লিখিতেয়ং কণ্টকোল্লেখরেখা ॥ ১
ইত্যভূন্মদনোদ্দাম-যৌবনে কালিয়দ্বিষঃ।
গোপাঙ্গনানাং সংরম্ভ গর্ব্বোপালম্ভবিভ্রমাঃ ॥ ২
শ্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা ॥ ৩

সঙ্কেতকুঞ্জে রাধা প্রিয়তমের অপেক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণের আগমনের দেরী দেখিয়া এক সহচরীকে খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। সহচরী ফিরিলে উল্লিখিত শ্লোকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কবি ক্ষেমেন্দ্রের জীবনকাল দশম শতাব্দীর শেষের দিক বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতিতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা হইতে ক্ষেমেন্দ্রের কৃষ্ণচরিত বর্ণনা স্বতন্ত্র। নিম্নোদ্ধৃত একটি শ্লোক হইতেই তাহা বোঝা যায়। নারদ কংসকে বলিতেছেন—

পিতৃষ্বস্তে দেবক্যা য সমুৎপন্নস্তে সুতঃ
স সুরৈর্নিশ্চিতো হন্তা বিভূতের্জীবিতস্য তে ॥

অতঃপর লেখক যে মূর্ত্তিগুলির পরিচয় দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। হরেকৃষ্ণবাবু যে বাদামীগুহার অমুকমূর্ত্তিটাকে গোপীপরিবৃত কৃষ্ণমূর্ত্তি, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অমুকটাকে গুপ্তযুগে নির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণ, মহাবলিপুরে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থিতাটি শ্রীরাধা, খাজুরাহোর রাধাকৃষ্ণের যুগল-

মূর্ত্তিটি সপ্তম শতকের ইত্যাদি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সন্দেহ রাখি। কারণ আমার মতে রাধাসমন্বিত কৃষ্ণপূজা চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রচলিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে তীর্থ-ভ্রমণ করিতে গিয়া যে সকল বৈষ্ণবজনবাঞ্ছিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে:—চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ৭, বরাহমূর্ত্তি ১, বামনমূর্ত্তি ১, নৃসিংহমূর্ত্তি ৩, পরশুরামমূর্ত্তি ১, রাম-মূর্ত্তি ৯, অনন্তমূর্ত্তি ১ এবং কৃষ্ণমূর্ত্তি ১।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে একটি মাত্র কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—মধ্বাচারি মঠে। উহার নাম 'উড়ুপী'কৃষ্ণ। সেটি বাল-গোপালের ছবি—সঙ্গে রাধা নাই। চৈতন্য-সম্প্রদায় ব্যতীত আর অন্যান্য সম্প্রদায় 'তত্ত্ববাদী' অথবা 'জ্ঞানবাদী' ছিলেন। চৈতন্য-সম্প্রদায় ভক্তিবাদী। ভক্তিবাদের উপরে চৈতন্য-সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক রাধাভাবের সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব্বে সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এবং পুরাণাদিতে রাধার যে মানবীয়তা এবং পরমেশ্বরী ভাব সূচিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের শ্রীরাধা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা ভক্তিবাদের উপর সংস্থাপিত। রাধা বলিতে আমরা এই আধ্যাত্মিকা রাধাকেই বুঝি—চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাণকারদিগের পরাশক্তিসম্পন্না শ্রীরাধাকে বুঝি না। এইজন্য মনে হয় জ্ঞানবাদী ভারত কৃষ্ণের বাল-গোপাল, সাক্ষিগোপাল প্রভৃতি মূর্ত্তি লইয়াই ব্যস্ত ছিল, ভক্তিবাদের উপর স্থাপিত কৃষ্ণের মুরলীধর ত্রিভঙ্গ রাধাসমন্বিত মূর্ত্তির প্রচার চৈতন্যের সময়ে হইয়াছিল।

উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা ত্রিভঙ্গ-কৃষ্ণ-মূর্ত্তিও নহে, সঙ্গে রাধিকাও নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে যদি শ্রীচৈতন্য অপর কোনো কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সগৌরবে তাহার উল্লেখ থাকিত। চরিতামৃতকারের মতে বাংলায় কোনো কৃষ্ণমূর্ত্তি আবিষ্কারের কথা পাওয়া যায় না। এইবার আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-যাত্রার কথা আলোচনা করিব। নিম্নলিখিত স্থানে চৈতন্যদেব নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি দেখেন: কাশীধামে ২টি বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ ও চতুর্ভুজ বিন্দুমাধব। প্রয়াগে ২টি, বেণীমাধব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি। মথুরায় ৭টি ভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, স্বয়ম্ভূ, কেশব, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রামদেব প্রভৃতি। এইরূপে কোথাও তিনি কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখেন নাই, রাধার তো নামই পান নাই। খাস বৃন্দাবন অথবা বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে তিনি যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে দুএকটি কৃষ্ণমূর্ত্তি থাকিলেও তাহারা ত্রিভঙ্গ ও মুরলীধর নহে—রাধার তো নামগন্ধ নাই।

১৫১৫ সালে শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যান। ১৫১৭ সালে রূপ-গোঁসাই গোবিন্দ-বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। মথুরা হইতে সনাতন গোঁসাই মদনমোহন বিগ্রহ আনয়ন করিলেন। যমুনা পণ্ডিত যমুনাকূল হইতে গোপীনাথ বিগ্রহ তুলিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার-মতে মাত্র এই তিনটিই বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ। গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সঙ্গে কোনো রাধামূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম তিনটি রাধামূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া পুরী হইতে তাহা বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের একটি গোবিন্দের রাধা হইল, অপর দুইটিকে মদনমোহনের দুইপাশে রাধা ও ললিতা নামে বসান হইল। ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদানুযায়ী নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী গোপীনাথের রাধিকা পাঠাইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা চৈতন্যদেবের সময় হইতেই তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধাসমন্বিত মুরলীধর ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ চৈতন্যদেবের পর হইতে বহুল পরিমাণে স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বংশীধারী ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণ ও প্রেমবিগলিতা রাধার অপূর্ব্ব যুগল-মিলনের ছবি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বকালে জ্ঞানবাদী ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভাবিতে পারে নাই। বীরভূমে কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেব গোস্বামীর পাট-বাড়ীতে যে রাধা-মাধবের বিগ্রহ আছে তাহা চৈতন্যের পূর্ব্বে স্থাপিত বলিয়া যে জনরব আছে তাহা প্রমাণ অভাবে মিথ্যা।

এই সকল কারণে মহাবলিপুরের সপ্তশতাব্দীর শিলামূর্ত্তিগুলির মধ্যে অমুক মূর্ত্তিটি শ্রীরাধার, পাহাড়পুরে প্রস্তরফলকের মধ্যে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি গুপ্তযুগের শিলাশিল্পের পরিচয়, খাজুরাহোর অমুক রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিটি সপ্তম শতকের—প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধান্ত হরেকৃষ্ণবাবু করিয়াছেন তাহা যে কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহার বিচার তাঁহার এবং তথাকথিত পণ্ডিতদের নিকট হইতে প্রার্থনা করি।

—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ লিখিত "রাধানামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" পড়িলাম। আমার প্রবন্ধে কোথায় "অতি অন্যায় হইয়াছে", কোথায় "উচিত হয় নাই" তিনি তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি পদ্ম-পুরাণের কথা লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি আন্দাজ করিয়াছেন—"আমার মনে হয় হরেকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা লিখিতে গিয়া ভুলে পদ্ম-পুরাণের কথা লিখিয়াছেন।" আমি কোন্ পুস্তক পাঠ করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছি প্রমথবাবু তাহাও ধরাইয়া দিয়াছেন, "হরেকৃষ্ণবাবু বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।" ইহা হইতে মনে হয় তিনি কেবল ভুল ধরিতেই পটু নহেন, কিজন্য ভুলটা হইয়াছে তাহাও বলিতে পারেন। আমার প্রবন্ধ তাঁহাকে 'পীড়া' দিয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম।

প্রমথবাবুর মতে বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের নাম না করা আমার "অতি অন্যায়" হইয়াছে। আমি আমার প্রবন্ধের (১৮৭ পৃঃ) একস্থানে বলিয়াছি—"গোপাল তাপনী প্রভৃতি (শ্রুতিনামে পরিচিত) দুই একখানি গ্রন্থে এবং রাধাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার বর্ণনা আছে।" ইহা হইতেই লেখকের ধরিয়া লওয়া উচিত ছিল যে কেবল বৃহৎ গৌতমীয় নয়, আমি 'শারদা-তিলক,' "রুদ্র-যামল" "কালীবিলাস" ইত্যাদি তন্ত্রের কথাও ইচ্ছা করিয়াই আলোচনা ত্রুটি নাই। গোপাল তাপনী, বৃহৎ গৌতমীয় প্রভৃতি গ্রন্থের বয়স সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গৌতমীয় তন্ত্রখানি ব্রহ্ম-

বৈষ্ণবের কিছু পূর্বে সংকলিত বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। রাধাতন্ত্রও বেশী দিনের পুরাতন নহে। গর্গ সংহিতা আরো আধুনিক। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে "শারদাতিলক" তন্ত্রখানি প্রাচীন। আচার্য্য পরম্পরা হইতে জানিতে পারা যায় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে এই তন্ত্রখানি সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৈষ্ণবগণ এই তন্ত্রোক্ত "ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং, গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপ সঙ্ঘাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"—ধ্যানেই শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই তন্ত্রে রাধার নাম পাওয়া যায় কিনা দেখিবার অবসর ঘটে নাই।

রুদ্র-যামলে রাধা রাকিনী শক্তি নামে পরিচিতা। কালীবিলাস তন্ত্রে রাধা কালিকা হইতে উৎপন্না। রাধাতন্ত্রে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যাযুক্তা নবমী তিথিতে রাধার আবির্ভাবের কথা আছে। এই সমস্ত মতভেদ এবং সাধনরহস্যের বর্ণনা থাকায় আমি তন্ত্রের কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচনা করি নাই। প্রমথবাবু যে বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র দেখিয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাইলাম না। তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বজনপরিচিত শ্লোকটি মাত্র উদ্ধার করিয়াই কাজ সারিয়াছেন। ঐ শ্লোক গৌতমীয় তন্ত্রের কোন্‌স্থানে আছে, উক্ত তন্ত্রে রাধা সম্বন্ধে কি কি কথা আছে না জানিয়া এ বিষয়ে আর কিছু বলা চলে না।

পদ্ম-পুরাণ পাতাল খণ্ডের ৪০ হইতে ৪৬ অধ্যায় (৩৪৩ পৃঃ হইতে ৩৬৮ পৃঃ) দেখিলেই প্রমথবাবু রাধার নাম, ললিতাদি সখীর নাম, শ্রীদামাদি সখার নাম, বৃষভানুর নাম পাইবেন। দুই একটি শ্লোক তুলিয়া দিলাম—

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভাঃ।
তৎকলা কোটী কোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা॥

পদ্ম-পুরাণ, পাতালখণ্ড, ৩৮ অধ্যায়।

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্য ভূষাম্বর স্রজম্॥

পদ্ম-পুরাণ, পাতালখণ্ড ৩৯ অধ্যায়।

আশা করি প্রমথবাবু এখন বুঝিতে পারিবেন, আমি ভুল করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লিখিতে পদ্মপুরাণ লিখি নাই। আমি চৈতন্যচরিতামৃত ধৃত শ্লোক দেখিয়া কোন কিছু সিদ্ধান্ত করি নাই।

আমি প্রবন্ধে বলিয়াছি নিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তাঁহার বেদান্ত দশশ্লোকীর শ্লোকও তুলিয়া দিয়াছি। ইনি খ্রীঃ একাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। নিম্বার্ক-সম্প্রদায় আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন, "আমার মতে রাধাসমন্বিত কৃষ্ণপূজা চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রচলিত" এ মতের মূল্য কতটুকু? "আমার মতে" বলিয়া তিনি যে স্পর্দ্ধা প্রমাণ করিয়াছেন নিম্বার্ক-সম্প্রদায় তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণে গিয়া রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি না দেখিয়া থাকিলে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ ও রাধা পূজা পাইতেন না। মহাপ্রভু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোনও মঠে গিয়াছিলেন কি না চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু মাত্র কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থেই গিয়াছিলেন। সুতরাং কোন পল্লী অঞ্চলে কোন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবের গৃহে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি থাকিলে তিনি যে সেখানেই যাইতেন এমন আন্দাজও করা চলে না। নিম্বার্ক শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র আজিও বৃন্দাবনেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মঠাধীশ অষ্টোত্তর শতশ্রী সন্তদাস ব্রজবিদেহীকে পত্র লিখিয়া প্রমথবাবু দাক্ষিণাত্য এবং উত্তর ভারতে তাঁহাদের কতগুলি মঠ কোন্ কোন্ স্থানে আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণের পূজা হয় কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি জানিয়া লইতে পারেন।

আমি যে বাদামীগুহা, পাহাড়পুর, মহাবলীপুর প্রভৃতি স্থানের মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমার নিজের গবেষণা কিছুই নাই। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত উল্লেখ করিয়াছি মাত্র।

আশার ক্ষীণালোক

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

মানুষের উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, প্রেরণা যেখানে সত্য সেখানে বড় কিছু গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট উপাদানের অভাবও মানুষকে দমাইতে পারে না; দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষুদ্র হইলেও প্রবল মানসিক শক্তির দ্বারা সে অঘটন ঘটাইতে সক্ষম হয়, পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্য পক্ষে, প্রভূত আয়োজন সত্ত্বেও কেবলমাত্র সাধু প্রেরণা ও যথেষ্ট ইচ্ছা-শক্তির অভাবে বহু প্রতিষ্ঠান যে পণ্ড হইয়াছে তাহারও ইতিহাস আছে।

মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে সামান্য অবস্থা হইতে কি করিয়া বিরাট ও মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে, সকল অভাব, সকল দৈন্য, সকল বাধাকে পদদলিত করিয়া প্রবল পার্ব্বত্য বন্যার মত কেমন করিয়া নিজের পথ নিজে করিয়া লইয়াছে, জীবনে যাঁহারা সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। একটা সমগ্র জাতিকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে তাঁহাদের আদর্শ অত্যাবশ্যক হইলেও এইরূপ ব্যক্তিগত জীবন জাতিগঠনের পক্ষে গৌণ উপাদান।
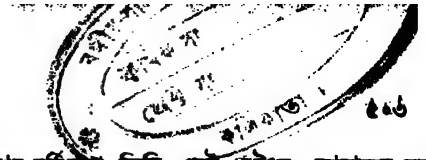
কারণ, প্রায়শই দেখা যায়, যেখানে এইরূপ একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কোনও জাতি বড় হয় বা বড় হইতে চায়, সেই ব্যক্তির অপসারণের অথবা তাঁহার প্রভাব বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান যুগে এই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জাতিগঠন-পদ্ধতি আদর্শ পদ্ধতি নয়।

সরিষা, ছেলেদের বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-বাটী।

যেখানে প্রতিষ্ঠানকেই বড় করিয়া দেখানো হয়, পিছনের ব্যক্তি অন্তরালে থাকে, নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গোষ্ঠীর জন্য ব্যক্তি আত্মনিবেদন করে, সেখানেই সহজে কিছু গড়িয়া তোলা এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশ বা জাতিকে মহদভাবে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়। মানুষের বুকের রক্তরূপ সার পাইয়া যে ফসল গজায়, আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেই নয়নমনোহর ফলশস্য দেখিয়াই আনন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হই, যাঁহারা বুকের রক্ত দিলেন তাঁহাদিগকে স্মরণ না করিয়াই গৌরবান্বিত করি।

এই পদ্ধতি নূতন এবং সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পদ্ধতি। মানবের সভ্যতাবিস্তারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান। সন্ন্যাস ও ব্যক্তিগত বৈরাগ্য-বিলাসের দেশে নিজের মুক্তি ও নির্ব্বাণই আমাদের কাম্য। আমাদের বুদ্ধ সমগ্র মানবের নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে নাই, আমরা বুদ্ধের তপস্যাকে মনে রাখিয়া তাঁহার উপদেশ ভুলিয়াছি, পাষাণ-দেবতার মূর্ত্তিরূপে তিনি সেই হইতে আমাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সত্য টিকে নাই। এই সমগ্রের জন্য ব্যক্তিকে বলিদানের শিক্ষা আমাদের ধাতুগত নয়, উহা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে; পশ্চিম এখানে আমাদের গুরু হইবার অধিকার দাবী করিতে পারে। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মহত্ত্বকে এখনও আমরা শ্রদ্ধা ও স্বীকার করিতে শিখি নাই। এ বিষয়ে যেখানে সামান্য যতটুকু চেষ্টা হইয়াছে আমরা তাহাকে সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছি। আমরা নিজ আত্মার মুক্তির জন্য তীর্থযাত্রা করি, ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া থাকি—সেবার দ্বারা কুষ্ঠকে, আতুরকে, অন্ধকে, মূকবধিরকে তৃপ্ত করিবার সাধনা আমাদের নহে, তাহাদিগকে লইয়া আশ্রম গড়িতে অথবা সমগ্র জাতিকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কোনও প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই।

চেকোস্লোভাকিয়ার 'সোকোল' আন্দোলনের কথা আমার মনে হইতেছে। যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন পৃথিবীতে ইহার চাইতে মহত্তর ও বৃহত্তর কিছু করা বুঝি সম্ভব নয়। যে এক বা একাধিক মানবের মনে এই

বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।

প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা বীজরূপে সুপ্ত ছিল তাঁহাদের স্মৃতিও আজ নাই—শুধু তাঁহাদের কল্পিত প্রতিষ্ঠান-বীজ বিরাট মহীরুহ রূপে সমগ্র বিশ্বের সম্ভ্রম উদ্রেক করিতেছে। নিজের ব্যক্তিত্বকে

সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিতে না পারিলে এইরূপ করা সম্ভব নয়।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বর্ত্তমান চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ সহরে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের প্রাণে দেশের ও জাতির ক্ষুদ্রতার কথা স্মরণ করিয়া বেদনা-বোধ জাগ্রত

বালিকাদের ড্রিল।

হয়। তাঁহারা ইহার প্রতীকার করিতে মনস্থ করিয়া 'সোকোল'-আন্দোলন সুরু করেন। তিন কি চারি জনকে লইয়া সুরু হয়। তাঁহাদের আদর্শ-বাণী (motto) ছিল—"আমরা সুস্থ ও সবল হইব।" সেই আদর্শ লইয়া সোকোল আজও কাজ করিতেছে। কিন্তু এই ষাট বৎসরের মধ্যেই প্রাগ সহরের সেই ক্ষুদ্র আন্দোলন সমগ্র চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রাগের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যখন স্ত্রীপুরুষ কুড়ি হাজার সোকোল ইউনিফর্ম্মে (লাল শার্ট ও [illegible] জ্যাকেট) সজ্জিত হইয়া পুরোভাগে তাঁহাদের ঈগলশোভিত (সোকোল শব্দের অর্থ [illegible]) ধ্বজা রাখিয়া একত্র ড্রিল করে, তখন [illegible] বিস্ময়ে চাহিয়া দেখে। শুধু এই কারণে প্রাগ সহর এখন একটি তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোকোল-আন্দোলন সমস্ত জাতির চেহারা ও প্রকৃতি বদলাইয়া দিয়াছে।

ড্রিলের দৃশ্য।

রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই পাশ্চাত্য আদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বলিতে গেলে, ইউরোপীয়ান মিশনরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রমজাতীয় আশ্রমসমূহকে বাদ দিলে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত, দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো প্রতিষ্ঠানগুলিতেই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবসেবা, তথা দেশ ও জাতিকে সমগ্রভাবে বড় করিয়া তুলিবার সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ইঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন এই বিরাট দেশের পক্ষে তাহা সামান্য হইলেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। যে বীজ স্বামী বিবেকানন্দ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন, যে বীজমন্ত্র তিনি পশ্চিম হইতে শিখিয়া আসিয়া তাঁহার শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের দান করিয়াছেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আজিও তাহা স্বাভাবিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করিলেও কালে যে মহৎ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। স্বার্থলেশশূন্য যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া বুকের রক্ত দিয়া স্বামীজির আদর্শকে কাজে খাটাইতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই আশা লইয়া কাজ করিতেছেন যে তাঁহাদের স্মৃতি লুপ্ত হইলেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান অমর হইয়া থাকিবে। স্বার্থ-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাজ করিলে তাঁহাদের ইচ্ছা যে ফলবতী হইবে তাহা নিসন্দেহে বলা যায়।

ইঁহারা প্রচার-কামনা করেন না বলিয়া উন্নতির বিলম্ব হইতেছে—পশ্চিমে কিন্তু এইরূপ হইত না। বিজ্ঞাপন ও

প্রচারের দ্বারা দেশ ও জাতিকে সচকিত করিয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে তাহারা জানে। এবং ইহাই যুগ ও কালোপযোগী পদ্ধতি। দুঃখের বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যকলাপ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয় নাই, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। জাতি-গঠনের কার্য্যে যাঁহারা যেখানে যতটুকু সাহায্য করিতেছেন দেশের লোকের কাছে তাঁহাদিগকে সেটুকু যথাযথ প্রকাশ করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত এইরূপ একটি আশ্রমে আমরা সম্প্রতি গিয়াছিলাম—তাঁহাদের আশ্রম, আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আশ্রমটি ২৪ পরগণায় ডায়মণ্ডহারবারের অনতিদূরে সরিষা নামক গ্রামে অবস্থিত। যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহা বিস্ময়কর। দেশ ও জাতিকে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা-আশ্রমের এক বা একাধিক কর্ম্মী, ১৯২১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর আশ্রম প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে অক্লান্ত ভাবে করিয়া আসিতেছেন, ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে প্রায় বার বৎসর পরে তাহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহার ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার মত। আশাতীত রকমের কিছু নয়, কিন্তু স্থান কাল পাত্র বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, ইঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। আশ্রমটি দর্শন করিয়া আশার ক্ষীণালোক আমাদের মনে জাগিয়াছে বলিয়াই দেশের জনসাধারণের নিকটে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছি। আশ্রমের প্রাণ-স্বরূপ স্বামী গণেশানন্দ মহারাজকে আশ্রম হইতে তফাৎ করিয়া দেখিবার উপায় নাই, তাই শুধু আশ্রমের কথাই বলিব। আমাদের মূল বক্তব্য চিত্রগুলিতে নিহিত—ভরসা করি, ছবি দেখিয়া আশ্রমের সম্বন্ধে একটা ধারণা পাঠকের জন্মিবে এবং তাঁহারা এইটি অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন।

* * *

কলিকাতার প্রায় ২৬ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার রোডের অনতিদূরে পাশাপাশি তিনটি গ্রাম—নারিকেল, খেজুর, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের চূড়া সদর রাস্তা হইতে গ্রাম তিনখানিকে প্রায় আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। বসতি বেশী ঘর নয়, তিনখানা গ্রামে শিশুবুড়া স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া লোকের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজারের কিছু বেশী। লেখাপড়া বড় একটা কেউ জানিত না, দুই চারি জন উচ্চশিক্ষিত ছাড়া লিখিতে পড়িতে অল্প যাহারা জানিত তাহাদের বিদ্যা ছিল ওই নাম-সই পর্য্যন্ত। জমিওয়ালা পুরুষেরা চাষবাস মামলা মকর্দ্দমা লইয়া দিন কাটাইত, তাহাদের মেয়েরা দিনের কাজ সারিয়া কলহ ও পরচর্চ্চায় অবসর যাপন করিত; বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকাতে এ বিষয়ে বিভেদ ছিল না। পুঁথি হাতে করা মেয়েদের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। সাধারণ গ্রামবাসীদের অবস্থা স্বচ্ছল মোটেই নয়, নিকটবর্ত্তী পাটকলে চটকলে দিন-মজুরী করিয়া তাহারা কোনও রকমে অন্নসংস্থান করে। মোটের উপর, ইংরেজীতে যাহাকে 'ব্যাকওয়ার্ড' বলে গ্রাম গুলি ছিল তাহাই। এই অজ্ঞ পল্লীগ্রাম তিনটির নাম, যথাক্রমে সরিষা, মানখণ্ড, কলাগাছিয়া।

সরিষা গ্রামের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ঠিক উপরেই ফাঁকা মাঠের উপর আশ্রম—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কুটিরের সমষ্টি। কয়েকটি নারিকেল গাছ এখানে ওখানে মাথা খাড়া করিয়া আছে। শীতকালে ফাঁকা মাঠ, কিন্তু বর্ষায় জলে ডুবিয়া থাকে। ১৯২১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী এই গ্রামগুলির উন্নতিকল্পে এই জলাভূমির উপরেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন—পুকুর খুঁড়িয়া মাটি তুলিয়া জমি কিছু উঁচু করা হইয়াছে কিন্তু এখনও বর্ষাকালের অসুবিধা দূর হয় নাই। প্রথমে একটি কুটির মাত্র নির্ম্মাণ করিয়া ছেলেদের সামান্য লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থা করিলে কি হইবে, ছাত্র হয় না। বহু পুরুষ ধরিয়া লেখাপড়ার কাজে যাহারা অভ্যস্ত নয়, হঠাৎ মা-সরস্বতীর বরপুত্র হইতে তাহাদের বাধে। ইহাদেরও বাধিয়াছিল। কিন্তু আশ্রমকর্ম্মীদের নিরলস চেষ্টার ফলে বাধা দূর হইয়াছে। এখন গ্রামের ছেলেরা আশ্রমকে ভালবাসে। ছেলেদের ভালবাসা ও বিশ্বাস অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া মেয়েরাও লিখিতে পড়িতে আসিতে সুরু

ড্রিলের দৃশ্য।

করিয়াছে—বাঁশী বাজাইয়া 'লেফ্ট-রাইট' হাঁকিয়া সদম্ভে ড্রিল করিয়া আজ পল্লীর আকাশ বাতাসকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ইতিহাস দিতে বসিলে স্থানীয় লোকেরাই অবাক হইয়া যাইবে। বাইবেলের উটের গল্পের মত নাকটুকু ঢুকাইবার অনুমতি লইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত উটটাই ঢুকিয়া পড়িয়াছে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সন্দিগ্ধ অশিক্ষিত গ্রামবাসী, ছেলেদের দূরের কথা, মেয়েদেরও শিক্ষা-দীক্ষা স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম-চর্চ্চাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভোরে স্তিমিত আলোকে মেয়েরা একা বা দলে দলে সকল ভয় ও সংস্কারকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের অতিপ্রিয় সারদা-মন্দিরে ছুটিয়া আসে; রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 'নাইট স্কুলে' শিক্ষা দিয়া ফেরে—পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত ভীত গ্রামবালিকা তাহারা আর নয়; তাহাদের চারি পাশের হাওয়াকে তাহারা এমন করিয়া তুলিয়াছে যে সহরবাসী আমরাই মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিলাম—দেখিলাম, সত্যকার প্রাণ দিয়া কাজ করিলে প্রাণকে জাগানো কঠিন নয়।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সামান্য একটি কুটির, মান্ধাতার আমলের তিন খানি গ্রামের অন্ধ সংস্কার কেমন করিয়া দূর করিল, বহুদিনের সযত্নপুষ্ট অজ্ঞতা ও তমকে কোন্ মায়ামন্ত্রবলে উড়াইয়া দিল, বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া সেই কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা দেখিলাম—

পরিপাটি কয়েকটি কুটীর, একটি অট্টালিকা, দুইদিকে দুইটি পুকুর—কঙ্করাস্তীর্ণ পথে ও মাঠে ছাত্রেরা উল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে—দুই শতেরও অধিক ছাত্র। শিক্ষকদের সহিত তাহাদের অত্যন্ত সহজ সম্বন্ধ। আড়ম্বরহীন সেবা পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পূর্ব্বে আশ্রমের কর্ম্মীরাই ছাত্রদের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

এখান হইতে উত্তরে, রাস্তার ওপারে নারিকেল-পল্লবের অবকাশ-পথ দিয়া খোলা আকাশের গায়ে মেয়েদের শিক্ষালয় বা সারদামন্দিরের চূড়া দেখা যায়। একটা নালার উপর বাঁশের সেতু, সেই সেতু অতিক্রম করিয়া সারদামন্দিরে উপস্থিত হইয়াই যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে মনে হইল সুদূর প্রাগ সহরের ব্যায়ামশীল সোকোলদের একটা ক্ষুদ্রদল যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে—পিঙ্গল জ্যাকেট-পরিহিতা মেয়েরা নেত্রীর আদেশের সঙ্গে তাল রাখিয়া ড্রিল করিতেছে। সাড়ী আঁট করিয়া গায়ে জড়ানো, সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে দৃঢ় পদক্ষেপে তাহারা যে বাঁচিয়া আছে এবং বাঁচিয়া থাকিবে তাহাই প্রচার করিতেছে। সহর হইতে বহুদূরে বাংলাদেশের পল্লীর পক্ষে এ যেন এক অপরূপ দৃশ্য।

সারদা-মন্দিরের ছাত্রীসংখ্যা একশতেরও অধিক; শুধু লেখা আর পড়াতেই ইহাদের শিক্ষা পর্য্যবসিত নয়; সমাজ ও পরিবারকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন ইহারা সবগুলিই এখানে শিখিতেছে। বিদ্যালয়টি ইহাদের নিকট শুধু একটা প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান নয়, এ যেন তাহাদের পূজামন্দির; মন্দিরটি নিকাইয়া পুঁছিয়া, ইহারই ছায়ায় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ইহারা যে আনন্দ পায়, প্রাণ দিয়া এটিকে ভালবাসে, তাহার লক্ষণ তাহাদের মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে পরিস্ফুট। বাড়ী হইতে তাহারা স্কুলে আসে তীর্থযাত্রার আগ্রহ লইয়া—তাই তাহাদের ভয় নাই; যখন তখন একা মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে আসিতে তাহারা দ্বিধা করে না। আশেপাশের সমস্ত স্থানকে তাহারা যেন নির্ম্মল পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

স্কুলের শিক্ষা লাভ করা ছাড়া এই সকল ছেলে-মেয়েরা গ্রামে গ্রামে 'নাইটস্কুল' প্রতিষ্ঠা করিয়া অপেক্ষাকৃত বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদের পালা করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকে; বাড়ী ঘরদুয়ার পুকুর পাদাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়, রোগীর সেবা করিয়া থাকে; মাঝে মাঝে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইয়া আসে। ইহারা গ্রামের আকৃতি ও প্রকৃতি যেন বদলাইয়া দিয়াছে, গ্রামবাসীরাই তাহা স্বীকার করিবে।

অনেক আশা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমের মামুলি বর্ণনা, আয়ব্যয়ের হিসাব, অভাব অভিযোগের কথা বলিলাম না, কারণ অতি অল্প আয়াসে মাত্র আট আনা পয়সা বাসের ভাড়া দিয়া কলিকাতা হইতে যে কেহ এ সকল চাক্ষুষ দেখিয়া আসিতে পারেন। কে জমি দিয়াছেন, জমির পরিমাণ কত, পাকা বাড়ী কাহার খরচায় হইয়াছে, স্কুলগুলিতে কতদুর পর্য্যন্ত পড়ানো হয়, কোন শ্রেণীতে কত ছাত্র, কি কি বিষয় শেখানো হয়, কতটাকা হইলে জমি উঁচু করা যায়, ছেলেদের খেলার মাঠ হইতে পারে—এ সকল কথা আশ্রম-বিবরণীতে বিশদ ভাবে লেখা আছে। আশ্রমটি দেখিয়া আসিয়া আমার মনে যে আশা জাগ্রত হইয়াছে, জাতিগঠনের যে সম্ভাবনার কথা মনে হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই নিবন্ধ। সরিষার এই ছোট আশ্রম ও তাহার স্কুল আমার মনে সুর ধরাইয়াছে—মনে হইতেছে এই ভাবে কাজ করিলে এই অধঃপতিত জাতির দেবতা একদা সুপ্রসন্নও হইতে পারেন।

ছবিগুলি শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত, তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

বাংলার আর্থিক সঙ্কট ঘুচিবে কিসে

(দ্বিতীয় ধারা)

—শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

গত 'ফাল্গুন' সংখ্যায় আমাদের আর্থিক সঙ্কটের পরিচয় ও বিভিন্ন আর্থিক জীবন সংগঠনের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যত সমাজনৈতিক জীবন যে ঠিক কিরূপ গড়িয়া উঠিবে তাহা এখন বলা কঠিন। সম্প্রতি কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের বেকার সমস্যা কমিতে পারে ও সকল শ্রেণীর লোকের হাতে কাজ ও মুখে অন্নের সংস্থান হইতে পারে তাহা বিচার করা যাক।

১৯৩১ সালের আদমসুমারিতে বাঙ্গালায় মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পাঁচ কোটির কিছু উপর। ইহার মধ্যে রোজগারশীল ১,৩৭,৫০,০০০ নির্ভরশীল কর্ম্মীশ্রেণীভুক্ত ৬,৬৩,০০০ অর্থাৎ শতকরা ২৯ জন এবং নিষ্কর্ম্মা পরমুখাপেক্ষী ৩,৫৭,০০,০০০—অর্থাৎ শতকরা ৭১ জন। ১৯২১ সালের আদমসুমারিতে বাংলা দেশে শতকরা ৩৫ জন কর্ম্মনিরত ও ৬৫ জন নিষ্কর্ম্মাশ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানা যায়, সুতরাং ১৯২১ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে নিষ্কর্ম্মার সংখ্যা অর্থাৎ বেকারসমস্যা যে বাংলায় কত বাড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলায় শতকরা অধিক লোক নিষ্কর্ম্মাশ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ে লোকসংখ্যার ৫৫ জনের অধিক বেকার থাকা উচিত নয়, এ হিসাবে দেখিলে বাংলার ২ কোটি ৩০ লক্ষ কর্ম্মোপযোগী লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৪৫ লক্ষ কর্ম্মনিরত। অর্থাৎ বাংলায় সকল শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ। ইহা ছাড়া কর্ম্মনিরতদের মধ্যে বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ কাজ নাই। বেকার ও অর্দ্ধবেকার মিলাইয়া দেখিলে বাংলার বেকার সমস্যায় খিন্ন ব্যক্তির সংখ্যা এক কোটিরও অধিক হইবে।

বর্ত্তমানে যাহারা কায়ক্লেশে পরিশ্রম করিয়া খাইতেছে তাহাদের কর্ম্মকুশলতা বাড়াইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু শুধু সেই দিকে নজর দিলে আমাদের বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া পড়ার সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই সব দিকে যেখানে অন্যূন এক কোটি কর্ম্মহীনের কিছু কাজের যোগাড় হইতে পারে।

আদমসুমারির হিসাবে দেখা যাইতেছে যে বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে যে দেড় কোটি লোক এখন কাজ করিয়া খাইবার সুযোগ পাইতেছে তাহারা মোটামুটি নিম্নলিখিত কাজে ব্যাপৃত :—

ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনসংক্রান্ত কাজে নিরত—	১,০৫,৬৭,০০০
খনিজ উৎপাদনে নিরত—	৪৪,০০০
শিল্পের কাজে নিরত—	১৩,৮২,০০০
যান-বাহনাদির কাজে নিরত—	৩,১৩,০০০
ব্যবসা ও বাণিজ্যে নিরত—	১০,৬৬,০০০
সরকারী চাকুরী, মসীজীবী ও মস্তিষ্কজীবী—	৪,৪৪,০০০
বিবিধ—	১৭,৮৭,০০০
মোট	১,৫৬,০৩,০০০

ইহাদের মধ্যে এমন অনেকে রহিয়াছে যাহারা একাধিক কাজে নিরত থাকিয়া অন্নসংস্থান করে। তাহাদের সংখ্যা উপরোক্ত তালিকায় একাধিক বার ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া মোট কর্ম্মনিরতের সংখ্যা পূর্ব্বে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উপরের তালিকায় কিছু বেশী দেখাইতেছে। শিল্পের কাজে নিরত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯৩১ সালে কারখানা-শিল্পনিরতের সংখ্যা ছিল ৪,৮০,০০০ এবং কুটীর-শিল্পনিরতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯,০০,০০০। ইহা হইতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে কুটীর-শিল্পের স্থান সূচিত হইতেছে।

সে যাহাই হউক, বাংলার অন্যূন এক কোটি বেকার লোকের অধিকাংশকে কাজে লাগান যে প্রধানতঃ ভূমিকর্ষণ ও পশুপালনের দিক দিয়াই সম্ভব করিতে হইবে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। অতএব আমাদের কৃষির অবস্থা কি তাহা একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা দরকার।

সরকারী হিসাবে পাওয়া যাইতেছে যে ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে জমির ব্যবহার নিম্নলিখিত মত হইয়াছে, যথা :--

চাষ আবাদ করা জমির পরিমাণ—	২,৩৬,২০,০০০ একর
চাষবাবদ জিরান জমি—	৫০,০৩,০০০ ,,
চাষোপযোগী পতিত জমি—	৫৯,৩৬,০০০ ,,
চাষের অনুপযুক্ত জমি—	১,০৫,৯৪,০০০ ,,
জঙ্গলাদি ,, —	৪৪,৩৫,০০০ ,,
মোট জমির পরিমাণ—	৪,৯৫,৯৬,০০০ ,,

ইহা হইতে দেখা যায় যে বাংলায় ভূমিকর্ষণ বৃদ্ধি করার এখনও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং প্রতি বর্গ মাইলে বাংলার লোকসংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অধিক হইলেও এখনও সমস্ত চাষোপযোগী জমি কর্ষিত হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

বাংলার জমিতে ১৯১৭-১৮ হইতে ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত গড়ে বাৎসরিক যে পরিমাণ মোট শস্য পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রধান গুলির একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতে বাংলার চাষীর মোট উৎপাদনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ;

শস্যের নাম—	পরিমাণ
১। চাউল, গম, ছোলা প্রভৃতি মোট খাদ্যশস্য—	২২,৪৩,৭০,০০০ মণ
২। চিনি ও গুড়—	৬২,৩৭,০০০ ,,
৩। সর্ষে, মশিনা প্রভৃতি তৈলদ বীজ—	৪৯,১৪,০০০ ,,
৪। পাট—	১,৮২,৭০,০০০ ,,
৫। তুলা—	৫২,৫০০ ,,
৬। চা—	৫,৪৩,৭৫০, ,,
৭। তামাক—	২৯,৯৭,০০০ ,,

জমির দোষগুণ হিসাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু গড়ে বাংলার জমিতে প্রতি একরে (প্রায় ৩½ বিঘা) কি পরিমাণ শস্য সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার আভাস পররর্ত্তী লিখিত তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

প্রতি একরে গড়ে উৎপন্ন (১৯২১-২২ হইতে ১৯৩০-৩১ পর্য্যন্ত) শস্যের নাম ও পরিমাণ এই—

শস্যের নাম	পরিমাণ [মণ—সের]
চাউল—	১১ মণ ৭ সের
গম—	০৬ " ১৩ "
গুড়—	৩০ " ৩৫ "
চা—	১১ " ৩০ "
তুলা	১ " ১০ "
পাট—	১৫ " ৪ "
মশিনা—	৪ " ১২ "
সরিষা—	৪ " ২৫ "

বাংলার জনসংখ্যা হিসাবে মোটামুটি আমাদের বিভিন্ন উৎপন্ন জিনিষের কি পরিমাণ চাহিদা হওয়া উচিত ও তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে কত আমরা বাংলার জমি হইতে পাইতেছি তাহা বিচার করিয়া দেখিলে কোন্ কোন্ দিকে বিস্তৃতির প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একে একে তাহা হিসাব করিয়া দেখা যাক্।

খাদ্যশস্য—১৯২৭-২৮ হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে লোকে গড়ে কিঞ্চিদধিক আধ সের করিয়া খাদ্য ব্যবহার করিয়াছিল। সেই অনুপাতে বাংলার জনসংখ্যার হিসাবে উৎপন্ন শস্যে কিছু ঘাটতি পড়ে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আধ সের খাদ্যে সবলদেহ ব্যক্তির পুষ্টি হইতে পারে না। শিশু ও বৃদ্ধ লইয়া গড়ে তিন পোয়া পরিমাণ চাউল কিম্বা ময়দা প্রত্যহ প্রত্যেক ব্যক্তির পাওয়া আবশ্যক। সে হিসাবে বাংলার খাদ্য শস্যের উৎপন্নে প্রায় দশ কোটি মণ ঘাটতি পড়ে। বাঙ্গালীকে হৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে হইলে যে উপায়েই হৌক এই ঘাটতি পূরণ করিয়া ফেলিতে হইবে। খাদ্যশস্য উৎপন্ন যে সমস্ত বাংলাদেশেই করিতে হইবে এমন নয়। বিহার ও আসামের অনেক অংশ পতিত রহিয়াছে। আবশ্যক হইলে বাঙ্গালীকে সে দিকে শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইবার জন্য বিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। এবং অন্যান্য অর্থকরী শস্য উৎপাদনে যে লাভ হইবে তাহার দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

গুড় ও চিনি—১৯২৭-২৮ হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ভারতবাসী বৎসরে তের সের পরিমাণ চিনি ও গুড় ব্যবহার করিয়াছিল। এই হিসাবে বাংলার উৎপন্ন বাঙ্গালীর

চাহিদার অনুপাতে প্রায় এক কোটি মণ কম রহিয়াছে। শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরের পুষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর এদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

তুলা—ভারতবর্ষের জনপ্রতি বৎসরে ১৫ গজ করিয়া কাপড় ব্যবহারের হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রায় ১৪ লক্ষ মণ তুলার প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালীর কি এদিকে উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত নয়? উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন-বস্ত্রের যোগান সম্ভব হইলে বহু বাঙ্গালীর বেকার-সমস্যা ঘুচিয়া যাইবে।

তৈলদ বীজ—সমগ্র ভারতবর্ষের গড় হিসাবে জনপ্রতি তৈলদ বীজের ব্যবহার হয় বৎসরে তের সের মাত্র। ইহা অত্যন্ত কম সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অনুপাতেও বাংলায় এক কোটি মণেরও উপর উৎপন্নে ঘাটতি রহিয়াছে।

অতএব মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে পাট, চা, তামাক প্রভৃতি কতকগুলি অর্থকরী শস্য ভিন্ন প্রায় সমস্ত শস্যেই আমাদের উৎপন্নে ঘাটতি রহিয়াছে। ১৯২৭-২৮ হইতে ১৯২৯-৩০ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদির মূল্যের হার হিসাবে দেখিলে সমগ্র ভারতীয় মানদণ্ডের হিসাবে বাংলায় নিম্নলিখিত মূল্যের শস্যের ঘাটতি ও বাড়্তি রহিয়াছে দেখা যায়, যথা :—

ঘাট্তির হিসাব	কোটি টাকা
খাদ্য শস্য—	২৩
চিনি ও গুড়—	৭৷৷০
তুলা—	৯৷৷০
তৈলদ শস্য—	৯

মোট—৪৯ কোটি টাকা।

অপর দিকে বাড়তির হিসাবে পাওয়া যায়—

	কোটি টাকা
পাট—	৩১
চা—	৬৷৷০
তামাক	১৷০

মোট—৩৮ কোটি টাকা।

ইহা হইতে মনে হয় যে বাংলার জনশক্তির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালীকে বৎসরে অন্ততঃ এগার কোটি টাকার ঘাট্তি বহন করিতে হইবে। এ অবস্থায় জাতি টিকিবে কয়দিন?

অবশ্য এই খানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত হিসাবগুলি কোনক্রমেই নির্ভুল নহে। গ্রামবাসীর কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের গড় চাহিদার অনুপাতে বাংলার জনসংখ্যার কত ব্যবহার হওয়া উচিত তাহারই আনুমানিক গণনা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কেরোসিন, লবণ, দুধ, লৌহ ও ইস্পাতের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর হিসাব করা প্রায় অসম্ভব মনে হওয়ায় বাদ দিয়া রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এগুলির চাহিদা মিটাইতে নিতান্ত কম লোকের প্রয়োজন হয়। যাহা হৌক্, কি ব্যবস্থায় বাংলার এই ঘাট্তি পূরণ হইতে পারে ও বাঙ্গালীকে সে পূরণের কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হইতে পারে তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। কোন একটী মন্ত্রের বলে অথবা একটী মাত্র ব্যবস্থায় যে উহা সম্পাদিত হইবে ইহা কল্পনা করাও বাতুলতা। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চিন্তাধারা এদিকে প্রবিষ্ট করাইয়া কতকগুলি সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়া সকলকে জাতিসংগঠনের এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। আবশ্যক মত এই ব্রত উদ্‌যাপনে পারিপার্শ্বিকের যে কোন বাধা দূর করা প্রয়োজন বোধ হইবে তাহা যত শক্ত ও চিরন্তন হৌক না কেন নবীন বাংলাকে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে।

গত ১৯৩২ সনে ওরিয়েণ্ট্যাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানী মোট ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭ শত ২৭ টাকার জন্য ২৯ হাজার ৯৮২টী বীমাপত্র দাখিল করিয়াছেন। পূর্ব্ব সনে তাঁহারা মোট কাজ ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত ৫৪ টাকার জন্য ২৬ হাজার ৪৮৬ খানি বীমাপত্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই দুর্ব্বৎসরেও তাঁহারা গত বৎসর অপেক্ষা ৩ হাজার ৪ শত ৯৬ খানি বীমাপত্রে ৫৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭ শত ৭৩ টাকার অধিক কাজ করিয়াছেন।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী, ২৮০ পৃষ্ঠা, এন্টিক কাগজ, মূল্য দেড় টাকা। কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের সমষ্টি।

মাসিক ও সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পুস্তক-পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা যাঁহারা রাখেন তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল পুস্তক পরিচয়ের আশায় হাতের কাছে আসে সেগুলি এত নগণ্য ও মনকে এমন বিষাক্ত করিয়া দেয় যে, একটা ভাল বই হাতে আসিলেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে বাধে; অর্থহীন প্রলাপ ছাপাইয়া মানুষ পয়সা নষ্ট কেন করে এই বেদনাদায়ক চিন্তার ফাঁক দিয়া ভাল বইও কোন্ সময় হাত হইতে ফস্কাইয়া বাহির হইয়া যায়, বুঝিতে পারি না। কঙ্কর-উপলাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে মণি-মাণিক্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেমন মনেও আসে না, মণি-মাণিক্য পায়ে ঠেকিলেও যেমন তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাই অনেক সময় তেমনই হয়তো ভাল বই সম্বন্ধেও অবিচার করিয়া বসি।

ইট-পাটকেলের দেশে হঠাৎ কৃষ্ণরাও-এর মত একখানা হীরকখণ্ডের সন্ধান পাইয়া এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃখও মনে জাগিল, সহজ সরল অনাড়ম্বর জোয়ালো খাঁটি বাংলা যাঁহার এমন দখলে ছিল তিনি কি না—মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা না করিয়া সুদূর বিদেশে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ জজিয়তী করিয়া কাটাইলেন—আর বাঙ্গালা ভাষার আত্ম শ্রাদ্ধ করিবার জন্ত রহিয়া গেলেন——যাক্, নাম করিয়া আর শত্রু বৃদ্ধি করিব না। 'পরিচয়ে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'পুরানো কথা' পড়িয়াও একথা মনে হইয়াছে, আজ কৃষ্ণরাও পড়িয়াও সেই কথাই বলিতেছি, গল্পাংশ যেমনই হউক শুধু সুন্দর বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে 'কৃষ্ণরাও' অমর হইয়া থাকিবে।

এই পুস্তকের পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জাগিতেছে, এত অল্প পরিসরে ইহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বাঙালী পাঠককে আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বইখানি সংগ্রহ করিয়া একবার পড়িয়া দেখেন; চমৎকার মারাঠা জীবনের গল্প তো পাইবেনই, অধিকন্তু ভাষার দিক দিয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্য হইবে। ইহার অধিক কিছু বলিতে পারি না। ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।—

"ভাবি এ বুঝি সংসার এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এখানে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ আছে, দিগন্তবিস্তৃত বালির রাশি আছে, মাঝে মাঝে এক আধটা সুন্দর সুশীতল ওয়েসিসও আছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী আছে অনন্ত পিপাসা, আর পিপাসাতুরকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত মায়াবিনী মরীচিকা। তৃষ্ণাতুর হরিণ এক চুমুক জলের জন্ত ভীষণ রোদে চারিদিকে পাগলের মত ঘুরছে। এমন সময় দূরে দেখলে সুন্দর সবুজ গাছের তলায় শান্ত স্নিগ্ধ হ্রদ। দিলে এক ছুট। এইবার জল খেয়ে প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু যত যায় হ্রদও তত পিছিয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়ে শেষে আর পা চলে না, টল্‌তে টল্‌তে ঘাড় মটকে পড়ল তপ্ত বালির উপর। তৃষ্ণা মিটল চিরদিনের জন্ত। আর তার জলের দরকার হবে না। এই মৃগ-তৃষ্ণিকা। সংসারে অনেক মানুষের দশা এই হরিণের মত। এক জনের কথা নীচে লিখছি। নাম তার করসনদাস মূলজী। তার দৌড় শেষ হয়েছে। ঘাড় মটকেও পড়েছে, তবে কে জানে আর উঠবে কি না।"

ইহাই প্রথম গল্পের ভূমিকা—বাকীটা পাঠক স্বয়ং পড়িয়া দেখিবেন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ভবানন্দের 'হরিবংশ', ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুত যোগেন্দ্র গুপ্তের 'শিশুভারতী' চার সংখ্যা এবং ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্প-পুস্তক 'ত্রিলোচন কবিরাজে'র পরিচয় স্থানাভাবে এবার দিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় এই পুস্তকগুলির পরিচয় থাকিবে।]

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—৫ম স্বাস্থ্য-সংখ্যা; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম সম্পাদিত; মূল্য মাত্র চার আনা।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পঞ্চম স্বাস্থ্য-সংখ্যা দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এই ধরণের সুসম্পাদিত পত্রিকা খুব কমই চোখে পড়ে। গঠন, প্রবন্ধ ও চিত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীযুক্ত হোম যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশের সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জগৎ-খ্যাত বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি ছাড়া, এই সংখ্যায় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র মহাশয় কর্ত্তৃক য়ুরোপ-প্রবাসকালে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য-তত্ত্বনিরূপক চিত্রগুলি। এই সমস্ত চিত্র দেখিলেই, মনে মনে এই কথা উদিত হয় যে, য়ুরোপে স্বাস্থ্য-তত্ত্বকে কতখানি প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সব দেশের শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সমাজ-নেতা সকলে মিলিয়া এই স্বাস্থ্যতত্ত্বকে পাঠশালার অজ্ঞাত অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিয়া এক বিরাট প্রাণ-স্পন্দনময় নব-বিজ্ঞানের মহিমায় কেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে দুঃখ হয়, যখন দেখি আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সকলের সম্মিলিত উদাসীনতা এবং অজ্ঞতা। গেজেটের স্বাস্থ্য-সংখ্যা দেখিয়া এই কথা বড় দুঃখে মনে জাগিয়াছে এবং

আমার বিশ্বাস যে কেহ দেখিবেন তাহারই জাগিবে—এবং সেইখানেই বোধ হয় সম্পাদকের বহুদিনের ঐকান্তিক শ্রমের সার্থকতা ঘটিয়াছে।

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৩৯ ও বিচিত্রা চৈত্র, ১৩৩৯

'উড়িষ্যায় বর্গীর প্রতিরোধ' চৈত্রের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধ, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন লিখিত। প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য এই—ইহা ছোট, সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ; একাধারে এই তিন গুণ বাংলা মাসিকের প্রবন্ধে দুর্লভ। ঢেঙ্কানাল-মহারাষ্ট্রের যুদ্ধ লইয়া কবি ব্রজনাথ বড়জেনা (উড়িষ্যাবাসী) 'সমর তরঙ্গ' নামক যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। উদাহরণ গুলি হইতে দেখিতেছি—কাব্যটির ইতিহাস-ভাগ যত মূল্যবান হউক, কাব্যাংশে ইহা নিকৃষ্ট তো নয়ই উপাদেয়। একটা সংবাদে আশ্বস্ত হইলাম "তখনকার লোকে আত্মরক্ষা করিতে জানিত, দায়ে পড়িয়া শিখিত, এবং এখনকার মত দস্যুতস্কর মাত্রের নিকট অসহায় বোধ করিত না।"

'দুলালের গল্প' পরশুরাম বিরচিত। কবিতা লিখিলেন পরশুরাম, ছাপা হইল প্রবাসীতে, প্রবাসীর সম্পাদক বদলও হয় নাই দেখিলাম; এদিকে রবীন্দ্রনাথ ফুটনোট দিয়াছেন—'এটি প্রকাশ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।' ব্যাপারখানা কি? শ্রীমান দুলালের নিকট লুক্কায়িত এই কবিতাটি ছাড়া অনেক ভাল ভাল কবিতা রবীন্দ্রনাথ জীবনে অনেকের কাছে লুক্কায়িত দেখিয়াছেন; অনেকে, কবিহিসাবে তাঁহারা নিশ্চয়ই পরশুরামের চাইতে বড়, লুকাইয়া অনেক লুক্কায়িত কবিতা তাঁহাকে দেখাইয়া আসিয়াছেন, তিনি তারিফ করিয়াছেন কিন্তু কই বরাবরই তো 'প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ' করিয়া আসিয়াছেন! তবে?

একটা হদিস পাওয়া গেল। চৈত্রের বিচিত্রার ৩২৭ পৃষ্ঠায় 'কল-কারখানা' নিবন্ধে—শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রে। রবীন্দ্রনাথ এতকাল বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক প্রতিষ্ঠানটি দেখেন নাই বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন হঠাৎ মনে করিয়াছেন, তাহারই স্বীকারোক্তি এই চিঠিতে আছে—বেঙ্গল কেমিক্যাল দেখেন নাই বলিয়া শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের কাছে অপরাধ স্বীকার! কল দানব, কারখানা মানুষ (কারণ, বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা!), বুদ্ধদেব, ধর্ম্ম, শক্তি, মণীষা, সত্ত্ব ইত্যাদি অনেক কথা এবং শেষে "রাজশেখর বসুর মনীষা!" এতগুলা বন্যায় স্তার পি, সি, রায়কে ভাসাইতে পারে নাই, এবার রবীন্দ্রনাথ ভাসাইলেন!

"শুধু মণীষা নয়, 'সৃষ্টিপ্রসারিণী মণীষার সাহস!'

এখানেই চিঠি সমাপ্ত নয়, "আমার মনে হোলো, কলকাতা সহরে সবচেয়ে বড়ো দেখবার জিনিষ এই বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা। যা দেখা গেল তার চেয়ে দূরনির্দ্দেশী ইসারা আছে এর মধ্যে।"

সে ইসারা আমরাও লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডও করিতেছেন।

চিঠির শেষে আছে—"আমি জানি তুমি বিদেশে অনেক ভ্রমণ করেচ। কিন্তু একটা ভ্রমণ তোমার বাকী আছে, সেটা সেরে নিয়ো—একবার যাত্রা কোরো বেঙ্গল কেমিক্যালের দিকে।"

হায় ভগবান, কপালে এতও ছিল?

চৈত্রের বিচিত্রার প্রথম কবিতা 'স্নান সমাপন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রসানুভূতি যে ভোঁতা হইয়াছে, রস-বুদ্ধি যে রস-বিকারে পরিণত হইয়াছে তাহা কাহাকে বুঝাইব? রবীন্দ্রনাথকে যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে সেই এই আঘাতের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। ভালোর সাথে মন্দ, সুন্দরের মধ্যে এই কুৎসিত কোথা হইতে আসিয়া জুটিতেছে! অসঙ্গতিতে অসঙ্গতিতে শেষ পসরা ভরিয়া উঠিল!

বেশ চলিতেছিল—

"শর্ষেক্ষেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল,
মালিনী খুলেচে ফুলের পসরা পথের ধারে
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হোলো মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চললেন বন ঝাউ ভেঙে
গাঙ শালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।"

কিন্তু তারপর হঠাৎ—

"শিষ্য শুধালো 'কোথায় যাও, প্রভু'
ওদিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।"

পড়িয়া সমস্ত মন কুঞ্চিত হইয়া উঠে। শেষ পংক্তিতে 'ভদ্রপাড়া' শব্দের প্রয়োগ যে কি কুৎসিত রবীন্দ্রনাথকেও কি তাহা বুঝাইতে হইবে?

কথার উপর কথা গাঁথিয়া যাইবার এই খেলা শেষ হউক, রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও কি এই কামনা করিতে হইবে?

'পারস্য-ভ্রমণ'—প্রবাসীর কেদার চট্টোপাধ্যায়ের শেষ হইয়াছে, বিচিত্রার রবীন্দ্রনাথের এখনও শেষ হইল না। ওদিকে 'বিপ্রদাসে' শরৎচন্দ্র আসর জমাইয়া ফেলিলেন। ঘুণ-ধরা বাঁশেও যে বাঁশী হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণ পাই নাই।

বিচিত্রার শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নীললোহিত'। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'হাসি-ব্যঙ্গ' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন "এ হচ্ছে বিদ্যুতের বাঁকা-চোরা চমক। আলোতে চোখ ঝলসে দেয়, গায়ে লাগলে মৃত্যু।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, অতুল বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার মত সকলেই নন-কণ্ডাক্টিং মেটিরিয়ালের উপর দাঁড়াইয়া নাই। অবশ্য মন্দের ভাল, তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন বলিয়া এই হাসির স্বরূপ জানিতে পারিলাম। বন্ধুপ্রীতির সীমা থাকে বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এখন দেখিতেছি ভুল।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু মোপাসাঁর একটি গল্প অবলম্বনে 'মণিকা' নামক যে গল্পটি লিখিয়া চৈত্রের বিচিত্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেকগুলি ভাষার ভুল ও একটি ছাপার ভুল আছে। তাঁহার ভাষা-ভুলের নমুনা

অনেক দেওয়া হইয়াছে—'এই সময় দিয়ে, আমি কখনো যা আশা করি নি, তাই ঘট্‌লো।' 'ঘাসাবৃত আঙিনা' 'নামের অভাবে তাকে মেয়েলোক বলতে হচ্ছে' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা বৃথা। ছাপার ভুল—'মোপাসাঁর অনুসরণে' কথাটা বাদ পড়িয়াছে।

চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'স্বাগতা' শেষ হইয়াছে, আশা করিয়াছিলাম, আগামী সংখ্যা হইতে তাঁহার চমকপ্রদ কোনও উপন্যাস 'ইস্কাপনের গোলাম' অথবা 'পকেটমার কে?' শীঘ্রই বাহির হইবে, এই ধরণের একটা আশ্বাস প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় দিবেন। কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই।

চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'অরিন্দমের মৃত্যু'—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখিত। মানুষ যখন আত্মহত্যা করে তখন অরিন্দমের মত করিয়াই করে, এই কথা প্রবাসীরই জানা প্রয়োজন ছিল। অচিন্ত্যবাবু প্রবাসীকে বাঁচাইলেন। তবে আট পৃষ্ঠা গল্পের প্রতি পংক্তিতে তিনি 'মরা মরা' করিয়াছেন বলিয়াই যা ভয়।

প্রবাসীতে শ্রীসুখলতা রাও-এর ত্রিবর্ণ চিত্রটির নীচে 'নেতা ধোপানী' লেখা হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। 'পদী ময়রানী' অথবা 'সদী জেলেনী' লিখিলেই বা কি দোষ হইত?

প্রবাসীতে একবার রবীন্দ্রনাথের নূতন কবিতার অভাবে তাঁহার একটি অত্যন্ত পরিচিত পুরাতন কবিতাকেই প্রথম কবিতা করিয়া ছাপানো হইয়াছিল। চৈত্রের বিবিধ প্রসঙ্গে দেখিলাম—"নোবেল প্রাইজ পাইবার আগে রবীন্দ্রনাথের আদর" শীর্ষক দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি প্রসঙ্গে ১৩১৮ সালের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাও অনুরূপ নূতন আদরের অভাব সূচনা করিতেছে না ত?

ফাল্গুনের বসুমতী ও চৈত্রের ভারতবর্ষ দেখিয়া মনে হইল, 'বসুমতী' সর্ব্বংসহাই বটেন এবং 'ভারতবর্ষ' পরাধীন। 'মহাপ্রস্থানের পথ' হইতে ফিরিয়া আসিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। প্রবোধ সান্যাল মহাশয় বৃথা ভয় পাইয়াছেন—"এবারে ডান্‌ হাতটা গেলেই বাঁচি, আর গল্প লিখিতে হয় না, সাহিত্যের-স্বাস্থ্য রক্ষকের দল, নিন্দুক সমালোচকের পাল খুসী হয়!" শোনা যায়, মহিষের শৃঙ্গে উপবিষ্ট সেই মহদাশয় মশাটাও এই ভাবেই চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু সহজ অবস্থার কথা হইলেও বা কথা ছিল। তিনি এমন অবস্থায় ওই আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, যখন "চল্‌তে চল্‌তে একবার দাঁড়াই, বুকের মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী শব্দ হতে থাকে, কানের মধ্যে বাজে জলতরঙ্গ!" Sublime ও ridiculous-এর একত্র সমাবেশের কথা শুনিয়াছি কিন্তু 'বিশ্রী শব্দ' ও 'জলতরঙ্গ' একই সময়ে একই জনের বুকে ও কানে—? "জয় বদরী-বিশালা-কী-জয়!"

শুক্লপক্ষ এই, অচিন্ত্যকুমার এইবার ভারতবর্ষের 'কৃষ্ণপক্ষ'—কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান, 'বদরীবিশালা' পর্য্যন্ত যাইবার চেষ্টা করেন নাই। রাঁচীতেই তাঁহার গল্পের পরিসমাপ্তি। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বসুমতীর 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে'—ছবি, যাঁহাদের রজনী প্রায়ই যায় তাঁহাদেরই এক জনের ছবি—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ও স-শিশু গৃহস্থ-জননীকে চাপা দেওয়ার মত ছবিই বটে। 'উপনিষদের ভূমা' তবু একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছেন। তারপর 'সন্ধি' গল্প, 'বিবর্ত্তন' উপন্যাস। নারীর কর্ত্তব্য'র ভিতর ত্রিবর্ণ নারী 'তন্ময়' হইয়া বসিয়া আছে। কোমরের কাপড় খসিয়া পড়িতেছে তাহাতে হুঁস নাই। কর্ত্তব্য করিতে গেলে হুঁস না থাকিবারই কথা।

সম্পাদকীয়

বঙ্কিমচন্দ্র

সেই নিদারুণ ২৬শে চৈত্রের সায়াহ্ন আসিয়া আবার চলিয়া গেল—বাংলার নব্য-হিন্দুদের প্রথম ঋষি, বাংলার নবযুগমন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা, বাংলার জাতীয় জীবনের প্রথম উদ্বোদ্ধা উনচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ১৩০০ সনের এই ২৬শে চৈত্র তারিখের সায়াহ্নে দেহ-রক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে নবযুগের প্রথম বলিলাম বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, রাজা রামমোহন রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, তিনি যে-তাহার কথা কহিয়াছিলেন তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে নাই; মস্তিষ্কের শুষ্ক গণ্ডীর মধ্যে পাক খাইতে খাইতে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এরূপ হিসাব করিতে গেলে তো প্রাচীন ঋষিরাও আছেন, তাঁহারা খাঁটি দেবভাষায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই কিন্তু নবযুগের নূতন বাণী তাহা নয়।

এই বাণী প্রথম শুনাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শুধু শুনাইলেন নয়—তাঁহার বাণী আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল; মাতৃভাষা শুনিয়া আমরা মাতৃভাষাকে ভালবাসিতে শিখিলাম,—মাকে ভালবাসিতে শিখিলাম, দেশমাতার চরণ-বন্দনা করিয়া বলিলাম—বন্দেমাতরম্।

—নাই লিখিতেন বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, নাই লিখিতেন কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ প্রবন্ধ, মুচিরাম গুড় আর লোকরহস্য; 'আমার দুর্গোৎসবে'র বঙ্কিম, 'একটি গীতে'র কমলাকান্ত বাঁচিয়া থাকুন। যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলার রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসেন, ততদিন পর্য্যন্ত শুনিয়া যাই,—"বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি শ্মশানভূমিপ্রতি চাই। যখন দেখি,·····অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তরতর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি - তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে সে মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়?"

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেন কতলু খাঁর দুর্গে বিমলার মত, ধর্ম্মত্যাগ করিবেন এই প্রলোভন দেখাইয়া দুর্ভেদ্য ইংরেজী-সাহিত্য-দুর্গে প্রবেশ করিয়া বঙ্গভাষা-তিলোত্তমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। বহু দুঃখে গড়িয়া তোলা বলিয়া এই ভাষা আমার দেবতাকে, আমার জাতিকেও একদিন গড়িয়া তুলিবে। বঙ্কিম তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বঙ্কিম অমর।

কমলাকান্ত-বঙ্কিম ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণিয়াছিলেন —সাত শতাব্দীর হিসাব গণিয়াও তিনি কিনারা পান নাই। বহু দুঃখে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক-জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই?" ১৩০০ সন হইতে আমরাও দিন গণিতেছি, উনচল্লিশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া বৎসর গণনা করিয়াছি—আমরা কমলাকান্তের মত প্রশ্ন করিতে ভুলিয়াছি। কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল—দেশমাতা আর জাগিলেন না, মনুষ্যত্ব বুঝি মিলিল না।

কলিকাতায় ৪৭ তম কংগ্রেসের অধিবেশন

বিপ্লব—ইরাজীতে যাহাকে Revolution বলা হয়, তাহা জনমতকে স্বীকার করিয়া অথবা না করিয়া, গোপনে শক্তিসঞ্চয় করিয়া একদিন ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কিন্তু আবর্ত্তন ইংরেজীতে যাহাকে Evolution বলা হয়—তাহা ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর সম্মুখে, অধিকাংশের সম্মতি লইয়া পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয়। Revolutionএর সৃষ্টি হয় গোপনে—Evolutionএর মধ্য দিয়া যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখেই সংঘটিত হয়। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে যে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন—তাহাকে তাঁহারাই Constitutional Reform নাম দিয়াছেন—আমরা তাহার বাঙ্গলা নাম করিয়াছি নিয়মতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার। সকল দেশেই এই নিয়ম-তান্ত্রিক সংস্কার Evolution বা বিবর্ত্তন-পন্থার সাহায্যেই সংঘটিত হয়। এই বিবর্ত্তন-পন্থা যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় যাহাতে জনমত অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথের আশ্রয় না গ্রহণ করে, সেই জন্য প্রত্যেক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে একটা প্রকাশ্য বিপক্ষদলও থাকে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে যে-দল যখন কর্ত্তৃত্ব করে, তাহার বিপক্ষ দলও তখন শাসন-সভায় স্থান পায়। বর্ত্তমান নিয়মতান্ত্রিক শাসন-বিধিতে Oppostion party বা বিপক্ষ দলের একটা অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহারা সত্য সত্য Revolution অর্থাৎ বিপ্লবতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক শাসন-বিধিতে একটি প্রকাশ্য বিপক্ষ দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-সংস্কার স্বীকার করিব, অথচ প্রকাশ্য বিপক্ষ দলের অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, ইহা বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের উল্টা কথা। কলিকাতার ৪৭ তম কংগ্রেসের অধিবেশন এবং তাহাতে ভারত-সরকারের মনোবৃত্তির যে-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্বভাবতই এই কথাগুলি মনে হইতেছে।

যে-দিন প্রথম একজন ইংরাজের প্রেরণায় ভারতবর্ষে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, আর আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কোনও দিন সংগোপন বিপ্লব-পন্থায় আস্থা স্থাপন করে নাই; বরঞ্চ প্রকাশ্যভাবে অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যেক সংগোপন-রাজনৈতিক ক্রিয়ার নিন্দাবাদ করিয়াছে। এই দিক দিয়া কংগ্রেস পুরা Evolution বা বিবর্ত্তনবাদী এবং আজও পর্য্যন্ত যে তাহা নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-বিধির পক্ষপাতী, তাহা গত গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর যোগদানেই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-বিধিতে যেমন একটি বিপক্ষদলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়—ভারতবর্ষে তেমন কংগ্রেস বর্ত্তমান অবস্থায় সেই বিপক্ষ দলের স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে-কোনও রাজনীতির ছাত্র এই দিক দিয়া কংগ্রেসের অস্তিত্ব বে-আইনী বলিতে পারেন না—তাহা হইলে তাঁহাকে নিয়ম-তান্ত্রিক

শাসন-বিধিও অস্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে সরকারী মতও এই উক্তি সমর্থন করে যে, কংগ্রেস অথবা বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, ৪৭তম কংগ্রেস বে-আইনী নয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের উত্তরে সরকারী জবাবে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা গিয়াছিল যে, ৪৭তম কংগ্রেসকে সরকার বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করেন নাই। কোনও নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-বিধি তাহার বিপক্ষ দলকে বে আইনী বলিতে পারেন না।

কিন্তু ৪৭তম কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন কলিকাতায় এবং অন্যান্য যায়গায় যে-সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে যে-কোনও লোকের ধারণা জন্মাইতে পারে যে, সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহাতে কোনও পার্কে সভার অধিবেশন না হইতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ সতর্কতা লইয়া সমস্ত পার্ক প্রবেশ-নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের পথে বন্দী করা হইয়াছিল; নির্দ্ধারিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে আসানসোলে সদলবলে গ্রেপ্তার এবং কারারুদ্ধ রাখা হয়। তবুও চৌরঙ্গীর মোড়ে টাম্রওয়ের যাত্রী-বিশ্রাম-স্থলে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাকে সভাপতি করিয়া ৪৭তম কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া যায়। খবরের কাগজে প্রকাশ যে প্রায় দু'হাজারের উপর প্রতিনিধি সেই সভায় যোগদান করেন। পুলিশ আসিয়া সভানেত্রী এবং অন্যান্য লোককে গ্রেপ্তার করে এবং সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু এইভাবে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ায়, এ কথা আজ বিশেষ করিয়া লোকের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, অগ্নিকে স্বীকার করিব অথচ তাহার তাপকে স্বীকার করিব না, জলকে স্বীকার করিব, অথচ তাহার তরলতাকে স্বীকার করিব না, নিয়ম-তান্ত্রিক শাসন-সংস্কার স্বীকার করিব অথচ প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন স্বীকার করিব না, তাহা কখনই হয় না।

অতি-সতর্কতা না অনাচার ?

কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই—কংগ্রেসের নায়ক বা নেতাগণ তাঁহারা সকলেই প্রকাশ্য এবং অহিংস নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের সংগ্রামের আদর্শ তাঁহারা খৃষ্ট-ধর্ম্মের জনক, জেরুজালেমের ছুতোর [illegible] যীশুর নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন—বলা যাইতে পারে। আঘাত পাইলে, আঘাত করিয়া তাহার প্রতি-বিধান করিতে তাঁহারা চাহেন না। অভিযুক্ত হইয়াও, তাঁহারা নিজেদের দোষক্ষালনের চেষ্টা করেন না। তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং আজ তাঁহারা যে আদর্শ পালনে দণ্ডিত হইতেছেন, জগতের সকল জাতি সেই আদর্শকেই শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে এবং যতদিন জগৎ থাকিবে, ততদিন যীশুর আত্ম-সমর্পণ, অশোকের কল্যাণ-ধর্ম্ম, টলষ্টয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সমগ্র ইংরেজ-জাতির নিয়মতান্ত্রিকতা (মনে হয় এই কয়টি লইয়াই কংগ্রেসের আদর্শ) শ্রদ্ধা করিবে। অথচ যখন আমরা শুনি যে, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)-এর ন্যায় সম্ভ্রান্ত, জ্ঞানে গরিমায়-উন্নত একান্ত অহিংস ব্যক্তিকে কংগ্রেসের সম্পর্কে থাকার দরুণ হাতে হাত-কড়ি দিয়া কারা-গারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে—তখন বিস্মিত হওয়া ব্যতীত আর আমরা কিছুই করিতে পারি না।

কালো কালিতে ছাপান হোয়াইট পেপার

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে বহুবার বহু লিখিত প্রস্তাব আমরা পার্লামেণ্ট হইতে পাইয়াছি—বর্ত্তমান কালে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট আমাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতেই জাগরূক আছে। এই ধরণের আধুনিকতম প্রস্তাব, যাহা টেমস্ নদীর পার হইতে আমরা পাইয়াছি—তাহার নাম, হোয়াইট পেপার। এই হোয়াইট পেপারে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে যে-সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাই যে ভারতে সংঘটিত হইবে—এমন নয়। ভারতবাসী বা কংগ্রেসের হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে কি মনোভাব তাহা না বলিয়া এখানে পার্লামেণ্টের লর্ড সভার সদস্য লর্ড স্নেল যাহা বলিয়াছেন, এবং কমন্স সভার সদস্য মেজর এটলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লর্ড স্নেল বলেন, "ভারতবাসীদিগকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দিবার যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করা হয় নাই। ঐ প্রতিশ্রুত আমাদের অবশ্যই পালন করা কর্ত্তব্য। ক্রুদ্ধ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে আমাদের শুনিতে হইবে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা হইয়াছে, এমন কি বিশ্বাস ভঙ্গও করা হইয়াছে।"

পার্লামেন্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মেজর এটলিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, "ভারতকে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দূরে থাক্, কোন প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগই এই হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবে দেওয়া হয় নাই।"

বৈজ্ঞানিকরা শাদা রঙকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, শাদা রঙকে ভাঙ্গিলে, নানা রকমের অন্য সব রঙ দেখা যায়। হোয়াইট পেপারের "শুভ্রতা" সংজ্ঞার অন্তরালে, মনে হয়, তেমনি বহুরঙ লুকাইয়া আছে।

এভারেষ্টের উপরে

দুর্জ্জয়কে জয় করার সাধনাতেই মানুষ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়—এই দুর্জ্জয়কে জয় করার চেষ্টায় মানুষ কি লাভ করে? শুধু কি অন্তরের তৃপ্তি? শুধু কি জ্ঞান-সাধনার একটা নিষ্ক্রিয় সার্থকতা? জ্ঞানের জন্য জ্ঞান-সাধনার কথা ছাড়িয়া দিলেও—মানুষের এই প্রত্যেক দুর্জ্জয় সাধনা হইতে আমরা আমাদের অধিকাংশ জাগতিক সুবিধা ভোগ করি। স্বভাবতই মনে হইতে পারে, না হয় মানুষ এভারেষ্টের উপরে উঠিল, তাহাতে কি? এভারেষ্টের কথা যখন বলিতেছি—তখন ভূগোলের কথাই ধরা যাক্। যে-লোক শুধু অজানা দেশ ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়া জীবন দিয়া গেল—সে তাহার নিজের অন্তরে কি শান্তি, কি তৃপ্তি, কি গরিমা-বোধ লইয়া গেল, তাহা এখানে বিচার করিতে চাহি না—কিন্তু সে সেই অজানা দেশ দেখিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত খবর দিল বলিয়া—আমরা বাণিজ্য করিবার সুবিধা পাইয়াছি, যুদ্ধ জয় করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছি, খনি হইতে সম্পদ্ খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছি। লিভিংষ্টোন্, মাঙ্গোপার্ক আফ্রিকায় প্রাণ দিয়াছিলেন, তাই সেখানে বৃটিশ-পতাকা আজ উড়িতেছে। এই সমস্ত দুর্জ্জয় সাধনার মধ্যে প্রতিদিনকার জগতের মহা-ভবিতব্যতা সংগোপনে থাকে।

এভারেষ্টের শৃঙ্গে উঠিবার জন্য মানুষ বার বার চেষ্টা করিয়াছে—বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুর্জ্জয়ের সাধনায় এক শ্রেণীর মানুষের কৌতূহলের বিরাম নাই। পায়ে হাঁটিয়া যখন সেখানে পৌছান সম্ভব হইল না, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, এরোপ্লেন করিয়া সেই অনন্ত তুষার-শৃঙ্গ-স্থানের উপরে উঠিবেন। এই ব্যাপারে আমেরিকার ক্যাপটেন বিয়ার্ড মেরু-প্রদেশ পরিভ্রমণে প্রথম পথ দেখান। এরোপ্লেন করিয়া তিনি মেরু-প্রদেশে হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া একটা ২০ হাজার মাইল ব্যাপী নূতন ভূ-খণ্ড চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছেন। স্বদেশের নামে তিনি সেই প্রদেশের নামকরণ করিয়া আসিয়াছেন—লিট্‌ল্ আমেরিকা। তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্লাইডস্‌ডেল, ব্লাকার, ম্যাকইন্‌টায়ার এবং বেনেট এভারেষ্টের উপরে, এরোপ্লেন করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং আজ না হয় কাল, মানুষ এই রহস্যময় দুরধিগম্যতার সকল খবর জগৎকে দিবে। পীড়িত মানবতার কোন্ মহৌষধির খবর তাহার মধ্যে থাকিবে, কে বলিতে পারে!

পরলোকে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড

গত ২রা এপ্রিল ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। লর্ড গোসেনের বাড়ীতে চা-পানে নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা তিনি হৃদপিণ্ডে একটা ব্যথা অনুভব করেন। এবং উহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তৎক্ষণাৎ লেডী চেমস্‌ফোর্ডকে টেলীফোনে ডাকিয়া পাঠান হয়। সেখান হইতে মৃতদেহ অক্সফোর্ডে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৯১৬ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন।

নানা কারণে তাঁহার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে চিরদিন বিজড়িত থাকিবে।

চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

ইহাঁর পরিচয় অনাবশ্যক, সমগ্র পৃথিবীর চিত্রশিল্পী-রণীদের ইনি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কলমে যেমন কবিতা, নন্দলালের পেন্সিলে ও তুলিকায় তেমনই ছবি—অনায়াসে আসে, ভিড় করিয়া আসে, এবং ভিড়ের মধ্যেও মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা নন্দলালবাবুর একটি রঙিন (তথাগত) ও দুইটি রেখাচিত্র (পুরাতন ভারতীয়

চিত্রের অনুকরণে) সন্নিবিষ্ট করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভবিষ্যতে নন্দলালের চিত্রের সঙ্গে চিত্রশিল্পে তাঁহার দান ও তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলায় অবাঙ্গালীর প্রভাব

বাংলাদেশে ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮ তন্মধ্যে ৪,৭১,৩৩,৮৮৮ জনের মাতৃভাষা বাংলা। অবশিষ্ট লোকের কত জনের কোন্ কোন্ ভাষা মাতৃভাষা তাহা নীচের তালিকায় উদ্ধৃত হইল।

হিন্দী ১৮৯১৩৩৭, খেরআরী ৮৭৯৮০৯, ত্রিপুরা ১৯১৭২৫, ওরাওঁ ১৮৫৭৯৭, উড়িয়া ১৫৯৮৫৪, নেপালী ৬৪১৪৭, আরাকানী ৮৬৫৫৪ গারো ৬৮১৯২, মুন্ডা ৬৫৬২০, মণিপুরী ১৯৮৮০, লিম্বু ১৫০১৬ ভুটানী ১৪৪৬৭, মগারী ১২২১৭, বার্মীজ ৮৫০৬, কোচ ৮১৫৯, নেওয়ারী ৭১৯৭, গুজরাটী ৬৫৯৪, মারাঠী ৩:৬১, পাঞ্জাবী ১৪৫৪৫, রাজস্থানী ১৯৫৪৫, তেলেগু ৬৩১২৫, তামিল ৫৮৫৫, ম্রো ৩৭৯৩, কুকী ৩৭৭৮, গুরুং ২৭৫৩, আসামী ২৭৫০, লুশাই ২৫৭৮, পস্তু ৪০৮৪, মালয়ালম ৬০৫, খাসী ৫০১, ক্যানারিজ ১০৯, কাশ্মিরী ৬৩, সিন্ধী ৫০৪, চাইনীজ ৪৬৪৩, আরবী ১৫৪২, পার্শী ১১১৬, আর্মেনিয়ান ৭০০, ইংরাজী ৪৮৯৬২, ফার্সী ২২৯, ইতালীয় ২৮৬, পর্তুগীজ ১৩৮, হিব্রু ১২০৮, স্পেনীশ ৪৬, সুইডীশ ৯, জার্মেনী ৭৪, গ্রীক ৬৮, ডাচ ৬৫, রাশিয়ান ৩৯, জাপানী ৫৪৭, শ্যামীজ ২, সিংহলী ২৫, তুর্কী ৩।

দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া জাতি লইয়া বাংলার প্রকৃত অধিবাসীর সংখ্যা ৪৮০ লক্ষ হইবে। তাহা হইলে ৩০ লক্ষ অবাঙ্গালী বাংলার বাহির হইতে আসিয়া বাংলায় আড্ডা গাড়িয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সহরে, কলকারখানায় এবং খনিসমূহে বাস করে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে হাজারকরা ৮০০ জন সহরে বাস করে। ভারতবর্ষে হাজারকরা ১১০, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ২১১, মান্দ্রাজে ১৩৬, যুক্ত প্রদেশে ১১২ কিন্তু বাংলায় ৭৩ জন সহরে বাস করে। অবাঙ্গালীদিগকে বাদ দিলে সহরবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা আরও কম হইবে। সহরে বাস করার খরচ কিছু বেশী হয়। ৩০ লক্ষ লোকের গড়ে জনপ্রতি মাসিক ১০ টাকা প্রয়োজন হইলে মাসে ৩ কোটী বৎসরে ৩৬ কোটী টাকার প্রয়োজন। যে কোন অবাঙ্গালী বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের কাহারও আয় মাসিক ১০৲ টাকার কম নহে। বাংলায় অবাঙ্গালীদের উপার্জ্জন বৎসরে ১০০ কোটী টাকার কম নহে। মাসে হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন করে এরূপ অবাঙ্গালী ভারতীয়ের সংখ্যা কলিকাতার সহরেই এক হাজারের বেশী। কলিকাতা বাদে বাংলায় আরও এক হাজারের বেশী হইবে। বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করে এরূপ অবাঙ্গালী ভারতীয়ের সংখ্যা একশতেরও বেশী হইবে। বাংলায় আসিয়া অবাঙ্গালী ভারতীয়েরা বৎসরে যত উপার্জ্জন করে, বাংলায় ইংরাজ বণিকের উপার্জ্জন তাহার তুলনায় অতি নগণ্য বলিলেও হয়। কলিকাতা সহরের অধিবাসী অর্দ্ধেক অবাঙ্গালী। এই ৩০ লক্ষ অবাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দী ও খেরআরী ভাষীর সংখ্যা ২৭৭০ হাজার। ১৮৮১ সালে বাংলায় হিন্দী-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ৭৫০৬৮৫ ছিল। কয়েকটি স্থানে কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

	১৮৮১ সালে	১৯৩১ সালে
কলিকাতা	১৩৪৫০৫	৪৩৬১২৩
হাবড়া	২৭৪২৫	১২৯৭০৩
২৪ পরগণা	৪৫৯০৭	২৪২১৩৪
হুগলী	১৩৭৭৭	৯৫৩৬১
বর্দ্ধমান	২০৭৯৫	৯২৫৯৯
দিনাজপুর	২২৩৪৫	৬৭২৬৫
রাজসাহী	১৬৪৬১	৩৩২৬৫
জলপাইগুড়ি	৯৩৯৩	১২০৬৯৯
রংপুর	১১১১০	৫৩৩৬২
বগুড়া	৬৮৫৭	২৫১০৭

১৮৮১ সালে বাঙ্গালীর সংখ্যা বিহারে ৩২৭৬৩৩, ছোটনাগপুরে ৯১৩০৮৬, উড়িষ্যায় ২৮৯৫৩, উড়িয়ার করদ রাজ্যে ১৯৮৩, ছোটনাগপুর করদ রাজ্যে ১৬৪৩০ ছিল। গত ১৯৩১ সালে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪১৯৩৮, ১৩৯৬২৩৪, ৩৫৬২৫, ৪০৪২৬, ৪৫৩৬৪ হইয়াছে। ১৮৮১ সালে গয়া জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ৯৪২ ছিল, ১৯৩১ সালে ৮৪০ হইয়াছে। ১৯০১ সালে বাঙ্গালীর সংখ্যা দ্বারভাঙ্গা জেলায় ১৩২০, চাম্পারণে ৯০৮, শাহাবাদে ১১৪৩, পুরীতে ১০৪২৫, বালেশ্বরে ১৭০৮৫ ছিল, ১৯৩১ সালে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৮১০, ৭৮৩, ৬১৮, ৩৭৫৯, ১৬৯৪৯ হইয়াছে।

বাংলায় শতকরা ৬ জন বাংলার বাহিরের লোক। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে প্রবাসীর সংখ্যা এত বেশী নহে। বাংলায় তামিল তেলেগু ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬৮৯৮০, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৬৭৮ জন মাত্র। বাংলায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা ১৯৫৪৫ জন কিন্তু রাজস্থান ও আজমীড় মাড়োয়ারে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১২৫৩ জন মাত্র। বাংলায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা আরও বেশী হইবে। বহু মাড়োয়ারীর জন্মস্থান এই বঙ্গদেশে, এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় ৩২৯০৬ জনের জন্মস্থান রাজপুতানায়, ৫১৬ জনের জন্ম আজমীড় মাড়োয়ারে। অনেক মাড়োয়ারী হয়ত হিন্দী-ভাষাভাষীর সামীল হইয়াছে।

—শ্রীরামানুজ কর

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পদ্মা

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
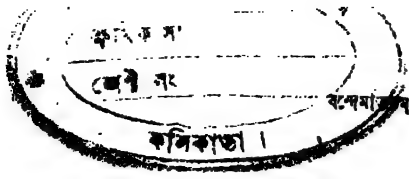
স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে আজ চলিয়াছে দড়ি টানাটানি,
ইহলোকে পরলোকে বাধিয়াছে প্রচণ্ড সংগ্রাম
একটি মানবে ঘিরি। প্রাণ, পণ করিয়াছে প্রাণী,
বিচার চলিছে ঊর্দ্ধে সে প্রাণের কতটুকু দাম।
যুগে যুগে যাহাদের 'জন্ম আর মৃত্যু' ইতিহাস,
কাল-বারিধির তটে যাদের বালুকা-পরিচয়—
এল আর চলে গেল, মুহূর্ত্তের বুদ্বুদ-বিলাস,
তাহারই একটি লাগি মৃত্যুদূত গণিছে সংশয়!
সে কি শুধু দেহসার? দেহহীন আত্মাও সে নহে!
তার পরিচয়—সে যে মানবীর গর্ব্বের সন্তান,
বিশ্বমানবের ধাত্রী ধরা তাই আসন্ন-বিরহে
মুছিছে নয়ন-অশ্রু; নাড়ীতে পড়েছে তার টান।
দেবতা ডাকিছে ঊর্দ্ধে, এস, এস, হে আত্মা মহান,
প্রশান্ত নয়ন মেলি চেয়ে দেখে মানুষের ছেলে—
চলে দড়ি টানাটানি; স্বর্গে মর্ত্ত্যে ঘুচে ব্যবধান,—
ধরা হেসে-কেঁদে কয়, এ আত্মা মাটিতে শুধু মেলে!
মাঝখানে বসে স্তব্ধ ধ্যানরত মহান মানব,
মুখেতে মাখানো তাঁর প্রেম আর বিদায়ের হাসি,
স্বর্গের আহ্বান নাই, থেমেছে আত্মার কলরব,
বলে—যেতে পারিব না, এ ধরারে আমি ভালবাসি।
দেহহীন দেবতারা দেহীরে করেন আশীর্ব্বাদ,
আনন্দে ক্ষরিয়া পড়ে ধরণীর স্তন্যদুগ্ধধারা—
ধরায় রহিল আত্মা, স্বর্গে মর্ত্ত্যে ঘুচিল বিবাদ,
মৃত্যুরে যে নাড়া দেয়, দেহ নয় সে আত্মার কারা।

—— ——

সাহিত্যে অশ্লীলতা

(শেষ অংশ)

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

সাহিত্যিক অশ্লীলতার প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলিতে হইল; তথাপি নানা দিক দিয়া বিচার করিলে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যরসের সম্পর্কে যে প্রশ্নই উঠুক, বিষয়টি খুব গূঢ়-গভীর না হইয়া পারে না; সাহিত্য জীবনের মতই বিস্তৃত অথচ অখণ্ড বলিয়া ইহার একটি মাত্র দিক বা অংশের আলোচনা করিতে হইলেও মূলে বা সমগ্রতায় টান পড়ে। এ জন্য মাত্র অশ্লীলতার কথা বলিতে গিয়া কেবল ভাষার অপরিচ্ছন্নতার বা অলঙ্কারশাস্ত্রোল্লিখিত বিধিনিষেধের আলোচনাতেই তাহা সমাপ্ত হইতে পারে নাই, সেই সঙ্গে অশ্লীলতার মূলে যে কল্পনাভঙ্গি থাকে, কাব্যরস যে বৃহত্তর নীতি বা সত্য-সুন্দরের অনুগত এবং কাব্যের ও তথা জীবনের যে প্রধানতম প্রেরণা নরনারীর প্রেম বা কাম-প্রবৃত্তি ও সেই প্রবৃত্তির আধার যে দেহ, সে সকলের সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ আমি অশ্লীলতার প্রাচীন আলঙ্কারিক অর্থই গ্রহণ করি নাই; আধুনিক রুচিসম্পন্ন রসিকসমাজের দ্বারা ঐ কথাটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি, এই দুইটি অভিযোগ প্রায় একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে আর একবার বলিব। আমরা যে নূতন নৈতিকতার আদর্শ এ যুগে গ্রহণ করিয়াছি তাহার প্রভাবে দেহ অপেক্ষা মানস-অভিমান, হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা অহং-চেতনা, সহজ সরল ভাবগ্রাহিতা অপেক্ষা আত্মাভিমান-প্রণোদিত বিবেকবুদ্ধি অধিকতর উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে যে দেহই নিম্নতম হইতে উচ্চতম জীবসত্তার সহিত পরমসত্তার একমাত্র যোগ-সেতু—সেই দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষের মানসাভিমান 'ব্যক্তি' নামক এক নূতন সত্তাকে আপনার উপরে আরোপ করিয়াছে, তাহার ফলে এমন এক অদ্ভুত নীতি ও সত্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে দেহের কোনও আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা বা রহস্যগভীর চমৎকারিতা আর নাই। এ যুগের এই আধুনিক আদর্শের মূলে যে বিশেষ ধর্ম্মমতের প্রভাব প্রথমে মুখ্যভাবে ও পরে গৌণভাবে কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

*　　*　　*

আধুনিক (অতি-আধুনিকের কথা বলিতেছি না) সাহিত্যে প্রাচীন ধরণের অশ্লীলতার প্রসার আর তেমন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা আছে তাহা অশ্লীলতার মতই দোষাবহ কি না, তাহা কাব্যের বৃহত্তর নীতি বা পরমরসসত্যের ব্যভিচারী কি না, ইহাই অতঃপর একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। তথাকথিত অশ্লীলতাও কবি-কল্পনার গভীরতর ও উদারতর দৃষ্টির বলে রস-হানি না করিয়া রসের পুষ্টি-সাধন করে, গতবারে তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি; আমার বিশ্বাস তাহাতে রসিকজনের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটিবে না। অশ্লীলতার জন্যই যে অশ্লীলতা, তাহাই vulgar; কিন্তু যাহাকে ইংরেজীতে obscene বলে তাহাকে কোনও ক্ষুদ্রতর নীতির বা কেবলমাত্র রুচির খাতিরে কোনও বড় কবিই কাব্যে আমল দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কবি-কল্পনার বিদ্যুতালোকে, মানুষের মহিমময় দেহ-নিয়তির অনুধ্যানে, জীবনরস-রসিকতার অপূর্ব্ব আবেশে কবিগণ দৈবী প্রতিভার গুণে যে পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন, তাহাতে দেহ-আত্মার দ্বৈত-চেতনা থাকে না, দ্বৈতাশ্রয়ী অদ্বৈতই পরমরসরূপে প্রতিভাত হয়। কাম-প্রেমের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মানুষের মনুষ্যত্ব-মহিমার যে চরম বিকাশ যুগে যুগে কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে,—যে-রহস্য মানুষের

জীবনের একমাত্র রস-সত্য তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই দেহই সর্ব্বমূলাধার, সহজ সুস্থ প্রাণ-লীলার আশ্রয়-রূপে দেহই সবচেয়ে বড় reality, ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া বা পাশ কাটাইয়া কোনও সত্যকার সাধনাই সম্ভব নয়। বৈষ্ণব কবিসাধকগণের যে উপলব্ধিকে আমরা গীত-রস রূপে আস্বাদন করি, তাহাতে প্রেম যে গভীর মধুর উৎকণ্ঠায় আধ্যাত্মিকতার কোঠায় পৌছিয়াছে তাহাও মূলে দেহঘটিত, দেহের মৃণ্ময় বেদিকার উপরেই সে প্রেমবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে যে একটি কথা কখনই ভুলিলে চলিবে না তাহা এই যে, কোনও চিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারমূলক নীতিবাদ, কবিকল্পনার আশ্রয় নহে; ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ দুই অর্থেই—দেহ, বা যাহা concrete তাহাই খাঁটি কবি-কল্পনার ধাত্রী এবং ভাবের দেহ-রূপই চিত্ত-চমৎকারের নিদান। অতএব কল্পনার পরিধি যত বড়ই হোক তাহার কেন্দ্রস্থল দেহেরই কোনও না কোনও রূপ এবং কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসপ্রেরণা যে প্রেম তাহাতে মানস-অভিমানপ্রসূত কোনও চিন্তার আদর্শ বা মতবাদের অবকাশ নাই। বরং এই অভিমান সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া দেহের ভিতর দিয়াই অহং-বিস্মৃতির পরম আনন্দলাভ ঘটে—দেহ-আত্মার অভিন্নতাবোধ বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য রসরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য কাব্যে প্রেম-কল্পনার মত রসবস্তু আর কিছুই নাই; সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার অতীত যে ভাবাবস্থা—কাব্য-সৃষ্টির যাহা একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা উৎকৃষ্ট প্রেম-কল্পনাতেই সমধিক সার্থকতা লাভ করে।

* * *

কিন্তু আধুনিকের সাহিত্য-রুচি এই রসের আদর্শ মানে না; নরনারীর প্রেম-লীলায় দেহ-আত্মার রহস্যময় অদ্বৈত-সিদ্ধি, আত্মবিলোপ বা আত্মদান—প্রাচীন বা মধ্যযুগের একটা কুসংস্কার বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। যাহা মাত্র ধ্যান বা অতি-গভীর অনুভূতি-গোচর, যাহাকে যুক্তিবিচারের আঁকুশী দ্বারা করতলগত করা যায় না, যাহা জ্ঞানগম্য নয় বরং দুর্জ্ঞেয়, যাহাকে ভাব-চৈতন্যের গভীর গহনে অপরোক্ষ করা সম্ভব, বুদ্ধির দ্বারা পরোক্ষভাবে জানা যায় না—এমন সকল ব্যাপারে বিশ্বাস করা অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-মনের ব্যামোহ মাত্র। তাই আধুনিক সাহিত্যে রসের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক জীবনযাত্রার লাভ ক্ষতি বা প্রয়োজনের নীতি, সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির দ্বন্দ্বে, অথবা নারী ও পুরুষের স্ব স্ব অধিকারনির্ণয়ে, নানাবিধ তথ্যলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের আদর্শই বরণীয় হইয়াছে। ইহার নামই আধুনিকতা—মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের উপরে জাগ্রত মনোবুদ্ধির জয়-ঘোষণা। এ নীতি সৃষ্টির অসীম রসরহস্যকে স্বীকার করে না—অহংকার-মদমত্ত মানুষের জ্ঞানবৃত্তি নিজের দেহসত্তাকেও অস্বীকার করিয়া অতি-সঙ্কীর্ণ মানস-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। এককালে মানুষ নিজ দেহভাণ্ডেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আভাস পাইয়া প্রজ্ঞাপারমিতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, এখন তাহা বর্ব্বরোচিত জাড্যের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মনোবুদ্ধির অগোচর বলিয়া কোনো-কিছুকে শ্রদ্ধা করিবার প্রয়োজন আর নাই; যুক্তিপ্রমাণ ও ব্যক্তির স্বার্থ-প্রয়োজনের অনুগত না হইলে, কিছুরই আর কোনো মূল্য নাই। এক কথায় অ-সীমার রস-রহস্যে আত্ম-সমর্পণ করার যে আধ্যাত্মিক আনন্দ, বৃহৎকে বরণ করিয়া ক্ষুদ্রের যে আত্ম-চরিতার্থতা, মানুষের হৃদয়-মনেরও অগোচরে আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা আত্মোপলব্ধির যে সাত্বিক আকাঙ্ক্ষা—যাহাকে spirituality বলে, আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সে সম্বন্ধে নাস্তিক, সেই নাস্তিকতাই তাহার গর্ব্বের বস্তু। তাই কাব্য-রসের আদর্শও যেমন, প্রেমের আদর্শও তেমনই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ব্যক্তির স্বাধিকার-বাদ কবি-কল্পনাকেও অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন প্রেমের কাব্যে যে মর্ম্মান্তস্পর্শী ট্র্যাজেডি—কাম-প্রেম, দেহ-আত্মার যে অদ্বৈতরস-পরিণাম মানুষের মহিমাকে দেবত্বেরও উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিতে পাই, আধুনিক প্রেমের চিত্রে সে অনির্ব্বচনীয়তা আর নাই—আছে ব্যক্তি-স্বার্থপ্রণোদিত অতি-সংকীর্ণ বিবেক-বুদ্ধির জয়োল্লাস। সামাজিক বা পারিবারিক চরিত্র-নীতির হিসাবে যাহা কল্যাণপ্রসূ বলিয়াও বরণীয় হইতে পারে, উৎকৃষ্ট রসের আদর্শে তাহা যে হীন ও হেয় হওয়া সম্ভব, সে সংস্কার একালে লোপ পাইয়াছে। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যে সম্বন্ধ তাহা যে এইরূপ বাস্তব সমস্যাঘটিত নহে,—সাহিত্যে, আমরা জীবনের একটি অখণ্ড, রহস্যময় সমগ্রতার আভাস পাই বলিয়া তাহাকে একটি স্বতন্ত্র অপরোক্ষ জ্ঞানযোগ বলিয়া আদর করিয়া থাকি, কবিকল্পনা যে বাস্তব-বিশ্লেষণমূলক একটি বিচার-বৃত্তি নয়, এ কথা আজিকার দিনের রসিক-সমাজও বিস্মৃত হইয়াছে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

* * *

আমি প্রথমেই এমন একখানি আধুনিক সাহিত্য-রচনার দৃষ্টান্ত দিব, যাহাতে চরিত্র-নীতির আদর্শই রসের আদর্শকে বহুদূরে হঠাইয়া দিয়াছে। বইখানি ইবসেন-রচিত A Doll's House, ইহাকে আধুনিক রুচি ও রস-পিপাসার একখানি বাইবেল বলা যাইতে পারে। এই চুটকী নাটকখানিতে মানুষের জীবনের যে আদর্শ নিপুণ রচনাকৌশলে উপস্থাপিত হইয়াছে, সামাজিক প্রয়োজনের দিক দিয়া হয়ত তাহা অনুচিত নহে। আমাদের দেশে নীলকরের অত্যাচার-দূরীকরণপক্ষে নীল-দর্পণ নাটকের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, আধুনিক জীবনের দুর্দ্দশা-দূরীকরণে নৈতিক ন্যায়ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে, এ নাটকও হয়ত ততখানি বা তাহার বেশি সহায়তা করিবে। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকে এমন রচনা-নৈপুণ্য না থাকিলেও, নাটক হিসাবে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, তাহাতে মানব-চরিত্র-রসের অভাব নাই; ইবসেনের নাটকখানিতে কুত্রাপি সে রসের বালাই নাই, ইহার যাহা কিছু রস তাহা অতি রুক্ষ চরিত্র-নীতির উৎসাহে নিঃশেষ হইয়াছে।

* * *

এই নাটিকার নাট্যকার একটি দম্পতীজীবনের চিত্র দিয়াছেন—কিন্তু নারী ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের রস-কল্পনা এ নাটকে বর্জ্জিত হইয়াছে। দুই জন ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষ ভাবে একত্র বাস করিলেও তাহাদের মধ্যে সত্যকার প্রেম নাই—প্রেমে ফাঁকি আছে, ইহাই দেখাইবার জন্য তিনি একটি ভক্তি প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন; তাহাতে নাটকখানি বিয়োগান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু রসের দিক দিয়া যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই, ট্র্যাজেডি না হইয়া, ট্র্যাজি-কমেডিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেম না থাকিতে পারে, এরূপ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতে হইলে সেই প্রেমহীনতার মধ্যেও পাত্র-পাত্রীর হৃদয়-গৌরব অক্ষুণ্ন থাকা দরকার, নতুবা পাঠক বা দর্শকের চিত্তের সুগভীর রস-সংবেদনার অবকাশ ঘটে না। যে দাম্পত্য-জীবনে কোনো পক্ষেই প্রেম নাই—সে দাম্পত্যকে কঠিন তিরস্কার বা বিদ্রূপ করিবার জন্যই যদি সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হয় তবে তাহাতে প্রেমকে ব্যঙ্গ করাই হয়, কোনও বৃহত্তর প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্য রস-সত্য বা খাঁটি কাব্যের আদর্শ অনুসারে এরূপ রচনা একরূপ দুর্নীতিগ্রস্ত। অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, আত্মাভিমানী যে নারীকে লেখক, আদর্শ দাম্পত্যের উপযুক্ত, অথচ বিড়ম্বিত নায়িকারূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সে নিজেও কখনও ভালবাসে নাই; স্বামীর ভালবাসার মধ্যে দুর্ব্বলতার ফাঁকি ছিল; তাহার নিজের ভালবাসাতেও প্রবল আত্মনিষ্ঠার ফাঁকি ছিল। কারণ, কেবলমাত্র অত্যুচ্চ কবি-কল্পনাতেই নহে—বাস্তব জীবনেও ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তবে রাজসংসারে হোক আর দীনহীন দরিদ্র পরিবারেই হোক, আত্মদান ও আত্ম-বিস্মৃতির মহিমাতেই তাহা অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। Doll's Houseএর নোরা যে জাতের মানুষ তাহার পক্ষে কাম-প্রেমের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকল অবস্থাতেই ব্যর্থ হইবার কথা; তাহার দেহে ও-বস্তুর সাড়া কখনও জাগিতে পারে না। নতুবা যে স্বামীর সঙ্গে সে এতকাল ঘর করিয়াছে, যাহার এতগুলি সন্তানের সে জননী হইয়াছে, সে-স্বামীর প্রেমে দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করিয়া তাহাকে এমন করিয়া এক কথায় ত্যাগ করিল কেমন করিয়া? ত্যাগ করা কি এতই সহজ? জীবনের দারুণতম ট্র্যাজেডির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কি এতই সুসাধ্য? যাহাকে ভালবাসিয়াছি তাহাকে কিছুতেই, কোনও কারণে, ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়াই ত' মানুষের জীবন দুঃখে-শোকে, পাপে-তাপে এত মহীয়ান! কপালকুণ্ডলার স্নেহ সম্বন্ধে সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে শ্মশান-ভূমিতে বলিরূপে আগাইয়া দিতে আসিয়া, নবকুমার সেই প্রেমহীনা অথচ করুণাময়ী পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিল, সমগ্র উপন্যাসখানির ট্র্যাজেডি তাহাতেই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে; যুগল জীবনের যে চিরন্তন হাহাকার সাহিত্যের আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কবিকল্পনার একটা বিশেষ প্রেরণা হইয়া আছে, সেই হাহাকারের আর্ত্তরব সেখানে কি অপূর্ব্ব রস-ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়াছে! কেবল কাব্যে নয়, জীবনেও ইহা অহরহ ঘটিতেছে; সংসার-শ্মশানে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড দীর্ণবিদীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কত পুরুষ ও নারী সে জ্বালা হাসিমুখে সহ্য করিতেছে। যেখানে প্রেম নাই সেখানে সৃষ্টি অন্ধকার; আবার যেখানে প্রেম আছে, সেখানে দুঃখেরও অবধি নাই। সত্যকার প্রেম অন্যোন্যসাপেক্ষ নয়, যুগল প্রেমই প্রেমের পূর্ণরূপ বটে, কিন্তু যুগলের একের মধ্যেও যদি

সত্যকার প্রেম জাগে, তবে অপরেও তাহার infection হইতে রক্ষা পায় না—পাপিষ্ঠও তরিয়া যায়। ইবসেনের নাটকে এই প্রেমকে লইয়া শুধু নায়কই পুতুল-খেলা করে নাই, নায়িকাও করিয়াছে, বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দম্ভে সে প্রেমকে পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে।

* * *

এইবার বইখানির ভিতরকার দুই একটি কথা উদ্ধৃত করি। নায়িকা নোরার যখন প্রেম-মোহ ভঙ্গ হইল, তখন স্বামী তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে—"Have you not been happy here ?", নোরা বলিতেছে—"No, never. I thought I was, but I never was." স্বামী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"Not—not happy !"—দুর্ভাগ্য স্বামী! মোহভঙ্গে তাহারও কি অবস্থা! নোরা ঠিক কথাই বলিয়াছে, সে ত' কখনও ভালবাসে নাই—সুখী হইবে কেমন করিয়া? অবশে সুখী হইবার যাদুমন্ত্র যে তাহার আয়ত্ত নহে; অহেতুকী প্রীতি তাহার হৃদয়ে কখনও বাস করে নাই। সুখী হইয়াও সে সুখী হয় নাই; কারণ, সুখের হেতু সম্বন্ধে সে কখনও নিঃসংশয় হইতে পারে নাই; তাই সুখী না হইয়াও সুখের ছল করিয়াছে, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিয়াছে! এই নারীই আবার স্বামীর অপ্রেমের মিথ্যাচারে নিজেকে অপমানিত মনে করে! সমগ্র নাটকখানির পরিকল্পনায় যে অতি-সংকীর্ণ সমাজ-দ্রোহমূলক আদর্শ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই সর্ব্বশেষে অতি কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—নোরারূপিণী একটি আধুনিক মানবিকার মুখ দিয়া কয়েকটি প্রেমহীন, লজ্জাহীন, ধর্ম্মহীন কথা শুনাইবার জন্যই লেখক এতক্ষণ পাঠকের মনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন – তাহার চরিত্রে একটা স্বাকামীপূর্ণ মাধুর্য্য এবং সেবা ও স্নেহশীলতার মাত্রা বাড়াইয়া তাহাকে সহানুভূতির যোগ্য করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু শেষে নোরার যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পুষ্প হইতে সাপের আবির্ভাবের মত; মনে হয় তাহার পূর্ব্বমূর্ত্তি যেন একটা অতি সুনিপুণ ছদ্মবেশ। গৃহত্যাগকালে নোরার শেষ স্বামী-সম্ভাষণ এইরূপ :—

Helmer (স্বামী)—Before all else you are wife and a mother. (স্বামী এখানে দুষ্ট সমাজের প্রতিনিধি)

Nora—That I no longer believe. I believe that before all else I am a human being. Just as much as you are—or, at least I should try to become one. I know that most people agree with you, Torvald, and that they say so in books. But henceforth I can't be satisfied with what most people say, and what is in books. I must think for myself and try to get clear about them.

অন্যত্র নোরা বলিতেছে—

"...But now I shall try to learn I must make up my mind which is right—society or I."

আর অধিক উদ্ধৃত করিতে হইবে না; ইহাই আমার আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট। এ বিদ্রোহ সমাজ ও প্রকৃতি দুয়েরই বিরুদ্ধে। প্রেম সম্বন্ধে নোরার অর্থাৎ লেখকের কিছুই বলিবার নাই; আধুনিক লেখকের আধুনিক আদর্শে নারী পুরুষের সে সম্পর্ক যুক্তিসহ নহে; কাম-প্রেম, দেহ-আত্মা—এক কথায়, দেহ ও সৃষ্টির রহস্য ইহাদের কল্পনার বাহিরে, ভাবনারও অযোগ্য।

* * *

আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ এই নাটকে জীবনের যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কর্ত্তব্য নাই, মাতৃধর্ম্মও নাই—মর্ম্মান্তদাহী বেদনার আধ্যাত্মিক তপশ্চরণ নাই, প্রাণের গভীরতম উৎকণ্ঠার—ক্রুশবিদ্ধ দেহের—অপূর্ব্ব Passion নাই। ইহাতে আছে দুইটি অতি ক্ষুদ্রপ্রকৃতি নরনারীর দাম্পত্য-অভিনয়ের কাহিনী; পুরুষটি কৃপণ-হৃদয়, নীতি-তান্ত্রিক; মেয়েটি একটি স্বাতন্ত্র্যবাদিনী বীরাঙ্গনা—যেমন দেবা, তেমনই দেবী। কাব্যরস হিসাবে এই নাটকখানির ট্র্যাজেডি যে কি পরিমাণ উপভোগ্য – নোরার গৃহত্যাগে তাহার স্বামীর "সেই অনাথের মত করুণ অবস্থা" যে কতখানি হৃদয়বিদারক তাহা সহজেই অনুমানযোগ্য; ট্র্যাজেডির নামে এমন কমেডি দুর্লভ।

* * *

বলা বাহুল্য, আমি এই নাটকখানির যে মূল্যবিচার করিয়াছি তাহা সাহিত্য বা কাব্যহিসাবেই;—জীবনের যে রূপ কবির কল্পনায় কাব্যরূপ পরিগ্রহ করে, এই কাব্যে জীবনের তথা মানব-চরিত্রের সেই পূর্ণতর, গভীরতর ও সুন্দরতর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে কিনা, আমি তাহাই অনুসন্ধান করিয়াছি। আধুনিক বলিয়াই কোনও সাহিত্য পৃথক মর্য্যাদা পাইতে

পারে না; কাব্যকলা বা কাব্যরূপের আদর্শ যুগবিশেষে যতই বিভিন্ন হউক, কাব্যরস মানুষের শাশ্বত হৃদয়-রহস্যের মতই, মূলে চিরদিন এক লক্ষণাক্রান্ত—তাহার স্বাদ-গন্ধ যত বিচিত্র হউক, প্রমাণ সেই এক লক্ষণে। Doll's House-এর লেখক কাব্যে বাস্তব সমস্যার অজুহাতে যে নূতন ন্যায়নীতির ঘোষণা করিয়াছেন, বাহতঃ তাহা সমাজ-বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা বৃহত্তর ও মহত্তর নীতির বিরুদ্ধে আক্রোশ। মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যবাদ বা egoismই চরমতম দুর্নীতি, কাম-প্রেমের দুর্নীতি তাহার তুলনায় সহস্র গুণ নির্দ্দোষ। কারণ ইহা নিছক আত্ম-প্রতিষ্ঠার নীতি—ইহা মানুষের পশু-ধর্ম্ম,—জীবমাত্রেরই আত্মরক্ষণ-ধর্ম্মের একটা সজ্ঞান ও সূক্ষ্মতর সংস্করণ। কিন্তু মানুষ পশু নয়, মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা যে আত্মলাভ—তাহা এইরূপ আত্মাভিমানমূলক স্বার্থ বা স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা নয়। মানুষ যখন তাহার মানবীয় মনোবৃত্তির দ্বারা এইরূপ পশুধর্ম্মকে শোধন করিয়া, সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত করিয়া, নিজ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে—তখন সে তাহার স্বভাবসম্মত উচ্চাধিকারকে খর্ব্ব করে বলিয়াই দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়। ইবসেনের আদর্শ-নারী যখন সদম্ভে বলিয়া উঠে—"I believe that before all else I am a human being," তখন এই 'human being' বলিতে যাহা বুঝি তাহা আর কিছুই নহে,—জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মসচেতন, দ্বিপদ ও উর্দ্ধশির পশু মাত্র; পশুরই মত তাহার ক্ষুধা ও আত্মরক্ষণ-ধর্ম্ম মাত্র আছে; তফাৎ এই যে, পশু যাহা অন্ধ সংস্কারবশে করিয়া থাকে, এই নর-পশু তাহা বুদ্ধি ও যুক্তিশক্তির সাহায্যে আরও পরিপাটীরূপে সাধন করিতে চায়। মানুষ যে শেষ পর্য্যন্ত উন্নত পশু মাত্র, ইহা বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে; কিন্তু জীবনে ও কাব্যে আমরা মানুষের মহত্তর মূর্ত্তি দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। মানুষের প্রকৃতি জড়-বিজ্ঞান, গণিত বা যুক্তি-শাস্ত্র—এমন কি মনোবিজ্ঞানের দ্বারাও নিরূপিত হইবার নহে। ছোট বড় যত নরদেবতা এই পৃথিবীতে নিরন্তর আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ন্যায়-শাস্ত্র বা গণিতশাস্ত্র অনুসারে জীবন যাপন করেন না—সকল হিসাব সকল দেনাপাওনার বিসংবাদ উড়াইয়া দিয়া, তাঁহারা যে-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশে জীবনকে চিরসুন্দর ও মনুষ্যত্বকে অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রেম,—দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইয়া লইবার দুর্দ্দম প্রবৃত্তি নয়, সমানাধিকার আদায় করিবার দুর্দ্ধর্ষ সংকল্প নয়, জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অপরের সঙ্গে আইন-সঙ্গত ভাবে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য বিচারবুদ্ধির আদালতে ওকালতির প্রতিভাও নয়। বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে, যে নীতি বা আদর্শ অপরিহার্য্য—ব্যক্তির সহিত ব্যক্তি, সমাজের সহিত সমাজ ও জাতির সহিত জাতির সংঘর্ষে যে নীতি সত্য ও ন্যায়ের নীতি বলিয়া আদরণীয় ও আচরণীয়, কাব্যের শাশ্বত রস-সত্যের ক্ষেত্রে—চিরন্তন সৃষ্টি ও চিরন্তন মানবের কাহিনী-কল্পনায় তাহা নিতান্তই অসত্য বলিয়া অশ্লীল অর্থাৎ অসুন্দর।

* * *

কারণ, জীবনের সমস্যা সমাধান, শ্রম ধর্ম্ম, বা লালসার লাগাক্লেদের মূল্যবিচার সাহিত্যের কাজ নয়। সাহিত্য জীবনকে বর্জ্জন করে না সত্য, কিন্তু গভীরভাবে গ্রহণ করে। কাব্যলোক ও বাস্তব জীবন-ক্ষেত্র কখনও এক নহে; কাব্য যদি বাস্তব জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র হইত তবে কাব্যের অস্তিত্বই ঘটিত না। জীবনকে যদি বলা যায় experience, তবে কাব্যের নাম perfection of experience. রসবোধ-সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই তাহার গভীরতর চৈতন্যের স্ফুরণ-মুহূর্ত্তে এই—perfection of experience লাভ করে; তাই কাব্যে যাহা পাই তাহাতে অন্তরের অন্তরতম অনুভূতি সাড়া দেয়, সুস্থ সবল প্রাণবান মানুষ যেন তাহার সমগ্র সত্তার দ্বারা এই পূর্ণ সত্যের সৌন্দর্য্যকে সাক্ষাৎকার ও সমর্থন করে। এ রসবোধ যাহার জন্মে নাই, সে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি বিকলাঙ্গ, সে পুণ্যহীন, "পুণ্যবন্তঃ প্রমিধন্তি যোগিবৎ রসসন্ততিং"। অতিকর্ষিত মনো-বৃত্তির বশে আধুনিক মানুষ এই রসবোধে বঞ্চিত হইয়াছে; যাহাকে সে মনুষ্যত্বের গৌরবময় পরিণতি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে অতিপক্ক ফলের অন্তিম পচন-অবস্থা। "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন" তাহার মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। আসন্ন বিনাশের কালে মুমূর্ষু দেহে মানস-পিশাচের উপদ্রব বাড়িয়াছে। Doll's Houseএর মত সাহিত্য সৃষ্টি, ও সে সাহিত্যের রস-সাফল্য আধুনিক যুগে মনুষ্যত্বের সেই দুর্গতি সূচনা করিতেছে।

* * *

এতক্ষণ যে বইখানির সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহাতে তথাকথিত অশ্লীলতার লেশমাত্র নাই, কারণ ইহাতে দেহের স্থান অতি অল্প—যৌন সম্বন্ধ বা দেহঘটিত যে অশ্লীলতা তাহার অবকাশই ইহাতে নাই, ইহা এমনই মনঃপ্রধান। এইবার অপর একখানি কাব্য লইয়া আলোচনা করিব, তাহাতেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাইবে। এখানিও আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যমণি—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'! ইহাতে, নারী পুরুষের যৌন-সম্বন্ধঘটিত ব্যভিচার এবং উৎকৃষ্ট রস-সত্যের বিরোধিতা—এই উভয়বিধ দুর্নীতিই লক্ষিত হয় বলিয়া আমাকে একটু বিস্তারিত আলোচনাই করিতে হইবে; নতুবা বহু ভক্তের মনঃপীড়া ঘটাইয়া পাপসঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল না।

*　　　*　　　*

'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ নূতন নহে: স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক সময়ে এই লইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদেশী সমালোচক, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ-ভক্ত টমসন সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে এই অশ্লীলতার অভিযোগ সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই, কতকটা স্বীকার করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। আমি ঠিক এই ধরণের অভিযোগ সমর্থন করি না; 'চিত্রাঙ্গদা'র যাহা প্রধান দোষ তাহা অশ্লীলতা নয়, দুর্নীতি; তাহাতে ভাষাগত অশ্লীলতা ত নাই-ই, অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে ধরণের দুর্নীতি এ কাব্যের প্রধান দোষ, তাহা কল্পনাবস্তু ও কল্পনাভঙ্গিতেই প্রকট হইয়াছে। আমি যে দুর্নীতির কথা বলিতেছি তাহা নীতিবাগীশের দুর্নীতি নহে; কবির কল্পনায় যে ভাব-বঞ্চনা রহিয়াছে, সৃষ্টির সত্যকে উপেক্ষা করিয়া একটা অযথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা উহাতে লক্ষিত হয়—এ কাব্যের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির মূল কারণ তাহাই; ইতিপূর্ব্বে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

*　　　*　　　*

'চিত্রাঙ্গদা' রচনায় কবির প্রথম প্রমাদ এই যে, ইহার কাব্যরীতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য নাই; 'চিত্রাঙ্গদা'র কবিত্বের মাত্রা যত অধিক ততই তাহা বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্যহীন। প্রেম বা সৌন্দর্য্যের স্তুতি এ কাব্যের অভিপ্রায় নয়। নারী-পুরুষের মিলনে যৌন আকর্ষণের সীমা, এবং দাম্পত্যজীবনে নারীর পদমর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই এ কাব্যের স্পষ্ট উদ্দেশ্য। ইবসেনের Doll's Houseএ যে সমস্যার অবতারণা আছে, এখানেও কতকটা সেই সমস্যা আছে; কিন্তু গীতিকাব্য-কল্পনার অত্যধিক আগ্রহে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অতিশয় অবাস্তব অসত্য কল্পনা, ও অসঙ্গত নাট্যকৌশলের দোষে রঙ্গীন জলবিম্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উপমাটা বোধ হয় ঠিক হইল না, জলবিম্বেরও একটা সঙ্গতি-সুষমা আছে—ইহাতে রং প্রচুর আছে, কিন্তু সেই সঙ্গতি-সুষমা নাই। তেলে ও জলে যে সম্পর্ক—কোনও নীতি বা তত্ত্বঘটিত বিষয় ও এইরূপ কাব্যভঙ্গির সম্পর্কও তদ্রূপ। যে-কাব্যে প্রেমের উপরে স্বাতন্ত্র্যনীতি, সৌন্দর্য্যের উপরে সামাজিক প্রয়োজনকে জয়যুক্ত করার অভিপ্রায় আছে, তাহাতে এত অধিক গীতি-কল্পনার উচ্ছ্বাস কেন? তাই, ইহার কাব্য অংশ ও সমস্যা অংশ একত্রে এমন অসংলগ্ন ও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে।

*　　　*　　　*

সমস্যা বা তত্ত্বের দিকটাই আগে ধরা যাক, কাব্যের দিকটা পরে আলোচনা করিব। নরনারীর যৌন-সমস্যাঘটিত একটা আদর্শনির্ণয়ের জন্য এ কাব্যে, পুরুষ ও নারী-চরিত্রের মূল তত্ত্ব, বা সৃষ্টির অন্তর্গত আদি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে; সেজন্য নায়িকা চিত্রাঙ্গদা ও নায়ক অর্জ্জুন, কেহই কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা individual না হইয়া, এমন কি, কোনও type বা বিশেষ ধরণের চরিত্র না হইয়া—একজন নারী-সামান্যের ও অপরটি পুরুষ-সামান্যের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে। কাব্যবিশেষের কল্পনায়, particularএর পরিবর্ত্তে এইরূপ universalএর রস-প্রেরণা অসঙ্গত নয়। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা কাব্যের নারী ও পুরুষ চরিত্রে স্বভাবসিদ্ধ নারীত্ব বা পুরুষত্বের লক্ষণ নাই। তা' ছাড়া, কাহিনীর প্রারম্ভে চিত্রাঙ্গদার যে বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ অবস্থার বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হইবে কবির কল্পনা individualকে লইয়াই অগ্রসর হইতে চায়—একটি বিশেষ ঘটনাসংস্থানে একটি বিশেষ চরিত্রের নাটকীয় বিকাশই যেন তাহার লক্ষ্য। কিন্তু আমরা যতই অগ্রসর হই, চিত্রাঙ্গদার মুখে যে সকল বক্তৃতা ও তত্ত্বকথা শুনি, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, সমগ্র নারী-জাতির প্রতিনিধিরূপেই সে একটা আদর্শকে জাহির করি-

তেছে। তাহার নিজ মুখে নিজের প্রথম পরিচয় অনুসারে সে কিন্তু তাহা নহে। সে পরিচয় এইরূপ। দেব উমাপতি বর দিয়াছিলেন, তাহার পিতৃবংশে কন্যা জন্মিবে না—

আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্ব্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনই কঠিন নারী আমি।

অন্যত্র—

নারী হ'য়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর।

তাহার দেহেও নারীসুলভ লাবণ্য বা কোমলতা নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, চিত্রাঙ্গদা নারী হিসাবে একটা **freak of nature**। তাই যে পুরুষকে দেখিয়া তাহার কামনার উদ্রেক হইয়াছে সে পুরুষের মধ্যেও পৌরুষের পরিচয় নাই; এ অর্জ্জুন কিম্বদন্তীপ্রসিদ্ধ বীর বটে, কিন্তু এ কাব্যে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় বীররূপে নয়—সৌন্দর্য্য-লালসা-হত, অতি দুর্ব্বল **effeminate** পুরুষরূপে। এক কথায় এ কাব্যে নারীই পুরুষ এবং পুরুষই নারী। এই রূপ পুরুষ-প্রাণ নারী ও নারীস্বভাব পুরুষ অঙ্কিত করিবার অধিকার অবশ্যই কবির আছে, কিন্তু এই চিত্র ও এই কাহিনীকে সৃষ্টির নিয়ম-নীতির সঙ্গে জড়াইতে গিয়া তাঁহার কল্পনা সত্যভ্রষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পুরুষ ও নারীকে দিয়া যৌন-সমস্যার সমাধান, বা সামাজিক আদর্শের স্থাপনা কোনটাই হইতে পারে না। এ কাব্যের নায়িকা যেমন **individual** হইলেও **normal** নহে, তেমনই সে **type**ও নয়, চিরন্তন নারীও নয়। ইহার নায়কও সুস্থ সবল পুরুষ নহে। এ কাব্যের সকল দোষের মূল—কল্পনার এই সত্যভ্রষ্টতা।

* * *

সমস্যা-সমাধান বা তত্ত্বের দিক দিয়া আর একটি বাধা—নাটকীয় ঘটনার অস্বাভাবিকতা। অর্জ্জুনের দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য বা উপবাসের পর সম্ভোগ-তৃষ্ণা প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু রূপই যে আকর্ষণের একমাত্র হেতু, সেই আকর্ষণ শেষে এমন আকস্মিক ভাবে, যেন মন্ত্রবলে, অতি গভীর প্রেমে পরিণত হয় কি করিয়া? এরূপ অবস্থায় ভোগের পর বিতৃষ্ণাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, আমরা জানি, প্রেম ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই উদ্দীপিত হয়; বিশ্বপ্রেমের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এ জাতীয় প্রেমের প্রধান আশ্রয় ব্যক্তি-বিশেষ। এই 'ব্যক্তি' একটা দেহ-নিরপেক্ষ **abstract** সত্তা নহে। তবেই প্রশ্ন উঠে, যে-চিত্রাঙ্গদার রূপে প্রথমে অর্জ্জুনের দেহের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, এবং যে-চিত্রাঙ্গদার গুণে শেষে তাহার আত্মার ক্ষুধা মিটিল—এই দুই চিত্রাঙ্গদা কি এক ব্যক্তি?—দেহে ত' এক নয়! বরং এত বিপরীত যে এক জনকে আর একজন বলিয়া চিনিয়া লওয়াই দুঃসাধ্য। চিত্রাঙ্গদা যখন স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্যের অবসানে তাহার মুখাবগুণ্ঠন মোচন করিল, তখন অর্জ্জুন, শুধুই কুৎসিত নয়—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীকে দেখিয়া অপ্রতিভ ও সন্ত্রস্ত হইল না? এই সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তিধারিণীকে তৎক্ষণাৎ সে গভীর প্রেমের চক্ষে দেখিল কি করিয়া? এ যেন এক নারীকে ত্যাগ করিয়া আর এক নারীতে আসক্ত হওয়া। তাহা হইলে, সম্ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য এক নারী, এবং সেই তৃষ্ণার অবসানে ধর্ম্মচর্য্যার জন্য আর এক নারীর ব্যবস্থাই সমীচীন? দেহ যখন এক নয়, (দেহ এক হইবার প্রয়োজনও নাই, কারণ, এ কাব্যে দেহের স্বতন্ত্র মূল্য নাই) তখন ব্যক্তিও এক হইতে পারে না। যৌবনের অবিমৃষ্য-কারিতার পরে অনেকেই এমন গৃহধর্ম্মচারী হয়; কবি কি সেইরূপ আচরণ স্বাভাবিক বলিয়া তাহার সমর্থন করিতেছেন? তাহাও না হয় মানিলাম; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমসঞ্চারের পক্ষে নারীপুরুষের যৌন-মিলনের আবশ্যকতা আর থাকে না; যৌন-পিপাসা মিটাইল একজন, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিল আর একজন—জীবনের সত্য ইহা নয়, ইহা সৃষ্টি-নিয়মের বহির্ভূত। দেহ ও দেহের রূপকে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এই অসঙ্গতি কতকটা দূর হয় বটে, কিন্তু তাহাও তত্ত্ব হিসাবে মানিয়া লওয়া দুষ্কর; তা ছাড়া, এ কাব্যে দেহ ও রূপ একাকার হইয়া আছে, নায়িকার অবস্থা-সঙ্কটের কারণ তাহাই। চিত্রাঙ্গদার মুখে কবি যতই উৎকৃষ্ট নীতি ও সুন্দর **sentiment** সন্নিবিষ্ট করুন না কেন, জীবনের কোনও বড় সমস্যার অন্ধকারকে যদি রস-সত্যের আলোকে দূর করিতে হয়, তবে তাহা এইরূপ একান্ত বাস্তব-বিমুখ কল্পনার সাহায্যে করা সম্ভব নয়; কারণ, যে-কল্পনা কবির একটা মনোগত **idea** মাত্র, তাহা সত্যকার কবিদৃষ্টির মত সুন্দরের দ্বারা অসুন্দরকে জয় করিতে পারে না। কবির

নির্ম্মাণ-কৌশল যতই অনবদ্য হউক, মিথ্যা কখনও সুন্দর হইতে পারে না।

* * *

অর্জ্জুন নিজে বীর আদর্শ পুরুষ; আদর্শ পুরুষ আদর্শ-নারীকেই কামনা করে, tomboy বা 'মদ্দ-মেয়ে'র প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এরূপ পুরুষ শক্তির পূজা অবশ্যই করে, নারীর মধ্যেও নারীশক্তিরই পূজা করিবে, পুরুষশক্তির নহে। কিন্তু এই নারী-চিত্রাঙ্গদার যে শক্তি-পরিচয় আমরা পাই তাহা পুরুষোচিত চরিত্র-শক্তি—কর্ম্মস্পৃহা ও নীতি-নিষ্ঠা। এ কাব্যের অর্জ্জুন মহাভারতের অর্জ্জুন নয়, আদর্শ পুরুষ নয়—ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু তাহা হইলে এ কাব্যের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। এ অর্জ্জুন স্বাভাবিক সুস্থ পুরুষ নয়, ইহার চরিত্রে পৌরুষ অপেক্ষা ভাব-প্রবণতাই বেশী; এ একজন খাঁটি aesthete; পৌরাণিক বীরচরিত্র ত' নহেই—একজন আধুনিক ভাববিলাসী কবি; তাই তাহাকে বলিতে শুনি—

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা শান্ত হ'য়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবন-বাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।

এবং—

খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।

—ইহা আর যাহাই হোক, পুরুষের উক্তি নহে। এ আদর্শ জীবনেরও নহে, নাটক অথবা এপিকের উপযুক্তও নহে; ভাবস্বপ্নবিলাসের গীতিকাব্যই ইহার উপযুক্ত বিশ্রাম-স্থান। চিত্রাঙ্গদা গীতিকাব্য, এবং ইহার কবিও কমলবিলাসী বাঙ্গালী-জাতির শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা জানি; সেই জন্যই প্রথমেই বলিয়াছি, এ কাব্যের বিষয় ও কল্পনাভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। প্রকৃত পক্ষে এ নাটকে পুরুষ নাই, ইহার পুরুষও নারী;—ইহা নারীরই পৌরুষ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যে কেন এইরূপ আদর্শের পক্ষপাতী—তাঁহার কবি-ব্যক্তিত্বের মূলে কোন্ প্রবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আধুনিক psycho-analysis বিজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট গবেষণার বিষয় হইতে পারে।

সমস্যা বা তত্ত্বের দিক দিয়া আর অধিক আলোচনা করিব না। এইবার এ নাটকের কাব্যাংশ সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহাই বলিব। এ নাটকে দুইটি মাত্র চরিত্র আছে, তাহারও একটি—যেটি পুরুষ—অপরটির ছায়ামাত্র; যাহা করিবার বা করাইবার তাহা সেই করিতেছে বা করাইতেছে। এই কুরূপা, কঠিনাঙ্গী, পৌরুষাভিমানিনী নারী যে পুরুষকে দেখিয়া মুগ্ধ আত্মহারা হইয়াছে, সেই পুরুষের আপনাতে আপনি অটল মূর্ত্তি, এবং শেষে তাহার বিখ্যাত-বীর-পরিচয়ই নাকি তাহার সেই চিত্ত বিপ্লবের কারণ, কিন্তু বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয়, এই পুরুষটি অতিশয় দুর্ব্বল, এবং সেই দুর্ব্বলতাই চিত্রাঙ্গদার পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইয়াছে; কারণ, পুরুষ যেমন করিয়া নারীকে জয় করিতে চায়, চিত্রাঙ্গদাও তেমনই এই পুরুষকে জয় করিয়া নিজের নারীদেহে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছে, সেই পুরুষের আত্মাভিমান চরিতার্থ করিতে চায়। নারীর ন্যায় ছলনা, ও নারীর একমাত্র অস্ত্র রূপকেই সে আশ্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই রূপ তাহার নিজের নহে, সে ছলনাও তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়,—উভয়কে সে ঘৃণা করে। চিত্রাঙ্গদা নারীর মত আত্মদান করিতে উৎসুক নহে, বরং ঠিক বিপরীত—সে আপনাকে জাহির করিতে চায়, প্রেমের উপরে আত্মমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। সে বলে—

আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে' যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব।

* * *

আপনারে একবার দেখাইতে পারি
যদি, নিশ্চয় সে দিবে ধরা।

ইহাও আধুনিক প্রেম—এ নায়িকাও Doll's Houseএর নায়িকার সমধর্ম্মিণী; প্রভেদ এই যে, উক্ত নাটকের নায়িকা

যে আত্ম-মর্য্যাদা দাবী করিতেছে, তাহা human being হিসাবে; নারী, পুরুষ, উভয়েই সমানাধিকারবাদের উপর দাঁড়াইয়া। এ নায়িকা কেবল নারী হিসাবেই তাহা দাবী করিতেছে; নারীর নারীত্ব-মহিমাও চাই, সেই সঙ্গে পুরুষের ন্যায় স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহাও বিদ্যমান। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করে, কিন্তু সাধারণ নারীর মত ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নহে। এ প্রেম একটা রীতিমত business। ইহা বৈষ্ণব কবি-সাধকদের সাধন-বস্তু ত নহেই; শেকস্‌পীয়ারের নাটকে, অত্যুৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টির সহায়ে, আমরা যে গভীর, প্রবল, আদিম অথচ শাশ্বত প্রবৃত্তির লীলা দেখিয়াছি—এ প্রেম মাত্রা হিসাবেও সে জাতীয় নহে। সে নাটকের পরিণামে ক্লিওপেট্রার মত নায়িকাও বলিয়া উঠে—

No more but e'en a woman and commanded
By such poor passion as the maid that milks
And does meanest chare.

এ কাব্যের আদর্শ প্রেমিকা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই কথা বলে—

যে নারী নির্ব্বাক ধৈর্য্যে চিরমর্ম্ম-ব্যথা
নিশীথ নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু নিষ্ফল না হবে!

* * *

যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি?

এবং সর্ব্বশেষে—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি।

ইবসেনের নোরাও তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল—"Here I have been your doll-wife···I thought it fun when you played with me.·· That has been our marriage, Torvald." মোটের উপর, এ নায়িকার প্রেম-সাধনার সর্ব্বত্র একটি মন্ত্রই প্রধান—'আমি, আমি, আমি।'

* * * *

এইবার চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের প্রত্যক্ষ দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করিব। এ কাব্যে, কবি দেহকে ও দেহের রূপকে অতি নিম্নে স্থান দিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা রূপসী নয় বলিয়াই রূপের প্রতি তাহার বড় আক্রোশ। নিজের দেহ রূপহীন বলিয়া সে দেহকেও ধিক্কার দেয়—ভিতরের 'আমি'টার জয়গান করে। নাটকীয় অবস্থায় চরিত্রবিশেষের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। অর্জ্জুন তাহার রূপ সম্ভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছে দেখিয়া সে সুখী নহে, কারণ সে রূপ তাহার নিজের নহে। ভগবান তাহাকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে, বসন্তের নিকটে যে রূপ সে ধার করিয়া নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়াছে তাহাও নিজস্ব নহে; অথচ রূপ চাই, দেহকে রূপমণ্ডিত না করিলে পুরুষ-শিকার অসম্ভব। দেহকে চাই, আবার চাইও না; প্রেমের লীলায় দেহদান করিতে হইবে, অথচ দেহের সঙ্গে আত্মদান সম্ভবপর নহে, কারণ দেহটা ত' 'আমি' নয়! এমন বিপদে কি কখনও আর কোনও প্রেমিকা পড়িয়াছে? অর্জ্জুন কাহাকে প্রেম করিতেছে? কাহার সুধায় পিপাসা মিটাইতেছে? তাই চিত্রাঙ্গদা কাঁদিয়া উঠে—

মীনকেতু
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি' ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত? চিরন্তন তৃষাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান।

* * *

সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝঙ্কার সম, সে ত' মোর নহে!

——বড় দুঃখের কথা বটে। কিন্তু অর্জ্জুন কি শুধু চকোরের মত রূপ-জ্যোৎস্না পান করিতেছে? চিত্রাঙ্গদা যাহা বলিতেছে তাহা ত' দেহসম্ভোগের কথা; তবে কি দেহটাও তাহার নহে! মদন ও বসন্ত দুই দেবতায় মিলিয়া তাহার কায়াটিও কি বদলাইয়া দিয়াছে! দেহসম্ভোগের আরও স্পষ্ট উল্লেখ কাব্যখানির মধ্যে আছে। চিত্রাঙ্গদা নিজেই সে সংবাদ দিতেছে—

শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে।"
গম্ভীর আহ্বানে জন্ম জন্ম শত জন্ম
মোর, উঠিল জাগিয়া এক দেহমাঝে।

কহিলাম "লহ লহ, যাহা আছে, সব
লহ জীবন বল্লভ।" দিলাম বাড়ায়ে
দুই বাহু।—চন্দ্র অস্ত গেল বনান্তরে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী! স্বর্গ মর্ত্ত্য
দেশকাল, দুঃখ সুখ, জীবন মরণ,
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

— —এ 'অসহ্য পুলক' কি চিত্রাঙ্গদার নিজ দেহের নয়? রূপের সঙ্গে কি সে দেহখানিও ধার করিয়াছিল? না, পরিহাস করিতেছি না,—এত বড় কবির কল্পনায় এতখানি শৈথিল্য সত্যই বড় পরিতাপের বিষয়। দেহ দিব, অথচ সে দেহের সঙ্গে আপনাকে দিব না, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর দুর্নীতি আর কি হইতে পারে? দেহদানকালেও সে দেহকে নিজ হইতে তফাৎ করিয়া দেখে,—এই জন্যই চিত্রাঙ্গদার ধার-করা রূপ, কুরূপা বারাঙ্গনার কৃত্রিম অঙ্গরাগের মতই কুৎসিত ও বীভৎস। কবি, প্রেমসাধনায় দেহকে বাদ দিতে চাহিয়াছেন, অথচ ইন্দ্রিয়লালসা ও দেহসম্ভোগের উচ্ছল বর্ণনায় কাব্যখানি ভরপূর; তাই বোধ হয় মহারসরসিক বাঙ্গালী পাঠকসমাজের পক্ষে কাব্যখানি এত সুস্বাদু হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদার ধার-করা রূপের একটা রূপক অর্থ আছে, তাহা জানি—তাহা এই যে, বাহিরের রূপই ভিতরকার মানুষের যথার্থ পরিচয় নহে; উহা নিতান্তই বাহিরের, উহা অন্তরঙ্গ নহে। রূপ সম্বন্ধে না হয় তাহাই মানিলাম; কিন্তু দেহ? দেহকে বাদ দিয়া জীবন! তাহাও শুনিতে হইবে কবির মুখে! এ যে কত বড় মিথ্যা, এই চিত্রাঙ্গদা কাব্যের বিফল রস-প্রেরণাই তাহার আর একটি প্রমাণ। চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি যে অশ্লীলতা ও দুর্নীতির অভিযোগ করিয়াছিলেন, ভালো করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধান তাঁহারা করেন নাই। কাব্যে, প্রেমের লীলায় দেহদানের উল্লেখ, বা দৈহিক আকাঙ্ক্ষার বর্ণনাই অশ্লীল বা নীতিবিগর্হিত নহে; কিন্তু যে সম্ভোগ ব্যাপারে, দানে বা গ্রহণে, দেহের মর্য্যাদাবোধ নাই, দেহ যেখানে সম্ভোগের সহায় মাত্র, মিলনের সেতু নয়—সেখানে কাব্যের গভীরতর নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতি, সকল নীতিই লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।

*   *   *

চিত্রাঙ্গদা কাব্যে প্রেমের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যেমন, রূপের সম্পর্কও তেমনই। এ কাব্যে সৌন্দর্য্যও একটা প্রয়োজন বা ব্যবহারের জিনিষ মাত্র। আধ্যাত্মিক বলিলে ভুল হইবে—একটা আধিমানসিক নৈতিক আদর্শের খাতিরে, রূপ নরনারীর যৌনমিলনের আকর্ষণী মাত্র, তদধিক মূল্য তাহার নাই। কাব্যের এক স্থানে অর্জ্জুনের মুখে যে উচ্চাঙ্গের রূপ-বন্দনা শুনি, সমগ্র কাব্যখানি যেন তাহারই প্রতিবাদ—চিত্রাঙ্গদার বক্তৃতাগুলি এই রূপমোহের মোহমুদ্গর বলিলেই হয়। বসন্তের মুখ দিয়াও কবি একস্থানে বলাইয়াছেন—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

যেন, উদ্ভিদ্ জগতের মত, মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য্যের ওই একই কাজ। ফুল অপেক্ষা ফল বড় এবং ফলপ্রকাশ পর্য্যন্তই ফুলের প্রয়োজন। মানুষের জীবনেও যৌন প্রয়োজনে রূপের দরকার—তারপর যে প্রেমের ফল ফলিয়া থাকে, তাহাই হৃদয়ের পরিণততর অবস্থা; সে অবস্থায় রূপমোহের আর প্রয়োজন থাকে না বলিয়াই মানুষের জীবনে রূপের স্থান অতি সংকীর্ণ। চিত্রাঙ্গদার প্রেম সম্পর্কে এ কথা খাটে; এ প্রেম খাঁটি business—স্ত্রী ও পুরুষ, পরস্পরের মধ্যে চুক্তিমূলক একটা সাংসারিক সম্বন্ধ মাত্র। টমসন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে, চিত্রাঙ্গদা-সমালোচনাপ্রসঙ্গে, অধ্যাপক রোলোর (Prof. Rollo) যে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত অধ্যাপক মহাশয় এ কাব্যের এই অভিনব প্রেম-সৌন্দর্য্য-ঘটিত আদর্শ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

Surely this is heresy both to beauty and to love... Life and love ought not to take a nobler turn at the changing point of this Play.

*   *   *

But alas! this sharing by the wife of the husband's thought and action is made to supersede that world of beauty and dreams, of enchantment in which they first have loved one another.

*   *   *   *

চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের রূপ-মোহকে বার বার ধিক্কার দিয়াছে—নিজের ধার-করা রূপের উপরেও তাহার বিতৃষ্ণার অন্ত নাই; ইহা অবশ্যই প্রেমের প্ররোচনায় নহে। সে যে রূপ চায় না—তাহা নিজেরই আত্মাভিমান-তৃপ্তির জন্য। অর্জ্জুনের রূপ-মোহ রূপহীনা চিত্রাঙ্গদার বড়ই আক্ষেপের কারণ, তথাপি অর্জ্জুনের দুষ্ট ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাহাকে ধার করিয়া কুপথ্য যোগাইতে হয়—ইহা তাহার কম অসুখের কারণ নয়। কুমার-সম্ভবের

কবি যে লিখিয়াছেন—"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী" তার কারণ পার্ব্বতীর প্রেমাস্পদ তপস্বী শিব, সে যে রূপ চায় না; এবং—"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"। প্রেমাস্পদের প্রীতির জন্যই ত' রূপের প্রয়োজন। তাই, পার্ব্বতী নিজের রূপকেও ধিক্কার দিল। পার্ব্বতীর যদি রূপ না থাকিত এবং প্রেমাস্পদ যদি রূপপিপাসু হইতেন, তবে পার্ব্বতী এইরূপ ধার-করা রূপের লাঞ্ছনা হাসিমুখে সহ্য করিয়া প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদন করিত, এবং তাঁহার সুখেই অবশে সুখী হইত। এই আত্মত্যাগই প্রেমের চিরন্তন প্রবৃত্তি। চিত্রাঙ্গদার রূপ-বিতৃষ্ণায় প্রেমের এ লক্ষণ নাই—তাহার মূলে আছে প্রবল আত্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি। তাই এই রূপ-বিদ্বেষের মধ্যে জীবনের সত্য নাই, কাব্যের সৌন্দর্য্যও নাই।

* * * *

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের এই যে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম, তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত যাহা দাঁড়ায় তাহা এই। এ কাব্যে যে সৃষ্টি-সমগ্রতার অভাব, দুর্নীতি-দোষ ও স্বভাব-সত্যের বিরোধী কল্পনা লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূল কারণ—কবিচিত্তে দুই বিপরীত সংস্কারের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিতায় ইহার নিদর্শন আছে; কিন্তু এ কাব্যে কবিত্বের উৎসধারায় এই দ্বন্দ্ব যেরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে টমসন সাহেব যে নিন্দা ও প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই অতিরিক্ত, কিন্তু গ্রন্থশেষে তিনি সাধারণ ভাবে যে একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন—

If we refuse to allow ourselves to be satisfied with the rich and often wonderful beauty of his work, declining to sink back on pillows of such variegated softness, asking in stead what is its value for the mind and spirit of man......we often feel there is a slackness somewhere, probably at the very springs of thought and conception. His poems rarely fail in beauty of style but they often fail in grip.

এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই। আমি যে দ্বন্দ্বকে এই দোষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই। যে ধরণের বিবেক-বুদ্ধি বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রনীতি হিন্দুর সংস্কারবিরুদ্ধ, তাহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে পড়িয়াছে—যে সেমিটিক ধর্ম্মনীতি উপনিষদের মুখোস পরিয়া আমাদের দেশে আধুনিক কালে নব্যতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাতে তাহার ধাক্কা কম লাগে নাই। তাই, দেহ ও মন, ভোগ ও ত্যাগ, চরিত্রনীতি ও সৃষ্টির বৃহত্তর নীতি ইত্যাকার নানা দ্বন্দ্বের বিক্ষোভে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে—"**we often feel there is a slackness somewhere ... ... they often fail in grip,**"

* * * *

এইবার এ প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে। উপসংহারে পুনরায় সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিব। অশ্লীলতার যেমন প্রকারভেদ আছে, তেমনই কাব্যের তাৎপর্য্য ও কল্পনার ভঙ্গি অনুসারে রসের দিক দিয়া তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিতে হয়। কাব্যের দোষগুণ কাব্য হইতে পৃথক করিয়া লইয়া বিচার করার রীতি আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসায় অচল। অশ্লীলতা বলিতে আমরা কাব্যের যে দোষ বুঝি, তাহা কবিকল্পনা ও বিষয়-বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই কাব্যবিশেষের সেই দোষ একটা কোনও বিধিবদ্ধ সংজ্ঞার সাহায্যে নির্দ্দেশ করা যায় না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহার মূলে গভীরতর কারণ বিদ্যমান। অশ্লীলতা কেবল একটা শব্দার্থগত দোষ নয়, কেবল বর্ণনাবিশেষ বা ভাববিশেষের জন্যই রচনা অশ্লীল হয় না; পরন্তু কল্পনার মিথ্যাচারই নানা ভঙ্গিতে অশ্লীল হইয়া উঠে। যাহা কুৎসিত বা অকথ্য, তাহাই যদি অশ্লীল হয় এবং যাহা মিথ্যা বা কুকল্পিত, ভাষার সৌষ্ঠবে, বর্ণনার পারিপাট্যে তাহাই যদি শ্লীল হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অশ্লীলতা-দোষ নিতান্তই রুচিঘটিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়—কাব্যের যাহা প্রাণ, সেই রস-সত্যের সন্ধান লওয়া হয় না; যদি তাহাই উচিত হয় তবে সাহিত্যের সম্পর্কে অশ্লীলতার আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু তথাকথিত অশ্লীলতাই অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর কাব্য-নীতির অনুমোদিত হইতে পারে, এবং যেহেতু সেই কারণে অশ্লীলতা একটা দোষ না হইয়া কাব্যের রসপুষ্টির কারণ হইতে পারে; অতএব অশ্লীলতা কাব্যের একটা দোষ বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে। বরং আধুনিক সাহিত্যে রস-সত্যের ব্যাভিচারমূলক যে কদর্য্যতার

সৃষ্টি হইতেছে তাহাই যথার্থ অশ্লীল। এ অশ্লীলতা ভাবগত, কল্পনাগত, ইহা মানসিক ব্যভিচার বলিয়া immoralও বটে। বলা বাহুল্য morality অর্থে আমি চারিত্রিক নৈতিকতা বলিতেছি না; আমি যে নীতিকে কাব্য-সমালোচনাতেও গ্রাহ্য করিয়াছি, তাহা সকল নীতির নীতি, সৃষ্টি-সুষমার মূলীভূত আদর্শ।

* * *

এই অশ্লীলতার প্রসঙ্গেই আমি সেই নীতি সন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এ প্রবন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক যে কয়খানি কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি তাহাদের শ্লীলতা বা অশ্লীলতাবিচারে আমি এই নীতিকেই প্রামাণ্য করিয়াছি। এই অশ্লীলতার প্রসঙ্গেই আমি কাম-প্রেম এবং জীবনে তথা কাব্যে দেহের স্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার অবকাশ পাইয়াছি। কবি-কল্পনায় দেহের সঙ্গে মনের চাতুরী বা লুকাচুরী দেহকে বাদ দিয়া মনের অতিরিক্ত শুশ্রূষাই যে কাব্যের রসহানির কারণ এবং তাহাই যে সর্ব্বপ্রকার অশ্লীলতা ও দুর্নীতির আকর তাহাও দেখাইয়াছি। সর্ব্বশেষে আমার আলোচনায় যে একপ্রকার দেহাত্মবাদের সমর্থন আছে তাহাও আমি অস্বীকার করি না। এ যুগের দার্শনিক চিন্তাধারায় anti-intellectualism একটা তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে —এই দেহবাদ তাহা হইতে ভিন্ন নহে। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে এই anti-intellectualism চিরদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্য বা পরম তত্ত্ব কি সে সম্বন্ধে মতবাদের পার্থক্য থাকিবেই, কিন্তু যিনি রসিক, যিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি জানেন উপলব্ধিই সত্য, মতবাদ মূল্যহীন। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগসাধনা—সাক্ষাৎ উপলব্ধির পন্থা। সে সাধনায় মনোবুদ্ধি নয়—অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির প্রকর্ষই প্রধান সম্পদ। এই অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি সাক্ষাৎ দেহ-চেতনাসম্পর্কিত। রস এই অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তিরই সাধন-বস্তু। তাই কবিকল্পনা মনোধর্ম্ম নয়, রসও মনস্তত্ত্বের অধিকারভুক্ত নয়। দেহ-জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যে প্রেম তাহাই রসের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এ জন্য প্রেমেও যেমন কাব্যেও তেমনই দেহের আরতি অপরিহার্য্য। দেহের আরতি অশ্লীল হয় কেবল সেইখানে যেখানে জীবনে প্রেমের মত কাব্যে তাহা রসের আশ্রয় নয়, অর্থাৎ দেহ যেখানে আত্মপূজার উপচার মাত্র, দেহসম্ভোগে দেহের মর্য্যাদা-বোধ নাই। আধুনিক কাব্যরসের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রেম নয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ—প্রেমও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের অধীন। এরূপ সাহিত্যে অশ্লীলতা দেহঘটিত হইলে তাহা মিথ্যাচার বলিয়াই অশ্লীল। সাহিত্যের অশ্লীলতাপ্রসঙ্গে ইহাই আমার শেষ কথা।

আর এক দিক

যুগে যুগে মহাকাল লিখিয়াছে অগ্নির অক্ষরে
সত্যের বিজয়-গাথা, অসত্যের অসীম লাঞ্ছনা;
হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের বক্ষ ছুঁয়ে আলোক ঠিকরে,
মৃত্তিকাস্তূপের কাছে ব্যর্থ হয় তাহার সাধনা।
তথাপি মৃত্তিকা চাহে আলোকের স্পর্শ-অধিকার,
মিছা মরীচিকা পিছে ছুটিছে বিমূঢ় কুরঙ্গিনী,
যত নাহি মিলে জল তত তার হাহা হাহাকার—
মরুবালুকার মাঝে কোথায় তরল তরঙ্গিনী!
দেবতার আশীর্ব্বাদ নিজ দোষে হয় অভিশাপ,
তত ভেঙে ভেঙে পড়ে যত তার হয় অভ্যুদয়—
শিরে করাঘাত সার, অক্ষমের থামে না বিলাপ,
সেধে ডাকে অপমানে ভিক্ষামাত্র করিয়া আশ্রয়।
সামান্য মর্য্যাদা-বোধ নাহি যার শোণিতে-মজ্জায়,
কাঁদিয়া করিবে জয় এই যার জীবনের পণ—
ধিক্কারি কি ফল তারে, লজ্জা মেনে তাহার লজ্জায়
মুষ্টিমাত্র ভিক্ষা দিয়ে দূরে থাকে সুবুদ্ধি সুজন।
থামে না চোখের জল, বারিধির সলিল শুকায়—
মন্দিরে দেবতা তার অনুক্ষণ করে হায় হায়।

প্রদর্শনী

গত বারে আমরা আধুনিক ফটোগ্রাফির পরিচয় ও প্রগতির নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি প্রতিকৃতি দিয়াছিলাম--এবারে আরও কয়েকটি দিলাম।

আধুনিক শিল্পকলায় শিল্পীর দৃষ্টিকেই অনেকে সকলের চাইতে বড় কথা বলিয়া মনে করেন; ফটোগ্রাফ-শিল্পীও এদিক দিয়া যুগের সহিত তাল রাখিয়া সমানে অগ্রসর হইতেছেন—এবং বহু প্রয়োজনে তাঁহার সে দৃষ্টি কাজে লাগিতেছে। পাশের ছবিটি মোমবাতির বিজ্ঞাপন মাত্র। কিন্তু ইহার শিল্প-মূল্য কেবল সে দিক হইতে লক্ষ্যের বস্তু নয়—চিত্র-শিল্পের দিক দিয়াও ইহা উল্লেখযোগ্য।
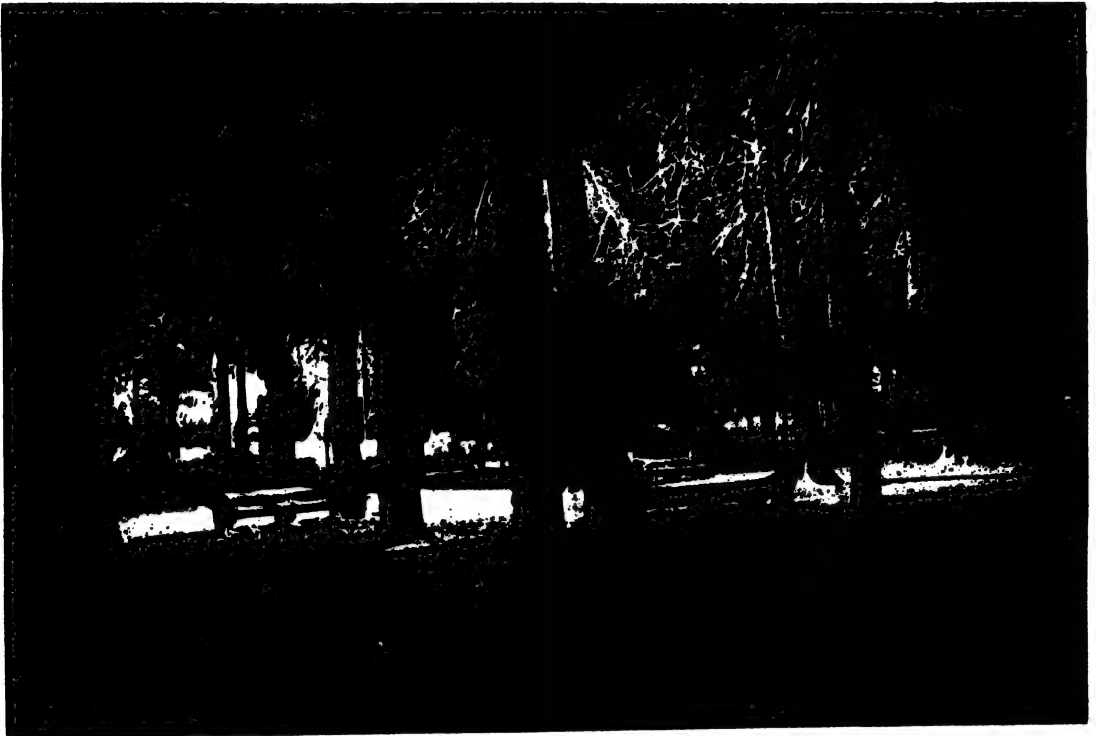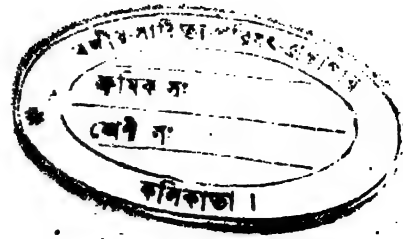
ব্রুসেল্‌সের একটি নগরোদ্যানে শীতার্ত্ত সন্ধ্যার অবতরণ যে অপরূপ ভাবে এই প্রতিকৃতিতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—বিশেষ করিয়া সুন্দর ফটোগ্রাফিই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়—ঘন বৃক্ষসন্নিবেশের অভ্যন্তরে আলোছায়ার লুকাচুরীতে ইহার নয়নানন্দকর মাধুর্য্য উপভোগ্য।
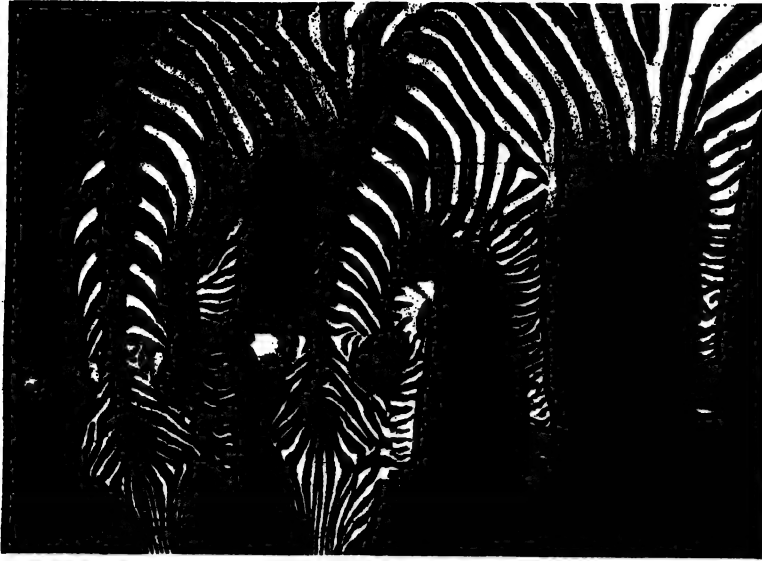
আধুনিক শিল্পে প্রাণিজগত যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে,—বর্ত্তমান সাহিত্যে ও চিত্রকলায় আমরা তাহার নানাবিধ পরিচয় পাইয়াছি। শেখভের গল্পে ঘোড়াগাড়ীর কোচোয়ান তাহার দুঃখ-শোকের সান্ত্বনার সন্ধান গাড়ীতে জোতা ঘোড়া দুইটির মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে—মানুষের দুর্লভ সমবেদনা হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি সহিস পশুর কাছ হইতে তাহার প্রার্থিত বস্তু চাহিয়া পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও এ উদাহরণ আর খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নহে। কিন্তু সৃষ্ট জগতের মধ্যে পশুরও একটি
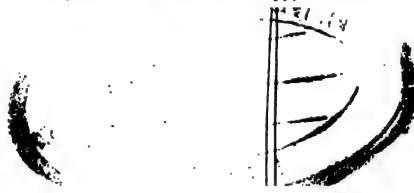
স্বতন্ত্র সত্তা আছে—মানুষের সম্পর্কে না আসিয়াও তাহারা জাগতিক জীবনের বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া আছে—তেমন দৃষ্টি লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে ইহাদেরও একটি ধারা আছে, সে-ধারায় মনুষ্যোচিত না হইলেও স্নেহ-মমতার স্রোত অজ্ঞাত নয়।

পশু-জীবনের সেই দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব যুক্তরাষ্ট্রের ওক্‌ল্যাণ্ডের এই গাভী দুইটি এবং বার্লিনের পশুশালার একাংশে বন্দী এই জেব্রা দুইটি একেবারে তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়—এই বিপুল বিশ্বে ইহাদেরও স্বকীয় মূল্য আছে। এবং সে মূল্য অবহেলার নয়।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নবম পরিচ্ছেদ

[মিলনে বিরহের সূচনা]

মাধব তাহার পত্নী ও শ্যালিকার সহিত মিলিত হইয়াই মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা কি আমি ভুলতে পারি?

হেমাঙ্গিনীর বুক হইতে আশঙ্কার গুরুভার তখন নামিয়া গিয়াছে, সে দিদিকে মাধবের নিকট একা রাখিয়া লঘু-পদক্ষেপে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। মাধব আবার বলিল, তুমি যা করেছ তা ভুলবার নয়—কথা দিয়া সে যাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না তাহার দৃষ্টিতে সেই কৃতজ্ঞতা ছিল।

—বেশ, ভুলতে যদি না পার, হেমের জন্যে মনে করে রেখ। ঈশ্বর না করুন, যদি কখনো তার ওপর তোমার রাগ হয় তার দিদির আজকের এই যন্ত্রণা-ভোগের কথা মনে করে তাকে ক্ষমা ক'রো। আমার কথা যদি বল, এ আমাকে করতেই হ'ত। যাক, আমি তা হলে আসি।

মাধব বলিল, সেকি দিদি, কতদিন হেম তোমাকে দেখে নি, আরও ঘণ্টা কয়েক সে তোমার সঙ্গে থাকতে পেলে খুসী হবে। যদি দু একদিন না থাকতে চাও, সকাল হলেই আমার পাল্কীতে বাড়ী যেয়ো এখন। এই রাত্রেই হেঁটে বাড়ী যাবার দরকার কি?

মাতঙ্গিনী বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—অদৃষ্টের লিখন! সে সুখ আমার কপালে নেই ভাই। আমাকে যেতেই হবে।

মাধব আবার প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি দিদি? আমার জানতে কিছু বাধা আছে?

লজ্জা ও দুঃখে বিচলিত হইয়া মাতঙ্গিনী শুধু বলিল, উনি, তুমি তো ওঁকে জান! আমি এখানে থাকলে চটবেন।

—বোনের বাড়ীতে থাকলে চটবেন! কেন, তুমি কি শপথ করে এসেছ যে ধূলোপায়েই ফিরবে? তিনি জানেন তুমি কোথায় আছ?

মাতঙ্গিনী বলিল, না আমি শপথও করি নি, কোথায় আছি তা তিনি জানেনও না।

মাধব বলিল, আশ্চর্য্য, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তুমি এলে কি করে! তুমি যখন বাড়ী থেকে বেরোও, উনি কোথায় ছিলেন?

হেমাঙ্গিনী বলিল, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রো না।

এই উত্তর শুনিয়া মাধবের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য—সে মন হইতে সকল সন্দেহ মুছিয়া ফেলিল এবং চুপ করিয়া কিছুকাল ভাবিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর আয়ত নীল বিষণ্ণ চক্ষের দৃষ্টি মাধবের দিকে নিবদ্ধ রহিল।

শেষে সে বলিয়া উঠিল, না, আর থেকে লাভ কি? আমি যাই। করুণা আমার সঙ্গে চলুক—মাতঙ্গিনী বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বর ভারী শুনাইল। সে বলিল, তবে আসি ভাই, আসি মাধব, তুমি সুখী হও।

মাধব তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু অশ্রুসজল। মাতঙ্গিনী কাঁদিতেছিল—আর আমার হেম তোমার কাছে থেকে সুখী হোক।

মাধব বলিল, তুমি কাঁদছ, কি হয়েছে দিদি?

মাতঙ্গিনী জবাব দিল না, কাঁদিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ যেন তাহার অন্তরের যন্ত্রণায় পাগল হইয়া সে মাধবের হাত দুইটি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার পদ্মফুলের মত মুখখানি নত হইয়া হাতের কাছে আসিল। মাতঙ্গিনীর নিষ্কলঙ্ক ললাটের কোমল কুঞ্চিত কেশদামের স্পর্শের উন্মাদনায় মাধব কাঁপিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনীর অশ্রুধারায় মাধবের হাত দু'খানি সিক্ত হইয়া গেল।

—আমাকে ঘৃণা ক'রো না, আমাকে ঘৃণা ক'রো না—আবেগাতিশয্যে মাতঙ্গিনীর কুসুমসুকুমার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল—আমার এই চরম দুর্ব্বলতার জন্য ঘৃণায় মুখ ফিরিও না। মাধব, হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, তাই এই শেষ মুহূর্ত্তে বলছি, তোমাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, তোমাকে আমি এখনও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি—তাই তোমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিতে এত কষ্ট হচ্ছে।

মাধব কি মাতঙ্গিনীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিল? না, সে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল, চোখের জলে হাতের তালু ভিজিয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য দুই জনেই নীরব, উভয়ের বুকের স্পন্দন দ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী যেরূপ আচম্বিতে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল নিজেকে সামলাইয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইল না, সেই বুকভাঙা নীরবতা সেই প্রথমে ভঙ্গ করিল।

সেই দূরে সরিয়া থাকা, সেই সঙ্কোচ, মনের সেই বিষাদ, ভাঙা বুকের সেই হাহাকার যাহা প্রথম হইতেই মাতঙ্গিনীকে পাইয়া বসিয়াছিল, কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে, গভীর উত্তপ্ত ভালবাসার হঠাৎ প্রকাশের উত্তেজনা ও অধীরতাও প্রশমিত হইয়াছে, মাতঙ্গিনী শান্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু তাহার স্বভাবতঃ ম্লান মুখখানি এক অব্যক্ত ভাবাবেগে উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

তাহার কোমল অঙ্গ ব্যাপিয়া একটা মধুর অথচ শান্ত গাম্ভীর্য্য তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এ গাম্ভীর্য্য নিবিড়তম আনন্দানুভূতি হইতে নয়—কারণ, হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড বন্যা তাহাকে এমন একস্থানে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল যেখানে বর্ত্তমান অকথিত সুখের উন্মাদনায় ন্যায়-অন্যায়-বোধমাত্র থাকে না, নিকটতম বর্ত্তমান ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। মাতঙ্গিনী কেবলমাত্র মাধবের সান্নিধ্যটুকুই উপভোগ করিতেছিল, মাধবের হাতে যে তাহার বহুদিননিরুদ্ধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মাধবও তো তাহার সঙ্গে চোখের জল ফেলিয়াছে! এই অনুভূতিগুলিই মাতঙ্গিনীর মনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল—এই মুহূর্ত্তকালের জন্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি—যে কলঙ্কিত আনন্দ-তরঙ্গে তাহার হৃদয় ভাসমান ছিল তাহার উজ্জ্বলতার উপরে কালো ছায়া ফেলিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর লালসা-পূর্ণ দৃষ্টিতে একটা জ্বালা ছিল—তাহার চাঁদের মত ললাটে একটা জ্যোতি ছিল; সে যখন তাহার নিটোল সুগোল বাহুলতা ডামাস্কবস্ত্রাচ্ছাদিত সোফার উপর রাখিয়া ঈষৎ নমিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সুগঠিত মাথাখানি করতলের উপর ন্যস্ত ছিল এবং সেই হাতের ও উদ্বেল বুকের উপর তাহার সুকৃষ্ণ বিপুল কেশদাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন মাধবের হঠাৎ মনে হইয়াছিল ইহা অপেক্ষা নারী-সৌন্দর্য্যের চোখ-ধাঁধান মূর্ত্তি যেন পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয়।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, ভেবেছিলাম মানুষের কানে কখনও আমার এই কথা পৌঁছবে না। তোমার কানেও নয়—কিন্তু কই চেপে তো রাখতে পারলাম না। আমার মনে কি হচ্ছে আমি নিজেই জানি না।

মাতঙ্গিনীর উদ্দাম প্রেম-নিবেদনের পর মাধব এই প্রথম কথা কহিল, বলিল, মাতঙ্গিনী আমি ভেবেছিলাম সহজেই এই বিদায়ের পালা শেষ হবে, কিন্তু তুমি—একি করলে তুমি?

মাধবের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে বলিল, আমি বুঝতে পারছি, তুমি অনেক সহ্য করেছ, অনেক কিছু ত্যাগ করেছ। আর একবার শেষ চেষ্টা কর, তোমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় থেকে এ চিন্তা মুছে ফেল, সব ভুলে যাও।

মাতঙ্গিনী বলিল, না, না, কিছু ব'লো না তুমি—বলিতে বলিতে মাতঙ্গিনী যেন নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিল; মস্তক অবনত করিয়া সে নিজের উদগত অশ্রুর বন্যা লুকাইতে লুকাইতে বলিয়া উঠিল, মাধব, তুমি আমাকে গালাগালি দাও, ধিক্কার দাও, আমার শিক্ষা হোক। আমি পাপী, পাপ করেছি, আমার ঈশ্বরের কাছে আমি অপরাধী এবং এই পৃথিবীতে যে আমার ঈশ্বর—আমাকে বলতে দাও মাধব, সেই তোমার কাছেও অপরাধ করেছি। আমি নিজেকে নিজে যতটা ঘৃণা করছি তার চাইতে বেশী ঘৃণা তুমি আমাকে করতে পারবে না। ঈশ্বর জানেন, এই ক'বছর আমি কত সহ্য করেছি। বুক চিরে যদি দেখাতে পারতাম, দেখতে আমার বুকে কি হচ্ছে।

মাধব কাঁদিল। কাঁদিয়া বলিল, মাতঙ্গিনী - প্রিয়—

মাধব আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

—বল বল মাধব, আবার বল, যে কথা শুনবার জন্যে আমার হৃদয় এতকাল প্রতীক্ষা করে আছে আর একবার সেই কথা বল। তুমি কি তবে আমাকে এখনও ভালবাস? একটি বার মাত্র একথা বল, শুনে আজ রাত্রেই আমি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করব।

মাধব নিজেকে সংযত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, মাতঙ্গিনী শোন—আমাকে ক্ষমা কর। এ দারুণ দুঃখ আমি আর সইতে পারি না। তোমাদের বাড়ীতেই আমার মনে এই আগুন ধরেছিল—বোধ হয় দুজনকেই এতে পুড়ে মরতে হবে। তখন আমরা ছোট ছিলাম, চেষ্টা করলেও এ আগুণ নিভত না—সেই সময়েই যখন আমরা কর্ত্তব্যের পথ থেকে একচুল বাইরে যাইনি, আজ বহুদিন ধরে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় কঠিন হয়েছে, এখনই কি আমরা ভুল করব? মন থেকে এই পাপ দূর করে দাও—মাতঙ্গিনী, এস আমরা পরস্পরকে ভুলে যাই, দূরে দূরে থাকি।

মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মাতঙ্গিনী সোজা হইয়া দাঁড়াইল—তাহার সমস্ত দেহ এক নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিজের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে করিতে সে বলিল, তাই হোক, মানুষের মন যদি চেষ্টা করে ভুলতে পারে তাহলে আমিও ভুলব। তোমাকে আমি ভুলে যাব। এস, আমরা চিরকালের জন্য বিদায় নি।

মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বরে একটা ভয়াবহ শান্তির ভাব প্রকাশ পাইল।

প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সে চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না—মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া মাধবের কাছে তাহা লুকাইতে চাহিল এবং পরক্ষণেই দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

[প্রত্যাবর্ত্তন]

প্রভাত হইতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব ছিল, বিষাদিত অন্তঃকরণে ও শ্লথ পদক্ষেপে মাতঙ্গিনী আবার সেই বনপথ ধরিয়া ফিরিয়া চলিল, করুণা নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। নক্ষত্রখচিত ম্লান নীলাকাশ ততক্ষণে সঞ্চরমান লঘু মেঘখণ্ডে অর্দ্ধেক আবৃত হইয়াছে,—ঘন কৃষ্ণ একটা মেঘ দূর দিক্‌চক্রবালের প্রান্তে ভাসিতেছিল, তাহারই ধূসর ছায়া প্রতিফলিত হওয়াতে দূরে দূরে ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত বৃক্ষচূড়াগুলি গম্ভীরদর্শন মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ অরণ্যের উপর দিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল বাতাস মাঝে মাঝে একটানা একটা অশুভ আর্ত্ত বিলাপধ্বনির সৃষ্টি করিতেছিল; ক্বচিৎ বা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ধরাবক্ষে অথবা ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-পত্রের উপর পতিত হইয়া একটা সুরের সৃষ্টি করিতেছিল। মাতঙ্গিনী নিজের ভাবনায় এমনই ডুবিয়াছিল যে বহিঃপ্রকৃতির এই রূপ দেখিবার অবকাশ তাহার ছিল না—সে শুধু ইহাই অনুভব করিয়া চলিয়াছিল যে তাহার চারিদিকের প্রকৃতি যেন দুঃখভারাক্রান্ত। নিষিদ্ধ অথচ আকাঙ্ক্ষিত মিলনের স্মৃতিটুকু তাহার মনকে ভরিয়া রাখিয়াছিল—বাড়ীতে গেলে তাহারা কি ভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, তাহার স্বামী এই ঘটনার কথা জানিতে পারিলেই বা তাহার কতখানি বিপদ ঘটিতে পারে—এই সকল দুশ্চিন্তা সেই মিলন-দৃশ্যের স্পষ্টতাকে বিন্দুমাত্র ছায়াচ্ছন্ন করিতে পারে নাই; সেই স্মৃতিই তাহার মানস-চক্ষে কখনো উজ্জ্বল রঙে কখনও গভীর কালিমায় ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে মাধবকে কথা দিয়াছে, সে ভুলিয়া যাইবে; কিন্তু মাধবের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে সে এই স্মৃতিরই পূজা করিতে লাগিল—মাধব যতগুলি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি সে মনে করিয়া করিয়া তাহা লইয়াই স্বপ্নরচনা করিতে লাগিল—মাধবের প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দুর স্মৃতি তাহাকে পাগল করিতে লাগিল। এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার এই মনের উন্মাদনা কাটিয়া গিয়া নিজের অন্তরের পাপের স্মৃতি, সে যে দেবতাদের ও মানুষের ঘৃণ্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা ভাবিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে আকাশ ক্রমেই কালো মূর্ত্তি ধরিতেছে দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে একটা ঝড় আসন্ন। সেই সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া করুণা বলিয়া উঠিল, ঠাকুরুণ, তাড়াতাড়ি চল, এখুনি ঝড় উঠবে, তার আগে বাড়ী পৌছতে হবে।

অন্যমনস্ক মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, হ্যাঁ, তাই চল।

করুণার গতি দ্রুততর হইল, মাতঙ্গিনীও কোনও প্রয়োজনের বোধে নয়, শুধু তাহার দেখাদেখি দ্রুত চলিতে লাগিল।

করুণা বলিল, ঐ দেখ গাছের পাতায় বড় বড় ফোঁটা পড়তে সুরু হয়েছে—

তাই নাকি?—মাতঙ্গিনী এই প্রথম তাহার স্বপ্ন-লোক হইতে জাগরিত হইয়া কথা বলিল। পরক্ষণেই কান পাতিয়া শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, না, না, এতো জলের ফোঁটার শব্দ নয়—তবে কি? মনে হচ্ছে যেন মানুষের পায়ের শব্দ—কারা যেন গাছের পাতা মাড়িয়ে চলেছে—

করুণা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, তাই নাকি ঠাকরুণ?—সে তাহার গতি দ্রুত বাড়াইয়া দিল—দেরী হইলে সে অরণ্যে ইতস্তত বিচরণশীল ডাকাতদের হাতে পড়িতে পারে ভাবিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাদিগকে বেশীদূর চলিতে হইল না—ক্রোধোন্মত্ত বাতাস জাগিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, বজ্রগর্জ্জনে আকাশ মুখর হইল—বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া সন্দেহের অবকাশ দিল না।

করুণা বলিল, বৃষ্টিতে ভিজে আজ মরণ হবে দেখছি। গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাথাটা বাঁচিয়ে নিলে হ'ত না?

মাতঙ্গিনী বলিল, আচ্ছা তাই চলো—বহুবিস্তৃত একটা তেঁতুল গাছের পত্র-শাখার নীচে আশ্রয় লইবার জন্য মাতঙ্গিনী অগ্রসর হইল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের অনতিদূরে সেই গাছেরই তলায় একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে।

করুণা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল, পালাও, পালাও এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণপণে বিমূঢ় মাতঙ্গিনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে সুরু করিল। ঝড়-জলের মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে সে বারবার চীৎকার করিতে লাগিল, পালাও পালাও এবং যতক্ষণে না বাড়ীর দরজায় পৌছিল ততক্ষণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ী বেশী দূরে ছিল না—তাহারা বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল।

[ক্রমশঃ]

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

বঙ্গদেশ একদিন সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশকে পথ প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু নিজের দোষেই হউক আর দৈবদুর্ব্বিপাকেই হউক বাঙ্গালী ক্রমশ বহুবিভাগে পরাজয় স্বীকার করিতেছে। যে অক্লান্ত উদ্যমের সহিত সে নবযুগের নূতন পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল, কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহার গতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা পিছনে ছিল, নিদ্রাকাতর চক্ষু মেলিয়া তাহারাই আহ্বানে যাহারা ছিন্নশয্যায় জাগিয়া বসিয়াছিল, তাহারাই একে একে গতিবেগ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। বাণিজ্য ব্যবসায়, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এমন কি সাহিত্য ও শিক্ষাবিভাগেও বাঙ্গালী তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া মনের ক্ষোভে পূর্ব্বগৌরবের আস্ফালন করিয়া চিত্তবিনোদনের প্রয়াস করিতেছে—পিছনের লোকেরা চোখ ফিরাইয়া অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া চলিয়া গেল। মনস্বী গোখেলের সেই সুবিখ্যাত উক্তি—বাঙ্গালা দেশ আজ যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারতবর্ষ কাল তাহাই চিন্তা করিবে—অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে না হইতে তাহা উপহাসের মত শোনাইতেছে।

দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা এই যে, মানবীয় সাধনার এক বিভাগে, চারুশিল্প ও চিত্রকলায় বাঙ্গালীকে এখনও কেহ হঠাইতে পারে নাই, বাঙ্গালী এখনও ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালী শিল্পীরাই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অভিযান করিয়া দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে, এখনও তাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী সাধনা করিতেছে। চিত্রশিল্পবিভাগে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শিক্ষায় বাঙ্গালীই গুরুগিরি করিতেছে এবং হয় তো আরও কিছুকাল করিবে। বাঙ্গালী এখনও কিছুকাল এই গৌরব করিতে পারিবে যে চিত্রশিল্পের সহায়তায় সমগ্র ভারতের মনে সৌন্দর্য্যের পিপাসা জাগ্রত করিয়া বাঙ্গালীই

মাদ্রাজে শিল্পী দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিও। মাদ্রাজের গবর্ণর স্যার জর্জ্জ ফ্রেডারিক ষ্ট্যান্‌লি উপবিষ্ট--তাঁহারই আবক্ষমূর্ত্তি নির্ম্মাণরত শিল্পী দেবীপ্রসাদ।

এখনও চিন্তারাজ্যে অধিনায়কত্ব করিতেছে—বাঙ্গালী এখনও পরাজিত হয় নাই। কিন্তু এ বুঝি নিতান্তই হতাশার সান্ত্বনা, প্রাণপণ সাধনায় হৃতগৌরব-পুনরুদ্ধার না করিলে বাঙ্গালীর এ বড়াই বেশীদিন টিকিবে না।

চিত্রশিল্পের কথা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল এখনও জীবিত। তাঁহারাই বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য তৈয়ারী করিয়া ও দিগ্‌বিদিকে প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষকে জয় করিয়াছেন, গৌরবের অনেকখানিই তাঁহাদের প্রাপ্য। পৃথিবীর সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য্যগণের সহিত গুপ্ত, সারদাচরণ উকীল, রণদাচরণ উকীল প্রভৃতি নেতৃত্ব করিয়া বাঙ্গালাদেশকে সম্মানিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী মুকুল দে, সুরেন কর, সুধাংশু চৌধুরী ও ধীরেন্দ্র দেববর্ম্মণ ভারতের বাহিরেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। মণীষী দে, প্রভাত নিয়োগী, সুধীরঞ্জন খাস্তগীর প্রভৃতি তরুণ শিল্পীরাও ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া শুধু শিল্প-সাধনার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ ও পাথেয় সংগ্রহ করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এ সকল কম গৌরবের কথা নহে।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীও এই দলের। ১৩৩৬

ঝড়-বৃষ্টিতে।

তাঁহারা একাসন পাইবার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে দেশেই তাঁহারা জন্মাইতেন তাঁহাদের নেতৃত্ব সকলকে মানিতে হইত, ভারতবর্ষও মানিতেছে। সুদূর সিংহলে মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, অন্ধ্রদেশে ও বরোদায় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আদিয়ারে অর্দ্ধেন্দুকুমার বন্দোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ে পুলিনবিহারী দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ দত্ত, জয়পুরে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌয়ে অসিতকুমার হালদার, ললিতমোহন সেন, বীরেশ্বর সেন, আরও পশ্চিমে সমরেন্দ্র সালের প্রারম্ভে তিনি স্থায়ীভাবে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু শিষ্যের গুরু হইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশকে শিল্প-ব্যাপারে বাঙ্গালী ভাবে ভাবিত করিয়াছেন। নিজে তিনি অক্লান্তকর্ম্মী, মৃত্তিকা ও ব্রোঞ্জমূর্ত্তি নির্ম্মাণে ভারতবর্ষে এখন তিনি অদ্বিতীয় বলিলেও হয়। ছাত্রদের শিক্ষাকার্য্যে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখিয়াও নিজের সাধনায় তিনি অবহেলা করেন নাই। বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রারম্ভে মান্দ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনীতে

তিনি তাঁহার যে অপরূপ চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইবার জন্য রাখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার শিল্প-নিষ্ঠার পরিচয় আছে। সেইগুলির কয়েকটি ফটোগ্রাফ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ এখনও তরুণ, তাঁহার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর, এই বয়সেই তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন প্রবীণ শিল্পীদেরও তাহা কাম্য। লক্ষৌ ও কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষতা অসিতকুমার হালদার ও মুকুল দে করিতেছেন, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ বয়সে তাঁহাদের ছোট, কিন্তু কীর্ত্তিতে ছোট নন।

প্রাসাদ ও কুটীর।

ভাস্কর দেবীপ্রসাদের চিত্রেও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে; তিনি সুস্থ সবল ঋজু মানুষ, পালোয়ানের মত তাঁহার দেহ; তাঁহার শিল্পেও তাঁহার দেহের স্বাস্থ্যগত আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—এবিষয়ে তিনি এক নন্দলাল ব্যতীত বাঙ্গালী অন্য সকল শিল্পী হইতে পৃথক। চিত্রের বিষয়গুলিতে প্রাণের অভাব, রক্তাল্পতা ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ততার যে অপবাদ প্রাচ্য শিল্পকলাবিদগণকে দেওয়া হইয়া থাকে, দেবীপ্রসাদ নিজ দেহ ও মনের সবলতার প্রভাবে সেই অপবাদ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলেন। এজন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় না; নিজের স্বভাববশেই সেই দৌর্ব্বল্য হইতে তিনি মুক্ত। বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত বর্ষার একটি ছবিতেই তিনি এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্যপথে গরুর গাড়ীর চাকা কাদায় ডুবিয়া গিয়াছে, নগ্নদেহ গাড়োয়ান চাকা ঠেলিতেছে, ইহাই হইল চিত্রটির বিষয়। গাড়ীর চালকের দেহ-সৌষ্ঠব শিল্পী দেবীপ্রসাদ এমন ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দৃঢ় মাংসপেশীগুলি এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে দেখিলেই মনে সম্ভ্রম জাগে। সেই একখানি ছবিতেই শিল্পী দর্শকের মন জয় করিতে সক্ষম হন্।

তাঁহার কুমারজীবের চীন-যাত্রা, অরণ্যভৈরব, পক্ষী-মিথুন প্রভৃতি চিত্র আজিও শিল্পরসিকগণের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু এসকলের জন্যও শিল্পী দেবীপ্রসাদের নাম নয়, ভাস্কর্য্য-শিল্পে তিনি অদ্বিতীয়, মূর্ত্তিনির্ম্মাণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা। যাঁহার মূর্ত্তি তিনি নির্ম্মাণ করেন, মূর্ত্তির মধ্যে সেই ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তাটিকে খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব হয় না, মূর্ত্তি দেখিলেই মনে হয়, এই তো ঠিক। এক তাল কাদাকে খেলার ছলে তিনি কেমন করিয়া রূপ ও প্রাণ দান করেন, যাঁহারা তাঁহার ষ্টুডিওতে তাঁহাকে কাজ করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অনুভব করিয়াছেন।

আমরা এখানে শিল্পী দেবীপ্রসাদের যে চিত্রগুলি প্রকাশ করিতেছি, সেগুলি এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে মান্দ্রাজে স্কুল অব আর্টস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। ২১শে জানুয়ারী স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌টস্ গৃহে এই প্রদর্শনী খোলা হয়। দেবীপ্রসাদের পাঁচটি সুবৃহৎ রঙীন চিত্র এই প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল—আমরা চারিটির ফটোগ্রাফ প্রকাশ করিলাম। মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার শিল্প-সমালোচক চিত্রগুলি দেখিয়া লিখিয়াছেন, "চিত্র-গুলি দেখিয়া কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না, মন এমনই বিস্ময়াভিভূত হয়। তবে যদি নিতান্তই নাম করিতে হয় আমরা 'ঝড়বৃষ্টিতে' (Through foul weather) ও 'প্রাসাদ ও কুটীর' (Huts and Palaces) চিত্র দুইখানির নামোল্লেখ করিব। এই চিত্রের পরিকল্পনায়

গোধূলি।

রুদ্র প্রকৃতি।

ও প্রকাশভঙ্গীতে এমন অসাধারণত্ব আছে যে শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ এগুলির নাম করা যাইতে পারে। এই বৎসরে প্রদর্শিত মিঃ রায়চৌধুরীর চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য পারি-পার্শ্বিকতার সামঞ্জস্যে ও আব্‌হাওয়ার সৃষ্টিতে। ভারতীয় চিত্রকলার নির্জ্জীব বেষ্টনীর মধ্যে এগুলি চমকের সৃষ্টি করে। আনন্দের বিষয় এই যে অন্তত মান্দ্রাজ স্কুল অব আর্টস্‌-এ এই নির্জ্জীবতার সাধনা পরিত্যক্ত হইতেছে।" মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যর জর্জ্জ ফ্রেডারিক ষ্ট্যান্‌লি সাহেবের আবক্ষ মূর্ত্তিটিও এই প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল। এই মূর্ত্তিটি বহু প্রশংসিত হইয়াছে।

কয়েকটি ডিজাইন।

'মান্দ্রাজ মেল' এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ঝড় বৃষ্টিতে' নামক অসম্পূর্ণ ওয়াটার-কলার চিত্রটিতে প্রমাণিত হয়—শিল্পীর স্বীয় শিল্প-উপাদানের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব। এই চিত্রটিকে কোনও একটা মামুলি ছবির শ্রেণীর মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া যায় না—নিজস্বতায় ইহা সম্পূর্ণ পৃথক। গোধূলি (Twilight) ছবিখানিতে রঙের অপরূপ সামঞ্জস্যে প্রকৃতি যেন মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই প্রদর্শনীতে শিল্পী দেবীপ্রসাদ পরিকল্পিত (ক্রাফ্‌টস্‌ বিভাগ হইতে) চেয়ার টেবিল ইত্যাদির কয়েকটি ডিজাইন ছিল। আমরা তাহারই তিনটি প্রকাশ করিলাম।

এই গেল অধ্যক্ষের কথা, তিনি যে সকল ছাত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাদের কাজের নমুনাগুলিও প্রদর্শনীটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির আলোকচিত্র আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় আমাদের প্রদর্শনী বিভাগে সেগুলি প্রকাশিত হইবে। শুধু ভি. ডি. গোবিন্দরাজ-অঙ্কিত ত্রিবেন্দ্রামের পার্ব্বত্য দৃশ্য-বিষয়ক একটি ওয়াটার কলার চিত্র এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। ভি. ডি. গোবিন্দ-রাজ ভাস্কর্য্য-শিল্পে দক্ষ, এই চিত্রখানিতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে রঙের খেলাতেও তিনি কম নন। সকল ছাত্র অপেক্ষা ইনিই দেবীপ্রসাদের টেক্‌নিক্‌ বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং প্রথম দৃষ্টিতে এই চিত্রখানি গুরুরই বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই এই প্রবন্ধে চিত্রটি সন্নিবেশিত হইল।

ত্রিবেন্দ্রামের পার্ব্বত্য-দৃশ্য। [ভি. ডি. গোবিন্দরাজ-অঙ্কিত]
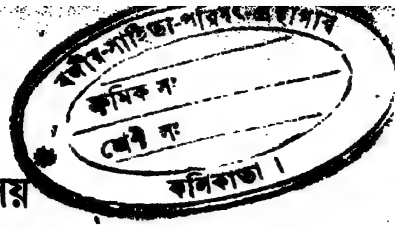
বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়

চতুর্থ পর্য্যায়

—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গ্রেট ন্যাশনালের দল মহোৎসাহে নূতন করিয়া অভিনয় দেখাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালে পুরুষদের দ্বারাই স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হইত। এই সময়ে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী নামে পাঁচটি অভিনেত্রী সংগৃহীত হইল। আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৮৭৪ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল :—

GREAT NATIONAL THEATRE
Beadon Street.
GRAND OPENING NIGHT.
Saturday, 19th *September*, 1874
Opera ! Opera !! Opera !!!
Great attraction, Great attraction.
Curiosity and Pleasure combined.
সতী কি কলঙ্কিনী ?
SATI KI KALANKINI.
Dancing and Singing throughout.
Orchestra under the Leadership
of
Babu Modun Mohun Burman.
NAGENDRA NATH BANERJI
Manager.

No pains and money have been spared in securing a set of choice actors and actresses for the coming season.

The Book price (annas eight).

BHOOBUN MOHUN NEUGHY
Proprietor.

১৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে সমারোহের সহিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হইল। এই সময় হইতে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারের ম্যানেজার হন ; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মদাস সুর ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের আয়ের হ্রাস ও টাকাকড়ির গোলযোগই এই পরিবর্ত্তনের কারণ—কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।* 'সতী কি কলঙ্কিনী' :অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালে ছিলেন না। বিনোদিনী দাসী রচিত 'আমার কথা' পুস্তকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

> বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার নাম্নী অভীনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

ইহার পর-সপ্তাহের শনিবারে—২৬এ সেপ্টেম্বর আবার 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হয়। ১লা অক্টোবর তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন,—

> গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর এবার যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে এত দিনের পর বুঝি ইঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। বাবু ভুবনমোহন নেউগী ইহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহারা যদি এখন ভাল ভাল নাটক পান এবং আবার আত্ম কলহ না করেন তবে ইঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন। গত দুই অভিনয়ে লোকে অনেক আশান্বিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৭৪, ৩রা অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকের অভিনয় হয়। ১০ই অক্টোবর পুনরায় 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'ভারতে যবন' নাটক দুইখানির অভিনয় হইয়া পূজাবকাশ পর্য্যন্ত থিয়েটার বন্ধ থাকে। ১৩ই অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা শেষোক্ত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া জানান যে পূজার ছুটির পর এই নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইবে।† ৪ঠা নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ 'রুদ্রপাল' নামে ৩১এ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়,—

---

* 'গিরিশচন্দ্র'—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৮২।

† "The Theatre will be closed till after vacation, when Shakespear's Macbeth in Bengali will be played."
—*The Englishman* for Octr. 13, 1874.

GREAT NATIONAL THEATRE. On Saturday last the play of 'Macbeth' or 'Rudropal', dramatized in Bengalee, by one of the managers from the well-known English romance, was for the first time performed by the above theatrical company···

১৮৭৪ সনের ১৪ই ও ২১এ নবেম্বর তারিখে 'আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'কিঞ্চিত জলযোগে'র অভিনয় হয়। 'আনন্দ কাননে' অর্দ্ধেন্দুশেখর একটি ভূমিকা লইয়াছিলেন। শেষের তারিখের অভিনয় সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা ২৪এ নবেম্বর তারিখে লেখেন,—

THE GREAT NATIONAL THEATRE.—The opera Ananda Kanan (The Bower of Bliss) or Madaner Digbijaya was performed at the National Theatre for the second time on Saturday last before a good though not a crowded house. The performance was fairly done, the actors and actresses acquitting themselves creditably. Among them the following deserve special mention : Rati and Sati represented by Jadumoni, Kabita and Kamala by Rajkumari, Ahamika by Khetoo, Chapalata by Haridasi, Lila by Kadu, Sangita by Hari Charan Banerjee, Madan by Sooresh Mitter, Basanta by Nagendra Nath Banerjee, Abibek by Ardhendu Mustafi and Narayan by Amrita Lal Bose······

১৮৭৪, ২৬এ নবেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় পরবর্ত্তী ২৮এ নবেম্বর তারিখে 'রুদ্রপাল' এবং ২রা ডিসেম্বর বুধবার অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী উপলক্ষে 'শত্রুসংহার' নাটক অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুইটি অভিনয় হয় নাই বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ প্রথমটি যে হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। এই সময়ে গ্রেট ন্যাশনালের দলে একটা কিছু গোল বাধে। গিরিশচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতা শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

···লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'আনন্দ কানন' গীতিনাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে প্রীত করিয়া সম্প্রদায়ও বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনমোহন বাবুকে বলেন,—'তুমি একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দাও,—আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ডামেজ দিবে।' ভুবনমোহন বাবু এরূপ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। ('গিরিশচন্দ্র', পৃ. ১৮০)

১৮৭৪, ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত গণ্ডগোলের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সংবাদটি এইরূপ :—

THE NATIONAL THEATRE :—A correspondent writes to say that there has been a collapse at the Great National Theatre, and there was no performance on Saturday night [28 November]. He also mentions some painful facts which may transpire in the Police Court, if, as he says, a warrant has been issued against one prominent character connected with it, for his apprehension on a charge of embezzlement and criminal appropriation ; the amount of defalcation is stated to be Rs. 10,000, which is probably an exaggeration, as is also the statement that a young native gentleman has been induced to incur debts, in connection with the theatre, to the extent of Rs. 50,000

এই সংবাদে অবশ্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই নগেন্দ্রবাবু 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম দিয়া কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করিতে থাকেন।

গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছাড়িবার পর নগেন্দ্রবাবুর দল প্রথমে চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৭৪, ২৭এ ডিসেম্বর (রবিবার) তারিখের 'সাধারণী' পত্রে প্রকাশ,—

কলিকাতার ন্যাসানেল থিয়েটর চুঁচুড়ার বারিকে আসিয়া অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গতবর্ষে আসিয়া যাঁহারা মোহন্ত নাটক দেখাইয়া সাধারণকে প্রীত করিয়াছিলেন, এঁরাই সেই দল। গত বৃহস্পতি বারে [২৪এ ডিসেম্বর] দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হইয়াছিল, গত রাত্রে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতাভিনয় হইয়াছিল। কাল রাত্রিতে বৃটিশ চন্দননগরের উমাচরণ সিংহের বাটীতে 'জামাই বারিক' অভিনীত হইবে।

অতঃপর নগেন্দ্রবাবুর দল 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নামে গড়ের মাঠের সুপরিচিত লিউইস্ থিয়েটার রয়ালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র অভিনয় করেন। ১৮৭৫, ১২ই জানুয়ারি (মঙ্গলবার) তারিখের

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে এই অভিনয় হয় ৯ই জানুয়ারি। যোধপুরের মহারাজা, অনেক গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। রাধিকার ভূমিকায় যাদুমণি, এবং 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' মাতালের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। মদনমোহন বর্ম্মণের নেতৃত্বে কনসার্টও ভালই হইয়াছিল।

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেজে অভিনয় করেন। ১৮৭৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী'র, এবং ৩০এ জানুয়ারি 'আনন্দ কানন' ও 'ভারতে যবন' নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও বিবরণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শেষের দিনের অভিনয়ে খুব জনসমাগম হয় এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করে।

১৮৭৫, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইংলিশম্যানে' বিজ্ঞাপিত হয় যে ১৯এ ফেব্রুয়ারি হইতে অপেরা হাউসে অনেকগুলি গীতিনাট্য অভিনীত হইবে এবং ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকিবেন। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা অনেক দেশীয় অভিনেত্রী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে তাহাও জানানো হয়। ১৯এ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হইবে বলিয়াও এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ আছে।

গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইয়া ৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে অভিনয় আরম্ভ করে। উহার কথা বেঙ্গল থিয়েটারের ইতিহাস-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

আবার গ্রেট ন্যাশনালের কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর ধর্ম্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হইলেন। তিনি পূর্ব্বেও ম্যানেজার ছিলেন; কিন্তু মাঝে কিছুদিনের জন্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজার হন। নগেন্দ্রনাথ ভিন্ন দল গঠন করিবার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর নামে গ্রেট ন্যাশনালের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। ১৮৭৫, ১৬ই জানুয়ারি তারিখের বিজ্ঞাপনে আবার ধর্ম্মদাস সুরের নাম দেখা যায়।

এই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবার পর ১৮৭৪ সনের ১২ই ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে 'শত্রুসংহার' নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকটি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকের অভিনয়ে একটি ছোট ভূমিকা লইয়া সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

> আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। ...তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৮অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'বেণী-সংহার' [শত্রুসংহার] পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বইএর ড্রেস-রিহার্সাল হয় সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।...ইহার কিছুদিন পরই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।...এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেই সঙ্গে মদনমোহন বর্ম্মণ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। ('আমার কথা', ১৩২০, পৃ. ২৩-২৭)

১৮৭৪, ১৯এ ডিসেম্বর তারিখেও 'শত্রুসংহারে'র অভিনয় হয় এবং তাহার পরের সপ্তাহে (২৬এ ডিসেম্বর) 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের অভিনয় হয়।

এই সময়ে বঙ্গীয় নাট্যশালায় কোন বড় জমিদার বা রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয় করিবার একটা রেওয়াজ হয়। বেঙ্গল থিয়েটারই উহার প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৮৭৫, ২রা জানুয়ারি তারিখের অভিনয়-সম্বন্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি :—

Under the distinguished and kind patronage of
His Highness, Moharaj Koomar Hurundra
Kissore Sing Bahadur of Bhettia.
His Highness will be personally present.

এইদিন দুর্গাদাস দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের* প্রথম অভিনয় হয়; অভিনয় খুব সফল এবং উহাতে খুব জনসমাগমও হয়।

ইহার পর-সপ্তাহে (৯ জানুয়ারি) উহার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ১৪ই জানুয়ারি তারিখে লেখেন,—

> গত শনিবার এবং তাহার পূর্ব্বেকার শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে শরৎ-সরোজিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দুই দিন রঙ্গভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শরৎ-সরোজিনী নাটকের অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের এই রূপ কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়া ছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় না কি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচ শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু জীবিত থাকিলে অদ্য তাঁহার কি সুখের দিন হইত! বস্তুতঃ নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অভিনয় উত্তম হইয়াছিল। শরৎ সরোজিনী, সুকুমারী, হরিদাস, মতিলাল ও ভগবানের অংশ সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। বিনয়ের অংশ ভাল হয় নাই। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কের অভিনয় জঘন্য হইয়াছিল। সভার দৃশ্য ও বক্তৃতাদি অপকৃষ্ট হইয়াছিল। শেষ গর্ভাঙ্কের অভিনয় এত উত্তম হইয়াছিল, যে দর্শক মণ্ডলীর অধিকাংশই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের ম্যানেজারদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন আগামী শনিবার এবং আরও দুই তিন দিন এই নাটকখানি অভিনয় করেন। দর্শকের কিছু মাত্র অপ্রতুল হইবে না।

১৮৭৫, ১৬ই জানুয়ারি প্যাণ্টোমাইম ও রাসলীলা প্রদর্শিত হয়। এই অভিনয়ে ব্রহ্মদেশের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী ২১এ জানুয়ারি 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখেন,—

> গত শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে 'প্যাণ্টোমাইম' হইয়াছিল। দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল বলিতে হইবে। বর্ম্মার রাজার দূত উপস্থিত ছিলেন। আগামী শনিবারে শরৎ-সরোজিনী নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হইবে। এবারেও জনতা হইবার সম্ভাবনা।

২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় হয়। উহা প্রমথনাথ মিত্রের 'নগ-নলিনী'।

১৮৭৫, ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান' হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২৮এ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) হোলকার সদলবলে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়ি গমন করেন। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, বেথিয়ার মহারাজকুমার, ব্রহ্মরাজ-দূত, মহীশূর-বংশ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনখানি অভিনয় করেন। অভিনয় দেখিয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পশ্চিম-ভ্রমণ

মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কতকগুলি অভিনেতা গ্রেট ন্যাশনালের নামে অভিনয় করিবার জন্য পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হন। এই দলে ধর্ম্মদাস সুর, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি ছিলেন। ১৩৩১ সালের 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে প্রকাশিত বিনোদিনীর 'আমার অভিনেত্রী জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই পশ্চিম-ভ্রমণের অনেক কথা পাওয়া যায়। উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> আমার থিয়েটারে প্রবেশ করবার কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, আমাদের থিয়েটার পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরুল। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। মা আমায় একলা ছেড়ে দিতেন না, তিনিও আমার সঙ্গে গেলেন। যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের প্রথমে দিল্লীতেই যাওয়া হয়।......দিল্লীতে অভিনয় সাত আট দিন হয়েছিল। সেখানে বড় সুবিধে হয়নি। তবে আমরা আরও দিন-সাতেক সেখানে ছিলাম! যা যা দেখবার, আমাদের সব দেখান হয়েছিল।......... আমরা দিল্লী ছেড়ে লাহোরে রওনা হলাম। [পৃ. ৩২০]†
>
> লাহোরে আমরা অনেক দিন ছিলাম। তবে অভিনয় রোজ হ'ত না, বোধ করি দশ বার দিন মাত্র হয়েছিল। নাচগানের বহরই সেখানে বেশী চলত, নাটকের অভিনয় বড় হ'ত না।

---

* শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেকে ভ্রমক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাসকে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবু নাটকখানির প্রকাশক বটেন।

† "The Great National Theatre Company of Calcutta have gone to Lahore."—*The Indian Mirror* for April 7, 1875.

অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে খুব আসর জমিয়ে নিয়েছিলেন, প্রায়ই বড় বড় লোকদের বাড়ি তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত। তারই জন্যে আমাদের সেখানে অত বেশী দিন থাকতে হয়েছিল। আমরা সকলেই কিন্তু সেখানে বেশ আমোদ আহ্লাদের মধ্যে ছিলাম।......

যাক, ক্রমে আমাদের বিদায় নেবার সময় এল। শেষ অভিনয়ের দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি গান বেঁধে দেন, তার একটি লাইন আমার মনে আছে ; গানটি এই,—

"লাহোরবাসি, লইতে বিদায়
দুঃখে প্রাণে আমাদের সকলের—"

গানটি গাওয়া হ'ল,

"নিদয় বিধাতা, কেনরে আমারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করিয়া—"

এই সুরে। অভিনয়ের পর একটি সভা হয়, আমরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চোখের জলের মধ্যে লাহোরবাসীদের কাছে বিদায় নিই।

আমাকে নিয়ে এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং ব'লে একজন মস্ত বড় লোক সেখানে ছিলেন, তাঁকে সবাই রাজা ব'লে ডাকত। তাঁর খেয়াল হ'ল আমায় তিনি বিয়ে ক'রে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর এ কথাও বললেন, মা যদি সেখানে থাকতে চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই ; মাকে তিনি মাসে ৫০০৲ ক'রে টাকা দেবেন। মা ত কেঁদেই অস্থির, তাঁর ভয় হ'ল যদি তিনি আমায় কেড়ে নেন। ধর্ম্মদাস বাবু তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, "না গো ওরা ভদ্রলোক, ওরা অসদব্যবহার করবে না। আর আমরাও শীগ্‌গির চলে যাচ্ছি, ভয় কি!" আমি সিংজীকে দেখেছিলুম, খুব সুন্দর, কিন্তু যে তার লম্বা দাড়ি! দেখেই ভয় হ'ত, আমি ছোটবেলা দাড়িওলা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না। হাঁ একটা কথা বলা হয় নি,—'সতী কি কলঙ্কিনী'তে আমি রাধিকা সেজেছিলাম, সেই সাজে আমায় দেখে তাঁর বিয়ে করতে খেয়াল হয়েছিল। শেষটা গল্পের মতই হ'ল, আমাদের বিয়ে আর হ'ল না।

এ ত সামান্য টাকা,—আমার এই অভিনেত্রী-জীবনে দু-তিনবার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে এসেছিল, থিয়েটারের মায়ায় তা আমি ধুলোর মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম।...

লাহোর থেকে আমরা মিরাট যাই ; সেখানে মাত্র তিন দিন অভিনয় হয়েছিল। [পৃ. ৩৬১-৬৩]...

মিরাট থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার মাঝখানে দিন-কতক আমরা আগ্রায় "প্লে" করি, আগ্রায় আমরা বেশী দিন ছিলাম না। বোধ হয় সেখানে টিকিট বিক্রয় বড় বেশী হ'ত না। মাত্র তিন চারিদিন আমরা আগ্রায় ছিলাম। রাত্রে অভিনয় হ'ত, আর দিনের বেলায় আমাদের কাজ ছিল, তাজমহল, যমুনার ধার, আর বড় বড় সব বাড়ি বেড়ান। ধর্ম্মদাস বাবু এবং অবিনাশ বাবু আমাদের এই সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন ; তাঁদের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেমন বিদেশে গেছিলাম, তাঁরাও তেমনি যত্ন ক'রে আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁদের ব্যবহারে কোন দোষ ধরবার ছিল না। আগ্রায় অভিনয় করবার সময়ই কথা উঠ্‌লো, বৃন্দাবনের এত কাছে এসে, গোবিন্‌জী না দেখে দেশে ফেরাটা নিতান্তই অ-হিন্দুর মত হয়, কাজেই দলের সকলেরই মত হ'ল, লক্ষ্ণৌ যাবার আগে একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে যাওয়াই উচিত। যেমনি কথা উঠলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। তখন আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাবার রেল হয় নি। আমাদের সব উটের গাড়ীতেই যেতে হ'ল। দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে গাড়ীতে উঠলেম। উঠের গাড়ীখানা দোতলা ছিল, আমি ত আগেই দোতলার ওপর উঠে বসলাম ; লক্ষ্মী নারায়ণী আমার সঙ্গেই ওপরে এসে বস্‌ল। মা, ক্ষেতুদিদি এরা সব নীচেই বস্‌লো,—কাদম্বিনীও তাদের সঙ্গে বস্‌লো, তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, তিনি একটু গম্ভীর হয়েই থাকতেন, একে গায়িকা, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী, যাক—তারপর সমস্ত দিন-রাত হটর-হটর ক'রে উটের গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে পরদিন সকাল সাতটায় বৃন্দাবনে পৌছান গেল। যাবার সময় পথে সকলের কি আনন্দ, দেবদর্শনের জন্য সকলের কি উৎসাহ!......

শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে পরদিনই আমরা সেই উটের গাড়ী চড়ে আবার আগ্রায় ফিরলাম। সেখানে একরাত্রি বিশ্রাম ক'রে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে রওনা হলাম। [পৃ. ৩৯৩-৯৪]

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম থেকে পর দিনই আগ্রায় ফিরে এসে একরাত্রি বিশ্রাম করা হ'ল। তারপর আমরা সদলবলে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলাম। আমাদের যাবার আগে সেখানে আমাদের এক জন লোককে পাঠানো হয়েছিল, সে গিয়ে আমাদের জন্যে একটা বাসা ঠিক ক'রে রেখেছিল, আমরা গিয়ে ত সেখানে উঠলাম। সেখানে ছত্রমঞ্জিলে ধর্ম্মদাস বাবু দিন খাটিয়ে এক রকম ক'রে ষ্টেজ সাজিয়ে নিলেন, সে বেশ দেখতে হয়েছিল। কল্‌কাতার নামজাদা ন্যাসান্যাল থিয়েটার অভিনয় করতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে লোক ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল, থিয়েটার দেখবার জন্যে মারামারি পড়ে গেল। মস্ত বড় এক বাড়ির মধ্যে আমাদের ষ্টেজ বাঁধা হ'য়েছিল। চারদিকে গ্যাসের আলো জ্বলছিল, সমস্ত বাড়িটা লোকে ভরে গিয়েছিল, অভিনয়ের সময় বেশ জমজম করতে লাগল।

প্রথম দিন লীলাবতীর অভিনয় হ'ল। তারপর একখানি অপেরা, 'সতী কি কলঙ্কিনী,' কি 'কামিনীকুঞ্জ,' এমনই একখানি কি অপেরা ; এই দু'-খানি অপেরাই বেশী হ'ত।

দু-দিন অভিনয় করবার পর একদিন বিশ্রাম করবার জন্য অভিনয় বন্ধ রইল। সে দিন আমরা বেড়াতে বার হ'লাম। কত বাগান, বেগম মহল আমরা দেখে বেড়াতে লাগ্‌লাম। ... ...

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নেমন্তন্ন ক'রে আসা হ'ল। যত সব বড় বড় সাহেব মেম ও ওখানকার যত সব বড় লোক, সবই সে দিন থিয়েটার দেখতে আস্‌বেন। তাই স্থির করা হ'ল, 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটকখানির অভিনয় সব চেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জমত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা!

নীলমাধব বাবু কর্ত্তা সাজতেন, নবীনমাধব সাজতেন মহেন্দ্র বাবু, বিন্দুমাধব ভোলানাথ ব'লে একজন নতুন লোক, উড সাহেব অর্দ্ধেন্দু-বাবু, তোরাব মতিলাল সুর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশ বাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, তার ওপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাট্‌কাট্ মারমার গোঁয়ারগোবিন্দ-গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত, হাঁ সত্যিকারের রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তফি সাহেবকে—আড়ে বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তার পর মতিলাল সুরের তোরাব, সে তোরাব আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর। বিন্দুমাধবটি ভাল মানুষ, কর্ত্তাও নিরীহ গোছের লোক।

ফিমেল পার্টে—ক্ষেতুদিদি সাবিত্রী, কাদম্বিনী সৈরিন্ধ্রী, আমি সরলা, লক্ষ্মী ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়ণী।

পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষৌয়ের এই ঘেরা বাড়িতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।

সেদিন বাড়ি একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

অভিনয় ত আরম্ভ হ'ল। হাঁ, ভাল কথা, সেদিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল ইংরাজীতে, এবং তার সঙ্গে দু চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সেদিন যেন কেমন ভয় ভয় করছিল,—কিন্তু অভিনয় যতই এগিয়ে যেতে লাগল, আমাদের সে ভয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় করতে লাগলাম।

ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার ক'রে বলছে, "ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।" তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনি সাহেব দর্শকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হ'তে লাগল—সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচ জনে তাদের ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল,—আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না! ভাবলাম আর রক্ষে নাই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে!

যাক্, কতক সাহেব চলে গেল, যারা তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের উপর উঠে এল, তাদের আর পাঁচজন ঠেকাতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে এলেন,—সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব। সৈন্য আসতে তখন গোলমাল কতকটা ঠাণ্ডা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তখনই অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলেন এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্ম্মদাস বাবু চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না! অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নীচে তিনি চুপ ক'রে বসে আছেন। কার্ত্তিক পাল ত তাঁকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন;—তিনি কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত্ত ছেড়ে বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশ বাবু, অর্দ্ধেন্দু বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলে দিলেন, "এখানে আর অভিনয় ক'রে কাজ নেই, পুলিস সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিস পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।"

আমরা ত দুর্গা নাম করতে করতে গাড়ীতে উঠে বাসার দিকে রওনা হলাম। অনেক অভিনেতাও আমাদের গাড়ীর পেছন পেছন একা ক'রে আস্‌তে লাগলেন। সিন ড্রেস সব সেইখানেই পড়ে রইল, অবশ্য পুলিসের জিম্মায়। ঠিক হ'ল, সকালে এসে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় এসে পড়লাম। সে ছাই বুকের কাঁপুনি কি আর যায়! খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গেল, অনেকেই কিছু খেলে না। সকালে কখন কি ক'রে কলকাতায় ফেরা যাবে, তারই পরামর্শ হ'তে লাগল। সে রাতটা আর কারু চোখে ঘুম এল না, ঘুম কি আর আসে!

সকাল বেলা উঠে, ধর্ম্মদাস বাবুও আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে চলে গেলেন। সিন্ ড্রেস দেখে আনবার কথা উঠল। ধর্ম্মদাস বাবু বললেন, 'আমি ওখানে আর যাচ্ছি না, সিন ড্রেস থাক পড়ে।' সেখানে যে-সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁরা আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা কুলি পাঠিয়ে সিন ড্রেস সব আনিয়ে বেঁধে ছেঁদে লাগেজ ক'রে দিলেন। তাঁদের ভারি ইচ্ছে ছিল

আরও দু-এক দিন এখানে অভিনয় হয়, তাঁরা সব ষ্টেশনে এসে সে-কথাও বললেন, 'ষ্টেশনের মাঠে ষ্টেজ বেঁধে আপনারা আরও দুটো দিন অভিনয় করুন।' কিন্তু কেউ আর সেখানে থাকতে রাজি হলেন না।...[পৃ. ৪২৭-২৯] *

পরবর্ত্তী মে মাসের গোড়ায় এই দল পশ্চিম-ভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

ধর্ম্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনালের একটি অংশ যখন পশ্চিমে অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন মূল গ্রেট ন্যাশনালও কলিকাতায় অভিনয় করিতেছিল। সে-সময়ে বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু এই নাট্যশালার 'অস্থায়ী ম্যানেজার' ছিলেন। এই কয় মাসের মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে যে-সকল অভিনয় হয় তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—সধবার একাদশী (২০ মার্চ্চ), নয়শো রূপেয়া (১০ এপ্রিল), তিলোত্তমাসম্ভব (১৭ এপ্রিল), সাক্ষাৎ-দর্পণ (২৪ এপ্রিল) ও নন্দন কানন (৮ মে)।

মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই উপলক্ষে ১৮৭৫, ১৫ই মে তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

> The portion of the Company lately giving so many successful performances in Delhi, Lahore etc. so favourably noticed in the papers having just returned to Calcutta, the performances will henceforth be on a grand scale. The orchestra under the direction of Modun Mohun Burman is a charming one.

মদনমোহন বর্ম্মণের প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। তিনি কাদম্বিনী নামে একটি অভিনেত্রীকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আবার গ্রেট ন্যাশনালে ফিরিয়া আসেন।

১৮৭৫, ৩রা জুলাই তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে মহেন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় হয়। ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশ, এই অভিনয় মহেন্দ্রবাবুর সাহায্যার্থ হয়, এবং মহেন্দ্রলাল নিজে ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন; আলাউদ্দীনের ভূমিকা গ্রহণ করেন গোপালচন্দ্র মজুমদার। এই নাটকের শেষে জনপ্রিয় অভিনেত্রী যাদুমণি 'ভারত-সঙ্গীত' গান করেন।

দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার

ইহার অল্পদিন পরেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভুবনমোহন নিয়োগী স্বত্বাধিকারী হইলেও ধর্ম্মদাস সুরই উহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। আগষ্ট মাস হইতে ভুবনবাবু ধর্ম্মদাস সুরের হাত হইতে কার্য্যভার অপসারিত করিয়া রঙ্গমঞ্চ শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইজারা দেন। ১৮৭৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিতে পাই,—

> GREAT NATIONAL THEATRE.—The grand Beadon Street pavilion owned by Babu Bhuban Mohun Neogi has been leased out to Babu Krishnadhan Banerjee and this evening the brilliant drama Padmini will be performed under the management of Babu Mohendra Lall Bose...

এই ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে আছে। অবিনাশবাবু বলেন,—

> ...মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাস বাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজের সম্মুখে অভিনয় করিয়া গ্রেট ন্যাশান্যাল সম্প্রদায় যেরূপ অধিক অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন বাবুকে যৎসামান্য অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহার স্বরূপ একখানি অল্পমূল্যের রুমাল ও একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া ভুবনমোহন বাবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ খৃঃ) হইতে

---

* গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌয়ে যে-সকল অভিনয় হয় তৎসম্বন্ধে ১৮৭৫, ৩০এ মে তারিখের 'সাধারণী' পত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রকাশিত হয়,—

> নাটকাভিনয়। লক্ষ্ণৌয়ে।—লক্ষ্ণৌয়ে ন্যাশনাল থিয়েটরের দ্বারা সতী কি কলঙ্কিনী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে অভিনীত হইয়াছে।...ইহার পর 'ভারত মাতার বিলাপ' অভিনীত হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে অভিনীত হয় নাই, মধ্যে অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া অল্পেতেই সমাপ্ত করা হইয়াছিল। বোধ হয় রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়া।...
>
> অতঃপর নীলদর্পণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।...

শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষ্ণধন বাবু থিয়েটারের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রলাল বসুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন ;...(পৃ. ১৮৪-৮৫)

এই সময় ধর্ম্মদাস সুর ও আরও কয়েক জন অভিনেতা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হন। তাঁহারা 'দি নিউ এরিয়ান (লেট্ ন্যাশনাল) থিয়েটার' নাম লইয়া ১৮৭৫, ১৪ই আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন। বেঙ্গল থিয়েটারের বিবরণে এ-কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহেন্দ্রলাল বসুর অধ্যক্ষতায় ১৮৭৫ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে 'পদ্মিনী' নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়-সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই, কাজেই থিয়েটারের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারিতেছি না ; কিন্তু পরবর্ত্তী ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয়-সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহাতে থিয়েটারের নাম The Indian (late *Great*) National Theatre বলিয়া দেওয়া আছে। ১৭ই আগষ্ট তারিখের 'ইংলিশম্যানে' শরৎ-সরোজিনী অভিনয়ের যে বিবরণ বাহির হয় তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

> The following actors and actresses deserve special notice :—Babu Mohendro Lal Bose (Sarat), Kiran Ch. Banerjee, Jagattarini, Bindubasini and Kshetramani. The songstress Jadumoni deserves praise.

ইহার পর এই নূতন নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ' অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৫ সনের ২১এ আগষ্ট। বিজ্ঞাপনে আছে—"With an entirly New Cast." এই সময়েই অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আসিয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে' যোগদান করেন বলিয়া মনে হয়। বিনোদিনী তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন,—

> তখন নীলদর্পণের অভিনয় খুব সমারোহে চলছিল, সেই সময় ভুনিবাবু (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) আমাদের থিয়েটারে এলেন, এর আগে ত তাঁকে দেখিনি, শুনলাম ইনি জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে যে থিয়েটার হয় তাতে নীলদর্পণে ছোট বৌ সাজতেন। এবারে আমাদের এখানে তাঁকে আর সেই ছোট বৌটি সাজতে হ'ল না, সাজলেন তাঁর স্বামী বিন্দুমাধব।

'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দুই দিন পরে—২৩এ আগষ্ট তারিখে সুকুমারী দত্তের * সাহায্য-রজনী উপলক্ষে 'অপূর্ব্ব সতী' অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ও ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে যথাক্রমে দুইখানি নূতন নাটক অভিনীত হয় ; নাটক দুইখানির নাম 'ডাক্তার বাবু' ও 'কনকপদ্ম'।

১৮৭৫, ৬ই নবেম্বর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' অভিনীত হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। পূজাবকাশের পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালে ইহাই প্রথম অভিনয়, কারণ বিজ্ঞাপনে "Grand Opening Night" দেখিতেছি। খুব সম্ভব উহার অব্যবহিত পরেই এই থিয়েটারে আর একটি পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৭৫ সনের আগষ্ট মাসে শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ইজারা লন। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশচন্দ্র' পুস্তকে (পৃ. ১৮৫) লিখিয়াছেন,—

> চারিমাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি [কৃষ্ণধনবাবু] ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, থিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না। ভুবনমোহন বাবু বাধ্য হইয়া পুনরায় থিয়েটার নিজ-হস্তে গ্রহণ করিলেন।
>
> এবার গ্রেট ন্যাসান্যালের ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাস [হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র] এবং ম্যানেজার হইলেন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

২৩এ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল

---

* এই অভিনেত্রীটি প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার নাম ছিল গোলাপ। শরৎ-সরোজিনী নাটকে তিনি 'সুকুমারী'র ভূমিকা অভিনয় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'সুকুমারী' নাম দিয়াছিল। ১৮৭৫ সনের প্রথম দিকে উপেন্দ্রনাথ দাসের চেষ্টায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৭৫, ১২ই ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে পাই,—

> সাপ্তাহিক সংবাদ।...প্রতিধ্বনি বলেন, গ্রেট-ন্যাসনেল থিয়েটারের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোলাপমোহিনীর সহিত উক্ত নাট্যশালার অন্যতর অভিনেতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দত্তের বিবাহ ১৮৭২ অব্দের তিন আইন অনুসারে আগামী মঙ্গলবার নির্ব্বাহ হইবে, এমত কথা আছে।

থিয়েটার' নাম উঠিয়া এই নাট্যশালার পূর্ব্বনাম আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মনে হয় এই সময়েই ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটে। যে-বিজ্ঞাপনটির কথা বলিলাম তাহা এইরূপ,—

GREAT NATIONAL THEATRE.
Sensational Attractions !!
Saturday 29th December, 1875.
হীরক চূর্ণ নাটক
THE DEPOSED GAEKWAR !!
The subject is of *National* interest, and the performance will be sustained with zeal and ardour by all the actors and actresses of the Theatre.
Railway train on the Stage !!!
The author himself has kindly consented to take up a part in the play.

অমৃতলাল বসু এই নাটকের প্রণেতা। 'হীরকচূর্ণ' নাটকটির বিষয় গাইকোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতি।*

ইহার পর গ্রেট ন্যাশনালে দুর্গাদাস দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক ১৮৭৫, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে সুকুমারী দত্ত বিনোদিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

পর বৎসর (১৮৭৬) ৮ই জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বেলেটীর জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রকৃত বন্ধু' নাটক অভিনীত হয়। বিনোদিনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

> হেমলতার পর আমাদের যে নূতন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম 'প্রকৃত বন্ধু'। এ নাটকে নায়ক সাজলেন, স্বর্গীয় মাধু বাবু। এঁর পুরা নাম, বাবু রাধামাধব কর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ৺ আর, জি, করের ভাই। আমি যখন থিয়েটারে যাই, তখন এই মধু বাবুও আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন।
>
> ইনি অভিনেতাও ছিলেন ভাল, সুগায়কও ছিলেন। শিক্ষক ব'লেও এঁর খ্যাতি ছিল খুব। মাধু বাবু নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা। (রূপ ও রঙ্গ, ১৮ মাঘ ১৩৩১)

'প্রকৃত বন্ধু' নাটক অভিনয় হইবার পরের তিন সপ্তাহে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের এবং ৫ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারি 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয়। উহার পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯এ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে যে অভিনয় হয়, উহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ এই অভিনয়ের ফলে গবর্ণমেণ্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্য আইন করেন।

ঘটনাটি এই। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স রূপে কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের বাড়িতে আহ্বান করেন। যুবরাজ তাঁহার ভবানীপুরের বাড়িতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া ভারতীয় প্রথায় বরণ করেন।† এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী-সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং কাগজে অনেক লেখালেখি ও প্রতিবাদ হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীমাৎ' শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষ্যেই লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানা প্রহসন অভিনয় করে। প্রহসনখানির নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ সনের ১৯এ ফেব্রুয়ারি শনিবার 'সরোজিনী' নাটক অভিনীত হইবার পর এই প্রহসন-খানিও অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয়ে খুব জন-সমাগম হয় এবং পরবর্ত্তী বুধবারে (২৩ ফেব্রুয়ারি) গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর সাহায্যার্থ 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'গজদানন্দ' অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন 'গজদানন্দ' ভিন্ন নামে ও আকারে অভিনীত

---

* ইহা প্রকাশিত হইলে ১৮৭৫ সনের ১৭ই জুন 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

> হীরক চূর্ণ, অথবা গাইকোয়াড় নাটক, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ৷৵০ আনা। গ্রন্থ-কারের নাম নাই, কিন্তু তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছি তাহার নাম অমৃতলাল বসু এবং তাহাকে আমরা একজন খ্যাতাপন্ন আক্টর বলিয়া জানি।...

† "His Royal Highness the Prince of Wales went, we are told, to the residence of the Hon'ble Babu Juggodanand Mukerji, Member of the Bengal Council and Junior Government Pleader, accompanied, among others, by Her Highness the Begum of Bhopal and the Hon'ble Miss Baring. A large number of Bengali ladies and girl congregated at the house of the Babu to see his Royal Highness. The visit we are informed, was arranged through Dr. Fayrer, to enable the Prince to have an idea of the Bengali Zenana life."
—*The Indian Mirror* for Jany. 5, 1876.

হয় বলিয়া একজন দর্শক উল্লেখ করিয়াছেন। * কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয় হইবার পরই একজন সম্ভ্রান্ত ও রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিস হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কর্ণাটকুমার নাটক', এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটিকে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল। অভিনয়-শেষে থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা করিলেন। ১৮৭৬, ৩রা মার্চ্চ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রে প্রকাশ,—

> ন্যাসন্যাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্তচক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরাজজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে। যাহাহউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেণ্টও মুদ্গর প্রস্তুত করিয়াছেন।

'হনুমান চরিত্র' ও 'কর্ণাটকুমার' নাটকের অভিনয়ও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেলে, ১লা মার্চ্চ তারিখে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্য-রজনী উপলক্ষে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া 'The Police of Pig and Sheep' নামে একটি প্রহসন ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হইল। এই অভিনয়-শেষেও উপেন্দ্রনাথ দাস 'অভিনেত্রী' সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বক্তৃতা করেন। নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য বড়লাট নর্থব্রুক ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন এবং এ-সম্বন্ধে একটি আইন করিতেও বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

১লা মার্চ্চ তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিলেন,—

> A GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY was issued last evening containing an Ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory. seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest......
>
> We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous farce, entitled "Gajanund" on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta All honor to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency The Ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Viceregal Council on the subject."

এদিকে তিনবার বাধা পাইবার পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার আর নিষিদ্ধ প্রহসনগুলির অভিনয় না দেখাইয়া সাধারণ অভিনয় দেখাইবার বিজ্ঞাপন দিলেন। কিন্তু ইহাতেই ব্যাপারটা মিটিয়া গেল না। গবর্ণমেণ্ট একদিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট ন্যাশনালের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অন্য উপায়ে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল। ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'উভয় সঙ্কট' অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যখন 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিসের ডেপুটি কমিশ্যনর সদলবলে গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রমুখ আট জন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ—পূর্ব্বে অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। ৬ই মার্চ্চ তারিখে উত্তর-বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্সের এজলাসে দশ জন আসামীর বিচার আরম্ভ হইল।† ৮ই মার্চ্চ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্র বাবু ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ হইল; অন্য সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। এই রায়ের সম্বন্ধে ১৮৭৬ সনের ১০ই মার্চ্চ তারিখে 'ভারত-সংস্কারক' লিখিলেন,—

---

* "THE "GAJANANDA" FARCE. To the Editor of the *Indian Mirror*. Sir,—That objectionable farce 'Gajananda' was again brought on the stage of the Great National Theatre last night, but under a new name, and in a somewhat different garb. I must, however, candidly admit, that there was nothing obscene in it. The presence of the Police had no doubt something to do with it. The Director of the Theatre availed himself of a pause between the two Acts to harangue the audience in eloquent language on behalf of his Company, and was quite successful too......" Yours truly G. C. Dey. *The 24th Feb.* 1876 (*The Indian Mirror* for Feb. 27, 1876).

† "Yesterday the Court of the Magistrate of the Northern Division was crowded to suffocation, the occasion being the trial of the actors of the Great National Theatre, under Sections 292 and 294 of the Penal Code, they having been alleged to have acted on the 1st instant an immoral piece, entitled *Surendro Benodini*. The defendants, ten in number, were arrested on warrants issued by Mr. Dickens, and, after being confined a whole night, were released on bail to appear before the Magistrate on Monday...The case was, after this, adjourned till to morrow."—*The Indian Mirror* for March 7, 1876.

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর সামান্য পরিশ্রমের সহিত এক এক মাস মেয়াদ হইয়াছে। যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।

সে যাহা হউক এই বিচারের পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। এই মোকদ্দমায় সে-যুগের অনেক বিখ্যাত উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৯ই মার্চ্চ বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীর এজলাসে এই মোকদ্দমার শুনানী হইল। এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নির্দ্দেশ-মত মিঃ ব্রানসন্, এম. ঘোষ ও টি. পালিত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ২০এ মার্চ্চ বিচারপতিদ্বয় রায় দিলেন। হাই-কোর্টের বিচারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্র বাবু ও অমৃতলাল দুই জনেই মুক্তি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার অনেক গণমান্য লোকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সনের মার্চ্চ মাসে Dramatic Performances Control Bill নামে যে আইনটির খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয় তাহা সে-বৎসরের শেষের দিকে আইনে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল বলা যাইতে পারে। ১৮৭৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখিলেন,—

নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জ্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এই রূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।

পরিশিষ্ট

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, শনিবার *Indian Daily News* ১৯-৯-৭৪ ; অ. বা. প. ১৭-৯-৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী	ঐ	২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ২৪-৯-৭৪
পুরুবিক্রম	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩ অক্টোবর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ১-১০-৭৪
{ সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ অক্টোবর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ৮-১০-৭৪
{ ভারতে যবন (রূপক)	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
রুদ্রপাল (১ম অভিনয়)	হরলাল রায়	৩১ অক্টোবর ১৮৭৪, শনিবার *I. D. N.* ৪-১১-৭৪ ; ইং. ৩১-১০-৭৪
{ সতী কি কলঙ্কিনী	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো।	৭ নবেম্বর ১৮৭৪, শনিবার *I. D. N.* ৭-১১-৭৪ ; অ. বা. প. ৫-১১-৭৪
{ ভারতে যবন	কিরণচন্দ্র বন্দ্যো।	
{ আনন্দ কানন	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	১৪ নবেম্বর ১৮৭৪, শনিবার *I. D. N* ১৪-১১-৭৪ ; অ. বা. প. ১২-১১-৭৪
{ কিঞ্চিৎ জলযোগ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ঐ	ঐ	২১ নবেম্বর ১৮৭৪, শনিবার *I. D. N.* ২১-১১-৭৪ ; অ. বা. প. ১৯-১১-৭৪
রুদ্রপাল (এই অভিনয় হয় নাই)	হরলাল রায়	২৮ নবেম্বর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ২৬-১১-৭৪
শত্রুসংহার (বেণীসংহার অবলম্বনে)	(অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী)	২ ডিসেম্বর ১৮৭৪, বুধবার অ. বা. প. ২৬-১১-৭৪
শত্রুসংহার	হরলাল রায়	১২ ডিসেম্বর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ১০-১২-৭৪
ঐ	ঐ	১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ১৭-১২-৭৪ ; *I. D. News* ১৯-১২-৭৪
বঙ্গের সুখাবসান	ঐ	২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪, শনিবার অ. বা. প. ২৪-১২-৭৪
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	২ জানুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার অ. বা. প. ৩১-১২-৭৪
ঐ	ঐ	৯ জানুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার অ. বা. প. ১৪-১-৭৫
{ প্যাণ্টোমাইম		১৬ জানুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার ইং. ১৬-১-৭৫ ; অ. বা. প. ২১-১-৭৫
{ রাসলীলা		
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	২৩ জানুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার অ. বা. প. ২১-১-৭৫
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	৩০ জানুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার ইং. ৩০-১-৭৫
ঐ	ঐ	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার ইং. ৬-২-৭৫
শত্রুসংহার	হরলাল রায়	১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, বুধবার ইং. ১০-২-৭৫
নবীন-তপস্বিনী	দীনবন্ধু মিত্র	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার ই. ১৩-২-৭৫
নগ-নলিনী	প্রমথনাথ মিত্র	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার -ইং. ২০-২-৭৫
শরৎ-সরোজিনী	দুর্গাদাস দাস	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, শনিবার অ. বা. প. ৪-৩-৭৫
হেমলতা	হরলাল রায়	৬ মার্চ্চ ১৮৭৫, শনিবার ইং. ৬-৩-৭৫

সধবার একাদশী দীনবন্ধু মিত্র ২০ মার্চ্চ ১৮৭৫
ইং. ২০-৩-৭৫

{ জামাই বারিক ঐ ৩ এপ্রিল ১৮৭৫
{ ভারতে যবন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইং. ৩-৪-৭৫

{ নয়শো রুপেয়া শিশিরকুমার ঘোষ ১০ এপ্রিল ১৮৭৫
অ. বা. প. ৮-৪-৭৫
{ ভারত-সঙ্গীত —

{ তিলোত্তমাসম্ভব মাইকেল ১৭ এপ্রিল ১৮৭৫
ইং. ১৭-৪-৭৫
{ একেই কি বলে সভ্যতা ঐ

সাক্ষাৎ-দর্পণ ২৪ এপ্রিল ১৮৭৫
অ. বা. প. ২২-৪-৭৫

নন্দনকানন (গীতিনাট্য) ৮ মে ১৮৭৫

শরৎ-সরোজিনী দুর্গাদাস দাস ১৫ মে ১৮৭৫
ইং. ১৫-৫-৭৫

{ পদ্মিনী মহেন্দ্রলাল বসু ৩ জুলাই ১৮৭৫ ইং. ৩-৭-৭৫
(মহেন্দ্রলাল বসুর সাহায্য-রজনী)
{ ভারত-সঙ্গীত —

দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার

পদ্মিনী মহেন্দ্রলাল বসু ৭ আগষ্ট ১৮৭৫ ইং. ৭-৮-৭৫

শরৎ-সরোজিনী দুর্গাদাস দাস ১৪ আগষ্ট ১৮৭৫ ইং. ১৪-৮-৭৫

নীলদর্পণ দীনবন্ধু মিত্র ২১ আগষ্ট ১৮৭৫
অ. বা. প. ১৯-৮-৭৫

অপূর্ব্ব সতী সুকুমারী দত্ত ২৩ আগষ্ট ১৮৭৫, সোমবার
(সুকুমারী দত্তের সাহায্য-রজনী) ইং. ২৩-৮-৭৫

সতী কি কলঙ্কিনী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ আগষ্ট ১৮৭৫, শনিবার
ইং. ২৮-৮-৭৫

ডাক্তার বাবু ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
ইং. ৪-৯-৭৫

রং-তামাশা ও নৃত্য ... ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
ইং. ১১-৯-৭৫

পুরুবিক্রম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
ইং. ১৮-৯-৭৫

{ কনক পদ্ম হরলাল রায় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫
ইং. ২৫-৯-৭৫
{ Burlesque [? এই কলিকাল]*

বৃত্রসংহার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ নবেম্বর ১৮৭৫
ইং. ৬-১১-৭৫

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

হীরক চূর্ণ নাটক অমৃতলাল বসু ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫
অ. বা. প. ২৩-১২-৭৫

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী দুর্গাদাস দাস ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫, শুক্রবার
(১ম অভিনয়) অ. বা. প ৩০-১২-৭৫

শরৎ-সরোজিনী ঐ ২ জানুয়ারি ১৮৭৬, রবিবার
অ, বা প ৩০-১২-৭৫

প্রকৃত বন্ধু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ৮ জানুয়ারি ১৮৭৬, শনিবার
অ. বা. প. ১৩-১-৭৬

সরোজিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬, শনিবার
অ. বা. প. ১৩-১-৭৬

ঐ ঐ ২২ জানুয়ারি ১৮৭৬
ইং. ২৫-১-৭৬

ঐ ঐ ২৯ জানুয়ারি ১৮৭৬
অ. বা. প. ২৭-১-৭৬

বিদ্যাসুন্দর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (?) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬
অ. বা. প. ৩-২-৭৬

ঐ ঐ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬
অ. বা. প. ১০-২-৭৬

{ সরোজিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬
{ গজদানন্দ ও যুবরাজ উপেন্দ্রনাথ দাস (?) ইং. ১৯-২-৭৬

{ সতী কি কলঙ্কিনী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, বুধবার
(অমৃতলাল বসুর সাহায্য-রজনী) ইং. ২৩-২-৭৬
{ গজদানন্দ ও যুবরাজ উপেন্দ্রনাথ দাস

{ কর্ণাটকুমার সত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬,
শনিবার ইং. ২৬-২-৭৬
{ হনুমান চরিত্র —

{ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী দুর্গাদাস দাস ১ মার্চ ১৮৭৬, বুধবার
(উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্য-রজনী) ইং. ১-৩-৭৬
{ পুলিশ অফ পীগ্
এণ্ড শীপ্

{ সতী কি কলঙ্কিনী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ মার্চ ১৮৭৬, শনিবার
ইং. ৪-৩-৭৬
{ উভয় সঙ্কট রামনারায়ণ তর্করত্ন

সরোজিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ মার্চ ১৮৭৬
(উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্যকল্পে) ইং. ১১-৩-৭৬

আনন্দ কানন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৮ মার্চ ১৮৭৬
ইং. ১৮-৩-৭৬

পদ্মিনী মহেন্দ্রলাল বসু ১ এপ্রিল ১৮৭৬
ইং. ১-৪-৭৬

ভীমসিংহ তারিণীচরণ পাল ৮ এপ্রিল ১৮৭৬
ইং. ৮-৪-৭৬

---

* ১৮৭৫ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র এই বিজ্ঞাপনটি দেখিতেছি :—

Burlesque ! Burlesque ! Burlesque !

এই কলিকাল

ব্যঙ্গকাব্য।

অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় কেহ ব্যঙ্গ কাব্য প্রণয়ন করেন নাই। এইখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়া গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটরে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। ৭৯ নং আহিরীটোলা হজুরের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট...প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা।

মহাশ্বেত

—শ্রীসুশীলকুমার দে

মহাশ্বেতা দেখিল কারে অচ্ছোদের কূলে,
পড়িল কার অক্ষমালা আসিয়া পদমূলে ?
কে আসি কানে পরাল পারিজাত,
মৃণালসম ললিত-মৃদু কাহার দুটি হাত ?

শুভ্রবেশ, আর্দ্রকেশ, অক্ষমালা হাতে,
তাপস-যুবা পুণ্ডরীক আসিল কেন প্রাতে ?
আনিল কেন ত্রিদিব-ফুলমালা,
নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রহিল রাজবালা !

মকরকেতু ধনুকবাণ নিভৃতে ল'য়ে করে
সেদিন বুঝি ভ্রমিতেছিল বনের অন্তরে,
চাহিয়া শুধু দেখিল হাসিমুখে,—
পাগল-করা পুষ্পশর বিঁধিল আসি বুকে।

তরুণ ঋষি অক্ষমালা ভুলিয়া গিয়া, পরে
ফিরিয়া আসি চাহিল যবে, বেপথু-ভরা করে
মুক্তামালা কণ্ঠ হ'তে খুলে,
অক্ষমালা রাখিয়া গলে দিল সে বালা ভুলে।

কুসুমশর দৃষ্টি সাথে দৃষ্টি বুঝি গাঁথে,
করের সেই অক্ষমালা বক্ষমালা সাথে ;
হিয়ার সাথে হিয়ার বিনিময়,
বনের পথে মনের ভুলে হ'ল সে পরিণয়।

সহসা নব কলিকা যেন পাপড়ি মেলি ফুটে,
নূতন-জাগা রবির করে পরশধারা লুটে ;
দোঁহার পানে চাহিয়া দোঁহে রহে,
কানন ভরি নূতন করি বাতাস যেন বহে।

রাজার বালা চলিয়া গেল, তাপস আনমনে
নূতন সুখে নূতন দুখে ফিরিল তপোবনে ;
নাহি ত সুখ তপের দুখ-দাহে,
প্রেমের সুখ-দহনে তাই হৃদয় দুখ চাহে।

দীপ্তিহীন আঁখিটি আনে তৃপ্তিহীন তৃষা,
নামের জপ ভুলাল তপ হারায়ে গেল দিশা ;
তাপস ভাবে ভাসিয়া আঁখিজলে—
এ যদি হয় গরল তবে অমৃত কারে বলে ?

মরণ-পরে শূন্য কোন্ স্বর্গ-অভিলাষী
জীবন কেন ধরার সুখে নিত্য-উপবাসী ?
থাক্ না দূরে আঁধার-যবনিকা,
ভুবন ভরি জ্বলিছে তবু রূপের দীপশিখা।

পরশ তাই সরস করে সারাটি দেহ-মন,
মাগিছে আঁখি সতত আজ আঁখির দরশন ;
বাহুটি চায় বাঁধিতে বাহুটিরে,
একটু শুধু মমতা লাগি হৃদয় কেঁদে ফিরে।

আবার তাই সুখের ধ্যানে নয়ন তার জাগে,
হৃদয় জাগে আবার কোন্ দুখের তপোরাগে ;
শিথিল করি প্রাণের গ্রন্থিরে,
দেহের লাগি দেহের সব বাঁধন গেল ছিঁড়ে।

শীর্ণ তনু শীর্ণ আরো, জীবন আশাহীন
কাটেনা আর, মৃত্যু তাই আসিল একদিন ;
অমৃতসম গরলধারা তা'রে
করিল মৃত গরলসম অমৃত-অধিকারে !

চন্দ্রালোকে সৌধতলে থামিয়া গেল বীণা,
তন্ত্রীহারা বুকের 'পরে লুটা'ল গীতহীনা ;
ছুটিয়া আসি অচ্ছোদের তীরে
লুটাল রাজকুমারী আজ ধূলায় আঁখিনীরে।

প্লাবিত দুটি নয়ন তুলি দেখিল রাজবালা—
কণ্ঠে আজো রয়েছে সেই তাহারি দেওয়া মালা ;
ঝাঁপিয়া বুকে রিক্ত বাহু দিয়া
বেড়িয়া সেই কণ্ঠ তার পড়িল মুরছিয়া।

প্রভাতে ক্ষণ-মিলন-পরে বিচ্ছেদের তীরে
আঁধারে দুটি চক্রবাক দোঁহারে খুঁজে ফিরে,
হৃদয়ে শুধু জ্বালিয়া আশা-বাতি—
আবার কবে প্রভাত হবে, কাটিবে দুখরাতি।

মৃত্যুশর বিঁধিল আসি তাহারি একটিরে,
প্রভাত নাহি ফুটিল আর উদয়-গিরি-শিরে ;
বিরহ-নিশা দীর্ঘতর করি,
নামিল আসি অন্তহীন মরণ-বিভাবরী।

যেখানে তার চোখের আলো হ'য়েছে অপহৃত,
যেখানে তার প্রাণের সুখ হ'য়েছে চিরমৃত,
মহাশ্বেতা জাগিল সেথা একা,
যেখানে আজো র'য়েছে আঁকা প্রিয়ের পদ-রেখা।

বাঁধিয়া দীন কুটীর সেই অচ্ছোদের তীরে,
পূজার ফুল তুলিয়া নিতি পূজিত স্মৃতিটিরে ;
মরণ-ভূমি তীর্থ হ'ল তার,
তাপস-প্রিয়া তাপসী হ'ল, নয়নে জলভার।

ক্ষণেক তরে দেখিয়া যারে নয়ন নাহি ভরে,
সে-রূপ বুঝি নয়ন আজ হারাল চিরতরে,
হারাল সেই পরশ তনুমন,
আনিল যাহা ক্ষণেক কবে নীপের শিহরণ।

সে-দেহ হায়, একটি দিন বাঁধেনি সে ত বুকে,
চকিতে শুধু দেখিল কবে হাসিটি সেই মুখে,
ভুবনে বুঝি তুলনা তার নাহি
ক্ষণেক তরে যে মুখ ফোটে মুখের পানে চাহি।

দিনের পর কাটিল দিন বিরহ-তপোবনে,
হারান' মুখ একেলা বালা ধেয়াল প্রাণে মনে ;
দেহের লাগি দেহটি রহে জাগি,
দরশ আর পরশ তা'র একটু শুধু মাগি'।

মনের সব মমতা আজ মনের লাগি কাঁদে,
ধরার রূপ-পরিধি মাঝে কেমনে তারে বাঁধে ?
কখনো আর জীবন-ছায়ালোকে
একটি সেই মুরতিমায়া পড়িবেনা কি চোখে ?

সে রূপ-রেখা রয়েছে আজো জড়ায়ে প্রাণমূল,
সে প্রীতিলেখা রয়েছে চোখে স্বচ্ছ অনাকুল,
দিনের পর কাটিয়া যায় দিন,
বুকের মাঝে আকাশ-চাওয়া আশা ত নহে ক্ষীণ।

প্রভাতে আসি পূর্ব্বতটে পাণ্ডুমেঘে হারা
ফুটিয়া রয় ধরণীপানে মলিন শুকতারা,
অস্তমেঘে দিনের চিতা জ্বলে,
সন্ধ্যা-বধূ আসিয়া ম্লান দাঁড়ায় আঁখিজলে

নিদাঘ-দাহ কখন আসে, লুটায় ঝরা-ফুল,
দীরঘ দিন, কাতর মন, হৃদয় তৃষাকুল ;
বরষা আসে, নিবিড় ধারা ঝরে,
সজল বায়ে শ্যামল-ছায়া মেঘের মায়া ভরে ;

উদাস করে রুচির ধরা শরতে সারাবেলা,
স্বচ্ছ নভে জ্যোৎস্নাসাথে অলস মেঘ-খেলা ;
আকুলি' আসে শিশির-কুহেলিকা,
কানন-পথে সুবাসে ঝরে শীর্ণ শেফালিকা ;

ধূসর বন শিহরে শীতে, ডাকেনা আর পিক,
দীর্ঘ নিশা কাটেনা আর, কুয়াশা ভরে দিক ;
আলোকে আসে পুলকে মধুমাস,
মলয় মৃদু আবার আসি ফোটায় ফুল-হাস ;

আসেনা সেত যাহার তরে জাগিছে দেহ-মন,
উজল আজো যাহার রূপে স্মৃতির নিকেতন ;
একেলা শুধু মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম
বিরহানলে পুড়িয়া জ্বলে নিকষ-কষা হেম।

কেমনে তারে ভুলিবে আজ, যাহার সাথে চির-
জনম হ'তে জনম আছে বাঁধন কত দৃঢ় ?
রয়েছে শুধু চোখের অগোচরে,
চোখের তারা নিয়েছে যারে আঁকিয়া চিরতরে।

অরূপ প্রেম রূপের দ্বারে স্মৃতির মন্দিরে
বারেক চাহে বুকের নিধি বুকের মাঝে ফিরে ;
জীবন আজ মরণে ল'বে জিনি,
তাপসী তাই অশ্রুজলে ধেয়ায় একাকিনী।

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

পুত্র অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে শুনিয়া পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজগৃহে লোক পাঠাইলেন। এই লোকেরা রাজগৃহে আসিয়া ভিক্ষুদের রকমসকম দেখিয়া বুদ্ধকে আর গৃহে ফিরিবার কথা বলিতে ভরসা করিল না। অবশেষে শুদ্ধোদন কালুদায়ী নামক সিদ্ধার্থের একজন বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে অনেক লোকজন দিয়া বুদ্ধকে গৃহে ফিরাইবার জন্য রাজগৃহে পাঠাইলেন। কালুদায়ী বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে বাল্যবন্ধুর মতিগতি জানিত, সুতরাং বুঝিল সোজাসুজি বলিলে কোন ফল হইবে না, তাই সে বেণুবন আরামে গিয়া বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল ও কিছুদিন তাঁহার উপদেশাদি মন দিয়া শুনিবার ভাণ করিল। তখন শীত শেষ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হইয়াছে ; সিদ্ধার্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার কথা কালুদায়ীর জানা ছিল। সে মধ্যে মধ্যে বসন্তকালে রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু যাইবার পথে অরণ্যানীর কিরূপ পুষ্পপল্লব শোভা হয় তাহা বুদ্ধের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী হইলেও বুদ্ধ কম চতুর ছিলেন না, তিনি বাল্যবন্ধুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার হঠাৎ এরূপ কবিত্বের আবেগ হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কালুদায়ী তখন শুদ্ধোদনের তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছার কথা জানাইল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের কপিলবাস্তু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

বুদ্ধের কপিলবাস্তু-গমন

কালুদায়ী আগেই রওনা হইয়া কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া শুদ্ধোদনকে সুসংবাদ দিল। শাক্যেরা পরামর্শ করিয়া নগরের বাহিরে 'ন্যগ্রোধ-আরাম' নামক একটি উদ্যানে সশিষ্য বুদ্ধের থাকিবার বন্দোবস্ত করিল। কপিলবাস্তু-বাসীরা বুদ্ধের অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করিল। প্রথমে বালকবালিকাদের দল, তাহার পিছনে অভিজাত-তনয়রা ও শেষে রাজবংশীয়েরা সুবেশ পরিয়া মাল্য ও গন্ধ-দ্রব্য হাতে লইয়া অগ্রগমন করিয়া সদলে বুদ্ধকে ন্যগ্রোধ-আরামে অভ্যর্থনা করিল। বুদ্ধ বয়সে ছোট বলিয়া শাক্যবংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠেরা বুদ্ধকে প্রণামাদি করিলেন না। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি, বাল্যক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি, তাহাকে হঠাৎ "বুদ্ধ" বলিয়া কে সহজে মানিতে চায় ? বুদ্ধ সমাগত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিলেন। নগরবাসীরা নগরে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় কেহ তাঁহাকে স্বগৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল না। শুদ্ধোদনও কিছু বলিলেন না। "আমার পুত্র আমার বাড়ীতেই আহার করিবে, ইহা আর নূতন কথা কি ?" এই ভাবিয়া বোধ হয় তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন কথা মনেই হয় নাই। বস্তুতঃ বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষুদলের জন্য শুদ্ধোদনের গৃহেই আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছিল।

পরদিন অভ্যাস মত যথা সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়া কপিলবাস্তুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে করিতে পিতৃ-ভবনের সামনে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শুদ্ধোদন-ভবনের বাতায়নে বাতায়নে মহিলারা ভীড় করিয়া এ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। রাহুলমাতা শুদ্ধোদনকে খবর দিলেন। শুদ্ধোদন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ছুটিয়া আসিয়া রাজবংশের পক্ষে এরূপ অপমানকর কার্য্যের জন্য পুত্রকে তিরস্কার ও অনুযোগ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ শান্তভাবে বলিলেন যে সকল ভিক্ষুরই ভিক্ষায় বাহির হওয়া উচিত। শুদ্ধোদন পুত্রকে বংশ-মর্য্যাদা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বুদ্ধ উত্তর দিলেন যে, শুদ্ধোদন ও তাঁহার বংশ উচ্চকুলসম্ভূত সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজবংশ

ও বুদ্ধ বংশ বিভিন্ন, দুইএর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, দুইএর ব্যবহারও বিভিন্ন। পথে দাঁড়াইয়াই শুদ্ধোদনের সঙ্গে বুদ্ধের এই কথোপকথন হইতেছিল। তারপর ভিক্ষার প্রশংসা করিতে করিতে ও পিতাকে উপদেশ দিতে দিতে বুদ্ধ শুদ্ধোদনের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর হইতে পালিকা মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমীও আসিয়া বুদ্ধের কথা শুনিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাবতী বহির্ভবন হইতে বুদ্ধকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে ও শিষ্যদিগকে আহার করাইলেন। আহারান্তে পরিজনবর্গ ও অন্তঃপুরিকারা বুদ্ধকে ঘিরিয়া বসিলেন। রাহুলমাতা নিজকক্ষেই রহিলেন, বুদ্ধের কাছে আসিলেন না। পুরনারীরা তাঁহাকে আসিয়া প্রণামাদি করিতে ও বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে অনুরোধ করিলে রাহুলমাতা বলিলেন, "আমার যদি কোন মূল্য থাকে তবে আমার স্বামী নিজেই আমার কাছে আসিবেন, তিনি আসিলে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব।" বুদ্ধকে এই কথা জানান হইল। বুদ্ধ বলিলেন, "ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই, তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রণামাদি করিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া শুদ্ধোদনের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিয়া সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ রাহুলমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। যে কক্ষে রাহুলমাতা ছিলেন সেখানে আসিয়া বুদ্ধ তাঁহার জন্য প্রস্তুত আসনে বসিলেন। রাহুলমাতা দ্রুতপদে আসিয়া বুদ্ধের পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন ও নিজের মস্তকে বুদ্ধের চরণ ধারণ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন। ক্ষণকাল পরে আত্মসম্বৃত হইয়া সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন ও শুদ্ধোদনকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রাহুলমাতা দূরে সরিয়া অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলিলেন যে যেদিন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন সেই দিন হইতে রাহুলমাতা সকল প্রকার আমোদ ও বিলাস ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী দিবসে একবার মাত্র ভোজন করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী কেশচ্ছেদন করিয়াছেন, ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তিনিও অনুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন। শুদ্ধোদনের মুখে পূর্ব্বপত্নীর এই আচরণের কথা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন, "ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, রাহুলমাতা তাঁহারই উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন।"

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী লেখকেরা এইটুকু বর্ণনাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন, আর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পালিকা-মাতা মহাপ্রজাবতী স্নেহে অধীর হইয়া দীর্ঘ আট বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগত সন্ন্যাসীপুত্রকে দেখিবার জন্য বহির্ভবনে ছুটিয়া গেলেন—এ ঘটনা নেহাৎ ঘটিয়াছিল বলিয়াই সন্ন্যাসীদের ইহা উল্লেখ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু মাতাপুত্রে যখন এতদিন পরে দেখা হইল তখন বিকারহীন বুদ্ধ অবিচলিত রহিলেন বটে, কিন্তু মাতার অশ্রুপাত, মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আবেগের কিছু বর্ণনা করা সন্ন্যাসীদের কাছে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, তাই তাঁহারা এসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বুদ্ধ শ্বশুর ও দুইজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিতা আত্মবিস্মৃতা রাহুলমাতার উচ্ছ্বসিত পতি-সম্ভাষণ—ইহা তো সন্ন্যাসীদের কাছে বর্ণনার বিষয় নয়, ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল জ্ঞানহীন নারীচিত্তের পক্ষে স্বাভাবিক মোহময় আচরণ; ইহা কৃপা বা অনুকম্পা—না, উপেক্ষার বস্তু। তাই তাঁহারা ইহার বর্ণনা যত কম কথায় সম্ভব করিয়াছেন। মহাপ্রজাবতী ও রাহুলমাতা উভয়েই পরে ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন এবং অনেক সময় বুদ্ধের অতি সান্নিধ্যে বাস করিয়াছিলেন। অন্য শিষ্য-শিষ্যাদের সম্বন্ধে কত গল্প, কত কাহিনী বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ভিক্ষুণী মহাপ্রজাবতীর কথা অল্পই আছে আর ভিক্ষুণী রাহুলমাতার কথা নাই বলিলেই হয়। ভিক্ষুণীচিত্তের অন্তরালে মাতা বা পত্নীহৃদয়ের কোন স্ফুরণ অবশ্য সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরোধী, তাহার কথা তো উঠিতেই পারে না; কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে এই সাংসারিক স্নেহের বন্ধন থাকার ফলে মহাপ্রজাবতী বা রাহুলমাতার কথা সন্ন্যাসীরা বোধ হয় পাছে কোন ফাঁকে মারের চক্রান্তে পড়িয়া যাইতে হয় এই ভয়ে সযত্নে এড়াইয়া চলিতেন। এই দুইটি ভিক্ষুণীর পতিপুত্রকে লইয়া অশ্বঘোষের মত প্রতিভাবান লেখক কাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় মহাপ্রজাবতী ও রাহুলমাতা ইহাঁরা দুইজন বৌদ্ধ-সাহিত্যের উপেক্ষিতা।

মহাপ্রজাবতীর গর্ভে শুদ্ধোদনের আর একটি পুত্র হইয়াছিল, ইহার নাম নন্দ। এই সময় নন্দের তাহার পিতৃব্য-কন্যা জনপদকল্যাণী নাম্নী শাক্যযুবতীর সঙ্গে বিবাহ হইবার কথা ছিল। বুদ্ধ একদিন তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটি নন্দকে ধরিতে দিলেন, নন্দ উহা হাতে করিয়া রহিল। বুদ্ধ পিতৃভবনে

সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাত্রটি লইবার আর নাম করিলেন না। নন্দও ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। অবশেষে বুদ্ধ 'ন্যগ্রোধ-আরামে' ফিরিয়া চলিলেন। ভিক্ষাপাত্রটি বুদ্ধকে ফিরাইয়া লইতে বলিতে নন্দের সাহস হইল না, সেও পাত্র হাতে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। জনপদকল্যাণী বাতায়নে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছিল, সে নন্দকে এইভাবে বুদ্ধের পিছন পিছন যাইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিল। ফিরিবার নন্দের খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বুদ্ধ তাহাকে ভিক্ষাপাত্র ধরিতে দিয়াছেন, তিনি তাহা ফিরাইয়া না লইলে সে কেমন করিয়া চলিয়া আসে? এদিকে চতুর বুদ্ধ কোন দিকে না তাকাইয়া 'ন্যগ্রোধ-আরামে'র পথে অগ্রসর হইলেন। নন্দও পাত্রহাতে সেখানে আসিল। বুদ্ধ নন্দকে সংসার ত্যাগ করিতে বলিলেন, নন্দ না বলিতে পারিল না, ভিক্ষু হইল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল জনপদকল্যাণীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া নন্দ শুখাইয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জনপদকল্যাণীর মত সুন্দরী আর কেহ আছে কি না; সে বলিল, সমগ্র পৃথিবীতেও এরূপ সুন্দরী আর নাই। বুদ্ধ তাহাকে একটি বনের মধ্যে লইয়া গেলেন, এখানে দাবানলে দগ্ধ একটি মাঠের মধ্যে একটি বানরী পুড়িয়া মরিয়া পড়িয়াছিল। বর্ণিত আছে তারপর তিনি নিজের ঋদ্ধিবলে স্বর্গের অপ্সরী সৃষ্টি করিয়া নন্দকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপ্সরীগণ ও জনপদকল্যাণীর মধ্যে কে বেশী সুন্দরী। নন্দ বলিল, অপ্সরীদের তুলনায় জনপদকল্যাণী সেই অগ্নিদগ্ধা বানরীর মত। বুদ্ধ নন্দকে এই অপ্সরীদের একজনকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে নন্দ কি করিলে অপ্সরী পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিল। বুদ্ধ বলিলেন, তাঁহার কথামত চলিলে অপ্সরীলাভ হইবে। অপ্সরীলাভের লোভে নন্দ সর্ব্বদা বুদ্ধের কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে ভিক্ষুরা অপ্সরীলাভের লোভে নন্দের সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা ত্যাগ করার কথা জানিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে লজ্জিত হইয়া নন্দ একান্তে নির্জ্জনে বসিয়া সাধনা করিতে লাগিল ও ক্রমে তাহার বাসনা দূর হইল। এইরূপে তাহার চৈতন্যোদয় হইলে সে বুদ্ধের কাছে গিয়া বলিল যে, সে আর অপ্সরী চায় না। বুদ্ধ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আগে নন্দ ভাঙ্গা ছাদওয়ালা ঘরের মত ছিল, ভিতরে বাসনাবৃষ্টির জল পড়িত, কিন্তু এখন সে ভাল পাকা ছাদ-ওয়ালা ঘরের মত সুরক্ষিত হইয়াছে।"

প্রথম দিনের পর বুদ্ধ বোধ হয় কপিলবাস্তুতে আর ভিক্ষায় বাহির হন নাই। পিতৃগৃহে তাঁহার প্রত্যহ ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকিত। একদিন তিনি ভোজনে বসিয়াছেন; রাহুলমাতা অন্তঃকক্ষে রাহুলকে বসনভূষণে সাজাইয়া বলিলেন, "রাহুল, উনিই তোমার পিতা, তাঁহার কাছে মহামূল্য জিনিষ আছে, তুমি উহার কাছ হইতে তোমার পৈতৃক ধন (দায়জ্জং) চাহিয়া লও।" রাহুল পিতামহ শুদ্ধোদনকেই জানিত, সে বলিল, তাহার আর কোন পিতা নাই। রাহুলমাতা তখন তাহাকে লইয়া গিয়া বাতায়নপথে ভোজনে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন, যে ঐ শ্রমণই তাহার পিতা। রাহুল তখন বুদ্ধের কাছে গিয়া "শ্রমণ, তোমার চেহারা তো বেশ সুন্দর!" প্রভৃতি বালসুলভ সরলতার সঙ্গে অনেক কথা বলিতে লাগিল। আহারান্তে বুদ্ধ বিদায় লইয়া যাইবার সময় রাহুল-"শ্রমণ, আমার পিতৃধন আমাকে দেও (দায়জ্জং মে দেহি)" বলিতে বলিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহাকে বারণ করিতে কাহারও সাহস হইল না, বুদ্ধও বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলিলেন না। বালক পিতার অনুসরণ করিতে করিতে 'ন্যগ্রোধ-আরামে' উপস্থিত হইল। বুদ্ধ সারিপুত্রকে বলিলেন, "রাহুল আমার কাছে ঐহিক ধন চাহিতেছে, আমি উহাকে ইহার চেয়ে এমন ভাল জিনিষ দিব যাহা জীবনে কখন নষ্ট হইবে না।" তিনি রাহুলকে দীক্ষা দিতে বলিলেন। মৌদগল্যায়ন রাহুলের মাথা মুড়াইয়া দিলেন ও সারিপুত্র তাহাকে দীক্ষাদান করিলেন। রাহুল সারিপুত্রের শিক্ষাধীন রহিল। রাহুলমাতা রাহুলকে যে বুদ্ধের কাছে পৈতৃক ধন চাহিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন বৌদ্ধ লেখকরা তাহা এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যেন শুদ্ধোদনের প্রাসাদে সঙ্গোপনে রক্ষিত বুদ্ধের কোন গুপ্তধন ছিল এবং তাহার কথা রাহুলমাতা এইভাবে জানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। রাহুলমাতার চরিত্রের আমরা যে পরিচয় তাঁহার আচরণ ও তাঁহার সম্বন্ধে বুদ্ধের কথা হইতে পাই,

তাহাতে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধেরা রাহুলমাতাকে হীন করিয়াছেন মনে হয়। রাহুলমাতার কথা ও আচরণে মনে হয় বুদ্ধের উপর তাঁহার যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল ও বুদ্ধের মহত্ত্ব তিনি বিশ্বাস করিতেন। মনে হয় "পৈতৃক ধন" দ্বারা রাহুলমাতা ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ তপস্যা দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মহামূল্যবান এবং পুত্রের মুখে ইঙ্গিতে বুদ্ধকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা যে পুত্রও সেই মহাধনের ভাগী হয়। রাহুলের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়া শুদ্ধোদন মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগ করিল, দ্বিতীয় পুত্র নন্দ ও পৌত্র রাহুলও এই সঙ্গে গেল। তাঁহার বংশরক্ষার জন্য কেহ থাকিল না। তিনি শোকার্ত্ত হইয়া 'ন্যগ্রোধ-আরামে' গিয়া বুদ্ধের কাছে অনেক কাতরতা জানাইলেন ও সন্তানস্নেহ কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন যে, উরুবেলে তপস্যার সময় বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই, পুত্রশোক মানুষের চর্ম্মভেদ করিয়া মাংসভেদ করে, মাংসভেদ করিয়া অস্থিভেদ করে, অস্থিভেদ করিয়া মজ্জায় প্রবেশ করে। তিনি নিজে যে গুরুতর শোক পাইলেন আর কোন পিতাকে যাহাতে সেরূপ না পাইতে হয় এজন্য শুদ্ধোদন বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, ভবিষ্যতে যেন পিতামাতার বিনা অনুমতিতে কাহাকেও দীক্ষা না দেওয়া হয়। বুদ্ধ শুদ্ধোদনের অনুরোধপালনে স্বীকৃত হইয়া শিষ্যদের ডাকিয়া একথা জানাইলেন।

এইবার বুদ্ধ জন্মস্থান হইতে এবারকার মত বিদায় লইয়া রাজগৃহে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তিনি অনুপ্রিয় গ্রামে—যেখানে প্রথমবার গৃহত্যাগের পর প্রথমে আসিয়াছিলেন—বিশ্রাম করিলেন। কয়েকজন শাক্য যুবক তাহাদের সঙ্গে উপালি নামক নাপিতকে লইয়া কপিলবাস্তু হইতে এই গ্রামে বুদ্ধের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য আসিল। বুদ্ধ যে বনে ছিলেন সেখানে প্রবেশ করিবার আগে এই শাক্য যুবকেরা তাহাদের মূল্যবান পরিচ্ছদাদি উপালির হাতে দিয়া কপিলবাস্তুতে লইয়া যাইতে বলিয়া সাধারণ বস্ত্রে বুদ্ধের কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। উপালি কিছু পথ গিয়া ভাবিল শাক্যেরা যেমন ক্রোধী, এই সব বস্ত্রাদি যুবকদের গৃহে লইয়া গেলে তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। এই ভাবিয়া উপালি জিনিষগুলি একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া যুবকদের ধরিল ও বলিল যে, সেও তাহাদের সঙ্গে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। তখন সকলে মিলিয়া বুদ্ধের কাছে গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিল ও বলিল যে, তাহাদের আভিজাত্য-গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য নাপিত উপালিকেই সকলের আগে দীক্ষা দেওয়া হউক, উপালির পর তাহারা দীক্ষা লইবে। বুদ্ধ ইহাতে সম্মতি দিলেন। এই যুবকদের মধ্যে বুদ্ধের দুইজন পিতৃব্যপুত্র, দেবদত্ত ও আনন্দ ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়। দেবদত্ত বোধহয় হইতে পারেন, কিন্তু আনন্দ ইহার অনেক পরে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবনের শেষ কুড়ি পঁচিশ বৎসর আনন্দ ছায়ার মত সর্ব্বদা বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি বুদ্ধকে শুধু ভক্তিই করিতেন না, খুব ভালও বাসিতেন। আনন্দের কথা পরে বলিব। বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দের এই ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায় যেখানেই বুদ্ধ সেখানেই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া বুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলাই যায় না। এই জন্য আনন্দ-সম্বন্ধীয় তারিখের গোলমাল হইয়া থাকিবে।

[কপিলবাস্তুর ও তাহার পরের ঘটনাগুলি অঙ্গুত্তর-টীকা ১।৩০১, ধম্মপদট্ঠকথা ১।১১৫ ও ৩।১৬৩, জাতক ১।৮৭, থেরগাথা ৫২৭—৫৩৬ (টীকা), উদান ৩।২, মহাবগ্গ ১।৫৪ চুল্লবগ্গ ৭।১, এবং পরবর্ত্তী সংস্কৃত-গ্রন্থ "মহাবস্তু" ২।৬৯, ৩।১৪১-১৪৩, ২৫৫-২৭১ প্রভৃতি স্থানে বর্ণিত আছে।]

বুদ্ধ উপযুক্ত লোককে শিষ্য করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে কৌশলও অবলম্বন করিতেন। যশকে লুকাইয়া রাখা, নন্দকে

বুদ্ধের প্রকৃতি, আকৃতি ও দৈনিক কার্য্যাবলী

ভিক্ষাপাত্র ধরিতে দেওয়া ও অপ্সরী-লাভের লোভ দেখান প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, সিংহ নামক লিচ্ছবি সেনাপতিকেও তিনি ঔদার্য্যের পর ঔদার্য্য দেখাইয়া ও রোজ নামক একজন মল্লবংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সৌজন্যে অভিভূত করিয়া বশ করিয়াছিলেন। গীতার 'যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্—সুকৌশল কর্ম্মের নামই যোগ' একথা বুদ্ধের অনেক কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়সুলভ আর একটি গুণ তাঁহার ছিল ; ক্ষমা, করুণা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিতে বিজীগীষাও ছিল ; গুরু উদ্রক ও

আলারকে ধর্ম্ম বুঝাইবার ইচ্ছা, সকলের সামনে জটিলের শিষ্যত্ব-স্বীকার দেখান, পিতাকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে কপিলবাস্তু গমন প্রভৃতিতে এভাব প্রকাশ পায়; পরে আমরা দেখিব যে অঙ্গুলিমাল নামক একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে তিনি লোকের নিষেধ না মানিয়া একলা গিয়া বশীভূত করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করাইয়াছিলেন। তাঁহার রহস্য-বোধ ছিল; আনন্দের সঙ্গে তিনি কখন কখন ঠাট্টাতামাসা করিতেন। ছড়া বাঁধিয়া ছড়ার উত্তর দেওয়া অরসিক লোক পারে না। আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না এমন কয়েকটি প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য তাঁহার ছিল, যথা তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধ, পারিপাট্য-প্রিয়তা প্রভৃতি। বাল্যসঙ্গীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টার কথা আমরা দেখিয়াছি; বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছেন যে তিনি এতস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু যথার্থ সুরম্যস্থান একটিও দেখেন নাই! বিচিত্রবেশী লিচ্ছবিদের তিনি দেবতাদের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন; দূর হইতে বৈশালী নগরীর শোভা দেখিয়া একবার তিনি আনন্দকে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না, নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন; কিন্তু ঘোর নির্জ্জনতা আবার তাঁহার অপ্রিয় ছিল, এইজন্য তিনি প্রাগ্‌বোধি পাহাড় ছাড়িয়া উরুবেলে আসিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নাক কান চোখে কোন অনুভূতি গ্রহণ না করা আমাদের দেশে সাধনার উচ্চাবস্থার দ্যোতক বলিয়া মনে করা হয়; এ বিষয়ে বুদ্ধের প্রকৃতি বিপরীত ছিল; যাহা কর্কশ, অসুন্দর তাহাতে তাঁহার অস্বস্তি ও বিরক্তি জন্মিত। তিনি সুন্দর সুখকর মৃদু অবস্থার মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন; নগরের কোলাহল ও অরণ্যের ঘোর নীরবতা এ দুইএর কোনটিই তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল ছিলনা, নগরের একটু বাহিরে উদ্যান গুলিতেই তিনি থাকিতে ভালবাসিতেন, ঋষিপত্তনের "মৃগোদ্যান", রাজগৃহের "বেণুবন", বৈশালীর "মহাবন", কৌশাম্বীর "শিশংপাবন", শ্রাবস্তীর "জেতবন" প্রভৃতি উদ্যানের সৌন্দর্য্যের মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ ও শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল। পথপার্শ্বস্থ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড সমুহের সমাবেশে প্রস্তুত ভিক্ষুদের চীবর প্রণয়ন ও ধারণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি হইতে বুদ্ধের রুচিজ্ঞান, ভিক্ষুদের উপবেশন, শয়ন, স্নান প্রভৃতির নিয়মগুলি হইতে তাঁহার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতাবোধ এবং সঙ্ঘ-শাসনের নানা নিয়মাবলী হইতে তাঁহার বহুজনের সম্মিলিত কর্ম্মে শৃঙ্খলাস্থাপন-শক্তির পরিচয় পাই। একটি কথা মনে রাখিলে আমরা বুদ্ধচরিত্রের মূলসূত্র ধরিতে পারিব, তাহা এই যে, তিনি উপযুক্ত ক্ষত্রিয়-সন্তানের সমস্ত শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, কৌশল, নিপুণতা, লোকচরিত্রজ্ঞান, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি নিজের রাজ্যজয়, সুখভোগ, রাজ্যশাসনে প্রয়োগ না করিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্যে বহুজনের মঙ্গলকামনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন; সুপটু ক্ষত্রিয় যে শক্তিতে অন্যকে নিজের বশীভূত করে সেই শক্তি তিনি লোককে ধর্ম্মের বশীভূত করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের ভাল যাহা তাহা তিনি কিছুই ছাড়েন নাই, তাহাকে শোধন করিয়া লইয়া—আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে "সাবলাইমেশন্" বলে—ক্ষত্রিয়ত্ব ও যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া "অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ" হইয়াছিলেন। গীতার একটি কথার প্রকাশ বুদ্ধের জীবনে দেখি—

"অবিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেরূপভাবে কর্ম্ম করে বিদ্বান ব্যক্তি লোকের উপকারের জন্য অনাসক্ত হইয়া সেই রূপভাবে কর্ম্ম করিবেন—"

> সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
> কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্॥ গীতা ৩।২৫.

বুদ্ধ যে মধ্যপথের কথা বলিতেন তাহা একটি দৃষ্টান্তে খুব স্পষ্ট হইয়াছে। সোন নামক এক যুবা ভিক্ষু অত্যধিক কৃচ্ছ্রাভ্যাস করিয়া কোন ফললাভ না করিতে পারিয়া, সংসারের ভোগসুখে ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল। বুদ্ধ একথা জানিতে পারিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "সোন, গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কি তুমি বীণা বাজাইতে পারিতে?"

"হাঁ ভদন্ত, পারিতাম।"

"সোন, তোমার কি মনে হয়? তোমার বীণার তারগুলি যদি খুব আঁট করিয়া বাঁধা থাকে তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় বা ভাল করিয়া বাজান যায়?"

"না ভদন্ত, তাহা যায় না।"

"সোন, তোমার কি মনে হয়? তোমার বীণার তারগুলি যদি খুব ঢিল করিয়া বাঁধা থাকে তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় বা ভাল করিয়া বাজান যায়?"

"না ভদন্ত, তাহা যায় না।"

"সোন, কিন্তু তোমার কি মনে হয়? যদি তোমার বীণার তারগুলি বেশী আঁট বা বেশী ঢিল করিয়া না বাঁধিয়া ঠিকমত টানিয়া বাঁধা হয় তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় ও ভাল বাজান যায়?"

"হাঁ ভদন্ত, যায়।"

"সোন, সেইরূপ অতিপ্রয়াসে ঔদ্ধত্য জন্মে এবং অত্যল্প প্রয়াসে আলস্য জন্মে (অচ্চারদ্ধবিরিয়ং উদ্ধচ্চায় সংবত্ততি, অতিলীনবিরিয়ং কোসজ্জায় সংবত্ততি)।" মহাবগ্‌গ ৫।১।১৬

বুদ্ধ ভালকথা বলিতে খুব ভালই বাসিতেন বলিয়া মনে হয় এবং মৌনব্রতাবলম্বী কয়েকজন শিষ্যকে তিরস্কার ও পশুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহাদের সঙ্গে তিনি সদালাপ করিতেন এবং প্রায়ই শিষ্যদের কথাবার্ত্তার মধ্যে "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছ?" বলিয়া উপস্থিত হইয়া যোগদান করিতেন। পথ-পর্য্যটনের সময়ও তিনি কথাবার্ত্তা ও আলোচনা করিতেন। "ব্রহ্মজাল-সুত্ত" নামক প্রসিদ্ধ আলোচনার সারাংশ রাজগৃহ হইতে নালন্দার পথে তিনি শিষ্যদের বলিয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রকৃতিতে একটা প্রবল আকর্ষণীশক্তি ছিল; একজন সন্ন্যাসী বুদ্ধের সম্বন্ধে মহাবীরকে বলিয়াছিলেন যে শ্রমণ গোতম মায়াবী, তিনি লোককে মায়ায় ভুলাইয়া শিষ্য করেন, মহাবীরের শিষ্যরা যেন শ্রমণ গোতমের কাছে না যায়।

বুদ্ধের শরীর দীর্ঘকায়, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর এবং মুখশ্রী সুন্দর ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশিটি ছোট লক্ষণ ছিল। বর্ণিত আছে যে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বুদ্ধ বাস্তবিকই মহাপুরুষ কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আসিয়া এই লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করিতেন ও এগুলি দেখিয়া বুদ্ধের মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন। লক্ষণগুলি সবই শরীর সম্বন্ধীয়; খুব সম্ভব বুদ্ধের দৈহিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইতেই এগুলির অধিকাংশের উদ্ভব হইয়াছিল। এই লক্ষণগুলির সবের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কতকগুলির কথা বলিব।

বুদ্ধের মস্তকের উপরের মধ্যস্থল সুপুষ্ট উচ্চ ছিল। মস্তকের কেশ মুণ্ডিত থাকিত, বাড়িলে কুঞ্চিত হইয়া বাম হইতে দক্ষিণে তরঙ্গায়িত হইত। কপাল প্রশস্ত ও মসৃণ ছিল। যুগ্মভ্রু ছিল এবং ভ্রুযুগলের সন্ধিস্থলে একগোছা কেশ জন্মিয়াছিল, বার্দ্ধক্যে ইহা তুষারশুভ্র দেখাইত। চক্ষুদ্বয় দীর্ঘপক্ষ্ম ছিল, চক্ষুতারকা ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং দন্তগুলি সুসন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি প্রশস্তবক্ষ, প্রশস্তস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু ছিলেন এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার চলন ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যযুক্ত এবং কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ গম্ভীর ছিল।

বুদ্ধকে চিরজীবন তাঁহার প্রচারকার্য্যে প্রায়ই স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। বর্ষাবাসের সময় যখন ভ্রমণ বন্ধ করিয়া তিনি একস্থানে বাস করিতেন, তখন তাঁহার দৈনিক কার্য্যাবলী কেমন ছিল তাহার বিবরণ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক বুদ্ধঘোষ প্রণীত "সুমঙ্গল-বিলাসিনী" নামক দীঘ নিকায়ের টীকা হইতে জানিতে পারা যায়। বুদ্ধ অতিপ্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। যে ভিক্ষুর উপর তাঁহার পরিচর্য্যার ভার থাকিত, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি নিজেই জল আনিয়া হাতমুখ ধুইতেন ও চীবর পরিধান করিতেন। তাহার পর নির্জ্জন স্থানে গিয়া আসনে উপবেশন করিয়া বা পায়চারি করিয়া ধ্যান করিতেন। তারপর তিনি বহির্বাস পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষায় বাহির হইতেন; কখনও তিনি একাকীই যাইতেন কখনও সঙ্গে অন্য ভিক্ষুদের কেহ কেহ থাকিত। কেহ পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রিত করিয়া রাখিলে সেখানেই যাইতেন, নতুবা পথে পথে গৃহে গৃহে নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যহ একই পথে যাইতেন না, এক এক দিন এক এক পল্লীতে ভিক্ষা করিতেন। এ সময়ে তিনি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন ও শিক্ষা উপদেশ দিতেন। ভিক্ষার জন্য কোন গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলে কখন কখন গৃহস্থ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিত, তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিত, আসন বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া আহার দান করিত। আহারান্তে বুদ্ধ গৃহস্থ ও তাহার পরিজনবর্গকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তারপর তাঁহার আবাস-স্থানে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বারান্দায় বসিয়া অন্য ভিক্ষুদের আহার সমাপনের অপেক্ষা করিতেন। ভিক্ষালব্ধ আহার সমাধা করিবার পর শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। এই সময়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন, তাহাদের উৎসাহ ও

উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের ধ্যানের বিষয়নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইলে তিনি নিজের কক্ষে গিয়া একাকী বিশ্রাম করিতেন। তাঁহার কক্ষে ভিক্ষুরা গন্ধপুষ্প রাখিয়া দিত। বিশ্রামান্তে তিনি আবার ধ্যানে বসিয়া অপর লোকের অবস্থার কথা সুখদুঃখের কথা ভাবিতেন। বৈকালে দর্শনার্থীরা গন্ধপুষ্প ও মাল্য হাতে লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক ও উপদেশ দান এই সময় তিনি করিতেন। দর্শনার্থীরা চলিয়া গেলে তিনি স্নানে যাইতেন, এই সময় তাঁহার পরিচর্য্যাকারী ভিক্ষু তাঁহার কক্ষ পরিষ্কৃত করিত। সন্ধ্যাকালে তিনি একাকী বসিয়া ভিক্ষুদের জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাহারা আসিয়া তাহাদের ধ্যানের ফলাফল তাঁহাকে জানাইত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিত ও উপদেশ গ্রহণ করিত। অন্য দর্শনার্থীরাও এই সময়ে আসিত। লোকজন বিদায় হইলে বুদ্ধ আবার বসিয়া বা পায়চারি করিয়া ধ্যান করিতেন। ধ্যানান্তে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রাভঙ্গে প্রত্যূষে উঠিয়া সংসারের লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন।

সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান আমাদের দেশে অতি সাধারণ কথা। যত বড়ই সাধু বা যোগী হন না কেন তাঁহাকে ভিক্ষাটন করিতে দেখিলে আমাদের মোটেই আশ্চর্য্য বোধ হয় না, কারণ আমাদের দেশের ইহাই সনাতন প্রথা। ভিক্ষা-গ্রহণ ও ভিক্ষা-দান প্রথার অনেক কুফল আছে স্বীকার করি; কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া লোকের অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর ব্যবসা চালাইয়া আরামে কাল কাটাইয়া দেয় ইহাও সত্য। কিন্তু বুদ্ধ প্রভৃতি সাধুদের অনুষ্ঠিত ভিক্ষাগ্রহণ প্রথার একটা অর্থ আছে নিজের ও পরের উভয় চিন্তাই আমাদের করা উচিত, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই যে লোক নিজের কথা বেশী ভাবে তাহার পরের, ও যে লোক পরের কথা বেশী ভাবে তাহার নিজের কথা ভাবা জীবনে ঘটিয়া উঠে না। যে পরের জন্য খাটে তাহার নিজের অন্নচিন্তার জন্য খাটিতে আর প্রবৃত্তি বা সময় থাকে না। আমাদের দেশের মত ব্যক্তিগত ভাবে নিজের জন্য ভিক্ষা না করিলেও ইউরোপ আমেরিকার লোকও দল বাঁধিয়া চাঁদা তুলিয়া লোক-হিতকর কার্য্য করে। খৃষ্টান মিশনারীরা ধর্ম্মপ্রচার ও লোকসেবায় সমস্ত খরচ বড় লোকদের মোটা দান ও গির্জ্জার চাঁদা হইতে চালাইয়া থাকেন। রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারী-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকর্ত্তা ও সাধারণ প্রজার মঙ্গলচেষ্টায় উৎসৃষ্ট-জীবন লেনিনের জীবনীতেও দেখি অপরের সাহায্যেই তাঁহার সংসার চলিত। ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে বাহির হইয়া আমাদের সাধুরা নিজেদের নিরহঙ্কার দৈন্য ও পরসেবা-পরায়ণতা প্রকাশ করিতেন। পরসেবার ব্রত যে গ্রহণ না করিয়াছে তাহার ভিক্ষার অধিকার নাই।

নানাস্থানে ক্রমাগত ভ্রমণে ব্যায়ামের অভাব হইত না। তাহা ছাড়া তিনি মুক্তস্থানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। দিবসে একবার মাত্র আহার করিতেন। এইসব নিয়মনিষ্ঠায় তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের সহায়তা হইয়াছিল। অসুখ বা রোগ জীবনে তাঁহার হয় নাই বলিলেই হয়, সামান্য অসুস্থতার জন্য কয়েকবার মাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এইবার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বুদ্ধের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে তাঁহার ধর্ম্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

পাঠককে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে আমাদের বিচার্য্য বিষয় এখানে "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামে প্রচলিত ধর্ম্মদর্শন নহে, বুদ্ধ নিজে "ধম্ম" বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহাই। বুদ্ধের ধর্ম্মের লক্ষ্য কি ছিল তাহা তাঁহার নিজের কথা দ্বারা বিচার করিতে হইবে। যে যে স্থানে এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধম্মে"র লক্ষ্য কি?

মজ্ঝিম নিকায়ের "চূল-মালুঙ্ক্য-ওবাদে" আছে যে মালুঙ্ক্য-পুত্র নামক একজন শিষ্য বুদ্ধের কাছে আসিয়া বলিল যে, তাহার কাছে ইহা আশ্চর্য্য মনে হয় যে, বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে অনেকগুলি অতি গভীর ও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সুমীমাংসা থাকে না, যেমন জগৎ অনন্ত কি সান্ত, তথাগতের মৃত্যুর পর কোন অস্তিত্ব থাকে কি না ইত্যাদি। মালুঙ্ক্য-পুত্র আরও বলিল যে এই গুলির কোন মীমাংসা না হওয়া তাহার ভাল লাগে না ও ঠিক মনে হয় না, তাই সে বুদ্ধের কাছে তাহার সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে,

বুদ্ধ অনুগ্রহ করিয়া ইহার যদি পারেন উত্তর দিন, কারণ কোন লোক যদি একটি বিষয় সম্বন্ধে না জানে বা না বুঝে এবং সে যদি খাঁটি লোক হয় তবে তাহা স্বীকার করে।

বুদ্ধ বলিলেন "মালুক্যপুত্র, তোমাকে পূর্ব্বে কি বলিয়াছি? আমি কি তোমাকে বলিয়াছি 'এস মালুক্যপুত্র, আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন, তথাগতের মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কি না'?"

"না ভদন্ত, আপনি তাহা বলেন নাই।"

"মালুক্যপুত্র, আর তুমিই বা কি আমাকে বলিয়াছিলে 'আমি আপনার শিষ্য হইতেছি, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন, তথাগতের মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কি না'?"

"না ভদন্ত, আমিও তাহা বলি নাই।"

"দেখ মালুক্যপুত্র, কোন ব্যক্তি যদি বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয় এবং তাহার আত্মীয় স্বজনেরা সুদক্ষ চিকিৎসককে ডাকিয়া আনে, তখন যদি আহত ব্যক্তি বলে 'যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি না জানিতেছি যে আমাকে যে বাণবিদ্ধ করিল সে লোকটি কে, অভিজাত-বংশীয় না ব্রাহ্মণ না বৈশ্য না শূদ্র, ততক্ষণ আমি আমার ক্ষতের চিকিৎসা করিতে দিব না,' অথবা বলে 'যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি না জানিতেছি যে আমাকে যে বাণবিদ্ধ করিল তাহাকে লোকে কি বলিয়া ডাকে, সে কোন গোত্রের, সে দীর্ঘাকার না হ্রস্বাকার না মধ্যমাকার, বা যাহা দিয়া আমাকে মারিল সে অস্ত্রটা কি ভাবে নির্ম্মিত হইল, ততক্ষণ আমি আমার ক্ষতের চিকিৎসা করিতে দিব না' তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি হয়? লোকটি বাণাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কি না এসব বিষয়ে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের কোন শিক্ষা দেন নাই। কেন? কারণ এসব জানিলে শুদ্ধতাবৃদ্ধি বা শান্তি বা জ্ঞানলাভ হয় না। যাহাতে শান্তি ও জ্ঞান লাভ হয় সে সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজের শিক্ষা দিয়াছেন—দুঃখের সত্য কি, দুঃখের উদয়ের সত্য কি, দুঃখের নিবৃত্তির সত্য কি এবং দুঃখ-নিবৃত্তির পথের সত্য কি। অতএব, মালুক্যপুত্র, যাহা আমি প্রকাশ করি নাই তাহা অপ্রকাশিতই থাকুক এবং যাহা প্রকাশ করিয়াছি তাহাই প্রকাশিত হউক।"

বুদ্ধের এই উক্তি বড় মূল্যবান। ইহা হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারি, প্রথমতঃ বুদ্ধ সব প্রশ্ন সম্বন্ধে—তাহাতে লোকের যতই আগ্রহ থাকুক না কেন—উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার কার্য্য, উদ্দেশ্য ও ব্রত ছিল সব সমস্যার সুমীমাংসা করা নয়, কিন্তু ঐ চিকিৎসকের বিষাক্ত বাণবিদ্ধ লোকটিকে বাঁচানর মত দুঃখবিদ্ধ মানুষকে দুঃখমুক্ত করা। তিনি নিজেকে একজন খুব বড় তাত্ত্বিক সত্যবিদ্ প্রচারক মনে করিতেন না; একটা অতি গুরুতর প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার ব্যবহারিক মূল্যবত্তার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, ইহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের পরমব্রত ও অপরের প্রধান প্রয়োজন মনে করিতেন। মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ইহার সহায়তা হইত তাহাকেই তিনি কাজের মনে করিতেন, আর সবই তাঁহার কাছে গৌণ ছিল। যাহাতে এই উদ্দেশ্যসাধনের কোনরূপ অন্তরায় ঘটিত তাহাকেই তিনি বাজে, নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিরর্থক ভাবিতেন। মানবের এই প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণে তিনি বলিয়াছেন যে কোন গৃহে যদি আগুন লাগে ও সেই গৃহে বালকেরা থাকে তবে তাহাদের পিতা যেমন খেলনার লোভ দেখাইয়া ছেলেদের ঘরের বাহিরে আনিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন সেইরূপ দহ্যমান সংসার হইতে রক্ষা পাওয়া অবোধ লোকের প্রধান কাজ। এখানেও দেখিতে পাই তাঁহার উক্তির মূলে একটি গুরুতর প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অতএব মুক্তিই তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি সংসারের লোককে বিষাক্ত বাণবিদ্ধ ব্যক্তির মত বা দহ্যমান গৃহমধ্যস্থ অবোধ শিশুর মত মনে করিতেন। নানারূপ বড় বড় কথার বৃথা আলোচনা করিয়া ফল নাই, করিবার সময়ও নাই, কি করিয়া মুক্তি পাইব, বিষ নাশ করিয়া নীরোগ হইব সেইটাই আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্রের একমাত্র রস লবণরস, সেইরূপ এই ধর্ম্ম ও নিয়মের একমাত্র রস বিমুক্তিরস—"সে যথাপি ভিক্খাবে, মহাসমুদ্দো একরসো লোণরসো এবং এব খো ভিক্খাবে, অয়ম্ ধম্মবিনয়ো এক-রসো বিমুত্তিরসো"—চুল্লবগ্‌গ ৯।১।৪।

বিমুক্তিই যদি প্রধান কথা হইল তবে অন্য কতকগুলি প্রশ্ন যাহাকে বুদ্ধ অপ্রধান বলিলেও অপরে বড় দরকারী ভাবিত,

সে গুলি সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলেন জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছিলেন দেখা যাউক।

সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত আছে যে, কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ একবার সাকেত হইতে শ্রাবস্তীতে যাইতেছিলেন, পথে বুদ্ধশিষ্যা ভিক্ষুণী ক্ষেমার (খেমা) সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। ক্ষেমা জ্ঞানবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া প্রসেনজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে ?"

"মহারাজ, ভগবান এমন কথা প্রকাশ করেন নাই যে মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে।"

"আর্য্যে, তবে কি মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না ?"

"মহারাজ, ভগবান এমন কথাও প্রকাশ করেন নাই যে মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না।"

"আর্য্যে, তবে কি মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকেও, থাকেও না ?"

"মহারাজ, ভগবান এরূপ প্রকাশ করেন নাই যে 'মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকেও, থাকেও না'

"আর্য্যে, কি হেতু ও কি কারণে ভগবান ইহা প্রকাশ করেন নাই

"মহারাজ, অনুমতি করুন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনার কি এমন কোন হিসাবনবীস বা ধনাধ্যক্ষ আছে যে গঙ্গার বালুরাশি গণিয়া বা মহাসমুদ্রের জলরাশি মাপিয়া বলিতে পারে এতগুলি বালুকাকণা বা এত জল আছে ?"

"না আর্য্যে, আমার এরূপ লোক নাই।"

"ভাল, কেন ইহা বলা যায় না ? কারণ মহাসমুদ্র গভীর অগাধ, অতল। মহারাজ, সেইরূপ তথাগতের অস্তিত্বও স্কন্ধগুলির (খন্ধ) দ্বারা পরিমাপ করিলে তথাগতে এই স্কন্ধগুলির বিলুপ্তি ঘটে, তাহাদের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, তালগাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখার মত এগুলিও ভবিষ্যতে আর গজাইতে পারে না। মহারাজ, তথাগতের অস্তিত্ব যে জাগতিক মাপের দ্বারা পরিমাপিত হইবে এ অবস্থা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন; তিনি গভীর মহাসমুদ্রের মত অতল ও অগাধ। 'মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে' এ কথা ঠিক না, 'মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না' এ কথাও ঠিক না।"

পরে প্রসনেজিৎ বুদ্ধকে এই প্রশ্ন করিয়া হুবহু একই উত্তর পাইয়াছিলেন। ইহাতে আমরা দেখি যে সাধারণ থাকা না থাকা সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণা দ্বারা তথাগতের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। তিনি যে থাকিবেন না একথা বলা হইল না।

বৎসগোত্র (বচ্ছগোত্ত) নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধের কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত গৌতম, ব্যাপারটি ঠিক কি ? আত্মা (অত্তা) বলিয়া কি কিছু আছে ?" বুদ্ধ বৎসগোত্রের কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। বৎসগোত্র আবার বলিলেন, "ভদন্ত গৌতম, তবে কি আত্মা বলিয়া কিছুই নাই ?" বুদ্ধ তবুও কোন উত্তর দিলেন না। তখন বৎসগোত্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বৎসগোত্র কিছুদূর গেলে আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বুদ্ধ বৎসগোত্রের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না কেন ? বুদ্ধ বলিলেন, "আমি যদি বৎসগোত্রকে বলিতাম যে আত্মা আছে তবে তাহাতে শাশ্বতবাদী (সস্সতবাদি) শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মতের সমর্থন করা হইত, আর যদি বলিতাম যে আত্মা নাই তবে তাহাতে উচ্ছেদবাদী শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মতের সমর্থন করা হইত। আমি যদি বলিতাম যে আত্মা আছে তবে তাহাতে কি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত—সবই অনাত্ম তাহার কি এ জ্ঞান জন্মিত ?"

"না ভদন্ত, তাহার এ জ্ঞান জন্মিত না।"

"আনন্দ, কিন্তু আমি যদি বলিতাম আত্মা নাই তবে সে এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িত, ভাবিত, আগে আমার আত্মা ছিল না কি ? কিন্তু এখন আর তাহা নাই।"

তাহা হইলে দেখা গেল যে কথাটা এই—বুদ্ধ এ সম্বন্ধে হাঁও বলেন নাই নাও বলেন নাই, তিনি ইহা প্রকাশ করেন নাই, কেননা ইহার দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না, লোকের কোন লাভ হইবে না। সুদক্ষ চিকিৎসক যেমন বলিতেন যে 'ক্ষতের বিষনাশ করিয়া প্রাণরক্ষাই তোমার ও আমার কাজ, কে বাণ মারিল, তাহার বাড়ী কোথায়, এ সবে এখন তোমারও কাজ নাই আমারও কাজ নাই, এ সব খবর জানিলে তোমার রোগ দূর হইবে না' সেইরূপ বুদ্ধেরও প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাহাতে লোকের বাস্তবিক উপকার হইবে তাহা বলা, অহার নানাবিষয়ক নিরর্থক কৌতূহল চরিতার্থ করা নয়। দীঘ নিকায়ের "পোট -

ঠপাদ সুত্তে" তিনি বলিয়াছেন যে আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রশ্নের উত্তর এই জন্য দেন না যে এ সবের আলোচনায় আসল কাজের কোন সুবিধা হইবে না; অষ্টাঙ্গ মার্গের ফল সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত, তিনি এই মার্গের কথাই লোককে বলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে তিনি এ সব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন বলিয়া তিনি কি যাহা বলিতেন তাহার বেশী কিছু আর জানিতেন না বা তাহা ছাড়া আর কিছু আছে তাহা মানিতেন না? তাঁহার আর একটি উক্তিতে এ সমস্যা সরল হইবে।

সংযুক্ত নিকায়ে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধ এক সময়ে কৌশাম্বী নগরের "শিংশপা-উদ্যানে" ছিলেন। তিনি কয়েকটি শিংশপা পত্র হাতে লইয়া শিষ্যদের বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? কোনটা বেশী—আমার হাতের মধ্যে যে কয়টি শিংশপাপত্র রহিয়াছে তাহা, না শিংশপা বনে অন্য যে যে সব পত্র আছে তাহা?"

"ভদন্ত, ভগবানের হাতে যে কয়টি পত্র রহিয়াছে তাহা বেশী নয়, ঐ বনে যে সব পত্র আছে তাহাই বেশী।"

"ভিক্ষুগণ, সেইরূপ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহার চেয়ে আরও বেশী অনেক আছে, যাহার কথা আমি জানিয়াছি অথচ তোমাদিগকে বলি নাই। ভিক্ষুগণ, কেন তোমাদিগকে এসবের কথা বলি নাই? কারণ হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে তোমাদের কোন লাভ হইবে না, ইহাতে শুদ্ধতাবৃদ্ধি হইবে না, ইহাতে সাংসারিক বিষয় ছাড়িয়া বাসনাদমনের চেষ্টা হইবে না, ইহাতে ক্ষণস্থায়িত্ব নাশ হইবে না, ইহাতে শান্তিলাভ, প্রজ্ঞালাভ, বোধিলাভ এবং নির্ব্বাণলাভ হইবে না—তাই আমি তোমাদের কাছে এ সব প্রকাশ করি নাই। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কাছে আমি কি প্রকাশ করিয়াছি? 'দুঃখ ইহা' ভিক্ষুগণ এই কথা আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখ উৎপত্তির কারণ ইহা' এই কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখের নিরোধ ইহা' এই কথা আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখ নিরোধের পথ ইহা' এই কথা আমি তোমাদের কাছে প্রচার করিয়াছি।"

আত্মা আছে কি নাই, জগৎ অনন্ত না সান্ত, মৃত্যুর পর মুক্তপুরুষের কোনরূপ অস্তিত্ব আছে না নাই, এসব প্রশ্ন মুক্তির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এ কথা বলা বুদ্ধের ঠিক হইয়াছিল কি না সে প্রশ্নের বিচারে আমাদের এখানে প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি ভুলই করুন আর ঠিকই করুন, তাঁহার নিরুত্তর তুষ্ণীভাবে একটা বিপত্তির সৃষ্টি হইল। তাঁহাকে লোকে যে সব প্রশ্ন করিত তাহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে আত্মা কি আছে ইত্যাদির তিনি যখন উত্তর না দিতেন তখন লোকে স্বতই মনে করিত তবে বুঝি তিনি এগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন; আবার যখন আত্মা কি নাই ইত্যাদিরও উত্তরে নীরব থাকিতেন তখন প্রশ্নকর্ত্তা মনে করিত তবে বুঝি তিনি বলিতেছেন এগুলি আছে। এ মহা সমস্যার কথা, ইহা লইয়া বৌদ্ধ দর্শনের তথা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লক্ষ্যবস্তু নির্ব্বাণের অর্থ লইয়াই বা কত না বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। কেহ বলিলেন, নির্ব্বাণের অর্থ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার মত—একেবারে কিছুমাত্র আর থাকে না। বুদ্ধ যাহার সম্বন্ধে নীরব রহিলেন অনেকে বলিল, সেগুলি নাই। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? 'ইহা কি আছে?' ইহার উত্তরে 'না' বলিলে যদি উহা সত্যই একেবারে নাই এরূপ বুঝায় তবে তিনি 'তবে কি ইহা নাই?' ইহার উত্তরেও 'না' বলিলেন কেন? পরিব্রাজক বৎসগোত্রের প্রসঙ্গে তিনি আনন্দকে যখন বলিয়াছিলেন, "যদি আমি বলিতাম, আত্মা নাই, তবে সে এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িত, ভাবিত; 'আগে আমার আত্মা ছিল না কি, কিন্তু এখন আর তাহা নাই!" তখন মনে হয় না কি যে তাঁহার কথার অর্থ এই যে বৎসগোত্র যদি ভাবে তাহার আত্মা নাই তবে সে ভুল বুঝিয়াছে? বুদ্ধের কথার ভাবে মনে হয় যে লোকে যে অর্থে বলিত আত্মা প্রভৃতি আছে তাহা তিনি অস্বীকার করিতেন, যে অর্থে বলিত আত্মা ইত্যাদি নাই তাহাও তিনি অস্বীকার করিতেন।

প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা বড় অভিযোগ ইহার অনাত্মবাদ, সর্ব্বশূন্যতা অর্থে নির্ব্বাণবাদ এবং যে অক্ষয় অমরতা ও ভবিষ্যতের উপর মানবের মনের এত আশা-ভরসা তাহার সম্বন্ধে আশাহীন অন্ধকার। বুদ্ধ কি সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া এই নিরাশার শূন্যগর্ভ বন্ধ্যা বাণী জগৎকে দিয়া গেলেন? কিসের আশায় আমরা রূপরসগন্ধস্পর্শময় এই বিচিত্র সংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করিব? কি লাভের জন্য এত ত্যাগ এত যত্ন এত শ্রম করিব? সে কি ঘনান্ধকার শূন্যতার সাধনায়? সংযুক্ত নিকায়ে আছে তিনি কাত্যায়নকে বলিয়াছিলেন, "এক অন্তে—'সবই আছে', আর এক অন্তে—'কিছুই নাই', হে কাত্যায়ন, তথাগত এই দুই অন্তকে দূরে পরিহার করিয়া যে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহা এই দুই অন্তের মধ্যবর্ত্তী।" এই মধ্যস্থতার অর্থ কি এই যে দুই-ই ছাড়িলাম কিন্তু কিছুই পাইলাম না? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে। নির্ব্বাণ বলিতে বুদ্ধ ঠিক কি বুঝিতেন আমাদের বিচার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)
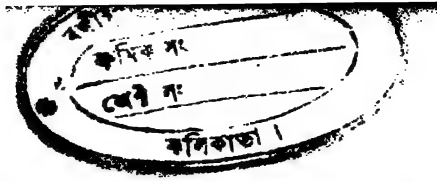
মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধান *

—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের ভাষা-সংস্করণ বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। কোন্ শুভদিনে কোন্ সুলগ্নে গৌড়েশ্বর এই অমর কবিকে ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনি সেই আজ্ঞাপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু তাহা যে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে নিরতিশয় অমৃতময় লগ্ন ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। উত্তর ভারতেও অমনি শুভদিন আসিয়াছিল, কিন্তু আরও প্রায় দুইশত বৎসর পরে। বাঙ্গালায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে তুলসীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতময় মধুমাখা রামকথা বিলাইয়া হিন্দীভাষী জনগণের জাতীয় জীবনকে পবিত্রতর উন্নততর খাতে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কোন্ পুণ্যবলে ইহার দুইশত বৎসর আগেই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে?

বাঙ্গালা ভাষার এবং ঐ ভাষায় সাহিত্যের জন্ম কৃত্তিবাসের আবির্ভাবেরও অনেক পূর্ব্বে। কাজেই কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে যে কেহ বাঙ্গালায় রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলেনা। যদি কেহ দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সৃষ্ট সেই সাহিত্য আমাদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইবার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৃত্তিবাস সূর্য্যের জ্যোতিতে ঐ সকল প্রভাতী তারা অল্পকাল মধ্যেই ম্লান এবং অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ধরাই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পরেও বাঙ্গালা দেশে অনেক কবি ভাষা-রামায়ণ রচনায় হাত দিয়াছিলেন; কেহ কেহ দুই এক কাণ্ড মাত্র লিখিয়াছেন, কেহ বা কোন কাণ্ডের ঘটনা বিশেষ লইয়া স্বীয় কল্পনাবলে তাহাকে বৃহৎকাব্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কয়েকজন লেখক কিন্তু গোটা রামায়ণ খানিরই ভাষা-সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণই পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁরা অনেকে রচনাশক্তিতে এবং কবিত্বে কৃত্তিবাসের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। রামায়ণ-রচকগণের মধ্যে কৃত্তিবাসই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া চাটগাঁ পর্য্যন্ত এবং উড়িষ্যার সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া কামরূপের সীমানা পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথির অবাধ প্রচার দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিরও পরিচয় লওয়া আবশ্যক। শ্রীরামপুরের মিশনারী-দের যত্নে মুদ্রিত হইয়া মুদ্রিতরূপে সর্ব্বসাধারণ্যে সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত হইয়া কৃত্তিবাস ও কাশীদাস প্রত্যেকেই যতটা খ্যাতি আত্মসাৎ করিয়াছেন, ততটা খ্যাতি কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাওনা নহে,—কাশীদাসের তো নহেই।

অন্যান্য রামায়ণ-রচকগণের পরিচয় খুঁজিতে স্বতঃই আমরা এই বিষয়ে এক মাত্র গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"এর শরণাপন্ন হই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থখানি যতটা সাহায্য করে, বিপথে চালনা করে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-রচনায় হাত দেন তখন বাঙ্গালা পুথি খোঁজার প্রবৃত্তি বাঙ্গালা দেশে জাগে নাই। এই প্রবৃত্তির উদ্বোধক যে দীনেশ বাবু এবং তাঁহার বিশ্রুত গ্রন্থ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য দীনেশ বাবু চিরকালের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে ব্যবধান, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নব্যাপারে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম প্রচার-কাল এবং বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেও ততখানিই ব্যবধান। দীনেশ বাবু নিজের সংগৃহীত কয়েকখানি পুথি এবং পরে বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পুথিগুলির উপর নির্ভর করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাই এই পুস্তক পড়িয়া গ্রন্থকারগণের গ্রন্থপ্রচারের ভৌগোলিক সীমানা বা তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমানে পঞ্চম সংস্করণ চলিতেছে। প্রথম সংস্করণের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য দীনেশ বাবু নানারূপ জোড়া-তাড়া দিয়া নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মত হালনাগাদ খবর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের কাঠাম তাহাতে বদলায়

---

* বহু পুথি মিলাইয়া মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার ও সম্পাদন-ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে লেখকের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। আদি ও সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদন শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ আদিকাণ্ডের ভূমিকারই প্রথমাংশ। ব: স:।

নাই। বরং ফকীরের কন্থার মত সমস্ত পুস্তকখানি তাহাতে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। এই ক্ষেত্রে বিগত ত্রিশতাধিক বর্ষের অধিকাংশ গবেষকদিগের অধিকাংশ গবেষণা অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করিয়া, সেই গুলি তিনি পড়িয়াছেন কিনা,—আলোচনা করিয়াছেন কিনা,—কেন উহা গ্রাহ্যের যোগ্য মনে করিলেন না—ইত্যাদির কোন পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে না দিয়া তাঁহার এই কালবারিত মালে বোঝাই জীর্ণ গাধা-বোট তথাপি তিনি এক সংস্করণের ষ্টেশন হইতে অন্য সংস্করণের ষ্টেশনে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন! এই অদ্ভুত ব্যাপার কেবল আমাদের দেশের মত autocracyতে অভ্যস্ত দেশেই সম্ভবপর।

দৃষ্টান্ত দিতে গেলে সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খানিরই সংশোধনী লিখিতে হয়। একটি শুধু দেখুন। পঞ্চম সংস্করণের গ্রন্থে রামায়ণ-রচকগণের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্যের নাম তিনি করিয়াছেন। ৪৩০-৩১ পৃষ্ঠা। কিন্তু মাত্র দুইটি প্যারাগ্রাফে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের মতামত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই তিনি অদ্ভুতাচার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়াছেন। রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের যে আলোচনার পুনরালোচনা সেন মহাশয় করিয়াছেন, তাহা কোথায় বাহির হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শনী দেওয়া সেন মহাশয় আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই এই প্রকার নিদর্শনী দেওয়াকে তিনি শত্রুবৎ এড়াইয়া গিয়াছেন। পুথির উল্লেখ স্থানে স্থানে করিয়াছেন—কিন্তু তথায়ও পদ্ধতি একই প্রকারের যথা, ১২০ পৃষ্ঠায় একখানি রামায়ণের পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—নিদর্শনীরূপে আছে—"বে, গ, পুথি, ৪ পত্র।" বে, গ, পুথি অর্থাৎ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি কোথায় রক্ষিত আছে, উহার নম্বর কত—ইত্যাদি কৌতুহলী পাঠককে স্বয়ং খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক হতভাগ্য সেই চেষ্টা করিয়াছিল। করিয়া জানিল, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথিগুলি বর্ত্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী লিখিয়া জানাইলেন,—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সংগ্রহে এই পুথি কেন,—একখানা "অঙ্গুরীয় সংবাদ" ভিন্ন কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন পুথিই নাই। নিরুপায় হইয়া দীনেশ বাবুর কাছে পত্র লিখিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন, তিনি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে ফিরাইয়া দিয়াছেন,—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত বাঙ্গালা পুথির নম্বর বদলাইয়া নূতন করিয়া কেটেলগ করিবার জন্য স্তূপীকৃত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন; ঐ স্তূপ হইতে, আমি যে পুথিখানি চাই তাহা, কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিতে দীনেশবাবু অক্ষম! আবার এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর নিকট পত্র দিলাম—দীনেশ বাবুর চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি সক্রোধে জানাইলেন—এশিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পুথি সুশৃঙ্খলরূপে তালিকাবদ্ধ, কোথাও কোন পুথি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া নাই। ব্যাস্—এই পুথির অনুসন্ধান এইখানেই খতম হইয়া গেল। গভর্ণমেণ্টের পয়সায় খরিদ করা গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তিনি যে পুথি নিজের পুস্তক রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহার এইরূপ বেমালুম অদৃশ্য হওয়ার পরেও দীনেশবাবুর গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত পেন্‌সন বজায় থাকে কি করিয়া তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এই রামায়ণখানি (অর্থাৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণখানি) এক সময়ে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।" কষ্ট স্বীকার করিয়া সামান্য রকম একটু খোঁজ-খবর করিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে গঙ্গার উত্তর পারে গোটা বরেন্দ্রী দেশটায় মালদহ হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত, এমন কি ময়মনসিংহ জেলায়ও অদ্ভুতাচার্য্যের পুস্তকই বেশী চলিত—কৃত্তিবাসের নহে। এই দুই মহাবীর যেন বাঙ্গলাদেশটাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন—গঙ্গার স্রোত ছিল তাহার সীমানা। রঙ্গপুর পরিষদের ক্ষুদ্র সংগ্রহেও অদ্ভুতের ২০ খানা পুথি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংগ্রহে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা হইতেই অদ্ভুতের ৩২ খানা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তরবঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্যের খ্যাতি প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। তবে প্রচার হিসাবে সর্ব্ববঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রচার যে অদ্ভুতাচার্য্য অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ সুপ্রাচীন। রঙ্গপুর পরিষদে অদ্ভুতের প্রাচীনতম পুথির তারিখ ১১৫১ সন, অর্থাৎ প্রায় ২০০ শত বৎসর। উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান গা-লাগাইয়া কেহ এপর্য্যন্ত করেন নাই। করিলে

হয়ত অদ্ভুতের বয়স স্থির হইতে পারে। সম্ভবতঃ অদ্ভুত কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবি—তবে এই বিষয়ে জোর করিয়া কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী যে নহেনই এমন বলবৎ প্রমাণওতো বিশেষ কিছু নাই। অদ্ভুতের পুথি-গুলিতে এমন কোন কথা এযাবৎ খুঁজিয়া পাই নাই যে কৃত্তি-বাস-রচিত রামায়ণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা উহার পরিচয় তিনি জানিতেন। অপর পক্ষে ইহাও দ্রষ্টব্য যে কৃত্তিবাসের কোন পুথিতেও অদ্ভুতের রামায়ণের কোন উল্লেখ নাই। পরিষদের সংগ্রহে কৃত্তিবাসের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পুথি উহার ২নং পুথি। পুথি খানি আদিকাণ্ডের,—তারিখ ১১০৬ সন। এই পুথি খানি বাঙ্গালার পশ্চিমতম প্রান্তে রাজমহল সহরে বসিয়া নকল করা। এই পুথি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা এমন প্রভাবিত যে আদিকাণ্ডের পাঠোদ্ধারে ইহা বিশেষ কোন কাজে লাগাইতে পারি নাই। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে মিশনারীগণ কর্ত্তৃক ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়া এতকাল ধরিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া যাহা বাজারে চলিতেছে, তাহার বহুস্থান অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা! সিন্ধাবাদের গল্পের বৃদ্ধের মত অদ্ভুতাচার্য্য কৃত্তিবাসের পুথিগুলির ঘাড়ে এমন ভাবে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন যে এখন কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার উদ্ধার-সাধন অমানুষিক পরিশ্রমসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দেখা যাইবে, গোটা একখানি অদ্ভুতাচার্য্যের আদিকাণ্ডের পুথি শুধু ভণিতা মাত্র বদলাইয়া কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়েনগণ অদ্ভুতাচার্য্য হইতে বাছা বাছা অংশ লইয়া কৃত্তিবাসের ভণিতা দিয়া কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার সহিত অসঙ্কোচে চালাইয়া দিয়াছেন।

গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী কবির "ইতিহাস পুস্তক" বা "ধর্ম্ম ইতিহাস" নামক একখানি পুথির অস্তিত্ব আমি বহুদিন হইতেই জানি। ত্রিপুরা জেলায় প্রত্নানুসন্ধানে বাহির হইয়া ১৩১৮ সনের পৌষ মাসে কুমিল্লার মাইল দশেক পশ্চিমস্থ ফকন্দা নামক গ্রামে এক সূত্রধরের বাড়ীতে এই পুথি একখানি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। (প্রতিভা, ১৩২০, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা। মল্লিখিত "প্রত্নানুসন্ধানের সুখ দুঃখ" নামক প্রবন্ধ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ইহার পাঁচ খানি পুথি আছে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের ৯৭ ও ৫৮০ নম্বর পুথি এই পুস্তকেরই পুথি। মুন্সী সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহার রচনা নিতান্ত নীরস। স্থানে স্থানে কিন্তু ইহাতে বেশ সরস রচনার পরিচয় পাইয়াছি। আমি যে কয়খানি পুথি অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পুথিতে রামচন্দ্রের হরধনু-ভঙ্গ বৃত্তান্তে এমন একটি স্থান পাইলাম যাহার রচনা অতি সুন্দর কিন্তু অন্য কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডগুলির সহিত মিলে না। ভাবিলাম খাঁটী কৃত্তি-বাসী রচনা পাইয়াছি, অন্য পুথিগুলি এই চমৎকার রচনাটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আমার পুথি হইতে এত দিনে উহার উদ্ধার সাধন হইল! স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণকে এই স্থানটুকু প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-রক্ষক শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ একদিন ঐ গুণরাজ খাঁর ইতিহাস পুস্তকের কয়েকখানি পুথি পাঠাইয়া দেখাইয়া দিলেন মৎপ্রশংসিত খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া বিবেচিত স্থানটি গুণরাজ খাঁর পুথিগুলিতে আছে! এইবার গুণ-রাজ খাঁর "ইতিহাস পুস্তক" এই অদ্ভুত নামযুক্ত পুথিগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হইল। দেখিলাম, ইহা কৃত্তিবাস অদ্ভুতাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রচনা—রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিস্তৃত পুথি। ইহার পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সংক্ষেপে এই স্থানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ইহার পটভূমি মহাভারতের বন পর্ব্ব। যুধিষ্ঠির পাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনে গিয়াছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ তাঁহাকে রামচরিত শুনাইতেছেন। আদিকাণ্ড বেশ বিস্তৃত রচনা, ৭০।৮০ পাতায় সমাপ্ত। পরে আর ১০।১৫ পাতায় রামায়ণের বাকী অংশ বিবৃত হইয়াছে।

আমার অবলম্বিত সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পুথি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন, সমগ্র রামায়ণের পুথি,—আগাগোড়া এক হস্তে লিখিত—এবং পুরুষানুক্রমে সম্ভ্রান্ত পরিবারে রক্ষিত। তাহার মধ্যে পর্য্যন্ত যখন গুণরাজ খাঁ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন—১১০৬ সনে রাজমহলে বসিয়া লিখিত কৃত্তিবাসী পুথিতে যখন অদ্ভুতাচার্য্য যাইয়া ভর করিয়াছেন তখন খাঁটি কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করা যে কত কঠিন কাজ, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সেই সঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্য এবং গুণরাজ খাঁ এও কোং কত প্রাচীন কাল হইতে কৃত্তিবাসকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহারও আভাস পাইবেন।

খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজন্ম কামনা। পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতেই পরিষদ এই বিষয়ে সচেষ্ট আছেন। বিষয়-বৈষম্য দেখিয়াই ১৩০৭ সনে পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনে যখন কৃত্তিবাসী অযোধ্যা কাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভূমিকায় হীরেন্দ্র বাবু নিম্নরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন :—

"পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অধুনা প্রচলিত বটতলা রামায়ণের আদর্শ স্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথিও পুস্তকের মেলন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

"১৩০১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় কৃত্তিবাস প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গের সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম যে কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে বহুল পরিমাণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য এবং অঙ্গ-বৈকল্য ও অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। পরে এই বিষয়ে আরও আলচনার ফলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রচলিত রামায়ণে এমন কোন এক পংক্তি বিরল যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই।"

কালান্তরে ভাষান্তর অনিবার্য্য। রামায়ণের পাঁচালী সারা দেশময় গাওয়া হইত, এখনও রামায়ণ গাহিবার জন্য দেশে বহু পাঁচালীর দল আছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাস যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন, আজিও সেই ভাষায়ই পাঁচালী গীত হইবে, এমন আশা করা যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই যুগে যুগে কৃত্তিবাসের রচনায় ভাষান্তর, সঙ্গে সঙ্গে শব্দান্তর প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে গুণগ্রাহী পাঁচালী গায়ককে লইয়া। তিনি যুগে যুগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কৃত্তিবাস-পরবর্ত্তী রামায়ণ-রচকগণের রচনায় যেখানে যেটুকু নূতন বা মুখরোচক বা কবিত্বময় পাইয়াছেন, ভণিতা বদলাইয়া সমস্ত আনিয়া নিজের অবলম্বিত কৃত্তিবাসের পুথি খানিতে ঢুকাইয়াছেন। ঐ পুথির নকল-পরম্পরায় ঐ গুলি স্থায়ী ভাবে কৃত্তিবাসের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একই কাণ্ডের এক দেশের পুথির সহিত অন্য দেশের পুথির, সময় সময় একই দেশে প্রচলিত একই কাণ্ডের বিভিন্ন পুথিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধার কি একেবারেই অসম্ভব কার্য্য ?

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই মনে হয় বটে—কিন্তু অনেক পুথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মনে একটু একটু করিয়া আশারও সঞ্চার হইতে থাকে। যেখানে ভেজালের সম্ভাবনা কম, কৃত্তিবাসের মধ্যস্থ এমন একস্থান হইতে উদাহরণ দেখাইতেছি। পাঠকসাধারণ যাহাতে উদাহরণগুলি পরখ করিয়া লইতে পারেন, সেই জন্য শুধু মুদ্রিত এবং সহজপ্রাপ্য পুথি-তালিকা হইতেই উদাহরণগুলি সংগৃহীত হইল।

১। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ। (পরিষৎ পুথি-শালায় সংগৃহীত) তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সঙ্কলিত ও শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩৩০ সনে প্রকাশিত

৫৪নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড, ১১৭৩ সন, মেদিনীপুরে প্রাপ্ত। আরম্ভ :—

পিতা পুত্রে পঙ্করাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদিগ নাক্রি জানি আকাশ মণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আসে পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরাণ॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবীর অঙ্গদ কটকে দিছেন আবাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিশাদে সে মরি।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বত্রেতে তরি॥
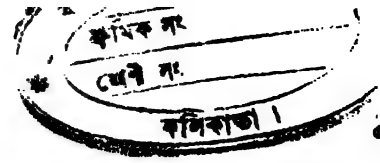
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গণ জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সভে নিদ্রার দেহমন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরণ॥

৫৭নং পুথি। রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড, ১২৩১ সন, প্রাপ্তি-স্থান অজ্ঞাত।

পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিণ সাগর॥
লক্ষ দক্ষ বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ॥
দিগ দিগ নাহি জ্ঞান আকাশ মুণ্ডলে।
হিল্লোল কল্লোল করে সাঁগরের জলে॥
জল-জন্তু ভয়ঙ্কর শুনি দেখি লাগে ডর।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর॥
জল জন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বানরগণ লাগে চমৎকার॥
সাগরের কুলে নিশি বঞ্চে সর্ব্বজন।
পর্ব্বতের ফল ফুল করিল ভোজন॥
ফল ফুল খ্যায়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ॥

৫৮নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড। ১২৪০ সন। প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত।

পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গণিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশ মণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবা রাত্রি হইল অবসান॥

২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ। (পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত)। তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। ১৩৩৩ সনে প্রকাশিত।

১৩৫নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড, ১২৩৭ সন। প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত।

বাপে পোয়ে পক্ষরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
তজ্জন গজ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গণিছে প্রমাদ॥
জল জন্তু কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে দেবতা বানররূপ আপুনি॥
জলজন্তু দেখি জেন পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান॥

১৩৯নং পুথি। রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড। ১২৩৬ সন। প্রাপ্তিস্থান নদীয়া।

পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর
বানর সব চলি গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশ মণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সেস্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান॥

১৪৪ এবং ১৪৯ নম্বরের পুথিও সুন্দরাকাণ্ডের পুথি। উহাদের আরম্ভও অনুরূপ,—বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

৩। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত বাঙ্গালা প্রচীন পুথির বিবরণ। ১৩১০ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

৮৯ নং পুথি। রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডের পুথির প্রথম পাতা মাত্র। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত। হাতের লেখা দেখিয়া সঙ্কলয়িতা পুথিখানি সুপ্রাচীন ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বাপেপুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
ভয়ে গর্জ্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে॥
সাগর দেখিয়া কপি লাগিল ত্রাস।
অঙ্গদের সম্ভাষ সবে করিয়া আশ্বাস॥

বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস ॥

পাতাটির এইখানেই শেষ।

১৬১ নং পুথি। রামায়ণের প্রায় সম্পূর্ণ পুথি—শুধু মধ্যে হইতে লঙ্কাকাণ্ড নাই। ১২০৪ মঘীসন। কাজেই বাঙ্গালা সন ১২০৪+৪৫=১২৪৯। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত।

বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর ॥
তর্জ্জেগর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণন্তি প্রমাদ ॥

৪। **Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts (In the collection of the Calcutta University. Vol. I. by Basantaranjan Roy Vidvadballabha and Basanta Kumar Chatterjee, M. A. Published in 1926.)**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের পুথি অধিকাংশই বাঁকুড়া জেলায় সংগ্রহ। ৭৬, ৭৯, ৮২, ৮৫, ৮৮ নং সুন্দরাকাণ্ডের পুথিতে আমাদের উদ্দিষ্ট আরম্ভ আছে। উহাদের সমস্তগুলি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। উহাদের প্রথম খানি ১০৭৩ মল্লসন অর্থাৎ ১১৭৪ বাঙ্গলা সনের। প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়া। উহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

বাপে পোএ পক্ষরাজ গেল দিক উর্ত্তর।
বানর কটক নাঞা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর ॥
তর্জ্জেগর্জ্জে বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া বানর গুনিল প্রমাদ ॥
দিগ বিদিগ নাহি জানি ভুমি আকাশমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল ॥
জল জন্তু খল বল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে ছায়া দেখি দৈব দাপুনি ॥
আকাসে উঠিআ লাগে ঢেউ পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের কুলে বসিঞা বানরের দেয়ান ॥
সাগরের বিক্রম দেখিঞা বানর নৈরাস।
মহাবির অঙ্গদ দিলেক আশাস ॥
বিসাদ না ভাবিহ বানর বিসাদ ভাবিলে মরি।
বিসাদ না চিন্তয়লে বানর সর্ব্বত্রেতে তরি ॥
সুখে নিদ্রা জার বানর সাগরের কুলে।
সাগর তরিতে চিন্তা করিব কালি বিহান বেলে ॥

বাজার প্রচলিত মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নিম্নলিখিত রূপে সুন্দরাকাণ্ড আরব্ধ।

পিতা-পুত্রে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর তরঙ্গ দেখি গণিল প্রমাদ ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোলে কল্লোল তুলে সমুদ্রের জল ॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে।
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান ॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস ॥
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেই তরি ॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে ॥

এখন আমার অবলম্বিত ক ও খ পুথি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। দুই পুথিই সম্পূর্ণ রামায়ণের পুথি। প্রথমখানি ঢাকাজেলার এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে প্রাপ্ত। তারিখ —১৫৭১ শক বা বাঙ্গালা ১০৫৫ সন। দ্বিতীয় খানি ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত, প্রত্যেক কাণ্ড স্বতন্ত্র, নকলের তারিখও এক নহে। সুন্দরাকাণ্ডের নকলের তারিখ ১২১৪ সন। আমার ক পুথিতে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড নিম্নরূপে সমাপ্ত।

বাপে পুত্রে পক্ষি গেল আপনার ঘর।
কটক চলিয়া গেল দক্ষিণ সাগর।
কীর্ত্তিবাস কবিগাথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত কিষ্কিন্ধার কাণ্ড।

তাহার পরে সুন্দরাকাণ্ডের আরম্ভ দুই পুথি হইতে পর পর দেখান গেল।

ক পুথি

গর্জ্জিয়া বানর সব ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের তরঙ্গ দেখি গণন্ত প্রমাদ ॥
দিগ বিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সাগর উথলে ॥
শাগর দেখিয়া কপির লাগিল তরাস।
অঙ্গদে শান্তাএ সভা করিয়া আশ্বাস ॥
বিশাদে বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
বিশেষ দেখিয়া শত্রু করে উপহাস ॥
কপিগণ সান্তাইয়া বঞ্চিলেক রাত্রি।
প্রভাতে মিলিল আসি সর্ব্ব সেনাপতি ॥

খ পুথি

তর্জ্জয়ে বানর সৈন্য করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি চিন্তয়ে প্রমাদ ॥
দিক বিদিক নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লল করি সাগর উথলে ॥
সাগরের ঢেউ দেখি লাগিলেক ত্রাষ।
অঙ্গদে সান্তাএ সব করিয়া আশ্বাস।
বিসাদে বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
বিসাদ দেখিয়া শত্রু করে উপহাস ॥
কপীগণ সান্তাইয়া বঞ্চিলেক রাত্রি।
প্রভাতে একত্র হৈল যত সেনাপতি ॥

ইহার সহিত চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মুন্সী সাহেবের ৮৯ নং পুথি মিলাইলে দেখা যাইবে যে এই তিন পুথিতে চমৎকার মিল আছে—গরমিল গুলি শব্দান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত পরিষৎ পুথিশালার পুথি গুলির পাঠ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার পুথিগুলির পাঠ মিলাইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,—কৃত্তিবাসের মূল রচনা যেমন বেমালুম হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া হীরেন্দ্র বাবু ও প্রফুল্লবাবু হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে কৃত্তিবাস ততখানি হারাইয়া যায় নাই। শব্দান্তর ঘটিয়াছে, ভাষান্তর ঘটিয়াছে, অনেক স্থান বর্জ্জিত হইয়াছে, অন্য কবির রচনা আসিয়া কৃত্তিবাসে ঢুকিয়াছে—ইত্যাদি। এতগুলি গলদ দূর করিয়া মূল কৃত্তিবাস উদ্ধার করা কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই, তবে অসাধ্য কার্য্য নহে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন ও আধুনিক পুথি গুলি সম্পূর্ণ ঘাঁটিলে কৃত্তিবাসের স্বরূপ ধরা পড়িবেই পড়িবে। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বীরভূম রতন লাইব্রেরী, রঙ্গপুর পরিষৎ এবং ঢাকা মিউজিয়ম ও ঢাকা সাহিত্য পরিষদে যে পরিমাণ প্রাচীন পুথি বর্ত্তমান কালে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধারকার্য্যে হাত দেওয়া যাইতে পারে। আদি কাণ্ডের পাঠোদ্ধার এমন করিয়াই হইয়াছে। অবলম্বিত পুথিগুলির পরিচয় বারান্তরে প্রদত্ত হইবে।

জলাঙ্গী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

চলেছি একাকী পথে অন্যমনে ভাবনা-বিলাসী ;
কৃষ্ণচূড়াবীথি হ'তে বসন্তের আলঘু নিঃশ্বাস
সমীরিত রৌদ্রদাহে ;—ধরণীর নব প্রেমোচ্ছ্বাস
নূতন করিয়া কহে—ভালোবাসি শুধু ভালোবাসি।
ভাবিলাম, এই গতি, ভুলে-যাওয়া আর ভালোবাসা—
এই শুধু অনন্ত জীবন ; দুর্ব্বল স্মরণ-তরী
ভাসায়েছি কাল-স্রোতে সঙ্গী সেই অসীম পিপাসা।
সহসা চিন্তার জাল দীর্ণ করি' উঠিল মর্ম্মরি'
জলাঙ্গী, তোমারি প্রেম, তব স্বচ্ছ জলময়ী ভাষা—
কীর্ত্তি-নির্ব্বাপণ-গান কর্ণে মোর উঠিল গুঞ্জরি।

মনে হ'ল ফিরে যাই তব তীরে কিশোরের বেশে—
কালের অঙ্কনহীন সুকুমার প্রসন্ন ললাট,
নিঃশঙ্ক স্বচ্ছন্দগতি—আশা আর হাসির সম্রাট,—
স্মৃতির উজান ঠেলি' ফিরে যাই বিস্মৃতির দেশে !
সবুজ মটর-ক্ষেত, তা'রি নীচে শুভ্র বালুচর,
শেহলা দুলা'য়ে মাথা শান্ত স্রোতে সাথী হ'তে চায় !
ছোট ছোট জেলে ডিঙি—বারোমাস জলের উপর
উন্মুক্ত জীবন-যাত্রা—ওপারের তটের রেখায়
ঘন নীল আকাশের ছায়া—তারপরে শ্যামস্তর
শিহরিয়া উঠে শুধু শালিখের পাখায় পাখায়।

তব প্রেম স্বপ্ন মোর, হে জলাঙ্গী, সলিল-শোভনা,
ভুলেছি কত যে নাম, তব নাম পারি নি ভুলিতে !
ফিরিব না কভু আর, আজি তাই অয়ি শুচিস্মিতে,
তব নাম-সূত্র ধরি' ঘুরে মরে আকুল কামনা।
হয় ত বা দেখা হ'বে ব্রিজ * হ'তে ক্ষণকাল তরে
চাঁদের পাণ্ডুর আলো তব স্রোতে উঠিবে ঝলসি' !
কত নাম, কত মুখ হৃদয়ে আসিবে ভিড় ক'রে
কত অসমাপ্ত গান দীর্ঘশ্বাসে উঠিবে উচ্ছ্বসি !
চিনিবে বন্ধুরে তব ? বল বল তারার অক্ষরে
বক্ষে তব কা'র নাম ?—সাক্ষী যা'র তন্দ্রাহীন শশী !

---

* জলাঙ্গী কৃষ্ণনগরের প্রান্তবাহী নদী।

নরহরি সরকার ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়

—শ্রীসুকুমার সেন

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীখণ্ডের দান বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও মূল্যবান্। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের মুসলমান বাদশাহ যে বঙ্গভাষী ছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দরবারে হিন্দু সামন্ত ও কর্ম্মচারী-দের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহাদের অধিকাংশই যে শিক্ষিত ও অভিজাত বাঙ্গালী ছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সাহিত্য-চর্চ্চাও কিছু কম ছিল না। চিত্রশিল্পের ও ভাস্কর্য্যের চর্চ্চাও গৌড় অঞ্চলে যথেষ্ট হইত।[১] এই সাহিত্যচর্চ্চায়—বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বাদশাহের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠ-পোষকতারও অভাব ছিল না। ফলে গৌড়-দরবারে একটা সাহিত্যিক হাওয়া বহিত এবং অন্যস্থান হইতে আগত রাজ-কর্ম্মচারিগণও তাহার প্রভাবে পড়িতেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদের অনেকে গৌড়-দরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। সেই সূত্রেই বাঙ্গালা পদরচনা শ্রীখণ্ডে পঞ্চদশ শতক হইতেই আরব্ধ হয়। যতদূর জানা যায় ব্রজবুলীর সৃষ্টি শ্রীখণ্ডেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে উদ্ধৃত যশোরাজ খানের পদটাই বাঙ্গালীর রচিত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ব্রজবুলীপদ। এই পদটীর ভণিতায় গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের উল্লেখ আছে—

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সো-হ এ রস জান।
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান॥

হোসেন শাহের রাজ্যকাল খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত। সুতরাং পদটী খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ সালের মধ্যে কোন সময়ে রচিত। শ্রীখণ্ডের অধিবাসী রামগোপাল দাস বা গোপাল দাস (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) তাঁহার 'রসকল্পবল্লী'তে যশোরাজ খানকে বৈদ্য ও শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এই কথা বলিয়া গিয়াছেন [সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃষ্ঠা ১০১; অষ্টত্রিংশ ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৬]। রামানন্দ রায়ের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি সুবিখ্যাত পদটী অন্যতর প্রাচীনতম ব্রজবুলী পদ। এই পদটীতে "নরাধিপ" (প্রতাপ-)রুদ্রের উল্লেখ আছে। প্রতাপরুদ্রও খৃষ্টীয় ১৫০৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর শ্রীচৈতন্য যখন বিদ্যানগরে রামানন্দের সহিত মিলিত হন তখন রামানন্দ এই পদটী তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু খ্রীষ্টীয় ১৫০০—১১ সালে দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হন। সুতরাং পদটী খ্রীষ্টীয় ১৫০৪—১১ সালের মধ্যে কোন সময়ে রচিত। যশোরাজ খানের ও রামানন্দ রায়ের পদ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বতর তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, তবে যশোরাজ খানের পদটীই প্রাচীনতর হইবার সম্ভাবনা বেশী।

শ্রীখণ্ডের অপর এক অধিবাসী একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ইনিই 'সঙ্গীতদামোদর' বা (?) 'সঙ্গীতদর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহারই দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস তাঁহার প্রথম জীবন শ্রীখণ্ডে মাতামহাবাসে কাটাইয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডের এক শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কবিরঞ্জন। ইহাঁর নামান্তর ছিল 'বিদ্যাপতি'। মৈথিল বিদ্যাপতি হইতে পৃথক্ করিবার জন্য লোকে ইঁহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিত। ইনিও গৌড়দরবারে কর্ম্ম করিতেন [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃষ্ঠা ৪৩]। ইনি একটী পদে "সুলতান শাহ নসির"-এর উল্লেখ করিয়াছেন—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমলবাণী॥[২]

---

১ মহাপ্রভু প্রথমবার বৃন্দাবনযাত্রায় বহির্গত হইয়া গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলী গ্রামের নিকটবর্ত্তী কানাই নাটশালা গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এইগ্রামে ব্রজলীলা বিষয়ক চিত্র বা ভাস্কর্য্য ছিল বলিয়া মনে হয়। গ্রামের নামটীর উৎপত্তিও ইহাই হইতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণচিত্র(-চরিত্র) লীলা॥ [শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ]।

২ এই পদটী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ সংখ্যক পুঁথিতে আছে। এই সংবাদটীর জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই "সুলতান শাহ নসির" হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ ভিন্ন অন্য কেহ বলিয়া মনে হয় না। নসরৎ শাহের রাজ্যকাল খ্রীষ্টীয় ১৫১৯ হইতে ১৫৩৩ সাল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তি নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন। ইনি পরবর্ত্তী কালে সরকার ঠাকুর এই নামেই সুপরিচিত হন। নরহরির এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম মুকুন্দদাস। ইঁহাদের পিতার নাম নারায়ণদেব সরকার। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য। মুকুন্দদাস গৌড়ের বাদশাহের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। গৌড়ের দরবারে তখন কৃষ্ণভক্ত লোক কয়েকজন ছিলেন, অন্ততঃপক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট ছিল এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। সম্ভবতঃ রাজদরবারে চাকুরী করিবার কালেই মুকুন্দদাস ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন। নীলাচলে একদা ভক্তগণের গুণকথা প্রসঙ্গে মুকুন্দদাসের অলৌকিক ভগবদ্‌ভক্তির প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য—

> ভক্তগণে কহে— শুন মুকুন্দের প্রেম।
> নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
> বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
> অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥
> একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
> চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
> হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।
> রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥
> ময়ূর-পুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
> অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
> রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
> আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
> রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি।
> মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥
> রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
> মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
> মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
> মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥ [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]।

মুকুন্দের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন। ইনি আবাল্য ভগবৎ-প্রেমিক। মহাপ্রভু নীলাচলে মুকুন্দদাসকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

> তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন।
> কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়।
> নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥ [ঐ]।

ইহাতে মুকুন্দ উত্তর করিলেন রঘুনন্দনই আমার পিতা, আর আমি উহার পুত্র, ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। কারণ—

> আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
> অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥ [ঐ]।

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। "যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।"

রঘুনন্দন অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে সকলে প্রদ্যুম্ন বা কামদেবের অবতার বলিত।

নরহরির জন্ম আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৪৭৮ সালে। আনুমানিক ১৫৪১ সালে তিনি তিরোধান করেন। নরহরিও খুব সুপুরুষ ছিলেন। ইনি বিবাহ করেন নাই।

মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন এই তিনজন মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীখণ্ডের এই ত্রয়ী, পিতা, পিতৃব্য ও পুত্র, বৃন্দাবনের শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব এই ত্রয়ীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকুন্দদাস ও নরহরি মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় অনুচর ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, যদিও সে বিষয়ের কুত্রাপি উল্লেখ নাই। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলে যে সকল গৌড়ীয়ভক্ত মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে নীলাচলে গমন করেন তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দন ছিলেন। জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনের সময় ইঁহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

> খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
> নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

নীলাচল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে গিয়া ইঁহাদের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, এই কথা শ্রীখণ্ডনিবাসী উদ্ধবদাস তাঁহার একটী পদে বলিয়া গিয়াছেন [পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৩৭৫]।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে এমন কি ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেও শ্রীখণ্ডে শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। শ্রীচৈতন্যের শক্তি পাইয়া নরহরি সরকার ঠাকুর এই কৃষ্ণভক্তি-

বিহীন রাঢ়দেশে প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা বহাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য কবিশেখর রায় তাঁহার একটী পদে বলিয়াছেন,

যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ-সহোদর। [পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৩৭৪]।

প্রধানতঃ নরহরি সরকার-ঠাকুরের মাহাত্ম্যেই শ্রীখণ্ড ষোড়শ শতকের শেষ দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

মুকুন্দদাস কাহাকেও দীক্ষাদি দিতেন বলিয়া বোধ হয় না। নরহরি কিন্তু বহু বহু লোককে দীক্ষা দিয়া ভক্তির পথে আনিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনও তাহা করিয়াছিলেন। নরহরি প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব ছিল। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী "ভক্তিকল্পবৃক্ষের যেঁহো প্রথম অঙ্কুর" তাঁহার উপাস্য ছিল বালগোপাল। পুরীপাদের শিষ্য অদ্বৈত প্রভুরও এই উপাস্য ছিল। পুরীপাদের অন্যতম শিষ্য শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য দশাক্ষর গোপালমন্ত্রই লাভ করেন। শিক্ষাষ্টক ব্যতীত মহাপ্রভুর রচিত যে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায় সে দুইটীই বালগোপাল বিষয়ক।

এই শ্লোক দুইটী চমৎকার। শ্রীরূপগোস্বামি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে এই শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত আছে। সকলের জানা নাই অনুমান করিয়া শ্লোক দুইটী এখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

দধিমথননিনাদৈ স্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈ রাশু নির্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥
সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভি র্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখী বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥ [পদ্যাবলী, শ্লোকসংখ্যা ১৪৩, ১৪৪]।

এই বিষয়ে মহাপ্রভুর রচিত আর একটী অর্দ্ধশ্লোক আছে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে আসিতেছেন। নীলাচলের উপকণ্ঠে কমলপুরে আসিয়া দেউলের ধ্বজ দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া ভাবাবেশে এই অর্দ্ধশ্লোক পড়িতে পড়িতে শ্রীচৈতন্য বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িলেন।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ। [শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়]।

মহাপ্রভুর পারিষদ ও ভক্তগণের অধিকাংশই বাল-গোপালের উপাসক ছিলেন। নরহরি কিন্তু যুগলমন্ত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ইষ্টমন্ত্রে মহাপ্রভুরও পূজা করিতেন। নরহরির স্বতন্ত্র ভজনের বিষয় 'অদ্বৈত-প্রকাশ'এ কিছু ইঙ্গিত আছে। গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকায় গৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধনকল্পে অদ্বৈত প্রভুকে অনুরোধ করেন। অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ পিতার হইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্যের পৌরোহিত্য করিবেন বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আচার্য্য প্রভু ইহাতে অনুমতি দিলেন। তখন অচ্যুতানন্দ জানিতে চাহিলেন কোন্ ধ্যান ও কোন্ মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। আচার্য্য প্রভু উত্তর করিলেন কৃষ্ণ স্বয়ং নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন সুতরাং "গোপা-লের দশাক্ষরী মন্ত্রধ্যানে" মহাপ্রভুর পূজা হইবে এই সন্ধান তোমাকে বলিয়া দিলাম।

ইহা শুনিয়া অচ্যুতানন্দ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা মতই করিব—

কিন্তু খণ্ডবাসী সুপণ্ডিত নরহরি।
সরকার-ঠাকুর যেঁহ প্রেমের গাগরি॥
শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তেতে গণন।
যাঁরে কৃষ্ণের নিত্যসাথী কহে সাধুগণ॥
তিঁহ মোরে কহে গৌরের পূজা মতান্তরে।
ইহার কারণ কিবা কহ প্রভু মোরে॥ [অদ্বৈত-প্রকাশ, বিংশ-অধ্যায়]।

আচার্য্য প্রভু উত্তর করিলেন, মতে কিছু আসিয়া যায় না। ভক্তিই আসল; ভক্তি করিয়া পূজা করিলে যে কোন মন্ত্র চলিতে পারে।

নরহরি শ্রীখণ্ডে গৌরনিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপনা করিয়াছিলেন। সরকার-ঠাকুর গৌরাঙ্গ-পূজার অন্যতম প্রবর্ত্তক। ইঁহার রচিত গৌরপূজা বিষয়ক একখানি ছোট পুঁথির সন্ধান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন [Notices of Sanskrit Manuscripts, Second Series Vol. I, পৃষ্ঠা ৯৮]। এই গ্রন্থটী ঊনপঞ্চাশ শ্লোকাত্মক, নাম

'গৌরাঙ্গাষ্টকালিক'। শ্লোকগুলি সবই শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। প্রথম শ্লোকটী এই—

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তিবিহিতা সা তৈ র্যথালভ্যতে।
তাং তন্মানসিকস্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যাং সদা সত্তমৈঃ
স্তৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্॥

নরহরি সরকার-ঠাকুর বা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের সাধনার মধ্যে তান্ত্রিকতার বা 'সহজ'-মতের কোন স্থান ছিল না। তাঁহারা পুরাপূরি ভক্তিরসিক ছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে কিন্তু তান্ত্রিক-সাধনা কতক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ও শেষার্দ্ধে শ্রীখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকতার স্রোতঃ বাহ্যতঃ লুপ্ত হইলেও অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত ছিল' তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যদিগের মধ্যে দুই একজন এইরূপ তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কাটোয়া-নিবাসী যদুনাথ দাসের লেখা 'সংগ্রহতোষণী' নামক গ্রন্থের একখানি পুঁথি আছে। তাহাতে আছে যে রঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য রায় শেখরের বা কবিশেখর রায়ের দুর্গাদাসী নাম্নী এক সাধন-সঙ্গিনী ছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করা চলে না।

ত্রিপুরা দেবীর উপাসনা এককালে সমস্ত উত্তর ভারত ব্যাপিয়া চলিত, কারণ ত্রিপুরা-স্তব বা ত্রিপুরা-মাহাত্ম্যের পুঁথি উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া গিয়াছে। রাঢ়েও এই দেবীর পূজার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। রঘুনন্দরের অপর এক শিষ্য শ্রীখণ্ডবাসী কবিরঞ্জন বা "ছোট" বিদ্যাপতির দুইটী পদের ভণিতায় এই ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ দুইটী বোধ হয় কবিরঞ্জন যখন শাক্ত ছিলেন তখনকার রচনা। সরকার-ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়, তাঁহার বন্ধু ও শ্রীখণ্ডের উদ্ধব দাসের শিষ্য কবিবল্লভ তাঁহার 'রসকদম্ব' গ্রন্থে এই ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরা দেবীকে রাধা-কৃষ্ণের আবরণী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সরকার-ঠাকুর মধুর-ভজন করিতেন। স্ত্রীলোক-ঘটিত সাধনার স্থান তাহাতে ছিল না সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। রামানন্দ দাস তাঁহার 'হাটপত্তন'-এ লিখিয়াছেন—

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥

নরহরির সাধন-প্রণালীর ইঙ্গিত তাঁহার কতকগুলি 'পিরীতি'-ঘটিত আধ্যাত্মিক ধরণের পদের মধ্যে লুকায়িত আছে বলিয়া মনে হয়। এই পদগুলি প্রায় সবই চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

নরহরির প্রখ্যাততম শিষ্য সুলোচন বা লোচনদাস। ইনিই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা। লোচনের সাধন-প্রণালীও গুরু-অনুগত ছিল। ইনিও কতকগুলি সাধনতত্ত্বঘটিত আধ্যাত্মিক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটী পদ আসামে পাওয়া গিয়াছে [ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৯]। এই পদটীর সহিত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত দুইটী পদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে [সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর ৭৮৮ ও ৭৯০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য]।

নরহরি সরকারই গৌরলীলার আদি চরিতকার। তিনি গৌরাঙ্গের লীলা সকল স্বচক্ষে দেখিয়া পরবর্ত্তী জীবনীকার-দিগের জন্য বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একটী পদে বলিয়াছেন—

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনও জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ॥
গৌর-গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥ [গৌরপদতরঙ্গিণী]।

এই পদটী হইতে বুঝা যায় যে তখনও পর্য্যন্ত অন্ততঃ "ভাষায়" অর্থাৎ ব্রজবুলীতে ও বাঙ্গালায় গৌর-চরিত্র সম্বন্ধে কোন পদ বা গ্রন্থ রচনা হয় নাই। মুরারি গুপ্তের কড়চা হয়ত

তখন লেখা হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে মুরারি গুপ্তের কড়চা সংস্কৃতে লেখা। মহাপ্রভুর পারিষদ বাসুদেব ঘোষ মহাশয় মহাপ্রভুর চরিত লইয়া বিস্তৃত ভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন।[১] এ বিষয়ে যে ঘোষ-ঠাকুর সরকার-ঠাকুরকে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌরচরিত সম্বন্ধে সরকার-ঠাকুর যে কতগুলি পদ লিখিয়াছিলেন তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই, কারণ ঘনশ্যাম বা নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদের সহিত সরকার-ঠাকুরের পদ মিশিয়া গিয়াছে। পর্য্যালোচনা করিলে যে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি বাছিয়া লওয়া যায় না, এমন নহে। তবে এইরূপ নির্ব্বাচন-প্রথা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। 'পদকল্পতরু'-তে নরহরির ভণিতায় ছত্রিশটী পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুড়ি পঁচিশটী পদ নরহরি-সরকারের বলিয়াই বোধ হয়।

নরহরি উপরে উদ্ধৃত পদটীতে "গৌর-গদাধর লীলা"র উল্লেখ করিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিত রাধার অবতার বলিয়া তৎকালে বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হইতেন। কৃষ্ণ-রাধার প্রতীক বা অবতার হিসাবে গৌর-গদাধর পূজার প্রবর্ত্তক সরকার-ঠাকুরই ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। স্বরূপ-দামোদর বা শ্রীরূপ প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় কিন্তু এই মত পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্যই রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, তিনি "রাধা-ভাবদ্যুতি সুবলিত" "কৃষ্ণ-স্বরূপ।" কবিকর্ণপূর-রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় [১৪৯] স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

> পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা।
> সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ॥

শ্রীচৈতন্যের মূলস্কন্ধশাখা বর্ণনপ্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

> বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
> তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম কেহ নাঞি॥

অদ্বৈত প্রভুর মতেও শ্রীচৈতন্য রাধা-কৃষ্ণের যুগল অবতার।

> হাসি সীতানাথ কহে জানিয়া না জান।
> স্বয়ং কৃষ্ণ নদীয়ায় হৈলা অবতীর্ণ॥
> রাধা অঙ্গ-কান্ত্যে ঢাকা সর্ব্ব কলেবর।
> যৈছে বস্ত্র আবরণে দৃশ্য রূপান্তর॥ [অদ্বৈতপ্রকাশ, বিংশ অধ্যায়]।

নরহরি-সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার মধুমতী সখীর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। দক্ষিণে নরহরি, বামে গদাধর ও মধ্যে মহাপ্রভু এইরূপে নরহরির শিষ্যগণ পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়।[১]

যাহা হউক, "গৌর-গদাধর" লীলার পদাবলীর স্রষ্টাও নরহরি সরকার-ঠাকুর। ইনি অনেক গুলি পদে গৌরাঙ্গকে নবীন নাগর বলিয়া—কৃষ্ণ-লীলার সহিত ঐক্যের হিসাবে—বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিবার আছে। বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে নরহরি সরকার-ঠাকুর বা শ্রীখণ্ডের অন্য কোন পরিকরের নাম নাই। ইহাতে অনেকে মনে করেন যে বৃন্দাবন দাসের সহিত নরহরির মনান্তর ছিল, এবং এই কারণেই নরহরি তাঁহার শিষ্য লোচন-দাসকে দিয়া 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' লিখাইয়াছিলেন। এই কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ লোচন দাস স্বীয় 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-এ বৃন্দাবন দাসকে বন্দনা করিয়াছেন।[২] আর বৃন্দাবন দাস যখন সকল ভক্তের নাম দেন নাই তখন দুই একটী নামের অসদ্ভাব হইতে কিছু প্রমাণিত হয় না। বৃন্দাবন দাস একস্থানে বলিয়াছেন [শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ]—

> অতএব যত মহামহিম সকলে।
> গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

---

১ বাসুদেব ঘোষ মহাশয়ের অধিকাংশ পদ গৌরলীলার সহিত কৃষ্ণলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্য ব্রজলীলার অনুকরণে লেখা, সুতরাং তাঁহার পদ হইতে মহাপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বাসুদেব ঘোষের গৌর পদের সংখ্যা অশীতি মাত্র। এখন কিন্তু শতাধিক পদ বাসুদেব ঘোষের নামে চলিতেছে। 'সংকীর্ত্তনামৃত'-সঙ্কলয়িতা দীনবন্ধু দাস বলিয়াছেন।

> বাসুঘোষ ঠাকুরের বিচিত্র বর্ণন। শুনিতেই যুড়ায় শ্রোতার কর্ণ মন॥
> গৌরাঙ্গের জন্ম আদি যত যত লীলা। বিস্তারি অশীতি পদে সকল বর্ণিলা॥

১ রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর বা কবিশেখর রায় তাঁহার একটী পদে লিখিয়াছেন।

> পহুঁর দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সখী
> মধুমতী রূপে নরহরি। [গৌরপদতরঙ্গিণী]।

২ শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে॥ [শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড]

এখানে হয়ত সরকার-ঠাকুরের উপর কিছু কটাক্ষ আছে। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেই যে নরহরি পদ লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে বাসুদেব ঘোষ তখনও গৌরলীলার উপর "নদীয়া নাগরী" বিষয়ক কোন পদ লিখেন নাই।

রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর একটী পদে লিখিয়াছেন যে সরকার-ঠাকুর "গৌরাঙ্গজন্মের আগে বিবিধ রাগিণী-রাগে ব্রজরস করিলেন গান" [গৌরপদতরঙ্গিণী]। সরকার-ঠাকুর শ্রীচৈতন্য হইতে সাত আট বৎসরের বেশী বড় ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে ব্রজলীলাত্মক পদরচনা সম্ভবপর নহে। ইহার অর্থ এই যে নরহরি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ-লীলাত্মক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

সরকার ঠাকুরের গৌরলীলাত্মক ও ব্রজলীলাত্মক উভয়-বিধ পদই নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' 'শ্রীনিবাস-চরিত্র', 'নরোত্তম-বিলাস', 'গীতচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'-র পূর্ব্বেকার কোন পদসংগ্রহে ইঁহার রচিত কোন পদ সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি', 'সংকীর্ত্তনামৃত', 'পদামৃত-সমুদ্র', 'কীর্ত্তনানন্দ' প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থে "নরহরি" ভণিতায় যে সকল পদ সংগৃহীত আছে, সরকার-ঠাকুর সেগুলির রচয়িতা বুঝিতে হইবে। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি অর্ব্বাচীনতর পদসংগ্রহ গ্রন্থধৃত "নরহরি"-ভণিতার পদগুলি হইতে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি বাছিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। সরকার-ঠাকুরের ভাষা প্রাঞ্জল, ছন্দ সরল। অপরপক্ষে নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভাষা দুরূহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এবং ছন্দ কুটিল। ভাবের দিক দিয়া দেখিলেও সরকার-ঠাকুরের পদগুলি সরল ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট।

আমার মনে হয় সরকার-ঠাকুর বৃন্দাবনলীলা বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত খণ্ড খণ্ড ভাবে নহে। "কৃষ্ণ-পদামৃতসিন্ধু" নামক একটী আধুনিক পদসংগ্রহ গ্রন্থে কতকগুলি 'নরহরি'-ভণিতার পদ পাইয়াছি। ভাষা ভাব ও ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিলে সেগুলি সরকার-ঠাকুরের রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই পদ-গুলি হইতে নরহরি সরকার-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গোড়ার কথা জানিতে পারা যায়। সে কাহিনী এই। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ও রাধার সংঘটন ইচ্ছা করিয়া প্রথমে যাবট গ্রামে বৃষভানুর গৃহে গেলেন। তথায় গিয়া দেখেন রাধা খেলা করিতেছেন। রাধাকে ক্রোড়ে করিয়া পৌর্ণমাসী তাহাকে বলিলেন, "কৃষ্ণ নামে এক রসিক নাগর গোকুল নগরে আছে।" আমার কথায় শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সহিত "করহ পিরীতি খানি।" ধর্ম্ম কর্ম্ম বড়ই দুরূহ, তাহাকে অনেক যত্ন করিতে হয়; গোকুল-রাজকে পাইবার সহজ পন্থা তাঁহার প্রীতিসাধন। ইহা বলিয়া তিনি রাধার কর্ণে "কৃষ্ণ" এই দুই অক্ষর প্রেমের অঙ্কুর স্বরূপ রোপণ করিলেন। তথা হইতে চলিয়া আসিয়া পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ সখাগণ লইয়া যেখানে খেলিতেছেন সেখানে দর্শন দিলেন। সখাগণ সকলে তাঁহার পদধূলি লইলে পর তিনি কৃষ্ণকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া তাঁহার কর্ণে রাধা নাম অর্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি বনে বনে ফিরিতেছ। এখানে গন্ধর্ব্বকিন্নরাদি অপদেবতা বিস্তর আছে। সেই জন্য তোমার মা আমাকে দিয়া তোমাকে এই মন্ত্রটী বলিয়া পাঠাইয়াছেন। তুমি এই মন্ত্রটী জপ কর।

ইহার ঠিক পরের কবিতাগুলি পাওয়া যায় নাই। না পাওয়া গেলেও গল্পের ধারা বুঝিবার কোন ব্যাঘাত হয় না। এই প্রকারে, পৌর্ণমাসীর দৌত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিকদিগের সৃষ্টি, ইহা অনেকে মনে করিয়া থাকেন। তাহা সত্য নহে। মথুরা দাসের[১] 'বৃষভানুজা' নাটিকায় দেখিতে পাই যে রাধা কৃষ্ণের মিলন এই প্রকারেই সংঘটিত হইয়াছিল। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেও[২] দেখি, মদনিকা (=পৌর্ণমাসী) রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন করাইতেছেন।

নরহরি সরকারের কতকগুলি ব্রজলীলাত্মক ও "পিরীতি"-ঘটিত পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল। আমার মনে হয় "পিরীতি"-ঘটিত পদের সৃষ্টিকর্ত্তা নরহরি। সম্ভবত ইনিই "পিরীতি" এই শব্দটী "প্রেম" এই অর্থে বাঙ্গালা সাহিত্যে চালাইয়া দেন।

---

১ মথুরাদাসের গ্রন্থে কিছু তারিখ দেওয়া নাই। তবে তিনি পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়াই বোধ হয়।

২ এই নাটক মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের মিলনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং নাটকটী খ্রীষ্টীয় ১৫০৪ হইতে ১৫১০ সালের মধ্যে একসময়ে রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ

—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

'বাঙ্গালা টাইপ ও কেস' নাম দিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে লিখিতেছি। সেই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য বাঙ্গালা টাইপ ও কেস যে আমূল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক তাহাই প্রতিপন্ন করা। এই সকল প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া আমাকে বাঙ্গালা বাণান এবং কিছু কিছু শব্দতত্ত্বও আলোচনা করিতে হইতেছে। আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমগ্র ভাষার যাবতীয় শব্দের প্রয়োগ ও উহাদের বাণান লক্ষ্য করিয়া টাইপের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রত্যেক টাইপের প্রয়োগ-বহুলতা নির্দ্ধারিত হইয়া কেসের মধ্যে প্রত্যেক টাইপের সংস্থান নিরূপিত হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রথমে দেখা হইয়াছে কোন্ টাইপটি ভাষার মধ্যে কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার পর ঠিক হইয়াছে কেসের মধ্যে সেই বিশেষ টাইপটির খোপ বা ঘর কিরূপ আকারের হইবে, শেষে ঠিক হইয়াছে সেই বিশেষ টাইপটির জন্য বিশেষ খোপটি কেসের মধ্যে কোন্ স্থানে তৈয়ার করিতে হইবে, অর্থাৎ কম্পোজিটারের ডান হাতের ঠিক সামনে খুব কাছে, না ডাইনে-বাঁয়ে, এদিকে-ওদিকে, অল্প দূরে বা বেশি দূরে খোপ্‌টিকে বসাইলেও চলিবে।

১৩৩৯ সালের পৌষ-সংখ্যার প্রবাসীতে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, যেমন ইংরাজি টাইপের বাঁধাধরা পাকা ফর্দ্দ আছে, অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাইপ কিনিবার দরকার হইলে কোন্ কোন্ টাইপ কি কি পরিমাণে লাগে তাহার পরিমাণ-সূচক নির্দ্দিষ্ট তালিকা আছে, আমাদের বাঙ্গালা টাইপের জন্য সেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট তালিকা আজও প্রস্তুত হয় নাই। আজও আমরা ঠিক জানি না যে, কোন্ টাইপটি বা অক্ষরটি কি পরিমাণে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন টাইপ-ঢালাইকর তাঁহাদের মন-গড়া বিভিন্ন ফর্দ্দ-অনুসারে টাইপ সরবরাহ করিয়া থাকেন। আর এই প্রধান বিষয়টি আজও স্থির-নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিয়াই কেসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ঘরগুলির আকার বা আয়তনও ঠিক করা হয় নাই। তা ছাড়া কোন্ ঘরটিকে কেসের কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহাও এখন পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটা যা-তা করিয়া গোঁজামিল দিয়া এই ষাট-সত্তর বৎসর ধরিয়া সমানে চলিয়া আসিতেছে।

কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা টাইপ ও কেসের কোনরূপ সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাষার যাবতীয় শব্দ-সম্পদ্ তথা বর্ণ ও অক্ষর-সম্পদ্ সুমার বা গণনা করিয়া তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে অযুক্ত ও যুক্ত—প্রত্যেক অক্ষরের প্রয়োগ একটি একটি করিয়া গণিয়া ঠিক করিতে হইবে; তাহার পর বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত প্রত্যেক টাইপটির সমষ্টির গড়-পড়তা হিসাব করিতে হইবে, তবে আমরা নিখুঁতভাবে বলিতে পারিব যে, কোন্ টাইপটি ঠিক কি পরিমাণে বা কিরূপ সংখ্যায় ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত হয়। তখন প্রত্যেক টাইপটির পরিমাণ-জ্ঞাপক আপেক্ষিক মান নির্দ্দিষ্ট হইবে, যেমন ইংরাজি, ফরাসি, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষার জন্য নির্দ্দিষ্ট তালিকা আজ সত্তর-আশী বৎসর ধরিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু টাইপের এই মান-তালিকা প্রস্তুত করা বিষয়ে প্রধান অন্তরায় অনেকগুলি। প্রথম অন্তরায় বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দের বাণান এখনও ঠিক হয় নাই,—খাঁটি বাঙ্গালা এবং বিদেশী শব্দের ত নয়ই, এমন কি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে, সেগুলিরও বাণান ঠিক নাই। যাঁহার প্রাণ যখন যাহা চায় বা যাঁহার কলমের মুখ দিয়া যখন যাহা বাহির হয়, তাহাই তখনকার মত তাঁহার ব্যবহৃত সেই বিশেষ শব্দের বাণান। 'তখনকার মত' কেন লিখিলাম, তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। বড় বড় পণ্ডিতের লেখাতেও দেখিতেছি, একই শব্দ একই পৃষ্ঠার মধ্যে দুই-তিন রকমে বাণান করা হইতেছে। পূর্ব্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, একই শব্দের এই যে সব বাণান-বৈষম্য—এগুলি ছাপাখানার ভূতেদের কীর্ত্তি। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, যাহা কিছু ভ্রমপ্রমাদ ছাপার অক্ষরে বাহির হয়, সেগুলি সবই মুদ্রাকর-প্রমাদ। মুদ্রিত পুস্তক-মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে লেখকগণ অম্লানমুখে—শুধু অম্লান নহে, হাসিমুখে—সেই সব দোষ ভূতেদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেরা সাধু তথা প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ সাজিতেন। কিন্তু যে দিন হইতে স্বয়ং ছাপাখানার ভূত বনিয়াছি, সেই দিন হইতে গ্রন্থকারদের সাধু-সাজা হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছি। যাক, দেবতাদের লীলাখেলা ভূতের মুখে যেন রাম-নাম শুনাইতেছে। তাহার উপর আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে, বড় বড় সাহিত্যিকগণ পর্য্যন্ত একই শব্দের বাণান মাসে মাসে বা সপ্তাহে সপ্তাহে পরিবর্ত্তন করিতেছেন। নামোল্লেখ করিয়া মহাজনগণের শাপমন্নি শিরে লইবার বাসনা নাই।

দ্বিতীয় অন্তরায়, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নাই, ভাল অভিধান নাই।—কিরূপে শব্দের রূপ ও বাণান ঠিক করিব? তথাকথিত ও উচ্চপ্রশংসিত যে দুই-একখানি অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিতে এক বিচিত্র পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।— সকল শব্দের সাধু-অসাধু, সু-কু, সকল প্রকার

রূপই প্রদত্ত হইয়াছে এবং সবাইকে এক পঙ্‌ক্তিতে—সমশ্রেণীতে বসানো হইয়াছে,—উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দলের বা মতের লোক অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি না বিরূপ হন। কিন্তু এই পন্থা আচরিত হওয়ায় অভিধান-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কেন-না অভিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য ভাষায় ব্যবহৃত বিশুদ্ধ শব্দসমূহের একত্র সমাবেশ করা এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থাদি প্রকাশ করা।

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাণান ঠিক না হইলে টাইপ ও কেসের সংস্কারে হাত দেওয়া আর না-দেওয়া দুই-ই সমান। এই কারণেই বাঙ্গালা ভাষার বাণান ঠিক করিয়া দিবার জন্য বিশ্বকবি-প্রমুখ মহারথগণের দ্বারস্থ হইয়া প্রার্থনা জানাইতেছি এবং নিজে আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনুপাতে এই সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করিতেছি—পাণ্ডিত্য বা মূর্খতা প্রকাশ করিবার জন্য নয়, নিজে যেখানে যেখানে ঠেকিয়াছি, গোলে পড়িয়াছি—সেই সকল স্থল বিদ্বজ্জনসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে গোলযোগ মিটাইবার উদ্দেশ্যে।

বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। ১৩৩৯ সালের চৈত্র-সংখ্যার প্রবাসীতে এই সকল শব্দ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই শব্দগুলিকে লইয়া আমাদের ভাষায় বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া চলিতে বলেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে বলিতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ দখল না থাকিলে এই সকল শব্দের সহিত সন্ধি ও সমাস করিতে গিয়া, ইহাদের লিঙ্গনিরূপণ করিতে গিয়া,—এমন কি মাত্র শব্দটিকে ভাষায় প্রয়োগ করিতে গিয়াও পদে পদে হোঁচট খাইতে হয়—ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। বড়বড় পাকাপাকা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সব শব্দ-সংক্রান্ত প্রয়োগে বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন,—সংস্কৃত-না-জানা লোকের ত কথাই নাই। সেই জন্য এই শব্দগুলিকে লইয়া রীতিমত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি সংস্কৃত কিছুই জানি না, তবু কেন যে এই দুরূহ ও জটিল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে—বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাইতেছি, তাহার একমাত্র কারণ এই বিষয়ে বিদ্বন্মণ্ডলীর দৃষ্টি সশ্রদ্ধভাবে আকর্ষণ করা। যদি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এই সকল শব্দের বিশুদ্ধ প্রয়োগ-পদ্ধতি বা সূত্র-নিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কোন্ পথে চলা উচিত, কিরূপ বাণান হওয়া ঠিক তাহার হদিশ বাত্‌লাইয়া দেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার মহোপকার সাধিত হইবে, আর সেই সঙ্গে বাঙ্গালা টাইপ ও কেস-সংস্কার-বিষয়ের ঘনান্ধকার-মধ্যে আশার একটু ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিবে।

'বিদ্বন্মণ্ডলী' এবং 'মহোপকার'—এই দুইটি শব্দ এই মাত্র লিখিতে গিয়া মনের ভিতরে আপনা আপনি হাসির একটু চিড়িক মারিল। ঐ দুইটি শব্দও আমাদের আলোচ্য সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তর্গত। নিম্নে লিখিত নব-গুরু-শিষ্য-সংবাদ পাঠ করুন। সংবাদটি অধুনালুপ্ত 'গুরুট্রেনিং' স্কুলের মোড়ল-গুরুর দৈনিক পাঠনা-বিষয়ক নোটবুক হইতে উদ্ধৃত।

"মোড়ল-গুরু—'বিদ্বান্' বাণান কর দেখি।

ছাত্র-গুরু—বয়ে হ্রস্ব ইকার দয়ে যফলা আকার আর দন্ত্য ন।

মো—না, ভুল হইল। দয়ে যফলা আকার নয়,—দয়ে বফলা আকার।

ছা—কেন? 'বিদ্' ধাতু হইতে ত 'বিদ্যা' এবং 'বিদ্বান্' দুইটি শব্দই হইয়াছে, তবে একটায় যফলা আর অন্যটায় বফলা হইবে কেন?

মো—বিদ্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় করিলে হয় বিদ্য, তারপর স্ত্রীলিঙ্গ আপ্ প্রত্যয় করিয়া হয় 'বিদ্যা'। আর বিদ্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিলে হয় 'বিদৎ'।

ছা—'বিদৎ'এ কৈ বফলা ত খুঁজিয়া পাইতেছি না?

মো—সবুর কর। সংস্কৃত ব্যাকরণ অত সোজা নয়। সব কথা খুঁটাইয়া লেখা আছে, বাপু! তবে অবহিত হইয়া শিক্ষা করা আবশ্যক।

ছা—আমরা ত সংস্কৃত পড়িতেছি না—আমরা আপনার কাছে বাঙ্গালা শিখিতেছি। তবে আপনি সংস্কৃত ব্যাকরণের উল্লেখ করিলেন কেন?

মো—বাঙ্গালা ভাষা কি আর সংস্কৃতের বাহিরে? সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে বাঙ্গালার একটি শব্দও বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যায় না। হাঁ, কি বলিতেছিলাম, ভাল? শতৃ প্রত্যয় করিয়া 'বিদৎ' হইল। তারপর অদাদিগণীয় বিদ্ ধাতুর শতৃ-স্থানে বিকল্পে 'ক্বসু' প্রত্যয় হয় এবং ক্বসু প্রত্যয়ের 'ক্' এবং 'উ' ইৎ, 'বস্' থাকে। এই সকল সূত্রানুসারে 'বিদৎ'-স্থানে 'বিদ্বস্' হইল। দেখিলে বাবা, কেমন করিয়া বফলা আসিয়া জুটিল।

ছা—উহা ত হইল 'বিদ্বস্' শব্দের বফলার কথা; বিদ্বানের বফলা কোথা থেকে আসিল?

মো—সেই কথাই বলিতেছি। সংস্কৃত 'বিদ্বস্' শব্দের অর্থ—জ্ঞানী, পণ্ডিত—যিনি অনেক-কিছু জানেন। এই 'বস্'-ভাগান্ত বিদ্বস্ শব্দের প্রথমার একবচনে হয়—'বিদ্বান্'। এই 'বিদ্বান্' পদটি বাঙ্গালায় মূলশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ ইহাকে মূলশব্দ ধরিয়া লইয়া ইহার অন্তে কারক-বিভক্তিগুলি যোগ করিয়া প্রয়োগ করা হয়,—যেমন, 'ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব বিদ্বানের আলোচ্য—মূর্খের নহে।'

ছা—'বিদ্বান্' শব্দ বাঙ্গালায় হসন্ত-চিহ্ন দিয়া লিখিতে হইবে কি,—না, না দিলেও চলিবে ?

মো—হসন্ত-চিহ্ন দেওয়াই উচিত, কিন্তু বাঙ্গালার মহামহা সাহিত্যিকগণও সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করেন না। ফলে তাঁহারা নিজেরা এবং তাঁহাদের দেখাদেখি আপামরসাধারণ সকলেই শব্দগুলিকে অকারান্ত ভ্রম করিয়া সন্ধি ও সমাস করিতে গিয়া ভুল করিয়া বসেন এবং লিঙ্গ-নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বিকট বিভ্রাট ঘটান। এইরূপ অশুদ্ধ 'সমস্ত' শব্দের ভারে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গভাষা-জননীকে অহো-রাত্র মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে হইতেছে। আচ্ছা, 'বিদ্বানের আশ্রয়' সমাস করিলে কি হয় ?

ছা—বিদ্বান্ + আশ্রয় = বিদ্বানাশ্রয় হইবে।

মো—না, ভুল হইল। আবার চেষ্টা কর।

ছা—স্মরণ হইয়াছে—'নস্ত লোপঃ পূর্ব্বস্ত'—এই সূত্রানু-সারে 'ন্'-এর লোপ হইয়া 'বিদ্বাশ্রয়' হইবে।

মো—বড়ই দুঃখের বিষয় তোমার মহামূর্খত্ব প্রকাশ পাইল। 'বিদ্বান্' সংস্কৃতের মূল শব্দ নয়। উহা বাঙ্গালায় মূলশব্দরূপে ব্যবহৃত হয় বটে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কৃত মূলশব্দ যে 'বিদ্বস্' তাহারই প্রথমার একবচনের পদ। শব্দ ও পদে পার্থক্য কি তাহাই জ্ঞান নাই, সমাস শিখিবে কিরূপে ?

ছা—আপনি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, সমাসের মধ্যস্থিত যাবতীয় পদের বিভক্তির লোপ হয়, অর্থাৎ মূল শব্দের সহিত সমাসে মূল শব্দ যুক্ত হয়,—এই ত ? বেশ, তাহা হইলে মূল সংস্কৃত শব্দ বিদ্বস্ + আশ্রয় = 'বিদ্বসাশ্রয়' হইল। কি বলেন, এবার ঠিক হইয়াছে ত ?

মো—হইয়াছে তোমার মস্তক! না, পুনরায় হস্তি-মূর্খত্ব প্রকাশ করিয়াছ। পাণিনির একটি বিশেষ সূত্র আছে—বসুস্রংসুধ্বংস্বনডুহাং দঃ। ৮।২।৭২। ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কোন ব্যাকরণে এই সূত্রের উল্লেখ নাই। ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সমাস করিতে হইলে পূর্ব্বপদস্থ বস্-ভাগান্ত প্রভৃতি শব্দের অন্তে দ্ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ ছেলেখেলা নহে, বাপু! এখন বল, 'বিদ্বানের আশ্রয়' সমাস করিলে কি হয় ?

ছা—বিদ্বস্-স্থানে বিদ্বদ্ হইল; বিদ্বদ্ + আশ্রয় = 'বিদ্বদাশ্রয়'।

মো—এতক্ষণে ঠিক হইয়াছে। মনে রাখিও, বিদ্বজ্জন, বিদ্বদ্গণ, বিদ্বন্মণ্ডলী ইত্যাদি।

ছা—আমরা কি পাণিনি-ব্যাকরণের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত শিখিয়া তবে বাঙ্গালা লিখিতে শিখিব ?

মো—নান্যঃ পন্থাঃ, নান্যঃ পন্থাঃ—অন্য কোন পন্থা নাই, উপায় নাই, গতি নাই।"

এইখানে এই একাঙ্ক নাটিকার যবনিকা-পাত হইয়াছে। 'মহোপকার' লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। অনায়াসে দেখাইতে পারা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ততঃ আট-দশটি সূত্র ভাল করিয়া জানা না থাকিলে এই শব্দটিকে বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যায় না এবং ইহার মূলশব্দ 'মহৎ'কেও ব্যাকরণ বাঁচাইয়া ব্যবহার করাও যায় না। সম্প্রতি একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি 'মহৎ কীর্ত্তি' লিখিয়াছিলেন দেখিয়া সভয়ে ও সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করিয়াছিলাম, " 'মহৎ কীর্ত্তি'ই কি চলিবে ?" তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই চলবে। বাংলায় লিঙ্গভেদ নেই।" এই উক্তির উপর টিপ্পনী করিবার কোন অধিকার বা ধৃষ্টতা আমার নাই।

সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলি লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধারা-বাহিক আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে,—বাঙ্গালা ভাষায় বহুল প্রচলিত ব্যঞ্জনান্ত শব্দগুলির একটি বিস্তৃত তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছি। এই সকল শব্দ লইয়াই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বিস্তর গোলযোগ বহুকাল হইতে সমানে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহাদের বাণান ও প্রয়োগ-সম্বন্ধে কোনরূপ স্থিরনিশ্চয়তা আজও নিরূপিত হয় নাই। বড় বড় দিগ্গজ সাহিত্য-বিশারদও এই সব শব্দের ব্যবহারে মহাভ্রম করিয়া আসিতেছেন। একটি মাত্র উদাহরণ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কেহ বা বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মের 'সনাতনী পন্থা'র সন্ধানে আছেন (বিস্পষ্ট-বিসর্গ পন্থার 'আ'কার দেখিয়া, অবিদ্যার ঘোরে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞান ঘটিয়াছে), 'আকারান্তা মেয়েলিঙ্গাঃ' ধরিয়া লইয়া 'আত্মা দেবী'র স্তুতি করিতেছেন ;..."

একজন আমার মহাগুরু, আর একজন আমার অধ্যাপক—শিক্ষাগুরু। তাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহারা উভয়ে পরলোক হইতে আমার এই ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন।

সৌন্দর্য্যলহরী

—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সৌন্দর্য্যলহরী শতশ্লোকাত্মক একটী প্রসিদ্ধ শক্তিস্তব[১]। এই দেবীস্তুতির অপর নাম 'আনন্দলহরী[২]'। তন্ত্রোক্ত 'সুন্দরী' (ত্রিপুরাসুন্দরী) বা শ্রীবিদ্যার লোকোত্তর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করাই স্তোত্রটীর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। ভাষার সারল্য, ভক্তির প্রবলতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্যলহরী সাধকগণের পরম আদরের বস্তু; ইহার প্রতি শ্লোকে ভক্ত-হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছ্বাস এবং পরমার্থচিন্তার নির্ম্মল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিত্বের দিক্ দিয়াও যে স্তোত্রটীর বিশেষ মূল্য আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় শক্তিপূজা প্রচলিত আছে। শাক্তগণ অখণ্ড ব্রহ্মবুদ্ধিতেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন। শাক্তের পরা শক্তি এবং উপনিষদের পর ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে শ্রীবিদ্যাকে বলা হইয়াছে—'পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী', 'জগচ্চৈতন্যরূপিণী' এবং 'জগদাধাররূপিণী'। শ্রীবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন[৩]। শঙ্কর ও ভাস্কর রায়প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীবিদ্যার বেদমূলকত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যলহরী বিরচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই আমরা দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত, সপ্তশতী, ললিতা-সহস্রনাম[৪]প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তোত্রে পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়ার মাহাত্ম্য-বর্ণনা দেখিতে পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রকার স্তোত্রের সংখ্যা কম নহে।

আমাদের দেশে বহু দিন হইতেই শ্রীবিদ্যার উপাসনা সুপ্রচারিত। তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীবিদ্যার অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—অম্বিকা, শারদা, অন্নদা, শ্রী, ষোড়শী, নিত্যা, ত্রিপুরা, মহালক্ষ্মী, ললিতা ইত্যাদি। শ্রীবিদ্যার তত্ত্ব ও অর্চ্চনাবিধিসম্বন্ধে অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীতারাদি বিদ্যার তুলনায় শ্রীবিদ্যার উপাসকের সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশ—মহারাষ্ট্র—দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি বহু দেশেই ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যার উপাসক এখনও বর্ত্তমান আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মনু, কুবের, কন্দর্প, পরশুরাম, অগস্ত্য, সুমেধা ও ভরদ্বাজপ্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ শ্রীবিদ্যার উপাসক বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ[৫]। ত্রিপুরোপনিষৎ, শক্তিসূত্র, লক্ষ্মীতন্ত্র, পরশুরামকল্পসূত্র, ত্রিপুরারহস্য, শ্রীক্রম, ললিতাসহস্রনাম, কামকলাবিলাস, সৌভাগ্যভাস্কর, বরিবস্যা-রহস্য, সেতুবন্ধ এবং শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিপ্রভৃতি বহু গ্রন্থে শ্রীবিদ্যার তত্ত্ব ও পূজাক্রমাদি বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্মণাচার্য্যের 'শারদাতিলক' এবং শঙ্কর-রচিত 'প্রপঞ্চসার' উভয়ই শ্রীবিদ্যা-বিষয়ক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থমধ্যে পরিগণিত। শ্রীবিদ্যার যে সাধনা-প্রণালী সৌন্দর্য্যলহরীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ কৌলমার্গানুমোদিত না হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রে যাহা বেদোক্ত সাধনার অবিরোধী 'সময়মার্গ' বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহারই সিদ্ধান্তানুসারে লিখিত। শ্রীবিদ্যার যন্ত্রের নাম শ্রীচক্র বা শ্রীযন্ত্র।

সৌন্দর্য্যলহরীর রচয়িতা কে তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিভিন্ন মত ও নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

---

১ এই স্তোত্রটী বিদ্বৎসমাজে ও সাধকসংপ্রদায়ের মধ্যে কত দূর সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা ডিণ্ডিমা, সুধাবিদ্যোতিনী, লক্ষ্মীধরা ও সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী নামক ইহার চারিটী টীকা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। একটী স্তোত্রের উপর চারিটী টীকা কম গৌরবের কথা নহে।

২ সৌন্দর্য্যলহরী এমন সুন্দর ভাবে গ্রথিত যে, ইহা পাঠ করিলে বস্তুতই সাধকের হৃদয়ে আনন্দের বিপুল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হয়। এই জন্যই বোধ হয় স্তবটীর নামান্তর হইয়াছে 'আনন্দলহরী'। স্তোত্রকার নিজেই বলিয়াছেন :—

'ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্'। ৮ম শ্লোক।

৩ 'সা এব পঞ্চমী শক্তিঃ পরংব্রহ্মস্বরূপিণী'।—গন্ধর্ব্বতন্ত্র (২য় পটল)।

'অতিগুহ্যতমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যৈব কেবলা'।—গন্ধর্ব্বতন্ত্র (২য় পটল)

৪ কথিত আছে—শ্রীবিদ্যার উপাসক মহামুনি অগস্ত্য হয়গ্রীবের নিকট হইতে ললিতা বা ত্রিপুরাসুন্দরীর সহস্রনামাত্মক স্তব শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৫ মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ লোপামুদ্রা চ মন্মথঃ।
অগস্তিরগ্নিঃ সূর্য্যশ্চ ইন্দ্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা॥
ক্রোধভট্টারকো দেব্যা দ্বাদশামী উপাসকাঃ॥

অনেকে মনে করেন—আচার্য্য শঙ্করও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। কেহ কেহ ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত শ্রীবিদ্যোপাসকের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্তোত্রটী বেদান্তমার্গপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদের রচনা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সৌন্দর্য্যলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধর এবং ভাস্কররাজ উভয়েই শঙ্করাচার্য্যকে স্তোত্রকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শারদাতিলকের টীকাকার রাঘবভট্টও তন্ত্রশাস্ত্রকার [প্রপঞ্চসার-রচয়িতা] বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যলহরীর ডিণ্ডিমাখ্য টীকার প্রদত্ত বিবরণে কোন নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্ত নাই। এই টীকায় তিনটী বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখা যায়[১]। কেহ বলেন,—এই স্তোত্রটী স্বয়ং শিবকর্ত্তৃক পরিভাষিত; কেহ মনে করেন,—ইহা শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত; আবার কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, আদ্যাশক্তি শ্রীললিতা-দেবীর দন্তপঙ্‌ক্তি হইতেই এই স্তবের উদ্ভব হইয়াছিল। সুধাবিদ্যোতিনী টীকার বিবরণ অন্য প্রকার। এখানে কথিত হইয়াছে যে, দ্রমিড় নামক নরপতির পুত্র প্রবরসেন এই স্তবরাজ রচনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী-টীকাকার স্তোত্রকার-নিরূপণ প্রসঙ্গে যে আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, পূর্ব্বজন্মাহিত পুণ্যবলে জগন্মাতার স্তন্যপান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া বালক শঙ্কর এই অপূর্ব্ব স্তুতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ধ্যান করিলে স্বর্গাপবর্গ লাভ হয়, সেই সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী জগদম্বার স্তন্যামৃত পান করিলে যে মানুষের সমস্ত বিদ্যার স্ফূর্ত্তি এবং কবিত্বামৃতনদীর প্রসার হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

স্তোত্রটীর প্রাঞ্জল ভাষা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, ইহা নিশ্চয়ই তত্ত্বদর্শী আচার্য্যপাদের রচনা। শঙ্কর ভিন্ন অন্য কেহ এমন সুন্দর করিয়া ভুক্তি-মুক্তি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস হয় না। শঙ্করাচার্য্য যেমন এক দিকে ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন, তেমন অন্য দিকে আগম-শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। যতিগণের নিকট শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার বলিয়াই পরিচিত। এমন নির্ম্মল জ্ঞান ও প্রদীপ্ত প্রতিভা কি সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব! অদ্বৈতভূমির চরম সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই শঙ্কর শক্তিবাদের এই প্রকার অপূর্ব্ব ও মধুর ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন। তৎপ্রণীত প্রপঞ্চসার (তন্ত্রগ্রন্থ), অন্নপূর্ণাস্তব, গঙ্গাস্তবপ্রভৃতি পড়িয়া অনেকেই বলিবেন যে, শঙ্কর কেবল আগমশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন না, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-বিস্ফারিতনেত্রে শক্তিতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি আগমশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য যে বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের রূপান্তরমাত্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রপঞ্চসার তন্ত্র শঙ্কর-রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। প্রপঞ্চসার-বিবরণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্বয়ং শিব তদীয় অবতার শঙ্করের দ্বারা এই অমূল্য তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শঙ্করের শারীরকভাষ্য দার্শনিক চিন্তার কৌস্তুভমণি এবং আচার্য্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রধানতঃ মহাদার্শনিক বলিয়াই সুপরিচিত। কিন্তু এত বড় এক জন জ্ঞানী ও দার্শনিক যে পরম ভক্ত ও সাধক ছিলেন—একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়াছিলেন—তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। শঙ্করের চিন্তাপ্রবাহ ও অসাধারণ বিচারনৈপুণ্য শুধু দার্শনিকতার গণ্ডীর মধ্যেই সংবদ্ধ ছিলনা। দর্শনের বাদ-বিতণ্ডা ও খণ্ডন-মণ্ডন ছাড়িয়া সাধনার পবিত্রমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি যে জীবনে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা সত্য যে, তৎকালীন যতি বা উপাসক-সংপ্রদায়ের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য এক জন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব যে সৌন্দর্য্য-লহরীতে স্তোত্রকার কোন্ ভাবে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছেন। এখানে তিনি জ্ঞানগুরু বা বিচারমল্লের বেশ ধারণ না করিয়া মাতৃভাববিগলিতচিত্ত এক জন পরম ভক্তের বা তন্ত্রোক্ত মহাসাধকের রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী বলিয়া যদি কেহ শঙ্করকে শক্ত্যুপাসক বলিতে কুণ্ঠিত হন, তবে আমরা বড়ই দুঃখিত হইব। ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার ভাষ্যে শঙ্কর যে অদ্বৈতজ্ঞান বা ব্রহ্মভাবকে সাধনার পরা কাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সৌন্দর্য্য-লহরীর শক্তিবাদের কোনও বিরোধ নাই, বরং প্রতিপদে বিশেষ সামঞ্জস্যই পরিলক্ষিত হয়। শঙ্কর শক্তিরূপে 'হরিহরবিরিঞ্চিবন্দিত' যে পরম বা অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের স্তব

---

১ স্তোত্রমেতদ্যদন্যোকে শিবেন পরিভাষিতম্।
তস্যৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন।
কেচিদ্যদন্ত্যাদ্যশক্তের্ললিতায়া মহৌজসঃ।
দশনেভ্যঃ সমুদ্ভূতমিতি নানাবিধশ্রুতিঃ।

করিয়াছেন [অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিভিরপি] সে মূর্ত্তিতে স্ত্রী হইলেও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বপ্রকারে অভিন্ন। চরম তত্ত্বের স্ত্রীত্ব বা পুংস্ত্বনিবন্ধন কোনও পার্থক্য নাই, কাজেই শঙ্কর বিদ্যাবিশেষের উপাসক ছিলেন কিংবা অখণ্ড চৈতন্যজ্ঞানে মহাশক্তির আরাধনা করিতেন ইহা শুনিয়া কাহারও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। নিজের উপাসনা-প্রণালী এবং ইষ্টদেবতার কথা স্বগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ না করিলেও তিনি ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রজপ, উপবাস ও দেবতাবিশেষের আরাধনাপ্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও বিদ্যার [তন্ত্রোক্তকালাদি বিদ্যার] অনুগ্রহ লাভ করা যায়[১]। তিনি আরও বলিয়াছেন,—ইতিহাসে [যথা ত্রিপুরা-রহস্যে] দেখা যায় যে সংবর্ত্তপ্রভৃতি বিদ্যোপাসকগণ আশ্রমোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও নগ্নচর্য্যাদি তন্ত্রোক্ত যোগের সাহায্যে মহাযোগিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন[২]। ভাষ্যের বিদ্যোপাসনা বা দেবতারাধনা এবং জপ-সিদ্ধির বিষয় শুনিয়া স্বতই মনে হয় যে, ইহা শঙ্করের সাধনা-জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। শঙ্কর স্বয়ং বিদ্যার উপাসনায় 'বিশেষানুগ্রহ'লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—আত্মার চরম পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। এই জন্যই এত দৃঢ়তার সহিত তিনি বিদ্যার অনুগ্রহের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সংবর্ত্তাদির ন্যায় তিনিও যে এক জন মহাযোগী ছিলেন তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইবার কারণ নাই। তদীয় প্রপঞ্চ-সার পড়িয়া অনেকেই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শঙ্কর যথার্থই শ্রীবিদ্যার উপাসক এবং তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শঙ্কর যে বহুবিধ যোগাঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাস তাঁহার অমরুকের শরীর প্রবেশের ঘটনা হইতেই সাধারণে জানিতে পারেন।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব—আচার্য্যপাদ সৌন্দর্য্য-লহরীতে কি ভাবে শক্তিতত্ত্বের পরম রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং কি প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পরম দেবতার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। শঙ্করের ন্যায় এক জন পরম জ্ঞানীর মুখে ভক্তির কথা শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

চিদানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া পরা শক্তির নাম হইয়াছে 'সুন্দরী[৩]', এবং যে স্তোত্রে তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের বিচিত্র তরঙ্গলীলা উপবর্ণিত হইয়াছে তাহারই অন্বর্থ নাম 'সৌন্দর্য্যলহরী'। শক্তি বা প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত শিব (নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ) বা পুরুষ যে সৃষ্টিব্যাপার বা কোনও কার্য্য করিতে পারেন না এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকলেই যে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাই আচার্য্যপাদ প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন:—

> 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
> নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
> অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চাদিভিরপি
> প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি'॥

প্রকৃতি-পুরুষের যোগেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংসাধিত হয়। ইহা চিরন্তন সত্য। শক্তিবিরহিত শিব কখনও সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। শাক্ততন্ত্রে শিব অপেক্ষা শক্তিরই সমধিক প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বামকেশ্বর তন্ত্রও এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

> 'পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্ যদি।
> সৃষ্টিস্থিতিলয়ান্ কর্ত্তুমশক্তঃ শক্ত এব হি'॥

'তদৈক্ষত', 'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্',[৪] 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি[৫]',

১ 'বিশেষানুগ্রহশ্চ'—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৩৮ শাঙ্করভাষ্য—'জপোপবাস-দেবতারাধনাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি'। স্বীয় অভীষ্টদেবতার বিশেষানুগ্রহের কথাই বোধ হয় এখানে বলা হইয়াছে। ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা সিদ্ধিলাভের কথা তন্ত্রশাস্ত্রেও বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে।

২ 'অপি চ স্মর্য্যতে' ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৩৭, শাঙ্করভাষ্য—'সংবর্ত্তপ্রভৃতীনাং চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে'। এই সংবর্ত্তের ইতিহাস 'ত্রিপুরারহস্যে' দেখা যায়:—

> 'ভার্গবাঙ্গিরসং ত্বং মাং জানীহ্যবরজং গুরোঃ।
> সংবর্ত্ত ইতি বিখ্যাতং ত্রিলোক্যাং প্রথিতং গুণৈঃ'।—ত্রিপুরারহস্য, ৪।৩৭

৩ ত্রিপুরেতি সমাখ্যাতা সৌন্দর্য্যাতিশয়াত্তথা। গন্ধর্ব্বতন্ত্র, ২য় পটল। গিরিরাজকন্যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যজ্যোতিঃ স্তোত্রকার এই ভাবে বলিয়াছেন:—

> 'ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে! তুলয়িতুং
> কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ'।

৪ বৃহদারণ্যক, ৪।৩

৫ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৬।৩

'স একাকী ন রমতে', 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ',[1] ইত্যাদি শ্রুতিতে পরম পুরুষের যে ইচ্ছার স্ফুরণ দেখিতে পাই তাহাই ইচ্ছাশক্তির প্রথম উন্মেষ বা সৃষ্টিতত্ত্ব। ইচ্ছাশক্তিরূপা মহামায়াই বিশ্বজগতের মূল কারণ। প্রপঞ্চসারতন্ত্রের প্রারম্ভে আচার্য্যপাদ সারদা বা শ্রীবিদ্যাকে 'বিশ্বযোনি' বলিয়াই নমস্কার করিয়াছেন :—

'সকলজগদধীশা শাশ্বতী বিশ্বযোনি-
র্বিতরতু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সারদা বঃ'।

এই শক্তিতত্ত্বই সাংখ্যের প্রকৃতি, বেদান্তের চৈতন্য এবং ন্যায়-বৈশেষিকের জগৎকারণ। কামকলাবিলাসকার পুণ্যানন্দও ত্রিপুরাসুন্দরীর নমস্কারে এই তত্ত্বেরই উল্লেখ করিয়াছেন :—

'সা জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা।
ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্ম্মলাদর্শঃ ॥'

কামকলাবিলাস, ২

শক্তিযুক্ত হইয়াই যে শিব জীবজগতের ভোগাপবর্গ দান করিতে সমর্থ হন তাহা তত্ত্বপ্রকাশকার ভোজদেবও স্বগ্রন্থে বলিয়াছেন :—

'শক্তো যয়া স শম্ভুর্ভুক্তৌ মুক্তৌ চ পশুগণস্য।
তামেকাং চিদ্রূপামাদ্যাং সর্ব্বাত্মনাস্মি নতঃ' ॥

নমস্কারশ্লোকে স্তোত্রকার নিজে অকৃতপুণ্য বলিয়া বড়ই দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন; এমন কি নিজের উপযুক্ত পুণ্যবল নাই বলিয়া সর্ব্বদেবারাধিতা জগদীশ্বরীকে প্রণাম বা স্তব করিতেও তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাঁহার গুণবর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়া বাগ্‌দেবতার রসনাও জড়িত হয়, তাঁহার কথা বলিবার মত সামর্থ্য মানুষের কতটুকু আছে! পুষ্পদন্ত সত্যই বলিয়াছেন :—

'মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ'।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ' ॥

বিশ্বপ্রপঞ্চ শক্তির বিলাসমাত্র। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই শক্ত্যাত্মক।[2] ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যে যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাকেন তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই; মহাশক্তির প্রেরণায় বা তাঁহার পরতন্ত্ররূপেই তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন—ভগবতীর চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহারা আজ্ঞাবহের ন্যায় কার্য্য করেন মাত্র।[3] পরা প্রকৃতি বা মহাশক্তি হইতেই যে সকলের উৎপত্তি তাহা শঙ্করাচার্য্য তদীয় প্রপঞ্চসারতন্ত্রেও বলিয়াছেন :—

'অথাভবন্ ব্রহ্মহরীশ্বরাখ্যাঃ
পুরা প্রধানাৎ প্রলয়াবসানে'।

দেবতাত্রয়কে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন বলিয়া শ্রীবিদ্যার নাম 'ত্রিপুরা'।[4] দেবীর শক্তিকণা লাভ করিয়াই সকলে শক্তিশালী। এজন্যই স্তোত্রকার বলিয়াছেন :—

'তনীয়াংসং পাংসুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং
বিরিঞ্চিঃ সংচিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং
হরঃ সংক্ষুভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্' ॥

সৌন্দর্য্যলহরী, ২

সংসারের জরামৃত্যু বড়ই ভীতিপ্রদ। জীবজগৎ নিরন্তর ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত। আবার অভীষ্ট ফললাভের পথেও মানুষের বহু বাধাবিঘ্ন। তবে মানুষ কেমন করিয়া দুঃখ যন্ত্রণার হাত এড়াইবে? সকল দুঃখনিবৃত্তির জন্য স্তোত্রকার আমাদিগকে জগদম্বার চরণাশ্রয় করিতে বলিতেছেন :—

'ভয়াত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছাসমধিকং
শরণ্যে! লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণৌ' ॥

সৌন্দর্য্যলহরী, ৫

---

১ বৃহদারণ্যক, ৪।৩

২ তস্মাচ্ছক্তিপ্রধানা চ শক্ত্যা ব্যাপ্তমিদং জগৎ। গন্ধর্ব্বতন্ত্র (২য় পটল)

৩ জগতামীশ্বরত্বং চ লব্ধং ত্বদনুকম্পয়া।
ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বং বিষ্ণুনা তথা ॥
সুরাসুরমুনীন্দ্রাণাং মহত্বং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
তেনেয়ং মহতী বিদ্যা দুর্ল্লভা ভুবনত্রয়ে ॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্র (২য় পটল)

৪ ত্রয়াণামপি দেবানাং প্রচোদিতা ত্রিপাদিকা।
ত্রিপুরেতি সমাখ্যাতা কামদা সা হি কামিনী ॥—গন্ধর্ব্বতন্ত্র
ত্রিপুরাশব্দের অন্য প্রকার নির্ব্বচন যথা :—
'ত্রীন্ বস্তাঃ পুরতো দত্তাদ্দুর্গা সা পরমেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি সমাখ্যাতা সৌন্দর্য্যাতিশয়াত্তথা ॥—গন্ধর্ব্বতন্ত্র
প্রপঞ্চসারতন্ত্রে শঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে ত্রিপুরা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—
ত্রিমূর্ত্তিসর্গাচ্চ পুরাভবত্বাত্ত্রয়ীময়ত্বাচ্চ পুরৈব দেব্যাঃ।
লয়ে ত্রিলোক্যা অপিপূরণত্বাৎ প্রায়োঽম্বিকায়াস্ত্রিপুরেতি নাম ॥
প্রপঞ্চসার, ৯।২

সাধকের নিকট ভগবতী বরাভয়করা এবং সর্ব্বসৌভাগ্য-দায়িনী। মায়ের চরণে শরণ লইলে মানুষ ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং অভীষ্টফললাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া নিস্তারের অন্য উপায় নাই।

অষ্টম শ্লোকে আচার্য্যপাদ ত্রিভুবনজননীর নিবাসভূমি বা দিব্য পুরীর বড় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন [১] :—

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াম্
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্॥

সৌন্দর্য্যলহরী, ৮

ভগবতী সুধাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সুরতরুপরিবৃত মণিমণ্ডিত দ্বীপের চিন্তামণিগৃহে বাস করেন। এই নিরুপম ভূমিই সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনীর বাসগৃহ। সুধাসমুদ্রস্থ রত্নমণ্ডপ ভিন্ন সুন্দরীর যোগ্য বাসস্থান জগতে আর কি হইতে পারে? জগতের কোন কবিই বোধ হয় জগদীশ্বরীর ইহা অপেক্ষা সুন্দর বাস-ভূমির কল্পনা করিতে পারিতেন না। উপনিষদের 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ' [২] অর্থাৎ ভগবান্ নিজের মহিমায় নিজে প্রতিষ্ঠিত এবং 'দিব্য ব্রহ্মপুর' বা 'বিরজ ব্রহ্মলোকের' বর্ণনার মধ্যে আমরা দিব্য পুরীর এমন মধুর চিত্র দেখিতে পাই না। যিনি সকল চিন্তার সার এবং স্বয়ং চিন্ময়ী তাঁহার গৃহের 'চিন্তামণি' নাম রাখিয়া স্তোত্রকার যথেষ্ট সরসতার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর রাজপ্রাসাদ বা অট্টালিকা কি এত সুন্দর হয়? যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী এবং স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী তাঁহার গৃহের সহিত তুলিত হইতে পারে জগতে এমন গৃহ বা মন্দির নাই। বগলামুখীর ধ্যানেও আমরা সুধাসমুদ্র, মণিমণ্ডপ ও রত্নবেদীর উল্লেখ দেখিতে পাই :—

'মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্'।

শ্রীচক্রের তন্ত্রোক্ত আকারের স্বরূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে ভৈরব-যামলতন্ত্রও সুধাসিন্ধু প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

'বিন্দুস্থানং সুধাসিন্ধুঃ পঞ্চযোন্যঃ সুরদ্রুমাঃ।
তত্রৈব নীপশ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্॥
তত্র চিন্তামণিকৃতং দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্'।

বৈষ্ণবগণও শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাভূমি চিন্ময় বৃন্দাবনের বর্ণনায় রত্নবেদী, রত্নমণ্ডপ এবং কল্পবৃক্ষপ্রভৃতির কথা বলিয়াছেন :—

অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে'।
'ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে।
নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষমণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতে।
কল্পাটবীতলে সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্যমণ্ডপে॥'

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

ভক্তচূড়ামণি নরোত্তম দাসঠাকুর বৃন্দাবন বর্ণনায় বলিয়াছেন :—

'বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণিধাম
তাহে রতন মন্দির মনোহর'।

এখন দেবীর রূপের কথা :—

'ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে! তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ।'

সৌন্দর্য্যলহরী, ১২

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কিংবা স্বয়ং বাগ্দেবী বা বৃহস্পতি কেহই জগন্মাতার রূপবর্ণনার যোগ্য নয়। এই রূপ অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব। স্তোত্রকার তাই বলিতেছেন,—জগদীশ্বরীর রূপের তুলনা নাই—এই রূপের উপমা জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[৩] উর্ব্বশীতিলোত্তমাপ্রভৃতি অমরললনাগণও কালিদাসপ্রভৃতি কবির তুলিকায় সত্য সত্যই সুন্দরী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সৌন্দর্য্য ভগবতীর সৌন্দর্য্যের তুলনায় অতিতুচ্ছ। যাঁহার রূপে জগতের রূপ, যাঁহার রূপজ্যোতিতে চন্দ্রসূর্য্যাদি সকল উজ্জ্বল[৪] [যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি]

---

১ ভৈরবযামলপ্রভৃতি তন্ত্রে 'দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্' বর্ণিত হইয়াছে। রহস্যের দিক্ দিয়া বলিতে গেলে ত্রিকোণাত্মক শ্রীচক্রই (যাহার অপর নাম 'বৈন্দবস্থান') শ্রীবিদ্যার প্রকৃত মন্দির বলিতে হয়; ইহারই নাম 'অমৃতপুরী' (অমৃতেনাবৃতাং পুরীম্) বা 'অপরাজিতা পুরী'। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে শঙ্করাচার্য্য 'অর' ও 'ণ্য'নামক ব্রহ্মলোকের দুইটী অমৃতহ্রদ, হিরণ্ময় গৃহ ও অপরাজিতা পুরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেবযান পথে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারাই উক্ত সুধাহ্রদে স্নান করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সুধাহ্রদই বৈষ্ণবদর্শনে 'ব্রহ্মহ্রদ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২ ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

৩ কবিরাজ শ্রীহর্ষও নলের মুখমণ্ডল বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া তত্তুল্য সুন্দর বস্তু না দেখিয়া শেষে শুধু বলিয়াছেন—'অতন্মরীজিতরসুন্দরান্তরে ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে' অর্থাৎ নলের মুখের সহিত উপমিত হইতে পারে চরাচরে এমন আর দ্বিতীয় সুন্দর পদার্থ নাই।

৪ যস্য দেব্যা মহেশানি! ভাসা সর্ব্বং বিভাসতে।
তদ্ভাসা রহিতং কিংচিৎ ন চ যচ্চ প্রকাশতে॥
তামেবানুপ্রবিশ্যৈব ভাতি লোকং চরাচরম্। ভৈরবযামল

—তাঁহার রূপের সাদৃশ্য কোথায় মিলিবে? দেবগণ এই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

'রূপং তবৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ'[1] অর্থাৎ দেবীর রূপ অচিন্তনীয় ও অতুলনীয়। এই কথারই পুনরুক্তি—

'কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ'[2]।

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের শোভা যাঁহার নখপঙ্‌ক্তিতে বিরাজমান[3], যাঁহার বিমল রূপ যোগিগণের পরম ধ্যেয় বস্তু[4]—তাঁহার রূপের কথা বলা মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহার রূপের কণা ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেও হৃদয় পরমানন্দে ডুবিয়া যায়, তাঁহার রূপ কি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব! সাধক রামপ্রসাদ সত্যই গাহিয়াছেন—

'রামপ্রসাদ বলে কুতুহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল,
যাঁর রূপ হৃদমাঝারে নিরখিলে হৃদয়পদ্ম করে আলো'।

দেবীর রূপটী কেমন? স্তোত্রকার বলিতেছেন—

'শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং শশিযুতজটাজূটমকুটাং
বরত্রাসত্রাণস্ফটিকগুটিকাপুস্তককরাম্।'

সৌন্দর্য্যলহরী, ১৫

জগজ্জননী শরচ্চন্দ্রিকার ন্যায় অতিশুভ্র; তাঁহার মস্তক চন্দ্রকলাযুক্ত এবং জটাজূটমুকুটমণ্ডিত; তাঁহার হস্তে বর, অভয়, অক্ষমালা ও বিদ্যামুদ্রা (পুস্তক) শোভা পাইতেছে।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে শঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে ত্রিপুরাসুন্দরীর ধ্যানগম্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"আতাম্রার্কাযুতাভাং কলিতশশিকলারঞ্জিতগ্রাং ত্রিনেত্রাং
দেবীং পূর্ণেন্দুবক্ত্রাং বিধৃতজপবটীপুস্তকাভীত্যভীষ্টাম্।
পীনোত্তুঙ্গস্তনার্তাং বলিলসিতবিলগ্নামসৃক্‌পঙ্করাজ-
ন্মুণ্ডস্রগ্‌বর্তিতাঙ্গীমরুণতরদুকূলানুলেপাং নমামি'॥

প্রপঞ্চসার, ৯।৮

এখন আমরা দেখিতে পাইব যে, জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য ভক্তির মধুর স্পর্শে কতদূর বিগলিত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রবল বন্যাস্রোতে তাঁহার জ্ঞান ও তর্কবুদ্ধি তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ইষ্টদেবতার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি এক সময় বৈষ্ণবের মত দীনতাসহকারে দাস্যভাব গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই—

'ভবানি! ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণাম্
ইতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমকুটনীরাজিতপদাম্'।

সৌন্দর্য্যলহরী, ২২

একদিন যাঁহার অত্যদ্ভুত বিচারশক্তির নিকট ভারতের বিবুধমণ্ডলীকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল এবং যাঁহার সুপ্রচারিত অদ্বৈতবাদ উপাসনারাজ্যের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই প্রতিভার অবতার শঙ্করাচার্য্য আজ দীনহীনের ন্যায় দেবীর কৈঙ্কর্য্য ভিক্ষা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা মধুর জিনিষ আর কি হইতে পারে? ইহাকেই বলে ভক্তির জয়।

এই শ্লোকটীতে ভক্তিরসের আরও একটী সুন্দর কথা আছে। জগদীশ্বরী পরমকরুণাময়ী। তাঁহার এত করুণা যে, ভক্ত তাঁহার কৃপাভিক্ষা করামাত্রই পরমপদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়। জপহোমাদি কঠোর তপস্যার আবশ্যক নাই; শুধু ভক্তির সহিত তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

জগদীশ্বরীর পূজার অধিকারী কে? সামান্য মানুষ তাঁহার পূজা করিতে পারে কি? মহামায়ার গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মাদি যে তিনজন প্রধান দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন কেবল তাঁহারাই মহাপূজার অধিকারী—

'ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানাং তব শিবে
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা'।

সৌন্দর্য্যলহরী, ২৫

মানুষের এত শ্রদ্ধাভক্তি বা পূজোপযোগী উপকরণ নাই যাহার দ্বারা সে জগদীশ্বরীর অর্চ্চনা করিতে পারে। আবার নিজে শিব না হইলেও শিবানীর পূজার অধিকার জন্মে না[5]। জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মানুষ যখন শিবতুল্য নির্ম্মল হয় তখনই সে বিশ্বেশ্বরী পূজার যোগ্যতা লাভ করে। অন্যথা তাহার জপোপাসনা সকলই নিষ্ফল।

দৃশ্যমান জগতের সকলই অনিত্য। উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুর ধর্ম্মমাত্র। কালক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যম ও কুবের সকলই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও ক্ষণস্থায়ী। কালের করাল কটাহে সকলেই পরিপাক লাভ করে[6]—থাকেন শুধু যিনি কালের কাল এবং তাঁহার সমবায়িনী শক্তি (মহামায়া)। শৈবাগমে শিব ও শক্তি (শক্তি ও শক্তিমান) অভিন্ন—

'পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং ভাস্করস্যেব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা শিবা'॥

লিঙ্গপুরাণেও শিব ও শক্তির অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে—

---

১ দেবীমাহাত্ম্য, ৪।২১

২ দেবীমাহাত্ম্য, ৪।৩

৩ উত্তুঙ্গহারদর্পণচন্দ্রনখরে মঞ্জীরসংশিঞ্জিতে
ব্রহ্মাণ্ডপ্রলিতার্পিতৈঃ সুরসুরৈর্মৌনৈরভিষ্টুতপদে।

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী

৪ রূপং তে বিমলং মুনীন্দ্রসকলৈর্ধ্যেয়ং পরং নিষ্কলম্।

সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী।

৫ শিবো ভূত্বা শিবাং যজেৎ। কুলার্ণব
গন্ধর্ব্বতন্ত্রে বলা হইয়াছে—'দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'।

৬ কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।

'উমাশঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ'।

সদাশিব ও শক্তিতত্ত্বের নাশ নাই[১]।

'বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং
বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্।
বিতন্দ্রী মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলিতদৃশা
মহাসংসারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ'।

সৌন্দর্য্যলহরী, ২৬

'প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্' এই সাংখ্যসূত্রেও প্রকৃতিপুরুষ ভিন্ন অন্য সকল পদার্থের অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব ও শক্তির নিত্যতা কথিত হইয়াছে—

'ব্যাপকমেকং নিত্যং কারণমখিলস্য তত্ত্বজাতস্য'।

তত্ত্বপ্রকাশ

'চিদ্‌ঘন একো ব্যাপী নিত্যঃ সততোদিতঃ প্রভুঃ শান্তঃ'।

তত্ত্বপ্রকাশ

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাবিদ্যার নাম 'নিত্যা'[২]। তাঁহার উৎপত্তি ও ধ্বংস নাই—তিনি উদয়াস্তবিবর্জ্জিত।

'নিত্যা চ পঞ্চমী শক্তিঃ পরংব্রহ্মস্বরূপিণী'।

গন্ধর্ব্বতন্ত্র

যিনি আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ সকল বস্তুতে আত্মদর্শন করেন তাঁহার শারীর চেষ্টাই ভগবানের অর্চ্চনা, তাঁহার মুখের কথাই মন্ত্রোচ্চারণ এবং তাঁহার দৃষ্টিপাতই ধ্যান[৩]। মানুষ তাহার শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক সকল প্রকার প্রযত্নের দ্বারাই যে অজ্ঞাত ভাবে প্রতিনিয়ত জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া থাকে তাহাই স্তোত্রকার অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বলিতেছেন—

'জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্'॥

সৌন্দর্য্যলহরী, ২৭

শৈবাগমেও এই প্রকার সর্ব্বাত্মভাবের আরাধনাপদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে—

'আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সংচারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো। তবারাধনম্'॥

ভক্ত-সাধক রামপ্রসাদও তাঁহার সরস সঙ্গীতের মধ্যে এই ভাবের সর্ব্বাত্মনিবেদনরূপ রহস্যপূজা প্রকাশ করিয়াছেন—

'যা শব্দ শোন শ্রুতিপুটে তাইতো মায়ের মন্ত্র বটে,
তুমি মনে কর নগর ফের কেবল প্রদক্ষিণ কর মাকে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রাতে মায়ের ধ্যান,
মনে কর ভোজন কর কেবল আহুতি দেও শ্যামা মাকে'॥

মহাশক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী। তাঁহার নিমেষ ও উন্মেষের দ্বারা যথাক্রমে জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সংসাধিত হয়। তন্ত্র ও পুরাণে এই তত্ত্বের যথেষ্ট উপদেশ আছে।

'সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে'।—দেবীমাহাত্ম্য

'স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী'।

—দেবীমাহাত্ম্য

শ্রীচক্র ও ষট্‌কমলভেদপ্রভৃতি আন্তর পূজার ক্রমনির্দ্দেশ করিয়া স্তোত্রকার উপসংহারে বলিতেছেন যে, এই স্তোত্র-নির্ম্মাণে তাঁহার কোনও কৃতিত্ব নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তিনি তাঁহার কথায়ই তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন—

'প্রদীপজ্বালাভির্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং
ত্বদীয়াভির্বাগ্‌ভিস্তবজননি! বাচাং স্তুতিরিয়ম্'॥

সৌন্দর্য্যলহরী, ১০০

প্রদীপশিখার দ্বারা মানুষ যেমন বিশ্বপ্রকাশক আদিত্য-দেবের আরত্রিক করে; চন্দ্রকান্তমণির জলকণার দ্বারা যেমন চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান করে; সমুদ্রের জল দিয়াই যেমন সমুদ্রের তর্পণ করে; আচার্য্যপাদও সে প্রকার মহাবিদ্যার স্বরূপভূত শব্দসন্দর্ভের দ্বারাই তাঁহার স্তোত্র গ্রথিত করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ণমালা বা ধ্বনিমাত্রই পরা বাক্ বা মহাবিদ্যার রূপ। কাজেই এই স্তোত্রে শঙ্করের নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার মত কিছুই নাই। কি সুন্দর কথা! ভক্ত ভিন্ন এমন মধুর ও প্রাণস্পর্শিনী কথা আর কেহই বলিতে পারে না। সৌন্দর্য্য-লহরী শঙ্করের ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের করুণ নিবেদন—তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার অমৃতময় ফল। এই প্রসিদ্ধ দেবীস্তুতি চিরদিনই সাধকের কণ্ঠাভরণরূপে বিরাজিত থাকিবে।

---

১ ব্রহ্মাদি সকলই কালচক্রে বিনষ্ট হয় এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানই যে অনাদিনিধন তাহা বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—

'কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুঁয়া আদি অবসানা।
তুঁয়ে জনমি পুনঃ তুঁয়ে সমাওত
সাগরলহরী সমানা'।

২ দেবীমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—
'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে'॥

৩ আত্মৈকভাবনিষ্ঠস্য যা যা চেষ্টা তদর্চ্চনম্।
যো যো জল্পঃ স মন্ত্রস্তদ্ধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্॥—কুলার্ণব

পাণিনির পরাজয়

—শ্রীলালমোহন দে

বিরল-বসতি কানা-গলিটির এক প্রান্তে, ভিনিসিয়ান-রেড্-রঞ্জিত, একখানি মাঝারি গোছের দ্বিতল বাড়ি। এই বাড়ির উপরের তলায় আবার একটি মাঝারি রকমের ঘর।

ঘরের একপাশে একখানা খাট। খাটের উপর ধব্‌ধবে বিছানা পরিপাটি করিয়া রচিত।

দেওয়ালের গায়ে একটি আলমারি, বইয়ে ঠাসা। অপর দিকে একটি বুক্-কেশ,—কাপড় জামায় ভর্ত্তি।

বাহির হইতে দেখা যায় না, কিন্তু ঘরে ঢুকিলেই চোখে পড়ে, দক্ষিণে, দেওয়ালে ঝুলান একটি শেল্‌ফ। উহার স্তরে স্তরে রঙবেরঙের পুতুল ও খেলনা সজ্জিত;—গরু, ঘোড়া, মুরগী, মোটর-গাড়ি, এরোপ্লেন,—এই সব।

গৃহের বামে, ঘরে প্রবেশ করিবার দরজার দিকে মুখ করিয়া, গৃহস্বামী শশীবাবু ইজি-চেয়ারে দেহ এলাইয়া একখানা মাসিক পত্রিকা তন্ময় হইয়া পাঠ করিতেছেন।

বয়সে যুবা হইলেও শশীবাবুকে দেখিতে বালকের ন্যায়। একহারা ছিপছিপে গড়ন, রঙ একপ্রকার ফর্‌সাই। তবে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে; যেন নবদূর্ব্বাদল শ্যাম। ত্রিশ বৎসর বয়সেও শশীবাবুর গোঁপ জোড়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রথম যৌবনের গোঁপের রেখাটি আজও তাই রেখামাত্রই রহিয়া গিয়াছে। যেন সুনিপুণ কোন্ চিত্রকরের তুলির একটি টান!

বাটীর একতলা হইতে দুগ্ধপূর্ণ কোনো পাত্র ও ঝিনুকের সংঘাতজনিত শব্দের ন্যায় একটা টুং টাং শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী কোনো শিশুর উচ্চ চীৎকার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। শশীবাবুর মাসিক পত্রিকা পড়া বুঝি আর হয় না।

শিশুর চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া শশীবাবু পাঠ স্থগিত রাখিয়া একতলার উদ্দেশে হাঁকিলেন—

"আঃ হা, আজ বাড়িতে কি ডাকাত পড়েচে, এঁ্যা! দেখ দেখি একবার চেঁচামেচির বহরটা। বলি হ'ল কি তোমাদের? ছুটীর দিন; আপিস-টাপিস নেই; একটু নিশ্চিন্তে ব'সে যে একখানা বইও পড়বো, তার যো নেই দেখছি।"

গৃহস্বামীর তর্জ্জনে একতলায় বাটি-ঝিনুকের টুং টাং ও উচ্চ চীৎকার যুগপৎ থামিয়া গেল।

আপনার হুমকির এবম্বিধ আশু কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া শশীবাবু ঈষৎ হাস্য করিলেন। তারপর কি মনে করিয়া, পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ ভৃত্যকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"ওরে ও গজানন, গজানন। হতভাগারা সব আজ গেলো কোন চুলোয়! এই গজা।"

এক মিনিট পরে ঘরের বাহিরে কাহারো পদশব্দ শোনা গেল। গজানন আসিয়াছে মনে করিয়া শশীবাবু বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাটা উড়ে, কানে তুলো গুঁজে ব'সে থাক! টিকি ধরে যেদিন মাথায় পাক—"

বাম হস্তে ফুটফুটে, হৃষ্টপুষ্ট, একটি তিন বৎসরের উলঙ্গ শিশুর প্রকোষ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিয়া ও দক্ষিণহস্তে দুগ্ধপূর্ণ একটি বাটি লইয়া এক বিংশতিবর্ষীয়া তন্বঙ্গী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভৃত্য গজাননের পরিবর্ত্তে স্ত্রী মলিনাকে পুত্রসহ উপস্থিত দেখিতে পাইয়া শশীবাবু চক্ষের পলকে পরিত্যক্ত পুস্তকখানা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া অতি মনোযোগের সহিত উহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার চালাকিটুকু পত্নীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। স্বামীর প্রতি একটা বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয়া, কতকটা উষ্ণতার সহিত মলিনা বলিল—"বড় যে ষাঁড়ের মত চেঁচান হচ্ছিল! খাওয়াও ত দেখি ছেলেকে তোমার এক ঝিনুক দুধ। বাবা, বাবা! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, এমন গুণধর ছেলে আর দু'টি দেখলাম না। কি দস্যি ছেলে গো, কি দস্যি ছেলে! এমন জোর, আমি ত পারিনে ওর সঙ্গে। হবে না আবার; যেমন বাঁশ, তেমন কঞ্চিই ত হবে! ইস্, এই এতক্ষণ ধরে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিটা না করা গেল। কিন্তু উঁহু, ঐ যে এক ঝিনুক গিলে মুখ বুজেচে, কিছুতেই আর হাঁ করবে না।......

হিমালয়

রাখলে বই ? আমি মরছি বকে বকে, উনি ভারি আরাম করে ইজি-চেয়ারে শুয়ে বই পড়ছেন।"

তাড়া খাইয়া, মুখের উপর হইতে বইখানা সরাইলে দেখা গেল শশীবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হাসিতে ঝলমল করিতেছে।

পার্শ্বস্থিত জয়পুরী টিপয়ের উপর বইটা ধপ করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শশীবাবু চেয়ারে সটান উঠিয়া বসিলেন। তৎপর সহাস্যে ও কৃত্রিম সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—"আজ্ঞে, আপনার অঞ্চলাশ্রিত এই বৃষের প্রতি কি আদেশ হয় ? বাঁশকে কি কঞ্চির পৃষ্ঠে পড়িতে হইবে ? বলুন আপনার কি অভিরুচি, আমি যথোচিত ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করি।"

মধুর ভ্রূভঙ্গি করিয়া যুবতী উত্তর করিল—"কথার ছিরি দেখ না ! আমি যেন সাধ করে ওঁকে 'ষাঁড়' বলতে গেছি। কথাটা মুখ দিয়ে ফস্ করে বের হয়ে গেল, কি ক'রবো ? তাই বলে আবার খোঁটা দেওয়া ! একে এই বজ্জাত ছেলেটা দগ্ধাচ্চে, তার উপর উনি এলেন ওঁর মিছরির ছুরি চালাতে। মাগোঃ, মরণ হলেই বাঁচি।" বলিয়া, হাতের দুগ্ধপূর্ণ বাটি ঠন্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া, মলিনা উহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তৎপর উক্ত শিশুকে জোর করিয়া আপনার ক্রোড়ে শোয়াইয়া, বাম হস্তে তাহার গ্রীবা ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"দুষ্টু ছেলে কোথাকার, ভাল চাও ত দুধটা খেয়ে নাও। নইলে, বুঝলে কিনা, জুজুবুড়ীর কাছে এক্ষুণি তোমাকে ফেলে দেব।"

শ্রীমান পাণিনি মাতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য যথেষ্ট কসরৎ করিতেছিল। জননীর কঠিন বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্র হস্তপদসঞ্চালন বন্ধ করিয়া, মায়ের দিকে বড় বড় কালো কালো চোখ দুটি তুলিয়া, পরিষ্কার তিনটি শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল—"দুদ—খাবো—না।"

স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মলিনা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"এই নাও, শুনলেত নিজের কানে ? এখন যদি জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতে যাই দুধ, এক্ষুণি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। কী যে মুস্কিলে পড়া গেছে এই দুরন্তটাকে নিয়ে !—ওগো, তুমি না হয় একবার বলে দেখো না। তোমার কথায় যদি খায়।—ঐ দেখো, ছেলে কিন্তু এক পা দু'পা করে সরে পড়েচে।"

পত্নীর অনুরোধে শশীবাবু মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন—"পাণিনি !"

শ্রীমান পাণিনি ততক্ষণে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে সে আর পালাইতে সাহস করিল না। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে সে উত্তর করিল—"আজ্ঞে"।

কায়দাদুরস্ত উত্তর শুনিয়া ঘরের ভিতর স্বামিস্ত্রী দুজনায় মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৎপর হাস্য সম্বরণ করিয়া কৃত্রিম কোপের আভাস ফুটাইয়া, শশীবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন—'বাইরে দাঁড়িয়েই 'আজ্ঞে' হচ্ছে, বেয়াদব কোথাকার। ঘরের ভেতর বাঘ না ভালুক ? শীগগির ঘরে আয়। শুনে যা।"

গুটিগুটি পা ফেলিয়া পাণিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু পিতার নিকট উপস্থিত না হইয়া মাতার পৃষ্ঠদেশে গিয়া দাঁড়াইল। মলিনার মস্তকে ঈষৎ অবগুণ্ঠন ছিল। একটানে উহা অপসারিত করিয়া শ্রীমান মাতার কবরীস্থিত সোনার কাঁটাগুলির সেন্‌সাস্ লইতে আরম্ভ করিল—"এক, দুয়, তিন বারো" !

পুত্রকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া মলিনা ক্ষিপ্রহস্তে পুনরায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার পর সস্মিতমুখে পাণিনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আহা, গুণের আর সীমা নেই। উনি দিয়েছেন তিনটে মোটে সোনার কাঁটা, বাবু গুণে ফেল্লেন বারোটা ! তোর বাবুজী মস্ত বড়ো মানুষ, নয় ? একটা দুটো কোন ছার, একেবারে বারো বারোটা সোনার কাঁটা আমায় গড়িয়ে দিয়েছেন, কেমন ?"

পত্নীর বাক্যে শশীবাবুর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হইল। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"ডাকলুম আমি, সেদিকে খেয়াল নেই ; মায়ের পেছনে গিয়ে কাঁটা গুণতে আরম্ভ করলে ? বড়ো ডেঁপো ছেলে হয়ে উঠেচ ! এমন ঠেঙ্গানি একদিন দেবো, যে যাকে বলে ! এদিকে, আমার কাছে আয় বলছি।"

ধীরে ধীরে পাণিনি পিতার দুই জানুর মধ্যদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শশীবাবু পুত্রের দুই স্কন্ধে আপনার দুই হাত রাখিয়া ডাকিলেন—"পাণিনি"।

"আজ্‌জে" বলিয়া উত্তর দিয়াই খোকা পিতার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মালিনা সহাস্তবদনে শিখাইয়া দিল—'আজ্‌জে' নয়; বলো 'আজ্ঞে'।

পাণিনি জননীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বলিল—"আজ্‌জে।

"ফের বলে 'আজ্‌জে'। 'আজজে' নয়, 'আজজে' নয়; 'আ-জ্ঞে'। বলো 'আজ্ঞে"।

"আ-আ-আ-আজ্‌জে"।

শশীবাবু হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বেশ, বেশ; ঐ 'আজ্‌জে'তেই আমি আপাততঃ সন্তুষ্ট। আর, ঐযে ডাকবা মাত্রই তুমি আমার কাছে এসেচ, এতেও আমি তোমার ওপর খুব প্রসন্ন হয়েচি। তোমার পিতৃভক্তি যথার্থই প্রশংসার বস্তু, বুঝলে?"

পাণিনি পিতার বক্তৃতায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। শশীবাবু তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—তোমার গা-ময় দুধ আর কাদা। কোলে যদি ওঠো বাপু, আমার কাপড়চোপড় এই দণ্ডেই গয়াপ্রাপ্ত হবে। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শোনো যা বলছিলাম। তুমি যে তোমার বাপুজীর কথা শোনো, এটা খুব ভালো কথা। সবাই বলবে কি জানো? সবাই বলবে—পাণু বড়ো লক্ষ্মী ছেলে; সে তার বাপুজীর কথা শোনে। কিন্তু, তুমি যে তোমার মায়ের কথা শোনো না, দুধ খেতে চাও না, জ্বালাতন কর তাঁকে, এটা আবার অত্যন্ত গর্হিত কথা। এতে আবার সবাই বলবে কি জানো? সবাই বলবে,—পাণুটা ভারী দুষ্টু; সে তার মায়ের কথা শোনে না, দুধ খায় না, খালি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে। পাণুটা পচা, গন্ধ, হ্যাক্ থুঃ।"

পিতার "হ্যাক থুঃ" বলিবার হাস্যজনক মুখভঙ্গি দেখিয়া পাণিনি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর মায়ের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিল—"মা, মা, বাপুজী বলছে, 'পাণুটা পচা, গন্ধ, হ্যাক থুঃ'। এ কথা বলেছে বাপুজী।"

মলিনা পুত্রকে সস্নেহে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল—"না, না, তোমার বাপুজী কিচ্ছু জানে না। পচা, গন্ধ, হ্যাক্ থুঃ আবার! আরো না কিছু! পাণু আমার লক্ষ্মী ছেলে, চাঁদ ছেলে। কেমন আমার কথা শোনে, ঢক্‌ঢক্ ক'রে দুধ খায়। দেখাও ত বাবা, তোমার বাপুজীকে দেখাও ত, কেমন তোমার গলার ভেতর ময়নাটা বড়ো হয়েচে।" বলিয়া জননী পুত্রকে পুনরায় কোলে শোয়াইয়া এক ঝিনুক দুধ তাহার মুখের নিকট ধরিলেন। পাণিনি বিনা আপত্তিতে দুধটা মুখে লইয়া ঢক্ করিয়া উহা গলাধঃকরণ করিল।

মলিনা স্বামীর প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ করিয়া বলিল—"শুনেছ, ওগো শুনেছ, ময়নাটা যে ডাকল? পাণুর গলার ভেতর ময়নাটা দুধ খেয়ে খেয়ে কত বড়োটি হয়েচে দেখলে? কেমন দুধ গলায় যেতেই ঢক্ করে ডেকে উঠল।"

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া শশীবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—"সত্যি ত, সত্যি ত! পাণুর গলার ভেতর সত্যি সত্যি ময়নাটা ডাকল! আরে রামোঃ, দেখেচো একবার কাণ্ডখানা! গলার ভেতর ময়না বসে ঢক্‌ঢক্ করচে। ডাকো, ডাকো শীগগির, রুণু, ঝুণু, রেণু, টুলটুল, নেরু সবাইকে। ওরে অ টুলটুল, নেরু, রুণু, ঝুণু, রেণু,—শীগগির দৌড়ে এসে দেখ না,—পাণুর গলার ভেতর মস্ত বড়ো একটা ময়না ঢুকেচে, আর দুধ খেয়ে ঢক্‌ঢক্ করচে।"

ডাকিবমাত্রই এক ঝাঁক নানা আকারের ও নানা বয়সের কাচ্চাবাচ্চা "কোথায়, দেখি কাকাবাবু, দেখি কেমন ময়না," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দুড়্‌দাড়্ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

[illegible] একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"কি ময়না কাকীমা? চড়ুই, না টিয়ে, না শালিক?"

"না, না, চড়ুই, শালিক টালিক নয়; এটা মস্ত বড়ো একটা পাহাড়ে ময়না। দেখচিস্‌নে কী জোরে জোরে ডাকচে।" বলিয়া, মলিনা ক্ষিপ্রহস্তে চার পাঁচ ঝিনুক দুধ ঢক্‌ঢক্ করিয়া পুত্রকে খাওয়াইয়া দিল।

শ্রীমান খোকা তাহার কণ্ঠবাসী পাহাড়ে ময়নাটির পরিচয় এই প্রকারে সকলের সাক্ষাতে দিতে পারিয়া মহোল্লাসে এবং সগৌরবে হাত পা ছুঁড়িয়া জননীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

মলিনা দেখিতে পাইল, এই উপযুক্ত সুযোগ। এই সুযোগ, পাণিনির ময়নার ডাক শুনাইবার উৎসাহ থাকিতে থাকিতে, অবশিষ্ট দুধটুকু তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইতে। কিন্তু টুলটুল সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল।

টুলটুল সাত কি আট বৎসরের মেয়ে। বুদ্ধি একটু হইয়াছে। সে অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে দলস্থ সকলকে বলিল—"না রে, ওটা ময়না নয়; দুধ খাবার ঢক্‌ঢক্‌ শব্দ। ময়না বুঝি আবার গলার ভেতর থাকে? আমরা সব বোকা কিনা! কিছু যেন বুঝিনে 'আর'! চল্‌, চল্‌, আমরা ছাদের ওপর কুমীর-কুমীর খেলা করিগে।" বলিয়া 'দলপতী' আপনার দল গুটাইয়া কুইক্‌ মার্চ্চ করিতে করিতে ছাদের দিকে প্রস্থান করিল।

খেলার গন্ধ পাইয়া পাণিনি মায়ের বাহুপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিল।

পুত্রের ব্যস্ততা দেখিয়া মলিনা বলিল—"দুধটুকু খেয়ে নাও, তবে খেলা করতে যেতে পাবে। আর বেশী নেই; এই ক' ঝিনুক খেয়ে ফেলো, বাস্‌, তুমিও খালাস, আমিও খালাস। শীগগির শীগগির খেয়ে নাও। উ বাবা! জানো ত ওদের বাড়ির চাঁপুকে লুলুভূতটা কি করেছিল? চাঁপা দুধ খেতে চায়নি, তার মা ডেকে বল্লে,—আয়ত রে লুলুভূতু, চাঁপুকে নিয়ে যা ত রে। আর,—ও মাগো, লুলুভূতু সত্যি সত্যি গটগট্‌ করে' এসে হাজির।"

পাণিনি কিন্তু এতটুকুতে ভয় পাইবার ছেলে নহে। চোখে মুখে শিশুসুলভ একটা তরল হাসির দীপ্তি ফুটাইয়া সে জননীকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"লুলুভূতুটা চাঁপাকে কি করেছিল, মা"?

"চাঁপাকে কি করেছিল? লুলুভূতু চাঁপাকে থলের ভেতর ভরে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেছল। তারপর, ছুরি দিয়ে চাঁপার পিঠ কেটে, তেল, নুন, লঙ্কা ঘষে দিয়েছিল! আর, মাগো মা, কি জলুনি, তার কি জলুনি।"

চাঁপাসুন্দরীর দুর্দ্দশায় শ্রীমান পাণিনির মহাস্ফূর্ত্তি। ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুটি ঘুরাইয়া মুরুব্বীর মত সে জিজ্ঞাসা করিল—দুষ্টু মেয়েটা কি করলে তখন?

"কি করলে চাঁপু? চাঁপু 'ওর বাবারে, ওরে মারে' বলে চেঁচাতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'আমাকে আমার মায়ের কাছে দিয়ে এসো গো, আমি মায়ের অবাধ্য আর হবো না গো; এখন থেকে আমি ঢক্‌ঢক্‌ করে দুধ খাবো গো'—বাবা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার, খেয়ে নাও ত। বেশী আর নেই; এই দু' ঝিনুক দুধ বই ত নয়। চাঁদ আমার—দেখ, দেখ, পানু কেমন দুধ খায়"—বলিতে বলিতে আর তিন ঝিনুক দুগ্ধ মলিনা পুত্রের গলায় ঢালিয়া দিল।

জননী যখন চম্পাসুন্দরীর নির্য্যাতন-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিলেন, পুত্রটি তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি, প্রত্যেকটি বাক্য জলন্ত উৎসাহ সহকারে দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। কল্পনাচক্ষে সে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছিল বিভীষিকাময় নির্দ্দয় লুলুভূত নামক জীবটি চাঁপাসুন্দরীর কর্ত্তিত পৃষ্ঠদেশে তৈল এবং লঙ্কা মর্দ্দন করিতেছে, আর দুষ্টা মেয়েটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। এমতাবস্থায়, উৎপীড়িতা চাঁপার দুরবস্থা স্মরণ করিয়া, পাণিনি দুই তিন ঝিনুক দুগ্ধ নির্ব্বিবাদে কণ্ঠস্থ করিল বটে, কিন্তু চতুর্থ ঝিনুকটি মুখের নিকট আসিবা মাত্র সে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পদাঘাতে জননীর সঝিনুক হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—"আর টেঁপীকে কি করেছিল লুলুভূতু?"

বকিতে বকিতে মলিনার মুখ আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কত প্রকারে সে পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টা। ভবী নাহি ভোলে! অগত্যা টেঁপীর কাহিনীটাও তাহাকে বলিতে হইল।

"টেঁপিকে কি করেছিল লুলুভূত? হাঁ—, টেঁপিকেও লুলুভূতুটা থলের ভেতর ভ'রে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেল। তারপর টেঁপির গায়ে এই এত বড়ো এক বাটি গুড় মাখিয়ে দিয়েছিল। গুড় মাখিয়ে শেষে এই বড়ো বড়ো, ডেঁয়ে পিঁপড়ে টেঁপীর গায়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর আর কি, বড়ো বড়ো ডেঁয়ে গুলো কটাস্‌ কটাস্‌ করে টেঁপিকে কামড়াতে লাগল। আর, ও মাগো মা! কি জলুনি। তার কি জলুনি। টেঁপির সমস্ত গা রক্তের মতো লাল হয়ে উঠল, আর গাল-ফুলো গোবিন্দর মায়ের মতো এই ঢ্যাবঢেবে হয়ে ফুলে গেলো।"

শিশুর কৌতূহল দুর্দ্দমনীয়। লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় শত মুখে উহার বিকাশ, পর্ব্বতনিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় দুর্ব্বার, দুরতিক্রমণীয়। শ্রীমান পাণিনির অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপ্ত হইয়া বল্‌গাহীন অশ্বের ন্যায় একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর চিবুকে হাত রাখিয়া সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"লুলুভূত টেঁপিকে কি বল্লে?"

মলিনাকে উত্তর দিতেই হইল।

"টেঁপিকে কি বল্লে লুলুভূত ?—বল্লে, কিগো, লাগচে কেমন ? পিঁপড়ের কামড় খেতে এখন কেমন লাগচে ? বড়ো যে দুধ খেতে চাও না, রোজ রোজই মাকে দুধ খাওয়ার সময় যে জ্বালাতন করে মারো, এখন তার কি ? দুধ যদি না খাও, খুব পেট ভ'রে পিপড়ের কামড় খাও !"

"টেঁপি কি বল্লে, শুনি ?"

"কি আর বলবে ; শুধু হাউ, মাউ আর কাঁউ !—'আর দুধ খেতে কাঁদবো না, মাকে জ্বালাতন করবো না, আমাকে বাড়ি রেখে এসো'—এই বলে কী কান্না। শেষে রেখে এলো ললুভূতু টেঁপিকে বাড়ি।—শুনলে ত এখন চাঁপা আর টেঁপির কি হাল করেছিল লুলুভূতটা ? এখন, এই ক' ঝিনুক দুধ খেয়ে নাও ত লক্ষ্মী,—বাবা আমার, খেয়ে নাও ত সোনামণি।"

পাণিনি মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আর এড়াইতে সাহস করিল না। চাঁপা এবং টেঁপির যে জ্বলন্ত নজীর জননী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন, তাহার পর শ্রীমানের আর এবম্বিধ না হইবারই কথা ! সুতরাং বিনা আপত্তিতে, মুখের নিকট ঝিনুক ঝিনুক দুগ্ধ যেমন আসিতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পান করিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু গোল বাধিল শেষের তিন চার ঝিনুক দুধ লইয়া। ঐটুকু দুগ্ধের আর গতি হয় না। লুলুভূতের ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী, পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জন, মাতার স্নেহের উৎপীড়ন,—একে একে সমস্ত বিফল হইল। পাণিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া জননীর অঙ্কে বসিয়া রহিল।

এমন সময় দুই বৎসরের রেণু সশব্দে এক খণ্ড ইক্ষু চুষিতে চুষিতে, দরজার বাহিরে আসিয়া দেখা দিল।

মলিনা পুত্রকে কোল হইতে উঠাইয়া, অদূরে উপবিষ্ট স্বামীর দিকে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"যা চলে আমার কোল থেকে উঠে। দুষ্টু ছেলে কোথাকার ! দুধ খাবেন না কিছু খাবেন না, শুধু শুধু কোলে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন। রোজ রোজ দুধ খাওয়াতে একি জ্বালারে বাপু। যেন দুধ খেলে আমার পেট ভরে ! আয় ত রে রেণু আমার কোলে। আয়, পানুর ঐ বড়ো মোটর-গাড়িটে তোকে দি'। দেখবি কেমন চাবি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেই গাড়ি সোঁ-সোঁ ক'রে ছোটে ! নিবি তুই ঐ গাড়ি ?"

পাণিনির বড়ো মোটর-গাড়ি ! যে গাড়ি শ্রীমান প্রাণাধিক ভালোবাসে এবং যাহাতে অপর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারও নাই। এ হেন মোটর-গাড়ি লাভ করিবার এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ পাইয়া শ্রীমতী রেণুবালা তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত ইক্ষুখণ্ড সুদূরে নিক্ষেপ করিল, এবং "নেবো কাকীমা, ঐ বলো মোতর গালিতা আমি নেবো" বলিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কাকীমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"নিবি ? আচ্ছা, আয় তোকে দি" বলিয়া মলিনা রেণুকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত খেলনাপূর্ণ শেল্‌ফের নিকটে উপস্থিত হইয়া অঞ্চলের চাবিদ্বারা উহা উন্মুক্ত করিল।

শ্রীমান পাণিনি এবার কোন বাধা না মানিয়া শশীবাবুর কোলে গিয়া বসিয়াছিল। ঐ স্থান হইতে রেণুকে কোলে লওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেল্‌ফের দ্বারোদ্ঘাটন পর্য্যন্ত, তাহার জননীর প্রত্যেকটি কার্য্য সে স্তব্ধভাবে ও নিতান্ত শুষ্ক মুখে লক্ষ্য করিল। কিন্তু যখন সে দেখিতে পাইল সত্য সত্যই রেণু তাহার বড় সাধের মোটর-গাড়িটা আলমারি হইতে বাহির করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মহোৎসাহে উহাতে কট্‌কটা কট্‌কট্ করিয়া চাবি ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ধ্বসিয়া পড়িল। কোন প্রকারে উত্থিত ক্রন্দনের বেগ ধারণ করিয়া, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—"বাপুজী, আমার মোটর-গাড়ি রেণু নিলে। তুমি আমাকে কিনে দিয়েছিলে না ? রেণু নিয়ে নিলে আমার গাড়ি।"

শশীবাবু পুত্রমুখ সস্নেহে চুম্বন করিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—"তুমি বড়ো দুষ্টু হয়েচ। ঐ দুধটুক খেয়ে ফেল্লেই ও সব লেঠা চুকে যায়। তুমি দুধটুকু খেলে না বলেই তোমার মা রাগ ক'রে তোমার গাড়ি রেণুকে দিয়ে দিলে। যাও, নিজের হাতে বাটি মুখে তুলে, দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে নাওগে। তা হলে রেণু তোমার গাড়ি রেখে দেবে নিশ্চয়। যাও, দেখি তুমি কেমন আমার কথা শোনো।"

সুড়্‌সুড়্ করিয়া শ্রীমান পিতার কোল ত্যাগ করিয়া নামিয়া পড়িল। ধীরে, ধীরে,—নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত,

দুধের বাটির নিকট গিয়া বসিল এবং রেণুর হস্তস্থিত মোটর-গাড়ির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, বাটিটা একবার মুখের নিকট তুলিতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই উহা ভূমির উপর রাখিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু আসল খাওয়াটা আর হইল না। বোধ করি এত সহজে পরাভব স্বীকার করিতে তাহার আত্মমর্য্যাদায় বড়ই বাজিতেছিল।

এদিকে অপর পক্ষ একেবারে নাছোড়বান্দা!

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া মলিনা আর এক চাল চালিল।

রেণুর হাত হইতে মোটর-গাড়িটি লইয়া যথাস্থানে উহা স্থাপন করিয়া সে বলিল—"কি হবে ছাই এ মোটর গাড়ি নিয়ে! এত আর সত্যিকারের মোটর গাড়ি নয়। তার চেয়ে, এই ডলি পুতুলটা তুই নেরে রেণু। কেমন মজার পুতুল এটা জানিস? শুইয়ে দিলেই এটা চোখ বুজে থাকে; আবার দাঁড় ক'রে দাও, এক্ষুণি চোখ মেলে চাইবে, আর বলবে—'মা, মা'! কি মজার পুতুল, নারে? নিবি ওটা?"

রেণু সাগ্রহে চেঁচাইয়া উঠিল—"নেবো, নেবো কাকীমা, আমি ও পুতুল নেবো।"

জননীর এই সাংঘাতিক প্রস্তাবে এবং শ্রীমতী রেণুবালার এবম্বিধ কলঙ্কজনক "পরদ্রব্যেষু সন্দেশবৎ" আচরণ দেখিয়া পাণিনির অন্তরাত্মা হায় হায় করিয়া উঠিল। আর এক তিল বিলম্ব বিপজ্জনক। মোটরখানা কোনো প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু আবার একি নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত। আত্মমর্য্যাদা উপস্থিত নিজের চরকায় তৈল প্রয়োগ করুক।

চট্ করিয়া বাটিটা মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া শ্রীমান পাণিনি অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং শূন্য বাটিটা ঠন্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া, উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে, সে তাহার 'বাপুজী'র নিকট ফিরিয়া গেল।

শশীবাবু পরাজয়ক্লিষ্ট পুত্রের ক্ষুণ্ণ বদন লক্ষ্য করিয়া অন্তরে আঘাত পাইলেন। খোকাকে সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনার সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার পানু বড়ো লক্ষ্মী ছেলে।" তাহার পর ধমকের সুরে—"হ্যাঃ, পানুর ডলি পুতুল আবার রেণুকে দিতে চায়! যে দেবে, তার হাড় গুঁড়ো করে ফেলব না। খবরদার, পানুর পুতুল-টুতুলে হাত দিও না বলছি। হাত কেটে ফেলব! পানু কেমন আমার কথা শুনে আপন হাতে দুধটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্লে!"

কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া মলিনা শেল্‌ফের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তৎপর অঞ্চল হইতে দু'টি পয়সা খুলিয়া, রেণুর দুই হাতে দিয়া বলিল—"যাওত মা, রুণু, ঝুণু, নেরু, টুলটুল—সবাইকে দেখাওগে দুটো পয়সা পেয়েচ।"

শ্রীমতী রেণুবালা অর্দ্ধআনা ক্যাশ হস্তগত করিয়া ও 'যথালাভ' মনে করিয়া আনন্দে একেবারে 'গদগদ' হইল। তবে তাহার কাকীমার সমস্ত দানেরই অনিত্যতা সে এতক্ষণে একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিল। মোটর আসিল, মোটর আবার শেল্‌ফের 'গেরাজে' প্রবেশ করিল; ডলি-পুতুল হস্তগত হইতে না হইতে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া পলকহীন নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। কি জানি, সম্প্রতিলব্ধ পয়সা দুটিও যদি পুনরায় তাহার কাকীমার অঞ্চলগত হয়, তবে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। বুদ্ধিমতী মেয়েটি এই প্রকার সাত পাঁচ ভাবিয়া সত্বর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

রেণু পলায়ন করিলে, পুত্রের নিকটে আসিয়া মলিনা সহাস্য মুখে গান ধরিল—

"পানু বড় ভালো রে ভালো,
আরও দুদু ঢালো রে, ঢালো,
তাতে চিনি একটু দিয়োগো, বাপুজী,
নইলে, পানু দুদু খাবে না, খাবে না।

কেমন, পেটটি, ভরেচে এবার? কার পেট ভরল,—তোমার না আমার?"

"তোর।"

"ও বাবা, আবার তুই তোকারি হচ্ছে যে, রাগ হয়েচে বুঝি বাবুর? তা'ত হবেই। আমার পেটটি যখন ভরেচে, তখন রাগ ত' হবারই কথা। যাক্, আর ভাবনা নেই, আজ চৌপর দিন আমার আর কিছু না খেলেও চলবে!—আচ্ছা, তা যেন হলো; এখন বলো দেখি, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে, কত কষ্ট করে, তোমাকে খাইয়ে আমার পেট ভরালুম, তা' আমিই ভালো, না ঐযে তোমার 'বাপুজী' যিনি চুপটি করে বসে তামাসা দেখলেন, আর মুচকে মুচকে হাসলেন,—ঐ বাপুজীই ভালো? বলো কে ভালো,—আমি, না বাপুজী?

"বাপুজী ভালো।"

"আর আমি?"

"তুই লুলুভূত!"

আপনার উত্তর শুনিয়া খোকা আপনিই হাসিয়া কুটিকুটি।

সেই শিশুসুলভ চপল হাসির সহিত পিতামাতার উচ্চহাস্য মিলিত হইয়া কক্ষটিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীমান পাণিনির দক্ষিণ গণ্ডে শশীবাবুর ও বাম গণ্ডে মলিনার অজস্র স্নেহচুম্বন চৈত্রের করকাধারার ন্যায় সশব্দে নামিয়া আসিল।

পৃথিবীতে কত মুসলমান ?

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইবার সময় মৌলানা মহম্মদ আলি প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে ভারতীয় মুসলমানদের দাবী সম্বন্ধে এক পত্র লিখেন। তন্মধ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা আছে :—

A community that in India alone must now be numbering more than 70 millions can not easily be called a minority in the sense of Geneva minorities, and when it is remembered that this community numbers nearly 400 millions of people throughout the world, whose ambition is to convert the rest of mankind to their way of thought and their outlook on life, and who claim and feel a unique brotherhood, to talk of it as a minority is a mere absurdity.

অর্থাৎ যে সম্প্রদায় কেবল মাত্র ভারতেই ৭ কোটীর অধিক তাহাকে জাতি-সঙ্ঘের ভাষায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলা চলে না, বিশেষ করিয়া সেই সম্প্রদায় পৃথিবীতে ৪০ কোটী এবং সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিজ মত ও নিজ ভাবাপন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। এই সম্প্রদায়কে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বলা বাতুলতা মাত্র।

উপরি উদ্ধৃত উক্তি হইতে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ কোটী বলিয়া দাবী করিবার কারণ ও হেতু স্পষ্টই বুঝা যায়। লাহোর হইতে প্রকাশিত ত্রৈ-মাসিক মুস্লিম রিভাইভাল পত্রিকায় পৃথিবীর তাবৎ মুসলমানের সংখ্যা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে :—

According to estimates from Muslim sources, the Muslim population of the world stands at 400 millions.

অর্থাৎ মুসলমানদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ৪০ কোটী। গত আষাঢ় মাসের মাসিক মোহাম্মদীতে মৌলানা আক্রাম খাঁ মুস্লিম রিভাইভালের অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া পরোক্ষভাবে উহাই সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা কত ? পৃথিবীর সব দেশে আদম-সুমারী হয় না। এই সব দেশের লোক-সংখ্যা বা তাহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত মাত্র। তবে এই সিদ্ধান্ত যে একটা আন্দাজী অনুমান তাহা নহে, বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া সত্য ও প্রকৃত তথ্য জানিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারই ফল মাত্র।

ইংরাজী ১৯২৪ সালের ডিসেম্বার মাসে প্যালেষ্টাইনের জেরুসালেম সহরে নিখিল পৃথিবীর মুস্লিম কন্‌ফারেন্সে সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ ধরিয়া লওয়া হয়। বিলাত হইতে প্রকাশিত মোস্লেম ওয়ার্ল্ড নামক পত্রিকায় ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে এস্, এম্, জোয়েমার সাহেব **"A New Census"** প্রবন্ধে সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৫০ লক্ষ সাব্যস্ত করেন। ফরাসী ভাষায় লিখিত *L' Annuair du Monde Mussalman*, ল্যানুয়ার দ্য মন্দ্ মুসলমান পত্রিকায় সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২২ কোটী ৬২ লক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। H. Lawmens S. J প্রণীত *L' Islam—Croyances et Institutions* নামক গ্রন্থে উক্ত সংখ্যা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চার্চ্চ এসেম্ব্লী কর্ত্তৃক প্রকাশিত *The Call from the Moslem World* নামক পুস্তকে পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৫০ লক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ইংরাজী ১৯৩২ সালের *Whittaker's Almanack*-এ সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২০ কোটী ৯০ লক্ষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৯৩ সালে **American Statistical Society** সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ১৭ কোটী ৬৮ লক্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। **Mulhall,** মুলহল সাহেব তাঁহার *Dictionary of Statistics* নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থে সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২০ কোটী ৯ লক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ইংরাজী ১৯৩২ সালের *Statesman's Year Book*এ পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২৫ কোটী ৯৩ লক্ষ বলিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু এই সংখ্যা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। *Statesman's Year Book* প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসে লণ্ডন সহর হইতে প্রকাশিত

হয়। ইহাতে ইংলণ্ডের কোন কথা বৎসরের পর বৎসর ভুল থাকিলে ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। পার্লামেণ্টের ভোটের জন্য পূর্ব্বে বৎসরে দুইবার—একবার জানুয়ারী মাসে, অপর জুলাই মাসে ভোটারের—তালিকা তৈয়ারী হইত। কিন্তু এক্ষণে অনাবশ্যক খরচা কমাইবার উদ্দেশ্যে গত ১৯২৬ সাল হইতে বৎসরে একবার করিয়া ভোটারের তালিকা তৈয়ারী হয়। অথচ ইংরাজী ১৯৩২ সালের *Statesman's Year Book*এ দেখিতে পাই, যে,

Two registers of electors must be prepared each year, one in the spring and the other in autumn, except in Irelend where only one is required.

অর্থাৎ দুইবার করিয়া—একবার বসন্তে, অপর শরৎকালে ভোটারের তালিকা প্রতি বৎসর তৈয়ারী করা হয়। কেবলমাত্র আয়ারলণ্ডে একবার করিয়া করা হয়। *Statesman's Year Book*এর সম্পাদকগণ যদি নিজের দেশের ব্যবস্থার কোন খবর না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকাশিত বিদেশের তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক।

উপরে লিখিত বিভিন্ন হিসাব হইতে পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে, উহা কোন ক্রমেই ৪০ কোটী হইতে পারে না। আমরা মুস্লিম কন্‌ফারেন্স যে অঙ্ক প্রামাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম ; অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কত মুসলমান ও সেই সেই দেশের মোট অধিবাসীদের সংখ্যা কত তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল। পাঠকগণের সুবিধার জন্য কোন্ দেশে মুসলমান শতকরা কত তাহা কষিয়া দেখান হইল। সংখ্যা সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলি পূর্ব্বোক্ত *The Moslem World* নামক পত্রিকা হইতে গৃহীত হইল।

দেশ	অধিবাসী	মুসলমান	শতকরা
	'০০০	'০০০	
রুশিয়া (ইউরোপ ও এসিয়া)	১৩৬,০০০	২০,০০০	১৪·৭
যুগোস্লাভিয়া	১২,০০০	১,৩০০	১০·৮
আফ্রিকা			
মিসর	১২,৭৫০	১১,৬৫৮	৯১·৪
কঙ্গো	১১,০০০	১,৭০০	১৫·৪
আবিসিনিয়া	১০,০০০	৩,০০০	৩০·০
ইটালী-অধিকৃত লাইবিয়া, ঈরীট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড	২,০০০	১,৬০০	৮০·০
ফরাসী-অধিকৃত উত্তর আফ্রিকা, আলজিরিয়া, টিউনিস ও মরক্কো	১৩,০০০	১২,০০০	৯২·৩
জাঞ্জিবার	১৯৬	১৮৩	৯৩·৪
সুদান ও সোমালিল্যাণ্ড	৫,০০০	২,০০০	৪০·০
ইউগাণ্ডা	৩,০৭১	৭৩	২·৩
কেনিয়া	১,৬৩০	৪২৭	১৬ ২
টাঙ্গানাইকা	৭,৬৫৯	১,২৭৬	১৬·৬
নাইসাল্যাণ্ড	১,২০১	৭৩	৬ ০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮,০০০	৬০	০·৭
নাইজিরিয়া	১৬,২৫০	১০,৮৩৩	৬৬·৬
গাম্বিয়া, গোল্ড-কোষ্ট ও সিয়েরা লিয়ন	৩,৬৫২	৪৩০	১১ ৭
টোগোল্যাণ্ড ও কেমেরণ	৩,৬৮১	১,০৭৮	২৯·২
এসিয়া			
মালয়	৩,৩৫৮	১,৬৯৪	৫০·৪
ভারতবর্ষ	৩১৮,৯৪২	৭১,৫০৫	২২·৪
আরব	৫,০০০	৫,০০০	১০০·০
পারস্য	১০,০০০	৯,৩৫০	৯৩·৫
মেসোপোটেমিয়া	২,৮৪৯	২,৬৪০	৯২·৩
প্যালেষ্টাইন	৭৭০	৬০০	৭৭·৯
সিরিয়া	৩,৪০০	৩,০০০	৮৮·২
তুরস্ক	৮,৯৬১	৮,৩২১	৯২·৮
আফগানিস্থান	৬,৩৮০	৬,৩৮০	১০০·০
চীন	৪২৮,০৩১	১০,০০০	২·৩
ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারত	৪৯,৩০৩	৩৯,০০০	৭৯·৫

[উপরোক্ত হিসাব ১৯২৩ সালে ১৯২১ সালের আদম-সুমারীর উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে]

উপরে উদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় যে *The Moslem World*এর লেখক মুসলমানের দিকে টানিয়া মুসলমানের সংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আরব দেশে বহু ইহুদী ও ও কাফ্রীর বাস সত্ত্বেও আরবের সমস্ত অধিবাসীদিগকে তিনি মুসলমান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ইংরাজী ১৯২১ সালের আদম-সুমারীতে ভারতের মুসলমানের সংখ্যা ৬৮, ৭৩৫, ২৩৩

হয়। লেখক তথাপি বাড়াইয়া ৭১,৫০৫,০০০ ধরিয়াছেন। ইহার কারণ এইরূপ অনুমিত হয় যে বোম্বাই প্রদেশে বহু হিন্দু পীরের পূজা দেয় কিন্তু অপর সমস্ত ব্যাপারে, আচারে,ব্যবহারে তাহারা সম্পূর্ণ ষোল আনা হিন্দু, দেবদেবীর পূজাদিও করিয়া থাকে, তথাপি লেখক সংখ্যাসম্বন্ধে সর্ব্ব সন্দেহ-নিরাকরণার্থ তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

কথা উঠিতে পারে ইংরাজী ১৯২১ সালে পৃথিবীর মোট মুসলমানের সংখ্যা উপরি উক্ত ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এক ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা ৬ কোটী ৮৭ লক্ষ স্থলে ৭ কোটী ৭৭ লক্ষ হইয়াছে। যেমন ভারতবর্ষে বা অন্যান্য স্থানে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনি মধ্য এসিয়ায়, তুর্কীস্থানে জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সোভিয়েট রুশিয়ার অত্যাচারে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। চীন দেশের মোট লোকসংখ্যা উপরি উক্ত হিসাবে ৪২'৮০ কোটী ধরা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে আংশিক গণনার উপর নির্ভর করিয়া প্রফেসার উইলকক্স (Willcox) ৩৪'২০ কোটী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমতে চীনা মুসলমানের সংখ্যাও খুব কমিয়া যাইবে। এইরূপ কমাবাড়ার ফলে বর্ত্তমানে মুসলমানের সংখ্যা কি দাঁড়াইবে সঠিক বলা যায় না বটে, কিন্তু তাহা ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ হইতে বেশী তফাৎ হইবে না।

এই ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ মুসলমান সকলেই যে আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ ষোল আনা মুসলমান তাহা নহে। কেহ কেহ আবার নামে মাত্র মুসলমান। *The Call from the Moslem World* গ্রন্থ-প্রণেতার মতে,

The converts from Animism to Islam are mainly in Africa and the Malay Archipelago—their religion is strongly coloured by fetishism and magic.

অর্থাৎ আফ্রিকা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের বেশীর ভাগ মুসলমান প্রেত-পূজকের রূপান্তর—তাঁহাদের ধর্ম্ম অনেক স্থলে প্রেত-পূজার ও ম্যাজিকের দ্বারায় কলঙ্কিত। উক্ত লেখকের মতানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের মুসলমান ও তাঁহাদের সংখ্যা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

১। সুন্নী (হানাফী, মালিকী, সাফেই ও হানবালিসী এই ৪ সম্প্রদায়ের)	১৫'১০ কোটী
২। সিয়া	১'৩০ কোটী
৩। আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রেতপূজক জাতিসমূহ, যাঁহারা নামে মাত্র মুসলমান হইয়াছেন	৬'০০ কোটী
৪। নব্যভাবাপন্ন (সম্ভবতঃ)	'১০ কোটী
	২৩'৫০ কোটী

মালয় প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কিরূপ মুসলমান তৎসম্বন্ধে *Encyclopædia of Religion and Ethics* নামক ধর্ম্ম ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত কোষ-গ্রন্থে লিখিত আছে যে :—

The grotesquely slight influence, however, that is really exercised by Mahomedanism on the wild races of the Malayan jungles is best evidenced by the statement of these tribes that Muhammad, the Prophet of God is the wife of the Supreme deity.

অর্থাৎ মালয়ের জঙ্গলী জাতিসমূহের উপর মুসলমান ধর্ম্ম কত অল্প ও বিকৃত প্রভাব স্থাপন করিয়াছে তাহা উক্ত জাতি সমূহের বিশ্বাস—ভগবানের প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ পরমেশ্বরের স্ত্রী, এই হইতেই বেশ বুঝা যায়। মালয় প্রভৃতি স্থানের মুসলমানেরা কিরূপ মুসলমান তাহা উপরি উদ্ধৃত উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়। *The Call from the Moslim World*-প্রণেতা মালয় প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদিগকে প্রেতপূজক মুসলমান বলিয়াছেন ; প্রকৃতপক্ষে মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের বহু মুসলমান সরিয়াৎ অনুযায়ী চলেন না বা লৌকিক ব্যবহারে সরিয়াৎ মানিয়া চলেন না। যেমন উত্তরাধিকারী-নির্ণয়ের সময় **matriarchal family law** বা মাতৃ-পরিচয়ে বংশধারার ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী ও স্ত্রীর সমগ্র সম্পত্তি উভয়ে বিভাগ করিয়া লয়েন। এইরূপ বহু অ-মুসলমানী আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। চীনা মুসলমানগণ নামে মাত্র মুসলমান, তাঁহাদের **family law** বা কুলাচার এবং আচার ব্যবহার অন্য চীনাদের ন্যায়।

এক্ষণে আমাদের ঘরের নিকট ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কে কিরূপ মুসলমান, তৎসম্বন্ধে দুই একটী নমুনা দেওয়া যাউক। মুসলমান নেতাদের মুখে আজকাল প্রায়ই বেলুচিস্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তথাকার মুসলমানদের সম্বন্ধে ১৯২১ সালের বেলুচিস্থান আদম-সুমারীর রিপোর্টে এইরূপ লিখিত আছে :—

With the common mass Islam is merely an external badge that goes awkwardly with the quaint bundle of superstitions which hold them in thrall. The Zikri, numbering 28 thousand, substitute the Mahdi for Muhammad in their *Kalima*—the very negation of Muhammadanism.' (আদম-সুমারীর রিপোর্ট, ৫৭ পৃঃ)

অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিকট ইশ্লাম একটী বহিরাবরণ মাত্র ও তাহারা যে কুসংস্কার-সমষ্টির দাস তাহার সহিত ইহা খাপ খায় না। জিক্‌রিরা, সংখ্যায় ২৮ হাজার, কল্‌মা পড়িবার সময় মহম্মদের পরিবর্ত্তে মাহ্‌দীর নাম করে। মুসলমান ধর্ম্মের মূল সূত্রের উল্টা কার্য্য করে।

গেট সাহেব লিখিত ভারতবর্ষের ১৯১১ সালের আদম-সুমারীর রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে গুজরাটে কয়েকটি সম্প্রদায় আচারে ব্যবহারে না হিন্দু না মুসলমান, কিন্তু মুসলমান বলিয়া সেন্সসে পরিগণিত হইয়াছে। যেমন মাটিয়া কুন্‌বীরা প্রধান প্রধান সংস্কারের সময় ব্রাহ্মণ ডাকে, কিন্তু পিরানা সাধু ইমাম সাহ ও তাঁহার চেলাদের মতাবলম্বী এবং খাঁটী মুসলমানদের ন্যায় মৃত্যুর পর গোর দেয়। সেমদাসেরা বিবাহ সময়ে হিন্দু এবং মুসলমান পুরোহিত উভয়কেই নিযুক্ত করেন। মোম্‌নারা ত্বক্‌চ্ছেদ্ করে, মৃত্যুর পর গোর দেয়, গুজরাটী কোরান পাঠ করে, কিন্তু অপর সমস্ত বিষয়ে হিন্দু আচার ও পদ্ধতি অনুসরণ করে।

যুক্ত প্রদেশের সেন্সস-সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ব্লাণ্ট সাহেব বলেন যে, মালকানারা রাজপুত, জাঠ ও বেণিয়া বংশ সম্ভূত, তাহারা নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ও সাধারণতঃ নিজেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিনামে পরিচয় দেয়, এবং কদাচিৎ মালকানা নাম স্বীকার করে। তাহাদের ডাক-নাম হিন্দু, অধিকাংশ স্থলেই তাহারা হিন্দু মন্দিরে উপাসনা করে; দেখাসাক্ষাৎ হইলে 'রাম! রাম!' বলিয়া প্রতিনমস্কার করে এবং কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করে। অপর পক্ষে, তাহারা সময়ে সময়ে মস্‌জিদে যায়, ত্বক্‌চ্ছেদ করে ও মৃতদিগকে কবরস্থ করে। মুসলমানের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব থাকিলে একত্রে আহার করে এবং 'মিঞা ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধিত হইতে ভালবাসে। তাহারা স্বীকার করে যে তাহারা হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণ। সম্প্রতি উহাদের মধ্যে কতক কতক একেবারেই ইশ্লামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইবার নিজ বঙ্গদেশের গোটাকতক উদাহরণ দিব। পাঠকগণের মধ্যে কেহ যেন মনে না করেন ইহা আমাদের নিজের কথা। সরকারী রিপোর্ট বা সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত *District Gazetteer* হইতে তথ্যগুলি সংগৃহীত। যশোহর জেলার ছোটভাসিয়া মুচীরা একটী ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায়; তাহারা ময়লা সাফ করে বলিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছে। তাহারা কালি ও সত্যনারায়ণ পূজা করে। মৈমনসিংহের নেত্রকোণা ও ঈশ্বরগঞ্জের মুসলমানরা ত্বক্‌চ্ছেদন করেন না এবং হিন্দুদিগের ন্যায় সন্তান-প্রসবের পর ষেটের পূজা করে। মৌলভী আব্দুল ওয়ালি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্নালে বালিয়াদিঘীর ফকিরী সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলেন যে, "তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার বহু পরিমাণে ইশ্লাম-বিরুদ্ধ।" রাজসাহী ও দিনাজপুরের সীমান্ত-স্থানের মুসলমান চাষীরা সরিয়াৎ অনুযায়ী চারটী বিবাহ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, সাধারণতঃ ছয়টী বিবাহ করেন। রাজসাহীর নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ছেলেদের অসুখ হইলে পদ্মপুরাণ পাঠ করিয়া শুনান হয় ও গো-মড়ক উপস্থিত হইলে "গোরক্ষার লাড্ডু" গীত করা হয়। বিবাহের সময় মঙ্গলচণ্ডীজয় পূজা করা হয়। উত্তর বঙ্গ, পূর্ণিয়া ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের আব্দালেদের হিন্দু হাড়ীর ন্যায় পেশা। তাহারা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য ও অপর মুসল-মানেরা তাহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করেন না। তাহাদিগকে মসজিদে ঢুকিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীদের সহিত একত্রে উপাসনা করিতে দেওয়া হয় না। সাধারণ গোরস্থানে কবর দিতে দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে আরও অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে করা গেল না।

যাহারা অপর কর্ত্তৃক মুসলমান বলিয়া গণ্য বা যাহাদিগকে মুসলমানেরা স্বশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন, এরূপ সমস্ত মুসলমানদিগকে লইয়াও বিশেষজ্ঞগণের মতে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ। এই সংখ্যা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে বা স্থির আছে বলা বড় শক্ত। সেজন্য আমরা উপস্থিতের জন্য সমগ্র পৃথিবীর মোট মুসল-মানের সংখ্যা ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

বিচিত্র জগৎ

ইউকাতানের অরণ্যে প্রাচীন যুগের নগরের ধ্বংসাবশেষ

গত শতাব্দীর প্রথমেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে কোনো উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা আমেরিকা মহাদেশে ঘটে নাই। যাঁহারা আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার জন্য অনুসন্ধানে
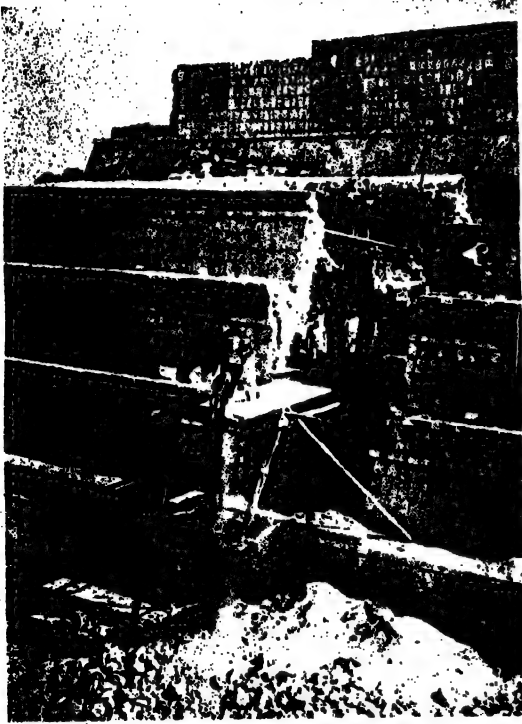
চিচেন ইৎসার খনন-কার্য্য।

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে দুই একটা ভগ্ন মৃৎপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, পাথরের হাতুড়ী বা বর্শার টুক্‌রা ছাড়া অন্য কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই—সুতরাং তাঁহারা বিশাল আমেরিকা মহাদেশের প্রাক্-কলম্বীয় যুগের সভ্যতাকে সংক্ষেপে 'প্রস্তর যুগের সভ্যতা' বলিয়া কর্ত্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন এবং অধিকতর গৌরবের সহিত ইহা প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই যে, জগতের যত কিছু সভ্যতা, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এ সবেরই উৎপত্তি-স্থান প্রাচীন মহাদ্বীপ অর্থাৎ এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে একদল ঐতিহাসিক আবির্ভূত হইলেন, তাঁহারা দেখিলেন, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্ সভ্যতাকে এমন ভাবে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের সুসভ্য প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে নিজেদের একটা সম্পর্ক খাড়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কেহ বলিলেন, প্রাচীন ফিনিশীয় অথবা মিসরীয় জাতিদের সঙ্গে আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ানদের যোগ আছে, কেহ বলিলেন, ইহারা অধুনালুপ্ত আট্‌লান্টিস্ জাতির সহিত সম্পর্কিত—ইত্যাদি। এই দলের মতবাদ বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো ভুল নাই যে ইণ্ডিয়ান সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রাচীনতা ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তাহা অকুতোভয়ে স্বীকারও করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি আমেরিকায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে তথায় যে একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিল ইহা তখনকার লোকে ভাবিতেও পারিত না।
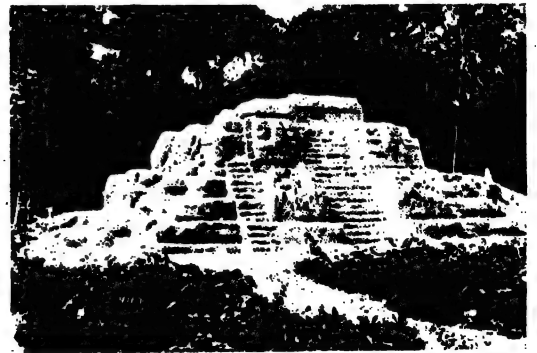
ওয়া-শাক্-তুন্-এ আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

সৌভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমানে ইতিহাসের আলোচনা-রীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উন্নততর অনুসন্ধান-রীতির ফলে গত শতাব্দীর এই উভয় মতবাদই বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত তো

হইয়াছেই বরং এমন সময় আসিয়াছে যখন আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।
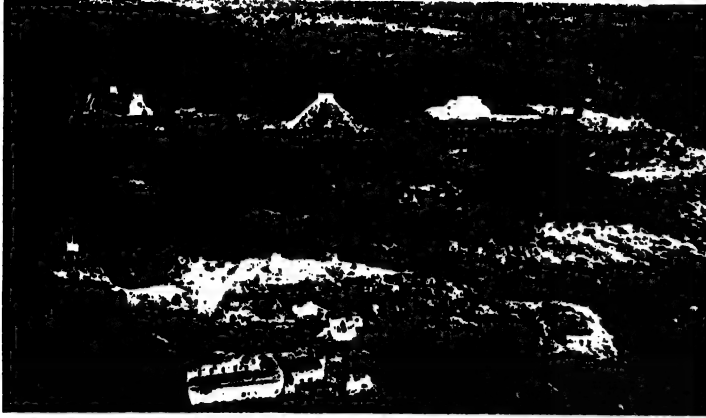
মায়া-সভ্যতার প্রধানতম কেন্দ্র: চিচেন ইৎসা—বিমান দৃশ্য।

এই অনুসন্ধান বিষয়ে যে কয়েকটি সুবিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে অগ্রণী—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তন্মধ্যে অন্যতম। ইহাঁরা চল্লিশ বৎসরেরও উপর হইল দেশের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহাঁদের আগ্রহে, আদর্শে ও অর্থানুকূল্যে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে—বিখ্যাত **Peabody Museum** তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা দুই চারিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নাই—এখন প্রতি বৎসরে নানা বিভিন্ন দেশীয় স্বচ্ছল ধনী ব্যক্তি ও ব্রেজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু ও যুক্ত-রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট এই অনুসন্ধান-কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন—উপযুক্ত নেতার অধীনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দল প্রেরিত হয়। নিবিড় বনভূমি রীতিমত জরীপ করানো হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য জাহাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়, বড় বড় খবরের কাগজগুলি এ সম্বন্ধে এতটুকু খবর পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে—জনমত-গঠনে সাহায্য করে।

গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সেই সকল মালমশলার সাহায্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইতিহাসের সৌধ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

এই সভ্যতার মূলে ছিল কৃষি। কৃষি-কর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইঙ্কা, মায়া ও আস্‌টেক্ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভুট্টা বা মকাই (**maize, zea mays**) তখনকার যুগে আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান খাদ্যশস্য ছিল এবং যেখানে যেখানে এই জাতীয় যবের চাষের সুবিধা ছিল, সেই স্থানেই এক এক বিশেষ ধরণের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সবের উৎপত্তি কোথায় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে—কেহ বলেন পেরু, কেহ বলেন মেক্সিকো দেশের মালভূমিতে—উৎপত্তি-স্থান যেখানেই হউক—যে জাতীয় বন্যঘাস ইহার আদি পুরুষ, তাহা এখনও দক্ষিণ আমেরিকার
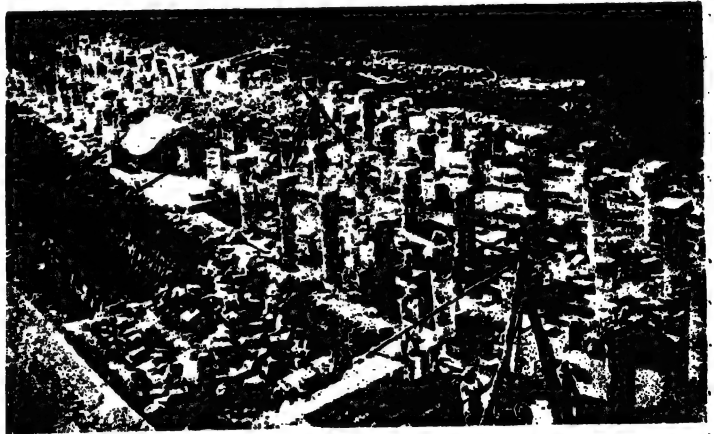
খনন-ক্ষেত্রের উত্তরাংশের দৃশ্য।

বহু স্থানে নিবিড় ভাবে জন্মে, আণ্ডিজ পর্ব্বতের অধিত্যকা ও মেক্সিকোর মালভূমি এই ঘাসে পরিপূর্ণ।

তাঁহাদের মত এই যে টল্‌টেক্, আস্‌টেক বা মায়া সভ্যতার জন্মস্থান আমেরিকার বাহিরে কোথাও নয়, এই দেশেই,

এমন কি বোধ হয় মেক্সিকোর এই মালভূমিরই আশে-পাশে, যেখানে এই যবের চাষের সুবিধা অত্যন্ত বেশী। শিকার ছাড়িয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ যেখানে কৃষিজীবী হইল প্রাচীন আমেরিকান্ সভ্যতার সূত্রপাত হইল সেখানে।
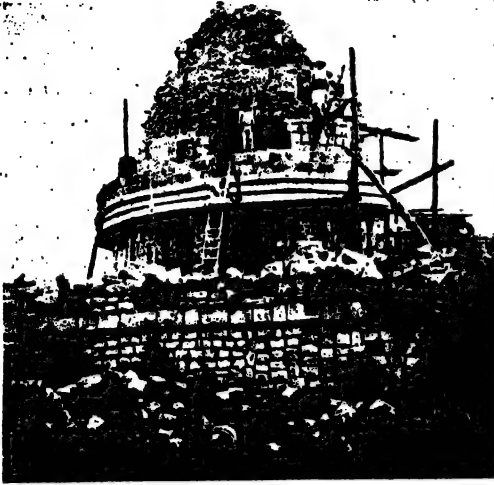
চিচেন ইৎসার জ্যোতিষ-মন্দির-(caracol)-সংস্কার।

মানুষে ঘর বাঁধিল, বনে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিল। সকল সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার মূলে যে অমূল্য জিনিসটি বর্ত্তমান, অর্থাৎ অবকাশ—মানুষের ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ জীবনে এইখানে বোধ হয় সেই নিরুপদ্রব অবকাশ সর্ব্বপ্রথম দেখা দিল। এই অবকাশের ফলে মানুষ নিজেকে চিনিতে শিখিল, জগৎকে নূতন চোখে দেখিতে শিখিল।

কৃষিকর্ম্মের মধ্যে আদিম মানুষে যে বিস্ময় ও রহস্যের সন্ধান পাইল, এতকাল পরে আজ আমরা তাহার ধারণাও করিতে পারিব না। কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া নানা উৎসব, অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিল—নানা দেবতার সন্ধান পাওয়া গেল—কেহ সুদৃষ্টি দেন, কেহ শস্যক্ষেত্রকে ফলবান করেন; এই ভাবে নানা নব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। দেবতাকে মন্দিরে স্থাপিত করিয়া পূজা করিবার প্রয়োজন হইল—কারণ তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে তবেই তো প্রতি বৎসরে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

কুইকুইলকো পিরামিড্ ইণ্ডিয়ান্ স্থাপত্য শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা একমত। মেক্সিকো সহর হইতে বারো মাইল দক্ষিণে সান্ ফার্ণাণ্ডো নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামের উপকণ্ঠে এই পিরামিডের ধ্বংসস্তূপ অবস্থিত। মেক্সিকো গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ ম্যানুয়েল গেমিও এই স্তূপটি আবিষ্কার করেন।

এই পিরামিডের উচ্চতা ছিল এক সময়ে ৫২ ফিট্ ও ব্যাস প্রায় ৪১২ ফিট্। পিরামিডটি অব্যবহৃত ভাবে কিছুকাল পড়িয়া থাকিবার পরে নিকটবর্ত্তী একটা আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত হইয়া যায়—(জমি হইতে ২৫ ফিট পর্য্যন্ত)—বর্ত্তমানে ইহার চূড়াটি এই জমাট লাভার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে। সুতরাং পিরামিডের বয়স নির্ণয় করিতে হইলে এখন আর অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না—ইহা যে এই লাভাস্রোতের অপেক্ষা প্রাচীন, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তো বটেই। ভূতত্ত্ববিদ্যা এখানে প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে।

কুইকুইলকো পিরামিড্ এইজন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা এই পিরামিডের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কি বলে, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯২৩ সালে ডাঃ বায়রণ কামিংস্-এর অধীনে একটি দল এখানে প্রেরিত হয়—এই দলের সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ ডার্টন।

ভূমিতল হইতে পূজাবেদী-উদ্ধার।

এই দলটি অনেক দিন এখানে থাকিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে ডাঃ বায়রণ কামিংস্ এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন—প্রবন্ধটিতে তিনি ডাক্তার ডার্টনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, কুইকুইলকো পিরামিডের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এই লাভাস্রোতের বয়স

অন্ততঃ তিন চার হাজার বৎসর। সুতরাং পিরামিডের বয়স ন্যূনকল্পেও তিন চার হাজার বৎসর।

ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। পিরামিডটির উত্তর দিকে কিছুদূরে সান্ আঞ্জেল নামক আর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি প্রাগৈতিহাস যুগের সমাধি-স্থান সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সমাধি-স্থানটিও উপরোক্ত লাভাস্রোতে চাপা পড়িয়াছিল। মাটীর তলায় পাথরের নুড়ি ও জমাট লাভার নীচে আমেরিকার সুপ্রাচীন অধিবাসীদের এই সকল কঙ্কাল বহুযুগ পরে আবার দিনের আলোয় প্রকাশ পাইয়াছে। হয় তো যাহাদের এই কঙ্কাল, তাহারাই কুইকুইলকোর পিরামিড গড়িয়াছিল, কোন বিস্মৃত দেবতার উদ্দেশে এইখানে তাহারা অর্ঘ্য নিবেদন করিত। তাহাদের সমাধির মধ্যে মাটীর বাসন, পাথরের ছুরি ও নানা আকৃতির ছোট ছোট মৃন্ময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—হয় তো ভূত ও অপদেবতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সকল দেবদেবীর পূজা তৎকালে প্রচলিত ছিল।

মেক্সিকোর মালভূমিতেই যে এই আদিম আমেরিকান সভ্যতার জন্ম এ বিষয়ে বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ নাই। এইখানে কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমে চারিদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে এক ধরণের নতুন ওষধি পাওয়া গিয়াছে যাহার দানা খাইয়া মানুষে জীবন ধারণ করিতে পারে। কৃষিকর্ম্ম এই ভাবেই বিস্তার লাভ করিল—কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া মায়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিল।

সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের একটা হিসাব রাখার প্রয়োজন অনুভূত হইল। কৃষিজীবী সভ্যতার পক্ষে ইহা তো না হইলেই চলিবার নয়। কখন কোন্ ঋতু আসে কোন্ ঋতু যায়, কখন বীজ ছড়াইতে হইবে, ফসল কাটিতে হইবে—চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির একটা মোটামুটি হিসাব—এসব তো চাই। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন পিরামিড্ গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইহাই। এগুলি জগতের প্রাচীনতম মানমন্দির। আজ এতকাল পরে ঠিকমত বুঝিতে পারিবার কথা নহে, আদিন মানব কিরূপে ইহার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিত—কালগতির হিসাব রাখিত, শস্য বপণের সময় হইয়াছে কিনা জানিতে পারিত।

চিচেন-ইৎসার খননে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর স্তূপ: বীরবৃন্দের মিলন মন্দির, Temple of Warriors—যুগ যুগান্তের এই ধ্বংস-স্তূপকে বর্ত্তমানে অপূর্ব্ব শ্রী দেওয়া হইয়াছে।

খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্বে মায়া জাতির এক শাখা দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে গিয়া দক্ষিণ গুয়াতেমালার ঘন অরণ্যে বসতি স্থাপন করে। এখানে বড় বড় সহর গড়িয়া উঠিল, নতুন ধরণের পিরামিড্ স্থাপিত হইল আর দেবমন্দিরের তো কথাই নাই। গুয়াতেমালার এই অঞ্চলে দেবমন্দিরের যে সকল ধ্বংস-স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সংখ্যায় দুই দশটা নয়—দুইশত পাঁচশত।

এই সকল দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে অদ্ভুত গঠনের স্তম্ভ গঠিত হইত ১৮০০ দিন অন্তর। এগুলিকে পাথরের পঞ্জিকা বলা যাইতে পারে। অধুনালুপ্ত মায়া চিত্রলেখের সাহায্যে ইহাদের গায়ে তৎকালীন প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সে হিসাবে এই স্তম্ভগুলি একাধারে পঞ্জিকা ও জাতীয় ইতিহাস।

এই সময়ে মায়া সভ্যতার উন্নতির সূত্রপাত হয়। বড় বড় রাজপ্রাসাদে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য উভয়বিধ শিল্পের সৌকর্য্য প্রদর্শিত হইতে লাগিল—নানা প্রকারের বনলতা, ওষধি ও প্রস্তরের সাহায্যে বহুবিধ রং প্রস্তুত করিয়া শিল্পীরা তদ্দ্বারা মন্দিরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল,—পালকের কাজ, কাঠ খোদাই, মৃৎপাত্র গঠন, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পেরও সমধিক উন্নতি সাধিত হইল। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াজাতিকে যে পণ্ডিতেরা 'the Greeks of the New World' বলিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি মনে হয় না।

মায়া-সভ্যতার এই গৌরবময়ের যুগের ইতিহাস ছড়ানো আছে—মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্দুরাস প্রভৃতি স্থানের নানা পিরামিড ও স্তম্ভের ধ্বংসস্তূপের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রলেখে, ছবিতে, দেবদেবীর মূর্ত্তিতে। এ সম্বন্ধে আজকাল যথেষ্ট অনুসন্ধান চলিতেছে, মেক্সিকো সহরের মিউজিয়মে এ যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

একটি অদ্ভুত প্রস্তর-নিদর্শন—সর্পের মুখ হইতে মনুষ্য-মুখের এই নিক্রমণ-কল্পনার অনেকে অনেক অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন সর্পকে পূজা করা হইত বলিয়া তাহাকে আত্মার অধিকারী হিসাবে এমন করিয়াই কল্পনা করা হইত।

এই যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই বিপদ আসিয়া জুটিল—কৃষিজীবী সভ্যতা কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এমন একদিন আসিবে যখন ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে দেশ আর সক্ষম হইবে না—বৎসরে বৎসরে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল, আবাদী জমির পরিমাণ ঠিকই রহিল—অথচ লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেল অনেক। বাড়্তি লোকে নূতন দেশ নূতন জায়গা-জমির সন্ধানে বাহির হইল, নতুবা স্বদেশে আর চলে না। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে মায়াজাতির এক শাখা ইউকাতান উপদ্বীপে উপনিবেশ করিল।

ইউকাতান এখনও যাহা, তখনও তাহাই ছিল। ঘন অরণ্যে সমস্ত দেশটা ভরা, মাঝে মাঝে ছোট বড় নদী, নদীর উভয় তীরে ও মোহানায় অরণ্য আরও গভীর—ম্যান্‌গ্রোভের বনে মোহানা দুর্গম, অনেকস্থলে স্রোত এত প্রখর যে নৌচালনা আদৌ নিরাপদ নয়। মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গে ভরা, জলেস্থলে নানা আকারের মৃত্যুদূত—বিষাক্ত সর্প, কুমীর, বিষাক্ত মাছ। দেশের সাহসী বীরেরা নব অভিযানে বাহির হইয়া এই সকল জিনিষ পাঠাইয়া সহর স্থাপন করিল, দেবায়তন উঠাইল, কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তম শতকের শেষভাগে মেক্সিকোর প্রাচীন সাম্রাজ্য ছাড়িয়া মায়াজাতি ইউকাতান উপদ্বীপে নব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দী মায়া-সভ্যতার আর এক গৌরবময় যুগ। ইহা স্থায়ী হয় তিন চারিশত বৎসর—প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। এ যুগের স্থাপত্য-রীতি প্রাচীন সাম্রাজ্যের রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নবীন সাম্রাজ্যের রাজধানী চিচেন-ইৎসা নগরের বিরাট ধ্বংসাবশেষ সংপ্রতি ইউকাতানের আরণ্য ভূভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছে—কত প্রাসাদ, দেবায়তন, ঘন জঙ্গলে দড়ির মত মোটা লায়ানা লতার আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল আজ পাঁচ ছয়শত বৎসর—কত মানমন্দির, গ্রন্থাগার, আশ্রম, বিচার গৃহ, প্রমোদ-শালা—বিস্মৃত জাতির এই সব ইতিহাস, এই সব নিদর্শন আজকাল দার্শনিক ভ্রমণকারীর মনে কত অদ্ভুত চিন্তাই না জাগায়!

নবীন সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ সময় রাজ্যমধ্যে গৃহবিবাদ সুরু হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়; যুদ্ধ ও রক্তপাতে দেশ ক্রমশ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে একশত বৎসর পরে স্পেনীয় আক্রমণকারীগণ যখন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল—বাধা দেওয়ার শক্তি আর তখন তাহার ছিল না।

১৯১৬ সালে Central American Expedition অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রাচীন সাম্রাজ্যের রাজধানী ওয়াশাক্‌-তুনের (Uaxactun) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

এই সহরে সর্ব্বপ্রাচীন মায়াস্তম্ভ ও লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভের তারিখ মোটামুটি ৬৮ খৃষ্টাব্দ। এই স্তম্ভ ও লেখের সবটাই শৈবাল ও তৃণে আচ্ছাদিত ছিল - ইহাঁরা সে সব পরিষ্কার করিয়া বহুকষ্টে লেখের পাঠোদ্ধার করেন।

'ওয়া-শাক্-তুন্' শব্দের অর্থ "অষ্টম প্রস্তর"। উপরোক্ত মায়াস্তম্ভের গাত্রে মায়া-পঞ্জিকার '৮' তারিখ উৎকীর্ণ আছে। ইহা সম্ভবতঃ শতাব্দী-জ্ঞাপক অঙ্ক। এখানকার প্রায় সমস্ত স্তম্ভের গায়ে যে পক্ষযুক্ত অজগর সর্পের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—নবীন সাম্রাজ্যের রাজধানী চিচেন্-ইৎসার কয়েকটি মন্দিরেও সেই সর্পের প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে—সম্ভবত; ইহা কোনো মায়া দেবমূর্ত্তি হইবে। স্তম্ভে উৎকীর্ণ তারিখ দেখিয়া মনে হয়, ওয়া-শাক্-তুন মায়া-রাজ্যের প্রাচীনতম নগর। বর্ত্তমানে কার্ণেগী ইন্‌ষ্টিট্যুট্ এখানে খনন কার্য্য চালাইতেছেন—এখনও কার্য্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, আশা করা যায় আর কয়েক বৎসর পরে কার্ণেগী ইন্‌ষ্টিট্যুটের উদ্যম সফলতা লাভ করিলে এই রহস্যময়, সুপ্রাচীন সভ্যতার বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

সুনিপুণ কারুকলাযুক্ত আলপনামণ্ডিত মর্য্যাদা-পরিচায়ক চাক্তি।
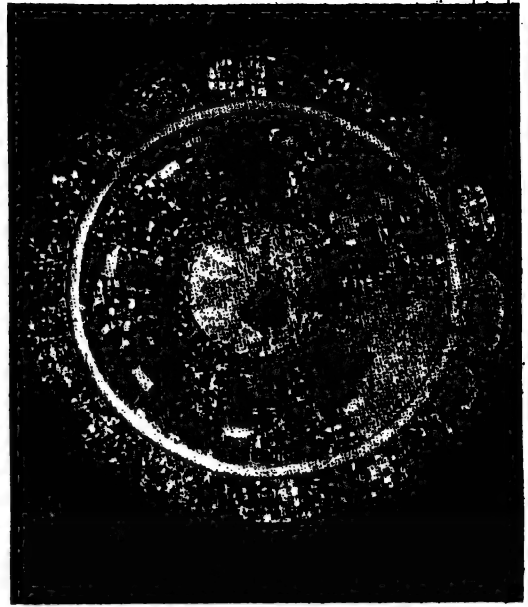
—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

সংস্কৃত-সাহিত্যে অশ্লীলতা

গত চৈত্রমাসের 'বঙ্গশ্রী' কাগজে শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস মহাশয় 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' নামক প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। অবশ্য ঐ বক্তব্য লেখকের প্রতিপাদ্য তথ্যের কোন প্রতিবাদ নহে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধটির মধ্যে যে পরিমাণ চিন্তাশীলতা ও লিপিকৌশল রহিয়াছে তাহাতে লেখকের বিরুদ্ধবাদীরাও শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া তাহার প্রতিপাদ্য তথ্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য-প্রকাশের বেগ অনুভব করিবেন না এমন আশা করা যায়। আমরা যে সম্বন্ধে বলিতে চাহি তাহা হইতেছে দুই একটি বিষয়ে আমাদের নিকট প্রতীয়মান লেখকের অনবধানতা। তাঁহার এই উপাদেয় প্রবন্ধটি এই সামান্য কারণে আশু সমালোচনার যোগ্য হইয়াছে। বিষয়টি এই :- লেখক বলিতে চাহেন, "ইংরেজীতে যাহাকে obscene বলে তেমন কোন অর্থে ইহার ('অশ্লীল' শব্দের) প্রয়োগ নাই (অলঙ্কার শাস্ত্রে) ; তেমন অর্থবাচক কোনও অপর শব্দও নাই" (বঙ্গশ্রী, চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ২২৯) এবং 'অশ্লীল শব্দের প্রাচীন অর্থ obscene নয় vulgar' (তদেব, পৃঃ ২৭০ পৃঃ)। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত আমাদের যে অতি স্বল্প পরিচয় আছে তাহাতে মনে হয় এই সকল উক্তি মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-দর্পণে'র সপ্তম পরিচ্ছেদে দোষ-নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে 'অশ্লীলতা' সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্তাদি দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমাদের এই কথা মনে হইয়াছে। দর্পণকারের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তিনি উড়িষ্যার লোক হইলেও সুদূর মহারাষ্ট্রে ও উত্তর পশ্চিমে এবং আমাদের বাঙলা দেশেও তাঁহার গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর রহিয়াছে।

দর্পণকারের মতে অশ্লীলতা দুই জাতীয় :—শব্দগত ও অর্থগত। শব্দগত অশ্লীলতা আবার ত্রিবিধ :—(১) ব্রীড়াজনক, (২) জুগুপ্সাজনক এবং (৩) অমঙ্গলজনক ('ব্রীড়াজুগুপ্সা মঙ্গলজনকত্বাৎ ত্রিধা')। ইহাদের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে—

(১) দৃপ্তারিবিজয়ে রাজন্ সাধনং সুমহৎ তব।' এখানে 'সাধন' শব্দ শিশ্ন-বাচী।

(২) 'প্রসসার শনৈবায়ুর্বিনাশে তন্বি তে তদা।' এখানে 'বায়ু' শব্দ অধোবায়ুর বাচক। মনে হয় এই দুই জাতীয় অশ্লীলতাকে vulgar এবং obscene দুইই বলা চলে।

(৩) 'শূরা অমরতাং যান্তি পশুভূতা রণাধ্বরে।' বীর পুরুষেরা রণ-রূপ যজ্ঞে পশুত্ব-প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পশুর মত বলিপ্রদত্ত হইয়া অমরত্ব-প্রাপ্ত হন। এই অশ্লীলতাকে ইংরেজীতে elegance বা proprietyর অভাব বলা যায়।

অর্থগত অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত দর্পণকার নিম্নোক্ত শ্লোকে দিয়াছেন :—

"উদ্দমেব প্রবৃত্তস্য স্তব্ধস্য বিবরৈষিণঃ।
যথাশু জায়তে পাতো ন তথা পুনরুন্নতিঃ॥"

ইহার অশ্লীল অর্থ টির জন্য টীকা নিম্নলিখিত প্রকারের :—

স্তব্ধস্য দৃঢ়মেঢ্রস্য বিবরং ভগং তদ্গামিনঃ পাতঃ সুরতানন্তরং নম্রতা উন্নতিঃ পুনরুদ্গমঃ।

ইহা হইতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির অশ্লীলতা এতই দুঃসহ মনে হয় যে ইহাকে obscene বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। 'অশ্লীলতা' ছাড়া দর্পণকার 'গ্রাম্যতা' নামক একটি দোষ উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা দুই প্রকার (১) শব্দগত ও (২) অর্থগত। ইহাদের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে :—

(১) 'কটিস্থে রমতে মনঃ'। এখানে 'কটিশব্দ' গ্রাম্য। দর্পণের টীকাকার তর্কবাগীশের মতে গ্রাম্য শব্দ মানে 'হালিক-সাধারণ-প্রসিদ্ধার্থকঃ শব্দঃ' অর্থাৎ যে শব্দ কেবল চাষাদের মধ্যেই প্রচলিত। ইহাকে নিঃসংশয়ে vulgar বলা চলে। (আধুনিক শব্দশাস্ত্রের বিধানে 'কটি' শব্দটি সংস্কৃতে এক জাতীয় slang)।

(২) "স্বপিহি ত্বং সমীপে মে স্বপিম্যেবাধুনা প্রিয়" এই দৃষ্টান্তটির টীকায় তর্কবাগীশ নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধার করিয়াছেন :—

"স গ্রাম্যঃ যরিরংসায়াং পামরৈর্যত্র কথ্যতে।
বৈদগ্ধ্যবক্রিমলয়ঃ হিত্বৈব বনিতাদিষু॥"

এই বচনানুসারে অর্থগত গ্রাম্যতার মানে হইতেছে খোলাখুলি ভাষায় সুরতাদি কার্য্যের প্রস্তাব, যাহা কেবল অশিক্ষিত হীন জনের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বক্রোক্তিতে বা ব্যঞ্জনামুখে হইলে তাহা আর অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইবে না। কাজেই অর্থগত গ্রাম্যতাকে vulgar এবং কিয়ৎ পরিমাণে obsceneও বলা যায়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের এবংবিধ দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে সংস্কৃতে অশ্লীল মানে কখনো vulgar, কখনো obscene এবং কখনো বা elegance অথবা proprietyর অভাব। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনার আদর্শে দেহধর্ম্ম বিশেষের সম্বন্ধে শেমীয় (Semitic) মনোবৃত্তিসুলভ কোন বিরূপতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। 'অশ্লীল' কথাটির যৌগিক (radical) অর্থেও এরূপ মতের পোষকতা আছে বলিয়া ভাবিতে পারা যায়। কারণ, অশ্লীল=ন+শ্লীল অর্থাৎ যাহা শ্লীল নহে; আর শ্লীল=শ্রীল (রলয়োরভেদঃ) =শ্রীযুক্ত অর্থাৎ যাহার শ্রী বা সৌন্দর্য্য আছে। অতএব এই দাঁড়ায় যে যাহার সৌন্দর্য্য আছে তাহাই 'শ্লীল', যাহার তাহা নাই উহাই 'অশ্লীল'। এই অর্থই সংকীর্ণতর হইয়া পরে অশ্লীল শব্দের 'সৌন্দর্য্যের হানিকর' মানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অবশ্য আধুনিক অর্থ আরো সংকীর্ণ অর্থাৎ 'যাহা যৌনাদি সম্পর্কের উল্লেখ বশতঃ শ্রবণের বা উল্লেখের অযোগ্য'। সে যাহাই হোক 'অশ্লীল' শব্দের যৌগিক অর্থে আমরা সু-নীতি ও কুনীতির কোন প্রসঙ্গ পাই না। যাহা শ্রীর বা সৌন্দর্য্যের অনুকূল নহে পরন্তু প্রতিকূল তাহাই 'অশ্লীল'। কিন্তু শ্রী বা সৌন্দর্য্য কোন্ বস্তু তাহা লইয়া পণ্ডিতজনের মধ্যে বিস্তর মতবাদের লড়াই আছে। সেই সমস্যার কোন শেষ মীমাংসার চেষ্টা বর্ত্তমানে আমাদের অভিপ্রেত নয়; আর এই সমস্যা হয়ত চিরকাল সমস্যারূপেই থাকিয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গে এই কথাটি বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে না যে, সৌন্দর্য্যবিচারের সময় দেশকাল পাত্র সম্বন্ধে খুব সচেতনতা চাই এবং যথাসম্ভব বস্তুসাপেক্ষ (objective) ভাবে সৌন্দর্য্যের বিচার করা প্রয়োজন। মনে হয় শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস মহাশয় স্থানে স্থানে তাঁহার দৃষ্টিকে বস্তুসাপেক্ষ রাখিতে পারেন নাই। যথা, তিনি মেঘদূতের 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ' এই টুকু উদ্ধৃত করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সমালোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দরবাবু বলিতেছেন, "উপমাটির মধ্যে নগ্নতা আছে; নারীর এমন একটি অঙ্গের বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে যাহা চিরদিন সুরুচির বিঘ্নকারক; তা ছাড়া, পৃথিবীর বিরাট দেহের যে অসংবৃত অবস্থা ইহাতে সূচিত হইতেছে তাহা আরও অশ্লীল" (বঙ্গশ্রী, চৈত্র, ৩৯, পৃঃ ২৭৩-৪)। এস্থানে লেখকের মতকে বস্তুসাপেক্ষ বলিবার কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কি বলিতে চাহেন যে আমাদের অর্থাৎ তথাকথিত পৌত্তলিক হিন্দুদের শত শত দেবী মূর্ত্তি ও তাহাদের স্তবগান সকল নিছক কুরুচির পরিচায়ক, আর লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে যুগ যুগ ধরিয়া কুরুচির দ্বারা কলুষিত করিয়া আসিয়াছেন? কারণ স্তনকে রূপদান, স্তনের বর্ণনা ত ঐ সকলের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে কোন কুরুচির প্রশ্ন উঠিতে পারে না; কারণ দেবী ভক্তের জননীতুল্য আর স্তন জননীত্বের এক শ্রেষ্ঠ প্রতীক। কালিদাস যে পর্ব্বতবিশেষকে বসুন্ধরার স্তন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে অশেষ-ভূতধাত্রী ধরিত্রীদেবীর বিরাট্ মাতৃত্বের যে মহনীয়তা (sublimity) তাহারই আভাস দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। স্তনের বর্ণনাদ্বারা যে মাতৃত্বের ভাবটির আভাস-দান কালিদাস 'রঘুবংশে'ও তাহা একবার করিয়াছেন। সুদক্ষিণার গর্ভাবস্থার পরিণতি-বর্ণনচ্ছলে তাঁহার আসন্ন মাতৃত্বের যে ছবি কালিদাস আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে আদিরস কবির অভিপ্রেত ছিল মনে করিলে তাহার যথাযোগ্যতা-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। শ্লোকটি এই :—

"দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্তপীবরং তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্।
তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজ-কোশয়োঃ শ্রিয়ম্॥"

অর্থাৎ কালক্রমে গর্ভিণী সুদক্ষিণার অত্যন্ত পীবর স্তন-দ্বয়ের চুচুকের চারিদিকে নীল দাগ পড়িয়া উঠিল; তাহাতে মনে হইল যেন ঐ স্তনদ্বয়, যাহাদের মুখে ভ্রমর বিলগ্ন হইয়াছে পরিপূর্ণাবয়ব এমন পদ্ম-কোশদ্বয়ের শোভাকে তিরস্কার করিল (অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য রাখা গেল না)।

এই যে গর্ভিণীর স্তনে নীল দাগ পড়া, তাহা স্তনে ক্ষীরের সঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্ভাবস্থার পরিণতি সূচনা করে। তাই ইহাতে আসন্নমাতৃত্বের এবং নারীর সম্মুখে যে দুঃসহ ক্লেশ রহিয়াছে তাহারও আভাস, এই দু'য়ের মধ্য দিয়া মাতৃত্বের প্রতি একটি সুন্দর সহানুভূতি সৃষ্টির চেষ্টাও রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ আর যে কোন উদ্দেশ্যই কবির থাক্ তিনি অন্তঃসত্ত্বা রাজমহিষীকে লইয়া কুরুচিপূর্ণ কিছু লিখিয়াছেন তাহা ভাবিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে কালিদাসের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ করা হইবে।

আশা করি শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বাবু এ সম্বন্ধে উল্লিখিত কথা কয়টি একবার লক্ষ্য করিবেন এবং আমরা কিছু ভুল করিলে তাহার নিরাকরণ করিবেন।

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শ্রীসত্যসুন্দর দাসের উত্তর

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের আলোচনা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। আমার মত অপণ্ডিত ব্যক্তির সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করা যে কত খানি ধৃষ্টতা তাহা আমিও জানিতাম; কিন্তু গরজ বড় বালাই, তাই নিবৃত্ত হইতে পারি নাই। এক্ষণে কিছু কৈফিয়ৎ না দিলে অপরাধ আরও গুরুতর হইবার সম্ভাবনায় কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি লিখিয়াছি, "অশ্লীল শব্দের প্রাচীন অর্থ obscene নয়, vulgar", আরও লিখিয়াছি—"ইংরাজীতে যাহাকে obscene বলে তেমন কোনও

অর্থে ইহার প্রয়োগ নাই, তেমন অর্থবাচক কোনও অপর শব্দও নাই।" শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রতিবাদ ও উদ্ধৃত প্রমাণ সত্ত্বেও আমার পূর্ব্ব মতই আমি বজায় রাখিতে চাই—কেন, তাহা যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সাহিত্যদর্পণকার 'অশ্লীলতা'র যে ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন, আজিকার দিনে আমরাও সেইরূপ ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত কাব্য হইতে সেইরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারি এবং আমাদের তুলনায় বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রাচীন হইলেও, আমি যে প্রাচীনতার আলোচনা করিয়াছি, তাহার তুলনায় তিনি অর্বাচীন যুগের মানুষ। তাঁহার কালে সংস্কৃত সাহিত্যের সে সৃষ্টিপ্রেরণা আর ছিল না; রসবোধে ও চিন্তাপ্রণালীতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে সমসাময়িক Culture এর প্রভাব অবশ্যই ছিল; এবং তাহা যে বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় Culture নহে ইহাও সত্য। এ জন্য কবিরাজ মহাশয়ের 'অশ্লীলতা' বিচার আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধে।

দ্বিতীয়তঃ, কবিরাজ মহাশয় অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার মধ্যে যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল মাত্র obscenityর পক্ষে সে রূপ ভেদ-নির্দ্দেশ চলে না; কারণ গ্রাম্যই হোক আর অশ্লীলই হোক উভয় ক্ষেত্রেই যখন রচনা obscene হইতে পারে, তখন 'অশ্লীল' শব্দটির বিশেষ অর্থ obscene হইতে পারে না। প্রভেদটা শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় ভাষার উপরে। অতএব অশ্লীল বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, কবিরাজ মহাশয় তাহার সেইরূপ ব্যাপক অর্থ ধরিলেও, উক্ত শব্দটি যে ইংরাজী obscene শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য নয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; তাহা যদি হইত তবে কবিরাজ মহাশয়কে এমন করিয়া তাহার বিবিধ অর্থ-নির্দ্দেশ করিতে হইত না। পারিভাষিক শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণ হইয়া থাকে—শব্দসংক্ষেপের জন্য, নতুবা obscenityর ধারণা যেকালে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেকালে ঐ 'অশ্লীল' শব্দটি ছাড়া আর কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইল না কেন? শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ও তেমন অর্থবাচক অপর শব্দের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বশেষে এ সম্পর্কে আর একটি কথা বলিব। গ্রাম্যতা দোষের প্রসঙ্গে লেখকমহাশয় দেখাইয়াছেন—অর্থগত গ্রাম্যতার মানে হইতেছে খোলাখুলি ভাষায় সুরতাদি কার্য্যের প্রস্তাব। যাহা কেবল অশিক্ষিত হীনজনের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বক্রোক্তিতে বা ব্যঞ্জনামুখে হইলে তাহা আর অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইত না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি obscenityর বিষয়ে 'গ্রাম্যতা' ও 'অশ্লীলতা'র কোনও প্রভেদ নাই। এক্ষণে ঘোষ-মহাশয়েরই এই উক্তিতে প্রাচীনের অশ্লীলতা-বোধ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যই বজায় থাকিতেছে। "বক্রোক্তিতে বা ব্যঞ্জনামুখে"—অর্থাৎ অলঙ্কৃত ভাষার গুণে অশ্লীলও শ্লীল হইয়া উঠে। আমি লিখিয়াছিলাম—"কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকের একটা মত আজিও সত্য—আরও বেশি সত্য—তাহা এই যে, ভাষার গুণে অশ্লীলও শ্লীল হইয়া উঠে।...এইরূপ শ্লীলতার ভঙ্গিও এক ধরণের উৎকৃষ্ট আলঙ্কারিকতা, প্রাচীনেরা ইহাতে অল্প খুসী হইতেন না।" আমার মনে হয়, সাহিত্যদর্পণকার 'অশ্লীলতা'র শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়া অতি সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও, ঐ শব্দের প্রাচীন আলঙ্কারিক অর্থ, ও প্রাচীনের অশ্লীলতাবোধ এই উভয়ের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি ছিল না। এ জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়কে আমার এই অনুরোধ তিনি যেন প্রাচীনতর অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অশ্লীলতার সংজ্ঞা ও সে বিষয়ে তদানীন্তন রসিকজনের ধারণা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। কারণ এ বিষয়ের মীমাংসা একটু ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসারে হইলেই ভাল হয়।

কিন্তু তিনি অন্য দুই একটি বিষয়ে আমাকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সুরসিক পণ্ডিতজনের উপযুক্ত হয় নাই। প্রথমতঃ আমি আমার প্রবন্ধে হিন্দু কালচারের বৈশিষ্ট্য ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছি; প্রাচীন রুচির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা দূরে থাক, আমি তাহার সমর্থনই করিয়াছি। মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটির অশ্লীলতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছি তাহা আধুনিক রুচিবাগীশদের জবানীতে; উহার মধ্যে যে বক্র কটাক্ষ আছে তাহা যদি লেখককেই বুঝাইয়া দিতে হয়—তাঁহার মত অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ সুরসিকের নিকটেও যদি 'রস নিবেদন' ব্যর্থ হয়, তবে আর উপায় কি? আরও একটা নালিশ আমার আছে। কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'দেবীমূর্ত্তি' 'স্তবগান' ও 'লক্ষ লক্ষ ভক্তে'র কথা তুলিয়া আমাকে এমন অপরাধী করিলেন কেন? আমি ইহাতে বড়ই ভীত হইয়াছি; সম্প্রদায় বিশেষের মত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাও অতঃপর এজন্য আমার প্রাণবধও করিতে পারে—আশ্চর্য্য কি? তাঁহার মত এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি এতটা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া থাকেন, তবে অন্যে পরে কা কথা? অথচ তিনি জানেন, আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও কথাই বলি নাই; আমি নিরীহ নির্ব্বোধ সাহিত্যিক মাত্র; ধর্ম্ম আমার পেশা নয়। এরূপ অপবাদ দেওয়া তাঁহার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তির কি উচিত হইয়াছে?

তথাপি মেঘদূতের উক্ত শ্লোকে কালিদাস যে স্তনের উপমা দিয়াছেন তাহা যে erotic বা আদিরসাশ্রিত নয়, এমন কথা আমি বলিতে পারিব না—বলিলে কালিদাসের কবিপ্রতিভাকেই অসম্মান করা হয়। মেঘদূত রঘুবংশ নয়—মেঘদূত আগাগোড়া আদিরসপ্রধান; উহা একখানি অখণ্ড ভাব-কল্পনার গীতিকাব্য, মহাকাব্য নয়। স্তনের বর্ণনা যে সকল স্থানেই একই রসের দ্যোতক হইবে, না হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে, অথবা 'হিন্দু' ধর্ম্ম লোপ পাইবে এমন কোনও কথা যে কালিদাস মানিতেন ইহা মানিতে আমাদের কষ্ট হয়। মেঘদূতের যক্ষ হঠাৎ ধরণী-মাতার স্তন দেখিয়া রামপ্রসাদী ভক্তি-রসে বিহ্বল হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার না করি তাহাতে কালিদাসের কবি-যশের কিছু মাত্র হানি হয় না। এ সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়া আমার লেখনীকণ্ডূয়ণ নিবারণ করিব। "মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ" যদি আসন্নপ্রসবা সুদক্ষিণার স্তনের ন্যায় মাতৃত্ব-মহিমারই নিদর্শন হয়, তবে কবি সেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিতেছেন কেন?—'নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং'—যে স্তন-শোভা মাতৃত্বমহিমাব্যঞ্জক তাহাই কি বিশেষ করিয়া অমর-মিথুনের প্রেক্ষণীয়? 'অমর-মিথুন' বাক্যটির সার্থকতা কি?

দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে আমি যতটা মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার রসিকতার পরিচয়ে ততটা মুগ্ধ হইতে পারি নাই। তথাপি পণ্ডিতের নিকটে আমার মত অপণ্ডিতের মস্তক নত করিতে হয়—তিনি অশ্লীলতা সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকারের যে বিচারটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং আমার যে অনবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম।

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

প্ল্যান

—শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখিত
ও শ্রীঅরবিন্দ দত্ত চিত্রিত

নির্ব্বিবাদে মাষ্টারি করিতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে উহা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ছাত্র-জীবনের অন্তহীন 'অ্যাম্বিশান'কে খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহারি কোনো একটা বিকলাঙ্গ খণ্ড গলায় ঝুলাইয়া দিনের পর দিন স্কুলে হাজিরা দেওয়া—ইহার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে?

প্রাইভেট গাড়ির নম্বর দেখিতে দেখিতে ৩৪ হাজারে পৌঁছিয়াছে—ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির বাড়ির মাথায় ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে—ট্রামগাড়ি প্রতি বৎসর রং বদলাইতে বদলাইতে শাদা হইয়া উঠিল,—আমার শুইবার ঘরের মেঝে হইতে পায়ে চলার পথ বেশি পালিশ ঠেকে, তাকাইলে মুখ দেখা যায়,—ভোটের মরশুমে শতশত সদস্য-পদপ্রার্থী "হে ওয়ার্ডবাসী তোমার উপকার করিবই" বলিয়া মুঠা মুঠা টাকা পথে পথে ছড়াইল—দেখিয়া দেখিয়া মন খারাপ হইয়া উঠে। ভাষার অক্ষমতার দরুণ নিজেকে কীটস্য কীট পর্য্যন্ত মনে হয়, ভাষায় কুলাইলে কি যে মনে না হইতে পারিত তাহাই ভাবি। এরূপ অবস্থায় চল্লিশ টাকা বাঁধা মাহিনায় তৃপ্ত থাকিতে পারে তাহারাই যাহারা গোয়ালে বসিয়া বাঁধা খোরাক পাইতে পছন্দ করে।

দুই জন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে, অন্যান্য সকলে হাত নাড়িয়া সম্মুখে পশ্চাতে…

চল্লিশটি টাকার জন্য শালিখা হইতে কালিঘাট যাইতে হয়। পৈত্রিক বাড়ি শালিখায়, ছাড়িবার উপায় নাই—অথচ শালিখার চতুঃসীমানার মধ্যে একটি চাকরি জুটিল না, কাজেই পথ-খরচ বাদে যে ত্রিশটি টাকা বাঁচে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব—মায়াবাদ হইতে লেনিনবাদ, ইভলিউশান হইতে রিভলিউশান কত কি আপন আপন খুশী মত নৃত্য করিতে থাকে। আহিরীটোলা-ঘাট পার হইয়া যখন নিমতলা ট্রামে হেয়ার ষ্ট্রীট ডালহৌসি স্কোয়ার ভেদ করিয়া চলি, তখন "আমি কে?"—দর্শনের এই অমীমাংসিত প্রশ্নটি মনের মধ্যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠে।

দর্শন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই—উত্তর দিয়াছে ক্লাইভ ষ্ট্রীট। এক-বার গিয়া দেখিলেই হয়—পথে ক্ষণ-কালের জন্য দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সোঽহং উচ্চারণের অধিকার আমার নাই, আমি সংসার-ভীরু সন্ন্যাসী। জীবনের সকলপ্রকার ভোগ-সুখ হইতে আমি চিরবঞ্চিত ভোগ কাহাকে বলে আমি জানিনা; আমি ত্রিশদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া পনেরো মাইল যাতায়াত করিয়া মাত্র চল্লিশটি টাকা পাই—যাহা ক্লাইভ ষ্ট্রীট সৌধ-সমূহের সামান্য একটুকরা পাথরের দামও নয়।

যাহাদের মনের চারিদিকে কঠিন আবরণ পড়িয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাহিরের কোনো কিছুই তাহাদের সেই আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেনা—তাহারা মহৎ। কিন্তু আমি মহৎ নহি—আমার মনের একটা দিক একেবারে খোলা। ডালহৌসি স্কোয়ার ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বজগৎ সেই পথে যাতায়াত করে—আমি বুঝিতে পারি, আমি কে।

অনেক রকম চিন্তা করিলাম। পৈত্রিক টাকা কিছু ব্যাঙ্কে আছে—বেশি নহে মাত্র পাঁচ হাজার। আমার চল্লিশ

টাকা আয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ পাঁচ হাজারে হস্তক্ষেপ করি নাই, তাহার কারণ আছে। নিজস্ব বাড়ি থাকার দরুণ বাড়িভাড়া লাগেনা—এবং সংসারে আমি ছাড়া উদ্বৃত্ত লোকের মধ্যে আমার একটি স্ত্রী আছেন। একটি ঝি আছে বটে কিন্তু তাহাকে মাহিনা দিতে হয় না—সে শিশুকাল হইতে আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বৃদ্ধা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঐ পাঁচ হাজারের কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়।

কিন্তু আর ত অল্পে সুখী হওয়া চলেনা, ঐ পাঁচ হাজার টাকায় যে-কোনো একটা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে, অধ্যবসায় থাকিলে উন্নতি অনিবার্য্য, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

সন্ধ্যায় আমাদের একটা আড্ডা জমিত, একদিন সেখানেই কথাটি উত্থাপন করিলাম। আমাকে বেশি কথা উচ্চারণ করিতে হয় নাই,—কেবল বলিয়াছিলাম—আমি একটা ব্যবসা করতে চাই। আড্ডায় আকাশ-পাতাল কত কি আলোচনা হইতেছিল—কিন্তু আমার কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কিসের ব্যবসা ?

—সেটা এখনো ঠিক করিনি—

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন—ব্যবসা যদি করতে চান ঘিয়ের ব্যবসা করুন—পাঁচশ টাকা ফেলতে পারলে লাল হ'য়ে যাবেন দুচার মাসের মধ্যে।

ভবতারণবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—না হে, অত সোজা নয়। পাঁচশ টাকায় যদি লাল হওয়া যেত, তা হ'লে আমার স্ত্রী লাল হ'ত সব্বার আগে। তাকে তিনশ টাকার হাওয়া বদল করিয়েছি, দুশ' টাকার লিভার খাইয়েছি—কিন্তু এখনো শাদা মেরে বসে আছে।

—আসল কথা ঘিয়ের ব্যবসায় জোচ্চুরি না করলে কিছু হয় না—কিন্তু জোচ্চুরি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা দরকার—মাষ্টার মশাই জোচ্চুরির কি জানেন ?

দীনবন্ধুবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—কখ্খনো নয়—জোচ্চুরি করবার দরকার নেই—মফঃস্বলে ঘিয়ের সের এক টাকা, কলকাতায় দুটাকা, খরচা বাদে সেরে আট আনা, মণ পিছু বিশ টাকা। সোজা হিসেব।

ভবতারণবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—সোজা হিসেব হ'লে আর কেউ তিরিশ টাকায় দশ ঘণ্টা কলম ঠেলত না।

দীনবন্ধুবাবু কেরাণী। তিনি এইবার বুঝিতে পারিলেন কথাটা বোধ হয় ঠিক—কারণ, সহজ হইলে সে চাকরি করে কেন !

দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও দৌড়াইতে লাগিল।

দীনবন্ধুবাবুকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভবতারণবাবু বলিলেন, ব্যবসা করাও যেমন শক্ত, সে সম্বন্ধে কিছু বলাও তেমনি কঠিন। মাষ্টার মশাই আমার একটি পরামর্শ শুনুন, আপনি ঘি ভুলে যান, ব্যবসা যদি করতে হয়, মাছের ব্যবসা করুন। ভোরে উঠে শিয়ালদ, ব্যস্। ভোরে উঠলেই

টাকা। Early to bed—এই প্রবাদ বাক্যটি একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী বহুদিন আগে প্রচার করেছিলেন। গোয়ালন্দের মাছ—কষ্ট ক'রেছে জেলেরা, কষ্ট ক'রেছে কুলিরা, কষ্ট পেয়েছে মাছ,—আপনার কোনো কষ্ট নেই, এ বিষয়ে আমার একটি প্ল্যান আছে।

নরেনবাবু বিড়িতে একটা টান মারিয়া 'ড্যাম-ইওর-মাছ' বলিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন।

ভবতারণবাবু নরেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কেন মাছ 'ড্যাম' কেন? মহাশয়, মাছের কি জানেন?

উঁহাদের হাত ছাড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ…।

দাঁতে বিড়ি চাপিয়া বিকৃতস্বরে নরেনবাবু জবাব দিলেন—মাছের আমি কি জানি?—কিন্তু মহাশয়ের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি জানি সেটা মনে রাখবেন। আপনি মাছের যেটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে বেশি চিনি মাছের খদ্দেরকে। মাছ এ যুগে অচল। ব্যবসা যদি করতে হয় সিনেমাই হচ্চে সব চেয়ে সেরা। দশ হাজার টাকা ছাড়ুন, লাখটাকা উঠে আসবে এক মাসের মধ্যে। একটা লোক তার পরিবারের জন্যে মাসে ক টাকার মাছ কেনে? বড় জোর দশটাকা। কিন্তু একটা পরিবার মাসে সিনেমা দেখে—কি বল হে আশুতোষ—কত টাকার?

আশুতোষ ভয়ানক সিনেমা-ভক্ত, সে ভাবিয়া বলিল, মাছের চেয়ে বেশি বটে।

ভূপতিবাবু কথা আরম্ভ করিলে কেহ কথা বলিবার ফুরসুৎ পায় না কিন্তু তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন—এইবার আর তাঁহার চুপ করিয়া থাকা পোষাইলনা—

আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আছে—মাছ সিনেমা ওসব বাজে—একেবারে বাজে, এই কথা দ্বারা তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

আড্ডায় প্রায় পনের জন লোক উপস্থিত ছিল এইবার তাহারা সকলে একসঙ্গে কথা কহিয়া উঠিল, বোঝা গেল সকলেরই একটি করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্ল্যান আছে। আমাকে ঘিরিয়া লইয়া সকলে সমস্বরে নিজের নিজের প্ল্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে দুইজন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে, অন্যান্য সকলে হাত নাড়িয়া সম্মুখে পশ্চাতে গম্ভীর ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, সকল কথা মিলিয়া মিশিয়া যেটুকু মনে আছে তাহা এই—

মাছ হচ্চে লিজার্ডস্কিন দশ হাজার ফীট তুলে চার হাজার পোল্‌ট্রি ট্যানিং শিখতে আলু পটোল চিৎপুর বাজারে লণ্ড্রিতে ভীষণ চায়ের দোকান এই দেখ না ইনশিওর‍্যান্স ইণ্ডাষ্ট্রির চেয়ে শিমূল তুলো মার দিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ ফ্রুট সিরাপ মাত্রেই ছাপাখানার ব্যাপারে ফুটবল ম্যানুফ্যাকচার আপটুডেট চিনির কলে কেমিষ্ট জোগাড় করতে মাইকামাইন বিশেষ মনোহারি দোকানে মুরগীর চাষে কলের লাঙল জুড়ে মাসিক পত্র চালানো সেণ্ট পার সেণ্ট তামাক পাতার খাবারের দোকান ঐ ত মুস্কিল—

মিলিত চীৎকারে কান ঝালাপালা হইয়া গেল, আমিও ঐ সঙ্গে চীৎকার সুরু করিলাম—ব্যবসা করব না, করব না আপনারা থামুন, মলেও আর—

কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হয় না, অগত্যা আমি জোড় হাতে সকলকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম—কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই চারজন আমার সঙ্গে ক্রমাগত বকিতে বকিতে চলিল, আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তিনজন

মধ্যপথ হইতে রণে ভঙ্গ দিল—মাত্র একজন থাকাতে অনেকটা সাহস পাইয়া দৌড়ান বন্ধ করিলাম। তখন সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—আমার প্ল্যানটা—

—তোমার মাথাটা—আমি ব্যবসা করব না।

—সে কি হয়, ব্যবসার চেয়ে—

—কি হে বিপিন—

চমকিয়া চাহিয়া দেখি আমার এক বন্ধু গাড়ি হইতে ডাকিতেছেন। গাড়ি কাছে আসিল—বন্ধু আমার ভয়ার্ত্ত মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিয়া বলিলাম—আমাকে দেখে যতটা মনে করছ ততটা না হ'লেও খানিকটা বিপদে পড়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছে বাঁচা গেল। চল তোমার সঙ্গে যেদিকে হোক খানিকটা যাওয়া যাক।

আমার সঙ্গে যিনি প্ল্যান আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। গাড়িতে উঠিয়া বন্ধুকে সংক্ষেপে বিপদের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে সত্যি বেঁচেছিস, যে-সব ব্যবসার কথা শুনলাম ওতে তোর সর্ব্বনাশ হ'ত, ব্যবসা সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আমি ঠিক করে রেখেছি, যদি লাগে তোর কাজেই লাগুক।

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—কতদূর এসেছি?

—হাওড়া ষ্টেশনের কাছে।

—তা হ'লে থামাও, আমার একটা গুরুতর কাজ আছে, এক্ষুণি নামতে হবে, প্ল্যান অন্যদিন শুনব। গাড়ি থামিবা মাত্র নামিয়া গেলাম। গাড়ি অদৃশ্য হইল, আমিও ট্রামে উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু গোলমালে ভোরের বেলাই ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফটক খুলিতেই দেখি পূর্ব্ব দিনের কয়েকজন এবং আরো নূতন কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে কোন্ ব্যবসা শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিবা মাত্র দুই তিনজন খপ্ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

একজন বলিল,—আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি আমার কথা যদি,—আর একজন বাধা দিয়া বলিল—তোর গ্যারাণ্টির মূল্য কি? আমার ঘড়ি বাজি রাখছি যদি আমার প্ল্যানে—

ইহার পর আর ইহাদের তর্ক অনুসরণ করিতে পারি নাই—কেননা পূর্ব্বদিনের মত দশ বারোজন সমস্বরে চীৎকার করিয়াছে।

আমি তর্কের মধ্যে ফস্ করিয়া উহাদের হাত ছাড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, আমার হিতৈষিগণ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য দিন সাধারণত বেলা নয়টায় গঙ্গা-স্নান করি—

দেখি শুশুক নহে, ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গলের মাথা।

সে দিন ভয়ে ভয়ে আটটায় স্নান করিতে গিয়াছি। জলে নামিয়া একটি মাত্র ডুব দিয়াছি, আমার পাশে কে স্নান করিতেছিল পূর্ব্বে খেয়াল করি নাই। ডুব দিয়া উঠিতেই সেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ বলিল—ও আপনি, ভাল কথা আপনি নাকি ব্যবসা করবেন? আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি—সে যা হোক, আপনি যদি টাকা নষ্ট করতে না চান তবে ইন্‌শিওরেন্স—

আমি ভাল সাঁতার জানিতাম—ইন্‌শিওরেন্সের কথা শেষ হইবার আগেই "ভগবান বাঁচাও" বলিয়া ডুবিয়া গেলাম। প্রায় এক মিনিট জলের ভিতর চলিয়া মাথা তুলিতেই দেখি আমার নিকট হইতে তিন হাত দূরে সেই লোকটিও মাথা

তুলিল। প্রায় এক মিনিট দম বন্ধ করিবার পর তৎক্ষণাৎ আবার ডুব দেওয়া সম্ভব নহে—কাজেই নির্ব্বোধের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে একটু কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল,—আমাদের কোম্পানির নাম ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গল লাইফ,—পলিসি কণ্ডিশানগুলো যদি—

কিন্তু যতই কষ্ট হউক, ইহার পর আমি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না—আবার ডুবিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম, তারপর যেমনি মাথা তুলিয়াছি দেখি

বিছানা হইতে আচম্বিতে লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে··· ।

ইনফ্যাণ্ট বেঙ্গলও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আমাকে দেখিবা মাত্র সে বলিতে আরম্ভ করিল,—আমাদের H. M. System—6 years rating up—রিজার্ভের সঙ্গে লাইফ ফাণ্ডের অনুপাত—

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম—বুঝতে চাই না—

ভদ্রলোক বাধা দিয়া বলিলেন—না বুঝে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া উচিত নয়—আপনাকে বুঝতেই হবে।

"হে মধুসূদন" বলিয়া আবার ডুবিলাম কিন্তু দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতে মাথায় কিসের সঙ্গে ভয়ানক গুঁতা লাগিয়া গেল। শুশুক মনে করিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতেই দেখি, শুশুক নহে ইনফ্যাণ্ট বেঙ্গলের মাথা। মাথাটি যেন কথা বলিতে বলিতেই উঠিল,—শেষ পর্য্যন্ত ইন্সিওর‍্যান্সে আপনাকে নামতেই হবে—এর থেকে পরিত্রাণ নাই!—

কথাটা আমারও অনেকটা বিশ্বাস হইল। বলিলাম, আপনার মত অধ্যবসায় ত আমার নেই।

—বলেন কি, আপনার অধ্যবসায় যা দেখছি আমি ত তার কাছে শিশু। অল্প মূলধনে যদি ব্যবসা করতে হয়—

ব্যবসার কথা শুনিবা মাত্র চমকিয়া উঠিলাম—পরিত্রাণ পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আবার ডুবিলাম। এবারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর পারের দিকে ছুটিতে লাগিলাম—পূরা এক মিনিট তীর বেগে ছুটিবার পর যখন উঠিলাম তখন দেখি আহিরীটোলা-ঘাটের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গল আমার গতি অনুমান করিতে না পারিয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে, না হইলে নিশ্চয় লাইফ ফাণ্ড কিংবা এক্স্‌পেন্স্‌ রেশিও সম্বন্ধে কথা তুলিত।

ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পুনরায় সাঁতার দিয়া অপর পারে যাওয়া সম্ভব নহে। তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে জেটির দিকে চলিতে লাগিলাম। অবসন্ন দেহ, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছি, এমন সময় কে খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল—কি বিপিনদা, একেবারে দেখতেই যে পাচ্ছেন না!

ইনি আমার শ্যালক।

আমি খুশী হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না, গম্ভীর ভাবে বলিলাম, ভাই হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্চে—ওপার থেকে সাঁতার কেটে এসেছি—তোমার গায়ে একটু ভর দিয়ে চলি।

—কোথায়?

—ষ্টীমারের জেটিতে। সঙ্গে পয়সা নেই একটা টিকিট কিনে দাও।

—আমিও যে আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি।

—কি মনে ক'রে?

—আজ এই মাত্র শুনলাম, আপনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন। যা তা ব্যবসায় পয়সা নষ্ট না ক'রে চাকরি করাই কি ভাল নয়?

এইবার যথার্থ খুশী হইয়া বলিলাম, ব্যবসা আমি করব না, চাকরি বেঁচে থাক্—

—যদি করতেন, তা' হ'লে কিসের করতেন বলুন ত?

—কিছু মনে করবার সময় পাইনি ভাই, মনে ক'রব ব'লে মনে করছিলাম।

—যদি নেহাৎই ব্যবসা করতে হয় তা' হ'লে আমি একটি ভাল প্ল্যান—

—তুমিও প্ল্যান?—দেখ, আমার প্ল্যান-ট্যান কিছু দরকার নেই।

—বলেন কি ! ব্যবসার গোড়ার কথাই হচ্ছে প্ল্যান, যে ব্যবসা করবেন—

—আমি বিনা প্ল্যানে ব্যবসা করব।

—তা হয় না, আপনি একটা অসম্ভব কথা বল্লে আমি শুনব কেন ? কিসের ব্যবসা করবেন, কত টাকা ফেলবেন, কিনে বেচা না ম্যানুফ্যাকচার, কমিশন এজেন্সি না আমদানি রপ্তানি, কত টাকা খাটবে, কত ব্যাঙ্কে থাকবে,—ধরুন যদি দশহাজার টাকা এস্‌টিমেট ক'রে থাকেন তাহ'লে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখা চাই, আরো বেশি রাখতে পারলে আরো ভাল হয়।

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, ভগবান !

শ্যালক তৎক্ষণাৎ বলিল, ভগবান প্রথম অবস্থায় কিছুই করেন না, ডাকতে হয় শেষ কালে ডাকবেন।

শ্যালকের মুখে বক্তৃতার খই ফুটিতে লাগিল, আমি নিরুপায়, ষ্টীমার হইতে লাফাইবার শক্তি নাই, চুপ করিয়া রহিলাম।

চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্তিবশত চোখ বুজিয়া আসিয়াছে—আধ-জাগ্রত অবস্থায় এক বিভীষিকা দেখিলাম। সমস্ত শালিখার লোক বাঁধাঘাটে আমাকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি ঘাটে পৌঁছিবামাত্র হাজার হাজার লোক 'আমার প্ল্যান, আমার প্ল্যান' করিয়া চীৎকার করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মধ্যে আমার স্ত্রীকেও দেখা যাইতেছে—সেও তাহার এক প্ল্যান লইয়া আসিয়াছে—আমাদের বৃদ্ধা ঝি তাহার পশ্চাতে 'পেলান, পেলান' করিয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে। তাহার দাঁত নাই এবং সেই জন্যই তাহার স্বর কোনো বাধা না পাইয়া সকলের স্বরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। এই টুকু পর্য্যন্ত বেশ মনে আছে—ইহার পরের ঘটনা আর কিছু মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি, আমি হাঁসপাতালে শুইয়া এবং পাশে আমার স্ত্রী এবং শ্যালক বসিয়া। স্ত্রী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে এবং শ্যালক তাহাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতেছে।

চোখ চাহিলাম। স্ত্রী আনন্দে আরো বেশি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাশে চাহিয়া দেখিলাম সারি সারি বিছানা, প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া রোগী এবং রোগীকে ঘিরিয়া তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা বসিয়া আছে।

হঠাৎ একটি শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। পাশের বিছানা ঘিরিয়া যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইতেছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু কথার ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল তাহাদের সমস্তা প্ল্যানে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কেহ বলিতেছে ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান, কেহ বলিতেছে থ্রী-ইয়ার প্ল্যান……

মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কোনো কথার অর্থগ্রহণ করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। প্ল্যান কথাটি শুনিবামাত্র আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলাম। উঠিয়া বসিলাম। মনে মনে তিন সেকেণ্ড পরিমাণ মোহ-মুদ্গর আওড়াইয়া দেখিলাম, হাতে পায়ে অনেকটা জোর ফিরিয়া আসিয়াছে। স্ত্রীর দিকে একবার তাকাইলাম। আবার কানে আসিল

আজ সাতদিন মামা-বাড়িতে লুকাইয়া আছি এবং আরো কিছুদিন থাকিব মনে করিতেছি।

থ্রী-ইয়ার প্ল্যান…। আর থাকিতে পারিলাম না, বিছানা হইতে আচম্বিতে লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। হাঁসপাতালময় একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল—আমি প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলাম, আমাকে ধরিবার জন্য লোক ছুটিয়াছিল, কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—চট্ করিয়া একটা সরু গলিতে ঢুকিয়া গেলাম।

* * * *

আজ সাতদিন হইল মামা-বাড়িতে লুকাইয়া আছি এবং আরো কিছুদিন থাকিব বলিয়া মনে করিতেছি। চাকরিটি থাকিবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসা করিয়াই খাইতে হইবে কিন্তু কাহারো প্ল্যানে আর ঢুকিতেছি না।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীর্ত্তি-কাহিনী

বুনো রামনাথ

প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে নবদ্বীপে একজন অশেষ জ্ঞানী নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়-শাস্ত্রে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁদের নৈয়ায়িক বলা হ'ত। তাঁর নাম হ'ল, রামনাথ। এক সময় ভারতবর্ষে নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের খুব আদর ছিল—কারণ বুদ্ধি এবং মেধায় তাঁদের তুল্য পণ্ডিত খুব কম দেখা যেত।

রামনাথ কিন্তু খুব দরিদ্র ছিলেন। জ্ঞানের সাধনায় তিনি সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। গ্রামের মধ্যে একখানি কুঁড়ে ঘর বাঁধবারও সঙ্গতি বা চেষ্টা তাঁর ছিল না। সেইজন্য গ্রামের শেষে এক বনে একটা সামান্য কুঁড়ে ঘর তৈরী করে সেখানেই পণ্ডিত রামনাথ এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী বাস করতেন। কুঁড়ে ঘরখানির সামনে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ছিল। সেই তেঁতুল গাছের তলায় ছিল ব্রাহ্মণীর ভাঁড়ার-ঘর, রান্না-ঘর, উঠোন—সবই।

এখানে সেকালের আদর্শ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং তাঁদের শিষ্যদের একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী, একান্ত সরল-প্রকৃতি এবং সাংসারিক জ্ঞানে একেবারে অনভিজ্ঞ। সারাক্ষণ তাঁরা অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বড়মানুষী কি, তা তাঁরা জানতেন না। পাঠ্যাবস্থায় দিনের বেলায় শুকনো পাতা সংগ্রহ করে, রাত্রে সেই শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে সেই আলোতে পড়তেন। দিনের বেলায় যা পাঠ করতেন, রাত্রে তা কণ্ঠস্থ করতেন। আটকে গেলে সেই শুক্‌নো পাতার আগুনে ফুঁ দিতেন; দু একটা আগুনের শিখা জলে উঠত—সেই আলোয় হলদে পুথির কালো অক্ষর গুলো একবার দেখে নিতেন।

কেউ কেউ ধনী এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ ও ভূমি পেতেন। তাঁদের অবস্থা অবশ্য স্বচ্ছল ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের গুটিকতক করে ছাত্র থাকত। তাঁদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা অধ্যাপক মহাশয়কেই করতে হ'ত। মোগল-বাদশারা এই সমস্ত টোলের ছাত্রদের জন্য কিছু কিছু অর্থ দিতেন।

"ছাত্রেরা কিন্তু পাঠে এমন মগ্ন থাকিত, যে তাহারা তরী তরকারির কথা ভুলিয়া যাইত। যথাসময়ে ভাত চড়াইয়া দিয়া যখন দেখিত কিছুই নাই, তখন নিকটবর্ত্তী কোন আমড়া গাছে উঠিয়া দুই চারিটা আমড়া পাড়িয়া আনিয়া ভাতে দিত এবং তাহা দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ন্যায়শাস্ত্রের টোলে "আমড়া ভাতে-ভাত খাওয়া" একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" (পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

পণ্ডিত রামনাথ কখনও কোন ধনী ব্যক্তির দ্বারস্থ হতেন না। সেই সময় কৃষ্ণনগরের রাজ-বংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিশেষ খাতির করতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত হলেই, তাঁরা তাঁর ব্রহ্মোত্তরের ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু রামনাথ কোন দিন সেই রাজবাড়ীর দরজা মাড়ান নি। তিনি বলতেন, ব্রহ্মোত্তর পেলে লোভ জন্মাবে, লোভ জন্মালে শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটবে! সে জন্য অবশ্য তাঁর কোন কষ্টবোধও ছিল না। কিন্তু তাঁকে এত দরিদ্র জেনেও, বহু দূর দেশ থেকে তাঁর সেই তেঁতুল গাছ তলায় বসে পড়বার জন্যে শিষ্যেরা আসত। গুরুর আদর্শ অনুযায়ী শিষ্যরাও কোন রকমে ব্যঞ্জন-হীন অন্ন খেয়ে সগৌরবে অধ্যয়ন করত। বনের মধ্যে বসে পড়াতেন বলে, তাঁর নাম হয় বুনো রামনাথ।

সেই তেঁতুলতলায় যে শুধু বিদ্যার্থীরা আসত, তা নয়—বাংলার পণ্ডিতমহলে যখনই কোনও জটিল বিষয়ের মীমাংসা কেউ করে উঠতে পারতেন না—তখনই সবাই ছুটত বুনো রামনাথের কাছে। এক কথায় তিনি সমস্ত জটিলতার মীমাংসা করে দিতেন।

একবার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র সস্ত্রীক নবদ্বীপে এসেছিলেন। নবদ্বীপের ঘাটে বজরা বেঁধে রাণী তাঁর দাসীদের নিয়ে স্নান করতে নামেন। রামনাথের স্ত্রীও তখন সেই ঘাটে জল নিতে আসেন। তাঁর পরণে একখানি ছেঁড়া ময়লা কাপড়, হাতে অলঙ্কারের বদলে সধবার চিহ্ন-

স্বরূপ একগাছি লাল সূতো বাঁধা ছিল। নিত্য যেমন ঘাটে নেমে স্নান করেন, সেদিনও তেমনি ঘাটে নেমে স্নান করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর দাসীরা ধমক দিয়ে উঠল—"হাতে একগাছা শাঁখাও জোটে না, মাগীর তেজ দেখো—তোর পা-ধোয়া জল রাণীর গায়ে লাগছে দেখতে পাচ্ছিস্ না।"

ব্রাহ্মণী তাদের কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে কলসীতে জল ভরে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, "আমার হাতে এই লাল সুতো বাঁধা আছে বলে নবদ্বীপের সম্মান এখনও আছে।"

কথাটা মহারাজ শিবচন্দ্রের কানে গিয়ে উঠল। তিনি খবর নিয়ে জানলেন যে, ব্রাহ্মণী বুনো রামনাথের সহধর্ম্মিণী। যাঁর স্ত্রী এরকম তেজস্বিনী, তাঁকে দেখবার বড়ই কৌতুহল হ'ল। অনুসন্ধান করে মহারাজ শিবচন্দ্র বুনো রামনাথের সেই তেঁতুলগাছ তলায় উপস্থিত হলেন। দেখলেন, ব্রাহ্মণ শিষ্যদের পড়াচ্ছেন।

একজন ছাত্র উঠে মহারাজকে বসবার আসন এনে দিলেন—একটা তালপাতার চেটাই! মহারাজ সন্তুষ্ট চিত্তে তার ওপর বসে শিষ্টাচারের পর জিজ্ঞাসা করলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনার কোন অনুপপত্তি আছে?"

রামনাথ অমনি বলে উঠলেন, "চারি চিন্তামণির * মধ্যে আমার কোথাও অনুপপত্তি নাই—এক যায়গায় একটু অনুপপত্তি ছিল—ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করুন, মাসখানেক হ'ল তাহারও আমি উপপত্তি করে দিয়েছি।"

"অনুপপত্তি" কথাটার দুটি অর্থ—এক অর্থ, সাংসারিক জিনিষ-পত্রের অভাব; দ্বিতীয় অর্থ, বুঝতে বা বোঝাতে না পারা। মহারাজ শিবচন্দ্র প্রথম অর্থে কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত রামনাথের সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা মনেই থাকত না—তাই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ভেবেছিলেন যে, মহারাজ বুঝি তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র তখন সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি শাস্ত্রীয় অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করি নি, আপনার সাংসারিক অভাব-অনটন কিছু থাকে তো আমি তা দূরীভূত করতে পারি।"

রামনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বল্লেন, "ওঃ! সে সব আমি কিছুই জানি না, ব্রাহ্মণী জানেন।"

এই বলে আবার তিনি ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ করলেন। নিরুপায় হয়ে মহারাজ শিবচন্দ্র কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "মা, আপনার সংসারে কি কিছু অভাব আছে?"
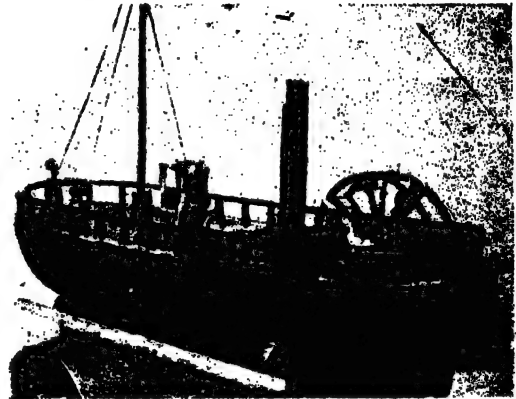
সিমিংটনের তৈরী প্রথম বাষ্প-চালিত নৌকা।

ভেতর থেকে উত্তর এল—"আমাদের সংসারে কোনই অভাব নেই। শয্যার জন্যে মাদুর আছে, অন্ন-গ্রহণের — পাথর আছে, তেঁতুলগাছে যথেষ্ট পাতা আছে—কর্ত্তা তেঁতুল-পাতার ঝোল খেতে বড় ভালবাসেন।"

এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী লোককে সাহায্য করবার গর্ব্ব ত্যাগ করে মহারাজ শিবচন্দ্র ফিরে এলেন।

জ্ঞান-তপস্বী বললে যা বোঝায়, বুনো রামনাথ তাই ছিলেন। একবার কলকাতায় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন। বিচারে তিনি ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিতকে পরাস্ত করে কলকাতায় আসেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রমুখ সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখলেন যে, বাংলার নাম ডুবে যায়। তখন সকলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, বুনো রামনাথকে নিয়ে আসতে হবে। বার বার নানা রকম

* ন্যায়-শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থের নাম—তত্ত্বচিন্তামণি। উহা চারখণ্ডে বিভক্ত। অধিকাংশ পণ্ডিত প্রথম দুইখণ্ড আয়ত্ত করিতেন। কিন্তু রামনাথের চার খণ্ডই আয়ত্ত ছিল।

প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠান হতে লাগল। কিন্তু সেই নির্লোভ জ্ঞান-সাধক কিছুতেই কলকাতায় আসতে রাজী হলেন না। অর্থের প্রলোভনে তাঁকে ভোলান যাবে না দেখে, একদল পণ্ডিত অবশেষে তাঁর দ্বারস্থ হয়ে জানালেন যে, তিনি না গেলে, বাংলার সম্মান যায়।

অগত্যা বুনো রামনাথ কলকাতায় এলেন। সেই সময়কার সমস্ত বড়লোক মিলে তাঁকে বিরাট ভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। বিচারে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হলেন। শুধু পরাস্ত নয়, রামনাথের পাণ্ডিত্য দেখে তিনি নির্ব্বাক হয়ে গেলেন।

উইলিয়াম সিমিংটন।

তখন চারিদিকে রামনাথের নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। ধনীদের কাছ থেকে ভারে ভারে উপহার আসতে লাগল। অনেকে এল বার্ষিক বৃত্তি দেবার জন্য, অনেকে এল ব্রহ্মোত্তর দেবার জন্য। সেই সব ব্যাপার দেখে বুনো রামনাথ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বল্লেন, "এক মুহূর্ত্তও আর আমি কলকাতায় থাকব না। আমাকে যেখান থেকে এনেছিলে সেইখানে পৌছে দাও—এখানকার আবহাওয়ায় লোভ—এখানে থাকতে নেই—।"

এই বলে, সেই সমস্ত উপহার, বার্ষিক বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তরের প্রস্তাব, সব ফেলে রেখে, যেন জীবনের সব চেয়ে বড় আতঙ্কের মুখ থেকে ছুটে তিনি পালিয়ে এলেন তাঁর সেই নির্জ্জন তেঁতুল গাছের তলায়।

বাংলার এই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে, আর আজকাল আমাদের চারপাশের জীবনের দিকে চেয়ে, বারে বারে এই প্রশ্ন মনে জাগে, এঁরা কারা? এঁরা কি কোন আলাদা জাতের লোক? জগতের বহু মহামূল্য বিলুপ্ত জিনিষের মত এঁরাও কি একেবারে হারিয়ে গেছেন কালসিন্ধুর তরঙ্গে?

নব-কথামালা

বাদুড়ের ভাগ্য

একদা এক বাদুড় নিজের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এ কি রকম অন্যায়? আমার ডানা আছে, অথচ আমি পাখী নই। গায়ে আমার লোম রহিয়াছে, দিব্য রহিয়াছে কান, তবুও আমি ইঁদুর নই। রোজ রোজ সেই বাদুড়দের সঙ্গে উঠা-বসা করা আর ভাল লাগে না! আজই পাখীদের দলে যাইব।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পাখীরা যখন নীড়ে ফিরিয়া শয়নের চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় একান্ত কুণ্ঠার সহিত বাদুড়টি আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, শুভ-প্রভাত!

পাখীরা হাসিয়া উঠিল। একটি বৃদ্ধ পাখী নীড়ের ভিতর হইতে বলিল, কে হে বাপু তুমি, রাত্রি বেলায় শুভ-প্রভাত জ্ঞাপন করিতেছ?

পাখীদের সন্ধ্যায় বাদুড়ের প্রভাত হয়—পাখী হইতে আসিয়া সে কথা বাদুড় ভুলিয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি নিজের ত্রুটী সংশোধন করিয়া সে বলিল, অপরাধ লইবেন না। আমি বাদুড়। আমি আপনাদের দলে মিশিতে আসিয়াছি। দেখুন, আমারও ডানা আছে!

বৃদ্ধ আর একটু মুখ বাড়াইয়া বলিল, ডানা তো আছে—কিন্তু পালক কই! যদি কখনও পালক গজায়, তখন মিশিতে আসিও। বিরক্ত করিও না—যাও!

মনের দুঃখে বাদুড় অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইঁদুরদের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকাডাকির পর একটি

ইঁদুর গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি ?

বাদুড় সভয়ে উত্তর করিল, আমি তোমাদেরই মত একজন ইঁদুর !

ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া ইঁদুরটি বলিল, তাহা তো দেখিতেছি কিন্তু পাশে ও দুইটি কি ?
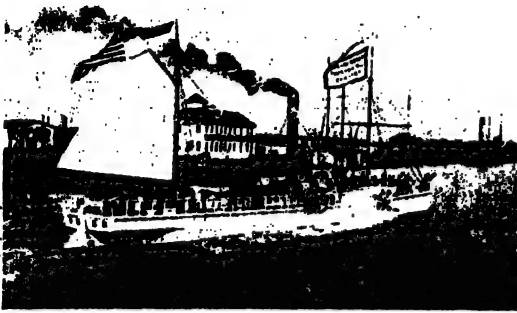
১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হাড্‌সন্ নদীতে ফুল্‌টনের অনুরূপ নৌকা তৈরী করে এক উৎসব হয়। এই চিত্র সেই সময় গৃহীত হয়।

একটা ইঁদুর গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া একটি ডানা টানিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ও বাবা ! এর যে ডানা আছে ! বেরোও, বেরোও, এখান থেকে !

একান্ত হতাশ চিত্তে বাদুড় ফিরিয়া গেল। যাহাদের মধ্যে জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইয়া সে শুধু ভাগ্য-বিধাতাকে অভিশাপ দিল।

কে প্রথম বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণ করেন ?

জগতে কে প্রথম বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণ ক'রল ? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এখনও জাতিতে জাতিতে প্রায়ই বচসা চলে। একদল লোক বলেন, স্কটল্যাণ্ডের উইলিয়াম সিমিংটন প্রথম বাষ্প দিয়ে জাহাজ চালান ; কেউ বলেন, আমেরিকার রবার্ট ফুল্‌টন প্রথম এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হন ; স্পেনের লোকেরা বলে যে, ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্লাস্‌কো দ্য গ্যারি বলে একজন স্পেনদেশের লোক সর্ব্বপ্রথম একটা মডেল বাষ্পীয়-পোত তৈরী করেন। ফিট্‌চ ব'লে আমেরিকার একজন এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে একটা বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণ করেন। সম্প্রতি আমেরিকায় ফিট্‌চ ফ্যামিলি এসোসিয়েশন ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ফিট্‌চ-ই প্রথম বাষ্পীয়-পোত নির্ম্মাণ করেন, এই কথা প্রমাণ এবং প্রচার করা। এ ছাড়া বাষ্পীয়-পোতের ইতিহাসে, অনেক নাম আছে—কিন্তু সকল দিক দিয়ে কৃতকার্য্য না হওয়ার দরুণ তাঁদের নাম আজ তাঁদের তৈরী প্রথম জাহাজগুলোর মতই ডুবে গিয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মারকুইস্ দ্য জুফ্রয় বলে একজন ফরাসী প্রথম বাষ্প-চালিত একটি বোট তৈরী করেন। লিয়ন্‌স্ শহরে তার পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষায় জুফ্রয়ের উদ্যম সার্থক বলে গৃহীত হয়। কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞান-মণ্ডলী, যাকে একাডেমী, Academy বলে, তাঁরা বলেছিলেন যে জুফ্রয়কে প্যারিসে এসে পরীক্ষা দিতে হবে। ফরাসী গভর্ণমেণ্টও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর উদ্যম সফল হলে তাঁকে ফ্রান্সে বাষ্পীয়-পোত তৈরী করবার একাধিপত্য দেওয়া হবে। আট বছর ধরে চেষ্টার ফলে তিনি যদিও কৃতকার্য্য হলেন, কিন্তু ফরাসী একাডেমী এবং গভর্ণমেণ্ট লিয়ন্‌স্ শহরের পরীক্ষাকে স্বীকার করলেন না। মনের দুঃখে জুফ্রয় আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করলেন।
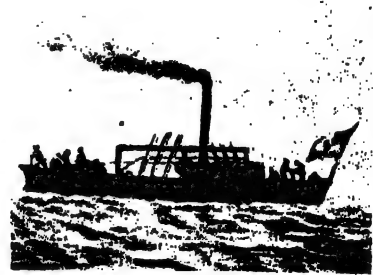
ফিট্‌চের প্রথম বাষ্প-চালিত নৌকা।

এই সময় আমেরিকায় জেম্‌স্ রাম্‌সে এবং জন ফিট্‌চ্ বলে দুজন এঞ্জিনীয়ার বাষ্প দিয়ে কি করে বোট চালান যায়, তার পরীক্ষা করছিলেন। ফিট্‌চ্ জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সৈন্যবিভাগে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন। বাষ্পের সাহায্যে বোট চালাবার কথা প্রথম ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মাথায় আসে এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়াতে তাঁর তৈরী প্রথম নৌকার

তিনি পরীক্ষা দেন। ফিট্‌চের প্রথম বাষ্প-চালিত নৌকা ঘণ্টায় তিন মাইল, কখনও চার মাইল যেত। তারপর ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে, দুবার তিনি নতুন ধরণের আরো দুখানা ষ্টীম-বোট তৈরী করলেন। শেষের খানা ঘণ্টায় ৭ মাইল হিসাবে নির্ব্বিবাদে যাতায়াত করতে লাগল।

এই সময় তাঁর স্থির বিশ্বাস হ'ল যে, বাষ্প-চালিত জাহাজের সাহায্যে সাগরও পার হওয়া যায়। যা টাকা-কড়ি ছিল তাই নিয়ে তিনি ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ঘুরে বেড়ালেন। বহু লোকের দ্বারে দ্বারে তাঁর এই প্রস্তাব নিয়ে ফিরলেন। কিন্তু কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করল না। অর্থহীন, সহায়হীন হয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি আমেরিকায় ফিরে এলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমেরিকায় তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য পেলেন না। মনের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

আটলাণ্টিক বুকে সাভানা।

ফিট্‌চ যখন ফ্রান্সে ছিলেন তখন ফুল্‌টন বলে একজন লোককে তিনি তাঁর প্ল্যান দেখান। ফুল্‌টন্ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পেন্‌সিল্‌ভানিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। কিন্তু অন্য অনেক দিকে তাঁর অসামান্য প্রতিভা ছিল। জেম্‌স্ রাম্‌সে তাঁর সেই প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ষ্টীম-বোট তৈরী করবার কথা ভাবতে বলেন। সেই থেকে ফুল্‌টন্ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ষ্টীম-বোট তৈরী করার দিকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে তিনি প্রথম তাঁর ষ্টীম-বোট তৈরী করলেন। কিন্তু সেটা এত ভারী হ'ল যে, পরীক্ষার দিনই সিইন্ নদীতে ডুবে গেল। কিন্তু তাতে হতাশ না হয়ে তিনি আর একখানা বোট তৈরী করলেন। এবার তিনি বহু চেষ্টা করে, সোজা নেপোলিয়ানের কাছে উপস্থিত হলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাষ্প-চালিত নৌ-বহর গড়ে তোলবার পরামর্শ নিয়ে তিনি নেপোলিয়ানের কাছে আসেন। কিন্তু নেপোলিয়ান সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। যদি নেপোলিয়ান ফুল্‌টনের সেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন, তা হ'লে ট্রাফাল্‌গার যুদ্ধের ফলাফল যে কি হ'ত, তা বলা হয়ত কঠিন নয়!

বিফলমনোরথ হয়ে ফুল্‌টন্ আবার আমেরিকায় ফিরে এলেন। দিনের পর দিন লোকের উপহাস আর উদাসীনতার মধ্যে তিনি আবার ষ্টীম-বোট তৈরী করতে লাগলেন। লোকে তাঁর এই ব্যাপারকে ঠাট্টা করে বলত, **Foulton's folly.** কিন্তু একদিন তাঁর এই বোকামি সার্থক হয়ে উঠল! রীতিমত যাত্রী নিয়ে তাঁর বাষ্প-পোত ৩২ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল ঘুরে এল! কোথাও একটুও গণ্ডগোল কিছু হ'ল না। ক্রমশঃ তাঁর নৌকাতে পয়সা দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করতে লাগল।

ফুল্‌টনের মৃত্যুর দু বছর পরে এক কমিটী বসে। এই কমিটীতে বিচার ক'রে দেখা হয় যে, ফুল্‌টনের বোট ফিট্‌চের বোটের মডেলেই গড়া হয়েছিল।

কিন্তু ফুল্‌টনের প্রথম সার্থক-চেষ্টার প্রায় ৫ বছর আগে স্কটল্যাণ্ডে উইলিয়াম্ সিমিংটন ব'লে একজন লোক সার্‌লটি ডাণ্ডাস্ নামে একটা বাষ্প-পোত তৈরী করেন। ক্লাইড খালের ভেতর দিয়ে দুখানা মাল-নৌকা টেনে সার্‌লটি ডাণ্ডাস্ নিরাপদে ২০ মাইল অতিক্রম করে। কিন্তু সেই খালের যাঁরা স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁরা বললেন যে, এরকম নৌকা যদি খালে চালানো হয়, তা হলে খালের পাড় নষ্ট হয়ে যাবে। এই বাজে অজুহাতে সিমিংটনের বাষ্প-পোত সেই খালের ধারেই টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ে রইল।

সিমিংটনের নৌকা দেখে হেন্‌রী বেল্ বলে আর একজন স্কচ-ম্যানের স্থির বিশ্বাস হয় যে, সিমিংটনের চেষ্টাকে এ রকম ভাবে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। বেল্ নিজে ষ্টীম্-বোট তৈরী করতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের চারদিকে জনমত তৈরী করবার জন্যে প্রচার করতে লাগলেন। সরকারী লোকদের দরজায় দরজায় অবসর পেলেই তিনি ঘুরতেন।

অবশেষে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁর নৌকা তৈরী হ'ল। তার নাম দিলেন "কমেট্"। যেদিন কমেট ক্লাইড খালে নামল, সেদিন দুই তীরে লোক! দূর গ্রাম থেকে সব লোক এসেছে দেখবার জন্য! যখন চিমনী থেকে আগুনের ফুলকী শুদ্ধ ধোঁয়া বেরোতে লাগল তখন দু-তীরে লোক বলাবলি করতে লাগল—এ নিশ্চয়ই কোনো শয়তানী কাণ্ড! নির্ব্বিবাদে যাত্রা শেষ করে যখন কমেট তীরে ফিরে এল তখন দুধার থেকে লোক ছুটে পালাতে লাগল! কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে ইংলণ্ডে ক্রমশঃ নদীতে ষ্টীম-বোট চলতে আরম্ভ করল।

ফুলটন্ এবং নেপোলিয়ান।

নদীতে ষ্টীম-বোট চলাচল নিরাপদ হলে, সাগরের ওপর গিয়ে পড়ল মানুষের দৃষ্টি। বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর আমেরিকা থেকে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে সাভানা নামে বাষ্পীয় পোত আটলান্টিক সাগর পার হয়ে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করল। সাতাশ-দিন পরে সাভানা লিভারপুলে এসে পৌছোয়। কিন্তু এই সাতাশ দিনের যাত্রার মধ্যে মাত্র ৮০ ঘণ্টা বাষ্প-শক্তিতে জাহাজ চলেছিল—অবশিষ্ট সময় পাল তুলে হাওয়ার ওপর নির্ভর করে চলতে হ'য়েছিল। এই জন্য এই তারিখটিকে আটলান্টিক পার হবার প্রথম তারিখ বলে ধরা হয় না।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাষ্প-পোতের সাহায্যে আটলান্টিক পার হওয়া হয়। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ এবং সিরিয়াস্ নামে দু'খানি বাষ্প-পোত ইংলণ্ড থেকে নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করে। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ সিরিয়াসের চেয়ে বড় এবং ভারী বলে সিরিয়াস্ ছাড়বার চার দিন পরে ছাড়ে। কিন্তু আঠারো দিন পরে দুটো জাহাজই এক সঙ্গে নিউইঃর্কে প্রবেশ করে। এর পর থেকে দেখতে দেখতে তরঙ্গ-বিজয়ী বিরাট সব অর্ণব-পোত তৈরী হতে লাগল। সমুদ্রের ভয় ধীরে ধীরে বিদূরিত হয়ে এল।

জগতের প্রথম দশটি সর্ব্ববৃহৎ বাষ্প-পোত

নাম	কোন জাতির	দৈর্ঘ্য ফিট	প্রস্থ-ফিট	কত টন ভার বহন-ক্ষম
ম্যাজিষ্টিক	বৃটীশ	৯১৫৷৷০	১০০	৫৬৫৫১
লিভিয়াথান	যুক্তরাষ্ট্র	৯০৭৷৷০	১০০৷০	৫৯৯৫৭
বেরেঙ্গেরিয়া	বৃটীশ	৮৮৩	৯৮	৫২২২৬
অলিম্পিক	বৃটীশ	৮৫২৷৷০	৯২৷৷০	৪৬৪৩৯
এ্যাকুইটেনিয়া	বৃটীশ	৮৬৮৷৷০	৯৭	৪৫৬৪৭
মরিটেনিয়া	বৃটীশ	৭৬২	৮৮	৩০৬৯৫
হোমেরিকা	বৃটীশ	৭৫১	৮৩৷০	৩৪৩৫৬
কলাম্বাস	জার্ম্মাণ	৭৫০	৮৩	৩৫০০০
প্যারিস	ফরাসী	৭৩৫৷৷০	৮৫৷০	৩৪৫৬৯
এ্যাড্রিয়াটিক	বৃটীশ	৭০৯	৭৫৷৷০	২৪৫৪৯

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস

বিওউলফের কাহিনী

১

বৃটীশ মিউজিয়ামে ছাগলের চামড়ার ওপর লেখা হাজার বছর আগেকার একখানা পুঁথি আছে। সেই পুঁথিতে বিওউলফ্ বলে একজন বীরপুরুষের কাহিনী লেখা আছে। ইংলণ্ডে যখন এ্যাঙ্গেল্স্ আর ডেন্স্রা বাস করতো, সেই সময়কার যত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই বিওউল্ফের কাহিনীই হ'ল সকলের চেয়ে প্রাচীন। সেই জন্য ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস সেইখান থেকেই সুরু হয়েছে।

আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময় ইংলণ্ডে বই-এর চলন আদৌ ছিল না। একদল লোক—তাদের মিন্ষ্ট্রেল্ বলতো—তারা গান গেয়ে গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। সেই ছিল তাদের পেশা। আমাদের দেশের বৈরাগীদের একতারার মত, তাদের হাতে একটি যন্ত্র থাকত—তাকে তারা হার্প ব'লত। সেই হার্প নিয়ে সন্ধ্যে বেলা যখন তারা এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে প্রবেশ ক'রত—ছেলে,

বুড়ো, যুবা সবাই তাকে ছেঁকে ধ'রত, ব'লত, গল্প ব'ল। জগতের সবচেয়ে পুরোনো আব্দার!

গ্রামের যিনি দলপতি, তাঁর বাড়ীর উঠোনে সকলে জড় হ'ত। সেইখানে হার্প বাজিয়ে বৈরাগী গান ধরত—জগতের আদিম সব বীরপুরুষদের কাহিনী—কেমন করে তারা ভীষণ ভীষণ ড্রাগনদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে—সাগরের তলায় গিয়ে সাগরের দানবকে হত্যা করে এসেছে—অতিকায় পশুদের সঙ্গে জগতের আদিম মানুষদের যুদ্ধ-কাহিনী। বৈরাগীকে খাইয়ে-দাইয়ে সন্তুষ্ট করে কেউ কেউ তার কাছ থেকে কিছু গান শিখে নিত। সে আবার অন্য আর একজনকে শেখাত। এমনি করে লোকের মুখে মুখে সেই সব গান ঘুরে বেড়াত।

তারপর যখন তারা লিখতে শিখলো, তারা স্বভাবতই সেগুলো লিখে রাখবার চেষ্টা করল। কাগজ তখন ছিল না। জন্তুদের চামড়ার ওপর তারা লিখতে আরম্ভ করল।

ছাগলের-চামড়ার-ওপর-লেখা এই যে বিওউল্‌ফের কাহিনী আমরা পেয়েছি—সাহিত্যের দিক দিয়ে এ অবশ্য খুব মূল্যবান্ জিনিস নয়। জগতের অন্যসব জাতির আদিম কাহিনী আমরা যা পেয়েছি, সেগুলো বিওউল্‌ফের কাহিনীর চেয়ে ঢের ভাল—এতো ভাল যে তুলনাই হয় না। এবং পণ্ডিতেরা বলেন যে, সে-সময় ইংলণ্ডে যে-সব কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল—তার কিছুই তো আমরা পাই নি! তবে এই বিওউল্‌ফের কাহিনী থেকে সেই সময়কার এ্যাঙ্গেল্‌স্ এবং ডেন্‌স্‌দের জীবন-যাত্রার অনেক কথা জানা যায়। সেই জন্যে ইতিহাসের দিক দিয়ে এর একটা মূল্য আছে।

এই কাহিনী থেকে বেশ বুঝা যায় যে, তা'রা ঝড়, বৃষ্টি, সাগর অরণ্য খুব ভালবাসত। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিকে তাদের ভাল লাগত। ঝড়ের রাতে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউএর ওপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে অজানা দেশে বেড়াতে যেতে তাদের বুক নেচে উঠত। মেয়েদের তারা শ্রদ্ধা করত, তাদের সম্মান রাখবার জন্যে পুরুষেরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

হ্রোথ্‌গার বলে ডেনমার্কের এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে গ্রেণ্ডেল বলে এক দানবের বড় উৎপাত হতে আরম্ভ হ'ল। রোজ রাত্রে নিঃশব্দে এসে চার পাঁচটি লোককে উদরসাৎ করে সে চলে যেত। বড় দুঃখে রাজা হ্রোথগারের দিন কাটে। এই দুর্ব্বিপাকের কথা গথ্‌দের দেশের রাজার ভাগ্নে বীরপুরুষ বিওউলফের কানে এসে পৌঁছল। তিনি বেরুলেন গ্রেণ্ডেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। হ্রোথ্‌গারের রাজ্যে পৌঁছলে স্বয়ং রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে রাজপ্রাসাদে স্থান দিলেন। সেইখানে একদিন রাত্রে যখন নিঃশব্দে গ্রেণ্ডেল আসছিল—বিওউলফের সঙ্গে তার তুমুল লড়াই বেধে গেল। বিওউল্‌ফ দানবটার একটা হাত ছিঁড়ে হ্রোথ্‌গারের প্রাসাদের দরজায় টাঙিয়ে দিলেন। দানবটা পালিয়ে গেল বটে কিন্তু সেই রাত্রেই সে প্রাণত্যাগ করল। হ্রোথ্‌গার রাজার রাজ্যের লোক বিওউল্‌ফকে নিয়ে সারারাত্রি খুব আমোদ আহ্লাদ করল। কিন্তু সকাল-বেলা দেখা গেল যে, তাঁদের দলের মধ্যে অনেকে মরে পড়ে আছে। সেই দানবটার মা পুত্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা নেবার জন্য এ কাজ করে গিয়েছে। পরের দিন রাত্রি বেলায় বিওউল্‌ফ অপেক্ষায় রইলেন কখন সে আসে। সমুদ্রের ধারে এক বিরাট গহ্বরে সে বাস করত। তাড়া করে বিওউল্‌ফ তাকে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং সেই অন্ধকার গহ্বরের ভেতর যখন তিনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তখন দেখেন যে, অন্ধকারে বিদ্যুতের মত, শূন্যে একটা তরবারি ঝলমল করছে। সেই দৈব-অস্ত্র নিয়ে তার শিরশ্ছেদ করে বিওউলফ ফিরে এলেন।

তারপর এক ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধে বিওউল্‌ফ ভীষণ ভাবে আহত হন এবং সেই আঘাতের ফলে প্রাণত্যাগ করেন। সমুদ্রের ধারে এক বিরাট চিতা প্রস্তুত করে এই বীরপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা হলো।

এই হ'ল বিওউল্‌ফের কাহিনী।

পিটার দি গ্রেট
(জীবনী)

১

রাশিয়ার অর্দ্ধেক দেহ এশিয়ায়, অর্দ্ধেক দেহ য়ুরোপে।
যে অংশ এশিয়ায় সেখানে শুধু বরফের মধ্যে শ্বেত ভল্লুক ঘুরে বেড়ায়।
সভ্যতার বা শিক্ষার কোনও ধার ধারে না সেখানকার লোকেরা।
পিটার দি গ্রেট যখন জন্মেছিলেন তখন সবখানি রাশিয়াই তাই ছিল—
অসভ্য, অশিক্ষিত, স্থবির, জড়।
পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার সঙ্গে সভ্যতার যোগসাধন করিয়ে দিলেন, একা!

৯ই জুন ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে জার এ্যালেক্সির ঔরসে পিটার মস্কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর মা তাঁকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরতেন, বলতেন বুকের মাণিক!
তাঁর নিজের একটা খেলা-ঘরের গাড়ী ছিল—সোনা-মণি-মুক্তা-বসান।
ছোট্ট পনী-ঘোড়ায় চড়ে চার জন লোক সেই গাড়ীর পাশে পাশে থাকত।
তাঁর দশ বছর বয়সে জার এ্যালেক্সী পরলোক গমন করলেন।
দশ বছর বয়সে রাজমুকুট পরে পিটার রাশিয়ার সিংহাসনে বসলেন।

২

ছোট্ট ছেলে রাজ্যের কিছুই জানেন না।
তখনও লিখতে পড়তে আদৌ শেখেন নি।
বড় বোন সোফিয়া ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন থেকে তাঁকে দূরে রাখলেন।
একটা দূর জায়গায় পিটারকে আলাদা করে রেখে দিলেন।
যত ধূর্ত্ত বিদেশী আসত তাদের পিটারের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।
উদ্দেশ্য পিটারকে খারাপ করা।
বালক পিটার সেই বিদেশীদের কাছে তাদের দেশের গল্প শুনত!
ভাল লাগত নতুন দেশের নতুন নতুন সব কথা।
তাদের দেশে লোক আছে যারা বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন দেয়—

তাদের দেশে বড় বড় কবি আছে, হৃদয় নিঙড়ে যারা নিত্য নব সুর বার করে।

৩

যোল বছরে সোফিয়ার ষড়যন্ত্র ভেদ করে পিটার সিংহাসনে বসলেন।

টানা টানা বড় চোখ দুটোর দিকে চাইতে লোকের ভয় হয়।

নানা লোকে নানা রকমের কথা নিয়ে আসে, নানা রকমের দোস্ত।

পিটার বলেন—এই অসভ্য রাশিয়াকে সভ্য করতে হবে!

এই জড়-পিণ্ডতে দিতে হবে নতুন প্রাণ!

এই সময় লেফর্ত বলে একজন বন্ধু পেলেন।

সে বন্ধু দিয়ে গেল পিটারের মনে সুদূরের স্বপ্ন।

একদিন এক পুরানো জিনিসের দোকানে দেখলেন একটা ভাঙ্গা জাহাজ।

সর্ব্বশরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—এর আগে আর জাহাজ দেখেন নি!

ফিরে এসে ভাবলেন, তিনি রাজা, তাঁর নৌবহর কৈ?

রাশিয়ার নৌ-বহর কই?

দেশের চারদিকে চেয়ে দেখলেন সবাই ঘুমুচ্ছে—জানবার শেখবার কেউ নেই।

স্থির করলেন, এই কোটী ঘুমন্ত লোকের মধ্যে তিনি একা জাগবেন।

প্রথমে দিন-কতক য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষা আয়ত্ত করলেন।

তারপর সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন—কাজ শিখতে!

রাজার ছেলে সিংহাসন ফেলে বেরুল ছুতোরের কাজ শিখতে!

৪

ছদ্মবেশে হলাণ্ডে এসে একটা কাবিন-বয়ের চাকরী নিলেন।

ফ্লাণ্ডার্সে এসে আঁকতে শিখলেন।

বেলজিয়ামে গিয়ে স্থপতি-বিদ্যা, ফ্রান্সে এসে চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

লণ্ডনে এসে রীতিমত এঞ্জীনিয়ারিং এবং দন্ত-চিকিৎসার শিক্ষা নিলেন।

অক্সফোর্ডে এসে আইন পড়লেন।

প্যারিসে বসে জগতের সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন।

জেনেভার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ঘড়ি তৈরী করা শিখলেন।

তারপর জিয়ন-কাঠি হাতে নিয়ে তিনি আবার ফিরলেন মরার দেশে।

৫

বুঝলেন, সৃষ্টি করতে হলে, কঠোর হতে হবে।

সমস্ত ষড়যন্ত্র কঠোর হাতে দমন করলেন।

তারপর সিংহাসনে বসে আরম্ভ করলেন, রাশিয়াকে বদলাতে।

৬

পুরানো পোষাক বদলে নতুন পোষাক সকলকে পরালেন।

অপমানকর কু-সংস্কারের বন্ধন থেকে মেয়েদের দিলেন মুক্তি।

দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করে আনালেন।

বিরাট-নৌবহর তৈরী হতে লাগল রাশিয়ার।

চারদিকে লোক পাঠালেন—প্রত্যেক জায়গা থেকে খবর আনবার জন্য।

কোথায় কি গাছ আছে—কোথায় কত পশু আছে।

কোথায় মাটির তলায় আছে খনি—বিশেষজ্ঞরা ছুটলেন সেই দিকে।

কোথায় কতদূর রাশিয়ার সীমানা—নতুন করে তৈরী হ'ল মানচিত্র।

নতুন প্রাণের প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠল নতুন শহর পিটার্সবর্গ!

পিটার দি গ্রেট।

৭

প্রতিবাদ যে হয় নি—তা নয়!

নিজের পুত্র হল এই সংস্কার-বিরোধী দলের নেতা।

নিজের হাতে আজ্ঞা দিলেন—পুত্রের ফাঁসির!

সেই সঙ্গে তৈরী করলেন নতুন আইন, নতুন দুর্গ!

মাঠের মধ্যে দিয়ে তৈরী করলেন নতুন বড় বড় রাস্তা।

সাগরের ধারে ধারে তৈরী করলেন নতুন সব বন্দর।

নগরে নগরে তৈরী করলেন নতুন সব স্কুল।

সকল কাজের শেষে লিখতে বসলেন নিজের জীবনের কাহিনী।

কত অল্প সময়ে কত পরিশ্রম তিনি করেছেন তিনি তা জানতেন না।

তাই হঠাৎ ৫৩ বৎসর বয়সে দিতে হ'ল নিজেকে।

কিন্তু আজ অসভ্য রাশিয়া জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি!

একটা সত্যিকারের মানুষ জাগলে এমনি ধারাই হয়!

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সেদিন বিনু যে কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল তাহা সে নিজেই জানেনা। ভিতরের একটা প্রচণ্ড ভাষাহীন আবেগ তাহাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট মানুষ সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। তাহার মনের চারিধারে গাঢ় কুয়াশার একটা পর্দা যেন টাঙান। সে পর্দার পিছনে সমস্ত পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গেছে।

বিকাল বেলা তাহাকে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় একটি পার্কের মধ্যে দেখা গেল। মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; সমস্ত দেহ ধূলিধূসর। পথের নিরাশ্রয় অনাথ ছেলেদের ভিতর হইতে তাহাকে আর চিনিয়া লইবার উপায় নাই।

কিন্তু ক্লান্ত হইলেও এতক্ষণে তাহার মনের চারদিককার শ্বাসরোধকারী কুয়াসা খানিকটা সরিয়া গিয়াছে। এইটুকু বালকের অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা অবিরাম পথ চলার ভিতর দিয়াই বুঝি অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।

বাড়ির কথাটা সে যেন জোর করিয়াই মন হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে। বসিয়া বসিয়া পার্কের ছেলেমেয়েদের খেলায় সে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু খানিক বাদে আর ভাল লাগিল না। সে যেন সমবয়সী ছেলেমেয়েদের চাইতে হঠাৎ অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত ছেলেমানুষী খেলা আর তাহার ভাল লাগে না। তাহার এখন ইচ্ছা করে অনেক দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে। মনের মধ্যে অনেক দূর বলিয়া যে জায়গাটা সে কল্পনা করে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। দেবুর কাছে শোনা বিদেশের গল্পের সঙ্গে তাহার খানিকটা মিল আছে—খানিকটা তাহার নিজের কল্পনা দিয়া গড়া। সেই সুন্দর দেশে যেন সব আছে। বাবা যখন ভাল ছিলেন, মায়ের মুখে যখন হাসি ফুটিত, তখনকার তাহাদের বাড়ির মত সে দেশ মধুর—আবার দেবুর বইএ পড়া ভীষণ অরণ্যের মত সে দেশ রোমাঞ্চকর।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পার্ক প্রায় খালি হইয়া আসিতেছে। ছোট ছেলে মেয়ের দল চলিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে বয়স্ক লোকেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। চারিধারের রাস্তায় খানিক আগেই আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, সেই আলোর মালার বেষ্টনীতে সমস্ত পার্কটিকে দেখাইতেছিল বড় অদ্ভুত।

অন্যদিন হইলে এই অন্ধকারে একা পার্কের মাঝে বসিয়া থাকিতে হয়ত বিনুর ভয় করিত। আজ কিন্তু সে সাধারণ ভয়-ভাবনার উর্দ্ধে কেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বেঞ্চির উপর গুটিসুটি হইয়া বসিয়া সে এখন কোথায় যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। মনে হইল আজ দেবু থাকিলে তাহার আর কোন ভাবনা থাকিত না। অনায়াসে তাহাদের বাড়ি গিয়া সে থাকিতে পারিত। কিন্তু দেবুদের বাড়ি সে আর কোন মতেই যে যাইতে পারে না।

সারাদিন তাহার চোখ দিয়া একবারও জল পড়ে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে দেবুকে মনে পড়িতেই হঠাৎ চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল। হৃদয়ের গভীরতম বেদনা-টিকে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্য এ যেন তাহার মনের একটি কৌশল। দেবুর অভাবটিকেই বড় করিয়া দেখার ছলে তাহার মন যেন ভিতরের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে চায়।

দেবুর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত দেহে বেঞ্চির উপরেই শুইয়া বিনু এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম যখন তাহার ভাঙিল তখন রাত বেশ হইয়াছে। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে অপরিচিত আবেষ্টন দেখিয়া সে একবার বুঝি ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। বেঞ্চির আর দিক হইতে ভারী গলায় কে বলিল—"চেঁচায় কেরে!"

ভাল করিয়া ঘুমের ঘোর কাটিতেই বিনু আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। লোকটার গলার স্বরে ভয় পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সমস্ত পার্ক অন্ধকার। লোকটাও হয়ত বেঞ্চির অপর পিঠে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। এবার বিনুর সাড়া না পাইয়া সে কৌতূহলী হইয়া এদিকে ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনু দেখিল গলাটা ভারী হইলেও মানুষটা দেখিতে এমন কিছু নয়। শীর্ণ ছোট-খাট চেহারা! গলার স্বর না শুনিলে

অন্ধকারে তাহাকে বালক বলিয়া মনে হইত। কোলে তাহার ছোট একটি শিশু ঘুমাইয়া আছে বলিয়াই মনে হইল।

খানিকক্ষণ বিনুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লোকটা বলিল—"এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠে শুয়ে আছ যে খোকা, যাও যাও বাড়ি যাও! রাত কত হয়েছে জান! গীর্জ্জের গড়ীতে ঢঙ্ ঢঙ্ করে এগারটা বেজে গেল এই মাত্র। হ্যাঁ ঘড়ি বানিয়েছে বটে গীর্জ্জের!—তিন মাইল দূর থেকে ঘণ্টা শুনতে পাবে। আর হবেনাই বা কেন! এযে আসল বিলিতি গোরার গীর্জ্জে!

বিনু কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত যে অনেক হইয়াছে তাহা সেও বেশ বুঝিতে পারিতেছে। বাহিরের রাস্তায় লোকজন গাড়িঘোড়া নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় বা সে যাইবে!

লোকটা কি ভাবিয়া আর একটু কাছে আসিয়া বলিল—বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ বুঝি! বাবা বড্ড মেরেছিল, কেমন? এতক্ষণে বাবার রাগ জল হয়ে গেছে, দেখগে যাও। মাও সেই কখন থেকে কাঁদছে! ছি, খোকা বাপমার ওপর কি রাগ করে!

বিনু এবার সত্যই বিহ্বলভাবে লোকটার দিকে তাকাইয়া রহিল। এ লোকটার কথায় জবাব না দিলে নয়। অথচ কিইবা সে বলিতে পারে!

কোল হইতে শিশুটিকে কাঁধের উপর ফেলিয়া লোকটা এবার এক হাত দিয়া বিনুকে একটু টানিয়া বলিল—খানিক বাদেই মালী গেট বন্ধ করে দেবে যে! তখন আর সারারাত কাঁদলেও বেরুতে পাবে না। যা উঁচু রেলিঙ। আমিই টপকাতে পারি না ত তুমি! চল, চল বাড়ি চল।

বিনুকে উঠিতেই হইল। লোকটা যে রকম নাছোড়বান্দা, না উঠিলে আরো কতক্ষণ ধরিয়া বক্‌বক্ করিবে কে জানে! অথচ পার্কের বাহিরে যাইতে তাহার একটুও ইচ্ছা নাই। এখানে তবু শুইবার একটা বেঞ্চি আছে। বাহিরে রাস্তায় রাস্তায় সারা রাত কাটাইবার কথায় তাহার সত্যই ভয় করে।

লোকটা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আবার বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিল—বাপ মা মারলে কি রাগ করতে আছে খোকা! বাপ মা হল দেবতা! কেষ্ট-বিষ্টু, কালি-কালি যা বল বাবা সাক্ষাৎ দেবতা হ'ল শুধু বাপ-মা। রোজ সকাল বিকেল বাপ-মার পা ধুয়ে একটু জল খেয়ো দেখি, মানুষ ত' মানুষ যম তোমায় ছুঁতে পারবে না। আমাদের পাড়ার নরেন বোস কলকেতা সহরে চারটে তেতালা বাড়ী, দুটো মোটর—টাকার কুমীর বল্লেই হয়—এখনো দুটি বেলা মার পায়ের চন্নামেরত তার খাওয়া চাই-ই চাই। বরাত কি আর অমনি খোলে।

তাহারা এখন পার্কের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, গ্যাসের আলোয় লোকটাকে এবার ভাল করিয়া দেখা গেল। অবস্থা যে তাহার একেবারে খারাপ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গায়ে ছেঁড়া তালি-দেওয়া একটা পাঞ্জাবী। কিন্তু সেটা বোধ হয় তাহার নিজের নয়, আলখাল্লার মত তাহা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পরণের কাপড়খানি জামার তুলনায় ফর্সা হইলেও শতছিন্ন। কাঁধের উপর যে শিশুটি ঘুমাইতেছে তাহার গায়ে কোন প্রকার জামা নাই। একটা পুরাণ গায়ের কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা চাপা দিয়া রাখিয়াছে মাত্র। লোকটার শুকনো পাকানো মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার বয়স বুঝিবার উপায় নাই। ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যে কোন বয়স তাহার হইতে পারে। সব শুদ্ধ জড়াইয়া এই শীর্ণ ছোটখাট মানুষটির চারিধারে এমন একটি অসহায় সঙ্কুচিত ভাব আছে যে দেখিলে দয়া হয়। ইহার কাছে বিনুরও যেন নিজেকে আর ছোট বলিয়া মনে হইতে ছিল না।

লোকটাও আলোয় বিনুকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ পিতৃমাতৃভক্তির সমস্ত উপদেশ ভুলিয়া সে বলিল—আহা এযে ফুলের মত ছেলে গো! এমন ছেলেকে কোন প্রাণে বাপ-মা মারে বলত! এমন পাষাণ বাপমার মুখে আগুন। কোন্ দিকে তোমার বাড়ি বাবা?

লোকটাকে এড়াইয়া যাইবার জন্য বিনু খেয়াল মত একটা দিক দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। ঘুমন্ত ছেলেটাকে সযত্নে অন্য কাঁধে বদল করিয়া লোকটা বলিল—চল বাবা, চল, আমিও যাব এই দিকে। খানিকটা তোমায় এগিয়ে দিই।

কথা না কহিয়া লোকটা বুঝি থাকিতে পারে না। খানিক দূর যাইতে না যাইতে সে আবার কথা সুরু করিল—কি বলছিলাম না তখন? হ্যাঁ হ্যাঁ বাপমার কথা। তা দেখ

বাবা, মারধোরই করুক আর যাই করুক তারা জন্মদাতা, তাদের কখনও অমান্য করবে না। বাপমাকে কষ্ট দিয়েই না আজ এই দুর্দ্দশা। তখন একটু মার খেয়ে রাগ করেছি আর আজ দুনিয়াশুদ্ধ মেরে যাচ্ছে। কার ওপর রাগ করব বল। তাই বলি, মার্ বাবা মার্, কত মারতে পারিস! এ যুগে ত আর দয়ামায়া মানুষের শরীরে নেই। যে যার্ নিজের গণ্ডাটি শুধু বোঝে।

ক্লান্ত পদে চলিতে চলিতে বিনু লোকটার কোন কথাই বিশেষ মন দিয়া শুনিতেছিল না। কাঁধের শিশুটির কান্নায় তাহার প্রথম চমক ভাঙ্গিল। তাহার কেমন সন্দেহ হইল যে লোকটা ইচ্ছা করিয়াই ছেলেটাকে কাঁদাইয়াছে, তাহারা তখন বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। রাস্তার ধারে বোধ হয় বাসের জন্যই একজন সুবেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। লোকটা হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া সটান তাহার হাত ধরিয়া ভদ্রলোকের কাছে গিয়া হাজির হইল।

তাহার পর ভারী গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া সে যাহা বলিতে আরম্ভ করিল তাহাতে বিনু ত' একেবারে অবাক! এক বছরের ওই দুগ্ধপোষ্য ছেলেটিকে রাখিয়া তাহার স্ত্রী নাকি মারা গিয়াছে। সংসারে তাহার আর কেহ নাই, চাকরী বাকরী আজ দুই বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া পাইতেছে না। একটু দুধের অভাবে ছেলেটা মারা পড়িতে চলিয়াছে। সে পুরুষ মানুষ, ছেলের যত্নের কিই বা জানে। কোথাও রাখিবার জায়গা নাই বলিয়াই নিজেই সারাদিন বহিয়া বেড়ায়। ভদ্রলোক যদি দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া সরিয়া যাইবার সময় একবার বিনুর দিকে তাকাইলেন। লোকটা তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে বিনুকে দেখাইয়া বলিল—আর এইটি বড় ছেলে মশাই। রাজপুত্তুরের মত চেহারা ছিল। খেতে না পেয়ে পেয়ে কি দশা হয়েছে দেখুন না। কোথায় কোন বদছেলের সঙ্গে মিশে বকে যাব তাই সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই। সহর কি পাজি জায়গা জানেন ত!

একটা বাস আসিয়া পড়িয়াছিল। ভদ্রলোক আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেই দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে একটা গাল দিয়া লোকটা বলিল—চামার বেটারা সব চামার! বেটাদের ঘরে যাও, দেখবে কুকুর-বেড়ালের রাজভোগ হচ্ছে, আর এমন কচি মুখ দেখে বেটাদের মায়া হয় না।"

লোকটার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিনু এবার নিজে হইতেই একদিকে চলিয়া যাইতেছিল। লোকটা পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল—এই দিকে বুঝি বাড়ি বাবা তোমার! যাও বাবা বাড়ি যাও। কিছু মনে কোরোনা বাবা, পেটের দায়ে অমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা গুলো বলি, তাতেও কি কিছু হয়! এই দেখ না রাত বারোটা পর্য্যন্ত দুধের ছেলেটাকে রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াই, চিমটি কেটে কাঁদিয়ে ভিক্ষে করি তবু দুগণ্ডা পয়সাও মেলে না। এসব পাপ জমা হচ্ছে জানি, চিত্রগুপ্তের খাতায় ঢেঁড়ার পর ঢেঁড়া পড়ছে। কি করব যে—"

লোকটা আবার কিছু বলিতেছিল। কিন্তু বিনু আর না শুনিয়া সামনের দিকে আগাইয়া গেল।

বড় রাস্তাও এখন নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। দুই একটা মোটর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল মাত্র। লোকজন একেবারে নাই বলিলেই হয়। একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় অনেকগুলা লোক শুধু মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিলেও এই অপরিচিত লোকগুলার ভিতর শুইতে বিনুর সাহস হইল না। পার্কের সেই বেঞ্চিটির জন্যই তাহার লোভ হইতেছিল। সেখানকার অন্ধকার নির্জ্জনতায় সামান্য একটু ভয় হয়ত করিতে পারে কিন্তু তবু, সে জায়গা অনেক দিক দিয়া সুবিধার। এখনও হয় ত মালী গেট বন্ধ করে নাই এই আশায় বিনু পার্কের উদ্দেশেই আবার ফিরিল। কিন্তু বেশী দূর তাহাকে যাইতে হইল না।

পথের মাঝখানে ছেলে কোলে লইয়া সেই লোকটাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—এই বুঝি তোমার বাড়ি যাওয়া খোকা? আমি ভাবলাম ছেলেটা এত রাত্রে একলা বাড়ি যাবে—একটু এগিয়েই দেখি! তোমার এমন ফাঁকি দেবার মতলব তা কেমন করে জানব।

বিশেষ কারণ না থাকিলেও বিনু এবার অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিতেছিল। মাথা নীচু করিয়া বলিল—আমার ওধারে বাড়ি নয়।

—না বাবা, তোমার চালাকীতে ভুলছিনে, চল কোথায় তোমার বাড়ি আমি তাহ'লে দেখে আসব। এমন পাগলা ছেলেও ত দেখিনি কখন। মার জন্যে মন কেমন করছে না!

বিনু চুপ করিয়া রহিল।

লোকটা বলিল—কেমন, মন কেমন করছে ত? করবে না বাবা! ও করতেই হবে, ছেলেবেলা আমি অমন কত পালিয়েছি। দিনের বেলা টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু রাত হলে আর কথাটি নেই, সুড় সুড় করে বাড়িতে গিয়ে হাজির। মাকে না দেখে কতক্ষণ থাকা যায়!

নিজের মনে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বিনুর মুখের দিকে চাহিয়া লোকটা থামিয়া গেল। কাতর ভাবে বলিল, কি হ'ল বাবা! ছিছি এত বড় ছেলে কাঁদে নাকি! চল বাড়ি চল।

বিনু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—আমার বাড়ি নেই!

—বাড়ি নেই? খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটা বলিল—এই ব্যাপার। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বাবা আবার বিয়ে করেছে, সৎমা উঠতে বসতে মুখ নাড়া দেয়, কেমন? তাইত ভাবি ছেলেটা বাড়ি যেতে এমন নারাজ কেন! এত শুধু রাগের ব্যাপার নয়!

বিনু এ কথায় কোন প্রতিবাদই করিল না। উচ্ছ্বসিত হইয়া এইবার সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লোকটা খানিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল তারপর হঠাৎ বিনুর হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ বাবা চল্, অমন বাপ-মায়ের কাছে তোকে আর যেতে হবে না। নকুড় দাস ভিক্ষে মেগে খায় তবু ছেলের অযত্ন সইতে পারে না। আমাদের যদি জোটে ত তুইও খেতে পাবি, না জোটে শুকিয়ে মরবি! কি করবি বল্, যেমন বরাত করেছিস্। তবু দরকার নেই অমন সৎমার ঘরে গিয়ে। মাগী কোনদিন হয়ত বিষই দিয়ে দেবে। বেটিরা সব পারে!

নকুড় দাস নিজের মনে বকিতে বকিতেই চলিল। বিনুর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া আর কিছু ছিল না। নকুড়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার আর কোন চেষ্টা সে করিল না।

(ক্রমশঃ)

অন্তঃপুর

—বিষ্ণুশর্ম্মা

চীনা মহিলাদের পারিবারিক অবস্থা

গতবারে চীনা মহিলাদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে চীনা মহিলারা বাঙ্গালী মহিলাদের অপেক্ষা যে বেশী স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন তাহা নহে বরং বহু বিষয়ে তাঁহাদের অসুবিধা আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চীনা-মহিলারা নিজেদের অসুখী বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য—গৃহিণী হওয়া, কারণ, গৃহিণী-পদাভিষিক্ত হইলেই তাঁহারা অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকেন। বধূ-অবস্থায় তাঁহাদের বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, স্বামীর ছায়ানুগামিনী হইয়া থাকিলেই যে তাঁহাদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশপালনে কোন প্রকার ত্রুটী ঘটিলে তাঁহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকেনা। স্বামীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি থাকিলেও শ্বশুর বা শাশুড়ীকে কোনমতে অবহেলা করা চলেনা। সমাজের সর্ব্বত্র এইরূপ রীতি বর্ত্তমান থাকায় বাল্যকাল হইতে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও নম্রতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।
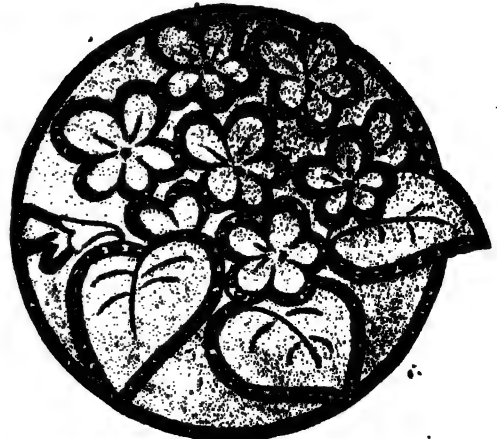
প্রথমে ডিজাইনের চারিপাশ বুনিয়া গোড়া-পত্তন করিতে হইবে।

অনেকে হয়তো ভাবিতে পারেন যে এইরূপ অবস্থায় মেয়েরা কখনই সুখে থাকিতে পারেন না কিন্তু সুখের পরিমাপ সর্ব্বত্র সমান নহে। পাশ্চাত্য মহিলাসমাজের আলোচনা করিতে বসিয়া প্রাচ্যের মহিলারা হয়তো বলিবেন যে তাঁহারা মোটেই সুখী নহেন, আবার একথা অপর পক্ষও বলিতে

সাটিনের বুনানিতে ক্রমে ক্রমে পাতা ও ফুল তৈয়ারি করিতে হইবে।

পারেন—আসল কথা যাঁহারা যেরূপভাবে জীবনযাত্রা পালন করিতে অভ্যস্ত এবং যে সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত, তাঁহারা তৎসমাজভুক্ত অপর মহিলারা কতখানি সুখ-সুবিধা ভোগ করেন তাহা লইয়াই বিচার করিতে অভ্যস্ত বলিয়া বাহির হইতে অপরে যতটা তাঁহাদের অনুন্নত অবস্থার কথা ভাবিয়া দুঃখিত হন তাঁহারা নিজেরা সেরূপ হন্ না

বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ সম্পর্কে স্ত্রীর অসুখী হওয়ার কথা খুব অল্পই শোনা যায়। তবে মাঝে মাঝে কয়েকটি পরিবারে শাশুড়ীর অত্যাচারের জন্য বধূদের অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয় এবং অনেক সময় নিরুপায় বধূরা আত্মহত্যা করিয়াও সকল জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। চীনাদের ধারণা, শত্রুকে জব্দ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কৌশল শত্রুর বাটীতে গিয়া আত্মহত্যা করা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চীনা বধূরা শাশুড়ীকে জব্দ করিবার জন্য আত্মহত্যা করে—অবশ্য মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব আছে বলিয়াই এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

চীনে বহুবিবাহের প্রচলন থাকাতে মেয়েদের সময় সময় কষ্ট ভোগ করিতে হয়—কিন্তু সকলেই যে বহু বিবাহ করে তাহা নহে। প্রথমা স্ত্রীর সন্তানসন্ততি না হইলে অনেক পুরুষ বংশরক্ষার জন্য বিবাহ করে। দারিদ্র্যের মধ্যে দুই পত্নী গ্রহণ করার অবস্থা সকলের না থাকাতে শতকরা নিরানব্বই জন একটি বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

চীনদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা অপর যে কোন দেশের তুলনায় অধিক দেখা যায়। পরিবারে সকল পুরুষদের আহার শেষ হইলে তবে মেয়েরা আহার করিতে পায়। মেয়েরা পুরুষদের সহিত একত্র ভোজন করেনা—পুরুষরা সাধারণতঃ বাহিরে রৌদ্রে বসিয়া আহার করে এবং মেয়েরা অন্তঃপুরে ভোজন করিয়া থাকে। যাহারা অবস্থাপন্ন তাহাদের গৃহে স্ত্রীপুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ আছে এবং অতিথিদের অপর কক্ষে আপ্যায়িত করিবার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের বাহিরে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইলে কিন্তু পুরুষদের অত্যন্ত সম্মান দেখাইতে হয় অতি দরিদ্র ব্যক্তিও মেয়েদের বাহিরে যাইবার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকে। হয়তো একটি গাড়ীতে একটি মাত্র লোকের বসিবার ব্যবস্থা আছে, সে ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজে পদব্রজে গমন করে, কখনও স্ত্রীকে হাঁটাইয়া লইয়া গিয়া নিজে পথশ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করে না।

এইবার চীনের অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাদের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। চীনা মহিলারা যে-অন্তঃপুরে থাকেন তাহা বাসযোগ্য হইলেও কারাগারের অনুরূপ। বাহিরে কোন জানালা নাই, ভিতর-বাটীতে কয়েকটি দরজা জানালা আছে। পুরুষদের দৃষ্টি হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য বাহিরের দিকে বিরাট পাঁচিল তুলিয়া দেওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা

পাপড়ি ফুটাইয়া তুলিতে কেমন করিয়া সূচ চালাইতে হইবে, এ চিত্রে তাহা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।
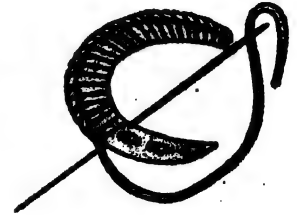
বলিয়া চীনাদের ধারণা। অন্তঃপুর ও বাহির-বাড়ী প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আছে। অবস্থাপন্ন গৃহে অন্তঃপুর সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন নিয়মকানুন বর্ত্তমান। বনিয়াদী ঘরের মহিলারা বাহির-বাড়ীতে কখনও পদার্পণ করেন না। কুলীরমণী বা

অন্যান্য শ্রমিক মেয়েদের যে স্বাধীনতা আছে ইঁহাদের তাহা নাই। নব বৎসরের প্রথম দিনে একবার মাত্র স্বামীর সহিত তাঁহারা বাহিরের পার্কে প্রকাশ্যে বেড়াইতে পান কিম্বা এক
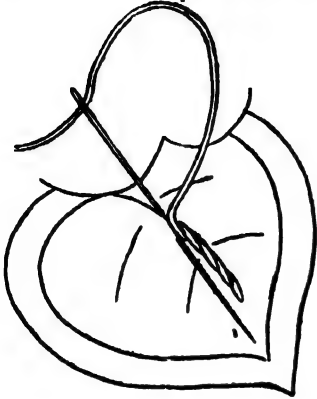
ডাঁট ও পাতার শিরা তুলিবার রীতি।

দিন দুইদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পান। তাহা ছাড়া কোন মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন চীনা মহিলা সাধারণতঃ পিত্রালয়ে যাইতে চাহেন না, কারণ সেখানে তাঁহাদের সমাদর তো হয়ই না উপরন্তু তাঁহাদের পিতামাতা অবর্ত্তমান থাকিলে পিত্রালয়ের অপর আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের বিশেষ সুচক্ষে দেখে না। এইজন্য স্বামীগৃহই তাঁহাদের নিকট সকলের চেয়ে আপনার এবং যে কোন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্না মহিলার পক্ষে অপর কোথাও একরাত্রির জন্য থাকাও মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা আছে বলিয়া বড় বড় ঘরের মেয়েরা কোন থিয়েটার বায়স্কোপে যান না। মাঝে মাঝে বাটীতেই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইলে তাহাই দেখিতে পান। নানা প্রকার সূচীশিল্প ও স্বামীর পরিবারবর্গের জন্য নূতন নূতন বন্ধন করা বনিয়াদী ঘরের মেয়েদের নিত্যকর্ম্ম। তাহা ছাড়া ঘরের ভিতরে বসিয়া যতটুকু পুরুষদের সাহায্য করা সম্ভব তাহাই মেয়েরা করিতে পারেন।

চীনামেয়েরা সাজসজ্জা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। সাধারণতঃ মেয়েরা পায়জামা ও পুরুষদের মত পাঞ্জাবী পরিয়া থাকে, কিন্তু বড় ঘরের মেয়েদের সিল্কের গাউন ও অন্যান্য পোষাক-পরিচ্ছদে সত্যই সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাকেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, তবে শীতকালে ঠাণ্ডার হাত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য যখন জামার উপর জামা পরাইয়া চীনাসুন্দরীরা ছেলেদের বাহিরে পাঠান, তখন তাহাদের কাপড়ের পুঁটুলি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। মেয়েদের গহনার মধ্যে হাতের বালা, মাকড়ী ও হার সর্ব্বপ্রধান, তাহা ছাড়া খোপার সজ্জার জন্যও যথেষ্ট আড়ম্বর করা হইয়া থাকে। চীনামেয়েদের খোপা বাঁধিবার রীতি অনেকটা আমাদের বাঙ্গালাদেশের মত হইলেও কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের মেয়েরা চুলকে সম্মুখের দিকে একটু টানিয়া দেন, কিন্তু ওদেশের মেয়েরা ঠিক তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, পিছনের দিকে চুলকে টানিয়া খোপার প্রতি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। এই খোপার ভিতরে ভিতরে বহু প্রকার বিচিত্র গহনা সন্নিবেশিত হয়।

চীনামেয়েদের শিক্ষাবিষয়ে কতটা অভাব আছে তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। নারী যে পুরুষের চেয়ে সকল বিষয়ে ছোট এ ধারণা চীনাদের মজ্জাগত। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মেনসিয়ুস্ (Mencius) বলিয়াছেন যে প্রাত্যহিক কোন কর্ম্মে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। যদি কোন অপরিচিতা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী, মাতা ছাড়া অপর কোন মহিলা ডুবিয়াও যান তাহা
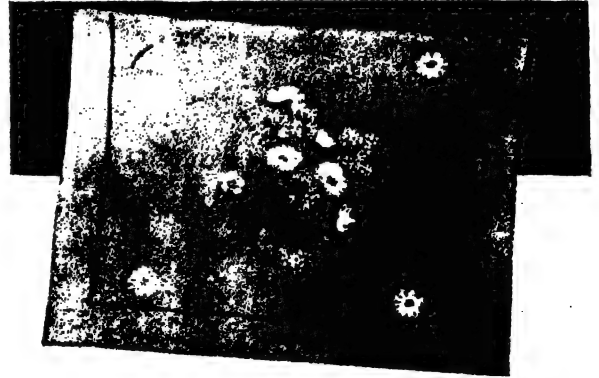
টেবিল ও চেয়ারের ঢাকনি হিসাবে এই ফুলের ডিজাইনটি সুন্দর।

হইলেও কোন পুরুষ তাহাকে বাঁচাইবে না, কারণ বাঁচাইতে গেলে তাহাকে স্পর্শ করিতে হইবে এবং ইহার চেয়ে অসভ্যতা আর কিছু হইতে পারে না। তবে সুখের বিষয় এই যে,

চীনের পুরুষরা শতকরা নব্বইজন এই কঠোর নিয়মকে অনুসরণ করেন না। নারী ও পুরুষের সর্ব্বত্র বিরাট ব্যবধান থাকিলেও চীনের যুবক-যুবতীরা পরস্পর গোপনে দেখা করিয়া প্রেমেও যে পড়েন তাহার দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারা যায়। অবশ্য প্রেমে পড়িয়া যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহারা সময় সময় চীনে-সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকেন।

মেয়েরা রূপসী হইলেই যে সম্মানিতা হইবেন তাহা নহে। চীনে একটি প্রবাদ আছে যে কুৎসিতদর্শনা ও মূর্খা নারী চীনসমাজের সম্পদ এবং যাঁহারা ইঁহাদের বিবাহ করেন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্। কিন্তু প্রবাদ যাহাই থাকুক না কেন সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক—সেই জন্য অনেক সময় কুৎসিত বধূ আনিয়া, সুন্দরী পতিতার নিকট গমনাগমন করা বহু পুরুষের পক্ষে লজ্জাকর নয়, এমন কি অনেক সময় পিতামাতাও এই বর্ব্বরতার অনুমোদন করেন।

কাপড়ের কাজ

হাল্কা নীল সিল্কের কাপড়ে রঙিন্ সূতা দিয়া বহু বিচিত্র ফুলের গুচ্ছ বুনিতে পারা যায়। যাঁহারা সামান্য বুনিতে পারেন তাঁহারাও চেষ্টা করিলে চিত্র-প্রকাশিত ডিজাইন তৈয়ারি করিতে পারেন। গাছের ডাঁটিগুলির জন্য ঘোর কাল বা নীল-রংয়ের সিল্কের সূতা ব্যবহার করিবেন। ফুলগুলির মধ্যস্থান বুনিবার জন্য হরিদ্রাবর্ণের সূতা ও পাপড়ির জন্য সাদা সূতার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ছোট ছোট কণিকাগুলি গোলাপী বা লাল রংয়ের সূতা ব্যবহার করিয়া তৈয়ারী করিতে পারেন। টেবিল ক্লথ কিম্বা কুশনের উপর এইরূপ সূচীকর্ম্ম করিলে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত কাঁথার উপর বা কাপড়ের উপর প্রত্যেক কোণের কাজ করিবার জন্য কয়েকটি চিত্র দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি পাতা কি ভাবে করা যাইতে পারে এবং আপনারা কি ভাবে ছুঁচের ব্যবহার করিবেন তাহাও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সামান্য পরিশ্রমে এই ডিজাইন তোলা সম্ভব

আইভানের দুর্গতি

—লিওনিদ্ লিওনভ

আইভান যে সামান্য উপহারটি আনিয়াছিল তাহা দেখিয়া লেনকা হাসিয়া উঠিল। সে সেটাকে গোল করিয়া পাকাইয়া আইভানের পায়ের কাছে বরফের উপর ফেলিয়া দিল। এবং আইভানের দুঃখ দেখিয়া লেনকার দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, কোমরে হাত রাখিয়া সে হাসিয়া উঠিল। সৌভাগ্য বশতঃ সে হাসি আইভানের কাণে পৌঁছিল না……

আইভান্ যখন পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক মাত্র, মাঠে মাঠে কাজ করিয়া বেড়ায়, সেই সময় একবার তাহার জর হয়। জর যখন কিছুতেই সারে না তখন প্রতিবেশীরা সকলে তাহাকে তাহার ভূম্যধিকারিণীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পরামর্শ দিল। তিনি একা বাস করিতেন ও নিজের প্রচুর অবসরজনিত অবসাদ দূর করিবার জন্য কৃষকদিগের অসুখ-বিসুখের সময় ঔষধাদি বিতরণ করিতেন। তিনি আইভানকে যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইন দিয়া বলিলেন—এতে তুমি হয়ত কালা হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার জর সেরে যাবে! বাস্তবিক, কুইনাইন খাওয়ার পর আইভানের জর সারিয়া গেল, কিন্তু সে যে হঠাৎ বধির হইয়া গিয়াছে আনন্দের আতিশয্যে তাহা তখন লক্ষ্য করিল না। এই বধিরতা তাহার চাষ-বাসের

কাজে কোন বিঘ্ন জন্মায় নাই, প্রতিবেশীদিগের সহিত কলহের হাত হইতে সে মুক্তি লাভ করিল, তাহাকে যুদ্ধেও যাইতে হইল না। এই বধিরতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পাইতেছিল, কিন্তু সে ইহাতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে এই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা তাহার নিকট বেশ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবী তাহার চক্ষে এক নীরব সোৎকণ্ঠ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আকাশে শুধু মেঘ ও পাখী ভাসিয়া যায়, মাটিতে ঘাস গজায়, তুষারপাত হয়···পৃথিবীতে যে মানুষও বাস করে, আইভান তাহা লক্ষ্যই করিত না। সংসারের লোকেরাও তাহাকে তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে লাগিল। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ছুতার-মিস্ত্রীর কাজ জানে বলিয়া লোকের নিকট তাহার খ্যাতি ছিল, তবুও তাহাকে প্রায়ই অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হইত। সে তাহার নিজস্ব নিস্তব্ধ জগতের পাখী, ঘাস কিংবা অন্য কোন বস্তুকে বিরক্ত করিত না, তবু পুরোহিত তাহাকে দিয়া কবর খনন করাইয়া লইয়া পয়সা দিত না, বালকেরা তাহার সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া পুকুরে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। তাহার জীবন এইরূপ নানা দুর্ঘটনায় পূর্ণ ছিল। তাহাতে সে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিত না। তাহার মনে হইত ইহাই সংসারের রীতি, এ সব তাহার জীবনের সামান্য আনন্দটুকু লোপ করিতে পারিবে না। তাহার একমাত্র ক্ষোভের বিষয় ছিল, সে লেনকার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। শুধু সেইজন্যই সে মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করিত।

আইভান অতি বিনীত ভাবে রুমালখানা বরফের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া বুকের মধ্যে রাখিল। গ্রামের ছেলেরা এই সরল লোকটিকে ঘিরিয়া বরফের উপর নাচিতেছিল ও তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুই শুনিতে পাই না। তাহার এক মাসীমা ছিলেন। সে যখন ভাগ্য-বিড়ম্বনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িত, তখন তিনিই তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। সে তাহার এই মাসীমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। মাসীমাটি প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এক সমৃদ্ধ গ্রামে বাস করিতেন। সেখানে গ্রামের পুরোহিতের বাড়ীতে তিনি নার্সের কাজ করিতেন। অতি চমৎকার স্বভাবের স্ত্রীলোক তিনি, নাম মেরিয়া। আইভান তাহার দুঃখ-কষ্ট লইয়া প্রায়ই তাহার নিকট আসিত ও দিন তিনেক অতিথিরূপে থাকিয়া মাসীমার উপদেশে নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিত। সংসারের দুঃখ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

সেই বৎসরই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সমস্ত পৃথিবী এক দুঃসহ বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠে। যুদ্ধশেষে, গৃহের স্বজন-বান্ধবদিগকে দেখিবার আশায় ও নূতন করিয়া জীবন-গঠনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া, সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলে। আইভান যে গ্রামে বাস করিত, তাহা একটি সদর রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল বলিয়া তাহার উপর দিয়া সৈন্যেরা দলে দলে যাতায়াত করিত। রাস্তাটি একটি উচ্চ বাঁধের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছিল। উজ্জ্বল সায়াহ্নে দেখা যাইত, সৈন্যগণ ক্লান্ত দেহে দলে দলে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মুখমণ্ডল ক্রোধে কালিমাময়, দেহ অস্ত্রভারে অবনত। প্রতিকূল অবস্থায় ব্যবহার করিবার জন্য এই অস্ত্রভার তাহারা বহন করিত। সৈন্যেরা যখন কৃষকদিগের কাছে রুটী চাহিতে আসিত তখন চাষীদিগের মন দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু নিস্তব্ধতার অভেদ্য দুর্গপ্রাকারে বন্দী আইভানের মনে কোনদিন বিন্দুমাত্র ত্রাসের সঞ্চার হইত না।

চারিদিকে কি ঘটিতেছিল সেদিকে আইভানের কোন খেয়াল ছিল না। মৃদুমন্দ ভাবে বরফ পড়িতেছিল; লঘু অন্ধকারে লেনকার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মাসীমার জানালার দূর আলোক লক্ষ্য করিয়া বরফরাশির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে সে বেশ আরাম বোধ করিতেছিল। লেনকা সুন্দরী ও দাম্ভিক; তাহার পক্ষে আইভানের মত একজন সামান্য ঠিকা কারিকরকে বিবাহ করা সম্ভব নয়;—সে যখন ইহা বুঝিতে পারিল, তখন সঙ্কল্প করিল, যে রুমাল-খানা লেনকা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সেটা তাহার মাসীমাকে কৃতজ্ঞার চিহ্ন স্বরূপ দিবে। মাসীমা হয়ত ছুটির দিনে সেটা মাথায় বাঁধিতে পারিবেন আর এই অনাথ লোকটির কথা মনে করিবেন।

আইভান যখন বন পার হইয়া গ্রামের পথে পা দিয়াছে, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। গ্রামটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। গির্জ্জার ঘণ্টা-ঘরটি আকাশ স্পর্শ করিয়াছে; নীচে সন্ধ্যাবেলার পাখীরা উড়িয়া বেড়াইতেছে। আইভান্ পুরোহিতের বাড়ী যাইবার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল ও নিকটে পৌছাইয়া দ্বারে আঘাত করিল। সে ভাবিয়াছিল মাসীমা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। কিন্তু যে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল সে তাহার মাসীমা নয়, গৃহ-স্বামীর মেয়ে। ব্যাপারটা আইভানের নিকট অসঙ্গত বোধ হইল; তাহার বুক দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। অপরাধীর মত হাসিয়া ও টুপীটা হাতে করিয়া সে বালিকার দিকে তাকাইল। বালিকা তাহার ফেল্টবুটপরা পা দিয়া রাগে মাটিতে আঘাত করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল।

বালিকার চীৎকারে নিদ্রালু পুরোহিত বাহির হইয়া আসি-লেন—তাঁহার পরণে ডোরাদার পায়জামা, চুলগুলি অযত্ন-বিন্যস্ত, মুখে রাগের চিহ্ন।

সুপ্রচুর কেশের মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে তিনি বলিলেন—বুড়ী মারা গেছে। তোমার মাসীমা মারা গেছে।

আইভান তখন পুরোহিতকে ধন্যবাদ দিবার জন্য বিনীত ভাবে মাথা নত করিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঐরূপভাবে বসিয়া রহিল। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল সে দেউড়ীতে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে বন্ধ দরজার কাছে মাসীমার জীর্ণ সুট-কেশটা, আর আর তাহার টুপীটা মাটীতে পড়িয়া আছে। সে টুপীটা তুলিয়া পাতলা চুলের উপর বসাইয়া বুকের ভিতর হইতে রুমালখানা বাহির করিল। সংসারে এখন তাহার আর কেহ নাই যাহাকে সে এই রুমালখানা দিতে পারে। হতবুদ্ধি হইয়া সে একদৃষ্টে রুমালখানার দিকে চাহিয়া রহিল। তেমন কিছু দামী রুমাল নয়, কিন্তু আইভানের চক্ষে তা-ই কত সুন্দর! লঘু অন্ধকারে সেটা জলজল করিতেছিল আর আইভানের মনে হইতেছিল যেন তাহাতে তাহার হাত পুড়িয়া যাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি সেটা বুকের ভিতর পূর্ব্বস্থানে ঠেলিয়া দিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিতের বাড়ীর জানালা হইতে ক্ষীণ আলোকরেখা তরল অন্ধকার ভেদ করিতেছিল। সেই আলোকে সে দেখিতে পাইল বরফ পড়িতেছে।

এই বৃহৎ জনপদে তাহার আর কোন আশ্রয় ছিলনা। সে যে লেনকার কাছে ফিরিয়া যাইবে রাস্তায় নেকড়ের উৎপাতে সে উপায়ও ছিলনা। দিশেহারা ভাবে একটু হাসিয়া সে আপন মনে বলিল—"আমার দুর্ভাগ্য!" সেই গ্রামের এক বিধবা স্ত্রীলোকের একটি পানশালা ছিল। সে স্থির করিল সেইখানেই রাত্রির জন্য আস্তানা খুঁজিবে। এই বিধবা আপেল হইতে একরকম পানীয় প্রস্তুত করিত। সমস্ত জেলায় এই পানীয় প্রসিদ্ধ ছিল। আস্তিন গুটাইয়া সেই পীবরপয়োধরা "আমাজন"-সদৃশ স্ত্রীলোকটি নিতান্ত ব্যবসায়ী লোকের মত আইভানের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটি বোতল আনিয়া দিল।

"জিনিষটা একটু বেশী ঘন হয়েছে, জল মিশিয়ে নিতে হবে—" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি কান পাতিয়া সেই নৈশ নিস্তব্ধতায় এক প্রকার গোঙানি শব্দ শুনিতে লাগিল। "এলকিম আবার তার স্ত্রীকে মারছে। সে গালের ওপর মারতে ভালবাসে। বলুনত' সংসারে কত রকম প্রবৃত্তিই লোকের থাকে।" লোকটি যে শুনিতে পায় নাই সহসা মেয়েটি তাহা টের পাইল। অমনি তাহার মাথায় একটা মতলব আসিল—সে স্থির করিল, রাত্রে এই বধির লোকটিকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া সে তাহার একঘেয়ে বৈধব্য-জীবনে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আনয়ন করিবে। ইহা ভাবিয়া সে তাহার মুখখানা আইভানের নিকট আগাইয়া দিয়া তাহার পিঠে পুরুষোচিত ভাবে একটা চড় মারিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল ও তাহাকে কুটীরের ভিতর ঠেলিয়া দিল। লাল রংয়ের একটা জামা সে সেলাই করিতেছিল। সেটি টেবিলের উপর আলোর কাছে পড়িয়াছিল। সেজন্য যে আগুণে সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা হইতে যে বাষ্প উঠিতেছিল তাহাও লাল দেখাইতেছিল। আইভান তাহার স্বাভাবিক অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কুটীরের ভিতরে গেল ও ষ্টোভের পাশে বসিয়া একাগ্র মনে স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিল। বিধবাটি টেবিলের উপর খাবার সাজাইতে লাগিল—আপেল, বাদাম ও আইভানের কেনা বোতলটা। তারপর পেটের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভাবে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া সে আইভানকে বলিল, সে যেন এ বাড়ীকে নিজের বাড়ীর মতই মনে করে। আইভান টেবিলের উপর হইতে গ্লাস তুলিয়া লইল ও মুহূর্ত্তকাল ভিতরের তরল পদার্থে নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিল, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক চুমুকে সবটুকু নিঃশেষ করিয়া আর এক গ্লাসের জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু কি জানি কেন সে ইতস্ততঃ করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল।

বিধবাটি ক্ষুণ্ণ মনে তাহার এই সকল অসংলগ্ন হাবভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

একটা শক্ত আপেলের খোলা কামড়াইতে কামড়াইতে সে বলিল—অমন কাঁদ-কাঁদ মুখে বসে আছ কেন? ফূর্ত্তি কর! কারো উপর রাগ করেছ বুঝি?...তোমাকে দেখে মনে হয় যেন জীবনে তোমার কিছুই নেই। রাত্রি বেলায় কাকেরাও নিজ নিজ বাসায় ফিরে যায়, কিন্তু তুমি যেন একা গৃহহীন, অনাথ!—এই বলিয়া সহানুভূতিসূচক দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া সে তাহাকে প্রণয়ের সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। তোমার চোখ দুটি রোগা, চঞ্চল...পুরুষ কি করে অমন চোখে মেয়েদের দিকে তাকাতে পারে? মেয়েরা ধূর্ত্ত জীব...তারা আমোদ চায়। আর কেউ হ'লে কখন্ তোমাকে দরজা দেখিয়ে দিত! তোমার জন্য দুঃখ হয়।

আইভান চুপ করিয়া প্রদীপের হলদে শিখাটা দেখিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, পথে নেকড়ের উৎপাত, সঙ্গে দেশলাই থাকিলে ভাল হইত। ইতিমধ্যে বিধবাটি তাহার পাশে সরিয়া আসিল ও তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আইভানের সে দিকে কোন খেয়ালই ছিল না। মদ খাওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না বলিয়া সে শীঘ্রই মাতাল হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু তাহার মাসীমার সুট-কেশটার কথা ভাবিতেছিল। বেঞ্চ হইতে উঠিবার তাহার কোন প্রবৃত্তি ছিল না। এমন সময় স্ত্রীলোকটি আলো নিবাইয়া দিল। আইভান হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সে অন্ধকারে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘুষি চালাইতে লাগিল ও পাথরের মত শক্ত একটা জিনিষের উপর আঘাত করিয়া বসিল। কিন্তু তাহার

সেই আত্ম-রক্ষার চেষ্টাকে উপহাস করিয়া লাল বাষ্পরাশি হাসিয়া উঠিল…

ভোরের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিল তাহার সম্মুখে বনের সেই ছায়াশীতল শান্ত পথটি, তুষার-কণাচ্ছন্ন বৃক্ষশাখাগুলি সেই পথের উপর আনমিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ সমস্তই তাহার মনে লেনকার জন্ত একটা অস্থির অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিল।

লোক-নিন্দা এড়াইবার জন্ত ও আইভানের নিকট প্রণয়-ব্যাপারে নিরাশ হইয়া বিধবা সকাল বেলা তাহাকে তাড়াতাড়ি জাগাইয়া অভুক্ত অবস্থায় ধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিল। তাহার অবসন্ন মুখে বিগত রজনীর কোন চিহ্নই ছিল না, কিন্তু আইভান অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। সন্ত্রান্ত চাষীরা তখনও পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসে নাই।

এক মিনিট কাল অকৃতসঙ্কল্প ভাবে দাঁড়াইয়া সে শুনিতে পাইল তাহার পিছনে সশব্দে দরজা অর্গলবদ্ধ হইয়া গেল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কলঙ্কহীন বরফের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার হাত-পা ব্যথা করিতেছিল। চলিতে চলিতে সে স্বপ্নে দেখা সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখানে আসিয়া তাহার ব্যথা ও লজ্জা দুই-ই দূর হইল—তাহার বোধ হইল যেন তাহার অন্তরের নিস্তব্ধতা পৃথিবীর নিস্তব্ধতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। তাহার প্রিয় গাছগুলির নাম সে জানিত, প্রত্যেক জুনিপারের ঝোপের আকৃতি তাহার কাছে পরিচিত ছিল। ইহার আগে এখানে সে কত বার আসিয়াছে। কিন্তু এখন প্রভাতের এই মৌন গাম্ভীর্য্যে সে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল, মনে হইল যেন তাহার অন্তরের সত্য এখানে মূর্ত্তি ধরিয়াছে। তাহার মন আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিল। শরীর হাল্কা বোধ হইল, মনে হইল এ দেহ-ভার বহন করা তেমন কঠিন কাজ নয়। হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল, সে কিছুক্ষণ প্রাণ খুলিয়া চীৎকার করে, কিন্তু দূরে রাস্তায় কয়েকটি 'স্লেজ' গাড়ী দেখিয়া নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল।

"ওহে ছোকরা জলদি পালাও…ক্রুটিলিনের বাড়ী থেকে কাল রাত্রে একটা ঘোড়া চুরি গেছে"—একজন বৃদ্ধ তাহার 'স্লেজ' হইতে তাড়াতাড়ি চেঁচাইয়া এই কথাগুলি বলিল কিন্তু আইভানকে চিনিতে পারিয়া সে শুধু হাত দোলাইয়া ইঙ্গিত করিয়া ঘোড়াটাকে ছুটাইবার জন্য ঠোঁট দিয়া একটা শব্দ করিল। বৃদ্ধের কথাগুলির মধ্যে উদ্বেগ ছিল, কিন্তু আইভানকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। যাত্রার শেষে এখন সে গতদিনের সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল,—এখন সে শুধু ক্ষুধা বোধ করিতেছিল। শেষে বন ছাড়িয়া সে যখন তুষার-ঢাকা সমান ভূমিতে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার মন ভাবী দুর্গতির সম্মুখীন হইবার জন্ত অনেকটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বেলা তখন দুপুর হইয়া আসিয়াছিল, আইভান সামরিক পোষাক পরা অপরিচিত লোক দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল।

গ্রামের নিকটে আসিয়া একটা টিলার উপরে উঠিয়া আইভান বিষণ্ণ ভাবে থামিল। নীচে চাহিয়া দেখিল, গ্রামের গোলাবাড়ীর কাছে এক বিরাট জনতা জমা হইয়াছে; মনুষ্যশিরের উর্দ্ধে অসংখ্য ক্রুদ্ধ মুষ্টি উঠিতেছে, সংখ্যাতীত ফেল্টবুট পরা লোক রাগের সহিত বরফের উপর চলাফেরা করিতেছে; জনতার উপরে ঘন নিঃশ্বাস-বাষ্প ভাসিতেছে, মাঝে মাঝে চাষীদের সঙ্গে কয়েকজন অপরিচিত সৈনিক মাটীতে পদাঘাত করিতেছে। তাহারা সংখ্যায় প্রায় বার জন। তাহারাও জনতার সঙ্গে মিশিয়া রাত্রির ঘটনা আলোচনা করিতেছিল। দুই জন দাড়িওয়ালা নিরীহ প্রকৃতির চাষী কামার জোটোভকে ধরিয়া রাখিয়াছিল ও যাহাতে সে পালাইতে না পারে সে জন্ত অন্তেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কামার জোটোভ জেলার একজন দাগী ঘোড়া-চোর। সে তাহার নির্দ্দয় বিচারকদিগের প্রতি চাহিয়া বিষণ্ণ ভাবে হাসিতেছিল। সে নিজের মনকে কঠিন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিল ও থুথু ফেলিতেছিল—যেন সে নিজের অদৃষ্টের জন্ত প্রস্তুত। আর একজন কৃশ, লম্বকায় কৃষক—ক্রুটিলিন স্বয়ং—প্রাচীনদের কাছে সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল…অপরিচিত সৈন্যদিগের কাছে—ততটা নয়, যতটা তাহাদের বন্দুকগুলির কাছে। বলিতে বলিতে সে বারবার বন্দুকের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিতেছিল।

ক্রুটিলিন এই সামরিক আদালতের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—চাষী ভাইগণ, এর মানে কি? এখন কি করি? …কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য কর্ত্তৃপক্ষ করে নাই, নিজেদের হাতেই এখন আইনের প্রয়োগ করতে হবে। তোমরা যদি সাবধান না হও, তা হ'লে আজ চোরে আমার ঘোড়া নিয়েছে, কাল সে তোমাদের ঘরবাড়ী শুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে পালাবে। জোটোভকে দেখছ না! মুখে একটু লজ্জা নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই। পারে ত সে উল্টে আমাদের বকে, অনুতাপ হওয়া ত' দূরের কথা! পাজি! বল্, কে আমার ঘোড়া নিয়েছে?—ক্রুটিলিন রুক্ষস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ও রাগে টুপীটা মাটীতে ফেলিয়া দিল।

—যদি নিয়েই থাকি তাতে হয়েছে কি!—আঙুলের ভিতর একটা চুরুট ঘুরাইতে ঘুরাইতে ও আঘাতের ফলে রক্ত-নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে করিতে অভিমানের সহিত জোটোভ দোষ স্বীকার করিল।

অপরিচিত লোকগুলি যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিল, গ্রামবাসীরা তাহা পালন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ

ভাসিলি ব্রাগিন সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটি আকারে ছোট, মুখে দাড়ী, মন দয়ামায়াহীন। তার ছোট চোখ দুইটি সর্ব্বদাই ছলছল করিত, কাহারো দিকে সে মুখ তুলিয়া চাহিত না। সেই জন্য গ্রামের সকলেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত ও তাহার সালিসিকে ভয় করিত।

পাকা চুলে অভ্যাস মত হাত বুলাইতে বুলাইতে লোকটি বলিতে লাগিল—আমি ভাবছি, কামার ভায়া আর কোনদিন অন্যের ঘোড়ার উপর লোভ করবে না·····পূর্ব্ব রাত্রিতে জোটোভকে বেশ উত্তম মধ্যম দেওয়া হইয়াছিল। তাহা মনে করিয়াই এখন সে এই কথা বলিল।—কিন্তু জোটোভকে শাস্তি দিয়ে কি হবে? তাকে শাস্তি দেওয়া যে কথা, আমাদের ঘোড়াগুলিকে নিজ হাতে গুলি করে মারাও সেই কথা। চাষী ভাইগণ, জেলাতে আমাদের কামার মোটে একজন···সে আমাদের ঘোড়ার পায়ে নাল লাগায়। শুধু তাই নয়, বলতে গেলে সে রীতিমত পশুর ডাক্তার। তাছাড়া সে আমাদের গাড়ীর চাকায় টায়ার লাগায়। আমাদের কাজের পক্ষে জোটোভই সবচেয়ে দরকারী। তাকে গোর দেব—সে কথা চিন্তা করার সময় এখনও আসে নি! আমরা এই ছোকরা সৈনিকদের নিকট কৃতজ্ঞ···তারা যুদ্ধের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। সর্ব্বত্রই এরা সৈনিকের মেজাজে থাকে·· সোজা কথায় বলতে গেলে এদের হাতে কাজ নেই, এদের এখন কিছু কাজ দরকার। কিন্তু আমাদের কামার ভায়াকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের জন্য তাকে এদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি নে।—বলিতে বলিতে সে বিশ্রামের জন্য একটু থামিল ও যে টিলার উপর হইতে আইভান গ্রামের দিকে নামিতেছিল, সেই দিকে চক্ষু তুলিল।—অথচ এমন সুযোগ হারান যায় না···বস্তুত দুষ্ট লোকদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার যে, এমন কাজের ফল মৃত্যু। চাষী ভাইগণ, আমাদের কামার মোটে একজন, কিন্তু ছুতোর আছে চারজন। আমার মনে হয় একজন ছুতোর আমাদের না হ'লেও চলে···

এই বলিয়া লোকটি জনতার ভিতর মিশিয়া গেল। সে কোথায় গেল কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার কথা ভাবিতে লাগিল ও তাহার মীমাংসা মানিয়া লইল। এমন সময় আইভান কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া জনতা ভেদ করিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পৌছিল। সে দেখিল সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছে। সে অনাথ, সে ছুতার, সে একজন সামান্য প্রাণী, সংসারে তাহার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই; সে অপরাধী, কেননা অপরাধ সমাজের পক্ষে প্রয়োজন। সে একবার এদিক একবার ওদিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল জনতার সকলের মুখ একই প্রকার—উদাসীন, বিকট।

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন বৃদ্ধ আঙ্গুল তুলিয়া বলিল—আইভান, রাজী হও ভাই, তোমার পক্ষে ত সবই সমান!

—সমাজকে একটু অনুগ্রহ কর, আইভান। দেখছইত, ঘোড়ার চোরে আমাদের অস্থির করে তুলেছে···তোমার স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে।

আমরা তোমাকে নিজের ছেলের মত করে গোর দেব··

চারিদিক হইতে সকলেই তাহার দিকে হাত বাড়াইতেছে দেখিয়া আইভান বিস্মিত হইল। কিন্তু জনতা ইতিমধ্যেই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে টানিয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইতে লাগিল। সে স্বপ্নেও সংসারের কাহারো প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে নাই, তবু সে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া নির্ভীক ভাবে হাসিতে হাসিতে জনতার অনুগমন করিতে লাগিল—শুধু মনে হইতে লাগিল তাহার দুর্ভাগ্য যেন অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এমন কি তাহার বোধ হইল যেন এক অনামা অপরাধ করিয়া সে সংসারকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে—সেই জন্যই সে অমন, অপ্রতিভের মত হাসিতেছিল। গ্রামের বাহিরে আসিয়া জনতা প্রান্তরের অমল তুষাররাশির উপর দিয়া চলিতে লাগিল; বৃদ্ধেরা পশ্চাতে খোঁড়াইয়া ছুটিতে লাগিল, বালকেরা আইভানের শেষ দুর্গতি দেখিবার জন্য সম্মুখে দৌড়াইতে লাগিল। তাহাকে একটি নর্দ্দমার কাছে দাঁড় করান হইল এবং দুইজন সৈন্য বন্দুকে গুলি ভরিল।

স্থানটি বায়ুসঙ্কুল ছিল। বাষ্পতাড়িত বরফে 'মিল ফয়েল' ফুলের কাল মাথাগুলি ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আইভান একটি ফুল ছিঁড়িয়া লইল ও আঙুলের মধ্যে তাহা ঘসিয়া বিভ্রান্ত ভাবে তুষারশীতল বাতাসে ইহার উগ্র গন্ধের আঘ্রাণ লইল। সে তখনও হাসিতেছিল, কিন্তু সৈনিকদিগের চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া তাহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতে পারিল, বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিল, সংসারের প্রবল ঝটিকাসমূহের সহিত তাহার নিজের নিদারুণ অনৈক্য। আইভানের মনে তাহার মাসীমার সুট-কেসটার কথা উদিত হইল,—কিন্তু তখন সামান্য একটা সুটকেসের কথা ভাবিবার সময় নয়।

"লেনকাকে আমার নমস্কার দিও!" সে শুধু এই ক'টি কথা চীৎকার করিয়া বলিল। বাতাসে তখন একটা পাখী উড়িতেছিল। সে দিন দ্বিতীয় বারের মত আইভানের নীরবতা পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

সন্ধানী

সভ্যতার ভবিষ্যৎ *

যাহা হইবার আপনা হইতে হইবে (Laissez faire)—এ নীতির যুগ ক্রমশঃ কাটিতেছে।

চুক্তি এবং প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা আছে বলিয়া সমাজ যন্ত্রের মত আপনাকে আপনি ঠিক করিয়া লইবে এরূপ মনে করা যায় না।

অর্থ নৈতিক সম্পর্ক

ব্যক্তিসর্ব্বস্ব অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে দুইটি স্তর দেখিতে পাইতেছি—উপরের ক্ষুদ্র স্তরে সদা অপ্রসন্ন বিলাস-প্রিয় জীবন, নীচেকার বিস্তীর্ণ স্তরে দুঃখ আর দৈন্য। এই সামাজিক ব্যবস্থা কিছু অনিবার্য্য নয়। বাহিরের যে-সব অবস্থার উপর আমাদের নিজেদের কোন হাত নাই সেগুলির দ্বারাই ব্যক্তি এবং সমাজের ছাঁচ তৈয়ারী হইতেছে, এ ধারণা সাধারণতঃ গ্রাহ্য নয়।

যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হীন দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইয়া জ্ঞান এবং শিল্পচর্চ্চার জন্য বেশী অবসর পাইব, এমন আশা করিয়াছিলাম। যন্ত্রের দ্বারা মানুষের শ্রমের লাঘব হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু দাস্যবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে; আধুনিক কল-কারখানায় চুলচেরা শ্রমবিভাগের ফলে কারিকর শিল্প-নৈপুণ্য হারাইয়াছে; কারখানায় অলৌকিকের প্রতি মোহ বা সৌন্দর্য্যের কোন স্থান নাই, শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাও নাই। শিল্পী হইয়াছে কারিকর—অধিকতর পণ্য উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র।

একটানা একঘেয়ে কাজে শরীরের ক্ষয় হয়, মনেরও কোন তৃপ্তি নাই। নিপুণ সৃষ্টিকার্য্যে চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির যে বিকাশ হয় তাহা ভিন্ন প্রকার কার্য্যে চাওয়া হইতেছে; শ্রমিকরা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে আনন্দ খুঁজিতেছে। বেতনবৃদ্ধি, অধিকতর অবসর, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ-সুবিধা, বিশ্রাম ও আলস্য তাহারা চাহিতেছে। কিন্তু এত চেষ্টার পর লব্ধ যে বিশ্রাম তাহা তাহারা প্রচুর অর্থব্যয়ে মিথ্যা উত্তেজনায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। টাইম্‌স্ স্কোয়ার, পিকাডিলি সার্কাস এবং চৌরঙ্গীতে দিবারাত্রি ব্যয়সাধ্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইতেছে; তাহাতে অবসর কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, নিষ্প্রাণ শূন্যগর্ভ দৈনন্দিন জীবন হইতে একটুখানি আরামের সন্ধান করা হইতেছে মাত্র। শ্রম-ক্লান্তিতে জীবনের যে সকল উচ্চতর বৃত্তি ব্যাহত বা দমিত হইয়া পড়িতেছে সে গুলির পরিপোষণ অবসরকালে করা হইতেছে না। অবসর, জীবনে কোন সত্যকার সুখ আনিতে পারে কিনা, সন্দেহ হইতেছে। কল-কারখানার মজুররা বস্তিতে বাস করিতেছে আর মদ্যপানে ও নৃত্যগীতে আত্মার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। যেখানে সম্পদ, হৃদয়েরও সাড়া সেইখানে—এ উক্তি সম্প্রদায়ের পক্ষে যেমন তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও সত্য। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কাছে কি বেশী মূল্যবান জানিতে হইলে আমাদের জানিতে হইবে তাহাদের অবসর বিনোদন কি করিয়া হয়। মনুষ্যত্বের এই ভীতিজনক বিনাশে আমরা উৎসাহিত হইতে পারি না। প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছে যে মানুষের তিনটি জিনিষ অতি প্রয়োজনের মধ্যে—শ্রম, বিশ্রাম আর পূজা। শ্রমকালে আমরা অপরাপর লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে চিনিতে ও বুঝিতে পারি এবং তাহাদের মঙ্গল সাধন করিতে পারি; বিশ্রামকালে স্বাধীন চিন্তা ও আত্মবোধের দ্বারা আমরা আপনাদিগকে জানিতে প্রবৃত্ত হই। পূজা দ্বারা আমরা এই জগতের মূল শক্তি কি এবং এ সবের উদ্দেশ্যই বা কি তাহা বুঝিবার প্রেরণা পাই। কিন্তু শ্রম আজ মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার, তাহার সহজাত সামাজিক সংস্কারকে পঙ্গু করিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশ্রাম মানুষের মনের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং পূজায় নিকৃষ্টতর আদর্শকে স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের অধ্যাত্ম-সত্তাকে স্থূল করিয়া তুলিতেছি। নির্জ্জনতা আমরা সহিতে পারি না। একা শ্রম, একান্তে বিশ্রাম বা পূজা করিতে হইলে আমরা নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ করি। কারখানার কাজ, জনতার মধ্যে আনন্দ উপভোগ, সম্মিলনে যোগদান, দল বাঁধিয়া পাপ এবং বহুজনে মিলিয়া উপাসনা আমাদিগকে করিতেই হইবে। গৃহে শান্ত

---

* শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার প্রণীত '*Kalki or Future of India*' নামক পুস্তিকার অনুবাদ করিবার অনুমতি শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরীকে দিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।—বঃ সঃ

সন্ধ্যাযাপন, নির্জ্জন গ্রাম্যপথে ভ্রমণ এবং অধ্যাত্ম সাধন ও ধ্যান আমাদিগকে যেন পীড়া দেয়। আমাদের যুগে প্রশান্তি ও সুষুপ্তি যেন সত্যই নাই। প্রয়োজন হইতেই যেমন সকল বিজ্ঞান এবং আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে তেমনি অবসরকালেই শিল্প এবং দর্শন, সাহিত্য এবং ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। মনের সুস্থ চিন্তার জন্য যে অবসর প্রয়োজন তাহা সুমণ্ডন সভ্যতার অত্যাচারে একরূপ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্রাম, বিশ্লেষ এবং একাগ্রতা না হইলে মৌলিক চিন্তা করা চলে না, কিন্তু সভ্যতা এইগুলিরই অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের প্রসারে বুদ্ধির প্রসার হয় নাই।

তাহা ছাড়া এই শিল্পের যুগে আমাদিগকে অর্থের পূজারী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা বস্তুতঃ এইটা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে ধনশালী হইলেই আমাদের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব। স্বর্গরাজ্যের ছাড়পত্র হইয়াছে ধনসম্পদ। যে কোন উপায়ে বা মূল্যে কৃতকার্য্য হওয়াই হইয়াছে আমাদের আদর্শ। অর্থশালী হইবার ভাগ্য বা সামর্থ্য যাঁহার আছে তিনিই সমাজের উচ্চস্তরে স্থান পাইতেছেন। শিল্পযুগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সামাজিক মূল্যনির্দ্ধারণের মাপকাঠি আমাদের অন্যরূপ ছিল,—সাধু, জ্ঞানী, কবি এবং দার্শনিকরা ছিলেন আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয়। আর্থিক অবস্থার কথা বাদ দিয়াও সাহিত্যিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তিতে যাঁহারা বড় হইতেন তাঁহাদেরই নেতৃত্বের অধিকার থাকিত। দারিদ্র্যকে যে যুগে সুস্থ, শুচি, আত্মসম্মানকর বলিয়া মনে করা হইত সে যুগ আর নাই। অর্থার্জ্জন জগতে প্রচলিত শিল্পসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান শিল্প-আন্দোলনের অতি বিষময় ফল এই যে, ইহাতে আমাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমেরিকা এবং রুশিয়ায় আমরা ইহা লক্ষ্য করিতেছি—সেখানে প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। নর-নারী সব গৃহের বাহিরে কর্ম্মরত হইতেছে; ছেলে-মেয়েরা ঘুমের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্কুলে বা কলেজে পড়াশোনা করিতেছে, মাঠে ফুটবল খেলায় অথবা সিনেমায় আমোদ উপভোগ করিতেছে। রুশিয়া সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কী কি বলিতেছেন দেখা যাক। তিনি তাঁহার "জীবন-সমস্যা" (*Problems of Life*) গ্রন্থে লিখিয়াছেন: —"সনাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ পরিবারের উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লব মহা বিপর্য্যয়রূপে উপস্থিত হইয়াছে ··· সমাজতন্ত্রমূলক অর্থনৈতিক সংস্কার আমাদের আরো প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র তাহা হইলেই, যে দুঃখ-দুর্ভাবনা পরিবারকে পীড়ন করিতেছে ও ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করিতে পারি। সাধারণ রজকালয়ে বস্ত্র ধৌত, সাধারণ ভোজনাগারে আহার্য্য গ্রহণ এবং সাধারণ সীবনালয়ে পোষাক তৈয়ারী আমাদিগকে করিতেই হইবে। শিক্ষার কাজে যাঁহাদের সত্যকার মমত্ববোধ আছে—এমন গণ-শিক্ষকগণের দ্বারা ছেলেমেয়েদিগকে অবশ্য শিক্ষিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে বাহিরের এবং দৈবগত, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন দূর হইবে—একে অপরের জীবনকে গ্রাস করিবে না।" সংক্ষেপে বলিতে গেলে গৃহে নর কিংবা নারী কাহারো স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না।

শিল্পপ্রধান যুগে মানুষ নব নব অভাব-সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। ভোক্তার ক্ষুধা ভোজ্য বস্তুর দ্বারাই বাড়িয়া চলে। আর্থিক উন্নতির লক্ষণই হইল বেশী চাওয়া এবং বেশী পাওয়া। এই উত্তেজক প্রতিযোগিতা দ্বারা আমরা জীবনের শূন্যতাকে নিজেদের নিকট ঢাকিয়া রাখিতেছি। আমাদের যান্ত্রিক যুগ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের যোগান দিতেছে। শিল্পকলা লোপ পাইতেছে।

গণতন্ত্রের এখন পরীক্ষা-কাল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র তেমন জনপ্রিয় হয় নাই। ইটালীতে এবং স্পেনে ইহা অচল হইয়াছে। চীন এবং রুশিয়াতেও ইহার প্রতি আনুকূল্য দেখিতে পাই না। এমন কি পূর্ব্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার যে সব অংশে গণতান্ত্রিক শাসনের সাদৃশ্য মাত্র রক্ষিত হইয়াছে সেই সব স্থানেও যথেষ্ট সংশয় লক্ষিত হইতেছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ড অথবা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া অপর কোথাও সত্যকার গণতন্ত্র সম্ভব হইতে পারে কি না সে বিষয়ে লর্ড ব্রাইস সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজনীতি

স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমরা গণতন্ত্রকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কার্য্য-কলাপে আমরা আর সন্তুষ্ট নই, বর্ত্তমানে আমাদের ধারণা জন্মিতেছে যে শাসন একটি কারুকলা এবং সেই কলা-নৈপুণ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শাসক হইতে পারেন। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সত্য করিয়া হইলে দেশ যোগ্যতম ব্যক্তিগণের দ্বারা শাসিত হইবার সুযোগ কচিৎ পাইতে পারে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও যন্ত্র-যুগের প্রভাব চলিতেছে। গণতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আড়ালে থাকিয়া রাজ্য-শাসন করিতেছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন স্বাধীনতা বা কার্য্য আরম্ভ করিবার নিজস্ব কোন শিক্ষা নাই, কারণ তাহারা এক বিরাট যন্ত্রের অসহায় অঙ্গ মাত্র। সদস্যগণ অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় অনুযায়ী ভোট দেন না কিংবা ব্যবস্থা-পরিষদের তর্ক-বিতর্ক, এমন কি নিজেদের ভোটকেন্দ্রের মতের প্রভাবে পড়িয়াও নয়। আলোচনা অযথার্থ, তর্ক অনর্থক এবং গণতন্ত্র শুধু নামেই রহিয়াছে।

গণতন্ত্রের মোটামুটি ফল যাহা ফলিয়াছে তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুকূল হয় নাই। ইউরোপ এবং আমেরিকার গণতান্ত্রিক আদর্শ সর্ব্বোত্তম এবং সমুচ্চ বলিয়া কথিত, কিন্তু ব্যক্তিত্বের মূল্য সে সব দেশে খুব কমই। স্বাধীন ভূমিতেও

মূলতত্ত্ববাদ (Fundamentalism) দেখা যায় এবং কু-ক্লুকস্-ক্লানও প্রাধান্য লাভ করে। কালচারের উপরে খেতাঙ্গদের অত্যাচার দেখা যায়। এমন সব প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে যেখান হইতে রাজনীতিকদের মতবিরোধ হইলে প্রাণভয়ে ভীত হইতে হয়। শোভিয়েট রুশিয়ায় কোন মানুষেরই ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই। কলে কর্ম্ম করিবার দক্ষতাই লক্ষ্য, কাজেই প্রত্যেককে চালকের ইচ্ছানুযায়ী কলের বিভিন্ন অংশে জুড়িয়া দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। স্বাধীন কর্ম্ম বা স্বাধীন বিবেক বলিয়া কোন কিছু নাই। অজ্ঞতা, শৃঙ্খলাভাব এবং নিম্ন-রুচির মধ্যে গণতন্ত্র স্ববর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সংবাদপত্রগুলি দেখিলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদ, নরহত্যা, নাচঘর এবং পুলিশ কোর্টের কথা যে গণতন্ত্রে পাই, তাহাতে সভ্যতা শুধু কৃত্রিমভাবে ফলিয়াছে বলিতে পারি। সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা যদিও এখন অনেকেই পাইয়া থাকেন তথাপি সাধারণের কালচার এখনও বাড়ে নাই। কলেজে প্রবেশ করা সহজতর হইলেও শিক্ষালাভ কঠিনতর হইয়াছে। আমরা পড়িবার শিক্ষা পাই, চিন্তা করিবার শিক্ষা পাই না। জনশিক্ষার ফলে এবং সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতারের কল্যাণে, ফ্রয়েড এবং জঙ্গের রুচিবাদ (Behaviourism) ও জন্মনিরোধ এবং আরও অনেক কিছুর বদহজম করিয়া সাধারণ মন এক অদ্ভুত ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহাদের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশী তাঁহারা মনের কথা প্রকাশ করিতে ভয় পান এবং সাধারণ লোকের চিন্তার সহিত তাল রাখিয়া চলেন। সাধারণের মনোবেগ, জনতার ভাবপ্রবণতা এবং সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের সমালোচনা হয় না, কাজেই সেগুলি প্রামাণ্য ও চলিত প্রথাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। যে সব সমস্যার আমরা সম্মুখীন হইয়াছি সেগুলি বিচার করিয়া দেখিবার সময় বা সামর্থ্য আমাদের নাই; কিংবা যাঁহাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে তাঁহাদের নেতৃত্বে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই। গণের প্রাধান্য হইয়াছে বলিয়া গণমতই মুষ্টিমেয় চিন্তাশীলদের মতকে ছাপাইয়া উঠিতেছে। গ্রেশামের মুদ্রানীতির অনুসরণে সৎ ও সুচিন্তিত অভিমত ক্রমশঃ বিবেচনাহীন, অসৎ ও আকস্মিক মনোবেগপ্রসূত শক্তি দ্বারা বিতাড়িত হইতেছে।

সকল গণতন্ত্রের মধ্যেই মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসকে সাধারণ ছাঁচ দিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। আমাদের মন চলে কলের মত। মনকে এইরূপ যন্ত্র করিয়া তুলিলে তাহাতে সৃষ্টিক্ষম প্রয়াসের সর্ব্বনাশ হয়। মানুষের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি কোন একটা প্যাটার্ণ অনুযায়ী চিন্তার ফলে হয় না, যাঁহারা সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি, গভীর চিন্তা ও নির্জ্জন সাধনার ফল স্বরূপ আমরা তাহা পাইয়া থাকি। প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের যে রূপ পাইতেছি তাহা গণতন্ত্রের বিরোধী—কথাটা হেঁয়ালির মত শুনাইলেও সত্য। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই হইল ইহার মূল উদ্দেশ্য। ইবসেন বলিয়াছেন "মানব, তুমি আত্মস্থ হও" আর আমাদের গণতন্ত্রগুলিও এই চায় যে, যে চলিত প্যাটার্ণে অন্তর শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহারই কম-বেশী সাদৃশ্য আমরা গ্রহণ করি। আমরা যদি সকলেই একমত হইতে সুরু করি তাহা হইলে চিন্তার উন্নতি হইতে পারে না।

যেখানে অর্থ নৈতিক অসাম্য এতখানি সেখানে কোন রাজনৈতিক সাম্য হইতে পারে না। শ্রমিক, সমাজ এবং সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহ উৎকৃষ্টতর সমাজপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এবং রাজশক্তি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, জাতীয় অন্তরায়গুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং শ্রেণী-বিদ্বেষকে বড় করিয়া তোলা হইতেছে। দেশপ্রেম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব, শ্রমিকদিগকে জাতীয়তাবাদীর কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে। বলসেভিকপন্থী বলেন—"আমার শ্রেণীই আমার দেশ" এবং এই শ্রেণী-বিদ্বেষের শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যকার গণতন্ত্র কখনই সম্ভবপর নয়। সম্প্রদায় বিশেষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাইতে হইলে সেই সম্প্রদায়ে স্বাধীনমনা ও স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি কতজন তাহাই দেখিতে হয়। চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে কাজে লাগানো সাম্প্রদায়িক সুস্থতার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নয়। মানবের সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভোট ও লটারির চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপায় খুঁজিয়া আমাদের বাহির করিতেই হইবে। [ক্রমশঃ]

অভিশাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড বাড়ী যাহাদের, ভূমিকম্পের সময় ভয় নাকি তাহাদেরই বেশি। এ সময় বাড়ী ছাড়িয়া ফাঁকা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইতে হয়। উমা তাড়াতাড়ি গ্লাসের জলে হাতটা ধুইয়া স্বামীকে তাহার জাগাইবার জন্যই ছুটিতেছিল। পাশের ঘরে মেয়েটা একাই শুইয়া আছে। আগে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া শ্রীহর্ষকে টানিয়া উঠাইয়া তাহারা নীচে নামিয়া যাইবে—এই ছিল উমার ইচ্ছা। পরের পর তিনখানা ঘর পার হইতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, পায়ের তলায় সমস্ত বাড়ীখানাই যেন দুলিতেছে। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে এই প্রথম। তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া চৌকাঠে হোঁচট্ খাইয়া উমা একবার আছাড় খাইয়া পড়িল। মেঝেয় হাত চাপিয়া উঠিতে গিয়া শুনিল, মাথার উপর কেমন যেন চিড়চিড়্ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে। কিসের শব্দ শুনিবার জন্য উপরের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখিল ছাদের খানিকটা অংশ ফাটিয়া হাঁ হইয়া গেছে আর সেই ফাটলের মুখ দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বালি পড়িতেছে। সেই বালি তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই ভয়ে শিহরিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ছাদটা ফেটেছে, ওগো তুমি পালাও, খুকিকে নিয়ে নীচে নেমে যাও।'

শ্রীহর্ষের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। বলিল, 'তুমি পালিয়ে এসো! হে হরি, হে হরি, হে মা কালী!'

কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল। মনে হইল ভয়ে যেন সে কাঠ হইয়া গেছে।

উমা বলিল, 'যাচ্ছি।'

বলিয়াই সে চোখ খুলিয়া যেমন অগ্রসর হইতে যাইবে, তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর একটা শব্দে সচকিত হইয়া সে চীৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল। যেই পিছাইয়া আসা, দেখিল ঠিক তাহার সুমুখে মাথার উপরের ছাদটা হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বহুদিনের পুরানো বাড়ী, কাঠের কড়ি, কাঠের বর্গা, কোথায় কি গলদ ছিল কে জানে; কিন্তু সর্ব্বনাশ, দপ্ দপ্ করিয়া আলোগুলাও নিবিয়া গেল যে! চারিদিক অন্ধকার! স্তূপীকৃত ইট কাঠে সুমুখের পথ বন্ধ। পিছনের সিঁড়ি দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অথচ কোথায় দরজা, কোথায় পথ, অন্ধকারে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই!—উমা চীৎকার করিতে লাগিল, 'ওগো তুমি গেছ ত? খুকিকে নিয়ে তুমি নীচে নেমে যাও, এদিক দিয়ে আর যাবার জো নেই। পেছন দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি, কিন্তু উঃ!' অন্ধকারে হাত্ড়াইয়া হাত্ড়াইয়া পথ চলিতে গিয়া জানালার কপাটে মাথাটা তাহার ঠাই করিয়া লাগিল। এদিকেও হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়িবার শব্দ হইতেছে। আবার কোথায় যেন কোন্ থানটা ধ্বসিয়া পড়িল। উমা ভাবিল আজ আর তাহার নিস্তার নাই, এইখানেই এই ইটকাঠের তলায় আজ তাহাকে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে। তাহোক্, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহার স্বামী? তাহার কন্যা? সকলে একই সঙ্গে যদি মরে ত' মন্দ হয় না, কিন্তু না না···'ওগো শুনছো! কোথায় তুমি? পালাও, পালাও, খুকিকে নিয়ে তুমি—' এই বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে গিয়া সহসা তাহার কি যে হইল কে জানে, প্রচণ্ড একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর কোথায় কেমন করিয়া যে তলাইয়া গেল কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে অন্ধকারের মধ্যে মেয়েকে তাহার কোলে লইয়া যে-ঘরে তাহার টাকা আছে সেই ঘরের মাঝখানে শ্রীহর্ষ দাঁড়াইয়া। উমার কথা শুনিয়া প্রাণের ভয়ে ঘর ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা সে যে করে নাই তাহা নয়, কিন্তু যতবার চেষ্টা করিয়াছে দরজা হইতে ততবারই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। টাকাগুলা এই-খানে ফেলিয়াই যদি যাইতে হয় ত' বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই। অবশেষে চারিদিক যখন ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন ভাবিয়াছিল যেমন করিয়াই হউক, টাকাগুলা সে সঙ্গে লইয়াই যাইবে, কিন্তু ইলেক্‌ট্রিকের তার কাটিয়া গিয়া আলোগুলা তখন নিবিয়া গেছে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীহর্ষ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বিপদের সময় মানুষের অনেক সময় ঠিক এমনিই হইয়া থাকে। ছুটিয়া পলাইয়া না গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, পায়ে যেন চলিবার জোর পায় না। যাই

হোক্, হঠাৎ এক সময় শ্রীহর্ষের মনে হইল যেন ভূমিকম্প থামিয়াছে। কিন্তু সে নিজে তখনও থামে নাই। শ্রীহর্ষ তখনও 'হে ভগবান, হে ভগবান' করিতেছে আর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে। উমার কি হইল কে জানে। তাহার আর কোনও সাড়াশব্দ নাই! শ্রীহর্ষ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, 'তুমি কি নীচে নেমে গেলে নাকি? হাঁগা, এবার ত' থেমেছে, আমি কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে' যাই বল দেখি! সব যে অন্ধকার!' বলিতে বলিতে মেয়েটাকে তেমনি কোলে লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া সে অতি সাবধানে আগাইতে লাগিল। ডান দিকের যে দরজা দিয়া সচরাচর তাহারা আনাগোনা করে সেদিক দিয়া যাইবার উপায় নাই, ইঁটের স্তূপে সে দরজা বন্ধ হইয়া গেছে সুমুখের দরজা খুলিলে বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া যায়। দরজাটা বন্ধই ছিল। শ্রীহর্ষ একহাত দিয়া মেয়েটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত দিয়া দরজাটা খুলিল। কিন্তু দরজা খুলিয়া রাত্রির অন্ধকারেও যাহা তাহার চোখে পড়িল তাহা যেমন বীভৎস তেমনি নিদারুণ। এত বড় বাড়ীটার দোতলার প্রায় সমস্ত ঘরগুলাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ইঁটের স্তূপ। মাথার উপরে আকাশ দেখা যায়। আশেপাশে কয়েকটি দেওয়াল মাত্র খাড়া দাঁড়াইয়া আছে।—কিন্তু উমা কোথায়? শ্রীহর্ষ সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া আবার ডাকিল, 'হাঁগা কোথায় তুমি!' এত জোরে ডাকিল যেন নীচে থাকিলেও শুনিতে পায়। কিন্তু উমার কাছ হইতে কোনও জবাব আসিল না।

তবে কি সে চাপা পড়িল নাকি?

চাপা পড়া বিচিত্র কিছু নয়। সেকথা এতক্ষণ তাহার মনেই হয় নাই। মনে হইতেই হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। এত ডাকাডাকির পরেও যখন তাহার সাড়া মিলিল না তখন নিশ্চয়ই সে চাপা পড়িয়াছে।

আকাশে অগণিত নক্ষত্র। তাহারই যৎসামান্য আলোকে যতটুকু দেখা যাইতেছিল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া শ্রীহর্ষ ইঁটের উপর দিয়া টলিতে টলিতে অতি সাবধানে চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই দেখিল, সিঁড়ির কাছাকাছি ইঁটের গাদা এমন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, অন্ধকারে আর এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। উমাকে ইহার ভিতর হইতে বাহির করাও কঠিন। রাত্রিও কম হয় নাই। ভূমিকম্পের সময় প্রাণের ভয়ে শহরটা একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, তাহার পর ভূমিকম্প থামিবার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলও থামিয়াছে, শহরটা বোধহয় আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাকিলে কাহারও সাড়া পাওয়া যাইবে কি না কে জানে, অথচ না ডাকিলেও উপায় নাই। বুড়া বৈকুণ্ঠ পাশেই থাকে। ডাকিতে হইলে তাহাকেই ডাকিতে হয়।

বৈকুণ্ঠের নাম ধরিয়া শ্রীহর্ষ চীৎকার করিতে লাগিল।

বুড়া বোধ করি জাগিয়াই ছিল। ডাক শুনিবা মাত্র লণ্ঠন হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিল। দেখা গেল সে একা আসে নাই। একে রাত্রি তায় অন্ধকার বলিয়া পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান ভাইপোটিকে তাহার সঙ্গে আনিয়াছে। ফটক পার হইয়া আসিয়াই লণ্ঠন দুইটি উপরে তুলিয়া বাড়ীর অবস্থা দেখিয়াই বৈকুণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "এ রাম-রাম রাম-রাম, এ কি হয়েছে শ্রীহর্ষ!"

ছাদের উপর ইঁটকাঠের স্তূপের মাঝখানে দাঁড়াইয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'দেখুন মশাই, ভূমিকম্পে আমার কি ক্ষতি করে' দিয়ে গেল।'

ক্ষতি যে হইয়াছে তাহাতে আর কোনও ভুল নাই।

বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'আলো বুঝি নিবে গেছে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তার কেটে কোথায় কি যেন সব বিগ্ড়ে গেল। আলো নিয়ে আপনারা একবার দয়া করে' ওপরে উঠে আসবেন?'

'কেন আসব না?' বলিয়া তাহারা আগাইয়া আসিয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টাই করিতেছিল, কিন্তু সিঁড়ির উপরেও অনেকগুলা ইঁট আসিয়া পড়িয়াছে। বৈকুণ্ঠর ভাইপো তিনকড়ি আগে আগে অতি কষ্টে পথ-করিয়া উপরে উঠিল। পশ্চাতে বৈকুণ্ঠ। ক্রমাগত সে শুধু 'হায় হায়' করিতে লাগিল, 'এমন সুন্দর এত বড় বাড়ী দাদা, একটা হ'তে হয় না, আর শালার ভূমিকম্পের কাজ ভাখো দেখি! আমার বাবা বয়েস হলো গিয়ে সত্তোর বছর, কিন্তু এই এতদিনের মধ্যে এমন ভূমিকম্প আমি কখনও দেখিনি। এ যেন একটা মহা-প্রলয় হয়ে গেল, বুঝলে?'

বলিতে বলিতে এদিক ওদিক তাকাইয়া সেও উপরে উঠিয়া আসিল। বলিল, 'কিন্তু বা, দেখে যেন মনে হচ্ছে—এই যে দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এগুলোও পড়বে। এমনি ভূমিকম্প জাপানে হয় শুনেছি। এইবার আমাদের দেশেও হ'তে সুরু হলো। দিনে দিনে আরও কত হবে। মানুষের এত পাপ কি আর ধরিত্রী সহ্য করতে পারে!'

কিন্তু সে সব কথা শুনিবার অবসর তখন শ্রীহর্ষর ছিল না। সে তখন উমার সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। উমা নিশ্চয়ই চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে এতক্ষণ তাহাকে সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত। শ্রীহর্ষর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। মেয়েটাকে সে তাহার বুকের উপর আরও জোরে চাপিয়া ধরিল। তিনকড়িকে বলিল, 'এইদিকে একবার এসো ত' ভাই দেখি।' বলিয়া সে তাহারই সন্ধানে তিনকড়িকে সঙ্গে লইয়া এখানে ওখানে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'কিন্তু বাবা, অত সাহস করে' এগিয়ে যেয়ো না। এখন এ-সব নিরাপদ নয়। জিনিষপত্তর চাপা পড়ে থাকে, লোকজন ডেকে কাল দিনের বেলা খোঁজ কোরো। আজকার রাত্তিরটা নীচেকার কোনও একটা ভাল ঘর দেখে কাটিয়ে দাওগে, আর নয় ত' চল বাবাজি, এই গরীবের ঘরেই চল।'

কিন্তু শ্রীহর্ষ যে কিসের সন্ধান করিতেছে সেকথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। শুধু বলিল, 'রাত্তিরে আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'না বাবাজি, কষ্ট কিছুই নয়। এসো তুমি পালিয়ে এসো ওখান থেকে।'

হঠাৎ একটা ঘরের মাঝখানে কতগুলা ইঁটের ফাঁকে কি যেন দেখিতে পাইয়া শ্রীহর্ষ তিনকড়ির দিকে ফিরিয়া তাকাইল। বলিল, 'লণ্ঠনটা ভাই এইখানে নামাও। নামিয়ে আমার এই মেয়েটাকে একবার ধরতে পারবে?'

এই বলিয়া মালতীকে সে তিনকড়ির কোলে দিতে গেল। মালতী কিছুতেই যাইতে চাহিল না।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করতে হবে বলুন! দামী জিনিষ কিছু চাপা পড়েছে? বের করতে হবে?'

উমা যে শাড়ীখানি পরিয়া ছিল তাহারই কিয়দংশ ইঁটের ফাঁকে শ্রীহর্ষ দেখিতে পাইয়াছে। আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'আমার স্ত্রী।' আর কিছু সে বলিতে পারিল না, ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

'সরুন্।' বলিয়া তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ ইঁটগুলা দু'হাত দিয়া সরাইতে আরম্ভ করিল। এবং মিনিটকয়েক পরেই সে দেখিতে পাইল, যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল সত্যই তাই। প্রথমে উমার আলতাপরা শুভ্র সুন্দর দু'খানি পা দেখা গেল, পরে তাহার সমস্ত দেহটাই বাহির হইয়া পড়িল। হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া মনে হইতেছিল উমা যেন নিশ্চিন্ত মনে উপুড় হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। মাথাটা ফাটিয়া গিয়া প্রচুর রক্ত তাহার মুখের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে। মাকে তাহার এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া 'মা' 'মা' করিয়া মালতী তাহার বাবার কোল হইতে আসিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। চোখ মুছিতে মুছিতে শ্রীহর্ষ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

বৈকুণ্ঠ দূরে বসিয়া ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো? পেলে তোমার জিনিষ?'

তিনকড়ি বলিল, 'দেখে যান।'

বৈকুণ্ঠ উঠিয়া গিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহা সে দেখিবার কল্পনাও করে নাই। হাতের লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া উমার মৃতদেহটা সে একবার ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর ভীত স্তম্ভিত বৈকুণ্ঠ একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া হাতের লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। বলিল, 'এ রাম-রাম রাম-রাম! নারী-হত্যা হয়ে গেছে; সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ! এ বাবা তোমার অমঙ্গলে বাড়ী, এ বাড়ী বিক্রি করে দাও। ছি ছি ছি ছি! আহা মা আমার, কত যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিস্ মা! নাঃ, এ একেবারে দৈব দুর্য্যোগ।' বলিয়া সে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

তিনকড়ি বলিল, 'এখন কি হবে কাকা? এমন করে' বসে থাকলে ত' চলবে না!'

কাকা মুখ তুলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, সমিস্যা বটে! পাড়াগাঁ নয় যে, জালিয়ে দেবে। কলকাতার সহর। পুলিশে একটা খবর দিতে হবে। বাস্, তার পরে কাল সবাই মিলে শ্মশানে গিয়ে মাকে আমার জালিয়ে দিয়ে আসতে হবে। আর কি

হবে বল! যার গেল তারই গেল বাড়ী ত' গেলই, ঘরের লক্ষ্মীও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।'

বলিতে বলিতে বৃদ্ধেরও দু'চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

শ্রীহর্ষের এই বিপদের দিনে বুড়া বৈকুণ্ঠ যেরকম সাহায্য করিল তেমনটি বড় একটা কেহ করে না। ওই বুড়া বয়সে রাত্রি জাগিয়া বৈকুণ্ঠ বসিয়া রহিল শ্রীহর্ষের কাছে মৃতদেহ আগ্‌লাইয়া আর তাহার ভাইপো তিনকড়ি গেল পুলিসে খবর দিতে। অত রাত্রে থানায় কাহাকেও পাওয়া গেল না। যিনি ছিলেন, ঘুমের ঘোরে উঠিয়া বসিয়া তিনকড়িকে প্রথমে খুব একচোট তিরস্কার করিয়া রাতভোর মৃতদেহ আগ্‌লাইয়া রাখিবার হুকুম দিয়া শ্রীহর্ষের নাম ঠিকানা তিনি লিখিয়া লইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীহর্ষের বাড়ীতে লোক যেন আর ধরে না! গত রাত্রির ভূমিকম্পে এত বড় বাড়ীটা ভাঙ্গিয়া কিরকম চুরমার হইয়া গিয়াছে দেখিতে আসিয়া লোকে যখন শুনিল শুধু বাড়ী নয়, বাড়ীর গৃহিণীও ওই সঙ্গে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, মৃতদেহটা স্বচক্ষে না দেখিয়া তখন কেহই আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না। অথচ মৃতদেহ পড়িয়া আছে দোতলার উপর। যাইতে হইলে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হয়। ওদিকে সিঁড়ির নীচেই দাঁড়াইয়া আছে বুড়া বৈকুণ্ঠ। যে যাইতেছে হাতজোড় করিয়া তাহাকেই বলিতেছে, 'কি আর দেখবি বাবা! দেখলেই চোখে জল আসবে। ও আর দেখতে হয় না, যা বাড়ী যা

এমনি করিয়া যত পারিল বৈকুণ্ঠ তাড়াইল, কিন্তু মানুষের কৌতূহল শুধু মুখের কথায় নিবৃত্ত হইবার নয়। একদল গেল ত' আবার আর একদল ভিড় করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এমনি একদল লোকের পশ্চাতে অতি সাবধানে 'সরে দাঁড়া বাবা, একটুখানি পথ ছেড়ে দে পথ ছেড়ে দে।' বলিতে বলিতে আমাদের সেই চপলা-ঠাকরুণ আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীহর্ষ আগে যে খোলার বাড়ীতে বাস করিত সেই বাড়ীর মালিক চপলা-ঠাকরুণের কথা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। ঠাকরুণের গায়ে নামাবলী, হাতে কমণ্ডলু, বোধ করি গঙ্গায় স্নান করিয়া এই পথ দিয়াই বাড়ী ফিরিতেছিল; এত লোকের জনতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে কী বাবা?'

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'দেখতে পাচ্ছ না ভূমিকম্পে বাড়ীখানা কি রকম—'

বাড়ীর ছাদটা সেইখান হইতেই দেখা যাইতেছিল। ঠাকরুণ একবার সেইদিক পানে তাকাইল। তাকাইয়াই হয়ত সে চলিয়া যাইত, কিন্তু ছাদের উপর যে-লোকটি ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাকে কেমন যেন শ্রীহর্ষ বলিয়া মনে হইতেই ঠাকরুণ আর ফিরিয়া গেল না। সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে লোকজনের পিছু-পিছু সেও সেখানে গিয়া ঢুকিল। দেখিল, তাহার অনুমান সত্য। শ্রীহর্ষ মালতীকে কোলে লইয়া ভাঙা ছাদের উপর পায়চারি করিতেছে।

বুড়া বৈকুণ্ঠ তাহাকেও বিদায় করিতেছিল, কিন্তু চপলা-ঠাকরুণ তাহার সেকথায় কর্ণপাত করিল না, সরাসর উপরে উঠিয়া গিয়া ডাকিল, 'শ্রীহর্ষ!'

শ্রীহর্ষ মুখ ফিরাইয়া চপলা-ঠাকরুণকে দেখিবামাত্র স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চপলা-ঠাকরুণ ত' অবাক্! জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছিস্ কেন রে? তোকে দেখতে পেয়েই আমি এলাম এখানে। এত লোকই বা কেন, এ বাড়ীই বা কার, বৌমা কোথায়, কিছু বুঝতে পারছিনি বাবা, ব্যাপার কি বল্ দেখি?'

কিন্তু মালতী চপলা-ঠাকরুণকে বোধ হয় এখনও ভুলে নাই। তাহাকে দেখিবামাত্র নির্ব্বোধ মেয়েটা হাসিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার কোলে উঠিতে চাহিল।

হাতের কমণ্ডলুটা সেইখানেই নামাইয়া চপলা-ঠাকরুণ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'ভুলিস্‌নি এখনও? কেন তোর মা-বাবা ত' দিব্যি ভুলে গেছে?' বলিয়াই সে শ্রীহর্ষের মুখের পানে তাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রে—এর মা কোথায়?'

কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে মুছিতে শ্রীহর্ষ কয়েকটা ইঁটের স্তূপ পার হইয়া গিয়া ধরা-ধরা গলায় ডাকিল, 'এইদিকে একবার এসো মাসি।'

'কেন রে?' বলিয়া ঠাকরুণ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই—উমার মৃতদেহের উপর হইতে সাদা কাপড়ের ঢাকাটা শ্রীহর্ষ তুলিয়া দিয়া বলিল, 'এই তোমার বৌমা—'

বলিতেই ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া আসিল, কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া ঠাকরুণ সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এইমাত্র সে যে গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়াছে, মৃতদেহ স্পর্শ করিলে আবার তাহাকে স্নান করিতে হইবে সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া চপলা-ঠাকরুণ হাত বাড়াইয়া মৃতদেহটাকে উল্টাইয়া উমার মুখখানি একবার দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তারি মৃতদেহ তখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, মুখ তাহার আর দেখা হইল না, মেয়েটাকে মাটিতে সেইখানেই নামাইয়া দিয়া উমাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'হায় হায়' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উন্মাদিনীর মত মাথা চাপ্ড়াইয়া বুক চাপ্ড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'এ কি হলো বাবা শ্রীহর্ষ? আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে এলো, আসি মা, আবার দেখা হবে। সে কি এমনি করেই দেখা হবার কথা বলেছিল রে? না না শ্রীহর্ষ, তুইই ওকে মেরে ফেলেছিস্ বাবা, তোর ওপর অভিমান করেই ও চলে গেছে।'

কিন্তু পুলিশের লোক তাহাকে ওরকম ভাবে বেশিক্ষণ কাঁদিতে দিল না। সময় তাহাদের অত্যন্ত কম। আসিয়াই তাহারা রিপোর্ট যতটুকু সংগ্রহ করিবার করিল, খাতায় কি সব লিখিল, তাহার পর মৃতদেহ হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীহর্ষকে বলিল, 'পুড়িয়ে ফেলতে চান 'ডেড্ বডি' আপনি হাঁসপাতাল থেকে 'ডেলিভারি' নেবেন। আমরা নাচার মশাই, আমাদের সেখানে পাঠাতেই হবে।'

মেয়েটাকে কিন্তু চপলা-ঠাকরুণ আবার তাহার কোলে তুলিয়া লইয়াছিল। বলিল, 'যা করবার তুই কর্ বাবা শ্রীহর্ষ, মেয়েটাও আবার তোর কাছে থেকে মরে কেন? ওকে আমি নিয়ে চললাম।'

এই বলিয়া কমণ্ডলুর গঙ্গাজলটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া মালতীকে লইয়া চপলা-ঠাকরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

শ্রীহর্ষের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি কে?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'আগে আমি যে বাড়ীতে থাকতাম সেই বাড়ীর মালিক।'

'আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়?'

ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহর্ষ বলিল, 'না।'

(ক্রমশঃ)

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

'ওরিয়েণ্টাল'এর ১৯৩২ সনের একখানি উদ্বৃত্ত-পত্র সমালোচনার জন্য আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে তাঁহারা ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ১৪ হাজার ৫ শত ২৩ টাকার মোট ৪৩ হাজার ৫৫৫ খানি বীমা-প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭ শত ২৭ টাকার, ২৯ হাজার ৯৮২ খানি বীমাপত্র মঞ্জুর হইয়াছে। ইহার মধ্যে এণ্ডাউমেণ্টের সংখ্যা ২৫ হাজার ৮৮, হোল-লাইফ ৪ হাজার ৩৮। কোম্পানীর নব-প্রবর্ত্তিত 'পার্ফেক্ট প্রোটেক্সান'এর সংখ্যা ১১৯, 'ম্যারেজ' 'এডুকেশন' ও 'জয়েণ্ট লাইফ' যথাক্রমে ১৭১, ৪১ ও ১৩৭। এ বৎসরে ভারতবর্ষের বাহিরে ১ হাজার ৭ শত ৮৯ খানি বীমা-পত্র দাখিল হইয়াছে। মৃত্যুজনিত দাবীর মূল্য ৪১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৪০ টাকা ৮/০ আনা ২ পাই। বীমাকাল শেষ হওয়ায় দাবি দাঁড়াইয়াছে ৪৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১১৪ টাকা ৮/০ আনা ৩ পাই। মৃত্যুজনিত দাবীর তালিকায় মৃত্যুর কারণে দেখিতেছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালীর রোগে মৃত্যুসংখ্যা বেশী, তৎপরে ক্ষয়রোগের প্রাধান্য। বৎসরের আয়, ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৫২৭ টাকা ৮৶০ আনা ১১ পাই—ব্যয়, ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৩ হাজার ২৪১ টাকা ।/০ আনা ৭ পাই। বৎসরের শেষে ফাণ্ডের মজুদ ২২ কোটি ৪৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬৮ টাকা ৫০ আনা ৭ পাই। এ বৎসরের ব্যয়ের অনুপাত (রেশিয়ো অব এক্সপেন্স) কমিয়া শতকরা ২১এ দাঁড়াইয়াছে।

উপরের যে কোন একটি সংখ্যা হইতে বোঝা যাইবে বীমাক্ষেত্রে 'ওরিয়েণ্টাল' ভারতবর্ষের গৌরব। এ কথা যাঁহারা বীমা সম্বন্ধে সামান্য সংবাদও রাখেন, তাঁহারাই জানেন, সুতরাং নূতন করিয়া সে কথার উল্লেখ পুনরুক্তি মাত্র।

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

কবি ভবানন্দের হরিবংশ—সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৮৹+ ২৯২ পৃষ্ঠা।

ভবানন্দের 'হরিবংশ' প্রকাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুব প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। আর যাহার উপর বইটী সম্পাদন করিবার ভার ছিল তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের, একজন ধুরন্ধর ছিলেন। সুতরাং সম্পাদনকার্য্য যে খুবই সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ সুসম্পাদিত বই খুব কমই বাহির হইয়াছে।

সম্পাদক তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় অনেক কথাই বলিয়াছেন। গ্রন্থের ব্যাকরণঘটিত বিশেষত্বগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে অনেক স্থলেই তাহা আরও সংক্ষেপে বলা যাইতে পারিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত হরিবংশের শব্দ-সাদৃশ্য খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার। সম্পাদক বলিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের জন্মস্থল মিথিলার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী এবং তাঁহার জন্মকাল ভবানন্দের অন্যূন এক শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তথাকথিত ব্রজ-বুলীর প্রভাব বা হিন্দী-মৈথিলের সাক্ষাৎ অনুসরণের কোনও চিহ্ন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাত্র একস্থলে 'জৈসানে' ও 'তৈসানে' পাওয়া গিয়াছে" ইত্যাদি (পৃঃ ১।৵৹)। সম্পাদকের এই উক্তি ঠিক নহে। 'জৈসানে', 'তৈসানে' ছাড়া আরও কতকগুলি ব্রজবুলী মৈথিল পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়; যথা ধরল (পৃঃ ৪), সংহারল (পৃঃ ৫), ভইল (পৃঃ ৫৩) ইত্যাদি।

ভবানন্দের হরিবংশের কথাবস্তুর একটু বিশেষত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত ভাবগত মিল থাকিলেও বস্তুগত মিল কিছু মাত্র নাই। হরিবংশের কৃষ্ণ একটী প্রচণ্ড লম্পট এবং রাধিকাও তদনুরূপ [পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য]। হরিবংশে রাধার নামান্তর 'তিলোত্তমা'। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার নামান্তর 'চন্দ্রাবলী'। রাধার ননদীর নাম 'মহোদা'। এই নাম বোধ হয় 'যশোদার' সাদৃশ্যে (analogy) গঠিত। বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার ননদীর নাম জটিলাই পাওয়া যায়। এই সব বিষয়ে হরিবংশের খুবই বিশেষত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক হরিবংশকে যত প্রাচীন বলিতে চাহেন ইহা তত প্রাচীন কিনা সন্দেহ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুথির তারিখ সন ১০৯৭ সাল (= আন্দাজ খ্রীষ্টীয় ১৬৯০)। গ্রন্থখানি ঐ তারিখের খুব বেশী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ কিছু প্রমাণ নাই। তবে ইহা যে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের দিকে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত হরিবংশের ভাবগত মিল আছে, যদিও বস্তুগত মিল এমন নাই যাহাতে বলা চলে যে, কবিদ্বয়ের মধ্যে কেহ অপরের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমের দিকে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি লৌকিক কাহিনী সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রচলিত ছিল। এবং এই কাহিনীগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব ছিল। রাধা-কৃষ্ণের এই মানবোচিত লীলা-কাহিনীর প্রত্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত এক রূপ পাই "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস"এর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, এবং প্রত্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত এক রূপ পাই ভবানন্দের হরিবংশে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অন্ততঃ প্রাপ্ত ও প্রকাশিত অংশে শ্রীচৈতন্যের প্রচলিত ধর্ম্মের কোন ছাপ একেবারেই পাওয়া যায় না, কিন্তু ভবানন্দের হরিবংশে এই ছাপ যথেষ্টই বিদ্যমান আছে। অবশ্য ভবানন্দের হরিবংশে চৈতন্য-বন্দনা নাই। তেমনি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের অনেক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় গ্রন্থেও চৈতন্য-বন্দনা পাওয়া যায় না। এমন কি মহাপ্রভুর ভক্ত ও পারিষদ মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের প্রাচীনতর পুঁথিতে চৈতন্য-বন্দনা মিলে না।

সম্পাদক মহাশয় ভবানন্দকে পূর্ব্ববঙ্গের মহাকবি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস,—ইঁহাদের সমকক্ষ সমশ্রেণীর কবি বলিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। কবিত্ব হিসাবে ভবানন্দ উপরোক্ত কবিদের অনেক নীচে বলিয়াই মনে হয়।

ত্রিলোচন কবিরাজ—কয়েকটি ব্যঙ্গ-গল্পের সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পাক্ষিক পত্রিকা 'সম্মিলনী'তে শ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায় মহাশয় রবীন্দ্র-নাথ মৈত্র প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যঙ্গ ও রসরচনায় সজনীকান্তের শিষ্য ছিলেন। মনে হয়, কালিদাস-বাবু রবীন্দ্র মৈত্রের রচনার সহিত যথেষ্ট পরিচিত নহেন, হইলে, এইরূপ ভুল করিতেন না। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব ছিল; তিনি প্রথম যেদিন 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার তালতলা সাহিত্যবিষয়ক ব্যঙ্গ-রচনাটি পাঠাইয়াছিলেন, প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, তখন সজনীকান্ত সবেমাত্র লিখিতে সুরু করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই লেখাতেই ছিল এবং তাঁহার পরের সমস্ত ব্যঙ্গ-লেখাতেই এই বৈশিষ্ট্যেরই পরিণতি দেখা যায়।

কষ্ট-কল্পনা নামক বস্তুটি রবীন্দ্রনাথের ত্রিসীমানাতে কখনও আসিতে পারে নাই; কি গম্ভীর গদ্যরচনায়, কি ব্যঙ্গ লেখায়, কি লঘু-গম্ভীর প্রবন্ধে

সর্ব্বত্রই তাঁহার সুস্থ মনের ও সহজ সরল চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস বাবুর একথা খুবই ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্বেষ বা অকারণে কাহাকেও আঘাত দেওয়ার চেষ্টা ছিল না, তিনি যাহাদের লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহারাও সেই ব্যঙ্গ উপভোগ করিয়াছে।

'ত্রিলোচন কবিরাজ' রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি ব্যঙ্গ-গল্পের সমষ্টি ; যে ক্ষমতা তিনি 'দিবাকরী' ও 'বাস্তবিকাতে' দেখাইয়াছেন, ত্রিলোচন কবিরাজে তাহারই পরিণতি লাভ ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্র মৈত্রের যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমরা মনে মনে তাঁহার স্থান নির্দ্ধারণ করিতেছিলাম সেগুলি তাঁহার শেষ তিনখানি বই—'মানময়ী গার্ল'স স্কুল,' 'ত্রিলোচন কবিরাজ' ও 'মৃতকুম্ভ' অবলম্বন করিয়াই। 'মানময়ী' জীবিতাবস্থায় তাঁহার শেষ পুস্তক, 'ত্রিলোচন কবিরাজ' মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত, 'মৃতকুম্ভ'—অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

'ত্রিলোচন কবিরাজ' গল্পটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে detachment বা নির্লিপ্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা মোটেই বাঙালীসুলভ নহে। এদেশে নাটক লিখিতে বসিয়া নাট্যকার ভাবাবেগে এক বা একাধিক চরিত্রের সহিত নিজেকে এক করিয়া নাট্যকলার নামে কাব্যিয়ানার চূড়ান্ত করিয়া বসেন, সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাই সংবাদ দিবার ফাঁকে ফাঁকে সম্পাদকীয় স্তম্ভের অভাব পূরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সত্যকার নাটকীয় প্রবৃত্তি প্রবল ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখা এই দোষে দুষ্ট হয় নাই এবং এই কারণেই 'ত্রিলোচন কবিরাজ'কে একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গল্প বলিতে পারি।

এই পুস্তকে আরও ছয়টি গল্প আছে।

শিশু-ভারতী—সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। প্রথম চারিখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল্য প্রতিখণ্ড ৮০।

ইংরাজী 'বুক অব নলেজ' 'চিল্‌ড্রেনস্ এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বাঙালী শিশু ও বালকবালিকাদের জন্য ওই ধরণের বইয়ের অভাব অত্যন্ত বেশী অনুভব করিতাম ; মনে হইত, এই দুর্ভাগ্য দেশে কোনও প্রকাশকই কি এমন একটা প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিবেন না ? তাই শিশুভারতী প্রকাশিত হওয়াতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। এই শ্রেণীর বিলাতী গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের মনে আমরা যে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড খাড়া করিয়াছিলাম শিশু-ভারতী ততদূর পর্য্যন্ত না পৌছাইলেও ইহা যে সৎ-প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই এবং এই গ্রন্থ-প্রকাশের গুরু ব্যয়ভার ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতে আমরা বাধ্য। হয়তো, এই পরিমাণ অর্থব্যয়ে ইহা অপেক্ষা ভাল একখানি বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল, সম্পাদন হয়তো আরও ভাল করা যাইত—এই সকল কথা বলিয়া বই খানিকে উপেক্ষা করিয়া লাভ নাই ; এই পরিমাণই যে প্রকাশক ও সম্পাদক মহাশয়েরা করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

ভুলভ্রান্তি অনেক আছে, চিত্র-সংযোজনাও যথেষ্ট সাবধানতার সহিত করা হয় নাই, অনেক প্রবন্ধের ভাবা শিশুরা দূরের কথা আমরাই বুঝিতে পারি নাই, বিভিন্ন বিভাগে একই বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে—এই সকল নানা দোষ সত্ত্বেও আমরা প্রথম খণ্ড হইতেই দেখিতেছি, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সকল বিষয় লেখাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, পঞ্চানন মিত্র প্রভৃতির নাম শিশু-ভারতীর লেখক-শ্রেণীতে দেখিয়া সম্পাদক যোগেন্দ্র-বাবুকে প্রশংসা করিতে হইবে। এদেশে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ হইতে লেখা আদায় যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, পত্রিকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। চিঠির উপর চিঠি দিয়া তাহার জবাব মেলে না, অর্দ্ধেক লেখা পাঠাইয়া বাকী অর্দ্ধেক পাঠাইতে লেখক ভুলিয়া যান—ইত্যাদি অনেক বাধা আছে।

প্রত্যেক সংখ্যায় অনেকগুলি বিষয় আলোচিত হইতেছে, প্রত্যেক বিভাগেই ছবি আছে। বিভাগগুলি এই—মানবের জীবনধারা, অমর জীবন, খাদ্যশস্য, পৃথিবীর যুগ বিভাগ, ইতিহাস, উদ্ভিদ্ জীবন, আমাদের দেশ, বিশ্ব-সাহিত্য, সাহিত্য, গল্প ও কাহিনী, বায়ু, শব্দ, কবিতাচয়ন ইত্যাদি। এত অল্প পরিসরে এই বৃহৎ ব্যাপারের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলে অন্যায় করা হইবে, আরও কয়েকটি খণ্ড দেখিয়া শিশু-ভারতীর দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব, কারণ, ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নানাদিক দিয়া ইহার আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে।

করকোষ্ঠীর চাবীকাঠী—শ্রী যো গে ন্দ্র কু মা র ভট্টাচার্য্য। ভাগ্যগণনা-কার্য্যালয়, ২৯নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১॥০।

আমাদের অবস্থা যতই খারাপ হইতেছে, হাত দেখাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার তত বেশী চেষ্টাই আমরা করিতেছি। রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, ফোঁটাতিলককাটা উড়িয়া, দাড়িটুপীপরা ফকির, পাগড়ী-কোট পরা পাঞ্জাবী গণৎকারেরা এক একটা হাতের ছাপ আর একজোড়া পিত্তলের পাশা লইয়া বসিয়া আছে, আর তাহাদিগকে ঘিরিয়া ভদ্র অভদ্র নানা জাতীয় জীব আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার লোভে বসিয়া আছে এবং বসিয়া বসিয়াই ঠকিয়া যাইতেছে। সভাসমিতি আড্ডায় কেহ কাহারও হাত টানিয়া একবার বসিলেই হয়, আমারটা একটু দেখে দিন মশাই, ভারী বিপদে পড়েছি ইত্যাদি অনুরোধে এমেচার গণৎকারকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্থানত্যাগ করিতে হয়।

বই কিনিয়া অবসর সময়ে নিজের হাত দেখিতে শিখিলে শিক্ষা ও আনন্দ, উভয়ই প্রচুর পাওয়া যায়, বন্ধুবান্ধবেরাও হাত দেখাইয়া বাঁচে। বইগুলি এতদিন অধিকাংশই, হয় সংস্কৃত, নয় ইংরাজী ছিল। বাংলাতেও যে দুই একখানি বই দেখিয়াছি পরিভাষা ও রাশিচক্রের দ্বারা সেগুলি এমনই কণ্টকিত যে পড়িয়া অর্থগ্রহণ হয় না। সম্প্রতি দুই একখানি বাংলা সহজবোধ্য বই দেখিতেছি। 'করকোষ্ঠীর চাবীকাঠী' তাহারই একটি। বইটিতে গ্রন্থকার প্রথম

শিক্ষার্থীর উপযোগী তেত্রিশটি পাঠ দিয়াছেন। 'গোড়ার কথা'র পরিভাষার গোল চুকাইয়াছেন, অত্যন্ত সহজভাবে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া ব্যাপারটা লেখা হইয়াছে। পুঁথি মিলাইয়া হাতের রেখা পাঠ করিলে ভবিষ্যৎ মিলিবে কিনা বলিতে পারি না, দুই একটা উপর চাল যে দেওয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম—শ্রীবিধুভূষণ জানা। তমলুক, মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৵০ ; সচিত্র।

মনের মধ্যে কোনও খুঁত না রাখিয়া প্রথমেই এই বইখানি সকল স্বাস্থ্য-কামীকে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। গ্রন্থকার স্বয়ং স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম বিভাগে কৃতী ব্যক্তি, তিনি বইখানি লিখিয়াছেন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে—ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা চয়ন করিয়া নহে।

বইখানিতে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—স্বাস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, ব্যায়ামের স্থান, ব্যায়ামকারীর পরিধান, আহার, নিদ্রা, স্নান এবং ব্যায়াম-বীরগণের সচিত্র পরিচয়।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—যে দেশের বাণী, সে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার দিনে বইটি কাজে লাগুক, এই প্রার্থনা করি।

বইটির মূল্য একটু অতিরিক্ত হইয়াছে।

রক্ত-চক্র—রহস্যচক্র সিরিজ (প্রথম গ্রন্থ), শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন কলিকাতা, মূল্য ৸০।

মামুলি প্রেমের উপন্যাসগুলি হইতে যে এই সকল রহস্য-উপন্যাস ভাল, পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই ধরণের গল্প ও উপন্যাসের প্রভূত প্রচারের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাদের তো এগুলি খুবই ভাল লাগে। আমাদের ডালভাত-শাকচচ্চড়ীময় বৈচিত্র্যহীন জীবনে থ্রিলের অত্যন্ত অভাব—২০০ মাইল স্পীডে গাড়ী চালাইয়া আমরা মরিতে শিখি নাই। এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া যে একটু চাঙ্গা হইব তাহার উপায় নাই—নাইট ক্লাব, স্পিক-ইজিস তো এত করিয়াও গড়িয়া উঠিল না, আধপেটা খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যদি রহস্য-সিরিজের উপন্যাসই পড়িতে না পাই তাহা হইলে জীবন কাটে কি করিয়া? সুতরাং রক্ত-চক্রের মত উপন্যাস আমাদের দরকার, তা হোক না এগুলি চোরা ইংরাজি ক্রাইম নভেল। রক্ত-চক্রের লেখক ভেল চমৎকার বদলাইয়াছেন।

মাসিক-পত্রিকা ও সাপ্তাহিক—পঞ্জিকাকারেরা যদি যথাযথ গণনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ১৩৪০ সালের পঞ্জিকাতে দেখিতে পাইতাম—এবার দেবীর কা-গজে আগমন। নূতন মাসিক ও সাপ্তাহিকে বঙ্গবাণীর পাদপীঠ অর্থাৎ রাস্তার ষ্টলগুলি ছাইয়া গেল। অবশ্য এই নূতনের মধ্যে আমাদেরও স্থান, কিন্তু আমাদের জন্ম উনচল্লিশ সালে।

হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার—চিরন্তনী, শ্রীহর্ষ, ফাল্গুনী, বাঙালী—দুই একমাস আগেই আসিয়াছেন, নূতন বৎসরের বিজয়-পতাকা কাঁধে লইয়া আসিলেন, ঢাকার অভিযান, কলিকাতার উদয়ন, অভ্যুদয়, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রূপ, আরতি, ব্রতী। শুনিতেছি পুরাতন দুই একখানি নাকি লাটেও উঠিবে। জয়শ্রী এবারে মোটা হইয়াছেন, বিচিত্রায় নীল দেখা দিয়াছে, 'ইয়েলো পেরিলে'র কথা ভাবিয়া প্রবাসী হলুদ হইয়াছেন, জণ্ডিস নয়। অচল অটল গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করিতেছেন, পরাধীন 'ভারতবর্ষ' এবং 'সর্ব্বংসহা' 'বসুমতী'।

এই নূতন কাগজগুলি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকে এক নূতন উপাধি দিতে ইচ্ছা হইতেছে—আশীর্ব্বাদী রবীন্দ্রনাথ। এই 'রেটে' কাগজ বাহির হইতে থাকিলে আশীর্ব্বাদ-কার্য্যে তাঁহার হাত পাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। নূতন কাগজগুলির মধ্যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বিষয়-বুদ্ধির ছাপ আছে, অভ্যুদয়ের সম্মুখের পর্দ্দা কাব্যগন্ধী হইলেও পিছনে অন্য গন্ধ আছে। পিতৃনাম স্মরণ করিয়া উদয়ন বাজারে বাহির হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে আর যাই থাক, ফাঁকি নাই; শুধু শেষে উদয়ন-অফিসের দুরঙা ছবিটা—তা যেখানে অন্য পরিচয় নাই, সেখানে জমিদারীর খবরটা দিতে হয় বৈকি! ঢাকার অভিযান কপনি আঁটিয়া গরীবের মত আসিয়াছেন, অভিযান হইলেও 'মাসলে'র ছাপ নাই। গোলযোগ একটু আছে—প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচনে। তিনি লিখিয়াছেন—

আকাশ বাতাস
ছেয়ে গেল আজ
তোদের মিলন গানে,
মায়ের পূজার
পূত-উপচার
পূর্ণ হবে শুধু—
সে যে তোদেরই অরঘ-দানে।

এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ? আসল রবীন্দ্রনাথ হইলে, ছন্দবিদ্ দিলীপকুমার কোথায়? আর এই কি অভিযানের বীজমন্ত্র?

এবার 'পুরুষ্ট'দের কথা। উদয়নের ৮৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'হিন্দু সভ্যতার পত্তনের' পরেই ঈশ্বর গুপ্তের একটি কোটেশন দেওয়া হইয়াছে—'এমন পাঁঠার নাম' ইত্যাদি—আমরাও সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, লোভটাই সব নয়, আদর্শও আছে—১২৫ পৃষ্ঠায় আছে; বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ও রবীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শনের কথা আছে—'উদয়নের সূচনায় আমরা এই দুই মনীষীর সূচিত মহতী বাণীর অনুবর্ত্তনের অভিপ্রায় লইয়াই যাত্রা করিলাম।' একজন মৃত, অন্যজন মৃতকল্প, আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

উদয়নের পয়সা আছে, পাঁচ রকম প্রতিযোগিতা পুরস্কারের ঘোষণা আছে, সম্পাদক শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের

'সে আজি এসেছে গণ্ডে মাখিয়া
প্রেমের স্বপন-মহিমা'

আছে, পড়িয়া গোপালদা বলিয়াছেন, 'স্বপন মহিমা' নামীয় 'ম্নো'কে প্যারীবাবু 'পুশ' করিতেছেন, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের 'দেহের দাবী' আছে,

তার মনি-ভ্যাল্ আছে, দিলীপকুমারের 'বিশ্বমাতা' আছেন—যাঁর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, মন্দাক্রান্তা ছন্দে

মন্দ্রে ঐকে গুরু গরজনে লোলরঙ্গে সমুদ্রে ?
হুহুচ্ছাসে ডমরুস্বননে বজ্রভঙ্গে সমূর্ছে ?
গাহে প্রেমে নিখিল সঘনে কম্পি' ত্রাসে করালি—
কৃষ্ণা জ্বালা গমকরণনে দীপ্তি একি ঝয়ালি ?

এবং শেষ কিন্তু নিরেশ নয়, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের 'সাহিত্যে' আছে—

'তরুলতা গুল্ম শষ্পরাজি নদী সমুদ্র ভূধরের রূপচ্ছবিতে মন্দ পবনের মৃদু স্পর্শে পুষ্পগন্ধে কিম্বা আপন মনের নিভৃত আলোড়নে কবির জ্ঞানধর্ম্মী চিত্ত-বৃত্তি যখন তলাইয়া যায় তখন প্রমুহূর্ত্তপ্রাকস্মৃতির অস্পষ্ট প্রতিভাসে অজ্ঞাতসত্তাক সংস্কারের নিবিড় অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যে একটী স্পন্দন ধারা কবিপুরুষের সমগ্র সত্তাকে বিকম্পিত করিয়া তুলে'—ইত্যাদি

পড়িয়া কিন্তু আমরা আর নাই। উদয়নের ছাপা চমৎকার। সব চাইতে চমৎকার Supplement to "Udayan"—Baisakh. B.S 1340' দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, স্বাভাবিক ইচ্ছা হ্রাস হওয়ার কথাটা।

'অভ্যুদয়ে' ঐশ্বর্য্যের চটক নাই, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং তাঁহার নিবেদনে লিখিয়াছেন—

"এ আয়োজন নিতান্তই দরিদ্রের; বিত্তহীন, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, সংসার-জ্ঞানবর্জ্জিত, ভাবপ্রবণ কবি-সাহিত্যিকের;"

এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকার সমালোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"সেই প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নামটি পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নাই।"

সুতরাং আমাদের কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না।

শুধু পত্রিকার অবয়বে নয়, ভাষার দিক দিয়াও সম্পাদক মহাশয় মহনীয় দারিদ্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—

'বাহোবা—কি ছ্যা ছ্যা! একেবারে মতি ময়রার টানা কদমা—টানো বড় হইবে, চুষিলে মুখের রস ফুরাইবে না।'

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত আমরাও "আশা করি, 'অভ্যুদয়' পরিচালনে কোন উচ্চ আদর্শ অনুসৃত হইবে।"

দুলালী—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক। কিশোর লাইব্রেরি, ২৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম, এক টাকা।

, গল্পের বই। সাতটি গল্পে বই শেষ হইয়াছে। প্রথম গল্পের নায়িকা দুলালী সুন্দরী দোসাদিনী, মদ্যপ স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া তাহার জীবন দুর্ব্বহ হওয়া সত্ত্বেও সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর ঘর-কন্না করে—কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই, অত্যাচার আরও বাড়িয়া চলে। অতঃপর একদিন মদের ঝোঁকে দুলালীর ভগ্নীপতিকেই তাহার স্বামী খুন করিয়া বসিল এবং বিচারে যখন তাহার ফাঁসী হয়-হয়, তখন দুলালীর মিথ্যা সাক্ষ্যে স্বামীর প্রাণ বাঁচিল। শেষ গল্প 'অবসান'এও মদ্যপানের দোষ বিভিন্ন অবস্থানে দেখানো হইয়াছে—তাই বলিয়া বইখানিকে কেহ টেম্পারেন্স সোসাইটির প্রচার-পত্র বলিয়া মনে না করেন। কেননা আর পাঁচটি গল্পে পতিতা নারীর মাহাত্ম্য, মাতৃত্বের মহিমা, লাঞ্ছিতা নারীর দুর্ভাগ্য ইত্যাদির বিবরণ আছে। সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্যকে মহান্ বলিতেই হইবে। এই সাধু উদ্দেশ্য প্রবন্ধাকারে প্রচারিত হইলে ভাল হইত—গল্প লিখিবার শক্তি লেখকের নাই।

ভুলের ফুল—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক, সান্যাল বুকষ্টোর, ১৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এখানিও গল্পের বই। ভূমিকায় লেখক লিখিতেছেন,—'সাহিত্য সাধনাকে আমার জীবনে আমি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করি। দুঃখ দুর্দ্দশাময় জীবনের ধূলিক্লেদ হইতে আবাল্য ইহাকে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।'—বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন হয়তো, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কেননা লেখকের যে ধারণা—'নগ্ন বাস্তবতার কদর্য্য চিত্রগুলি আঁকিয়া ধরিলে সাহিত্য সেবার পবিত্র ব্রতে কলঙ্ক স্পর্শ করে'—তাহা ভুল। স্বভাব-শিল্পীর স্পর্শে পৃথিবীর যে-কোন কদর্য্যতা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে; সে শিল্পীর ভাবিবার প্রয়োজনই হয় না—'মায়ের বেদীর সম্মুখে কদর্য্যতার অর্ঘ্য আনিয়া সন্তান ধরিতে পারে'—কিনা! লেখক 'শুদ্ধ, স্নাত, পবিত্র' হইয়া আসিয়াও 'ভারতীর পুণ্য পীঠ'এ অনধিকার-প্রবেশই করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'দুলালী' লিখিয়া তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন, 'ভুলের ফুল'এ তাহা কাঁটা হইয়া উঠিয়াছে—ফুল লেখকের কল্পনাতেই থাকিয়া গেছে।

রসায়ন—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক—সিংহ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্। মূল্য—১৲ টাকা।

—'রসায়ন'এর পরিচয় দিতে লেখক বলিয়াছেন, 'আমার চতুর্থ গল্প-পুস্তক' এবং অতঃপর দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠায় তিনি বাংলা সাহিত্যের বাজার-দর ও হালচাল সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানাইয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছেন। ভূমিকা পড়িয়া আর গল্প পড়িতে ইচ্ছা ছিল না—তবু পড়িতে হইল। ছয়টি গল্পের মধ্যে 'বাঘ-নাচ' পাঠ্য, কিন্তু এটি লেখকের কথায় 'নিছক গল্প নয়'। 'তাই বাঁচোয়া! নিছক গল্পে লেখকের প্রতিভা খোলে না'। পালাগান সংগ্রহে' নিযুক্ত থাকিলেই তিনি ভাল করিবেন বলিয়া মনে হয়।

পর পর তাঁহার তিনখানি বই পড়িয়া আমাদের এই মত দাঁড়াইল।

স্মৃতির স্বপ্ন—মেটার্লিঙ্কের 'মোনাভ্যানা'র অনুবাদ। শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ৯ কামারপাড়া লেন, বরাহ নগর কলিকাতা। দাম এক টাকা।

বাংলার অনুবাদ-সাহিত্য এ বইখানি ক্ষুণ্ণ করিবে।

আদর্শ সূচী-শিল্প—প্রথম ভাগ। শ্রীসুশীলা দেবী। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

জামা-কাপড় সূচ ও সূতার নমুনার কাজের সচিত্র পুস্তিকা। এ পুস্তিকার প্রচলন হইবে আশা করা যায়।

সম্পাদকীয়

গান্ধীজীর কল্যাণ-ব্রত

৩০শে এপ্রিল ভোর চারিটা হইয়াছে। যারবেদা কারাগারে প্রতিদিনের মত গান্ধীজী, মহাদেব দেশাই এবং সর্দ্দার বল্লভভাই জাগিয়া উঠিয়াছেন। এখনি প্রতিদিনের উপাসনা আরম্ভ হইবে।

প্রিয়শিষ্য মহাদেব দেশাই পূর্ব্বের রাত্রে বহুক্ষণ নিশি-জাগরণ করিয়া লিখিয়াছেন। রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিবার সময় তিনি জানিতেন প্রভাতে নিশি-জাগরণের জন্য তিরস্কৃত হইবেন।

৩০শে এপ্রিল প্রভাতে কারামন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হইল। মহাদেব দেশাই গাহিলেন,

"উঠ জাগ মুসাফির ভোর ভই
অব রেন কহান যো শোভত হই!"

প্রার্থনা শেষ হইলে দেশাই গান্ধীজীর তিরস্কারের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তিরস্কার করিলেন না। শুধু বলিলেন, কাল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছ। কোনও কথাবার্ত্তা না বলিয়া আধ-ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও!

মহাদেব দেশাই পুনরায় শয্যা-গ্রহণ করিলেন।

ইত্যবসরে গান্ধীজী সর্দ্দারকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার হাতে একটি বিবৃতি প্রদান করিলেন। শুধু বলিলেন, কোন তর্কের স্থান নাই, বল্লভভাই! আমি আশা করি তুমি তর্ক করিবে না।

এই বিবৃতিতে, তিনি আত্ম-শুদ্ধির জন্য যে কল্যাণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ৮ই মে হইতে একুশ দিন তিনি সর্ত্তহীন ভাবে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিবেন। এই বিবৃতিতে উপবাসের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর অর্থাৎ সত্য আমাকে যে মহাপরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছেন, প্রত্যহ আমি তাহার সমর্থক নূতন কারণের সন্ধান লাভ করিতেছি। যে সকল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, উপবাসব্রত অবলম্বন না করিলে আমি উহার ফলে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া পড়িতাম। যে উদ্দেশ্যে আমি অনশনব্রত অবলম্বন করিতেছি, সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা জানি না, কিন্তু অনশনের ফলে আমি অন্ততঃ রক্ষা পাইব। এই ব্রত উদ্‌যাপনের চেষ্টায় আমার জীবনান্ত ঘটে, কি আমি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া উঠিতে পারি,—তাহা নিতান্তই গৌণ বিষয়। অনশন-ব্রত ব্যতীত আমি হরিজন-সেবাকার্য্যের উপযুক্ত থাকিতাম না, এমন কি, সমস্ত সেবাকার্য্যের পক্ষেই অনুপযুক্ত হইতাম।

"আমি পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে চাই যে, * * * হরিজন-দিগকে অনুগৃহীত করিবার উদ্দেশ্যে আমি প্রায়োপবেশন করিতেছি না। আমার এবং সহকর্ম্মীদের চিত্তশুদ্ধির জন্যই আমি অনশনব্রত অবলম্বন করিতেছি। * * এই অনশন দ্বারা আমি সনাতনী হিন্দুদের প্রতি পুনরায় চাপ দিতে উদ্যত হইয়াছি আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিবেন যে, সমস্ত মন্দিরে হরিজনদিগকে প্রবেশাধিকার দান করিলেও, অস্পৃশ্যতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইলেও কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমি অনশন ভঙ্গ করিব না, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কাহারও উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আমি অনশনব্রত অবলম্বন করি নাই।

"বিদ্বেষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে—হৃদয় পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে—হরিজন-সেবার আন্দোলন যে সম্পূর্ণ নৈতিক আন্দোলন এবং নৈতিক বিশুদ্ধতার সহিত এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি উপবাসব্রত উদ্‌যাপন করিতেছি।"

সর্দ্দার বল্লভভাই কয়েকবার সেই বিবৃতিটি পড়িলেন। একটিও কথা বলিলেন না, কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন না! সেই শুভ্র মৌনতায় মহাত্মাজীও বিস্মিত হইলেন।

মহাদেব দেশাই নিদ্রা হইতে উঠিলে বল্লভভাই মহাত্মাজীর বিবৃতি তাঁহাকে দেখাইলেন। দেশাই প্রশ্ন তুলিলেন। সর্দ্দারজী উত্তরে শুধু বলিলেন, নায়াগ্রার জল-স্রোতকে রোধ করিবার চেষ্টা বৃথা! যদি মহাত্মাজীর অপেক্ষা পবিত্রতর জীবন আজ ভারতবর্ষে কেহ যাপন করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপার হইতে

তাঁহাকে নিরত করিবার চেষ্টা তিনিই করুন, আমার দ্বারা তাহা কখনই হইবে না!

তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, এক মাস ধরিয়া আমরা যেন কিছু না করি, একমাস ধরিয়া আমরা যেন কিছু না বলি, এবং সম্ভব হইলে এক মাস ধরিয়া আমরা এমন কিছু চিন্তা না করি, যাহাতে তাঁহার আত্মার এই মর্ম্মর-শুভ্র শান্তি বিক্ষুব্ধ হয়!

কারা-মন্দিরের নির্জ্জনতায় শুধু দুইটি প্রাণী! সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারাই তখন প্রথম জানিয়াছেন—বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের এই মরণ-ব্রতের কথা! কি দুর্ল্লভ কঠোর আত্মীয়তা!

ভারতবর্ষে মহাত্মাজী যতবার অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, মহাদেব দেশাই সকল ক্ষেত্রেই গান্ধীজীর পার্শ্বে ছিলেন। তিনি ভাল রকমই জানিতেন, প্রাণের চেয়ে প্রিয় আদর্শকে জীবনে কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, সে বিষয়ে মহাত্মাজীকে আমরা যে-ভাবে জানি, তাহার অপেক্ষা বেশী তিনি নিজেকে জানেন!

৩০শে তারিখের মধ্যাহ্নেই তিনি উপবাস আরম্ভ করিবেন স্থির করেন। কিন্তু যাহাদের বন্দীরূপে তিনি অবস্থিত তাহাদের না জানাইয়া এই ব্রত গ্রহণ করিতে তাঁহার পৌরুষ সমর্থন না করায় তিনি আর এক সপ্তাহকাল সময় লইলেন। এই সময় সমস্ত জগৎ তাঁহার এই কঠোর ব্রতের কথা স্তম্ভিত বিমূঢ়তায় অবগত হইল।

চারিদিকে শঙ্কা, আকুলতা, সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ, কাতর অনুরোধ জাগিয়া উঠিল।

প্রিয় সহকর্ম্মী রাজাগোপাল আচারী আসিলেন। নানা প্রশ্ন ও প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। অবশেষে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ তিনিও মানিয়া লইলেন। শুধু বলিলেন, উপবাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একবার ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে হইবে।

মহাত্মাজী একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, ডাক্তারী পরীক্ষায় আমি সম্মতি দিতে পারি না। ইহাতে আমার নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বাস দেখান হয়।

উত্তরে রাজাজী বলিলেন, আপনি কোনো কথায় সায় দিতেছেন না। আপনি যে অভ্রান্ত, কেবলই এই জিদ করিতেছেন।

মহাত্মাজী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অন্তরের নিঃসংশয় ধারণাকে এরকম ভাবে শিথিল করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, এ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইবই।

তাঁহাদের চলিয়া যাইবার পর, সহসা উত্তেজিত হওয়ায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন। ব্রত আরম্ভের পূর্ব্বে চিত্তের এই অপ্রসাদ ভাব অন্যায় বিবেচনা করিয়া তিনি পরের দিন প্রাতঃকালেই আচারীর নিকট পত্র লিখিলেন:—

প্রিয় "সি আর"—তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। কাল তোমার ও শঙ্করলালের প্রাণে তীব্র আঘাত দিয়াছি। "ক্ষমা কর"—একথা বলিয়া কোন লাভ নাই। কেন না চাহিবার পূর্ব্বেই তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। কিন্তু যে কথায় আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, আমি তাহাই করিব। আমি ডাক্তারের দ্বারা শরীর-পরীক্ষায় রাজী আছি। যখন, যাহাকে দিয়া ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা করাইতে পার, তবে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল বাহিরে প্রচার করা উচিত মনে করি না, কেন না এই সংবাদের রাজনৈতিক ব্যবহার হইতে পারে। অবশ্য এটা নিশ্চয় যে, ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইলে তাহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, উপবাস অবশ্যই আরম্ভ হইবে।

গতকল্য আমার প্রাণে যে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ধৌত করিবার জন্য এই চিঠিখানি লিখিলাম। তুমি ও শঙ্করলাল ভালবাসা জানিবে—"বাপু"।

পত্র পাইয়া রাজাগোপাল আসিয়া বলিলেন, ক্ষমা চাহিবার কোন কারণ নাই। ডাক্তারী পরীক্ষা না করাই আমরা স্থির করিয়াছি।

গান্ধীজীর সহকর্ম্মিগণ জানিতেন, শুধু একটি লোকের সপ্রেম প্রতিবাদ হয়ত এই পর্ব্বতকঠোর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে এমনি নিঃসংশয়ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। কারাগারে যখন তাঁহার নিকট এই সংবাদ গিয়া উপস্থিত হইল, তিনি গান্ধীজীকে লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। যে বিষয় আমি বুঝিনা, সে সম্বন্ধে আমি কি বলিতে পারি?

আমার মনে হয় এক অপরিচিত দেশে আমি যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সকলেই আমার অপরিচিত। তাহার মধ্যে শুধু একজনকে আমার পরিচিত বলিয়া জানি। সে আপনি। অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিতেছি। পদে পদে আঘাত লাগিতেছে। তবুও যাহাই ঘটুক না কেন, আমার ভালবাসা আপনাকে ঘিরিয়া রহিল।" জহরলালের এই পত্র পড়িতে গিয়া গান্ধীজীর চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

সকল অনুরোধ, প্রতিবাদ দূরে রাখিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধীজী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এ শুধু তাঁহার সহিত তাঁহার নিজের এবং তাঁহার ভগবানের বোঝাপড়া। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে যোগীর একান্ত স্বতন্ত্র যোগ-জীবনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, আমাদের দেশে তাহা নূতন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রলয়ের পূর্ব্বে আমাদের শিব সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসেন; আমাদের দধীচি তনুত্যাগের পূর্ব্বে তনুকে তেজোময় করেন। আজ বহুযুগ পরে ভগবানে আর মানবে সেই অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে—মানুষের অন্তর ভগবানের কাছে কৈফিয়ৎ চাহিতেছে। বহুদিন পরে আমরা দেখিতেছি, একটি মানুষ একান্ত নির্ভরতার সহিত সেই কথা বলিতেছে—

"আমি যদি পরাভূত হই, তবে সে আমার লজ্জা নহে প্রভু, সে তোমারই লজ্জা!"—(তুলসীদাস)

গান্ধীজীর কারামুক্তি এবং সন্ধি-সুলভ মনোভাব

মহাত্মা গান্ধীর উপবাসগ্রহণের প্রথম দিনে অর্থাৎ ৮ই মে রাত্রি ৮—৪৫ মিনিটে তাঁহাকে সরকার পক্ষ হইতে কারামুক্ত করা হয়। কারামুক্ত হইয়া তিনি মোটরযোগে লেডী থ্যাকার্সের বাংলোতে আসেন এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সেই খানেই অবস্থান করিতেছেন।

কারামুক্ত হইয়াই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ অ্যানের সহিত পরামর্শ করিয়া গান্ধীজী বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে,

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত আণে যদি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একমাস অথবা ৬ সপ্তাহকাল আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল, ঐরূপ একটি ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

দেশের মধ্যে সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্ডিনান্স সংক্রান্ত আইনগুলি স্থগিত রাখিয়া আন্দোলন-সম্পর্কিত বন্দীদের মুক্তি দিবার জন্য আমি গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিতেছি।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে স্থলে আমি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থল হইতে আমি কার্য্যারম্ভ করিতে ইচ্ছা করি ... এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা থাকিলে কোন না কোন প্রকার কার্য্যক্রম আবিষ্কৃত হইবে। আমার দিক হইতে আমি বলিতে পারি, যে, কার্য্যক্রম আবিষ্কার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

মহাত্মাজীর এই বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত আনে ৬ সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গান্ধীজীর এই বিবৃতি প্রকাশ এবং মিঃ আণের সমর্থনে দেশের অধিকাংশ লোকই আশা করিয়াছিলেন যে, সরকার এই সন্ধিসুলভ মনোবৃত্তির সুবিধা গ্রহণ করিয়া এই রাজনৈতিক সঙ্কটের মীমাংসার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন। কিন্তু এই বিবৃতির উত্তরে সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, "আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করাইবার জন্য ঐ আন্দোলনের নেতাদের মুক্তি দিয়া একটা আপোষের জন্য কোন কথাবার্ত্তা চালাইতে আমাদের ইচ্ছা নাই। অস্থায়ী ভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া কংগ্রেস যে কথাবার্ত্তা চালাইতে উদ্যত, তাহা পূর্ব্বকথিত সর্ত্তগুলি এমনভাবে পূর্ণ করিতেছে না, যাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইতে পারেন।"

অস্থায়ীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার না করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাহা প্রত্যাহার করার মধ্যে একটা নিয়মতান্ত্রিক বাধা আছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা কারাগারের বাহিরে আছেন আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে প্রত্যাহার করিয়া লইবার তাঁহাদের অধিকার নাই। আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে প্রত্যাহার করিবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির এবং দুর্দ্দৈবের ব্যাপার যে, তাঁহাদের অনেকেই এখন কারাগারে। এহেন ক্ষেত্রে, অস্থায়ীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া কংগ্রেস যে শান্তিপ্রবণ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর

স্বরূপ সরকারী এস্তেহারে যে মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অপর পক্ষের রাজনৈতিক উদারতার অভাব অতি শোচনীয়ভাবে দেখা দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কোনও বিখ্যাত লেখকের একখানি উপন্যাসের একটি চিত্র মনে পড়িতেছে। একজন বন্দীকে হাতে-হাত-কড়া দিয়া অফিসারের সম্মুখে আনা হইয়াছে। বন্দীর মাথায় টুপী দেখিয়া অফিসার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, টুপী নামাও!

বন্দী উত্তর দিল, হাত-বাঁধা থাকলে কি করে টুপী নামাতে হয়, জানি না!

অর্ণবপোত-পরিচালন বিদ্যা

শুধু সুবিধা ও সুযোগের অভাবই যে বর্ত্তমান সভ্যতার বহু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে, যে কয়জন ভারতীয় যুবক বর্ত্তমানে অর্ণবপোত-পরিচালন বিদ্যা অর্জ্জন করিবার অধিকার পাইয়া 'ডাফরীণ' নামক ট্রেনিং-জাহাজে শিক্ষালাভ করিতেছে, এই বিদ্যায় তাহাদের আশ্চর্য্য-জনক দক্ষতাই তাহা প্রমাণ করিতেছে। বোম্বাইয়ের বিগত ২৯শে এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই জাহাজে ক্যাডেটদের পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ও তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের অসামান্য উন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, যে অতঃপর আর এই যুবকদের ইঞ্জিনিয়ার-অফিসার রূপে সমুদ্রে কাজ করিতে যাইতে কোনও বাধা নাই।

১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে ভারতবাসীদিগকে এই সুবিধা প্রথম দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তিনদল ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিনে সমুদ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭২, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৭ জন এবং হুগলী রিভার সার্ভে বিভাগে ৩ জন। এত অল্পকালের মধ্যে এইরূপ সাফল্য আশাতীতই বলিতে হইবে।

প্রকৃতি ও মানুষ

প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টায় বারবার ব্যাহত হইয়াও মানুষ চেষ্টা ছাড়িতেছে না, আকাশ সমুদ্র ও পর্ব্বতকে জয় করিবার আগ্রহে কত মহাপ্রাণ যে আত্মবলি দিয়াছে তাহার তালিকা দিয়া শেষ করা কঠিন। গত পনের দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশজন সাহসী বীর এই কার্য্যে প্রাণ দিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ কর্ণেল ষ্টেটহাম মধ্যভারতের রায়পুর জিলার সিংহপুর নামক স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বত-গুহায় প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধান করিতে গিয়া মৌমাছির কামড়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কর্ণেল ষ্টেটহাম সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন না। নিজের অদম্য জ্ঞানপিপাসার তাড়নায় একাকী ভারতের গহন অরণ্যে গিরিগুহায় ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন।

বিমানকে জয় করিতে গিয়া বিখ্যাত বৈমানিক বার্ট হিঙ্কলার মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন, সম্প্রতি ফ্লোরেন্স নগরের অনতিদূরে আপিনাইন পর্ব্বতমালার এক দুরারোহ শৃঙ্গে সমুদ্র সমতল হইতে ৪৬০০ ফিট উর্দ্ধে তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত ৭ই জানুয়ারী তারিখে তিনি ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া বিমানপথ ন্যূনতম সময়ে অতিক্রম করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতে তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটনের জ্যেষ্ঠপুত্র ভাইকাউণ্ট নেবওয়ার্থ অক্জিলিয়ারী এয়ারফোর্সের তরফ হইতে বিমানপোত চালনা-কৌশল আয়ত্ত করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন।

কমাণ্ডার ডব্লিউ এম, কেরীর অধিনায়কত্বে রয়্যাল রিসার্চ্চ জাহাজ ডিসকভারি (২) দক্ষিণ মেরুতে ১৯ মাস সামুদ্রিক গবেষণা করিয়া দেশে ফিরিতেছিল। দক্ষিণ মেরুতে তিমি মাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে ডিসকভারি যাত্রা করে, ফিরিবার পথে উষাণ্ট নামকস্থানে কমাণ্ডার কেরী জাহাজের পাটাতন হইতে জলে পড়িয়া নিহত হইয়াছেন।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মানুষ যে প্রকৃতিকে বশে আনিতেছে মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিস্তার তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ইংলণ্ড-ভারতবর্ষ টেলিফোন

বিগত ১লা মে তারিখে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেলিফোন সার্ভিস প্রথম খোলা হইয়াছে এবং এই টেলিফোন-যোগে লণ্ডন হইতে বোম্বাইয়ে সর্ব্বপ্রথম বার্ত্তালাপ করিয়াছেন বোম্বাইয়ের গবর্ণর ও ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যার স্যামুয়েল হোর। এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তের দূরত্ব ছিল ৬৩০০ মাইল। মানুষের অঘটনঘটনপটিয়সী প্রতিভা আরও কি করিবে, মানুষই হয় তো তাহা ভাবিয়া অবাক হইতেছে।

এই টেলিফোনযোগেই লণ্ডনের একটি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁহার পুত্র দেবীদাস গান্ধীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষকে শাসন করিবার আর একটি নূতন অস্ত্র ইংরাজের হইল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তদ্দেশীয় যাঁহাদের প্রেম প্রগাঢ় তাঁহারা কিন্তু বলিতেছেন ইহাতে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পাইবে।

আর্থিক সঙ্কট

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত আলোচনার ফলে হঠাৎ পৃথিবীতে মুদ্রা ও কারেন্সী-নোটের মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে সুরু করিয়াছে। ডলারের দাম, এই চড়িতেছে আবার এই নামিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, আমেরিকার এ একটা চাল, সমস্ত পৃথিবীর টাকার বাজারকে ঘায়েল করিবার এক কৌশল। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, অনেকেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কারু ও শিল্প-শিক্ষা

বাংলার মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের আংশিক ভাবে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট চেষ্টিত হইয়াছেন এই সংবাদ বিস্ময়কর হইলেও সত্য। বাংলার ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে বেঙ্গল ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কলিকাতায় নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চার হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। বিষয়গুলি এই।

১। ছাতা নির্ম্মাণ শিক্ষা [ছাতার বাঁট বাঁকান ও তাহাতে নক্সা কাটা, বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়া সম্পূর্ণ ছাতা নির্ম্মাণ।]

২। পিত্তল ও বেলমেটালের সহিত নূতন এক ধরণের খাদ মিশাইয়া তৈজসাদি নির্ম্মাণ শিক্ষা।

৩। ছুরী কাঁচি ইত্যাদি নির্ম্মাণ শিক্ষা।

৪। উন্নত কুমোরের চাকার সাহায্যে মাটির দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও তাহা পালিশ করা শিক্ষা।

যে সকল যুবকেরা বেকার বসিয়া আছেন অথচ নিজেরা খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে তাঁহারা আশা করি এই সুবিধা ছাড়িবেন না।

যখের ধন

কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে ভারত সরকার মাঝে মাঝে এক একটা ঋণ তুলিবার জন্য ইস্তাহার জারি করিতেছেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে সে ঋণের টাকা গবর্ণমেণ্টের তহবিলে আসিয়া জুটিতেছে। সুদের হার ব্যাঙ্কের সুদের হারের চেয়ে সামান্য পরিমাণ বেশী। গবর্ণমেণ্টকে এই সকল ঋণের খানিকটা এই ভারতবর্ষীয় লোকেরাই দিতেছে। অথচ এদিকে টাকার অভাবে কত ভাল ভাল ব্যবসায় যে গত অল্পকালের মধ্যে নষ্ট হইয়া গেল তাহার হিসাব নাই। টাকা যাহাদের আছে তাহারা এই সকল ব্যবসায়কে সাহায্য করিলে বেশী সুদ তো পাইবেই, অধিকন্তু তাহাদের ছাতা-পড়া টাকা ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিবে। বুকের পাটা না থাকিলে পৃথিবীর কোনও জাতি টাকায় বড় হইতে পারে না। এই ভাবে যখের ধন গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ফেলিয়া না রাখিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাহার যথাযথ ব্যবহার করিলে দেশের বেকার-সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। দেশের শতকরা নিরানব্বই জন না বাঁচিলে একজনও বাঁচিবেন না, এই কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না।

বিমান-পোত-চালনা শিক্ষা

৯ই মের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা খবর দিয়াছেন যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ লিমিটেড নামক সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ভারতে বিমানবিহারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমনই আশান্বিত যে তাঁহারা অবিলম্বে এই বিদ্যায় ভারতীয়দের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একটি বিমানপোত পরিচালন বিষয়ক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশার কথা।

এদেশে আকাশমার্গকে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা ও সাহস যে সকল যুবকের আছে, তাহারা তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুবিধা অদূরভবিষ্যতে পাইবে এবং একদিক দিয়া বেকারসমস্যারও কিঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

শুনা যাইতেছে, দিল্লীতে এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর অপরাইজড মূলধন এখন বিশ লক্ষ টাকা, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার ডিরেক্টর—

স্যার ফিরোজ সেঠনা, মিঃ এফ বি রায়ানহাম, মিঃ এইচ এম মেটা, বি কে বসু (অনরেবল), যোধপুর দরবার হইতে একজন এবং আর ই গ্রাণ্ট গোভান।

ডি ভ্যালেরার নূতন প্রচেষ্টা

ফ্রি ষ্টেটের এক অধিবেশনে সভাপতি মিঃ ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি আয়ারল্যাণ্ডকে সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়া সমস্ত ব্যাপারের যবনিকা-পাত করিব। তিনি আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ফ্রী ষ্টেটের আদালত হইতে কোন মামলার আপীল যাহাতে প্রিভি কাউন্সিলে যাইতে না পারে, তজ্জন্য তিনি শাসনতন্ত্রের যথোচিত সংশোধন করিবেন এবং আয়র্লণ্ডকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণার পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ে জনমত নির্দ্ধারণ করিবেন।

সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথত্যাগের জন্য যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পাকাপাকিরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং গবর্ণর জেনারেল উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

গত ১৪ই এপ্রিল লাহোরে নিখিলভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশনে, উক্ত সভার সভাপতিরূপে ডাঃ জিয়াউদ্দীন

আহম্মদ বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অবহিত হওয়া দূরে থাকুক, শিক্ষা-বিভাগ হস্তান্তরিত করিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের ঘাড়ে শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত দায়িত্ব-ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, অথচ ঐ দায়িত্ব সম্পাদন বিষয়ে পর্য্যাপ্ত অর্থ তাঁহাদের হাতে দেওয়া হয় নাই, কাজেই কোন প্রদেশেই শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়া কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। সর্ব্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অদূরভবিষ্যতে যদি এই সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের শিক্ষার ব্যবস্থায় এক বিপ্লব দেখা দিবে—ঐ বিপ্লব অসহযোগ বা করদান-বন্ধ আন্দোলন অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম বিপজ্জনক হইবে না।

কলিকাতা করপোরেশনের নূতন মেয়র

গত ১৬ই বৈশাখ সম্মিলিত কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এবং হাজি আবদুর রেজাক যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যথারীতি মেয়রকে অভিনন্দিত করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, —"আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আমি দলগত মনোভাব পরিহার করিব, কিন্তু সেই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতি আমার অনুরাগ বিস্মৃত হইতে পারি না। আমি সেই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দীন সেবক, ইহা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমার রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

নারী-শিক্ষার জন্য দান

লোয়ার সারকুলার রোডের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র মহাশয়ের উইল অনুসারে তাঁহার সম্পত্তি হইতে মাসিক ৪০০০৲ টাকা বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দেওয়া হইবে। এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ উইলের সাক্ষী।

শিক্ষাবিস্তারকল্পে স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের বদান্যতার অপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—তিনি উইলে আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার (রায় বাহাদুরের) জীবিতকালে যদি তাঁহার পুত্র শ্রীযুত অনিরুদ্ধ মিত্রের পুত্র-সন্তান না হয়, অথবা যদি শ্রীযুত অনিরুদ্ধ মিত্র ও তাঁহার পত্নী রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ না করেন, তবে রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি (দান, মাসোহারা ইত্যাদি ব্যতীত) বাঙ্গলা দেশে হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দেওয়া হইবে, এবং যাবৎ শ্রীযুত অনিরুদ্ধ মিত্রের পুত্রসন্তান না জন্মে অথবা তিনি বা তাঁহার পত্নী দত্তক গ্রহণ না করেন, ততদিন সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে থাকিবে।

ভ্রম-সংশোধন

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : প্রথম যুগ

(বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪০)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫৭।১	১৬	সাহিত্যের	সাহিত্যের
	১৯	কথা বস্তুর	কথা-বস্তুর
৪৫৮।১	৬	মত্তের	যত্তির
৪৫৮।২	২৩,২৭	শূণ্যপুরাণ	শূন্যপুরাণ
৪৫৯।২	২২	যাত্যাস্ও	যাত্যাসও
৪৬১।১	৮	একচোট,	একচোট দিল,
	১৩	পৌছাইল	পোঁছাইল
	২২	অনধিক	অধিক
	৪৩	৩,	৩/০
৪৬২।১	৪৩	ক্রিয়ার	ক্রিয়া
৪৬২।২	২৭	মত,	মতে
৪৬৩।১	২৭	রা	বা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৩।২	২	সামান্ত	অসম্পন্ন
	১৭	খবর	খরচ
	২১	হরহরি	হরহরি বসুর
৪৬৪।১	২৬	ভাষায়	ভাষার
৪৬৫।২	২৭	সেকবিল্লি	সেকচিল্লি
	৩৮	—ক্ষেণ—	—ফেন—
৪৬৬।২	৯	পদের	শব্দের
	১৭	ফীশ	কীশ
৪৬৭।১	১১	যে সে	'যে-সে'
৪৬৮।১	৫	সম্পাদিত	সম্পাদিত
৪৬৮।২	২৫	অর্থ	'অর্থ'
	৩৪	ধাঁযের	ধাঁচের

৪৬৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকার চিহ্নটি ২৭ পংক্তির শেষে হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মা

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

ভারতীয় শিল্পকলা ও ইতিহাসের অনুধাবন

—ভগিনী নিবেদিতা

পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতন বা আধুনিক যুগধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা, ইহাই আজিকার দিনে ভারতবর্ষের বৃহত্তম সমস্যা। নূতন যে যুগে আমরা প্রবেশ-লাভ করিতেছি, দেখিতে পাইতেছি তাহা বিশ্বব্যাপী জাগরণের যুগ। বাষ্প ও তাড়িতের আবিষ্কারের ফলে অত্যন্ত নিরুৎসাহী লোকের পক্ষেও দিগ্‌বিজয় করা সম্ভব হইয়াছে। আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই দিগ্‌বিজয় করিয়াছে; আধুনিক বিজ্ঞান সমস্ত পৃথিবী জয় করিল বলিয়া। এখনকার যে কোনও সাধারণ লোকের বসিবার ঘর পৃথিবীর সকল কাল ও দেশ হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত। বস্তুতঃ সমগ্র মানবজাতি তো বটেই, ব্যক্তিগত মানুষের মনও আমাদের এই পৃথিবীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে একটা সমগ্র দৃষ্টি লাভ করিয়াছে।

আধুনিক যুগকে পরস্বাপহরণের (exploitation) যুগ বলা চলে। এখনও মূল্যবান দ্রব্য আহরণের জন্য ইউরোপকে হয় অতীত কালের বিস্মৃতির মধ্যে অবগাহন করিতে অথবা এখনও সভ্য হইয়া উঠে নাই এমন মানুষের রাজ্যে হানা দিতে হইতেছে। পারস্য ও তুর্কীস্থান-জাত 'রাগ', বোখারার সূচীশিল্পের নিদর্শন, মনোহারী চীনা 'পোর্সিলেন' এবং ধাতুদ্রব্য—এ সকলের চাহিদা বাড়িয়াছে, কিন্তু এগুলি প্রাচীনা পৃথিবীর পুষ্পোদ্যানে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত, ইহাদের সংগ্রহ-কার্য্যে সেই উদ্যানের নির্জ্জনতা ও শান্তি ব্যাহত হইতেছে। লণ্ডনে শিশুরা স্কুলে স্কুলে ড্রইং শেখে। কেন? নূতন কিছু সৃষ্টি করিবে বলিয়া নয়, চিত্রশিল্পে বতিচেলি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সম্যক বুঝিবার জন্য তাহারা ড্রইংয়ের মক্স করিতেছে। যে স্বপ্নানুভূতি ও আত্ম-বিশ্বাসের ফলে ওই সকল সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, লণ্ডন তাহার শিশুসন্তানদিগকে তাহা শিখাইতে পারে না। শেক্সপীয়ার পড়িবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু নূতন শেক্সপীয়ার গড়িয়া তোলার সাধনা কোথায়? যে সকল প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করিয়া আজ আমরা আনন্দাপ্লুত হই, সেগুলিও বহুপূর্ব্বে ঋষিকল্প ব্যক্তিরা সাধনা করিতে করিতে ভাবোন্মাদনার মুহূর্ত্তে রচনা করিয়া গিয়াছেন; সেই সকল বাণীর অনুরূপ একটি বাণী রচনা করিতে যে কত বৎসরের তপস্যা প্রয়োজন, তাহা আজ আমরা ভাবিতেই পারি না। এ যুগ পরস্বাপহরণের যুগ, সৃষ্টির যুগ নয়।

আধুনিক যুগ সংগঠনেরও (organisation) যুগ। যন্ত্রের বেলায় যেমন দেখি, এখানে একটি স্ক্রু অথবা ওখানে একটি চাকার যথাযথ ব্যবহার করিয়া আমরা আমাদের ক্ষমতার পরিধি বহুদূরপ্রসারী করিতে সক্ষম হই—স্বভাবতঃ আমরা যে-ক্ষমতা আয়ত্ত করার কথা কল্পনাই করিতে পারিনা—তেমনই বর্ত্তমান যুগও লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে বহুমানবকে সংগঠনের সাহায্যে একটি যন্ত্রের মত করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে কৌশলে পরিচালনা করিয়া ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করিতে। নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের আরাম, বিলাস ও শিক্ষালাভের জন্য একদল ক্ষমতাপন্ন মানুষ সমগ্র জাতিকে বলি দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। শুধু নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অভ্যাসের বলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটি যন্ত্রের মত ব্যবহার করিতে আমরা শিখিয়াছি। অফিসে, ফ্যাক্টরীতে, রাষ্ট্র-পরিচালনায় এই যান্ত্রিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগও (age of the people) বটে। আজ প্রত্যেক সাধারণ মানুষও সমাজে ও রাষ্ট্রে কার্য্যকুশলতা ও দায়িত্ব লইয়া মাথা ঘামাইতেছে—এতকাল এই সকল দায়িত্বের কথা চিন্তা করার অধিকার সম্রাট ও তাঁহার শাসন-পরিষদেরই ছিল। আমাদের প্রত্যেকের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে রাজারাজড়ার মত—অথচ আমরা

রাজা হইতে পারি নাই। আমরা প্রত্যেকেই এমন শিক্ষা লাভ করিতেছি যাহা পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরই একচেটিয়া ছিল, ফলে, জনসাধারণের উপর যে নিপীড়ন চলিতেছে, জনসাধারণই সে সম্বন্ধে অবহিত হইয়া বিচার করিতেছে।

আধুনিক যুগের মোটামুটি বৈশিষ্ট্য এই গুলি। ভারতবর্ষ বহু ব্যাপারে এখনও মধ্যযুগেই (mediæval) অবস্থান করিতেছে, এখনও আধুনিক হইতে পারে নাই। মধ্যযুগ মুখ্যতঃ ছিল সৃষ্টির যুগ, অপহরণের যুগ ছিল না। তখনকার কল্পনা-বিলাসীরা শিশুসুলভ সারল্যে বহু স্বপ্ন রচনা করিত; জনসাধারণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠে নাই এবং আচারে ব্যবহারে তাহাদের জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল। রাষ্ট্রীয় অধিকার শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া (monopoly) ছিল। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত জীবন কাজেকর্ম্মে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্মুখী ছিল। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য যেমন ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিল্পকলা তেমনই মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষ হাতে-কলমে কাজ করিত, যন্ত্রের সাহায্যে নহে। সুতরাং দ্রব্য উৎপাদন সময়সাপেক্ষ ছিল। অতি ধীরে ধীরে শিল্পজাত দ্রব্য জমিয়া উঠিত। বংশ বংশ ধরিয়া একখানি ঘরকেই সুসজ্জিত করা হইত, এই কারণেই মধ্য-যুগের পুরাতন একখানি রান্নাঘরও আধুনিক যুগের যে কোনও 'ড্রইংরুম' হইতে সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমরা এখন অনেকেই অনুভব করিয়া থাকি যে যেখানে নূতনকে পরিহার করিয়া পুরাতনকে ধরিয়া রাখা সম্ভব সেখানেই তাহা করা সমীচীন কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ইচ্ছামত তাহা করিতে পারি না। পুরাতন মধ্যযুগ এখানে সাংঘাতিক আঘাতে পীড়িত। প্রথম আঘাত দিয়াছে আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য (trade)। পশ্চিমের * অল্প আয়াসে ও সময়ে প্রস্তুত অল্পদিনস্থায়ী যন্ত্রজাত দ্রব্যসমূহের আমদানির ফলে বংশপরম্পরায় বহু ধৈর্য্যে ও পরিশ্রমে গড়িয়া তোলা বহু শিল্পের অবসান ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতা-পশুর দুইটি শৃঙ্গ—দারিদ্র্য ও বীভৎসতা—প্রতিদিন প্রবলতর ভাবে ভারতবর্ষের অনাড়ম্বর সৌন্দর্যাকে আক্রমণ করিতেছে। শিল্পদ্রব্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলাগুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হইতেছে; বহু যুগ ধরিয়া বংশে বংশে কাজ করিতে করিতে যে সকল শিল্পী-জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, অভাবের তাড়নায় তাহারা মৃতকল্প অথবা বাধ্য হইয়া বহু অপ্রিয় কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

আসলে, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মৃত্যু-দণ্ড সেই দিনই ঘোষিত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ফলে সে যেদিন হইতে নিজেকে ইংরাজী-ভাষাভাষী একটি অধীন রাজ্যে পরিণত করি-য়াছে। ভাল হউক, মন্দ হউক এই আধুনিকতার প্রভাব এত অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে যে ফিরিবার উপায় নাই। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর পণ্যশালায় ভারতবর্ষ সাজিয়া গুজিয়া বসিয়াছে। তাহার গর্ব্ব এখনও আছে, আত্মাভিমান এখনও জাগ্রত, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া নিজের ভিত্তিতে নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আর চলিতে পারিতেছে না—বিশ্বের দরবারে কোনও কিছু উপহার দিয়া সে খুসী হইতে পারিতেছে না। প্রত্যেক জাতিরই অধিকার আছে এমন কোনও প্রণালী খাড়া করিয়া তোলা, যাহার অনুসরণে শুধু যে তাহার মহৎ প্রতিভাবান সন্তানদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ও পরিপুষ্ট হইবে এমন নহে, অতি অধম যে সন্তান সেও প্রতিনিয়ত নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নীত হইবে। ভারতবর্ষে আজ দেখিতেছি, অধমেরা নির্ব্বিচারে এবং বীভৎস ভাবে অনুকরণপ্রয়াসী। এবং এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কল্পনাতীত বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া কাজ করিতে হইতেছে। অথচ যে কার্য্যের জন্য তাঁহারা প্রাণপাত করিতেছেন তাহার গুরুত্ব সমাজ উপলব্ধি করিতেছে না। অধম ও মহৎ এই দুয়ের মাঝখানে দেশের পনেরো আনা জনসাধারণ 'কোন্ পথে যাই' এই ভাবনায় পীড়িত। ধর্ম্ম, নীতি, বুদ্ধি ও সমাজ ব্যাপারে বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে যথাযথ বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, ভারতবর্ষ বিভ্রান্ত, বিমূঢ় ও সংশয়তিমিরে দিশাহারা হইয়া আছে।

এখন নিজের সমুদয় চেষ্টাকে সংহত ও কার্য্যকরী করিতে হইলে, ভারতবর্ষকে প্রভূত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে, তাহাকে আধুনিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। অর্থাৎ, চিন্তা ও প্রকাশের (thought and expression) আধুনিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পদ যাহা তাহাকেই সমৃদ্ধতর করিতে হইবে এবং পৃথিবীর অপর যে সকল জাতির সহিত তাহার কারবার তাহাদের অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ না হউক, সে যে তাহাদের সমকক্ষ তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের পুঁথিগত জ্ঞান লাভ করিলেই হইবে না, ভারতবর্ষকে আধুনিক বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে; যে সকল সমস্যার আজিও সমাধান হয় নাই বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার সমাধান করিতে হইবে। অন্যের আবিষ্কৃত বাষ্পীয় পোত ও অন্যান্য যন্ত্রকে বরণ করিয়া লইলেই চলিবে না, যন্ত্র যাঁহারা আবিষ্কার করিবেন তাঁহাদিগকেও গড়িয়া তুলিতে হইবে—জীবনের নানাবিধ সুবিধা ও সম্ভাবনাকে তাঁহারা সফল করিয়া তুলিবেন। বিদেশী সাহিত্যসম্ভোগে ডুবিয়া থাকিলেই চলিবে না, নিজেদের দানের দ্বারা সেই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে; ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ও রাষ্ট্র-

* এই প্রবন্ধ ১৯০৮ সালে রচিত হয়। সম্ভবতঃ জাপানী দ্রব্যের আমদানী তখন এত অধিক হয় নাই। বঃ সঃ

নেতাদের কার্য্যকলাপে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না, নিজের ক্ষমতার প্রসার করিয়া ঘরে ঘরে বীরপুরুষ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

চিত্র-শিল্পে আমাদের এই উক্তি যেমন সহজে প্রমাণিত হইবে, এমন আর কিছুতে নয়। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের শিল্পসাধনার বহু পরিচয় অনেক অপরূপ চিত্রে আমরা পাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগসংঘর্ষে তাঁহাদের শিল্প-ধারা বিলুপ্ত—নবীন শিল্পসাধকেরা অসহায় ভাবে পথ চলিতেছেন এবং ইয়োরোপের ব্যর্থ অনুকরণে ক্যান্‌ভাসের উপর রঙের প্রলেপ দিয়াই কল্পনাকে মূর্ত্তি দিতে চাহিতেছেন।* কিন্তু না ইয়োরোপীয়, না দেশীয় কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। স্পষ্ট বুঝিতেছি যে এখন এমন কয়েকজন সাধকের প্রয়োজন যাঁহারা চিত্রশিল্পের আধুনিক টেক্‌নিক আয়ত্ত করিয়া জাতীয় মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কোনও উপায়ে সেই আদর্শকে রূপ দান করিবেন। উপাদান সমূহের প্রয়োগ আয়ত্ত করিতে হইলে শিল্পীদের একটি 'স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এখানে নির্দ্দিষ্ট শিল্পপ্রণালী অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টাই শুধু চলিবেনা, এখান হইতে জাতীয়তার বাণী দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

এক কথায়, যদি ভারতমাতার সন্তানেরা ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষীয়ের মত করিয়া ধারণা করিতে না পারে, ভারতের অন্তর্নিহিত ভাবসাধনাকে মূর্ত্ত করিবার জন্য সাধনা না করে তাহা হইলে দেশের মূল্যবান যাহা-কিছু সবই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইবে।

নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় এই নব-জাগরণের আর একটি অপরিহার্য্য দিক্ হইবে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুশীলন সম্পর্কীয় আন্দোলন। মানুষের দেহে ভগবান একজোড়া চক্ষু দিয়াছেন, সে তাহা দিয়া দেখে; জাতির পক্ষে ইতিহাসও সেই চোখের কাজ করে। জাতীয় চরিত্র জাতির ইতিহাস-চর্চ্চার ফলেই গঠিত হয়। আমরা কি এবং কোন্ পথে চলিতে চাই তাহা জানিতে হইলে আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম তাহাও জানিতে হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুশীলনে ভারতবাসীর প্রভূত আগ্রহ থাকা আবশ্যক এই কারণে যে, এই ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই এবং ইহার অনেকখানিই এখনও তমসাচ্ছন্ন।

যদি সম্যক উপলব্ধি হয়, ঐতিহাসিক দৃশ্য হিসাবে ভারতীয় বিবর্ত্তনবাদের ছবিটি অপরূপ। ধীরে ধীরে নানা বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণে কেমন করিয়া ভারতীয় ভাবধারার উদ্ভব হইল, যুগে যুগে নবাগত জাতিকে আত্মসাৎ করিয়া কেমন করিয়া ভারতের জাতীয়তা গড়িয়া উঠিল, তাহার ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।

ইতিমধ্যেই দুইটি ভারতবর্ষের কথা আমরা শুনিয়াছি—সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য হিন্দু ভারতবর্ষ এবং বাবর বংশধরগণ-শাসিত মোগল ভারতবর্ষ; তৃতীয় ভারতবর্ষ এখনও গড়িয়া উঠিবার প্রতীক্ষায় আছে—জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ভারতবর্ষ (National India)। পূর্ব্বে এবং মধ্যে যে সকল যুগ গিয়াছে সেগুলিকে আমরা উদ্যোগ-কাল বলিতে পারি—এই সময়ে ভারতীয় রক্তে নূতন রক্ত, ভারতীয় ভাবে নূতন ভাব মিলিত হইয়াছে, ইহা নূতন উপাদান সংগ্রহ ও প্রসারের কাল। এখন আমরা নিঃসংশয়ে একথা বলিতে ও বুঝিতে পারি এবং ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে ইতিহাস কোথায়ও থামিয়া যায় না, ইহা গীতিশীল। যদি কোনও জাতি কোনও সময়ে আধ্যাত্মিকতা অথবা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে, কোনও কারণে যদি তাহার পতনও হয়, সেই শিখরে পুনরায় আরোহণ করা সেই জাতির পক্ষে অসম্ভব নয়। শিল্পবিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতায় বড় কিছু করিবার সাধনা কোনও জাতির শক্তিকে নিঃশেষিত করিতে পারে না; যদি দেখা যায় সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সে-জাতি বিলাসপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে, অথবা জাতির মজ্জায় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। জাতির অধঃপতন এই বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম।

ইতিহাসের টানার উপরে জাতীয়তার পোড়েন বোনা হয় (History is the warp upon which is to be woven the woof of Nationality.)। নিজের অতীতের দর্পণেই ভারতবর্ষ নিজের আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে এবং সেই ছায়াদর্শনের দ্বারাই সে নিজেকে চিনিতে পারিবে। একমাত্র, ইতিহাস অনুশীলনের সাহায্যেই তাহার জাতিগঠনের পক্ষে কোন্ কোন্ উপাদান আবশ্যক তাহা সে জানিতে পারিবে এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই তাহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে; শৌর্য্যে বীর্য্যে সে আবার মহৎ হইবে।

---

* আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা অবগত আছেন ভগিনী নিবেদিতা এই নূতন ধারা গড়িয়া তুলিবার জন্য কতখানি দায়ী। তিনিই মর্ডাণ রিভিউ ও অন্যান্য পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিয়া তখনকার চিন্তাশীল মনীষীদের সহিত বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া নবীন শিল্পীদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহে দেশীয় শিল্পীরা অনেকেই পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের অনুকরণ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। এই প্রবন্ধেও তাহার সূচনা আছে। বঃ সঃ

প্রদর্শনী

-শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর একটি ছবি *

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ অরিয়েণ্টাল আর্টের ১৯২৬-২৭ সনের প্রদর্শনীতে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ছবি আমার বেশ একটু চোখে ধরিয়াছিল। ছবিখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা। এই প্রদর্শনীতেই বসু মহাশয়ের আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র ছিল—কৃষ্ণার্জ্জুন, নদীয়া, দুইখানি নৃত্যের ছবি; কিন্তু এ-সকলের মধ্যেও যে ছবিখানার কথা প্রথমে বলিলাম সে-খানি আঁকিবার ধরণ ও বিষয়বস্তু, উভয় দিক হইতেই আমার কাছে খুব নূতন ঠেকিয়াছিল।

ম্যাডোনা অব দি ম্যাগ্নিফিকাট : বত্তিচেলি
উফিৎসি গ্যালারি, ফ্লোরেন্স।

আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধেই বলা চলে না যে তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবুর মুদ্রাদোষ নাই ইহা তাঁহার চিত্রাঙ্কন-রীতির একটি কথা বটে, কিন্তু উহার চেয়েও বড় কথা তাঁহার পটুয়া-জীবন সচল—জীবন্ত নদীর মত প্রবহমান। অনেকে হয়ত বলিবেন, এই শ্রান্তিহীন পরীক্ষণ-প্রীতির মধ্যে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কালাতীত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অনুকূল নয়, নন্দবাবু এখনও তাঁহার রূপের আদর্শ ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই বহুবিধ "ষ্টাইল" ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে হাত-ড়াইয়া বেড়াইতেছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলেও নিন্দার বিষয় না-ও হইতে পারে। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে—শুধু সুকুমার কলা কেন, ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই এমন এক যুগ অবশ্য ছিল যখন সমাজ ও আদর্শের ভিত্তি অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠ ছিল এবং মানুষের মনও সংশয়মুক্ত ছিল। তখনকার দিনে চিত্রকর বা শিল্পী প্রচলিত জনমত ও আদর্শের মধ্যেই তাঁহাদের কাজের সুদৃঢ় অবলম্বন পাইতেন; রূপ ও বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সজ্ঞানে নিজেকে ও জগৎকে পরীক্ষা করিতে হইত না। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসের ভাস্কর্য্য, রিণেসেন্সের কালে ইতালীর চিত্রকলা, প্রাচীন চৈনিক ও জাপানী চিত্র, সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ ও ফ্লেমিশ চিত্রাঙ্কন, সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা বলা চলে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের বশে আমরা যে-যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সে-যুগে মানবজাতির

---

* চিত্রটিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রিবর্ণ 'মা' চিত্র (তিনটি) দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রটি প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বঃ সঃ

চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও গবেষণার প্রসার, যাতায়াত ও ভাব আদান-প্রদানের সুবিধা, শিক্ষা ও শিক্ষার ভাণের অতিবিস্তার—এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর একটা দুর্ব্বহ চাপ আসিয়া পড়িয়াছে, ফলে আমাদের সেই পুরাতন দ্বিধাহীন ভাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শুধু চিত্রাঙ্কনের দৃষ্টান্তই লওয়া যাক না কেন—আজকাল যিনিই ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি-আধুনিক ইউরোপীয়, চীন-জাপানের চিত্র হইতে সুরু করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্য্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তির ফল পাত্রের যোগ্যতাভেদে তিন প্রকার হইতে পারে,—প্রথম, ক্লৈব্য ও জড়তা; দ্বিতীয়, অনুকরণ এবং জোড়াতালি ও গোঁজা-মিল দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা (আর্ট সম্বন্ধীয় পরিভাষায় ইহাকে pastiche বলা হয়); তৃতীয়, অবিরত পরীক্ষা এবং জগতের 'আর্ট ট্রেডিশ্যন'-গুলিকে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত রূপ দিবার চেষ্টা। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টার সব-গুলিই যে সফল হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু দৈবক্রমে যদি একটি চিত্রেও প্রতিভার স্ফুরণ ও প্রচলিত রীতির মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। চিত্র-কলার ক্ষেত্রে আমাদের এই অশান্ত যুগে ইহার অপেক্ষা বড় কীর্ত্তি সম্ভবপর নয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ম্যাডোনা লিটা (স্তন্যদায়িনী) : কপি (?)। বহুকাল ধরিয়া এই চিত্রটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অঙ্কিত বলিয়া জানা ছিল। হারমিটেজ গ্যালারি, লেনিনগ্রাদ।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের বহু আর্টিষ্ট সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারা যায় না, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সম্বন্ধে তাহা বলা চলে—অর্থাৎ তিনি এই তৃতীয় পর্য্যায়ের চিত্রকর। তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্য্যন্ত বহু রীতির প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান, এবং ভারতবর্ষের বাহিরের চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন। 'মিডিয়ম' সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও সুবিদিত। অথচ তাঁহার কোন ছবিই বিশুদ্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না। নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না কেন তাহাকে স্বায়ত্ত ও নিজস্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়, এবং এই

কারণেই তাঁহার চিত্রগুলি স্থায়ী হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

বর্ত্তমান যুগের বাঙালী চিত্রকরদের মধ্যে নন্দবাবুর স্থান সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা স্পষ্ট হইল কিনা বলিতে পারি না। স্পষ্ট না হইলেও উপায় নাই, কারণ অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া মূল বক্তব্যই ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। নন্দবাবুর যে চিত্রটির কথা বলিতেছিলাম সেটি একটি ছোট টেম্পেরা প্যানেল। মাঝখানে একটি মানবী মাতা, শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া, দুই পাশে তিনটি

স্নান (উডকাট) : ই. এম্. ডারুইন্।

তিনটি করিয়া পশুমাতা, শাবককে স্তন্য দিতে রত। মাতৃমূর্ত্তি, চিত্রকলাতে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের বিশিষ্ট দান। যীশু ও মাতা মেরীর পূজাকে অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় চিত্রকরদের বাৎসল্যের আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইতালীয়ান চিত্রকরদের নিকট এই বিষয়বস্তুটির আকর্ষণ আরও অনেক প্রবল ছিল। শিশুপ্রীতি ইতালীয়ান চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাই ইতালীয়ান চিত্রকরেরা নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে 'বাম্বিনো'কে আঁকিয়া তাঁহাদের মনের সাধ মিটাইয়াছেন। কালক্রমে মাতৃমূর্ত্তি শুধু মাতা মেরী ও যীশুর চিত্রেই আবদ্ধ থাকে নাই, সাধারণ সাংসারিক চিত্রেও প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আমি যতদূর জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এই রেওয়াজটি হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কনপ্রসঙ্গে দুইটি চিত্রের কথা সকলেরই মনে পড়িবে। উহাদের একটি স্যর জস্যুয়া রেণল্‌ড্‌সের "ডাচেস্ অফ ডিভনশায়ার ও তাঁহার শিশু," অপরটি মাদাম ভিজে লেব্রাঁর "মা ও মেয়ে"। ইহাদের মধ্যে স্যর জস্যুয়া রেণল্‌ড্‌সের ছবিটির ভঙ্গী ও অঙ্কনরীতি আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে ম্যাডোনার চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে মাতৃমূর্ত্তি আঁকিবার যে ধারা দেখা দিয়াছে তাহাও ইউরোপের ম্যাডোনা মূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। তবে আমাদের দেশে মাতা ও পুত্রের একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত থাকায় মাতৃমূর্ত্তি এখানে যশোদা ও গোপালে রূপান্তরিত হইয়াছে,—বিদেশীয় মাতা মেরী ও যীশুর চিত্র হয় নাই, আবার সাধারণ সাংসারিক চিত্রও হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু আবার এই মাতৃমূর্ত্তিকে চৈতন্যের জননীরূপে আঁকিয়া ইহার একটি একান্ত বাঙালী রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩০ সনে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের প্রদর্শনীতে "চৈতন্য-জননী" নামে নন্দ বাবুর যে ছবিটি প্রদর্শিত হয় তাহা এ-যুগের ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমার মনে হয়, "চৈতন্য-জননী"র মাতৃমূর্ত্তির রূপ ও আদর্শ নন্দবাবুর কল্পনায় এই চিত্রটি আঁকিবার পূর্ব্বেই আসিয়াছিল, কারণ ১৯২৬-২৭ সনের মাতৃমূর্ত্তিটি ও "চৈতন্য-জননী"র মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে একটি আদল বর্ত্তমান।

কিন্তু আগের ছবিটির বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নন্দবাবু যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার চেষ্টা পরে তিনি আর করেন নাই। বোধ করি এই নূতনত্বটুকু নিতান্তই খামখেয়ালীর বশে হইয়াছিল, তাই কোন বড় ছবিতে তিনি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। কিন্তু ছোট প্যানেলখানিতে তিনি যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা উপভোগ করিবার মত একটি জিনিষ। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন তাঁহাদের কেহই মানবেতর মাতার কথা স্মরণ করেন নাই। নন্দবাবু পশুমাতাকে মানবীমাতার সঙ্গিনী করিয়া শুধু যে সমদৃষ্টিই দেখাইয়াছেন তাহাই নয়, সূক্ষ্ম রসিকতারও পরিচয় দিয়াছেন। পরিহাস ও বাৎসল্যের

অপ্রত্যাশিত সম্মিলনে এই সাতটি ম্যাডোনার চিত্র মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

এই ত গেল চিত্রটির বিষয়বস্তুর কথা। উহার আঁকিবার ভঙ্গী সম্বন্ধেও সামান্য কিছু না বলিলে উহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ছবিমাত্রেরই দুইটি দিক আছে,—(১) উহার বিষয়বস্তু, ও (২) উহার 'ডেকোরেটিভ' বা আলঙ্কারিক মূল্য, এ-কথা সকলেই মানিয়া থাকেন ; কিন্তু গোল বাধে এ-দুয়ের স্থান ও সম্পর্ক লইয়া। সাধারণ লোকে ছবিকে শুধু প্রতিচ্ছবি বলিয়াই ধরে, এবং সেজন্য ছবি দেখাকে কনে দেখায় পরিণত করিয়া চেহারা পছন্দসই না হইলেই অনর্থের সৃষ্টি করে। যে ছবিটির কথা বলা হইতেছে উহাতে মায়ের নাকটি অত্যন্ত লম্বা হইয়াছে বলিয়া একজন আমার নিকট অত্যন্ত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের আবার অতি-অসাধারণ একদল প্রতিপক্ষ আছেন। শেষোক্ত অতি-আধুনিক আর্ট-সমালোচকেরা চিত্রাঙ্কনকে প্রতিচ্ছবি বলিয়াই মানিতে প্রস্তুত ন'ন। ইঁহাদের গোঁড়ামি প্রথমোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা কম উগ্র নয়, বোধ করি কম অন্ধও নয়। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে, নিসর্গানুকরণই চিত্রাঙ্কনের মূল প্রেরণা। তাহা না হইলে মানুষ শুধু 'ডেকোরেটিভ প্যাটার্ণ' সৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, কারুকার্য্য ভিন্ন ছবি আঁকিবার বা মূর্ত্তি গড়িবার কোন চেষ্টা করিত না। চীনা, জাপানী, পারস্য-দেশীয়, মোগল ও রাজপুত চিত্রের 'ডেকোরেটিভ' বা আলঙ্কারিক মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু এই সকল চিত্রও যাঁহারা আঁকিয়াছেন তাঁহারাও মুখ্যতঃ প্রতিচ্ছবি আঁকিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। আসল কথাটা এই, সকল চিত্রেই স্বভাবানুকরণ ও অলঙ্কার এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে ছবির এই দুইটি দিককে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করাই চিত্রাঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য 'মিডিয়ম' ও 'ফর্ম্মেল' সৌন্দর্য্যের ধারণা, এই দুইটি জিনিষের দ্বারা সীমাবদ্ধ, শুধু সীমাবদ্ধই নয় শৃঙ্খলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ড্রয়িং বা রেখাচিত্রের কথা বলা যাইতে পারে। রেখাচিত্র ছবি হিসাবে সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক

মা ও ছেলে (উডকাট) এফ. এম. মেডওয়ার্থ।

হইতে পারে, কিন্তু বর্ণ ও পূর্ণ 'কিয়ারস্কুরো'-বিহীন ছবি যে কখনও স্বভাবানুযায়ী হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

নন্দবাবুর বর্ত্তমান চিত্রটিতেও প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যে চিত্রকরের 'ফর্ম্মেল' সৌন্দর্য্যের ধারণা সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে মাঝের প্যানেলটির মাতৃমূর্ত্তির কথাই ধরা যাক। ইহাতে মা যে ভাবে শুইয়া আছেন, তাহা শিশুর প্রতি স্নেহের ফলও হইতে পারে, আবার মাঝের ফাঁকা জায়গাটিকে সুসমঞ্জসভাবে ভরিয়া তুলিবার জন্যে চিত্রকরের

ম্যাডোনা : আন্তোনেলো দ মেসিনা।
[illegible]।

একটা নিয়মিত সৃষ্টির চেষ্টার ফলও হইতে পারে। আবার মাতৃমূর্ত্তির পিছনে যে তিনটি কলাগাছ দেওয়া হইয়াছে, সে-গুলিও 'ডেকোরেটিভ' দিক হইতে না দেখিলে অবান্তর। এবারে জীবজন্তুর প্যানেলগুলি দেখা যাক। উহাদের প্রত্যেক-টিতেই গাছ আছে। এই গাছগুলি সম্পূর্ণ 'ডেকোরেটিভ'। তারপর হাতীর বাচ্চাটি। হাতীর ছানার সম্মুখের পা-দুটি যে-ভাবে আঁকা হইয়াছে, কোন সত্যকার হস্তিশাবক সে ভাবে পা রাখে না। কিন্তু রেখাপাতের সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিলে এই-রূপে পা-দুটি আঁকা অন্যায় হইয়াছে এ-কথা বলিতে পারি না। এইরূপে সমস্ত ছবি গুলি দেখিলে এই জিনিষটা উপলব্ধি করা যায় যে, ইহাতে যে-সকল রেখা বা রং-এর সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা কোন না কোন নৈসর্গিক বস্তুর প্রকাশ হইলেও উহাদের আর একটি উদ্দেশ্যও আছে—সে উদ্দেশ্য একটা 'ফর্ম্মেল' সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।

এ-পর্য্যন্ত আমি নন্দবাবুর 'ফর্ম্মেল' সৌন্দর্য্যের আদর্শ কি বা উহার উৎপত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। কারণ বিষয়টি বড় এবং জটিল। তবে বর্ত্তমান ছবিটিকে উপলক্ষ্য করিয়া এটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে নন্দবাবুর 'ফর্ম্মেল' সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রধানতঃ 'লিনিয়ার'। সেজন্য রেখাপাতের সৌন্দর্য্য ও ছন্দেই তাঁহার শিল্প-চাতুরীর চরম বিকাশ হইয়াছে। যদি 'লিনিয়ারিজম্' ও 'প্ল্যাষ্টিসিটি'ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হয় তাহা হইলে নন্দবাবু পুরাদস্তুর 'ওরিয়েন্ট্যাল'। তাঁহার এই ক্ষুদ্র ছবি-খানির প্রত্যেকটি প্যানেলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রেখাপাতের যে সামঞ্জস্য ও ছন্দ দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার।

আর একটি কথা। চিত্রটিতে বাংলা দেশের পটের প্রভাব দেখা যায়, কয়েকটি জন্তু যে-ভাবে আঁকা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার ছায়া আছে, এ সকল কথা উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করি নাই, কারণ এগুলি সহজেই ধরা যায়। চিত্রকর যে-যুগেই আবির্ভূত হন না কেন, তাঁহার হাতের কাছে কতকগুলি ধরা-বাঁধা 'ফর্ম্ম' থাকেই, সে-গুলি তিনি কাজে লাগাইতে বাধ্য। নন্দবাবুর উপরেও নানারূপ পূর্ব্বতন 'ফর্ম্ম'-এর প্রভাব আছে। প্রথমজীবনে তাঁহার চিত্রে অজন্তার ছায়া ছিল, এখন হয়ত পটের প্রভাব আছে। কিন্তু এই অনুচিকীর্ষাই তাঁহার চিত্রকলার সবটুকু নয়। প্রচলিত ধারাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন জীবন ও নূতন রূপ দিতে পারাই প্রতিভাসাপেক্ষ। নন্দবাবুর এই প্রতিভা আছে, ইহা সকলেই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন।

আমরা এই সঙ্গে পাঁচটি পাশ্চাত্য চিত্রের প্রতিলিপিও প্রকাশ করিলাম—সেগুলির বিষয়বস্তুও মাতৃত্ব।

বাংলায় পারসীক শব্দ

—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

বিশ্বের হাটে দেখাইবার মত বাঙ্গালীর যদি কোন জিনিষ থাকে তবে সেটি তাহার ভাষা। তাহারই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের আজ আলোচনা করিব।

অনেকে বলিয়া থাকেন ভাষাই জাতির প্রাণ। কথাটা বোধ হয় অত্যুক্তি। কিন্তু একথা ঠিক যে, কোন জাতির প্রকৃত পরিচয় পাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় সে জাতির ভাষার আলোচনা করা। জাতীয় সভ্যতা যখন দ্রুত উন্নতি লাভ করে, জীবনের আনন্দ যখন সমস্ত জাতিকে গতিশীল, কর্ম্মিষ্ঠ করিয়া তুলে, জাতীয় ভাষাও তখন সেই সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হয়। আর জাতি যেখানে প্রাণহীন অচলায়তন, জাতীয় ভাষাও সেখানে গতিহীন, নিস্পন্দ। গ্রহণশীলতা ব্যতিরেকে মনোনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ কোন প্রকার সভ্যতারই উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয় না। সভ্য হইবার জন্য মানুষের জগতে নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় তাহার চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা। সভ্যতার সকল উপাদান মানুষের সম্মুখেই রহিয়াছে, মানুষের কেবল তাহা গ্রহণ করিবার অপেক্ষা। এবং গ্রহণযোগ্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের ভাণ্ডার জগতে এমনই অফুরন্ত যে অতিমাত্রায় অসভ্য না হইলে কেহ মনে করিতে পারে না সে সভ্যতার চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার আর গ্রহণীয় কিছুই নাই। ভাষা সভ্যতার ছায়া, কাজেই সে সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ভাষাও সমৃদ্ধ হয় মানুষের এই অন্তরগত গ্রহণশীলতা দ্বারা।

আর্য্যজাতির প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস কেবল আর্য্যজাতির ভাষা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করা যায়। কিন্তু এই ভাষা আলোচনা করিলে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে এই আর্য্যজাতির অদ্ভুত গ্রহণশীলতা। আর্য্যজাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বত্রই আর্য্যগণ নূতন আবহাওয়ায় নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং দেশ ও জাতিভেদে আর্য্যজাতির ভাষাও দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। আধুনিক বাংলা, পারসীক, ইংরাজী, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক শব্দই মূল আর্য্যভাষা হইতে প্রাপ্ত। ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক্‌গণ বাহির হইতে কোন শব্দ গ্রহণ করা প্রায় অপরাধ বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক্‌গণ যে এরূপ ছিল না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ক্রীট্-সভ্যতার নিকট গ্রীক্ সভ্যতা বহু বিষয়ে ঋণী, asaminthos, labyrinthos প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দই তাহার প্রমাণ। অপর দিকে দেখা যায়, শ্‌পেঙ্গ্‌লর্ Spengler-এর ভাষায়, যে সব জাতি অনৈতিহাসিক যুগের মধ্য দিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ মরণ অভাবে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের ভাষা বহুদিন যাবৎ প্রায় একরূপই রহিয়া গিয়াছে। দিন্‌দের ভাষা অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাহারা যে সব জার্ম্মান-শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখনও প্রায় অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে, যদিও জার্ম্মানিক ভাষাগুলির মধ্যে সে সব শব্দ নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ইস্তাম্বুল ও আণ্বাথান্‌বাসী তুর্কদের মধ্যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। পারস্যের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। গত সহস্র বৎসরের মধ্যে পারসীক ভাষা অতি সামান্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বের সহস্র বৎসরের মধ্যে, যখন পারস্য সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল, পারস্যের ভাষা প্রতি শতাব্দীতেই স্পষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। নানা ভাষা, বিশেষ করিয়া আর্ম্মানি ভাষা, বহু শব্দ পারসীক ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে; সেগুলির আলোচনা করিলেই একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন যে সব শব্দ পহ্লবী-তে ছিল, কিন্তু আধুনিক পারসীক ভাষায় যাহাদের চিহ্নমাত্র নাই, সে সব শব্দের সংখ্যাও বড় কম নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বাংলা ভাষাও কি এইরূপ মরণ অভাবে বাঁচিয়া থাকার দলে? উত্তরে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, 'না'। প্রধানতঃ সাহিত্য দিয়াই ভাষার বিচার করিতে হয়—ইহা স্বাভাবিক। আমাদের প্রধান সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে মাপকাঠি ধরিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ভাষায় লিখিতেন এখন আর ঠিক সেই ভাষায় লেখেন না। মনে হয় এই অপরিসর কালের মধ্যেই তাঁহার শব্দ-ভাণ্ডারে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক পুরাতন শব্দ ব্যবহার

করা এখন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাংলার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার লঘু চঞ্চল গতি স্পষ্টই প্রতীয়মান। মধ্যযুগেও যে বাঙ্গালী ভাষাকে অবাধ গতি দিয়াছিল তাহার একটি প্রধান প্রমাণ বাংলা ভাষায় বহুলভাবে পারসীক শব্দ গ্রহণ। ভারতবর্ষ যখন মুসলমান রাজাদের আমলে পারসীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিল, বাঙ্গালী তখন আড়ষ্ট ভাবে পাশে সরিয়া দাঁড়ায় নাই। নিজের বিশেষত্ব না হারাইয়া যাহা কিছু গ্রহণীয় ছিল সমস্ত উদার ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে বাংলা ভাষার অন্তর্গত পারসীক শব্দগুলি আলোচনা করিলে বাঙ্গালী জাতিরও চরিত্র সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করা যায়। বলাই বাহুল্য যেসব কথা বিশেষ কোন সঙ্ঘ বা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ বা যেসব কথা আজকাল বাংলাভাষার টুঁটি টিপিয়া গলাধঃকরণ করানর চেষ্টা করা হইতেছে—সেসব কথা এরূপ আলোচনার বহির্ভূত, কারণ সেগুলিকে ঠিক বাংলাভাষার সম্পত্তি বলা যাইতে পারে না। যেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বাংলাভাষার সম্পত্তি তাহাদেরও অল্প কয়েকটি মাত্র এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

কথিত বাংলা ভাষায় আমরা প্রতিনিয়তই পারসীক শব্দ ব্যবহার করি অথচ তাহার খেয়াল করি না। মাঝে মাঝে আমরা রহস্য করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বলি 'আশমান্ জমিন্ ফরাক্', কিন্তু কেহ যখন আধুনিক বাংলারই নিজস্ব হাল্কা ভঙ্গীতে বলে 'জিনিষটা খুব বেশী রকম খারাপ' তখন ভাবিলে হঠাৎ অবাক হইয়া যাইতে হয়—যে এই কথাগুলির প্রত্যেকটি পারস্য হইতে আমদানি। 'খোদা, নমাজ, মোল্লা, মিঞা' প্রভৃতি কথা যে বাহির হইতে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে একটুও খবর রাখেন তাঁহারা বুঝিবেন 'আরাম, হাওয়া, গরম, বরফ, বাদাম, জান্, হায়রাণ, হরদম, বরাবর, জানোয়ার, আস্বাব' প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য বহু শব্দ আমরা পারসীক ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ বলিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না যে 'কম, বেশী, জায়গা, জমি, জমা, খরচ, দোয়াত, কলম, দরকার, পছন্দ, চেহারা, বদ, চালাক' প্রভৃতি শব্দ এককালে বাংলা ভাষায় ছিল না। এমন কি বাংলার বহু নাম পারসীক,—যথা 'সরকার, মজুমদার, মুস্তফী' ইত্যাদি। অনেক পারসীক শব্দ আমাদের রান্নাঘরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, যেমন 'হালুয়া, পোলাও' ইত্যাদি। আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনের দিনে তদ্বিষয়ক বহু পারসীক কথাও বাংলায় প্রচলিত হইতেছে, 'ইন্‌কিলাব্ জিন্দা বাদ্' তো দূরের কথা, 'চরকা' পর্য্যন্ত পারস্য হইতে আসিয়াছে। এমন কি 'বিদায়', যাহা লইয়া ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর এত ভাব ও কবিতার উচ্ছ্বাস, তাহাও আমাদের পারসীকদিগের নিকট হইতে ধার করা।

উপরে উল্লিখিত কথা কয়টি হইতেই বুঝা যাইবে পারসীক শব্দগুলি কিরূপ বাংলাভাষার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন কোন দিক চোখে পড়ে না যাহার উপর পারসীক সভ্যতা অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করে নাই। মধ্যযুগে আমাদের রাজারা ছিলেন পারসীক ভাবাপন্ন, তাই বাংলায় রাজকার্য্য ও বিচারালয় সম্পর্কিত যত কথা, সবই প্রায় পারস্যোৎপন্ন, যথা 'হাকিম, মোক্তার, উকিল, মুহুরী, আদালৎ, মোকদ্দমা, রুজু, আসামী, ফেরার, দরখাস্ত, জারি, হুকুম, ফরমান, ফতোয়া' প্রভৃতি অসংখ্য কথা, 'পাইক, পেয়াদা'ও বাদ নহে। দেখা যাইতেছে আজকাল আমরা কাজীর বিচারের যতই নিন্দা করি এক সময়ে বাঙ্গালীকে জীবন মরণের সকল ব্যাপারেই তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। এখন আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সমস্ত স্মৃতি ও নিবন্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে সেগুলি হইতে অনুমান করিবারও উপায় নাই যে ভারতবর্ষে বিচারালয়-সম্পর্কিত সংস্কৃতের কোন কথা কখনও প্রচলিত ছিল। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'প্রাড্‌বিবাক' বলিলে সাধারণ লোকে হয় তো বুঝিতে পারিত, কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একথা শুনিলে সাধারণ লোকে নিশ্চয়ই মাথা চুলকাইত। ইহা হইতে বুঝা যায় আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রে ভারতের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই, তাহার সাহায্য একটা কাল্পনিক অবস্থা সমাজের উপর চাপাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু সমাজ তাহা কখনও গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক যুগে বিচারালয়-সম্পর্কিত রাশি রাশি ইংরাজী শব্দ পূর্ব্বেকার পারসীক শব্দগুলির স্থান অধিকার করিতেছে,—

ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু পাড়াগাঁ অঞ্চলে পারসীক শব্দগুলিই এখনও লোকে বেশী বুঝিতে পারে।

কোন ভাষার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের নামও যে অপর কোথাও হইতে ধার করা তাহা স্বীকার করিতে সকলেরই মনে বাধে। খাদ্য ও পানীয়ই হইল সভ্যতার প্রথম সোপান, তাহাই যদি ধার করা হয় তবে কি বুঝিতে হইবে দেশের নিজস্ব কোন সভ্যতাই ছিল না?—ইহাই সকলের মনের ভাব। মম্‌সেন্ **Mommsen** বাস্তবিকই খাদ্যবিচার দ্বারা একস্থলে রোমক সভ্যতার মাপ করিয়াছেন, এবং এই কারণেই রুষ পণ্ডিতগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না যে তাঁহাদের ভাষার **chleb** (রুটি) ও **moloko** (দুধ) জার্ম্মানদের নিকট হইতে ধার করা (তুলনীয়, গথ-ভাষার **hlaifs**, ইংরাজী **loaf milk**)। বলাই বাহুল্য, রুষরা যতই পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করুক না কেন, জার্ম্মানরা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়াই সত্য গোপন করা যায় না, বাঙ্গালীকে স্বীকার করিতেই হইবে যে বহু খাদ্য ও পানীয়ের নাম তাহারা পারসীকদের নিকট হইতে ধার করিয়াছে,—এবং সেগুলির নাম বাঙ্গালীর এত ভাল করিয়াই জানা যে তাহার ফর্দ্দ দেওয়াও এখানে নিষ্প্রয়োজন। পারসীকেরা যে একটু ভোজন-বিলাসী তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, মহাবীর আলেক্সান্দর **Alexander**-ও পারস্যের ভোজনবিলাসের কুহক এড়াইতে পারেন নাই। আর ভারতের মনীষিগণ যে কোন দিন এই দিকে বিশেষ মন দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। বৈদিক সাহিত্যে দুগ্ধ, সোমরস ও পুরোডাশ বা তাহাদের সংমিশ্রণোৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্যের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে অরুচি জন্মিয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও পানাহারের যে বর্ণনা আছে তাহা খুব লোভনীয় নয়। কাজেই বুভুক্ষু বাঙ্গালী যে পারসীকদিগের নিকট হইতে পানাহার-সম্পর্কিত বহু কথা ধার করিবে এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আহার্য্য অপেক্ষা পানীয়ের দিকে কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বেশী মন দিয়াছিলেন, বৈদিক সুরা সোমরস ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যে গৌড়ী, মাধ্বী প্রভৃতি বহু মাদক পানীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু পারসীক 'সরাব' 'সরবৎ' বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

সাজ পোষাকেও অনেক পারসীক কথা বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন 'জামা, মোজা, পিরান, আস্তিন' ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন পারসীকদিগের নিকট হইতেই আমরা জামা পরা শিখিয়াছি। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও জামা পরার কথা আছে বলিয়া জানি না। কামসূত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিলেও থাকিতে পারে, এখন স্মরণ নাই। কিন্তু ভারতের শিল্প হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেই বেহারীদের মত লম্বা ধরণের জামা পরা ভারতবাসীর অভ্যাস ছিল। তখনই ভারতে পারসীক প্রভাব এত প্রবল হইতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে তৎপূর্ব্বেই আমরা পারসীকদের নিকট হইতে জামা পরা শিখিয়াছি, কারণ কথাটি প্রাচীন পারস্যেও প্রচলিত ছিল, পহ্লবী 'জামক'। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে পহ্লবী 'জামক' ও আধুনিক পারসীক 'জামে' যে ঠিক সমার্থক, তাহার প্রমাণ নাই। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তখনই সম্ভব হইবে যখন বাংলা ভাষার একটি ঐতিহাসিক অভিধান লেখা হইবে,—ম্যরে **Murray**র **New English Dictionary** বা গ্রিম্ **Grimm**-এর **Deutsches Woerterbuch**-এর মত। যাহা হউক ইহা কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভারতের পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে জামাপরা মূর্ত্তি দেখা যায় না। অজন্তায় এরূপ কোন মূর্ত্তি আছে বলিয়া মনে পড়ে না। বাঙ্গালী মেয়েদের অনেক অলঙ্কারের নামও পারসীক, যেমন, 'তাবিজ, টায়রা, বাজু' ইত্যাদি। ('বাজু' কথাটা সংস্কৃত 'বাহু'রই পারসীক রূপ।) শুধু তাই নয়, খুব সম্ভব নাক বিঁধানর ফ্যাশানটাও—সুখের বিষয় এটি আজকাল আর প্রায় নাই—বাঙ্গালী মেয়েরা পারসীকদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, যেমন অজন্তায়, কর্ণাভরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু নাকের উপর কুৎসিত অলঙ্কার কোথাও দেখা যায় না।

রণকর্কশতা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব নহে, কাজেই ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই যে 'কামান' 'বন্দুক' পারস্য হইতে আসিয়াছে। আজকাল ইংরাজদের অনুকরণে শিকার করা খুব ফ্যাশান হইয়াছে, কিন্তু 'শিকার' কথাটা ইংরাজরা আমাদের দেয় নাই, এটি আসিয়াছে পারস্য হইতে।

শব্দালোচনা করিলে আরও বুঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা পারসীকদের নিকট বহুল ভাবে ঋণী,—প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে 'দোকান, বাজার, জমা, খরচ, পাইকারি, খুচরা, খরিদ্দার, মাল, সরবরাহ' ইত্যাদি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নেহাৎ অপটু ছিলেন না, এবং তৎসংক্রান্ত পরিভাষাও যে সংস্কৃতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। তথাপি এতৎ সম্পর্কিত এত কথা বাঙ্গালীকে ধার করিতে হইল কেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। বোধ হয় রাজার জাতের অনুকরণেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। এখনও যেমন বাংলাদেশে একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজরা যেরূপ করিয়া হাঁচিত ও হাসিত, ঠিক সেই রূপ করিয়া হাঁচিতে ও হাসিতে না শিখিলে নিজেদের সুসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না, মধ্য যুগেও বাঙ্গালী-সমাজে এইরূপ একশ্রেণীর লোক হয় তো ছিল, যাহারা সকল বিষয়েই পারসীক শব্দ ব্যবহার করাটা খুব বাহাদুরীর কাজ বলিয়া মনে করিত। যাহাই হউক, সমাজের এই আগাছাগুলিদ্বারাও কিন্তু বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। লেখাপড়াসংক্রান্ত অনেক কথাও আমরা পারসীকদের নিকট হইতে লইয়াছি; শুধু 'মক্তব, মাদ্রাসা' নহে, নিত্যব্যবহার্য্য কথা, যেমন 'দোয়াত, কলম, কাগজ, খাতা', পারসীকরাই আমাদের দিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন আমরা লিখিতেও শিখিয়াছি পারসীকদের নিকট হইতে। কথাটা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পার নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিশ্বাস করা কঠিন যে বৈদিক যুগে লেখার প্রচলন একেবারে ছিল না। অনেক বৈদিক মন্ত্রের পাঠভেদ মনে হয় লিপিকর-প্রমাদ বশতঃই হইয়াছে। অপরদিকে কিন্তু ইহাও ঠিক যে বৈদিক সাহিত্যে লেখার উল্লেখ কোথাও নাই। ব্রাহ্মণাদিতে লিখ্-ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই 'আঁচড় কাটা' অর্থে, কোন শব্দ বা বাক্য লেখার অর্থে নয়। ইংরাজি write কথাটিরও অর্থোদ্ভব এইরূপ, প্রাচীন ইংরাজি writan-এর আসল মানে 'আঁচড় কাটা, আঁচড়ান'—তাহা হইতেই আধুনিক জার্ম্মাণ ritzen, reitzen, reissen ইত্যাদি। কাজেই বৈদিক সাহিত্যে লিখ্-ধাতুর প্রয়োগ দেখিয়া বৈদিক যুগেও লেখার প্রচলন ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। 'লিপি' কাথাটা কিন্তু সব সময় লেখার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে ইহার ব্যবহার নাই, পাণিনিই প্রথম কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু পাণিনির উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে তখনও কথাটির বানান ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি 'লিপি, 'লিবি' এই দুইটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন। বানান ঠিক না হইবার কারণও যথেষ্ট আছে, কারণ কথাটি সদ্যসদ্যই পারসীকদের নিকট হইতে ধার করা; ধার করা কথার বানান সম্বন্ধে প্রথম প্রথম কিছু গোলমাল থাকা খুবই স্বাভাবিক। অশোকের শিলালিপিতেও এইরূপ গোলমাল, কোথাও 'লিপি' কোথাও 'দিপি'। আসলে পারসীক ধাতুটি ছিল 'দিপ্' বা 'দিব্',—পহ্লবীতে ধাতুটির দুইটি রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। দ-এর জায়গায় ল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ দ-স্থানে ল বহু ভাষায় দেখা যায়। শব্দতাত্ত্বিকদের মতে ল ও দ এর প্রভেদ খুবই অল্প। এইজন্য সংস্কৃতে দেখা যায় 'উদূখল: উলূখল'। সংস্কৃতে 'দেবর'-ও লাটিন levir মূলে একই কথা। লাটিনের মধ্যেও একই কথার দুইটি যমজরূপ আরও দেখা যায়, lingua : dingua, lacruma: dacruma ; সব জায়গাতেই দ-কার বিশিষ্ট রূপটিই আদিম ; লাটিন lingua ও ইংরাজি tongue মূলে একই, এবং লাটিন dacruma ও গ্রীক্ dakru -(আমাদের 'অশ্রু')- ও তদ্রূপ। কাজেই লিপি শব্দটা যে আমাদের পারসীকদের নিকট ধার করা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্রাট অশোকও বোধহয় পারস্য সম্রাটদের অনুকরণেই—পর্ব্বতগাত্রে ও শিলাস্তরে তাঁহার রাজাজ্ঞা উৎকীর্ণ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে মুসলমান আমলের বহুপূর্ব্বের পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ আরম্ভ হয়। হখামনিষ্-বংশীয় সম্রাট দারয়বহুষ্ গান্ধার জয় করিয়াছিলেন এবং সালামিস ও প্লাতোইয়া Salamis ও Plataea-র যুদ্ধে পারসীক বাহিনীর মধ্যে অনেক ভারতীয় সৈন্যও ছিল। অনেকেই জানেন রোমক সাম্রাজ্যের যুগে ভারতের সহিত রোমের বেশ বাণিজ্য চলিত। সেটা হইত প্রধানতঃ স্থলপথেই, পারস্যের ভিতর দিয়া আমু-দরিয়া ও সির-দরিয়া নদী তখন আরল-হ্রদে না পড়িয়া কাস্পিয়ান-সাগরে পড়িত। কাজেই মধ্য এশিয়ার খানিকটা পথ কষ্টেসৃষ্টে

অতিক্রম করিতে পারিলেই বাকি পথ বাণিজ্য-দ্রব্য সহজেই পোত-সহকারে চালান দেওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন তখনকার দিনে মধ্য এশিয়ার জল-হাওয়াও সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থকারগণ সাংসারিক প্রায় সকল বিষয়েই উদাসীন; তথাপি আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে পারসীকদের উল্লেখ আছে, ইহা কম কথা নয়। আরও মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষ যে নামে আজ পৃথিবীতে পরিচিত সে নাম পারসীকদেরই দেওয়া; খুব সম্ভব পারসীকদের নিকট হইতেই গ্রীকৃগণ India কথাটি পাইয়াছিল। আমরা নিজেদের হিন্দু মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি, কিন্তু ভুলিলে চলিবেনা 'হিন্দু' কথাটি পারসীকদের নিকট হইতেই আমাদের নেওয়া। 'India' 'হিন্দু'—দুইটি কথারই উৎপত্তির আদিম কারণ ভারতের সীমান্তস্থিত সেই সিন্ধুনদী।

দুইটি সভ্যজাতি যখন পাশাশাশি বাস করে তখন প্রায়ই দেখা যায় তাহারা স্নেহবশতঃই যেন পরস্পরের নামকরণ করিতেছে। এইরূপে গ্রীসের নাম দিয়াছে ইটালীর লোকে (হেল্লাস্ Hellas তো গ্রীকেরা ছাড়া এখন আর কেহ বলে না) এবং ইটালীর নামকরণ না হউক নাম প্রচার অন্ততঃ করিয়াছে গ্রীক্‌রা; ইটালীর লোকদের মুখে তাহাদের দেশের নাম প্রচারিত হইলে সেটি অন্যরূপ ধারণ করিত, খুব সম্ভব হইত * Vitulia, (মনে রাখিতে হইবে যে Italia বলিতে বুঝায় যে দেশে বাছুর পাওয়া যায়, vitulus=বাছুর।) আমরাও সেইরূপ চীন দেশের নাম দিয়াছি, কিন্তু পারসীকদের স্নেহের সম্মান আমরা রাখিতে পারি নাই। তাহাদের দেশের নাম—'পারস্য, ইরান্'—তাহারা নিজেরাই দিয়াছে। 'তুরান' কথাটা আরবিক।

এতক্ষণ শব্দালোচনা দ্বারা কেবল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি পারসীক সভ্যতার নিকট আমাদের কি বিপুল পরিমাণ ঋণ। এখন বহুভাষী ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে কেবল ভাষাতত্ত্বের দিক হইতেই কয়েকটি শব্দ আলোচনা করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্রমসংশোধন করিয়া লইব। বলা হইয়াছে যে উপরে উল্লিখিত শব্দগুলি পারসীক ভাষা হইতে বাংলায় আসিয়াছে। এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু সেজন্য মনে করিলে চলিবে না যে সে শব্দগুলির সবকটিই পারসীকদের নিজস্ব সম্পত্তি। বস্তুতঃ পারসীকদের দৌত্যে অন্য বহু ভাষার কথাও বাংলায় আসিয়া পড়িয়াছে। পারসীক ভাষায় উপর আরবিক ভাষার প্রভাব অত্যন্ত। এই প্রভাব বশতঃ লোকে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে পারসীক ভাষাও আর্য্যজাতিরই একটা ভাষা। কাজেই সহজেই অনুমেয় যে, বহু আরবিক শব্দ পারসীক ভাষার আড়াল দিয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'সাহেব, সেলাম, হুকুম, গোলাম'; 'গরীব' কথাটাও আরবিক, তবে বাংলায় ইহার অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; কথাটির আদিম অর্থ ছিল 'বিদেশী, অজ্ঞাতকুলশীল'। এই প্রকারের অর্থবিপর্য্যয় অন্যান্য ভাষাতেও দেখা যায়। লাটিন hostis ('শত্রু') ও ইংরাজি guest মূলে একই কথা; এ ক্ষেত্রেও কথাটির আদিম অর্থ ছিল 'বিদেশী, অজ্ঞাতকুলশীল'। লাটিন ভাষার মধ্যেই এই প্রাচীন অর্থের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'গজল, তবলা, খেয়াল'—তিনটা কথাই আরবিক; দেখা যাইতেছে—গান-বাজনায় আমরা পরোক্ষভাবে আরবদের নিকট অনেকটা ঋণী। নিত্যব্যবহার্য্য শব্দের মধ্যে 'মাল, রকম, তারিখ, জবাব, খবর' প্রভৃতি আরও অনেক শব্দ এইরূপে পারস্যের মধ্য দিয়া আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে। 'আইন' কথাটা খাঁটি পারসীক কিন্তু 'কানুন' আরব হইতে আসিয়াছে। 'উজির' কথাটার ইতিহাস একটু জটিল। এটি আসলে পারসীক শব্দই বটে, ইহার আদিম রূপ ছিল 'বীচির'। কথাটি পারসীক ভাষা হইতে আরবগণ গ্রহণ করে এবং পরে পারসীকগণ পুনরায় শব্দটি বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া আনে। মাঝে আরবিক ভাষার দৌত্য না থাকিলে শব্দটির পারসীক রূপ হইত '*গুজির'। পারসীক ভাষায় শব্দটির এই রূপ যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাহা নহে, কিন্তু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে ধারকরা 'উজির' রূপটি,—শেষে এটি বাংলা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। এ অনেকটা সেইরূপ হইল যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুত মদ পারিসের ছাপ লইয়া না ফিরিলে সেখানকার লোকেদের মুখে রোচে না। নানা ভাষাতে এইরূপ বহু শব্দের ছদ্মবেশে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইংরাজিতে ship ও equip দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা। যে সব ইংরাজ নিজের ভাষা সম্বন্ধে কিছু খবর রাখে তাহারা জানে যে equip কথাটি আসলে ফরাসী। কিন্তু খুব কম ইংরাজেই জানে যে ফরাসীরা বহু পূর্ব্বে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে এই কথাটি ধার করিয়াছিল এবং মূলে ship ও equip

অভিন্ন। মূল শব্দটি এখনও গথ-ভাষায় skipএ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসীরা অপরিবর্ত্তিত প্রাচীন রূপেই শব্দটি নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করে। তাহাদের ভাষায় শব্দারম্ভে ব্যঞ্জনসমষ্টি সাধারণতঃ বরদাস্ত করা হয় না, উচ্চারণের শ্রম-লাঘবের জন্য একটি স্বর প্রশ্লেষ করা হইয়া থাকে। এইরূপে skip ফরাসী দেশে আসিয়া হইল * eskip এবং পরে স-কারটিও লুপ্ত হওয়ায় ক্রমে বর্ত্তমান ফরাসী 'e´quipe´' শব্দটির উদ্ভব হইল (তুলনীয়, study=e´tude)। আজকাল শব্দটির অর্থ বিচার করিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে কোনদিন ship কথাটির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল, কিন্তু প্রাচীন ফরাসীতে ইহার অর্থ ছিল 'জাহাজ সাজান'। যাহাই হউক, —ইংরাজরাই যে কেবল এইরূপে ফরাসীদের নিকট ঠকিয়াছে তাহা নহে, অনেক সময় ঠিক এইরূপে ফরাসীদেরও ইংরাজদের নিকট ঠকিতে হইয়াছে। Budget কথাটা আজকাল সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে, ফরাসীরাও ইহা ব্যবহার করে। Anglo-Norman ভাষার (অর্থাৎ ইংলণ্ডে নর্ম্মানদের মধ্যে ব্যবহৃত ফরাসী ভাষার) -dg- দেখিয়া সকলেই মনে করে ইহা খাঁটি ইংরাজী শব্দ ; কিন্তু আসলে কথাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগেই ফরাসী হইতে ইংরাজীতে ধার করা হইয়াছিল। শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গাল্লিয়া Gallia বা ফ্রান্সের লুপ্ত ভাষার bulga হইতে, যাহা লাটিন ভাষাতেও প্রচলিত হইয়াছিল।

পারসীক ভাষার দৌত্যে আরবিক ভাষা ছাড়াও অন্যান্য বহু ভাষার কথা বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। পেয়ালা করিয়া চা খাওয়া এখন দৈনন্দিন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার এই অভ্যাসের উপরে পারসীক প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, কারণ 'পেয়ালা' ও 'চা' এই দুইটি কথাই আমরা পারসীকদের নিকট শিখিয়াছি। আসলে কিন্তু দুটির একটিও পারসীকদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, কারণ 'পেয়ালা' আসিয়াছে গ্রীস্ হইতে এবং 'চা' কথাটি যে চৈনিক তাহা বলাই বাহুল্য। কাগজের আবিষ্কার এবং খুব সম্ভব নামকরণও চৈনিকদের দ্বারাই হইয়াছে, কিন্তু কথাটি আমাদের ঘর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছে পারসীকরা। খুব সম্ভব 'নোঙর' কথাটিও আসলে গ্রীক্, ইহা পারসীকদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে।

বাহির হইতে ধারকরা কথাগুলি ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় পারসীক ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলিকে ঠিক খাঁটি পারসীক বলা চলে না। অনেক কথা সমীপবর্ত্তী সমজাতীয় অপর কোন ইরানীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করা। ভাষাতত্ত্বে এই প্রকারের শব্দগুলির জাতি ও উৎপত্তি নির্ণয় করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যদি কেহ আজ বিচার করিতে বসেন কলিকাতায় যে সমস্ত বাংলা কথা শুনা যায় তাহার কোন্‌গুলি বাংলার কোন্ অংশ হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে রীতিমত বিপদে পড়িতে হইবে। 'চাকু' ও 'কবুতর' —পারস্য হইতে আমদানি এ দুটি কথাই যে পূর্ব্ববঙ্গের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এইরূপে শব্দের আদি জন্মস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব, কারণ উচ্চারণের অতি সামান্য পার্থক্য অবলম্বন করিয়া এস্থলে বিচার করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু ভাষার সাধারণ নিয়মানুসারেই এই পার্থক্য শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে না।

খাঁটি পারসীক ভাষা প্রাচীন cuneiform বা 'বাণমুখ' শিলালিপির ভাষা ও সাসানীয় পহ্লবীর বংশধর ; অবেস্তার ভাষা কিন্তু আসলে প্রাচীন মাদ (Medes) জাতির ভাষা ইহার সহিত আধুনিক পারসীকের খুব নিকট সম্বন্ধ হইলেও এই দুই ভাষাকে একই শ্রেণীতে দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আর্সাকীয় পহ্লবী এই অবেস্তার ভাষার বংশধর, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জাতীয় পহ্লবী সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই জানিতে পারি নাই। মধ্য এশিয়ার তুর্ফান ও মিশরের ফাইয়ুম হইতে যে সমস্ত পহ্লবী পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলিতে কেবল সাসানীয় পহ্লবীরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর্সাকীয় পহ্লবীর পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ প্রাচীন মুদ্রা হইতে।

তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পারসীক ভাষার অনেক শব্দ আর্সাকীয় পহ্লবী বা মাদ ভাষা হইতে গৃহীত এবং তাহার কয়েকটি বাংলাতেও আসিয়া পড়িয়াছে। এ শব্দগুলির আলোচনা যে দুরূহ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল দুইটি কথার এখানে আলোচনা করিব। 'পাঞ্জা' কথাটা যে পারস্য হইতে আসিয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন এবং সংস্কৃত 'পঞ্চ' কথাটির সহিত ইহার যে নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা না বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কথাটির আধুনিক পারসীক উচ্চারণ খাঁটি পারসীক ভাষার নিয়মানুবর্ত্তী নহে। প্রাচীন 'চ' আধুনিক পারসীকে প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরাজি z এর

মত করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। তদনুযায়ী প্রাচীন 'পঞ্চ' কথাটির আধুনিক পারসীক উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল * panz, কিন্তু উহার আসল উচ্চারণ panj 'পঞ্জ', সাসানীয় পহ্লবীতেও কথাটির উচ্চারণ এই প্রকারই ছিল। তাই অনুমান হয় কথাটি উত্তর-পশ্চিম ইরানের প্রাচীনতর আর্সাকীয় পহ্লবী হইতে আসিয়াছে। 'শাহ' কথাটির ইতিহাস আর একটু জটিল। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে প্রাচীন পারসীক শিলালিপির 'খ্‌ষায়থিয়' হইতেই ইহার উৎপত্তি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে, শিলালিপিতে যেরূপ লেখা দেখা যায়,উচ্চারণও কি বাস্তবিক সেইরূপ ছিল? বহু ইরানীয় লিখন-প্রণালী সম্বন্ধে তালের‍াঁ Talleyrand-এর বিখ্যাত উক্তিটি খাটে যে, মানুষকে বাক্‌শক্তি দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে আপন মনোভাব গোপন করিতে পারে। পহ্লবীতে প্রচলিত **ideogram** অর্থাৎ ভাবদ্যোতক অক্ষরের কথা এখানে তুলিব না, সে এক অভিনব ইতিহাস। অবেস্তার ভাষা লইয়া যে আজও এত গণ্ডগোল তাহার প্রধান কারণ পূর্ব্বপ্রচলিত বিচিত্র লিখন-প্রণালী। বাণ-মুখ শিলালিপির লিখন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু তাহাও বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আলোচ্য কথাটির বিষয়ে এই শিলালিপির লিখন মানিয়া চলিলে যে ঠকিতে হইবে তাহা অবধারিত। এখন সকলেই প্রায় মানিয়া লইয়া থাকেন যে, প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় উচ্চারণে সাধারণতঃ ঝোঁকের স্থান ছিল অন্ত হইতে তৃতীয়াক্ষরের উপর। এখন যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে 'খ্‌ষায়থিয়' কথাটি লিখনানুযায়ীই উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কথাটির ঝোঁকের স্থান ছিল প্রথম 'য়'-এর উপর। কিন্তু কথাটির প্রথমাক্ষরের উপরেই যে ঝোঁক পড়িত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না; কারণ নহিলে শব্দটির আধুনিক পরিণত রূপ 'শাহ্‌' হইতে পারিত না, খুব সম্ভব '* শেহ্‌' হইত। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যদিও শিলালিপিতে লেখা আছে 'খ্‌ষায়থিয়' তথাপি হখামনিষীয় সম্রাটদের আমলে কথাটির আসল উচ্চারণ ছিল 'খ্‌ষায়থ্য'। কিন্তু এখানে পুনরায় গণ্ডগোল। দেখা যায় অনুরূপ স্থলে পারসীক ভাষায় 'থ্য' হইতে 'দ'-এর উদ্ভব হইয়াছে। আর্সাকীয় পহ্লবীতে কিন্তু এই সকল স্থানে 'হ-' দেখা যায়, যেমন অবেস্তার 'পথ্য' (=পত্য, আধিপত্য) আর্সাকীয় পহ্লবীতে 'বেহ্‌'-রূপ ধারণ করিয়াছে। তাই মনে হয় 'শাহ্‌' কথাটিও আর্সাকীয় পহ্লবী হইতে আসিয়াছে। এটি আমার নিজের বিশ্বাস মাত্র, পাঠককে বিনা বিচারে এই মত গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না।

দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে এমন অনেক পারসীক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে যাহাদের অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ ভারতেই বাঙ্গালীর হাতের কাছে ছিল, অথচ বাঙ্গালী তাহা গ্রহণ করে নাই। পারস্য হইতে আমদানি 'দুষ্‌মন্‌' কথাটি সংস্কৃত 'দুর্মনস্‌' শব্দের রূপান্তর মাত্র, অথচ বাংলায় এই সংস্কৃত কথাটির প্রচলন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'চরকা' কথাটি পারস্য হইতে আসিয়াছে; আসলে এটি সংস্কৃত 'চক্র' হইতে অভিন্ন। এখানে র-কারের স্থানভ্রংশ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, বহু ভাষায় এই ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন ইংরাজীতে gras ও gars (ঘাস) এই দুইটি রূপই প্রচলিত ছিল। আরও কতকগুলি পারসীক শব্দে বাংলার র-কারের স্থানভ্রংশ পরিলক্ষিত হয়। 'বুজরুক' কথাটির আসল পারসীক রূপ 'বুজুর্ক্‌'। পারস্য হইতে কথাটি আর্মানি ভাষাতেও গিয়াছে, এবং সেখানেও কথাটি 'বুজরুক্‌' রূপ ধারণ করিয়াছে। পারসীক 'শাগির্দ্‌' কিন্তু আর্মানি ভাষায় আদিরূপই বজায় রাখিয়াছে, যদিও বাংলায় আমরা বলি 'শাগরেদ্‌'। 'সিপাহি' কথাটিরও প্রাচীন ভারতীয় রূপ বৈদিক 'স্পশ্‌' (=চর) শব্দটির মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৈদিক সাহিত্যের পর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি কথা পারস্যে গিয়া এমনই আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে সেগুলি আর চিনিবার উপায় নাই। ভাষাতত্ত্বের সাহায্য ব্যতিরেকে বুঝা যাইবে না যে পারসীক 'সফেদ্‌' ও সংস্কৃত 'শ্বেত' মূলে একই কথা। সংস্কৃত 'শ্ব'এর স্থলে প্রাচীন ইরানীয় ভাষাগুলিতে সর্ব্বত্র দেখা যায় 'স্প', যেমন 'অশ্ব'='অস্প'। প্রাচীন পারস্যে সংস্কৃত 'শ্বেত' কথাটির প্রতিশব্দ ছিল 'স্পেত্‌' (পহ্লবী)। আধুনিক পারসীকে কিন্তু শব্দারম্ভে ব্যঞ্জনসমষ্টি থাকিতে পারে না, সেজন্য কখন আদিতে স্বরপ্রশ্লেষ হয়, কখন স্বরভক্তিস্বরের উদ্ভব হয়। এখানে স্বরভক্তির ফলে 'স্পেত্‌' 'সপেদ্‌' ও পরে 'সফেদ্‌'এ পরিণত হইয়াছে। 'পাহারা' কথাটিও পারসীক হইতে ধার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইহার প্রতিশব্দ 'পাত্র' কথাটি সংস্কৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'পাহারা' অর্থে 'পাত্র'-শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতেই অতি বিরল।

দুই এক স্থলে বুঝিয়া ওঠা কঠিন, শব্দটি পারস্য ঘুরিয়া আসিয়াছে কি না। সংস্কৃত 'বৎস' হইতে 'বাছা' কথাটির উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু 'বাচ্চা' কথাটির এত সহজে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না; ভাষার নিয়মানুযায়ী '*বচ্চা' বা 'বাছা' এই দুটি রূপ সংস্কৃত 'বৎস' হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। তাই

মনে হয় 'বাচ্ছা' কথাটি আসলে পারসীক ভাষা হইতে ধার করা। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে 'বাছা' ও *'বচ্ছা' এই দুইটি রূপের সংমিশ্রণে ভারতেই 'বাছা' কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। আমার মনে হয় বাংলা 'আগুন' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপে। পালি 'অগ্‌গি' হইতে সাধারণ ভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে হিন্দি 'আগ্‌', এবং সংস্কৃত 'অগ্নি' হইতে অপরদিকে '*অগুনি' বা 'আগুন্‌' শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকা সম্ভব; 'গ' ও 'ন'এর মধ্যে স্বরভক্তিস্বর রূপে উ-কারের উদ্ভব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'আগ্‌' ও '*অগুন্‌' এই দুইটি রূপের সংমিশ্রণে বাংলায় উৎপন্ন হইবে 'আগুন'।

'শিরোনামা' কথাটি আজকাল বাংলায় খুব প্রচলিত হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় এটি খাঁটি সংস্কৃত কথা, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কোথাও 'শিরোনামা' কথাটি প্রয়োগ আছে বলিয়া তো জানি না। মনে হয় এটি আসলে পারসীক 'সর্‌নাম্‌', ভারতবর্ষে আসার পর কথাটিকে সংস্কৃত পোষাক পরান হইয়াছে।

পারস্য হইতে প্রত্যাগত কোন কোন শব্দ আকৃতিতে বিশেষ পরিবর্ত্তিত না হইলেও সম্পূর্ণ নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে 'আশ্‌মান'। এইটি সংস্কৃত 'অশ্মন্‌' (=পাথর) ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু 'আশ্‌মান্‌' বলিতে আমরা বুঝি আকাশ। আসল কথা এই যে অতি প্রাচীন কালেই ইরানে লোকে আকাশকে প্রস্তরনির্ম্মিত একটা কঠিন আচ্ছাদন বলিয়া মনে করিত, ইরানের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য অবেস্তার গাথার মধ্যেই এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইটালীর লোকেরও এইরূপ ধারণা ছিল, কারণ লাটিন caelum ('আকাশ') কথাটির আসল অর্থ কুঁদিয়া প্রস্তুত করা একটি ছাদ বা আচ্ছাদন' (লাটিন caelum জার্ম্মান hoehlen কথাটির সহিত সম্পর্কিত)। ভারতে কিন্তু আকাশে আলোর ছটা, ঋগ্বেদে কবি পুনঃ পুনঃ গাহিয়াছেন 'রোচনা দিবি'—'উজ্জ্বল আকাশ', তাই কাশ্‌-ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দ দিয়া ভারতে আকাশের নামকরণ হইয়াছে।

পারস্য-ভ্রমণের ফলে কোন কোন কথার অর্থ ও আকৃতি দুই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন 'মিহির'। 'পাত্র' হইতে যেরূপ 'পাহারা' ও 'চিত্র' হইতে 'চেহারা' হইয়াছে. 'মিত্র' হইতে সেরূপে হইয়াছে 'মিহির'। কিন্তু বাংলায় 'মিত্র' ও 'মিহির' এই দুইটি কথার অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কথা দুইটার অর্থোদ্ভবের ইতিহাস বিশেষ জটিল, তাহা খুব লঘুপাঠ্য হইবে না।

বাংলা ভাষার এমন অনেক পারসীক শব্দ আছে, যেগুলিকে আমরা নিতান্তই বিজাতীয় বলিয়া মনে করি, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় ইহাদের মধ্যে অনেক শব্দ মোটেই বিজাতীয় নয়। কোন বাঙ্গালী যদি হঠাৎ আজ 'সূর্য্য উঠিতেছে' না বলিয়া 'আফ্‌তাব উঠিতেছে' বলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভয় পাইয়া যাওয়ারই কথা বটে। কিন্তু 'আফ্‌তাব' কথাটির মধ্যে ভীতিপ্রদ কিছুই নাই. খুব সম্ভব এটি সংস্কৃত 'আতাতাপ' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'খোদা' (পারসীক 'খুদাই') কথাটি সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নহিলে বুঝিতেই পারা যায় না। কথাটির ব্যুৎপত্তি লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে। আজকাল যে মতটি সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে তাহাই এখানে দিব। নবাবিষ্কৃত সোঘ্‌দীয় ভাষার কথাটি এই আকারে দেখা যায় gwt'w (মনে রাখিতে হইবে উপরে উল্লিখিত তালের্‌াঁ Talleyrand-র উক্তিটি সোঘ্‌দীয় লিখন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য)। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন শব্দটির উৎপত্তি '*স্ব-তবায়্‌' হইতে (সংস্কৃত '*স্ব-তবিষী')। এখানে বলিয়া রাখা ভাল 'নাখোদা' মানে নিরীশ্বর নহে; 'না' বলিতে এখানে বুঝায় 'নৌকা', 'নাখোদা' মানে 'পোতাধ্যক্ষ'। অর্থ ও আকৃতির সাদৃশ্য থাকিলেও 'জান্‌' ও 'জীবন' এই দুইটি কথার মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বে মনে করা হইত 'জান্‌' সংস্কৃত 'ধ্যান'-এর সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু সাসানীয় পহ্লবীতে অধুনাতন কালে এই শব্দটির যে প্রাচীন রূপ পাওয়া গিয়াছে তাহা 'গ্যান্‌'। কাজেই এখন নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে সংস্কৃত 'ধ্যান' কথাটির সহিতই ইহার আসল সম্পর্ক। শব্দাদিতে 'বি'-স্থানে 'গু'-হওয়া পারসীক ভাষার নিয়ম, যথা অবেস্তা 'বর্দ', গ্রীক্‌ rhodon (<* wrodon): পারসীক 'গুল্‌'। অন্যান্য ভাষাতেও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়, যেমন্‌ ইংরাজি William : ফরাসী Guillaume.

এই কয়টি কথার আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে কত পারসীক শব্দ কত বিভিন্ন পথ দিয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা বাংলা ভাষা কি পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাংলা ভাষার একটি ঐতিহাসিক অভিধান হইলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইবে, এখন সবই অনেকটা অন্ধকারে ঢিল্‌ মারা। অবেস্তার জ্ঞান না থাকিলে যেরূপ সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারা অসম্ভব, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ পারসীক ভাষায় জ্ঞান প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর সভ্যতাও যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পারসীক সভ্যতার নিকট কতটা ঋণী তাহা ভাষার আলোচনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়। বাংলা সাহিত্যের উপর পারসীক সাহিত্যের প্রভাব সাহিত্যিকেরা বিচার করিবেন।
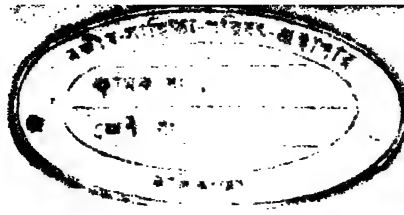
ক্রোমোপ্যাথি

—শ্রীহলধর বর্দ্ধন লিখিত
শ্রীঅরবিন্দ দত্ত চিত্রিত

ভোর হইতে না হইতে বঙ্কিম ওষুধের প্যাঁটরা-পুঁটরি খুলিয়া বসিয়াছিল। খলে পুরিয়া ঢালিয়া বহুক্ষণ মাড়িবার পর মধু আর পান-আদার রস দিয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেটি সে পান করিল—তারপর প্যাঁটরা-পুঁটরি তুলিতে তুলিতে বলিল, আঃ যদি হজমটা হ'ত ভাল ক'রে!

ততক্ষণে সুনীলের ঘুম ভাঙিয়াছিল। চাকরে চা লইয়া আসিয়াছিল, বিছানার উপর হইতে হাত বাড়াইয়া চায়ের কাপ লইয়া সে বাসি মুখেই চা পান সুরু করিল। পাশেই টেবিলে এক রাশ খাতা বই, সেগুলির দিকে বিষদৃষ্টি হানিয়া, চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আর পারিনে বঙ্কিম বাবু, পরীক্ষাটা যদি হ'য়ে যেত সব ল্যাঠার হাত থেকে উদ্ধার পেতাম।

তখনও অবনীর নাক ডাকিতেছিল এবং অতঃপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে-নাক-ডাকার বিরাম ঘটিবেনা, ইহা বঙ্কিম ও সুনীল দু'জনেরই জানা ছিল, সুতরাং তাহার দিকে চাহিয়া দু'জনেই ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম বলিল,—খায় দায়, দিব্যি হজম হয়, পেটে তো আর চাপ ধরে নেই দিবারাত্র, ঘুমোচ্ছে বেশ।

সুনীল উত্তর দিল,—আরে মশাই, পরীক্ষার তাড়া নেই, ভাবনা কি? বলিয়া চায়ের বাটিটা তক্তপোষের তলে রাখিয়া সে বই খুলিয়া বসিল। বঙ্কিম শিশি খুলিয়া নিম-চালমুগ্‌রার তেল মাখিতে বসিয়াছিল—একে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার জ্বালা, তার উপর আবার মাসখানেক হইল খোস-চুলকানি দেখা দিয়াছে।

নীচের পথ তখন রিক্‌শর ঝুন্‌ ঝুনি আর ছ্যাকড়াগাড়ির চাকার শব্দে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দোকানে উড়িয়া পান-ওয়ালা সদ্য স্নান সাঙ্গ করিয়া হাতে মুখে গোপীচন্দনের তিলক দিতে দিতে রসবতীর গান করিতেছে। পথের কল হইতে ভিস্তি-ওলা জল লইয়া গলির ভিতর ছুটিয়াছে। এবং মোড়ে খবরের কাগজ-ওয়ালা চীৎকার জুড়িয়াছে।

অবনীর ঘুম ভাঙিয়াছিল। টুথব্রাশে পেষ্ট ঢালিতে ঢালিতে সে বাথ-রুমে চলিয়া গেল। বঙ্কিম তলপেটে সজোরে তেল ঘসিতে ঘসিতে অবনীর পেশীপুষ্ট চেহারার দিকে চাহিয়া ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বাথ-রুম হইতে ফিরিতেই বঙ্কিম অবনীকে জিজ্ঞাসা করিল – কি অবনীবাবু, হজম হ'য়েছে তো ভাল? কাল যা লুচিমাংস বোঝাই করেছিলেন –

অবনী বাধা দিয়া বলিল—আরে মশাই, বেকারের আবার—! একটা চাকরি যদি জুটত, দেখিয়ে দিতাম —মোদ্দা একটা টুশনি, গোটা তিরিশেক টাকার। তা তাও

যদি হজমটা হ'ত ভাল ক'রে—

কি তেমন করেছি। বলিয়া খবরের কাগজখানি টানিয়া 'ওয়ান্টেড' দেখিতে লাগিল।

সুনীল কোঁচার খুঁটে চশমা মুছিয়া আড় হইয়া গা ভাঙিতে ভাঙিতে বলিয়া উঠিল,—ষোড়শ শতাব্দীর বিজয়নগরে জন্ম নিলে এ সমস্যা আপনার মিটত অবনী বাবু। স্মিথ সাহেব ব'লছেন, সে রাজ্যে গরীবই ছিল না।

অবনী উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

বঙ্কিমের ভাটার মত চোখ দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত হইল।

বর্ত্তমানে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণী এই বঙ্কিম এক কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের নাম-করা ছেলে ছিল। ভরা পদ্মা পাড়ি দিতে দিতে পাল তুলিয়া এক একটি পান্‌সী যেমন সগৌরবে ছোটে, বঙ্কিম তখন সেই রকম চালে চলিত—তারপর জালে কোথা হইতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার আক্রমণে সামান্য একটি ছিদ্র দেখা দিল এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে অগাধ জীবন-সমুদ্রে সে নাকানি-চুবুনি খাইতে আরম্ভ করিল। বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না, পরীক্ষার ফির দশগুণ টাকা ডাক্তারে-কবিরাজে হাওয়া-বদলে ফুঁকিয়া গেল, কিন্তু নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিল না।

মা-বাপে রমণীরঞ্জন নাম রাখেন্‌নি কেন তাই ভাবি—

বনোয়ারী বলিত, ভাল হবে কেন স্বাস্থ্য! সারাদিন মুখগোমড়া করে বসে থাকবে ঘরের ভেতর, না হাসি, না ফুর্ত্তি—আরে ছ্যাঃ।

সারা মুখে বনোয়ারীর ব্রণ—মরা, আধমরা, তাজা। নিজের চেহারা নিজেই আয়নায় দেখিয়া খুশী—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিবে—আ মরি, মুখ তো নয় যেন পদ্মচাকা! মা-বাপে রমণীরঞ্জন নাম রাখেননি কেন, তাই ভাবি। মাথার চুলগুলি কাপ্তেনী ছাঁটে কাটা। দিব্য মজার লোক, হাসিঠাট্টা লইয়াই থাকে।

কিন্তু রমেশের উপর সে অত্যন্ত খাপ্পা। সে বেচারি বি-এ পাশ করিয়া 'ই-বি-আর' এ ক্রুগিরি করিতেছে, টেম্পোরারি। সারা রাত্রি ডিউটি দিতে হয়। একটু কাব্যি-ঘেঁসা, একটু প্রেমিকও। পাশের এক বাড়ি হইতে একটি পোনেরো ষোলো বছরের মেয়ে বেণী দুলাইয়া ইস্কুলের বাসে গিয়া বসে আর রমেশ রেলিঙ্‌ ধরিয়া তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া থাকে, তাহার বুকটা কচ্‌কচ্‌ করিতে থাকে, হয় তো ভাবে—মেয়েটি যদি ভালবাসে,তবে ক্রুগিরি ছাড়িয়া এ-টি-এস্‌ হইতে কতক্ষণ! রমণীর মন না পাইলে কবে কাহার জীবনে জোয়ার আসিয়াছে! মেয়েটির জন্য জীবনে তাহার অস্বস্তির অন্ত নাই।

কিন্তু বনোয়ারী সারাদিন এজন্য তাহাকে কথা শোনাইতেছে—ভদ্রলোকের বাড়ীর দিকে নজর কেন বাপু?—যাও না··· সাহসে কুলোয়না বুঝি। লোকে খারাপ বলবে—ভয়!

রমেশ উচ্চবাচ্যও করে না।

সাঁইত্রিশ নম্বরের মেসের তেতলায় এই কয়টি বাসিন্দা।

ফুটপাথের ওপারের বাসাটায় সাইনবোর্ড ঝুলানো, মিস্‌ আশা দাস, গবর্ণমেণ্ট হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণা নার্স। ইহাদের বাসা হইতে তাহার ঘরের খানিকটা দেখা যায়—একটা পালঙ্ক, তাহাতে দামী নেটের মশারি ঝুলিতেছে, ড্রেসিং টেবল একটা। সামনে দাঁড়াইয়া মিস্‌ দাস প্রসাধন করে—পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স হইবে কিন্তু তবুও একটু কেমন-কেমন ভাব।

বনোয়ারী তাহার উদ্দেশ্যে গালিগালাজ বর্ষণ করিয়াই আছে—মারো বেটিকে।

মিস দাসের বাড়ীর পাশে একটি বাড়ীতে টু-লেট ঝুলানো, বহুদিন হইতে আছে। টু-লেটের বোর্ডটা রৌদ্রে পুড়িয়া-বৃষ্টিতে ভিজিয়া অদ্ভুত দেখিতে হইয়াছে। বাড়ীটিতে কে কবে মরিয়াছিল সেই হইতে ভাড়াটিয়া জুটিতেছে না।

একটু বেলা হইতে মিস দাস কাজে বাহির হয়, হিল উঁচু জুতা পায়ে, কোঁচানো শাড়ী খুব সাবধানে ধরিয়া রিক্সতে চাপিয়া বসে, হাতে একটি ব্যাগ। বঙ্কিম তখন আফিসে চলিয়াছে। রমেশ বারান্দায় পায়চারি করিতেছে ইস্কুলের বাসের প্রতীক্ষায়। সুনীল দাড়ি কামাইতে বসিয়াছে আর বনোয়ারী মুখে ব্রণের ওষুধ লাগাইতে লাগাইতে গানের নামে

চীৎকার জুড়িয়াছে, 'তোমায় দেখিবার সাধ মেটেনি এখনও···' অবনী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

সকাল দুপুর হয়, মেস নির্জ্জন হইয়াছে। রমেশ ও অবনী ঘুমাইতেছে। সুনীল হাতে রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধিয়া নোটের খাতা হাতে লাইব্রেরিতে গিয়াছে। মিস দাস বাসায় ফিরিয়াছে, তাহার হিন্দুস্থানী দাই স্নানাহারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। পথ রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছে—একখানি ছ্যাক্ড়া গাড়ি রাস্তায় খাড়া। হঠাৎ গলির ভিতর হইতে হয় তো একটি খোকা ছুটিয়া বাহির হইয়া ষ্টেশনারি দোকান হইতে এক পয়সার কুচো বিস্কুট কিনিয়া গলির ভিতর ছুটিয়া পলাইতেছে।

এম্নি দিন কাটিতেছিল।

সহসা একদিন সম্মুখের বাড়ীর টু-লেট অদৃশ্য হইল এবং দিন দুয়েক পরেই একটি মোটরলরি অনেক আসবাবপত্র লইয়া আসিয়া সাঁইত্রিশ নম্বরের সম্মুখের ফুটপাথে দাঁড়াইল। কাঁচা-পাকা চুলের একটি ভদ্রলোককেও দেখা গেল, তিনি মালপত্রের তদ্বির করিতেছেন। বাড়ীর ঘরগুলি সাজিয়া-গুজিয়া বিয়ের ক'নের মত হাসিখুসি হইয়া উঠিল। জানালায় জানালায় পর্দ্দা পড়িল। নীচে রাস্তার দিকে একখানি ঘর, আলমারী শো-কেসে লাল নীল জারে ওষুধের শিশি বোতলে ডিস্পেন্সারি গোছের করা হইল, সেই ঘরের দোরে ট্যাবলেট দেখা গেল—এ, কে, পুরকায়স্থ এম-এস্-সি, এম-বি। বড় বড় অক্ষরে নীচে লেখা ক্রোমোপ্যাথিষ্ট। দেখিয়া বনোয়ারী বলিল, এ ব্যাটা আবার কোন্ বুজ্রুক্। সুনীল তাহাকে ক্রোমোপ্যাথির ইতিবৃত্ত বুঝাইয়া দিল, বলিল,—প্রাচীন ইজিপ্টে এর প্রচলন ছিল, ম্যাস্পেরো সাহেব প্রমাণ পেয়েছেন। শুনিয়া বঙ্কিমের মনে সামান্য আশা হইল, —ডাক্তার কবিরাজে অনেক টাকাই তো গিয়াছে, ক্রোমোপ্যাথির শরণ লইয়া দেখিলে হয়। রমেশ জানালার পর্দ্দাগুলির দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। অবনী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—খবর ভাল রমেশ বাবু!

চাকর-ঠাকুরের মুখে ভাড়াটিয়াদের সকল তথ্য শুনিতে বিলম্ব হইল না।

কাঁচা-পাকা চুলের যে ভদ্রলোককে দেখা গিয়াছিল, তিনিই কর্ত্তা। মৃতদার। একটি মাত্র মেয়ে, আইবুড়ো। অগাধ পয়সা। কোথায় এক নেটিভ ষ্টেটে বড় ডাক্তার ছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া মেয়েকে লইয়া দেশ-ভ্রমণ করিয়াছেন অনেক দিন। এই ভ্রমণের অবসরেই ক্রোমোপ্যাথির চর্চ্চা। সম্প্রতি বাড়ী হইতেছে বালীগঞ্জের দিকে, সেই বাড়ী শেষ না হওয়া অবধি এইখানে আড্ডা থাকিবে।

বনোয়ারী সব শুনিয়া বলিল, যাক্, রমেশ বাবুর একটা হিল্লে তা হ'লে হ'তেও পারে।

সুনীল কেক চিবাইতেছিল, বলিল—আপনিও হাল ছাড়বেন না।

বেণী ঝুলাইয়া ইস্কুলের বাসে গিয়া বসে—

বনোয়ারী অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল—আমি? আমার হিল্লে কি মশাই? তারপর ঘর-ফাটানো হাসি হাসিয়া বলিল, দুঃরু, মেয়েমানুষের বাড়ি যাই, মদ খাই—আমার আবার হিল্লে। তবে বঙ্কিম বাবুর একটা সুবিস্তা হ'তে পারে। এত ক'রে বলি ভদ্রলোককে, মশাই দু-এক ডোজ খান, ডিস্পেপ্সিয়া বাপ-বাপ করে পালাবে ..তা শুনবেন না।

অবনী বলিল—অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা। নো হার্ম, ট্রাইং দি লাক—কি বলেন রমেশ বাবু? কিন্তু মেয়েটি কি রকম দেখতে হবে বলুন্ তো?

সুনীল চট্ করিয়া জবাব দিল—রোগা, ফর্সা, ফিন্‌ফিনে।

বয়স পোনেরো, হাসিতে হিল্লোলে পোনেরো বছর উপ্‌ছে পড়ছে পোনেরোটা পরীর মত—

অবনী তাহার মুখের কথা কাড়িয়া বলিল—কিচ্ছু জানেন না আপনি—মেয়েটি দোহারা, শ্যামলী, চোখে চশমা, সতেরো বছর হবে বয়েস, ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কয়, কইতে কইতে হাঁপিয়ে ওঠে, তখন আকাশের দিকে চেয়ে আকাশের মত নীল হ'য়ে ওঠে আর কাছে কেউ থাকলে তাকে কবিতা শোনায়, শেলী কি রবি ঠাকুর থেকে···কি বলেন বঙ্কিম বাবু?

কোঁচানো শাড়ী খুব সাবধানে ধরিয়া রিক্‌সতে চাপিয়া বসে।

হঠাৎ বঙ্কিমও উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু। মেয়েটি গম্ভীর, সব সময়ে নীল শাড়ী পরে থাকে আর সেলায়ের কাজ করে। উনিশ হবে বয়স···কারুর পানে চায় না, অনেক কথার উত্তরে শুধু বলে, না—তারপর সরে যায়। যদি হাঁ বলতে হয় তবে না ব'লে মৃদু হাসে—প্রতিবাদ করতে হ'লে ভ্রূ কোঁচ্‌কায়।

বনোয়ারী লাফাইয়া উঠিয়া রমেশকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দাদারে! হজম হয়না-টয়না যে বলিস্‌ তা তোর সব ফাঁকি—স্ত্রীলোকের রূপের এমন বর্ণনা দিতে পারিস্‌ তুই···

অবনী বলিল—রমেশ বাবুর কি মত?

দূরে এক বাড়ীর ছাদে একটা মেয়ে চুল শুকাইতেছিল, রমেশ সেইদিকে চাহিয়াছিল—সে কোন উত্তর দিল না, শুধু দেখা গেল তাহার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে।

বনোয়ারী তাহার পিছনে গিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বলা দরকার যে কিছুদিন আগে ইহারা সকলে 'চিরকুমার সভা' দেখিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর একদিন ভাড়াটিয়ারা আসিল বলিয়া বোঝা গেল। সেই কাঁচা-পাকা চুলের ভদ্র ব্যক্তিটিকে কাজে অকাজে দেখা যায়—ডিস্‌পেন্‌সারির সামনে মাঝে মাঝে বড় বড় জুড়ীগাড়ী কি মোটর আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের স্থূল-কায় আরোহীদের দেখিয়া বঙ্কিম ভাবিয়া পায় না, কি অসুখ ইহাদের—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, হজম হয় না?

এমন করিয়া প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গেল—কিন্তু লক্ষ-পতির উত্তরাধিকারিণী কোথায়? পর্দার আড়ালে কোন জীবন্ত প্রাণী থাকিলে বোঝা যাইত। অন্দর ছাড়িয়া এক-বারও কি সদরে আসিত না!···অবনী ও সুনীলের এই ব্যাপারে একটা মনকষাকষিই হইয়া গেল। সুনীল বলিতেছিল, সব বাজে কথা। অবনী তাহা মানিতে চাহে না।

শেষ অবধি শোনা গেল, উত্তরাধিকারিণী আজও এ বাড়ীতে আসেন নাই, ইস্কুলের বোর্ডিংএ আছেন, দার্জ্জিলিংএর কোন্‌ ইস্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন—ইস্কুল বন্ধ হইলে আসিবেন, এবং সে দিনের বিলম্ব নাই।

কিন্তু বঙ্কিমের ততদিন তর্‌ সহিল না, এক রবিবারের সকালে সে পকেটে দুইটা টাকা ফেলিয়া, ছেঁড়া চটিতে পা ঢুকাইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়া উঠিল। ঢুকিয়া তাহার তাক্‌ লাগিয়া গেল—একটি ত্রিকোণ ঘর, দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া রাজ্যের আলমারি, সেগুলিতে হাজারে হাজারে বই; একপাশে একটি পূর্ণায়তন কেঙ্কিটন, তাহার নীচে একটি ষ্ট্যাণ্ডের উপর মাঝারি গোছের একটি গ্লোব। একপাশে খানিকটা জায়গা কাল কাপড় ঘেরা, তাহাতে ভিতরে ঢুকিবার জন্য একটি লাল টক্‌টকে ক্রীনের দরজা বসানো,

সেই স্ক্রীনের উপর কাল কাপড়ে দুইটা মানুষের হাড় আড়াআড়ি করিয়া আঁকা। ভিতরের দিকে দুইটা ঘর, সেখানে ডাক্তার বসিয়া আহার করিতেছেন—কলার পাতে ধব্ধবে আতপ চাউলের দু'এক মুঠা ভাত, একটা ডিমসিদ্ধ, পাশে একটি খুরীতে পয়সা চারেকের দই, অন্য পাশে প্লেটে একটুক্‌রা আম আর দুইটি কলা ছাড়ানো। এখানে ওখানে ইক্‌মিক কুকারে কয়েকটা বাটি ছড়ানো। বৃদ্ধ স্বপাক আহার করেন।

বঙ্কিম কি করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। ডাক্তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাকে বসিতে বলিলেন।

লক্ষপতির আহারের নমুনা দেখিয়া বঙ্কিম রীতিমত ভড়্‌কাইয়া গিয়াছিল—সঙ্কেতে সাহস পাইয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

ডাক্তার দাঁতে খড়্‌কি দিতে দিতে ঘরে ঢুকিলেন, বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেন আপনি?

বঙ্কিম অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে চাকরী করি, কেরাণীগিরি।

—তারপর?

—ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ভুগ্‌ছি, তাই—

ডাক্তার আঁচাইয়া ফিরিয়া আসিয়া একটি চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন—বুঝ্‌লাম। আমার ফি কত জানেন, টাক দিতে পারবেন, মাইনে কত পান?

—পঞ্চাশ, তার পাঁচ টাকা কেটে নেয় মাসে মাসে, ধার নিয়েছিলাম দুশ' টাকা সেই জন্য—

—তাহলে!...ধার নিলেন কেন?

—এই চিকিৎসার জন্যই।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন,...আচ্ছা তোমাকে আমার ফি দিতে হবে না। কিন্তু এখন যেসব ওষুধ খাচ্ছ, আমার চিকিৎসা করাতে হলে, সেগুলি ছাড়তে হবে।

বঙ্কিম রাজী হইল।

আধ ঘণ্টা পরে বঙ্কিম মেসে ফিরিলে, বনোয়ারী, সুনীল, অবনী, রমেশ—সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল—কি হ'ল? —কি আবার হবে? চিকিৎসা করাব, বলিয়া জামা খুলিয়া বঙ্কিম শুইয়া পড়িল।

—সেতো পরের কথা, মোটের উপর তাহ'লে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল, মেয়েটি কবে আস্‌ছে? বলিয়া অবনী বঙ্কিমের বিছানায় আসিয়া বসিল।

—এসেছে। বঙ্কিম পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল।

সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হ'ল আপনার?

—হ'ল। আমাকে খুব ভরসা দিলে মেয়েটি, বল্‌লে, কোন ভয় নেই আপনার, বাবার কাছ থেকে জীবনে কোন রুগী

— টাকা দিতে পারবেন, মাইনে কত পান?

হতাশ হ'য়ে ফেরেনি। উনি ধন্বন্তরী,—এমন অসুখ নেই পৃথিবীতে যা সারাতে পারেন না।

—বটে বটে! অবনী লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দেখলেন কেমন, সুন্দরী?

—কি জানি ভাই। তোমাদের ওসব আমি বুঝিনে—যার হজম হয়না, পেট ভুটভাট্ করে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সুন্দরীও তার,—

—বয়স কত?

—পোনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। কণ্ঠস্বর অদ্ভুত—মনে হয়, স্যাক্সোফোনে কসরৎ দিচ্ছে—কাল রঙ্, ঠোঁটে শ্বেতী, কপালের উপর দুটো আঁব উঠেছে—মাথার তালুতে চুল ঠেকেছে—একটা হাতে সাতটা আঙুল, পায়ে গোদ—নাকে নাকছাবি, কানে পাশী মাকড়ী, দাঁতে মিশি দেয়—

অবনী বাপ-বাপ করিয়া উঠিয়া বসিল। বনোয়ারী বলিল—আইডিয়াল। সুনীল 'ইণ্টারেষ্টিং' বলিয়া রমেশের দিকে চাহিল—রমেশ মুখভার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

রাস্তার ওদিক্কার বাড়ীতে মিস দাস তখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথে মুদিখানার দোকানে লোকজনের ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে—একদল ছেলে দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে লালশালুতে লেখা পতাকা খাড়া করিয়া গান করিতে করিতে চলিয়াছিল।

পরের রবিবারে আসিয়া বঙ্কিম নূতন খবর দিল। ক্রোমোপ্যাথিষ্ট তিনবার বিবাহ করিয়াছিল—মেয়েটি দ্বিতীয় পক্ষের দরুণ—সে দার্জ্জিলিংএ থাকিয়া পড়ে, শীঘ্র আসিবে—এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দিবে—একটি টিউটার দরকার। বঙ্কিম যদি ইচ্ছা করে অবনীবাবুকে ট্যুশানিটা জোগাড় করিয়া দিতে পারে। শুনিয়া অবনী বঙ্কিমের পা জড়াইয়া ধরিল।

নিজেকে ছাড়াইয়া বঙ্কিম বলিল—কিন্তু আসল কথা তো তা নয়।
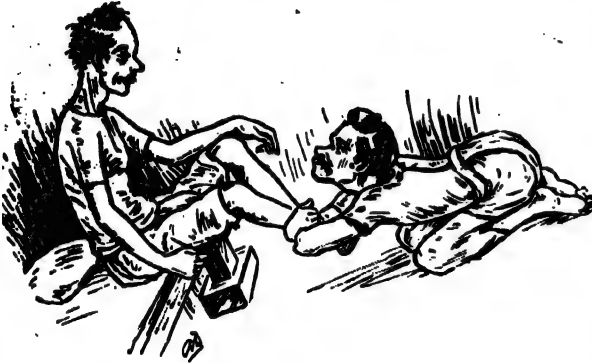
অবনী বঙ্কিমের পা জড়াইয়া ধরিল।

—তবে আসল কথা কি? সুনীল জিজ্ঞাসা করিল।

—আসল কথা হচ্ছে, বুড়ো বলে, বিয়ে করলেই আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারবে। এবং আর যা সব বলে, তা কহতব্য নয়।

বনোয়ারী আঁক্ আঁক্ করিয়া বলিল—কেমন, কেমন—বলেছিলাম কিনা? চলুন্ আজই আপনার ওষুধ বাত্‌লে দিচ্ছি—

—তবে বুড়ো বেশ মজার লোক। তিনটি বউয়ের সব কটিকে সমান ভালবেসেছে—তিনটির কথাতেই তার চোখে জল আসে।

যাহাই হউক্, সামান্য কয়দিনের চিকিৎসাতেই বঙ্কিমের ভাল লাগিতেছিল। আশ্চর্য্য হইবার ব্যাপার, কেননা চিকিৎসার জন্য সে ঘোরে নাই, কলিকাতা সহরে এমন ডাক্তার কবিরাজ ছিল না। শেষ অবধি সকলে মিলিয়া যখন বলিল. মনের অসুখ, তখন সে পেল্‌ম্যান ইনষ্টিট্যুটে যাইতেও বাকী রাখে নাই, সেখানে ফ্রয়েডের স্বীয় শাগ্‌রেদও তাহার কিছু করিতে পারে নাই। অগত্যা সে মন ভুলাইবার জন্য তানপুরা লইয়া সা-ঋ গা-ম সাধিয়াছে। বেহালায় ওস্তাদ্-বাড়ীতে ধন্না দিয়াছে—এমন কি বিকালে দর্জ্জি-ইস্কুলে ভর্ত্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে। শহরে যতগুলি ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর স্কুল ছিল তাহার সবগুলি সে ঘুরিয়া আসিয়াছে, সুইমিং ক্লাবও বাদ যায় নাই। অবশেষে কাশীপুরে এক গুরু পাকড়াও করিয়া সে যোগ-সাধনাও সুরু করিয়াছিল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা নীচে পা উপর দিকে করিয়া সে কাটাইয়া দিয়াছে—দিনেরপর দিন গো-চোনা খাইয়াছে, মাসের পর মাস ঘাসপাতা ফলমূল খাইয়া থাকিয়াছে—পেটে কাদা লাগাইয়াছে—প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছে। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়াছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

অথচ মাসখানেকে এখানে বেশ ফল ফলিয়াছে, সে আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল। এ ডাক্তারের চিকিৎসার পন্থা একটু অভিনব, লাল-নীল জল ও আলো লইয়া সামান্য ক্রিয়া মাত্র। সপ্তাহে দুইবার—তারপর রোজ বৃদ্ধের আত্মকাহিনী শোনা, তাহার যৌবনের খুঁটিনাটির কথা—রুণার মায়ের সহিত প্রেমের কাহিনী এবং কবে কোন্ দিল্লীউলীর মোহে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই আদ্যোপান্ত ইতিহাস। আর এমন একটি দুইটি নয়—অন্ততঃ পক্ষে একশত ঘটনা। তাহার প্রত্যেকটি বলিতে বলিতে বুড়ার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসে।

তারপর মেয়ে রুণার কথা। অস্বীকার করিবার উপায় নাই, মেয়ের কথা শুনিতে শুনিতে বঙ্কিমের নেশা লাগে। না দেখিয়া যদি ভালবাসা যায়, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে বঙ্কিম রুণাকে ভালই বাসিয়াছে। সে এখন জানে রুণা রাগিলে রক্ষা থাকে না, খুশী হইলে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারে—ঠিক তার মায়ের মতই মেজাজ।

রুণা আর দিন পনেরো পরে আসিবে। এই কয়টা দিন যেন আর বঙ্কিমের কাটিতেছিল না—নিজের অলক্ষ্যে সে সারাক্ষণ প্রাণ দিয়া একটি দিনের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার বিবর্ণ মুখে রক্ত দেখা দিয়াছে, তাহার চোখের দীপ্তিও বুঝি ফিরিল। ত্বকের স্বাস্থ্য ফিরিয়াছে—লিভারের অবস্থাও একটু ভাল। রুণা আসিবার আগে তাহাকে সম্পূর্ণ সারিতেই হইবে—মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সুনীল বনোয়ারীর চোখ এড়ায় নাই-- অবনী রমেশও বুঝিয়াছে। সকলেই ঠাট্টা করে কিন্তু তাহারা তো সমগ্র কাহিনীটা জানে না। জানে না যে রুণার সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়া বৃদ্ধ ক্রোমোপ্যাথিষ্ট কি কি কথা তাহাকে বলিয়াছে।

এমন সময় একটি গোল বাধিল। গোল বাধাইল বনোয়ারী। শনিবার রাত্রে সে প্রথামত বাসায় ফিরিতে রাত করিয়াছিল। তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। বনোয়ারীর চোখ অবশ্য শাদা ছিল না—কিন্তু তবু সে শপথ করিয়া বলিতেছে, অত রাত্রে সে ক্রোমোপ্যাথিষ্টের ঘরে মিস আশা দাস নার্সকে দেখিয়াছে। সুনীল অবনী রমেশ কেহই একথা বিশ্বাস করে নাই—বঙ্কিম তো করেই নাই। কিন্তু বনোয়ারী বলিতেছে—ইহা নিছক সত্য ঘটনা।

বঙ্কিম আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ করে নাই। এসব কথা তাহার কানেই পৌঁছাইতেছিনা। আজিকার দিনটা কাটিবার অপেক্ষা শুধু—কাল সকালে দার্জ্জিলিং মেলে রুণা আসিবে। অক্ষয়বাবু ষ্টেশনে যাইবার সময় তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইবেন।

রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হয় নাই। ভোরের দিকে তাই ঘুম আসিয়াছিল—কাহার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ মেলিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিতেই দেখে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে—সে বিরক্ত হইয়া উঠিতে যাইবে, সুনীল তাহাকে বারান্দা হইতে ডাক দিল—দেখে যান্ মশাই।

বাহিরে আসিয়া সে প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেল—কি ব্যাপার! সম্মুখের বাড়ী দুইটা পুলিশে পুলিশে ছাইয়া গিয়াছে—নার্স ও ক্রোমোপ্যাথিষ্টের নাকি পাত্তা নাই।

কাল রাত্রে তাহারা গা ঢাকা দিয়াছে, কোথায়, কখন, কেহ কিছু বলিতে পারে না। বাড়ী দুইখানির আসবাব পত্রের একটিও কোথাও কিছু সরে নাই। শুধু লোক দুইটিই নাই।

বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সংবাদ পাওয়া গেল—বাড়ীর আসবাবপত্র সব ওয়েল্‌স্‌লির কোন্ ফার্ণিশিং হাউস হইতে ভাড়া করা। তাহাদের লোকও খবর পাইয়া আসিয়াছিল, কয় মাসের কিস্তিই তাহারা পায় নাই। ক্রোমোপ্যাথি ও নার্সিং দুই-ই ভূয়া। দুই জনেই পুরাণো দাগী—ইনসিন জেল হইতে মাস পাঁচ ছয় আগে পিছে খালাস পাইয়াছে। ইণ্টারন্যাশনাল ভাবে যে-জোচ্চোরের দল গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই দুইজন। কলিকাতায় এই মাস কয়েকের মধ্যে তাহাদের পাল্লায় বহু লোকে বহু রকমে ঠকিয়াছে।

হঠাৎ বঙ্কিমের মনে হইল, রুণার যে দার্জ্জিলিং মেলে আসিবার কথা। কাল বিলম্ব না করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অবশ্য রুণাও ভূয়া!

দিন পোনেরো পরে সন্ধ্যার দিকে আবার সাঁইত্রিশ নম্বর হইতে দেখা গেল, সামনের বাড়ী দুইটাতে টু-লেট ঝুলিতেছে।

আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ

ইউরোপের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতেছে—ইউরোপের রাজনীতিকরা, অর্থনীতিকরা একবাক্যে পুস্তকে ও পত্রিকায় চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ইহা জানাইতেছেন। আমরাও এই সমস্ত পড়িয়া এবিষয়ে একরকম নিশ্চিন্ত হইতেছিলাম, এমন সময়ে একজন ইংরেজ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ গণনা করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহার বক্তব্য হইতেছে এই যে, ইউরোপের যে অবস্থাই হোক্ তাহাতে ভাবনা-চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা দুই শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে আর এমন একটি লোকও পাওয়া যাইবে না যাহার মাথা ঠিক থাকিবে। তাঁহার হিসাব এই—১৮৫৯ সনে ইউরোপে প্রত্যেক ৫৩৫ জনে একটি পাগল ছিল। ১৮৯৭ সনে ৩১২ জনে একটি পাগল হয়—১৯২৬ সনে হইয়াছিল ১৫০ জনে একটি। এই হিসাবে ১৯৭৭ সনে শতকরা একটি পাগল পাওয়া যাইবে এবং ২১৩৯ খৃষ্টাব্দে শতকরা একশত পাগল পাওয়া যাইবে।—আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ!

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) [কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসের অধ্যক্ষ শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত পোর্ট্রেট হইতে]

বুদ্ধকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

নির্ব্বাণের অর্থ কি?

সকলের আগে বুদ্ধের প্রথম উপদেশ "ধম্মচক্ক-প্পবত্তন সুত্তের" কথা ধরি। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "অমতং অধিগতং, আমি অমৃত পাইয়াছি"; যে অবস্থার নাম মরণহীনতা তাহা নিশ্চয় সর্ব্বশূন্যতা নয়।

সংযুত্তনিকায়ে আছে যে যমক নামক একজন ভিক্ষু বলিয়াছিল "আমি ভগবানের প্রচারিত ধর্ম্মের এই অর্থ বুঝি যে যদি কোন নিষ্পাপ ভিক্ষুর শরীর বিনষ্ট হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে সে মৃত হয়, এবং মৃত্যুর পর তাহার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না।" সারিপুত্র, যাঁহার মত জ্ঞানী শিষ্য বুদ্ধের আর ছিল না ও যিনি সকলের অপেক্ষা ঠিকভাবে বুদ্ধের শিক্ষা বুঝিতেন, সেই সারিপুত্র ভিক্ষু যমকের এই কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাহার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সে তথাগতকে এই জীবনেই সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারে না, অতএব তথাগতের ধর্ম্মের মর্ম্ম সে সব বুঝে এ কথা বলার তাহার কোন অধিকার নাই। সারিপুত্রের কথার অর্থ এই যে তথাগত সম্বন্ধে (অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে) বলিতে গেলে চিন্তা এমন একটি গভীর দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে প্রবেশ করে যে তাহার সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত তর্ক করা চলে না; যে ভিক্ষু আনন্দলাভ করিতে চায় তাহার অন্য বিষয়ে উদ্যম করিতে হইবে। সারিপুত্র যদি মনে করিতেন যে মৃত্যুর পর তথাগতের কোনই অস্তিত্ব থাকে না তবে কি তিনি এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন? নিশ্চয়ই না।

নির্ব্বাণের অর্থ তবে শূন্যতা নয়। ইহা একটি অতি গভীর, অতি গম্ভীর, অতি দুর্জ্ঞেয় বিরাট অবস্থা। আমাদের সসীম জ্ঞানের অস্তিত্ব ইহা নয়, ইহা একটি বৃহত্তর বিশাল অসীমের অবস্থা, ইহা আমাদের ধারণার অতীত। এ অবস্থা সাধারণ অস্তিত্ব-ধারণার বহির্ভূত কিন্তু ইহা নাস্তিত্ব নয়। উপনিষদের মত বুদ্ধও ইহার "নেতি নেতি" বর্ণনা করিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ, এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে পৃথিবীও নাই, অপ্‌ও নাই, তেজও নাই, বায়ুও নাই, আকাশের অসীমতাও নাই, জ্ঞানের অসীমতাও নাই, অথচ যাহা সর্ব্বশূন্যতাও নহে; এখানে ইহলোকও নাই পরলোকও নাই, সূর্য্যও নাই চন্দ্রও নাই। হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে আমি আসাও বলি না যাওয়াও বলি না, স্থিতিও বলি না চ্যুতিও বলি না, জন্মও বলি না মৃত্যুও বলি না; ইহা অতল, অচল ও অনন্ত, ইহাই দুঃখের নিবৃত্তি"—"অত্থি ভিক্খবে তদ্ আয়তনং, যত্থ ন'এব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানঞ্চায়তনং ন বিঞ্ঞাণানঞ্চায়তনং ন আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং ন নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমসূরিয়া, তদ্ অমৃহং ভিক্খবে ন'এব আগতিং বদামি ন গতিং ন ঠিতিং ন চুতিং ন উপপত্তিং, অপ্পতিট্‌ঠং অপ্পবত্তং অনারম্মণং এব তং, এস্'এব' অন্তো দুক্খস্‌সা'তি।" (উদান, পাটলিগামিয়্যবগ্গ, ১)

দুঃখের নিবৃত্তির নামই নির্ব্বাণ। বুদ্ধের এই উক্তিতে দেখিলাম যে তিনি ইহাকে একটি 'অবস্থা' বলিয়াছেন এবং 'ইহা আছে'ও বলিয়াছেন। এই অবস্থার যে মহান পরিচয় তাঁহার কথায় পাওয়া যায় তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বহির্ভূত হইলেও অন্ততঃ এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে ইহা আছে, ইহা পূর্ণতার অবস্থা, রিক্ততার নয়। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সার ব্রহ্ম (ইংরেজি 'অ্যাবসলিউট্') সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ইহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে একথার এই সমালোচনা হইয়াছিল যে ব্রহ্ম আছেন যখন বুঝি তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়

কেমন করিয়া বলি? বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধেও আমরা বলিতে পারি যে উহার স্বরূপ যখন অস্তিধর্ম্মক, তখন তাহাকে শূন্যতা কেমন করিয়া বলা যায়?

বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "ইধ মোদতি, পচ্চ মোদতি, কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি—এখানেও পরেও, কৃতপুণ্য ব্যক্তি উভয়ত্রই আনন্দ লাভ করে।" ভবিষ্যতে যদি কোন সত্তাই না থাকিবে তবে 'পরে' আনন্দলাভ করা যায় কিরূপে? মর্ত্ত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া যে 'বিপুলং সুখং' লাভের কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহা কি এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়? "চজে মত্তাসুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলং সুখং"—যে বিপুল সুখের জন্য মর্ত্ত্যসুখ ত্যাগ করিতে বলা হইল তাহা কি এতই ক্ষণস্থায়ী?

ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও "মিলিন্দ পঞ্ঞ্হো" নামক পালিগ্রন্থ বৌদ্ধদের কাছে অতিপ্রামাণিক বলিয়া মান্য হয়। এই গ্রন্থে নাগসেন নামক বৌদ্ধ শ্রমণের সঙ্গে একজন রাজার বৌদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের বিবরণ আছে। রাজার নাম পালিতে মিলিন্দ; ইনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ডেমেট্রিয়সের পুত্র মেনাণ্ডার বা মেনাণ্ড্রস্ নামক যে গ্রীকো-ব্যাকট্রিয় রাজা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাগলনগরে রাজত্ব করিতেন, তিনিই এই মিলিন্দ। "মিলিন্দ পঞ্ঞ্হো" গ্রন্থোক্ত সব আলোচনাই যে বাস্তবিক ভিক্ষু নাগসেন রাজা মেনাণ্ডারের সঙ্গে করিয়াছিলেন তাহা নয়। উভয়ের কিছু আলোচনা বোধ হয় হইয়াছিল এবং সেই আলোচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই অতিপ্রামাণিক গ্রন্থে যে আলোচনা আছে, তাহা হইতে আমরা নির্ব্বাণের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেনের কথায় বৌদ্ধধর্ম্মের মতবাদের মধ্যে যেখানে অস্পষ্টতা অনুভূত হইত বা যাহাতে সন্দেহ থাকিত এমন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও বোধ্য করার চেষ্টা করা হইয়াছে। মেনাণ্ডার-নাগসেন-সংবাদ আমাদের সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

রাজা মেনাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত নাগসেন, নির্ব্বাণ কি পূর্ণ আনন্দ, না ইহাতে কিছু দুঃখ থাকে?"

"মহারাজ, নির্ব্বাণ পূর্ণ আনন্দ; ইহাতে দুঃখের অংশ নাই।" রাজা তখন বলিলেন, লোক নির্ব্বাণলাভের জন্য শরীর মনের কত কষ্ট সহ্য করে, সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া কত দুঃখ পায়, এসব যখন নির্ব্বাণের জন্যই তখন নির্ব্বাণে এগুলি থাকে বুঝিতে হইবে। নাগসেন উত্তর দিলেন যে নির্ব্বাণ অবিমিশ্রিত সুখ; নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পথ দুঃখময় বটে কিন্তু রাজাকেও রাজ্যসুখলাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই কি? বিদ্যালাভের জন্যও মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করে কিন্তু তাই বলিয়া যে রাজ্যসুখ ও বিদ্যাসুখের আনন্দে দুঃখের অংশ থাকে, তাহা নয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোনও উপমা, ব্যাখ্যা, যুক্তি বা তর্ক দ্বারা নির্ব্বাণের রূপ, আয়ু (বয়ং) বা পরিমাণ বুঝান যায় কিনা; নাগসেন বলিলেন যে তাহা যায় না, কারণ নির্ব্বাণের সদৃশ আর কিছুই নাই। রাজা বলিলেন, নির্ব্বাণ যখন আছে এমন একটি জিনিষ (অত্থিধম্মস্স নিব্বানস্স) তখন ইহা পারা যাইবে না কেন? নাগসেন বুঝাইলেন যে সমুদ্রের অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া কি সমুদ্রে ঠিক কত জল বা কত প্রাণী বাস করে তাহা রাজা বা পদার্থবিদেরা (লোকক্খায়িকা) বলিতে পারেন? বা অরূপকায়িক দেবতাদের বর্ণনা করা অসম্ভব হইলেও তাঁহাদের কি অস্তিত্ব নাই? সেইরূপ অস্তিধর্ম্মক হইলেও উপমা প্রভৃতি দ্বারা নির্ব্বাণের স্বরূপ বুঝান যায় না। রাজা বলিলেন, নির্ব্বাণের কি এমন লক্ষণ কিছু নাই যাহা অন্য পদার্থেও বিদ্যমান (অঞ্ঞেহি অনুপবিট্ঠং) এবং যাহার সম্বন্ধে উপমা দেওয়া যাইতে পারে? নাগসেন বলিলেন, নির্ব্বাণের রূপ সম্বন্ধে না গেলেও কয়েকটি গুণ সম্বন্ধে এরূপ উপমা দেওয়া যাইতে পারে; নির্ব্বাণে পদ্মের একটি গুণ, জলের দুইটি, ঔষধের তিনটি, সমুদ্রের চারটি, খাদ্যের পাঁচটি, আকাশের দশটি, চিন্তামণির তিনটি, রক্তচন্দনের তিনটি, ঘৃতের তিনটি এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ আছে, যথা—

পদ্মে যেরূপ জলস্পর্শ হয় না নির্ব্বাণে সেইরূপ পাপস্পর্শ নাই; জল যেরূপ শীতল ও দাহনাশী নির্ব্বাণ সেইরূপ শীতল ও পাপজ্বরনাশক; জলে যেরূপ জীবের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নির্ব্বাণে সেইরূপ কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা দূর হয়; ঔষধ যেরূপ বিষক্লিষ্ট লোকের শরণ নির্ব্বাণ সেইরূপ পাপবিষক্লিষ্ট

জীবের শরণ ; ঔষধে যেরূপ ব্যাধিশান্তি হয় নির্ব্বাণে সেইরূপ শোকশান্তি হয় ; ঔষধ যেরূপ অমৃত (অমতং) নির্ব্বাণ সেইরূপ অমৃত ;

সমুদ্রে যেমন শবদেহ থাকিতে পারে না নির্ব্বাণে সেইরূপ কোন পাপ থাকিতে পারে না ; সমুদ্র যেরূপ মহান ও অসীম্ এবং সমুদ্রে অনেক নদী পড়িলেও তাহা যেমন পূর্ণ হয় না সেইরূপ নির্ব্বাণও মহান ও বিশাল এবং তাহাতে বহু জীব প্রবেশ করিলেও তাহা পূর্ণ হয় না ; সমুদ্রে যেমন মহাজীবেরা বাস করে নির্ব্বাণেও সেইরূপ অর্হৎরা বাস করেন ; সমুদ্র যেরূপ অসংখ্য, বিবিধ ও সুন্দর তরঙ্গবিক্ষেপ কুসুমনিচয়ে সংকুসুমিত নির্ব্বাণও সেইরূপ অসংখ্য, বিবিধ ও সুন্দর বিশুদ্ধি-জ্ঞান-বিমুক্তি-কুসুমনিচয়ে সংকুসুমিত ;

খাদ্য যেরূপ সকল জীবের আশ্রয় নির্ব্বাণলাভ হইলে সেই রূপ জীবনের আশ্রয় হয় কারণ ইহাতে জরামৃত্যুর অন্ত হয় ; খাদ্যে যেমন জীবের শক্তিবৃদ্ধি হয় সেইরূপ নির্ব্বাণ-লাভে সকলের "ইদ্ধি"বৃদ্ধি হয় ; খাদ্য যেমন জীবের শ্রীহেতু নির্ব্বাণও সেইরূপ সকলের পুণ্যশ্রীহেতু ; খাদ্যে যেরূপ জীবের ক্লেশ দূর ও ক্ষুধানাশ হয় নির্ব্বাণলাভে সেইরূপ সর্ব্বজীবের পাপক্লেশ দূর ও সর্ব্বযাতনানাশ হয় ;

আকাশের মত নির্ব্বাণও অজ, অজর, অমর, অক্ষয় এবং জন্মান্তরহীন ; ইহা অজয়, চোরে ইহা চুরি করিতে পারে না, ইহা আশ্রয়নিরপেক্ষ ; আকাশে যেমন পক্ষিরা বিহার করে, সেইরূপ নির্ব্বাণে অর্হৎরা বিহার করেন এবং আকাশের মত ইহা অবাধ ও অনন্ত ; চিন্তামণির মত নির্ব্বাণেও সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়, ইহা আনন্দদায়ক ও সমুজ্জল ; রক্তচন্দনের মত নির্ব্বাণও দুর্লভ, অতুলসুগন্ধি ও সুজন-প্রশংসিত ; ঘৃতের মত নির্ব্বাণও সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্বাদ ; এবং গিরিশৃঙ্গের মত নির্ব্বাণও মহোচ্চ ও অচল, গিরিশৃঙ্গ যেরূপ দুরারোহ নির্ব্বাণও সেইরূপ পাপের পক্ষে দুরারোহ ; গিরিশৃঙ্গে যেমন তৃণাদি জন্মিতে পারে না নির্ব্বাণেও সেইরূপ পাপ জন্মিতে পারে না ; এবং গিরিশৃঙ্গের মত নির্ব্বাণও প্রিয়াপ্রিয়নির্বিকার। (মিলিন্দ পঞ্হো ৪।৮।৫৮-৭৫)

মেনাণ্ডারের প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষু নাগসেন আবার বলিলেন "মহারাজ, শান্তিময়, সুখময় ও সুকুমার এই যে নির্ব্বাণত্ব (নিব্বাণধাতু), ইহা অস্তিধর্ম্মক···কেমন করিয়া নির্ব্বাণকে জানা যায় ? ভয়বিপদশূন্যতা, নির্ভয়তা, শান্তি, আনন্দ, সুখ, সৌকুমার্য্য, শুদ্ধতা ও শীতলতা দ্বারা ইহা জানা যায়। জলন্ত অঙ্গারের উপর হইতে প্রবল চেষ্টায় মুক্ত হইয়া শীতল স্থানে গেলে, গলিত শবাদিপূর্ণ কূপ হইতে বহুশ্রমে বাহির হইয়া মুক্তস্থলে পৌছিলে, বা সশস্ত্র শত্রুর সম্মুখে ভীত কম্পিত অবস্থা হইতে মহাশক্তিতে পলাইয়া সুরক্ষিতস্থানে আশ্রয় লইলে লোকের মনে যে পরমানন্দ লাভ হয় জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভ করিলে জীবেরও সেইরূপ পরমানন্দ লাভ হয়। (মি-প, ৪।৮।৭৬-৮৪)

একস্থানে নাগসেন বলিয়াছেন "মহারাজ, জ্ঞানহীন জীব ইন্দ্রিয়ে ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করে ও তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে, এইজন্য তাহারা জন্মজরাব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হয় না, দুঃখবিমুক্তিলাভ করে না, কিন্তু জ্ঞানবান আর্য্যশিষ্য ইন্দ্রিয়ে বা ইন্দ্রিয়বিষয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করেন না, তাহাতে বদ্ধ হন না, ফলে তাঁহার তৃষ্ণাদূর হয় ; তৃষ্ণা দূর হইলে উপাদান দূর হয়, উপাদান দূর হইলে ভব দূর হয় এবং ক্রমে জন্মজরাব্যাধি-দুঃখশোক-পরিদেবন প্রভৃতি দূর হয়। এইরূপে দুঃখের নিরোধ হয়, এবং নিরোধই নির্ব্বাণ (নিরোধো নিব্বানন্ তি)"—(মি-প, ৩।৪৬)।

আর একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মৃত্যুর পর নির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিনা সে বিষয়ে মেনাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভদন্ত নাগসেন, বুদ্ধ বলিয়া কোনও ব্যক্তি কি আছেন ?"

"হাঁ মহারাজ, আছেন।"

"নাগসেন, তবে কি তিনি এখানে আছেন বা ওখানে আছেন তাহা দেখাইতে পারা যায় ?"

"মহারাজ, যেরূপ অন্ত হইলে এমন কিছু আর বাকি থাকে না যাহাতে আবার ব্যক্তির উদ্ভব হয় (অনুপাদিসেসায় নিব্বান-ধাতুয়া) তথাগতের সেইরূপ অন্ত হইয়াছে ; তথাগত এখানে আছেন বা ওখানে আছেন এরূপ দেখাইতে পারা যায় না।"

"একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝান।"

"মহারাজ, আপনার কি মনে হয় ? যেখানে খুব বড় একটা আগুন জ্বলিতেছে সেখানে একটা শিখা নিভিয়া গেলে কি বলা যায় ইহা এখানে বা ওখানে ?"

"না ভদন্ত, সে শিখার অন্ত হইয়াছে, তাহা আর নাই।"

"মহারাজ, সেইরূপ তথাগতেরও অস্ত হইয়াছে, তিনি এখানে আছেন বা ওখানে আছেন এরূপ দেখাইতে পারা যায় না।" (মি-প, ৩।৫।১০)

শেষ কথাটিতে দেখা গেল যে দহ্যমান দুঃখের অবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপেই নির্ব্বাণ। এই সসীম ও সদুঃখ অবস্থার শূন্যতা হইতে নির্ব্বাণ অর্থে শূন্যতা এই কথার বোধহয় সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই অনেক অনর্থের সূত্রপাত হয়। নাগসেন যে আনন্দ, পূর্ণতা, শান্তি ও শীতল অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলিলেন তাহা সর্ব্বপূর্ণতার অবস্থা, ইহাকে সর্ব্বশূন্যতা বলিয়া কাহারও ভ্রম করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থার সঙ্গে উপনিষদের মুক্তি-অবস্থার কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে স্বীকার করিয়া বেদান্ত মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে যে ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, জীবাত্মাকে অস্বীকার করিয়া ও পরমাত্মা সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেই একই লক্ষ্যকে আদর্শ করিয়াছেন; গন্তব্যস্থান উভয়ের একই, পার্থক্য শুধু মার্গ লইয়া। জৈনশাস্ত্রের নির্ব্বাণের আদর্শেও দেখি যে তাঁহারা পরমাত্মা না মানিলেও জীবাত্মার মুক্ত অবস্থার যে কল্পনা করিয়াছেন তাহাও প্রায় বেদান্তের মুক্তির অনুরূপ। ভারতীয় সাধনা বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শ প্রায় একই ছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বুদ্ধ জন্মগত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, তিনি ইহা মানিয়াই লইয়াছিলেন। আরও একটা মারাত্মক কথা তাঁহারা বলিয়াছেন যে বুদ্ধের শিক্ষা তিনি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়দের লক্ষ্য করিয়া এবং মুখ্যতঃ তাহাদেরই জন্য প্রচার করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দলের সংগঠনই নাকি তাঁহার সঙ্ঘস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। এ কথা স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বুদ্ধবচনে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। এ মতের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করিব।

বুদ্ধ ও জাতিভেদ

জাতিব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধ মানিতেন না। বোধিলাভের অল্পদিন পরেই উরুবেলের বনে তিনি এক উদ্ধত ব্রাহ্মণকে যে কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। একজন ব্রাহ্মণ সংসারত্যাগ করিয়া অন্য এক সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। সেও ভিক্ষায় ভোজন করিত। তাহার একবার মনে হইল যে বুদ্ধ বোধ হয় শুধু তাঁহার নিজের শিষ্যদেরই 'ভিক্ষু' বলেন, অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমণদের ভিক্ষু বলেন না। সে বুদ্ধের কাছে গিয়া বলিল "ভদন্ত গৌতম, আমি ভিক্ষায় মাত্র ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকি, আমাকেও আপনি ভিক্ষু বলিয়া সম্বোধন করিবেন।" বুদ্ধ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করে বলিয়াই আমি লোককে ভিক্ষু বলি না; সব নিয়মগুলি পালন করিলেও ভিক্ষু হয় না; যে পাপপুণ্য ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানবলে সংসারে বিচরণ করে তাহাকেই আমি ভিক্ষু বলি"—(ধম্মপদট্ঠকথা ৩।৩৯২)। শাস্ত্র আওড়াইলেই ব্রাহ্মণ হয় না—"যে প্রাচীন ঋষিদের প্রণীত স্তোত্র ও কথা আবৃত্তি করিয়া নিজেকে ঋষি মনে করে তাহার তুলনা সেই দাস বা সাধারণ লোকের সঙ্গে করা যায় যে যে-আসনে বসিয়া রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে আজ্ঞা দেন সেই আসনে বসিয়া ঠিক সেই কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়া নিজেকে রাজা মনে করে"—(দীঘনিকায়, অম্বট্ঠ সুত্ত)। বুদ্ধ বলিয়াছেন "জটা, গোত্র বা জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, যাহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম থাকে সেই সুখী, সেই ব্রাহ্মণ"—

> ন জটাহি ন গোত্তেন ন যচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
> যম্হি সচ্চঞ্ চ ধম্মো চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো। ধম্মপদ, ৩৯৩।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি মানিতেন তবে সাধারণ লোকে যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতির লোকের সন্তান মাত্রেই ব্রাহ্মণ অতএব শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি মানিতেন না। সত্য ও ধর্ম্ম যাহার মধ্যে আছে, সে যে গৃহেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইত। হোমযাগযজ্ঞের বুদ্ধ নিন্দা করিয়াছিলেন; যাগযজ্ঞ কথাগুলিরও তিনি উচ্চতর ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ যে ভাবে যাগযজ্ঞ করিয়া থাকেন তাহার চেয়ে যে যজ্ঞে জীবহত্যা হয় না তাহা ভাল, জীবহত্যাহীন যজ্ঞের চেয়ে দানযজ্ঞ ভাল, দানযজ্ঞের চেয়ে ধর্ম্ম, অহিংসা, সত্যপরায়ণতা ও অকপটতা ভাল, ভিক্ষুর শুদ্ধ সাম্যভাব এগুলির চেয়েও ভাল, এবং সব চেয়ে শ্রেষ্ঠযজ্ঞ হইতেছে নির্ব্বাণলাভের জ্ঞান। (দীঘ-নিকায়, কূটদন্ত সুত্ত)।

জাতিব্রাহ্মণ হইলেই যে বুদ্ধ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তাহা নয়। তাঁহার অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। বিখ্যাত সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নও ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেরঞ্জ নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে এ কথা ঠিক কিনা যে বুদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন না, তাঁহাদের দেখিলে গাত্রোত্থান করেন না ও বসিতে আসন দেন না। বুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে এমন ব্রাহ্মণ কেহ নাই যাহাকে এরূপ সম্মান দেখান তাঁহার উচিত। ইহাতে বুঝা যায় বুদ্ধ জাতিব্রাহ্মণদের অন্য সাধারণ লোকের মতই দেখিতেন। জাতিব্রাহ্মণ উপযুক্ত হইলে তাহার সঙ্গে তিনি উপযুক্ত ব্যবহারই করিতেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতি বুদ্ধকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছিল। ভিক্ষুরা ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে পূর্ব্বজন্মে তিনি অনেকবার ইঁহাদের সন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণদম্পতির মৃত্যু হইলে বুদ্ধ শবানুগমন করিয়াছিলেন (ধম্মপদট্ঠকথা, ৩।৩১৮)। একবার বুদ্ধ বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উপবাণ নামক একজন শিষ্যকে দেবহিত নামক ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে গরম জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। দেবহিত ইহাতে আনন্দিত হইয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন দানের ফল সবচেয়ে বেশী। বুদ্ধ বলিলেন যে দানের মূল্য দাতার গুণানুসারে হয় (ধম্মপদট্ঠকথা, ৪।২৩৩)।

অবশ্য এ কথা বলা যায় বুদ্ধ সমাজ হইতে জাতিভেদ তুলিয়া দিতে বলেন নাই। কিন্তু তিনি সকলেরই কাছে এ কথা প্রচার করিতেন যে জাতিতে মানুষের শ্রেষ্ঠতা হয় না, গুণের দ্বারাই হয়। নিজের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে তিনি কোনরূপ জাতিগত বিভিন্নতাকে স্থান দেন নাই, সেখানে সকলেই সমান। যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে বয়ঃকনিষ্ঠের কাছে সম্মানভাজন, যে গুণবৃদ্ধ সে সকলেরই সম্মানার্হ, জাতির কোন কথা সঙ্ঘে উঠিতে পারিত না। বুদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরযূ মহী প্রভৃতি মহানদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন তাহাদের পূর্ব্বের নামগোত্র আর থাকে না এবং সকলেই সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির লোক গৃহত্যাগ করিয়া তথাগত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাদের পূর্ব্বের নামগোত্র আর থাকে না, সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হয়"—উদান, ৫।৫।

বুদ্ধের অনেক ক্ষত্রিয়শিষ্য ছিল বটে কিন্তু সঙ্ঘে তাহাদের পদপ্রাধান্য কিছু ছিল না, যে কেহ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে অন্য সকলের সঙ্গে সমান আসন পাইত। অতএব তিনি জাতিভেদ মানিতেন বা ক্ষত্রিয় দল সংগঠন করিয়াছিলেন এ কথা কেমন করিয়া বলি? হিন্দুসমাজের লোকে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বসিয়া খায় না, আমিও হিন্দুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে অস্পৃশ্যবর্জ্জিত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসিয়া খাই; কিন্তু আমার নিজের বাড়ীতে আমি অস্পৃশ্যদের সঙ্গে যদি বসিয়া খাই এবং অস্পৃশ্যদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান না করি তবে কি আমি হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য বর্জ্জনের সমর্থন করি বুঝিতে হইবে?

অনেক হীনজাতির ও নীচপদের লোকও সংঘে প্রবেশ করিত। এক ব্রাহ্মণের দাস পলাইয়া গিয়া সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ দাসকে ফিরাইয়া লইবার জন্য বুদ্ধের কাছে আসিলে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে দাস তাহার বোঝা নামাইয়া দিয়াছে, তাহার উপর ব্রাহ্মণের আর কোন অধিকার নাই (ধ-কথা, ৪।১৬৮)। আর একস্থানে বুদ্ধের সঙ্গে রাজার এইরূপ কথা হইয়াছিল—বুদ্ধ বলিলেন "যদি আপনার কোন দাস বা ভৃত্য পীতবাস গ্রহণ করিয়া নির্দ্দোষ চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে ধর্ম্ম পালন করে তাহা হইলে কি আপনি বলিবেন 'এ লোকটি এখনও আমার দাস ও ভৃত্য থাকুক, আমার সামনে দাঁড়াইয়া থাকুক, আমাকে প্রণাম করুক, আমার আজ্ঞা পালন করুক, আমার আরামের জন্য খাটুক, সসম্ভ্রমে কথা বলুক ও আমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকুক'?"

"না ভদন্ত, আমি তাহাকে অভিবাদন করিব, তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসিতে আসন দিব, সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, তাহার বস্ত্র অন্ন ও ঔষধের প্রয়োজন হইলে তাহা দান করিব এবং তাহাকে যথোচিত নির্ভয়তা দান ও রক্ষা করিব" (দীঘনিকায়, সামঞ্ঞফল-সুত্ত)। এখানে দেখি যে, সংঘে প্রবেশ করিলে যে পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিল সে রাজারও সম্মানার্হ হইত।

"থেরগাথা" গ্রন্থে সুনিত নামক একজন ভিক্ষু এই কথা বলিয়াছেন "নীচ বংশে আমার জন্ম, আমি অনাথ ও দরিদ্র ছিলাম ; আমি হীনকার্য্য করিতাম, দেবালয় ও রাজভবনের শুষ্ক পুষ্পাদি ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমার কাজ ছিল ; লোকে আমাকে অবহেলা করিত, ঘৃণা করিত, তুচ্ছজ্ঞান করিত, সসঙ্কোচে আমি সকলকে সম্ভ্রম দেখাইতাম। তারপর মগধের প্রধান নগরে আমি সেই বীরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে ভিক্ষুদলের সঙ্গে যাইতে দেখিলাম ; আমার ভার ত্যাগ করিয়া আমি দৌড়িয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে গেলাম। সেই নরশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি দয়ালু হইয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কাছে গিয়া সেই লোকশ্রেষ্ঠ আমাকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করুন এই ভিক্ষা করিলাম। জগতের প্রতি করুণাময় সেই দয়ালু ভগবান আমাকে বলিলেন "এস, ভিক্ষু!" ইহাই আমার দীক্ষা হইল!"

তারপর সুনিত বনে প্রবেশ করিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া স্মিতহাস্তে বলিয়াছিলেন "শুদ্ধ উদ্যমের দ্বারা, শুদ্ধ জীবনের দ্বারা, সংযম ও আত্মদমনের দ্বারা লোকে ব্রাহ্মণ হয়—ইহাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব।" বুদ্ধের কাছে শীল বা চরিত্রই সকলেই চেয়ে বড় ধর্ম্ম ছিল।—"চন্দন টগর উৎপল বা বস্সিকী, এই সব গন্ধদ্রব্যগুলির মধ্যে শীলগন্ধই সর্ব্বোত্তম"—

চন্দনং তগ্গরং বাপি উপ্পলং অথ বস্সিকী
এতেসং গন্ধজাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।—ধম্মপদ, ৫৫।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব,—বুদ্ধ অনেককেই কৃপা করিতেন কিন্তু নির্ব্বোধদের সহ্য করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিলে তাঁহার কাছে কঠিনভাবে তিরস্কৃত হইত ও তিনি নির্ব্বুদ্ধিতার নানারকম নিন্দা করিতেন—"যদি শ্রেষ্ঠতর বা সমান ব্যক্তির সঙ্গ না পাওয়া যায় তবে একাকী চলাই উচিত ; মূর্খের সঙ্গ একেবারেই পরিত্যাজ্য"—

চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয্য সেয্যং সদিসং অত্তনো
একচরিয়ং দল্‌হং কয়িরা, নত্থি বালে সহায়তা।—ধম্মপদ, ৬১।

"মূর্খব্যক্তি চিরজীবন পণ্ডিতের সঙ্গ করিলেও ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না ; হাতা যেমন চিরকাল ঝোলে নিমজ্জিত থাকিলেও ঝোলের আস্বাদ পায় না।"—

যাবজীবম্ পি চে বালো পণ্ডিতং পয়িরুপাসতি
ন স ধম্মং বিজানাতি দব্বী সুপরসং যথা।—ধম্মপদ, ৬৪।

বুদ্ধের অনেক শত্রু ছিল। এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার শত্রু আছে একথা সত্য, কিন্তু তিনি কাহারও সঙ্গে বিবাদ করেন না, লোকেই তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করে। তিনি যাহা সত্য তাহাই বলেন, বিবাদের জন্য নয়, কিন্তু লোকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করে।

বুদ্ধের সঙ্গে শিষ্যেরা ছাড়া বাহিরের অনেক লোকের আলাপ কথাবার্ত্তা ও তর্কবিতর্ক হইত। সুত্তপিটকে এইসব কথাবার্ত্তার অনেক বিবরণ আছে ; এগুলিতে প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাদিক দিয়া বুদ্ধের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহার তর্কের রীতি ও আলোচনার পদ্ধতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বুদ্ধের কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি বিরুদ্ধ বা ভিন্ন মতাবলম্বী কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় প্রথমে নিজের মতামত কিছু না বলিয়া অপর পক্ষকে প্রশ্ন করিতে থাকিতেন ও শেষে তাহার বিশ্বাস, মত বা ধারণায় অনেক অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি দেখাইয়া দিতেন। বিখ্যাত গ্রীকপণ্ডিত সোক্রাটিস্‌ও এই রীতি অবলম্বন করিতেন বলিয়া ইংরেজিতে ইহাকে "সোক্রাটিক্ (অথবা "ডায়ালেক্‌টিক্) মেথড" বলা হয়। বুদ্ধের তর্কগুলির মধ্যে একটির উল্লেখ করিব ; মূল বিবরণগুলি অতিদীর্ঘ ; অনেক পুনরুক্তি, বাহুল্য প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া সংক্ষেপে মূলের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়া ইহা উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্রাহ্মণ বাসিষ্ঠের সঙ্গে বুদ্ধের তর্ক

বুদ্ধ একদা ভ্রমণ করিতে করিতে কোশলের অন্তর্গত ও অচিরবতীনদীতীরস্থ মনসাকট নামক ব্রাহ্মণগ্রামে আসিয়া একটি আমবাগানে বাস করিতেছিলেন। এই গ্রামের বাসিষ্ঠ (বাসেট্‌ঠ) ও ভারদ্বাজ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক নদীতে স্নান সমাপন করিয়া চিন্তাকুল মনে নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কোন্ মার্গ সত্য, কোন্ মার্গ মিথ্যা ইহা লইয়া উভয়ের আলোচনা হইতেছিল। বাসিষ্ঠ বলিল ব্রাহ্মণ

পোক্‌করসাতি যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ করিলেই ব্রহ্মলাভ হয়, উহাই সহজ ও সরল পথ (উজুমগ্‌গ)। ভারদ্বাজ বলিল, ব্রাহ্মণ তারুক্‌খ যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিলেই ব্রহ্মলাভ হয়, উহাই সরল ও সহজ পথ। এইরূপে উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল কিন্তু কেহ অপরকে স্বমতে আনিতে পারিল না। তখন তাহারা স্থির করিল যে বুদ্ধের কাছে গিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবে কারণ বুদ্ধের খ্যাতি তাহাদের জানা ছিল।

বাসিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ বুদ্ধের কাছে গিয়া অভিবাদনাদি করিয়া তাহাদের বক্তব্য জানাইল। বুদ্ধ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন "বাসিষ্ঠ, তোমাদের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কি লইয়া?"

"গৌতম, সত্য পথ কোনটি ইহা লইয়াই আমাদের বিরোধ। বিভিন্ন ব্রাহ্মণেরা বিভিন্ন পথের কথা শিক্ষা দেন (ব্রাহ্মণা নানামগ্‌গে পঞ্ঞাপেন্তি), এগুলির সবেই কি মুক্তিলাভ হয়? গৌতম, যেমন গ্রামের কাছে অনেক পথ থাকিলেও গ্রামের মধ্যে সব পথই একত্র মিলিত হয় সেইরূপ বিভিন্ন ব্রাহ্মণদের উপদিষ্ট বিভিন্ন পথও এই প্রকার। ইহাদের সবেই কি মুক্তিলাভ হয়?"

"বাসিষ্ঠ, তুমি কি বল যে সব পথই এক প্রকারের?"

"হাঁ গৌতম, আমি তাহাই বলি।"

"বাসিষ্ঠ, তুমি কি সত্যই মনে কর সব পথই ঠিক পথ?"

"হাঁ গৌতম, আমি তাহাই মনে করি।"

"কিন্তু দেখ বাসিষ্ঠ, ত্রিবেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?"

"না গৌতম, সেইরূপ একজনও নাই বটে!"

"আচ্ছা বাসিষ্ঠ, তবে ঐ ব্রাহ্মণদের গুরুদের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?"

"না গৌতম, সেইরূপ একজনও নাই বটে!"

"তবে ঐ ব্রাহ্মণ গুরুদের শিষ্যদের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?"

"না গৌতম, এমন একজনও নাই বটে!"

"ঐ ব্রাহ্মণদের সাতপুরুষের মধ্যে কি এমন কেহ একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন?"

"না গৌতম, সেইরূপ নাই বটে!"

"আচ্ছা বেশ বাসিষ্ঠ, ব্রাহ্মণেরা এখন যে সব মন্ত্র আবৃত্তি ও উচ্চারণ করেন সেই সব মন্ত্রের প্রণেতা ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে কি কেহ এরূপ বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসেন, কোথায় যান, তাহা আমরা জানি, আমরা দেখিয়াছি'?"

"না গৌতম, তাঁহাদের কেহ এরূপ বলেন নাই বটে!"

"বাসিষ্ঠ, তবে তুমি বলিতেছ যে ব্রাহ্মণদের বা ব্রাহ্মণদের গুরুদের বা গুরুদের শিষ্যদের, বা ব্রাহ্মণদের সাতপুরুষের মধ্যে কেহ ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, এবং এমন কি যে ঋষিদের প্রণীত মন্ত্রগুলি এখন ব্রাহ্মণেরা এত সযত্নে পুরুষানুক্রমে ঠিক একভাবে আবৃত্তি ও উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন সেই ঋষিদের মধ্যেও কেহ ব্রহ্ম কে বা কেমন তাহা জানেন নাই বা দেখেন নাই। অতএব বলিতে হয় ব্রাহ্মণেরা এমন বস্তুর পথ দেখাইতে চাহেন যে বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না বা দেখেন নাই। আচ্ছা বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয়? এরূপ কথা বলা কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে মূর্খতা নয়?"

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় যে ইহা মূর্খতা।"

"বাসিষ্ঠ, একসারি অন্ধলোক যেমন জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া থাকে এবং সামনের বা মধ্যের বা পিছনের কেহই দেখিতে পায় না, ব্রাহ্মণদের কথাও ঠিক সেইরূপ—হাস্যকর, শুধু কথামাত্র, রিক্ত ও তুচ্ছ; বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয়? যে চন্দ্রসূর্য্যের ব্রাহ্মণেরা উপাসনা করেন, অর্চ্চনা করেন, স্তব করেন এবং চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের দিকে ফিরিয়া যুক্তহস্তে তাহাদের অনুগমন করেন, সেই চন্দ্রসূর্য্যকে কি ব্রাহ্মণরা সাধারণ লোকের মত দেখিতে পান?"

"হাঁ গৌতম, নিশ্চয়ই দেখিতে পান।"

"তাঁহারা কি চন্দ্রসূর্য্য লাভের পথ দেখাইতে পারেন?"

"না গৌতম, নিশ্চয় পারেন না।"

"বাসিষ্ঠ, তাহা হইলে তুমি বলিতেছ যে তাঁহারা ইহা পারেন না অথচ তথাপি বলিয়া থাকেন যে পারেন—ইহা কি মূর্খতা নয়?"

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় যে ইহা মূর্খতা!"

"আচ্ছা বাসিষ্ঠ, কোন লোক যদি বলে 'এই দেশের জনপদকল্যাণী-(শ্রেষ্ঠ সুন্দরী)কে লাভ করিতে আমার ইচ্ছা

হইয়াছে' কিন্তু প্রশ্ন করিলে সেই রমণীর নাম কি, গোত্র কি, সে দীর্ঘা না হ্রস্বা, গৌরাঙ্গী না শ্যামাঙ্গী, তাহার বাড়ী কোথায়, ইত্যাদি কিছুই বলিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না তাহা লাভ করিবার পথ বলিতে পারেন এরূপ বলা কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে মূর্খতা নয় ?"

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় ইহা মূর্খতা !"

"বাসিষ্ঠ, যদি কোনও লোক প্রাসাদে উঠিবার জন্য চৌ-মাথার সিঁড়ি বানাইতে আরম্ভ করে কিন্তু প্রাসাদটি কোথায় বা কিরূপ তাহার কিছুই বলিতে পারে না, তবে কি লোকে তাহাকে মূর্খ বলে না ? অচিরবতী নদীতে যখন অনেক জল থাকে তখন পার হইতে ইচ্ছা করিয়া কোন লোক যদি এক তীরে দাঁড়াইয়া অন্য তীরকে তাহার কাছে আসিতে আহ্বান করে, তবে অপর তীর কি আসিবে ?"

"না গৌতম, নিশ্চয়ই না !"

"বাসিষ্ঠ, ব্রাহ্মণরাও এইরূপে যাহার দ্বারা মানুষ সত্যই ব্রাহ্মণ হয় তাহা না করিয়া এবং যাহার দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণ হয় না সেই সব কাজ করিয়া দেবতাদের স্তব ও পূজা করেন ; মৃত্যুর পর যে তাঁহারা দেবতাদের কাছে যাইবেন ইহা হইতেই পারে না। আবার নদীর এক তীরে যদি কেহ বাঁধা থাকে বা ঘুমাইয়া পড়ে তবে সে যেমন অপর তীরে যাইতে পারে না, সেইরূপ যে ইন্দ্রিয়বদ্ধ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন সেও সংসারের অপর পারে যাইতে পারে না। আচ্ছা দেখ বাসিষ্ঠ, যখন গুরু-শিষ্যে আলাপ হয় তখন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কাছে কি শুনিয়াছ ? ব্রহ্মার বিষয়-সম্পত্তি ও পত্নী আছে, না নাই (সপরিগ্‌গহো বা ব্রহ্মা অপরিগ্‌গহো বা তি) ?"

"না গৌতম, নাই।"

"ব্রহ্ম সবৈরচিত্ত না অবৈরচিত্ত ?"

"ব্রহ্ম অবৈরচিত্ত।"

"ব্রহ্ম সব্যাবাধচিত্ত না অব্যাবাধচিত্ত ?"

"ব্রহ্ম অব্যাবাধচিত্ত।"

"ব্রহ্ম সংক্লিষ্টচিত্ত না অসংক্লিষ্টচিত্ত ?"

"ব্রহ্ম অসংক্লিষ্টচিত্ত।"

"ব্রহ্ম বশবর্ত্তী না অবশবর্ত্তী ?"

"ব্রহ্ম বশবর্ত্তী।"

"আচ্ছা বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয় ? ব্রাহ্মণরা অপরিগ্রহ না সপরিগ্রহ ?"

"গৌতম, ব্রাহ্মণরা সপরিগ্রহ।"

"ব্রাহ্মণরা সবৈরচিত্ত না অবৈরচিত্ত ?"

"সবৈরচিত্ত।"

"ব্রাহ্মণরা সব্যাবাধচিত্ত না অব্যাবাধচিত্ত ?"

"সব্যাবাধচিত্ত।"

"ব্রাহ্মণরা সংক্লিষ্টচিত্ত না অসংক্লিষ্টচিত্ত ?"

"সংক্লিষ্টচিত্ত।"

"ব্রাহ্মণরা বশবর্ত্তী না অবশবর্ত্তী ?"

"অবশবর্ত্তী।"

"বাসিষ্ঠ, তাই যদি হয় তবে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি কোন সাদৃশ্য আছে ?"

"না, নিশ্চয়ই নাই।"

"বাসিষ্ঠ, এই ব্রাহ্মণরা যে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলাভ করিবেন ইহা হইতেই পারে না ! অতএব দেখা গেল যে ব্রাহ্মণরা যখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তখন তাঁহাদের অধোগতি হয়, অধোগতি হইতে বিষাদ উপস্থিত হয়—যদিও এ সময় তাঁহারা মনে ভাবেন যে কোনও সুখকর স্থানে যাইতেছেন ! অতএব দেখা গেল যে ব্রাহ্মণদের ত্রিবিদ্যাকে শুষ্ক মরু (ঈরিণং) বা পথহীন অরণ্য (বিপিনং) বা বিনাশ (ব্যসনং) বলা যাইতে পারে।"

বুদ্ধের কথা শুনিয়া বাসিষ্ঠ বলিল, "গৌতম, শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ব্রহ্মলাভের (ব্রহ্মাসহব্যতায়) মার্গ জানেন ?"

"বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয় ? মনসাকট এখান হইতে কাছে না দূরে ?"

"গৌতম, মনসাকট কাছেই, দূরে নয়।"

"বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয় ? মনসাকট গ্রামে যে জন্মিয়াছে, বড় হইয়াছে এবং কখন সে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই তাহাকে যদি ঐ গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে কি তাহা বলিতে তাহার কোন কষ্ট হয় ?"

"না গৌতম, কোনই কষ্ট হয় না, কারণ গ্রামে যাইবার সব পথই তাহার খুব ভাল জানা আছে।"

"বাসিষ্ঠ, মনসাকট গ্রামে জাত ও বর্দ্ধিত লোকের সেই গ্রামে যাইবার পথ বলিতে বরং কষ্টও যদি হয় কিন্তু তথাগতের পক্ষে ব্রহ্মলাভের বা ব্রহ্মলোকের কথা বলিতে কোন সংশয় বা কষ্ট হয় না, কারণ আমি ব্রহ্মকে জানি, ব্রহ্মলোককে জানি ও তাঁহার লাভের পথও জানি; যে ব্রহ্মলাভ করিয়াছে ও ব্রহ্ম-লোকে উৎপন্ন হইয়াছে ঠিক তাহারই মত করিয়া জানি।" তারপর বুদ্ধ বাসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজকে তাঁহার ধর্ম্ম বুঝাইলেন। (দীঘনিকায়, তেবিজ্জিসুত্ত)।

এইরূপ বহু তর্কবিতর্ক পালিশাস্ত্রে লিখিত আছে। বুদ্ধ তর্কের দ্বারা অন্যের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার নিজের 'ধম্ম' সম্বন্ধে তর্ক ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেককে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার সত্যতা বিচার করিতে বলিতেন। এই জন্য সাধারণের কাছে তাঁহার ধর্ম্ম 'এহি পস্‌সিক' আখ্যা পাইয়াছিল অর্থাৎ যে ধর্ম্মে বলা হয় 'এহি পস্‌স—এস, দেখিয়া যাও'।

বুদ্ধ অনেকবার তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন যে তাহারা যেন বাক্যশরণ না হইয়া যুক্তিশরণ হয়; ব্যক্তি বা শাস্ত্রের বচনে বিশ্বাস না করিয়া যুক্তি ও বিচারের উপর যেন নির্ভর করে। নিজের কথা সম্বন্ধেও তিনি বলিতেন যে তিনি বলি-তেছেন বলিয়াই যে অপরকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নয়, তাঁহার কথাও যেন লোকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করে। (ক্রমশঃ)

বিচিত্র জগৎ

ক্রিষ্টোফার রেন্

তিনশত বৎসরে পূর্ব্বে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত স্থপতি ক্রিষ্টোফার রেন্ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। রেন্ স্থাপত্য-শিল্পে একটি বিশেষ ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এমন এক সময় ছিল যখন ইংলণ্ডে ধনীদিগের অধিকাংশ পল্লীভবন এই ধারায় নির্ম্মিত হইত। ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের বহু সুবিখ্যাত প্রাচীন বাসভবন, গির্জ্জা, সেতু এখনও রেনের প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে।

আগুন লাগিয়া লণ্ডন সহর পুড়িয়া যাওয়ার পরে আবার যখন নতুন সহর গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন বেশীর ভাগ বাড়ীই নির্ম্মিত হইল এই পদ্ধতি অনুসারে। ইংলণ্ডের সে এক গৌরবময় নবযুগ—ক্রিষ্টোফার রেন্ স্থপতি, স্যামুয়েল পেপিস্ ডায়েরী-লেখক, আইজাক্ নিউটন্ টাঁকশালের অধ্যক্ষ ও আইজাক্ ওয়ালটন্ মৎস্য-শিকারী।

ইংলণ্ডের লোকে রেনকে ভালবাসে, রেন্-পদ্ধতির বাড়ীকে ভালবাসে। তাহাদের মনে হয় ইংলণ্ডের এই গৌরবময় অতীত যুগের আত্মা রেন-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত যে-কোন ঘর-বাড়ীর চূণ-সুরকি-ইটের বন্ধনে আজও সজীব আছে—তাহাদের মতে এই ধারা তাহাদের জাতীয় মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। সবুজ পল্লীপ্রান্তরের এক পাশে কিংবা বড়লোকের সুবৃহৎ উদ্যানে গাছপালার আড়ালে রেন্-পদ্ধতির বাড়ী বা গির্জ্জা দেখিলে তাহাদের মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড আজও জীবিত আছে, আজও জাগ্রত আছে। বিলাতে রেন্-সোসাইটি আছে, তাহারা রেনের প্রবর্ত্তিত স্থাপত্য-ধারাকে অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, বই, পুস্তিকা, সাময়িক পত্র, ছবি ইত্যাদি বাহির করে—আর্ণেষ্ট নিউটন্, ডবার, লুটেন্‌স্ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অনেক বিখ্যাত স্থপতি এই সোসাইটির সদস্য ও কর্ম্মকর্ত্তা।

ক্রিষ্টোফার রেন্ সুপণ্ডিত ছিলেন, গণিতশাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন, স্বপ্নপ্রবণ শিল্পী ছিলেন—তিনি ইউরোপের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়া সকল দেশের স্থাপত্য-রীতির চর্চ্চা করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি ইংলণ্ডকে ভুলিয়া যান নাই—ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ইংরেজ। তিনি নিজে ছিলেন দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, উত্তরকালে যদিও বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তিনি যথেষ্ট ধনও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু

দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত যোগ তিনি কখনও হারান নাই।

এই জন্যই তিনি ছিলেন ধনী ও মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর স্থপতি। একদিকে যেমন সেন্টপলের বিরাট গির্জ্জা, গ্রীনুউইচ হাঁসপাতাল, দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো অন্ততঃ পঞ্চাশটি বড় বড়

গু্মব্রিজ পালেস : রেন-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত একটি আদর্শ উদ্যান-বাটিকা : জানালার সার্সি, কোণাকৃতি ছাদ, কার্ণিশ ও চিম্‌নি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, দুইদিকে সামঞ্জস্য রাখিবার রীতি ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগাইবার কৌশলও দ্রষ্টব্য।

গির্জ্জা তাঁহার কীর্ত্তি, অন্যদিকে কত দূর পল্লীপ্রান্তের গ্রাম্য ডাক্তারের ও গ্রাম্য জমিদারের বাসভবন, গ্রাম্য গির্জ্জা প্রভৃতিও তাঁহার মনের স্থিতিস্থাপকত্ব ও সহানুভূতির পরিচায়ক। যেখানে বেশী জমি নাই, বাড়ীর কর্ত্তার হাতে বেশী অর্থ নাই—তিনি সেখানে নাক উঁচুতে উঠাইয়া অবজ্ঞাভরে প্রস্থান করিতেন না—বরং সেই অপ্রচুর উপকরণ ও অস্বাচ্ছল্যের মধ্যেও কি উপায়ে শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিতেন। ক্রিষ্টোফার রেনের এই সহৃদয়তার বহু পরিচয় আছে ইংলণ্ডের পল্লীপ্রান্তে। দেশবাসী এই জন্যই তাঁহাকে ভালবাসিত।

কিন্তু বর্ত্তমানে এক ধরণের বৈদেশিক স্থাপত্য-নীতি আসিয়া ইংলণ্ডের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে—ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে তাহার উদ্ভব, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইটালিতে ভিনোলা, ইংলণ্ডে বার্লিংটন ও ক্যাম্বেল এই ধারার প্রবর্ত্তক। স্থাপত্য-শিল্পে এই নীতি একেবারে অতি আধুনিক, আমাদের দেশেও ইহা আমরা দেখিতে পাইব, আলিপুর অঞ্চলের দু-চারটি নতুন বাড়ী এই ধারায় নির্ম্মিত। সরল রেখার সুসমঞ্জস সমাবেশ এই পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব, ইহার জানালাগুলি একজোড়া দীর্ঘ সমান্তরাল সরল রেখার মধ্যে স্থাপিত—বাতায়ন-রেখা ছাদের কার্ণিসের সঙ্গে সমান্তরাল (ছবি, ৬৮৩ পৃষ্ঠা)। কার্ণিশ গৃহভিত্তি হইতে অনেক উঁচু এবং ছাদ সমতল। ফ্রান্সে কর বুসিয়ে এই ধরণের বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম ইস্পাতের কাঠামো ও কংক্রিটের গাঁথুনি ব্যবহার করেন। সেই হইতে ইট ও চূণ সুরকীর উপাদান সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে।

অনেকের মত, এই পদ্ধতি টিকিবে না। শীতপ্রধান দেশের পক্ষে এ ধরণের বাড়ীর প্রধান অসুবিধা এই যে, সমতল ছাদে শীতের দিনে তুষার জমিবে, নীচু জানালা দিয়া আগষ্ট মাসের সূর্য্যালোক ঘরে ঢুকিবে না—সুতরাং ফ্যাশনের বেলা যাহাই হউক না কেন, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই পদ্ধতির অনেক দোষ।

আর্ণেষ্ট নিউটন প্রমুখ দুই একজন সুবিখ্যাত স্থপতি উপরোক্ত উভয় পদ্ধতির দোষগুলি বর্জ্জন করিয়া মাত্র সুবিধা ও সৌন্দর্য্যের অংশগুলি একত্রিত করিয়া একটি অভিনব ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, (ছবি, ৬৮৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু ইহা এখনও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই।

কলোরাডো নদীপথে সাড়ে সাত শত মাইল

কলোরাডো নদীর নাম বিশ্ববিখ্যাত। যুক্তরাজ্যের উয়োমিং প্রদেশে Wind-river পর্ব্বত এই নদীর উৎপত্তি-স্থল। উটা ও আরিজোনা প্রদেশের জলহীন শুষ্ক মালভূমি ও মরুর মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেক দূর যাইবার পরে

গু্মব্রিজ পালেসেরই অপরাংশ।

ইহা খাড়া দক্ষিণে গিয়া Old Mexico প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে, পরে আবার কিছু বাঁকিয়া কালিফোর্ণিয়া উপসাগরে গিয়া পড়িতেছে। এক হাজার মাইল ধরিয়া এই নদী উচ্চ পাষাণময় তীরভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে

উচ্চভূমি হইতে নিম্নে পড়িতেছে। নৌকায় যাতায়াত করা এই নদীতে এতই বিপজ্জনক যে গত ষোল বৎসরের মধ্যে যতগুলি দল নদী-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল—তন্মধ্যে মাত্র একটি দলের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্থাপত্য-শিল্পের অতি-আধুনিক ধারা—ইস্পাতে ও কংক্রিটে শাদামাঠা করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণের এই পন্থা ইউরোপ হইতে ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কলিকাতার এখানে-ওখানেও এই ধরণের বাড়ী দেখা দিয়াছে।

এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন মিঃ ক্লাইড এডি—ইনি এবং ইঁহার দলের সকলেই তরুণবয়স্ক কলেজের ছাত্র। কি করিয়া একদল অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্র এই বিপদসঙ্কুল দুরূহ নদীটি উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, সে বিবরণ অতীব কৌতুহলোদ্দীপক।

গ্রীন্ রিভার হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি দলটি রওনা হয়। সেখানকার লোক ইহাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয়

রেলপদ্ধতির প্রাচীন ধারা ও অতি-আধুনিক ধারাকে মিলিত করিবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার।

নাই। জুন মাসের শেষে বন্যা আসিয়া নদীর জল বাড়াইবে বটে, কিন্তু বিপদ এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জলের অল্প নীচেই ক্ষুরধার শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিরাজমান, স্রোতের তোড়ে ছুটা পড়িলে দুখানা হইয়া যায়—যদি ডিঙির সঙ্গে ঐ সব নিমজ্জিত শিলাস্তূপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—নৌকা তো খান-খান হইয়া যাইবেই, সেই খরস্রোতে পড়িলে একটি প্রাণীও টিকিবে না। পথের এ সমস্ত বিপদ কাহারও অজানা ছিল না, তবুও এই তরুণদল একটুও দমিল না।

কলোরাডো নদী যুক্তরাজ্যের যে অংশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—তাহার সবটাই অনুর্ব্বর তৃণগুল্মহীন মালভূমি ও বালুময় মরু। এই নদীর দুইতীর একেবারে জনশূন্য, লোক-বসতিহীন, নদী বহিয়া দুশো পাঁচশো মাইল চলিয়া যাও, কোথাও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না, আগুনের ধোঁয়া দেখিবে না, গৃহপালিত কোন জীবজন্তু দেখিবে না। এই নির্জ্জনতা সকলে সহ্য করিতে পারে না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে
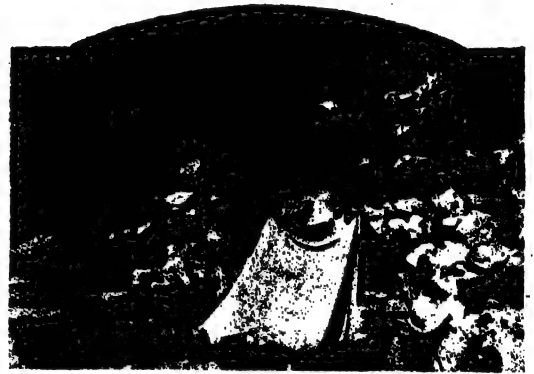
নদীর ধারে এডি-অভিযান-বাহিনীর তাঁবু পড়িয়াছে।

যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী লেফ্টেন্যাণ্ট অইভস্ লিখিয়াছিলেন—"আমার মনে হয় আমাদের পর আর কোনো সভ্যদেশের মানুষ এই বিজন প্রদেশে পর্য্যটন করিতে আসিবে না। এই অঞ্চলকে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতি কোনো চেষ্টারই ত্রুটী করে নাই, প্রকৃতির ইচ্ছা বোধ হয় এই যে, কলোরাডো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে মনুষ্য-কীট কোনো দিন বাসা না বাঁধে।"

গ্রীন্ রিভার ও গ্র্যাণ্ড্ রিভার এই দুটি নদী যেখানে গিয়া মিশিল সেখান হইতেই কলোরাডো নদী প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। এই অংশে একটিমাত্র রেলপথ নদীর উপরে সেতু বাঁধিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে—সভ্য মানুষের কীর্ত্তির এই একটিমাত্র চিহ্ন বাদে এখান হইতে সাড়ে সাতশো মাইলের মধ্যে আর কোনো সেতু, ঘরবাড়ী, বাঁধ, কলকারখানা

গ্রাম বা সহর কোথাও কিছু নাই। খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে না থাকিলে এই জনহীন মরুপ্রদেশে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই।

তটভূমির দুইপার্শ্বে কঠিন গ্রানিট-স্তর, মধ্যে সঙ্কীর্ণ অথচ খরস্রোতা নদী, আশেপাশে কোথাও শস্যাগ্রভাগ দৃষ্ট হয় না, প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার মত কোথাও সামান্য আশ্রয় পর্য্যন্ত নাই।

মিঃ এডি ও তাঁহার দলটির উপরোক্ত দুটি নদীর সঙ্গম-স্থানে পৌঁছিতে লাগিল মাত্র তিন দিন; এই অংশে তত বিপদ নাই, স্রোতও তেমন প্রখর নয়, কাজেই পথের এই ভাগ উত্তীর্ণ হইতে কম সময় লাগিবারই কথা। তাহারি পরই কলোরাডো নদীর সুরু এবং নদীর সে অংশ আবার দুধারের প্রস্তরময় তীর বহিয়া গিয়াছে একটানা একচল্লিশ মাইল। ইহার নাম Cataract Canyon। ভূবিদ্যার ভাষায় এই ধরণের উচ্চ পাষাণময় নদীর পাড়কে Canyon বলে, বাংলায় ইহার কোনো প্রতিশব্দ নাই, সম্ভবতঃ সংস্কৃতেও নাই, কারণ ভারতবর্ষে কোনো নদীরই ভৌগোলিক অবস্থান এমন নহে।

এই Canyon পার হইতে দলটির লাগিয়া গেল সাত আট দিন। গ্রীন্ রিভার হইতে তখন প্রায় দুইশত মাইলের বেশীও আসা হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ পথের মধ্যে কোথাও জনমানবের চিহ্নও মেলে নাই। Cataract Canyon যেখানে শেষ হইয়াছে, একজন বৃদ্ধ সেখানে একা তাঁবু খাটাইয়া অনেকদিন হইতে বাস করিতেছে ও সোনার খনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দুইশত মাইলের পরে এই একমাত্র মানুষের মুখ দেখা গেল—এই প্রথম এবং এই শেষ—পরবর্ত্তী দেড়শো মাইলের মধ্যে আর মনুষ্য-বসতি নাই।

বছর ত্রিশ আগে কলোরাডো নদীতে সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। তখন যুক্তরাজ্যের সকল প্রদেশ হইতে দলে দলে লোক সোনার লোভে আসিয়া জুটিতে লাগিল কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সোনা এত কম পরিমাণে পাওয়া যায় যে তাহাতে মজুরী পোষায় না। বছর পাঁচেক পরে যে যার নিজের দেশে হতাশ মনে ফিরিয়া গেল—কেবল ঐ এক-জন ছাড়া।

এই লোকটি আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই নির্জ্জন প্রদেশে একা জীবন কাটাইতেছে। নদীর ধারেই তার কাঠের কুঁড়ে-ঘর—আশে-পাশে বালুচরে সে দিনরাত সোনার সন্ধানে মাটী খুঁড়িয়া বেড়ায়। এই জনমানবহীন বিজন স্থানে কিসের লোভে সে এতকাল বাস করিতেছে, সেই জানে। অথচ সে যে বিশেষ কোনো ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। পঁচিশ বছর ধরিয়া মানুষে কি করিয়া এই বনবাস স্বেচ্ছায় সহ্য করিতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত।

প্রচণ্ড কলোরাডো নদীর ক্ষণিক বিশ্রাম-স্থল: সমুদ্র-পথে মহাবেগে ছুটিবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের এই শান্তশ্রী: পারে সুমহান্ পর্ব্বত শ্রেণী। ইহাকেই কাটারাক্ট কেনিয়ন্ বলা হয়।

বলাবহুল্য লোকটি বৃদ্ধ হইলেও এখনও খুব কর্ম্মক্ষম ও উদ্যমশীল। ষাট বছর আগে সে Long Islandএর একটি ক্ষুদ্র নগরের রাজপথে তাহার বয়সের অন্য বালকবালিকাদের

সঙ্গে মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইত—কতকাল সে জন্মভূমি দেখে নাই, নিজের আত্মীয়-স্বজন দেখে নাই—কিন্তু সেজন্য তার মনে এতটুকু দুঃখ নাই।

ভগ্নতরী মেরামত করা হইতেছে। এই মেরামত ব্যাপারে চারদিন লাগে। শেষ অবধি মেরামতী নৌকাটি কাজে আসে নাই।

মিঃ এডি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ জায়গা যদি ছেড়ে দাও, তবে আবার কোথায় যাবে? লোকটি বলিল—এখান থেকে যদি কখনো যাই, তবে মেক্সিকোতে যাবার ইচ্ছে আছে। মেক্সিকোতে সোনার অভাব নাই, কিন্তু সবাই কি আর পায়?

এখান হইতে সাড়ে চারশো মাইল একেবারে জনশূন্য। কলোরাডো নদীর এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। দুই তীরের পাথরের পাড় প্রায় এক মাইল উঁচু, এমন ভয়ানক তার খাড়াই যে, নদীতে নৌকা ডুবিয়া গেলে যদি কেহ সাঁতার দিয়া তীরেও ওঠে তবুও এই দুরারোহ পাথরের পাড়ে উঠিবার সাধ্য কাহারও হইবে না—অতএব খাদ্যাভাবে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখানে সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর যে দুপুরবেলা নদীতে জলের ওপর থাকাও দায়। মাঝে মাঝে এই অংশে লোকবসতির ধ্বংসাবশেষ আছে—যারা ত্রিশ বছর আগে সোনার খনির সন্ধানে আসিয়াছিল, তাদেরই ছোট ছোট কাঠের ঘর, এক আধটা মরিচা-পড়া এঞ্জিন, কোদাল কুড়াল ইত্যাদি। পাষাণময় খাড়া পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া বন্য পাহাড়ী ভেড়ার দল নীচের নৌকা ও মানুষগুলাকে দেখিতেছিল, এ দৃশ্য তারা কখনও দেখে নাই—মানুষ তাদের কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত জীব।

কলোরাডো নদীপথে ভ্রমণ করিতে গেলে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অসতর্ক পথিক যে কোনো মুহূর্ত্তে বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। খরস্রোত, চরাবালির চর, নিমজ্জিত শিলাখণ্ড এসব তো আছেই—তা ছাড়া অনেক সময় তেরোশো ফিট্ উঁচু পাষাণতীর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই খসিয়া পড়ে—অনেক জায়গায় এ ধরণের পাথর পড়িয়া নদীর মাঝখানে স্তূপাকার হইয়া আছে—তার দুপাশে এমন খরস্রোত ও দুরন্ত আবর্ত্ত যে, মাঝি নিতান্ত সুনিপুণ না হইলে নৌকা সাম্‌লানো একরূপ অসম্ভব। অনেক দূর হইতে ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে নৌকা গিয়া পাথরের স্তূপে ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া যায়—যত বড় সন্তরণপটুই হোক্ না কেন, এ রকম টানের ও ঘূর্ণাবর্ত্তের মুখে কোনো মানুষই টিকিতে পারে না। তবে নিপুণ ও অভিজ্ঞ মাঝি অনেক দূর হইতেই জলের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সম্মুখের বিপদ বুঝিতে পারে ও পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হয়।

Cataract Canyonএ একবার হঠাৎ নদীর জল বাড়িয়া দলটি বিপন্ন হইয়াছিল। সারাদিন দাঁড় টানার কঠোর পরিশ্রমের পরে সকলে সন্ধ্যার পরে নৌকা বাঁধিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইল এবং নদীর বালুময় তীরে কম্বল বিছাইয়া যে যেখানে পারিল বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িল। অনেক

এডি-অভিযানের একটি বিশ্রাম-স্থান।

রাত্রে একজন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল—তাহার পায়ে জল লাগাতে ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়াছে—নদীর দিকে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, নদীর জল বাড়িয়া তাহার বিছানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং হুহু করিয়া বাড়িতেছে। সে চীৎকার করিয়া সকলকে

জাগাইয়া তুলিল—রাত্রের রান্নার কড়াই, চাটু ইত্যাদি ইতিমধ্যে জলে ভাসিতেছে, জলের তোড়ে নৌকাগুলি সজোরে ডাঙায় আছাড় খাইতেছে, আর একটু বিলম্ব হইলেই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিত। সে রাত্রের মধ্যে নদীর জল বাড়িয়া গেল ১৮ ফিট্—সে বছরে অত বড় বন্যা আর হয় নাই।

রুদ্র সৌন্দর্য্যের একাংশ।

আর একটা অসুবিধা এই যে, কলোরাডো নদীতে ভ্রমণ করিতে গেলে সবটাই নৌকার উপর চড়িয়া যাওয়া চলে না। মাঝে মাঝে নৌকা ও জিনিষপত্র ঘাড়ে করিয়া পথ হাঁটিতে হয়, কারণ অনেক স্থলে নদীর জল উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ এত নিম্নে গিয়া পড়িতেছে যে সে-সব স্থানে কোন মাঝিই নৌকা বাঁচাইতে পারে না। মরুদেশের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ভারী নৌকা ও আসবাবপত্র বহিয়া পথ হাঁটা যে কত আরামের, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। এই পথ একটু-আধটু নয়, অনেক সময় দশ মাইল বারো মাইল পর্য্যন্ত না হাঁটিলে নিরাপদ অংশে পৌঁছানো যায় না। মিঃ এডির দল এ অসুবিধাও অকাতরে সহ্য করিয়াছিল।

সাড়ে সাতশো মাইল দীর্ঘ পথের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়টি স্থানে ভাল পানীয় জল পাওয়া যায়। কলোরাডোর জল অত্যন্ত ঘোলা, পানের অনুপযুক্ত—দু' একটি শাখা নদীর জল ভাল, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষারমিশ্রিত ও বিস্বাদ। গ্যালোওয়ে খালের মুখে পরিষ্কার জলের একটা উনুই আছে—এখানকার জল সুপেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে।

Little Colorado নদী যেখানে আসিয়া কলোরাডো নদীতে মিশিয়াছে, তাহার একটু পরেই Upper Granite Gorge নামে একটি অতীব বিপদসঙ্কুল অংশ অবস্থিত। এখানে দুধারের গ্রানিট্ পাথরের উঁচু পাড়ের মধ্যে নদীর মুখ সঙ্কীর্ণ হইয়া আশী ফিটে দাঁড়াইয়াছে—নদী এখানে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া উন্মত্ত রোষে কঠিন পাষাণতীরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে—স্রোত যেমন প্রখর, আবর্ত্ত তেমনি ভয়ঙ্কর—ইহার উপর আবার এই স্থানেই নদী এক মাইলের মধ্যে ২৫ ফিট্ নামিয়া গিয়া গভীর বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে।

Upper Granite Gorge পার হইয়া অল্পদূরেই জগদ্বিখ্যাত Grand Canyon—ইহার রুদ্র সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই—পৃথিবীর সকল দেশ হইতে পর্য্যটকেরা পথের কষ্ট তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতির এই অদ্ভুত রূপ দেখিতে আসে।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একদিক

আইনষ্টাইনের সেক্রেটারি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া আইনষ্টাইনের পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল। যাহার সহিত যেখানে দেখা হইতেছে, সকলে মিলিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া মারিতেছে—'রিলেটিভিটি' কথার অর্থ কি? তাহার পক্ষে ক্লাবে যাওয়া দূরের কথা পথে বাহির হওয়াই মুস্কিল। এমন কি রাত্রে কোন করিয়া ঘুম হইতে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারখানা কি! আইনষ্টাইন চুপ করিয়া ছিলেন, একটু হাসিয়া জবাব দিলেন—যারা জিগ্যেস করে, তাদের ব'লবেন যে দু ঘণ্টা ধরে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রেও মনে হয়—মাত্র এক মিনিট আলাপ ক'রছি আর এক মিনিটের জন্ত গরম ষ্টোভের উপর বসিয়ে দিলে মনে হয় দু-ঘণ্টা বসে আছি—রিলেটিভিটি হচ্ছে এই।

আইনষ্টাইনকে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—জীবনে উন্নতি করার উৎকৃষ্ট পন্থা কি? আইনষ্টাইনের উত্তর—'ক' যদি উন্নতি হয় তবে ক=অ+আ+ই; অ হচ্ছে কাজ, আ হচ্ছে খেলা। ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—আর ই কি? আইনষ্টাইন উত্তর দিলেন—মুখ বন্ধ রাখা।

খুশ্‌-টিগেরী

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের পুরানো কথা। শুনিলে কাহিনী বলিয়া মনে হইবে। আজকাল যেখানে-সেখানে যখন-তখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কথাই শুনিতে পাই—ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া, চাকুরীর জন্য রেষারেষি, কৌন্সিলে গলাবাজীর আমলের দখল-বেদখলের মন কষাকষি! এই সবের মিটমাট করিতে কত প্যাক্ট, কত সলা, কত সভা। বিরোধ সেকালেও ছিল, কিন্তু সেই বিরোধের মাঝেও দুই একজন হিন্দু ও মুসলমান সাধু কি ভাবে কোন্ পথে মিলনের চেষ্টা করিতেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারও একটা দিগ্‌দর্শন হইবে। মুসলমান বাদশাহ, ওমরাহ, জমিদার প্রভৃতির হিন্দুকে জমি দেওয়ার সনদ্ অনেক দেখিয়াছি, আজ হিন্দু ভূস্বামীর মুসলমান ফকিরকে ভূমিদানের দানপত্র দুই একখানি দেখাইতেছি।

গ্রামের নাম 'খুশ্‌-টিগেরী', অর্থাৎ 'আনন্দ নিকেতন', আনন্দকে যেখানে পাকড়াও করা যায়। কেহ বলে খোশ্‌টিকরী, অর্থ বোধ হয় আনন্দের টুক্‌রা। কেহ কেহ কুশটিকরীও বলে। বলে যে একটা উঁচু জায়গায় কুশের বন ছিল, সেই খানেই গ্রামের পত্তন হওয়ায় গ্রামের নাম কুশটিকরী হইয়াছে। বীরভূমের সদর সিউড়ী হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই গ্রাম। গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই মুসলমান, কয়েক ঘর মাত্র হিন্দু।

শুনিতে পাই, "আরবের (?) অন্তঃপাতী কেরমান সহরের অধিপতি সৈয়দ শাহ বড় খোরদার সাহেব" ইরাণের বাদশাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসেন, এবং তদানীন্তন গৌড়েশ্বর হাবশী বাদশাহের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বড় খোরদার সাহেবের পুত্র হজরৎ সৈয়দ শাহ আবদুল্লাহ ওলিয়াল হোসেনিয়ান কেরমানী। ইনি তখন বালক, পিতার সঙ্গহারা হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। একদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত পরিচয় পাইয়া বালককে বয়সোচিত একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন বালক খাতাঞ্জীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন একজন খিদ্‌মদ্‌গার একটি বহুমূল্য পানপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলায় সম্রাট তাহাকে কোতল করিবার হুকুম দেন। দেখিয়া আবদুল্লা চাকুরীত্যাগের সংকল্প করেন। আবদুল্লার জিম্মায় কতকগুলি সুন্দর মাটীর বাসন ছিল, একজন চাকর হোঁচট খাইয়া তাহার কয়েকটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। কখনও কোন বাগানভোজ ইত্যাদির সময় সম্রাটের হুকুম হইলে ঐ সমস্ত মাটীর বাসনগুলি হাজির করিতে হইত, বাসনগুলি নাকি সম্রাটের ভারি সখের জিনিষ ছিল। একবার এক ভোজে সম্রাট বাসন আনিবার হুকুম দিলেন, আবদুল্লার খুব ভয় হইল, তিনি খোদার কাছে আরজ জানাইলেন, সম্রাট যেন বাসনের কথা ভুলিয়া যান। খোদার মর্জ্জিতে তাহাই হইল। অতঃপর আবদুল্লা চাকুরীতে ইস্তাফা দিলেন। তাঁহার মনে হইল এমনি করিয়া সামান্য কারণে নিজের গরজে যদি খোদাকে দিক করিতে হয়, সে চাকুরীর দরকার নাই।

দিল্লী হইতে আবদুল্লা পাটনার আজিমাবাদ সহরে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। তথা হইতে বাঙ্গলায় পাণ্ডুয়ায় আসেন এবং ফকীর আরজান সাহেবের শাগ্‌রেদী করিতে থাকেন। আরজান সাহেব তাঁহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। একদিন তরকারী না দিয়া অতি অল্প পরিমাণে ভাত দেন, আবদুল্লা কিছু না বলিয়া সেই ভাতকয়টি খাইয়াই খুশীর সঙ্গে কাজ করিতে থাকেন। একদিন এক মেথরকে আবদুল্লার গায়ে ময়লা ঢালিয়া দিতে বলেন, আবদুল্লা কাহাকেও কিছু না বলিয়া জলে গিয়া ময়লা ধুইয়া ফেলেন। আর একদিন একটা ছেলে আরজান সাহেবের কথায় আবদুল্লার মাথার উপর থুতুভরা পিক্‌দানীটা উপুড় করিয়া দেয়। এত সব করিয়াও আরজান যখন আবদুল্লাকে তাড়াইতে এমন কি রাগাইতেও পারিলেন না, তখন বলিলেন "এইবার তুমি কিছু পাইবে।"

আরজান সাহেবের পুত্রের নাম ছিল করিম আবদুল্লা। সেই জন্য আমাদের এই সৈয়দ শাহ আবদুল্লা নিজেকে গোলাম আবদুল্লা বলিতেন। একদিন আরজানের মাংস খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় করিম আবদুল্লাকে তাহা বলেন, এবং করিম নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে শীকার খুঁজিতে যান। দৈবদুর্ব্বিপাকে শীকার

খুঁজিয়া না পাইয়া দিনরাত্রির মধ্যে করিম আস্তানায় ফিরিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে আরজান ডাকিলেন—"আবদুল্লা", সৈয়দ উত্তর দিলেন "গোলাম আবদুল্লা হাজির"! তিনবার ডাকিয়া একই উত্তর পাইয়া আরজান গোলাম আবদুল্লাকে এক মসক পানি আনিয়া দিতে বলিলেন। গোলাম আবদুল্লা জল আনিতে গেলে একটী স্ত্রীলোক জল চাহিলেন। আবদুল্লা জল দিলে সেই জলে স্নান সারিয়া স্ত্রীলোকটি একটি সন্তান প্রসব করিয়া চলিয়া গেলেন। সদ্যপ্রসূত ছেলেটি প্রবীণের মত আবদুল্লাকে স্নেহের সহিত ডাকিয়া শুধাইলেন, "কিছু পাইলে?" আবদুল্লা বলিলেন, "বার বৎসর আছি, কিছুই পাই নাই।" তখন ছেলেটি তাঁহাকে ফকিরী দিলেন; সাধন দিলেন। ছেলেটি পরিচয় দিলেন "আমি খেজের পয়গম্বর,—লোকে বলে দরিয়ার পীর।" আরও বলিলেন, "তোমার পিতা হাবশী বাদশাহের দরবারে চাকুরী করিতেছেন। তিনি (বর্দ্ধমানে) পরগণে মজফর শাহীর মালিক হইয়া আসিবেন। তোমার ভ্রাতা দিল্লীর পশ্চিমে এক জঙ্গলে খোদার নাম জপিতেছেন, তিনি শাহ ফরিদ দফরগঞ্জ হইবেন। তুমি সেনভূমে জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে আনন্দ পাইবে সেইখানে গিয়া বাস কর। সেখানে এক কালী দেবী আছেন। তাঁহাকে মান্য করিও। অন্য ফকির গিয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিলে তিনিই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন। অতঃপর আবদুল্লা আরজান সাহেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে "জায় নামাজ, পাগড়ী, দাঁতন, খড়ম, কোরান শরীফ এবং তসবী (মালা)" দিলেন। বলিলেন, "আমি সন্ধ্যার পর দেহ রাখিব, তুমি হুজরাতে নমাজ পড়িয়া আমাকে দর্শন করিও"। তাহাই হইল, তাহার পর তিনি পদ্মার উপর হাঁটিয়া এ পারে আসেন। এদিকে করিম আবদুল্লা শীকার হইতে ফিরিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া গোলাম আবদুল্লার পিছনে ছুটিলেন। গোলাম আবদুল্লা তখন পদ্মার এপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। করিম আবদুল্লা তাঁহাকে ডাকিলেন, গোলাম আবদুল্লা "পাগড়ী" ফেলিয়া দিলেন, "মুরীদ" করিলেন। তাছাড়া তিনি আরজান সাহেবের একগাছি ছড়ি, পাঁচটি তসবী-দানা এবং একপাটি খড়ম ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার ওপার, আমার এপার"।

শাহ আবদুল্লা প্রথম বড় গ্রাম ফলিয়ালপুরে আসেন। সেখান হইতে মজফর শাহীতে গিয়া পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরিয়া আসিলে বড়গ্রামের লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করায় তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া খুশ-টিগেরীর জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘুরিতে ঘুরিতে এই জঙ্গলে আসিবা মাত্র তাঁহার মন যেন এক অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয় এবং কালীদেবী আসিয়া দর্শন দেন। তখন শাহ আবদুল্লা বুঝিতে পারেন যে "আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে।" কালীদেবী অন্যান্য ফকিরদের তাড়াইয়া দিয়া শাহ আবদুল্লাকে বলেন, "এখানে তুমি আর আমি আমরা দুইজন থাকিব।" শাহ আবদুল্লা আপন আস্তানার দরজায় কালীর স্থান করিয়া দেন। আস্তানার ভিতরে যাইতে হইলে আগে কালীকে মাথা নোয়াইয়া যাইতে হয়। আস্তানার দরওয়াজার চৌকাঠ আজিও "কালীচৌকাঠ" নামে প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের বহু হিন্দু তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহার এক হিন্দু চাকর গঙ্গাস্নানে যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে আস্তানার সম্মুখের একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলেন। স্নান করিয়া উঠিয়া আসিলে লোকে জিজ্ঞাসা করায় সে কাটোয়া সহর ও গঙ্গাঘাটের কথা হুবহু বলিয়া গেল। অথচ সে ইতিপূর্ব্বে একবারও কাটোয়ায় যায় নাই। তদবধি পুষ্করিণীর নাম হইয়াছে "গঙ্গা গড়ে।" শাহ আবদুল্লা কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার দুই পুত্র, এক পুত্রের নাম "আবদুল রসুল", আর এক পুত্রের নাম "শাহ অলিমুল্লা"।

এক ফকীরকে তাঁহার পুত্র সেলাম না করায় ফকীর খুব রাগ করেন। শাহ আবদুল্লা তজ্জন্য ছেলেকে কিল মারিতে থাকেন। চৌদ্দ কিল মারিলে পত্নী তাঁহাকে নিষেধ করেন, তখন শাহ আবদুল্লা বলেন "আমার বংশে চৌদ্দজন বংশধর হইবে।" বর্ত্তমানে এই বংশের চৌদ্দপুরুষ চলিতেছে। ৯০৫ হিজরায় খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৯ সালে হজরৎ সৈয়দ শাহ আবদুল্লা দেহ রক্ষা করেন। সমাধির পূর্ব্বে তিনি বলেন "আমি দেহ রাখিব, এক ফকীর আসিবে। আমার নমাজ তাঁহার দ্বারাই পড়াইবে। এই আস্তানার ভিতরে আমাকে কবর দিও। গোরাচাঁদ ফকির বাহিরে কবর দিবার জন্য জেদ করিবে, তাহার কথা শুনিও না।" নিকটস্থ একটি তেঁতুল

গাছকে লোকে 'দাঁতনকাঠীর গাছ' বলে। শাহ আবতুল্লা, আরজান সাহেবের যে দাঁতন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই পুঁতিয়া দেওয়ায় নাকি ঐরূপ গাছ হইয়াছে। গাছটির চেহারাও সাধারণ গাছের মত নহে।

এই সৈয়দ শাহ আবতুল্লাই খুশটিগেরী জমিদার বংশের আদি পুরুষ। বিবি ফাতেমার গর্ভে আলির ঔরসে যে তিন পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে ইহাঁরা এমাম হোসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে সৈয়দ শাহ হজরৎ মৌলনা মহম্মদ হোসেন এবং তাঁহার পুত্র সৈয়দ শাহ মৌলভী মহম্মদ হাফেজ বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁরা হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহাঁরা আজিও প্রজার হাল বা বকেয়া খাজনার কোনরূপ সুদ গ্রহণ করেন না। ধান দাদন দিয়া তাহার ব্যাজ গ্রহণও এ বংশের রীতিবিরুদ্ধ।

পাণ্ডুয়া হইতে আসিতে কোথায় পদ্মাপার হইতে হয়, কোন্ পথে শাহ আবতুল্লা পদ্মা-পার হইয়াছিলেন জানা যায় না। তিনি যে-সম্রাটের নিকট দিল্লীতে চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা "বহলোল লোদী" বলিয়া মনে করি। ইনি খ্রীঃ ১৪৫১—১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবতুল্লার পিতা যে হাবশী বাদসাহের দরবারে চাকুরী করিতেন, তাঁহার নাম "মালিক আন্দিল হাবশী"। ইনি "সৈফ উদ্দীন ফিরোজশাহ" নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্যগ্রহণের কৌতূহলজনক ইতিহাস স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় খণ্ড" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইলিয়াস-শাহী বংশের শেষ সুলতান জলালউদ্দীন ফতেশাহকে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস বারবগ্ সিংহাসন গ্রহণ করিলে মালিক আন্দিল্ তাহাকে বধ করেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—

"জলালউদ্দীন ফতেশাহের হত্যার তুই অথবা ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত প্রভুহন্তা বারবগ্ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ফতেশাহের পত্নী ও শিশুপুত্র প্রাসাদ হইতে তাড়িত হইয়া গৌড় নগরে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেছিলেন। সিংহাসন অধিকৃত করিয়া ক্রীতদাস বারবগ্ "সুলতান শাহজাদা" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অন্যান্য খোজা ও নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়াছিল। ফতেশাহের মৃত্যুকালে গৌড়রাজ্যের প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাবশী রাজকার্য্যে সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন। বারবগ্ তাঁহাকে বশীভূত না করিতে পারিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মালিক আন্দিল বারবগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফতেশাহের পুত্রকে গৌড়সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। মালিক আন্দিল্‌কে বিনাশ করিবার জন্য বারবগ্ অবশেষে তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে আদেশ করিল। মালিক আন্দিল সসৈন্যে গৌড়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে বারবগ্ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিল না, কিন্তু মালিক আন্দিল কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে বাধ্য হইলেন যে, বারবগ্ যতক্ষণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না।

"একদিন গভীর রাত্রিতে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মালিক আন্দিল্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বারবগ সুরাপানে অচেতন হইয়া সিংহাসনের উপর নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মালিক আন্দিল তখন বারবগ্‌কে স্পর্শ করিলেন না। কিন্তু তুরদৃষ্টবশত মত্ততা-প্রযুক্ত বারবগ্ সিংহাসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল। তখন মালিক আন্দিল তাহাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করিলেন। সে আঘাতে প্রভুহন্তা নিহত হইল না। বারবগ্ মালিক আন্দিলকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর উপবেশন করিল। এই সময়ে তুরুষ্ক জাতীয় য়গ্রশ্ খাঁ ও মালিক আন্দিলের অন্যান্য হাবশী অনুচর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আঘাতে হীনবল হইয়া বারবগ্ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল, এবং এই সময়ে কক্ষের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সে ভূগর্ভস্থিত একটি কক্ষে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিল। মালিক আন্দিল য়গ্রশ খাঁ ও অন্যান্য হাবশীদিগের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাওয়াচী বাশী নামক জনৈক কর্ম্মচারী সেই কক্ষে আসিয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। সে ভূগর্ভস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলে বারবগ্ তাহাকে দেখিয়া মৃতবৎ পতিত রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মিষ্ট কথায় প্রতারিত হইয়া সে তাওয়াচী বাশীকে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া রাজ্যের প্রধানগণকে ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। তাওয়াচী বাশী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া মালিক আন্দিল্‌কে বারবগের কথা জানাইল, তখন তিনি দ্বিতীয়বার

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বারবগকে হত্যা করিলেন।" অতঃপর প্রধান মন্ত্রী খাঁ জহান্, ফতেশাহের বিধবা পত্নী এবং গৌড়-রাজ্যের অপরাপর প্রধানগণ একমত হইয়া মালিক আন্দিলকে সিংহাসনগ্রহণে অনুরোধ করেন। মালিক সৈফ্ উদ্দীন ফিরোজশাহ উপাধিসহ বাঙ্গালার মসনদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই হাব্শী বাদশাহ নামে পরিচিত।

খুশ-টিগেরীর নিকট মঙ্গলডিহি গ্রামে সৈয়াদ শাহ আবদুল্লার সম-সাময়িক এক ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম "পর্ণগোপাল ঠাকুর"। পান বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ঐ নাম; লোকে তাঁহাকে "পানুয়া ঠাকুর" বলিত। পানুয়া ঠাকুর মঙ্গলডিহি ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। ইনি শ্যামচাঁদ ও বলরাম বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও দেবসেবা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই পর্ণগোপালের সঙ্গে সৈয়দ শাহ আবদুল্লার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আজিও লোকের মুখে মুখে তাঁহাদের সম্প্রীতি ও মিত্রাইয়ের নানা রকম গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। পানুয়া ঠাকুর যেমন তদানীন্তন হিন্দু মুসলমান বহু জমিদারের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শাহ আবদুল্লাও জমিদারগণের নিকট হইতে তদপেক্ষা আরও অধিকতর ভূ-সম্পত্তি-আদি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা শাহ আবদুল্লা সাহেবের সময়ের কোন সনন্দ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরবর্ত্তী কালের যে সমস্ত সনন্দের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কয়েকটি শাহ আবদুল্লা সাহেবের দান-প্রাপ্ত ভূমির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর পুনঃ স্বত্ব সাব্যস্তের পাট্টা ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকখানি সনন্দের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নদীয়ার মহারাজার দেওয়া মৌজা আলি-বাজার ও প্রতিহারপুরের সনন্দ পাওয়া যায় নাই। সনন্দের প্রতিলিপির মধ্যে ছেদচিহ্নাদি আমরা যোগ করিয়াছি। বানান প্রায় অবিকল রাখিয়াছি।

[১] পঞ্চকোটাধিপতির দানপত্র—

শ্রীশ্রী ছোট মহারাজা বাহাদুর আজ্ঞা। হজরৎ খোন্দকার সাহেব ওয়ালা কফর আলিসান ফয়েজ রসান শ্রীযুক্ত হজরৎ সৈয়দ সাহ মৌলানা আল্লা হাফেজ সাহেব মদ্দ জোল্ল স্বামী। আপনি নিবেদন করিলেন যে আপনার মৌরসান আমার মৌরসানকে পঞ্চকোটী চাকলার মৌজে ঘুসরা ও মৌজে রাণীপুর এই দুই গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। আমার কুলে যে ব্যক্তি গদীতে প্রধান হইয়া শ্রীশ্রীকে চেরাগবতী অর্পণে ও খানকা খরচ দেওনে প্রবর্ত্ত থাকেন, ঐ মৌজা তাহারই ভোগ দখল হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমি গদ্দীনসীন হইয়া পূর্ব্বাপরের রীতিমত উল্লিখিত বিষয়ে প্রবর্ত্ত আছি। প্রার্থনা যে আপনার মৌরসানের দত্ত উক্ত মৌজাদ্বয়ে দখলীকার থাকিয়া সাজ্জাদানসীনিতে শ্রীশ্রীকে চেরাগবতী অর্পণ করিয়া খানকা খরচ দিয়া আপনাকে দোয়া গোর্দ্দি করিতে থাকি। অতএব আপনার প্রার্থনা অনুযায়ী হুকুম সনন্দ দেওয়া যাইতেছে যে আপনার কুলে উক্ত গদীতে যে যখন প্রবর্ত্ত হইয়া সাজ্জাদান-সীতিতে কায়েম থাকিয়া শ্রীশ্রীতে চেরাগবতী অর্পণ ও খানকা খরচ দিতে থাকিবেন, আমার মৌরসানের প্রদত্ত মৌজাদ্বয় তাঁহারই শাসনে থকিবে। ইতি সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৬ পৌষ।

[১১৭৮ সালের চাকলে পাককোটীর ফিরিস্তী হইতে এই নকল দেওয়া গেল। ৺এরাত খোনকার সাহেব, পরগণে চৌরাশী মোং রাণীপুর]

[২] বিষ্ণুপুরাধিপতির দানপত্র—

শ্রীশ্রীহরি

শ্রীযুক্ত সৈয়দ শাহ হুসেন আলী হজরৎ সাহেব সত চরিত্রেষু

[পার্শী ○ মোহর] রাজা জয় গোপাল সিংহ ৺পীরত্তর সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে মোতালকে পরগণে বিষ্ণুপুর ও গয়রহ তরফ তালসাগর মহল খানাবাড়ী সামীল মৌজে রাধা-দামোদরপুর মধ্যে জনকপুরের জঙ্গল। চতুঃসীমা—সুবল হালদারের জমার জমির উত্তর মৌজে কাকিটার হাসিল জমির পশ্চিম বেচারাম দালারের জমার জমির পূর্ব্ব বীরমিহা হইতে পাত্রসায়র যাইবার রাস্তার দক্ষিণ এই চতুঃসীমা মধ্যে উত্তর × × জমা খারিজ জঙ্গল পতিত জমি ১২৫/ এক শত পঁচিশ বিঘা আপনকাকে সাহাবদুল্লা ওলি কেরমানীর ফাতিহা × × দেওয়া গেল। জমি তরদুদাবাদ করিয়া ও সেবা করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিবেন। সন ১১২৪।১১ই মাঘ

[৩] বর্দ্ধমানাধিপতির দানপত্র—

৺শ্রীশ্রীহরি শ্রীরাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুর পরগণে

চম্পানগরী তহশীল বৃদ্ধপাল মৌজে কাশীপুর, ও গয়রহ মথত্রম কর্ম্মচারী সুচরিতেষু—

লিখিতং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীশ্রী৺খোসটিকুরীর সাহেবের চেরাগী জমি মৌজা হায়ে যে আছে সন ১১৪৮ সালের পর নাগাইত সন ১১৬৭ সাল দস্তখতে খাস দস্তখতে দেওয়ান সদর জমাবন্দী বাহাল মবলুক হস্তবুদে জমা জমি যে হইয়াছে এই সকল জমি বাহাল হইয়া ৺ইহার হুকুমনামা পূর্ব্বে পাইয়াছে। ভোগ পরিমাণ জমির ফসল ছাড়িয়া দিবে ইতি—সন ১১৭২ সাল তারিখ ২৮ মাঘ

(নিং শ্রীরাজা তিলোক)

[৫] রাজনগর-রাজের সনন্দ—

(ক) পার্শী ○ মোহর রাজা মহম্মদ তকি খাঁ
রাজনগর

সাহা আবদুল্লা সাহেবের দরগাহার হিঙ্গন সাহা শ্রীঅভয়াচরণ বাড়ুজ্যা সিকদার সুচরিতেষু

আগে তরফ ×× সাহেব তোমার এতমাম পরগণে জৈমুজাল দরুণ মৌজে শিরসা ও মৌজে পলাশী মৌজে সুলতানপুর ও মৌজে খুষ্টীকুড়ীতে বাগাত ও পুষ্করিণী শ্রী৺ উহাতে নজর পান। ×× আটক হইয়াছিল, পুনহ বাহাল করা গেল। বদস্তর সাবিক লেখ মাফিক লেখ দিবা। তাহার বিতং

মাফিক জমিদারের সনন্দ ১১৫৭ সাল ২৩ কার্ত্তিক

বাগাত ১৮০/ বিঘা
নিজ খোষ্টীকুরী পুষ্করিণী ৭/ বিঘা
মৌজে সীরশা ৬০/ বিঘা
মৌজে পলাশী ৫০/ বিঘা
মৌজে সুলতানপুর ৭০/ বিঘা

সন ১১৬৭ সাল ২৭ মাঘ

(খ) রাজা মহম্মদ তকি খাঁ
রাজনগর

শ্রীঅভয়াচরণ বাড়ুজ্যা শিকদার সুচরিতেষু

আগে নিজ খুষ্টীকুরী ৺চেরাগী ও গয়রহ সাবিক যে সুরতে আছে এখন তা খুষ্টীকুরী সাবিক মালগুজারী মামুলী বাহাল রাখিল। তোমরা সাবিক দস্তর খাজনা সমঝা লইবা। বেজায় তলব না করিবে। ইতি সন ১১৬৭। ২রা ফাল্গুন

[৬] ছাতনারাজের দানপত্র

সস্তি সামন্তাবনীনাথ রাজা শ্রীবলরাম নারায়ণ দেব মহোগ্রপ্রতাপানাং

শ্রীযুক্ত সাহুসেন আলি সাহেব স্বচরিত্রেষু

ছাড়ি সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে ছাতনা আমার জমিদারী মধ্যে মৌজে দুবসরা আপনকার সাবেক পিরত্তর আটক হইয়াছিল। আপনার তরফ লোকের যাহেরে ও তসদিগাতে জানা গেল যে মৌজা মজকুর আপনকার সাহেব পিরত্ত। অতএব ছাড় সনন্দ দিলাম যে মাফিক সুদামত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন আমাকে দোয়া করিয়া সেই মাফিক ভোগ দখল করিবেন। ইহাতে পঞ্চম ১৲ টাকা আছে তাহা সন সন দিবেন। এতদার্থে ছাড় সনন্দ দিলাম। ইতি সন ১২২৬।২৮ জৈষ্ঠ্য।

বিবাহ আদি শুভকার্য্যে, অথবা কোন স্থানে পুত্রকন্যাদের কিম্বা নিজেদের যাতায়াতে ইহাঁরা যেমন মৌলভীদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তেমনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদেরও পরামর্শ লইতেন। এই কার্য্যের জন্য সেকালের কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহাঁদের দেওয়া লাখরাজ ভোগ করিতেন, অথবা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। উৎসবাদিতে ইহাঁরা যেমন মঙ্গলডিহি ঠাকুর বাড়ীতে "সিধা" পাঠাইতেন, তেমনি ঠাকুরবাড়ীর প্রেরিত উপহারাদিও ইহাঁরা সাদরে গ্রহণ করিতেন। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানগণ পরস্পরে যাহাতে প্রীতিতে বাস করিতে পারে খুশ্‌-টিগেরীর জমিদার-বংশ তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। আজিকার দিনেও সেখানে কাঠমোল্লার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর-কথা

—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল ফরাসী চন্দননগরে গিয়া বাস করেন। বার্দ্ধক্যে অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিকিৎসাতে যখন তিনি কোন উপকার পাইলেন না, তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শে, তিনি কলিকাতার বাহিরে গঙ্গার উপর কোন বাড়ীতে বাস করিয়া কিছু উপকার হয় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পের ফলেই তাঁহার চন্দননগরে গমন।

চন্দননগরে ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর একবার গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তখন তিনি যৌবন অতিক্রম করেন নাই, বোধহয় তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। শুনিয়াছি, সেই সময় একজন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর স্থানীয় কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর অত্যাচার দর্শনে ব্যথিত হইয়া সেই নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নিকট অভিযোগ করেন এবং সেই অত্যাচারপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারীর যথোচিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করি নাই কারণ আমার জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াছিল, আমি আমার পিতার নিকট এই ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় বার—অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন চন্দননগরে গিয়া বাস করেন, তখন আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার নিকট যাইতাম। সেই সময় আমি তাঁহার স্বমুখে যে সকল কথা শুনিয়াছি এবং তাঁহার যে সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছি, আজ তাহারই আলোচনা করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগরে গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ডের দক্ষিণে দুইটি পাশাপাশি বাড়ী ভাড়া লইয়ছিলেন। ঐ দুইটি বাড়ীর মধ্যে একটি এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ বাড়ীর নিম্নতল গঙ্গার গর্ভে নির্ম্মিত, উহার ছাদ ষ্ট্রাণ্ডের ফুটপাথের সংলগ্ন এক সমতলে অবস্থিত। বর্ষাকালে সেই বাড়ীর নিম্নতলের কক্ষগুলির মধ্যে জল প্রবেশ করে। উহার দ্বিতলের কক্ষগুলি দূর হইতে দেখিলে একতলা বাড়ী বলিয়া মনে হয়। ঐ বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুরমহিলারা বাস করিতেন। উহার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সেই বাড়ীতে বাস করিতেন এবং আগন্তুক অভ্যাগতগণ সেইখানে গিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই দ্বিতীয় অট্টালিকাখানি এখন আর নাই। তাঁহার এই বাসাবাড়ীর সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, কারণ, যদি কেহ আমার এই নিবন্ধ পাঠ করিয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের বাসাবাড়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চন্দননগর গমনের তিন চারি দিন পরে একদিন আমার পিতা আমাকে বলিলেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, কাল ষ্ট্রাণ্ডে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। আজ বৈকালে তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।" পিতার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইল, তাহা এতদিন পরে প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহার বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়িয়া আমার বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে, যাঁহার বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী, সীতার বনবাস পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, যাঁহার ব্যাকরণ-কৌমুদী ও ঋজুপাঠ প্রভৃতি পাঠ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছি, যিনি বিধবা-বিবাহের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই পুরুষসিংহকে আজ দেখিতে যাইব, এই আনন্দে আমি বিভোর হইলাম।

বৈকালে বাবার সঙ্গে বিদ্যাসাগর দর্শনে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিলনা। ফটক পার হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, খর্ব্বাকৃতি, অনাবৃতদেহ এক ব্রাহ্মণ একটা হুঁকা হাতে করিয়া বাড়ীর একটা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাবা মৃদুস্বরে বলিলেন—"উনিই

বিদ্যাসাগর।” আমি বাবার কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। আমার ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইলেও যখন এক সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আকৃতিতে একজন হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি হইবেন। শৈশবকাল হইতে বহুবার স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়াছি, তিনিও একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান এবং স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যই আমার ধারণা হইয়াছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, ভূদেব বাবুর মত একজন, গৌরবর্ণ না হইলেও হয়ত তাঁহারই মত দীর্ঘাকৃতি, গম্ভীরপ্রকৃতি, রাসভারি লোক হইবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া আমার সে ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। যখন তাঁহার সম্মুখে গিয়া ভাল করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলাম, তখন সহসা আমার মনে হইল, আমাদের বাড়ীতে যে উৎকলবাসী ক্ষেতা মালী আছে, তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেন অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইনিই সেই ভারতবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!

আমার পিতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে আমিও তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিলাম। আমরা দণ্ডায়মান হইলে তিনি আমার পিতাকে বলিলেন—“ইন্দ্রকুমার, এইটি বুঝি তোমার বড় ছেলে?” পরে আমাকে বলিলেন—“তোর নাম কি?” তিনি আমাকে “তুই” বলিয়া সম্বোধন করাতে আমি বিস্মিত হইলাম, কারণ, বাড়ীতে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন ব্যতীত আমাকে কেহই “তুই” বলিয়া সম্বোধন করিত না। সুতরাং প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে ঐরূপ সম্বোধন করাতে যে আমি বিস্ময় বোধ করিব তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

বাগানের পূর্ব্ব প্রান্তে, রেলিংএর ধারে একখানা চেয়ার ছিল, বুঝিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেইখানে উপবেশন করিবেন বলিয়াই তথায় চেয়ার আনীত হইয়াছিল। তিনি একজন ভৃত্যকে আরও দুইখানা চেয়ার আনিতে বলিয়া বাবাকে বলিলেন—“আজ বড় মেঘ করেছে বলে আর গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম না, এস এই খানে বসেই কথাবার্ত্তা কওয়া যাক।” চেয়ার আনীত হইলে আমরা তিন জনেই উপবেশন করিলাম। তিনি কথা কহিতে কহিতে বাবার হাতে হুঁকাটি দিলে বাবা সসম্ভ্রমে উহা লইয়া একটা গাছের গোড়ায় রাখিয়া দিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—“ওকি, তুমি তামাক খাও না? তবে ত তোমার হাতে হুঁকা দিয়ে ভাল কাজ করিনি। তুমি কি তামাক খাও না?” বাবা তামাক খাইতেন, কিন্তু কুণ্ঠাবশতঃ তাঁহার সম্মুখে সে কথা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—“এই গ্যাখ, তুমিও আবার জ্যাঠামি আরম্ভ করলে? তামাক খাও কি না, এক কথায় তার উত্তর দিতে পারনা?” তখন পিতা অগত্যা নত মস্তকে বলিলেন—“আজ্ঞে খাই, কিন্তু আপনার সুমুখে—” বাধা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন “কেন আমার সুমুখে খেতে দোষটা কি? আমি কি তোমাকে মারব? তামাক খাওয়াটা যদি অন্যায় বা দুষ্কার্য্য বলে মনে কর, তা’হলে তামাক খেওনা, আর যদি মনে কর যে ওটা অন্যায় কাজ নয়, তাহ’লে আমার সুমুখে তামাক খাবেনা কেন? নাও হুঁকো তুলে নিয়ে তামাক খাও। তুমি খাবে বলেই আমি তোমার হাতে হুঁকো দিয়েছিলাম। ঐ যে আমাদের সমাজে কেমন ন্যাকামি আর ভণ্ডামি ঢুকেছে ওসব আমি দু’চক্ষে দেখ্‌তে পারিনা।” আমার পিতা অগত্যা হুঁকা লইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা অতীত হইবার পর দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহা দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—“ওরে, চৌকীগুল তুলে রাখ, বৃষ্টি পড়ছে। চল ইন্দ্রকুমার আমরা ভিতরে গিয়ে বসিগে।”

আমরা তাঁহার সহিত উপরে গেলাম। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি ত’ বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। এ কি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বসিবার ঘর, না কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের ড্রয়িং-রুম? প্রকাণ্ড হল, তিন দিকে দেওয়ালের গায়ে পুস্তক-পরিপূর্ণ সারি সারি আলমারি। সকল পুস্তকই অতি সুন্দর বাঁধান, চকচক্ করিতেছে। হলের ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিল, উহার চারিদিকে অনেকগুলি চেয়ার। উত্তর দিকের প্রাচীরগাত্রে একখানি ছোট খাট বিছানা পাতা, সেইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় শয়ন করেন। পশ্চিমের দেওয়ালে আলমারির উপরে পাশাপাশি দুইখানি তৈলচিত্র। পরে শুনিয়াছিলাম, একখানি তাঁহার জননীর ও আর একখানি তাঁহার জনকের প্রতিকৃতি। আমাদের প্রতিবেশী এক

ভদ্রলোক সেই চিত্র দুইখানি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ঐ ছবি দুইখানি কাহার? তাঁহার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্নিমেষ নয়নে সেই ছবি দুইটির প্রতি চাহিয়া অতি সুন্দর স্বরে বলিয়াছিলেন—"আমার দেবতার—বাবার আর মায়ের ছবি।" দেখিলাম তাঁহার নেত্র বাষ্পভারাক্রান্ত। বহুকাল পূর্ব্বে মৃত পিতামাতার চিত্র দেখিয়া বৃদ্ধকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির এরূপ নিদর্শন আর কখনও দেখি নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহসজ্জার কথা বলিতেছিলাম। সেই হলের মধ্যে চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাট প্রভৃতি যে সকল আসবাব ছিল, তাহা এতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল যে দেখিলে মনে হইত উহা সংপ্রতি ক্রয় করা হইয়াছে, এখনও ব্যবহার করা হয় নাই। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালীর বাড়ীতে চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ বা ঘাড়িতে ময়লা জমিয়া থাকে। কারণ অনেক সময় আমরা অনাবৃত শরীরে চেয়ারে হেলান দিয়া বসি, সেই জন্য আমাদের তেল ঘাম এবং ময়লা চেয়ারে লাগিয়া চেয়ারের বার্ণিশকে মলিন ও বিবর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেয়ারে প্রত্যহ উপবেশন করিতেন সেই চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে কোথাও একটু ময়লা ছিল না, অথচ তিনি শীতকাল ব্যতীত সকল ঋতুতেই অনাবৃত শরীরে থাকিতেন, এবং প্রত্যহ যথেষ্ট তৈল মাখিয়া স্নান করিতেন। আমি একদিন বালসুলভ চপলতাবশতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহার চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ ওরূপ পরিষ্কার আছে কিরূপে? আমার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিবেন—"আমি কখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসিনে তা চেয়ারে ময়লা লাগবে কেমন করে? তুই ত' এতদিন আস্‌ছিস্, আমাকে কখনও হেলান দিয়ে বস্‌তে দেখিস্ কি? হেলান দিয়ে বসলে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, লোক আয়েসী হয়ে পড়ে। ক্ষানিকক্ষণ হেলান দিয়ে বসলেই ইচ্ছা হয় টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিই। আমি ঠিক সোজা হয়ে বসি, কখন হেলান দিই না বা সামনে ঝুঁকে বসিনা।"

প্রথম সাক্ষাতের দিন, আমরা সেই হলে বসিয়া আছি, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কথা কহিতে কহিতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই খাটের নিকটে গিয়া মেঝেতে উবু হইয়া বসিলেন। দেখিলাম তিনি খাটের নীচ হইতে দুইখানা রেকাবি ও দুইটা গেলাস বাহির করিয়া একখানা তোয়ালে দ্বারা একবার মুছিয়া লইলেন, তাহার পর একটা হাঁড়ি হইতে কিছু মিষ্টান্ন বাহির করিয়া সেই রেকাবিতে রাখিলেন এবং একটা কুঁজা হইতে গেলাস দুইটাতে জল ঢালিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া সহাস্যে বলিলেন —"একটু মিষ্ট মুখ কর।"

আমরা জলযোগে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আবার সেই খাটের নিকটে গিয়া তলা হইতে একটা পানের বাটা বাহির করিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। দেখিলাম বাটার মধ্যে অনেকগুলি পান রহিয়াছে; তিনি একটা কাঠি লইয়া পানে চুন লাগাইয়া তাহাতে একটু খয়ের ও সুপারি দিয়া খিলি মুড়িয়া আমাদের হাতে দিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"আমার পান সাজা দেখে হাসি পাচ্ছে? আমি যে মেদিনীপুর জেলার উড়ে বামুন। দেখ নাই উড়েরা কোমরে একটা থলির ভিতর পান, চুন খয়ের সুপারি সব রেখে দেয়, আর কথা কইতে কইতে সেই পান সেজে খায় আর জাতভাইকে খাওয়ায়? আমিও উড়ে কিনা, তাই নিজের হাতে পান সেজে লোককে খাওয়াই।" তাঁহার এইরূপ স্বহস্তে জলখাবার সাজাইয়া দেওয়া ও পান সাজিয়া দেওয়া আমি প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে দুইটা বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা শ্বেতাঙ্গ পল্লীতে অবস্থিত বলিয়া সাধারণতঃ ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরাই সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেন, সেজন্য সেই বাড়ীতে বাঙ্গালীর উপযোগী পায়খানা ছিল না, সাহেবদের ব্যবহার্য্য "বাথরুম" ছিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে বাথরুমে কমোড ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। সেই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসাবাড়ীতে দেশীয় ধরণে পায়খানা নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিয়া আমাকে একদিন বলিলেন—"ওরে যোগীন, তোদের দেশে এসে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমাকে যে একটা পায়খানা তৈরী করাতে হ'বে। রাজমিস্ত্রি কোথায় থাকে, আমি ত' জানিনে, আমার কাছে একজন মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দিতে পারিস্?"

আমাদের বাড়ীতে সেই সময় একজন মিস্ত্রি কাজ করিতেছিল, সেইজন্য আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, পরদিন সকালেই

আমি মিস্ত্রিকে সঙ্গে করিয়া আনিব। পরদিন প্রাতে মিস্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিলে তিনি মিস্ত্রিকে সেই দিনই কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন এবং আমাকে ইট, চুন, সুরকি, বালি প্রভৃতি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আমি সেই দিনই চুন সুরকি পাঠাইয়া দিলাম এবং পরদিন ইট আসিবে জানাইলাম।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি যখনই তাঁহার কাছে যাইতাম, তখনই গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতাম এবং আসিবার সময়েও ঐরূপ প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতাম। চুন সুরকি পাঠাইয়া দিব বলিয়া আমি চলিয়া আসিবার পাঁচ সাত মিনিট পরে তাঁহার একজন ভৃত্য দ্রুত গতিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা আপনাকে একবার ডাকছেন।" আমি তাহার কথা শুনিয়া পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমি তাঁহার আবাসে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"ওরে একজন ছুতোর মিস্ত্রিও চাই যে, পায়খানার কপাট তৈয়ারী কর্ত্তে হবে, তা'ছাড়া আমার ছোট খাট দুই একটা মেরামতের কাজও কর্ত্তে হবে। ফরাসডাঙ্গায় এসে তোকেই আমি মুরুব্বি ধরেছি, তুই না থাকলে যে, আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত বলতে পারি না।"

আমাদেরই একজন সূত্রধর প্রজা ছিল, সে ল্যাজরাস কোন্নগর কারখানার একজন বড় মিস্ত্রি ছিল; আমি সেই দিন বৈকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিব বলিয়া বিদায়সূচক যেমন তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য নতমস্তক হইয়াছি, অমনি তিনি সহসা দুই তিন হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হা দেখ, মিন্সে যে আমাকে দেখ্-মার কর্ত্তে আরম্ভ করলে। তুই যতবার আমার কাছে আস্‌বি, ততবারই আমার পায়ে মাথা খুঁড়বি? তাহ'লে তোকে আর আমার কাছে আস্‌তে হবে না। আমি তোকে ঘরের ছেলে ক'রে তুল্‌ছি, আর তুই এই বুড়কে ঠেলে তফাৎ ক'রে দিচ্ছিস্? রোজ রোজ কি ওরকম নৌকতা ভাল দেখায়?"

বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগরে আসিয়া বাস করিতেছেন এবং আমি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাই এই কথা অল্প দিনের মধ্যেই আমার বন্ধু-বান্ধব ও সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য আমাকে আসিয়া সুপারিস ধরিতেন। সুতরাং প্রায় প্রত্যহই একজন বা দুইজন বন্ধু আমার সঙ্গে তাঁহার বাসাতে যাইতেন। তিনি প্রত্যহই সকলকে স্বহস্তে জলখাবার দিতেন ও পান সাজিয়া খাওয়াইতেন। চারি পাঁচ দিন পরে আমি এক দিন বৈকালে দুইটি বন্ধু সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কিরে তুই জলখাবারের লোভে রোজই নূতন নূতন বন্ধু আমদানি কর্ত্তে আরম্ভ কল্লি নাকি?" এই বলিয়া আমার বন্ধুদের পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি উঠিয়া বলিলেন—"তোরা এসেছিস একটু মিষ্টি মুখ করে যা। নইলে বলবি বামুন জাত কেবল খেতেই জানে, খাওয়াতে জানে না।" এই বলিয়া তিনি তিন খানি রেকাবিতে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া আমাদের তিন জনের সম্মুখে রাখিলেন। আমার সম্মুখে মিষ্টান্ন রাখিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি আজ অনেক বেলাতে ভাত খেয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।"

আমার কথা শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন—"ওঃ সেই খাবার লোভে বলেছিলেম বলে রাগ হ'ল নাকি? নে আর রাগ কর্ত্তে হবে না।" সুতরাং আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই মিষ্টান্নগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় চন্দননগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় আমার প্রতিবেশী ও সতীর্থ রায় সাহেব ৺ভোলানাথ দে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেই জন্য তাঁহার সর্ব্বদা বাড়ীতে আসা ঘটিত না। সরস্বতী পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আজ যখন বিদ্যাসাগরের কাছে যাবে তখন আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তাঁকে কখন দেখি নাই, আজ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

বৈকালে আমরা দুই বন্ধুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসাতে গমন করিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন—"তোর আর একটি বন্ধু নাকি? একে ত' এতু দিন দেখি নাই।" আমার বন্ধু বলিলেন—"আমি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ি, সেইখানেই থাকতে হয়। কাল

সরস্বতী পূজার ছুটিতে বাড়ীতে এসেছি। আর যোগীনের সঙ্গে আপনার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"হাঁ, আমার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছিস? তা' দেখ, আমার চরণ দর্শন করেই বাড়ী যা।" এই বলিয়াই তাঁহার সেই সর্ব্বজন-পূজ্য চরণযুগল তুলিয়া আমার বন্ধুর মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"যা, এইবার বাড়ী চলে যা। চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছিলি, তা'ত হল তবে আর কি?···এই সব জ্যাঠামিগুলো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। সোজা কথা বল্লেইত হ'ত যে, বুড় তোমার প্রথমভাগ বর্ণ-পরিচয় থেকে আরম্ভ করে কথামালা, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী পর্য্যন্ত পড়েছি, কিন্তু তোমাকে কখনও চোখে দেখিনি। তুমি এখানে এসেছ শুনে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি। এই ত' সোজা কথা, তা নয়, তোমার চরণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি। সব তাতেই জ্যাঠামি।"

তিনি আমাকে প্রথম দিনে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাতে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে তাঁহার মুখে এই 'তুই' শব্দ যেরূপ মিষ্ট লাগে, 'তুমি' শব্দ সেরূপ মিষ্ট লাগে না। অবশ্য অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোকদিগকে তিনি 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। নিজের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণতঃ তিনি কাহাকেও 'আপনি' সম্বোধন করিতেন না। এই ব্যাপার লইয়া এক দিন বেশ রঙ্গ হইয়াছিল। আমাদের প্রতিবেশী ৺গঙ্গাধর সরকার নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমাদের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। তিনি আমার পিতার অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড় ছিলেন। অকালবার্দ্ধক্যে তাঁহার চুল, গোঁফ, দাড়ী সমস্তই শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় হইলেও সরকার মহাশয়কেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই ভ্রম হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি সরকার মহাশয়কে সম্ভ্রমসূচক 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সরকার মহাশয় আমার পিতার সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর আবাসে গমন করিতেন, ফলে অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি হইয়াছিল।

এক দিন আমার পিতা, সরকার মহাশয় এবং আরও তিন চারিজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। সকলে গঙ্গার ধারে, বাগানে গাছতলায় চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া সুরেশের সঙ্গে কথা কহিতে ছিলাম। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—"গতিক ভাল নয়, চলুন ঘরের ভিতর গিয়ে বসা যাক।" এই বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকার মহাশয়কে অগ্রগামী হইতে বলিলে তিনি বলিলেন—"সে কি কথা? আপনি আগে চলুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"আপনি বয়সে বড় আপনি আগে চলুন।" সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি আপনার চেয়ে বোধ হয় বয়সে বড় নই, আপনিই বয়সে বড়।" তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন—"আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়? আপনার বয়স কত?" সরকার মহাশয় বলিলেন—"আমার বয়স উনসত্তর।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলে—"ওঃ তবে ত' তুমি আমার কোলের ছেলে হে, আমার বয়স একাত্তর।"

চন্দননগরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। আমার পিতাকে একদিন তিনি বলিলেন—"ইন্দ্রকুমার, তোমরা বাপবেটায় ত প্রায় রোজ আমাদের বাড়ীতে আসছ, কিন্তু আমাকে ত একদিনও তোমার বাড়ীতে নিয়ে গেলে না?"

বাবা বলিলেন—"আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে?" তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ; তুমি আমার কাছে আসবে, আমি তোমার কাছে যাব, এতে আর সৌভাগ্য অসৌভাগ্য কি আছে? আমি কাল তোমার ওখানে যাব।"

পরদিন অপরাহ্নকালে আমার পিতা গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিলেন। আমাদের প্রতিবেশী কয়েকজন ভদ্রলোককে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা যথা সময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৈঠকখানাতে ঢালা বিছানা পাতা ছিল,

সেই বিছানার ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য একখানা গালিচার আসন ও দুইটা তাকিয়া রাখা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও হইতে প্রকাশিত বঙ্গের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি কিনিয়া বৈঠকখানায় সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ছবি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র অভ্যাগতগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"আমি কি বিয়ে কর্ত্তে আসছি নাকি যে, আমার জন্য বরাসন পেতে রেখেছ?" এই বলিয়া তিনি বৈঠকখানার এক কোণে গিয়া উপবেশন করিলেন। একজন ভদ্রলোক একটা তাকিয়া লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলে তিনি বলিলেন—"তাকিয়া কি হবে? আমি ত' কখন হেলান দিয়ে বসি না।" সেদিন তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, এই আড়াই ঘণ্টা তিনি ঠিক এক ভাবেই বসিয়াছিলেন, একবারও দেয়ালে বা কোন পার্শ্বে হেলান দেন নাই। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি তাঁহার নয়নপথে পড়িবা মাত্র তিনি বলিলেন —"এই যে, আমাকেও এনে হাজির করেছ।"

আগন্তুকগণের মধ্যে এক ভদ্রলোকের একটি বালবিধবা কন্যা ছিল। নয় বৎসর বয়সে সেই হতভাগিনীর বিবাহ হয়, এগার বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন আমাদের বাড়ীতে যান তখন সেই মেয়েটির বয়স তের বৎসর। আমার পিতার মুখে এই দুর্ভাগিনীর কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পিতাকে বলিলেন—"তোমার মেয়ের আবার বিয়ে দাও।" তিনি বলিলেন—"আমি ত' বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের সমাজে যে কেহ বিধবা বিবাহ কর্ত্তে চায় না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সজল নয়নে বলিলেন "তবে চুলয় যাও।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। সমবেত ভদ্রলোকগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। আমাদের বাড়ীর নিকটে পথের পার্শ্বে এক দরিদ্রা বিধবার কুটীর ছিল। তাহার কুটীরের খড়ের চাল হইতে একটা নধর কচি লাউডগা পথের উপর ঝুলিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সযত্নে সেই লাউডগাটি চালের উপর তুলিয়া দিলেন। পথে অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি পথে বাহির হইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"হাঁগা, এই ঘরখানি কি তোমার?" সেই স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"বাছা, সংসার কর্ত্তে গেলে সবদিকে নজর রাখতে হয়। অমন কচি লাউডগাটি পথের ধারে ঝুলছিল, কেউ এখনই কুচ করে কেটে নিয়ে যাবে।" শত শত লোক প্রত্যহ সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত, কিন্তু সেই দরিদ্রা বিধবার ক্ষতির আশঙ্কা কাহার মনে উদয় হইত?

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন চন্দননগরে ছিলেন, তখন তাঁহার দৌহিত্র, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক "সাহিত্য"-পত্রের সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং তৎসহোদর যতীশচন্দ্র বালক মাত্র। সুরেশের বয়স তখন বোধ হয় ষোল কি সতর বৎসর হইবে। সুরেশ তখন মাতামহের কাছে সংস্কৃত পড়িতেন এবং একজন মাষ্টারের নিকট "ইজি সিলেক্‌শন্‌স্" পড়িতেন। কলিকাতা হইতে যে মাষ্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে চন্দননগরে আসিয়াছিলেন, তিনি কয়েকদিন পরে চন্দননগর হইতে চলিয়া যাইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রদিগকে পড়াইবার জন্য আমার পিতাকে একজন শিক্ষক মনোনীত করিতে বলেন; ফলে আমাদের প্রতিবেশী ৺যোগীন্দ্রনাথ রক্ষিত বি-এ সুরেশ ও যতীশের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যোগীন্দ্র বাবুও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় গমন করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউশনে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর যোগীন্দ্র বাবু ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। চন্দননগরে সুরেশের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। সেই সময় আমি কোন কোন মাসিক পত্রে ছোট গল্প লিখিতাম। পরে সুরেশ "সাহিত্য" প্রকাশ করিয়া আমাকে "সাহিত্য"-এ ছোট গল্প লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে আমি সাহিত্যে প্রায়ই ছোট গল্প লিখিতাম। এইরূপে 'সাহিত্যের' প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আমি উহার সহিত সংযুক্ত ছিলাম।

সুরেশ ও যতীশ আমাকে ঠিক অগ্রজের মত মনে করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চন্দননগর ত্যাগ করিলেও সুরেশ চন্দননগরের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সুবিধা পাইলেই তিনি চন্দননগরে আমাদের বাটীতে যাইতেন।

পামীরের রূপলোক

— শ্রীযামিনীকান্ত সেন

পামীরের নাম, পামীরের সহিত পরিচিত সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। জগতের নানা স্থানে রূপের বিচিত্র সম্ভার আছে কিন্তু সে সকলের মধ্যেও পামীর একটা অদ্ভুত সৃষ্টি—একটা অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক যোগাযোগে এই প্রদেশের সৌষ্ঠব বিকশিত। ইয়োরোপে এদেশকে roof of the world বলা হয়—কারণ, ইহার উচ্চতা সামান্য নয়। পামীরের সাধারণ উচ্চতা ১৩,০০০ ফিট। যে সমস্ত পাহাড় পামীরকে ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের উচ্চতা ১৭,০০০ এমন কি ১৮,০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত। এত উচ্চে সমতল ভূভাগ জগতে দুর্লভ।

পামীর।

পৃথিবীর নানা স্থান সম্বন্ধে রূপের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কোনটিকে ভূস্বর্গ, কোনটিকে তাহার চাইতেও উচ্চতর বিশেষণে মণ্ডিত করা হয়। সাহারার অগ্নিতাণ্ডব, মেরুলোকের শীত-শিহরণ প্রভৃতির ভিতরও মানুষ চলাফেরা করিয়া আসিয়াছে। মানুষ বিশ্বজয়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে—ভূলোকে-দ্যুলোকে তাহার জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। নিত্য নূতন রূপলোক আবিষ্কারের স্পৃহা তাহাকে আরব্যোপন্যাসের মায়ালোক অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর রাজ্যে লইয়া গেছে এবং সেখানকার প্রভুত্বে সে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। মানুষ মরুলোকে ছুটিয়াছে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, ভূগর্ভ খনন করিয়াও মানুষের তৃপ্তি হয় নাই। উপত্যকা, অধিত্যকা, অরণ্য, গুহা সকল স্থানেই রস-সন্ধানে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে। শীত-গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যকে সে তুচ্ছ করিয়াছে—জলের গভীরতা ভেদ করিয়া মুক্তা-সম্পদ আহরণ করিয়াছে। রাজন্যেরা দিগ্বিজয় উপলক্ষ্য করিয়া দিগদিগন্তে প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিয়াছেন। মানুষের ধৈর্য্য ও কৌশল জগতের সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছে। গহন অরণ্য, অগ্নিময় মরু, তুষারাচ্ছাদিত রাজ্য, শৈলশৃঙ্গ, অন্ধকার গুহা সব কিছু মানুষকে স্বাগত আহ্বান জানাইয়াছে। কিন্তু, পৃথিবীর বুকে পামীরই বোধ হয় একমাত্র স্থান যেখানে মানুষকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ যেমন তাহাকে বার-বার জয়াধিকারে ব্যর্থ করিতেছে পামীরও তেমনি তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং সন্ত্রস্ত করিয়া এক চিরন্তন বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।

উচ্চ গিরিশৃঙ্গ সাধারণতঃ মানুষের বিহারভূমি। পশ্চিমের সুইস্-ভূমি, এদেশের কাশ্মীর নেপাল প্রভৃতি রাজ্য বহু প্রাচীন কাল হইতে পথিকের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিয়াছে। পামীরও অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত জড়িত। অনেক পণ্ডিতের মতে আর্য্যজাতির আদিপুরুষগণ ইহার কোন কোন অংশে বিচরণ করিতেন। বাইবেলে উক্ত চারিটি নদী পামীর হইতেই উৎপন্ন এইরূপ একটা জনশ্রুতি পশ্চিমে অতি দূরতম অস্পষ্ট অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে।

একটা সমুচ্চ পর্ব্বতের মেরুদণ্ড অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহারই দুইদিকের উপত্যকা-ভূমিগুলি পামীর নামে

খ্যাত। তুষারের বিরাট স্তূপসমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সকল পাহাড়ের উপর দিয়া জলধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ফলে পাহাড়গুলির উচ্চনীচ উপলখণ্ড মসৃণ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত সমতল উপত্যকাভূমি সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত উপত্যকা হ্রদে পরিপূর্ণ; হ্রদগুলিও বরফের চাপে পরিপূর্ণ এবং স্রোতের প্রবাহে চঞ্চল। বিরাট glacier বা চলমান তুষার-স্তূপে আদিকাল হইতে পামীর একটা মারাত্মক শ্রী পরিগ্রহ করিয়া আছে। পামীর এক হিসাবে তুষাররাশির রচনা—দুরারোহ পর্ব্বতের উচ্চতম তুষার-শৃঙ্গ অবিশ্রান্ত স্রোতধারায় প্রবাহিত হওয়ায় নিম্নে বহু নদনদীর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রস্তরস্তূপকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ও স্খলিত করিয়া বহু সহস্র ফিট উর্দ্ধে এক প্রশস্ত সমতলভূমি রচনা করিয়াছে। উদ্দাম স্রোতধারায় এই সব নদী উচ্ছ্বসিত—পর্ব্বতমালা হইতে অজস্র ধারায় বিগলিত তুষার এই সমস্ত গিরি-নদীগুলিকে একেবারে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিকে শুষ্কতা এবং অনুর্ব্বরতায় পামীর ওতঃপ্রোত—একদিক হইতে অন্যদিকে সারি সারি মরুভূমির ভীষণ আবেষ্টন রচিত হইয়াছে। ভারত পরিক্রম উপলক্ষে অনেক পরিব্রাজককে পামীরের উপকণ্ঠে চলিতে হইয়াছিল। যাঁহারা পামীর দেখিয়াছেন তাঁহারা বিভীষিকার স্বপ্নও দেখিয়াছেন এবং হিমশৃঙ্গবেষ্টিত হ্রদপুঞ্জের অলৌকিক রুদ্র-সৌন্দর্য্যের পরিচয়ও পাইয়াছেন। কাশ্মীরের রমণীয় সৌকুমার্য্যের প্রত্যাশা এখানে করা যায় না। হিমালয়ের বক্ষস্থিত আধুনিক নগরগুলি দেখিয়া একথা মনে করা ভুল যে পাহাড়ের সব স্থান শান্ত ও স্থির সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। পামীরকে ঝোড়ো জায়গা বলা চলে—বৈশাখী ঝড়ের জন্মভূমি এ রকম স্থানে কল্পনা করা মন্দ নয়। পামীরের ঝড়ের তুলনা নাই—সে শুধু ঝড় নয়—একটা খণ্ড প্রলয়। জল, বায়ু, শৈত্য, ধূলিকণা, বরফের টুক্‌রা যেন শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া একটা সৃষ্টিছাড়া পাগলামিতে মাতিয়া যায়, বরফের লক্ষ লক্ষ টুক্‌রা দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া মানুষের সহিষ্ণুতাকে পরাজিত করে। প্রেমের চোখে পামীরকে দেখা কঠিন।

অথচ পামীরের দৃশ্য কি মনোহর! তুষার-শৃঙ্গ, দুরারোহ পর্ব্বতমালা, সমুজ্জ্বল তটিনী, বিপুল হ্রদাদি বিরাট উচ্চতার ক্রোড়ে নিহিত হইয়া এক অপার্থিব ব্যাপকতা ও বিপুলত্বের শ্রীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকের বেষ্টনী এক অপরূপ রূপের ধাঁধা সৃষ্টি করে এবং চক্রবালের আলিঙ্গনে এমন একটা মায়া-জগৎ রচনা করে যাহার তুলনা জগতে কোথায়ও পাওয়া যায় না। পরিব্রাজকেরা এজন্য বরাবর পামীরের রূপলোক সম্বন্ধে অদ্ভুত ঘটনা আরোপ করিয়া আসিয়াছেন।

পামীরের ইতিহাস অতি প্রাচীন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্‌-সিয়াঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে পামীর সম্বন্ধে একটা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামীর তখন 'পোমিলো' নামে পরিচিত ছিল। তিনি বলেন: "ইহা তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মাঝে অবস্থিত; এজন্য এদেশটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং এখানে অহরহ তীব্র হাওয়া ছুটে। বসন্ত ও গ্রীষ্ম, দুই ঋতুতেই বরফ পড়ে। দিবারাত্র সব সময়ে হাওয়া লাগিয়াই আছে। মাটিতে গন্ধকের সংযোগ আছে এবং তাহা বালি ও পাথরে পূর্ণ। বীজ রোপণ করিলে ফসল হয় না—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি কিছুই নাই বলিলেই চলে। একটার পর একটা কতকগুলি মরুভূমি দেশটিকে রচনা করিয়াছে, মানুষ এখানে বাস করিতে পারে না। পামীরের উপত্যকার ভিতর একটা ড্রাগন (Dragon) হ্রদ আছে। তাহা সুঙ্‌লিঙ্‌ পর্ব্বতের মাঝখানে অবস্থিত। এই হ্রদের জল কাচের মত স্বচ্ছ। হ্রদটি গাঢ় নীল

ক্ষুদ্র পামীর।

রঙের—জলের উপর বুনো হাঁস, বুনো বক ও পাতিহাঁস ভাসিয়া বেড়ায়। এখানে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়।" চৈনিক পরিব্রাজকের এই আলৌকিক বিবরণ রহস্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। হ্রদটির সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় কল্পনাসৃষ্ট ড্রাগনের নাম যুক্ত করিয়া দেওয়াটিও অত্যন্ত আশ্চর্য্য। বস্তুতঃ পামীর চিরকালই একটা অমানুষিক কল্পনার সহিত জড়িত। বিস্তৃত হ্রদের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে মনকে উদ্বেলিত করিয়া পামীরকে একটা অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে পর্য্যবসিত করে।

বিখ্যাত প্রাচীন পর্য্যটক মার্কোপোলোও পামীরের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই পর্য্যটক পামীর অতিক্রম করেন। তিনি বলেন : "ওয়াখান (Wakhan) ত্যাগ করে' উত্তর-পূর্ব্বদিকে ক্রমাগত তিন দিন অশ্বারোহণে

বোজাই গম্বুজ।

যেতে হয়। এই সময় যে সব পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে যেতে হয়—তাদের পৃথিবীতে উচ্চতম আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই উচ্চ ভূখণ্ডে একটি বিরাট হ্রদ আছে এবং হ্রদটি থেকে একটা নদী নির্গত হয়ে বহুদূর চলে গেছে।"

এই হ্রদটি সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মানস-সরোবর সম্বন্ধে যেমন নানা গুজব শুনিতে পাওয়া যায় তেমনি পামীরের হ্রদ সম্বন্ধেও অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। পামীরের উপাখ্যানে ইয়োরোপ, চীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যভূমি মুখরিত। পামীরকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হইয়া থাকে—এবং সকল দেশের পর্য্যটকেরই পামীর দেখিবার ঝোঁক অসাধারণ। এজন্য অনেকেই নানা উপন্যাস রচনা করিয়া পামীর সম্বন্ধে বিচিত্র বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। চীন দেশ কাল্পনিক ড্রাগনের ভক্ত; এজন্য পামীরের হ্রদটিকে চৈনিকগণ ড্রাগন-হ্রদ বলিয়া থাকেন। অনেক অলৌকিক ব্যাপার এই হ্রদে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ বিশ্বাস এসিয়ার সর্ব্বত্র আছে। মানুষের আদিম বাসভূমিরূপে কল্পিত হওয়াতে পামীরকে খ্রীষ্টরাজ্য বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমনি করিয়া একটা অলৌকিক ও রহস্যপূর্ণ ভূখণ্ড বলিয়া পামীর বহুকাল হইতে একটা বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অথচ পামীরের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে যাহাদের পরিচয় হইয়াছে তাহারা অবাস্তবকে ততটা ভয় করে নাই যতটা বাস্তবকে করিয়াছে।

কুরকুন্টাই হ্রদ, গুজ হ্রদ প্রভৃতি অতি চমৎকার। এই সমস্ত হ্রদ হইতে পার্ব্বত্য নদী বহুদূর বিস্তৃত। পামীরে বাইবেলে উল্লিখিত চারিটি নদীর সন্ধান ঠিক পাওয়া যায় না, কিন্তু চতুর্দিকই যে এক সময় জলে নিমজ্জিত হইয়া বহুদিকে স্রোতমুখর জলধারা সৃষ্টি করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুরকুন্টাই হ্রদ বৃহৎ পামীরে অবস্থিত। যখন জলের স্থিরতা থাকে তখন অহা বিচিত্র হিমপ্রধান আবেষ্টনীর মধ্যে একটা রৌপ্যফলকের মত দীপ্যমান হয়। চারিদিকের শুভ্র তুষারের প্রতিফলন তীরের কৃষ্ণরেখার ভিতর একখানা ফ্রেমে বাঁধান মায়াদর্পণ বলিয়া মনে হয়—এই জন্যই হুয়েন-সিয়াঙ্গ কল্পিত ড্রাগন-হ্রদের জলকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। জনকোলাহল ও সংস্পর্শবর্জ্জিত উচ্চ শৈলোপরি এই হ্রদের শোভা উপভোগ করার অধিকার হইতে মানুষ বঞ্চিত। চকমাতিন হ্রদ আরও বিচিত্র ও মনোহর। বিরাট উন্মুক্ত আকাশের নীচে আলো ও ছায়ার আবর্ত্তন এই হ্রদটিকে একটা মায়াপুরীর দৃশ্যে পরিণত করে। একটিও গাছ নাই—যে সবুজ রঙের সহিত আমরা প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যগুলিকে সহজেই যুক্ত করি—সে রঙ হইতে এ প্রদেশ অনেকটা বিমুক্ত। সারি সারি তালগাছ এ সমস্ত হ্রদের কূলে নাই—একটা নগ্ন উন্মুক্ততার ভিতর এই অদ্ভুত সৃষ্টি দীপ্যমান। সে উন্মুক্ততা ও আবরণহীনতায় কোন শালীনতা নাই, কোন সুগুপ্ত বার্ত্তা তাহার ভিতর আশ্রয় লাভ করে নাই। একটা উদ্দাম উলঙ্গতাই ইহার শোভা এবং এই দৃশ্যপট দূরদিগন্তে বিস্তৃত। এই হ্রদগুলির চারিদিকে বিস্তৃত সমতল রাজ্যকে পামীর আখ্যা দেওয়া হয়। সাহারার ন্যায় মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র হ্রদের দ্বারা

পামীরের মরুরাজ্য রচিত নয়। জলস্থলের একটা বিপরীত সমন্বয়ে পামীর সৃষ্ট হইয়াছে।

পামীর শব্দটি খোখণ্ডী-তুর্কী ভাষার শব্দ, অর্থ—মরু-প্রদেশ। চীনদেশে এ নামটি কিছু রূপান্তরিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। সেকালে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি বলিয়া বিবেচিত হইত এবং মধ্য এসিয়ার ভিতর দিয়া এসিয়া ও ইয়োরোপের পরিব্রাজকদের যাতায়াতের পথ ছিল। ভারতবর্ষে আসিবার পথে পামীরকে দেখিবার লোভ অনেকেই ছাড়িতে পারেন নাই। এই সমস্ত কারণে এ জায়গাটি মানুষ একেবারে বর্জ্জন করে নাই—আধুনিক কালেও অনেক পর্য্যটক পামীরে যাওয়ার দুঃসাহস করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ঈর্ষ্যা ও রেষারেষিও এ জায়গাটিকে কতকটা মূল্য দান করিয়াছে। পশ্চিমের রাষ্ট্রাধিপতিরা এদেশে খনিজ পদার্থ পাওয়ার প্রলোভনে আসিয়া নিরাশ হইয়াছেন। ইংরাজ ও রুষ এ স্থানে কালনেমির লঙ্কাভাগ করিয়াছে, চীনরাজ্যও তাহাতে যোগদান করিয়াছে। কিন্তু কাহারও পক্ষে এদেশে কোনও রূপ ভিত্তিস্থাপন সম্ভব হয় নাই।

কিন্তু এ ব্যাপারে কম অর্থ ব্যয় হয় নাই। এক একটা মিশন (Mission) পাঠাইতে বহু খরচ হইয়াছে। শীত-পাতের পূর্ব্বেই দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কারণ সে সময় গিরিবর্ত্মগুলি বরফে রুদ্ধ হইয়া যায়। পামীরে যাওয়ার দুইটি প্রশস্ত পথ আছে। একটা সোয়াট ও চিত্রলের ভিতর দিয়া। অন্য পথ গিলগিট, ইয়াসিন উপত্যকা এবং ডারকটের মধ্য দিয়া। যাত্রীদের প্রথম অনুভূতি অতি চমৎকার। ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে যাত্রা সুরু করিয়া পামীরের মহারৌরবে উপনীত হইতে হয়। কাশ্মীরের উলুর হ্রদের উত্তর দিকে অবস্থিত বন্দীপুর হইতে সাধারণতঃ রসদ ও অস্ত্রাদি জোগাড় করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়। পথটিও সহজ নয়। বিরাট অতিকায় পর্ব্বতের উপর দিয়া পথ। ট্রাগব্যাল পর্ব্বত ১১,৪০০ ফিট্ উচ্চ—তাহার উপরকার গিরিবর্ত্ম দিয়া যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হয়। ঘোড়া, খচ্চর ও উটই প্রধান সহায়। এ পর্ব্বতটি অতিক্রম করিয়া গুরাইস্ উপত্যকায় নামিতে হয়। এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বারজিল্ গিরিবর্ত্ম অনুসরণ করিতে হয়। এ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বহুদূরে চলিয়া যাইতে হয়—বুঞ্জী ও গিলগিটে—মাঝে মনোহর এষ্টর উপত্যকা অতিক্রম করা প্রয়োজন। গিলগিট হইতে আবার নূতন উদ্যমে যাত্রা সুরু করিতে হয়। পরবর্ত্তী পথে গুপিতা ও ইয়াসিন উপত্যকার সহিত পরিচয় ঘটে। ডাকসি গ্রাম ছাড়িয়া সারহদ্। ওয়াখান উপত্যকার শ্যামল শোভা দেখিতে দেখিতে যখন পথিকরা অগ্রসর হয় তখন কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহারা এমন জায়গায় উপস্থিত হইতেছে যেখানে নদী ও হ্রদের অভাব নাই অথচ একটি গাছও নাই। এ দেশটি ছাড়িয়া ক্রমশঃই অনুর্ব্বর ভূখণ্ডের সম্মুখীন হইতে হয়।
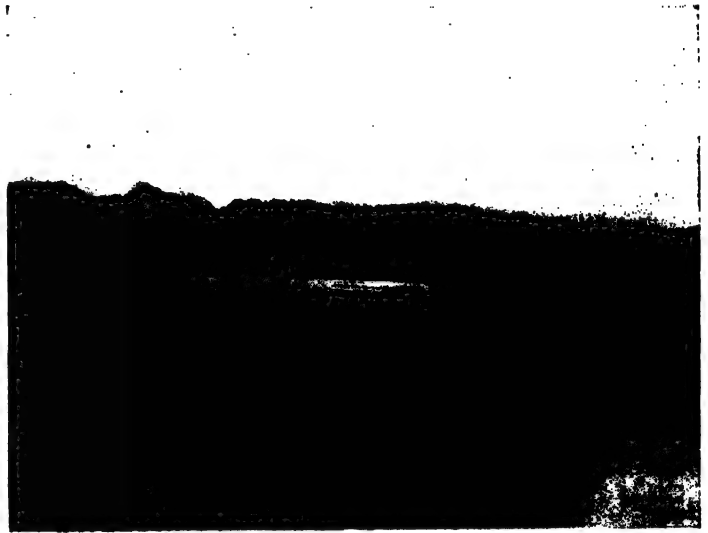
আক্সু নদী—পামীর।

বহুকাল পৃথিবীর বড় বড় শক্তিপুঞ্জ পামীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করে নাই। পামীরে লোভনীয় কিছু নাই বা তাহা দুরধিগম্য এমন একটা বিশ্বাস ইহার মূলে ছিল। কোকাণ্ডের খাঁয়েরা (Khans of Kokand) বহুকাল পামীরে প্রভুত্ব করিয়াছে। কিন্তু এই শুষ্ক রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব খাঁয়েদের কপালে বরাবর থাকে নাই। রুষভল্লুক তাহাদের বিত্রস্ত করিয়া তোলে। রুষের ভারত আক্রমণের সুগুপ্ত ইচ্ছাই এই রকম একটা অভিযানের প্রেরণা দান করে। ভারতের উত্তর সীমান্তে রুষ

লুব্ধনেত্রে বহুকাল হইতে চাহিয়া ছিল। ফলে কোকাণ্ডের আমীরের হাত হইতে পামীরের বিচ্যুতি ঘটে। খাঁয়েরা চিরকালের জন্ম সরিয়া পড়ে। রুষ গভর্ণমেণ্ট পামীর দখল করিয়া দেখিল যে তাহা অনেকটা মাকাল ফলের মত। ক্রমশঃ রুষ নিজের শাসন শিথিল করিয়া ফেলে—এরূপ স্থানে বৃথা অর্থব্যয় করিতে তাহার বাধে। কিন্তু তাহাতে নূতন ঘটনার সৃষ্টি হয়। চীন ও ইংলণ্ডের দৃষ্টি পামীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়—আফগানরাজও লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। কতকটা রুষিয়ার অজ্ঞাতেই এবং কতকটা অবহেলায় আফগানরা বাদক্শান, শিগুয়ান্ রোশন ও ওয়াখান দখল করে। চীনও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলিকে নিজের অধিকারভুক্ত করে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট চিরকালই জাগ্রত—কখন হাত হইতে ভারত খসিয়া যায় সেই চিন্তায় নিদ্রাহীন। এই সুযোগে ইংরাজ চিত্রল ও কাঞ্জুল দখল করে। তাহাতে তিনটা প্রধান শক্তি মরুভূমি পামীরের বক্ষে সামনাসামনি আসিয়া পড়ে। পামীরের অলৌকিক টান এমনিভাবে এসিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে এক অঘটনঘটনস্পর্শ সম্ভব করিয়া তোলে। ইহাদের ভিতর অনেক বোঝাপড়া হইয়াছে—অনেক সীমা-পরিসীমা নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে—কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই কারণ লুণ্ঠন করিবার মত কিছু পামীরে নাই।

মষাল হ্রদ—পামীর।

পামীরে যে সব জাতি যাতায়াত করে, তাহারা ইহাদের খবরও রাখে না। ইহারা কাহাকেও কর দেয় না এবং স্বচ্ছন্দে বিহার করে। পামীরে দাবী করিয়া কিছু করিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও নেই—পৃথিবীর শক্তিমান জাতিরা এখানে আসিয়া কাবু হইয়া গিয়াছেন। পামীর no man's landএ পর্য্যবসিত বেওয়ারিশ জায়গা, কাগজ পত্রে যাহাই লেখা থাক্ না কেন। দুনিয়ায় পামীরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে।

পামীর সৃষ্ট হইয়াছে হিমালয়ের বক্ষে বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে। শুধু ভূস্তরের সম্মিলিত ঐক্যে এদেশের পত্তন হয় নাই। বিরাট শৈলসমুচ্চয়ের শিখরদেশ হইতে প্রকাণ্ড তুষারস্তূপের অজস্র পতন, উদ্বেলিত বারিপ্রবাহের বেগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন প্রস্তর-প্রাচীরের স্খলন, হ্রদগুলির ব্যাপক ও দুর্গম ধারা এই সব মিলিয়া এই উপত্যকাটির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাণ্ড পাথরের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত গোলকগুলি সব স্থানে ছড়ান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলি ভগ্ন হইয়া এই দেশ রচিত হয় নাই। উপলখণ্ডগুলি জলস্রোতের সংস্পর্শে মসৃণ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং মনে হয় প্রকৃতির তাণ্ডব-সমারোহ বহুকাল হইতে এদেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই শ্রেণীর ভয়ঙ্কর বিপ্লবের ভিতর দিয়া পামীর-শিশু জন্মগ্রহণ করে। একালেও এই দানবটি প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল শক্তিগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হয়। যে সমস্ত পথিক পামীরের আকর্ষণে লুব্ধ হইয়াছে তাহারা জানে যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহারা বিপদ্গ্রস্ত হইতে পারে। পামীরের নামেই পথিকগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়। যতই সাবধান হউক না কেন, কোন পথিকই পামীর-পর্য্যটনে নিরাপদ নয়। সকলের মনেই পামীরের সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা লুকান থাকে। পামীরের জলবায়ুর উদ্দাম ঐশ্বর্য্য, ভীষণ অনুর্ব্বর মরুধর্ম্ম, দুরধিগম্য তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ প্রভৃতির ভিতর কোথাও এতটুকু কমনীয়তা নেই।

উত্তর মেরুর শীতসহিষ্ণু অধিবাসীরাও পামীরের তুলনায়

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভূমিতে বাস করে। শীতকালে যখন বরফের ঝড় আরম্ভ হয় তখন তাহার উদ্দাম গতিবেগ এবং উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত্ত কল্পনা করিতে পারে এমন কেহ নাই। জগতে এরকমের ব্যাপার আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। টুক্‌রা টুক্‌রা তুষারের খণ্ড চারিদিক হইতে এক অন্ধ উন্মত্ততায় ছুটিতে থাকে—ঝড়ের বেগ ধূলি পাথর প্রভৃতি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত বস্তুসংগ্রহ উপস্থিত করিয়া এমন একটা অপূর্ব্ব কোলাহল ও দুর্লক্ষ্য কাণ্ড সৃষ্টি করে, যাহা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গ্রীষ্মকালেও থার্ম্মোমিটার ১৪ ডিগ্রি (ফা) পর্য্যন্ত নাবে। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তাপ—৪৫ ডিগ্রিতে (ফা) নাবে এবং তুষার-ঝটিকা একটা প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এই রকমের ঝড়ের আবির্ভাবও ভয়ঙ্কর। হয়ত এই মুহূর্ত্তে আকাশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল আছে দেখিতে পাওয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে একেবারে বিস্ময়কর ভাবে নূতন পটক্ষেপণ হইয়া যায়। উন্মত্ত ঝড় রক্তলোলুপ বাঘের মত হঠাৎ যেন আকাশ হইতে লাফাইয়া পড়ে। চোখের পলকে পথের চিহ্ন মুছিয়া যায়—চারিদিক অন্ধকার হয় এবং ইতস্ততঃ বরফের টুক্‌রার বৃষ্টি হইতে সুরু করে—সাম্‌নের একগজ দূরের কোন জিনিষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এ অবস্থায় পথিকের আসন্ন মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন। ভগবানের নামগ্রহণ ছাড়া তখন গত্যন্তর থাকে না।

পর্য্যটকেরা বার বার এই তুষার-ঝটিকার উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় নিজের দলের লোক ও ভারবাহী জন্তুদের সঙ্গ ছাড়া বিপজ্জনক। কারণ ঝড় উপস্থিত হইলে দশবার হাত দূরেও কে কোথায় আছে টের পাওয়া যায় না—এবং এ সামান্য পথটুকুও যাওয়া সম্ভব হয় না। দুর্ভেদ্য যবনিকা পড়িয়া যায়—আকাশ কাল হইয়া ওঠে। বরফের টুক্‌রাতে চোখ অন্ধ হয়। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ঘোড়ায় চড়া যায় তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না—এক অদ্ভুত প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়। চেঁচাইয়া কোন ফল হয় না—একটা কথাও শ্রুতিগোচর হয় না, এমন কি বন্দুকের আওয়াজও শুনিতে পাওয়া যায় না। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঝড়ের বিপুল গর্জ্জনে ডুবিয়া যায়। যে পথিক দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রকার ঝড়ের কবলে পড়ে, তাঁবু বা খাদ্য, প্রচুর পশুলোমের পরিচ্ছদ যদি তাহার না থাকে তবে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাহার আর কোন উপায় থাকে না।

একদিন হয়ত কেহ একান্তভাবে নিরাপদে পথ চলে, পরদিন যে কোন মুহূর্ত্তে বিরাট তুষারস্তূপের (avalanche) নীচে বা তুষারঝটিকার কবলে পড়িয়া সে প্রাণ হারাইতে পারে। সারা বছরই এই অনিশ্চিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ক্রীড়া চলিতেছে। 'পলকে প্রলয়ের' নমুনা পামীরেই পাওয়া যায়। ইহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায় এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আবহাওয়ার ওস্তাদকেও (meteorologist) গণৎকারের মত আবহাওয়া সম্পর্কে

কুলকুণ্ডল হ্রদ—পামীর।

ভবিষ্যদ্বাণী (forecast) করার দুরাশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই নগ্ন প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মানুষকে 'কম্পাস-কাঁটা' যন্ত্রপাতির হাল ছাড়িয়া আসিতে হয়—নগ্ন প্রকৃতির শিশুর মত। এ সমস্ত হইতে মুক্তির আর কোন দ্বিতীয় পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই দুরন্ত দানব-রাজ্যের সমস্ত ঘটনাই অদ্ভুত। এখানে যতটা বরফপাত হইয়া থাকে তাহা শুনিয়া অবাক্ হইতে হয়। আলাই উপত্যকায় ৮৭০,০০০,০০০ বর্গগজ বরফপাত হয়। কখনও কখনও হিমালয়ের দুরধিগম্য সমস্ত গিরিবর্ত্মই তুষারপাতে রুদ্ধ হইয়া যায়। একদিকে হিমশৃঙ্গ হইতে স্খলিত তুষারের ক্রমাভিযান, অন্যদিকে বিপুল দাববহ্নির ন্যায় উদ্বেলিত সর্ব্বগ্রাসী তুষারঝটিকা!

পামীর দুইভাগে বিভক্ত—বৃহৎ পামীর ও ক্ষুদ্র পামীর। আকৃসু নদীর পাশেই ক্ষুদ্র পামীর—পাঁচ মাইল লম্বা ও ১৩,০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। বিখ্যাত নিকলাস্ পর্ব্বত

পামীরের উপরই অবস্থিত। পামীরের সমতল ভূমিতে তেমন কিছু বৈচিত্র্যও নাই—কেবল পাথরের স্তূপ, নানা খনিজ পদার্থের সংস্পর্শ ছাড়া আর বেশী কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হুয়েন্-সিয়াঙ্গ যে মনোহর ড্রাগন হ্রদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা বোধহয় সেই প্রাচীন পর্য্যটকের দিবাস্বপ্নের নোটবুক্ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু জায়গাটি যেরূপ অদ্ভুত তাহাতে মনে হয় একটা ড্রাগন-হ্রদ থাকিলেই মানাইত ভাল—কারণ অন্য পশুপক্ষীদের পক্ষে এখানে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। চীনের ড্রাগন-হ্রদ, আরব্য-স্বপ্নের দৈত্য-শক্তি, ভারতীয় কাপালিকের মারণ-যজ্ঞ প্রভৃতির একস্থানে যদি কোথাও মিলন সম্ভব হয় তবে তাহা পামীরেই হইয়াছে।
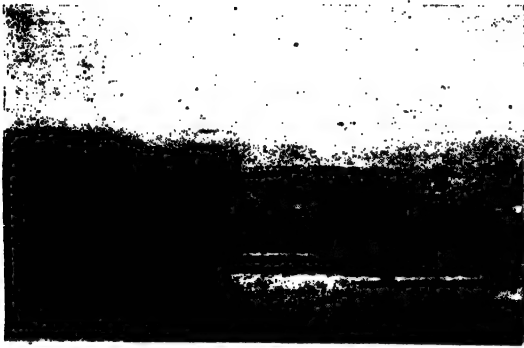
পামীরে ঘূর্ণীবাত্যা।

পামীরে গন্ধক ও জলজানযুক্ত অনেক ঝর্ণা আছে। আক্সু নদীর জলও বেশ গরম। বিপরীতের এখানে অদ্ভুত সমন্বয় হইয়াছে। উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ১০৫ ডিগ্রি উত্তাপের জল বাহির হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বরফের কুচি কুচি টুক্‌রাতে পরিণত হইতেছে। প্রচুর ঠাণ্ডা সত্বেও দেশে গরম জলের নদী, গরম জলের ঝর্ণা একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। শুধু ড্রাগন-হ্রদের অলৌকিক আবেষ্টনের মধ্যে এরূপ আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক বাস্তবিকই হিসাব করিয়াই এদেশের চরিত্র-চিত্র রচনা করিয়াছেন। ঠাণ্ডা ও গরমে এরূপ অহরহ সম্মিলন ব্যাপার বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পামীরে বাস করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও মাঝে মাঝে নানা-জাতির লোক খনিজ ও অন্যান্য পদার্থের লোভে পামীরে উপস্থিত হইয়াছে। বোজাই গুম্বজ একটা সীমানার স্তম্ভ—এদেশ হইতে ইংরাজ বাহিনী, রুষিয়া হইতে রুষীয় বাহিনী প্রভৃতি মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সীমা-পরিসীমা পরখ করিয়া থাকে। কিন্তু পামীরে অসীমের সঙ্গে বোঝা-পড়াই বেশী হইয়া থাকে। এখানে সীমার সীমান্ত লইয়া তোলপাড় করিবার উৎসাহ কাহারও থাকেনা—কারণ শীতাগমেই 'যঃ পলায়তে স জীবতি' এ বাক্যের সার্থক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞান এই ঐতিহাসিক ভূখণ্ডকে ক্ষণিকের তরেও নিরাপদ করিতে পারে নাই। পামীর একটা প্রাকৃতিক অব্যবস্থার লীলা-ভূমি – এই উপত্যকা সৃষ্টির একটা অদ্বিতীয় প্রহেলিকা উষ্ণ প্রস্রবণ ও উষ্ণ নদীর জন্যই মানুষ এ স্থানে নিজের বাসের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। হিমালয়ের দুরধিগম্য শৃঙ্গেও বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির রচিত হইয়াছে—সৌষ্ঠবে ও কলাকৌশলে সেগুলি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু এখানে বোজাই গুম্বজের মত ক্ষুদ্র স্তূপ ছাড়া মানুষ স্থাপত্যের কোন নিদর্শন রাখিতে পারে নাই। ধূমাবতীই এ জায়গায় সার্থক অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়ার যোগ্য—কারণ একটা বিপুল রিক্ততাই এই ভূমির মানপত্র ও নিদর্শন।

বৃক্ষগুল্মাদি, পশুপক্ষী প্রভৃতির কোনরকম প্রাচুর্য্য বা ঐশ্বর্য্য এদেশে নেই। যাহা আছে তাহাও আবার এমন অদ্ভুত যে মনে হয় বুঝি এদেশ মায়ার রাজ্য। পামীরের বিরাট উপত্যকায় একটি গাছ নাই—যদিও হিমালয়ের বহু উচ্চশৃঙ্গ বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপারের পরিচয় পামীরে পাওয়া যায়। পামীরে তৃণগুচ্ছ যথেষ্ট আছে—তাহাও আবার অদ্ভুত রকমের। পামীরের ঘাস সম্বন্ধে এক বিচিত্র বার্ত্তা পাওয়া যায়। মার্কো পোলো বলেন—"পামীরের ঘাসে একটা অদ্ভুত শক্তি আছে! দশদিন এ ঘাস খাইলে অতি শীর্ণকায় গাভী বা ঘোড়াও স্থূল হইয়া পড়ে। এমনি স্বাস্থ্যকর উপাদানে তাহা তৈয়ারী।" অন্য কোন পরিব্রাজক বলিয়াছেন, "The Grass of Pamir is so rich that a sorry horse is here brought into good condition in less than twenty days"—বলা বাহুল্য কোন গাছপালা এদেশে জন্মায় না। আঠার ইঞ্চির উঁচু কোন উদ্ভিদ্ পামীরে দেখা যায় না।

পামীরে অন্যান্য জীবজন্তুর বেশী প্রাদুর্ভাব নাই। মাঝে মাঝে নেকড়ে বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। Sven Hedin নিজের গ্রন্থে এ জন্তুটি দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—আর কাহাকেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে শোনা যায় নাই। হ্রদের উপর মাঝে মাঝে হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালে সব দক্ষিণে উষ্ণতর দেশে পলাইয়া যায়। তখন সব জীব-জন্তুই পামীর ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করে।

পামীরের রুদ্রতা দেখিয়া মানুষ তাহাকে যে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়াছে তাহা নয়। কতকগুলি ভ্রাম্যমাণ জাতি মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে পামীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিরঘিজ জাতি এদেশে অরণ্যবিহার করে। যে সব জীবজন্তু পাওয়া যায় তাহারা শিকার করে—তাহার ভিতর বিখ্যাত ovispoli (এক জাতীয় পার্ব্বত্য ভেড়া, এমন সুদৃশ্য শিং খুব কম জানোয়ারেরই দেখিতে পাওয়া যায়) সকলের সুপরিচিত—কুকুরের সহায়ে বরফের ভিতর অনুসরণ করিয়া ইহাদের হত্যা করা হয়। কিরঘিজরা একটা আশ্চর্য্য জাতি—তাহাদের সংস্পর্শে পামীর নূতন জীবন লাভ করে। কিরঘিজদের চলাফেরা, অশনভূষণ পামীরকে নূতন শ্রী দান করে। কিরঘিজরা দলে দলে নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে। এই দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য ভূখণ্ডে যাহা কিছু রস ও যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য আছে, কিরঘিজরা তাহাই ভোগ করিয়া থাকে। জাতিটি সঙ্গীতপ্রিয়। কৌনাস্ নামে একটা তারের সঙ্গীত-যন্ত্র কির্ঘিজরা বাজাইয়া থাকে। কৌনাস দিয়া যে শ্রুতিমধুর সুর বাজান হয় তাহা বহুদূরের নিস্তব্ধ উপত্যকায় এক অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করে। পামীরের নিষ্ঠুর ক্রোড়ে এই মধুর আওয়াজ একটা নূতন স্বপ্ন রচনা করে। হয়ত এই স্বপ্নই কিরঘিজদের পামীরে বাঁচাইয়া রাখে। *

* এই প্রবন্ধে প্রাচীন ও নবীন যে সমস্ত পর্য্যটক এই দুষ্প্রবেশ্য ভূমি দেখিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও বিবৃতির মূল্যবান্ অংশ হইতে তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কাহারও বিবরণ সম্পূর্ণ নয়—ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত টুক্‌রাতে পূর্ণ। প্রাচীনদের ভিতর মার্কোপোলো ও হুয়েন্-সিয়াঙ্গ প্রভৃতি এবং আধুনিকদের মধ্যে Sven Hedinএর নমে সুপ্রসিদ্ধ। এই প্রবন্ধে একটা বহুমুখী চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি।—লেখক।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতে নবযুগের সূচনা

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা করিতে আসিয়া ক্রমশঃ বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হইয়াছিল। ভারতবাসীরা ব্যবসাসূত্রে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিতে পারিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইংরেজ বলীয়ান, এবং এই জন্যই তাহার ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিলেন। হিন্দু কলেজের মত একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা রাজা রামমোহন রায়ের। সে-যুগের হিন্দু নেতারা এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ইংরেজগণের সহযোগিতায় এবং হিন্দুগণের চেষ্টায় ও অর্থে ১৮১৭ সনের ২০এ জানুয়ারি কলিকাতা ৩০৪নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে নবযুগের আরম্ভ।

গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে এখন যেখানে হিন্দু স্কুল রহিয়াছে, ১৮২৬ সনের ১লা মে হিন্দু কলেজ এই বাড়ীতে উঠিয়া আসে। হেন্‌রি ডিরোজিও নামে এক ফিরিঙ্গী যুবকও এই সনে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ডিরোজিও কবি ও দার্শনিক ছিলেন—বিশ বৎসর বয়সেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সহজ মিষ্ট ব্যবহারে ও শিক্ষার সুন্দর প্রণালীর দ্বারা তিনি ছাত্রদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রগণের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন। পরবর্ত্তী যুগে ডিরোজিও-শিষ্যগণই ধর্ম্মে সমাজে আচারে ব্যবহারে বিপ্লব আনিয়াছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্রগণ সাহিত্যসেবী—তাঁহারা মতপ্রচারে সাহিত্যকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী—দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক সকল প্রকার হিতসাধনে তৎপর ছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজসরকারে চাকরীও করিয়া গিয়াছেন। সেখানেও তাঁহারা যে শুধু স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, নিজ নিজ বিভাগে শুচিতারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে-যুগের এই অগ্রণী দলের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলীর ছাপ বর্ত্তমানের দেশহিতকর বিবিধ প্রচেষ্টায় প্রকট রহিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সে-যুগের এক একটি রত্ন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। আজ হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের ছাত্র-জীবনের শেষ হইতে আমরণ ইঁহারা কি ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণীয়। আজ আমরা রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ছাত্র-জীবন

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮১০ সনে কলিকাতা সিন্দূরিয়াপটিতে প্রসিদ্ধ মল্লিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। তূলার ও সূতার ব্যবসা করিয়া সিন্দূরিয়াপটির মল্লিকগণ বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ও-অঞ্চলের শ্রীশ্রীসীতারাম বিগ্রহ তাঁহাদেরই স্থাপিত।

পাঠশালায় অধ্যয়ন করার পর রসিককৃষ্ণ প্রায় এগার বৎসর বয়সে কলিকাতার হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি নয় বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে, ১৮৩০ সনের ১৩ই মার্চ্চ কলেজ কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট লাভ করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন। *

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কার্য্য যখন আরম্ভ করেন তখন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। কাজেই, কিছুদিন ক্লাসে ডিরোজিওর নিকটে পড়িবার সৌভাগ্য ইঁহাদের হইয়াছিল। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ের ছুটির পরও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে পড়াইতেন এবং তাঁহাদের লইয়া শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সে-যুগের "য়্যাকাডেমিক য়্যাসোসিয়েশন" নামে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক-সভা এই আলোচনার ফল। ডিরোজিও বহু বৎসর যাবৎ এই বিতর্ক-সভার সভাপতি ছিলেন। † প্রথমতঃ ডিরোজিও ভবনে, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলা বাগান-বাড়ীতে এই সভা বসিত। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ছাত্র-বন্ধু সাহেবেরা এই সভায় যোগদান করিতেন। সভায় রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা সকলের মনোরঞ্জন করিত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২০এ জানুয়ারি, ১৮৫৮) বলেন, **"His ready elocution won for him deserved applause of the Academic Association."**

য়্যাকোডেমিক য়্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে ১৮৩০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি হিন্দু যুবকগণ 'পার্থেনন' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করেন। দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সংবাদ পত্রের মধ্যে ইহাই প্রথম। সভার সভ্যগণ পরবর্ত্তী কালে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে আরও একখানি দ্বিভাষিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই কাগজখানি (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৪২) 'পার্থেনন' সম্বন্ধে লেখেন,—

> তৎকালে উক্ত মহাত্মার [ডিরোজিও] সাহায্যে পারথিনন নামক ইংরেজী সমাচার পত্র বাঙ্গালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১ [ম] সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরেজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ে প্রস্তাব ছিল, এবং গভর্ণমেন্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দরের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদ্যপি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই……।

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই পুরস্কার-বিতরণী সভায় ছাত্রগণ ইংরেজী নাটকাদি হইতে অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করিত। ১৮২৮ সনে রসিককৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। এই বৎসর জানুয়ারি মাসে অন্য ছাত্রদের মধ্যে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরচন্দ্র ঘোষ 'কেটো'র সেনেট সিন হইতে যথাক্রমে সেম্প্রনিয়াস, মার্কাস ও ডিসিয়াসের পাঠ আবৃত্তি করেন। সে-যুগের সংবাদপত্রে ছাত্রদের আবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা হয়। 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটের' (১৭ই জানুয়ারি, ১৮২৮) মন্তব্যে তাঁহাদের ইংরেজী সাহিত্যে দখল সম্বন্ধেও আমরা জানিতে পারি,—

> যাঁহারা বৃহৎ সাম্রাজ্যের দেশীয় প্রজাগণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিদ্যার বিস্তার কামনা করেন তাঁহারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রদর্শিত এই সকল বিষয়ে [এদেশীয়গণের] অদ্ভুত উন্নতিতে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হইবেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাই ইহাদের এযাবৎ একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল দৃশ্য হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, ইউরোপীয়দের অভ্যাস ও রীতি-নীতিও শিক্ষার ও অনুকরণের বিবরীভূত হইয়াছে।......বক্তাদের বয়সের অল্পতা এবং বক্তৃতাগুলি যেরূপ যোগ্য ও ফলপ্রদভাবে করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয় আবৃত্তি অতি বিস্ময়কর হইয়াছে।

---

* *Hindoo College Proceedings* (1816-1832). Unpublished.

† *The Bengal Spectator*, Sept. 1, 1842. p. 81. Footnote.

হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিবার পরও রসিককৃষ্ণ ছাত্রদের নানা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা করপোরেশন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন কোনও দেশে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তখন বাঙ্গালী মনীষিগণ এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের পথপ্রদর্শক। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রেরা ব্যাপকভাবে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কলিকাতার পল্লীতে, শহরের উপকণ্ঠে বেহালায়, এবং আন্দুল প্রভৃতি স্থানেও যে ইঁহারা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এইরূপ একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। 'সমাচার দর্পণ' (১৮ই জুন, ১৮৩১) বলেন,

> সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনা বেতনে এক বিদ্যা-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থ গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আপনার দেশের উপকার জন্য কি শ্রম করিতেছেন……।

শিক্ষকতা কার্য্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক

রসিককৃষ্ণ হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। তাঁহার বিদ্যাবত্তার কথা ছাত্রাবস্থাতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু কলেজ কমিটির ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ হইলে ডেভিড হেয়ার রসিককৃষ্ণকে তাঁহার পটলডাঙ্গার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডেভিড হেয়ারের নিজস্ব হইলেও স্কুলটি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ছিল এবং ইহাকে সোসাইটির নিয়ম-কানুনও মানিয়া চলিতে হইত।

হিন্দু কলেজে শিক্ষার ফলে রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন দেশের আচারব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহারা জ্ঞান-বুদ্ধিমতে যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন, কাহারও ওজর-আপত্তি না শুনিয়া তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের কোনরূপ বাচ-বিচার ছিল না। সমাজ কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে একত্রে ভোজন প্রভৃতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। একারণ শীঘ্রই হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষিত নব্য যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল।

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে যাহা লইয়া হিন্দু সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৩১ সনের ২৩এ আগষ্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ৭ জন হিন্দু কলেজে শিক্ষিত বিভিন্ন জাতীয় যুবক ভোজনার্থ মিলিত হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন পাশের বাড়ীতে এক খণ্ড নিষিদ্ধ মাংস ছুঁড়িয়া ফেলেন। এই ব্যাপারে পাড়ার লোক একত্র হয় এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বাধে। কৃষ্ণমোহন এই সময় বাড়ীতে ছিলেন না। পরে ফিরিলে, সমাজপতিদের প্ররোচনায় তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেন।

রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু সমাজ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, সমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে কমিটির কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন,—

> আপনারা পটলডাঙ্গা স্কুলের দুই জন শিক্ষকের [রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] ভোজে যোগদান সম্বন্ধে সকল তথ্য হয়ত জানিতে পারিয়াছেন। আপনারা এই ব্যভিচারীদের স্কুলের কর্ম্ম হইতে অবসর দিতে, না ইহাদিগকে স্কুলে রাখিয়া হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছেন—জানিতে ইচ্ছা করি। *

সোসাইটির সভ্যগণের মধ্যে ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুগণ যখন জিদ ধরিলেন যে, এই দুই জন শিক্ষককে না ছাড়াইয়া দিলে তাঁহারা সন্তানদিগকে সোসাইটির স্কুলে পাঠাইবেন না, এবং সোসাইটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন তখন অহিন্দু সভ্যগণ ইহা লইয়া আর ঘাঁটাইতে চাহেন নাই। ডেভিড হেয়ার রাধাকৃষ্ণ দেবকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, **"they were so well qualified as teachers that he [Mr. Hare] would certainly be sorry to lose them"** অর্থাৎ তাঁহারা শিক্ষক হিসাবে এরূপ গুণসম্পন্ন যে তাঁহাদিগকে হারাইতে তিনি বাস্তবিকই দুঃখিত। † রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনকে কোন্ তারিখে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই।

---

* "I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the Putuldanga School, and consequently wish to know whether you are determined upon removing those outcastes from the school, or retaining them to corrupt the Hindu pupils."—*Proceedings of the Calcutta School Society* (1818-1831). Unpublished.

† *Ibid.*

রসিককৃষ্ণের ছাত্রদের কেহ কেহ উন্নতি করিয়াছিলেন ও নামও করিয়াছিলেন। মধুসূদন গুপ্ত ও উমাচরণ শেঠ কৃতিত্বের সহিত মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করেন। *

হিন্দু সমাজের প্রধান লোকেরা রসিককৃষ্ণ প্রভৃতিকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায় তাঁহাদের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। রসিককৃষ্ণ অবিলম্বে এই সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া গণ্য হইলেন।

সাংবাদিক রসিককৃষ্ণ

সংবাদ পত্র যে জনসেবার প্রধান অঙ্গ—ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই ইঁহারা সংবাদ পত্র পরিচালনায় মন দিয়াছিলেন, 'পার্থেনন'-পত্র প্রকাশে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। শিক্ষকতার সময়ে রসিককৃষ্ণের স্বাধীন মত প্রকাশে এবং বিচার-সম্মত আচরণের ব্যাঘাত ঘটে। তিনি অতঃপর সংবাদ পত্রকেই বাহন করিয়া স্বাধীনভাবে স্বীয় বিচার-বুদ্ধিমত দেশ-সেবা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত।

১৮৩১ সনের ৩১এ মে দক্ষিণানন্দন (পরে, রাজা দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। বাংলা ভাষায় দেশ-দেশান্তরের সংবাদ, যুক্তিসম্মতভাবে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য। ১৮৩৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক জ্ঞানান্বেষণের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। রসিককৃষ্ণ ইহার সম্পাদক হইলেন। এই সময় হইতেই জ্ঞানান্বেষণ ইংরেজী বাংলা দ্বিভাষী কাগজে পরিণত হইল।

জ্ঞানান্বেষণের এই 'মটো' ছিল,—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

(বাংলা)

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েরে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ †

রসিককৃষ্ণ ১৮৩২ সনে 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানতঃ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইত।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাজা রামমোহন রায়

রসিককৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই জানিত। সংবাদ পত্র সম্পাদকতা আরম্ভ করিয়া তিনি কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেন। সাধারণ সভায় অকপটে নিজ মত ব্যক্ত করারও এখন সুবিধা হইল। তাঁহার বক্তৃতার এরূপ অবাধ গতি, এবং ইহা এত যুক্তিসহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইত যে শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যাইত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২২এ জানুয়ারি, ১৮৫৮) রসিককৃষ্ণের বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়া বলেন,—**"He rarely appeared before the public in the capacity of a speaker but when he did, his admirable fluency and pure English used to carry the minds of the audience."** অর্থাৎ তিনি কদাচ বক্তাহিসাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু যখনই তিনি বক্তৃতা করিতেন, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরেজী এবং বক্তৃতার প্রশংসনীয় অবাধ গতি লোকের মন হরণ করিত।

রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা শক্তির প্রথম পরিচয় পাই রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায়। কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি অগ্রণী দলের মুখপাত্র রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইঁহারা তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত না হইলেও তাঁহারই শিক্ষাদীক্ষা যে ভারতে নব যুগের সূচনা করিয়াছে তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেন। রসিককৃষ্ণের বক্তৃতায় অগ্রণী দলের এই মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৮৩৪ সনের ৫ই এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে এই স্মৃতি-সভা হইয়াছিল। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রসিককৃষ্ণই এই সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা * সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। তবে বিলাত-প্রবাস কালে রামমোহন রায় স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কি করিয়াছিলেন, রসিককৃষ্ণের বক্তৃতার এক অংশে তাহার আভাস পাওয়া যায়,—

> To his going there we are in a great measure indebted for the best clauses in the new charter, bad and wretched as the charter is. (*Laughter.*) Though it contains the few provisions for the comfort and happiness of the millions that are subject to its sway for the interests of millions were sacrificed to the interests of a few tea-managers—yet bad and wretched as it is, the few provisions that it contains for the good of our countrymen we owe to Ram Mohun Roy.

তাৎপর্য্য :

যদিও নূতন চার্টার খারাপ ও জঘন্য তথাপি ইহার ভাবধারাগুলির গঠন রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাওয়ার ফলেই সম্ভব

---

* *A General Biography of Bengal celebrities.* By Ram Gopal Sanyal. Calcutta. 1889.

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টাত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ২১১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সংবাদ পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* সমগ্র বক্তৃতাটি আমি *The Indian Messenger*, Nov. 20, 1932 সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি।

হইয়াছে। কোটি কোটি লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যৎসামান্য ব্যবস্থাই ইহাতে আছে, কারণ কতকগুলি চা-করের স্বার্থরক্ষার্থ জনগণের স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে; তথাপি, ইহা খারাপ ও জঘন্য হইলেও ইহাতে যা' কিছু সু-ধারা আছে তাহার জন্য আমরা রামমোহন রায়ের নিকটই ঋণী।

রসিককৃষ্ণের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, রসিককৃষ্ণ তাহার এক জন সভ্য মনোনীত হন।

জুরীর কার্য্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক

১৮৩৪ সনে ভারতীয়েরা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে জুরী ও পর বৎসর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এই সময়ে জুরি মনোনীত হন। তাঁহার জুরির কার্য্য করিবার সময়ে ১৮৩৪ সনের শেষভাগে একটি ঘটনা ঘটে এবং তাহা লইয়া সে-সময়ে সংবাদপত্রে আলোচনা হয়।

সে-যুগে জুরীকেও তামার পাত্রে গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। উক্ত সনের ১৯এ ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্টে এক হত্যার মামলায় রসিককৃষ্ণ জুরী ছিলেন। তাঁহাকে গতানুগতিকভাবে শপথ লইতে বলিলে তিনি আপত্তি করেন, এবং স্বয়ং যে শপথ লিখিয়া আনিয়াছিলেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করেন। সংবাদ পত্রে এই ব্যাপারের এইরূপ রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল,—

> The Jury were then empanneled, and Baboo Russick Krishna objected again to any of the usual forms of swearing, upon which the Court observed to him that a solemn affirmation on his part would answer the purpose if he declined abiding by any of the prescribed forms of swearing, the Baboo then handed to his Crier a form of his own which being presented to the Court, was approved of, and the Baboo sworn accordingly. The words in the form amounted to a solemn affirmation. *

এই রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় রসিককৃষ্ণ পূর্ব্বেও গতানুগতিক প্রথায় শপথ লইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এক জাল মোকদ্দমায় তিনি জুরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব এই বারেই তিনি প্রথম ঐরূপ শপথ লইতে অস্বীকার করেন। কথিত আছে, তিনি তখন বলিয়াছিলেন, **I do not believe in the sacredness of the Ganges'**—'আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না'। বেঙ্গল হরকরা এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া বলেন,—'যখন জুরীগণকে শপথ পড়ানো হয় তখন তাঁহাদের একজন—জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই বলিয়া শপথ লইতে আপত্তি করেন যে তিনি উহা বুঝেন না এবং কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার আস্থা নাই। রসিককৃষ্ণ এই পত্রে এরূপ অপবাদের জবাব দেন। তাঁহার এই জবাব হইতে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বমতনিষ্ঠার বিষয়ও জানিতে পারি। তিনি জবাবে এই মর্ম্মে লেখেন,—

> উক্ত কথাগুলি যে শুধু ভ্রমাত্মক তাহা নহে, ইহা আমার চরিত্রের উপরও বিশেষ কালিমা লেপন করিবে। সুতরাং আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্ম্মেই আমার আস্থা নাই, একথা আমি বলি নাই। অন্যপক্ষে, আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম—ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এজগতে কার্য্য করি। আমি এখানে বলিতেছি যে, এক-ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সকল প্রকার শপথেরই আমি বিরোধী—এই উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাকে মাত্র দুই রকম শপথের কথাই বলা হইয়াছে; কাজেই আমি সর্ব্ব প্রকার শপথের বিরোধী এরূপ কথা উঠিতেই পারে না। আমি অবশ্য বলিয়াছিলাম যে, পণ্ডিতের কথা আমি বুঝি না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। তিনি সংস্কৃতে এমন কিছু আবৃত্তি করিতেছিলেন যাহা আমার নিকট প্রায় অবোধ্য। অপবাদ নিরাকরণের জন্য এইটুকু মাত্র বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ উপরে যে-সব কথার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে সাধারণের মনে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। †
> —দি এসিয়াটিক জার্ণাল ১৮৩৫ (মে-আগষ্ট—এ ইণ্ট পৃষ্ঠা ৬৫) 'হরকরা' হইতে উদ্ধৃত।

শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনে রসিককৃষ্ণ মল্লিক

১৮৩৪ সন হইতে দু'তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি গুরুতর বিষয় লইয়া আন্দোলন হয় ও মীমাংসা হইয়া যায় যাহার ফলাফল আজ পর্য্যন্ত আমরা ভোগ করিতেছি। ইংরেজ সরকার এযাবৎ এদেশে সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য এই সকল ভাষায় অনূদিত হইয়া তবে ছাত্রদের পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত হইত। ইহাতে সময়, শক্তি ও অর্থের অযথা ব্যয় হইত। সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি এদেশের কথ্য ভাষা নহে। ইংরেজীর মতই এই সকল ভাষার যে-কোন একটি শিখিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। অথচ মাত্র ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়লাভ সহজ হয় এবং ইহা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিলে তাহাও স্বল্পায়াসে সমৃদ্ধ হইতে পারে। কাজে কাজেই, এই বিষয় লইয়া ঐ সময় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। একদল সংস্কৃত, আরবি

* *The Calcutta Courier*, Saturday evening, December 20, 1834. Quoted from *The Bengal Hurkaru*.

† 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে রসিককৃষ্ণের প্রচলিত রীতিতে শপথ লইতে অস্বীকৃতির তারিখ ১৮৩১ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভুল।

ফার্সির চর্চ্চার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। অন্যেরা ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করিতে প্রস্তুত। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁহারা শুধু ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চ্চারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁহাদের নিকট অদূরভবিষ্যতে যাহাতে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা সম্ভব হয় এই জন্য ইংরেজীর সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা এই মত পোষণ করিতেন। রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানান্বেষণে' ও কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারারে' এই বিষয়ে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে দেশীয়গণের এক সভা হইয়াছিল, উদ্দেশ্য—সংস্কৃত, আর্বি, ফার্সি শিক্ষার জন্য অযথা ব্যয় না করিয়া ইংরেজী ও দেশী কথ্য ভাষাগুলির চর্চ্চার উদ্দেশ্যে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিবার জন্য বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট আবেদন প্রেরণ।* এই সভায় আলোচিত বিষয়ের 'বেঙ্গল হরকরার' মন্তব্য হইতে রসিককৃষ্ণ প্রমুখ এদেশীয় উন্নতিকামীদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানা যায়।

তখন সরকারী কার্য্যেও ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হইত। রাজকার্য্যে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত তাহা লইয়া এই সময় আলোচনা সুরু হয়। রসিককৃষ্ণ জ্ঞানান্বেষণে লিখিলেন যে, দেশীয় লোকের সংস্পর্শে অহরহ আসিতে হয় বলিয়া রাজকর্ম্মচারীগণের কি বিচারালয়ে কি সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষারই প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। ১৮৩৮ সন হইতে রাজকার্য্যে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষারই চলন হইল।

শাসন-সংস্কারে রসিককৃষ্ণ মল্লিক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যখণ্ডে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করেন। প্রতি বিশ বৎসর পরে বিলাতের পার্লামেণ্ট এই সনন্দ নূতন করিয়া পাস করিতেন। ১৮৩৩ সনে এইরূপ এক সনন্দ পার্লামেণ্টে পাশ হয়। ইহা ১৮৩৩ সনের 'চার্টার য়্যাক্ট' বলিয়া খ্যাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। রাজ্যশাসনের ভারও কোম্পানীর হস্তেই তখন ন্যস্ত। সুতরাং রাজ্য যাহাতে সুশাসিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট এই আইন করিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু এই আইনে এমন কতকগুলি ধারা যুক্ত হইয়াছিল যাহাতে ভারতবাসীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য কোম্পানী ঋণ করিয়াছিল। এই আইনে তাহার এদেশের ব্যবসাগত ঋণও সমুদয়ই এই ঋণের সঙ্গে যুক্ত হইল। ভারতবর্ষের ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হইল। আইনের আর একটি ধারায় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য খৃষ্টান মিশনারির সংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থা হয় এবং ভারতবর্ষই তাহার ব্যয়ভার বহন করিবে ধার্য্য হয়। বড়লাট ভারতবর্ষ শাসন-ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

এই আইনের বার্ত্তা ভারতবর্ষে পৌঁছিলে ইংরেজ বাঙালী সকলেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার দেশী বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেরিফ্‌কে কলিকাতা টাউন-হলে অবিলম্বে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ১৮৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে সেরিফের সভাপতিত্বে সভা হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চার্টার য়্যাক্টের প্রতিবাদ হইলেও আরও দুইটি বিষয়ে ইহাতে আলোচিত হইবার কথা ছিল—(১) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহারক আইন রহিত করা ও (২) সাধারণ সভা নিষেধবিষয়ক নিয়ম তুলিয়া দেওয়া।

থিওডোর ডিকেন্স নামক একজন ইংরেজ প্রস্তাব করেন, —চার্টার য়্যাক্টের এমন কতকগুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহাতে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য (ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ সমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা) ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এই আইন এরূপভাবে সংশোধন করা হউক যাহাতে ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। থিওডোর ডিকেন্স, টমাস ই এ টার্টন এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক চার্টার য়্যাক্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। সে-যুগের সংবাদপত্রে তাঁহাদের বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা হয়। রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা সম্বন্ধে বেঙ্গল হরকরা বলেন,—"বাবু রসিকলাল [কৃষ্ণ] ও এই আইনে যে তাঁহার স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে আদৌ বিবেচনা করা হয় নাই তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত করেন।" *

সভায় আলোচিত বিষয়গুলি গভর্ণমেণ্টের ও বিলাতে পার্লামেণ্টের গোচরে আনিবার ভার যাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেও রসিককৃষ্ণ ছিলেন। †

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনেও রসিককৃষ্ণও যোগদান করেন। ১৮২৩ সনে আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হয়। সেই সময় হইতেই রাজা রাম-

* *The Calcutta Courier* (Supplement), 5th April, 1834.

* "......Baboo Russick Lal also exposed with great ability the utter want of consideration for his countrymen manifested in this measure."
—*The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News. p. 43.

† *Ibid.*

মোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকেন। ১৮৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারির সভায়ও ইহা রহিত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রসিককৃষ্ণ যে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাহা আগেই বলিয়াছি। স্যর চার্ল্‌স মেট্‌কাফ বড়লাট নিযুক্ত হইয়াই এই আইন রহিত করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার এই মনোভাব সাধারণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কলিকাতার ইংরেজ ও বাঙালী নেতারা তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ১৮৩৫ সনের ৮ই জুন কলিকাতা টাউন-হলে এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক জনসভা হয়। সভায় অসবোর্ণ নামক এক সাহেব বলেন যে, দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র সমূহকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—

He [Rasik Krishna Mallik] had not intended to address the Meeting but the ungenerous attack on the native press claimed from him a few words in its defence. Mr. Osborne had contended that the native press should have been continued shackled—should not have been set free because it circulated not among the highly civilized but only among wealthy natives, and that its contents were worthless. Yet the learned gentleman confessed that he could not understand the native Papers, could not even read their names, and yet he condemned them! (*cheers.*) He (Mr. O.) should have known more of the native press ere he came to a sweeping conclusion against it. He had long known that press; but could Mr. Osborne say that its articles were such as merited the stigma the learned gentleman has cast upon it. The *Sumachar Durpun* circulated in various districts and was full of useful discussion. Certainly the learned gentleman had not drawn his conclusion from the contents of the papers. This was not the first attempt that had been made to separate the natives from the European press; but he was glad to see that our rulers had scouted the proposition. Neither the European nor the native press would advocate licentiousness, and the native press could be restrained by the same laws that applied to the English. Why such distrust of the natives—there were good or bad of all races. He would conclude by calling the attention of the opponents of the native press to a passage from Milton—'Who kills man, kills a reasonable creature, God's image; but he who destroys a good book kills reason itself; kills the image of God in the very eye! Many a man lives a burden upon the earth, but a good book is the precious life of a master-spirit, embalmed and treasured up 'on purpose for a life beyond life.' (*Loud cheers*)*

স্যর চার্ল্‌স মেট্‌কাফ্‌কে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিবার ভার যাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৫ সনের ৩রা আগষ্ট স্যর চার্ল্‌স মেট্‌কাফ্‌ আইন দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠায় রসিককৃষ্ণ

এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠারও জল্পনা হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৩৫ সনের ৩১এ আগষ্ট কলিকাতা টাউনহলে ইংরেজ ও বাঙালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মিলিয়া এক সভা করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পুস্তকালয় স্থাপন ধার্য্য হয় এবং একটি কমিটি গঠিত হয়। বাঙালীদের মধ্যে রসময় দত্ত ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

সভায় পুস্তকালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলীও ঠিক করা হয়। একটি প্রস্তাবে দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা হয়। রসিককৃষ্ণ এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। †

এই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীই পরে কলিকাতার ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে।

রাজকার্য্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে স্থির হয় যে, রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ্য বিবেচিত হইলে এদেশ-বাসিগণও নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত দু'চার জন এই সকল পদে নিযুক্ত হইলেও ১৮৩৭ সন হইতেই হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ এই পদপ্রার্থী হইতে থাকেন। সে-যুগে ডেপুটি কলেক্‌টরী প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য সকলেরই লোভনীয় ছিল। হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র রাধানাথ শিকদার জরীপ-বিভাগের কর্ম্ম ছাড়িয়া ডেপুটি

* *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic news, pp. 170, 171

† *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic news—Puplic Library Meeting.

কলেক্‌টর হইতে চাহিয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণও হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইয়াই কিছুকাল ডেভিড হেয়ারের স্কুলে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা কার্য্য করেন। পরে, জ্ঞানান্বেষণের মত উচ্চদরের সংবাদপত্র পরিচালন ও সম্পাদন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্ঞানী, বাগ্মী ও স্বদেশ-প্রেমিক হিসাবেও তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ গুণসম্পন্ন লোকের নিয়োগে ডেপুটি কলেক্‌টরী পদেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণের নিয়োগের সংবাদে 'সমাচার দর্পণ' (৪ মার্চ্চ, ১৮৩৭) লিখিয়াছিলেন,—

> কিয়ৎকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহারা ডেপুটি কলেক্‌টরি পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ পদাভিলাষীদের মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাঁহাকেই তৎপদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবরা শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কলেক্‌টরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতার বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাকে অতি নিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাঁহার দ্বারা ডেপুটি কালেক্‌টরী পদের অবশ্যই সম্ভ্রম হইবে। *

রসিককৃষ্ণ সরকারী চাকরি লইয়া বর্দ্ধমান গমন করেন। সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার কর্ম্ম-পটুতার পরিচয় দিলেন। জনৈক বর্দ্ধমানবাসী 'সমাচার দর্পণে' (২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭) পত্র লিখিলেন,—

> আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক আমলারদের কর্ম্মেতে নিরত চক্ষু রাখেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন। †

রসিককৃষ্ণ বর্দ্ধমানেই বিশ বৎসর কাল ডেপুটি কলেক্‌টরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ১৮৫১ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি রেলওয়ে-বিভাগেও কার্য্য করিয়াছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৪ই জানুয়ারি, ১৮৫১) এই প্রসঙ্গে রসিক-কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিবার মত।

> রেইল রোডের কার্য্যে তিন জন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।… একজন বাবু অভয়াচরণ মল্লিক হাবড়া অবধি শ্রীরামপুর, দ্বিতীয় ব্যক্তি আনন্দচন্দ্র মিত্র শ্রীরামপুরাবধি হুগলি, তৃতীয় ব্যক্তি বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হুগলি অবধি পেঁড়ুয়া পর্য্যন্ত দেখিবেন। এই তিন ব্যক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত…।
>
> তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর যিনি হুগলি অবধি পেঁড়ুয়া পর্য্যন্ত রেইল রোডের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারি শ্রীযুত বুসবি সাহেব অনুরোধ করিয়া ইঁহাকে ডেপুটি কালেক্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত ভৃত্যদিগের মধ্যে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের তুল্য লোক অল্প আছেন, রসিকবাবু সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়াশীল, বিদ্বান, এমত ব্যক্তির হস্তে রেইল রোডের ব্যয় বিষয়ে তঞ্চকতা হইবে না আমরা নিশ্চিত বলিতেছি। *

রসিককৃষ্ণ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াও রাজসরকার কর্ত্তৃক যথোচিত পুরস্কৃত হন নাই, বরং সময় সময় তাঁহার উপর অবিচার হইয়াছিল। ১৮৫৪ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'সম্বাদ ভাস্কর' এই সংবাদ প্রকাশ করেন,—

> ডেপুটি কালেক্টরদিগকে একাদিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করণ।…লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব † যে শ্রীযুক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাবুকে ডাকিয়া নিয়া সর্ব্বাগ্রে ডেপুটি কালেক্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এত কাল নিরপেক্ষভাবে বিশ্বাসিত্বরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ দেখাইয়াছেন তাঁহাকে ৩৭ সংখ্যার পাতালে ফেলিয়া দিয়াছেন…।

দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে রসিককৃষ্ণের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। তিনি ১৮৫৭ সনে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন। পর বৎসর ৮ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইংরেজীতে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন। কবিতাটির এক স্থানে আছে,—

> O! how the winds
> Of circumstance and freshening April showers
> Of early knowledge, and unnumbered kinds
> Of new perceptions shed their influence;
> And how you worship Truth's omnipotence!

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিওর শিষ্যগণ আমরণ সত্যান্বেষী ছিলেন। দেশ-বাসীকে মিথ্যার ও কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা বীরের মত লড়িয়া গিয়াছেন। এই জন্যই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁহাদের প্রাধান্যে আতঙ্কিত হইয়াছিল। কালে সমাজ তাঁহাদেরই মতামত গ্রহণ করিয়া সুস্থ ও সবল হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারত-বর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রাজসরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এক মাত্র স্বাদেশিকতাই তাঁহাদিগকে প্রতি কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিত।

ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধচরিত্র

---

* সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড। পৃঃ ৩২৮

† ঐ। পৃঃ ২৭৫

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

† ইহা ভুল। ১৮৩৭ সনে লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষে বড়লাট ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

মা

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। কৃষ্ণনগরের উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—

রামতনু বাবু রসিককৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; রসিককৃষ্ণের নাম করিবার সময় তাঁহার চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন রসিকের মত thoughtful মানুষ আমি দেখি নাই; রসিক dared to think for himself।*

রসিককৃষ্ণ মল্লিক অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। বহু কঠিন বিষয়ে তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইতেন। পরবর্ত্তী জীবনেও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুবর্গ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—

বর্দ্ধমানে বাসকালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে কিছুদিন লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না। তখন হইতেই রসিককৃষ্ণও তাঁহার guide, philosopher and friendএর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। †

রসিককৃষ্ণ রাজকার্য্যে শুচিতা আনয়ন করিয়াছিলেন

* পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৩৩০। পৃঃ ৭।

† রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃঃ ১৩০, ১৩১।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়েও বলেন,—

এই কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ শুনিয়াছি বর্দ্ধমানের রাজসরকারের লোক অনেকবার তাঁহাকে উৎকোচাদি দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্বকর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ করিতে পারে নাই। রসিককৃষ্ণও ঘৃণাপূর্ব্বক সেই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন; এবং ন্যায় বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না। *

রসিককৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। সুতরাং তাঁহার মতে কোন ধর্ম্মেরই নিন্দাবাদ করা অনুচিত। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতের একখানা পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৬২সনে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্রের দুঃখেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি তাঁহার উইলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। †

রসিককৃষ্ণ সমাজসংস্কারক ছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তিনি মনে প্রাণে যোগ দিয়াছিলেন।

* *The Hindoo Patriot*, January 22, 1858.

† কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ। পৃঃ ১০৭।

বাংলার পরিচিত পাখী

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

বুলবুল

এ পর্য্যন্ত যে তিনটি পাখীর পরিচয় (উপাসনা, ২৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তাদের প্রত্যেকেরই একটা ক'রে বিশেষত্ব আছে। দোয়েলের বিশেষত্ব—তার সুগঠিত দেহ, সুবিন্যস্ত বর্ণসমাবেশ ও অতুলনীয় কণ্ঠমাধুর্য্য। তার গম্ভীর অচপল চালচলনে বেশ বোঝা যায় যে সে একটি বনেদী পাখী—বড়ঘরানা। শালিক যেন কলেজে-পড়ুয়া বাচাল ছাত্র—হৈ চৈ ও পলিটিকাল অ্যাজিটেশনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। ছাতারে নিতান্ত কোলাহল-প্রিয় বস্তি-নিবাসী কুলীর দল—তরুণ সাহিত্যিকের ভাল টার্গেট হবার উপযুক্ত।

এবার আমরা বুলবুলের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। এর চালচলনের মধ্যে দোয়েলের অতি-বনেদী গাম্ভীর্য্য নেই, অথচ বাচালতাও নেই। এদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ক্ষিপ্রতার মধ্যে অনেকখানি সুষমা আছে। এই পাখীর অস্তিত্ব আমাদের কানন-উপবনে আনন্দহিল্লোলের সঞ্চার করে। দোয়েলের মত এদের গলার স্বর লহরীর উপর লহরী, পর্দ্দার উপর পর্দ্দা ওঠে না বটে, সুমিষ্ট শীষও এদের কণ্ঠধ্বনিতে নেই; কিন্তু যে দুতিনটি হ্রস্ব স্বর এরা সারাদিন অবিরাম উচ্চারণ করে সেগুলি বেশ লঘু, সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য।

বুলবুল আমাদের প্রদেশের তথা সারা ভারতবর্ষের একটি অতি সাধারণ সুপরিচিত পাখী। প্রত্যহ একে প্রত্যেক স্থানে দেখা গেলেও এর চলাফেরায় আর কণ্ঠলালিত্যে এমনই একটা বিশেষত্ব আছে যে এরা আমাদের কাছে কখনও পুরাতন হয় না। পারস্যের কবিরা যে গুলচুমী বুলবুলের সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে সাহিত্যে অমর স্থান দান করে গিয়েছেন, তার সঙ্গে আমাদের এই নিতান্ত ঘরোয়া বুলবুলের আদৌ কোনও সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নেই। সে একেবারেই ভিন্ন

পাখী। তার ইংরাজী নাম নাইটিঙ্গেল এবং আমাদের ভাষায় তাকে "ভারত"-পাখী বলা হয়। এই "নাইটিঙ্গেল-ভারত" বাংলাদেশে পাওয়া যায়না। সুতরাং যে সব কবিদের বাংলা গজল-গানে বুলবুল পাখী চুলবুল করে, বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় একটু ধোঁয়াটে রকমের ব'লে সন্দেহ হয়।

বুলবুল।

অতি সাধারণ পাখী হ'লেও ভারতবর্ষে বুলবুলের জনপ্রিয়তা অসাধারণ। এদের ক্ষত্রিয়-সুলভ তেজ ও রণকুশলতার সুযোগ গ্রহণ করে মানুষ একটু আনন্দ লাভ করতে চেষ্টা করে। সেই জন্য এদেশে মুটে-মজুর, শ্রমজীবী, মুদি থেকে আরম্ভ করে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলেই বুলবুলকে সযত্নে পালন করেন। বছর তের চৌদ্দ পূর্ব্বে যখন একবার নিজামের রাজ্যে যাওয়ার সুযোগ হ'য়েছিল, শুনেছিলাম যে বুলবুলের লড়াই সেখানে এক মহা-সমারোহের ব্যাপার—যেন বাংলায় আমাদের বাইটন কাপের খেলা। হায়দ্রাবাদে বুলবুলের রীতিমত টুর্ণামেণ্ট হ'ত এবং বিজয়ী পাখীর মালিক পাঁচ ছয় হাজার টাকা লাভ করতেন। এখনকার কথা বলতে পারি না। তবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এখনও ছোটখাটো টুর্ণামেণ্ট হয়। শুনেছি লক্ষ্ণৌ সহরের নবাবী গন্ধের সৌখীন বাবুসাহেবগণ বামহস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একটি বুলবুল নিয়ে সন্ধ্যা-বায়ু সেবনে বের হ'তেন। কোনও বাড়ীর ঝরোখায় উপবিষ্টা ললনা দেখলে হস্তস্থিত বুলবুলকে ছেড়ে দিতেন। শিক্ষিত পাখী তরুণীর ললাট-শোভা উজ্জ্বল টিকলিখানি চঞ্চুপুটাগ্রে হরণ ক'রে প্রভুকে অর্পণ ক'রত। ইনি অপ্রতিভ সুন্দরীর লজ্জারুণ-রাগরঞ্জিত বদনশোভা দর্শন ক'রে পুলক সঞ্চয় ক'রতেন। কিন্তু এখন আর "সে অযোধ্যাও নেই, সে লক্ষ্ণৌও নেই।"

বুলবুলের মত এত বৃহৎ পক্ষী-সম্প্রদায় আর ভারতে নেই। বিভিন্ন প্রকারের বুলবুলের সংখ্যা হবে তিপ্পান্ন রকমের। এইটেই বোধ হয় এদের আভিজাত্যের বড় প্রমাণ। সকলেরই একটা কুলগত সাদৃশ্য আছে, দেশভেদে মাত্র বর্ণতারতম্য ঘটেছে। নূতন সংস্করণ **Fauna of British India** পুস্তকমালায় ষ্টুয়ার্ট বেকার (**Stuart Baker**) সাহেব দুইটি কুলগত বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছেন। (১) এদের সকলেরই মস্তকের লোমগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। উত্তেজিত হ'লে সেগুলি ঝুঁটির মত খাড়া হ'য়ে ওঠে। যেমন আমাদের কাল বুলবুলের। কয়েক জাতীয় বুলবুলের মাথার মাঝখানের লোমগুলি এত বেশী দীর্ঘ যে সব সময়েই মাথার উপর ঝুঁটিটি কিরীটের মত শোভা পায়, যেমন আমাদের কানাড়া বুলবুলের মাথায় দেখা যায়। নিম্ন অঙ্গের, যে স্থান থেকে লেজ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ বস্তি প্রদেশের, বর্ণ এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য। এই বর্ণ বেশীর ভাগ হয় লাল। জাতিভেদে হলদে বা অন্য রং দেখা যায়। বাংলা দেশের অতি-পরিচিত কাল বুলবুল ও কানাড়া বুলবুলের বস্তি-দেশের রং টকটকে লাল। উত্তর বাংলায় কুচবিহার ও আলিপুর ডুয়ার্স অঞ্চলে যে বুলবুল দেখা যায় তাদের বস্তি প্রদেশের বর্ণ কমলালেবুর মত। এরা আসাম দেশের বাসিন্দা। বাংলা-আসামের সীমান্ত জেলায় সেইজন্য এরা নয়নগোচর হয়। ষ্টুয়ার্ট বেকার সাহেব বস্তি-প্রদেশের বর্ণকে কুলগত বৈশিষ্ট্য ব'লে স্বীকার করেন নাই। (২) তাঁর মতে দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্চে এদের পদদ্বয়ের অতিশয় হ্রস্বতা। এ কারণ ধরিত্রীপৃষ্ঠে বিচরণ করবার পক্ষে এরা

একেবারে অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়েছে। ভূমিতে অবতরণ করলেই এদের পুচ্ছ মাটিতে ঠেকে যায়, চলাফেরা করতে পারে না। কাজেই শাখামধ্যেই এরা বিচরণ করে। মাঝে মাঝে পুকুরের ধারে তৃষ্ণানিবারণের জন্য ভূমিতে অবতরণ করে। সন্ধ্যাবেলা জলের ধারে গাত্রমার্জ্জনা করতেও লক্ষ্য করেছি।

বাংলাদেশে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণের আশে পাশে দুই জাতীয় বুলবুল তাদের আনন্দ-কলরোলে ও সদাচঞ্চল স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীতে পল্লীশোভা বর্দ্ধন করে। একটি হচ্ছে সুবিদিত 'কাল বুলবুল'। এই পাখীকেই যত্রতত্র পোষা অবস্থায় দেখা যায় এবং এদের দিয়েই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিযোগিতা চলে। এর মাথা, গলা, বক্ষ ও লেজ কাল রঙের। পৃষ্ঠ কাল্‌চে-বাদামী; উদর ও পৃষ্ঠদেশের শেষে পুচ্ছমূল শুভ্র। কাল পাখীটির পৃষ্ঠপ্রান্তের এই শুভ্র স্থানটি বড়ই সুস্পষ্ট দেখায়। উত্তেজিত হ'লে মাথার চুল খাড়া হ'য়ে চূড়ার মত দেখায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ঘাড়ের লোমের সঙ্গে মিশে থাকে। অন্য বুলবুলটির নাম স্থানবিশেষে কানাড়া বুলবুল, কাঁটরা বুলবুল কিংবা কাঁড়া বুলবুল। কাল বুলবুলের মত এরা গোলগাল মোটাসোটা নয়। একটু ছিপ্‌ছিপে গড়নের। এদের দীর্ঘ ঝুঁটির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এদের দুই পাশের দুই গণ্ডোপরি একটি ক'রে উজ্জ্বল রক্তরেখা আছে। কানের আশপাশ সাদা। এদের কোনও কোনও স্থানে 'সিপাহী বুলবুল' বলা হয়। এদের মেজাজ 'কাল বুলবুলের' মত উগ্র নয়।

সারাদিন অনবরত শাখা হ'তে শাখান্তরে, বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ে বেড়ায়—সদাই ক্ষিপ্র, সদাই চঞ্চল; এদের উৎপতনভঙ্গী বেশ একটু তুল্‌কী চালের—বাতাসের ঢেউয়ে যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্ঠ-কাকলী ধ্বনিত হয়। বসন্তের প্রারম্ভ থেকে সারাটা গ্রীষ্মকাল এদের কলরব শোনা যায়। শীতকালে কদাচিৎ শোনা যায়।

দোয়েলের মত অসামাজিক পাখী এরা নয়। বৈশাখ থেকে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে; কারণ এই সময় এরা সন্তান উৎপাদন করে। কিন্তু দোয়েলের মত তালুক ভাগ ক'রে এরা বাস করে না। দল বেঁধেই আহার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। অন্য ঋতুতে দল বেঁধে রাত্রিযাপন করতে আমি এদের দেখেছি। **Fauna of British India** পুস্তকমালার পাখীর বহির সম্পাদক মহাশয় বলেছেন—**They are not gregarious in the true sense of the word.** কিন্তু গয়া সহরের অনতিদূরে শেরঘাটির পথে একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনেকগুলি গাছে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে কাল বুলবুল মহাকলরব করছে। নিশাযাপনের স্থানের জন্য পরস্পরের মধ্যে কলহ, কোলাহল ও নখর-সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ করবার পর যখন অস্তরবির প্রতিফলিত আলোটুকু নিভে গেল, তখন সবাই নিস্তব্ধ হ'ল। সুতরাং একে **gregarious** না বলে পারি না। তবে শালিক বা ছাতারের মত সর্ব্বদা জ্ঞাতিপরিবৃত হ'য়ে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মত এরা বেড়ায় না। ষ্টুয়ার্ট বেকার সাহেব এদের ঝগড়াটে বলেছেন। কিন্তু একাকী বিচরণশীল পাখীদের মত উৎকট জ্ঞাতিশত্রুতা এদের নেই। একই স্থানে খাদ্যান্বেষণে রত অবস্থায় ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে কলহ হওয়াটা বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণে ছাঁদা নিয়ে অতি-সামাজিক মানুষের মধ্যেও কলহবচসা বিরল নয়। পোষা অবস্থায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয় বটে। কিন্তু সেটা মানুষের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। দুই এক দিন অনাহারে থাকবার পর ভোজ্যের সন্ধান পেলে বুলবুল কেন বুলবুলের পালনকর্ত্তারাও মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হতে পারে।

নিদাঘ বর্ষার কয়টা মাসে এরা যে কতবার ডিম পাড়ে তার অন্ত নেই। কোনওবার ডিম অনুর্ব্বর হয়, কখনও বা সাপে কিংবা অন্য পাখীতে বাচ্চা খেয়ে ফেলে। অতএব জন্মস্থানে এদের সর্ব্বদা "ভয়েবচ"। বুলবুলের বাৎসল্য-স্নেহ খুব বেশী। একজন ইংরাজের পক্ষীগৃহে মার্কিণ দেশের রবিন্ পাখীর সঙ্গে এক জোড়া বুলবুল ছিল। রবিন্-পাখীর বাচ্চা হ'লে পুং-বুলবুলের এমনই বাৎসল্য জেগে উঠ্‌ল যে সে রবিনের বাচ্চাগুলিকে খাওয়াতে যেত। পুরুষ-রবিন বাধা দিতে এসে অনর্থক প্রহার লাভ করত। ভূমি থেকে বেশী উর্দ্ধে এরা বাসা রচনা করে না। মানুষের সান্নিধ্য এদের মোটেই বিচলিত করে না। পুঁথিতে লেখে যে পাহাড় অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই এদের ডিম পাওয়া গিয়েছে। কাল বুলবুলকে দার্জ্জিলিং সহরেও দেখেছি। কানাড়া বুলবুল নাকি পাহাড় দেশে আরও উর্দ্ধগামী হয়।

আহার সম্বন্ধে আমিষ-নিরামিষের বাচ্-বিচার এরা করে না। কীট ও ফলাদি উভয়ই খায়। তাল গাছে বাঁধা হাঁড়ির কাণায় বসে চঞ্চু দ্বারা রসপান করতে এদের দেখা গিয়েছে। মাঝে মাঝে এদের নেশার ঝোঁক হয়। বটপাকুড়ের ফল, তুঁতে, তেলাকুচো, ঘাসের বীজ প্রভৃতি এরা খায়। কানাড়া বুলবুল মটরসুটি প্রভৃতি ক্ষেতবাগানের ফল ধ্বংস করে বটে; কিন্তু কাল বুলবুল যেসব কীট উদরসাৎ করে সেগুলি বেশীর ভাগই শস্য ও ফলাদির অপকারী। কাজেই এরা মানুষের মিত্র মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এবং এরা যাতে নির্ব্বিঘ্নে বাস করতে পায় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

ট্রেণ

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

নিতাই ঘোষালের পুত্রবধূকে লইয়া গ্রামে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

বউটির বয়স বেশী নয়। কলিকাতায় বাপের বাড়ী। বিবাহ-সময়ের কি একটা খুঁত লইয়া বিবাহের পর হইতে আজ পাঁচ বৎসর বাপের বাড়ী যাইতে পায় নাই। কবে পাইবে কে জানে।

শাশুড়ী বকে, বউটি চুপ করিয়া থাকে। শান্ত স্বভাব, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ফর্‌সা রং, টানাটানা চোখ, মাথায় কোঁকড়ান চুলের রাশ। শাশুড়ী বলে, অলুক্ষণে। পাড়ার লোকে বলে, লক্ষ্মী বউ।

নিতাই ঘোষালের পুত্র বামাচরণ বাপ অপেক্ষাও বিচক্ষণ। বিবাহের পর হইতে সংসারবিষয়ে তাহার জ্ঞান বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। মাকে বলে,—গরীবের ঘর থেকে মেয়ে এনেছ, কেবল ঘ্যান্-ঘ্যান্ প্যান্-প্যান্। আস্‌ত যদি নলডাঙ্গার গাঙ্গুলীবাড়ীর মেয়ে, তো···

বউটি ঘরের মধ্য হইতে চুপি চুপি স্বামীকে ডাকে, মৃদু হাসিয়া বলে,—গাঙ্গুলীদের মেয়েকেই বিয়ে করলে না কেন?

বামাচরণ ভাবে বিদ্রূপ। বউ যেন তাহাকে চাবুক মারে। বুকের মধ্যে কবেকার নিষ্ফল প্রয়াসের নৈরাশ্য জাগিয়া উঠে। গাঙ্গুলীরাই তাহাকে মেয়ে দিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীর এ কথার রহস্যটুকু সে বুঝিতেই পারে না; ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে—কী! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!··· হারামজাদি···

বউটির মৃদু হাসি কোথায় মিলাইয়া যায়। থতমত খাইয়া সে চুপ করিয়া থাকে। বামাচরণ গলা চড়াইয়া আরও কত কি বলে; বউটির কানে তাহার সব কথা পৌঁছায় না। চোখ দুটি তাহার জলে ভরিয়া আসে। ক্রুদ্ধ বামাচরণ টেরি কাটিয়া কোট গায়ে দিয়া ষ্টেশনের ধানের কলে কাজে চলিয়া যায়। বউটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এমনই কতদিন তাহাকে গালাগালি খাইতে হয়। সকালের কাজকর্ম্ম সারিয়া দীঘির ঘাটে সে স্নান করিতে যায়। তালগাছগুলির গুঁড়ির ফাঁকে ও-ধারের মাঠটার কতকটা দেখা যায়। সবুজ মাঠ। স্থানে স্থানে সাদা কাশফুল, ধান-গাছের সবুজ পাতায় শিশিরের বুকে আলোর ঝিকিমিকি। প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, সূর্য্যের আলোয় সমস্ত মাঠটা যেন কথা কয়। দূরে অন্য গ্রামের দুই চারটি খড়ের ঘর বাঁশবনের ভিতর হইতে উঁকি মারে। মাঠের একপাশ দিয়া রেলপথ। মাঝখানে কাহাদের জমির পগারের মাটি উঁচু হইয়া থাকায় ঘাট হইতে রেলপথ দেখা যায় না। শুধু ট্রেণের শব্দ কানে আসে। সকালের ট্রেণ চলিয়া যায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িতে থাকে। সেই ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বউটির কত কথা মনে পড়ে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদিন এমনই প্রভাতে রেলগাড়ীতে চড়িয়া সে এই গ্রামে নববধূবেশে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল। তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, আর সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে পায় নাই।

বাপমায়ের কথা মনে পড়ে। ছোট ভাই নিমাই এখন কত কথা বলিতে শিখিয়াছে। তাহার বিবাহের সময় নিমাইয়ের সামনের দুটি "দুধে দাঁত" উঠিয়াছিল, সেই দাঁত দুইটির সাহায্যে তাহার সকল কথা বলিবার কি প্রয়াস। দিদিকে দেখিলেই নিমাই একমুখ হাসিয়া কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত, তি—তি—করিয়া দিদি বলিত। সেই নিমাই এখন ছয় বছরেরটি হইয়াছে। হয়ত হাতে-খড়ি হইয়া প্রথম ভাগ ধরিয়াছে। সে কি এখন দিদিকে চিনিতে পারিবে? মায়ের অম্বলের অসুখটা ভাল হইল কিনা কে জানে! বাবা কি এখনও রাত্রি সাতটায় আফিস হইতে ফেরেন? রোজই বলিতেন, সে আফিস ছাড়িয়া দিবেন, এত খাটুনি আর তাঁর সহ্য হয় না। এতদিন হয়ত তিনি অন্য আফিসে ঢুকিয়াছেন। বাড়ীর পাশে অমিয়া-দি' এখন কোথায় আছেন কে জানে? হয়ত এতদিন শ্বশুর-বাড়ীর ঝগড়া মিটিয়া গিয়াছে, এখন তিনি হুগলিতেই গিয়াছেন। তাহাদের ঝণ্টু, চাকর বুড়া হইয়াছিল, হয়ত চাকুরী ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা, কলিকাতা,···ট্রাম, রাস্তা, লোকজন, গলিতে গলিতে ফেরি-ওয়ালার ডাক,—সবই যেন এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়।

একেবারে তালগাছগুলির মাথায় সূর্য্য উঠিয়া পড়ে। সামনের মাঠের রং বদলাইয়া যায়। কত বিচিত্র পাখীর সুর কানে আসিয়া লাগে। একটা গভীর বেদনায় বউটির দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়। মনে পড়ে, বিবাহের পর তাহার বাবা দুইবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, ইহারা তাঁহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিতে দেয় নাই। গালি খাইয়া বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, ইহাদের বাড়ীতে জলস্পর্শও করেন নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া মাকে কতবার সে চিঠি লিখিয়াছে কিন্তু মায়ের নিকট হইতে কোন উত্তর পায় নাই। হয়ত উত্তর আসিয়াছিল, উহারা সে-সব চিঠি লুকাইয়া ফেলিয়াছে, কিছুই বলে নাই।

অনেক বেলা হইয়াছে আর দেরী করা ঠিক নয়। চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া বউটি গৃহে ফিরিয়া আসে। শাশুড়ী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলে,—কোথাকার লক্ষীছাড়া ঘরের মেয়ে তুমি বউমা,—চান্ করে আস্তে এত দেরী? কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি?

বউটির বলিতে ইচ্ছা করে, যমের-বাড়ী। কিন্তু সে কোন কথাই বলে না, কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢোকে। শাশুড়ী উঠানে দাঁড়াইয়া গালিগালাজ করিতে থাকে। বউটি এক মনে সংসারের কাজ করিয়া যায়।

দ্বিপ্রহরে ধানের কল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বামাচরণ রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত খাইতে বসে। কিন্তু বাটির ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই চীৎকার করিয়া উঠে। হাঁসের ডিমের তরকারীতে গোটা পেঁয়াজ, দু'খানা-করা আলু,—তা'ও আবার ঝাল-ঝাল মিষ্টি-মিষ্টি,—রংটাও হয়েছে লাল্‌চে। এ-রকম রান্না আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। বামাচরণের গলার স্বর ক্রমশঃ সপ্তমে চড়ে।

শাশুড়ী হঠাৎ মালা জপিতে জপিতে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসে,—ছেলের গলার আওয়াজের উপর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া বলে,—ও সব বিলিতি রান্না আমাদের বাড়ীতে চল্‌বে না বউমা। ঐ সব খেয়ে খেয়েই ছেলের আমার চেহারা হচ্চে দেখনা। এমন লক্ষীছাড়া বংশের মেয়ে এনেছিলাম, হাড় আমার জ্বালিয়ে খেলে! খাস্ না বামা, খাস্ না,—ও-সব এই বউ-ই গিলুক। কাল থেকে আমিই যা' পারি চাট্টি রেঁধে দোব।

বামাচরণ হঠাৎ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মাতা ছুটিয়া আসিয়া ছেলের হাত ধরে, বলে,—আমার মাথা খাস্ বামা, উঠিস্ না, দুধ আর পাটালি দিয়ে আজকের মত না-হয় চাট্টি ভাত খা। এমন লক্ষীছাড়া ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, ঠিক্-দুক্কুর বেলায় বাছার আমার খাওয়া হোল না গা!

বামাচরণ পুনরায় খাইতে বসে, বলে, এতদিন মুখ বুঁজে' এ-সব রান্না খেয়ে আস্‌ছি, কিছু বলি নি মা। কিন্তু আর নয়।

বউটি রান্নাঘরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বামাচরণের খাওয়ার পরে মাতা পাথরের থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসে। বউকে বলে—অমন করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত চল্‌বে না; গিল্‌বে এস।

মুহূর্ত্তের জন্য একটা দুঃসহ অভিমান, একটা উগ্র ক্রোধ বউটিকে কঠিন করিয়া তোলে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নীরবে শাশুড়ীর পাশেই ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসে। এরূপ নিত্যই ঘটিতেছে। রাগ দুঃখ বা অভিমান করিবে কাহার উপর? এ সংসারে না খাইয়া উপবাস করিলেই বা কাহার ক্ষতি? বউ মরিলে ইহাদের কিছুই দুঃখ হইবে না। আবার বউ আনিবে। কিন্তু মরিলে নিমাইকে ত সে আর দেখিতে পাইবে না। মাকেও নয়, বাবাকেও নয়। মা হয়ত কত কাঁদিবে। বাবা ম্লান মুখে না খাইয়াই আপিস করিবেন। নিমাই কিছু বুঝিতে পারিবে না,—মা'কে কাঁদিতে দেখিয়া সে-ও কাঁদিতে থাকিবে। না, মরা তাহার চলিবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দোক্তার কৌটা লইয়া শাশুড়ী ঘোষাল-বাড়ী বেড়াইতে যায়। বউটি ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে চুল মেলিয়া বসে। বামাচরণ ধানের কলে চলিয়া গিয়াছে, আসিবে সেই সন্ধ্যার পর। পাড়ার যে দুই চারিজন বউ-ঝি মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে বেড়াইতে আসে, তাহারা ত সব দিন আসে না। হয়ত আজ আর কেহ আসিবে না। বউটি অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া থাকে। পূবের জানালা দিয়া মিত্তিরদের বাঁশবাড়ি দেখা যায়। দুপুরের রৌদ্র উহার পাতায় পাতায় ঝিক্ ঝিক্ করে। বামুন-পাড়ার পথের ধারে পুরাতন প্রাচীরের মাথা ছাড়াইয়া আতা গাছগুলি বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে। কাঁচা আতায় পাখীরা ঠোকর মারিয়া যায়। ঐ প্রাচীরঘেরা বাগানটুকু পার হইলেই দীঘির ঘাট। দীঘির তালগাছগুলি মাথা তুলিয়া ঝাঁকড়া-চুলো চৌকীদারের মত দীঘিকে রাত্রিদিন পাহারা দেয়। এই জানালা দিয়া গাছগুলিকে দেখিয়া কি ভাবিয়া বউটি শিহরিয়া উঠে।

হঠাৎ ট্রেনের শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসে। দুপুরের গাড়ী কলিকাতায় যায়। হুইসেলের তীব্র আওয়াজে মধ্যাহ্নের সমস্ত স্তব্ধতা একবার সচকিত হইয়া উঠে। তালগাছসারির ও-ধারে মাঠের আকাশে কাল ধোঁয়া ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতাগামী ট্রেণ দেখিতে বউটির বড় ভাল লাগে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুযোগ তেমন একটা ঘটিয়া উঠে নাই। মাঠের পগারের উঁচু ঢিবিটাই রেলপথ আড়াল করিয়া সব মাটি করিয়া দিয়াছে। পগারের এ-পাশে মাঠের মধ্যে মস্ত আম গাছ। সেই আমগাছের একটা ডাল মাটি হইতেই ক্রমশঃ বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে। সেই ডাল বাহিয়া কিছুদূর উঠিতে পারিলেই পগারের ও-ধারের মাঠে কলিকাতাগামী রেলগাড়ী দেখা যাইবে। তবে ফিরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া স্নান করিতে হইবে। ওখানটায় আবার ভাগাড় ছিল। না-হয়, ও-সবে আর কাজ নাই। কলিকাতায় ত যাইতে পাইব না। শুধু রেলগাড়ী দেখিয়া লাভ কি? আচ্ছা, ঐ রেলগাড়ীতেই ত তাহার মত কত বউ-ঝি কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে যায়। গাড়ীর জানালায় তাহাদের মুখ দেখা যাইবে ত!

কখন্ রৌদ্র চুলের রাশি ছাড়াইয়া যায়! বউটি আবার সরিয়া বসিয়া প্রখর রৌদ্রে চুল মেলিয়া দেয়। চোখের কোণে অনাহূত অশ্রুবিন্দু ঝিক্ ঝিক্ করে।

চোরের মত পা টিপিয়া আসিয়া কে বউটির পিছনে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ দুই হাতে তাহার চক্ষু দুটি চাপিয়া ধরে।

বউটি হঠাৎ ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে। তারপর নবাগতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলে,—ওমা, বিজলীলতা যে। কবে এলে ?

নবাগতার বয়স বউটির অপেক্ষা বেশী নহে। পাড়ারই মুখুয্যেদের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রায় দুইমাসের পর বাপের বাড়ী আসিয়াছে। রূপে আনন্দে সজ্জায় ঝলমল করিতেছে। বউটি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলে। বিজলী বসে। কিন্তু তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া যায়। চোখ টিপিতে গিয়া বউটির চোখের জলে তাহার হাত ভিজিয়া গিয়াছে। বিস্মিত চোখে বিজলী প্রশ্ন করে—কাঁদছিলে ভাই ?

বউটি হাসে, বলে,—কৈ আর কাঁদ্‌ছিলাম ? কান্না আর আসে কৈ ভাই ? তারপর বিজলীর হাতটি ধরে, বলে,—এস, এস, ঘরের মধ্যে বস্‌বে এস।

ঘরের মধ্যে মাদুরের উপর দুইজনে পাশাপাশি বসে। কত কথা হয়। বিজলীর মুখে শ্বশুরবাড়ীর প্রশংসা আর ধরে না। শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে কোন কাজই করিতে দেন না। অবস্থাপন্ন লোক তাঁহারা, বাড়ীতে কত লোকজন। স্বামীর ভালবাসারও অন্ত নাই। স্বামীর কথা বলিতে বিজলী প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কত মিলন-মধুর অর্দ্ধরাত্রির কথা সে কহিয়া যায়। আজই আবার চিঠি লিখিতে হইবে। মন কেমন হু হু করিতেছে।

বউটি বাহিরের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পড়ন্ত রৌদ্রে বনের মাথায় মাথায় সোনার অক্ষরে কাহারা যেন এই বিজলীরই মত বিরহ-লিপিটি লিখিয়া যায়। কত হারানো দিনের সুখ-দুঃখের কাহিনী ঐ রৌদ্রলেখায় ফুটিয়া উঠে। মায়ের চিঠি কতদিন সে পায় নাই। তাহারা সব কেমন আছে কে জানে!

সন্ধ্যার পর শাশুড়ী নিজেই রান্নাঘরে ঢোকেন। বলেন, তোমায় আজ আর রাঁধ্‌তে হবে না বৌমা। বাছার আমার ও-বেলা খাওয়াই হয় নি।

বউটি কোন কথাই বলে না। বলিবার কিছুই নাই। উহারা তাহাকে যেন বিষচক্ষে দেখিয়াছে। প্রথম প্রথম স্বামীর একটু-আধটু আদরও সে পাইয়াছিল। কিন্তু আজকাল ? স্বামী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহেন না।

কতবার রাত্রে ট্রেণের শব্দে ঘুমের ঘোরে তাহার মনে হয়, ট্রেণখানা বুঝি মাঠের পথ হইতে বাঁকিয়া আসিয়া তাহাদেরই এই পূর্ব্বদিকের জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহারই যাইবার অপেক্ষায় কতক্ষণ সেখানে রহিল। কতক্ষণ! গাড়ীর জানালায় কত অপরিচিত মুখ সে দেখিতে পায়। তাহার মধ্যে তাহার মা'ও যেন জানালায় বসিয়া তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন! চিনিবার যেন উপায় নাই। 'মা' বলিয়া ডাকিতে গিয়া হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। শিহরিয়া উঠিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে পূর্ব্বদিকের জানালার কাছে ছুটিয়া যায়। বাহিরের স্তব্ধ আকাশের নীচে কে যেন একটা কাল পর্দা টাঙাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কিছুই দেখিতে দিবে না। বাঁশঝাড়ের মাথায় ফালি-চাঁদের ক্ষীণ আলোটুকু এখনই বুঝি নিভিয়া যাইবে। বাতাসে বনতুলসীর গন্ধ, বাঁশপাতার শির্‌ শির্‌ শব্দ, রাত্রিচর পাখীর ডাক, সমস্ত মিলিয়া এই অন্ধকার রাত্রির গোপন-রহস্যটুকু তাহাকে শুনাইতে চায়। বউটির মনে হয় এই অন্ধকারের বুক চিরিয়া কাহারা যেন দলে দলে কোথায় চলিয়াছে। দীঘির তালগাছসারির পাশ দিয়া, পগার পার হইয়া, মাঠ ডিঙ্গাইয়া সকলে রেললাইনের দিকে ছুটিয়াছে। অন্ধকারের মধ্য হইতে তাহারা নীরবে অঙ্গুলি নাড়িয়া বউটিকে ডাকে। ট্রেণ আসিবার আর বিলম্ব নাই।

কতক্ষণ ধরিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ফালি-চাঁদ কখন আকাশের গায়ে মিলাইয়া যায়। ভোরের তারা পূব আকাশে জল্‌ জল্‌ করে। বউটি শয্যায় আসিয়া পুনরায় শোয়। এখনি সকাল হইয়া যাইবে। সংসারের কাজ-কর্ম্মের তুচ্ছতম ত্রুটিতে আবার সেই লাঞ্ছনা ও শ্লেষ সহিতে হইবে।

সেদিন দুপুরটা ভাল লাগিতেছিল না। বিজলী আসে নাই। শাশুড়ীও পূর্ব্ব অভ্যাসমত দোক্তার কৌটা হাতে লইয়া ঘোষালবাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে আকাশটা ঝলসিয়া উঠিতেছে। পথের ধারের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের মধ্য হইতে একটা ঘুঘু একটানা ডাকিতেছিল। ঘোষালবাড়ীর উঠানের নারিকেলগাছগুলির পাতা রৌদ্রে তলোয়ারের মত ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল। বউটির মনে হইল, এই উগ্র রৌদ্রভরা দুপুর বেলায় দীঘির পাড়ে বসিয়া সে শুধু সামনের মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিবে। হু হু করিয়া অশান্ত বাতাস কতদূর হইতে মাঠের উপর দিয়া বহিয়া আসিবে। ঊর্দ্ধে নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ, নিম্নে সবুজ মাঠে সাদা সাদা কাশের গুচ্ছ, দীঘির গভীর কাল জল, উঁচু পাড়ের উপর তালগাছের সারি, অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা,—কত কথা মনে পড়িবে। তারপর যখন দুইটার গাড়ী কলিকাতার দিকে চলিয়া যাইবে, বাঁশী বাজিবে, পগারের ও-ধারে ধোঁয়া পড়িবে,—সে ধোঁয়া আবার ধীরে ধীরে আকাশে মিলাইয়া যাইবে,—তখন সে চুপি

চুপি আবার গৃহে ফিরিয়া আসিবে। কাহাকে কোন কথা বলিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে বউটির মনে সত্য সত্যই সাধ হইল, দীঘির ঘাটে গিয়া এখন একবার কলিকাতার দিকে দুইটার গাড়ী যাওয়া দেখিবে। দীঘি তাহাদের বাড়ী হইতে অধিক দূর নহে। কতবার সে একেলা দুপুরবেলায় জল আনিতে সেখানে গিয়াছে। আজিও না হয় সে একবার সেখানে গেল, তাহাতে ক্ষতি কি? দুইটার গাড়ী চলিয়া গেলেই সে ফিরিয়া আসিবে।

ধীরে ধীরে বউটি দীঘির ঘাটে গেল। নির্জ্জন ঘাট। পশ্চিম পাড়ের তালগাছসারির ছায়া কতকটা জলের উপর পড়িয়াছে। দুইটা শঙ্খচিল ঘাটের পাশের তালগাছ হইতে হঠাৎ মাঠের দিকে উড়িয়া গেল। বউটি ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া। দুইটার গাড়ী যাইতে তখনও বোধ হয় একটু দেরী ছিল।

একবার ঐ উঁচু পগারের উপর আম গাছটির তলায় গিয়া দাঁড়াইলে হয় না! সেখান হইতে সমস্ত রেলগাড়ী বেশ পরিষ্কার দেখা যাইবে। ফিরিয়া আসিয়া দীঘিতে স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিলেই হইবে। কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। রেললাইনের খুব নিকটে দাঁড়াইয়া কলিকাতাগামী রেলগাড়ী দেখিবার তাহার একটা বড় সাধ। নিজে ত' কখনও আর বাপের বাড়ী যাইতে পাইবে না,—যাহারা কলিকাতায় যাইতেছে তাহাদিগকে দেখিলেও মনে যেন শান্তি আসে। কিন্তু ঐ পগারের আমগাছটির কাছে লোকে রাত্রে ভূত না পেত্নী কি সব দেখিতে পায়। ওখানে যাওয়াটা কি ঠিক হইবে!

দূরে আকাশে খানিকটা কাল ধোঁয়া ছড়াইয়া পড়িল। এইবার ট্রেণ আসিবে। এখনও শব্দ শোনা যায় নাই, এইবার যাইবে। বউটির আর ভাবিবার সময় নাই। কলিকাতাগামী ট্রেণ দেখিবার আগ্রহে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া পগারের উঁচু ঢিবিটার পাশে আমগাছটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

পগারের উপর শিয়ালকাঁটা ও কণ্টিকারীর দুর্ভেদ্য ঝোপ। উঠিবার উপায় নাই। চাপড়া চাপড়া হইয়া সমস্ত মাটি জুড়িয়া কাঁটার রাজত্ব। হঠাৎ সেই কাঁটা-বন হইতে একটা সাপও বাহির হইয়া গেল। ঢিবির উপর ওঠা অসম্ভব।

দূরে ট্রেণের শব্দ। আমগাছের যে মোটা ডালটা গুঁড়ি হইতে বাহির হইয়া মাটির কাছে কাছে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে তাহাতে চড়িলে হয় না? কে আর দেখিতে পাইবে? গাছে চড়ার অভ্যাস না থাকিলেও এ ডালে চড়িতে কষ্ট নাই। সে খুব সাবধানে ডাল ধরিয়া ধরিয়া উঠিবে। শব্দটা খুব নিকটে শোনা যাইতেছে, ট্রেণও আসিয়া পড়িল। বউটি একবার চারিদিক চাহিয়া ডালের উপর উঠিয়া পড়িল।

উঃ মাগো! ইঞ্জিনটা কি জোরে আসিতেছে! ইষ্টিসান অনেক দূরে, জোরে যাইবে না ত' কি? ধূলা উড়াইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া গর্জ্জন করিতে করিতে লাইনের উপর দিয়া ইঞ্জিনটা ছুটিতেছে। কানে যেন তালা লাগিয়া যায়। আচ্ছা, পড়িয়া ত' যায় না। কতগুলা গাড়ী? এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত···এতগুলো গাড়ী কত জোরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গাড়ীর জানালায় কত লোক বসিয়া আছে। ঐ যে মাথার ঘোমটা ফাঁক করিয়া কাহারা বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বয়স কত? দেখিতে কেমন? কিছুই ভাল দেখা যাইতেছে না। উহারা কি বাপের বাড়ী যাইতেছে? গাড়ীটা আস্তে আস্তে গেলে সে উহাদিগকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইত। গাড়ী চলিয়া গেল। উঃ কি ধূলা! বউটি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

ট্রেণ আর দেখা যায় না। লোহার লাইন দু'টা রৌদ্রে রূপার মত ঝক্ ঝক্ করে। বউটি আমগাছ হইতে নামিয়া আসিল। এইবার একটু ভয়-ভয় করে।

হঠাৎ পগার-ঢিবির পাশ হইতে অবিনাশ চক্কোত্তি উঁকি মারিল। চক্কোত্তি জমিতে ধান দেখিতে গিয়াছিল। ঠিক্-দুপুর বেলায় নির্জ্জন ভাগাড়ের কাছে ভুতুড়ে আমগাছ হইতে সাদা-কাপড়পরা আধঘোমটাটানা একটা মেয়েমানুষকে সটান নামিতে দেখিয়া ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল। হাতে পৈতা জড়াইয়া রামনাম জপিতে জপিতে সে ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পেত্নীটা হাওয়া হইয়া উড়িয়া গেল না, বা মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া তাহাকে ধরিতেও আসিল না। যাক্, বাঁচা গেল। পেত্নীটা তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দুর্গা-দুর্গা-রাম-রাম। কিন্তু চক্কোত্তির ভয় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, পেত্নীটা দীঘির ঘাটের দিকে যায় যে! ঐ দিকে ত' তাহাকেও যাইতে হইবে। চক্কোত্তিও চুপি চুপি দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিল। প্রাণে ভয়ও খুব, অথচ আগ্রহও কম নহে। একি!—চক্কোত্তির চক্ষু কপালে উঠিল! পেত্নীটা যে বউ সাজিয়া কাঁকালে ঘড়া লইয়া ঘোমটা টানিয়া গ্রামের দিকে চলিল! ব্যাপারটা কি, দেখিতে হইবে ত'। চক্কোত্তির বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

বউটি বাড়ীতে ঢুকিল। শাশুড়ী তখনও ফেরে নাই। চক্কোত্তি দূর হইতে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে পাড়ার জন সাতেক মাতব্বরের সহিত চক্কোত্তি মহাশয় আসিয়া বামাচরণ ও তাহার মাতাকে ডাকিল।

একটু তফাতে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া চক্কোত্তি মহাশয় চুপি চুপি আদ্যোপান্ত সব বলিয়া গেল। বামাচরণ ও বামাচরণের মাতা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। চক্কোত্তি বলিল, খুব সাবধান, যেন টের না পায়। একটু নজরে নজরে রেখো, আলাদা ঘরে শুতে দিও, ছোঁয়া-টোয়া খেও না। ঠিক-দুকুর বেলা আর নিশুতিরাতেই ওরা বেরিয়ে গিয়ে মড়া-টড়া খেয়ে ফিরে আসে। তোমার আগেকার বউ কি আর বেঁচে আছে? বউকে চিবিয়ে খেয়ে তা'র চেহারা ধরে' ও অনেক দিন থেকেই বউ সেজে এখানে আছে। কালই কুড়োরাম রোজাকে আনতে লোক পাঠাও। সেবার ও-পাড়ায়—চক্কোত্তি একটা রোমাঞ্চকর গল্প বলিয়া যায়; সকলে হাঁ করিয়া শোনে। গল্পশেষে বামাচরণ ও বামাচরণের মাতাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া চক্কোত্তির দল চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বউটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, শাশুড়ী আসিয়া ভয়ে ভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কেমন বউ সাজিয়া বসিয়া আছে দেখ, ধরিবার জো'-টি নাই! কথাবার্ত্তায় ঠিক যেন মানুষ। বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই,—জানিতে পারিয়াছি বুঝিলে আর রক্ষা থাকিবে না। শাশুড়ী কোন কথাই বলে না। বউটি একটু আশ্চর্য্য হইল।

শাশুড়ী বলিল,—আজ আর আমি কিছু খাব না। বামাচরণ ও-পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে গেছে,—সেখানে ছেলে-ছোকরাদের কি সব গান বাজনা হবে, রাত্রে ফিরব না বলে গেছে, আমারও শরীর ভাল নেই। তুমি খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়'।

কথাগুলো শাশুড়ী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখস্ত বলার মত বলিয়া যায়। টের পাইয়াছি জানিলে কি আর রক্ষা আছে, এখনি হয়ত মুট্ করিয়া ঘাড়টি মট্‌কাইয়া দিয়া ভাগাড়ের আম গাছে গিয়া আশ্রয় লইবে। কালই রোজা আসিয়া যাহা-হয় একটা কিছু করুক। আসল বউকে ত' পেত্নীটা মারিয়াই ফেলিয়াছে, তাহাকে ত' আর ফিরিয়া পাইব না। বউটির কত আচরণই এখন রহস্যময় হইয়া উঠে। ভাগ্যে চক্কোত্তি মহাশয় ধরিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা এতদিন কি হইত কে জানে? ভূতের সঙ্গে এক সংসারে বাস করা ত'সহজ নহে, প্রাণটি হাতে করিয়া থাকিতে হইবে। শাশুড়ী কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া সরিয়া যায়।

বউটি আশ্চর্য্য হয়; কিছুই বলেনা কিন্তু। ক্ষুধা পাইলেও একার জন্য রাঁধিতে ভাল লাগে না। মুড়ি খাইয়াই না-হয় রাতটা কাটান' যাক্। সামান্য কিছু খাইয়াই বউটি আপনার ঘরটিতে শুইয়া পড়ে।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়। কি জানি কেন ঘুম আর আসে না। কোথাকার একটা বেদনার পাথর যেন বুকের উপর আরও জাঁকিয়া বসে। এক একবার কাঁদিতে ইচ্ছা করে। কোথায় যেন কি হইতেছে, কাহারা দল বাঁধিয়া যেন তাহার সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়াছে। তাহাকে তাহারা বাপের বাড়ী যাইতে ত' দিবেই না, এবাড়ী হইতেও যেন তাড়াইতে চায়। বউটি উঠিয়া শয্যায় বসে। এ-সব কি কথা মাথায় আসিতেছে! পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চায়। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘ করিয়া তারাগুলাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস একটু জোরেই বহিতেছে। বাঁশঝাড়ে বাঁশে বাঁশে ঘষিয়া গিয়া একপ্রকার তীব্র করুণ শব্দ উঠিতেছে। কোথায় যেন দূরে বৃষ্টি হইতেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। প্রাচীর-ঘেরা মল্লিকদের বাগানে কাঁঠালী চাঁপা ফুটিয়াছে। বউটি জানালার গরাদে ধরিয়া একদৃষ্টে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ দূরে—দীঘির ও-পারের মাঠটায় ইঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠে। রাত্রির শেষ ট্রেণ কলিকাতার দিকে চলিয়া যায়।

পিপাসা পাইতেছে। বউটি ঢক্-ঢক্ করিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। ঘুম এখনও আসিতেছে না কেন? আর কি একটিবারও মায়ের কাছে যাইতে পাইবে না? নিমাইয়ের সহিত, মায়ের সহিত, বাবার সহিত দেখা করিয়াই সে চলিয়া আসিবে। শুধু একটি দিনের জন্য ইহারা তাহাকে কি ছাড়িয়া দিবে না? বউটির চোখের উপর মায়ের মুখখানি ভাসিয়া উঠে। মনে হয়, সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না। মরিবার আগে মাকে কি একটি বারও দেখিতে পাইবে না?

বাহিরে মেঘ ক্রমশ ঘনাইয়া আসে। ঝড়ের বেগ বাড়িয়া উঠে। হু-হু করিয়া ভিজা বাতাস জানালা দিয়া আসিয়া বউটির গায়ে লাগে। কত কথাই তাহার একে-একে মনে আসে। ভাবিতে ভাবিতে সে কখন মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়ে।

সকালে বউটির ঘুম হইতে উঠিতে একটু দেরী হয়। শাশুড়ী দুই চারিবার উঁকি মারিয়া ঘুমন্ত বউটিকে দেখিয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছে,—রাত্রে বোধ হয় ভাগাড়ে-পগারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এখন ঘুমাইবে বৈ কি! আপন ইচ্ছায় যখন হোক্ ও উঠুক্, ঘুম ভাঙ্গাইয়া কি শেষে সে বিপদ ডাকিয়া আনিবে? একবার না-হয় চক্কোত্তি মহাশয়ের কাছে যাওয়া যাক্।

এক ঝলক্ প্রভাতের রৌদ্র জানালা দিয়া আসিয়া বউটির মুখের উপর পড়িতেই সে ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, উঃ এতখানি বেলা হইয়া গিয়াছে? কেহ ত' তাহাকে ডাকে নাই! তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে সংসারের কাজে লাগিয়া গেল। শাশুড়ী কোথায় গিয়াছেন, বাড়ীতে কেহ নাই। সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে করিতে বউটির কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন কি ঘটিয়াছে; যেন সকলে মিলিয়া কোথায় কি একটা ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে।

পাশের বাড়ীর নফর গোঁসাইয়ের তিন বৎসরের মেয়েটি প্রায়ই ইহাদের বাড়ীতে আসে। বউটি কতবার তাহাকে নারিকেল-নাড়ু বা পাটালি খাইতে দিয়াছে। নারিকেল-নাড়ুর লোভেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক প্রত্যহ সকাল বেলায় মেয়েটির একবার করিয়া এখানে আসা চাই। আজও সে আসিল। চুপি চুপি বউটির পিছনে গিয়া তাহার চোখদুটা চাপিয়া ধরিল। বউটি হাসিয়া বলিল—কে রে, নন্তু? মেয়েটি একগাল হাসিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল—দাও। বউটি হাসিল, বলিল আজ যে ঘরে কিচ্ছু নেই নন্তু। নন্তু নিরাশ হইয়া বড় বড় চোখ বাহির করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। বউটি হঠাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। নন্তু বুঝিতে পারিল, নারিকেল-নাড়ুত সে পাইবেই,—তাহার সঙ্গে পাটালিও। বউটি এতক্ষণ শুধু দুষ্টামি করিতেছিল। আদরে গলিয়া গিয়া নন্তু তাহার হাতের কচি আঙুলগুলা বউটির মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। বউটি হাসিয়া বলিল, তুই খাবি নারিকেল নাড়ু, আর আমি খাব তোর আঙুল? বারে দুষ্টু মেয়ে!

হঠাৎ পিছনে চাপা কান্নার শব্দ শুনিয়া বউটি আশ্চর্য্য হইয়া দেখে শাশুড়ী ও নন্তুর মা দাঁড়াইয়া আছে। নন্তুর মা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। উদ্বিগ্ন স্বরে শাশুড়ী বলে,—নামিয়ে দাও ওকে বউমা, আহা ঐটুকু মেয়ে—ওর উপর কেন মা দৃষ্টি দাও।

কথাটা বলিয়াই শাশুড়ী চমকাইয়া উঠে,—ঐ যাঃ, এইবার বুঝি জানিতে পারিল আমরা টের পাইয়াছি। কথাটা বলা ভাল হয় নাই। তাড়াতাড়ি কথাটা ঢাকিয়া লইয়া বলেন, এত বেলা হ'ল এখন কি ছেলেপুলে নিয়ে খেলা করবার সময়?

নন্তুর মা তাড়াতাড়ি নন্তুকে বুকে তুলিয়া প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার আঙ্গুলগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া লয়, আঙুলে দাঁত বসাইল না কি? পেত্নীদের অসাধ্য ত কিছুই নাই! হয়ত আঙুল মুখে পুরিয়া রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে। উঃ—। নন্তুর মা শিহরিয়া উঠে।

বউটি অবাক্ হইয়া যায়। নন্তুর মায়ের কাঁদিবার কারণটিই বা কি? শাশুড়ীর কথাটা মনে পড়ে,—ওর উপর দৃষ্টি পড়া কি ভাল? বউটি ভাবে, এসব কি রহস্য?

নন্তুর মা নন্তুকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। শাশুড়ী ভয়-কম্পিত স্বরে বলে,—বামা আজও এখানে খাবে না! আমাকে আবার ঘোষাল-গিন্নি নেমন্তন্ন করেছে। তুমি শুধু তোমার মত চাট্টি রেঁধে নিও।

বউটি আশ্চর্য্য হইয়া বলে, ঘোষাল-গিন্নির বাড়ীতে আজ কি মা, তোমায় নেমন্তন্ন করলে?

শাশুড়ী আমতা-আমতা করিয়া কি একটা কারণ দেখায়। কিন্তু বউটি তাহা ভাল বুঝিতে পারে না। বলে, তবে থাক্‌গে মা, শুধু আমার একলার জন্যে রেঁধে আর কি হবে? চাট্টি মুড়ি খেয়েই থাক্‌ব'খন।

শাশুড়ী ভাবে, তা'ত বটেই, রাত্রে কোথায় মড়া-টড়া খেয়ে এসেছ যাদুধন, ক্ষিদে থাক্‌বে কোথা থেকে? কুড়োরাম রোজাকে বামা আমার আন্‌তে গেছে, ও-বেলা তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পাবে। প্রকাশ্যে বলে, তবে আমি চল্লাম বউমা, ঘোষাল-গিন্নির বাড়ী।

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। বউটি সকালের কাজকর্ম্ম সারিয়া স্নান করিবার জন্য দীঘির ঘাটে যায়। কিন্তু একি হইল? গ্রামের কোন বউঝিই আর তাহার সহিত কথা কহিতে চাহে না। তাহাকে দেখিলে তফাৎ দিয়া চলিয়া যায়। ডাকিয়া কথা কহিতে গেলে তাহারা তাড়াতাড়ি পলায়ন করে। বউটি কিছুই বুঝিতে পারে না। ধীরে ধীরে সে দীঘির ঘাটে আসিয়া বসে। ঘাটে তখন কেহই নাই। তালগাছ সারির ফাঁক দিয়া সেই সোনার বরণ মাঠখানি দেখা যায়। সকালের রৌদ্র ধানের শীষে শীষে ঝিক্‌মিক্ করে। কলিকাতা যাইবার ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছে। এখনই ট্রেণ আসিবে। কবে সে ঐ ট্রেণে করিয়া কলিকাতায় যাইতে পাইবে কে জানে! আর হয়ত এ জীবনে তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া ঘটিবে না। কোথায় কি যেন একটা গুরুতর কাণ্ড হইতেছে। সে কিছুই স্থির করিতে পারে না।

দূরে ট্রেণের শব্দ। ট্রেণ আসিতেছে। বউটি অসীম আগ্রহে উঠিয়া দাঁড়ায়। একবার ইচ্ছা হয় ছুটিয়া গিয়া পগারের সেই আম গাছের ডালে চড়িয়া ট্রেণ যাওয়া দেখে। সেই রকম ভয়ানক শব্দ করিয়া ধূলা উড়াইয়া ধোঁয়া ছড়াইয়া চক্‌চকে লাইনের উপর দিয়া ট্রেণখানি মাঠের উপরে ছুটিয়া চলিবে। ঐ ট্রেণে চড়িয়া সে কি আর একটিবারও কলিকাতায় যাইতে পারিবে না? বউটির দুই চোখ ভরিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে। আচ্ছা, হঠাৎ সে যদি কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? মা তাহাকে দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিবে,—বাবা সে দিন আর আফিসে যাইবেন না। ছোট ভাই নিমাই প্রথমটা চিনিতেই পারিবে না। কেমন করিয়াই বা চিনিবে? কতদিন দেখে নাই। সে নিমাইকে বুকে চাপিয়া ধরিবে। নিমাইয়ের মুখটিতে চুমু খাইয়া বলিবে, আমি তোর দিদিরে নিমাই, আমায় চিনতে পারলি না? তারপর সারাটা দিন কত কথা কত কাজ। সন্ধ্যার পরে সে মায়ের বুকের খুব কাছটিতে শুইয়া শ্বশুরবাড়ীর গল্প করিবে। সারারাত্রি এমনি করিয়াই কাটিয়া যাইবে। নিমেষের জন্য বউটির মুখ অপূর্ব্ব আনন্দ-স্বপ্নে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হঠাৎ কাহার পদশব্দে চমকিয়া

চাহিয়া দেখে মুখুয্যেদের ছোট বউ ঘড়া লইয়া স্নান করিতে আসিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই সহসা ছোট বউ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর এক পাও অগ্রসর না হইয়া তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকেই ফিরিয়া গেল। বউটি ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে, এসব কি কাণ্ড!—তাহাকে দেখিয়া সকলে সরিয়া যায় কেন?

ট্রেণ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। ঐ দূরে একটা রেখার মত ধোঁয়া ক্রমশঃ আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বেলা হইয়া পড়িল। এখানে বসিয়া আর দেরী করিয়া কি হইবে? বউটি স্নান সারিয়া ঘড়ায় জল ভরিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এত লোক কেন? তাহার স্বামীর পাশে দাওয়ায় বসিয়া ও ঝাঁকড়া-চুল বিশ্রী লোকটা কে? তাহার দিকে অত কটমট করিয়া তাকায় কেন? তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বউটি রান্নাঘরে গিয়া দাঁড়ায়। তাহার ঘরের পথ বন্ধ করিয়া উহারা কেন বসিয়া আছে? কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বউটির বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে থাকে।

কুড়োরাম রোজা বামাচরণকে চীৎকার করিয়া বলে,—কতই দেখলাম, ও দেবে আমার চোখে ফাঁকি! ও ঠিক তা'-ই বটে। দেখ্‌লে না আমায় দেখেই তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল! হুঁ—হুঁ—বাবা, মিথ্যেই কি আর এ বিদ্যে শিখেছিলাম।

সমবেত গ্রামবাসী কুড়োরামের বিদ্যার প্রথম নমুনা পাইয়াই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কেহ কোন কথা কহিল না। কুড়োরাম বামাকে বলিল,—ওকে এখানে নিয়ে এস।

বামা তবুও যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া কুড়োরাম কহিল,—*ভয় পাচ্ছ? না, কিছু ভয় নেই। এই শেকড়টা বাঁ হাতে মুঠো করে' ধরো। বাস্। যাও—*

বামা রান্নাঘরে ঢুকিতেই বউটি যেন চমকিয়া উঠে,—বলে, এসব কি কাণ্ড! ওরা সব কা'রা? কি কর্‌তে এসেছে এখানে?

বামাচরণ কোন উত্তর দেয় না। শুধু বলে, বাইরে এস।

বউটি অবাক্ হইয়া বলে,—এই ভিজে কাপড়ে? তুমি কি ক্ষেপ্‌লে নাকি? ওদের সামনে কেন বেরুব আমি?

কুড়োরাম রোজা ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া বলে, আস্‌তেই হবে তোকে,—আস্‌বি না কি! এই সরষে-পড়া রেখেছি, দেখি কেমন করে' তুই না আসিস্!

বউটি আশ্চর্য্য হইয়া বলে,—ও লোকটা ও-সব কথা কা'কে বলছে?

বামাচরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কুড়োরাম রোজা এইবার একমুঠা সরিষা লইয়া নিজে উঠিয়া আসে। রান্নাঘরের কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলে,—এই সরষে-পড়া দেখেছিস্? ভাল চাস্ ত শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়।

রোজার পিছনে পিছনে অনেক লোকই আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ভিড় করে। বউটি স্তম্ভিত হইয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, তারপর হঠাৎ স্বামীর পা' দুইটা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—ও লোকটা কেন আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে?—তুমি ওকে বারণ কর।

'ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লে রে' বলিয়া সবেগে পা ছাড়াইয়া লইয়া বামাচরণ একলাফে উঠানে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোক হুড়্‌মুড়্ করিয়া জড়াজড়ি করিতে করিতে চীৎকার করে। কুড়োরামও ভয়ে দুই পা পিছাইয়া যায়। কিন্তু রোজা হইয়া ভুতের ভয়ে পেছপাও হইলে চলিবে কেন? সে তখন নিজের সাহস দেখাইবার জন্য সজোরে বউটির হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া উঠানে দাঁড় করায়, লজ্জায় অপমানে বউটির চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে। কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার লোপ পায়।

কুড়োরাম চীৎকার করিয়া বলে, চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে! হুঁ হুঁ আমার নাম কুড়োরাম বাউরি, বাবুরামের ছেলে আমি। অনেক ভূতপেত্নী চরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। তুই দিতে চাস্ আমার চোখে ধূলো? কতদিন থেকে এখানে আছিস্ বল্,—নইলে—

লাঞ্ছনায় অপমানে বউটি কাঁপিতে থাকে। তাহারই বাড়ীতে, তাহার স্বামী শাশুড়ী ও পাড়াপড়্‌শীর সম্মুখে এ লোকটা তাহাকে এতটা অপমান করিতে সাহস পাইল কি করিয়া। কৈ, স্বামী বা শাশুড়ী কেহই ত কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। বউটির বাহ্যজ্ঞান যেন লোপ পাইয়া *আসিতেছিল। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল সে এই স্থান* হইতে ছুটিয়া পলায়ন করে। কিন্তু সে তাহা পারিল না, শুধু আবিষ্টের মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এইবার কুড়োরাম রোজা চোখ পাকাইয়া কতকগুলি সরিষা লইয়া বিড়বিড় করিয়া কি মন্ত্র পড়িয়া বউটির মুখের উপর মারিতে থাকে। বউটি ভাবে এই বর্ব্বরটার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? তাহাকে কি ভুতে পাইয়াছে? কৈ, সে নিজে ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে ত' তাহার জ্ঞান ঠিকই আছে। কখন আবার তাহাকে ভুতে পাইল! নিজের কয়দিনের সমস্ত কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া স্মরণ করিয়াও সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

বউটিকে নীরব থাকিতে দেখিয়া রোজার জিদ্ আরও বাড়িয়া যায়। চীৎকার করিয়া চোখ পাকাইয়া বলে,—বল্, কদ্দিন থেকে এখানে আছিস্?

বউটি কোন কথাই বলিতে পারে না। শুধু শাশুড়ী ও স্বামীর দিকে কাতর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কিন্তু বউটির অপমানে তাহারা ত' এতটুকুও অপমান বোধ করে না। রোজা পুনরায় অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া বলে, শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না? বলি কদ্দিন থেকে এখানে আশ্রয় নিয়েছিস্? লজ্জায় ও ভয়ে বউটি কাঁদিয়া ফেলে। কিন্তু কেহই তাহার সে কান্নার প্রতি মমতা দেখায় না। রোজা এবার জোর করিয়া বউটির হাতে একটা হ্যাঁচকা টান্ মারে,—শীগ্‌গির বল বল্‌চি,—নইলে—

বউটি হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠে। রোজার বুকে সজোরে এক লাথি মারিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলে, এ লোকটা আমায় অপমান কর্‌বে, আর তুমি দাঁড়িয়ে তাই দেখবে? দূর করে' দাও একে,—এসব কি কর্‌ছ তোমরা?

লাথি খাইয়া রোজার রাগ ভয়ানক বাড়িয়া যায়। সে তৎক্ষণাৎ সমবেত লোকগুলির দিকে ফিরিয়া বলে,—দেখছেন মশাই আপনারা, এ বেটি আমায় লাথি মার্‌লে,—সোজা পেত্নী নয় মশাই,—একে কবুল করাতে অনেক কষ্ট পেতে হ'বে দেখছি! উঃ বুকের ভেতরকার হাড়গুলো শুদ্ধ কন্‌কন্ করে উঠ্‌ল। ও বামাচরণ বাবু, তুমি একগাছা মুড়ো ঝাঁটা আনতো, দেখি বেটির কত পেরতাপ।

বউটি এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারে ইহারা কি একটা ভুল করিয়া তাহার উপর রোজা লেলাইয়া দিয়াছে। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুম্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোজাও ছুটিয়া গিয়া দরজার কাছে দাঁড়ায়। চীৎকার করিয়া বলে,—ভেবেছিস্, দরজা বন্ধ করে' পরিত্তেরাণ পাবি? হুঁ হুঁ এখনও গরম তেল-পড়া ছাড়ি নি—তখন টের পাবি রে বেটি,—হুঁ—হুঁ—খোল্ বলচি শীগ্‌গির—

বেলা দুপুর কাটিয়া যায়। বউটি কিছুতেই দরজা খুলিয়া দেয় না। সেকেলে শক্ত পেরেক-পোঁতা কাঁঠালকাঠের দরজা। ভাঙ্গিয়া ফেলা ত' সহজ কথা নহে। প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া অনেক ছড়া আওড়াইয়া ও নানা রকম ভয় দেখাইয়াও কিছুতেই রোজা দরজা খোলাইতে পারে না। শেষে রোজার হুকুমে বামাচরণ নিজে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রুক্ষস্বরে বউটিকে ঘরের বাহিরে আসিতে বলে। বামাচরণের উগ্র কণ্ঠস্বরে হঠাৎ বউটি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে। তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালের খানিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। ভিজা কাপড় জুড়িয়া মাটির দাগ। ভিজাচুল দেহের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঁ হাতের একটা শাঁখা কখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—কব্জির উপর মস্ত একটা হ্যাঁচড়ান কাটা দাগ। তাহাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত জমিয়া রহিয়াছে। বউটি বাহিরে আসিয়াই চীৎকার করিয়া বামা-চরণকে বলে,—ওগো, আমি ভুত নই গো, কেন তোমরা আমার উপর এ অত্যাচারটা কর্‌ছ? ওরা না-হয় ভুল বুঝেছে,—তুমি ত' আমাকে জান। ওগো তোমার পায়ে পড়ি,—ঐ লোকটাকে তাড়িয়ে দাও, এক্ষুনি,—এক্ষুনি,—

রোজা চোখ পাকাইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলে,—হুঁ,—আমাকে তাড়াবে বৈ কি? তা' না হ'লে তোর আর এখানে আধিপত্যের সুবিধে হবে কেন? ঢের ঢের ভুত দেখেছি,—এমন ধারা বদ্‌মাইসি আর কা'রোর দেখি নি বাবা! হুঁ, হুঁ,—আমার নাম কুড়োরাম,—বাবুরামের ছেলে; যেমন বুনো ওল তুই,—তেমনি বাঘা তেঁতুল আমি। বেটিকে ঘাড় ধরে' এদিকে নিয়ে এস ত বামাচরণ বাবু, কোন ভয় নেই, আমি ত' আছি!

বামাচরণ বউটির হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উঠানের এককোণে টানিয়া লইয়া আসে। স্বামীর মুখের দিকে বউটি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তাহার দুইচোখ বাহিয়া জল পড়ে। স্বামীকে বলে, তুমিও সত্যি আমায় ভুত বলে' ভাব্‌লে?

বামাচরণ কথা কহে না। রোজা বামাচরণের মাতাকে হাঁকিয়া বলে,—একখানা কাঁচি আন।

শাশুড়ী কাঁচি আনিয়া রোজার হাতে দেয়। বউটি কাঁচির দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকে। রোজা বলে,—এর মাথার চুলগুলো আগে সব কেটে দি। তারপর বাছাধনকে টের পাইয়ে দিচ্চি, আমি কেমন রোজা।

হঠাৎ বউটি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠে,—ওগো চুল কাট্‌তে হয়, তুমি নিজের হাতে কেটে দাও,—ওকে আমার চুল ছুঁতে দিও না।

রোজা বামাচরণের হাতেই কাঁচিখানা দিয়ে বলে,—ওর সাধ্যি কি তোমার কিছু করে! আমি রয়েছি না?

বউটির মাথার চুল কাটিতে বামাচরণ একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! রোজা ও সমবেত নরনারীর উৎসাহে তাহার দ্বিধাভাব কাটিয়া যায়। সে কাঁচি লইয়া চুল কাটিতে আরম্ভ করে।

বউটি স্থিরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার চোখের জল ধীরে ধীরে কখন শুকাইয়া যায়। গুচ্ছ গুচ্ছ কাল রেশমের মত চুলের রাশ চারিপাশে ঝরিয়া পড়ে। সারাটি গ্রামের মধ্যে এই চুলই তাহার গর্ব্বের বস্তু ছিল। কলিকাতায় তাহার মা এই চুল বাঁধিতে বসিয়া কত রাগই না করিতেন। চুলবাঁধা তখন তাহার আর পছন্দই হইত না। খোঁপা বাঁধিয়া আবার খোঁপা খুলিতে হইত। বউটির চোখ হইতে এবার হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে।

চুল কাটা শেষ হইলে রোজা চীৎকার করিয়া কত কি বলে। বউটির কানে তাহা বিন্দুমাত্রও পৌঁছায় না। নানা

প্রশ্নের উত্তরে সে যাহা ইচ্ছা একটা কিছু বলিয়া যায়। জীবনে তাহার আর মমতা নাই। স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। সে এ জীবন লইয়া আর কি করিবে? রোজা যে-সব কথা বলিল,—তাহার অর্থ অতি পরিষ্কার। সে অনেকদিন আগে আসল বউকে খাইয়া ফেলিয়া ইহাদের চক্ষে ধুলা দিয়া সেই বউয়ের মুর্ত্তি ধরিয়া ইহাদেরই সহিত বাস করিতেছে। আসলে সে মানুষ নহে। ক্রমশঃ বউটির মস্তিষ্ক গোলমাল হইয়া যায়, সত্যই কি সে মানুষ নহে? তবে ইহারা এত আড়ম্বর করিয়া রোজা ডাকিয়াই বা আনিয়াছে কেন? বউটির বাহ্যজ্ঞান যেন লোপ পাইয়া আসে।

দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, অপরাহ্নও কাটিয়া যায়। আস্ফালন ও অত্যাচারের সীমা নাই। লজ্জায় ও অপমানে বউটির পুনরায় ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা হয়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এইবার রোজা শেষ প্রশ্ন করে,—আর কক্ষণো এখানে আস্‌বি?

বউটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলে,—না।

—কোথা যেতে চাস্ তুই?—রোজা বলে।

বউটি ধীরে ধীরে বলে,—মায়ের কাছে।

রোজা রসিকতা করিয়া বলে,—কোন্ শ্মশানের শেওড়া গাছে তোর মা আছে?

অনেকেই একথায় হাসিয়া উঠে। রোজা উৎসাহের সহিত পুনরায় বলে, ঐ জলশুদ্ধ ঘড়াটা তোকে দাঁতে করে' ধরে' এ গাঁ ছাড়্‌তে হবে, বুঝ্‌লি?

বউটি ঘাড় নাড়িয়া বলে,—আচ্ছা।

পেত্নীটা শেষকালে এত শান্ত হইয়া পড়িবে, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। কে বলে কুড়োরাম রোজার মন্ত্রের শক্তি নাই! যাক্ ভালয় ভালয় যে পেত্নীটা সহজে যাইতে চাহিল, কাহারও ঘাড় মট্‌কাইল না বা উপদ্রব করিল না, ইহাতে পাড়ার লোক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ধন্য কুড়োরাম!

জলশুদ্ধ প্রকাণ্ড ঘড়াটা বউটির কাছে রাখা হয়। পাড়ার প্রায় সমস্ত লোক আসিয়া জড় হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। রোজা খুব খানিকটা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলে,—নে, এইবার দাঁত দিয়ে চেপে এই ঘড়াটা যতদুর পারিস্ নিয়ে যা। নইলে এই মন্তর-পড়া ঝাঁটা দেখেছিস্—

বউটি শেষবার বামাচরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে মিনিট দুই চাহিয়া থাকে। তাহার পর দুই হাতে তাহার পদদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া নিজের মুণ্ডিতপ্রায় মস্তকটি তাহার উপর রাখে। তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। বামাচরণ তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লয়।

দাওয়ায় বসিয়া পাড়ার পাঁচজন স্ত্রীলোকের সহিত বামাচরণের মাতা ভুত-তাড়ানো দেখিতেছিল, হঠাৎ এই দৃশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবারে,—আমার বামার পা দুটো চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে রে!

বউটির চক্ষুর সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ তখন দূরে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। কাহারও কাছে আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবার নহে। ক্রমশঃ তাহার মাথার ভিতরে কে যেন কিসের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। কাহারা এখানে ভিড় করিয়া বসিয়া আছে? ইহাদের কাহাকেও সে ত' চিনে না! এ কাহাদের বাড়ী? সে কোথায় আসিল? ইহারা এত আলো জ্বালিতেছে কেন? কি হইতেছে? কে তাহার মাথার সমস্ত চুল কাটিয়া লইয়া তাহাকে কাদামাখা কাপড় পরাইয়া দিল? এ লোকটা দাঁতে করিয়া ঘড়া তুলিতে বলিতেছে কেন? ইহাদের কথা বুঝি শুনিতেই হইবে,—না শুনিলে ইহারা বোধ হয় কলিকাতায় মায়ের কাছে যাইতে দিবে না।

হঠাৎ বউটি দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দাঁত দিয়া ঘড়ার কাণাটা চাপিয়া ধরে। তারপর মাটি হইতে খানিকটা উঁচুতে তুলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বাটীর বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সে বেশীদুর যাইতে পারে না। দীঘির রাস্তায় নামিয়াই সে ধড়াস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। তাহার সম্মুখের তিনটি দাঁত ভাঙ্গিয়া মুখ হইতে রক্তধারা ঝরিতে থাকে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া যে সকল লোক রোজার সঙ্গে বউটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল তাহারা তাহার সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়। কেশশূন্য মস্তক, রক্ত চক্ষু, শোণিতস্রোতে দেহ সিক্ত, দুইহাতে সে মাটি চাপিয়া ধরিয়াছে। বউটির সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।

হঠাৎ দূরে ইঞ্জিনের বাঁশী বাজে, সন্ধ্যার মালগাড়ী পশ্চিমে যাইতেছে। বাতাসে একটানা একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। ইহার পরেই কলিকাতা যাইবার যাত্রী-গাড়ী আসিবে। বউটি মুহূর্ত্তের জন্য কান পাতিয়া শোনে, যেন কতদূর হইতে কাহার আহ্বান আসিতেছে। ঐ বাঁশঝাড়ে—দীঘির কাল জলে, তালগাছসারির মাথায়, জোনাকিভরা অন্ধকার মাঠে, কি যেন কতদিন হইতে তাহাকে ডাকিয়া ফিরিয়াছে। পগারের উপর কণ্টিকারী ও শেয়ালকাঁটা ঝোপের পাশে আমগাছটার তলায় কে যেন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কলিকাতা যাইবার সময় হইয়া আসিল, এখনই ট্রেণ আসিয়া পড়িবে। আজ মায়ের কাছে না গেলে কোন রকমেই চলিবে না। এই সকল লোক বুঝি লণ্ঠন লইয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিতে চলিয়াছে।

মালগাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। হঠাৎ বউটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীঘির পথ দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। রোজা হাসিয়া বলে,—কুড়োরাম বাউরির মন্তরের জোর ব্যর্থ হবে? বেটিকে গাঁ ছাড়িয়ে তবে ছেড়েছি।

কিন্তু রোজার কণ্ঠস্বর কাহারও কানে পৌছায় না। সকলে ভয় বিস্ময়ে অন্ধকার পথের দিকে চাহিয়া থাকে। সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, এখন দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বাঁশঝাড় ও তালবন কাঁপাইয়া শব্দ তুলিয়া উদ্দাম বাতাস হু-হু করিয়া বহিয়া গেল। সেই অন্ধকারে, আসন্ন দুর্য্যোগে, সম্মুখের পথের দিকে চাহিয়া ভুতের পশ্চাতে ছুটিতে কেহই আর রাজি হইল না।

বাতাস আরও জোরে বহিতে লাগিল। দীঘির পাড়ের তালগাছগুলা ঝম্ ঝম্ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বউটি কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিল না। হোঁচট্ খাইয়া তাহার পা কাটিয়া রক্তধারা ঝরিতে লাগিল।

আমগাছের তলা দিয়া সে যখন পগারের উপর আসিয়া দাঁড়ায় তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। কন্টিকারী ও শেয়ালকাঁটায় তাহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখের রেল লাইন চক্ চক্ করিয়া উঠে। টেলিগ্রাফ-তারের সাদা থামগুলি দৈত্যের মত চক্ষুর সম্মুখে যেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে থাকে। অন্ধকার রাত্রে মাঠের তীব্র বাতাসে কাঁপিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বিদ্যুৎ ও বজ্রের নীচে দাঁড়াইয়া তাহার কেবলই মনে হইতে থাকে পৃথিবীতে কোথায় যেন কিছু নাই। একটা উন্মত্ত অন্ধকার আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। তাহাকে এমনই করিয়া পরিত্রাণলাভের আশায় দিবারাত্র ছুটিতেই হইবে।

সম্মুখে দূরে একটা আলো দেখা যায়। ক্রমশঃ সে আলো তীব্র হইয়া উঠে। সার্চ্চলাইট ফেলিয়া কলিকাতাগামী ট্রেণ আসিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়া উঠে। অন্ধকার আরও নিবিড় হয়। সার্চ্চলাইটের সম্মুখে পড়িয়া প্রবল বৃষ্টিধারা একটা দীর্ঘ প্রলম্বিত শুভ্রবর্ণ পরদার মত বোধ হইতে থাকে। ইঞ্জিনের নলে তুবড়ির মত আগুনের ফুল্‌কি ওড়ে। শব্দ বাড়িয়া উঠে। ট্রেণ আসিয়া পড়িল বলিয়া। আর সময় নাই। এ ট্রেণে তাহাকে কলিকাতায় বাপের বাড়ী যাইতেই হইবে। সেখানে তাহার মা এখনও তাহার পথ চাহিয়া আছে। কাঁটা-ঝোপ ঠেলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া বউটি একেবারে লাইনের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত লাইনটা তীব্র আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভীষণ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ! বউটি ট্রেণের দিকে উন্মাদ বেগে ছুটিয়া যায়। তাহাকে আজ কলিকাতায় মায়ের কাছে যাইতেই হইবে।

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত গ্রামখানি শুনিল পেত্নীটা নাকি পগারের পাশে রেললাইনের ধারে ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। কুড়োরাম রোজার মন্ত্র যাহা করিতে পারে নাই, ইংরেজের রেলগাড়ী তাহা অতি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছে ভাবিয়া সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সন্ধানী

আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ

[বর্ত্তমান নিবন্ধে 'কল্কি বা সভ্যতার ভবিষ্যৎ'এর—(*Kalki or the Future of Civilization*) দ্বিতীয় অধ্যায় 'ব্যতিরেকী ফল' (Negative Results) সমাপ্ত হইল। আগামী সংখ্যায় তৃতীয় অধ্যায় 'সমস্যা'র (The Problem) অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।]

মানবতা যাঁহার কাছে প্রিয় তিনি আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা দেখিয়া উৎসাহিত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। জাতিসমূহ শান্তির জন্য ওকালতি করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যে মনোভাব সংঘর্ষের পথে লইয়া যায় তাহা তাহারা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়। তবুও তাহারা যে অপরাপর জাতির মত নয়, এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। তাহাদের এই প্রত্যয় আছে যে, দৈবক্রমে তাহারা যে-জাতির অন্তর্ভুক্ত সে-জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে-ধর্ম্মের ক্রোড়ে তাহারা জন্মিয়াছে, তাহাই বিশ্ব-পৃথিবীর আশা এবং তাহারাই মানব জাতির নেতা। ধাত্রীক্রোড় হইতেই পতাকা উড়াইয়া, ভেরী বাজাইয়া, দেশপ্রেমের গান গাহিয়া ও বিদ্বেষের মন্ত্র আওড়াইয়া জাতীয়তার এই দম্ভ আমরা চর্চ্চা করিয়া থাকি। গত যুদ্ধের সময় প্রত্যেক জাতিই বলিতে চাহিয়াছে যে একমাত্র সে-ই সভ্যতার রক্ষাকল্পে যুদ্ধে নামিয়াছে। প্রত্যেক জাতি যাহা কিছু করিয়াছে সভ্যতার নামে তাহা ন্যায়তঃ বলিয়া চালাইয়াছে, সভ্যতারক্ষার অজুহাত দেখাইয়া তাহারা নরহত্যা ও ধ্বংস করিয়াছে। কুকুর যেমন ভীষণ হিংস্র হইয়া খেঁকশিয়ালীকে তাড়া করিয়া মারিয়া ফেলে, মানুষ ঠিক তেমনি নিজেকে পশুবৎ করিয়া ফেলিয়া অপর মানুষকে হত্যা করিবার জন্য মারমুখ হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার উচ্চতর প্রবৃত্তিকে বিদ্বেষের আগুনে এবং বিজয়লালসায় অবশ্যই নষ্ট করিয়া ফেলা চাই। অর্দ্ধ সত্য ও অসত্যকে চতুরতা সহকারে প্রচার করিয়া এবং অপরাপর জাতি ও তাহাদের কৃষ্টিকে ক্রমাগত বিকৃত চিত্রিত করিয়া মানুষের বন্য মনোবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হইতেছে। এণ্টনি যে উদ্দেশ্যে ও যেমন দক্ষতার সহিত সিজারের রক্তাক্ত পরিচ্ছদ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ও তেমনি দক্ষতার সহিত কোন কোন পেশাদার বক্তা গল্প ও ঘটনাবর্ণনা করিয়া চলিয়াছে—"কি করুণ দৃশ্য! কি ভয়াবহ দৃশ্য! প্রতিহিংসা! আগুন

জ্বালাও! খুন কর! খুন কর!" "O piteous spectacles! O most bloody sight! Revenge! Burn! Fire! Kill! Slay!" হাইনে (Heine) যখন তাঁহার ছোট ছেলেকে সৈন্য-সামন্তের কুচ্‌কাওয়াজ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন তখন ছেলেটি কি সত্য কথা'ই না বলিয়াছিল—"এই সৈন্যেরা এক সময়ে মানুষ ছিল?" সৈন্যদের এখন কোন ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহারা সত্তাহীন এবং আশাহীন—চক্রদন্ত সদৃশ তাহারাও যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষা মাত্র গ্রহণ করে, বলিতে গেলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই যন্ত্রকে তাহারা পূজা করিয়া চলিতেছে। যুক্তিবোধসম্পন্ন লোকেরা ইচ্ছাশক্তিহীন দাসে পরিণত হইতেছে। যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠিলে সভ্যতার সকল ভাণ অদৃশ্য হইয়া যায়, মানুষ তখন আবার যেন নিঃসহায় ভাবেই পশু হইয়া উঠে। যুদ্ধে দেশের পর দেশ মরুভূমি হইয়া যায়; বহু নগরী বিধ্বস্ত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে; আহত ও বিকৃতাবস্থা লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, অগণিত নারী ভগ্নহৃদয় লইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে; শিশুরা সব স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া অনাহারে দিন কাটায়; বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রে আবহাওয়া দূষিত হয়—যুদ্ধের ফল স্বরূপ এ সবই মানব-ধর্ম্মের উপর অত্যাচার-মাত্র। এই দানব-নৃত্যে ঘৃণা বোধ না জাগা পর্য্যন্ত আমরা সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না। পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ কি পীড়িত মানবের জন্য হাসপাতাল স্থাপন এবং অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কি হইবে; যদি আমরা বাচ্‌বিচার না করিয়া বৃদ্ধ, পঙ্গু, নারী, শিশু সকল মানুষকে মেসিন-গান বা বিষাক্ত বাষ্প প্রয়োগে স্বেচ্ছায় হত্যা করিয়া চলি—এবং তাহা কিসের জন্য?—ভগবানের নামে এবং জাতির সম্মানরক্ষার্থ!

ইহা খুবই সত্য যে, যুদ্ধ-বিরোধকে দমন করিতে পারি না বলিয়া আমরা ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু সে চেষ্টা ত' সফল হইতে পারে না। কারণ, যুদ্ধ পরস্পরবিরোধী দুইটি জাতির সংঘর্ষ-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ-মাত্র—পশুশক্তি প্রয়োগে এ সংঘর্ষের অবসান করিতে হইবে। বিরোধকে দমন করিতে পশুশক্তি প্রয়োগই যখন আমরা একমাত্র যুক্তি বলিয়া স্বীকার করি তখন একপ্রকার শক্তির সহিত অপর শক্তির প্রকারভেদ আমরা ঠিকমত করিতে পারি না। সাধ্যমত সকল শক্তি প্রয়োগে আমাদিগকে বিরোধ দমন করিতেই হইবে। লাঠি এবং তরবারিতে অথবা বারুদ এবং বিষবাষ্পে প্রকৃত কোন প্রভেদ নাই। বিরোধ দমন করিবার ইহাই যতদিন স্বীকৃত নীতি বলিয়া চলিবে ততদিন প্রত্যেক জাতিই তাহার মারণাস্ত্র অধিকতর শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে। *যুদ্ধই যে একমাত্র পন্থা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করাই যে মহত্তম পুণ্য!* সুতরাং প্রত্যেক জাতিকেই এই ভীষণ ভয়াবহ পথে চলিতে হইবে। এই যে, যুদ্ধকে সমর্থন কিন্তু ইহার প্রণালী ধরিয়া সমালোচনা—এ যেন নেকড়ে বাঘের ভেড়া উদরস্থ করায় সম্মতি কিন্তু তাহার খাইবার রীতি ধরিয়া সমালোচনা। যুদ্ধ যুদ্ধই, খেলা নয় যে নিয়মানুযায়ী খেলিতে হইবে।

ইহা সত্য যে আন্তর্জ্জাতিকতার প্রসার হইতেছে। অর্থনীতিবিদরা আমাদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিতেছেন যে যুদ্ধে কোন লাভ নাই, ব্যবসায় হিসাবে ইহা খারাপ। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নীতি হিসাবে শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন, দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে নহে। এক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিকতা বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। গত যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে, যাঁহারা তাঁহাদের আদর্শে বীরের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন—বাকী সকলেই তাহাদের দেশের বেদীমূলে মানবতাকে বলিদান দিয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মগুরুগণও সয়তানের মতানুপন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবানের উদ্দেশ্যে মন্দির তৈয়ারী করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারই কথা হাসিয়া ঘৃণায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-মন্দিরগুলি হইয়া পড়িয়াছিল সৈন্য-সংগ্রহের আড্ডা। সর্ব্বশক্তিমানের নিকট চারিদিকের উন্মত্ত আবেদনে ভগবানও বোধ করি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন; সে সময় লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা জে, সি, স্কোয়ারের একটি চার লাইনের কবিতায় বড় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে—

যুযুৎসু জাতিদের চীৎকার ভগবানের কানে পৌঁছাইল—
"ইংলণ্ডকে শাস্তি দাও ভগবান" এবং "রাজাকে রক্ষা কর হে ভগবান"!—
—এটা ভগবান, ভগবান ওটা, ভগবান সবই—
ভগবান বলে—"হায় ভগবান, আমার কৃত্য বুঝি সংক্ষেপ হইয়া আসিল!"

God heard the embattled nations shout
"Gott strafe England!" and "God save the king!"—
God this, God that, and God the other thing.
"Good God!" said God, "I've got my work cut out."

জাতিসঙ্ঘ আমাদের হইয়াছে সত্য কিন্তু ইহার কেবল বাহ্য আকারই দেখা যাইতেছে, দেহের ভিতরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার এখনও বাকী আছে। অশুভেচ্ছা এবং অবিশ্বাসের প্রবৃত্তি অত্যধিক। আন্তর্জ্জাতিকতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শ হিসাবে বর্ত্তমানে পোষণ করিয়া থাকেন, মানবের মনস্তত্ত্বের মধ্যে আজও ইহাকে পাইতেছি না। শান্তিঘোষণার দশ বৎসর পরে আকাশটা ১৯১৪ অব্দের আগষ্টের আকাশ অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই, যুদ্ধের আগে ইউরোপের সৈন্যসংখ্যা যত ছিল এখন তদপেক্ষা ১০ লক্ষ বেশী হইয়াছে। আপনাকে শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া স্বীয় অহঙ্কারে মানুষ সংগ্রাম ডাকিয়া আনে, মানুষের আত্মার এই ভাবকে চাপিয়া রাখিবার জন্য কোন জাতিই উৎসুক নয়। প্রত্যেক জাতিই বলিতেছে—"আমরাই শ্রেষ্ঠ" এবং দেশপ্রেমিক তাঁহাকেই বলি যিনি থিওডোর রুজভেল্টের নীতি মানিয়া চলেন। থিওডোর রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন—"স্বীয় স্ত্রীর প্রতি একান্ত যে ভালবাসা তাহা হইতে স্বামী যদি অপর স্ত্রীলোককে অংশ দেয় তাহা হইলে তাহা যেমন স্বামীর পক্ষে অশোভন ও অসম্মানকর, *কোন নাগরিকের পক্ষে একান্ত নিজস্ব স্বদেশপ্রীতির অংশ* অপর দেশকে দেওয়াও তেমনি অশোভন ও অসম্মানকর।" জাতির বিদ্বেষ এবং উচ্চাশা থাকিতে শান্তি কেবল যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কিছু নয়। ম্যাকিয়াভেলির লোকদ্বেষী সূত্রানুযায়ী রাজ্যপরিচালনার নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং জাতিগুলি অন্ধ স্বার্থ-প্রভুত্বের জন্য ব্যস্ত—নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য নয়।

রেল বনাম মোটর প্রতিযোগিতা

—শ্রী—

ভারতের যান-বাহন ব্যবস্থায় মোটরগাড়ীর ব্যবহার দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। ইতিমধ্যেই কোন কোন স্থানে রেলগাড়ীর সহিত মোটরযানের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষে যত মাইল রেলপথ আছে, তাহার অর্দ্ধপরিমাণ দৈর্ঘ্যের সহিত সমান্তরাল ভাবে অন্যপ্রকার যান চলিবার সুগম রাস্তা রহিয়াছে। এইসকল রাস্তার উপর দিয়া বিবিধ প্রাইভেট কোম্পানী তাহাদের বাস্, লরী ইত্যাদি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে রেলগাড়ীর সহিত মোটরগাড়ীর যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে রেলকোম্পানী সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে মিঃ মিচেল ও মিঃ কার্কনেস এবিষয়ে অনুসন্ধান গবেষণা করিয়া যে বিবরণী দাখিল করিয়াছেন, রেল কোম্পানীর এই প্রকার ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে প্রায় ২ কোটী টাকা অনুমাম করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দার দরুণ ভারতীয় রেল কোম্পানীগুলির আর্থিক অবস্থা অন্য প্রকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতই অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর মোটরযানের প্রতিযোগিতা রেল কোম্পানীর অবস্থা আরও গুরুতররূপে সমস্যা-মূলক করিয়া তুলিয়াছে।

এই দুই প্রকার যান-বাহনের প্রতিযোগিতা যে কেবল ভারতবর্ষেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এমন নয়। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে এই প্রতিযোগিতা ইতিপূর্ব্বেই জনসাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইহা নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। মোটরগাড়ীর পক্ষে কতকগুলি অসাধারণ এবং বৈষম্য-মূলক সুবিধা আছে বলিয়া সর্ব্বত্রই এই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। রেল কোম্পানীর মত বাস্ কোম্পানীকে নিজ ব্যয়ে পথ নির্ম্মাণ করিতে হয় না, বা কেবল স্থিরীকৃত সময়েই গাড়ী চালাইবার দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে হয় না। তা' ছাড়া কেবল নির্দ্ধারিত ষ্টেসনগুলিতেই গাড়ী থামাইবার জন্য বাস কোম্পানীকে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। ফলে প্যাসেঞ্জারের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী বাস কোম্পানী গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এই সকল কারণে সর্ব্বত্রই মোটর বাস এখন প্যাসেঞ্জারের নিকট কদর লাভ করিতেছে। রাস্তাঘাট নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিতে হয় না বলিয়া বাস কোম্পানী স্বল্প ভাড়াতেই প্যাসেঞ্জারের দাবী মিটাইতে পারে। ইহার জন্যই এইরূপ অনুমান করিতে হয় যে, প্রতিযোগিতা-নিরোধের কোন ব্যবস্থা না করিলে, বাস কোম্পানী অনেক স্থলেই রেল কোম্পানীকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ, যে সকল প্যাসেঞ্জার বা মাল অনতিদীর্ঘপথে চলাচল করিয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃই রেল কোম্পানীর হাতছাড়া হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণীতে এই প্রকার প্রতিযোগিতার ফলে এক আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই প্রতিযোগিতা এখনও তেমন জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু মোটরযানের ব্যবহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনতিকাল মধ্যে এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। এদেশে মোটরযানের প্রতিযোগিতার দরুণ রেল কোম্পানীকে প্রায় ২ কোটী টাকা লোকসানের দায় সামলাইতে হইতেছে সত্য, কিন্তু বাস-কোম্পানীর সহিত ইহাদের প্রতিযোগিতা এখনও মুখ্য ভাবে কেবল প্যাসেঞ্জার-চলাচলের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। মাল-চলাচলে মোটরবাসের ব্যবহার এখনও তেমন বিস্তার লাভ করে নাই। কেবল এন্. ডব্লু. আর লাইনেই মোটরলরীতে মাল-চলাচল রেল কোম্পানীর সহিত উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার চলাচলেই উল্লিখিত প্রতিযোগিতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়েও সবচেয়ে বেশী ক্ষতির দায় সহ্য করিতে হইতেছে ছোট ছোট লাইনগুলিকে; কারণ এগুলির দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয়।

সে যাহা হউক, অদূরভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতাই যে ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইয়া এক ঘোরতর সমস্যার সৃষ্টি করিবে, সে বিষয়ে ইদানীং ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয়েই সচেতন হইয়াছে। সমস্যার রূপ এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি

উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এ সম্বন্ধে কোন সহজ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।—কারণ 'রেল' এবং 'মোটর'এর মধ্যে কোনটিকেই অপ্রধান বিবেচনা করিয়া অপরের সুবিধা করিয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।—আপাতপক্ষে, রেল কোম্পানীও যাহাতে বাস চালাইয়া তাহাদের হৃত-ব্যবসার পুনরুদ্ধার করিতে পারে, সেজন্য বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় রেলবিষয়ক আইনের এক সংশোধক বিল প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই বিল বিস্তারিত আলোচনা করিবার জন্য এক সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি মূল খসড়া 'বিল'এর নানা প্রকার সংশোধন-প্রস্তাব করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রেল-কোম্পানী-গুলিকে স্ব স্ব মোটর বাস চালাইবার ক্ষমতা দিলেও, তাহারা প্রাইভেট বাসকোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। কারণ রেল কোম্পানী বাস চালাইলে, তাহার চলাচল সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত সময় বাঁধিয়া দিবে,—তাহার ফলে প্রাইভেট কোম্পানীগুলির প্যাসেঞ্জার আকৃষ্ট করিবার সুযোগ থাকিয়াই যাইবে। খরচের দিক দিয়াও প্রাইভেট কোম্পানীর তুলনামূলক সুবিধা থাকিবে। রেল-কোম্পানীর 'বাস'এ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, কোম্পানী ক্ষতি-পূরণের জন্য বাধ্য থাকিবে। তা' ছাড়া অপরাপর কর্ম্মচারীর বেতনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বেতন ইত্যাদি ব্যাপারেও বাস কোম্পানী অপেক্ষা রেল কোম্পানীকে অধিক পরিমাণে ব্যয় করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বাস চালাইবার ব্যাপারেও রেল কোম্পানী অপেক্ষা প্রাইভেট কোম্পানী কম মাশুল স্থির করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে থাকিবে। এই সকল সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখে সিমলায় মোটর বনাম রেল সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য এক সরকারী বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকে প্রস্তাবিত আলোচনার পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুর যে বিবৃতি করেন, তাহাতে উক্ত প্রতিযোগিতার তাৎপর্য্য সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'রেল'এর পক্ষ হইতে তিনি বলেন যে এদেশে রেলপথ নির্ম্মাণে এবং পরিচালনায় যে ৭।৮ শত কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার সংরক্ষণ সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। কেবল রেল-কোম্পানীগুলির নির্দ্ধারিত মাশুলের হার নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া 'রেল—মোটর' প্রতিযোগিতা নিরোধ করিবার চেষ্টাও প্রশস্ত হইবে না। এই প্রকার হ্রাসের দরুণ যে ক্ষতির সম্ভাবনা হইবে, তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে কেবল যে-সকল স্থানে মোটর-যানের প্রতিযোগিতা নাই, সেই সকল স্থানে মাশুলের হার বাড়াইয়া দিয়া। ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত দেশে এইপ্রকার মাশুল বাড়াইয়া দেওয়া কখনও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এদেশে কৃষকদিগের সহায়তার জন্য রেলপথে মাল-চলাচলের মাশুল যথাসম্ভব নিম্নতম হারেই বাঁধিয়া দিতে হইবে। ভারতবর্ষে সুলভ রেলভাড়ার সহিত মাল-চলাচল —তথা কৃষক সম্প্রদায়ের মঙ্গল ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং রেলপথের সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। অপর পক্ষে মোটর-যানের বিস্তৃতিও কোন প্রকার আইন ব্যবস্থার জোরে নিরোধ করিয়া দেওয়া মঙ্গলজনক হইবে না। বাস কোম্পানী জনসাধারণের জন্য রেল কোম্পানী অপেক্ষা অধিক সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতেছে বলিয়াই সমধিক আদৃত হইতেছে। সুতরাং তাহার বিস্তৃতি স্বাভাবিক কারণেই ঘটিতেছে বুঝিতে হইবে। ভবিষ্যতে মোটর-বাসের প্রসার নানা প্রকারে সমাজের কল্যাণই সাধন করিবে। এজন্যই উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সমস্যা নিরাকরণ করিবার জন্য সিমলার বৈঠকে রেল-কোম্পানীর পক্ষ হইতে বিবিধ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। রেল বিভাগের চীফ্ কমিশনর বলিয়াছেন যে, কোন কোন স্থলে রেল অপেক্ষা মোটর-যান অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচিত হইলেও, উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ না করিলে ভবিষ্যতে তাহার পরিণতি দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। রেল লাইন সংস্থাপনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে রেল-কোম্পানী ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিলে, দেশবাসীকেই পরোক্ষভাবে সে লোকসানের দায় সামলাইতে হইবে। এই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 'মিচেল কার্কনেস' তাঁহাদের রিপোর্টে এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মোটরবাসের সহিত রেল কোম্পানীর যে সকল স্থানে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তথায় রেল কোম্পানীকে মোটর-বাস

চালাইবার একচেটিয়া অধিকার দিয়া তাহাকে লোকসানের দায় হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব আমাদের নিকট সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রেল কোম্পানী তাহার একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগ লইয়া লোক বা মাল-চলাচল বিষয়ে জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার দিকে ঔদাসীন্য দেখাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; ইহার উপর মোটর-বাস চালাইবার বিষয়ে তাহাকে একচেটিয়া অধিকার দিলে জনসাধারণ মোটর-বাসের সহায়তায় এযাবৎ যে-সকল সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা আর থাকিবে না বলিয়াই আশঙ্কা করিতে হয়। রেল কোম্পানী প্যাসেঞ্জারের সুবিধার দিকে তেমন নজর দেয় না, এরূপ অভিযোগ আমরা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। মোটর-বাস যে ক্রমাগতই জনসাধারণের নিকট কদর লাভ করিতেছে, রেল কোম্পানীর ঔদাসীন্য তাহার অন্যতম কারণ। প্যাসেঞ্জারও প্রাইভেট বাস কোম্পানীর নিকট হইতে যে-সকল সুবিধা পাইতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

তারপর রেল কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দিয়া প্রাইভেট 'বাস কোম্পানী'গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলাও সমীচীন হইবে না। সম্প্রতি যে-সকল প্রাইভেট কোম্পানী রেল-কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাস চালাইতেছে, তাহারা রেল কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দিবার ফলে, যে-সকল প্রতিযোগিতাবিহীন পথে ভিন্ন কোম্পানী বাস চালাইতেছে, তথায় স্ব স্ব বাস এবং লরী অপসৃত করিয়া চালাইতে বাধ্য হইবে। বলা বাহুল্য যে এমতাবস্থায় বিভিন্ন বাস কোম্পানীর মধ্যে যে ঘোরতর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সকল কোম্পানীই যুগপৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।—ফলে এই দিকে ভারতবাসীর নিয়োজিত অর্থ এবং ব্যবসায়িক উদ্যম, দুইই নষ্ট হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, রেল কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দিয়াই 'রেল-মোটর' সমস্যার সমাধান করা চলিবে না।

এ বিষয়ে আমাদের নিকট যে ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়-সঙ্গত এবং দেশের পক্ষে কল্যাণজনক মনে হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

আলোচ্য সমস্যার প্রথম প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান 'রেল-মোটর'এর প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখিয়া রেল কোম্পানীকে ক্রমাগত অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে কি না। এ সম্বন্ধে রেল কোম্পানীর পক্ষ হইতে চীফ কমিশনর বলিয়াছেন যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ না করিলে রেল কোম্পানীর পক্ষে নিজ ব্যবস্থায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। চীফ্ কমিশনরের এই উক্তি ছোট বড় সকল লাইন সম্বন্ধেই সত্য কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পর যদি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মোটরবাসের প্রতিযোগিতা কেবল ছোট ছোট লাইনগুলিরই ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহা হইলে কেবল তাহাদের রক্ষা করিবার জন্যই 'মোটরবাস' সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ-মূলক ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে কিনা, তাহাও বিচার-সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে বাসের প্রতিযোগিতা যদি সকল রেল কোম্পানীর পক্ষেই ক্ষতিজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে যে এরূপ ক্ষতি 'বাস'-নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা এড়ান সম্ভব কি না। এ সম্পর্কে কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে রেল কোম্পানীগুলি তাহাদের ব্যয়াধিক্য সংযত করিয়া প্যাসেঞ্জার এবং মাল-চলাচলের বিষয়ে অধিকতর অবহিত এবং কর্ম্মতৎপর হইলেই, তাহাদের ক্ষতির দায় এড়াইতে পারে। যাঁহারা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে 'মিচেল কার্কনেস' কর্ত্তৃক অনুমিত ২ কোটি টাকার লোকসান সমগ্র রেল কোম্পানীর সমষ্টি আয়ের শতকরা মাত্র দুই অংশের সমান। ব্যবসায়-মন্দার সময় এই পরিমাণ ক্ষতি অস্বাভাবিক নয়। মোটর-বাস কোম্পানী ইহার জন্য আংশিক পরিমাণে দায়ী বিবেচিত হইলেও রেল কোম্পানীগুলি প্যাসেঞ্জারের এবং মাল-চলাচলের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ দিলে সহজেই এই লোকসানের দায় সামলাইয়া লইতে পারিবে। ইহার জন্য স্থায়ীভাবে মোটর-বাস কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকার অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

যদি এরূপ যাচাই করিবার ফলে প্রতিপন্ন হয় যে, রেল কোম্পানী যথাযথ ব্যয়সঙ্কোচ এবং রেল-পরিচালনার উন্নতি সাধন করিয়াও মোটর-বাসের প্রতিযোগিতা এড়াইতে পারিবে না, তাহা হইলে আলোচ্য সমস্যার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে রেল-

কোম্পানীকে 'বাস'-চালনার ক্ষমতা দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে রেল কোম্পানীকে ক্ষমতা দিলেই যে তাহা যথেষ্ট হইবে না, বা রেল কোম্পানীকে একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়াও যে সমীচীন হইবে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এ বিষয়ে এক বিকল্প প্রস্তাব হইতে পারে এই যে রেল কোম্পানীর উপর ব্যয়সাপেক্ষ যে সকল নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরোপ করা হইয়াছে—মোটর-বাস কোম্পানী সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেই রেলকোম্পানী মোটর-বাস কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে। এই প্রস্তাবের সমর্থক যুক্তি এই যে যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নাই বলিয়া ইদানীং বাসকোম্পানীগুলি প্যাসেঞ্জারের আপদ-বিপদের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যথেচ্ছ ভাবে গাড়ী চালাইতেছে এবং সেজন্য মোটর দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। জনসাধারণের হিতকল্পেই রেল কোম্পানীর অনুরূপ মোটর-বাস কোম্পানীর জন্যও কঠোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, এই প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হইলেই যে রেল কোম্পানীর বাস চালাইবার সমস্যা সমাধান হইয়া যাইবে, এমন নয়। ইহার পরেও বিভিন্ন রাস্তায় বাসের মোট সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। নতুবা রেল এবং প্রাইভেট কোম্পানীর বাসের মধ্যেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অর্থাৎ রেল এবং মোটর কোম্পানীর প্রতিযোগিতামূলক সমস্যা পূর্ব্বাপর সমানই থাকিয়া যাইবে।

এমতাবস্থায় 'বাস'এর মোটসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ প্রস্তাব অনুধাবন করিতে গেলে আলোচ্য সমস্যার আর একটি প্রশ্ন প্রকট হইয়া উঠিবে। যে সকল রাস্তায় অত্যধিক সংখ্যায় বাস চলিতেছে, তথায় নিয়ন্ত্রণের ফলে যাহা অতিরিক্ত সংখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদের পরিচালন-ব্যবস্থা কি হইবে? এই সকল অতিরিক্ত মোটর-বাস চালাইবার ব্যবস্থা না করিয়া দিলে বিস্তর ভারতীয় মূলধন ও সেই সঙ্গে 'বাস'-পরিচালনায় উদ্যোগী ভারতীয়দিগের ব্যবসায়ের উদ্যম নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। জাতীয় আর্থিক উন্নতির মাপকাঠিতে ইহা পরম ক্ষতি, বুঝিতে হইবে। এজন্য সিমলার বৈঠকে ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব স্যর জর্জ্জ সুষ্টার ঋণ-সংগ্রহ করিয়া নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। এই প্রকার নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের ক্ষেত্র হইবে রেল কোম্পানীর সহিত প্রতি-যোগিতা-বিহীন স্থানে, যেখানে বর্ত্তমানে যান-বাহনের বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে। রাজস্ব-সচিবের প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে, রেল কোম্পানীর সহিত বাস কোম্পানীর প্রতি-যোগিতা ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে; বরং বাস কোম্পানী অতঃপর মাল-চলাচলের ব্যাপারে রেল কোম্পানীর সহায়ক হইয়া দাঁড়াইবে। দেশবাসীও বিভিন্নস্থানে যানবাহনের পরম সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। রেল এবং বাস কোম্পানীর এই স্বার্থ-সমন্বয় করণের জন্য এবং সেই সঙ্গে নূতন রাস্তা গঠনের জন্য আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, অতঃপর তাহাই মীমাংসা করিবার জন্য দেশবাসীকে চিন্তা করিতে হইবে।

আর একদিক

আর্চিবাল্ড রুট্‌লেজ 'গুড হাউস্ কিপিং' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—ছেলেবেলায় ক্যারলিনাতে যখন ছিলাম, তখন হইতেই পাখী পুষিয়া খাঁচায় পুরিবার সখ আমার মিটিয়াছে। একদিন দেওদার গাছে একটি পাখী বসিয়া গান গাহিতেছিল, তাহাতে আমি খুসী হইলাম না। গাছে উঠিয়া সেটিকে ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পুরিলাম। দিন-দুই খাঁচায় বন্ধ থাকিবার পর দেখিলাম, পাখীটির মা ঠোঁটে খাবার লইয়া খাঁচার আশে-পাশে ঘুরিতেছে। দেখিয়া ভাল লাগিল,—মা'য়ে যে আমার চাইতে খাওয়ানোর কৌশল বেশী বোঝে, একথা আমি জানিতাম। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি—বেচারি পাখীটি খাঁচার ভিতর মরিয়া পড়িয়া আছে। আমার এই অভিজ্ঞতা যখন পক্ষীতত্ত্ববিদ্ আর্থার ওয়েন্‌কে বলি, তিনি বলিয়াছিলেন: পক্ষী-মা শাবককে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় দেখিতে পারে না—মাঝে মাঝে বিষাক্ত ফল লইয়া গিয়া তাহাদের খাইতে দেয়। ইহাদের ধারণা, বন্দী অবস্থায় বাঁচিয়া থাকার চাইতে মৃত্যু ভাল।

কস্মৈ দেবায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

নকুড় দাসের সংসার বিনুর কাছে সত্যকার একটা নূতন পৃথিবী। এ পৃথিবীর সঙ্গেও বুঝি তার পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। এ যেন একটা বিকৃত ছায়ার জগৎ—উৰ্দ্ধে কোথায় মানুষের জীবনের সত্যকার কাহিনী চলিতেছে, এখানে তাহারই নকল প্রতিবিম্ব—বিকৃত ও কুৎসিত।

দারিদ্র্য ও গ্লানির সঙ্গে তাহার পরিচয় ভাল মতেই আছে। তাহাদের বাড়ীর সমস্ত কাহিনী এই অভাব অনটনের পট-ভূমিতেই অঙ্কিত। কিন্তু এখানে দারিদ্র্যের যেন অন্য রূপ।

তাহার মা ও বাবার জন্য কোথায় অলক্ষ্যে বিনুর মনে একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত ঘৃণা বুঝি জন্মিয়াছিল। তাহাদের অক্ষমতা সে কেমন যেন ক্ষমা করিতে পারে নাই। কিন্তু এখানে নকুড় দাসের সংসার দেখিয়া তাহার সে ভাব কাটিয়া গেল। নিষ্ফল হউক আর যাই হউক তাহার মা ও বাবা তবু সংগ্রাম করিয়াছেন। গ্লানিবোধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা আহত হইয়াছেন। এখানে আঘাতের কোন অনুভূতি নাই। ইহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

নকুড় দাস যেমন করিয়াই হউক আশ্রয়টি জোগাড় করিয়াছে ভাল। গঙ্গার সঙ্কীর্ণ একটি শাখা নগরের একটি অংশের ভিতর দিয়া ক্ষীণ ভাবে বহিয়া গিয়াছে। তাহার পুণ্য সলিল এখন নগরের এই অংশের ক্লেদ বহন করে মাত্র। তবু তাহার মাহাত্ম্য যে যায় নাই পঞ্চাশ হাত অন্তর তীরের বাঁধান ঘাটগুলিই তাহার প্রমাণ। এমনি একটি ঘাটের উপরকার দুইটি পাকা ঘর নকুড় কেমন করিয়া অধিকার করিয়াছে। ইহার জন্য ভাড়া সে কাহাকেও অবশ্য দেয় না, কিন্তু তাহাকে উঠাইবার চেষ্টাও গত পাঁচ বছর কেহ করে নাই।

দুইটি ছেলে ও স্ত্রী লইয়া নকুড়ের সংসার। কোলের শিশুটিকে লইয়া নকুড় প্রতিদিন সকালে বিকালে ভিক্ষায় বাহির হয়। বড় ছেলেটি সারাদিন কোথায় যে থাকে কে জানে। দুইবেলা দুইবার খাইবার সময় সে শুধু বাড়ি আসে। এক একদিন দিনের বেলাও তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু নকুড় ও তাহার স্ত্রীর সে জন্য কোন দুর্ভাবনা নাই। সামনে থাকিলে যাহার আদরের সীমা থাকে না সারাদিন তাহার অনুপস্থিতি ইহাদের এতটুকু বিচলিত করে না। নন্দর সহিত বিনুর ভাল করিয়া পরিচয় হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিনু যে কোথা হইতে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, কেনই বা সে আছে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও যেন নন্দর নাই। বিনুকে সে গ্রাহ্যই করে না। বিনুর চেয়ে বয়সে একটু ছোট হইলেও সে অনেক বেশী পাকিয়া গিয়াছে।

নকুড় দাসের স্ত্রীকে বিনুর খারাপ লাগে নাই। কিন্তু ভাল লাগিবারও তাহার ভিতর কিছু নাই। নিতান্ত সাধারণ বর্ণহীন তাহার চরিত্র—নিজস্ব তাহার কোন সত্তা আছে বলিয়াই মনে হয় না। ভারবাহী পশুর মত সে সারাদিন কাজ করিয়া যায়, কিন্তু সে কাজেও তাহার কোন গা নাই। নেহাৎ না করিলে আহার জুটিবেনা বলিয়াই করে।

প্রথম দিন বিনুর সম্বন্ধে সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। নকুড় দাস তখন সবিস্তারে এই 'সোণার চাঁদের মত ছেলে' কুড়াইয়া পাওয়ার গল্প করিয়াছে। সৎমার দৌরাত্ম্যে ও পিতার ঔদাসীন্যে ছেলেটা কেমন করিয়া ঘরে টি'কিতে পারে নাই তাহার মনগড়া একটা গল্পও সে বলিতে ভোলে নাই।

নকুড় দাসের স্ত্রী সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বিনুকে বুকে জড়াইয়া বলিয়াছিল—আহা বাছারে! এমন ছেলেকে সারাদিন দেখতে না পেয়ে মা বাপ আছে কি করে! তাহাদের প্রাণ কাঁদে না গা ?

নকুড় দাস বিজ্ঞের মত বলিয়াছিল, তারা হয়ত এতক্ষণ আপদ গেছে ভেবে হরির লুট দিচ্ছে।

'এমন বাপমার মুখে আগুন' বলিয়া নকুড়ের স্ত্রী বিনুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিল, 'তুই বাবা আজ থেকে আমায় মাসি বলে ডাকিস্, আমার পেটের দুটো ছেলের আহার জোগাড় হয় ত তিনটেরও হবে।'

বিনু ইহাদের মাঝে পড়িয়া এতক্ষণে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। ইহারা তাহার বাড়ীর যে অবাস্তব চিত্র নিজেদের

মনোমত করিয়া আঁকিয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিবার উৎসাহও তাহার ছিল না। কুণ্ঠিত ভাবে সে তাহার নূতন আশ্রয়টি লক্ষ্য করিতেছিল। পাকা হইলে কি হয়, ঘাটের উপরকার এই পুরাতন ঘরটির অত্যন্ত ভগ্নদশা। কড়িকাঠ-গুলা উয়ে খাওয়া, উপরের টালিগুলা সব সময়েই পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়। তাহার উপর ঘরটি অত্যন্ত নোংরা। এত নোংরা ঘর সে কালীদের বাড়িতেও দেখে নাই। রাজ্যের জঞ্জাল এই ঘরটিতে কেন যে ইহারা জড় করিয়াছে তাহা বিনুর বোধগম্য নয়। ছোট বড় ভাঙা টিনের কৌটা। কাগজের নানাপ্রকার বাক্স, রাস্তার খড়কুটা ইহারা যাহা পাইয়াছে তাহাই ঘরে আনিয়া বোঝাই করিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নূতন পাতানো মাসির অশ্রুজল দেখিয়াও নিজের দিক হইতে তাহার মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় নাই। দেবুর মার স্নেহের স্পর্শে তাহার মন আপনা হইতে আর্দ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু নকুড় দাসের স্ত্রীর আদর যেন তাহাকে স্পর্শ ই করে নাই।

সন্তান যে কত পুণ্যের ফলে পাওয়া যায় এবং তাহার অযত্ন করা যে কত বড় পাপ নকুড় দাস সে বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলিয়া যাইতেছিল। মাসির সে বিষয়ে স্বামীর সহিত মতভেদ নাই। তা ছাড়া দরিদ্র হইয়াও যে ছেলের জন্য সব দুঃখ সহ্য করিতে পারে এই গর্ব্বেই স্বামীস্ত্রী তখন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মাসি বলিল, "হ্যাঁগা, আবার কোন দিন ফিরিয়ে দিয়ে আসবে না ত!"

নকুড় দাস সবিস্ময়ে বলিল, "ঈস্ ফিরিয়ে দেব সেই চামার বাপের হাতে! তুই বলিস্ কি বড় বৌ, সেধে নিতে এলে দেব না ত', ফিরিয়ে দেব। কই নিয়ে যাক্ দিকি কেমন করে কে নিতে পারে নকুড় দাসের হাত থেকে ছিনিয়ে!"

মাসি আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তাই বলছিলাম বাপু, আদর যত্ন করে মানুষ করে আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, আমার অমনি মায়া পড়ে গেছে।"

মাসির মায়া হয়ত সত্যই পড়িয়াছিল কিন্তু আহারের সময় তাই বলিয়া সে একটু উচ্চবাচ্য না করিয়া পারে নাই।

"বলি হ্যাঁগা ছেলে ত' সোহাগ করে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলে, তার খাবারের ব্যবস্থা করেছ! তিনজনের ভাতে চারজনের কুলোয়!"

নকুড় বিব্রত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিয়াছিল "ঘরে মুড়ি-টুড়ি নেই?"

"মুড়ি আবার নেই! আমায় ঝুড়ি ঝুড়ি পয়সা এনে দিয়েছ, আমি জালা জালা মুড়ি কিনে রেখে দিয়েছি!"

নকুড় দাস বলিয়াছিল "তা না হয় আমায় ভাত কিছু কম করে দিও।"

"তাত' দেবই!" বলিয়া মাসি গজগজ করিতে করিতে ভাত বাড়িতে বসিয়াছিল।

আহারের ব্যাপার লইয়া এই কথাবার্ত্তায় বিনুর অত্যন্ত লজ্জা হইতেছিল, কিন্তু সারাদিন উপবাসের পর তাহার তখন সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। খাইবে না বলিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

মাসি শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় নিজের অংশ হইতেই বিনুকে খাইতে দিয়াছিল, কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুব্ধ গুঞ্জন থামে নাই।

—"ভাললোকের হাতে পড়েছিলাম, খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল তবু দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে পাই না।"

—"পাঁচ কড়ার যার মুরদ নেই তার অত আদিখ্যেতা কেন!"

নোংরা বিছানার এক পাশে কুণ্ঠিত ভাবে শুইয়া বিনু বিষম লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। নিজের ক্ষুধা পাওয়ার অপরাধ সে কোনমতে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

ক্লান্ত হইলেও সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিনু ঘুমাইতে পারে নাই। অপরিচিত আবেষ্টনের ভিতর অনাত্মীয় লোকেদের মাঝে শুইয়া তাহার অত্যন্ত অশান্তি বোধ হইতে-ছিল। জিনিষপত্রে বোঝাই সঙ্কীর্ণ ঘরে কেমন একটা ভাপসা দুর্গন্ধ। তাহার পাশেই নন্দ শুইয়া ছিল। ঘুমের ঘোরে পা দিয়া বিনুকে সে খালি মেঝের উপরেই ঠেলিয়া দিয়াছে। বিনু সেখানেই পড়িয়া বিহ্বল মন লইয়া নিজের অবস্থাটা বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর যাহাই করুক, কাল সকাল হইতে সে যে ইহাদের আশ্রয়ে আর থাকিবে না এ বিষয়ে সে তখন স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছে।

* * * *

পরের দিন কিন্তু বিনুর যাওয়া হইল না, ঘুম হইতে উঠিল সে একটু বেলাতে। আর সকলে তখন উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেটা শুধু এক পাশে জাগিয়া বসিয়া খেলা করিতেছিল। বিনু ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই মাসি ডাকিয়া বলিল, "ঘুম ভাঙল বাবা এতক্ষণে! হাক্লান্ত হয়ে কাল ঘুমিয়েছিলি বলে আমি আর সকালে ডাকিনি।"

ঘরের বাহিরে ঘাটের পঁইঠার উপর এক তাল মাটি ও কয়লার গুঁড়া লইয়া মাসি গুল দিতে বসিয়াছিল তাহা প্রথমটা বিনুর চোখে পড়ে নাই। পলায়নের ইচ্ছা লইয়াই সে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে থামিতে হইল।

মাসি আবার বলিল, "ছেলেটার জন্য ঘর ছেড়ে যেতে পারছিলাম না। দস্যি ছেলে কখন গঙ্গায় পড়বে কখন রাস্তায় বেরিয়ে যাবে তার কিছু ঠিক নেই। পোড়াঘরের দরজা নেই যে আটকে রাখব।"

ঘরের অবস্থা মাসি অতিরঞ্জিত করিয়া বলে নাই। ভাঙা উইয়ে-খাওয়া দরজার ছুটি পাল্লা কোনরকমে টিঁকিয়া থাকিলেও তাহাদের বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। বাহিরের দিকের শিকলির কড়াসমেত কবে লোপাট হইয়া গিয়াছে কে জানে।

টিনের উপর সাজান গুলগুলা ঘাটের একধারে রৌদ্রে বসাইয়া আসিয়া মাসি বলিল, "ছেলেটাকে একটু দেখিস ত' বাবা, আমি চট করে বামুনদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। ছটো শাকপাতা যোগাড় না হলে ত' আজ শুধু ফ্যানভাত খেতে হবে।"

বিনুকে বাধ্য হইয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলে আগলাইতে বসিতে হইল। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মন লইয়াই সে ছেলে আগলাইতে বসিয়াছিল। এখানকার আবহাওয়া হইতে সে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় যাইবে কি করিবে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলেও তাহার মনে হইতেছিল এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। কিন্তু খানিক বাদে এ সব কথা সে ভুলিয়া গেল।

ছোট ছেলে যে এমন অপরূপ বিস্ময়ের বস্তু হইতে পারে একথা জানিবার সুযোগ তাহার কখনও হয় নাই। ছোট ভাইবোনের অভাবে এই বয়সের শিশুর সহিত পরিচয় তাহার ছিল না। মাসি বড় জোর আধঘণ্টা বাহিরে ছিল কিন্তু ইহারই মধ্যে দেখা গেল ছেলেটা নাক কামড়াইয়া গা-ময় লালা ফেলিয়া অপরূপ সব মুখভঙ্গি করিয়া বিনুকে একেবারে বশ করিয়া ফেলিয়াছে।

মাসী তরীতরকারী সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিতে বিনু এক গাল হাসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—মাসিমা, মিনু নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে পারে! দেখবে? এই দেখ, আমি হাত ছেড়ে দেব তবু দাঁড়িয়ে থাকবে!"

একদিক দিয়া নকুড় দাসের সংসার বিনুর পক্ষে সুবিধা-জনক। এই সংসারের ভিতরকার বন্ধন শিথিল না হইলে বিনু এত সহজে ইহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত না। আশ্রয় পাইয়াও হয়ত তাহার আড়ষ্টতা দূর হইত না। ইহাদের সংসারে সত্যকার কোন বাঁধুনি না থাকার দরুণ অনায়াসে বিনু খাপ খাইয়া গিয়াছে। ইহাদের মনে সত্যকার কোন স্থান তাহার হয়ত নাই, কিন্তু অনাবশ্যক উপদ্রব রূপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবার কথাও ইহাদের মনে আসে না। তাহাদের ভিক্ষার অন্নে ভাগ বসাইবার মত আর একটি প্রাণী বাড়ায় ছোটখাট যে সব অসুবিধা হয়, তাহাতে মাসি মাঝে মাঝে উত্যক্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহার ক্ষোভ বিনুর বিরুদ্ধে নয়, *ভাগ্য ও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে।* সংস্কারগত স্নেহের প্রেরণায় বিনুকে মাসি আদরও করে প্রচুর।

সব শুদ্ধ জড়াইয়া ধরিতে গেলে, এমন ভাবে মিশিয়া যাওয়ার সুযোগ তাহার পক্ষে কল্যাণকর কিনা, তাহা অবশ্য বিনুর বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু আপাততঃ সে অদূর অতীতের ঘটনাগুলিকে ভুলিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

ইহাদের জীবনের ধারা আর যাহাই হউক একঘেয়ে নয়। তাহার বৈচিত্র্যের স্বাদ বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের না থাকিলেও বিনুর আছে। ইহাদের প্রত্যেক দিনের অনিশ্চয়তাই বিনুর মনকে নাড়া দিয়া সচল করিয়া রাখে। পিছনের ঘটনার চারিধারে অন্ধ ঘূর্ণাবর্ত রচনা করিবার অবকাশ তাহার মনের মেলে না।

নকুড় দাসের সংসারে প্রত্যেক দিন একই সমস্যা নূতন ভাবে দেখা দেয়। আজিকার দিনে কোথা হইতে ক্ষুধার অন্ন মিলিবে ইহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা। এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তাহারা পথের বাছবিচার বড় একটা কখনও করে না। কোন দিন রাত থাকিতে মাসি হয়ত স্বামীকে ডাকিয়া তুলিয়া দেয়, "ওগো ওঠোনা, আজ যে বাগানে যাবে বলেছিলে?"

বাগানে যাওয়া ব্যাপারটার অর্থ আজ কয়দিন হইল বিনু বুঝিতে পারিয়াছে। ব্যাপারটা প্রাতর্ভ্রমণ ঠিক নয়, সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চর্চ্চাও তাহাকে বলা যায় না। ইহার ভিতরে একটু রহস্য আছে। বাগানে যাওয়ায় দিন ভোর হইবার অনেক আগে বাহির হইয়া সূর্য্য ওঠার পূর্ব্বেই নকুড় দাস নন্দকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাইবার সময় খালি হাতে গেলেও আসিবার সময় দেখা যায় তাহাদের কোঁচড় ভর্ত্তি হইয়া আছে। তরী তরকারী প্রভৃতির কয়েকদিন আর অভাব থাকে না।

প্রথম প্রথম ইহাদের এই আচরণে বিনু অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও মন তাহার ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে।

চুরি জিনিষটার বিরুদ্ধে তাহার মনের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। ইহারা এই ব্যাপার লইয়া বড়াই পর্য্যন্ত করে দেখিয়া তাহাতে বিস্ময় আরও বাড়িয়াই যায়। আজকাল কিন্তু ব্যাপারটা তাহার গা-সওয়া হইয়া আসিতেছে।

স্ত্রীর ডাকে নকুড় দাস উঠিয়া পড়ে। নন্দ বাড়ীর আর কোন কাজে সাহায্য না করিলেও এ ব্যাপারে পিতার সঙ্গে যাইতে আপত্তি করে না। বাহাদুরির একটা মোহ তাহার মনেও বোধহয় আছে। বাপের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সেও প্রস্তুত হয়।

বিনুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অনেক ক্ষণ। বিছানায় পড়িয়া সে উহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতে থাকে। হঠাৎ নন্দ বলে,—"রোজ রোজ আমরাইবা যাব কেন বল্‌ত? তোর নবাব বোন্‌পো একদিন যেতে পারে না?"

মাসির বিনুকে যাইতে দিতে যে বিশেষ আপত্তি আছে তাহা নয়—তবু একবার সে বলে—"না না ওকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। কখনও যায় নি, শেষ কালে—ধরা-টরা পড়ে যাবে!"

নন্দর কাছে কথায় পারিবার জো নাই। বিদ্রূপ করিয়া সে বলে—"ঈস্ কখন যায় নি! আমরাই কি পেট থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করেছি নাকি?"

মাসি পুত্রগর্ব্বে একটু হাসিয়া বলে-"ও কি তোর মত চট্‌পটে! নিড়বিড়ে মানুষ, শেষকালে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে।"

কিন্তু নন্দ আজ নাছোড়বান্দা। রাগিয়া উঠিয়া বলে "খাবার বেলা ত' বেশ চট্‌পটে দেখতে পাই। সে হবে না। আজ যেতে হবে ওকে!"

বিনুকে শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। একটু সঙ্কোচ থাকিলেও কৌতূহল যে তাহার এ বিষয়ে একবারে নাই তাহা নয়।

নকুড় দাস এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এইবার বিনুকে উৎসাহ দিয়া বলে, "এখন থেকে একটু চালাক চতুর হওয়া ভাল। ভয় কি! আমরা ত সঙ্গে আছি।"

গঙ্গার ওপারে সরকারী বাগান। গঙ্গায় জল অবশ্য সামান্যই। হাঁটিয়া পার হইতে বিনুর কোমর পর্য্যন্তও জল উঠে না। অন্ধকারে সন্তর্পণে গঙ্গা পার হইবার সময় বিনুর সমস্ত ব্যাপারটা তেমন খারাপ আর লাগেনা। কেমন যেন একটু উৎসাহই হয়। ব্যাপারটা যে চুরি করিতে যাওয়া মাত্র ইহা আর তাহার মনে থাকে না। মস্ত বড় একটা দুঃসাহসী কাজে যেন চলিয়াছে! অধীর ঔৎসুক্যে তাহার বুকটা অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত আনন্দে কাঁপিতে থাকে।

নির্জ্জন গঙ্গার ঘাট। আগের দিন কয়েকটা ইটের বড় মহাজনী নৌকা জোয়ারের স্রোতে আসিয়া মাল খালাস করিয়াছিল। ভাটা পড়িয়া আসায় তাহারা আর যাইতে পারে নাই, জোয়ারের অপেক্ষায় নোঙ্গর ফেলিয়া আছে। অন্ধকারে তাহাদের কাল মূর্ত্তিগুলা বড় অদ্ভুত দেখায়। ছোট নদীর উপরে যেন বড় বড় কাল পাথরের চাঁই পড়িয়া আছে। সেই নৌকাগুলার পাশ দিয়া সন্তর্পণে তিনজন ওপারে গিয়া উঠে। সামনে ঢালু গঙ্গার পাড়। পাড় বাহিয়া উঠিতে গিয়া বিনু পিছল কাদায় একবার পা ফস্কাইয়া পড়িয়া

যায়। নন্দ চাপা গলায় বলে,—"সাবধান, ওদিকে বড় কাদা, এই দিক দিয়ে আয়।"

চুরি করিতে যাওয়ার উত্তেজনায় ও উৎসাহে নন্দ বিনুর প্রতি তাহার নীরব অবজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছে। তিনজনের সম্বন্ধ এখন যেন নূতন।

পাড় বাহিয়া উঠিবার পর সরকারী বাগানের কাঁটার তারের বেড়া সামনে পড়ে। নন্দ সবার আগে তাহার ভিতর দিয়া গলিয়া ভিতরে গিয়া ঢোকে। বিনুকে বেড়া ডিঙাইতে একটু বিব্রত হইতে হয়। নন্দ তাহার সাহায্যে আসিয়া বলে, "তুই বড় আনাড়ি! দাঁড়া আমি দুটো তার ফাঁক করে ধরছি তুই ভেতর দিয়ে গলে আয়।"

নন্দ ও নকুড়ের সাহায্য সত্ত্বেও বিনুর পিঠের দুএকটা জায়গা কাঁটায় ছড়িয়া যায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তাহার আর ভ্রুক্ষেপ নাই। দুঃসাহসী কাজের উন্মাদনা তখন তাহাকেও পাইয়া বসিয়াছে।

বেড়ার ওপারে গিয়া তিনজনে খানিক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সামনে বহুদূরবিস্তৃত বাগান। অস্পষ্টভাবে নিকটের সারি সারি শাক-সবৃজির আলগুলি দেখা যায়। দূরে লিচু ও আমের বন অন্ধকার করিয়া আছে।

নন্দ চুপি চুপি বলে, "সেদিনকার মত আজ আবার কেউ ঘুপটি মেরে পাহারায় বসে নেইত'!" এ দিককার কথাটা বিনু একেবারেই ভাবে নাই। সহসা একটু ভয় পাইয়া সে বলে—"যদি থাকে?"

নন্দ সাহস দিয়া বলে—"থাকলেই বা, আমাদের ধরতে পারবে নাকি! সেদিন বেটার নাকের সামনে দিয়ে ত পালিয়ে গিয়েছি।"

বিনুর এতক্ষণের উৎসাহ একটু ম্লান হইয়া আসে। কাহারও নাকের সামনে দিয়া পলাইবার বাসনা তাহার নাই।

ক্ষেতের মাঝখানে কাঠের একটা মাচাবাঁধা ছোট ঘর। নকুড় দাস সেদিকে দেখাইয়া বলে, "দেখ্ দিকি, তক্তার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে কিনা।"

"ওইত' আলো দেখা যাচ্ছে, বেটা ভেতরেই আছে আজ! এস বাবা।" বলিয়া নন্দ সামনে চলিয়া যায়।

বিনু এবার অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হয়। ইহাদের সহিত আসার জন্য এইবার তাহার সামান্য অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কেমন ধারণা হয় যে আজ সে ধরা পড়িবেই। কেহ তাড়া করিলে ইহারা পলাইতে পারিলেও ওই কাঁটা-তারের বেড়া সে কিছুতেই পার হইতে পারিবে না।

নন্দ এক সময়ে পিছন ফিরিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলে—"পেছিয়ে পড়ছিস্ কেন! কিছু ভয় নেই, আয় না এগিয়ে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনুকে সামনে যাইতে হয়। সন্তর্পণে বাগানের মাঝামাঝি গিয়া তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে। ছোট ছোট চৌকোণা ক্ষেতে ভাল করিয়া বেগুন আলু লঙ্কা মূলা প্রভৃতির চাষ হইয়াছে। নন্দ ও নকুড়ের সমস্ত ক্ষেতই চেনা। বিনুকে পাহারাদারের ঘরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া তাহারা কোঁচড় ভর্ত্তি করিয়া তরকারী সংগ্রহ করিতে সুরু করে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে পাহারা-ঘরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ভয়ে বিনুর বুক কাঁপিতে থাকে। তাহার প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, কে যেন সন্তর্পণে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখনি চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধীরে ধীরে নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া খানিক বাদে সে চুপি চুপি বলে, "পাহারা-ঘরের কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে ভাই—হাত নাড়ছে।"

নন্দ ও নকুড় একথায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। নকুড় জিজ্ঞাসা করে—"কোথায়?"

বিনু হাত দিয়া দেখাইয়া দিতেই নন্দ একটু হাসিয়া বলে —"দূর ওটা কলাগাছ, হাওয়ায় একটা পাতা দুলছে দেখে হাত নড়ছে ভেবেছিস্। তুই ত আচ্ছা আটাশে!"

বিনু এবার সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হয়। নন্দ তাহার চেয়ে বয়সে ছোট। তাহার কাছ হইতে ভীরু অপবাদ শোনা সত্যই অপমানজনক। নিজের ভীরুতার অপবাদ খণ্ডন করাইবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে—"ও ধারের ক্ষেতটায় কি আছে?"

নন্দ বলে, "ওতে কপির চারা লাগিয়েছে!"

বিনু সাহস দেখাইয়া বলে—"আনব গোটাকতক!"

নকুড় মানা করিয়া বলে, "না না, ও চারাগাছ কি নষ্ট করতে আছে! পেটের দায়ে পরের জিনিষ আনতে হয় বাবা, কিন্তু জিনিষ কখন নষ্ট করেছি এমন কথা কেউ বলতে পারবে

না! নকুড় দাস এমন লোক নয়—ছুটো দরকার থাকলে তিনটে সে প্রাণ থাকতে নেবে না ··”

নন্দ বাধা দিয়া বলে—“আচ্ছ, আচ্ছা, তুমি বাবা এগুলো নিয়ে চলে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।”

নকুড় নন্দর সংগৃহীত তরীতরকারী গুলি নিজের কোঁচড়ে ভর্ত্তি করিতে করিতে বলে, “আবার একটু পরে কেন!”

নন্দ চাপাগলায় বলে, “আজ কলাবাগানে একটু যাব! যাবি বিনু!”

সাহস দেখাইতে গিয়া এমন অবস্থায় পড়িবে বিনু ভাবে নাই। এ প্রস্তাবে সায় দিতে তার মন চাহে না, তবুও সে জোর করিয়া বলে, “যাব।”

নকুড় ছেলেকে একটু বুঝি ভয় করে। একবার শুধু আপত্তি করিয়া তবু সে বলে, “কি হবে আর কলাবাগানে গিয়ে—ভোর হয়ে আসছে!”

“তা আসুক, তুমি যাও” বলিয়া নন্দ বিনুর একটা হাত ধরিয়া কলাবাগানের দিকে অগ্রসর হয়।

ভোর হইবার আগেকার নীলাভ তরল অন্ধকারে সমস্ত বাগান অপরূপ দেখাইতেছে। অদূরে কলাবাগানের ঘন ঝোপ বিনুর কাছে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। অত্যন্ত ভয় করিলেও আবার তাহার মনে একটু মোহ ধরিয়া আসে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহার কেমন মনে হয়—তাহার পাশে যে তাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছে সে নন্দ নয়—সে দেবু। দেবুর সঙ্গেই সে যেন দুঃসাধ্য কোন কাজে চলিয়াছে। ভয় বিপদ কিছু তাহারা গ্রাহ্য করে না। পাশাপাশি থাকিলে তাহারা সব কিছু উপেক্ষা করিতে পারে।

তাহার স্বপ্ন কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নির্ম্মম ভাবে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নন্দ বলে, “ভাল এক কাঁদি চাতাতে পারলে আজ বাজারে বিক্রী করে দেব। পয়সার ভাগ কিন্তু তোমায় দিচ্ছি না বাবা!”

নকুড় দাসের সংসারে বেশী দিন থাকিলে বিনু কি হইত বলা যায় না। ইহাদের জীবনের ধারায় নিজেকে মিলাইলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আর খুঁজিয়াই পাওয়াই যাইত না। তাহার শিক্ষা ও সংস্কারের শক্তি আর কতটুকু। ইহাদের জীবনের শৈথিল্য তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া অনায়াসেই তাহার সমস্ত সম্ভাবনা নিষ্ফল করিয়া দিতে পারিত।

ইতিমধ্যে তাহার বুঝি একটু-আধটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকাল বেলা হয়ত মাসি বলে—“আজ ত উনুন জ্বলবে না বাবা। দুটো কাঠ নিয়ে আসতে পারিস্?”

ঘাটের পাশে খড় ও কাঠের গোলা। ঘাটের নীচের ধাপ হইতে লুকাইয়া গোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়া যায়। দুএকটা কাঠ গোপনে চুরি করিয়া আনাও সহজ। বিনু মাসির কথায় বিনা প্রতিবাদে কাঠ আনিতে যায়। দুইটার জায়গায় চারিটা চেলাকাঠ আনিয়া বিনু উত্তেজিত স্বরে বলে, “এখন গোলায় কেউ নাই মাসি, নন্দ থাকলে এক বোঝা কাঠ আনতে পারতুম।”

মাসি হাসিয়া বলে, “দরকার নেই বাবা, তুমি যা এনেছ তাই ঢের।”

নকুড় দাসের সঙ্গে আজকাল নীলুকে লইয়া সেও সময় সময় ভিক্ষায় বাহির হয়। নকুড় দাস বিনুকে তাহার মাতৃহীন সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে বিনুর আর রাগ হয় না; মুখখানি ম্লান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে আজকাল ভালই পারে। নকুড় দাস আজকাল বুঝিয়াছে যে শিশু নীলুর চাইতে বিনুর সুন্দর ম্লান মুখের আবেদনের মূল্য অনেক বেশী! সে আজকাল বিনুকে সঙ্গে লইয়া যায়। হয়ত এই মিথ্যাচরণে বিনুর মনে কোথাও সঙ্কোচের কাঁটা এখনও বেঁধে, কিন্তু নকুড় দাসের সংসার তাহা না হইলে চলিবে না ভাবিয়া সে আর আপত্তি করে না। আপত্তি না করিবার আরও কারণ আছে। মাসি আজকাল কথায় কথায় বলে, “এ জন্মেই না হয় পেটে ধরিনি, ও-আমার আর জন্মের ছেলে। নন্দ আমাদের ভুললেও ও কখনো আমাদের ফেলবেনা, দেখো।”

অর্থহীন এই স্নেহের উচ্ছ্বাসে বিনু আজকাল কেমন যেন গলিয়া যায়। এ সংসারের দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতার আবহাওয়ায় মাসির পূর্ব্বজন্মের সন্তান হওয়াও তাহার কাছে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে হয়।

(ক্রমশঃ)

[এই বিভাগে কিশোর-বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীর পাঠযোগ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইবে]

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কীৰ্ত্তি-কাহিনী
দরিদ্র পেষ্টালটসি

আজকে একজন বিদেশী মহাপুরুষের কথা ব'লব। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সমস্ত জীবন তিনি অতিবাহিত করেন। যে-আদর্শ তিনি প্রচার করতে চেয়েছিলেন, নিজের জীবনে তিনি তা সফল দেখে যেতে পারেন নি। অথচ আজ তাঁর সেই চেষ্টা নিয়ে জগতে একটা দিকে যুগান্তর হতে চলেছে।

আর একটা কারণে তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার যে নানারকম পরিবর্ত্তন আজ হচ্ছে, তার প্রথম সূত্রপাত তিনিই করে যান।

যে-শিক্ষা মনকে সজাগ করে, সুন্দরকে ভালবাসতে শেখায়, সত্যকে করে তুলে বরণীয়—সেই শিক্ষার কথা—অতি পুরানো কথা যদিও—নতুন করে পেষ্টালটসি য়ুরোপকে শুনিয়ে যান।

প্রায় দুশো বছর আগে, ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী জুরিকে পেষ্টালটসি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা পরলোক গমন করেন। তাঁর আরও তিনটি ভাই-বোন ছিল। পিতার মৃত্যুতে তাঁর মা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি সাধারণ মেয়েদের মত ছিলেন না। সেই দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি ছেলেদের মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

তাঁর মার জীবন এবং তাঁদের বাড়ীর অভিজ্ঞতা থেকে পেষ্টালটসি চারটি অতি মূল্যবান কথা শেখেন। সেই চারটি কথা তিনি আজীবন জগৎকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

এক—মাকে যদি শিক্ষক হিসাবে পাওয়া যায়—তা হ'লে এত বড় শিক্ষক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না।

দুই—বাপ ছেলেকে যেমন ভাবে দেখে, শিক্ষকের উচিত ছাত্রকে সেইভাবে দেখা।

তিন—জীবনের সবচেয়ে বড় কামনার জিনিষ হচ্ছে ঘরের শান্তি।

চার—লেখাপড়া শেখাবার জন্য সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে স্নেহ এবং ভালবাসা।

পেষ্টালটসির যখন উনিশ বছর বয়স তখন খবরের কাগজে একটা লেখা বেরুনোর দরুণ রাজনৈতিক অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঠিক করলেন যে আইন পড়বেন। দরিদ্র কৃষকরা তখন বড় নির্য্যাতিত
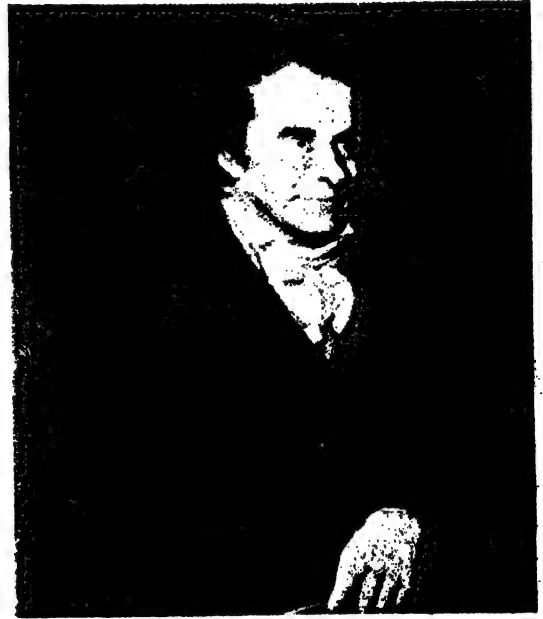
পেষ্টালটসি।

হ'ত। তিনি আইন পড়ে আদালতে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে দাঁড়াবেন স্থির করলেন।

রুশোর নাম তোমরা বোধ হয় শুনেছ। তিনি একজন মস্ত বড় দার্শনিক-কবি ছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, সভ্যতার এত সব আড়ম্বর ত্যাগ করে মানুষকে আবার প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে হবে। মানুষ যত সভ্যতার আসবাব বাড়িয়েছে, তত বেড়েছে তার দুঃখ। সেইজন্য

মানুষকে তার মাত্র জীবন-যাত্রা চালাবার জন্য যতটুকু সামান্য প্রয়োজন, তাই নিয়ে থাকতে হবে।

রুষোর এই কথায় সেই সময় অনেক লোকের জীবনের ধারা বদলে গিয়েছিল। পেষ্টালট্‌সি রুষোর লেখা পড়ে আইন পড়ার কথা মন থেকে ত্যাগ করে—গ্রামে ফিরে গিয়ে একটা ছোট জমি নিয়ে চাষবাস আরম্ভ করে দিলেন।

এই সময় তিনি একটু অবস্থাপন্ন একজন কৃষকের মেয়েকে বিয়ে করলেন। কালে তাঁর একটি ছেলে হ'ল। ছেলেটি বড় হওয়ার সঙ্গে, তিনি ছেলের লেখাপড়ার কথা ভাবতে লাগলেন এবং সেই সময় তাঁর মনে এই বাসনা জাগল যে, শুধু তাঁর নিজের ছেলের জন্য নয়, সব ছেলের জন্য ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জোর করিয়ে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে বা বেত দেখিয়ে ছেলেদের কতকগুলি কথা মুখস্থ করানকে তিনি ছেলেদের জবাই করা বলতেন। তিনি বলতেন, এত বড় ভয়াবহ দৃশ্য আর কিছু নেই। দুটো কথা শেখাবার জন্যে, এত শ্রম করে, এত শক্তি খরচ করে, শুধু মনকে মেরে ফেলা হয়; এবং মন তখন বোঝার চাপে মরে যায় বলে, সে-দুটো কথাও মনে থাকে না; মনে থাকলেও, জীবনে কোনও কাজে লাগে না। জীবনে যা কাজে লাগল না, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি?

আহার নিদ্রা ভুলে পেষ্টালট্‌সি দিনরাত এই সব কথা ভাবতে লাগলেন। মনকে হত্যা না করে, কি করে ছেলেকে মানুষ করা যায়?

স্ত্রীর যা টাকাকড়ি ছিল—তাই নিয়ে তিনি নিজে একটি আশ্রম খুললেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর কুড়িটি ছেলে তিনি পেলেন। পুত্রের অধিক স্নেহে তিনি নিজের বাড়ীতে তাদের রেখে তাঁর নিজের মতন করে তাদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

কিন্তু সেই কুড়িটি ছেলের বাপ-মা কিছু কাল পরে একে একে ছেলেদের তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যেতে লাগলেন। পেষ্টালট্‌সির শিক্ষা-প্রণালী তাঁদের পছন্দ হ'ল না। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, পেষ্টালট্‌সি ছেলেদের নিয়ে শুধু খেলা করে—লেখাপড়া শেখা কি খেলা?

কিন্তু পেষ্টালট্‌সির কাছে এ বড় দামী খেলা হয়ে উঠল। তাঁর টাকাকড়ি জমিজমা যা ছিল সমস্ত গেল। উপরন্তু স্কুলও গেল ভেঙ্গে। তারপর আঠার বছর কেউ আর সেই দুঃসাহসী স্কুল-মাষ্টারের কোন কথা শুনতে পায় নি। তার কারণ তাঁর এ রকম শোচনীয় অবস্থা হয় যে, বাইরে বেরোবার উপযুক্ত কাপড়-চোপড় তাঁর থাকত না। দিনের পর দিন অনাহারে চলে যেত। এই ভাবে দীর্ঘ আঠার বছর ধরে ধ্যান-রত যোগীর মত তিনি ভাবতে লাগলেন, কি উপায়ে জগতে এই শিশু-হত্যাকারী শিক্ষা-প্রণালী দূর করে, সত্যিকারের মানুষ-গড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

এই আঠার বছরের চিন্তার ফলে গল্পচ্ছলে তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তার কথা জার্ম্মাণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে একখানি বই লিখলেন, বইটির নাম হ'ল—Leonard and Gertrude. এই বইতে তিনি দেখালেন Gertrude বলে মেয়েটি কি ভাবে ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মত বদলিয়ে নিজের সংসারে এবং পরে সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নতুন জীবন এনে দিল—কেমন করে গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে এই পৃথিবীতে নন্দন-কানন গড়ে তুললে।

বইখানি সুইস্‌-গভর্ণমেণ্টের সুনজরে প'ড়ল। পেষ্টালট্‌সিকে ডেকে সেই বই লেখার পুরস্কার-স্বরূপ একটি সোণার মেডেল দেওয়া হ'ল। বাড়ী ফেরবার পথে সেই মেডেল বিক্রী করে খাবার কিনে এনে সেদিন সেই দরিদ্র পরিবারের খাদ্য-সংস্থান হয়।

তারপর শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতগুলি তিনি একে একে ছোট ছোট বই করে লিখতে লাগলেন। কিন্তু কেউ সেই বই পড়ল না। কোন লোকও এল না অর্থ নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে। তাঁর ধারণাকে কাজে সত্যি করে তুলবার কোনও সুবিধে তিনি পেলেন না। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক অদ্ভুত উপায়ে সেই সুবিধা এল।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। যুদ্ধের পর, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট দেখল যে অনেকগুলি বালক একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছে। তাদের নিয়ে Stanz বলে একটা জায়গার এক মঠে রেখে দেওয়া হ'ল। এই সমস্ত অনাথ ছেলেদের দেখাশুনা করবার একজন লোকের দরকার হ'ল। খবর পেয়ে, বহু চেষ্টা-চরিত্র করে পেষ্টালট্‌সি এই কাজটি পেলেন।

সেই মঠে সেই সব অনাথ ছেলেদের নিয়ে পেষ্টালট্‌সি উম্মাদের মত খাটতে লাগলেন এবং এক বছরের মধ্যে সেই সব ছেলেদের এত উন্নতি হ'ল যে, সরকারী লোক তদারক করতে এসে বিস্মিত হয়ে গেল। কিন্তু হতভাগ্য স্কুল-মাষ্টারের ভাগ্যে এ সুবিধাটুকুও রইল না। যারা যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, তাদের মনে ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা কতটুকু ঠাঁই পায়! সেই মঠকে তারা আহত সৈন্যদের হাসপাতাল করল। আবার পেষ্টালট্‌সি যে অসহায়, সেই অসহায় হয়ে পড়লেন।

বহু চেষ্টা করে এই সময় তিনি একবার নেপোলিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর শিক্ষা-প্রণালীর কথা নেপোলিয়ানকে বুঝিয়ে বলতে, উত্তরে জয়লিপ্সু যোদ্ধা সেদিন বলেছিলেন, এ, বি, সি, নিয়ে ভাববার সময় এখন আমার নেই।

কিন্তু এই কয়মাসে তিনি নিজের ধারণাকে কাজে সত্যি করতে পেরেছিলেন—এই অভিজ্ঞতার আনন্দে তাঁর মন ভরে গিয়েছিল। তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন যে তাঁর চিন্তা শুধু অলস কল্পনা নয়—তাঁর শিক্ষা-প্রণালী শুধু খেলা নয়!

সেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে তিনি এবার আর একখানি বই লিখলেন। প্রথম লেখা বইখানির সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে তার নাম দিলেন—How Gertude Teaches her Children—এবং আসলে এই বইখানিতে তিনি বিশদ ভাবে জানালেন কেমন করে পেষ্টালট্‌সি ছেলেদের শিক্ষা দেন।

এই বইখানি বেরুবার পর থেকে তাঁর নাম শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়ল। এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে Yverdunএ তিনি একটি স্কুল খুললেন। কুড়ি বছর এই স্কুলে তিনি ছেলেদের নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন এবং য়ুরোপের নানা দেশ থেকে নানা লোক তাঁর শিক্ষা-প্রণালী শেখবার জন্য তাঁর কাছে আসতে লাগল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কুড়ি বছর পরে, নানা কারণে তাঁর শেষ-জীবনের এই চেষ্টাও ভেঙ্গে যায়। হতাশ হয়ে তিনি তাঁর স্বগ্রামে ফিরে যান এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে নিঃশব্দে একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

আজ প্রায় দুশো বছর হয়ে গিয়েছে। নানা দেশে ছেলেদের মনকে গড়ে তুলবার জন্য নানা চেষ্টা হচ্ছে। পেষ্টালট্‌সির অনেক প্রণালী আজ অবশ্য পুরানো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি আসল যে সব কথা বলে গিয়েছিলেন, তাই অনুসরণ করে আজ জগতে শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার হচ্ছে।

যাকে শিক্ষা দিতে হবে—সেই হ'ল সব চেয়ে বড় জিনিস—তাই তাকে জানতে হবে প্রথমে—ছাত্রের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি—নতুন করে জগৎকে এই কথাই পেষ্টালট্‌সি শুনিয়ে যান।

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

(২) ইংলণ্ডের প্রথম কবি ক্যাড্‌মান

গতবারে তোমাদের বিওউল্‌ফের কাহিনী বলেছিলাম। আজকে ইংলণ্ডের প্রথম কবি ক্যাড্‌মানের গল্প বলব।

তোমরা হয়ত জান যে উত্তর সাগর পার হয়ে যাঁরা প্রথমে এসে ইংলণ্ডে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা পৌত্তলিক ছিলেন। তারপর ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রোম থেকে একজন খৃষ্টান সাধুপুরুষ—তাঁর নাম হ'ল অগাষ্টিন—দক্ষিণ ইংলণ্ডে এসে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করতে লাগলেন। এবং তাঁর প্রচারের ফলে দেখতে দেখতে অনেক রাজা, জমিদার, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতে লাগলেন।

খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এক শ্রেণীর লোক জীবন-মরণ পণ করে য়ুরোপের চারিদিকে তখন ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের ইংরেজীতে "মঙ্‌ক্", সন্ন্যাসী (monk) ব'লত। এই সাধু-পুরুষদের থাকবার জন্য গ্রামে গ্রামে এক রকম বাড়ী তৈরী হতে লাগল—সেই সময় সেই ধরণের বাড়ীকে "অ্যাবি" মঠ (abbey) বলা হ'ত। এই সমস্ত মঠে সাধুপুরুষেরা সমবেত হতেন, তাঁদের উপদেশ শোনবার জন্য লোকেরাও সেখানে জড় হ'ত এবং এইসব মঠে থেকেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম দিককার অনেক কবি, প্রচারক, সাহিত্যিক দেখা দেন।

ইয়র্কশায়ারের হুইট্‌বী প্রদেশে একটা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় এই রকম একটা মঠ ছিল। যে সময়ের কথা বলছি তখন এই হুইট্‌বী মঠের খুব খ্যাতি ছিল। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় সাধুসন্ন্যাসী সেখানে জড় হতেন।

সেই মঠের কর্ত্তা ছিলেন একজন নারী। তাঁর নাম ছিল হিল্ডা। তিনি রাজবংশের মেয়ে ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মের জন্য তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করেন।

সেই মঠের কাছে অতি দরিদ্র এক কৃষকের পরিবার ছিল। তাদের ক্যাড্মান বলে একটি ছেলে ছিল। হিল্ডা ক্যাড্মানকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ক্যাড্মান সেই মঠে থেকে সেখানকার কাজকর্ম্ম সব করত।

একদিন এক উৎসবের সময় নানা দূর দেশ থেকে সব সাধু-সন্ন্যাসীরা এসেছেন। কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন, কেউ এসেছেন গরুর গাড়ীতে। সাময়িক ভাবে একটা আস্তাবল তৈরী করা হয়েছে। ক্যাড্মানের ওপর ভার পড়ল, রাত্রে সেই আস্তাবল চৌকী দেওয়া; কেন না, তখন গরু ঘোড়া ভয়ানক চুরি হ'তো।

ধর্ম্ম আলোচনার পর, রোজ সন্ধ্যাবেলা সকলে সমবেত হয়ে গান গাইতে ব'সত। একজনের গান শেষ হয়ে গেলে, বীণা যন্ত্রটি সে আর একজনের কাছে এগিয়ে দিত, সে তখন আবার গান আরম্ভ ক'রত। এই রকমভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন হ'ত। সকলেই সেই উৎসবে যোগদান করে বীণা বাজিয়ে গান গাইত। ক্যাড্মানের মনে দুঃখ হ'ত। তার আঙুলের ছোঁয়ায় কেন বীণা বাজে না? তার কণ্ঠে কেন সঙ্গীত নেই?

একদিন এই রকম মনের দুঃখে আস্তাবলে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপ্নে দেখে এক দিব্যপুরুষ তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে—তাকে ডেকে কি যেন বলছেন। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থেকে সে স্পষ্ট শুনতে পে'ল, সেই দিব্য-পুরুষ বলছেন, ক্যাড্মান, আমাকে গান শোনাও!

বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে ক্যাড্মান বলে, প্রভু, গান গাইতে জানি না বলেই তো উৎসব থেকে দূরে এই আস্তাবলে পড়ে আছি!

তবুও ক্যাড্মান শুনল দিব্যপুরুষ বলছেন, তুমি গান গাও!

বিমূঢ় বিস্ময়ে ক্যাড্মান জিজ্ঞাসা করে, প্রভু, তবে বলে দিন আমি কি গাইবো!

"কেমন করে ভগবান এই বিশ্ব সৃজন করলেন, জীবনের সেই প্রথম দিনগুলার গান তুমি গাও!"

হুইটবী চ্যাপেল। এই ভগ্নাবশেষ অবশ্য পুরানো অ্যাবির ভগ্নাবশেষ নয়। পুরানো অ্যাবি বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। তার জায়গায় এই মঠ গড়ে ওঠে।

ক্যাড্মান স্বপ্নে গাইতে আরম্ভ করলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কোথা থেকে জোয়ারের জলের মত কথা আসতে লাগল। ক্যাড্মান গেয়ে চল্লেন, জগতের সকল জিনিষের জন্ম-কাহিনী—এই আকাশ, এই পৃথিবী, মেঘের ওপারে ঐ স্বর্গ, স্বর্গ ও পৃথিবী এক-করে-দেওয়া আলো আর অন্ধকারের জন্ম-ইতিহাস!

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই ক্যাড্মানের রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। স্বপ্নে সে যে গান গেয়েছিল, যখন জেগে উঠল দেখে তার প্রত্যেক কথাটি তার মনে রয়ে গিয়েছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে হিল্ডার কাছে ছুটে গিয়ে সমস্ত কথা ব'লল। তিনি বুঝলেন যে, যে শক্তি গোপনে ফুলের বুকে মধু ভরে দেয়, সেই শক্তি ক্যাড্মানের মন সুরে ভরে দিয়েছে।

তারপর অবশিষ্ট জীবন ক্যাড্মান সেই মঠে থেকে ভাল করে লেখাপড়া শিখলেন এবং বাইবেলের অধিকাংশ পুরানো গল্পগুলিকে তিনি কাব্যে রূপ দিলেন। ঈশ্বরের মহিমাগানে ইংরাজি কাব্যের যাত্রা আরম্ভ হ'ল। তাঁর কাব্যের প্রথম কয়-ছত্র হ'ল,

"Most right it is that we praise with our words,
Love in our mind, the Warden of the skies,

Glorious king of all the hosts of men ;
He speeds the strong, and He is the head of all
His High creation, the Almighty Lord."

"এই সব চেয়ে ভাল যে আমাদের কথা দিয়ে আমরা যশ গাইতে
পারলাম,
প্রেম রইল মনে ভরা, যশ গাইলাম আকাশের চির-প্রহরীর,
রাজ-অধিরাজ নিখিল-নর-লোকের ;
তিনি দিয়েছেন গতি প্রবলের বুকে, প্রবলতম তিনি—
তাঁরই বিরাট সৃষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু !"

তোমরা যখন বড় হয়ে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য পড়বে তখন দেখবে যে, এই সুর যুগের পর যুগ ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। ক্যাড্‌মানের স্তব ইংরাজি-কাব্যের ইতিহাসে প্রায়ই তোমরা শুনতে পাবে।

গাছের বয়স

কোন বড় গাছের গুঁড়ি যখন কাটা হয়, তখন লক্ষ্য করে দেখবে যে গুঁড়ির কাঠের ওপরে চাকার মতন এক্‌টু একটা দাগ পড়ে গিয়েছে। সেই দাগ দেখে গাছের বয়স বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করেন। সব গাছের গুঁড়ির ভিতরে দাগ সমান নয়। কারুর চাকৃতি-দাগগুলো খুব কাছাকাছি, কারুর বা দূরে দূরে। কোন গাছের একটা চাকৃতি হতে হয়ত এক বছর লাগে, কোন গাছের হয়ত একটা চাকৃতি হতে দশ বছর লাগে।

সঙ্গে যে গাছের গুঁড়ির একটা অংশের ছবি দেওয়া হয়েছে—সেটা ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাউথ কেন্‌সিংটন মিউসিয়ামে আছে। এই গাছটির বয়স ১৩৩৫ বছর ছিল। এর গুঁড়িতে ৮টা চাকতি আছে—বোঝাবার জন্যে এক, দুই করে দাগ দিয়ে রাখা হয়েছে।

যখন গাছটার গুঁড়িতে ১নং চাকতি দেখা দিল তখন ৫৫৭ খৃষ্টাব্দ। রোমের সিংহাসনে তখন সম্রাট জুষ্টিনিয়ান্। প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের মালিক তখন রোম।

৬০০ খৃষ্টাব্দে ২নং চাকতি দেখা দিল। তখন রোমের প্রতাপ কমে আসছে। ৩নং চাকতি যখন দেখা দিয়েছে তখন ৮০০ খৃষ্টাব্দ। বিখ্যাত বিজয়ী বীর সার্লেমান তখন রোমের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ৪নং চাকতির সঙ্গে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা সব চেয়ে বড় ঘটনা জড়ানো। এই সময় অর্থাৎ ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে মহামতি আল্‌ফ্রেড্ নতুন করে দেশকে গড়ে তুলছিলেন। ৫নং দাগের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের নর্ম্মান বিজয়ের স্মৃতি বিজড়িত। সে হ'ল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ। তারপর ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ৬নং চাকতি দেখা দিল। এই সময় ইংলণ্ডের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন ঘ'টল। রাজা জনকে ম্যাগ্না কার্টা স্বাক্ষর করতে হ'ল। তারপর ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ৬নং চাকতি দেখা দিল। সেই সময় ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথম ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনূদিত হ'ল। তারপর সর্ব্বশেষ দাগটি যখন গুঁড়িতে ফুটে উঠলো—তখন ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ—গাছটি দাঁড়িয়ে দেখল সমস্ত লণ্ডন সহর পুড়ছে। এই ভাবে গাছটির বয়সের সঙ্গে য়ুরোপের ১৩৩৫ বছরের বহু স্মৃতি জড়ানো।

গাছের বয়স।

অন্তঃপুর

—বিষ্ণুশর্ম্মা

চীনা মেয়েদের সামাজিক সম্মান

সমাজে চীনামেয়েদের স্থান কোথায় তাহা গতবারে নির্দ্দেশ করিয়াছি। যে কঠোরতার ভিতর দিয়া চীনামেয়েদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা তাঁহাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিকে বাধা দেয় কিনা ইহা আলোচনার বিষয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষের শাসনাধীনে থাকিয়া চীনামেয়েদের সামাজিক জীবনে হয়তো এতখানি খর্ব্বতা থাকিয়া গিয়াছে যাহা কাটাইয়া উঠিয়া পৃথিবীর সুসভ্য নারীসমাজের সহিত সমভাবে পা ফেলিয়া চলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, কিন্তু চীনের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে নবীনা চীনা

চীনা মহিলা

মহিলারা শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ কল্যাণের পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছেন এবং হইতেছেন।

চীনের পুরুষ নারীদের প্রতি ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করেন এরূপ কোন প্রমাণ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নারীসমাজের ভিতর অল্পবিস্তর সহায়-হীনতার ভাব বর্ত্তমান আছে এবং প্রাকৃতিক বিধানে তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকা যেরূপ সম্ভব, সেইরূপ চীনের মহিলাদের ভিতরও হয়তো কয়েকটি ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে, সেজন্য সমাজে তাঁহাদের সম্মান নাই একথা বলা চলে না।

চীনের বনিয়াদী ঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকেন, পুরুষের কাছে নিজেদের সুন্দরী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অলঙ্কারাদি পরিধান করা ছাড়াও লোহার নাল বাঁধাইয়া পদদ্বয়কে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলেন, নিজেদের অশিক্ষিত করিয়া রাখা গৌরবের কার্য্য বলিয়া মনে করেন, অতএব ইহার জন্য চীনের পুরুষরা দায়ী ও বর্ব্বর এরূপ ভাবা অনুচিত। এই ভাবে বিচার করিতে গেলে পৃথিবীর প্রত্যেক পুরুষকে বর্ব্বর বলা চলে।

নারী পুরুষের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতে চাহে, বাহবা পাইবার জন্য অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে পারে এবং স্ব স্ব সমাজের উচ্চতম নারীত্বের আদর্শ বলিয়া তাহার নিকট যাহা প্রতীয়মান হয় তাহাই সে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। চীন-সমাজে নারীত্বের আদর্শ যাহা আছে তাহাকে অনুকরণ করাই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া চীনা মহিলার ধারণা। চীনা পুরুষরাও এই ধারণা অনুসারে যে নারী সামাজিক রীতি নীতিকে অনুসরণ করিয়া আদর্শ নারী বলিয়া খ্যাত হইবার চেষ্টা করে তাহাকেই সম্মান প্রদান করিতে বাধ্য হয়। প্রথা বা সামাজিক রীতিনীতির ভিতর গলদ থাকিতে পারে, সে গলদের সংস্কার করারও হয়তো প্রয়োজন আছে, তাই বলিয়া চীনে নারীর সম্মান নাই এ কথা বলা চলে না।

চীনা গৃহিণীদের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দাস দাসী প্রভৃতি সকলের উপর তাঁহাদের অসীম প্রভাব দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অতিরিক্ত আসক্তি অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদের মধ্যে স্ত্রৈণত্বের অপবাদ দিয়া ব্যঙ্গ করার রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত।

এক একজন মেয়ের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব দেখা যায় যে কোন পুরুষ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না, সেই জন্য অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে সত্যকারের ভয় করিতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত পুরুষের উপর অশিক্ষিত মহিলার অতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া অবশ্য বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু জগতে কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম নাই।

আদর্শ চীনা মহিলাদের জীবনকাহিনী লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, তাহা ছাড়া চীনের বিশ্বকোষে ষোল শত আটাশ খানি পুস্তকের মধ্যে তিন শত ছিয়াত্তরখানি পুস্তকে শুধু সুবিখ্যাত রমণীদের সম্বন্ধে লেখা এবং সেগুলিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশংসার অন্ত নাই।

চা খাইতে খাইতে তাস খেলা।

মেয়েদের রচনার নমুনা ও তাঁহাদের শিক্ষার প্রগতি সম্বন্ধেও চীনের বিশ্বকোষে অনেক কিছু লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। চীনের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দেখা যায় যে এই বিরাট মহাদেশের শাসনকর্ত্রীর পদে উন্নীত হওয়াও নারীদের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাজ্ঞী উ-উ (Wu) সম্রাট এবং সাম্রাজ্য উভয়কেই অসামান্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়াছেন। অথচ তাঁহার যে লেখাপড়া খুব ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাজ্ঞী চীন সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাণী হন। আপন বুদ্ধিবলে তিনি দেশের শাসনকর্ত্রী হইয়া উঠেন এবং যথেষ্ট দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

চীনের পারিবারিক গোষ্ঠীর নিয়মই এই যে সন্তানদের পিতামাতাকে সমানভাবে ভক্তি করিতে হইবে। পিতা-মাতাকে সমানভাবে ভক্তি করিয়া যাহারা তাঁহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে তাহাদের প্রশংসার অবধি থাকে না। অনেক চীনা মেয়ে পিতামাতাকে আজীবন সেবা করিবার জন্য বিবাহ পর্য্যন্ত করেন না এবং সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদ পত্র 'পিকিং গেজেট' খুলিলে এইরূপ মেয়েদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখা যায়।

চীনের বড় লোকদের উপর তাঁহাদের মায়েদের প্রভাব যে কতখানি বিস্তৃত হইয়া থাকে সে কাহিনী এই সমস্ত লোকের জীবনী পাঠ করিলেই জানা যায় এবং লোকে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের মায়েদের ঠিক সমান ভাবেই শ্রদ্ধা করে।

মায়ের মৃত্যুতে তিন বৎসর শোক প্রকাশ করা সে দেশের একটি বিশেষ প্রথা। সে সময় সন্তান বাহিরের কোন কার্য্য করিবে না এবং বিষয়ান্তরে মন দিবে না। এই প্রথা চীন-বাসীরা বিশেষ ভাবে মানিয়া থাকে এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত সংস্কার না মানিলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তি-বিধান তো হইবেই না, উপরন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততিও যথেষ্ট কষ্ট পাইবে।

অল্পবয়সে বিধবা হইলে চীনামহিলাদের বিবাহ হইয়া থাকে এবং তাহা সমাজের অননুমোদিত নহে। বিধবারা পাছে মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে সেইজন্য তাহাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়ার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠে—অবশ্য বিবাহ না করিতে ইচ্ছুক হইলে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার রীতি নাই।

সম্ভ্রান্ত চীনা মহিলার চরণ-কমল।

এইভাবে মেয়েদের সুখ-সুবিধার প্রতি চীনাদের নজর রাখাও দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য মহিলারা হয়তো চীনা মহিলাদের জীবনকে করুণার চক্ষে দেখিবেন, কিন্তু একথা বোধ হয় তাঁহারা ভুলিবেন না যে রূপ-যৌবনের অভাব হইলে তাঁহাদের মূল্য যেমন অনেক সময় হ্রাস পায়, চীনা মহিলাদের পক্ষে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। যৌবনকে সংযত করিয়া বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্যকে সম্মানিত করিবার জন্য চীনসমাজে যে প্রথা আছে তাহা এক হিসাবে ভালই মনে হয়। নারীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাহারা যথেষ্ট দিয়া থাকে, কিন্তু এখনও সকল বিষয়ে তাহাদের পুরুষের সমকক্ষ করিয়া তুলে নাই বলিয়া এই বিরাট প্রাচীন জাতিকে অবজ্ঞা করা চলে না।

ফুচাও মহিলার খোপা।

বিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের হাওয়া অবশ্য সেখানেও গিয়া পৌঁছাইয়াছে। মেয়েদের জন্য নিত্য নূতন স্কুল, কলেজ গড়িয়া উঠিতেছে এবং শিক্ষার এই প্রগতির বিরুদ্ধে চীন সমাজের যে কোন আপত্তি আছে সেরূপ কোন লক্ষণও দেখা যায় না।

দেশ-বিদেশের জ্ঞানের বাণী আজ সেখানে ধ্বনিত হইতেছে, সকল কিছু জানিবার আগ্রহে তাহারা শিক্ষা-নিকেতনের প্রাঙ্গণে সমাগত, কিন্তু নারীত্বকে বর্জ্জন করিয়া পৌরুষের দীক্ষাগ্রহণে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, অন্তঃপুরকে বর্জ্জন করিয়া পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিতে তাহারা সম্মিলিত হয় নাই—নারীর শ্রীকে অক্ষুণ্ণ রখিয়া তাহারা জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে মহিমময়ী হইয়া উঠিতে চাহে।

সন্ধ্যায়

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সোনার দিগন্তে, সখা, একখানি পাল—
একখানি শশিকলা সন্ধ্যাতারা সাথে,
আর বন্ধু তুমি!
কপোত-পাণ্ডুর ছায়া নামিছে পশ্চাতে,
থামিছে স্রোতের ধ্বনি—ঢাকিছে বিশাল
গাঢ় মর্ত্ত্যভূমি।
আর বন্ধু তুমি!

আকাশে হাঁসের দল—দীর্ঘ গ্রীবা ভরে—
দীর্ঘতর ছায়া হানে দ্বিতীয়ার চাঁদ—
তুমি বন্ধু কোথা!
দুইটি বুকের মাঝে শূন্যতা অগাধ
অনন্ত ধ্যানের মত দুইটি অন্তরে
ব্যগ্র ব্যাকুলতা।
তুমি বন্ধু কোথা!

আভাসে উজ্জ্বল হ'ল চাঁদের গোলক,
মুমূর্ষু আলোর প্রান্তে রহিয়া রহিয়া
সন্ধ্যাতারা কাঁপে,
তোমার পরশ বন্ধু, অম্বর ব্যাপিয়া—
বিরহী ভুবন রচে বেদনার শ্লোক
বিচ্ছেদের তাপে।
সন্ধ্যাতারা কাঁপে!

অভিশাপ

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চপলা-ঠাক্‌রুণ বলে, 'আমার বাড়ীতেই দু'বেলা খেয়ে আসবি শ্রীহর্ষ।'

এদিকে বৈকুণ্ঠ বলে, 'না না, তোমার বাড়ী ত' অনেক দূর, আর আমার বাড়ী এই পাশেই।'

শেষ পর্য্যন্ত ইহাই স্থির হইল, চপলা-ঠাক্‌রুণ বিধবা মেয়ে, রাত্রে সে নিজের জন্য রান্না করে না, সুতরাং শ্রীহর্ষ দিনের বেলা খাইবে চপলা-ঠাক্‌রুণের বাড়ী, আর রাত্রে খাইবে বৈকুণ্ঠের বাড়ী।

চপলা-ঠাক্‌রুণ তাহার এই বাড়ীর ইতিহাস এতদিন জানিত না, এতদিন পরে শুনিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'এত বড় বাড়ী পেয়েছিস, আনন্দ করবারই ত' কথা বাবা, কিন্তু আমার উমা শুধু কষ্ট করেই গেল, ভোগ করতে আর পেলে না।'

এই বলিয়া একটু খানি থামিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া সে আবার বলিল, 'কিন্তু বাবা, বাড়ীটা বড় অপয়া বাড়ী। ও-বাড়ী তুই বিক্রী করে অন্য বাড়ী কিনে ভাড়ায় বসিয়ে দে।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'তাই দেবো মাসি, খদ্দেরের চেষ্টা করছি।'

কিন্তু আসলে সে খরিদ্দারের চেষ্টা করে নাই। শ্রীহর্ষের ধারণা, যত দিন যাইবে এ বাড়ীর দাম ততই বেশী বাড়িবে।

সেই আশাতেই সে বসিয়া আছে। একবেলা চপলা-ঠাক্‌রুণের বাড়ী খাইয়া আসে, একবেলা খায় বৈকুণ্ঠের বাড়ী, মেয়েটার ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট নিজেকে পোহাইতে হয় না, টাকাকড়িগুলি এতদিন পরে ব্যাঙ্কে রাখিয়াছে, দিনের বেলাটা কোনরকমে এখানে-ওখানে গল্প করিয়া কাটায় আর রাত্রির বেলা অতবড় ওই বাড়ীটার নীচের তলার একটা ঘরের একপাশে প্রকাণ্ড একটা সোফার উপর শুইয়া থাকে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চোখে তাহার ঘুম আসে না। কত কথা যে ভাবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক-এক সময় তাহার মনে হয়—মরুক্ না স্ত্রী! কত লোকের স্ত্রী মরে, তাহারাও মরিয়াছে।—সান্ত্বনার জন্য একটা কন্যা রাখিয়া গেছে, তাহার নিজের এই এত বড় বাড়ী, এত টাকা,—অনর্থক ভাবিয়া ভাবিয়া মন খারাপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রীহর্ষকে ভাবিতে হয়। এত বড় এই কলিকাতা সহরে কত অসংখ্য বড় বড় বাড়ী রহিয়াছে, ভূমিকম্পে কোনটাই পড়িল না আর শুধু তাহারই এই বাড়ীখানা ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল; ওপরের ওই ঘরখানা—যে ঘরে শিবপদ বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী মরিয়াছিলেন, সে ঘরখানা যেমন ছিল ঠিক্ তেমনি রহিল। শ্রীহর্ষ ভাবিতে লাগিল—ইহার কারণ কি!......

শুনিয়াছে আত্মহত্যা করিয়া যাহারা মরে, তাহাদের আত্মা নাকি সহজে মুক্তি পায় না। তবে কি মৃত্যুর পর তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, হাতে টাকা থাকিতেও যে-লোকটা তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করে নাই, যে-লোকটা গরীব সাজিয়া তাহাদের প্রতারণা করিয়াছে সেই তাহাকেই এত বড় বাড়ীটা এমন করিয়া দান করিয়া যাওয়া তাহাদের উচিত হয় নাই; এবং সেই জন্যই কি বাড়ীটা তাহারা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল?...

চোখ বুজিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন ভাবিয়া ভাবিয়াও শ্রীহর্ষ কিছুই কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না। অথচ এই লইয়া কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার উপায় নাই। এক-এক সময় ভাবে, ইহা হয়ত সত্য নয়, ভূমিকম্পে বাড়ী পড়িয়া যাওয়া এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা নয় যাহার জন্য শিবপদ বাবুর মৃত আত্মাকে দায়ী করা যাইতে পারে। ভূমিকম্পে বাড়ীও এমন অনেকেরই পড়ে, তাহার মধ্যে একখানা ঘর হয়ত নাও পড়িতে পারে, এবং বাড়ী চাপা পড়িয়া মানুষের আকস্মিক মৃত্যুও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

উমার একটা কথা শ্রীহর্ষের বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। প্রায়ই সে বলিত, 'ওগো তুমি এমন কোরো না। এতে লোকে তোমায় অভিশাপ দেবে।' উমা বাঁচিয়া থাকিতে কথাটা সে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মৃত্যুর পরে এক-একদিন মনে হয়, হয় ত' বা সত্যই তাই। কাহারও তীব্র অভিশাপ এমনি করিয়াই হাতে-হাতে ফলিয়া গেল কিনা তাই-বা কে বলিতে পারে!

বৈকুণ্ঠের বাড়ী হইতে রাত্রে আহারাদি করিয়া শ্রীহর্ষ একাকী তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে ফিরিয়া আসিয়া বসে। রাত্রি বেশী না হইলে বৈকুণ্ঠও এক-একদিন তাহার সঙ্গে আসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করিয়া যায়। বলে, 'তোমার এই বাড়ীতে বসে গল্প করতে এখনও আমার ভরসা হয় না বাবাজি।'

ঈষৎ হাসিয়া শ্রীহর্ষ বলে, 'কেন?'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'বসে থাকতে থাকতে আচম্কা কোনও শব্দ শুনলেই মনে হয় বুঝি মাথার ওপরেই ছাদটা তোমার ঝুলে পড়ল।'

শ্রীহর্ষ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলে, 'না আর পড়বে না। যা পড়বার পড়ে গেছে।' আর পড়লেই বা কি করছি বলুন, চোখের ওপর তিন-তিনটে মৃত্যু দেখে মৃত্যুভয় আর আমার নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'মনে ওরকম হয় শ্রীহর্ষ, তুমি ত' মাত্র তিনটে মৃত্যু চোখের ওপর দেখেছ, আর আমি দেখেছি অসংখ্য, আত্মীয় বলতে ওই একটিমাত্র ভাইপো—তিনকড়ি, আর ভাইঝি—চাঁপা, ওই দুটি ভাই-বোন, বাস্। বাকি সব শেষ হয়ে গেছে। আমার নিজের মরবার দিনও ঘনিয়ে আসছে জানি, টাকাকড়িও এমন কিছু নেই যে তার মায়ায় মরতে কষ্ট হবে, তবু আমার মৃত্যুর নামে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে বাবাজি।'

শ্রীহর্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকাকড়ি বড় খারাপ জিনিস, না ঘোষাল-মশাই?'

বৈকুণ্ঠ বলিল, 'খারাপও বলতে পার, আবার ভালও বলতে পার। ভাল বলছি এই জন্যে যে, টাকা না হ'লে আমাদের একদণ্ড চলে না, টাকা থাকলে অনেক বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আর খারাপ বলছি এইজন্যে যে, ওর মত পাপ আর কিছু নেই, দুনিয়ায় যত কিছু অনর্থপাতের মূল ওই অর্থ, বাবাজি।'

শ্রীহর্ষ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইতেছে বলিয়া বৈকুণ্ঠ বিদায় লইল, রাস্তায় লোক-চলাচলও বন্ধ হইল, আশপাশের বাড়ী হইতে এতক্ষণ লোক-জনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল, এবার বোধ করি তাহারাও ঘুমাইয়াছে। রাত্রি যে কত কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। দেওয়ালের বড় ঘড়িগুলা শিবপদ বাবু বাঁচিয়া থাকিতেই সেই যে বন্ধ হইয়াছে, মেরামত অভাবে ধূলায় বালিতে বোঝাই হইয়া এখনও সেগুলা তেমনি টাঙানোই আছে। অন্য সময় হইলে শ্রীহর্ষর চোখ দুইটা এতক্ষণ ঘুমে বন্ধ হইয়া আসিত কিন্তু সেদিন সে তেমনি চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। অতবড় ওই নীরব নিস্তব্ধ ভাঙ্গা বাড়ীটার একটেরে নীচের তলার একটি ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া বসিয়া সে ইহাই ভাবিতে লাগিল যে, তাহার সর্ব্বনাশ যদি কেহ করিয়া থাকে ত' সে তাহার সঞ্চিত অর্থই করিয়াছে। এবং করিয়াছে সে নিজে। অর্থের প্রতি তাহার এই অস্বাভাবিক মমতা যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়ত' আজ সে এই বাড়ীখানি পাইত না এবং বাড়ী না পাইলে উমাও মরিত না। আজ তাহার নিজের বলিতে ছোট ওই মেয়েটি মাত্র সম্বল। তাও সে বাঁচিবে কি না তাই বা কে জানে। অথচ তাহার অর্থ সম্পত্তি রহিয়াছে প্রচুর। এত প্রচুর যে একটা মানুষের পক্ষে অতিরিক্ত বলিতে হইবে। মেয়েটি যদি আজ মারাই যায়, কাল সে এই এত টাকা লইয়া কি করিবে? নিজেও হয়ত সে তাহার নিজের সুখ সুবিধার জন্য খরচ করিতে পারিবে না, তাহার মৃত্যুর পর পাঁচ ভূতে হয়ত লুটিয়া খাইবে, অথচ যে বেচারীর মনে এত সাধ ছিল, একটি ঝি রাখিয়া দিয়াও যাহাকে সে একটি দিনের জন্যও সুখে রাখিতে পারে নাই, সেই উমা তাহার মনের সাধ মনে লইয়াই অকালে অকস্মাৎ অপমৃত্যুতে মরিয়া গেল। শ্রীহর্ষ সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—কাল হইতে সে আর এমন করিয়া বাস করিবে না, রীতিমত দাসদাসী রাখিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দেই জীবন কাটাইবে। গরীব দুঃখীকে দান করিবে, কাহারও সঙ্গে এই অর্থের ব্যাপারে অনর্থক অসৎ ব্যবহার করিবে না, আগেকার বাড়ীভাড়ার দরুণ চপলা-ঠাকরুণের যাহা কিছু প্রাপ্য সবই মিটাইয়া দিবে, আর এখন তাহাকে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা দিবে সেকথা ত' আগেই হইয়া গেছে। আর এই বুড়া বৈকুণ্ঠ? যে রকম উপকার সে তাহার করিয়াছে এমনটি কেহ কখনও করে না। সুতরাং যেমন করিয়াই হোক্ তাহার উপকার সে করিবেই।

এমনি সব নানা রকমের আজগুবি চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহর্ষ কখন যে সেই সোফার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। গভীর রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিল। সে এক ভারি মজার স্বপ্ন। দেখিল,—শিবপদ বাবু আর রাণী দু'জনেই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছেন, শ্রীহর্ষকে বাড়ীখানা দেওয়া তাঁহাদের অন্যায় হইয়াছে, বাড়ী তাঁহারা আবার কাড়িয়া লইবেন। এই বলিয়া শ্রীহর্ষকে তাঁহারা খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। শ্রীহর্ষ কিন্তু কেমন করিয়া না জানি সেকথা টের পাইয়াছে এবং টের পাইয়া অবধি লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। আজ এখানে কাল সেখানে—এমনি করিয়া লুকাইয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ একদিন একটা ঘরের মধ্যে উমার সঙ্গে দেখা! শ্রীহর্ষ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ?'

উমা বলিল, 'হ্যাঁ, আমি।'

'তুমি না বাড়ী চাপা পড়ে'—

কথাটি উমা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'হ্যাঁ মরেছিলাম, কিন্তু তোমায় ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে'। তাই এলাম।'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'ভালই হল'। বেঁচে থাকতে তোমায় ভারি কষ্ট দিয়াছি। এসো, এবার আমরা দু'জনে বেশ ভাল করে' থাকি।'

উমা হাসিয়া বলিল, 'তা তুমি থাকবে কি ?'

শ্রীহর্ষ বলিল, 'কেন থাকব না ? এই মাত্তর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে!'

এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে শিবপদবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে রাণী। শিবপদবাবুকে দেখিবামাত্র শ্রীহর্ষ পলায়ন করিতেছিল কিন্তু দরজার কাছ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই তাহাকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। সজোরে হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'তোকে আমি খুন করব শ্রীহর্ষ। তুই আমাকে ভারি ঠকিয়েছিস্।'

এই বলিয়া তিনি রাণীর দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই দেখা গেল, রাণীর হাতে শিবপদবাবুর সেই দু'নলা বন্দুকটা, যেটা দিয়া তিনি নিজেকে হত্যা করিয়াছিলেন।

বন্দুকটা রাণী তাঁহার হাতে আগাইয়া দিতেছিলেন, এমন সময় উমা আসিয়া তাঁহার সুমুখে দাঁড়াইল। বন্দুক সমেত রাণীর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এবারের মত ওকে তুমি ক্ষমা কর দিদি, এই সব বাড়ী ঘরদোর আর ত' তোমাদের কোনও কাজে আসবে না!'

শ্রীহর্ষর হাত দুইটি শিবপদবাবু ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'তুমি সতী সাধ্বী মেয়ে আমি জানি, তোমার কথা শুনে স্বামীকে তোমার এবারের মত ছেড়েই না হয় দিলাম, কিন্তু শোন শ্রীহর্ষ, ও-বাড়ী যে তুমি বিক্রী করে' টাকা জমিয়ে মরে যাবে আর সেই টাকা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে—তা যেন কারো না। যতদিন বেঁচে থাকবে এই বাড়ীতেই তুমি বাস কোরো, তারপর মরবার সময় 'শিবরাণী' নাম দিয়ে এই বাড়ীতে ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি অনাথ-আশ্রম যা হোক্ একটা কিছু করে' দিয়ো। আর তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে কাঠা দুই তিন জায়গা ওই থেকে দিয়ো—অনেকখানি জমি আছে, বুঝলে ?'

শ্রীহর্ষ তখন কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যে আজ্ঞে হুজুর।'

শিবপদবাবু ও রাণী চলিয়া গেলেন, শ্রীহর্ষ তাহার চোখ মুছিয়া উমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, দেখিল উমাও নাই। হঠাৎ কিসের যেন একটি শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখে, বুকের ভিতরটা তাহার তখনও কেমন যেন ধক্ ধক্ করিতেছে, ঘরের আলোটিও নিবানো হয় নাই। জানালার পথে কালো রঙের একটা বিড়াল ঘড়ে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে পিতলের একটি ফুলদানি মেঝের উপর উল্‌টাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারই শব্দে অকস্মাৎ তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেছে। সেখান হইতে পলায়ন করিবার জন্য ঝপ্ করিয়া লাফাইয়া বিড়ালটা জানালার উপর চড়িল। শ্রীহর্ষ আচম্‌কা একবার চমকিয়া উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। ভাবিল, আলোটা সে নিবাইবে কিনা, কিন্তু অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবার যদি সে অমনি স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে!......কাজেই আলোটা সে নিবাইতে গিয়াও নিবাইল না। সোফার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া আবার সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই ভয়াবহ স্বপ্নের কথাটা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল ঘুম যেন তাহার চোখ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বসন্তসেনা

—শ্রীসুশীলকুমার দে

নমিছে তোমারে বসন্তসেনা অশ্রুর নির্ঝরে,
হে চারুদত্ত, এ বিপদে আর কে তা'রে রক্ষা করে?
নিঃশ্বাস রোধে কণ্ঠ তাহার,
চক্ষে ঘনায় মৃত্যু-আঁধার,
বেদনা-পাণ্ডু অধরে তবু সে তোমার নামটি ধরে,
তোমার প্রেমের আরতি-আলোক জেগে আছে অন্তরে।

এসেছিল প্রাতে রাজ-উদ্যানে একা তব অভিসারে,
নিভিল কখন রূপের শিখাটি মরণের আঁধিয়ারে;
গত রজনীর সোহাগ-আবেশ
তখনো হয়নি বুঝি সব শেষ,
প্রথম সে তা'র বাসর-শয়ন নব-জীবনের পারে
তেয়াগি' কখন প্রভাতে পশিল মরণ-শয়নাগারে।

সুখ-রজনীর রজনী-গন্ধা প্রভাতে পড়িল ঝরি'—
জীবনের পথে তোমারো যাত্রা গেছে বুঝি শেষ করি'।
একটি রজনী লাগি' সৌরভ
বিলসিল সেই রূপ-গৌরব;
আঁধারের সাথী, প্রাণের নিশীথে তৃষিতের সহচরী,—
সে-আঁধার বাহি' সুদূর গন্ধ আজো আছে নির্ঝরি'।

দু'টি দিন শুধু হ'ল দেখা-শুনা,—এল আর গেল চলি',
রেখে গেল শুধু একটি নিশির শিশিরের অঞ্জলি;
আলোর আড়ালে হ'য়ে গেল লীন—
আঁধারের যত ভাষা সীমাহীন
শুধু বক্ষের অজানা-কক্ষে রেখে গেল কত ছলি';
শুধু সে মুদিত-মুকুল-মহিমা আছে আজো উজ্জ্বলি'।

নামটি তোমার শুনেছিল শুধু, সখীগণ সাথে যবে
বসন্তসেনা হেরিল তোমারে বসন্ত-উৎসবে;
কাম-আয়তনে অভিনব কাম,
স্নিগ্ধ-মধুর মূরতি সুঠাম,—
উজ্জয়িনীর সীমন্তিনীরা কানাকানি করে সবে;
তুমি দেখ নাই,—একধারে শুধু আসিয়া দাঁড়াল কবে।

তুমি এলে তা'র উদয়-অচলে আশার সরণি বাহি',—
তামসী নিশার গ্রহ-তারা-হীন যবনিকা আর নাহি!
তীক্ষ্ণ দীপ্ত কান্তি অমল,
নিরঞ্জনার অভিষেক-জল,—
রজনীর ফুল রহিল নীরবে বিস্মিত চোখে চাহি';
বুকে তা'র জাগে নূতন সুবাস সে-কিরণে অবগাহি'।

বহু দিবসের জমাট অশ্রু গেল সে-নিমেষে টুটি';
বহু নিশীথের স্বপ্নের ত্রাস সেই প্রাতে গেল ছুটি';
অঙ্গার যত বুকের ভিতর
হয়ে গেল যেন হীরা ভাস্বর;
সারা-জীবনের নীলিম লজ্জা লাল হ'য়ে যেন ফুটি'
নব-বাসরের চেলীর বসনে অঙ্গে পড়িল লুটি'।

তবু সে বহু-কলুষ জীবন-সরসীর দর্পণে
কেমনে ধরিবে সোনার ছায়াটি অনুরাগ-অঙ্কনে?
হায় সুদূরের স্বপ্ন অলীক,
চিরদিন তুমি আশার অধিক;
উচ্চে আকাশ, ধূলায় ধরণী,—তড়িতের শিহরণে
ধরণী বিদরে, দাগ নাহি পড়ে আকাশের প্রাঙ্গণে।

বসন্তসেনা কে না জানে তা'রে? অনিন্দ্য-সুন্দরী,
উজ্জয়িনীর বিভূষণ সে যে, আনন্দ-মঞ্জরী;
বিদুষী, রসিকা কাব্যে কলায়,
চির-বিজয়িনী বিলাস-ছলায়,
কত বিদগ্ধ রসিক গুণীরে সুধা-বিষে জর্জ্জরি'
মদিরাক্ষীর লোল কটাক্ষ দিয়েছে ধন্য করি'।

কত অধন্য তবু সে জীবন,—আজ তাই প্রাণ দহে;
সকলের সে যে প্রিয়া, বুঝি তাই কাহারো সে প্রিয়া নহে
তুমি হ'লে তা'র প্রাণ-বল্লভ,
তাই আজ তুমি চির-দুর্লভ;
কণ্টক-বনে বৃন্ত যাহার আজন্ম বাঁধা রহে,
অনর্ঘ তোমা' কেমনে সেথায় বরিবে সে আগ্রহে?

তবু নিশীথের কাঁটার কুসুম হ'ল যেন প্রাতে জাগি'
উর্দ্ধমুখী সে সূর্য্যমুখীটি তপনের দাহ মাগি';
দূর হ'তে শুধু কান্তি-কিরণ,
জীবনের পথে ছড়াল হিরণ,
শুধু দূর হ'তে বেদনা-অর্ঘ্য ধরিল সে তোমা' লাগি';
তুমি যে মহান্, কেমনে সে হবে তব অনুরাগ-ভাগী?

উজ্জয়িনীর উজ্জ্বল মণি, শ্রেষ্ঠীর চত্বরে
কে না জানে তব বিপুল বিভব বিলালে যা' অকাতরে?
অভিজাত কুলে জন্ম তোমার,
কে না জানে তব মহিমা উদার?
সারাটি নগরী তোমার কীর্ত্তি -অবিনাশ-অক্ষরে
ধ'রে আছে বুকে বিহারে, আরামে, মন্দিরে, সরোবরে।

নিঃশেষ আজ রম্য তড়াগ—তাই সে বর্জ্জনীয়;
যে ছিল সবার পরমাত্মীয়, নাই তা'রি আত্মীয়;
বনস্পতিটি পর্ণ-বিহীন,
সুখের বিহগ হয় না ত লীন;
তবু প্রাণ তব চির-ক্ষমাশীল, প্রসন্ন, কমনীয়,
স্নেহ-রসে সব শোধন করেছে তিক্ত যা' অপ্রিয়।

হায় মানবের ভাগ্য-বিধাতা, তব উদাসীন করে
কূপ-যন্ত্রের ঘটিকার মত কেহ ওঠে, কেহ পড়ে।
জল-বিন্দুটি কত উজ্জ্বল
অরবিন্দের দলে টলমল্;
মিথ্যার মায়া নাহি আর রহে প্রবুদ্ধ অন্তরে;
অপ্রমত্ত চিত্ত দীপের নিবাত-কান্তি ধরে।

হে কলা-কোবিদ, কলা-লক্ষ্মীর সুশীতল হেম-ঝারি
ধুয়ে মুছে দিল জীবন তোমার, সব ব্যথা উৎসারি'।
নিস্পৃহ তুমি নহ কোনো দিন,
যৌবন তব নহে উদাসীন,
রসিক-শেখর নাগরিক তুমি, গুণীজন-মনোহারী,
বিদগ্ধজন-ধ্রুব-আদর্শ, কাব্য-কানন-চারী।

সে-দিন যখন সন্ধ্যা-তিমির আকাশে ঘনায়ে আসে,
রাজপথ ভরে বিট-কামুকের মত্ত কলোচ্ছ্বাসে,
সহসা কাহার অঞ্চল-বায়—
মৈত্রেয়-করে দীপ নিভে যায়,
ভয়বিক্লবা হরিণীর মত চকিতা ব্যাধের ত্রাসে
বসন্তসেনা দাঁড়াল একাকী তোমার দুয়ার-পাশে।

নৃত্যকলায় চতুর চরণ বিভ্রমে বিন্যাসি'
শঙ্কা-হরণ তোমার দুয়ারে শরণ মাগিল আসি';
অপটু জনের স্পর্শে কাতর
বীণা-তার যেন কাঁপে থরথর,—
পড়ে খসি' খসি' স্বর্ণ-মেখলা, অলকের ফুলরাশি;
নয়নের নীলে, অধরের কূলে মিলাইয়া যায় হাসি।

দাসী ভাবি' যবে প্রাবারক তব দিলে আসি' তা'র করে,
গুণ-নির্জ্জিতা দাসী সে তোমার হ'ল চিরদিন তরে;
জাতী-কুসুমের স্নিগ্ধ সুবাস
ভ'রে ছিল সেই অঙ্গের বাস,
কি-যেন-কিসের নেশায় তাহার হৃদয় আকুল করে,—
দুরাশা-ভয়ের দিগ্‌বলয়ের শিরে কি জ্যোৎস্না ঝরে!

সে-দিন স্তিমিত প্রদীপের তলে হেরিলে সে-মুখখানি;
দোঁহে ছাড়া আর কেহ নাহি জানে কি যে হ'ল জানাজানি
অলক্ষ্যে কোন্ সুর-মূর্চ্ছনা
জাগাল কি নব মর্ম্ম-বেদনা;
সকলের সাথে একেলা-যাওয়ার পথে, কে করুণা মানি'
আঁধারের কূলে বাঞ্ছিত যাহা এতদিনে দিল আনি'।

বসন্তসেনা এই সেই?—যা'রে সকল রসিকজনা
তপাসি' তপাসি' হয়েছে অধীর-দুরাশায় দুর্ম্মনা;
হৃদয়ের যত বাসনা নূতন
মিলায় ভীরুর ক্রোধের মতন,—
দরিদ্র প্রেম কি দিয়ে তাহার রচিবে পূজার্চ্চনা?
নহে নির্ভয় বিজয়, হায় রে প্রেমের প্রবঞ্চনা!

বহু-প্রকোষ্ঠ হর্ম্ম্য তাহার রাজার পুরীর মত,
বিত্তব-বিহীন বাসনা যেখানে চিরদিন প্রতিহত ;
জান না কি তবু—আলানে দ্বিরদ,
বল্‌গায় ধরে বাজি দুর্ম্মদ ?
নারী ধরা পড়ে হৃদয়ের জালে,—বৃথা নিঃশ্বাস যত ;
সমৃদ্ধি আজ দরিদ্র গৃহে হয়েছে শরণাগত।

সহসা সে-দিন দূর হ'তে যেন সেই নিঃশ্বাস-ভরে
প্রাসাদে তাহার রূঢ় দীপমালা নিভে গেল চিরতরে ;
থামিল নূপুর প্রমোদ-নিশির,
মুরজের রব স্নিগ্ধ নিবিড় ;
দ্বিরদ-দন্তে অবলম্বিত বীণা নাহি গুঞ্জরে ;
মুক্তার হার দুলিল না আর সে পূর্ণ-পয়োধরে।

নন্দনবন-সম তা'র সেই আনন্দ-উপবনে
গৃহ-শিখী আর নাচিল না তা'র বলয়ের নিক্কণে ;
পিঞ্জর-শুক কাঁদে চারিভিতে ;
কপোত সুপ্ত গৃহ-বলভীতে :
শুধু সে তোমার ক্ষণ-পরিচিত বপ্নে'র বাতায়নে
কজ্জলহীন-উজ্জ্বল-আঁখি ব'সে আছে আনমনে।

রুদ্ধ হয়েছে কনক-কপাট গজ-দন্তের দ্বারে ;
শূন্য আসন, সুরভি আসব নাহি ত কনকাধারে ;
নাহি বর্ণিকা, সিক্‌থ-ফলক,
দেহে নাহি আর হীরার ঝলক ;
দুষ্ট মেখলা নাচিল না আর,—শৃঙ্গার-ভৃঙ্গারে
হরষ-বিষের কলঙ্ক-রস জাগাল না আর তা'রে।

তুমি ত এলে না, তাই সে একেলা তব অভিসারে চলে,
সে-দিন নিবিড় বরষা নেমেছে তিমির-গগন-তলে ;
হৃদয়ের মত যেন সে-আকাশ,
পড়ে জলধারা, বহে নিঃশ্বাস ;
চপলার মত চপল দুরাশা ক্ষণে ক্ষণে যেন জ্বলে ;
নীপ হয় যেন পথের প্রদীপ ঈষৎ-স্ফুরণ-ছলে।

পণ্য-রমণী পথের লতা সে, বুকে তা'রে তুলে নিলে,
কত সুনিবিড় সোহাগের রসে সযতনে জিয়াইলে।
সন্ধ্যা-মেঘের মত ক্ষণ-রাগ
বারবধূ সে ত,—আঁধারের দাগ
কত ঘন হ'য়ে বুকের ভিতর জমেছিল তিলে তিলে ;
সেথা স্বাক্ষর অনলাক্ষরে অঙ্কিত ক'রে দিলে।

শ্মশান-বীথির রক্ত-কুসুম, রৌদ্র-দহনে জাগি'
ছিল সারাদিন একটু শীতল শিশিরের কণা মাগি' ;
যে-প্রেম করেছে মৃত্যুরে জয়
শ্মশানের ফুল সেই বুকে লয়,
ভস্মের টীকা দীপ্ত ললাটে ধরেছে যে সব ত্যাগি'
তাহারি কণ্ঠে উজলে গরল,—সুধা নহে তা'র লাগি'।

চিরদিন কত অনাথ বাসনা বুকে গুমরিয়া মরে,
একটু সহজ স্নেহের লাগিয়া প্রাণ আছাড়িয়া পড়ে ;
বাড়ে তৃষ্ণা, কোথা পিপাসার জল,
লবণের নীর ঘিরেছে অতল,—
অমৃত-ভাণ্ড ল'য়ে করে তুমি বুঝি মন্বন্তরে
ধন্বন্তরি, উদিলে তাহার দুঃখ-সাগর 'পরে।

গলদশ্রুর জলে সে বিরলে পূত অভিষেক করি'
নব স্নেহে ভরি' প্রাণের প্রদীপ প্রাণনাথে নিল বরি',
মলয়জ-রস স্পর্শে তাহার,
বাহু দু'টি যেন কুসুমের হার,
কত গৌরবে প্রেম-সৌরভে বুকে আকুলিয়া ঝরি',
অধরে নিঙাড়ি' মর্ম্ম-মদিরা ধরিল ওষ্ঠ 'পরি।

অনেকে এসেছে, অনেকে গিয়েছে, আজ বুঝি তাই একা
ক্ষুরধার-সম দুর্গম পথে তোমা' সনে হ'ল দেখা।
প্রাণের অর্ঘ্য কেহ ত আনেনি ;
কি ছিল তাহার কেহ ত জানেনি ;
মধুমাসে তা'রা মধু-লম্পট শোনে শুধু কুহু-কেকা,
তুমি পেলে তাই শ্রাবণ-ধারায় সঞ্চিত মধু-লেখা।

মত্ত মেঘের নিবিড় আসার ঘিরে আসে চারিধারে,
বৃহৎ ভুবন ক্ষুদ্র হয়েছে সঘন অন্ধকারে ;
উতরোল আজ আর্দ্র পবন,
দীপ নিভে যায়, রুদ্ধ ভবন ;
শুধু দু'টি প্রাণে জেগেছে বেদন,—আঁধারের পারাবারে
দেহের সীমায় এ-উহারে ধরে সুখ-দুখ-একাকারে।

যৌবন-ভরা বাহুপাশে তা'রে নিবিড়-রভসে ধরি'
অধরে, উরসে, পদ-পঙ্কজে চুম্বনে দিলে ভরি' ;
নব-লাজ-সম হাসির মুকুল
হ'ল নিরুপম প্রাণের দুকূল ;
অবগুণ্ঠন-হীন সে-জীবন যৌবনে সম্বরি',
নব-রাগ আজ মর্ম্মের জয়া হ'য়ে নিল সঞ্চরি'

দুঃখ পুড়িল সুখ-নিঃশ্বাসে, কদম্ব-শিহরণে
ভরিল অঙ্গ, মুরছিল সুখ দুঃখের স্পন্দনে ;
হ'য়ে দিশাহারা জাগে বিস্ময়—
স্বপ্ন এ কি বা মোহ মায়াময় !
মাধুরী-মদিরা করে মাতোয়ারা গৌরব-উপায়নে,
আঁধার-শ্রাবণে দু'টি দেহ-তটে প্রাণের বিপ্লাবনে।

আজি প্রতিষ্ঠা লভিয়া আর্য্য চারুদত্তের ঘরে
বঞ্চিতা নারী নারী হ'য়ে জাগে বুঝি এতদিন পরে ;
পরশের রসে প্রাণের আরাম—
বার-বার তোমা' করে সে প্রণাম ;
প্রভাতে দেখিল নব বিস্ময়ে—আলোকের নির্ঝরে
পদতলে আছে পৃথ্বী, আকাশ আশ্লেষে তা'রে ধরে।

আসার-ধৌত রজনী গিয়েছে,—আলোক-সিনান করি'
ফুটিল প্রভাত, সাথে সাথে তা'র এ কি আজ মরি, মরি,—
কা'র কচি মুখ বাপের মতন,
স্নেহ-সাগরের মন্থন-ধন,
অন্তরে আসি' জাগায় বেদন,—সারা প্রাণ হাহা করি'
একবার তা'রে বুকে জড়াইতে চাহে সারা বুক ভরি'।

সিক্ত-পদ্ম চক্ষু ঢেকেছে কজ্জল-কালো কেশে,
লীলায়িত করি' বাহু দাঁড়াইল বসন্তসেনা হেসে' ;
একবার ওরে আয়, বুকে আয়,—
তবু সে এলো না, ফিরিয়া দাঁড়ায়,—
জননী তাহার পরে না সোনার কঙ্কণ বাহু-দেশে।
নিমেষে নমিত হ'ল বাহু দু'টি, চোখ গেল জলে ভেসে।

কেমনে সে হ'বে জননী তাহার হিরণ্য-গর্ব্বিণী ?
খ'সে প'ড়ে গেল একে একে সব কঙ্কণ কিঙ্কিণী ;
মুগ্ধ-মুখের কথা সে মধুর
বুকে আসি' বাজে কত নিষ্ঠুর—
নিজ আভরণে মৃৎশকটিকা ভরি' তা'র, তেয়াগিনী
হ'ল ভিখারীর দয়িতা সে-দিন স্বেচ্ছায় ভিখারিণী।

সেই আভরণ-হরণ লাগিয়া তুমি আজ অপরাধী,
এ কি পরিহাস, রাজার দুয়ারে তোমারে এনেছে বাঁধি'।
চপলা সে ক্ষণ-কান্তি বিলায়,
চমকি' সহসা মরণে মিলায়,
পিছনে তাহার কান্ত জলদ ঝরে বুঝি কাঁদি' কাঁদি',—
তা'রি বিলয়ের ক্রূর অপবাদ আসে শুধু আচ্ছাদি'।

একটি রজনী শ্রবণ-যূথিকা দুলিল তোমার গলে,
আনিল সুরভি সুরার মতন চেতনা হৃদয়তলে ;
নব-বিকশিত পরিমল যা'র
ধন্য করিল জীবন তোমার,
তুমিই তাহারে দলেছ চরণে—একি আজ এরা বলে ?
যে-কুসুম রহে বুকের উপর, কে তা'রে চরণে দলে ?

সে-রজনী বুঝি নিমেষের মত কেটেছিল অজ্ঞাতে,
কত কথা ছিল বাকী, তাই তা'রে আসিতে বলিলে প্রাতে ;
অদৃষ্ট আসি' ঘটাল প্রমাদ,
ঘুচে গেল নব-জীবনের সাধ,—
সোহাগের পাখী একেলা কখন লুটাল সে নিরালাতে,
কেন ব্যাধ-শর ক্রৌঞ্চ-মিথুনে বিঁধিল না এক সাথে ?

ছিল তা'র এই অপরাধ শুধু—তোমারে সে ভালবাসে ;
কুলনারী-সম স্পর্দ্ধা তাহার—পণ্যরমণী না সে ?
ভিখারীর লাগি' এত বহুমান ?
রাজ-শ্যালকের করে অপমান ;
ভিখারীর নাম আজো লয় মুখে বেদনার উচ্ছ্বাসে
আশ্বাসহীন মৃত্যুর তটে অমৃতের আশ্বাদে।

কানে বাজে কত ক্রূর বিদ্রূপ, হাসিমুখে তবু কহে—
চারুদত্তের প্রণয়িনী, এ তো নিন্দার কথা নহে।
এ যে গুণ-গান, গর্ব্ব তাহার—
জুড়াল জীবন শুনি' বার বার ;
প্রেম বুকে তা'র প্রদীপ্ত মণি সব অভিমান দহে ;
তোমারি লাগিয়া মৃত্যুর ক্লেশ সুখের মতন সহে।

দোষী নহে, শুধু প্রেমে দোষী হ'য়ে, নিঠুর প্রেমানলে
অনর্ঘ যেন বেদনা-সমিধ্ উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ;
মধুজিহ্ব সে পূত হুতাশন
পবিত্র করে করিয়া দহন ;
সেই দহনের জয়-অঙ্কনে মরণের পরিমলে
স্মৃতি-ধূমধূপে কুণ্ঠাবিহীন প্রাণ-হবি উচ্ছলে !

মৃত্যু আসিয়া কণ্ঠ রোধিল, তবু কাকুতির স্বরে
কাঁদে না ফুকারি'—আপন জীবন ভিক্ষা সে নাহি করে ;
মনে জাগে তব মুখ-শতদল,
নয়নে অশ্রু ঝরে অবিরল,
শুধু সে তোমারে, হে চারুদত্ত, নমিয়া নমিয়া স্মরে,
তব নাম জপি' বসন্তসেনা মৃত্যুরে নাহি ডরে।

মরণের মহালগ্নে জেগেছে মরণ-বিহীন প্রেমে
দেবতার মুখ ভরি' সারা বুক,—ধুক্ ধুক্ গেছে থেমে ;
তুমি দেখায়েছ অমৃতের পথ,
প্রতিহত আর নহে মনোরথ !
জীবনে তাহার জাগর-স্বপ্নে একদিন এলে নেমে,
দাঁড়ায়েছ আজ সুপ্তির পথে সেই অনাবিল ক্ষেমে।

কে জানে কখন মুদি' আঁখিপাতা লুটায় সে ধরাতলে,
কখন পবন আসিয়া অশ্রু মুছায় স্নেহের ছলে ;
কে জানে কখন একরাশি ফুল
মাথার উপর ছড়ায় বকুল,
একখানি ছায়া বিছাইয়া দেয় ঘন-পল্লব-দলে ;
প্রভাত-কিরণ সিঁদূরের মত স্বচ্ছ ললাটে জ্বলে।

আলোচনা

সাহিত্যে অশ্লীলতা

'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধের লেখক (শ্রীসত্যসুন্দর দাস) মহাশয় আমার লিখিত আলোচনাটি (বঙ্গশ্রী, পৃঃ ৬০৩-৬০৪) পড়িয়া যে বিশেষ প্রীত হন নাই তাহা জানিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। সত্যনির্ণয়ে একটু সুবিধা হইতে পারে, এই কথা মনে ভাবিয়া আমি কিছু লিখিয়াছিলাম, প্রবন্ধ-লেখকের বক্তব্য কোন বিষয়ের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে নহে। আমার লেখা যে কোন কোন অংশে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পোষকতা করিয়াছে তাহা তিনিও তাহার উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন (তদেব, পৃঃ ৬০৫) আর লেখকেরও প্রবন্ধরচনায় এক মুখ্য উদ্দেশ্য যে সত্যনির্ণয় তাহা আমি সহজেই ধরিয়া লইতে পারি। এমত অবস্থায় আমি যে কেন তাহার বিরাগ-ভাজন হইয়াছি তাহা বুঝিলাম না। এই বিরাগের হেতু আমার কথার উত্তর-দান প্রসঙ্গে তিনি একটু ধৈর্য্যের অভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কেন এরূপ মনে হইল নিম্নে তাহা বলিতেছি।

(১) সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রবন্ধের গত চৈত্র মাসে প্রকাশিত অংশে লেখক সংস্কৃত সাহিত্যের অশ্লীলতা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন :—

(ক) "—এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এ দেশীয় রসিক জনের কোনও অভিযোগ ছিল না,—" (২৫৩ পৃঃ)

(খ) "—এ সম্বন্ধে (অশ্লীলতা সম্বন্ধে) হিন্দু মনের কোনও সজ্ঞানতাই ছিল না—" ('তদেব')

(গ) "—আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রেও অশ্লীলতা দোষের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা আধুনিক অর্থে নহে ; ইংরেজীতে যাহাকে obscene বলে

মা

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

তেমন কোন অর্থে ইহার প্রয়োগ নাই, তেমন কোন অর্থবাচক অপর কোন শব্দও নাই।" (২৫৯ পৃঃ)

(খ) "কিন্তু এ অশ্লীলতাকে আমাদের দেশের প্রাচীনেরা ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন—" (২৬০ পৃঃ)

(ঙ) "মনে হয় এ দেশের আলঙ্কারিকেরা, 'অশ্লীল' অর্থে এই দোষটি ধরিয়াছিলেন—" (তদেব)

(চ) "সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে অশ্লীলতা ইহার অধিক কিছু নয়।" (২৬১ পৃঃ)

(ছ) "কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকের একটি মত আজিও সত্য—" (২৬২ পৃঃ)

গত জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গশ্রীতে আমি (গ) উক্তিটির অন্তর্গত ভ্রম প্রদর্শন করিতে গিয়া 'অশ্লীলতা' সম্বন্ধে সাহিত্য-দর্পণকারের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে অশ্লীল শব্দের অর্থ কখনো কখনো obsceneও হইতে পারে। তাহার জবাবে প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন—"আমাদের তুলনায় বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রাচীন যুগের লোক হইলেও আমি যে প্রাচীনতার আলোচনা করিয়াছি তাহার তুলনায় তিনি অর্বাচীন যুগের মানুষ" ইত্যাদি (বঙ্গশ্রী, ৬০৫ পৃঃ)। প্রবন্ধকার যে বিশ্বনাথ কবিরাজ অপেক্ষা প্রাচীনতর আলঙ্কারিকদের মত আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা হইতে বোঝা অসম্ভব (উপরে উদ্ধৃত ক—ছ উক্তিগুলি সযত্নে দ্রষ্টব্য)। সে যাহাই হোক, লেখকের পরবর্তী উক্তি মানিয়া লইয়াও যদি আমরা অলঙ্কার শাস্ত্রের পাতা উল্‌টাই তবে কি দেখিতে পাই? ভামহ নিশ্চয়ই একজন খুব প্রাচীন আলঙ্কারিক। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে তিনি খুব সম্ভব ৭ম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের লোক (Sanskrit Poetics Vol I. পৃঃ ৪৯)। এই ভামহ 'শ্রুতিদুষ্টতা' ও 'অর্থদুষ্টতা' নামক দুই প্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্তাদি আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত দে মহাশয় তাহাদিগকে যথাক্রমে expressly indecent ও implicitly indecent বলিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন (তদেব, পৃঃ ১৩)। Indecent মানে যে obscene তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবেই দেখা যায় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতেও obscene জিনিষের অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতনতা ছিল। এতদ্‌ব্যতীত দর্পণকারের উপর অভারতীয় কাল্‌চারের প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যতদূর জানি ইতঃপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কোন গবেষণা করেন নাই অথবা ঐ রূপ গবেষণার সম্ভাব্যতার কোন আভাসও দেন নাই। এই গবেষণার অঙ্কুরটি কোন্ উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছে প্রবন্ধ-লেখক আমাদিগকে তাহার সন্ধান দিলে ভাল করিতেন। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত ধৈর্য্যহীন না হইলে এ জাতীয় অদ্ভুত মতকে তিনি উপেক্ষাই করিতেন।

(২) মেঘদূতের 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ' এই শ্লোকাংশের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অনুযোগ করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধ লেখকের মত নিপুণ সমালোচকের কাছে আশা করি নাই। তিনি ভাবিয়াছেন যেহেতু আমি সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় রাখি, অতএব আমি প্রাচীন রুচির একজন গোঁড়া সমর্থক (দ্রঃ, বঙ্গশ্রী ৬০৫ পৃঃ)। এ বিষয়ে আমার মতামত প্রবন্ধান্তরে ব্যক্ত করিব। তবে এখানে মোটামুটি বলিতে পারি যে হিন্দু কাল্‌চারের বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক প্রণালীতে আলোচিত না হইলে তাহার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা দেখাইয়া বিশেষ কোন ফল নাই। সেই আলোচনা সম্প্রতি সুরু হইয়াছে, তাহার ধারাটির সহিত পরিচয় না রাখিয়া হিন্দু কাল্‌চারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে গেলে পদে পদে অজ্ঞানতার প্রশ্রয় ঘটিতে পারে।

মেঘদূতের উদ্ধৃত শ্লোকাংশের উপর অশ্লীলত্বের আরোপ যে লেখক আধুনিক রুচিবাগীশদের জবানীতে করিয়াছেন তাহা তাঁহার লেখার ভাষা হইতে বুঝিতে পারা দুষ্কর। তিনি যে স্তনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন "—নারীর এমন একটি অঙ্গের বর্ণনা ইহাতে আছে যাহা সুরুচির বিঘ্নকারক :" (বঙ্গশ্রী পৃঃ ২৬৩) লেখকের এই উক্তিকে যদি তাঁহার নিজের উক্তি বলিয়া ধরিতে না হয় তবে ভাল; নচেৎ বলিব যে গুপ্তযুগের বিবৃতস্তনী রাণীর প্রতিমূর্ত্তি-যুক্ত মুদ্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন (বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন সংখ্যা)। এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে কালিদাস গুপ্ত যুগের মানুষ এবং স্তনের কুরুচিকরত্ব সেকালে অন্তত ছিল না।

ধরিত্রীর স্তন সম্পর্কে লেখক যে আদিরস কল্পনা করিয়াছেন সে বিষয়ে মল্লিনাথ তাঁহার সহায়; কাজেই আমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা তিনি নাও গ্রহণ করিতে পারেন। তবে নানা দিক বিবেচনায় মনে হয় এস্থানে টীকাকার মহাশয় কালিদাসের কাব্য হইতে দুর্ব্যাখ্যা-বিষ ঝাড়িতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাক্, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত স্থল গুলি ছাড়াও প্রবন্ধকার সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে এমন কয়েকটি উক্তি করিয়াছেন যাহা আমাদিকে ভাবাইয়া তোলে। যথা,

(ক) "আলঙ্কারিকের অর্থে অশ্লীলতার যত প্রকার-ভেদ হইতে পারে তাহার প্রায় সবই ইহাতে অছে, তাহার কারণ লেখকের শব্দার্থ-রীতি-বোধ নাই (বঙ্গশ্রী, ২৬০ পৃঃ)।

(খ) "শেষ চারিটি বাক্যরীতিঘটিত অশ্লীলতার নিদর্শন।" ('তদেব')।

(গ) "—এস্থলে ভাববিরোধী শব্দার্থের associationএ অশ্লীলতা ঘটিয়াছে।" (তদেব)।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বাক্য-রীতিঘটিত এবং ভাববিরোধী শব্দার্থের অশ্লীলতা নামে পরিচিত কোন দোষের উল্লেখ আছে বলিয়া শুনি নাই। এ বিষয়ের সন্ধান লেখক কোন্ পুস্তক হইতে পাইলেন তাহা জানাইলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

এই আলোচনার উপসংহারে আবার লেখকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যাহা কিছু লিখিয়াছি সত্যের অনুরোধেই লিখিয়াছি; অকারণে কাহাকেও আঘাত করার জন্য কিছু লেখা আমরা সঙ্গত মনে করি না। যদি লেখক ইহাতে কিছু আঘাত অনুভব করিয়া থাকেন তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে তাঁহার ভাষার অপূর্ণতা বা অস্পষ্টতাই আমাদিগকে [illegible]

আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে। উপরে এবিষয়ে কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। তবে বিষয়টি নিঃসন্দেহ রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার হইতে কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে তাঁহার ভাষা তাঁহার অতুলনীয় ভাবসম্পদ প্রকাশের পক্ষে কত অনমুকূল।

লেখক বলেন, "সে সাধনায় মনোবুদ্ধি নয়—অন্তঃকরণ প্রবৃত্তির প্রকর্ষই প্রধান সম্পদ। এই অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি সাক্ষাৎ দেহচেতনা সম্পর্কিত। রস এই অন্তঃকরণ প্রবৃত্তিরই সাধন বস্তু।" (বঙ্গশ্রী, ৫২৯ পৃঃ)।

এই বাক্যটিতে আমাদের একটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এতদিন যাবৎ আমরা ত জানিতাম যে 'অন্তঃকরণ' এক মন-কেই বলা হয়; কিন্তু তাহা হইলে দাঁড়ায়—'সে সাধনায় মনোবুদ্ধি নয়, মনঃপ্রবৃত্তির প্রকর্ষই প্রধান সম্পদ। এই মনঃপ্রবৃত্তি সাক্ষাৎ দেহচেতনা সম্পর্কিত। রস এই মনঃপ্রবৃত্তিরই সাধন বস্তু।' অথচ পরক্ষণেই লেখক বলিতেছেন, "তাই কবিকল্পনা মনোধর্ম্ম নয়, রসও মনস্তত্ত্বের অধিকারভুক্ত নয়।" লেখক কি বলিতে চাহেন আমরা তাহার এক বিন্দুও বুঝিলাম না। আশা করি এজন্য তিনি আমাদের অপরাধ লইবেন না।

ভাষার অপূর্ণতা ও অস্পষ্টতার কথা ছাড়িয়া দিলেও এবং লেখকের শেষ কথা সম্বন্ধে অশেষ সমালোচনা চলিতে পারিলেও সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। যেহেতু ইহা আমাদের চিন্তাশক্তি ও চিন্তা-প্রবৃত্তিকে একটা নাড়া দেয়। এজন্যে লেখককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। —শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্রত্যুত্তর

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমাকে ছাড়িবেন না দেখিতেছি; এবারেও আমার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষার অপূর্ণতা এবং অজ্ঞানতার প্রমাণ অবলীলাক্রমে প্রদর্শন করিয়া মনোরম প্রতিবাদ রচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত মানুষদের প্রথাই এই; একবার যদি কোনও ছিদ্র আবিষ্কার করিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তবে সেই কল্পিত ছিদ্রপথে পাণ্ডিত্যের দিগ্‌গজ প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারিলে আর সোয়াস্তি নাই; বিচারের মূল বিষয়টি যেখানেই পড়িয়া থাক, পাণ্ডিত্যের শোভাযাত্রা ক্রোশের পর ক্রোশ চলিতে থাকিবেই। এইরূপ পাণ্ডিত্যের পাল্লা দিবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না, কারণ "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে"। আমার প্রয়োজন আসল বক্তব্যটা, পাণ্ডিত্যপ্রকাশের কিছুমাত্র অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু যখন নিজ কর্ম্মদোষে পণ্ডিত-সংসর্গে নিপতিত হইয়াছি, তখন মান, লজ্জা, ভয়, তিনেরই সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা মরীয়া হইয়া সম্মুখীন হইতে হইল। বলা বাহুল্য, ইহাও প্রতিবাদ-যুদ্ধে জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষায় নহে, কুতর্ক ও ফাঁকা বিদ্যাভিমানের পঙ্ক হইতে আমার মূল বক্তব্যটিকে উদ্ধার করিবার জন্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য যে অবিসংবাদিত তাহাতে কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সন্দেহ নাই। ঘোষ মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তর যাঁহারা চান তাঁহাদের জন্য আমি বিষয়টির পুনরবতারণা ও কিঞ্চিৎ স্ফুটতর আলোচনা করিব। ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার যখন কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন একাজ আমাকেই করিতে হইবে। সম্ভাবনা নাই বলিতেছি এই জন্য যে (১) ঘোষমহাশয়ের অভিমান যতখানি, মূলধন যে তদুপযুক্ত নয় তার প্রমাণ এবার পাইয়াছি। প্রথম বারে বিশ্বনাথ কবিরাজের অবশ্যপাঠ্য পাঠ্য-পুস্তক হইতে তিনি মামুলী গৎ আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এবারে ডাঃ দের ইংরাজী বই হইতে ছিটা-ফোঁটা উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনার চূড়ান্ত করিয়াছেন দেখিতেছি, আমা হেন অজ্ঞানতিমিরান্ধের চক্ষু একেবারে ধাঁধিয়া দিয়াছেন। স্পষ্ট বুঝিতেছি, ভদ্রলোক আমার কথা ত' বুঝেন নাই; জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাও নাই। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের যেটুকু পরিচয় তিনি রাখেন তাহাতে এবিষয়ে বক্তা না হইয়া শ্রোতা হইয়া থাকিলেই ভাল করিতেন। কোনও রূপ ঐতিহাসিক তুলনামূলক আলোচনা করিবার মত মনোভাব তাঁহার নিকটে প্রত্যাশা করা ভুল; আলঙ্কারিকগণের সূত্রনির্ম্মাণ প্রচেষ্টার অন্তরালে তাঁহাদের যে ধারণা নিহিত রহিয়াছে, স্বাধীন বিচারপ্রণালীর দ্বারা তাহা আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সেই বাক্যগুলির ব্যাকরণ ও অভিধান-ঘটিত তাৎপর্য্যের একটু বাহিরে পা দিতে গেলেই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মত তিনি কোলাহল সুরু করিয়া থাকেন। (২) তিনি যে সত্যানুসন্ধান অপেক্ষা স্বমতঃমর্য্যাদায় অধিকতর আস্থাবান, তাঁহার আত্মাভিমান যে কিরূপ গগনস্পর্শী, তাহার প্রমাণও পাইতেছি। মেঘদূতের শ্লোকটির ('মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব' ইত্যাদি) যে ব্যাখ্যা অতিশয় সহজ ও সঙ্গত, যাহা কাব্যরসিক পাঠক বা পণ্ডিত টীকাকার কেহই অগ্রাহ্য করিবেন না (আমি যে অর্থ করিয়াছিলাম তাহা মল্লিনাথের অনুসরণে নয়, স্বাধীনভাবে), ঘোষ মহাশয় সে ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়াছেন—কেবল আমার মত অপণ্ডিতের ব্যাখ্যা বলিয়াই নহে, মল্লিনাথকেও অপদস্থ হইতে হইয়াছে, যথা—"তবে নানা দিক বিবেচনায় মনে হয়, এস্থানে টীকাকার মহাশয় (মল্লিনাথ) কালিদাসের কাব্য হইতে দুর্ব্যাখ্যা-বিষ ঝাড়িতে অসমর্থ হইয়াছেন"। অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়ের নিজের ব্যাখ্যাটিই সুব্যাখ্যা—'নানাদিক বিবেচনায়' সেই রামপ্রসাদী ভাব তিনি কিছুতেই 'ঝাড়িতে' প্রস্তুত নহেন। এমন একটি অতি প্রাঞ্জল শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাবিভ্রাট ঘটাইতে দেখিলে, স্বর্গীয় দ্বিজু রায়ের 'চণ্ডীচরণ'কে মনে পড়ে, তাহার ব্যাখ্যাতেও 'জলের মত বিষয় হয় ইঁটের মত শক্ত'।

আমার বক্তব্য ছিল—আধুনিক অর্থে আমরা অশ্লীল বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ইংরাজী obscene শব্দেরই সমার্থবোধক; সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের 'অশ্লীল' তাহা নহে। এই আধুনিক অর্থের অশ্লীলতা সম্বন্ধে প্রাচীন কবি ও আলঙ্কারিক কাহারও কোনও অচেতনতা ছিল না, কোথাও সে মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই না; ইংরাজী obscene শব্দে যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইবার জন্য অনুরূপ কোনও শব্দও অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাই। ইচ্ছা করিয়াই আমি মূল প্রবন্ধের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলাম না—ঘোষ মহাশয় যে বাক্যগুলি সযত্নে এক-দুই নম্বর লাগাইয়া সম্মুখে ধরিয়াছেন সেগুলির অন্তর্গত অভিপ্রায় যে ইহাই, তাহা পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনও জটিলতা নাই বলিয়াই আমি পূর্ব্বের বাক্-বন্ধন অগ্রাহ্য

করিলাম। ঘোষ মহাশয় obscene কথাটিকেই ভাল করিয়া আমল দেন নাই। একথা কে না স্বীকার করিবেন যে, যৌন বা দেহঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা বা উল্লেখ মাত্রই obscene, আধুনিক অর্থে অশ্লীল? উহা সভ্য ভাষায় করিলেও নিস্তার নাই। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিক 'অশ্লীলতা'কে যে দোষ বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা ভাব বা বস্তুঘটিত দোষ নয়, তাহা ভাষা বা রচনা-রীতিগত দোষ, এবং তাহারই প্রকারভেদের আলোচনা করিয়াছেন। এই 'অশ্লীল'কে আধুনিক অর্থে ইংরেজীতে inelegant, indecent, বা vulgar বলা যায়, এ দোষ আধুনিক সাহিত্যেও পরিহর্তব্য; কিন্তু প্রাচীনদের শ্লীলতা ওইরূপ দোষ পরিহার করিয়াও আধুনিক অর্থে obscene থাকিয়া যায়, এবং সেই obscenity সম্বন্ধে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে বা কাব্যে কোনও রূপ আপত্তির আভাস নাই। এই বাস্তব তথ্যটিকে স্বীকার করিয়া আমি আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ভারতীয় কালচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছি। তথ্যটি এতই সর্ব্ববাদিসম্মত যে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তাহার সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু এখন সে প্রয়োজন ঘটিয়াছে—'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'। উপায় কি?

যেটুকু সাধ্য ঐতিহাসিক আলোচনা পরে করিব। এক্ষণে একটু সাধারণ ভাবে দুই একটি কথা বলি। আমরা যে সকল শব্দকে অশ্লীল বলি, যেমন রতি, বিহার, পরিরম্ভন, কুচ, নিতম্ব, জঘন, নীবিবন্ধ, ত্রিবলি, নখক্ষত ইত্যাদি—অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে সেগুলি অশ্লীল নয়, তার কারণ উহারা সভ্য বা elegant শব্দ, বরং আদিরস-রচনায় ইহারাই প্রধান উপকরণ। আমরা কিন্তু ভাষার শ্লীলতার খাতিরেও এই সকল শব্দ বরদাস্ত করিব না। যাহার অন্তর্নিহিত ভাববস্তুই আপত্তিজনক তাহা অপেক্ষা অশ্লীল আর কি হইতে পারে? অশ্লীলতা-দোষের উদাহরণ হিসাবে কোনও অলঙ্কার-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ কাব্যনিচয় হইতে কোনও আদিরসপ্রধান 'অশ্লীল' শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। কালিদাসের 'জ্ঞাতাস্বাদোবিবৃতজঘনাং' অথবা 'নখক্ষতানীব বনস্থলীনাং'-এর মত কোনও শ্লোক কাহারও মনে পড়ে নাই। ভট্টির একাদশ, কুমারের অষ্টম, অথবা রঘুবংশের উনবিংশ সর্গকে অশ্লীল বলিয়া যদি কোনও আলঙ্কারিক 'ফতোয়া' দিতেন তবে সেকালের রসিক-সমাজে তাঁহাদের কোনও প্রতিপত্তি থাকিত না। নৈষধেও অশ্লীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন আছে। তাহা হইতেও কোনও শ্লোক কুত্রাপি উদ্ধৃত হয় নাই। এমন কি কুমারের অষ্টম সর্গে যে 'অশ্লীলতা' আছে তাহাও অশ্লীল নয়—সে দোষের নাম 'রসাভাস' বা অনৌচিত্য-দোষ। ইহা হইতে অতি সহজ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেকালে তাহা অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইত না। আমার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারও বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে—এমন সোজা কথার এমন 'দুর্ব্যাখ্যা' হইতে পারে—তাহা জানিতাম না।

কিন্তু সুপণ্ডিত ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন, এরূপ বাজে কথায় তিনি ভুলিবেন না, আধুনিক obscene অর্থেই 'অশ্লীলতার' ধারণা অলঙ্কার-শাস্ত্রে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; আমরা যাহাকে যে কারণে 'অশ্লীল' বলি, এবং যে কারণে তাহাতে আমরা আপত্তি করি অলঙ্কার-শাস্ত্রে ঠিক সেই 'অশ্লীলতা' ও তাহার ঠিক সেই কারণ উল্লিখিত আছে। দেখা যাক, পণ্ডিত মহাশয়ের এ উক্তির মূল্য কি।

আমি বরাবর একই কথা বলিয়াছি, তাহা এই যে, বস্তুগত অশ্লীলতার, অর্থাৎ বিষয় বা কল্পনাবস্তুর অপরিচ্ছন্নতার ভাবনাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাই; সেখানে অশ্লীলতা যে দোষপর্য্যায়ে পড়ে তাহা মুখ্যত শব্দার্থঘটিত বা রচনারীতিগত দোষ। একটা প্রমাণ দিই। আলঙ্কারিক দণ্ডী (ডাঃ দের মতে ইনি খৃঃ অষ্টম শতকের প্রথমার্দ্ধের লোক) অশ্লীলতা নামক কোনও দোষের উল্লেখ করেন নাই, তিনি ঐ জাতীয় সকল দোষকে 'গ্রাম্যতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রাম্যতা সম্বন্ধে দণ্ডী বলিতেছেন—'শব্দেঽপি গ্রাম্যতাস্ত্যেব সা সভ্যেতর কীর্ত্তনাৎ যথা যকারাদিপদং রত্যুৎসব নিরূপণে।' গ্রাম্যতার ভয়ে দণ্ডী 'যকারাদিপদ' বলিয়া যাহার ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা তাঁহার মতে দোষাবহ; কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে 'রত্যুৎসবে' তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; আধুনিকদের নিশ্চয়ই আছে, রত্যুৎসব ব্যাপারটি নিশ্চয়ই অশ্লীল, এবং তাহার নিরূপণে 'যকারাদিপদ'এর পরিবর্ত্তে সভ্যপদ ব্যবহার করিলেও তাহা শ্লীল হইবে না।

—এই যে দোষ, যাহার উল্লেখ অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাই, তাহা কি আদৌ ভাষারীতিগত, বা খাঁটি সাহিত্যিক (literary) দোষ, না তাহা ভাববস্তুগত—ভাষানিরপেক্ষ মানস-কলুষবিধায়ক কোনও ব্যাপার? ঘোষ মহাশয়ের গুঁতার চোটে আমি এ বিষয়ে আর একবার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অকাট্য। এ দোষকে আমাদের একালের অর্থে গ্রাম্যতা দোষ ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না—উহা আধুনিক obscenity নহে। আমি তাহাই বলিয়াছি, বড় সত্য কথাই বলিয়াছি; এ জন্য নিজের উপর বড় খুসী হইয়াছি। এইবার এ বিষয়ে একটু ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিলেই আমার এই আত্মপ্রসাদের কারণ বুঝা যাইবে।

আলঙ্কারিক ভামহ খৃঃ সপ্তম শতকের শেষ ও অষ্টম শতকের প্রথম ভাগের লোক (ডাঃ দের গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯) ইঁহার কাব্যালঙ্কার নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে, কাব্যের সৌশব্দ্যবিচারে, 'শ্রুতিদুষ্ট' 'অর্থদুষ্ট' ও 'কল্পনাদুষ্ট' ত্রিবিধ দোষের উল্লেখ আছে—গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতার নাম মাত্র নাই। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক দণ্ডী এই দোষকে সাধারণ আখ্যা দিয়াছেন 'গ্রাম্যতা', এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দণ্ডীর কাল অষ্টম শতকের প্রথমার্দ্ধ—ডাঃ দের অনুমান এইরূপ। তৎপরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন ডাঃ দের মতে, খৃঃ অষ্টম ও নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্যতার সঙ্গে অশ্লীলতা নামক আর এক দোষের উল্লেখ করেন। বামনের মতে, এই দোষ শব্দার্থ-গত বটে, কিন্তু ভাষার গ্রাম্যতাই ইহার একমাত্র কারণ নয়—ব্রীড়া জুগুপ্সাদির উদ্রেকও ইহার সূক্ষ্মতর কারণ—সভ্য ভাষাতেও যখন এরূপ দোষ ঘটিতে পারে, তখন তাহার জন্য আর একটি নাম নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন—সেই পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যই তিনি 'অশ্লীলতা' শব্দটির আমদানি করিলেন। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা স্পষ্টত ইঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বামন ভাষাগত দোষের আলোচনাতেই গ্রাম্যতাকে সাধারণ দোষ না বলিয়া বিশেষ দোষ

চিহ্নিত করিবার অভিপ্রায়ে অশ্লীলতা নামে আর একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক সভ্য ও সভ্যেতর উভয়বিধ ভাষাতেই যে সামান্য দোষলক্ষণকে গ্রাম্যতা নাম দিয়াছিলেন, বামন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, গ্রাম্য অর্থে 'লোকপ্রযুক্ত মাত্র', কিন্তু শিষ্ট ভাষাতেও এ দোষ ঘটে; সেখানে ভাষার দোষ নাই, অর্থাৎ ভাষা গ্রাম্য নয় বটে, কিন্তু তথাপি, ব্রীড়া জুগুপ্সা, মঙ্গলাতঙ্ক, এই ত্রিবিধ চিত্তবিক্ষেপ ঘটে; অতএব যেখানে ভাষাও গ্রাম্য নহে, সেখানে এই দোষের নাম 'অশ্লীলতা' রাখা গেল। এই যে ভেদ-নির্দ্দেশ ইহা যে একটা technical কারণে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই—'গ্রাম্য' শব্দটির অর্থ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হওয়াতেই বামন পূর্ব্বাচার্য্য-গণের ধারণাটিকে আরও বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন। ভামহের 'শ্রুতিদোষ' 'অর্থদোষ' ও 'কল্পনাদোষ'– এই তিনের মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার আপত্তির অবকাশ আছে; তিনি এই দোষগুলিকে কোনও সাধারণ নামে অভিহিত না করায়, দণ্ডী সেই নাম দিলেন গ্রাম্যতা। দণ্ডীর এই নামটি যথার্থ বলিয়া মনে না হওয়ায় বামন সাধারণ নাম পরিত্যাগ করিয়া দুইটি বিশেষ নামের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু মূল দোষ যাহা, সে সম্বন্ধে নূতন কোনও ধারণা বামনের মধ্যেও নাই। এই যে ব্রীড়া-জুগুপ্সাদির উল্লেখ বামন সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন—বিশ্বনাথ কবিরাজের গ্রন্থে তাহারই প্রতিধ্বনি আছে, তাহারই সহজ সন্ধান লাভে উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে নানা 'objective' আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ 'ব্রীড়া-জুগুপ্সা' প্রভৃতির উদ্রেক যে 'গ্রাম্যতা'র দ্বারাও হইতে পারে—বরং আমরা এখন যাহাকে vulgar বলি তাহাও যে ঐ কারণে; এবং vulgar মাত্রেই obscene অথবা obscene মাত্রেই যে vulgar নয়, তাহা ঘোষ মহাশয়ের চিন্তার বহির্ভূত বলিয়াই এত কথার প্রয়োজন হইয়াছে।

বামন অশ্লীলতার যে কারণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও মূলে ভাষাগত বা শব্দার্থঘটিত। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা ভামহ বা দণ্ডীর দৃষ্টান্ত হইতে পৃথক নয়। প্রমাণ দিই, ভামহ 'শ্রুতিদুষ্ট' বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন বর্চ্চঃ, ক্লিন্ন, বিসর্গ, পেলব, উপস্থিত, বাক্কাটব (কাব্যালঙ্কার ১।৪৭-৫২)। দণ্ডী শব্দগত দোষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যাহা কিছুর মধ্যে 'সভ্যেতরকীর্ত্তন' আছে তাহাই গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট, যথা, 'যকারাদিপদ' (যভমৈথুন)। ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ (কাব্যাদর্শ, ১।৬৫)। বামন, ঠিক এই জাতীয় শব্দ হইতেই ত্রিবিধ অশ্লীলতার সন্ধান দিয়াছেন, যথা,—ব্রীড়া-উদ্রেককারী—বাক্কাটব; জুগুপ্সা-উদ্রেককারী—কপর্দ্দক; অমঙ্গলাতঙ্ক উদ্রেককারী—সংস্থিত; (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি ২।১।২০)। বামনের মতে ইহাই শব্দগত অশ্লীলতা। অতএব দেখা যাইতেছে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ধারণায় শ্রুতিদোষ বা গ্রাম্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাই এক্ষণে ভিন্ন নামে বিশেষিত হইয়াছে। দণ্ডীর 'সভ্যেতর' কথাটা বামন মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু ভাষার অসভ্যতাই সর্ব্বত্র এ দোষের কারণ নয়; 'লোকপ্রযুক্তমাত্র'ই দোষহেতু বলিলে ভদ্র-ভাষাতেও যে আপত্তির কারণ ঘটে, তাহা গণনার মধ্যে আসে না, অতএব তিনি এই ভাষাঘটিত দোষেরই একটু সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ [illegible]য়াছেন, এবং ভদ্রভাষাও যে কারণে indecent হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া স্বতন্ত্র নাম দিয়াছেন 'অশ্লীলতা'। ইহাও indecent বা inelegant-এর অধিক কিছু নয়, কারণ, obscene বলিয়া আমরা যে আপত্তি করি, তাহা ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভাষা যতই সুন্দর বা শ্লীল হউক, বর্ণনা যদি দেহঘটিত বা কাম-মূলক হয়, তবে তাহার সমর্থন আমরা করি না। বামন যে অশ্লীলতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে পূর্ব্বাচার্য্যগণের, শ্রুতিদোষ, অর্থদোষ, গ্রাম্যতা বা vulgarity হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়, আর একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

প্রথমেই চোখে পড়ে, সকল আলঙ্কারিক এই দোষটিকে, শব্দ ও বাক্যার্থ ঘটিত, এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা, উভয় ক্ষেত্রেই ঐ এক বিচার। উদ্ধৃত উদাহরণগুলির মধ্যে, সকল গ্রন্থেই যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বড়ই অর্থপূর্ণ। প্রথমে শব্দগত দোষের বিচার ও দৃষ্টান্তগুলি দেখা যাক। এই দোষ প্রধানত দুই কারণে ঘটে—(১) সভ্যার্থবাচক হইলেও কোনও শব্দের যদি অপর একটি অসভ্য অর্থ থাকে, তবে তাহা বর্জ্জনীয়, যথা—বর্চ্চস্, হিরণ্যরেতস্ (ভামহ); দণ্ডীর 'যকারাদিপদ' এই শ্রেণীভুক্ত। বামনের শব্দগত অশ্লীলতার একটি দৃষ্টান্ত—বর্চ্চস্। (২) পদসন্নিবেশের দোষেও এরূপ ঘটিতে পারে; তাহার দৃষ্টান্ত ভামহ দিয়াছেন, শৌর্যাভরণ (ভামহ ইহাকে বলিয়াছেন, 'কল্পনাদুষ্ট'...১।৪৭-৫২) দণ্ডীর দৃষ্টান্ত—'যা ভবতঃ প্রিয়া' (বাক্যটি নির্দ্দোষ হইলেও পদসন্নিবেশদোষে, যকারাদি শব্দ 'যাভ' উৎপন্ন হইয়াছে; দণ্ডীর মতে ইহার নাম পদসন্ধানজনিত গ্রাম্যতা দোষ)। বামন ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—বাক্কাটব, কৃকাটিকা, কপর্দ্দক (কাট, পর্দ্দ যথাক্রমে ব্রীড়া ও জুগুপ্সার উদ্রেক করিতেছে, অথচ শব্দগুলি নির্দ্দোষ ২।১।২২)। মম্মট ইহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন—'রুচিং কুরু'; লেখা উচিত 'কুরু রুচিং,' কারণ 'চিংকু' শব্দটি অশ্লীল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এ দোষের নাম 'গ্রাম্যতা'ই হোক আর 'অশ্লীলতা'ই হোক, ইহা শব্দার্থরীতিগত দোষ; ইহাকে indecent বা inelegant বলা যাইতে পারে, ইহা obscene নহে। ইহার পর বাক্যার্থঘটিত দোষের লক্ষণ আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে ঘোষ মহাশয়কে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। ঘোষ মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন "ভামহ নিশ্চয় একজন খুব প্রাচীন আলঙ্কারিক। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে তিনি খুব সম্ভব ৭ম শতাব্দীর শেষ পাদের লোক। এই ভামহ 'শ্রুতিদুষ্টতা' ও 'অর্থদুষ্টতা' নামক দুই প্রকার দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্তাদি আলোচনা করিয়া শ্রীযুত দে মহাশয় তাহাদিগকে যথাক্রমে expressly indecent ও implicitly indecent বলিয়া তর্জ্জমা করিয়াছেন। Indecent মানে যে obscene তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।" এই আলোচনা যিনি পড়িবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন, ঘোষ মহাশয়ের গবেষণা কত গভীর এবং সিদ্ধান্ত কত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ। প্রথমত মূল ভামহ তিনি চক্ষেও দেখেন নাই; কল্পনাদুষ্ট নামক তৃতীয় প্রকার দোষের নামও তিনি শোনেন নাই। ভামহের গ্রন্থ পড়া থাকিলে তাঁহার চক্ষু স্থির হইত নিশ্চয়ই, কারণ ভামহের আলোচনায় অশ্লীলতার নাম-গন্ধ নাই; রচনার সৌশব্দ্যবিচারে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভাষাগত দোষ ছাড়া আর কোনও দোষ সন্ধানের অবকাশই নাই।

তারপর ডাঃ দের গ্রন্থে এ প্রশ্নের কোনও বিশেষ আলোচনা নাই, থাকিতে পারে না, কারণ, সে গ্রন্থের অভিপ্রায় ভিন্ন। 'শ্রুতিদুষ্ট' ও 'অর্থদুষ্ট' এই দুই শব্দের ইংরাজী তর্জ্জমা হইতেই ঘোষ মহাশয়ের এত বড় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, অথচ ঐ তর্জ্জমাটুকুতে এ সমস্যার কোনও সমাধানই হয় না। Indecent মানে যে obscene—কেবল মাত্র এইটুকু যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি কি সাহসে প্রতিবাদ করিতে নামিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইংরাজী ভাষার যদি 'বিশ্ব' বা 'অমরকোষ' থাকিত তবে ঘোষ মহাশয়ের খুবই সুবিধা হইত নিশ্চয়; তাহা যখন নাই, তখন আর একটু কষ্ট করিয়া ও-ভাষার শব্দার্থ নির্ণয় করিতে হয়। নিজের ভুল এমন করিয়া ডাঃ দের উপর চাপাইয়া সে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপদস্থ করা তাঁহার উচিত হয় নাই। এইরূপ যুক্তিপূর্ণ উক্তির পরেই ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন—"তবেই দেখা যায় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যেও obscene জিনিষের অস্তিত্ব রহিয়াছে।" ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজীতেই জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সিদ্ধান্ত 'subjective' না 'objective'?

ঘোষ মহাশয়ের আর একটি অতি মারাত্মক প্রশ্নের জবাব এইখানে দেওয়াই সঙ্গত। আলঙ্কারিক অর্থে অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি কয়েকটি বাংলা কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাহাতে ঘোষ মহাশয় পরম কৌতুকবিহ্বল হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে বাক্যরীতিঘটিত এবং ভাববিরোধী শব্দার্থের অশ্লীলতা নামে পরিচিত কোনও দোষের উল্লেখ আছে বলিয়া শুনি নাই, (শুনিবেন কেন? পড়িয়া দেখিবার অবকাশ কি তাঁহার নাই?) এ বিষয়ের সন্ধান লেখক কোন পুস্তক হইতে পাইলেন তাহা জানাইলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।" শব্দ-ঘটিত দোষ বা অশ্লীলতার যে আলোচনা আমি এই মাত্র করিয়াছি, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আলঙ্কারিক মতে, বাক্যরীতি ও শব্দার্থ-বিষয়ে রচয়িতার অনবধানতাই 'শ্রুতিদোষ' 'গ্রাম্যতা' বা 'অশ্লীলতা'র একমাত্র কারণ। ঘোষ মহাশয় 'কল্পনাদোষ' বা পদসন্ধান জন্য দোষের নামই শোনেন নাই, সে সম্পর্কে আলঙ্কারিকগণের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিবার সুযোগই তাঁহার ঘটে নাই; ঘটিলে দেখিতে পাইতেন, আমি যে 'বাক্যরীতিঘটিত' এবং ভাববিরোধী শব্দার্থের অশ্লীলতার কথা বলিয়াছি—কেবল একজন নয়, সকল আলঙ্কারিকই তাহা বলিয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের দুঃসাহস চমকপ্রদ হইলেও অনুকরণ-যোগ্য নহে। আশা করি, ঘোষ মহাশয় এবার প্রকৃতিস্থ হইবেন—কিন্তু তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা দাবী করিব না।

এইবার বাক্যার্থঘটিত দোষের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। ভামহ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

হস্তমেব প্রবৃত্তস্য শুক্রস্য বিবরৈষিণঃ
পতনং জায়তেঽবশ্যং কৃচ্ছ্রেণ পুনরুন্নতিঃ
(কাব্যালঙ্কার, ১।৪৭-৫২)

দর্পণকার প্রভৃতি পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক এই দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন—কিছু পাঠান্তর আছে মাত্র। দণ্ডীর দৃষ্টান্ত এইরূপ—'খরং প্রহৃত্য বিশ্রান্তঃ পুরুষো বীর্য্যবানিতি'। (কাব্যাদর্শঃ ১।৬৭)। বামন দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—স সা ধনোন্নতি যা স্যাৎ কলত্র রতিদায়িনী' ইত্যাদি। (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি, ২।১।২২)। দৃষ্টান্তগুলির সামান্য লক্ষণ এই যে, সর্ব্বত্রই অর্থঘটিত 'দোষ' বা 'অশ্লীলতা'র কারণ একই—দ্ব্যর্থ-সমন্বিত বাগ্‌বিন্যাস। এ যেন এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা বলা হইতেছে—প্রকাশার্থ একরূপ, গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। ইহাই দোষের কারণ; যদিও, মম্মট, দর্পণকার প্রভৃতি কোনও কোনও আলঙ্কারিক কামশাস্ত্র হইতে একটা বিধি গ্রহণ করিয়াছেন—"দ্ব্যর্থৈঃ পদৈঃ পিশুনয়েচ্চ রহস্যবস্তু" অর্থাৎ 'যাহা গোপনীয় তাহাকে দ্ব্যর্থপূর্ণ-পদের দ্বারা আবৃত করিবে'। বাক্যার্থঘটিত অশ্লীলতার এই দৃষ্টান্তগুলির সম্বন্ধে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। এইরূপ দ্ব্যর্থসূচক পদবিন্যাস ব্যতীত, কোনও অলঙ্কার-গ্রন্থে, অশ্লীলতার আলোচনায় কুত্রাপি কোনও কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয় নাই। আমরা যাহাকে obscene বলি সংস্কৃত কবিগণের কাব্য হইতে সেই আদিরসাত্মক কতিপয় অশ্লীল শ্লোক কুত্রাপি প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার কারণ কি? কবিগণ যে খোলাখুলিভাবে অশ্লীল, দ্ব্যর্থহীন পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা কি তবে অলঙ্কার-শাস্ত্র মতে 'অশ্লীল' নয়? ঘোষ মহাশয় কি বলেন? সেগুলি কি implicitly বা explicitly indecent নয়? এবং যেহেতু 'indecent মানে obscene', অতএব সেগুলি obscene নহে? 'জাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং' অথবা 'নখ-ক্ষতানীব বনস্থলীনাং' প্রভৃতি নিশ্চয়ই দ্ব্যর্থসূচক পদ নহে অতএব ইহারা আলঙ্কারিকের আলোচনার বহির্ভূত। তাহা হইলে আলঙ্কারিকগণের মনে 'অশ্লীলতা'র সঠিক ধারণা কি ছিল?

শব্দ ও বাক্যার্থঘটিত দুই প্রকার অশ্লীলতারই দৃষ্টান্ত আমরা দেখিলাম। শেষোক্ত প্রকার অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত হইতে আলঙ্কারিকের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সে অভিপ্রায় এইরূপ। যে পদবিন্যাসের মধ্যে কোনও রস নাই—বাক্য আছে, কাব্য নাই, অথচ দ্ব্যর্থের চেষ্টা আছে, তাহাই অশ্লীল, অর্থাৎ vulgar। এ অশ্লীলতা যে vulgar ভিন্ন আর কিছুই নহে, আশা করি, এতখানি আলোচনার পরে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঘোষ মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিবাদ-পত্রের এক স্থানে, 'হস্তমেবপ্রবৃত্তস্য' ইত্যাদি শ্লোকের অশ্লীলতা-প্রতিপাদক টীকা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"ইহা হইতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির অশ্লীলতা এতই দুঃসহ মনে হয় যে, ইহাকে obscene বলিতে কাহারও আপত্তি হইবে না"। এ মন্তব্য ঠিক হয় নাই। সকল কালের রুচির পক্ষেই ইহা দুঃসহ বটে, কিন্তু সেকালে ইহা দুঃসহ হইত—obscene বলিয়া নহে, vulgar বলিয়া; একালেও উহা (ঐ টীকার ভাষা) obscene অপেক্ষা vulgar বলিয়াই অধিকতর আপত্তিজনক। যাহা obscene, তাহার বাক্যার্থ বা প্রকাশভঙ্গি এত কুৎসিত হইবার প্রয়োজন নাই; প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কাব্যে যে অশ্লীলতার (আধুনিক অর্থে) ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে, তাহার ভাষা elegant, vulgar নহে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে এই ভাষা বা ভঙ্গির কদর্য্যতাই অশ্লীল, তাহাই দুঃসহ, এবং আলঙ্কারিক অশ্লীলতা ইহার অধিক কিছু নয় বলিয়াই, অশ্লীলতা-দোষ-বিচারে আমরা কুত্রাপি কবিগণকে লইয়া টানাটানি করিতে দেখি না। তাহার

সৌশব্দ্যবিচারে এই দোষের আলোচনা করিয়াছেন; দণ্ডী রীতিবিচারে মাধুর্য্য-গুণ সম্পর্কে ইহার আলোচনা করিয়াছেন; বামনও রচনারীতির দোষবিচারে এই অশ্লীলতার উল্লেখ করিয়াছেন—ভাববস্তু সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি নাই; তাই দেহঘটিত ব্যাপার বা যৌন ভাবমূলক বর্ণনার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ neutral। এই কারণেই আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি—আলঙ্কারিকের 'অশ্লীলতা' আধুনিক অর্থে obscenity নয়। আমি লিখিয়াছি—"ভাষার যেটুকু শ্লীলতারক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করিতেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যৌনভাবমূলক বর্ণনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়,—ভাষার এমন ভঙ্গি তাঁহারা পছন্দ করিতেন না; বর্ণনা প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহাতে ইতর অশিক্ষিত জনের মুখভঙ্গি যেন প্রকাশ না পায়।" অন্যত্র লিখিয়াছি— "সেকালে অশ্লীলতা বলিতে ভাষায় refinementএর অভাব বুঝাইত; ভদ্রলোকের ভাষা ভদ্র হওয়া চাই—কাব্যের বাকি যাহা দোষ গুণ রসিক চিত্তই তাহার প্রমাতা"। আজিকার এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে ঐ উক্তি কি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে?

মূল বিষয়টির সম্বন্ধে ইহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ঘোষ মহাশয় প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে, আমাকে যে দুই একটি খোঁচা অতিশয় ভদ্রভাবে দিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিষেধক প্রস্তুত না করিলে, আমার ও তাঁহার উভয়েরই দুর্নাম হইতে পারে।

(১) মেঘদূতের শ্লোকটির (মধ্যে শ্যামঃ ইত্যাদি) সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহাতে ঘোষ মহাশয়, ভারতীয় আদর্শ ও কালচারের এমন কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমার অশ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার উত্তরে আমি যখন কবুল করিলাম যে আমি শ্রদ্ধাহীন হওয়া দূরে থাক সে কালচারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, তখন ঘোষ মহাশয়, কি জানি কেন, অন্য ভাব ধারণ করিয়া, অতিশয় বিজ্ঞতা সহকারে আমাকে আর এক চোট উপদেশ দিয়াছেন দেখিতেছি। পাছে কেহ মনে করে যে তিনি সংস্কৃত বিদ্যা এত অধিক আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া, ভারতীয় কালচারের একজন গোঁড়া ভক্ত, এবং সেই জন্য আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাই এবারে লিখিয়াছেন—"তিনি ভাবিয়াছেন, যেহেতু আমি সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় রাখি, অতএব আমি প্রাচীন রুচির একজন গোঁড়া সমর্থক। এবিষয়ে আমার মতামত প্রবন্ধান্তরে ব্যক্ত করিব। তবে একথা মোটামুটি বলিতে পারি যে হিন্দু কালচারের বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক প্রণালীতে আলোচিত না হইলে তাহার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা দেখাইয়া বিশেষ ফল নাই...পদে পদে অজ্ঞানতার প্রশ্রয় ঘটিতে পারে।" এযেন, 'এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে'! ঐতিহাসিক প্রণালীর কথা আমিই তুলিয়াছিলাম এবং সে ভার তাঁহাকেই দিয়াছিলাম, কারণ আমার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য যাহা তাহা মুখ্যতঃ সাহিত্য-সমালোচনা, ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন না করিলেও তাহার একটা না একটা মূল্য থাকা অসম্ভব নয়। শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা যদি তাহাতে প্রকাশ পায় এবং তাহা যদি সত্য অথবা ভ্রান্ত হয়, তবে তাহার জন্য দায়ী হইবে আমার সাহিত্যজ্ঞান, আমার রসদৃষ্টি; কারণ, আমি ঐতিহাসিক নই, আমি সাহিত্যিক; আমার যাহা আলোচ্য বস্তু তাহা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের অধীন নয়; তাহা নিত্য ও শাশ্বত। আমাকে আদর্শ লইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা আমার কোনও কাজে লাগিবেনা, কারণ সে আদর্শ গোড়া হইতেই স্থির হইয়া আছে। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে সেই নিত্য সনাতনের আদর্শই আমি ধরিয়া থাকিব, তাহারই পদচিহ্নের সন্ধান করিব। এরূপ আলোচনায় হিন্দুর কালচার সম্বন্ধে যদি শ্রদ্ধাপ্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। তাহা যে অন্ধ শ্রদ্ধা, এমন কথা বলিতে হইলে, বক্তার সে অধিকার প্রমাণ করা চাই। ঘোষ মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে প্রবন্ধান্তরে আমার মতামত ব্যক্ত করিব," ইহাতে আশ্বস্ত হইলেও তাঁহাকে বলিয়া রাখা ভাল যে, তিনি একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক বটে, তথাপি তাঁহার মতামতের জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, তাঁহার এ ধারণা ভুল। আরও কিছুদিন গেলে ভাল হয় না? এত তাড়াতাড়ি কেন? এত শীঘ্র মতামতপ্রকাশে অধীর হইলে জ্ঞানসঞ্চয়ে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাঁহার প্রতিভার পরিপক্ব ফল আমরা ভোগ করিতে চাই, তাই, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলি।

(২) "এতদ্ব্যতীত, দর্পণকারের উপর অভারতীয় কালচারের প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি ...আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত ধৈর্য্যহীন না হইলে তিনি এ জাতীয় অদ্ভুত মতকে উপেক্ষা করিতেন।" পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই, এত বড় পণ্ডিতকে কি নাকালই করিয়াছি! এমন কথা কখনও পণ্ডিত মানুষের কাছে বলিতে আছে? "ঐতিহাসিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি," "গবেষণা," "গবেষণার সম্ভাব্যতা" "উর্ব্বর মস্তিষ্কে অঙ্কুরিত হওয়া"—একেবারে প্রলয় ব্যাপার! দর্পণ-কার কবিরাজ বিশ্বনাথ খুব প্রাচীন ব্যক্তি নহেন, তিনি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমার্দ্ধের লোক। সে সময়ে নিশ্চয়ই গুপ্ত বা প্রাক্-গুপ্ত যুগের ভারতীয় কালচার অবিকৃত, অকলঙ্কিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া দুর্দ্ধর্ষ সেমিটিক কালচারের সহিত সংঘর্ষের ফলে, খাঁটি ভারতীয় কালচার যে গৌণ অথবা মুখ্যভাবে কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় নাই, এমন কথা কোনও ঘোরতর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করিবেন না জানি, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার কথা কেন? এটুকু বলিতে হইলেও সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস লিখিতে হইবে? আমি উহা আপ্তবাক্যের মতই বলিয়াছি—আবশ্যক হয় ঘোষ মহাশয় ঐতিহাসিক সংস্কৃত পণ্ডিতগণের দ্বারা আমার বাক্য যাচাই করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ বাজে তর্ক না করিয়া ঘোষ মহাশয় যদি বলিতেন, অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতবিশেষের সম্বন্ধে, এমন কি, সমগ্র অলঙ্কার-শাস্ত্রের সম্বন্ধে এরূপ প্রভাবের কথা খাটে না—এখানেও অন্যান্য শাস্ত্রীয় চিন্তার মত হিন্দুর রক্ষণ-শীলতা প্রাচীন ধারাটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি যদি অষ্টম বা নবম খ্রীষ্টাব্দের কোনও অলঙ্কার গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিতেন (যেমন আমি এই আলোচনায় করিয়াছি), তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবাদ সার্থক হইত। সে যোগ্যতা তাঁহার নাই দেখিতেছি, তিনি ডাঃ দের গ্রন্থ হইতে ভামহের নাম ও দুইটা অসংলগ্ন শব্দ উদ্ধৃত করিয়াই সমস্যার অন্ত করিয়াছেন —দেখাইতে পারেন নাই যে, বিদেশী কালচার প্রবেশের বহু পূর্ব্বে অলঙ্কার শাস্ত্রে অশ্লীলতার উল্লেখ আছে। তাহা না করিয়া, বা করিতে না পারিয়া, তিনি

আমার একটি স্বতঃসিদ্ধ উক্তির বিরুদ্ধে ঘনঘটাপূর্ণ বাহ্বাস্ফোট করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'সত্যানুসন্ধিৎসা' যদি এখনও তৃপ্ত না হইয়া থাকে তবে, অনাবশ্যক এবং নিষ্ফল জানিয়াও, আমি পুনরায় আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তিনি যেন মূল বিষয়টিকে পাশ কাটাইয়া বাজে ভাঁওতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

(৩) ঘোষ মহাশয়ের শেষ খোঁচাটাই নিদারুণ, সামলাইয়া উঠা দায়। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার ভাষার অপূর্ণতা ও অস্পষ্টতাই আমাদিগকে মুখ্যত আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে।" ইহার উত্তরে আমি আর কি বলিব? তিনি যে আমার একটা কথাও বুঝিতে পারেন নাই, সে বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সে জন্য আমি সাতিশয় লজ্জিত, কারণ, 'বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে'। এ লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না, যদি না আমার সন্দেহ জাগিত যে, শ্রোতা মহাশয় কতকটা স্বাভাবিক বধিরতা বশত এবং কতকটা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বকর্ণ-আচ্ছাদন করত আমার বক্তব্য প্রণিধান করেন নাই। আমার ভাষা যে আধুনিক বহু পাঠকের নিকটেই অস্পষ্ট হইবে তাহা আমিও জানি—তাহার কারণও জানি, সে সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল। কবি বলিয়াছেন, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'—সে কথাও এখানে উত্থাপন করিব না। কিন্তু আমার ভাষার অপূর্ণতার যে দৃষ্টান্তটি তিনি দিয়াছেন তাহাতে সত্যই চমৎকৃত হইয়াছি। আমি লিখিয়াছি—"সে সাধনায় মনোবুদ্ধি নয়, অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তির প্রকর্ষই প্রধান সম্পদ।" এবার ঘোষ মহাশয় বড় সুবিধা করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার কোষবিদ্যা বড় কাজে লাগিয়াছে। ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন—"এতদিন যাবৎ আমরা ত জানিতাম (বলিবার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করিবার মত) যে, অন্তঃকরণ এক মনকেই বলা হয়", তাহা হইলে 'অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি'র টীকা ফর্দ্দে ব্যাখ্যা দাঁড়ায়—'মনঃপ্রবৃত্তি': তবে আর প্রভেদ রহিল কোথায়? ইহাকেও বলে পাণ্ডিত্য—একেবারে আদি অকৃত্রিম! অতএব ইহা অগ্রাহ্য করা চলে না, তাই নিম্নে ইহার উত্তর দিতেছি।

(ক) আমি বাংলায় প্রবন্ধ লিখিয়াছি—বাংলা ভাষার বাক্যরীতি ও প্রয়োজন অনুসারে আমাকে শব্দচয়ন, এমন কি প্রণয়ন করিতে হয়। 'অন্তঃকরণ' শব্দটি বাংলায় ঠিক 'মনে'র স্থানে ব্যবহৃত হয় না—উহার বেশ একটু স্পষ্ট পৃথক অর্থ আছে, অতএব বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ঐরূপ শব্দ-প্রয়োগ কিছু মাত্র অসুবিধাজনক হইবে না।

(খ) সংস্কৃত 'মনঃ' শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে: বাংলাতেও হয়, যেমন "যার সঙ্গে যার মজে মন"; কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় 'মন'কে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিলে উপায় নাই: এই রূপ ব্যবহার এখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে ratiocinative বা reasoning faculty বলে, আমরা 'মন' শব্দের দ্বারা তাহাকেই নির্দ্দেশ করি; intellectual বা mental বলিতে মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা বুঝিয়া থাকি। Emotionও 'মনে'র ধর্ম্ম বটে—এমন কি instinct ও intuitionও মনস্তত্ত্ব এবং আধুনিক মনোবিকলন শাস্ত্রের অধিকারভুক্ত; তথাপি বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি, সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের এই দুই ধর্ম্মকে বিশিষ্ট-নির্দ্দেশ করিবার জন্য 'মনঃ' শব্দটিকে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে বলিয়াই আমার ধারণা—এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তির বিচার আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যিক ভাষার প্রভাব অনিবার্য্য। ইংরাজীতে যখন পড়ি "The Heart should be the Mind's Bible", তখন তাহার তর্জ্জমা করিতে হইলে, যদি সংস্কৃত ইডিয়ম রক্ষা করি, তবে Heart ও Mind উভয়েরই প্রতিশব্দ 'মন' হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অর্থ কেমন হয়? এজন্য 'মন'কে Mind এর প্রতিশব্দ ও অন্য একটি ওই পর্য্যায়ের শব্দকে Heartএর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিলে, বাংলা ইডিয়মের ক্ষতি ত' হয়ই না, সংস্কৃত অর্থেরও বিরোধী হয় না, কারণ সে অর্থ অতিশয় ব্যাপক।

(গ) এ যুক্তি ছাড়িয়া দিলেও, আমি যে ভাবে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতেও অর্থের গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই—'মনে'র সঙ্গে 'বুদ্ধি' ও 'অন্তঃকরণের' সঙ্গে 'প্রবৃত্তি' যোগ করিয়া আমি অর্থের পার্থক্য রক্ষা করিয়াছি: কারণ, 'মন' ও 'অন্তঃকরণ' এক বস্তুবাচক হইলেও 'বুদ্ধি' ও 'প্রবৃত্তি' এই দুই শব্দে বিভিন্ন ক্রিয়া সূচিত হইতেছে।

(ঘ) সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের এতটুকু পরিচয় আছে তাঁহারাও জানেন আমি 'অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি' কথাটি কোথা হইতে লইয়াছি এবং সেখানে উহার অর্থ কি। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে দেখিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে, এই কন্যা তাঁহার বিবাহযোগ্যা কিনা, কারণ ক্ষত্রিয়কন্যা না হইলে, তাঁহার এই বাসনা অবৈধ হইবে। কিন্তু বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিঃসংশয় হইবার মত তথ্য তখন তাঁহার অজ্ঞাত, তথাপি তিনি স্থির করিলেন—

> অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
> যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
> সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
> প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

এই শ্লোকে 'মন' ও 'অন্তঃকরণ' দুই শব্দেরই ব্যবহার আছে কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে 'অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি' বাক্যটির দ্বারা মহাকবি মনের যে দিকটির উপরে জোর দিয়াছেন তাহা subconscious প্রেরণা, বা instinctএর কাজ। আমিও "অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি" সেই অর্থে-ই ব্যবহার করিয়াছি; এবং ইহাই বিশ্বাস করি যে নূতন কোনও শব্দের পরিবর্ত্তে ওই কথাটি ব্যবহার করিয়া ভালই করিয়াছি। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের মত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য হইতে ভগবান বাংলা ভাষাকে রক্ষা করুন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। সংস্কৃতজ্ঞ ঘোষ মহাশয় আমার সংস্কৃত ভাষাব্যবহারে ত্রুটির সন্ধান করিয়াছেন: ত্রুটি যথেষ্ট থাকিতে পারে, কারণ, আমি সংস্কৃত-ভাষাভাষী নই, পণ্ডিতও নই। আমি বাংলাভাষায় ভাবপ্রকাশ করিয়া থাকি এবং তাহা নিতান্ত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয় বলিয়া আমাকে অনেক নূতন বাক্য ও শব্দ গঠন করিয়া লইতে হয়, তাহা সব সময়ে সুষ্ঠু হয় না, তাহা জানি। কিন্তু ঘোষ মহাশয় যে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বা মামুলী কথা লইয়া কারবার করিয়া থাকেন তাহার ভাষা এত শিথিল ও দুর্ব্বল হয় কেন? সংস্কৃত জানিলে যদি বাংলা জানিবার প্রয়োজন না থাকে,

তবে বাংলায় লিখিবার প্রবৃত্তি দমন করাই ভালো। ঘোষ মহাশয়ের একটি উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে তাহারই ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন—"তবে নানাদিক বিবেচনায় মনে হয় এস্থানে টীকাকার মহাশয় কালিদাসের কাব্য হইতে দুর্ব্যাখ্যা-বিষ ঝাড়িতে অসমর্থ হইয়াছেন।" ইহার অর্থ আমরা কি বুঝিব? দুর্ব্যাখ্যা-বিষ কি কালিদাসের কাব্যেরই ভিতরকার বস্তু? কালিদাস কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে ব্যাখ্যাও পুরিয়া রাখিয়াছেন?—টীকাকারের কাজ সেই ব্যাখ্যা-অংশটুকু সংশোধন করিয়া দেওয়া? 'ঝাড়িতে' অর্থ কি? ভৃত্য টেবিল, চেয়ার, বিছানা, পোষাক 'ঝাড়ে', পণ্ডিত লোকে বড় বড় বক্তৃতা 'ঝাড়িয়া' থাকে; কিন্তু এক বস্তু হইতে আর এক বস্তু লোকে ত' 'ঝাড়ে' না 'ঝাড়িয়া ফেলে' বিছানা ঝাড়ে, কিন্তু গা' হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ফেলে। 'সকল দিক বিবেচনায়' বাংলা বাক্যরীতির পক্ষে সুষ্ঠু হয় নাই; 'সকল দিক বিবেচনা করিয়া' এইরূপ লিখিলে ভাল বাংলা হইত। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় নূতন ব্রতী বলিয়াই ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে আরও সতর্ক হইতে বলি। আমার মত বুড়া জানোয়ারকে নাচ শিখাইতে যাওয়া নিষ্ফল, আমাদের বদভ্যাস আর ঘুচিবে না; তাঁহাদের মত আশাস্থল যাঁহারা তাঁহারা এখন হইতে সাবধান হইলে ভাষা ও সাহিত্যের সমূহ মঙ্গল হইবে।

সর্ব্বশেষে ঘোষ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ; কারণ "শেষ কথার অশেষ সমালোচনা চলিতে পারে"—ইহার চেয়ে বড় কম্প্লিমেন্ট আর কি হইতে পারে? আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও মানুষের ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তায় যে দ্বন্দ্ব ঘুচিল না এবং কখনও ঘুচিবে না, সেই সনাতন শাশ্বত মতবিরোধই যদি আমার প্রবন্ধ সমালোচনার কারণ হয়, তবে তাহা যে 'অশেষ' হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে ঘোষ মহাশয়েরই ভাষায়, সে সমালোচনা যদি অত্যধিক 'আশু' হইয়া পড়ে তবেই সমধিক বিপদের সম্ভাবনা। অলমিতিবিস্তরেণ।

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

বর্ষারাত্রি

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার গ্রামপথ, বরিষে আষাঢ়,
সুষুপ্ত গহন রাত্রি, স্তব্ধ চারিধার।
একাকী নির্জ্জন গৃহে শুনিতেছি বসি'
অশ্রান্ত বর্ষণ-গান, বায়ু যায় শ্বসি;
গম্ভীর গরজে মেঘ, চমকে বিজুলী,
কেন রাত্রে আঁখি ক'র ওঠে ছলছলি?

কে যেন চলিছে বনে, বাজিছে মঞ্জীর,
তিমিরে কাঁপিছে তা'র হৃদয় অধীর।
বারি-ধারা সিক্ত তা'র সুনীল বসন
সম্বরি' চলিছে ধীরে চাপিয়া চরণ;
চলিয়াছে অন্তহীন যুগ যুগ ধরি'
কণ্টকিত কাননের পথ অনুসরি'।

গাগরীর বারি ঢালি' করিয়া পিছল
কণ্টক গাড়িয়া পথে, সামালি' আঁচল
বরষার অভিসার শিখিয়া গোপনে
কে চলিত পাগলিনী প্রেমের স্বপনে?
তিমির-কাননে তা'রি কম্পিত চরণ
বুঝিবা মিলায় ধীরে ছায়ার মতন।

তারি সাথে আজি মোর বিরহী পরাণ
নীরব বরষারাত্রে করিছে প্রয়াণ;
ভাসিতেছে কানে কোন্ স্বপ্নময় সুর
চিরন্তন বেদনার—আকুল, মধুর।
অন্ধকার টানিয়াছে গাঢ় অন্তরাল,
আমারে ঘিরিয়া আছে অন্তহীন কাল।

কোন্ সে মন্দির চির-নিরুদ্ধ-দুয়ার?
চিরন্তনী বিরহিনী করে অভিসার।
ভুজগে পূরিত পথ, সংসার সুদূরে—
আমি আজি চলিয়াছি সেই কল্পপুরে।
স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর।

রাজমোহনের স্ত্রী

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

(প্রত্যাবর্ত্তন)

বাড়ী পৌছিলে মাতঙ্গিনী বলিল, তুমি ফিরে যাও করুণা। এতরাত্রে তোমাকে ফিরে যেতে বলাটা অন্যায় হচ্ছে, বুঝি—কিন্তু তুমি থাকলে বিপদের ভয় আরও বেশী। তার চাইতে এক কাজ কর, কনকদের বাড়ী যাও, তাদের বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাক, ঝড়টা একটু থামলে, একটু ফর্সা হলেই ওদের বাড়ীর কেউ জাগবার আগেই তুমি চলে যেও।

এই কথা বলিয়া মাতঙ্গিনী তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল, করুণা চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দেখিল দরজা তখনও অর্গলবদ্ধ। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজমোহন যে কৌশলে দ্বারটি অর্গলমুক্ত করিয়াছিল সেই কৌশল প্রয়োগ করিয়া দ্বার খুলিয়া মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে পুনরায় দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, দেখিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি মূর্ত্তি ঘরে ঢুকিয়া ভারী হুড়কাটি লাগাইয়া দিল। পা ফেলার ধরণে ও শব্দে মাতঙ্গিনীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে আগন্তুক তাহারই ভয়ঙ্কর পতিদেবতা।

রাজমোহন কোনও কথা কহিল না, নিঃশব্দে অন্ধকারে হাতড়াইয়া চকমকি আর সোলা বাহির করিয়া আলো জালিয়া যথাস্থানে সেটিকে রাখিল। তখনও সে নির্ব্বাক, তক্তপোষের একধারে বসিয়া সে হিংস্র দৃষ্টিতে মাতঙ্গিনীকে দেখিতে লাগিল। সেই দৃষ্টি দেখিয়া মাতঙ্গিনী বুঝিল তাহার ভাগ্যে কি আছে। সে বিবর্ণ বা ভয়কম্পিত না হইয়া সগর্ব্বে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার সমস্ত দেহে তেমনই প্রখর শ্রী ও সাহস ফুটিয়া উঠিল যাহা দেখিয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় তাহার বর্ব্বর স্বামীর ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়াছিল। বাহিরের ঝড়ের আর্ত্তনাদ, বারিপতনশব্দ ও উর্দ্ধাকাশের ক্রুদ্ধ মেঘের গর্জ্জন ক্ষণে ক্ষণে গৃহাভ্যন্তরের ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

পরিশেষে রাজমোহন কথা কহিল, হতভাগী—। তাহার কণ্ঠস্বর তীব্র হইলেও সচরাচর রুক্ষ মেজাজের দরুণ তাহার কথায় যে রূঢ় কর্কশতা থাকে এখন তাহা মোটেই ছিল না। সে বলিল, হতভাগী, উপপতি করতে গিয়েছিলি ?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর, রাজমোহন মেঝেতে পদাঘাত করিয়া চাপা অথচ ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলিল, বল্ বলছি।

অর্দ্ধদোষী ও অর্দ্ধনির্দোষী মাতঙ্গিনী উত্তর দিল, এসব কথার আমি কোনও জবাব দেব না।

জবাব দিবি না হারামজাদী ?—রাজমোহন হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে এই কথা বলিয়াই সে হঠাৎ আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, তুই আজ রাত্রে মাধব ঘোষের বাড়ী গিয়েছিলি কি না ?

মাধবের নাম শুনিবা মাত্র মাতঙ্গিনীর ভাবান্তর হইল, সে সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, তোমরা তার বাড়ীতে ডাকাতি করবে মতলব করেছিলে, আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

রাজমোহন দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। বজ্র কণ্ঠে হাঁকিল, দেখ্ মাগী, আমাকে ঠকাতে পারবি না তুই। তুই জানিস না তোকে আমি কি ভাবে পাহারা দি। যে দিন থেকে তোর রূপ হয়েছে তোর অভিশাপ, সেইদিন থেকে তোকে আমি চোখে চোখে রেখেছি, তুই ভাবিস না, তুই কি করিস্ না করিস্ আমি দেখি না।

হঠাৎ কিছু শান্ত হইয়া সে বলিতে লাগিল, হতে পারি আমি পশু, তবু আমার রূপবতী স্ত্রীর জন্য আমার গর্ব্ব ছিল; বাঘিনী যেমন করে তার বাচ্চাকে আগ্‌লে বেড়ায় আমিও তেমনি তোকে আগ্‌লে থাকতাম। আমি কি দেখিনি, তোর বয়স পাকবার আগেই ওই হতভাগার পীরিতে তুই মজেছিলি ? আমি কি জানি না, আস্তে আস্তে আজ ওটাই তোর মনের পাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ? আজকে বিকেলেই যখন ওই বেশ্যামাগী, তোর ওই সাধের সইয়ের কুমতলবে ভুলে কাউকে কিছু না বলে ঘরের বাইরে গিয়েছিলি, তখনও আমি তোকে চোখে চোখে রেখেছিলাম—এটা জেনে রাখ্! বল্ তুই যাসনি ? বাগানের কাছে গিয়ে ইচ্ছে করে মনে পাপ নিয়ে ঘোমটা খুলিস্ নি ? নাগরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হবে, চোখ জলে যাবে না তোর ? পিছু নিয়ে চলতে চলতে একবার তোকে হারিয়ে ফেললাম—

একটু হুঁসিয়ার থাকলেই হ'ত! বাড়ী ফিরে খালি ঘর দেখে আমার কি বুঝতে দেরী হয়েছিল, কোন সাপের গর্ত্তে পাপ-কীট গিয়ে ঢুকেছে? ওদের খিড়কির দরজা থেকেই আমি তোর কাছে-কাছেই ছিলাম এবং এই ঝড়জলের মধ্যে তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত আমি তোর পিছু নিয়ে আস্‌ছি—তুই অসতী হয়েছিস—তোকে আর বেঁচে থাক্‌তে দেওয়া নয়, আজকে রাত্রেই ছোরা শাণিয়েছি—তোকে নিকেশ করে তবে ছাড়ব।

রাজমোহন থামিল, তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল, মাতঙ্গিনীর অসাড় দেহখানার দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে যেন শেষ দেখা দেখিয়া লইল। ক্ষণিক স্তব্ধতার মধ্যে বাহিরে ঝড়ের হাহাকার মাত্র শোনা গেল। অবশেষে মাতঙ্গিনী কথা বলিল—সে মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে, তবু অত্যন্ত ধীরভাবে বলিতে লাগিল—

—তোমার কথা ঠিক, আমি তাকে ভালবাসি, গভীর-ভাবে ভালবাসি—বহুদিন এ ভালবাসা আমার মনে বাসা বেঁধেছে। একথাও তোমাকে বল্‌ছি—আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, নিজেকে সামলাতে পারি নি। সেই ভালবাসার উন্মাদনায়, তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারবে না, আমার মুখ দিয়ে কয়েকটা কথা বেরিয়েছে এই মাত্র, এ ছাড়া আমি আর তোমার কাছে দোষী নই। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয়?

রাজমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না। তোকে মেরেই ফেলব। ইহা বলিয়া সে কোমর হইতে বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত একটা ছুরিকা টানিয়া বাহির করিল। "মা, মা, বাবাগো, তোমরা কোথায়?"—এই কথাগুলি মাত্র হতভাগ্য মাতঙ্গিনীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—পরক্ষণেই সে অচেতনের মত মেঝেতে পড়িয়া গেল। নিষ্ঠুর অস্ত্রখানি তাহার মাথার উপর ঝকঝক করিতে লাগিল—কম্পিতা মাতঙ্গিনীর বক্ষে তাহা প্রোথিত হইল বলিয়া। এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়িল—জানালায় কিসের ভয়ানক শব্দ হইল। রাজমোহন কারণ বুঝিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া দেখিল ঝাঁপ খুলিয়া গেল এবং খোলা পথে দুইটি কৃষ্ণকায় পালোয়ানের মত মূর্ত্তি পর পর লাফাইয়া ঘরে পড়িল। তাহাদের দেহ বৃষ্টিজলে আর্দ্র, [illegible] এবং তাহাদের ভয়াবহ রক্তচক্ষুর অন্তরাল হইতে [illegible] আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

(চে'রের ওপর বাটপাড়ি)

আগন্তুকদের একজন বলিল, আরে চোয়াড়, নিজের পরিবারকে খুন করবি নাকি? সে নিজে যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই তাহা তাহার চেহারাতেই প্রকট হইতেছিল; তাহার হাতের ছোরাখানিও একবার ঝলকিয়া উঠিল।

রাজমোহনও গর্জ্জন করিয়া আগন্তুকদের দিকে ধাবিত হইল, প্রশ্ন করিল, কে তোরা? তাহার হাতের ছুরি দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।—আমার ঘরে ডাকাতি!

—ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া আগন্তুকদের একজন উত্তর দিল, আস্তে, আস্তে; গোলমাল করলে তোমার ঘরের লোকরাই জেগে উঠ্‌বে। ডাকাত নয় দোস্ত, একটু নিরীক্ষণ করে দেখ, আমাদের চিনতে পারবে।—তারপর মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওগো বাছা, একবার আলোটা এদিকে নিয়ে এসো তো, দেখা যাক তোমার স্বামী তার বন্ধুদের মুখ মনে রাখতে পারে কি না।

কিন্তু মাতঙ্গিনীর তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান লুপ্ত না হইলেও সে মুহ্যমানের মত পড়িয়াছিল—তাহার জীবনের উপর অতর্কিত আক্রমণ এবং এই অপ্রত্যাশিত বাধা দুইই তাহাকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাজমোহন বলিল, শত্রু হও মিত্র হও, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।

—আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার পরিবারকে নিকেশ কর!—দুঃসাহসী আগন্তুকের মুখ একটা পৈশাচিক হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। রাজমোহন উন্মাদের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমার যা খুসী করব, আমাকে ঠেকাবে কে শুনি! এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া আগন্তুকের বুকে ছুরি রসাইতে উদ্যত হইল। আগন্তুক বিদ্যুৎগতিতে সরিয়া গিয়া সে আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিল এবং নিজের বিশাল তরবারির এক আঘাতে রাজমোহনের হাতের ক্ষুদ্র অস্ত্র দশ হাত দূরে নিক্ষেপ করিল। নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে সে সজোরে লৌহমুষ্টিতে রাজমোহনের হাত চাপিয়া ধরিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, ভিখু, আলোটা এদিকে ধর তো, আমার মুখটা ওকে দেখতে দে। বাপ রাজু,

এ চাঁদ-মুখ বাবা, তোমার চন্দ্রবদনী স্ত্রী এ মুখ দেখলে খুসীই হবে। ভিখু প্রদীপ আনিয়া তাহার সঙ্গীর মুখের কাছে ধরিল।

রাজমোহন বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—সর্দ্দার! আগন্তুক জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সর্দ্দার! যাহোক তবু চিনতে পারলে দেখছি! বন্ধুরা এত সহজে কি বন্ধুদের ভোলে?

রাজমোহনের রাগ কিন্তু ইহাতে প্রশমিত হইল না, সমান ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, তোমরা এখানে কেন? আমার বাড়ীতে চড়াও হবার মানে কি?

—আগে বল, তোমার বউকে খুন করতে যাচ্ছিলে কেন।

—সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন? দেখ, ভালয় ভালয় বলছি কেটে পড়, সর্দ্দার টর্দ্দার আমি মানি না, না গেলে লাথি মেরে বের করব।

সর্দ্দার ঠাট্টা করিয়া বলিল, বটে! কুলুপ-কলে তো পড়ে আছ, লাথি মারবে কে শুনি?

আমার পা এখনও স্বাধীন আছে, বজ্রনির্ঘোষে এই কথা বলিয়া রাজমোহন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন প্রচণ্ড পদাঘাত করিল যে ডাকাত-সর্দ্দারের লোহার মত দেহও কয়েক পা পিছাইয়া গেল, এবং রাজমোহনের বদ্ধ হাত দুইটিও মুক্ত হইল।

রাজমোহন তাহার ছুরিখানির দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া সর্দ্দার চীৎকার করিয়া বলিল, ভিখু, ওকে ধর, বেঁধে ফেল্।—হুকুম শেষ হইতে না হইতে ভিখুর ভীমবাহু রাজমোহনকে ধরিয়া ফেলিয়া ভূপাতিত করিল। সর্দ্দার ধূলিলুণ্ঠিত রাজমোহনের বুকের উপর বাঘের মত ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সে যতক্ষণ এই ভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিল ততক্ষণ অন্ত্যজন মাতঙ্গিনীর কাপড় টাঙাইবার আনলার বাঁশ হইতে দড়ি খুলিয়া শক্ত করিয়া তাহার হাত দুইটি বাঁধিয়া ফেলিল।

সর্দ্দার বলিল, বিশ্বাসঘাতক, তোমার প্রাণ এখন আমাদের হাতে।

—তা হতেই পারে, তোমরা দুজন, আমি একা। কিন্তু আমি কি করেছি যে আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করছ?

—কি করেছ? বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমার ভায়রা-ভাইকে বাঁচাবার জন্যে তুমি কি তাকে আগে থাকতে সাবধান করনি—চুকলিখোর কোথাকার!—সর্দ্দারের চোখদুটি রাগে জ্বলিতে লাগিল।—তুমিই খবর পাঠিয়েছ, তোমাকে মরতে হবে।

রাজমোহন বলিল, আমি? আমি তাকে খবর দিয়েছি?

—আকাশ থেকে পড়লে দেখছি! তুমি নয়তো কে? বোকামি হয়েছে আমারই। বিশ্বাস করেছিলাম তোমার ভায়রার বিরুদ্ধে আমাদিগকে তুমি সাহায্য করবে। তুমিও কম শয়তান নও—আমাদের সামনে মাধবের নামে তুমি যে সব কথা বল্‌তে তাতেই তো তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম!

রাজমোহন তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সত্যি বল্‌ছি, আমি খবর দিইনি।—সর্দ্দারকে সে ভাল রকমেই চিনিত এবং চিনিত বলিয়াই নিজের জীবন সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা হইতেছিল।—বিশ্বাস কর, আমি একাজ করিনি। মনে করে দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গেই বাড়ী ছেড়ে গেছি এবং ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যে তোমাদের সঙ্গ কি আমি ছেড়েছি?

—থাক্ থাক্, ঢের চালাকি হয়েছে—ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছ আর কি! এই দেয়ালের পাশে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমার স্ত্রী ঠিক ঘুমুচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে একবার ঘরের ভেতর আসনি তুমি? তাকে সব বলে তুমি তার হাত দিয়েই খবর পাঠিয়েছ, আমরা বুঝি না? বল যে এও মিথ্যা। সে খবর না দিলে আর কে খবর দিতে পারে শুনি!

—স্বীকার করছি সেই খবর দিয়েছে কিন্তু আমার অজান্তে। আমি যখন ঘরে ঢুকেছিলাম তখন সে সত্যি ঘুমুচ্ছিল। যে কোনও দিব্যি করতে বল করতে রাজি আছি।

সর্দ্দার রূঢ় কণ্ঠে বলিল, ঢের মিথ্যে বলেছ আর নয়। তোমাকে চিন্‌তে আর বাকী নেই। তোমার মতলব যদি খারাপই না হবে, মাধব ঘোষের বাড়ী থেকে হাঁক শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পালিয়ে এলে কেন? তোমার মতলব হাঁসিল হয়েছে, তখন আর থেকে দরকার? শোন বন্ধু, ঢের বয়েস হ'ল আমার, এত সহজে আমাকে ঠকাতে পারবে না। মরতে প্রস্তুত হও।

রাজমোহনের নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছিল। সর্দ্দারের বিপুল বপুখানি তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট শক্ত হইলেও আর অধিকক্ষণ সে গুরুভার সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, দোহাই তোমার আমাকে ছেড়ে দাও, ইষ্টদেবতার দিব্যি করে বলছি একথা ঠিক নয়, মায়ের দিব্যি আমি কিছুই জানি না।

—তোমার স্ত্রীইবা এ কাজ করলে কেমন করে? সেতো ঘুমুচ্ছিল!—এই প্রশ্ন করিয়া দস্যুসর্দ্দার রাজমোহনের বুক হইতে নামিয়া বসিল কিন্তু হাত দুইটি তাহার গলা হইতে নামাইল না—প্রয়োজন হইলে গলা চাপিয়া ধরা কঠিন হইবে না।

—সে হয় তো ঘুমের ভাণ করে পড়েছিল।

—হা হা, খুব বোকা পেয়েছ আমাকে! আমি চেয়েছিলাম ঘরের দেওয়ালের পাশ থেকে দূরে গিয়ে পরামর্শ করতে, তুমিই বললে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে। কোনও কুমতলব না থাকলে তুমি তা বলবে কেন? তুমি মাধব ঘোষের কাছে আমাদের নামে লাগিয়েছ, কে জানে কালকে পুলিশের কাছে লাগাবে কি না! মাধব তোমাকে নিশ্চয়ই বাঁচাবার চেষ্টা করবে আর তুমি বেঁচে থাকলে আমাদের স্বস্তি নেই—খুব পালিয়ে এসেছিলে—নইলে এতক্ষণ সাবাড় হয়ে যেতে!

রাজমোহন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা এখন ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে কি? মাধবের কাছে খবর দেবার জন্যে যাকে পাঠিয়েছিলাম বলছ, আমি তাকেই খুন করতে যাইনি? তোমরা না এলে এতক্ষণ কোথায় থাকত সে?

—হুঁ—সর্দ্দার যেন একটু দ্বিধায় পড়িল, পরামর্শ চাহিয়া তাহার নির্ব্বাক সঙ্গীর মুখের দিকে সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

ভিখু বলিল, হ্যাঁ সর্দ্দার, ও ঠিকই বলছে।

রাজমোহন তখন ভয়ে কাঁপিতেছে, সে বলিল, আমাকে যে কারণে তোমরা দোষী করছ ঠিক সেই কারণেই আমি ওকে খুন করছিলাম।

সর্দ্দার লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে ... মাগী গেল কোথায়? ওকেই খুন কর। সে রাজ... রাজমোহনের শাণিত ছুরির নীচে যেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল সেখানে ছুটিয়া গেল। এক স্থানে কয়েকটা কাপড় গাদা করা ছিল, সেখানেও সে হাতড়াইতে লাগিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলোকে স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছিল না।

—হতভাগী গেল কোথায়? ভেবেছে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, সেটি হচ্ছেনা বাবা—খুঁজে বের করবই তোকে।

রাজমোহনের কণ্ঠস্বর ততক্ষণে স্বাভাবিক হইয়াছে, সে বলিল, থাম, আমি ছাড়া আর কেউ আমার স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করতে পারবে না। আমার বাঁধন খুলে দাও।

সর্দ্দার ঘরের চারিদিকে দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছিল। সে ভিখুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভিখু দড়িটা খুলে দে, আমি চুলের মুঠি ধরে ওকে বের করছি। ভিখু তরবারির আঘাতে রাজমোহনের হাতের বাঁধন কাটিয়া দিল। সর্দ্দার আর একটা কাপড়ের গাদায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, হেৎ, খালি কাপড়ই দেখছি। দাঁড়া মাগী, পালাবি কোথায়?—ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিছানার পাশে আসিয়া সর্দ্দার তাহার উপর যথেচ্ছ হাতিয়ার চালাইতে লাগিল, কিন্তু মাতঙ্গিনী কোথায়?

সর্দ্দার হাঁকিল, ভিখু, বাতিটা নিয়ে আয়, তক্তপোষের তলায় লুকুলো কিনা দেখি।—ভিখু আলোটা বেশ করিয়া উস্কাইয়া লইয়া আসিল, রাজমোহনও পিছনে পিছনে আসিল; হামাগুঁড়ি দিয়া তিনজনেই দেখিল, কেহই সেখানে নাই।

বাতিটা উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহারা ঘরের আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র খোঁজ করিল কিন্তু মাতঙ্গিনীকে দেখিতে পাইল না। রাজমোহন দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, দরজার দিকে চেয়ে দেখ, খোলা না? আমি ঘরে ঢুকে হুড়কো বন্ধ করেছিলাম। হতভাগী পালিয়েছে।

মাতঙ্গিনী সত্যই পলাইয়াছিল। সর্দ্দার ও তাহার স্বামী যখন পরস্পরের প্রাণ লইয়া ঘোর যুদ্ধে মত্ত ছিল তখন তাহার কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না। এই দুই বর্ব্বর অপেক্ষা হৃদয় যাহাদের অল্প কঠোর তাহারা মাতঙ্গিনীকে একবার দেখিলে তাহার কথা ভুলিতে পারিত না। অলক্ষিতভাবে মাতঙ্গিনী দরজা পর্য্যন্ত গিয়া সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—শব্দ যদি কিছু হইয়াও থাকে যুদ্ধরত দুই মহাবীরের আস্ফালনে তাহা কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সর্দ্দার ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওকে ধরা চাই, নইলে ও আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।

রাজমোহন বলিল, হ্যাঁ, তাই চল, কিন্তু সাবধান আমার স্ত্রীর গায়ে কেউ হাত তুলোনা, তাকে তোমরা ধরো কিন্তু খুন করতে হলে আমিই করব; আমি যদি তা না করি তোমরা আমাকে মেরে ফেলো। আর কেউ যেন ওকে না ছোঁয়। চল আমিই আগে আগে যাচ্ছি।

তিনজনেই দ্রুত বাহির হইয়া গেল। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সর্ব্বত্র পলাতক সুন্দরীর অনুসন্ধান করা হইল। এদিকে প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল না, সময় অত্যন্ত কম।

প্রথমেই রাজমোহন কনকের বাড়ী গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবে ঠিক করিল। সর্দ্দারও সে পা টিপিয়া টিপিয়া কনকের কুটির পর্য্যন্ত গেল তারপর দাওয়ায় উঠিয়া ঝাঁপ তুলিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, আলোকের অভাব সত্বেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল মা ও মেয়ে ঘুমাইতেছে।

আশে পাশের ঝোপে ঝাড়ে খোঁজা হইল কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। মেঘাচ্ছন্ন সিক্ত প্রত্যূষের স্থলে রৌদ্রময় লোহিতাভ প্রভাতের সূচনা দেখা গেল, দস্যুরা আর অধিকক্ষণ বাহিরে থাকা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিল না। তাহারা রাত্রিতে কোথায় মিলিত হইবে তাহা স্থির করিয়া লইয়া পরস্পর পৃথক হইল। সর্দ্দার একথা জানাইতে ভুলিল না যে রাজমোহন যদি অনুপস্থিত হয় তাহা হইলে—বাক্যটি সমাপ্ত না করিয়া সে একটি কুৎসিৎ শপথ উচ্চারণ করিল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

নারী-জীবন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাক্তার শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম-বি, ডি-পি এইচ প্রণীত; কলেজ রোড, ফরিদপুর—সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা।

সৌভাগ্যের বিষয় ধাত্রীশিক্ষা, প্রসূতি-পরিচর্য্যা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মত ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকেরা এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন। ডাক্তার অভয়কুমার সরকারও এই বিদ্যায় হাত পাকাইয়াছেন। তিনি আজীবন মফঃস্বলে থাকিয়া গ্রামে গ্রামে বহুবিধ রোগীর সেবা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা কলিকাতার চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বলিয়াই এই স্বতন্ত্র পুস্তক তাঁহাকে রচনা করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, 'গ্রাম্য ধাত্রী ও অল্পশিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদের জন্য এই পুস্তকখানি লেখা বিশেষ প্রয়োজন আছে বোধ করিয়াই প্রণয়ন করিয়াছি।'

এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখান হইতে ধাত্রীবিদ্যার সূত্রপাত সেখান হইতেই গ্রন্থের আরম্ভ নহে। নারীজীবনের বিশেষত্ব, মাতৃত্বের বিকাশ, বিবাহের বয়সনির্ণয়, বিবাহের দায়িত্ব, বিবাহ বংশরক্ষার মূল, বিবাহে স্বয়ম্বর-প্রথা, মাতৃত্বে ব্রহ্মচর্য্য, অকালমাতৃত্ব, মাতৃত্বে ঋতু-পরিচর্য্যা, ঋতুকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ ও তাহার প্রতিকার এবং জনন-যন্ত্রাদি ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা আছে। গ্রন্থখানি সাধারণের উপকারে লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মা—ম্যাক্সিম গর্কী; অনুবাদক, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং, ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথম ভাগ, দাম পাঁচসিকা।

আমাদের বাংলাদেশ 'অরিজিন্যালিটি'র দেশ; চুনোপুঁটি হইতে রুই কাতলা সকলেই এখানে 'অরিজিন্যাল' হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন। উপন্যাসে গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় সকলে নিজ নিজ মনের গোপন রহস্য-সম্ভার বাহিরের উন্মুখ জগতকে দিবার জন্য দানসত্র খুলিয়া বসিয়া আছেন; অরিজিন্যাল গ্রন্থে গ্রন্থে দেশ ছাইয়া গেল।

কিন্তু তাহাতে কি? বঙ্গবাণীর দরবার যে তিমিরে সে তিমিরেই পড়িয়া আছে—এখানে সেখানে যেটুকু চমক দেখা যাইতেছে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নামে অরিজিন্যাল হইলেও সেখানে গলদ আছে; পাশ্চাত্য ভাব এবং বস্তু, অরিজিন্যাল বাঙালীর অরিজিন্যালিটি ভেদ করিয়াও উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কাহারও নিকট ঋণ স্বীকার করিতে বাঙালীর লজ্জার অবধি নাই।

অন্যদেশের ভাব ও বিষয়বস্তুকে নিজের ভাষায় সার্থক রূপ দান করা যে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে ছোট কীর্ত্তি নয় একথা বাঙ্গালীকে কে বুঝাইবে? আমরা অতিনিকৃষ্ট গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-লেখকের নাম অহরহ শুনিতে পাই, একজন উৎকৃষ্ট অনুবাদকের নাম কদাচিৎ শুনি—অথচ ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিক দিয়া শেষোক্তদের দানের সহিত প্রথমোক্তদের দানের তুলনাই হয় তো হয় নাই। আমাদের মধ্যে কয়জন 'ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের' অনুবাদকের নাম জানি? অথচ বঙ্গবাণীর গলায় মণিহারে ইহার তুল্য মণি খুব কমই আছে। অনুবাদ করিতে বসিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, অরিজিন্যালিটির ক্ষেত্রে অনেক যশস্বী সাহিত্যিকই হয় তো তাহা করেন নাই কিন্তু হতভাগ্য অনুবাদককে কেহ মনে রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করেনা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় গীজোর ইয়োরোপীয় ইতিহাসের যে চমৎকার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা কয়জন চোখে দেখিয়াছি? সুতরাং এই হতভাগ্য দেশে গর্কীর Motherএর এই অপরূপ ভাষান্তর করিয়া নৃপেন্দ্রবাবুরও আশান্বিত হইবার কারণ নাই।

যে দেশ আমাদের সকল অরিজিন্যালিটির মূল প্রেরণা যোগাইয়া থাকে সেই পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু অনুবাদকের অন্য ইতিহাস। অনুবাদক [illegible] এবং রসেটি, ফিটজেরাল্ড এবং বার্টন সেখানকার সাহিত্যে স্থায়ী আ[illegible] করিয়াছেন এবং সে আসন ছোট আসন নয়। ইংরেজি[illegible]

অনুবাদক গার্নেট দম্পতী, টলষ্টয়ের অনুবাদক মড্, লাগেরলফের অনুবাদক ওয়েষ্ট—মূল গ্রন্থ লেখকদের প্রায় সমান প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অবশ্য আমাদের দেশের অনুবাদকদেরও দোষ আছে ; তাঁহারা বাহিরকে বাহিরই রাখিয়া দেন, ঘর করিয়া তুলিতে পারেন না—দশ হাজার মাইলের ব্যবধান ভাষাতেও থাকিয়া যায়। যে কোনও ভাষার পাঠককে ভিন্ন দেশীয় কোনও পুস্তকের রসাস্বাদন করাইতে হইলে ভাষার সাহায্যে এমন আব-হাওয়ার সৃষ্টি করিতে হয়, যাহার মধ্যে পড়িয়া পাঠক যেন মনে করিতেই না পারে—এ কোথায় আসিলাম। পদে পদে হোঁচট খাইয়া চলিতে হয় বলিয়া অনেক অনুবাদই জমে না।

নৃপেন্দ্র বাবুর অনুবাদ এই দোষ বর্জ্জিত - তিনি অতি পরিচিত আব্-হাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে তিনি বাঙালীকেই রাশিয়ার মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতেছেন। তাই আশা হয়, বাঙালী হয় তো মুগ্ধ হইয়াই এ মূর্ত্তি দেখিবে। অনুবাদ পড়িতে পড়িতে মনে নেশার সঞ্চার হয়, একটা অত্যন্ত চেনা সুর কানে বাজিতে থাকে ; লিখিতে লিখিতে অনুবাদকের মনেও এই নেশা জমিয়াছিল বলিয়াই এরূপ হয়, নতুবা ভাষান্তরিত এই উপন্যাসখানির মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতাম না। এই অনুবাদ করিতে অনুবাদককে সাধনা করিতে হইয়াছিল—সম্ভবতঃ তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে।

প্রকাশকেরও কৃতিত্ব আছে, ছাপা-বাঁধা চমৎকার হইয়াছে কিন্তু তবু মন খুঁৎখুঁৎ করে। একসঙ্গে সমগ্র উপন্যাসটি প্রকাশ করিলেই যেন ভাল হইত।

কুয়াসা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী। সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং—৭৯।১৩এ লোয়ার সারকুলার রোড্, মূল্য এক টাকা।

পৃথিবীর বয়স যত বাড়িতেছে তাহার হতভাগা সন্তানদের মনও তত পাকিয়া যাইতেছে। আগে তাহারা সত্যকার গল্প শুনিতে ভালবাসিত তাই কথাসরিৎসাগর, ঈশপের গল্প, আরব্য উপন্যাস রচিত হইয়াছিল। এখন আমরা গল্প শুনিতে চাহি না—মনস্তত্ব চাই। মানুষের মন পীড়িত হইয়াছে তাই বিষ দিয়া বিষক্ষয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কুয়াসার গল্পগুলি পড়িয়া বড় আরাম পাইলাম, জ্ঞানেন্দ্রবাবু গল্পই বলিয়াছেন—মন লইয়া টানা-হ্যাঁচড়া করেন নাই। কুয়াসা, হৃদয়-বিনিময়, যমজ ভাই, ট্র্যাজেডী না কমেডী—খানিকক্ষণের জন্য আমাদের পুরাতন সুস্থ মনের আনন্দ বিধান করিল। বুঝিতেছি, ক্ষুধা এখনও যায় নাই, শুধু লঘু পথ্যের অভাব ঘটিয়াছে। 'কুয়াসা' লঘু পথ্য—নির্ব্বিচারে সকলে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন।

ভাগ্যস্রোত—শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ, গোপাল পাব-লিশিং হাউস, ১২ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা, মূল্য ...

সুধীর বাবু এই উপন্যাসখানিতে লঘু পথ্যই পরিবেশন করিয়াছেন ; 'বৈচিত্র্যহীন প্রেমের কাহিনী এবং অমূলক সমাজ সমস্যা' লইয়া মাথা ঘামান নাই। তিনি নিছক গল্প বলিয়াছেন, তাঁহার দুই আর দুয়ে চারই হইয়াছে, পাঁচ হয় নাই। গল্পের মধ্যে মধ্যযুগীয় সারল্য আছে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান শরৎ পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাহিরের বিশ্বে আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইল। একটি টাকা তাহার মূলধন - আর একটি কাগজের টুকরায় লিখিত পাঁচটি অদ্ভুত উপদেশ তাহার সহায়। উপদেশ-গুলি এই—১। পথ ছেড়ে অপথে যাবে। ২। যার ভাত নেই তার জাত নেই। ৩। ঘাট ছেড়ে আঘাটায় নাবে। ৪। জাগরণে ভয়ং নাস্তি। ৫। অতি ক্রোধে ধৈর্য্যং। এই পাঁচটি বিচিত্র উপদেশ অনুসরণ করিয়া শরৎ কি করিয়া ধনী ও বিখ্যাত হইল তাহার ইতিহাস কৌতুকপ্রদ। কয়েক ঘণ্টা অবসরযাপনের পক্ষে 'ভাগ্যস্রোত' সার্থকসৃষ্টি !

ময়নামতীর চর—বন্দে আলী মিয়া। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

চর আমরা দুই রকম দেখিয়াছি—শুধু বালুরাশি ধূ-ধূ করিতেছে, সবুজের স্পর্শ নাই চখাচখী আসিয়া বসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের উড়িয়া যাইতেও বিলম্ব হইতেছে না। আর এক রকম চর, তৃণে শস্যে শ্যামল, গাছপালায় মনোহর। মানুষ সেখানে বাসা বাঁধিয়া বাস করে, পাখীদের কূজনে-গুঞ্জনে চরের আকাশ মুখর হয়। ময়নামতীর চর এই শেষোক্ত জাতীয়। এখানে

> অশথের তলে জলি ধান লাগি চাষীরা বেঁধেছে কুঁড়ে—
> কাঁচা যবশীষ আলোর ডাকেতে আসিয়াছে মাটি ফুঁড়ে।
> ছায়া আর রোদে ঝিকিমিকি জ্বলে হাজার উর্ম্মিদল
> কূলে কূলে তার আছাড়িয়া পড়া—দিনে রাতে কোলাহল।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের এমন নিকট স্পর্শ বাংলাভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়চে না।"

লক্ষ্যহারা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলাপ পাব্লিশিং হাউস, ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অতি-আধুনিক টেক্‌নিকে লেখা একখানি উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে অতি-আধুনিক বলিয়া যে ভাবধারা বহিয়াছিল, তাহার স্রোত একেবারে বন্ধ না হইলেও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ইহার অন্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের চাইতে বড় কারণ হয়ত এই যে এই গোষ্ঠীতে এমন কোন শক্তিশালী লেখক আজ পর্য্যন্তও দেখা দেন নাই, যিনি নাকি নিন্দা-কুৎসাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া অধ্যবসায় ও সাধনা করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া এ ধারা যে ভবিষ্যতে আবার কোন দিন প্রবলতর হইয়া দেখা দিবে না এমন বলা যায় না। বরং বলিতে হয়, দেখা দিবার সম্ভাবনাই বেশী। এবং দেখা দিলে আমরা খুসীই হইব।

কেননা, আসলে অতি-আধুনিকদের যে উগ্র [illegible] উদ্দেশ্যকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। [illegible] সমালোচনা ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা ইহার মধ্যকার মেকী ও মিথ্যাকেই লাঞ্ছিত করিবার জন্য। সে লাঞ্ছনা দুর্বল প্রাণ-শক্তির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নাই, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান উপন্যাস খানি অতি-আধুনিক সাহিত্যের তেমন কোন বিশিষ্ট দান নয়—তবু এ বইয়ে এই ভাবধারার দোষ ও গুণ দুয়েরই কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের বক্তা অজয়দা। তাহার কাছে 'দেশের দারিদ্র্য আকাশের তারার মত চোখের উপর ফুটে ওঠে'—তাহার বন্ধু 'অশান্তর আলো দিয়ে সত্যিকার ভারতবর্ষকে' সে দেখিয়াছে 'রুগ্ন বিকলাঙ্গ, উপবাসী।' দেশের দারিদ্র্যের জন্য এই বেদনাবোধ অতি-আধুনিকতার একটি বিশিষ্ট দিক—কিন্তু ইহা যখন ম্যানারিজ্‌ম্ হইয়া উঠে, তখন ইহার ন্যাকামি অসহ্য।

এই অজয়দা 'অশান্তর ভারতবর্ষকে' 'উমার মধ্যে' দেখিলেন—এই উমা বিধবা। সুতরাং প্রতুলের আসিতে বিলম্ব হইল না। অতঃপর একদিন উমা নিজের মুখে নিজের পরিচয় অজয়কে দিতেছে—'প্রতুল কলকাতা থেকে নিয়ে গেল আমায় গিরিডি।...' তারপর প্রতুল 'নিজে যে ভার বইতে পারেনি' তাহা এক বন্ধুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশ হইল। অতএব উমা 'কলকাতার সমাজ বিশেষে...আজ সকলের উদ্বেজনা।' এই ধরণের নায়িকা আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। ইহার একঘেয়েমিতে সমালোচক কেন পাঠকেরাই হয়ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহাকে লইয়া আলোচনা করিব না। উপন্যাসের একটি সাব-প্লটও আছে। বন্ধু অশান্তর সহিত সাকিনার আখ্যান। সাকিনার একখানি চিঠিতেই বইখানি শেষ হইয়াছে। চিঠির শেষাংশ এই —সাকিনাকে অশান্ত চিঠি দিয়াছে—'তোমার প্রেম আমাকে যেন কি এক কঠিন দায়ীত্বে (?) আটকে রেখেছে। আমার উদ্যমকে যেন কোমল ক'রে দিচ্ছে। সুতরাং বিদায় সাকিনা!' ইহার উত্তর সাকিনা অজয়কে দিতেছে—'এই আপনার বন্ধুর চিঠি—আপনার কাপুরুষ বন্ধুর, দুর্ব্বল বন্ধুর আমার কাছে শেষ প্রেম পত্র। আপনারা তাকে অসমসাহসিক বলেন, আমি কিন্তু এখন তাকে সব চেয়ে ভীরু বলে ঘৃণা করি। আপনার বন্ধু কি ক'রে ভাবতে পারল জানিনা যে, তার মতো একটি দুর্ব্বল চিত্ত, যার কাছে নারী জীবনের কর্ম্মসঙ্গিনী নয়, যার কাছে নারীর প্রেম ব্রতের অন্তরায়, আমি যার কাছে শুধু মানসিক বিকার ও দৈহিক বাধা, তাকে পেলাম না ব'লে আমাকে আজীবন শোক করে কাটাতে হবে?'

বইখানির আখ্যানভাগে বৈচিত্র্য নাই, চরিত্রসৃষ্টিতেও নিপুণতার অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু তবু বইখানি পাঠ্য। বোধ করি লেখকের ইহাই প্রথম উপন্যাস। হয়ত একেবারেই বিক্রয় হইবে না, কেননা এদেশে সচল বইও অচল হইয়া পড়িয়া থাকে। অনেক ভাল বইয়ের নাম করা যায়, তিন বৎসরে যাহার একটি সংস্করণও ফুরায় নাই। সাহিত্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের অসীম ধৈর্য্যে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আমরা লেখককে সেই ধৈর্য্যের সহিত একনিষ্ঠ পরিশ্রম করিতে দেখিলে সুখী হইব।

জাতিস্মর—শ্রীশরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশক পি, সি সরকার এণ্ড কোং, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

গল্পের বই—তিনটি গল্পে বইটি সমাপ্ত। লেখক নিজে গল্পগুলির পরিচয় দিয়াছেন—"ইতিহাসসন্ধী গল্প।"......"ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তাৎকালিক আবহাওয়া যদি কিছুও সৃষ্টি করিতে পারিয়া থাকি তবেই উদ্যম সার্থক হইয়াছি জানিব।" লেখক সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ ধরণের গল্পের উপজীব্য শুধু আবহাওয়া। সে আবহাওয়া সৃষ্টি করা সহজ নহে। এমন অনেক ঐতিহাসিক গল্প বাংলায় পড়িয়াছি, যাহারা লেখক গল্প লিখিতে চেষ্টা করিয়া ইতিহাসের পাণ্ডিত্যে বাঁধা পড়িয়াছেন,—গল্প লিখিতে তো পারেনই নাই, অধিকন্তু ইতিহাসেরও মুণ্ডপাত করিয়াছেন। বর্ত্তমান তিনটি গল্পে ইতিহাসের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কেননা আমরা ইতিহাস জানি না—কিন্তু তাঁহার গল্প লেখার হাত আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহার ফলে 'লিপির সঙ্কেত-মন্ত্র' 'কুণ্ডল' পড়িয়া আনমনা হইয়া উঠিতে হয় এবং 'মৃগ মাংস ও সুরভিত হিঙ্গুল রঞ্জিত অতি উৎকৃষ্ট আসবের নৈশ আহারে' যোগদান করিতে ইচ্ছা করে। এবং যখন পড়ি—'যখনই আমাদের এই জন্মভূমির কঙ্কালসার ইতিহাস খানা আমার চোখে পড়ে তখনই মনে হয় ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার'—তখন অকস্মাৎ লজ্জিত হইয়া উঠি আর 'ষোলো শতাব্দীর আগেকার' যুগে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সোমদত্তার সহিত পরিচয় করিতে উৎসুক হই। এবং মনে হয় সে কেমন যুগ যখন 'আমাদের জামাকাপড়ের বালাই ছিল না। প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম্ম।' 'নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী। তাম্রবর্ণা কৃশাঙ্গী ক্ষীণকটি কঠিনস্তনী। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে প্রস্তর ফলকাগ্র বর্শা পঞ্চাশ হস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত।'

লেখক আমাদের কল্পনাকে চঞ্চল করিয়া তুলেন এবং ইহাই যথেষ্ট লাভ। কোথায় তাঁহার গল্পে কি ত্রুটি হইয়াছে, কাহিনী কোথায় দুর্ব্বল হইয়াছে—চরিত্রসৃষ্টি আরও ভাল হইতে পারিত কিনা সে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সমালোচনা মানে লেখকের যে-শক্তি আছে, সেই শক্তি সম্পর্কে তাঁহাকে সচেতন করা এবং পাঠক [illegible] কাছে তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় দেওয়া। শরদিন্দু বাবু[illegible] পরিচয় পাইয়াছি, বাংলার পাঠক সাধারণকে তাঁহার [illegible] করি এ পরিচয় স্থায়ী হইবে।

যুগগুরু—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

শ্রীমতিলাল রায় বাংলা দেশে অপরিচিত ব্যক্তি নন্। সাহিত্যও তাঁহার একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র নহে। এবং তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয়ও দেশবাসী বহুদিন হইল পাইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানির আলোচ্য বিষয় যুগে যুগে যাঁহারা ভারতের পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন তাঁহারা—শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, রামানন্দ, তুকারাম, রামদাস, কবীর, দাদু, বল্লভাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক ও বাংলায় যুগ সাধনা।

বইখানির ভাষা ইংরেজীতে যাহাকে বলে oratorical তাহাই, সুতরাং তথ্যানুসন্ধানের দিক দিয়া বইখানির মূল্য তেমন নয়। কিন্তু এ বই মনে সুর লাগায়, কিশোর চিত্তে নাড়া দেয়। বোধ করি সেই উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত। উদ্দেশ্য সফল হইবে।

আভ্যুদয়িক

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এই নিম্নলিখিত চিঠিটি পাইয়াছি।

বঙ্গশ্রী সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার 'লালচুল' (বঙ্গশ্রী—ফাল্গুন) গল্পের সম্বন্ধে অভ্যুদয় নামক একটি কাগজে ব্যঙ্গ করিয়া কয়েকটা কথা লেখা হইয়াছে, তাহার সরলার্থ, উহা কোন ইংরাজী লেখা হইতে চুরি। কোন লেখকের কি লেখা চুরি করিয়াছি তাহা প্রকাশ করা সম্পাদক কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। যে দু'লাইন ইংরাজী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আমার গল্পের একটা কথারও মিল পাইলাম না। অতএব কলিকাতায় ফিরিয়া আমাকেই অভ্যুদয় আফিসে দৌড়িতে হইল। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয় নাই, চিঠিতে প্রার্থনাটা জানাইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু চিঠিটার জবাব দেওয়াও সম্পাদকীয় সৌজন্যে বাধিল। আবার একদিন গিয়া সম্পাদককে আফিসে ধরিলাম। মিনতি জানাইলাম, কোন লেখা হইতে চুরি করিয়াছি—কৃপা করিয়া জানাইয়া নিঃসংশয় করুন। উত্তর পাইলাম—'আপনাকে ত' চোর বলা হয় নাই, যাহা হউক এক সপ্তাহ পরে চিঠির মারফত জবাব পাইবেন।' তাহারই প্রত্যাশায় আছি।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই মজাটা দেখিতেছি, আগে চোর বলিয়া দিয়া তাহার পর কি চুরি করিল, কোথা হইতে চুরি করিল ভাবিয়া চিন্তিয়া গবেষণা করিয়া ঠিক করিতে হয়। নিবেদন ইতি।

বিনীত—শ্রীমনোজ বসু
১৩।৩।৩৩

এ [illegible] আমাদেরও কিছু বলিবার আছে। চুরি করা পাপ, চুরি [illegible] ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু [illegible] ত গেলে যাঁহার লেখা হইতে চুরি তাঁহার ও যে গ্রন্থ হইতে চুরি তাহার নাম ও প্রকাশ করাই সঙ্গত। নাম গোপন করিয়া রহস্য করিবার কোনও কারণ এক্ষেত্রে থাকিতে পারে না। অভ্যুদয় আপনা হইতে নাম তো দেনই নাই, নাম চাইয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে কোথায়ও গোল আছে; আসলে ব্যাপার কিছুই নয়, একটা ধোঁকার সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য।

যখন কথা উঠিয়াছে তখন অভ্যুদয়ের উচিত নাম-ধাম প্রকাশ করা, পাঠকেরা আসল ও নকল মিলাইয়া দেখিলে কে চোর এবং কে জুয়াচোর সহজেই ধরিতে পারিবেন।

'বঙ্গশ্রী'র মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হুইস্‌ল' কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্যের বিরুদ্ধেও আমাদের এই অভিযোগ। আমাদের বিশ্বাস, অভ্যুদয় আরও কিছুকাল ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লইলে বুঝিতে পারিবেন যে হুইস্‌ল কবিতাটির যে অনুবাদ তিন বৎসর আগে কোনও ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তিনি ধারণা করিয়াছেন, আসলে তাহা রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" কবিতার অনুবাদ, হুইস্‌লের নহে। নাম-ঠিকানা প্রকাশ করিবার সৎসাহস যতদিন না হইবে, ততদিন বলিব, অভ্যুদয় মিথ্যা বলিয়াছেন। নাম জানিতে পারিলে মূল ও অনুবাদ দুটি কবিতাই পাশাপাশি সম্পূর্ণ ছাপিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিব।

উদয়ন—

বৈশাখের ত্রিত্ববাদী উদয়ন জ্যৈষ্ঠে একেশ্বরবাদী হইয়াছেন অথচ মূল ধর্ম্ম বদলায় নাই। 'তিনে গোলমাল' এ কথা স্মরণ করিয়াই পরিচালক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে মহাশয় একাই 'মিনমিন' করিবেন স্থির করিয়াছেন। সাহিত্য ও ব্যবসায়—তিনি একাই যদি করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ কাটিয়াছে।

আশা হইতেছে জ্যৈষ্ঠের পত্রিকা দেখিয়া; বৈশাখের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে—দূরে রৌদ্র দেখা দিয়াছে। লেডী অবলা বসু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের আদর্শ-স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধটি চমৎকার। বাংলা সাহিত্যে এখনও এই ধরণের প্রবন্ধের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বাংলায় আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের, বাংলা ও বাঙ্গালী শক্তির অভিব্যক্তি—শ্রীহরিদাস পালিতের, দুইটি সুলিখিত প্রবন্ধ।

কিন্তু শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুর 'চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা' বসুমতী বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যের পৃষ্ঠায় না বাহির হইয়া উদয়নে কেন বাহির হইল বুঝিতে পারিলাম না। 'অহো হো—হায় হায়—গেল গেল'-জাতীয় প্রবন্ধ কোনও পত্রিকায় দেখিলে সন্দেহ হয়, মহামহোপাধ্যায়রা আসিতেছেন বুঝি।

'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ' নামক পত্রাংশে (প্রথম প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

'……বাঙালীর কান ব'লে কোনো বিশেষ পদার্থ ব'লে আমি মানিনে।' একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ এতকাল কি ধরিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে ঘুরপাক খাওয়াইলেন?